জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

প্রতিষ্ঠাতা : আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু

আবেদন

1948 সাল থেকে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা বিষয়ে পরিকল্পিত ধ্যান ধারণা পরিষদ পালন করে আসছে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রকাশনের মাধ্যমে। ইতিমধ্যে পরিষদ কিছু অমূল্য রচনা বাংলাভাষায় প্রকাশ করেছে। বর্তমানে পত্রিকা প্রকাশনা ছাড়াও পরিষদ বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতার বিকাশ ঘটে। গ্রাম বাংলার পল্লীতে, আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে ও শহরের বস্তিতে, যেখানে বেশির ভাগ মানুষ জ্ঞানের আলো থেকে এখনও বঞ্চিত, তাদের কাছে বিজ্ঞানের মঙ্গলময় রূপ তুলে ধরতে পরিষদ বদ্ধপরিকর। এইসব বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মসূচীর রূপায়ণে অর্থের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অথচ পরিষদের দারুণ অর্থাভাব। তাই পরিষদ সরকার, বেসরকারী সংস্থা, ব্যবসায়ী ও সহৃদয় ব্যক্তির কাছে অর্থসাহায্যের আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছে। সাধারণ মানুষের জন্য তৈরী আচার্য বসুর পরিষদ যে কোনও সামান্য দানও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করে অবহেলিত মানুষের স্বার্থে ব্যয় করবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে পরিষদে প্রদত্ত সর্বপ্রকার দান আয়করমুক্ত।

কর্মসূচী

1. সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা সৃষ্টি করা এবং বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তোলা।
2. 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকাকে সাধারণের নিকট আরও আকর্ষণীয় করে তোলা।
3. পরিষদের মাধ্যমে গ্রামবাংলার বিজ্ঞান ক্লাবগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা এবং তাদের বিজ্ঞান ভিত্তিক জনহিতকর কাজে উৎসাহিত করা।
4. প্রতি বছরে পশ্চিম বাংলায় অন্ততঃ একবার বিজ্ঞান সম্মেলনের ব্যবস্থা করা।
5. গ্রামবাংলার বিভিন্ন মেলায় বিজ্ঞান ক্লাবগুলিকে নিয়ে পোস্টার প্রদর্শনী, বিজ্ঞান ভিত্তিক সিনেমা, আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞান, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করা।
6. বছরের শেষে বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা।
7. হাতে-কলমে, কারীগরী বিদ্যা শিখিয়ে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রী ও নাগরিকদের স্বনির্ভরশীল করা। ব্যয়ভার বহনের জন্য সামান্য অর্থের বিনিময়ে টি. ভি. টেপরেকর্ডার, রেকর্ড-প্লেয়ার ট্রানজিস্টার, এমারজেন্সি বৈদ্যুতিক আলো, ফটোগ্রাফী বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া।
8. মাটি পরীক্ষার কাজে শিক্ষা দিয়ে গ্রামের বিজ্ঞান ক্লাবগুলিকে সাধারণ চাষীদের সাহায্য করতে উৎসাহিত করা।
9. সাধারণ মানুষের জন্য বিজ্ঞান প্রবন্ধ থেকে মৌলিক গবেষণাপত্র পর্যন্ত বাংলা ভাষায় প্রকাশ এবং জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বই ও বিজ্ঞান সাধক চরিতমালা প্রকাশ।
10. যোগব্যায়াম ও তার গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন।
11. পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারটিকে সুসমৃদ্ধ করে গড়ে তোলা।
12. পরিষদ ভবনে 'বিজ্ঞান সংগ্রহশালা' স্থাপন করা।
13. নির্বিচারে যথেচ্ছ গাছপালা ও বনজঙ্গল ধ্বংসের ফলে পরিবেশ দূষণ ও আবহাওয়ার মারাত্মক পরিবর্তনের ভয়াবহতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সজাগ করা।
14. নির্বিচারে বন্যপ্রাণী ধ্বংসের দরুণ বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যের বিঘ্ন ঘটার বিপদ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা।
15. যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করা।
16. শহর ও গ্রামের প্রতিটি স্কুল, কলেজ ও গ্রন্থাগারে পরিষদের মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার গ্রাহকীকরণের মাধ্যমে পরিষদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচার।

সুকুমার গুপ্ত
কর্মসচিব

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জানুয়ারী, 1983
36তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের অনুশীলন করে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও সমাজকে বিজ্ঞান-সচেতন করা এবং সমাজের কল্যাণকল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করা পরিষদের উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন লেখকদের স্বাধীন মতামত বা মৌলিক সিদ্ধান্তসমূহ পরিষদের বা সম্পাদকমণ্ডলীর চিন্তার প্রতিফলন হিসাবে সাধারণত নিতে হবে না।

বিষয় সূচী

প্রচ্ছদ—আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু আলোকচিত্র—সুকুমার গুপ্ত

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : 30·00 টাকা

প্রতি সংখ্যা : 2·50 টাকা

যোগাযোগের ঠিকানা :

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা-700006
ফোন : 55-0660

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষট্‌ত্রিংশত্তম বর্ষ জানুয়ারী, 1983 প্রথম সংখ্যা

নববর্ষের নিবেদন

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের মুখপত্র জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা বর্তমান সংখ্যায় 36তম বর্ষে পদার্পণ করল। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পূর্বে আচার্য বসু ও তাঁর সহকর্মীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পত্রিকাটি জন্মলাভ করেছিল—এখন অবশ্যই তার শৈশব অতিক্রম করেছে। কেবল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সম্ভার নিয়া যে একটি মাসিক পত্র জনমানসে সাড়া জাগাতে পারে, জ্ঞান ও বিজ্ঞান তার অনন্য নিদর্শন। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে পথিকৃত এই পত্রিকার অনুসরণে অনেক পত্র-পত্রিকাই প্রকাশিত হয়েছে; কিন্তু জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রতি পাঠক সাধারণের আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই আজ নববর্ষের প্রাকালে আমরা পত্রিকার পাঠক, লেখক ও অনুগ্রাহকদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি ও শ্রদ্ধা জানাই আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে—যাঁর অকৃপণ স্নেহ ও সাহায্যে এই পত্রিকা একদা পুষ্টি লাভ করেছিল। দেশে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার তিনি পুরোধা ছিলেন। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের জন্মলগ্নে দেশের বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানীই এই পরিকল্পনার পৃষ্ঠপোষকতা অর্থবহ মনে করেন নি। এই সমর্থনের একান্ত প্রয়োজন, কারণ মাতৃভাষায় বিজ্ঞান প্রচারে বিজ্ঞানে জ্ঞান থাকা প্রথম শর্ত, দ্বিতীয় শর্ত মাতৃভাষা জানা। বিজ্ঞান প্রচারে পরিভাষা একটি প্রতিবন্ধক সন্দেহ নাই। অন্তত বাংলা ভাষায় দুরূহ বৈজ্ঞানিক শব্দের সমার্থক অনন্য পরিভাষা সবসময়ে সুলভ নয়। জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে পরিভাষা প্রণয়নের পরোক্ষ কার্য কিঞ্চিৎ সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে। এই সব রচনার পরিপ্রেক্ষিতে একদিন পরিভাষা সমস্যার সমাধান অসম্ভব নয়। তবে পরিভাষার প্রয়োজন নাই—একথা স্বীকার করা চলে না। কারণ বিজ্ঞানচর্চার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের স্থান এখনও অপরিসর—তাই বিদেশী শব্দের অবিকল ব্যবহার বা সমার্থক পরিভাষা নিশ্চিত প্রয়োজন। বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্লাব, বিজ্ঞান পত্রিকা ও সরকারী প্রচেষ্টা এই সমস্যা সমাধানে অবশ্যই ভূমিকা নিতে পারে। বিজ্ঞান-মনস্ক সাধারণ পাঠকদের বিজ্ঞান সচেতন করে তুলতে তত্ত্ব ও তথ্য-নির্ভর রচনায় পরিভাষার সার্থক ব্যবহার অবশ্যই প্রয়োজন।

আশার কথা, এদেশে একশ্রেণীর পাঠক নিয়মিত বিজ্ঞান সাহিত্য পড়েন ও পত্র-পত্রিকায় আলোচনা করেন; বিজ্ঞান পত্রিকার বহুল প্রচলনে এই মানসিকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে সবুজ বিপ্লব ও বিদ্যুতের কল্যাণে সাধারণ মানুষও আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতন। ক্রমশ অন্ধ কুসংস্কারের কুয়াশা ভেদ করে যেন আলোক দৃশ্যমান। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের মাধ্যমে তা উজ্জ্বলতর করাই বিজ্ঞান সাহিত্য রচয়িতা ও বিজ্ঞান প্রচারকদের আদর্শ হউক। দেশে বিজ্ঞান চর্চার বহুল প্রসার ঘটেছে। বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান গবেষকেরা এই কর্মযজ্ঞে অধিকতর ভূমিকা গ্রহণ করুন—এটাই আমাদের আবেদন।

এই প্রসঙ্গে আরও আবেদন—আগামী দিনের লেখকেরা যেন বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর আসর, বিজ্ঞান ও সমাজ, বিজ্ঞান সংবাদ প্রভৃতি বিভাগগুলি আরও প্রাণবন্ত করতে সচেষ্ট হন। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের রচনা হাল্কা কাহিনীর মত সাবলীল হোক এটি যেমন আমাদের অভিপ্রেত নয়, তেমনি দুরূহতায় সাধারণের দুর্বোধ্য হোক—এটিও আমরা চাই না। নূতন ও পুরাতন লেখকদের নিকট এই বিষয়ে আমরা পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করছি।

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের মুখপত্র। তাই পরিষদের কর্মধারাও এই পত্রিকার মাধ্যমেই প্রকাশ পেয়ে থাকে। গত 21শে জানুয়ারী '83 বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন হয়ে গেল। সাধারণ সভা ও নির্বাচনে নূতন কার্যকরী সমিতি দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন।

এখন সবাইকে আমরা আমাদের কর্মযজ্ঞে আহ্বান জানাই। আসুন—আমরা একযোগে কাজ করে পরিষদের কর্মধারাকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দিই। গত বছরের কর্মধারার হিসাব-নিকাশ মেলাতে গিয়ে আমরা দেখেছি—বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যেই বেশ কিছু কর্মসূচী আমরা রূপায়িত করতে পারি নি। সাধ থাকলেও অনেক সময় সাধ্য থাকে না। লোকাভাব ও অর্থাভাবই [illegible] প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সব বাধা থাকলেও আমাদের শুভেচ্ছাকে পাথেয় করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। যবে পরিষদের মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে' প্রতিটি স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরীতে পৌঁছে দিতে পারব সেদিনই পরিষদের স্বপ্ন কিছুটা সার্থক হবে। দেশের মানুষের মধ্য থেকে কুশিক্ষা, অপশিক্ষা ও কুসংস্কার দূর করতে সকল সভ্য ও পাঠককে আমরা আহ্বান জানাই। পরিষদের সকল কর্মসূচীর মধ্যে আপনারা অংশ নেবেন—এই আশা আমরা পোষণ করি।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর চোখে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা

মহাদেব দত্ত*

1963 খৃস্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞান গবেষণা ও সংস্কৃতি মন্ত্রকের উদ্যোগে ভারতে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদদের এক আলোচনা-চক্র বসে। এখানে আচার্য বসু বিজ্ঞান গবেষণার মান, বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চ গবেষণা সংস্থাগুলির মান নির্ধারণের ব্যাপারে সুচিন্তিত ও গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রকাশ করেন। এই অভিমতের গুরুত্ব বর্তমানে বিন্দুমাত্র কমে নি। তারই কিছু সারাংশ নিয়ে দেওয়া হলো।

গবেষণার মান : প্রশ্ন উঠতে পারে যে সংখ্যাগত তথ্য ও গুণগত প্রয়োজনের মধ্যে সম্পর্ক কি ? শিল্প উৎপাদন ও বিজ্ঞান গবেষণার মধ্যে সম্বন্ধ অবশ্যই নির্ণয় করতে হবে। কোন বৈজ্ঞানিকের প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যাই কেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ণ নয়, প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রবন্ধ কতবার উদ্ধৃত হয়েছে, তাও দেখা দরকার। কেবলমাত্র সংখ্যাগত তথ্যের উপর প্রবন্ধ থাকা উচিত নয়, গুণগত মানও সমধিক প্রয়োজনীয়।

বিজ্ঞান গবেষণা সংগঠন : বিশিষ্ট বিজ্ঞানীকে ঘিরে যখন সৃজনশীল গবেষণার কথা বলা হয়, তখন অবশ্যই দেশের প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। কাজে কাজেই বিজ্ঞানী ও শিল্পপতিদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা আবশ্যক। জাতীয় কারুশালা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে একসঙ্গে এগোতে হবে। এটা বলা উচিত নয় যে, জাতীয় কারুশালাগুলির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্ষতি হচ্ছে। এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে শিল্পপতিরা বিজ্ঞানীদের উপর অধিকতর আস্থাবান হন। বিজ্ঞানীরাও পরামর্শ করে সেই সব সমস্যার কথা ভাববেন যা বৃহত্তর বিজ্ঞানীগোষ্ঠীর আশু বিবেচনার বিষয় হয়। তরুণ বিজ্ঞানীদের জাতীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে অর্থকে গৌণ মনে করে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হতে হবে। তবেই হবে বিজ্ঞানের প্রগতি ও শিল্পের প্রসার। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে গবেষণার ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন করা উচিত। প্রতিভার অবক্ষয় কেবলমাত্র তরুণদের সমস্যা নয়, প্রবীণ বিজ্ঞানীরা যাঁরা এই তরুণদের শিক্ষক তাঁদেরও সমস্যা। সাহসের সঙ্গে এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। সমাধানের জন্য চাই আদর্শ, চাই অনুপ্রেরণা। বিজ্ঞানীদের বিশেষ করে তরুণ বিজ্ঞানীদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। প্রয়োজনে বিদেশে যাবার সুযোগও দিতে হবে। তবে আমরা নিশ্চিত হবো যে, সে যাতে সেখানে গিয়ে কিছু করতে পারবে এবং সে ক্ষেত্রে তাঁর প্রয়োজনীয় প্রশংসা বা পরিচয়পত্র থাকবে।

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও উন্নয়ন : নানান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মধ্য দিয়ে সমস্যার সৃষ্টি করে দূরীকরণের চেষ্টা চলছে। সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এবং সেই সঙ্গে জাতীয় কারুশালাগুলি সেখানেই হওয়া উচিত যেখানে প্রতিভাধরেরা থাকেন। কিন্তু বর্তমানে জাতীয় কারুশালাগুলি মরুভূমিতে গজিয়ে উঠছে। সুবুদ্ধির প্রতিকূলে অবশ্য কিছু সংশোধনের চেষ্টা চলছে।

*বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700 009

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতি আবেদন

মানব কল্যাণে মহাকাশ বিজ্ঞান*

প্রসেনজিৎ সরকার**

প্রখ্যাত বিজ্ঞান লেখক, আর্থার সি ক্লারক 1944-45 খৃস্টাব্দে যখন বলেছিলেন কৃত্রিম উপগ্রহ একদিন বিশ্ব জুড়ে যোগাযোগ বিপ্লব আনবে, সেদিন সাধারণ মানুষ তো বটেই এমন কি বেশ কিছু বিজ্ঞানীও তাকে পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। প্রথম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের পরেও কেউ ভাবতে পারে নি যে কৃত্রিম উপগ্রহ মানুষের কত কাজে আসতে পারে। 1957 খৃস্টাব্দে 4ঠা অক্টোবর রাশিয়া থেকে উৎক্ষিপ্ত হয় প্রথম মহাকাশযান "স্পুত-নিক-1"। এরপরে ক্রমে স্পুতনিক-2, 3, 4, 5 প্রভৃতি ছাড়া হয়। 1958 খৃস্টাব্দে 1লা ফেব্রুয়ারী, আমেরিকা মহাকাশে পাঠায় এক্সপ্লোরার-10। এরপর থেকেই শুরু হয় মহাকাশে রাশিয়া এবং মার্কিনের মহাকাশযান পাঠানোর প্রতিযোগিতা। 1961 খৃস্টাব্দে 12ই এপ্রিল ভোস্তক-1 মহাকাশযানে পাঠানো হয় পৃথিবীর প্রথম মহাকাশচারী ইউরি গাগারিনকে। 1969 খৃস্টাব্দের 17ই জুলাই চন্দ্রের দিকে যাত্রা করে মার্কিন মহাকাশযান অ্যাপোলো-11। এর যাত্রী ছিলেন আর্মস্ট্রং, কলিন্স, অলড্রিন, 20শে জুলাই "ঈগল" নামক "চন্দ্রভেলা" আর্মস্ট্রং ও অলড্রিনকে নিয়ে চন্দ্রের উপরে নামতে শুরু করে। 21শে জুলাই তাঁরা অবতরণ করেন চন্দ্রপৃষ্ঠে। মানব ইতিহাসে 1961 খৃস্টাব্দের 12ই এপ্রিল এবং 1969-এর 21শে জুলাই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এরপর আরও বহু মহাকাশ যান যাত্রীসহ কিংবা যাত্রীবিহীন হিসাবে যাত্রা শুরু করে শুক্র, চন্দ্র, মঙ্গলের দিকে, এর পরে 1977 খৃস্টাব্দে মহাকাশে পাঠানো হয় ভয়েজার যানদ্বয়কে। তারা বর্তমানে বৃহস্পতি ও শনি পার হয়ে ইউরেনাসের দিকে ছুটে চলেছে। অবশ্য তার আগে চলেছে পায়োনিয়ার। এরা অবশেষে প্লুটোকে পেরিয়ে চলে যাবে সৌরমণ্ডলের বাইরে।

এখন একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এত কোটি টাকা খরচ করে মহাকাশে যান ও মানুষ পাঠানো হচ্ছে, তাতে সাধারণ মানুষের কোন লাভ হচ্ছে কিনা অথবা শুধুমাত্র বিজ্ঞানীদের গবেষণায় ব্যয় হচ্ছে। মহাকাশ যাত্রার প্রথমদিকে গবেষণার ফল কেবলমাত্র বিজ্ঞানীদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাতে সাধারণ মানুষের কোন উপকার হতো না। কিন্তু বর্তমানে এই সকল মহাকাশযান মানুষের যে সব উপকার সাধন করছে তা অবর্ণনীয়। আবহ পর্যবেক্ষণ ও পূর্বাভাস, জলে-স্থলে লুকানো খনিজ সম্পদের সন্ধান; বেতার, দূরদর্শন ও টেলিযোগাযোগ, যানবাহন নিয়ন্ত্রণ, শত্রু দেশের উপর নজরদারি ইত্যাদি এমন বহু বিচিত্র কর্মে এরা আজ নিযুক্ত যার অনেকগুলিই পৃথিবীর উপর বসে চালানো অসম্ভব।

আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে উপগ্রহের ভূমিকা অনস্বীকার্য। পৃথিবীর প্রথম আবহ উপগ্রহ টাইরাস-10 (টেলিভিসন ইনফ্রারেড অবজারভেশনাল-স্যাটেলাইট) পাঠানো হয়েছিল 1960 খৃস্টাব্দের 1লা এপ্রিল। মার্কিন উপগ্রহ টাইরাস-10 ও রাশিয়ার উপগ্রহ "ম-নিয়ার" সাহায্যে পৃথিবীর কোন্ জায়গায় আবহাওয়া কখন কেমন থাকবে এখন অনায়াসেই আমরা তা জানতে পারি। গত দু-দশক ধরে এইভাবে আবহ উপগ্রহের সাহায্যে আমরা আবহাওয়ার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ অনায়াসেই করতে পারছি। পৃথিবীর উপরিভাগের মেঘের স্তর, মেঘের গঠনমূলক উপাদান, ঘনত্ব, বিস্তার, দূরত্ব প্রভৃতি যাবতীয় তথ্য এখন পাওয়া যাচ্ছে মুহূর্তের মধ্যে স্বয়ংক্রিয় ছবি প্রেরণ (এ. টি. পি) যন্ত্রের কল্যাণে এই সকল উপগ্রহ থেকে। মেঘের মানচিত্র ছাড়াও তুষারের মানচিত্র মেঘের সর্বোচ্চ স্তরের ও সমুদ্রের উপরিভাগের তাপ, সামুদ্রিক স্রোত চিহ্নিত-করণ, বায়ুর ও বরফের পরিমাণ, চাপ নির্ধারণ, ঝড়ের উৎপত্তি প্রভৃতি সম্বন্ধেও জানা যাচ্ছে। শুধুমাত্র তথ্য নয়, তার সাথে ঝড়ের কেন্দ্রস্থলের ছবি তুলেও কৃত্রিম উপগ্রহ তা পাঠিয়ে বিভিন্ন ভূ-স্টেশনকে সাহায্য করছে। এসব তথ্য বিমান, প্রতিরক্ষা জাহাজ চলাচল, কৃষি, পর্বতারোহণ এবং সাইক্লোন সংক্রান্ত পূর্বাভাস দেবার কাজে ক্রমশই বেশী করে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বছর সাতেক আগে অন্ধ্রপ্রদেশে যে প্রবল ঘূর্ণিঝড় হয় তাও উপগ্রহ মারফৎ ধরা পড়েছিল। এছাড়া সম্প্রতি উড়িষ্যা উপকূলে যে প্রচণ্ড ঝড় আছড়ে পড়ে—আমাদের ইনস্যাট-IA এবং আরও তিনটি আবহ উপগ্রহ 72 ঘণ্টা আগে তার পূর্বাভাস দিয়ে দেয়। বর্তমানে পৃথিবীর চারদিকে মোট 15টি আবহ উপগ্রহ প্রদক্ষিণ করছে। এর মধ্যে 1(A) উৎক্ষিপ্ত হয় 10ই জুলাই আমেরিকার কেপ ক্যানাভেরাল থেকে। আবহ বিজ্ঞানের এই উন্নতির মূলে কৃত্রিম উপগ্রহের দান লক্ষণীয়। বিভিন্ন দূরবর্তী ও দুর্গম অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ রাখতে আজ বহুল পরিমাণ ব্যবহৃত হচ্ছে জিও-স্টেশনারী স্যাটেলাইট (geostationary satellite)। এই ধরনের উপগ্রহ উৎক্ষেপণের ক্ষেত্রে ভারতের স্থান নবম। (আমেরিকা-1963, গ্রেটব্রিটেন-1969, রাশিয়া-1974, ফ্রান্স ও পঃ জার্মানী-1975, ইতালী ও জাপান-1977)। ভারতের জিওস্টেশনারী স্যাটেলাইটের নাম "অ্যাপল" (Ariane Passenger Pay Load Experiment)। এটি 1981 খৃস্টাব্দের 19শে জুন ফরাসী গায়েনার কুরু থেকে "এরিয়ান" নামক রকেটে করে মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়। তবে এটি বাণিজ্যিক ভাবে ব্যবহৃত উপগ্রহ নয়, এটি পরীক্ষামূলক। এর দ্বারা 1981 খৃস্টাব্দের 15ই অগাস্ট সর্বপ্রথম সারা ভারতে দূরদর্শনের অনুষ্ঠান

---

*"অমূল্যধন দেব স্মৃতি" প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় (1982) প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত

**আই. টি. পি. ব্যানার্জী লেন, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

প্রচার করা হয়। তবে Multipurpose Satellite উৎক্ষেপণের ক্ষেত্রে ভারতের স্থান ষষ্ঠ। এই সকল উপগ্রহ বেতার, দূরদর্শন, টেলিযোগাযোগ, আবহাওয়া প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে। ভারতের আগে যারা এই ধরনের উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করেছে তারা হলো, আমেরিকা, রাশিয়া, কানাডা, ইন্দোনেশিয়া ও জাপান। ভারতের প্রথম মালটিপরিপাস স্যাটেলাইট হলো ইনস্যাট-(1A)। এটি 1982 খৃস্টাব্দের 10ই এপ্রিলে ফ্লোরিডার কেপ-ক্যানাভেরাল থেকে ডেল্টা-3910 রকেটে চড়ে মহাকাশে পাড়ি দেয়। এটি বিভিন্ন দুর্গম স্থানের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে সাহায্য করবে। পরিকল্পনা ছিল ইনস্যাটের শক্তিশালী প্রেরকের মাধ্যমে দূরপাল্লার ট্রাঙ্ককলসহ 8000টি দ্বিমুখী টেলিফোন কল করা যাবে। এজন্য 100টি ডি. সি. পি. (ডাটা কালেকসন সেন্টার) তৈরি হয়েছে বা হচ্ছে। এই প্রকল্পের মোট খরচ পড়েছে 277 কোটি টাকা কিন্তু এর মাধ্যমে প্রায় চার গুণ টাকা আয় হবে।

ভারতের 2য় উপগ্রহ ভাস্কর-1 এ পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষকে কয়েকবার জরিপ করেছে। প্রতিবারে এক লক্ষ বর্গমিটার হিসাবে। এছাড়া সে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে প্রায় 3500 ছবি। এই সব ছবি থেকে জল ও বনজ সম্পদ এবং হিমালয়ের তুষার গলন সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা গেছে।

আমেরিকা তার দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানে (অর্থাৎ জমি জরিপ, বনজ সম্পদ প্রভৃতির উপর নজর রাখার জন্য) ল্যাণ্ডস্যাট নামে butterfly আকৃতির উপগ্রহ ব্যবহার করে। মানুষের চোখ বা সাধারণ ক্যামেরা যা দেখতে পারে না এটি তা সহজেই দেখতে পারে। এর multispectral scanning system পৃথিবীপৃষ্ঠের বিভিন্ন জিনিষকে সহজেই পর্যবেক্ষণ করতে পারে। এর কক্ষপথ পৃথিবী থেকে 917 কিঃ মিঃ উপরে। এটির ক্যামেরা image কে record করার পর —সেগুলিকে পরিণত করে বেতার-সংকেতএ। তারপরে সেই সংকেতগুলিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় গ্রাউণ্ড রিসিভিং স্টেশনে, যেখানে কম্প্যুটার আবার এগুলিকে পরিণত করে প্রতিবিম্বে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য। এই landsat আমাদের নানাভাবে সাহায্য করে। পৃথিবীপৃষ্ঠে কোথায় faults and fractures আছে এবং কোথায় বাড়ী, রাস্তা বা তৈল এবং গ্যাস লাইন বসান উচিৎ নয় তা এর মাধ্যমে জানা যায়। কোন বড় খামারের খাদ্যশস্য দেখার (watch) কাজে, মাটির পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে এটি ব্যবহৃত হয়। সমুদ্রের জল, মিষ্টি জলের উৎস, মাছের প্রাচুর্যতাও এর সাহায্যে নির্ণীত হয়। ডঃ জন-ক্রাইড একজন মার্কিন জীব-বিজ্ঞানী "গ্রিজলি বিয়ার" নামে এক ধরণের নিরীহ ভাল্লুকগোষ্ঠীর আচরণ আবিষ্কার করেন এবং তাদের সংরক্ষণ করার পদ্ধতিও নির্ণয় করেন। এতো গেল মানবকল্যাণে উপগ্রহের প্রত্যক্ষভাবে সাহায্যের নিদর্শন। উপগ্রহ অনেক সময় অপ্রত্যক্ষ ভাবে মানবগোষ্ঠীকে সাহায্য করছে। যেমন আমেরিকার প্রথম মহাকাশযান এক্সপ্লোরার-1 সর্বপ্রথম জানায় যে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 600 মাইল উপরে 40° উত্তর ও 40° দক্ষিণ অক্ষাংশ বরাবর বিকিরণ বলয় আছে। এটির নাম রাখা হয় ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ বলয়।* পরে আবিষ্কৃত হয় যে পৃথিবীর 4000 মাইল উপর আর একটি এই রকম বলয় আছে। এই বলয়গুলি মহাকাশ থেকে আগত মহাজাগতিক রশ্মির একটা বড় অংশকে প্রতিহত করে বলে পৃথিবীতে জীবজগতের সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীর চারদিকে বিভিন্ন মহাজাগতিক কণা মাপার এবং তাদের দ্বারা পৃথিবীর চারদিকে জীবজগতের কি ক্ষতি হতে পারে তা নির্ধারণ করার জন্য বহু উপগ্রহ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিছুদিন আগে (1981, 6ই অক্টোবর) আমেরিকা পৃথিবীর বিকিরণ (radiation) মাপার জন্য একটি উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করে।

গত 1লা মার্চ (1982) রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা ভেনাস-13 নামে একটি মহাকাশযান শুক্রপৃষ্ঠের উপর নামিয়েছেন। এখনও পর্যন্ত তাঁরা যে সমস্ত তথ্য পেয়েছেন তা বিশ্লেষণ করে তাঁরা পৃথিবীর সৃষ্টির সময়কার উপাদান ও পরিবেশ সম্পর্কে জানতে পারবেন বলে আশা করছেন। আর তা যদি সম্ভব হয় পৃথিবীর আবহাওয়া পরিবর্তন সম্পর্কেও অনেক কিছু জানা যাবে। পৃথিবীর বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ পরিণতি জানার জন্য ই-এস-এ (ESA) এবং জাপান অনেকগুলি উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করেছে। যেমন জিওস (GEOS) চন্দ্রের কক্ষপথের বাইরে পৃথিবীর চৌম্বক পুচ্ছ (magnetic tail) জানার জন্য ই. এস. এ-কস বি (ESA-COS B) পার্থিব গামা বিকিরণ (extra terristrial gamma radiation) জানার জন্য। এছাড়া জাপানের Denpa (আয়ন এবং ম্যাগনেটোস্ফিয়ার পর্যবেক্ষণের জন্য) হাকুচো (Hakucho) এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

বর্তমানে মহাকাশযানকে কেবলমাত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু 80 দশকের শেষ কিংবা 90-এর দশকের প্রথমদিকে মানুষ মহাকাশকে দেখতে শুরু করবে নতুন ভাবে, নতুন দৃষ্টিতে। এই দশকের শেষ দিকে মহাকাশে আমেরিকা স্থাপন করবে উপনিবেশ। পৃথিবী থেকে বিশাল কাঠামো নিয়ে যাওয়া হবে মহাকাশে বিভিন্ন মহাকাশ ফেরির মাধ্যমে। তারপরে সেগুলিকে জুড়ে তৈরি করা হবে কয়েক মাইল লম্বা একটি উপনিবেশ। মহাকাশফেরির (Space-Shuttle, Challenger) মাধ্যমে মানুষ যাতায়াত করবে সেইসব উপনিবেশে। এই সব উপনিবেশে থাকবে পৃথিবীর আবহাওয়া এবং নানা ধরণের কারখানা। এইসব কারখানায় তৈরি করা হবে বিভিন্ন ঔষুধ ও বিশুদ্ধ রাসায়নিক এবং সূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক্স্ যন্ত্রাংশ।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপ ও মাধ্যাকর্ষণের ফলে পৃথিবীতে

* এটির আবিষ্কারক জ্যোতির্বিজ্ঞানী জেমস্ এ ভ্যান অ্যালেনের নামানুসারে রাখা হয়।

দুটি মিশ্রিত রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করা সম্ভব নয় 100% বিশুদ্ধ রূপে। কিন্তু মহাকাশে না আছে বায়ুর চাপ এবং মাধ্যাকর্ষণ। ফলে যেখানে 100% বিশুদ্ধ রাসায়নিক পদার্থ তৈরি সম্ভব, এছাড়া বিভিন্ন সূক্ষ্ম যন্ত্রও সেখানে তৈরি করা যাবে। ইতিমধ্যে এ নিয়ে মহাকাশফেরি কলম্বিয়ার তৃতীয়বার যাত্রার সময় পরীক্ষা করা হয়ে গিয়েছে। দেখা গিয়েছে যে ইলেক্‌ট্রোফোরেসিস কার্ কোন ইমালশনের দুটি অংশকে শতকরা 100% বিশুদ্ধতায় পৃথক করা সম্ভব। শূন্য মাধ্যাকর্ষে শতকরা 100% বিশুদ্ধতায় ঔষুধ ও রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করা সম্ভব। আমেরিকার ম্যাক-ডোনাল্ড ডগলাস নামে একটি ঔষুধ কোম্পানী 1987-88 খৃস্টাব্দে নাগাদ মহাকাশে ঔষুধ তৈরির কাজ শুরু করবে। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে মহাকাশে ইস্পাত ও ধাতব যন্ত্রাংশ তৈরির কথা ভাবছে ইনকো, কাইজার এবং ইউ. এস. স্টীল। এছাড়া ঐ উপনিবেশকে কাজে লাগিয়ে চাঁদ থেকে বিভিন্ন মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য ধাতু আহরণ করার পরিকল্পনা আছে। কেননা অ্যাপোলো প্রকল্পের সময়েই জানা যায় যে চাঁদে প্রচুর পরিমাণে সিলিকন, টাইটানিয়াম ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু আছে। কিন্তু এসব কাজে নামার আগে দরকার প্রচুর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার। আর সেইজন্যই 1985 খৃস্টাব্দ নাগাদ মহাকাশে পাঠানো হচ্ছে "স্পেশল্যাব" (spacelab)। মহাকাশে উপনিবেশ স্থাপনের প্রথম পদক্ষেপ হবে spacelab-কে মহাকাশে স্থাপন করা।

স্পেশল্যাব, ই. এস. এ নাসা-এর যৌথ প্রচেষ্টার ফল। এর মাধ্যমে আমেরিকার এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরা মিটারোলজি, প্রাকৃতিক উৎস, যোগাযোগ, ঔষধ, জীববিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং high energy astrophysics নিয়ে গবেষণা করবেন।

বর্তমানে পৃথিবীতে শক্তিসংকট দেখা দিয়েছে। ভবিষ্যতে এটা আরও প্রবল আকার দেখা দেবে। তাই নাসার বিজ্ঞানীরা মহাকাশে সৌরশক্তিপ্ল্যান্ট তৈরি করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই কাজে ব্যবহার করা হবে আমাদের অ্যাপল বা ইনস্যাট-(1A)-র মত একটি ভূসমলয় কক্ষীয় উপগ্রহ (geostationary satellite)। তবে এটির আয়তন হবে বিশাল। এটি থাকবে কয়েক মাইল লম্বা একটি সৌর প্যানেল (solar panel)। এই সৌর প্যানেলে সূর্য থেকে আগত সূর্যরশ্মি এসে পড়ে পরিণত হবে বিদ্যুৎ শক্তিতে। তারপর সেই বিদ্যুত শক্তিকে উপগ্রহের অ্যানটেনা মারফৎ তীব্র সূক্ষ্ম তরঙ্গ রশ্মি (micro-wave ray) রূপে ভূ-পৃষ্ঠে কোন স্টেশনে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ভূ-পৃষ্ঠের সেই স্টেশনটি এই অতি শক্তিশালী Micro-wave Ray-কে পরিণত করবে বিদ্যুৎশক্তিতে। তারপর সেই বিদ্যুৎশক্তি পাঠিয়ে দেওয়া হবে বিভিন্ন কল-কারখানায়।

সেই আদিমকালের প্রাগৈতিহাসিক, উলঙ্গ, বর্বর, গিরিগহ্বর অরণ্যবাসী, ভীত, সংকুচিত মানুষ নামক জীব স্বীয় বুদ্ধি চেষ্টা ও ধর্মপ্রেরণায় ধাপে ধাপে দুঃসাধ্যকে সুসাধ্য করে, দুর্লঙ্ঘ্যকে লঙ্ঘন করে অজেয়কে জয় করে পৃথিবীর অধীশ্বর হয়েছে। কিন্তু সাথে সাথে মহাকাশ বিহারের কল্পনাকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টায়ও সে রত। কারণ 'তৃষ্ণৈক। তরুণায়তে', কিন্তু এই আনন্দের পশ্চাতে একটা ভয়ের ছায়া শান্তিকামী মানুষের মনে অশান্তির সৃষ্টিও করছে। যে দুর্বুদ্ধির প্রেরণায় জঙ্গীবাজ রাষ্ট্রশক্তি প্রভৃত সম্ভাবনাময় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলিকে ধ্বংসের কাজে নিয়োগ করতে কুণ্ঠা করে নি। তার দ্বারা পরিচালিত হয়ে যদি এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের অপব্যবহার করা হয় তা হলে পৃথিবী যে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে কয়েক সেকেণ্ডে—তা বলাই বাহুল্য।

যাযাবর পাখীর রহস্য

দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়*

হেমন্ত শেষ হলেই শীত আসবে। আর ঠাণ্ডা পড়ার সাথে সাথেই শুরু হবে কলকাতার চিড়িয়াখানা ও তার আশপাশে যাযাবর পাখীর আনাগোনা। মাসখানেক এখানে কাটিয়ে বসন্তের প্রাক্কালে আবার ওরা ফিরে যাবে হাজার হাজার মাইল দূরে ফেলে আসা তাদের বাসস্থানে। ওদের এই আসা যাওয়া যে শুধু কলকাতাতেই সীমাবদ্ধ তা নয়। উত্তর থেকে দক্ষিণ কিম্বা দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রায় গোটা পৃথিবী জুড়েই রয়েছে এদের শৈত্যনিবাস। কোনও জায়গা থেকে হঠাৎ কোন শ্রেণীর পাখীর অদৃশ্য হয়ে যাওয়া আজকের মত সে যুগের মানুষকেও বিস্মিত করেছে। অ্যারিস্টটল এর ব্যাখ্যায় একটা প্রস্তাবও রেখেছেন—সোয়ালো এবং ছোট ছোট পাখীরা শীত কাটায় কোন পুকুরের তলায় কাদার ভিতরে, গাছের কোটরে অথবা ডানা পালটে অন্য পাখী হয়ে যায়, যেমন কোকিল রূপান্তরিত হয় বাজপাখীতে। আবার অনেকে এমনও বলেছেন পাখীরা শীতটা কাটিয়ে দেয় চাঁদে গিয়ে। পাখীদের এই হঠাৎ অদৃশ্য হওয়ার রহস্য অবশ্য মানুষের কাছে খুব বেশী দিন অজ্ঞাত থাকে নি। এ ব্যাপারে প্রথম আলোকপাত করেন জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিখ। যুদ্ধ জয়ের উদ্দেশ্যে ভূমধ্য সাগরের উপর দিয়ে যাবার কালে তিনি একঝাঁক পাখীকে দক্ষিণ দিকে যেতে দেখেন। তিনি লেখেন পাখীরা হয়তো বা শীতটা কাটিয়ে দেয় পুকুরের তলায় নয়, দক্ষিণের কোনও দেশে। পরে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে

*রেডিওমিতি লেবরেটরী, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান

ডেনমার্কের একজন স্কুল শিক্ষকের প্রস্তাবমত সোয়ালো পাখীর পায়ে জাল ফিতে লাগিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। শীতের পরে পাখীরা তাদের বাসায় ফিরে এলে দেখা গেল, ফিতের রঙ মোটেই ফিকে হয়ে যায় নি বা তাতে কোন কাদাও লেগে নেই। এর ফলে সোয়ালো পাখীদের পুকুরের তলায় শীত কাটানোর ধারণা বাতিল হয়ে যায়।

মোট কথা হাজার হাজার যাযাবর পাখী শীত ফুরোলেই ফিরে যায় তাদের নিজ নিজ বাসস্থানে। কয়েক মাস আগে যে বাসা তারা ছেড়ে গিয়েছিল তা খুঁজে পেতে খুব একটা কষ্ট হয় না তাদের। কিন্তু ওদের এই আসা যাওয়া তো আর এবাড়ী ওবাড়ী যাতায়াতের মত নয়। মাঝে দূরত্বের ব্যবধান হাজার হাজার মাইল। এক ধরনের সামুদ্রিক পাখী আছে যা উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু বছরে দুবার যাতায়াত করে। অতিক্রান্ত দূরত্ব 38,000 মাইল। অথচ পথ হারিয়ে বিপদে পড়ে ওরা কদাচিৎ।

যাযাবর পাখীর রহস্যানুসন্ধানে 1915 খৃস্টাব্দে ওয়াটসন এবং ল্যাসলী থেকে শুরু করে বহু বিজ্ঞানী গৃহাভিমুখী পায়রার উপর পরীক্ষা চালিয়েছেন। ঠিক কথা এইসব পায়রাকে আসল বুনো যাযাবর পাখীর সঠিক প্রতিনিধি হিসাবে ধরা যায় কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে, কিন্তু এই সব পরীক্ষালব্ধ ফলের ভিত্তিতে যে সব উপসংহার টানা গেছে তা অনেক সময় পরস্পর বিরোধী হলেও পাখীর যাযাবর বৃত্তির ব্যাখ্যায় এসবের উপস্থাপনের প্রয়োজন আছে।

গুস্তাভ ক্রেমার এবং সেন্ট পল 1954 খৃস্টাব্দে খাঁচার মধ্যে বড় হওয়া পায়রাকে তার বাসস্থান থেকে 200 মাইল দক্ষিণে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে দেখেছেন আঠারোটার মধ্যে যে নটার খোঁজ পাওয়া গেছে তারা সবাই বাড়ীর দিকেই উড়ে চলেছে। একটা তো আবার আড়াই দিনেই ফিরে এসেছে তার পুরনো আবাসস্থলে। বোঝা যায় বাড়ী চিনে ফেরার জন্য আবাসস্থলের আশপাশ সম্পর্কে একটু একটু জ্ঞান থাকলেই যথেষ্ট। কারণ উপরিউক্ত পরীক্ষায় খাঁচায় আবদ্ধ থাকার জন্য পায়রারা আর কতটুকু অঞ্চলই বা দেখতে পেয়েছে ? অথচ বাড়ী তো ফিরেছে মোটামুটি পারদর্শীতার সাথেই। কিন্তু যদি কোন মরা আগ্নেয়গিরির মুখের (crater) মধ্যে খাঁচা রেখে ওদের এমনভাবে পালন করা হয় যাতে খাঁচার উপর অংশ থেকেও দিগন্ত নজরে না পড়ে তাহলে 100 মাইল দূরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে দেখা গেছে 99টা পাখীর কোনটাই ঘরে ফিরে আসতে পারে নি। যে 26টার খোঁজ পাওয়া গেছে তার মধ্যে 12টা বাড়ীর খানিকটা কাছাকাছি আসতে সমর্থ হয়েছে ঠিকই কিন্তু বাকী 14টা উড়ে গেছে বিভিন্ন দিকে। সুতরাং পায়রারা বাড়ী ফেরার ব্যাপারে আবাসস্থলের কাছাকাছি পরিচিত চিহ্নের সাহায্য নিয়ে থাকে ঠিকই কিন্তু ওদের এই ক্ষমতা খুব একটা উন্নত মানের নয়, যেমন বিজ্ঞানী প্রাট দেখেছেন, নিজ বাসস্থলের অনুরূপ কোন শহরের দিকে অনেক সময়ই ভুল করে উড়ে যায় ওরা। আবার 1959 খৃস্টাব্দে গাউন্ড-এর পরীক্ষায় দেখা গেছে এক জাতীয় ঘুঘু (Terrapene carolina) আছে যারা ওড়ার ব্যাপারে পরিচিত কোন চিহ্নের ধার ধারে না। যতক্ষণ আকাশে সূর্য থাকে ততক্ষণ ওরা বাড়ী ফেরে ঠিক দিকেই, কিন্তু সূর্য মেঘে ঢাকা পড়লেই ওদের ওড়াটা হয়ে যায় বিশৃঙ্খল। সুতরাং যাযাবর পাখীরা তাদের ওড়ার ব্যাপারে পরিচিত চিহ্ন ছাড়াও হয়তো বা আকাশে সূর্যের অবস্থানের উপর নির্ভরশীল। সূর্য নির্ভর যাযাবর বৃত্তির খবর কিন্তু আগেই 1950 খৃস্টাব্দে গুস্তাভ ক্রেমারের কিছু চিত্তাকর্ষক পরীক্ষায় প্রমাণিত।

এটা অনেক আগেই লক্ষ্য করা গেছে খাঁচায় আবদ্ধ স্টারলিং বা ঐ জাতীয় যাযাবর পাখীরা শরতের শেষে উড়ে যাবার সময়টাতে হঠাৎ খুব চঞ্চল হয়ে পড়ে। সম্ভাব্য দিকটির দিকে উড়ে যাবার বৃথা চেষ্টা করে তারা। পরিষ্কার ও মেঘলা দিনে পাখীর ব্যবহারে তারতম্য লক্ষ্য করার জন্য ক্রেমার 70 সে.মি. ব্যাসবিশিষ্ট লোহার জাল দিয়ে ঘেরা চারদিক আবদ্ধ একটা খাঁচা তৈরি করে তার মধ্যে কিছু স্টারলিং পাখী দিলেন ছেড়ে। মাথার উপরের আকাশটুকু দেখার জন্য খাঁচার উপরিভাগে গোটা ছয়েক জানালার ব্যবস্থা করা হলো। আকাশ মেঘলা থাকলে পাখীরা এদিক-ওদিক চারদিকেই ওড়ে। কিন্তু যেই মেঘ সরে গিয়ে সূর্য দেখা দেয় অমনি পাখীদের ব্যবহারও যায় বদলে। উড়তে লাগে একটা নির্দিষ্ট দিক বরাবর, জানলার সাথে আয়না লাগিয়ে খাঁচার ভেতর সূর্যালোক অন্য কোণে ফেলতেই পাখীরা তাদের ওড়ার দিকও সেই কোণের সমান করে ঘুরিয়ে দেয়।

পরীক্ষার দ্বিতীয় পর্যায়ে ক্রেমার করলেন কি গোটা বারো একই রকম দেখতে খাবার পাত্র সম ব্যবধানে খাঁচার চারপাশে রেখে দিলেন। কিন্তু মাত্র একটা থেকেই খাওয়ানো হতো পাখীদের। খুব তাড়াতাড়িই ওরা অভ্যস্ত হয়ে গেল ঐ পাত্রটির অবস্থানে। যদিও অন্য এগারোটি পাত্র থেকে এই পাত্রটি ভিন্ন ছিল না মোটেই, কিন্তু পাখীরা ঠিক এটিকে খুঁজে পেত একেবারে প্রথম চেষ্টাতেই। আর ঐ কাজটি সারত ওরা সূর্যের অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে পাত্রের অবস্থান লক্ষ্য করে। কিন্তু আগের মতই সূর্যরশ্মি আয়নার সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট কোণ পরিমাণ ঘুরিয়ে দিতেই পাখীরা প্রথম খাবার পাত্র থেকে সম পরিমাণ কোণে অবস্থিত দ্বিতীয় এক ফাঁকা পাত্রে গিয়ে হামলা চালাত খাবার আশায়।

কিন্তু আকাশে সূর্য তো আর স্থির হয়ে একজায়গায় বসে নেই। ক্রমাগত পাল্টাচ্ছে তার অবস্থান। সুতরাং তার পরিপ্রেক্ষিতে খাবার পাত্রের অবস্থানও যাচ্ছে বদলে। কিন্তু কোন সময়েই পাত্রটিকে খুঁজে নেবার ব্যাপারে পাখীরা ভুল করে না। বোঝা যায় সূর্যের অবস্থান পাল্টানোর ব্যাপারে পাখীরা রীতিমত সজাগ। সোজা কথা, সময় সম্পর্কে সচেতন ওরা। হয়তো বা তাদের শরীর মধ্যস্থিত কোন ঘড়ির কাঁটা সূর্যের সাথে সাথে ঘুরে যাচ্ছে ক্রমাগত।

পাখীদের এই শারীরবৃত্তীয় ঘড়ির ব্যাপারে জোরদার প্রমাণ

দেন জার্মান পক্ষীবিশারদ হফম্যান (Hoffman)। তিনি ক্রেমারের খাঁচায় নির্দিষ্ট পাত্র থেকে খাবার খেতে অভ্যস্ত দুটি স্টারলিংকে খাঁচা থেকে সরিয়ে পরীক্ষাগারে সৃষ্ট নকল দিন-রাত্রির মধ্যে রেখে দেন। এই নকল দিন রাত্রে সূর্য উঠা এবং অস্ত যেত আসল ঘটনার ছ'ঘণ্টা দেরীতে। এতেই ওরা অভ্যস্ত হতে দিন পনেরো পর পাখী দুটিকে ফাঁকা খাঁচায় ছেড়ে দিতে দেখা গেল খাবার পাত্রটি খোঁজার ব্যাপারে ওরা ভুল করছে যদিও পাত্রটি ছিল দক্ষিণ দিকে, ওরা 90° ঘুরে গিয়ে ওটার খোঁজ চালাচ্ছিল পশ্চিমে। তখন সময় ছিল বিকাল তিনটে। কিন্তু তাদের শারীরবৃত্তীয় ঘড়িতে সকাল নয়টা, ঠিক ছয় ঘণ্টা দেরী। ফলে ওদের ভুল হয়েছে। আসলে এই সময়ে সূর্য যে পশ্চিমে 90° কোণ বরাবর সরে গেছে! অবশ্য ফাঁকা জায়গায় প্রাকৃতিক দিনরাত্রির সংযোগে রাখতেই, পরবর্তী দিন পনেরোর মধ্যেই ওরা তাদের ভিতরকার ঘড়িটাকে ঠিক করতে পেরেছে।

সূর্যের সাহায্যে দিক্ নির্ণয়ের ব্যাপারটা বহু পাখীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু এরও খুঁত রয়েছে অনেক। যেমন ধরা যাক, শীতকালে যাত্রাপর্বে এক ঝাঁক পাখী সূর্যকে সামনে রেখে দক্ষিণ দিকে উড়ে চলেছে। কিন্তু বিষুব রেখা অতিক্রম করার পর সূর্য আর সামনে থাকে না, চলে যায় পিছনে। এক্ষেত্রে তাদের দক্ষিণের যাত্রা অব্যাহত রাখতে হলে সূর্যের দিকে নয়, তার থেকে দূরে সরে যাওয়া উচিত। আর সেটাই করে তারা কিন্তু কিভাবে বিষুবরেখার এই অদৃশ্য অঞ্চল পার হয়েই সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে তারা? বিশেষতঃ যে ক্ষেত্রে তাদের ডান এবং বাঁদিকের ধারণাগুলো সম্পূর্ণ উল্টে গেছে? এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানা নেই, হয়তো বা হফম্যানের পরীক্ষায় ঐ স্টারলিং দুটোর মত কিছু দিনের ব্যবধানে নূতন পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে তারা নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নেয়।

যাই হোক, উপরের আলোচনা থেকে ভাবার কোন কারণ নেই যে পাখীরা দিক্ নির্ণয়ে সূর্য ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থার সাহায্য নেয় না। বিশেষতঃ পারডেক্ (Perdeck) 1957 খৃস্টাব্দে স্টারলিং পাখী নিয়ে দেখেছেন পর পর কয়েকদিন আকাশে সূর্য না থাকলেও পাখীরা কয়েক দিনের ব্যবধানে আবার তাদের উড়ে যাবার দিক্‌টাকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারে। একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত অনুসিদ্ধান্ত! এই ধরণের বৈপরীত্য লক্ষ্য করলে স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় পাখীরা সূর্যের অনুপস্থিতিতে অন্য কোন সাহায্যকারী সূত্রের উপর নির্ভর করে অথবা যাতায়াতের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজানা কোন প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল।

তবে কি যুবক পাখীরা ওড়ার সময় বয়স্কদের সাহায্য নেয়? থিয়েনেম্যানের (Thienemann) 1931 খৃস্টাব্দে পরীক্ষায় এর উত্তর মেলে। তিনি দেখেন বাপ মায়ের সংযোগ ছিন্ন কিছু সারস পাখী তাদের শীতকালীন যাত্রাকালে ঠিক সেই পথই অনুসরণ করে যে পথে তাদের বাপ মা বা পূর্বসূরীরা বরাবর গেছে। একবার শীতকালীন ছুটি কাটিয়ে রাশিয়ার লাতাভিয়া এবং এস্তোনিয়ার দিকে ধাবমান এক ঝাঁক কাককে কালিনিনগ্রাদে ধরে জেনমার্কে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিছুদিন পরে তাদেরকে পাওয়া যায় সুইডেনে অর্থাৎ কাকেরা, তাদের নূতন জায়গায় ছেড়ে দেওয়া সত্ত্বেও উড়ে গেছে উত্তর-পূর্ব দিক বরাবর (যেদিকে, ধরার আগে ওরা উড়ছিল); ফলে পৌঁছে গেছে সুইডেন, লাতাভিয়ার পরিবর্তে। অবশ্য অঞ্চল ভেদে একই প্রজাতির পাখীর যাত্রাপথের মধ্যেও পার্থক্য লক্ষিত হয়। 1950 খৃস্টাব্দে সুজ্ (Schüz) পরীক্ষা করে দেখেছেন, কিছু পূর্বাঞ্চলের সারসকে পশ্চিমাঞ্চলের সারসের সাথে প্রতিপালিত করে একসাথে ছেড়ে দিলে উভয়ের যাত্রাপথে কোন পার্থক্য নজরে পড়ে না। কিন্তু আলাদা আলাদা ভাবে ছাড়লে দেখা যায় পূর্বাঞ্চলের সারসরা আদৌ আর পশ্চিমীদের অনুসরণ করে না। তাদের যাত্রাপথ তখন স্বাধীন পুবের সারসদের যাত্রাপথ যেদিকে সেদিকে সরে যায়। সুতরাং মনে হয় দিক্ নির্ণয়ের ব্যাপারে পাখীদের মধ্যে এক বংশানুক্রমিক ধারণা প্রথিত হয়ে আছে। একই প্রজাতির পাখীর উড়ে যাওয়ার যাত্রাপথের পার্থক্যটাও বংশানুগত।

1958 খৃস্টাব্দে প্রাট্ এবং ওয়ালরাফ্ উত্তরের তিনটি এবং দক্ষিণের একটি বাসস্থান থেকে একই প্রজাতির পায়রা নিয়ে একটি নির্দিষ্ট জায়গা থেকে ছেড়ে দিয়ে দেখেছেন, পায়রারা সব দিকে সমান পারদর্শিতায় বাড়ী ফিরতো না। যেমন উত্তরে উড়ে যাওয়া পায়রা দক্ষিণের চেয়ে অনেক বেশী সংখ্যায় বাড়ী ফিরতে পেরেছে। তবে কি উত্তর-দক্ষিণাভিমুখী পার্থিব চৌম্বক ক্ষেত্রের বলরেখার কোন প্রভাব আছে ওদের ওড়ার উপর? অবশ্য পাখীর ডানায় শক্তিশালী চুম্বক বেঁধে দেওয়া হয়েছে (এই আশায় যে এই চুম্বক পার্থিব চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব নষ্ট করে দিতে পারবে), রাডার তরঙ্গ দ্বারা আঘাত করা হয়েছে এমন কি শক্তিশালী তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের মধ্য কিছুক্ষণ রেখে দিয়েও দেখা গেছে দিক্ নির্ণয়ের সহজাত ক্ষমতা তাদের নষ্ট হয় নি।

আবার অনেক যাযাবর পাখী আছে যারা যাতায়াতের সময় হিসাবে বেছে নেয় রাত্রিবেলা। এক্ষেত্রে সূর্যের সাহায্যে দিক্ নির্ণয়ের ব্যাপারটা আর খাটে না। তবে ওদেরকে প্ল্যানেটোরিয়ামের ভিতর ভরে ওদের ওড়ার উপর বিভিন্ন তারার অবস্থান পাল্টানোর প্রভাব থেকে প্রমাণ করা গেছে যে, রাত্রিবেলা পাখীরা আকাশের বড় বড় তারার সাহায্যে কাজটুকু সেরে নেয়। অবশ্য ঠিক কোন্ কোন্ তারার উপর ওদের যাত্রাপথ নির্ভর করে তা এখনও নিশ্চিত-ভাবে বের করা যায় নি।

অর্থাৎ এখনও পাখীর যাযাবর বৃত্তির ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিত কোন উপসংহার টানা সম্ভব হয় নি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পাখীর উপর পরীক্ষা করে যে সব কাটা কাটা উপসংহার (discrete conclusion) টানা গেছে তা অনেক সময়ই বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন। এখনও সম্ভব হয় নি একটাকে আরেকটার সাথে জুড়ে দিয়ে একটি মাত্র সাধারণ সূত্রের সাহায্যে সমস্ত ঘটনা ব্যাখ্যা করা।

ঔষধ-নিষ্ক্রিয়তায় প্লাজমিডের ভূমিকা

মলয়কান্তি রায়চৌধুরী*

রোগ, শোক, জরা ও মৃত্যু সমস্ত জীবজগতে অবধারিত সত্য। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে রোগ প্রতিকারের সহজ উপায় জানা যাচ্ছে। বসন্ত, কলেরা, টাইফয়েড, যক্ষ্মা প্রভৃতি যে সমস্ত রোগ ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না, আজ বিভিন্ন ঔষধ আবিষ্কারের ফলে তা নিরাময় করা সম্ভব হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় ঔষধের আবিষ্কার মানব কল্যাণে বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তাই অ্যান্টিবায়োটিককে অনেকে "ম্যাজিক ড্রাগ" বলে থাকে। কিন্তু পরবর্তীকালে একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করা গেল। যে সমস্ত ঔষধে আগে রোগ নিরাময় হয়ে যেত, অনবরত একই ঔষধ ব্যবহারের ফলে রোগনিরাময়ের গতি ক্রমে শ্লথ হয়ে যায়। ঔষধ ক্রমশঃ নিষ্ক্রিয় হতে থাকে এবং রোগজীবাণু ঔষধ-সহনশীল হয়ে ওঠে। এই সমস্ত ঘটনাই বিজ্ঞানীকুলকে ঔষধ-নিষ্ক্রিয়তার কারণ খুঁজে বার করার জন্য ভাবিয়ে তোলে। বিশেষ গবেষণায় ঐসব জীবাণু কোষে 'প্লাজমিড' নামে একটা সামগ্রী পাওয়া গেছে যা হচ্ছে ঐ সব ঔষধ-নিষ্ক্রিয়তার কারণ।

এখন প্রশ্ন প্লাজমিড কি? এই প্রসঙ্গে জসুয়াল লেডারবার্গের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি 1950 খৃস্টাব্দে প্রথম দেখলেন যে ই. কোলাই নামক ব্যাক্টিরিয়ার দু-রকম কোষ পাওয়া যায়। একরকম হচ্ছে পুরুষ এবং অন্যরকম হচ্ছে স্ত্রী জাতীয় কোষ। এই প্রভেদ মূলতঃ কোষে একটা অতিরিক্ত সামগ্রীর উপস্থিতির জন্যেই হয়ে থাকে। একে বলা হয় 'F ফ্যাকটর'। তিনি 1952 খৃস্টাব্দে এই 'F ফ্যাকটর'-কেই প্লাজমিড নাম দিলেন। কিন্তু 1959 খৃস্টাব্দে জাপানে আমাশয় রোগে একটা অদ্ভুত ঘটনা দেখা গেল। এই রোগে ক্রমাগত ঔষধ ব্যবহারের ফলেও কোন নিরাময় হতে দেখা গেল না। শিগেলা ডিসেনটারিয়া (Shigella dysenteriae) নামে একপ্রকার জীবাণুর আক্রমণের ফলেই এই রোগ হয়। পরে দেখা গেল যে ঐ জীবাণু কোষে এক বিশেষ "জিন"-এর উপস্থিতি এই সমস্ত ব্যাকটিরিয়াকে ঔষধ-সহনশীল করে তোলে। 'F-ফ্যাকটরের' মত এই বিশেষ 'জিন'কে অন্য কোন আন্ত্রিক জীবাণুতে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে এবং এগুলির নাম দেওয়া হলো প্রতিরোধক (resistant) ফ্যাকটর বা 'R-factor'। অনুরূপভাবে স্ট্যাফাইলোকক্কাই (Staphylococci) জাতীয় জীবাণুতে ক্রমে পেনিসিলিন-সহনশীল জিন পাওয়া গেল। এই জিন পেনিসিলিনেজ (penicillinase) জাতীয় একপ্রকার এনজাইম তৈরি করে বা পেনিসিলিনকে ভেঙ্গে নিষ্ক্রিয় পদার্থে পরিণত করে। কিন্তু 1960 খৃস্টাব্দে দেখা গেল এই 'R-ফ্যাকটর' ও 'F-ফ্যাকটর' এক জিনিস নয়। এই 'F-ফ্যাকটর' কোষস্থিত ক্রোমোজোমের সঙ্গে যুক্ত থাকে কিন্তু 'R-ফ্যাকটর' স্বাধীনভাবে ক্রোমোজোমের বাইরেও বিরাজ করে।

কিভাবে জীবাণুতে প্লাজমিড এল এই সম্বন্ধে এখনও সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় নি। অনেকে অনেক রকম মতবাদ পোষণ করেন। কারও মতে জীবাণুর মূল ক্রোমোজোমেই এই ঔষধ-নিষ্ক্রিয় জিন বর্তমান। যা কোনও নির্দিষ্ট বাহ্যিক পরিবেশে ফুটে ওঠে এবং ঔষধ-সহনশীল হয়ে ওঠে। আবার কারও মতে নির্দিষ্ট বাহ্যিক পরিবেশের ফলেই জীবাণুটি ঔষধ-সহনশীল হয়। কিন্তু জুলিয়ান ই. ডেভিস (Julian E. Davies) নামে উইস্কনসিন (Wisconsin) বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞানী দেখলেন যে ব্যাসিলাস সারকুল্যানস (Bacillus circulans) নামে একটি ব্যাকটিরিয়া বিউটিরসিন (butirosin) নামে একটি অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি করে এবং এর সঙ্গে ব্যাকটিরিয়াতে এক ধরণের জিন পাওয়া যায়, যার উপস্থিতির ফলে এই ব্যাকটিরিয়াটি এই অ্যান্টিবায়োটিকের সহনশীল হয়ে ওঠে। পরে দেখা গেল এই জিনকে ই. কোলাই নামে একটি ব্যাকটিরিয়াতেও স্থানান্তরিত করা যায়। অনুরূপভাবে দেখা গেল যে যেখানে মাটিতে কিছু বিষাক্ত ধাতু বিদ্যমান সেখানে এই সমস্ত ধাতুর সহনশীল জীবাণুও পাওয়া যায়। এই সমস্ত জিন প্লাজমিড অথবা ক্রোমোজোমে বর্তমান। কিন্তু পরিশেষে এই সহনশীল জিন প্লাজমিডেই স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু কিভাবে এই সমস্ত সহনশীল জিন প্লাজমিডে স্থানান্তরিত হয় এই সম্পর্কে 1974 খৃস্টাব্দে অ্যালান ই. জ্যাকব (Alan E. Jacob) এবং রবার্ট, ডব্লু. হেগস (Robert W. Hedges) নামে লণ্ডন পোস্টগ্রাজুয়েট মেডিকেল স্কুলের দুই বিজ্ঞানী ব্যাখ্যা দিলেন ট্রানসপোসোন (transpouson) নামে একটি জেনেটিক সামগ্রীই এই সমস্ত নির্দিষ্ট জিনের স্থানান্তর ঘটায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, এই রকম একটা প্লাজমিড পাওয়া গেছে যাতে দশটি অ্যান্টিবায়োটিক সহনশীল জিন বর্তমান।

গঠনের দিক থেকে দেখা যায় প্লাজমিড হচ্ছে একটি ডি. এন. এ জাতীয় সামগ্রী এবং ডাবল হেলিক্স (double helix) হিসাবে থাকে। এতে অ্যাডেনিন, গুয়ানিন, থাইমিন এবং সাইটোসিন জাতীয় নিউক্লিক অ্যাসিড বর্তমান। প্লাজমিডের বেসের (base) বিন্যাসও নির্ণয় করা হয়েছে। দেখা গেছে 'স্ট্যাফাইলোকক্কাই'র (Staphylococci) 'R'-প্লাজমিড পি, আই 258 (PI-258) জাতীয় প্লাজমিডে 28,000 বেস জোড়া বর্তমান এবং এতে পেনিসিলিন, এরিথ্রোমাইসিন এবং কিছু বিষাক্ত ধাতু সহনশীল

*বসু বিজ্ঞান মন্দির, রসায়ন বিভাগ, 93/1, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা—700009

জিন বর্তমান। ব্যাকটেরিয়ার ক্রোমোজোমের মত প্লাজমিডের রেপ্লিকেশনও (replication) একটি নির্দিষ্ট স্থানে শুরু হয় এবং একটি নির্দিষ্ট স্থানে শেষ হয়। দেখা গেছে প্লাজমিডের স্বকীয়তা ধারণের জন্য জিনের একটি নির্দিষ্ট অংশের প্রয়োজন হয়। একে জেনেটিক রেপ্লিকেশন ড্রাইভ ইউনিট (genetic replication drive unit) বলে। সাধারণতঃ এটা 3000 বেস জোড়ার মত অংশে হয়।

বিভিন্ন রকম ঔষধ-সহনশীল জীবাণু আবিষ্কৃত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, একপ্রকার স্ট্যাফাইলোকক্কাই (Staphylococci) পাওয়া গেছে যা কেবলমাত্র পেনিসিলিনকেই ভাঙ্গতে পারে না—ক্যাডমিয়াম, বিসমাথ, সীসা, অ্যান্টিমনি আর্সেনিক ধাতুর ক্রিয়াও সহনশীল। এরিথ্রোমাইসিন (erythromycin) নামে আর এক অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধক প্লাজমিডও পাওয়া গেছে, যা রাইবোজোমের আর. এন. এ. জাতীয় নিউক্লিক অ্যাসিডকে সংশোধিত করে। টেট্রাসাইক্লিন (tetracycline) প্রতিরোধক প্লাজমিডও পাওয়া গেছে। সাইমন. ডি. সিলভার (Simon D. Silver) নামে ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞানী আর্সেনাইট প্রতিরোধক একপ্রকার স্ট্যাফাইলোকক্কাই পেয়েছেন, যাতে কোষে আর্সেনাইটের যাতায়াতের প্রক্রিয়ার পরিবর্তন হয়। তাছাড়া ব্যাকটিরিয়া বিনষ্টকারী কিছু ঔষধ যথা সালফার জাতীয় এবং ট্রাইমিথোপ্রিম (trimethoprim) ও ক্লোরামফেনিকল (chloramphenicol) জাতীয় ঔষধ-সহনশীল প্লাজমিডও পাওয়া গেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে জীবাণুর ঔষধ প্রতিরোধক্রিয়ায় এই প্লাজমিডের বিশেষ ভূমিকা আছে। মূলত বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার পদ্ধতি না মেনে বা না-জেনেই মুড়িমুড়কির মত বিভিন্ন ঔষধ ব্যবহারই এই প্লাজমিড তৈরি হতে সহায়তা করে। আর যথার্থ জেনেশুনে প্রয়োজনমত ঔষধ ব্যবহার করলে জীবাণুর এই প্রতিরোধক শক্তি বহুলাংশে লাঘব হবে।' এতো সমগ্র জীবজগতের বাঁচার সংগ্রামে বিভিন্ন প্রজাতি ও গোষ্ঠীর পারস্পরিক আক্রমণ প্রতিআক্রমণ, বিরুদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন ও সহনশীলতা শক্তি অর্জন এবং মাধ্যমে জীবকোষে অনাক্রম্যতা শক্তি (immunity) অর্জনের বংশগতিগত বিশেষ প্রক্রিয়া। প্লাজমিডও সম্ভবত ঐসব ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণুকোষে জাত স্থায়ী আত্মরক্ষামূলক জেনেটিক ফ্যাক্টর—বংশগতির ধারায় জীবাণুকোষ যা স্থায়ীভাবে অর্জিত অনাক্রম্যতা শক্তি। সুতরাং এই প্লাজমিড সম্পর্কে আরও বিশেষ জ্ঞান, তাকে নিষ্ক্রিয় করার উপায় এবং সর্বোপরি চিকিৎসায় ঔষধ প্রয়োগের যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান ও ব্যবহার বিধি সম্পর্কে কঠোরতা আজ একান্তই প্রয়োজন।

জীবতাত্ত্বিক পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ

অসিতকুমার দাস*

আধুনিককালে কীটনাশক ও আগাছানাশক হিসেবে যে সকল রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হচ্ছে তাদের মধ্যে কিছু কিছু খুব বিষাক্ত এবং উদ্ভিদ দেহে ও মাটিতে বহুদিন অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে ও ক্রমশঃ খাদ্য-শৃঙ্খলের মাধ্যমে আমাদের দেহে আসে এবং প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গ দমনের জন্য কীটনাশক প্রয়োগ করলে অনেক সময় উপকারী কীটপতঙ্গ ও জীবজন্তু মারা যায় ফলে জীব-জগতের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। জীব-জগতের ভারসাম্য নষ্ট না করে "জীবতাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রণের" মাধ্যমে কি ভাবে ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গ ও আগাছা দমন করা যায় সেই বিষয়ে এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

আজকাল জীবতাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রণ বা ইংরেজীতে যাকে বলা হয় "বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল" (biological control) এই ব্যাপারটি নিয়ে সাড়া বিশ্বে খুব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহের ক্ষতিকারক বিভিন্ন কীট-পতঙ্গ দমনের জন্য আমরা যে সকল রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করি তার ফলে সাময়িক ভাবে উপকার পেলেও ঐ সব পদার্থ আমাদের প্রচুর ক্ষতি সাধন করে থাকে। অনেক সময় ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গ দমনের জন্য রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগের ফলে অনেক উপকারী কীট-পতঙ্গ মারা যায়। ফলে আমাদের জীব-জগতের ভারসাম্য নষ্ট হয়। কিছু কিছু রাসায়নিক পদার্থ মাটিতে ও উদ্ভিদদেহে বহু দিন অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে এবং মাটিকে দূষিত করে তোলে। এই সব বিষাক্ত পদার্থ খাদ্য-শৃঙ্খলের মাধ্যমে (food chain) প্রাণী দেহে পৌছায় ও প্রচুর ক্ষতি সাধন করে। এই সব দিক বিবেচনা করে এখন জীবতাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

এখন জীবতাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারটি একটু ব্যাখ্যা করা যাক। সোজা কথায় জীবতাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রণ বলতে আমরা বুঝি কোনও এক প্রকারের জীব (উদ্ভিদ অথবা প্রাণী) দিয়ে অপর এক প্রকারের ক্ষতিকারক জীবকে দমন করা। এই ব্যাপারটি অনেকটা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা ব্যাপারের মত। যেমন কীট-পতঙ্গ আমাদের

*চৌধুরী পাড়া, পোঃ হালিশহর, 24 পরগণা

ক্ষেতখামারের ক্ষতি সাধন করে থাকে। আবার ব্যাঙ এই কীট-পতঙ্গ খায় কিন্তু ব্যাঙ আমাদের কোন ক্ষতি করে না। এখানে ব্যাঙ দিয়ে ক্ষেত খামারের কীট-পতঙ্গ দমন করা হচ্ছে। দেখা গিয়েছে ব্যাঙের সংখ্যা কমলে শস্যক্ষেত্রে রোগ পোকার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এটি একটি জীবতাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রণের উদাহরণ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই এই জীবতাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রণ' বিষয়টি নিয়ে চেষ্টা চলছে। একটি ব্যাপার বহু আগে থেকেই লক্ষ্য করা যাচ্ছিল যে বিদেশ থেকে গাছপালা আমদানীর সময় অসর্তকতার ফলে যদি কোন রোগ জীবাণু অন্য দেশে আসে তখন সেই রোগজীবাণু সেই নতুন দেশে ব্যাপক আকারে দেখা দেয়। সেই জীবাণুরা কিন্তু নিজের দেশে অর্থাৎ যে দেশ থেকে রোগজীবাণুযুক্ত গাছ আমদানী করা হয়েছে সেই দেশে সাধারণ ভাবে বা ব্যাপক আকারে রোগ সৃষ্টি করতে পারত না। এর কারণ সম্বন্ধে 1856 খৃস্টাব্দে আমেরিকার বিখ্যাত কীটতত্ত্ববিদ এশা ফিচ্ (Asa Fich) বলেছিলেন যে এর কারণ একটিই তা হলো গাছ সমেত জীবাণুদের যে দেশ থেকে আমদানী করা হয় সেই দেশে প্রকৃতি নির্বাচিত এমন কোন জীব আছে যারা এই রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুদের প্রশমিত করতে সক্ষম। কিন্তু বিভিন্ন প্রাকৃতিক বাধার ফলে এই জীবাণুদের প্রশমিত করতে সক্ষম এরূপ জীবরা অন্য দেশে যেতে পারে না। তাই অন্য দেশে ঐ সব জীবাণুর শত্রু না থাকায় রোগজীবাণুরা প্রচুর পরিমাণে বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম হয় এবং সেই দেশের ক্ষতিসাধন করে।

1887 খ্রীস্টাব্দে "cottony cushion scale insect" নামক পোকাটি ক্যালিফোর্নিয়াতে লেবু গাছে প্রচুর ক্ষতি সাধন করতে শুরু করে। এই পোকাটি এসেছিল অস্ট্রেলিয়া থেকে। তখন "এসা ফিচ্"-এর সূত্র ধরে একজন কীটতত্ত্ববিদকে পাঠানো হলো অস্ট্রেলিয়াতে সেই প্রকৃতি নির্বাচিত শত্রুটিকে খুঁজে বার করতে। কীটতত্ত্ববিদ দেশে ফিরে এলো এক বিশেষ প্রজাতির "লেডী বীটল" (Lady Beetle) নামক গুবরে পোকা নিয়ে। এই গুবরে পোকা "cottony cushion scale insect" নামক পোকাটি দমন করতে সক্ষম হয়। 1946 খৃস্টাব্দে যখন ক্যালিফোর্ণিয়াতে ডি.-ডি.-টি.-র ব্যবহার শুরু হয় তখন সেই গুবরে পোকারা মারা পড়ল; এবং লেবু গাছে আবার সেই রোগ দেখা দিল। তখন আবার গুবরে পোকা ছাড়া হলো এবং লেবু গাছের রোগ প্রশমিত হলো। এটি একটি ভাল জীবতাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রণের উদাহরণ। "মেরী ল্যাণ্ড", "ভার্জিনিয়া" ও "পশ্চিম ভার্জিনিয়ার" আপেল বাগানের মালিকরা তাদের আপেল বাগানে 'লেডী বীটল' নামক গুবরে পোকা ছেড়েছেন বাগানে কিছু বিশেষ ধরনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা দমনের জন্য।

ক্লামাথ (Klamath) নামক এক ধরনের আগাছা ক্যালিফোর্নিয়াতে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ একর জমিকে নষ্ট করে দিচ্ছিল। তখন 2-12-1948 তারিখে ক্রাইসোলিনা (chrysolina) নামক এক ধরণের গুবরে পোকার দুটি প্রজাতি ছেড়ে দেওয়া হলো। এই দুই প্রজাতির গুবরে পোকারা ক্লামাথ নামক ঐ আগাছাকে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়। এই গুবরে পোকাদের ছাড়ার আগে বহু পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল ঐ বিশেষ ধরণের আগাছা নির্মূলের পর গুবরে পোকারা খাদ্যের জন্য অর্থকরী গাছপালাকে নষ্ট করে কিনা। যখন দেখা গেল গুবরে পোকারা অর্থকরী গাছপালার কোন ক্ষতি করে না তখন প্রচুর পরিমাণে ঐ বিশেষ দুই প্রজাতির গুবরে পোকা ক্লামাথ নামক আগাছাযুক্ত এলাকায় ছেড়ে দেওয়া হলো। দুই বছরের মধ্যেই ঐ গুবরে পোকারা সেই বিশাল এলাকার জমিকে আগাছা মুক্ত করে ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে সক্ষম হয়েছিল।

মশার লার্ভা দমনের জন্য ব্যবহার করা হয় "গাম্বুসিয়া এফিনিস" নামক এক ধরণের মাছ। এই মাছটি আমেরিকা থেকে আমদানী করা হয়। এই মাছটি প্রচুর পরিমাণে মশার লার্ভা খায় এবং বদ্ধ ও নোংরা জলে থাকতে পারে। আমাদের দেশের 'খলসে' এবং 'তেচোকা' প্রভৃতি মাছও মশার লার্ভা খায়। এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন এবং সেই ভাবে মশক নাশের উপায় বেরোতে পারে।

ফ্লোরিডা (Florida) এবং তার আশেপাশের অঞ্চলে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে গৃহপালিত জন্তু মারা যেত 'স্ক্রু ওয়ার্ম ফ্লাই' (Screw worm fly) নামক এক ধরণের মাছির আক্রমণে। স্ত্রীমাছিরা গৃহপালিত জন্তুদের উন্মুক্ত ঘা কিংবা ক্ষতে ডিম পাড়ে। সেই ডিম ফুটে লার্ভা হয় এবং লার্ভারা ক্ষতের মাংস খায় এবং ঘাটিকে আরও বাড়িয়ে দেয়, ফলে স্ত্রীমাছিরা আরও বেশী জায়গায় ডিম পাড়ে, অবশেষে প্রাণীটি মারা যায়। এই মাছিদের দমন করা সম্ভব হয়েছিল তাদের পুরুষ মাছিদের নির্বীজ-করণ পদ্ধতি দিয়ে। পুরুষ মাছিদের উপর গামা (gamma) রশ্মি প্রয়োগ করে নির্বীজ করা হয়েছিল। স্ত্রীমাছিরা পুরুষ মাছির সাথে জীবনে একবার মাত্র যৌন মিলনে মিলিত হয় এবং পুরুষ মাছিরা অনেকবার যৌন মিলনে মিলিত হয়। 1958 খৃস্টাব্দে ফ্লোরিডা এবং আশেপাশের অঞ্চলে প্রতি সপ্তাহে প্রায় পাঁচ কোটি করে নির্বীজকৃত মাছি বিমানের সাহায্যে ছাড়া হতে লাগল (এই বিশাল পরিমাণ মাছির থেকে পুরুষ এবং স্ত্রীদের পৃথক করা সম্ভব ছিল না, তাই ধরা হয়েছিল এই বিশাল পরিমাণ মাছির অর্ধেক নির্বীজ পুরুষ), ফলে 1959 খৃস্টাব্দের প্রথম দিকে ঐ অঞ্চল থেকে 'স্ক্রু ওয়ার্ম ফ্লাই' মাছিদের নির্মূল করা গিয়েছে।

এমনি কিছু কিছু কীট-পতঙ্গ আছে যাদের উপর এক্স-রে বা 'গামা-রে'-প্রয়োগ করে নির্বীজ করা যেতে পারে। সেই রশ্মি তাদের স্বাস্থ্যের জন্য পরিবর্তনও আনে। তাদের দেহ-কোষের ক্রোমোজোম-গুলো স্থায়ী ভাবে ভেঙে একটা পরিবর্তিত রূপ নেয়। কিন্তু জীনগুলি (gene) অক্ষত থাকায় নতুন তাঁরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। এরা তাদের সুস্থ স্ত্রী-প্রজাতির সাথে যৌন মিলনে মিলিত

হলে ঐ অস্বাভাবিক পরিবর্তিত ক্রোমোজোম তাদের সন্তানদের মধ্যে যায়। ফলে এই অস্বাভাবিক ক্রোমোজোমযুক্ত সন্তানদের একাংশে জীনের সমতা রক্ষা না হওয়ার জন্য বন্ধ্যা হয় এবং একাংশ সন্তান উৎপাদন করতে সক্ষম হলেও তাদের সন্তানদের মধ্যে আবার একাংশ বন্ধ্যা হয়। এই ভাবে বংশানুক্রমিক ভাবে তাদের সংখ্যা ক্রমশঃ লোপ পেতে থাকে এবং অবশেষে তারা বিলুপ্ত হয়। মাছিদের (housefly) এই ভাবে দমনের চেষ্টা চলছে।

আজকাল কীট-পতঙ্গ দমনের জন্য কিছু কিছু ব্যাকটিরিয়াও ব্যবহৃত হচ্ছে। জাপানী গুবরে পোকাতে 'ব্যাসিলাস পোপিলিই' (Bacillus popilliae) নামক ব্যাকটিরিয়ার সাহায্যে 'milky disease' নামক রোগ সৃষ্টি করে তাদের দমন করা হচ্ছে। আমেরিকাতে 'ব্যাসিলাস থুরিনজিয়েন্‌সিস্' (Bucillus thuringiensis) নামক ব্যাকটিরিয়া দ্বারা কিছু কিছু অপকারী মথ ও প্রজাপতি নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। ক্যালিফোর্নিয়াতে এখন ব্যাসিলাস থুরিনজিয়েন্‌সিস্ ব্যাকটিরিয়া দ্বারা ষাট শতাংশ লেটুস্ (lettuce) ক্ষেতকে যাযাবর মথের হাত থেকে রক্ষা করা হয়েছে।

ভাইরাস দিয়েও কিছু কিছু কীট-পতঙ্গ দমন করা যায়। যেমন—'catton boll worm', 'tobacco bud worm', 'European pine sawfly', 'cabbage looper', 'alfalfa cuterpilla' প্রভৃতি কীটদের কয়েক ধরণের বিশেষ ভাইরাস দ্বারা দমন করা হচ্ছে।

সাবধানতা—এই জীবতাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কাজ করতে গেলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। যেমন—মাছি প্রভৃতিদের নির্বীজকরণ করে ছাড়ার সময় জানা প্রয়োজন এগুলোকে সম্পূর্ণ ভাবে নির্বীজকরণ করা হয়েছে কিনা। তা না হলে ফল উল্টো হবে। আর একটি জিনিস হলো ক্ষতি-কারক জীবের শত্রু নির্বাচন করা। এই শত্রুটি যদি উপকারী বন্ধুকে ধ্বংস করে তা হলে এটি যথোপযুক্ত জীবতাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রণ হলো না। এক্ষেত্রে একটি উদাহরণ দেওয়া যাক—একবার আমেরিকাতে কিছু আপেল বাগানে পোকা দমন করার জন্য শালিক পাখী ছাড়া হলো। প্রথম প্রথম খুব ভাল কাজ হলো কিন্তু পোকার সংখ্যা যখন খুব কমে গেল তখন শালিক পাখীরা আপেল খেতে আরম্ভ করলো। ফলে আপেল রক্ষা করার জন্য শালিক পাখীর সংখ্যা কমাতে হলো। এখানে জীবতাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রণ সাময়িক ভাবে সফল হলেও চিরস্থায়ী নয়। বরঞ্চ বিপজ্জনক পরিণতি।

আমাদের দেশ থেকে প্রতি বছর প্রচুর ব্যাঙের মাংস বিদেশে রপ্তানী করা হয় এবং এর ফলে কোটি কোটি টাকা বিদেশী মুদ্রা আসলেও প্রকৃতিবিদ্‌রা কিন্তু এতে শঙ্কিত। কারণ ব্যাঙের সংখ্যা কমলে ক্ষেতখামারে অপকারী কীট-পতঙ্গের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং অর্থকরী ফসলের প্রচুর ক্ষতিসাধন করে থাকে। ব্যাঙ এইভাবে ক্ষেত-খামারে, খাল-বিল প্রভৃতি থেকে না ধরে যদি ব্যাপক ভাবে ব্যাঙের চাষ করে বিদেশে রপ্তানী করা হয় তা হলে এই ক্ষেত খামারে অপকারী কীট-পতঙ্গের বৃদ্ধির ব্যাপারটি হয় না। এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষ এবং বিজ্ঞানী তথা বুদ্ধিজীবীদের বিশেষ ভাবে ভাবতে হবে।

শব্দ দূষণ প্রসঙ্গে

সুজিতকুমার নাহা*

শব্দময় জগৎ। শব্দের সাহায্যেই আমরা কথাবার্তা বলি, উপভোগ করি সঙ্গীত। আবার শব্দই আমাদের করে সতর্ক, যেমন সাইরেনের আওয়াজ বা দমকলের ঘণ্টা। শব্দ যন্ত্রাংশের বৈকল্য নির্ধারণেও সাহায্য করে, যেমন তড়িৎ-ব্যজনীর (electric fan) অস্বাভাবিক আওয়াজ সাধারণভাবে সূচিত করে বেয়ারিং (bearing)-এর ত্রুটি।

তথাচ, বহুক্ষেত্রে শব্দ আমাদের উত্ত্যক্ত করে। বস্তুত পক্ষে অনেক শব্দই আমাদের কাছে অপ্রীতিকর, অবাঞ্ছিত। বিমানবন্দরের কাছেপিঠে যারা থাকেন, বিমান ওঠা-নামার তীব্র শব্দ তাদের পীড়িত করে। অপেক্ষাকৃত জোরালো শব্দই যে শুধু বিরক্তি উৎপাদনে সক্ষম তা কিন্তু নয়। সময়বিশেষে মৃদু শব্দও অবাঞ্ছিত হতে পারে। যেমন, সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ পরিবেশে ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা কনসার্টও বেশ বিরক্তিকর বোধ হতে পারে।

এমনকি, শব্দ করতে পারে প্রভূত ক্ষতি। sonic boom-এর প্রভাবে চূর্ণ হতে পারে জানালার কাচ, খসে পড়তে পারে দেয়ালের পলেস্তারা। সবচেয়ে দুঃখের কথা, শব্দ ক্ষতি করতে পারে এক অতি সূক্ষ্ম শব্দগ্রাহক যন্ত্রের—যার নাম মানুষের কর্ণ।

শব্দ দূষণের কুফল—উচ্চস্বরবিশিষ্ট অবাঞ্ছিত শব্দ (loud noise) মনের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে বা শ্রবণযন্ত্রের অপূরণীয় ক্ষতি করতে পারে। শব্দ দূষণ তাই পরিবেশ দূষণেরই একটা দিক। প্রযুক্তিগত উন্নতির সাথে সাথে শব্দ-দূষণের মাত্রাও ভীষণভাবে বেড়ে চলেছে। কারখানার শ্রমিকদের অনেক ক্ষেত্রেই কাজ করতে হয় উচ্চমাত্রার শব্দবিশিষ্ট পরিবেশের মধ্যে। এর ফলে তাদের শ্রবণশক্তি ক্রমশঃ কমে যায়; এমনকি কেউ কেউ সম্পূর্ণ বধিরও হয়ে যেতে পারে।

* 22/1, কালীচরণ বসু রোড, কলকাতা 700 061

বোম্বাইতে অবস্থিত সেন্ট্রাল লেবার ইনস্টিটিউটের ডেপুটি ডিরেক্টার ডঃ হরবক্স সিং 1976 খৃষ্টাব্দে একটি সমীক্ষা চালান। উচ্চমাত্রার শব্দযুক্ত পরিবেশে কাজ করতে হয় এরকম 162 জন শ্রমিককে পরীক্ষা করে দেখা যায় শতকরা 80·6 জনের শ্রবণযন্ত্র ত্রুটিযুক্ত।

শুধু কল-কারখানার শ্রমিকদেরই নয়, পরিবেশে ক্রম-বর্ধমান শব্দ-দূষণের ফলে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ছি আমরা সবাই। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, আমাদের পূর্বপুরুষদের তুলনায় আমাদের শ্রবণ-শক্তি অনেক কমে গেছে। দেখা গেছে, অবাঞ্ছিত শব্দ আমাদের কথাবার্তা বা কাজকর্মে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। রাস্তায় যানবাহন চলাচলের আওয়াজ হয়তো আমরা কেউই খেয়াল করি না, কিন্তু পথিপার্শ্বস্থ কোন টেলিফোন বুথ থেকে ফোনে কথাবার্তা বলার সময় এই আওয়াজ নিতান্ত বিরক্তিকর বোধ হয়। অবাঞ্ছিত শব্দের প্রভাবে কর্মদক্ষতার অবনতি ঘটে। এটা বেশী করে ঘটে সেইসব কাজে যেখানে মনঃসংযোগের সবিশেষ প্রয়োজন আছে, যেমন পড়াশোনা, প্রুফদেখা, সম্পাদনা-কার্য, ড্রইং বা নকশা অংকন ইত্যাদি। আচমকা আওয়াজ মানুষকে বিভ্রান্ত করে এবং এর ফলে দুর্ঘটনা ঘটাও অসম্ভব নয়।

শহরাঞ্চলে শব্দ দূষণের উৎপত্তিস্থল—শহরাঞ্চলে শব্দ-দূষণের প্রধান আসামী হচ্ছে বিভিন্ন যানবাহন। ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরী পরিচালিত বিভিন্ন সমীক্ষায় জানা গেছে যে কলকাতা, বোম্বাই বা দিল্লীর মত বড় বড় শহরের কিছু এলাকায় অফিস-টাইমে অবাঞ্ছিত শব্দের মাত্রা (noise level) 90 ডেসিবেলের থেকেও বেশী হয়। বিশেষজ্ঞের মতে 85 ডেসিবেলের থেকে বেশী উচ্চস্বরের শব্দ শ্রবণশক্তির ক্ষতিসাধন করে। এই প্রসঙ্গে, আরও কয়েকটি উচ্চস্বরবিশিষ্ট শব্দের ডেসিবেল মাত্রা কত হয় দেখা যাক। পাশদিয়ে একটি ডিজেল ট্রাক গেলে noise level হয় 95 ডেসিবেল। পাশ দিয়ে একটি ব্যাণ্ডপার্টি গেলেও তাই হয়। কালীপুজোর সময়ে বড়সড় পটকা ফাটালে হয় 100 ডেসিবেল। বলে রাখা ভাল যে শব্দ-মাত্রা 120 ডেসিবেলের ওপরে হলে কানে যন্ত্রণা অনুভূত হয়। 130-140 ডেসিবেল হলে মুহূর্তের মধ্যে চিরতরে বধির হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বড় বড় শহরে বহুতলবিশিষ্ট বাড়ী রাস্তার দু'ধারে নির্মিত হয়েছে। এর ফলে প্রতিফলনের দরুন শব্দমাত্রা আরও বেড়ে যায়। নির্মাণকার্যে যে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার হয় সেগুলোর থেকেও শব্দ-দূষণ হয় যথেষ্ট পরিমাণে। এখন যে কোন অনুষ্ঠানে তারস্বরে মাইক বাজানোর চলন হয়েছে। এর ফলে অবস্থা যে কী ভীষণ হয়ে ওঠে সেটা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। পপ-সঙ্গীতের ফ্যাশন এখন তুঙ্গে। উৎসাহী শ্রোতারা ভালবাসেন খুব উচ্চমাত্রায় সঙ্গীত শুনতে। কিন্তু এই বাঞ্ছিত সঙ্গীতও শ্রবণযন্ত্রের ক্ষতি করতে পারে।

উপসংহার—পরিবেশে শব্দ-দূষণের মাত্রা বেড়েই চলেছে। এই বৃদ্ধির হার গড়পরতা হিসেবে প্রতি বছরে প্রায় 1 ডেসিবেল—সরল ভাষায় যার অর্থ প্রতি বছর প্রায় 12% শব্দ-মাত্রা (sound level) বৃদ্ধি। এই তথ্য বেশ ভয়াবহ। স্থল, জল এবং বায়ু দূষণ নিয়ে কিছুটা সচেতনতার সৃষ্টি হলেও শব্দ-দূষণ নিয়ে সবাই ততটা সচেতন নন। তাই শব্দ-দূষণ নিয়েও গভীরভাবে ভাববার দিন এসেছে।

বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যের ধারাবাহিকতা*

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য**

আলোচনার বিষয়বস্তু নির্ধারিত হয়েছে 'বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যের ধারাবাহিকতা'। এই নামকরণে 'সাহিত্য' শব্দটি লক্ষণীয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক রচনা মানেই সাহিত্য নয়। কতকগুলি বিশেষ গুণ থাকলেই রচনা সাহিত্য-পদবাচ্য হয়। কাজেই পাঠ্যপুস্তককে এ থেকে স্বভাবতঃই বাদ দেওয়া উচিত, কারণ পাঠ্যপুস্তক কচিৎ কখনও সাহিত্য রস সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু বাংলায় বিজ্ঞান রচনার শুরু অনেকটা পাঠ্য-পুস্তক দিয়েই। কাজেই ধারাবাহিকতার কথা বলতে গেলে ওদের প্রসঙ্গ আসবেই এবং আসাটাই স্বাভাবিক। আর, কিছু কিছু পাঠ্য-পুস্তকও, তা সংখ্যায় যত সামান্যই হোক, যে রচনার গুণে সাহিত্যধর্মী হতে পারে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে এগুলি ব্যতিক্রম। বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক বলতেই আমরা সাধারণতঃ ছাত্রদের ভীতিপ্রদ, ভাষার লালিত্যবিহীন এবং বহু দুর্বোধ্য শব্দের সমাহার-জর্জরিত রচনার সঙ্গেই বেশি পরিচিত। অধ্যাপনা করতে গিয়ে স্নাতক স্তরের বা তারও উচ্চস্তরের এ রকম কিছু কিছু গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ আমার হয়েছে। এ সব বই থেকে জ্ঞানার্জন হয়তো ঠিকই হয়, কিন্তু সাহিত্যের স্বাদ পাওয়া যায় কিনা সে বিষয়ে আমি অন্ততঃ সন্দিগ্ধ।

'সাহিত্য' শব্দটির মত 'বিজ্ঞান' শব্দটি নিয়েও একটু আলোচনা করলে মন্দ হয় না। ঐ শব্দটি এখন যে অর্থে ব্যবহৃত হয় সে

* রাজশেখর বসু স্মৃতি-বক্তৃতা, 1982

** 16 টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা-700 025

অর্থে কবে থেকে এর প্রচলন শুরু হলো তা নিয়ে পণ্ডিতেরা কিছু কিছু গবেষণা করেছেন। শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ তো বি— অর্থাৎ বিশেষ রকম জ্ঞান। কাজেই আমরা এখন বিজ্ঞান বলতে যে অর্থ বুঝি তা ছাড়াও এর অন্য অর্থ হতে বাধা নেই। যে কোন বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানকেই তো ঐ নাম দেওয়া চলে এবং এক সময়ে নাকি তা দেওয়াও হতো। উদাহরণ স্বরূপ উনবিংশ শতাব্দীর একখানা বই-এর নাম মনে পড়ছে। বইটির নাম দেওয়া হয়েছিল বিজ্ঞান সাধু রঞ্জন। বইটিতে কিন্তু আমাদের পরিচিত বিজ্ঞানের নামগন্ধও ছিল না, ছিল কিছু কবিতার সংকলন। অর্থাৎ লেখক তাঁর কাব্যকেই বিশেষ জ্ঞানের ধারক হিসেবে বিজ্ঞান নামে অভিহিত করেছিলেন। সেকালের গ্রন্থের নামকরণে এ রকম আরও নানা অর্থে বিজ্ঞান শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। তবে এখন অবশ্য বিজ্ঞানের সে সব অর্থ বাতিল হয়ে গিয়ে ইংরেজি science শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবেই শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে science শব্দটিও আগেকার দিনে ইংরেজিতে তেমন প্রচলিত ছিল না ; তখন এটিকে দর্শন শাস্ত্র বা ফিলজফিরই একটা অঙ্গ বলে ধরা হতো। তফাৎ বোঝার জন্য বলা হতো experimental philosophy। তারপর কবে যে শব্দটি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে science নাম গ্রহণ করল তা ভাষাতত্ত্ববিদরাই ভাল বলতে পারবেন।

বাংলায়ও অনেকটা অনুরূপ ব্যাপার ঘটেছে বলা যেতে পারে। বিজ্ঞান রচনার প্রথম যুগে বিজ্ঞান ও বিদ্যা প্রায় সমার্থসূচক ছিল। এমন কি চিকিৎসাবিজ্ঞান আয়ুর্বেদকেও বলা হতো বিদ্যা। প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনের মতে চিকিৎসককে যে বৈদ্য বলা হতো তাও এই কারণে, এখনও অনেকে physics-কে পদার্থবিদ্যা, zoology-কে প্রাণিবিদ্যা এইভাবে বলে থাকেন। বিজ্ঞান শব্দটি ধীরে ধীরে কেমন করে বিশেষ অর্থে অন্য সব প্রতিশব্দকে সরিয়ে নিজের স্থান গ্রহণ করে নিল তাও ভাষাতত্ত্ব-বিদ্‌রা গবেষণা করতে ছাড়েন নি। সুকুমার সেন মশাই বলেছেন, "বিজ্ঞানের পক্ষে বোধ হয় চরম রায় পাওয়া গেল 1875 খৃস্টাব্দে যখন বঙ্কিমচন্দ্র 'বিজ্ঞান রহস্য' বার করলেন।

যাই হোক, এ সব কথার উল্লেখ করার দরকার ততটা হয়তো হতো না, কিন্তু বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ আমার বক্তব্য বিষয়ের নাম নিজেরাই ঠিক করে দিয়েছেন কাজেই তাঁদের আদেশ শিরোধার্য করে এসব কথা একটু-আধটু বলতেই হবে বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখবার জন্যই।

ধারাবাহিকতার কথা বলতে গেলেই, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, বিজ্ঞানের ইতিহাসের প্রসঙ্গ আপনিই এসে পড়ে। আমার এই অল্প সময়ের সংক্ষিপ্ত ভাষণে অমন একটা দীর্ঘ বিষয় নিয়ে ভাল করে আলোচনার সুযোগ কোথায়? তা ছাড়া এ বিষয়ে ইতিপূর্বেই কেউ কেউ সুদীর্ঘ আলোচনা করে গেছেন এবং অধ্যাপক ডক্টর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তো সম্ভবতঃ এই বিষয়েই গবেষণা করে ডক্টর উপাধি অর্জন করেছেন। আমি তাই অল্প কথায় যেটুকু বলা যায় তাতেই যদি আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখি তা হলে আমাকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন।

পাঠ্যপুস্তককে সাহিত্য বলতে দ্বিধা থাকলেও এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা শুরু হয়েছিল এই পাঠ্যপুস্তক দিয়েই এবং এ কাজে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন ইয়োরোপীয় মিশনারী। আবার এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে প্রাচীন ভারত এক সময়ে বিজ্ঞানচর্চায় খুব এগিয়ে গেলেও মাঝখানে এসেছিল একটা বিরাট অন্ধকার যুগ। অথচ ঐ সময় থেকেই প্রায় সারা ইয়োরোপে পড়ে যায় নবজাগরণের সাড়া। সাহিত্য থেকে আরম্ভ করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা দিকে একটা প্রকাণ্ড অগ্রগতির জোয়ার শুরু হয়ে যায় যেন। ইয়োরোপীয়েরা যখন ভারত জয় করে এদেশে তাঁদের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন তখন স্বভাবতঃই তাঁদের কেউ কেউ এদেশেও সেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রবর্তনের জন্য এগিয়ে এলেন।

কাজটা শুরু হয়েছিল প্রধানতঃ তিনটি প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে— শ্রীরামপুর মিশন, হিন্দু কলেজ আর কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি।

কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগেই 1817 খৃস্টাব্দে এই পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে লেখা প্রথম বিজ্ঞানের বই বেরুল। বইখানি একখানি অঙ্কের বই এবং এদেশের স্কুলে প্রবর্তিত অঙ্ক থেকেই এর উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছিল। বইটির লেখক ছিলেন একজন ইংরেজ, তাঁর নাম মে। অঙ্ককে বিজ্ঞানের বই বলতে কেউ কেউ হয়তো একটু উদ্বেগ বোধ করেন। কিন্তু অঙ্কই হচ্ছে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের আদি বিজ্ঞান। কাজেই অঙ্কের বইকেও বিজ্ঞান বলে মেনে নিতে বাধা কোথায়?

অঙ্কের বই হলেও এই বইখানায় মধ্যে একটু নূতনত্ব ছিল। কবিতায় লেখা কিছু ধাঁধা বা হেঁয়ালী যার সমাধান দেওয়া হয়েছিল পরিভাষায়। কবিতা খুব উঁচুদরের না হলেও বিদেশীর লেখা হিসেবে তার কিছুটা মূল্য আছে নিশ্চয়ই। একটু উদাহরণ দিচ্ছি ঃ

"অনুপচন্দ্র ভট্ট কহেন　শুন কায়স্থের বালা,
সকল চন্দ্রের মধ্যে রন্ধ্র　তবে গাঁথিবে মালা।"

মে সাহেব কিন্তু বই এর নামকরণে সংস্কৃতের প্রভাব কাটাতে পারেন নি। বইটির নাম দেওয়া হয়েছিল "অঙ্কপুস্তকম্"।

এর দু'বছর পরে এ রকম আর একখানা বই লিখেছিলেন আর এক ইংরেজ,—জন্ হার্লে। এ বইটিও অঙ্কের,—নাম গণিতাঙ্ক। এতে এদেশের হিসেব পদ্ধতি—যেমন শুভঙ্করের আর্যায় ছিল, তাও তিনি কিছুটা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। এ বইটিতেও কবিতার ভিতর দিয়ে অঙ্কের সমস্যা ও তার সমাধান থাকায় এটিও একটু সাহিত্যের ছোঁয়াচ পেয়েছে। কবিতাগুলি অবশ্য অনেকটা শুভঙ্করের ধাঁচেই লেখা। যেমন—

"পাত্র কহে শুন নৃপ, নিবেদন,
ষোল তঙ্কা দর ভরি জানে জগজ্জন।
পঞ্চদশের এক মুদ্রা ধরিতে হইবে,
চতুর্দশের দুই মুদ্রা তাহাতে মিশাবে।"

শুভঙ্করের আর্যাও তো অনেকটা এই ভাষাতেই লেখা। শুভঙ্কর ছিলেন এদেশের একজন অজানা গণিতজ্ঞ। খুব সহজ উপায়ে বড় বড় হিসেব কষে দেবার অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করে তা কবিতার রচনা করে গেছেন তিনি, কবিতা তেমন উচ্চাঙ্গের না হলেও মনে রাখবার পক্ষে কবিতা যে কত বেশি কার্যকর তা কে না জানে?

"যত টাকা মণ প্রতি হইবেক দর
তত আনা আড়াই সের কহে শুভঙ্কর।
আনা প্রতি দুই কড়া গণ্ডায় আট তিল
শুভঙ্কর দাশ কহে এই মত মিল।
মণের দামের বামে ইলেক মাত্র দিলে
আধ পোয়ার দাম তবে নিমেষেতে মিলে।"

অবশ্য এখন দশমিক পদ্ধতি—মেট্রিক সিস্টেম চালু হওয়ায় মণ, কড়া, গণ্ডা, পোয়া এ সবেরও আর চল নেই। কিন্তু আমাদের ছেলেবেলায় এই আর্যা প্রয়োগ করে আমরা কত ছোট বয়সে কত সহজ উপায়ে বড় বড় অঙ্ক কষে দিতাম ভাবলে অবাক লাগে। শুভঙ্কর কে ছিলেন, কোথায় তাঁর বাড়ি, কি করে মাথা খাটিয়ে তিনি এই সব পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন এসব নিয়ে বিশেষ কিছু তথ্যানুসন্ধান হয়েছে বলে মনে হয় না। কিন্তু হলে ভাল হতো।

যাই হোক, শুভঙ্করের কথা এখন থাক, আমাদের মূল বিষয়ে আবার ফিরে আসা যাক। আগেই বলেছি অঙ্ককে বলা হয় সমস্ত বিজ্ঞানের আদি বিজ্ঞান। বিশেষ করে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান চর্চা করতে হলে অঙ্ক ছাড়া এক পা-ও এগোনো যায় না। তাই সম্ভবতঃ, জ্ঞানতঃই হোক আর অজ্ঞানতঃই হোক, আধুনিক বাংলা বিজ্ঞান রচনার প্রথম দুটি বই-ই রচিত হয়েছিল এই অঙ্কের ওপর।

অঙ্কপুস্তকম্ দিয়ে শুরু হলেও অল্প সময়ের মধ্যেই মিশনারী সাহেবদের চেষ্টায় বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায়, যেমন— জ্যোতির্বিজ্ঞান ভূগোল ইত্যাদির নানা বই প্রকাশিত হতে থাকে। এর মধ্যে কিছু অনুবাদ গ্রন্থও দেখতে পাওয়া যায়। 1818 খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশনের উদ্যোগে দিগ্‌দর্শন নামে একটি সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়—বার করেন জন্‌ ক্লার্ক মার্শম্যান্। দিগ্‌দর্শনের প্রকাশ বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যে একটি ঐতিহাসিক স্মরণীয় ঘটনা বলা যেতে পারে। এই পত্রিকাতে নিয়মিত ভাবে নানা বৈজ্ঞানিক রচনা প্রকাশিত হতে থাকে যাকে আমরা পাঠ্যপুস্তকের বাঁধাধরা গণ্ডী থেকে আলাদা করে নিয়ে সত্যিকার বিজ্ঞান সাহিত্য রচনার একটা চেষ্টা বলতে পারি। তবে, ঐ যে বললাম, বাংলায় বিজ্ঞান সাহিত্যের, তাকে সাহিত্য বলে স্বীকার করি আর নাই করি, ভূমিকা তৈরি হচ্ছিল পাঠ্যপুস্তকের ভিতর দিয়েই।

উদাহরণ স্বরূপ সে যুগের একখানা ভূগোল থেকে (ভূগোলকে বিজ্ঞানই বলব) একটু তুলে দেওয়া যেতে পারে। বইটিতে সে যুগের কথোপকথনের ছলে কেমন সুন্দর ভাবে একাধারে ভূগোল আর বিজ্ঞান পরিবেশন করা হয়েছে।

নিত্যানন্দ বলছে—"ভাল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। সাগরের জল যে লোনা ইহাতে কি উপকার হয়?"

পরমানন্দ উত্তর দিচ্ছে—"ইহাতে অনেক উপকার দর্শে। যদি সাগরে জল এমন লোনা না হইত তবে বদ্ধ পুষ্করিণীর জলের মত সকল জলই পচিয়া দুর্গন্ধ হইত। আর জলের যত মৎস্য তাহা অতি শীঘ্র মরিয়া যাইত। আর লোনা জল অধিক ভার সহে; অর্থাৎ লোনা জলেতে একখানা নৌকার ডালি সমান বোঝাই দিলে সে নৌকা স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে, কিন্তু মিঠানি জলে (মিঠানি মানে Fesh water) তেমন করিয়া লইয়া যাইতে হইলে দশ হাত যাইতে যাইতেই অমনি হঠাৎ ডুবিয়া পড়ে। কেননা মিঠানি জল তরল, এজন্য বড় ভার সহিতে পারে না। (তরল বলতে নিশ্চয়ই বেশি তরল বোঝাতে চেয়েছিলেন) ইহার একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলি শুন। যে মিঠানি জলে কোন একটা পক্ষীর ডিম্ব ফেলিয়া দেখ, অমনি শীঘ্র ডুবিয়া যাইবে; আর সেই জলেতে খানিকটা লবণ মিশাইয়া সেই ডিম্ব ফেলিয়া দেখ, কখনও ডুবিবে না,—ভাসিবে।'

এই বইটিও একজন ইংরেজের লেখা। তাঁর নাম পিয়ার্সন।

বাংলাভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনার কৃতিত্ব ফেলিক্স কেরির। ইনি বাংলা গদ্য রচনার অন্যতম পথিকৃৎ উইলিয়াম্ কেরির পুত্র। ইনি বিদ্যাহারাবলী নাম দিয়ে যে বইটি প্রকাশ করেছিলেন নিজেই তার নামের পাশে 'Bengalee Encyclopaedia' কথাটি যুক্ত করে দিয়েছিলেন। এই নামকরণ থেকেই বইটির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আন্দাজ করা যায়। বিজ্ঞানের নানা বিভাগ নিয়ে লেখা এই গ্রন্থে সে-যুগের সংস্কৃত-ঘেঁষা বাংলায় লেখা। ভাষাটা এখনকার পাঠকদের কাছে একটু খটমট লাগলেও বুঝতে কষ্ট হবার কারণ নেই। যেমন—

"প্রত্যেক রক্ত প্রবাহক নাড়ীর গাত্রাংশ সমান হওন পূর্বস্থানে শলাকাকার অর্থাৎ তৎগাত্রাংশের তাবদ্দ্রাঘিমাতে সমমান জানিবেন তদ্ব্যবস্থানুসারে রক্তপ্রবাহক নাড়ীর তাবচ্ছাখা এবং উপশাখা ব্যবস্থিতা।"

সংস্কৃতে যেমন সন্ধি ও সমাস কম্পালসারি। অর্থাৎ ব্যবহার করতেই হবে এখানেও তাই করা হয়েছে। তা ছাড়া ছেদচিহ্ন খুঁজে পাওয়াও মুশকিল। তবুও বলব, পথ প্রদর্শন হিসেবে এই ধরনের বৈজ্ঞানিক রচনার ঐতিহাসিক মূল্য নিশ্চয়ই আছে।

কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি আর একটি অভিনব প্রাণি-বিজ্ঞানের সিরিজ বার করেছিলেন—প্রধানতঃ বালকবালিকাদের জন্য। নাম দিয়েছিলেন "পশ্বাবলী", অর্থাৎ পশুদের আবলী, কিনা পঙ্‌ক্তি বা সমষ্টি। (যেমন গ্রন্থাবলী)। বইটি সংকলন করেছিলেন জন্ লসন্, আর তা বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন পিয়ার্স সাহেব। মাসিক পত্রের মত প্রতি মাসে একটি করে পশ্বাবলীর সংখ্যা প্রকাশিত হত। প্রতি সংখ্যার মলাটে একটি করে পশুর ছবি থাকত আর ভিতরে থাকত সেই পশুটিরই বিবরণ। যেমন সিংহ, হরিণ, গণ্ডার, এমন কি গাধাও। প্রধানতঃ ছোটদের জন্য

লেখা। তাই তথ্য যা থাকত তা হতো খুবই সহজ যাকে বলে প্রাথমিক জ্ঞান। আর সেই সঙ্গে সুযোগ বুঝে ঐ জন্তুটি সম্বন্ধে কিছু গল্প দিয়ে বইটিকে আর একটু সুখপাঠ্য করার চেষ্টা হতো। প্রথম পর্যায়ে ছয়টি সংখ্যা প্রকাশের পর পশ্বাবলীর প্রকাশ বন্ধ থাকে, সম্ভবতঃ লসন সাহেবের মৃত্যু হওয়ায়। বেশ কয়েক বছর পরে অবশ্য এটি নবপর্যায়ে আবার বেরোতে শুরু করে। এবার এর ভার নিয়েছিলেন রামচন্দ্র মিত্র। ইনি পর পর 16টি সংখ্যা পশ্বাবলী বার করেন।

দিগ্‌দর্শন পত্রিকার কথা বলেছি. ওরকম আরও একখানি পত্রিকার নাম করা যায় বিদ্যাদর্শন। এতেও বৈজ্ঞানিক রচনাতেই প্রাধান্য দেওয়া হতো। এ ছাড়া "সমাচার দর্পণ" নামে উইলিয়াম কেরি যে সংবাদ পত্রটি বার করেন তাতেও মাঝে মাঝে বিজ্ঞানের ওপর প্রবন্ধ বেরোত। বলা বাহুল্য এগুলো স্কুলপাঠ্য পুস্তক থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হলেও এখনকার পাঠকদের দৃষ্টিতে হয়তো খুব একটা আকর্ষণীয় মনে হবে না। যাই হোক, এইভাবেই বাংলায় আধুনিক বিজ্ঞান সাহিত্য রচনার বুনিয়াদ রচনায় এই সব ইয়োরোপীয়দের ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব।

বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যের বয়স মাত্র দেড়-শ' বছর বা তার সামান্য কিছু বেশি হলেও এই সময়টুকুর মধ্যে এর আয়তন নেহাৎ তুচ্ছ করবার মত নয়। কিন্তু তার বিশদ আলোচনা, আগেই বলেছি, খুবই সময়সাপেক্ষ। কাজেই এবার আমরা এর পরবর্তী যুগে চলে আসব—যেখানে প্রধানতঃ বাঙ্গালী লেখকেরাই এই সাহিত্যের হাল ধরার ভার নিয়েছেন।

মনে রাখতে হবে এ যুগে বিজ্ঞান যেমন দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে, দিনের পর দিন নিত্য নূতন আবিষ্কারে বিস্ময়ের পর বিস্ময় সৃষ্টি করে যাচ্ছে—উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় সে সমারোহের একান্তই অভাব ছিল। তার ওপর বাঙ্গালী পাঠক তখনও এমন বিজ্ঞান সচেতন হয়ে ওঠে নি—হয়ে উঠতে পারে নি। তথাকথিত উচ্চশিক্ষা বা পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিতে শিক্ষালাভের সুযোগ ছিল মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কাজেই সে যুগে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তুলবার দায়িত্ব যাঁরা নিয়েছিলেন তাঁদের কাজ যে কত কঠিন ছিল তা ভাবা যায় না।

এরই মধ্যে একজন লেখকের দেখা পাওয়া গেল যাঁকে বাঙ্গালী বিজ্ঞান সাহিত্যিকদের একজন পথিকৃৎ বলা চলে। তাঁর নাম অক্ষয়কুমার দত্ত। এরই পৌত্র কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—যাঁর জন্মশতবার্ষিকী এ বছর নানা জায়গায় পালিত হচ্ছে। কিন্তু কবি সত্যেন্দ্রনাথ পরিচয় অক্ষয় দত্তের পরিচয় নয়, বরং অক্ষয় দত্তের পৌত্র হবার সৌভাগ্য লাভ করে সত্যেন্দ্রনাথই ধন্য হয়েছিলেন।

19 শতকের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে স্থাপিত হলো তত্ত্ববোধিনী সভা। অনেকের ধারণা এখানে ব্রাহ্ম সমাজের লোকদেরই ছিল প্রধান ভূমিকা। অক্ষয়কুমার নিজেও ব্রাহ্মসমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু এই সভার সদস্যদের মধ্যে আমরা বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি সে যুগের মনীষীদেরও দেখতে পাই—যাঁরা ব্রাহ্ম সমাজের বাইরের লোক। এই তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র ছিল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নামে একখানি উচ্চাঙ্গের সাময়িক পত্র আর অক্ষয়কুমার দত্তের ওপরেই ছিল তার সম্পাদনার ভার। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের বহুল প্রচার, আর এ ব্যাপারে অক্ষয়কুমারের কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ। তিনি নিজেই যে শুধু স্বচ্ছন্দ ভাবে সে যুগের তুলনায় সরল প্রাঞ্জল ভাষায় বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ লিখতে পারতেন তাই নয়, সে যুগের অনেক মনীষী লেখককে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক রচনা লিখতে উদ্বুদ্ধ এবং উৎসাহিত করেছেন। এঁদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মায় সাহিত্য সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রও বাদ পড়েন নি। ছোটদের জন্য তাঁর নিজের লেখা চারুপাঠ, স্কুলপাঠ্য বই হলেও, তাতে যে সব বৈজ্ঞানিক রচনা বেরিয়েছিল তা আজও বাংলার বিজ্ঞান সাহিত্যের ইতিহাসে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে।

অক্ষয়কুমারের ভাষায় একটু নমুনা দিচ্ছি ঃ

"যেমন শোলা ও তৈল জলমধ্যে নিমগ্ন করিয়া দিলেও ভাসিয়া উঠে সেইরূপ বেলুন যন্ত্র বায়ুর মধ্য দিয়া উর্দ্ধগামী হয়। পৃথিবী বায়ুকে যেমন আকর্ষণ করে বেলুন যন্ত্রকেও তেমনি আকর্ষণ করে। বেলুন যন্ত্রে যে বাষ্প থাকে তাহা এরূপ লঘু যে সমুদায় বেলুন তাহার আয়তন প্রমাণ বায়ুরাশি অপেক্ষা লঘুতর হইয়া উর্দ্ধগামী হয়।"

অক্ষয়কুমার শুধু বিজ্ঞান সাহিত্য সৃষ্টি করেন নি, অনেক ইংরেজি শব্দের সময়োচিত পারিভাষিক শব্দ ও সৃষ্টি করে গেছেন। Electricity Inertia, Thermometer, Centre of gravity ইত্যাদি শব্দের বাংলা করে তিনি ব্যবহার করেছেন তড়িৎ, জড়ত্ব, তাপমান, ভারকেন্দ্র প্রভৃতি তৎসম শব্দ। অক্ষয়কুমার 1843 খৃস্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ভার নেন। বারো বছর ধরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন তিনি। তাঁর সম্পাদনার পরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জৌলুস কিন্তু অনেকটা অনেকটা কমে যায়।

অক্ষয়কুমারের আমলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সে যুগের কয়েক জন মনীষীর বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার কথা বলেছি। এঁদের মধ্যে বিদ্যাসাগর আর বঙ্কিমচন্দ্রের মত সাহিত্য মহারথীদের নামও পাওয়া যায়। পরে বঙ্কিমচন্দ্র "বিজ্ঞান রহস্য" নামে যে বইটি প্রকাশ করেন তা তাঁর সাহিত্য প্রতিভার জ্যোতিতে সমান ভাস্বর হয়ে আছে। বইখানা সাধারণ পাঠকের জন্য লেখা যাকে আমরা বলি 'পপুলার সায়ান্স বা জনপ্রিয় বিজ্ঞান'। বিজ্ঞান সে সময়ে এতটা অগ্রসর হয় নি, হয়তো সাধারণ পাঠকের কাছে তেমন করে উপস্থিত করতে পারলে খুব একটা দুর্বোধ্যও হতো না ; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রমণীয় ভাষা, উপমা ও বর্ণনায় তাকে সত্যিকার সাহিত্য করে গড়ে তুলেছিলেন, তাঁর চন্দ্রলোক, গগন পর্যটন ইত্যাদি লেখাগুলি আমরা এক সময়ে উপন্যাসের মতই আগ্রহ নিয়ে

পড়েছি। বঙ্কিমের বিজ্ঞানের ভাষার সামান্য একটু নমুনা দিচ্ছি :

"জগতে কত কোটি কোটি সূর্য, কত কোটি কোটি পৃথিবী তাহা কে ভাবিয়া উঠিতে পারে? যেমন পৃথিবীর মধ্যে এক কণা বালুকা, জগৎ মধ্যে এই সসাগরা পৃথিবী তদপেক্ষাও সামান্য,—রেণু মাত্র—বালুকার বালুকাও নহে। তদুপরি মনুষ্য কি সামান্য জীব। এ কথা ভাবিয়া কে আর আপন মনুষ্যত্ব লইয়া গর্ব করিবে?"

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার উল্লেখ প্রসঙ্গে আর কয়েকখানি সাময়িক পত্রের কথা মনে পড়ছে। এদের মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবিধার্থ সংগ্রহ, রহস্য সন্দর্ভ, বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময়কার ভারতী প্রভৃতি নাম অবশ্যই করতে হবে। এই পত্রিকাগুলির প্রথম দুটি প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিক রচনার জন্য খ্যাতিলাভ করেছিল। বঙ্গদর্শন ছিল আরও জনপ্রিয় পত্রিকা কিন্তু এতেও বৈজ্ঞানিক রচনা একটা বিশেষ মর্যাদা পেত, পেত ভারতীতেও। রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাংলায় বৈজ্ঞানিক রচনার লেখক ও সম্পাদক হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

এর প্রায় সমকালীন আরও কতকগুলি সাময়িক পত্রের উল্লেখ করতে পারলে ভাল হতো, কিন্তু তা হলে আলোচনা এত দীর্ঘ হয়ে পড়বে যে আপাততঃ তা আর করা সম্ভব হলো না।

এর পর আমরা চলে আসব রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর যুগে।

বাংলাভাষায় বিজ্ঞানকে সত্যিকার সাহিত্যের পর্যায়ে এনে দিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। ইনি ছিলেন একাধারে বিজ্ঞানী দার্শনিক ও সাহিত্যিক। 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন,—দর্শনের গঙ্গা, বিজ্ঞানের সরস্বতী এবং সাহিত্যের যমুনা—মানবচিন্তার এই ত্রিধারা রামেন্দ্র সঙ্গমে যুক্ত বেণীতে পরিণত হয়েছিল। কর্মজীবনে রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক—রিপন কলেজের (এখন যার নাম সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) অধ্যক্ষ। তাঁর লেখা বিজ্ঞানের বইগুলি এখনও আমাদের বিজ্ঞান সাহিত্যের পরম সম্পদ হয়ে আছে। কত সহজ ভাবে বিজ্ঞানের কত জটিল তত্ত্ব তিনি বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, ভাবলে অবাক লাগে। তাঁর ভাষার একটু উদাহরণ দিই :

অণুর (Molecule) আকার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলছেন,

"এক ফোঁটা জলকে যদি কোন রূপে বড় করিয়া আমাদের পৃথিবীর সমান করিতে পারি—যে পৃথিবীর পরিধি পঁচিশ হাজার মাইল,—সেই পৃথিবীর সমান করিতে পারি,—তবে সেই জলের ফোঁটার এক একটি অণু বেলের মত বড় দেখাইবে।"

শুধু বিজ্ঞান-সাহিত্য রচনা নয়, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নিয়েও তিনি কম কাজ করেন নি। তাঁর মতে বিজ্ঞানের পরিভাষায় যে শব্দটি ব্যবহার করা হবে তার যেন একটি সুনির্দিষ্ট বাঁধাবাঁধি, সীমাবদ্ধ, স্পষ্ট তাৎপর্য থাকে। প্রত্যেকটি শব্দ একটি নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করতে হবে, সেই শব্দটি আর দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার করা হবে না।

ইতিমধ্যে একে একে আরও অনেক শক্তিশালী লেখক বৈজ্ঞানিক রচনায় আসরে নেমে পড়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে কারো কারো রচনা শুধু সরল ও প্রাঞ্জলই নয়, সরসতার দিক দিয়েও কম আকর্ষণীয় ছিল না। এক কথায় বিজ্ঞানকে পুরোপুরি সাহিত্যের মঞ্চে বসিয়ে দিয়ে গেছেন এঁরা, যে কাজ শুরু হয়েছিল প্রধানতঃ রামেন্দ্রসুন্দরের হাতে। বঙ্কিমচন্দ্রকে যুগের ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে।

এঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় জগদানন্দ রায়ের। জগদানন্দ রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীতে বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করতেন। ছাত্রছাত্রীদের দিকে নজর রেখে তিনি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় একের পর এক বই লিখে গেছেন। এমন সহজ, সুন্দর, স্বচ্ছ তাঁর লেখার ভঙ্গী যে তাঁকে শিশুসাহিত্যের লেখক বলে দাবী করলেও ভুল হবে না। আমার মনে পড়ে, ছেলেবেলায় তাঁর লেখা বইগুলি কী আগ্রহের সঙ্গেই না পড়েছি! অবশ্য ইতিপূর্বেই ছোটদের জন্য বিজ্ঞান রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়ে গিয়েছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, তাঁর সুযোগ্য পুত্র সুকুমার রায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু এবং আরও কেউ কেউ। এরই মধ্যে আবির্ভাব হল চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের। ইনিও প্রেসিডেন্সী কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং এঁরও ভাষার যাদু ছিল অপূর্ব, তেমনি ছিল রচনাশৈলী। বিজ্ঞানকে কি করে রসময় করে,—সাধারণের কাছে মনোগ্রাহী করে তুলতে হয় সে কৌশল ভাল করেই জানতেন তিনি।

এই প্রসঙ্গে চারুবাবুর গুরু (আমারও গুরু) আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কথা স্মরণ করা দরকার। প্রফুল্লচন্দ্র নিজেই যে কেবল সুলেখক ছিলেন তাই নয়, বিজ্ঞান লেখকদের উৎসাহ দিতেও তাঁর জুড়ি ছিল না। আমি নিজেও তাঁর কাছে কম উৎসাহ পাই নি! অবশ্য প্রফুল্লচন্দ্রের সব লেখাই কিন্তু তাঁর নিজের নয়। অসাধারণ প্রতিভাধর কয়েকটি ছাত্র যেমন তিনি তৈরি করে গিয়েছিলেন তেমনি তাঁদের কাউকে কাউকে দিয়ে লিখিয়েও নিতেন এবং সহাস্য মুখে সে কথা বলে বেড়াতেও বাধত না তাঁর। তাই বলে তাঁর নিজের লেখায়ও কম কৃতিত্ব দেখান নি তিনি।

প্রফুল্লচন্দ্রের কথা উঠতে সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর কথা মনে আসে। আচার্য জগদীশকে আমরা পৃথিবীবিখ্যাত বিজ্ঞানী বলেই জানি, কিন্তু বিজ্ঞান সাহিত্য রচনায়ও তিনি যে কী অপূর্ব দক্ষ ছিলেন তা তাঁর "অব্যক্ত" বইখানির মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়। কেউ কেউ এমনও বলেছেন যে জগদীশচন্দ্র যদি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে মেতে না থেকে সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করতেন তবে তাইতেও তিনি বিখ্যাত হয়ে থাকতেন।

এরই মধ্যে একে একে বিজ্ঞান সাহিত্য রচনায় আরও কত শক্তিশালী বিজ্ঞানী নেমে পড়েছেন। ততদিনে বিজ্ঞান পুরোপুরি সাহিত্যের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। আগেই বলেছি, রামেন্দ্রসুন্দরের হাতে যার গোড়াপত্তন তার উত্তরসূরীরা ধাপে ধাপে তাকে আরও

এগিয়ে নিয়ে চলেছিলেন। কত নাম করব? কার নাম বাদ দেব? কাজেই তা থেকে বিরত থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

তবে একজনের নাম এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি। তিনি বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য—যে বিজ্ঞান পরিষদে দাঁড়িয়ে আজকের এই আলোচনা-সভা তার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘকালের সম্পর্কের জন্যই নয়, ইদানীং কালে বিজ্ঞানের একজন সফল সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর নাম মনে রাখবার মত। গোপালচন্দ্রের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি যে শুধু বিজ্ঞানকে সাহিত্যের পাতায় পরিবেশন করে গেছেন তাই নয়, তাঁর ছিল খাঁটি বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গী। তাঁর নিজের চোখে দেখা, নিজের হাতে পরীক্ষালব্ধ নানা গবেষণার কথাও তিনি অতি প্রাঞ্জল ভাবে লোকের চোখের সামনে তুলে ধরেছিলেন—বাংলা ভাষায়।

এরই মধ্যে আবির্ভাব হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের।

রবীন্দ্রনাথকে আমরা কবি বলে জানি। তাঁর মত সঙ্গীত রচয়িতা দুর্লভ। গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, দর্শন—কী না তিনি লিখে গেছেন! আর, আশ্চর্য, যাতেই হাত দিয়েছেন সেটাকেই বলা যায় A-class, অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর। সেই রবীন্দ্রনাথ যখন বিজ্ঞান-সাহিত্য রচনায় কলম ধরলেন তখন তা যে এক নতুন দিকে মোড় নেবে এতে আর আশ্চর্য কি?

রবীন্দ্রনাথ কোন কালেই বিজ্ঞানের ছাত্র নন। তিনি নিজেই লিখেছেন—

"আমি বিজ্ঞান সাধক নই সে কথা বলা বাহুল্য। কিন্তু বালককাল থেকে বিজ্ঞানের রস আস্বাদনে আমার লোভের অন্ত ছিল না।"

রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বপরিচয়' বিজ্ঞান-সাহিত্যের একখানা অনবদ্য বই। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ যাদুর কলমে তা পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। সহজ ভাষায় অত্যন্ত সরসভাবে বইখানি লেখা। কিন্তু সহজ ভাষায় হলেও তত্ত্বের দিক দিয়ে কোন ফাঁকি নেই। তিনি নিজেই বলেছেন, 'তথ্যের যাথার্থ্যে এবং সেটাকে প্রকাশ করার যাথাযথ্যে বিজ্ঞান অল্প মাত্রও স্খলন ক্ষমা করে না'।

তবে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নিয়ে তিনি লেখাকে অযথা গুরু-গম্ভীর বা সাধারণের কাছে দুর্বোধ্য করে তোলেন নি। তাঁর মতে 'বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ শিক্ষার জন্য পারিভাষিকের প্রয়োজন আছে, কিন্তু পারিভাষিক চর্ব্য জাতের জিনিস। দাঁত ওঠার পরে সেটা পথ্য। সেই কথা মনে করেই যতদূর পারি পরিভাষা এড়িয়ে সহজ ভাষার দিকে মন দিয়েছি'।

তাঁর ভাষায় একটু নমুনা দিলেই এর পরিচয় পাওয়া যাবে।

'অতি-পরমাণুদের দুরন্ত চাঞ্চল্য পজিটিভ নেগেটিভের সন্ধি করে সংযত হয়ে আছে, তাই বিশ্ব আছে শান্ত। ভালুকওয়ালা বাজায় ডুগডুগি, তারই তালে ভালুক নাচে, আর নানা খেলা দেখায়। ডুগডুগিওয়ালা না যদি থাকে, পোষমানা ভালুক যদি শিকল কেটে স্বধর্ম পায়, তা হলে কামড়িয়ে আঁচড়িয়ে চারদিকে অনর্থপাত করতে থাকে। আমাদের সর্বাঙ্গে এবং দেহের বাইরে এই পোষমানা বিভীষিকা নিয়ে অদৃশ্য ডুগডুগির ছন্দে চলছে সৃষ্টির নাচ ও খেলা। সৃষ্টির আখড়ায় দুই খেলোয়াড় তাদের ভীষণ দ্বন্দ্ব মিলিয়ে বিশ্বচরাচরের রঙ্গভূমি সরগরম করে রেখেছে।"

রবীন্দ্রনাথ চলে গেছেন আজ চল্লিশ বছরেরও আগে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনায় তিনি যে সহজ ছন্দের নিশানা দিয়ে গেছেন তাঁর উত্তরসূরীর দল হয়তো সেই আদর্শ সামনে রেখেই বিজ্ঞানকেও যে সহজ, সরল ও সরস করে পরিবেশন করা যায়—সুখপাঠ্য করা যায় তারই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সাহিত্যে চলতি ভাষার প্রচলন হওয়ায় সে সব বিজ্ঞান লেখকের ভাষা আরও স্বচ্ছ, সাবলীল ও স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। আজ যে সব বিজ্ঞানী এই রকম সহজ, সরল করে বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁদের সংখ্যা নেহাৎ কম নয় এবং বলতে বাধা নেই, বাংলাভাষায় বিজ্ঞানকে তাঁরা সত্যি সত্যি সাহিত্যের মঞ্চে অন্যান্য রমণীয় বিষয়ের পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দিতে পেরেছেন। অবশ্য এখানে একটা কথা মনে আসছে। উপমা দিয়ে আমরা যেমন কোন কোন যুক্তিকে তুলে ধরতে পারি আবার উপমা দিয়ে সেই যুক্তিকেই ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করতে পারি। কাজেই সর্বক্ষেত্রে উপমাকে, ন্যায়শাস্ত্রের খাতিরেই, যুক্তি বলে ধরা যায় না। তবে নিরঙ্কুশঃ কবয়ঃ।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ বা পূর্ববঙ্গের কথা। শুনতে খারাপ লাগলেও বলব, বাংলাদেশ নামটা, কিন্তু তাঁরা আমাদের একরকম অজানতেই এবং বিনা অনুমতিতেই কেড়ে নিয়েছেন। কিন্তু একটা বড় কাজ তাঁরা করেছেন—বাংলা ভাষাকে তাঁরা যথেষ্ট মর্যাদা দিয়েছেন। বাংলা ভাষাই এখন সেখানকার রাষ্ট্রভাষা এবং এই ভাষার উন্নতির জন্য তাঁরা অকৃত্রিম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের পশ্চিম বঙ্গের মত বাংলা ভাষাকে তাঁরা শুধু কাগজে-কলমে রাজ্যভাষা করে রাখেন নি। একথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে আজ পর্যন্ত পশ্চিম বাংলায় বেসরকারী সমস্ত কাজকর্ম তো বটেই, সরকারী কাজকর্মেও বাংলা ভাষার ব্যবহার কচিৎ সাধারণের চোখে পড়ে। নানা কাজে সরকারের কাছ থেকে আমরা যেসব চিঠিপত্র, নোটিশ, প্রচারপত্র, ইশতাহার ইত্যাদি পাই তার বোধ হয় শতকরা 99টিই এখনও ইংরেজিতেই লেখা হয়। বাংলাদেশে কিন্তু অন্য চিত্র দেখি। তার ফলে ঐ বাংলায় প্রচুর বাংলা বই লেখা হচ্ছে এবং তার মধ্যে বিজ্ঞানের বইও বড় কম নয়। কিছু কিছু কিছু ভালো বিজ্ঞানের বই চোখে পড়েছে। তবে পাঠ্য পুস্তকের,- বিশেষতঃ স্নাতক বা স্নাতকোত্তর শ্রেণীর জন্য রচিত বইগুলিতে সেই জড়তাদোষ এখনও তাঁরা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।

যে মনীষীর স্মৃতি উপলক্ষে আজকের এই বক্তৃতা তিনি নিজেও ছিলেন একজন বিজ্ঞান সাধক। কিন্তু রাজশেখর বসুর খ্যাতি বিজ্ঞান সাহিত্য রচয়িতা ——— নয় যতটা খ্যাতি তাঁর রস-রচনায়। 'পরশুরাম' ছদ্মনামে তিনি যে অপূর্ব রসসাহিত্য বাঙ্গালীকে উপহার দিয়ে গিয়েছেন তার মধ্যেও রসিকতার ভিতর দিয়ে বিদ্যু-

চমকের মত মাঝে মাঝে বিজ্ঞানের ঝিলিক মারে। যেমন "বিরিঞ্চি বাবা" গল্পে প্রফেসর ননী। ডেকচিতে কি একটা সিদ্ধ হচ্ছে আর ডেকচির ভিতর দিয়ে একটা রবারের নল একটা হারমোনিয়ামের বেলোর সঙ্গে জোড়া। দেখে কি জানতে চাওয়ায় ননীর স্ত্রী নিরুপম বললেন, ওঁর কত রকম খেয়াল জানেন তো? ঘাস সিদ্ধ হচ্ছে। প্রফেসর ননী বললেন, হাসির কথা নয় নিবারণ পৃথিবীতে আর অন্নকষ্ট থাকবে না। বন্ধু বললেন, সবাই তো আর প্রফেসর ননী বা রোমন্থক জীব নয় যে ঘাস হজম করবে। উত্তরে প্রফেসর ননী বললেন, আরে ওকি আর ঘাস থাকবে? প্রোটিন সিন্থেসিস্ হচ্ছে। ঘাস হাইড্রোলাইজড হয়ে কার্বোহাইড্রেট হবে। তার পর তার সঙ্গে কয়েকটা অ্যামিনো গ্রুপ জুড়ে দিতে পারলেই ব্যস্, হেক্সাহাইড্রক্সি ডাই-অ্যামিনো—

বিজ্ঞানকে নিয়ে কী সুন্দর সরস অথচ বিমল রসিকতা!

সকলেই বোধ হয় জানেন রাজশেখর বসু এক সময়ে বেঙ্গল কেমিক্যালের কর্ণধার ছিলেন এবং তখন ঐ প্রতিষ্ঠানের ছিল রমরম অবস্থা। এর আগে আমরা নানা প্রসাধন দ্রব্য, রাসায়নিক পেটেন্ট পদার্থের ইংরেজি নামেই অভ্যস্ত ছিলাম। রাজশেখরই তার মধ্যে বাংলা শব্দের প্রচলন শুরু করেন। তাই সেন্টের নাম হয় অগুরু, সাবানের নাম হয় শিপ্রা, রেবা, টুথপেস্টের নাম হয় রদফেন। দুঃখের বিষয় ইংরেজিনবীশ বাঙ্গালীরা শেষের নামটির অর্থ ধরতে না পেরে ওকে বলত রোডোফেন। রদ খাঁটি বাংলা তৎসম শব্দ—ওর মানে দাঁত, আর ফেন মানে তো ফেনা। তাই রাজশেখর বাবু টুথপেস্টের ঐ সুন্দর নামটি দিয়েছিলেন। কিন্তু ওর কি পরিণাম হতে পারে ভাবতে পারেন নি।

অবশ্য রাজশেখর বসু যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ একেবারে লেখেন নি এমন নয়। নানা পত্রিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তাঁর এরকম প্রবন্ধ হয়তো অনেকে পড়েছেন, ওঁর 'লঘুগুরু' বইটিও পড়েছেন। 'ভেজাল' নামে একটি প্রবন্ধে ঐ বিষয়ে নানা বৈজ্ঞানিক আলোচনার পর তিনি লিখেছিলেন, সাধারণতঃ খাবার জিনিসে ভেজাল দিলেই তাকে আমরা ভেজাল বলি, তা নইলে নয়। যেমন ধরুন বিশ্ব-বিদ্যালয় একটি স্বর্ণপদক দিয়ে প্রতি বছর গুণিজনদের সম্মানিত করেন। বলা হয় জগত্তারিণী স্বর্ণপদক। নামে স্বর্ণ পদক হলেও ওর 24 ভাগের 15 ভাগই ভেজাল, বাকি 9 ভাগ মাত্র সোনা। কিন্তু যে হেতু ওটা খাবার জিনিস নয় তাই আর ওটাকে ভেজাল বলা হয় না। মজা হচ্ছে, এই প্রবন্ধটি বেরোবার কয়েক মাস আগে রাজশেখর বসুকেই ঐ পদকটি দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল।

কিন্তু কথা প্রসঙ্গে মূল বিষয় থেকে একটু সরে এসেছি, ক্ষমা করবেন। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম। বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যের ধারাবাহিকতা। ইয়োরোপীয় মিশনারীদের হাতে যার সূত্রপাত আজ তা মহীরুহ হতে না পারলেও ফুলে ফলে বিকশিত হয়ে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে যে নিজের একটা স্থান করে নিতে পেরেছে এটাই বড় কথা। শুধু স্থান করে নেয় নি, দুর্বারগতিতে এগিয়ে চলেছে।

তবু বলব ভাষার জড়তা কি এখনও নেই? আছে যার জন্য অনেক সময় তথ্যপূর্ণ লেখাও সুখপাঠ্য হতে পারে না। আমার মনে হয় এর প্রধান কারণ পারিভাষিক শব্দ ব্যবহারের ওপর কারো কারো একটু অতিরিক্ত প্রবণতা। সহজ পারিভাষিক শব্দের নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে কিন্তু সে জন্য বর্তমানে সম্পূর্ণ অপ্রচলিত, কষ্টোচ্চারিত শব্দ দিয়ে ভাষাকে কণ্টকিত করার প্রয়োজন দেখি না। যে সব বিদেশী শব্দ আমাদের কাছে নিতান্ত পরিচিত তাকে আমাদের ভাষার মধ্যে টেনে নিলে দোষ কি? জীবন্ত ভাষার নিয়মই তো তাই। আরবী-ফারসীর কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, বাংলা ভাষায় কত যে ইংরেজী, ফরাসী, পর্তুগীজ প্রভৃতি ইয়োরোপীয় শব্দ ঢুকে পড়েছে আমরা ক'জন তার খবর রাখি? বোতাম, টুপি, সাবান—এসব তো পর্তুগীজ শব্দ। তেমনি স্কুল, কলেজ, ব্যাঙ্ক, ভোট, ডাক্তার, হাসপাতাল, ট্রাম, বাস, রেল, পেন্সিল, রবার, স্ক্রু ইত্যাদি কত যে ইংরেজি শব্দ আমরা নিত্য বাংলা কথা হিসেবেই ব্যবহার করছি তার আর লেখাজোখা নেই। এগুলির খাঁটি বাংলা খুঁজতে গেলে মাথায় হাত দিয়ে বসতে হবে। আমাদের চোখের সামনেই তো দেখলাম ইংরেজি র‍্যাশন, ফরাসী কিউ প্রভৃতি সাধারণের অপরিচিত শব্দগুলি কি করে 2য় মহাযুদ্ধের পর বাংলা ভাষার মধ্যে ঢুকে গেল। ইংরেজি ভাষাও কি আমাদের কাছ থেকে শব্দসম্ভার গ্রহণ করে নি? গুরু, শাল, পায়জামা, বাজার এসব তো হামেশাই ইংরেজের লেখা ইংরেজি বইতে চোখে পড়ে। সম্প্রতি একটি আমেরিকান বই এ দেখলাম "ঘেরাও" কথাটাও তাঁরা বেমালুম আত্মসাৎ করে নিয়েছেন। কাজেই অক্সিজেন, হাইড্রোজেন প্রভৃতি যে সব শব্দ আমাদের অতি পরিচিত তাদেরকে বাংলা অক্ষর ব্যবহার করে পুরোপুরি বাংলা করে নিতে দোষ কি? অম্লজান বা আর্দ্রজানের চাইতে তা নিশ্চয়ই সহজবোধ্য হবে। টেস্টটিউবকে অনেক বইতেই পরীক্ষা নল বলে লেখা হয়, ফ্লাস্ককে লেখা হয় কাচকুপি। কেউ কখনও কাউকে টেস্টটিউব না বলে পরীক্ষানল বলতে শুনেছেন? কাচকুপি বললে ভাবতে বসবেন না কি ওটা আবার কি জিনিস? কাজেই প্রত্যেকটি শব্দের পরিভাষা খুঁজে না বেড়িয়ে হাতের কাছে যে সব সহজবোধ্য বিদেশী বা আন্তর্জাতিক শব্দ আছে তাই ব্যবহার করলে, আমার তো মনে হয়, লেখার জড়তা অনেকখানি কেটে যেতে পারে। তবে হ্যাঁ, যেগুলির সুপরিচিত বাংলা পরিভাষা আছে, কিংবা সহজ পরিভাষা তৈরি করা হয়েছে বা হচ্ছে সেগুলি বাদ দিয়ে জোর করে অনাবশ্যক বিদেশী শব্দ চালানোর পক্ষপাতী কেউ আছেন বলে আমার মনে হয় না। অবশ্য সেই যে বহুদিন আগে একটা গল্পে পড়েছিলাম বাংলা ভাষার পক্ষে বক্তৃতা দিতে উঠে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'Gentleman, Bengal আমাদের mother country, Bengali আমাদের mother tongue। Sanskrit হাজার হলেও আমাদের mother tongue নয় সে কেন gentlemen, সে কেন আমাদের mohter tangue-এর মধ্যে trespass করবে?" এ রকম হাস্যকর বাংলা লিখতে আমি নিশ্চয়ই বলব না। (যদিও

বেতারের সংবাদ বিচিত্রায় এ ধরণের বাংলাও আমরা প্রায়ই শুনে থাকি।)

সেকালকার বিজ্ঞান-পত্রিকার কিছু কিছু উল্লেখ করেছি, একালকার কয়েকটার কথাও বলি। আজ থেকে আন্দাজ অর্ধ শতাব্দীরও কিছু আগে সত্যচরণ লাহা সম্পাদিত "প্রকৃতি" নামে একটি সুসম্পাদিত বিজ্ঞান-সাময়িক পত্রিকার কথা মনে পড়ছে। আমাদের ছাত্রজীবনেও আমরা আগ্রহের সঙ্গে ঐ পত্রিকা পড়তাম। তরুণ লেখকদের বৈজ্ঞানিক রচনা লিখতে এইসব পত্রিকা যে বিশেষ অনুপ্রেরণা জোগাত তাতে সন্দেহ কি? দুঃখের বিষয় বেশ কয়েক বছর চালিয়েও শেষ পর্যন্ত পত্রিকাখানিকে টিকিয়ে রাখতে পারা যায় নি। তার পর উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞান-পত্রিকা জ্ঞান ও বিজ্ঞান—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদেরই মুখপত্র। গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় যাত্রা আরম্ভ করে এখনও এটি সুষ্ঠুভাবে চলছে—এটা বিশেষ আনন্দের কথা। বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ভূমিকা এই উপলক্ষে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। যারা বলত বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা করা যায় না তাদের মুখের মত জবাব দিয়ে তিনি একদিন বলেছিলেন, "যারা একথা বলে, হয় তারা বিজ্ঞান জানে না, নয় তো বাংলা জানে না।" বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার জন্য বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ স্থাপন এবং তাকে বড় করে গড়ে তোলায়ও তাঁর ভূমিকা ছিল অসামান্য। নিজেও তিনি বাংলায় বৈজ্ঞানিক রচনা পরিবেশন করে তাঁর কথা ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে গেছেন।

তবে এইসব পত্রিকার বেশির ভাগই জনপ্রিয় বিজ্ঞান অর্থাৎ পপুলার সায়ান্স-এর পত্রিকা। বাংলায় গবেষণামূলক পত্রিকা তেমন একটা বেরোয় নি। কয়েক বছর আগে "গবেষণা" নাম দিয়ে একটি সাময়িক পত্র বেরিয়েছিল— যার উদ্দেশ্য ছিল কেবল গবেষণামূলক রচনা প্রকাশ। বলা বাহুল্য এ ধরনের পত্রিকার পাঠক সংখ্যা খুবই সীমিত হবার কথা। হয়তো সে জন্যই পত্রিকাখানি কিছু দিন পরে বন্ধ হয়ে যায়। হয়তো ঐ পত্রিকা পড়ে যাঁরা বুঝতে পারেন তাঁরা ওটা তেমন পড়তেন না, যাঁরা বুঝতে পারতেন না তাঁদের পড়ার তো প্রশ্নই ওঠে না।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান সম্বন্ধেও কারো কারো অভিযোগ ছিল—এই পত্রিকায় প্রায়ই কিছু কিছু এমন লেখা বেরোত যা বিশেষজ্ঞরা ছাড়া সাধারণ পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য মনে হতো। তাঁরা তাই ওর রসগ্রহণ করা দূরে থাক্ সভয়ে পাতাগুলি উল্টে যেতেন। আর মজা এই, ওগুলি পড়ে যাঁরা বুঝতে পারতেন তাঁরা কেউ বড় একটা ওগুলো পড়ার আগ্রহ দেখাতেন না। সুখের বিষয় এখনকার পরিচালকরা বোধ হয় আরও সতর্ক হয়েছেন। একই পত্রিকায় এই দু ধরনের রচনা প্রকাশের অসামঞ্জস্য তাঁদের দৃষ্টি হয়তো আকর্ষণ করেছে এবং পদ্ধতি পরিবর্তনে প্ররোচিত করছে।

বাংলা ভাষায় আজ 5/7 খানি সুসম্পাদিত বিজ্ঞান পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে এবং তার পাঠক সংখ্যাও খুব কম বলে মনে হয় না। কলকাতা থেকে তো বটেই, মফঃস্বল শহর থেকেও বেরুচ্ছে, বেরুচ্ছে ত্রিপুরা থেকে। বাংলা দেশও এ বিষয়ে পিছিয়ে নেই। তবে ইংরেজিতে ঐ ধরনের সাময়িক পত্রিকার তুলনায় এর কোনটির রূপসজ্জা চিত্রসম্পদ এবং মুদ্রণ পারিপাট্য তত্টা চিত্তাকর্ষক নয়। প্রকাশকেরা এদিকে মন দিলে পত্রিকার আকর্ষণ ও চাহিদা অনেক বেড়ে যাবে বলে আমাদের ধারণা।

এই প্রসঙ্গে ছোটদের জন্য রচিত বিজ্ঞান সাহিত্য নিয়ে দু'চার কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। আমি নিজেও এই মঞ্চে কিছু উৎপাত করেছি, কাজেই এ সম্পর্কে কিছু বলার দাবী হয়তো আমার আছে। একথা হয়তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে বাংলা ভাষায় বয়স্কদের জন্য রচিত বিজ্ঞান-সাহিত্যের চেয়ে ছেলেমেয়েদের—কিশোর-কিশোরীদের জন্য রচিত বিজ্ঞান সাহিত্য অনেক বেশি পরিপুষ্টি লাভ করেছে। যদি বলি অন্ততঃ এদিকটায় বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্য সত্যিকার সাহিত্যের রূপ পেয়েছে তবে খুব বাড়িয়ে বলা হবে না। সেই সখা-সখীর প্রমদাচরণ সেন, সন্দেশের উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর আমল থেকে বহু সাহিত্য-সাধকের দানের পরিণতি বলা যায় একে, আজ বাংলায় ছোটদের জন্য পৃথক বিজ্ঞান-পত্রিকারও অভাব নেই এবং তার প্রচার সংখ্যা শুনলে আনন্দ বোধ হয়। কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান অল্প দিনের মধ্যেই আসর মাৎ করেছে। বিজ্ঞানমেলা প্রভৃতি পত্রিকাও উল্লেখযোগ্য।

বিজ্ঞানের বই যদি সহজ ও সরস করে লেখা যায় তা হলে তার প্রতি পাঠকের আগ্রহ বাড়বেই। বিশেষ করে কিশোর পাঠকদের কথা বলছি। তারা নতুন পৃথিবীতে এসেছে, চোখের সামনে দেখছে নানা দিকে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। কৌতূহল তাদের অপরিমিত। সব কিছু তারা জানতে চায়। তাদের মনের খোরাক মেটাবার মত বই পেলে তাদের খুশির সীমা থাকে না। কথাটা আমি নিজের মন থেকে বলছি না, বলছি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে। সম্প্রতি কলকাতায় যে বইমেলা হয়ে গেল তাতে অবাক হয়ে দেখেছি বিজ্ঞানের বইএর চাহিদা কি রকম বেড়ে গেছে। বইএর চাহিদা হলে প্রকাশকেরাও এগিয়ে আসবেন এবং বিজ্ঞান সাহিত্যের প্রচার বাড়বে। প্রচার বাড়লে সৎ বিজ্ঞান-সাহিত্যও সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর রচিত হতে থাকবে।

সবশেষে বিজ্ঞান-সাহিত্যের আর একটা নতুন দিকের কথা বলে আমার আলোচনা শেষ করব। রহস্য-উপন্যাস চিরকালই সাধারণ পাঠককে আকৃষ্ট করে। আজকের এই বিজ্ঞানের যুগে স্বাভাবিক ভাবেই এক নতুন ধরনের রহস্য উপন্যাসের আবির্ভাব হয়েছে—যাকে বলা হয় বিজ্ঞানভিত্তিক বা বিজ্ঞাননির্ভর গল্প উপন্যাস। ইংরেজিতে বলা হয় science fiction। বাংলায় এর আর একটা সুন্দর নাম দেওয়া হয়েছে কল্প বিজ্ঞান। বাংলা ভাষায় বড়দের জন্য কিছু কিছু এবং ছোটদের জন্য এই ধরনের বই বেশ কিছু লেখা হয়েছে এবং হচ্ছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, যতদূর জানা যায় বাংলায় প্রথম বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প লিখেছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। তাঁর "পলাতক তুফান" একটি আশ্চর্য

সুন্দর বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প। শোনা যায় এটি নাকি তিনি কুন্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতার জন্য লিখেছিলেন। পুরস্কার পেয়েছিলেন কিনা ঠিক জানি না, কিন্তু বাংলার পাঠকদের তিনি একটি অনবদ্য উপহার দিয়ে গিয়েছিলেন সন্দেহ নেই।

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পকে বিজ্ঞান-সাহিত্য বলতে অনেকের দ্বিধা হতে পারে, কিন্তু দ্বিধা হবার কারণ দেখি না। বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করবার এ একটি অভিনব সন্দেহ নেই। তবে এই ধরণের রচনায় লেখকের দায়িত্ব খুব বেশি। বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প-উপন্যাস বলতে বিজ্ঞানকে ভিত্তি করেই তার মূল কাহিনী হওয়া দরকার। বিজ্ঞানের প্রাথমিক তত্ত্বকে অস্বীকার করে এ লেখা চলতে পারে না। আমাদের চোখের সামনে মাঝে মাঝে এমন সব ঘটনা ঘটতে দেখা যায় যা আপাত-দৃষ্টিতে আশ্চর্য মনে হলেও তার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন নয়। এই ধরণের রহস্য সৃষ্টি করে পাঠকের মনে চরম কৌতূহলের ঝড় তুলে সুদক্ষ লেখক সহজেই গল্প জমিয়ে তুলতে পারেন এবং শেষ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে সমস্ত রহস্যের মীমাংসা করে গল্প শেষ করতে পারেন। আবার বিজ্ঞানে এমন অনেক বিষয় থাকতে পারে যা এখনও সম্ভব হয় নি, কিন্তু ভবিষ্যতে অসম্ভব নয়। তা নিয়েও গল্প রচনা করা দোষের নয়। তবে দেখতে হবে বৈজ্ঞানিক সত্যকে নস্যাৎ করে কিংবা আজগুবি কল্পনার সাহায্য নিয়ে সে গল্প লেখা না হয়। গাছ থেকে আপেলটা খসে পড়লে সেটা মাটিতেই পড়বে। যদি গল্পের খাতিরে তাকে শূন্যে ভাসিয়ে রাখতে হয় বা ওপর দিকে টেনে নিতে হয় তা হলে তার একটা বিজ্ঞানসম্মত কারণ ও ব্যাখ্যা দিতেই হবে। তা না হলে সেটাকে আর বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প বলা যাবে না, সেটা হবে নেহাৎই আরব্যোপন্যাসের মতই ফ্যাণ্টাসি।

কল্পনার কথা উঠতেই আমার সেই অপূর্ব ছবিটির কথা মনে পড়ছে। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের বক্তৃতাগৃহে "সন্ধান" নামে একটি ছবি অনেকেই দেখে থাকবেন। ছবিটি শিল্পী নন্দলাল বসুর আঁকা, তবে পরিকল্পনাটি নাকি স্বয়ং আচার্য জগদীশচন্দ্রের। একটি বলিষ্ঠ যুবক, হাতে খোলা তলোয়ার নিয়ে একটি তরুণীর হাত ধরে বন্ধুর পথে এগিয়ে চলেছে—অনন্তের সন্ধানে। মেয়েটি অন্ধ, কিন্তু তার হাতে রয়েছে একটি বাঁশী। ছেলেটি হচ্ছে প্রজ্ঞা, আর মেয়েটি কল্পনা। ছবিটির উদ্দেশ্য মনে হয় এইটুকু বোঝানো যে সত্যের সন্ধান পেতে হলে প্রজ্ঞা এবং সাহসের যেমন দরকার, তেমনি দরকার কল্পনারও। দুটির একত্র সমাবেশেই সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়, একটিকে বাদ দিয়ে নয়। কল্পনা চিরদিনই অন্ধ, কিন্তু সে তার বাঁশীর সুরে প্রেরণা যোগায়, আর তাকে হাত ধরে নিয়ে চলে প্রজ্ঞা—বুদ্ধি আর সাহস।

এই আশ্চর্য ছবিটি মনের সামনে রেখে লেখক যখন কলম ধরবেন তখনই তাঁর সৃষ্টি হবে সার্থক।

শতবর্ষে আচার্য নন্দলাল বসু স্মরণে

নিখিলনাথ মজুমদার*

[অনেকের বিশ্বাস শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের মধ্যে একটি অবশ্যম্ভাবী প্রাচীরের বেড়া আছে, এ কথা নন্দলালের চিত্রাবলীতে মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। কারণ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ চক্ষু হইল রূপশিল্পের তৃতীয় নয়নে এবং নন্দলালের তৃতীয় নয়নে অনেক জ্ঞান-বিজ্ঞানের রহস্য-কথা সহজ ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। নন্দলালের জয় হউক, ভারত শিল্পের জয় হউক।—'ডাঃ নন্দলাল বসু ও তাঁহার রূপসৃষ্টি'—অর্দ্ধেন্দ্রকুমার (ও. সি.) গঙ্গোপাধ্যায়; জ্ঞান ও বিজ্ঞান, জুন, 1966।]

শ্রদ্ধেয় শিল্পী নন্দলাল বসুর জন্ম 1882 খৃস্টাব্দের 3রা ডিসেম্বর। শান্তিনিকেতনের নন্দলাল বসু ছিলেন শিক্ষক এবং আচার্য, কিন্তু তার আগে তাঁর একটি ছাত্র জীবনও [illegible]

শিবের তাণ্ডবনৃত্য

যখন তিনি অবনীন্দ্রনাথের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর তাঁর দেখা পাওয়া গেল হায়দ্রাবাদের অজন্তা গুহার অভ্যন্তরে 1909 খৃস্টাব্দে। ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম এবং শিল্প-গুরু অবনীন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য হিসাবে। ইউরোপীয় মহিলা লেডি হেরিংহ্যামের শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী শিল্পী হিসাবে 1909 খৃস্টাব্দ থেকে 1910 খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এঁরা ভারতীয় প্রথম গুহাচিত্র অজন্তার প্রতিলিপি নকল করেন। সিস্টার নিবেদিতার আগ্রহেই শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ যে কয়জনকে লেডি হেরিংহ্যামের সাহায্যে গুহাচিত্র অঙ্কনে পাঠান তাঁদের মধ্যে ছিলেন নন্দলাল বসু, অসিত

* 24/A, রাজ দিন স্ট্রীট, কলিকাতা-700 056

কুমার হালদার, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও ভেঙ্কাটাপ্পা। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ নিজে অজন্তায় না গিয়ে নন্দলালকে পাঠানোর উদ্দেশ্য হলো প্রিয়তম শিষ্যের উপর তাঁর এত বিশ্বাস ছিল যে, নন্দলাল যে কাজ করবেন তা নিশ্চয়ই তাঁর ইচ্ছাকে পূরণ করবে। তা ছাড়া নিজাম সরকার দু-জন শিল্পীকে দিয়েছিলেন এই কাজে সাহায্য করতে। একজনের নাম ফাজিলউদ্দীন কাজী, অপর জনের নাম সৈয়দ আহমেদ। লেডি হ্যোরিংহ্যামের সঙ্গে এসেছিলেন মিস লারচার, মিস লিউক ও মিস ডেভিস এই প্রতিকৃতি নেবার সময়কাল ছিল প্রায় 2 বছর। এবং এই ভারতীয় পদ্ধতির অঙ্কিত চিত্রকলা আবার পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দিলেন নন্দলাল প্রমুখ শিল্পীরা। এই ভিত্তিচিত্রের অনুলিপি আজও লণ্ডনের সাউথ কেপটাউন হল যাদুঘরে সযত্নে রক্ষিত আছে।

নন্দলালকে শিল্পী হিসাবে এই হলো আমাদের প্রথম দেখা। এর আগে সমবায় ম্যানসান। অবনীন্দ্রনাথের ওরিয়েণ্টাল আর্ট স্কুল এবং সেখানকার ছাত্রদের ইতিহাস অনেকেরই জানা নেই। এর পরবর্তীকালে অবনীন্দ্রনাথের ওরিয়েণ্টাল আর্ট স্কুলকে দেখা যায় 4 নং এসপ্লানেড ইস্টে। রতীন ঠাকুর ছিলেন তখনকার সেক্রেটারী। এখানে একবার নন্দলাল বসুর দেখা পাওয়া যায় শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে একজন বিদেশী শিল্পী জুপেঁয়র চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করতে। কারণ ঐ চিত্র প্রদর্শনী ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ্ ওরিয়েণ্টাল আর্ট স্কুলেই করা হয়। এই শিল্পী জুপেঁয় দেখিয়ে গেলেন ছবিতে স্পীড, তার গ্যালাপিং হর্স এখনও পেপিং রেস্তোরায় রাখা আছে। সে আজ বিয়াল্লিশ বছর আগের ঘটনা। তারপর সকলেই নন্দলাল বসুকে অবনীন্দ্রনাথের পর ভারতীয় শ্রেষ্ঠ শিল্পী

বাংলার বাউল

হিসাবে সম্মানে ভূষিত করেছেন। শান্তিনিকেতনের অধিকর্তা হিসাবে তাঁর স্থান রবীন্দ্রনাথের পরেই দেখা যায়। এমন কি রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখে যেগুলির উপর কাটাকাটি করতেন এবং সেইগুলিকেই একটি চেহারায় আনবার চেষ্টা করতেন অন্য মনস্ক ভাবে। তারপর দেখতেন ঐ কাটাকুটিতে যদি কোনও অভিব্যক্তি পাওয়া যায় এইজন্য নন্দলাল বসুর কাছে পাঠিয়ে দিতেন ফাইন্যাল টাচ দেবার জন্য। হতোও তাই। কাজেই মোটেই বলা চলে না। তাঁর ভারতীয় পদ্ধতি থেকে তিনি বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হন নি।

চেহারায় সাতন্ত্রিক কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল না নন্দলাল বসু, রামকিঙ্কর বেজ এবং ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের মধ্যে। তবুও তাঁরা অসাধারণ।

আচার্য নন্দলালের আঁকা কয়েকটি ছবি এখানে দেওয়া গেল যার থেকে বোঝা যাবে যে তিনি খাঁটি ভারতীয় পদ্ধতিতে সব ছবি এ'কে গেছেন এবং তাতে অভিব্যক্তির কোন ত্রুটি হয়নি।

জলসত্র

পরবর্তী যুগে শিল্প অলঙ্করণ, সাজসজ্জা, মঞ্চ, শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের শ্রী ও সজ্জা সমস্তই তাঁর অবদান। এটা আমাদের কম গর্বের বস্তু নয় যে অর্ধশতাব্দীর উপরে আচার্য নন্দলাল ভারতীয় নিজস্ব শিল্পধারা দিয়ে সুসজ্জিত করে দিলেন ভারতকে ও গুণমুগ্ধ বহির্ভারতীয়দের।

তখনকার দিনে বা বর্তমানযুগে ভারতীয় শিল্পীরা অধিকাংশই কিছু না কিছু পাশ্চাত্য পদ্ধতির মধ্য দিয়ে ভারতীয় চিত্রাদি অঙ্কন করেছেন। কিন্তু শ্রদ্ধেয় শিল্পী নন্দলালের ক্ষেত্রে সে কথা

(1) শিবের তাণ্ডব নৃত্য: এই ছবিটি অবনীন্দ্রনাথের ওয়াশ পদ্ধতিতে আঁকা। শিবকে এখানে তিনি সুন্দরের প্রতীক ভাবে দেখিয়েছেন। এর পূর্ববর্তী যুগের শিবকে জটাজুটো সমন্বিত গোঁপদাড়িযুক্ত শিবকে আঁকতে অভ্যস্ত ছিলেন। আমাদের সুর ও নৃত্যশিল্পের প্রতীক হিসাবে শিবকেই ধরা হয়। কিন্তু এতো সুন্দর শিব এবং তিনি প্রলয় নৃত্য দিয়ে সমস্তকে ভেঙে খান খান করে দিচ্ছেন। তখনকার শিল্পী সমাজ

ও সুধী সমাজ এই অনিয়ম সহ্য করতে পারলেন না প্রতিবাদ উঠল। গোঁপ, দাড়ি বর্জিত শিবকেই নিয়ে নন্দলাল গেলেন শিল্পীর নিবেদিতার কাছে এ বিষয় অভিমত চাইতে। শিল্পীর এ সম্বন্ধে কাগজে লিখলেন যার যা আরাধ্য তার কাছে তাই সুন্দর। তাতে যদি তাকে শ্মশ্রু গুম্ফ ও জটাহীনভাবে আঁকা হয় অথচ তার অভিব্যক্তি প্রাণ ছোঁয়া হয় তাতে কি দেবতার সেবা অধিকতর হয় না? সব মিটে গেল সবাই মেনে নিলেন এই তাণ্ডব নৃত্যরত

জহরব্রতে সতী

শিবকে এবং সেই থেকেই [illegible] শিবকে আর গোঁপ দাড়ি ভূষিত দেখা যায় না।

(2) বাংলার বাউল : [illegible] বাউলকে দেখিয়েছেন যে তার এ পৃথিবীতে কিছুই কাম্য নাই। সে শুধু দয়াল ঈশ্বরের পূজাতে নিজেকে বিলীন করে দিতে চায়। এই ছবিটিও ওয়াশ পদ্ধতিতে আঁকা।

(3) জলসত্র : সুদূর পথ অতিক্রমকালে পথিকের তৃষ্ণা নিবারণার্থে পথিপার্শ্বে আগের দিনে জলসত্র রাখার রেওয়াজ ছিল। অনেক ধর্মপ্রাণ ধনীব্যক্তি এই জলসত্রের ব্যবস্থার বহন করতেন। এ চিত্র সাত্বিক কল্যাণকর এবং মহত্বের পরিচায়ক।

(4) জহরব্রতে সতী : এই প্রথা মুসলমান রাজত্বকালে রাজস্থানে বহুল প্রচলিত ছিল। তারই এক করুণ মুহূর্ত তিনি তুলে ধরেছেন জন সমক্ষে। এ ছবিটিও অবনীন্দ্রনাথের ওয়াশ পদ্ধতিতে আঁকা।

(5) রানী কৈকেয়ী : মন্থরা তাকে রামের বনবাস গমনের মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে গেছে তাই তিনি উত্তেজিত ভাবে বসে

রাণী কৈকেয়ী

আছেন রাজা দশরথ এলে তাঁকে দিয়ে এই সাঙ্ঘাতিক কার্য সাধন করাবেন। তাই তাঁর চেহারাতে রুক্ষভাব। ভ্রূকুঞ্চিত, কেশরাশি আলুথালু। বসবার ভঙ্গি বাঁকাচোরা। বস্ত্রের অবস্থানও এলোমেলো। এতে তার চেহারা দিয়ে বোঝানো হলো যে তিনি ক্রূর স্বভাবা।

এতো কয়েকটি মাত্র ছবির অভিব্যক্তি দেওয়া গেল কিন্তু তাঁর সৃষ্টি অন্তহীন ও অবিনশ্বর। তাই জানাই তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম।

বিজ্ঞান শিক্ষা আসর

ব্লেসি পাস্কাল

নন্দলাল মাইতি*

সপ্তদশ শতকের ফ্রান্সের মানুষের কাছে পাসকাল ছিলেন "a holy man, perhaps a saint"। সুদীর্ঘ এই আড়াই-শ' বছর পরেও যে সে-মনোভাব বিশেষ বদলায় নি, তা তাঁর ধর্মতত্ত্ব সংক্রান্ত গ্রন্থ Penies পড়া থেকেই বুঝতে পারা যায়,—এখনো সারা বিশ্বের ধর্মপ্রাণ ও মানবদরদী মানুষ আগ্রহের সঙ্গে Penies ও Provincial Letters পড়েন। অবশ্য ধর্মতত্ত্ব-সংক্রান্ত এই বই দুটির আধ্যাত্মিক মূল্য ছাড়াও ফরাসী গদ্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে সাহিত্যমূল্য আছে। কিন্তু তা পাস্কালের জীবনের একটি দিক মাত্র। তাঁর যে দিকটি প্রায় উপেক্ষিত, তা হচ্ছে গণিত ও বিজ্ঞানসাধনার দিক। সত্যি কথা বলতে কি, পাস্কালের গণিত ও বিজ্ঞানসাধনা আজ ইতিহাসের পাতায় আবদ্ধ আছে। মুষ্টিমেয় বিজ্ঞানের ছাত্র ছাড়া আর কেউ এ-বিষয়ে কিছু জানেন না বললেই চলে। এই প্রবন্ধে আমরা তাঁর জীবন ও গাণিতিক আবিষ্কারগুলি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

পাস্কালের ব্যক্তিজীবন বিষাদকরুণ। খুব ছেলেবেলায় মাত্র তিন বছর বয়সে তিনি মাতৃহারা হন। তখন থেকেই পিতার স্নেহচ্ছায়ায় মানুষ। পিতা এতিয়েন পাস্কাল (Etienne Pascal) ছিলেন একজন সুপ্রতিষ্ঠিত আইনজীবী। তিনি ছিলেন গণিতানুরাগী, দর্শন ও আইনে পারদর্শী। মাতা অঁতোয়া-নেৎ (Antoinette) যখন তিনটি শিশু পুত্র-কন্যা রেখে মারা গেলেন, তখন পিতা এতিয়েন পুত্র-কন্যাদের ভার নিজের হাতে তুলে নিলেন। অতি শৈশবে মাতৃহারা হওয়ায় খুব সম্ভব পাস্কালের শরীর-স্বাস্থ্য কখনো ভাল যায়নি,—সারা জীবন রোগভোগ করেছেন।

1623 খৃস্টাব্দের 19শে জুন ব্লেস পাস্কাল ফ্রান্সের ক্লেরমোঁ-তে জন্মগ্রহণ করেন। পাস্কাল কোন স্কুলে পড়াশোনা করেননি,—তাঁর বাবা স্কুলে দেননি। কারণ, তখন স্কুলের পরিবেশ ছিল ভয় ও আতঙ্কের। শাসন, নির্যাতন, উৎপীড়ন সহ্য করার মতো ক্ষমতা ব্লেসের ছিল না বলে তিনি বাড়ীতেই পড়াশোনা করেন। বাবা ছিলেন তাঁর শিক্ষক, এবং সে-যোগ্যতা তাঁর ছিল। ছেলের লেখাপড়ার জন্য তিনি সব কাজকর্ম ত্যাগ করে ক্লেরমোঁ ছেড়ে প্যারিসে গিয়ে বসবাস করতে লাগলেন।

1631-40 খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বাবার তত্ত্বাবধানে গ্রীক, ল্যাটিন, গণিত ও বিজ্ঞানে পাস্কাল যথার্থ জ্ঞানলাভ করে ওই সব বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করলেন। তা ছাড়া সে যুগের দিকপাল গণিতবিদরা এতিয়েনের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। এতে পাস্কালের প্রতিভা বিকাশে বিশেষ সহায়তা হয়েছিল। এমনি

ব্লেসি পাস্কাল

করে খুব ছোটবেলা থেকে দেকার্তে, মার্সেনে, রোভারবল, ফেরমার মতো প্রতিভাশালী গণিতবিদদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়।

এতিয়েন পাস্কাল মনে করতেন খুব ছোটবেলায় গণিত স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয়। এদিকে ছোটবেলায় ব্লেসির স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় তিনি ছেলেকে গণিত পড়তে দেন নি। কিন্তু ব্লেসি পাস্কাল গণিতে মৌলিক প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন। মাত্র বার বছর বয়সে ইউক্লিডের জ্যামিতি না পড়েই তিনি অনেক উপপাদ্য আবিষ্কার করেন। কিন্তু সঠিক পরিভাষা জানা না থাকায় খুশী-মত নামকরণ করেন। পুত্রের গাণিতিক প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে পিতা আর অশ্রুসংবরণ করতে পারেন নি। তারপর নিজে গণিত শেখাবার ভার গ্রহণ করে ইউক্লিড পড়ার অনুমতি দেন।

*ঠাকুরানীচক, হুগলী, পিন—712 613

বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দিকটির প্রতি পাস্কালের তেমন আস্থা ছিল না,—এর পরীক্ষালব্ধ সত্যের প্রতি ছিল তার আকর্ষণ। মাত্র উনিশ বছর বয়সে গণকযন্ত্র (calculator) নির্মাণ করেন এবং নানা কারিগরী নির্মাণ, canal navigation, নতুন ধরনের দু-চাকার গাড়ী প্রবর্তনে, এমন কি ভূমি-সংস্কার আন্দোলনের সমর্থনে তাঁর ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ ও অনুরাগ দেখা যায়।

গণিত বিশেষভাবে জ্যামিতিক গবেষণায় ছিল পাস্কালের আজন্ম আগ্রহ, অনুরাগ। মাত্র ষোলো বছর বয়সেই তিনি কণিক জ্যামিতির একটি উপপাদ্য আবিষ্কার করেন। বিখ্যাত গণিতজ্ঞ সিলভিস্টার এই উপপাদ্যটিকে "Cat's Cradde" বলতেন। সে-যুগে গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ক কোন পত্র-পত্রিকা ছিল না। তখন সাধারণত বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও গণিতবিদদের মধ্যে পত্রালাপের মধ্যে নতুন আবিষ্কার প্রচারিত হতো। কিন্তু কিশোর পাস্কাল তাঁর আবিষ্কার প্রচার করার এক অভিনব পন্থা উদ্ভাবন করলেন। 50 কপি দেয়াল পোস্টার গীর্জা ও বাড়ীর দেয়ালে লাগিয়ে ফরাসী ভাষায় অতি সংক্ষেপে তাঁর আবিষ্কারের কথা জানালেন। তখনকার দিনে শিক্ষিত মহলে ল্যাটিন ভাষায় লেখা রীতি ছিল। কিন্তু পাস্কাল মাতৃভাষায় তাঁর গবেষণার কথা জানাতে শ্রেয় বোধ করলেন। পাস্কালের এই আবিষ্কার Projective Geometry-র এক নতুন অধ্যায় সূচনা করতে পারত। কিন্তু সে পথে তিনি একটি মাত্র পদক্ষেপ করেছিলেন। পরে পঁয়শলে রাশিয়ার কারাগারে বসে দুটি পদক্ষেপ করে এই জ্যামিতির দিগন্ত উন্মোচন করেছিলেন।

পাস্কালের ত্রিভুজ নামে পরিচিত নামে অসীম সংখ্যার তালিকাটি এক অভিনব আবিষ্কার। অবশ্য তাঁর আগে যে অন্য কেউ আর এ-বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করেননি, তা নয়। প্রাচীন ভারতে আবিষ্কৃত মেরু-প্রস্তর, ওমর খৈয়াম আবিষ্কৃত ত্রিভুজ সংখ্যা, চীনা গণিতবিদ চু শে কেই-এর গবেষণা ও ইটালীয় গণিতবিদ নিকোলো ফন্টানা বা তার্তাগলিয়ার আয়তাকৃতি এক ধরনের সংখ্যা তালিকা পাস্কালের আগেই দেখা যায়। কিন্তু পাস্কাল স্বাধীনভাবে এই ত্রিভুজাকৃতি অসীম সংখ্যার তালিকাটি আবিষ্কার করেন। এটি দেখতে এরকম।

```
        1
      1   1
    1   2   1
  1   3   3   1
1   4   6   4   1
```

দ্বিপদ রাশির বিস্তৃতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই তালিকার সাহায্য নিলে খুব সুবিধা হয়,—সহগ নির্ণয় এই তালিকা দেখেই জেখা যায়। যেমন, $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$, এই রাশির সহগ 1, 2, 1 ও $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$-এর সহগগুলি 1, 3, 3, 1 পাস্কালের ত্রিভুজ থেকে খুব সহজে নির্ণয় করা যায়। তা ছাড়াও এই ত্রিভুজের অনেক ধর্ম গণিতে প্রয়োগ করা যায়।

সম্ভাবনা তত্ত্ব আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠায় পাস্কালের অবদান অনস্বীকার্য। সে-যুগে অভিজাতদের মধ্যে জুয়া খেলার প্রচলন ছিল। অনেকে জানেন জুয়া খেলা থেকে গণিতের এই শাখাটি জন্মলাভ করে এবং পরে ঐশ্বর্যশালী হয়ে এখন মানববিদ্যার নানা ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হচ্ছে। পাস্কাল তাঁর পরিচিত আঁতোয়ান গোম্বোর জুয়া সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে সম্ভাবনা তত্ত্বের বিরাট সম্ভাবনা আবিষ্কার করেন। অবশ্য তাঁর এই গবেষণায় পিয়েরে দ্য ফেরমার অবদান কম নয়।

কেবলমাত্র একটি ছাড়া পাস্কালের গাণিতিক আবিষ্কার তাঁর পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সের মধ্যে। জীবনের শেষ লগ্নে তিনি যে গাণিতিক সমস্যায় নিমগ্ন হন তা সাইক্লয়েড সমস্যা সম্পর্কিত। গণিতের ইতিহাসে সাইক্লয়েড সমস্যা মহাকাব্য সুন্দরী হেলেনের সঙ্গে তুলনীয়। হেলেনের রূপলাবণ্য ও মুখচন্দ্রিমা "launcheda thousand ships"। তেমনি সাইক্লয়েডের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গণিতবিদদের মধ্যে তর্কবিতর্ক, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইত্যাদি দেখা যায়। ফলত গণিতবিদরা এই সুন্দরী বক্ররেখার নানান ধর্ম আবিষ্কার করেন। গ্যালেলিও, খ্রীস্টোফার রেন, ফেরমা, হুইগেন্স এতে আকৃষ্ট হন। হুইগেন্স তো দোলন ঘড়ি নির্মাণে এর নীতি প্রয়োগ করেন।

1658 খ্রীস্টাব্দ, তখন পাস্কালের পঁয়ত্রিশ বছর বয়স। যথারীতি আশৈশব সঙ্গী অনিদ্রা ও দাঁতের যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন। তিনি সাইক্লয়েড সমস্যার প্রতি আকৃষ্ট হলেন। আর আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর দাঁতের যন্ত্রণা সেরে গেল,—সম্পূর্ণ সুস্থবোধ করতে লাগলেন। আটদিন ধরে কঠিন পরিশ্রম করে তাঁর গবেষণালব্ধ ফলের ভিত্তিতে ছদ্মনামে (Amos Dettonville) কিছু সমস্যা সম্পর্কে ফরাসী ও ইংরেজ গণিতবিদদের উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ জানালেন। এতে ইংরেজ গণিতবিদ ওয়ালিশ অনেক ভুল করে পরে সংশোধন করেন; আর ল্যুয়েরে (Louire) প্রতিযোগী হওয়ার উপযুক্ত ছিলেন না।

সাইক্লয়েড আর কিছুই নয়, সমতলে কোন চাকা গড়াতে থাকলে তার পরিধিতে অবস্থিত একটি নির্দিষ্ট বিন্দু দ্বারা যে বক্ররেখা উৎপন্ন হয়, তা-ই হচ্ছে সাইক্লয়েড। গ্রীক শব্দ, এর অর্থ বৃত্তীয়। নদী ও হাইওয়ের ব্রীজ সাইক্লয়েড নীতিতে তৈরী।

1662 খৃষ্টাব্দের 19শে আগস্ট পাস্কালের মৃত্যু হয়। গণিতবিদদের জীবন সাধারণত দীর্ঘ হয়। পাসকালের জীবন দীর্ঘ হলে মানবসভ্যতার অশেষ কল্যাণসাধন হতো সন্দেহ নাই।

উদ্ভিদের অনুভূতি

শেখর ভূঞ্যা*

উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা নূতন নয় ; তবে উদ্ভিদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে চিন্তাভাবনা বোধহয় আচার্য জগদীশ বসুই প্রথম শুরু করেছিলেন। তাঁর কথায় জড় ও জীবের পার্থক্য শুধু—"এক জায়গায় শারীরবৃত্তীয় কাজের শেষ অন্য জায়গায় এই কাজের শুরু"। ইদানিংকালে একশ্রেণীর বিজ্ঞানী উদ্ভিদের গোপন জীবন নিয়ে গবেষণালব্ধ ফলাফলের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে যে সমস্ত ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন, তা শুনলে এই গতিময় বিজ্ঞানের যুগেও আমাদের রোমাঞ্চিত, শিহরিত হতে হয়। সত্যিকথা বলতে কি এসবের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আজও পরিষ্কার নয়।

ক্লি ব্যাকস্টার (Clee Backstar, 1966) হলেন আমেরিকার পুলিশ বিভাগে কর্মরত অপরাধ-বিজ্ঞানী এবং সত্যান্বেষী। তিনি তাঁরই পরীক্ষাগারে অবস্থিত তাঁরই প্রযত্নে গড়ে তোলা ড্রাসিলা ম্যাসেনজিনা (Dracaela masangeana) গাছ নিয়ে তাঁরই আবিষ্কৃত পলিগ্রাফ (Lie detector) যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা চালিয়ে গাছেদের নানারকম অনুভূতির কথা প্রকাশ করেছেন।

একদিন কানাডা থেকে আগত এক মহিলা শারীরতত্ত্ববিদ্ উদ্ভিদ নিয়ে পরীক্ষা দেখার জন্য পরীক্ষাগারে প্রবেশ করলেন। সেই মহিলার মনের ইচ্ছা বুঝবার জন্য ব্যাকস্টার তাঁর পলিগ্রাফের ইলেকট্রোড্ গাছের সঙ্গে যুক্ত করলেন। এক, দুই, তিন...... পাঁচবার চেষ্টা করেও সফল হলেন না। ব্যাকস্টার আশ্চর্য হয়ে ঐ মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন,—"আপনি যে গবেষণার কাজ করছেন তার মধ্যে গাছের পক্ষে ক্ষতিকর কোন ঘটনা আছে কি ?" মহিলাটি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, আমার কাজের জন্য গাছ তুলে এনে তাদের উনুনে শুকনো করি ও শুকনো অবস্থার ওজন নিই। এরপরে মহিলাটি ল্যাবরেটরি থেকে এয়ারপোর্টের দিকে রওনা দিলেন। আরও 45 মিনিট পর ব্যাকস্টার আবার গাছগুলোকে একইভাবে পরীক্ষা করলেন। দেখা গেল সমস্ত গাছগুলোই সমানভাবে পলিগ্রাফে রিডিং দিয়ে চলেছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাকস্টার বলেন কোন রকম ভয় বা নষ্টের আশঙ্কায় উদ্ভিদ নাকি মানুষের মত কষ্ট পায় তাই স্বাভাবিকভাবেই আগের থেকেই এক ধরণের মূর্চ্ছা যায় বা অনুভূতিশূন্য হয়ে পড়ে।

এর পরের পরীক্ষা আরও রোমাঞ্চকর। পুলিশবাহিনী থেকে ব্যাকস্টার তাঁর দুজন ছাত্রকে বেছে নিলেন। এবার একটি টুপির মধ্যে কতকগুলো কাগজ মুড়ে রেখে দিলেন। ঐ কাগজগুলোর মধ্যে একটিতে দুটো গাছের মধ্যে একটিকে মেরে ফেলার নির্দেশ ছিল। যে ছাত্রটি ঐ নির্দেশনামা কাগজটি তুলবে তাকেই গোপনে ঐ কাজটি করতে হবে। দুজনের মধ্যে একজন কাগজের নির্দেশ অনুযায়ী গোপনে দুটো গাছের মধ্যে একটিকে উপড়ে একদম নষ্ট করে ফেললেন। দ্বিতীয় গাছ ছাড়া অন্য কেউ ব্যাপারটি জানতে পারল না। এবার অপর গাছটির সঙ্গে পলিগ্রাফ যন্ত্রের ইলেকট্রোড যোগ করে দিয়ে ব্যাকস্টার একের পর এক প্রতিটি ছাত্রকে হেঁটে যেতে বললেন। দেখা গেল অন্য পাঁচজনের বেলায় পলিগ্রাফ যন্ত্রের কাঁটা নীরব, কিন্তু আসল খুনীর ক্ষেত্রে মিটারের কাঁটাটি অনেক দূরে সরে গেল। ব্যাকস্টারের মতে দোষীর মনের অপরাধী মনোভাব গাছেদের কাছে নাকি সহজেই অনুমেয়। যদিও এখানে খুনী বিজ্ঞানের স্বার্থেই অপরাধ করেছে, প্রকৃত সে দোষী নয়, তবুও মনে করা যেতে পারে, গাছ তার প্রতিবেশীর প্রতি এত বেশী সহানুভূতিশীল যে, তার প্রতিবেশীর ক্ষতিকারককে সহজেই সে চিনে ফেলতে পারে।

এরপরের ঘটনা আরও মজার। নিউজার্সির এক কারখানায় একটি মেয়ে খুন হয়ে গেল। সত্যান্বেষী ব্যাকস্টারের উপর ভার পড়ল খুঁজে বের করার। অন্য যে কোন ভাবে খুনীকে খুঁজে পেতে হলে সেটা হত সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই ব্যাকস্টার মেয়েটির মৃতদেহ অফিসের যে অংশে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল সেই অংশেরই দুটো গাছের সঙ্গে পলিগ্রাফ যন্ত্রকে যুক্ত করলেন, উদ্দেশ্য গাছ দুটি যদি কোন ব্যক্তির প্রতি বেশী প্রতিক্রিয়া দেখায় তা'হলে সেই গাছ দুটির সত্য সাক্ষ্যই প্রমাণ করবে আসল খুনীকে। এরপর কারখানা সংশ্লিষ্ট সমস্ত শ্রমিক ও কর্মচারীবৃন্দ নির্দেশ অনুযায়ী গাছ দুটির সামনে দিয়ে এক এক করে হেঁটে গেল। গাছেদের মধ্যে কোনরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না।

গাছদুটোকে বিশেষ প্রহরায় একরাত্রির জন্য সরিয়ে রেখে, দ্বিতীয় দিনও একই পরীক্ষা করা হলো, কিন্তু সেদিনও গাছেদের মধ্যে কোনরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। ব্যাকস্টার বললেন কারখানার কোন লোক খুনী নন। হলোও তাই, বেশ কিছুদিন পরে খুনী ধরা পড়ল এবং দেখা গেল যে সে বাইরে থেকে কারখানার মধ্যে ঢুকে মেয়েটিকে খুন করে আবার বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল। খুনীর অন্বেষণে গাছের এই সাহায্য—সত্যি অবিশ্বাস্য নয় কি ?

একদিন ব্যাকস্টার ছুড়ি দিয়ে হাতের আঙুল কাটার মনস্থ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে পলিগ্রাফের কাঁটাতে প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। গাছেরা জীবিত কলার মৃত্যুতে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। এমন কি

* উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, হাবরা শ্রীচৈতন্য কলেজ, 24 পরগণা

একটা কোষের মৃত্যুতেও গাছেরা আশ্চর্যান্বিতভাবে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করে। বিভিন্ন ধরণের এককোষী জীব যেমন অ্যামিবা, প্যারামেসিয়াম, ঈস্ট, রক্তকোষ ইত্যাদির মৃত্যুও পলিগ্রাফ যন্ত্রে ধরা পড়ে। এমনও দেখা গেছে অনেক পুরুষের মাঝে শুক্রকোষের (sperm cell) প্রকৃত দাতাকেও সহজেই সনাক্ত করে। একটা ডিম্বকোষকে ফুটন্ত জলের মধ্যে ফেলে দিলেও গাছেদের উত্তেজনা প্রকাশ করতে দেখা যায়। এসমস্ত দেখলে মনে হয় মস্তিষ্কই স্মৃতি সঞ্চিত রাখার একমাত্র অঙ্গ নয়,—সমস্ত ধরণের স্মৃতি একটা কোষের মধ্যেই হয়তো নিবদ্ধ রাখার ক্ষমতা রাখে।

একবার ব্যাকস্টার তাঁরই বাড়ীতে অবস্থিত ড্রাসিনা গাছের সঙ্গে ইলেকট্রোড যোগ করে দিয়ে ঐ গাছেরই একটা পাতাকে দেশলাই কাঠি দিয়ে পোড়াতে মনস্থ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে গাছ শিউড়ে উঠল এবং তা যন্ত্রে ধরা পড়ল। এটা কি করে সম্ভব? উত্তর আজও অজানা।

ভূমিকম্প বিচিত্রা

ধূর্জটিপ্রসাদ সাহু*

ভূমিকম্প সমন্ধে পৌরাণিক ধারণা : ভূমিকম্পের কারণ সম্বন্ধে ভারতীয় পুরাণে একটি সুন্দর গল্প আছে। কাহিনীটি এইরকম—আমাদের এই পৃথিবীকে মাথায় ধারণ করে আছে সর্পরাজ বাসুকী। সহস্রফনা বাসুকী যখন পৃথিবীকে তার এক মাথা থেকে অন্য মাথায় নিয়ে যায় তখনই পৃথিবী নড়ে ওঠে ও ভূমিকম্প হয়। জাপানীরা মনে করে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে একটি বিরাট বড় মাছ আছে। কোন কারণে মাছটি ক্ষিপ্ত হলে ভূমিকম্প হয়। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে এই সমস্ত আজগুবি ধ্যানধারণার অবসান ঘটেছে, আধুনিক বিজ্ঞানে জাদুস্পর্শে ভূমিকম্পের সঠিক রহস্য উন্মোচিত হচ্ছে।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকম্প : গত দু'হাজার বছরের মধ্যে প্রাচীনতম ও সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়েছিল ইটালীর পম্পাই নগরে। ইটালীর ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি বিসুভিয়াস একদিন জেগে উঠল, বেরোতে লাগল ধোঁয়া, আগুন আর লাভার স্রোত। গাছপালা, মানুষ, পশু-পক্ষী—কেউ রেহাই পেল না। গোটা শহরটা মাটির তলায় চাপা পড়ে গেল। অনেক বছর পর হঠাৎ একদিন মাটি খুঁড়তে গিয়ে পম্পাই এর পুনঃ আবিষ্কার হল। আধুনিক কালে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়েছে 1923 খৃস্টাব্দে জাপানে। এই ভূমিকম্প মাত্র আধ মিনিট স্থায়ী হয়েছিল, কিন্তু তাতেই দু'লাখের বেশী মানুষ মারা গিয়েছিল। তখনকার হিসাবে হাজার কোটি টাকার সম্পত্তির ক্ষয় ক্ষতি হয়েছিল। একই সঙ্গে আগুন ও সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস গোটা জাপানকে গ্রাস করেছিল। ভারতে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়েছিল 1934 খৃস্টাব্দে বিহারে। এছাড়া 1883 খৃস্টাব্দে ইন্দোনেশিয়ায়, 1775 খৃঃ লিসবোনে, 1908 খৃঃ সিসিলিতে, 1906 খৃঃ সান-ফ্রানসিসকোতে, 1920 খৃঃ চীনে, 1960 খৃঃ চিলিতে, 1962 খৃঃ ইরানে, 1963 খৃঃ যুগোস্লোভিয়ায়, 1966 খৃঃ তুরস্কে এবং 1968 খৃঃ সিসিলিতে অতি ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়েছিল। সম্প্রতি (13.12.82) এক ভীষণ ভূমিকম্পে উত্তর ইয়েমেনে প্রায় তিন হাজার লোক মারা পড়েছে।

ভূমিকম্প কেন হয় : মোটামুটিভাবে জানা গেছে আজ থেকে প্রায় 500 কোটি বছর আগে পৃথিবীর অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম, পৃথিবী বলতে তখন বোঝাতো অতি উষ্ণ, তরল, সান্দ্র, বৃহৎ গোলাকার এক বস্তুপিণ্ডকে। এই অতি উষ্ণ বস্তুপিণ্ড ক্রমাগত তাপ বিকিরণ করে ঠাণ্ডা ও কঠিন হতে লাগল এবং এখনও এই কাজ খুব ধীরে ধীরে চলছে। তরল ম্যাগ্‌মা কঠিন হতে থাকায় পৃথিবীর আয়তন ক্রমশঃ কমছে। এর ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ফাটলের সৃষ্টি হচ্ছে, যা ভূমিকম্পের একটি প্রধান কারণ। অন্য একটি মতবাদে বলা হয় বহুদিন আগে সমস্ত মহাদেশগুলি সব একে অপরের সঙ্গে যুক্ত ছিল, কোন এক অজ্ঞাত কারণে একদিন তাদের বিচ্ছেদ ঘটেছে এবং তারা একে অপরের থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে। এই সরণ বছরে 1 সে.মি.-এর মত, এর ফলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হচ্ছে বলে অনেকে মনে করেন। এই মতবাদকে বলা হয় Theory of Continental Drift. অনেকে মনে করেন কোন পর্বত ও সমভূমির সংযোগ-স্থলে যদি ফাটলের সৃষ্টি হয় তাহলে ভূমিকম্প হতে পারে। তাঁদের মতে এইভাবেই হিমালয় পর্বতে ভূমিকম্প হয়। এছাড়াও পৃথিবীর অভ্যন্তরে কোন স্থানের তরল ম্যাগ্‌মার উষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটলে যে চাপের উদ্ভব হয় তার ফলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হতে পারে।

ভূমিকম্পের তরঙ্গ : ভূমিকম্পের ফলে তরঙ্গের উৎপত্তি হয়। এই তরঙ্গ প্রধানত তিন প্রকার—P তরঙ্গ, S তরঙ্গ এবং L তরঙ্গ। (চিত্র : 1)। মানমন্দিরে প্রথমে ধরা পড়ে P তরঙ্গ, তারপর S তরঙ্গ এবং সবশেষে L তরঙ্গ। বিভিন্ন তরঙ্গ বিভিন্ন সময়ে যন্ত্রে এসে ধরা দেয় এবং সেই আসার পার্থক্য থেকে নির্ভুলভাবে ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল বলে দেওয়া সম্ভব।

ভূমিকম্পমাপক যন্ত্র : ভূমিকম্পের ফলে যে তরঙ্গের উদ্ভব হয় তা ভূমিকম্পমাপক যন্ত্রে ধরা পড়ে। প্রথমদিকে সাধারণ দোলককে ভূমিকম্পমাপক যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হতো। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্পমাপক যন্ত্রেরও

*বাগনান রু টীয় সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন, হাওড়া

উদ্ভাবিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে Milne—Shaw horizontal component seismograph, Galitzin horizontal seismograph, Wood-Anderson Torsion seismograyh (চিত্র : 2) উল্লেখযোগ্য। শেষেরটি ভারতে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমানে ভূমিকম্প মাপক নীতি কাজে লাগিয়ে মাটির নীচে তেল, খনিজ পদার্থ
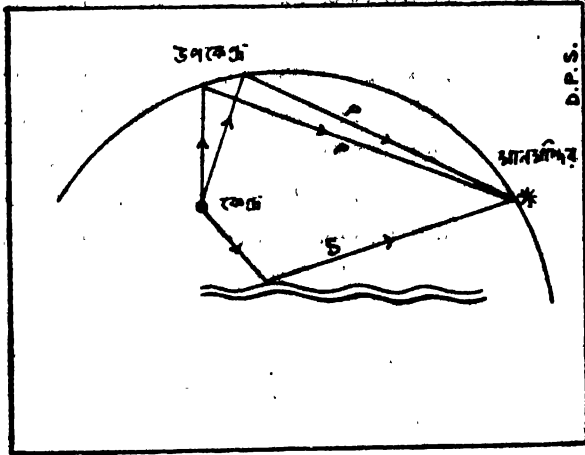
চিত্র 1 : ভূমিকম্পের তরঙ্গ

প্রভৃতির অনুসন্ধান করা হচ্ছে। এই কাজের উপযোগী ছোট ছোট ভূমিকম্পমাপক যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বিভিন্ন নিউক্লীয় বোমার বিস্ফোরণ অতি সুন্দরভাবে সিসমোগ্রাফ থেকে জানা যায় এবং বিস্ফোরণ স্থান ও বোমার ক্ষমতা সম্বন্ধেও মোটামুটি ধারণা করা যায়।

মানমন্দির : যেখানে ভূকম্পমাপক যন্ত্র থাকে তাকে মানমন্দির বলা হয়। মানমন্দিরে মাটির অনেক তলায় ভূকম্প
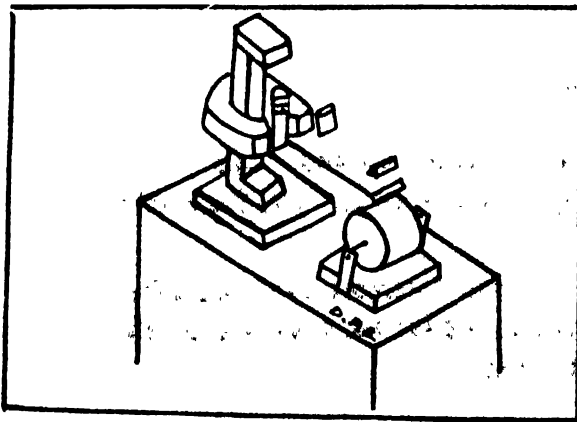
চিত্র 2 : ভূমিকম্পমাপক যন্ত্র

মাপক যন্ত্র বসানো থাকে। পৃথিবীর সমস্ত বড় বড় শহরে মানমন্দির আছে। প্রতি বছর International Seismological Association-এ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা যোগদান করে ভূমিকম্প বিষয় বিভিন্ন আলোচনা করেন।

ভূমিকম্পের শ্রেণীবিভাগ : ইটালীয় বিজ্ঞানী Rossi এবং সুইস বিজ্ঞানী Forel ভূমিকম্পের যে শ্রেণীবিভাগ করেন তাকে Rossi-Forel শ্রেণীবিভাগ বলে। এই পদ্ধতিতে ভূমিকম্পের তীব্রতাকে দশটি ভাগে ভাগ করা হয়। বর্তমানে ভূমিকম্পের তীব্রতাকে A থেকে F পর্যন্ত ছটি ভাগে ভাগ করা হয়।

সারণী-1

আধুনিক	Rossi-Forel	ভূমিকম্পের প্রকৃতি
F	ক্ষুদ্র	কেবলমাত্র অভিজ্ঞ লোকেরা বুঝতে পারে, যন্ত্রে ধরা পড়ে।
	অতি ক্ষীণ	পরিমাণ আগের থেকে সামান্য বেশী।
	নাতি ক্ষীণ	কম্পন কোন্ দিক থেকে আসছে তা বলা যায়।
	ক্ষীণ	দরজা, জানালা নড়তে থাকে।
	মৃদু	পূর্বের থেকে সামান্য বেশী।
E	সাধারণ	নিদ্রিত ব্যক্তি জেগে ওঠে। গাছপালা নড়তে থাকে। জল আন্দোলিত হয়।
D	প্রবল	বাড়িঘর ভেঙে যায়।
C	অতি প্রবল	সেতু ভেঙে যায়।
B	ভয়াবহ	ভূমিতে ফাটল ধরে।
A	অতি ভয়াবহ	রেলপথ বেঁকে যায়। অনেক স্থান মাটির তলায় চলে যায়।

ভূমিকম্প ও সমুদ্র : অনেক সময় ভূমিকম্পের ফলে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ নয়। 1883 খৃস্টাব্দে Krakatoa আগ্নেয়গিরির লাভা উদগীরণের ফলে যে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়েছিল তার দ্বারা সমুদ্রের জলে অনেক জায়গায় 135 ফুট পর্যন্ত ঢেউ উঠেছিল এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানকে প্লাবিত করেছিল। এই ভূমিকম্পের ফলে অনেক জায়গায় বড় বড় জাহাজ ডুবে গিয়েছিল।

ভূমিকম্পের পূর্বাভাষ : বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীরা উঠেপড়ে লাগলেন কিভাবে ভূমিকম্পের পূর্বাভাষ দেওয়া যায়। এবিষয়ে বিজ্ঞানীদের প্রধান হাতিয়ার বিভিন্ন পশু-পাখী। ভূমিকম্পের আগে বিভিন্ন পশু-পাখীর চরিত্রে অনেক অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা যায়। জাপানে ক্যাটফিস নামে একটি মাছ নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। ভূমিকম্পের আগে কোন জলাধারে রাখা এই ধরণের মাছকে অত্যন্ত অস্থির হতে দেখা যায়। কিন্তু জলাধারটি যদি রবারের প্রলেপ দ্বারা ঢাকা থাকে তাহলে এদের এ ক্ষমতা লোপ পায়। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখলেন, ভূমিকম্পের আগে কম্প

পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। এই বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলেই অতি মাত্রায় বিদ্যুৎ-সংবেদনশীল এই মাছেরা উত্তেজিত হয়। রবারের প্রলেপ অন্তরকের কাজ করে এবং এই অবস্থায় মাছ আর সাড়া দিতে পারে না।

ভূমিকম্পের আগে চিংড়ী, ইল, ইঁদুর, মোরগ ও বিভিন্ন ধরণের পাখীর আচরণে অস্থিরতা প্রকাশ পায়। এছাড়া অনেক জায়গায় কুয়োর জলের তল নীচে নেমে যায়, জল ঘোলা হয়ে যায় ও ঝর্ণার জলের প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়।

তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো ভূমিকম্পের আগে বাতাসে র‍্যাডন (A. N–86) নামে একটি গ্যাসের পরিমাণ খুব বেড়ে যায়। এর উপর ভিত্তি করে অনেক ভূমিকম্পের পূর্বাভাষ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। তবে সঠিকভাবে ভূমিকম্পের পূর্বাভাষ দিতে হলে আরও অনেক গবেষণার প্রয়োজন।

ভারতে কি ভবিষ্যতে ভূমিকম্প হতে পারে? বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর যে সমস্ত স্থানে ভূমিকম্প হতে পারে তা একটি কাল্পনিক রেখার দ্বারা চিহ্নিত করেছেন। এই রেখার দ্বারা আবদ্ধ স্থানকে ভূকম্প বলয় বলে। প্রধানত দুটি ভূকম্প বলয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রথমটির নাম Himalayan-Alpedo Belt.-এর মধ্যে হিমালয়, কারাকোরাম, পামীর, ককেসাস, আল্পস পর্বতমালাসমূহ ও তাদের পাদদেশ অবস্থিত। দ্বিতীয়টির নাম Circum Pacific Belt. এর মধ্যে আছে জাপান, চীন, আসাম, ব্রহ্মদেশ, মালয়, নিউজিল্যাণ্ড, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বোর্ণীয় প্রভৃতি স্থান।

পরিসংখ্যানের সাহায্য দিয়ে দেখা গেছে যে প্রতি আড়াই বছর ছাড়া ছাড়া ভারতে একটি করে A, B বা C ধরণের ভূমিকম্প হতে পারে। তার মধ্যে A শ্রেণীর ভূমিকম্প গড়ে 7 বছর ছাড়া একটি।

এর প্রতিকার কোথায়ঃ ভূমিকম্প থেকে বাঁচার উপায় সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের খুব একটা ভরসা দিতে পারছেন না। তবে ভূমিকম্প থেকে বাঁচার জন্য কয়েকটি সতর্কতা নিতে পরামর্শ দিয়েছেন। A বা B শ্রেণীর কথা বাদ দিলে অন্যান্য ভূমিকম্পের সময় প্রত্যেকেরই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসা উচিৎ। যে সমস্ত স্থানে অত্যধিক ভূমিকম্প হয় সেখানে কাঠ, বাঁশ, কার্ডবোড, প্ল্যাস্টিক প্রভৃতি দ্বারা তৈরী বাড়ীতে বাস করা উচিৎ। এই সমস্ত স্থানে পাকা বাড়ী নির্মাণ করলে তা কোনমতেই বহুতল করা উচিৎ নয়। বরং ছোটখাটো অথচ মজবুত কংক্রিটের বাড়ী নির্মাণ করা যেতে পারে। আশা করা যাচ্ছে ভবিষ্যতে বিজ্ঞানীরা ভূমিকম্পের সঠিক পূর্বাভাস দিতে সক্ষম হবেন।

বিজ্ঞপ্তি

গত 21শে জানুয়ারী 1983 বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সাধারণ এবং আজীবন সভ্যপদের চাঁদার হার 1983 খৃস্টাব্দ থেকে নিম্নোক্ত হারে বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছেঃ

সাধারণ সভ্য পদের বার্ষিক চাঁদা 25·00 (পঁচিশ টাকা) এবং আজীবন সভ্যপদের এককালীন দেয় চাঁদা 300·00 (তিনশত) টাকা। তবে কোন সভ্য যদি একাদিক্রমে পাঁচ বছর সভ্য থাকেন সে ক্ষেত্রে তিনি এককালীন 200·00 (দুই শত) টাকা দিয়ে আজীবন সভ্য হতে পারবেন।

সভ্য হবার আবেদন পত্রের মূল্য প্রতিটি 25 পয়সা।

'সত্যেন্দ্র ভবন'
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-700 006

সুকুমার গুপ্ত
কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

আন্তর্জাতিক একক পদ্ধতি

শান্তিনাথ ধাড়া*

1954 খৃস্টাব্দে ওজন ও পরিমাপের আন্তর্জাতিক কমিটির দশম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনীয়ারিং-এর ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ব্যবহারের জন্য এককের MKSA পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। এ পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক মিটার, ভরের একক কিলোগ্রাম, সময়ের একক সেকেণ্ড এবং বিদ্যুৎ প্রবাহের একক অ্যাম্পিয়ার। তারপর 1960 খৃস্টাব্দে ঐ কমিটির একাদশতম অধিবেশনে সুসংবদ্ধভাবে আন্তর্জাতিক একক পদ্ধতি (System of International Unit) গ্রহণ করেছেন। একই একক পদ্ধতি মূলতঃ MKSA পদ্ধতি অনুসরণে প্রবর্তিত হয়েছে। ভারত সরকারও এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। আন্তর্জাতিক একক পদ্ধতি MKSA পদ্ধতিকে আরও কয়েকটি প্রাথমিক এবং সম্পূরক একক দ্বারা প্রসারিত করে গঠিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক একক পদ্ধতি—এ পদ্ধতিটি সাতটি প্রাথমিক একক দুটি সম্পূরক একক এবং ইহাদের দিয়ে গঠিত অসংখ্য একক নিয়ে গঠিত হয়েছে। এই সাতটি প্রাথমিক এককের নাম ও চিহ্ন নিয়ে এক নম্বর সারণীতে দেওয়া হলো।

1 নং সারণী

একক	নাম	চিহ্ন
দৈর্ঘ্য	মিটার	m
ভর	কিলোগ্রাম	kg
সময়	সেকেণ্ড	s
প্রবাহী তড়িৎ	অ্যাম্পিয়ার	a
তাপ গতি তাত্বিক তাপমাত্রা	কেলভিন	k
পদার্থের পরিমাণ	মোল	mol
দীপন মাত্রায় প্রাবল্য	ক্যাণ্ডেলা	cd

আন্তর্জাতিক কমিটির দেওয়া এ সাতটি প্রাথমিক এককের সংজ্ঞা নিম্নে দেওয়া হলো।

মিটার—উদ্দীপ্ত অবস্থায় 86 ভরসংখ্যাবিশিষ্ট ক্রিপ্টন আইসোটোপ থেকে যে কমলা রঙের আলো নিঃসৃত হয়, শূন্য স্থানে ঐ আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের 1, 650, 763·73 গুণ হলো এক মিটার।

কিলোগ্রাম—আন্তর্জাতিক নমুনার তত্ত্বাবধানে এক কিলোগ্রাম ভরের সমান ভরকে এক কিলোগ্রাম বলে। এটি 2·20462 পাউণ্ডের সঙ্গে সমান।

সময়—ভৌম অবস্থায় সিজিয়াম-113 পরমাণুর শক্তিস্তরের দুটি অতি সূক্ষ্ম গঠনের মধ্যে সংক্রমণের ফলে বিকিরণের জন্য যে সময় লাগে তার 9192, 631770 গুণকে এক সেকেণ্ড বলে।

অ্যাম্পিয়ার—দুটি পরস্পর সমান্তরাল, নগণ্য প্রস্থচ্ছেদযুক্ত এবং অসীম দৈর্ঘ্যের পরিবাহীকে শূন্যস্থানে এক মিটার দূরে রেখে যে প্রবাহী তড়িৎ পাঠালে ওদের মধ্যে প্রতি একক দৈর্ঘ্যে 2×10^{-7} নিউটন বল অনুভব হয় সেই প্রবাহী তড়িৎকে এক অ্যাম্পিয়ার বলে।

কেলভিন—জলের ত্রিবিন্দুর তাপগতীয় তাপমাত্রার 1/273·16 ভাগকে কেলভিন ধরা হয়।

মোল—আন্তর্জাতিক এককে পদার্থের পরিমাণের একক। ·012 কিলোগ্রাম কার্বনের (C—12) মধ্যে যে পরিমাণ পরমাণু আছে সে সমস্ত মৌলিক একক যে পরিমাণ পদার্থের মধ্যে আছে তাকে মোল বলে। অণু, পরমাণু, আয়ন, ইলেকট্রন প্রভৃতি মৌলিক একক হতে পারে।

ক্যাণ্ডেলা—প্লাটিনামের হিমাঙ্কে, 101 325 নিউটন / বর্গমিটার চাপে, $\frac{1}{6\times10^5}$ বর্গমিটার প্রস্থচ্ছেদযুক্ত কোন কৃষ্ণবস্তু থেকে উলম্ব দিক বরাবর যে দীপন মাত্রার প্রাবল্য তাকে ক্যাণ্ডেলা হিসাবে ধরা হয়।

2 নং সারণীতে দুটি সম্পূরক এককের নাম ও চিহ্ন দেওয়া হলো।

2 নং সারণী

একক	নাম	চিহ্ন
সমতলীয় কোণ	রেডিয়ান	rad
ঘনকোণ	স্টেরেডিয়ান	sr

রেডিয়ান—যে কোন বৃত্তের কেন্দ্রে এর ব্যাসার্ধের সমান দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট বৃত্তচাপ যে কোণ উৎপন্ন করে তাকে রেডিয়ান বলে। 1 রেডিয়ান $= 57{\cdot}296^\circ$

স্টেরেডিয়ান—কোন গোলকের কেন্দ্রে এর ব্যাসার্ধের বর্গের সমান ক্ষেত্রফলকে আবদ্ধ করে যে ঘনকোণ, তাকে স্টেরেডিয়ান বলে।

প্রাথমিক একক এবং সম্পূরক একক দিয়ে গঠিত কতকগুলি প্রয়োজনীয় একক-এর নাম এবং চিহ্ন 3 নং সারণীতে দেওয়া হলো।

*রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম, বেলঘরিয়া, কলিকাতা-700056

3 নং সারণী

একক	নাম	চিহ্ন	একক	নাম	চিহ্ন
ক্ষেত্রফল	বর্গ মিটার	m^2	তড়িৎ আধান	কুলম্ব	C
আয়তন	ঘন মিটার	m^3	বিভব, বিভব বৈষম্য	ভোল্ট	V
ঘনত্ব	কিলোগ্রাম/ঘন মিটার	kg/m^3	তড়িৎক্ষেত্রের প্রাবল্য	ভোল্ট/মিটার	V/m
কম্পাঙ্ক	হার্জ	HZ	রোধ	ওহম্	Ω
বেগ	মিটার/সেকেণ্ড	m/S	পরিবাহিতা	সিমেন্‌স	℧
কৌণিক বেগ	রেডিয়ান/সেকেণ্ড	rad/S	ধারকত্ব	ফেরাড	F
ত্বরণ বা মন্দন	মিটার/বর্গ সেকেণ্ড	m/S^2	চৌম্বক ফ্লাক্স	ওয়েবার	ωb
কৌণিক ত্বরণ	রেডিয়ান/বর্গ সেকেণ্ড	rad/S^2	আবেশ	হেন্‌রি	H
বল	নিউটন	N	চৌম্বক ফ্লাক্সের ঘনত্ব	টেসলা	T ($\omega b/m^2$)
চাপ	প্যাসকেল	pa (N/m^2)	চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্য	অ্যাম্পিয়ার/মিটার	A/m
গতিশীল সান্দ্রতা	প্যাসকেল সেকেণ্ড	pa/S	দীপন মাত্রার ফ্লাক্স	লুমেন	lm
শুদ্ধগতি সান্দ্রতা	বর্গ মিটার/সেকেণ্ড	m^2/S	দীপনমাত্রার ফ্লাক্সের ঘনত্ব	লাক্স	l
পৃষ্ঠটান	নিউটন/মিটার	N/m	এনট্রপি	জুল/ডিগ্রী কেলভিন	J/°K
কার্য, শক্তি ও তাপ	জুল	J	আপেক্ষিক তাপ	জুল/কি. গ্রাম-কেলভিন	J/kgK
ক্ষমতা	ওয়াট	W	তাপ পরিবাহিতাঙ্ক	ওয়াট/মিটার কেলভিন	w/mK

একটু অন্য কথা

অবুঝ

1. বিখ্যাত বিজ্ঞানী মাক্স বোর্নের একান্ত ইচ্ছা ছিল পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ্ হওয়ার। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করে ইচ্ছানুযায়ী কাজও আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ অধ্যাপকের বিরাগ ভাজন হওয়ায় দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে তিনি ডেভিড হিলবার্টের কাছে আসেন তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যায় গবেষণার জন্য। হিলবার্ট বোর্নকে শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে মনে মনে অনিচ্ছুক ছিলেন। নিরুৎসাহ করার জন্য হিলবার্ট বোর্নকে এমন একটি প্রশ্নের সমাধান করতে দিলেন, যা খুবই জটিল এবং গণিতের উপর যথেষ্ট দখল ছাড়া যার সমাধান সম্ভব নয়। হিলবার্টের স্থির বিশ্বাস ছিল, যাঁর পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ্যার উপর ঝোঁক তার পক্ষে এ সমস্যার সমাধান করা একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু সমস্ত ধারাণকে ধূলিসাৎ করে অতি অল্প সময়ে এবং অভিনব সৌষ্ঠবে বোর্ন সমস্যাটির সমাধান করে দেন। হিলবার্ট আনন্দের সঙ্গে বোর্নকে শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করেন এবং গণিতীয় পদার্থবিদ্যার কাজ করতে উৎসাহিত করেন। ঘটনাচক্রে বোর্নের এই ইচ্ছার পরিবর্তন তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যায় শুধু যুগান্তর আনেনি বহু পদার্থবিদকে মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। বোর্ন-ই একমাত্র গাইড যাঁর সাতজন ছাত্র পাদার্থবিদ্যায় তত্ত্বীয় কাজের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

2. আধুনিক গণিতের তিন পঙ্ক্তিক্রৎ আর্কিমিডিস, নিউটন ও কার্ল ফেড্রিক গাউস্ (1777-1851)। গাউস্ বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত মেধাবী। গাউসের বাবা ছিলেন গরীব মালী। গাউস্ যখন খুবই ছোট তখনই বাবার হিসাবের গড়মিল ঠিক করে দিতেন। গণিতজ্ঞ গাউসের জ্যোতির্বিদ্যা ও পদার্থবিদ্যায় দান অনস্বীকার্য। চুম্বকীয় বিগালকের (magnetic flux) একক তাঁরই নামে চিহ্নিত। গাউসের এই অসামান্য প্রতিভার বিকাশের মূলে ছিল তাঁর একাগ্রতা। ফলে স্বাভাবিক সংসার সম্বন্ধে তিনি ছিলেন উদাসীন। তাঁর প্রথম স্ত্রী যখন মৃতপ্রায় (1809) তখন গাউসের এক বন্ধু তাঁকে খবরটি দিতে আসেন। গাউস্ তাকে বলেন—"আমি এখন কাজে বড়ই ব্যস্ত, ওনাকে একটু অপেক্ষা করতে বল।"

3. ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে রূপান্বিত অভিজাত মহিলাদের ধারণা ছিল বিস্‌মাথ কার্বনে পেস্ট মেখে স্নান করলে গায়ের রঙ খুব উজ্জ্বল হয়। একবার এক মহিলা ঐ পেস্ট মেখে ধারায় স্নান করে গুমড়ে কেঁদে ফেলেন। সারা শরীর কয়লার মত কালো হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি সাবান মেখে স্নান করতে তাঁর স্বাভাবিক রঙ ফিরে আসে। জলের ধারায় ছিল সালফাইড আয়ন। ঐ আয়ন বিসমাথের সঙ্গে বিক্রিয়া করে গঠিত হয়েছিল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বিসমাথ সালফাইড। আবার সাবান বিস্‌মাথ সালফাইড শোষণ করায় মহিলার কান্না থেমেছিল।

সী-ইউনিকর্নের রহস্য

হীরক দাস*

প্রাচীনকালে ইউরোপে 'সী-ইউনিকর্ন'দের (sea unicorn) নিয়ে নানান রূপকথা প্রচলিত ছিল। সী ইউনিকর্ন'দের মুখ ছিল নাকি ঠিক ঘোড়ার মুখের মত দেখতে আর মুখের আগে ছিল একটা প্যাঁচানো প্যাঁচানো লম্বা শিং। তাদের লেজ সিংহের লেজের মত। জাহাজের নাবিকেরা এই সব 'সী-ইউনিকর্ন'দের বেশী দেখেছে আর এই নাবিকদের একটি ধারণা ছিল যে এদের একটি নির্দিষ্ট রাজত্ব আছে এবং সেই জায়গাটুকুর মধ্যেই এরা সর্বদা ঘোরাফেরা করে, এর বাইরে কখনও যায় না।
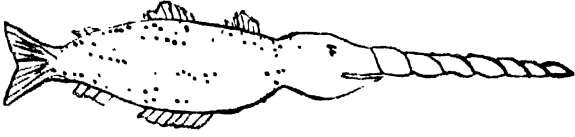
নারহোয়েল

এই 'সী-ইউনিকর্ন'দের শিং তখনকার দিনে আইভরি (ivory) বলে পরিচিত ছিল। এক একটি শিং-এর দাম ছিল হাতীর দাঁতের দামের চেয়েও বহুগুণ বেশী। সে সময় রাজা-বাদশারা এই শিংগুলোকে শুভ প্রতীক বলে মনে করতেন। রাজাদের তরবারির বাটে এই শিং ব্যবহৃত হতো। রাণী প্রথম এলিজাবেথের এরকম একটি শিং ছিল, তিনি তাঁর বিপুল ধনরাশির মধ্যে এই শিংকে অতি অমূল্য রত্ন বলে মনে করতেন। এই সব 'আইভরি' তখন গ্রীনল্যাণ্ডের ভাইকিং উপজাতিরা (viking tribes) ইউরোপে রফতানি করতো। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে ডাঃ ওয়ারমিয়াস (Dr. Wormius) নামে এক মৎস্যবিজ্ঞানী প্রথম প্রমাণ করে দেখালেন যে এই সব 'সী-ইউনিকর্ন' আসলে মেরু-সমুদ্রের শুশুক জাতীয় এক প্রকার জলজন্তু; নাম নারহোয়েল (narwhale), বৈজ্ঞানিক নাম মোনোডন মোনোসেরস্ (Monodon monoceros)। প্রাচীন মানুষেরা নার-হোয়েলের পরিচয় জানতো না বলে তারা এই সরল জলজন্তুটিকে এক অদ্ভুত, অপার্থিব প্রাণী ভাবতো। তাদের আরও ধারণা ছিল যে কোন জাহাজ যদি এদের এলাকার বা রাজত্বের মধ্যে প্রবেশ করে তবে এরা নাকি এদের শিং দিয়ে সেই জাহাজ করে ডুবিয়ে দেয়। কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে যে এই সব ঘটনা শুধুমাত্র রূপকথার গল্পতেই মানায় কারণ এরা শুশুকদের মত খুব সরল জীব।

নারহোয়েলরা সাধারণতঃ পাঁচ থেকে সাত মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়ের চোয়ালে দুটো করে দাঁত আছে। পুরুষদের বাঁদিকের গজদাঁতটি স্ক্রুয়ের মত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে সামনের দিকে বেড়ে যায়। এই দাঁত প্রায় দু থেকে তিন মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। এই দাঁতই 'সী-ইউনিকর্নের শিং নামে প্রাচীনকালে পরিচিত ছিল। একটি বয়স্ক নারহোয়েলের ওজন 20 থেকে 25 কিলোগ্রামের মত। গায়ের রং ফিকে নীল এবং শরীরের উপর বাদামী ছিট্ ছিট্ দাগও আছে। এদের খাদ্য হলো সামুদ্রিক ছোট মাছ, শামুক ইত্যাদি। সাধারণতঃ এরা প্রায় প্রতি ঋতুতে একটি করে বাচ্চার জন্ম দেয়।

আর সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো যে এরা শুধুমাত্র মেরু-সমুদ্রের 70 ডিগ্রি থেকে 84 ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশের হিমশীতল সাগরে ঘোরাফেরা করে। এই এলাকার বাইরে এদের খুব একটা দেখা মেলে না। অর্থাৎ বিউফোর্ট সাগরে, বাফিন ও হাডসন উপসাগরে এবং উত্তর সাইবেরিয়ার উপকূলবর্তী অঞ্চলে এদের বাস।

এরা সাধারণতঃ দল বেধে চলাফেরা করে। এক একটি দলে 6 থেকে 60টি পর্যন্ত নারহোয়েল দেখতে পাওয়া যায়। অনেক সময় এরা শুশুকদের মত চলন্ত জলযানের পিছু পিছু দল বেধে চলতে ভালবাসে।

তিমি, হাঙর প্রভৃতি এদের শত্রু, কিন্তু তার চেয়েও বড় শত্রু হচ্ছে মানুষ। এস্কিমোরা এদের হাজারে হাজারে নিধন করছে। ওরা এই জন্তুর চামড়ার নীচের চর্বি দিয়ে প্রদীপ জ্বালায়। এদের মাংস আর টুকরো টুকরো করে কাটা নারহোয়েলদের চামড়া খেতে এস্কিমোরা দারুণ ভালবাসে।

এই আশ্চর্য জন্তুটির সম্বন্ধে অনেক তথ্যই আজও অজানা রয়ে গেছে। কিন্তু নারহোয়েলদের সংখ্যা ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে কারণ ইদানিং প্রচুর সংখ্যায় এদের শিকার করা হচ্ছে। এভাবে শিকার চললে আর হয়তো কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই নারহোয়েল নামে এই আশ্চর্য জলজন্তুটি পৃথিবীর বুক থেকে লুপ্ত হয়ে যাবে।

*30/10, সেলিমপুর রোড, কলিকাতা-700031

হিমোডায়ালিসিস

মানস চক্রবর্তী*

আজ থেকে প্রায় 70 বছর আগে বাল্টিমোরের তিনজন বিজ্ঞানী প্রথম প্রাণীদেহে হিমোডায়ালিসিসের (haemodialysis) প্রয়োগ ঘটান। এর পর 1944 খৃস্টাব্দে হল্যাণ্ডের ডঃ ডবলু. জে. কল্ফ মানুষের দেহের উপর এর পরীক্ষা চালিয়ে সাফল্য লাভ করেন।

আমাদের দেহের পেটের ভিতর একটু পিঠের দিকে দুটি কিডনি আছে। এক একটি কিডনির আকৃতি প্রায় লম্বায় 10-12 সে.মি. এবং চওড়ায় 3-4 সে.মি. হয়। প্রত্যেকটি কিডনি অসংখ্য নেফ্রনের দ্বারা গঠিত। নেফ্রনের দ্বারাই কিডনির সকল কার্য পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। মানুষের দেহের অতিরিক্ত জলীয় ও বর্জ্য পদার্থ রক্ত থেকে শোষণ করে মূত্রের সাহায্যে দেহের বাইরে বের করে দেওয়াই কিডনির অন্যতম প্রধান কাজ। কোন কারণে যদি কিডনি তার স্বাভাবিক কার্য ক্ষমতা হারায় তাহলে দেহ জলীয় ও দূষিত পদার্থে ক্রমাগত পূর্ণ হয়ে উঠতে থাকবে এবং বিভিন্ন রকম রোগের উপসর্গ দেখা দেবে। বিভিন্ন কারণে কিডনির কার্য ক্ষমতা লোপ পেতে পারে, যেমন—রক্তের উচ্চ চাপ, রক্তে শর্করার উচ্চ মাত্রা, রক্তে ইউরিয়ার উচ্চমাত্রা ইত্যাদি অসুখ।

যখন মানুষের দেহের দুটি কিডনিই তার স্বাভাবিক কার্য ক্ষমতা হারায় তখন কৃত্রিম কিডনির সাহায্যে রক্তের দূষিত ও জলীয় পদার্থ বের করে রক্তকে পরিস্রুত করাকেই হিমোডায়ালিসিস বলে। যে সমস্ত রোগীর দুটি কিডনির স্বাভাবিক কার্য ক্ষমতা একেবারে লোপ পায় সেই সব রোগীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য হিমোডায়ালিসিসের প্রয়োজন হয়।

হিমোডায়ালিসিসের সময় রোগীর দেহ থেকে (হাত অথবা পা) একটি সরু নলের সাহায্যে দেহের রক্ত বের করে এনে কৃত্রিম কিডনির মধ্যে দিয়ে পরিচালিত করানো হয়। কৃত্রিম কিডনির ভিতর রক্ত পরিস্রুত হয়ে অপর একটি সরু নলের সাহায্যে রোগীর দেহের ভিতর ফিরে যায়। এই সমগ্র পদ্ধতিটি একটি মেশিনের দ্বারা পরিচালিত হয়। এক একটি ডায়ালিসিস সম্পূর্ণ হতে সাধারণতঃ পাঁচ থেকে ছয় ঘণ্টা সময় লাগে। এই ধরনের রোগীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখতে প্রতি সপ্তাহে দুই থেকে তিনটি ডায়ালিসিসের প্রয়োজন হয়।

হিমোডায়ালিসিস খুবই ব্যয়বহুল চিকিৎসা। আমাদের মত গরীব দেশের সাধারণ মানুষের পক্ষে এর ব্যয় বহন করা খুবই কষ্টসাধ্য। সরকারী চিকিৎসালয়ে এই ধরনের চিকিৎসার কোন সুব্যবস্থা নেই। এ কারণে অনেক গরীব রোগীকে বিনা চিকিৎসায় মারা যেতে হয়। এই ব্যাপারে সরকারী উদ্যোগ অনেক মূল্যবান প্রাণ বাঁচাতে পারে।

*বেলভিউ ক্লিনিক, ডায়ালিসিস ইউনিট, কলিকাতা

জনপ্রিয় বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে একটি জনপ্রিয় বৈজ্ঞানিক বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

বক্তা : ডাঃ শ্যামাপদ রায়চৌধুরী

বিষয় : চক্ষুদান কি এবং কেন ?

স্থান : 'সত্যেন্দ্র ভবন', পি-23 রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006

সময় : বিকাল 5টা

তারিখ : 3রা মার্চ, 1983

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

সলিড-স্টেট ওয়াটার লেভেল অ্যালার্ম

অভিজিৎ সান্যাল*

আলোচ্য প্রবন্ধে বাঁধ বা ব্যারাজের জলের বিপদসীমা অতিক্রমণের সংকেত দেওয়ার জন্যে একটি যন্ত্রের আলোচনা করা হয়েছে। যন্ত্রটির বিশেষত্ব এখানেই। এটি কেবলমাত্র বিপদ সংকেতই দেয় না; জল নিষ্কাশণের ব্যবস্থাগুলি ঠিকমত কাজ করছে কি না এবং করলেও তা নিরাপত্তার পক্ষে যথেষ্ট কি না, তাও বোঝা যায় এটি থেকে। সম্পূর্ণ সলিড-স্টেট হওয়ায় যন্ত্রটি যথেষ্ট ছোট ও নির্ভরযোগ্য।

প্রবন্ধের শুরুতে যন্ত্রটির নাম দেখেই তার কাজ সম্বন্ধে খানিকটা আন্দাজ করা যায়। কোন বাঁধ বা ব্যারাজে জলতল যাতে নির্দিষ্ট বিপদসীমা অতিক্রম না করে, মুখ্যতঃ সেই উদ্দেশ্যেই যন্ত্রটি নির্মিত। প্রত্যেক বাঁধ বা ব্যারাজের জলাধারের একটা নির্দিষ্ট ধারণক্ষমতা আছে। তা পেরিয়ে গেলে বাঁধের 'গেট' খুলে অতিরিক্ত জল বার করে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। এর জন্যে ক্রমাগত নজর রাখতে হয়, বাঁধের জলতল বিপদসীমা অতিক্রম করছে কি না। যন্ত্রটি এই কাজের জন্যই নির্মিত।

চিত্রে যন্ত্রটির বর্তনী চিত্র (circuit diagram) দেখে এর গঠন সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করা সম্ভব। বর্তনীটির তিনটি অংশ যেমন—

1. জলতল সুবেদী বর্তনী অংশ (water level sensing circuit)
2. ট্রিগার বর্তনীসহ সংকেত উৎপাদক বর্তনী অংশ (trigger circuit with alarm)
3. বিদ্যুৎ-সরবরাহ (power supply)

সলিড স্টেট ওয়াটার লেভেল অ্যালার্ম

আলোচ্য যন্ত্রটি দ্বারা জলের বিপদসীমা অতিক্রমণের দুটি সংকেত পাওয়া যাবে। প্রথমটি কেবল দৃশ্য (visual), দ্বিতীয়টি দৃশ্য-শ্রাব্য (audio-visual) এমনকি, অতিরিক্ত জল বের করে দেওয়ার ব্যবস্থাটি তা স্বয়ংক্রিয় হোক বা মনুষ্যচালিত হোক, ঠিকমত কাজ করছে কি না, করলেও নিরাপত্তার পক্ষে তা যথেষ্ট কিনা, তাও জানা যাবে যন্ত্রটি থেকে। যন্ত্রটির সব থেকে বড় সুবিধা হলো, ঘরে বসেই জলতলের অবস্থার একটা সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়, বার বার জলতলের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয় না।

যন্ত্রটি 15 ভোল্ট সমপ্রবাহ বিদ্যুতে (D. C.) চলে। ব্যবহারকারীর ইচ্ছামত এই অংশটির পরিবর্তন করা সম্ভব। এখানে ব্যাটারী ব্যবহারও করা যায়, আবার একটি BY 125 ডায়োড ও উপযুক্ত মানের ধারক (capacitor) ব্যবহার করে মূল এ. সি. (A. C. Mains) লাইন থেকেও কেউ প্রয়োজন মত সমপ্রবাহ সৃষ্টি করতে পারেন। প্রয়োগকারীর নিজস্ব সুযোগ-সুবিধার দ্বারা এটি নিয়ন্ত্রিত হবে।

চিত্রে P_1P_2 এবং N_1N_2 হচ্ছে পরস্পরের কাছাকাছি রাখা দু-জোড়া অ্যালুমিনিয়ামের পাত। P_1P_2 পাত দুটি

*কো: নং 3/M-3, ইউনিট-4 ওল্ড সেটেলমেন্ট, পো: খড়্গপুর: মেদিনীপুর

পরস্পরের মুখোমুখি এবং N_1N_2 পাত দুটিও পরস্পরের মুখোমুখি থাকে। N_1N_2 পাতজোড়া লাগানো হবে বিপদ সীমায় এবং P_1P_2 জোড়া লাগান হবে তার একটু নীচে।

এবার ধরা যাক, জলতল একটি নির্দিষ্ট হারে বাড়ছে। প্রথমে জল স্পর্শ করবে P_1P_2 পাতজোড়াকে। নদীর জল সামান্য বিদ্যুৎ পরিবাহী, কাজেই পাতদুটির মধ্যে সামান্য বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে। এর মান $200\mu A$ (200 মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার)-এর থেকে বেশী হলেই, R_1 রোধটিতে বিভব-পতন (voltage drop) 2 ভোল্টের বেশী হবে। এর ফলে T_1 ট্রানজিস্টরটি পরিবাহী হয়ে D_1 আলোকনিঃসারী ডায়োড (LED—Light Emitting Diode) টিকে কর্মক্ষম করবে। এর লাল আলোটি নিয়ন্ত্রণ বোর্ডে (control board) প্রথম বিপদ সংকেত রূপে গণ্য হবে।

জলতল কিন্তু ক্রমাগত বাড়ছে, ফলে কিছু পরেই N_1N_2 পাতজোড়াকেও জল স্পর্শ করবে। ফলে T_2 ট্রানজিস্টরটি পরিবাহী হয়ে D_2 LED-টিকে কর্মক্ষম করবে। কিন্তু T_2 ট্রানজিস্টরটির নিঃসরক (emitter) যুক্ত হয়েছে T_3 ট্রানজিস্টর-টির ভূমির (base) সঙ্গে। ফলে এটিও পরিবাহী হয়ে উঠে M সিলিকন কণ্ট্রোলড রেক্টিফায়ার (Silllcon Controlled Rectifier—SCR)-টির গেট-প্রবাহকে প্রবাহিত করবে। এই গেট-ক্যাথোড প্রবাহই কর্মক্ষম করে তোলে ট্রিগার বর্তনী (trigger circuit)-টিকে, এবং SCR-টি পরিবাহী হয়ে ওঠে। লাউডস্পীকারে শ্রুতি-সংকেতের (audio alarm) ফলে শোনা যাবে। D_2 LED-র লাল আলো ও লাউডস্পীকারের বিপদ-সংকেতকে নিয়ন্ত্রণ বোর্ডে (control board) দ্বিতীয় বিপদসংকেত বলে গণ্য করা হবে।

এখন দ্বিতীয় বিপদ সংকেত পাওয়ার অর্থই হলো, জলতল বিপদসীমা অতিক্রম করেছে। কাজেই জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা-গুলিও সঙ্গে সঙ্গে চালু হয়ে যাবে। এখন জলতল বৃদ্ধির হার যদি জল নিষ্কাশনের হারের থেকে কম হয়, তাহলে জলতল নামতে থাকবে, এবং প্রথমে D_2 ও পরে D_1 LFD গুলি নিভে যাবে। কিন্তু যদি তা না হয়, অর্থাৎ জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা যদি নিরাপত্তার পক্ষে যথেষ্ট না হয়, তাহলে LED গুলি জ্বলতেই থাকবে। কাজেই, একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরেও যদি LED গুলি না নেভে, তাহলে জল নিষ্কাশনের আরো ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। বাঁধের গেটগুলি তখন আরো বেশী খুলে দিতে হবে।

আবার, যতক্ষণ D_2 LED জ্বলছে, ততক্ষণ স্পীকারে শ্রুতি সংকেত তো বাজবেই, জলতল নেমে গেলেও ওটি বেজেই যাবে। কেন না, আমরা জানি, পরিবাহী SCR-এর উপর গেটের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। যতক্ষণ না, S_1 সুইচটি টিপে বর্তনী-ছিন্ন না করা হচ্ছে, ততক্ষণ ওটি বেজেই যাবে। আবার জলতল N_1N_2 পাত স্পর্শ করে থাকাকালীন, S_1 সুইচ টিপেও বিপদ সংকেত বন্ধ করা যাবে না। কাজেই, বিপদসংকেত যে কারো চোখ এড়িয়ে যাবে, তার কোন উপায় এখানে নেই।

অতএব, যন্ত্রটি থেকে বিপদসংকেত পাওয়া এবং জলতলের অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা, দুই হতে পারে। S_1 সুইচটি সাধারণ অবস্থায় 'on' থাকে, টিপে এক মুহূর্তের জন্যে ওটিকে 'off' করা যায়। অ্যালুমিনিয়াম পাতগুলির আকৃতি ও দূরত্ব এমন হওয়া উচিত, যাতে ওদের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ 200 মাইক্রো-অ্যাম্পিয়ার $(200\mu A)$ থেকে বেশী হয়। তাহলেই যন্ত্রটি কর্মক্ষম হবে।

প্রবন্ধটিতে যন্ত্রটির ব্যবহার, গঠনশৈলী ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো। বিভিন্ন রকম পরিবেশে, প্রয়োগশৈলীর একটু পরিবর্তন করে সাফল্যের সঙ্গে এটি ব্যবহৃত হতে পারে। যন্ত্রটিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ইলেকট্রনিক অংশগুলি (components) বর্তনীচিত্রে উল্লেখিত হয়েছে। এটির দ্বারা একই সঙ্গে বেশ কয়েকটি কাজ সম্পন্ন হয়। কাজেই বিভিন্ন বাঁধ বা ব্যারাজে ব্যবহারের পক্ষে এটি আদর্শ।

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন

1) বৈদ্যুতিক বাতিকে কেন বায়ুনিরুদ্ধ ও বায়ুশূন্য ভাবে তৈরি করা হয়?

2) বাংলাদেশে প্রথম ছাপাখানা কোথায় স্থাপিত হয়?

সুব্রত দাস
কলিকাতা-64

উত্তর :

1) বৈদ্যুতিক বাতি বায়ুনিরুদ্ধ করে তৈরি করা হয়। এই বাতিগুলি দুই প্রকারের হয়—(a) বায়ুশূন্য বাতি এবং (b) গ্যাসপূর্ণ বাতি, যাতে আর্গন, হিলিয়াম প্রভৃতি কোন একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস থাকে। সব ক্ষেত্রেই বাতিগুলি সম্পূর্ণরূপে বায়ুমুক্ত থাকে, কারণ তা না হলে বাতির মধ্যে উত্তপ্ত ফিলামেণ্ট বায়ুর ক্রিয়ায় জারিত হয়ে যাবে।

2) হুগলীতে, মনোহর দাস ও পঞ্চানন কর্মকারের সহায়তায় উইলকিন্স নামে একব্যক্তি এই ছাপাখানাটি স্থাপন করেন। 1800 খৃস্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

[প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছেন বিদ্যুৎকুমার মেন্দা]

শব্দ-

মলয় শীল*

সঙ্কেত

উপর থেকে নীচে।

1. পরমাণুর কেন্দ্রস্থল
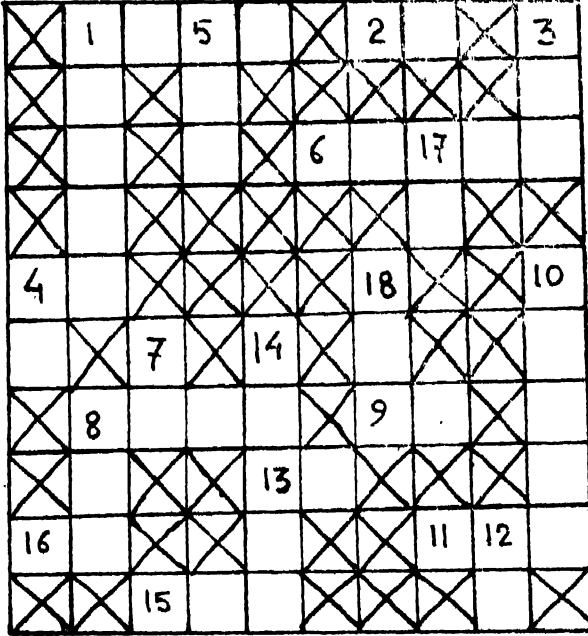
3. হৃৎপিণ্ডের স্বতঃস্ফূর্ত সংকোচন
4. টেলিগ্রাফ যন্ত্রের আবিষ্কারক
5. একপ্রকার চলন পদ্ধতি
7. খনি নিরাপত্তা বাতি আবিষ্কারক
8. C. G. S. পদ্ধতিতে ক্ষমতার ব্যবহারিক একক
10. জলাতঙ্ক রোগের সিরাম আবিষ্কারক
12. এক প্রকার শক্তি
14. ডি. ডি. টি-এর আবিষ্কারক
17. মস্তিষ্ক
18. বেতার-যন্ত্রের আবিষ্কারক

পাশাপাশি

1. পরমাণুর কেন্দ্রস্থ তড়িৎ-নিরপেক্ষ কণা
2. দেহস্থিত যে সকল রক্তনালী অশুদ্ধ রক্ত বহন করে
4. যে সকল অপুষ্পক উদ্ভিদের দেহে পাতা ও কাণ্ড থাকে কিন্তু মূল থাকে না
6. অন্ধদের পড়ার পদ্ধতির আবিষ্কারক
8. উদ্ভিদের স্ত্রীজননতন্ত্রে অবস্থিত ডিম্বকের অপর নাম
9. দুই অক্ষরে নাম, একপ্রকার ভেষজ উদ্ভিদ
11. রেডিও
13. গাছের যে অংশটি মাটির নীচে থাকে
15. বসন্তের টিকা আবিষ্কারক
16. দীপনমাত্রার বড় একক।

সমাধান পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে]

*119, জপুর রোড, কলিকাতা-700074

আবেদন

জ্ঞান ও বিজ্ঞানে প্রকাশের জন্য জনসাধারণ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে সহজবোধ্য ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠাবার জন্য বিজ্ঞান লেখকদের নিকট আবেদন করা যাচ্ছে। প্রবন্ধ ফুলস্ক্যাপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লিখে এবং সঙ্গে চিত্র থাকলে তা পৃথক কাগজে চীনা কালিতে এঁকে পাঠাতে হবে। সম্পাদকমণ্ডলী কর্তৃক উপযুক্ত বিবেচিত হলে যথাসময়ে তা "জ্ঞান ও বিজ্ঞানে প্রকাশিত হবে।

'সত্যেন্দ্র ভবন'
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা-700 006

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
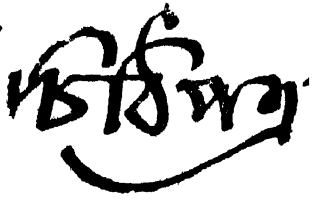
বিস্মৃতপ্রায় বাংলায় বিজ্ঞান লেখক

শারদীয় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান '82' পত্রিকায় হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত প্রবন্ধ "বিস্মৃতপ্রায় বাংলায় বিজ্ঞান লেখক" (পৃঃ 292 1982) এই মূল্যবান রচনাটিতে একটি বিশিষ্ট বাংলা বিজ্ঞান গ্রন্থের ও গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ না থাকায় আপনার অবগতির জন্য তা জানাতে বাধ্য হলাম। বাংলা তথা ভারতের কৃষি বিজ্ঞানে পথিকৃৎ প্রখ্যাত কৃষিবিজ্ঞানী প্রয়াত রাজেশ্বর দাশগুপ্ত (1878-1926) বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম রচনা করেন বিজ্ঞানভিত্তিক গ্রন্থ 'কৃষিবিজ্ঞান'। এটি দুই খণ্ডে প্রথম প্রকাশিত হয় 1926-1953 খৃস্টাব্দে এবং পর পর কয়েকটি সংস্করণও হয়। প্রকাশক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা বিভাগ। গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডে 'কৃষির মূলনীতি'তে আছে উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক বিস্তৃত আলোচনা। এ ছাড়া ভূমিতে সার প্রয়োগ, শস্যাবর্তন, শস্যোৎপাদিকা-শক্তি, ভূমিকর্ষণ, জলসেচন, বীজ পরীক্ষা ও রক্ষা, আগাছা ইত্যাদি বহু মূল্যবান তত্ত্ব ও তথ্য। দ্বিতীয় খণ্ডে 'ফসল, সব্জী ও ফল', এতে আছে ডাইল, ধান্যাদি, তৈল, ভেষজ ও মাদক, মসলা, পশুখাদ্য প্রভৃতি জাতীয় ও তন্তুপ্রদ, কন্দ, শর্করা পতঙ্গ প্রসূত ফসল; গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীতকালীন ও বিলেতি সব্জী, নানাপ্রকার দেশী ও বিদেশী ফল এবং কৃষিবচন ইত্যাদি বিষয়ে বহু অমূল্য আলোচনা ও তথ্য। সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত গ্রন্থটির প্রধান সম্পদ হলো বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক পরিভাষা সৃষ্টি। "কৃষিবিজ্ঞান" 2য় খণ্ডে প্রত্যেকটি ফসল, সব্জী ও ফলের আয়ুর্বেদীয় গুণাগুণ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা আছে।

বিকাশ মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা-25

পরিষদ সংবাদ

1লা জানুয়ারী '83 সকাল 10টায় 'সত্যেন্দ্র ভবনে' বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর 89তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়। পরিষদের সভাপতি ডক্টর সূর্যেন্দু বিকাশ করমহাপাত্র অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। প্রারম্ভে পরিষদের কর্মসচিব ডক্টর সুকুমার গুপ্ত আচার্য বসুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন—ডাঃ গুণধর বর্মণ, ডক্টর রতনমোহন খাঁ এবং যুগলকান্তি রায়। সভা শেষ হবার পর আচার্য বসুর বাসভবনে গিয়ে পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্য দান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন—ডঃ সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র।

* * *

25শে জানুয়ারী '83 'সত্যেন্দ্র ভবনে' বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের 35তম প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উদযাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি ডঃ জয়ন্ত বসু। উক্ত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বক্তা বিজ্ঞান পরিষদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ যাতে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করা যায় তার জন্য সচেষ্ট হতে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতি আবেদন জানান। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন যুগলকান্তি রায়, শিবচন্দ্র ঘোষ, বিষ্ণু মুখোপাধ্যায় ও মিহিরকুমার ভট্টাচার্য।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006 থেকে প্রকাশিত
এবং গুপ্তপ্রেস, 37/7, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-700 009 হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বিজ্ঞান পরিষদের আদর্শ অনুযায়ী জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার মত সমাজের কল্যাণমূলক বিষয়বস্তু সহজবোধ্য ভাষায় সুলিখিত হওয়া প্রয়োজন।
2. মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এবং পূর্ণ ঠিকানাসহ লেখকের পরিচিতি পৃথক কাগজে অবশ্যই লিখে দিতে হবে।
3. চলিত ভাষা এবং চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহৃত হবে। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্র্যাকেটে ইংরাজী শব্দটিও দিতে হবে। আন্তর্জাতিক সংখ্যা এবং মেট্রিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে।
4. মোটামুটি 3000 শব্দের মধ্যে রচনা সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়।
5. বিভিন্ন ফীচার, সমকালীন বিজ্ঞান গবেষণা ও প্রযুক্তিবিদ্যার সংবাদ এবং বিজ্ঞান-বিষয়ক সুন্দর আকর্ষণীয় ফটোগ্রাফীও গ্রহণীয়।
6. রচনার সঙ্গে চিত্র থাকলে আর্ট পেপারে চাইনিজ কালিতে সুঅঙ্কিত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন।
7. প্রত্যেক চিত্র প্রস্থে 8 সে. মি. কিংবা এর গুনিতকের (16 সে.মি. 24 সে.মি) মাপে অঙ্কিত হওয়া প্রয়োজন।
8. অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব বজায় রেখে পরিবর্তন পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে।
9. প্রত্যেক প্রবন্ধ/ফীচার-এর শেষে সঠিক গ্রন্থপঞ্জী থাকা বাঞ্ছনীয়।
10. জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পুস্তক সমালোচনার জন্য দুই কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।
11. ফুলস্ক্যাপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় যথেষ্ট মার্জিন এবং প্রতি লাইনের পর বেশ কিছুটা ফাঁক রেখে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে প্রবন্ধ লিখতে হবে।
12. প্রতি প্রবন্ধের শুরুতে পৃথকভাবে প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া আবশ্যিক।

সম্পাদনা সচিব

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

আবেদন

1948 সাল থেকে আচার্য্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা বিষয়ে পরিকল্পিত ধ্যান ধারণা পরিষদ পালন করে আসছে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রকাশনের মাধ্যমে। ইতিমধ্যে পরিষদ কিছু অমূল্য রচনা বাংলাভাষায় প্রকাশ করেছে। বর্তমানে পত্রিকা প্রকাশনা ছাড়াও পরিষদ বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতার বিকাশ ঘটে। গ্রাম বাংলার পল্লীতে, আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে ও শহরের বস্তিতে, যেখানে বেশীর ভাগ মানুষ জ্ঞানের আলো থেকে এখনও বঞ্চিত, তাদের কাছে বিজ্ঞানের মঙ্গলময় রূপ তুলে ধরতে পরিষদ বদ্ধপরিকর। এইসব বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মসূচীর রূপায়ণে অর্থের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অথচ পরিষদের দারুণ অর্থাভাব। তাই পরিষদ সরকার, বেসরকারী সংস্থা, ব্যবসায়ী ও সহৃদয় ব্যক্তির কাছে অর্থসাহায্যের আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছে। সাধারণ মানুষের জন্য তৈরী আচার্য বসুর পরিষদ যে কোনও সামান্য দানও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করে অবহেলিত মানুষের স্বার্থে ব্যয় করবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে পরিষদে প্রদত্ত সর্বপ্রকার দান আয়করমুক্ত।

কর্মসূচী

1. সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা সৃষ্টি করা এবং বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তোলা।
2. 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকাকে সাধারণের নিকট আরও আকর্ষণীয় করে তোলা।
3. পরিষদের মাধ্যমে গ্রামবাংলার বিজ্ঞান ক্লাবগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা এবং তাদের বিজ্ঞান ভিত্তিক জনহিতকর কাজে উৎসাহিত করা।
4. প্রতি বছরে পশ্চিম বাংলায় অন্ততঃ একবার বিজ্ঞান সম্মেলনের ব্যবস্থা করা।
5. গ্রামবাংলার বিভিন্ন মেলায় বিজ্ঞান ক্লাবগুলিকে নিয়ে পোষ্টার প্রদর্শনী, বিজ্ঞান ভিত্তিক সিনেমা, আলোচনাচক্র অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞান, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করা।
6. বছরের শেষে বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা।
7. হাতে-কলমে কারীগরী বিদ্যা শিখিয়ে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রী ও নাগরিকদের স্বনির্ভরশীল করা। ব্যয়ভার বহনের জন্য সামান্য অর্থের বিনিময়ে টি. ভি টেপরেকর্ডার, রেকর্ড-প্লেয়ার, ট্রানজিস্টার এমারজেন্সি বৈদ্যুতিক আলো, ফটোগ্রাফী বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া।
8. মাটি পরীক্ষার কাজে শিক্ষা দিয়ে গ্রামের বিজ্ঞান ক্লাবগুলিকে সাধারণ চাষীদের সাহায্য করতে উৎসাহিত করা।
9. সাধারণ মানুষের জন্য বিজ্ঞান প্রবন্ধ থেকে মৌলিক গবেষণাপত্র পর্যন্ত বাংলা ভাষায় প্রকাশ এবং জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বই ও বিজ্ঞানসাধক চরিতমালা প্রকাশ।
10. যোগব্যায়াম ও তার গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন।
11. পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারটিকে সুসমৃদ্ধ করে গড়ে তোলা।
12. পরিষদ ভবনে 'বিজ্ঞান সংগ্রহশালা' স্থাপন করা।
13. নির্বিচারে যথেচ্ছ গাছপালা ও বনজঙ্গল ধ্বংসের ফলে পরিবেষ দূষণ ও আবহাওয়ার মারাত্মক পরিবর্তনের ভয়াবহতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সজাগ করা।
14. নির্বিচারে বন্যপ্রাণী ধ্বংসের দরুণ বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যের বিঘ্ন ঘটার বিপদ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা।
15. যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করা।
16. শহর ও গ্রামের প্রতিটি স্কুল, কলেজ ও গ্রন্থাগারে পরিষদের মুখপত্র জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার গ্রাহকীকরণের মাধ্যমে পরিষদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচার।

সুকুমার গুপ্ত
কর্মসচিব

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ফেব্রুয়ারী, 1983
৩৬তম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা

বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের অনুশীলন করে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও সমাজকে বিজ্ঞান-সচেতন করা এবং সমাজের কল্যাণকল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করা পরিষদের উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন লেখকদের স্বাধীন মতামত বা মৌলিক সিদ্ধান্তসমূহ পরিষদের বা সম্পাদকমণ্ডলীর চিন্তার প্রতিফলন হিসাবে সাধারণত বিবেচ্য নয়।

বিষয় সূচী

প্রচ্ছদ—এতে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বাতাসের চরম বেগ দেখান হয়েছে।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : 30·00 টাকা

প্রতি সংখ্যা : 2·50 টাকা

যোগাযোগের ঠিকানা :

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা-700006
ফোন : 55-0660

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষট্‌ত্রিংশত্তম বর্ষ | ফেব্রুয়ারী, 1983 | দ্বিতীয় সংখ্যা

পরিবেশ ও মানুষ

সুকুমার গুপ্ত*

দেশের মানুষের বসতি হচ্ছে শহরে, আধা-শহরে বা গ্রামে। শহর ও গ্রামের পরিবেশ দূষণের কারণগুলি ঠিক একই নয়। শহরে অত্যধিক লোকসংখ্যার চাপ, অগণিত কারখানা থেকে নির্গত বিষাক্ত ধোঁয়া, রাসায়নিক কারখানা থেকে নির্গত বিষাক্ত গ্যাস ও তরল পদার্থ, পেট্রোল ও ডিজেল চালিত যানের সংখ্যাধিক্য, উন্মুক্ত স্থানের অভাব রাস্তার দু-ধারের ছোট-বড় গাছ কেটে রাস্তার প্রশস্ততা বৃদ্ধি, পৌরসংস্থার কর্মীদের কর্ম-নিষ্ঠার এবং মানুষের মধ্যে নাগরিক সচেতনতাবোধের অভাব শহরের পরিবেশকে দূষিত করছে।

দেশভাগের পর অগণিত মানুষের মিছিল শহর ও গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে। জীবনানন্দের রূপসী বাংলার রূপ আজ হারিয়ে গেছে। দোয়েল, শ্যামা বা কোকিলের গান আজ প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। গাংচিল, ফিঙ্গে বা মাছরাঙা ইত্যাদি পাখীদের আনা-গোনা আজ আর প্রায় দেখা যায় না। রাতে বিভিন্ন বন্য প্রাণীর এমনকি শেয়ালের ডাকও আজ অল্পই শোনা যায়। গ্রামে প্রকৃতির শ্যামলিমা আজ প্রায় অবলুপ্ত। প্রকৃতিতে ভারসাম্য রক্ষা হচ্ছে না। এই সর্বনাশা অশনি-সংকেত মানুষ কিন্তু আজও দেখতে পাচ্ছে না। মানুষ যদি এখনও সচেতন না হয়—ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের শত সহস্র অগ্রগতিও কিন্তু মানুষের অস্তিত্বকে রক্ষা করতে অক্ষম হবে।

আজ বিজ্ঞানীরা শঙ্কিত। তাঁরা বলে চলেছেন বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাচ্ছে, কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাপমাত্রা ঊর্ধ্বগামী হচ্ছে, যথেচ্ছ উদ্ভিদ নির্মূলের ফলে বৃষ্টিপাত কমে যাচ্ছে, বাতাসে অম্লতা বেড়ে যাচ্ছে। কোন নিয়ম না মেনে কলকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জল ও বাতাস দূষিত হচ্ছে।

এই পরিবেশ দূষণের মূলে রয়েছে সামাজিক অব্যবস্থা। একই কারণে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুশিক্ষা বা অপশিক্ষা ও বেকারত্ব বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রাকৃতিক ও সামাজিক আবহাওয়ার দূষণের মূল কারণ কিন্তু দারিদ্র্য ও অশিক্ষা।

এই প্রতিবেদনে গ্রামের পরিবেশ দূষণ ও তার উন্নয়নের বিভিন্ন দিকের সম্ভাবনা আলোচনা করা হয়েছে। মাটিকে অস্বীকার করে যেমন উদ্ভিদ বাঁচতে পারে না, তেমনই মানুষও সমাজকে অস্বীকার করতে পারে না। সমাজের উন্নয়নই মানুষের দেহ ও মনের উন্নতি ঘটায়। তাই প্রশাসনের সাহায্যে পরিবেশের উন্নতি ঘটানো যেতে পারে।

দেশ বিভাগের আগে লোকসংখ্যা ছিল কম। তখন গ্রামে অনাবাদী জমিই ছিল বেশী। তাই বনজঙ্গলের পরিমাণও ছিল বেশী। গবাদিপশুর বিচরণক্ষেত্র ছিল অঢেল। দীঘি, খাল, বিল বা পুকুরের সংখ্যা অনেক চোখে পড়ত। কিন্তু আজ জনবসতি বাড়ার সঙ্গে জমির উপর জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ফলে বনজঙ্গল কেটে ও খাল, বিল, পুকুর ভরাট করে বসতি স্থাপন করছে নয়ত অধিক ফসলের অভিযানে অনাবাদী জমিকে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করছে। ফসলের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য রাসায়নিক সারের উপর নির্ভরশীল হচ্ছে। বনজঙ্গলের অভাবে বন্য প্রাণীকুল ধ্বংস হচ্ছে আর যে কটা অবশিষ্ট ছিল তারাও জলের অভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে। কীটনাশক ওষুধের যথেচ্ছ প্রয়োগের ফলে কীট-পতঙ্গ বা পাখী এর সংস্পর্শে এসে ধ্বংস হচ্ছে বা তাদের প্রজনন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে। বিচরণক্ষেত্রের অভাবে মানুষ আর আজকাল গবাদপশু পালন করছে না। ফলে গ্রামে দুধ ও প্রাকৃতিক সারের অভাব ঘটছে। তাই আজ আমাদের মন থেকে গ্রামের ছবি হারিয়ে যাচ্ছে। উন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল দেশের মত ভবিষ্যতে হয়তো

* বঙ্গবাসী সান্ধ্য কলেজ কলিকাতা

উন্নত শহর ও উন্নয়নশীল শহর এই দুটি কথা ভাষায় প্রকাশ পাবে। গ্রাম শব্দটিকে হয়তো ইতিহাসের পাতায় টিকে থাকবে।

আদর্শ স্বনির্ভরশীল গ্রাম রচনা করার ব্যাপারে পঞ্চায়েতকে প্রশাসনের সাহায্যে কতকগুলি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে আহ্বান জানানো হচ্ছে—

1) পঞ্চায়েতের এলাকাভুক্ত সমস্ত জমি আবাদী না করে বেশ কিছু অনাবাদী জমি রাখা আবশ্যক। দশভাগের একভাগ জমি অন্তত এর জন্য ব্যবহৃত হবে—এখানে গাছ রোপণ করে জঙ্গলের আকার দেওয়া চলতে পারে। এখানেই থাকবে গবাদিপশুর বিচরণক্ষেত্র। এখানে ঘাস ও গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ যাতে জন্মাতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এতে গ্রামে উদ্ভিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে আর সাধারণ মানুষ গবাদিপশু পালনের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হবে। গ্রামে দুধ ও প্রাকৃতিক সারের অভাব কমতে থাকবে।

2) গ্রামে যে সব খাল, বিল বা জলাশয় মজে গেছে বা মজে যেতে বসেছে, সেগুলোকে অনতিবিলম্বে সংস্কার করা প্রয়োজন। এতে মাছ, জলজ প্রাণীর চাষ করা যেতে পারে। যেসব গ্রামে জলাশয় একেবারেই নেই, সেখানে বড় আকারের জলাশয় কাটানো দরকার। এই জলাশয়গুলির ধারে আবহাওয়া অনুযায়ী বিভিন্ন ফলের গাছ লাগানো যেতে পারে এবং এরই কাছাকাছি হাঁস-মুরগীর চাষ করলে ভাল হয়। এতে গ্রামে মাছ, মাংস, ডিম ও ফলের চাহিদা মিটবে।

3) গ্রামের মধ্যে ইঁটখোলার কাজ এখনই বন্ধ করা দরকার। কোনভাবেই এই ধরণের কাজ গ্রামের মধ্যে হতে দেওয়া উচিত নয়। কারণ এতে বায়ুদূষণ ভীষণভাবে বেড়ে যায়। দেখা গেছে, ইঁটখোলার কাছাকাছি কোন গাছে ফল ধরে না বা ধরলেও নষ্ট হয়ে যায়। আবার ইঁট তৈরির কাজ শেষ হয়ে গেলেও সেই জমিতে 50 60 বছরের আগে আর কোন শস্য হয় না। নদীর ধারে ইটখোলা তৈরি করা যেতে পারে এবং সেটাই হওয়া উচিত। ইঁটখোলা উঠে গেলে এখানকার জমি বেশী দিন নষ্ট হয়ে থাকে না, কারণ নদীর পলি পড়ে এই কাজে ব্যবহৃত জমি আবার উর্বর হয়ে ওঠে। বিষাক্ত গ্যাসে গ্রামের মানুষের বা ফলের ক্ষতি একেবারে বন্ধ না হলেও অনেকাংশে কমে যাবে।

4) যে বন্য প্রাণী বা উদ্ভিদের চাষ হয় না তাদের নিয়ে ব্যবসা এখনই বন্ধ করা দরকার নচেৎ এগুলি অচিরেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আজ গ্রামে গোধিকা, সোনা ব্যাঙ, বানর প্রভৃতির সংখ্যা ভীষণভাবে হ্রাস পেয়েছে। গুল্মজাতীয় গাছ যা দিয়ে বিভিন্ন ওষুধ তৈরি হয় তারও সংখ্যা বিলুপ্ত হতে চলেছে। এদের নিয়ে ব্যবসা করতে হলে এদের চাষের প্রয়োজন। এসবের দিকে পঞ্চায়েতের নজর দেওয়া দরকার।

5) ইচ্ছামত গাছকাটা এখনই বন্ধ করা প্রয়োজন। এর জন্য গ্রামবাসীকে সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে। এর জন্য আইন রয়েছে কিন্তু সেই আইন কেউ মেনে চলছে না। কাঠ চেরাইএর কারখানার সংখ্যা সীমিত করা দরকার।

6) যথেচ্ছ কীটনাশক ওষুধ ব্যবহারের ফলে কীট-পতঙ্গ এবং বহু পাখীর বংশ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এই ওষুধ তাদের খাদ্যের সঙ্গে শরীরে গিয়ে তাদের মৃত্যু ঘটাচ্ছে অথবা তাদের প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট করে দিচ্ছে। এদের অভাবে পরাগ সংযোগ বন্ধ হয়ে যাবে, ফলে প্রকৃতির ভারসাম্যের উপর দারুণভাবে আঘাত আসবে। এবিষয়ে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি দেওয়া এখন প্রয়োজন।

7) জলপথের উন্নতির দিকে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। নদী থেকে খাল কেটে গ্রামের মধ্যে দিয়ে নিয়ে গিয়ে সেটা আবার নদীর সঙ্গে যোগ করে দেওয়া যেতে পারে। এতে বন্যার তাণ্ডব নৃত্য কমতে বাধ্য কারণ বর্ষার জলধারাকে ধরে রাখার ক্ষমতা খালের মাধ্যমে নদীর বৃদ্ধি পাবে। আবার এই খালের জল চাষের কাজেও ব্যবহার করা যেতে পারে। খাল ও নদীর ধারে জঙ্গল সৃষ্টির মাধ্যমে নদীর তীরের মাটির ক্ষয় কমে যাবে। এতে যেমন তীরের ভাঙ্গন থেকে গ্রাম রক্ষা পাবে তেমন দেশের বনাসম্পদও বৃদ্ধি পাবে। বন্যপ্রাণীও তাদের বিলুপ্তি থেকে রক্ষা পাবে।

8) আদর্শ গ্রাম রচনায় প্রাথমিক স্কুল, শিশুদের খেলার মাঠ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, গ্রন্থাগার, কলাশিল্পের সংস্থা, বিজ্ঞান ক্লাব, যোগব্যায়াম কেন্দ্র, পরিচ্ছন্ন রাস্তা ইত্যাদি থাকা প্রয়োজন। এতে কিশোর ও শিশুদের শরীর ও মনের উন্নতি ঘটবে।

9) কঠিন সোনার মত তরল সোনারও মূল্য যেভাবে দিন দিন বেড়ে চলেছে, তাতে পেট্রোল ও ডিজেল চালিত গাড়ী ব্যবহারের খরচ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে আমদানী ও রপ্তানীকৃত দ্রব্যের দাম ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে। এই জন্য জলপথ সংস্কারের বিশেষ প্রয়োজন। জলপথে জিনিষ বেশী পরিমাণে আমদানী-রপ্তানী হলে জিনিষের দাম না বাড়ার সম্ভাবনা থাকে। এতে বহু লোকের কর্মসংস্থান হবে। গ্রামের লোক যদি কর্মসংস্থানের জন্য শহরের উপর নির্ভরশীল না হয়, তাহলে শহরের লোকের শহরের কর্মসংস্থানের অভাব ঘটবে না।

10) গ্রাম উন্নয়নের কাজে বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান-কর্মীদের দান অপরিসীম হতে পারে যদি তাঁদের কিছু সুযোগ-সুবিধা করে দেওয়া যায়। এক একটি গ্রামীণ বিজ্ঞান সংস্থার আওতায় কয়েকটি গ্রামকে রাখা যেতে পারে। গ্রামের মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা সৃষ্টি করে তাদের মন থেকে যাবতীয় কুসংস্কার দূর করার দুরূহ কাজে সেই সংস্থা আগ্রণী হতে পারে। গ্রামের অসংখ্য সমস্যা, যেমন—কৃষির, স্বাস্থ্যহীনতার, পানীয় জলের, জলসেচের, কুটির শিল্পের ইত্যাদির মোকাবিলা এই সংস্থা করতে পারে। মাতৃজঠর থেকে আমৃত্যু প্রতিটি মানুষ সমাজের কাছে ঋণী। কাজেই নিজের পরিবারের সঙ্গে সঙ্গে নিজের সমাজের প্রতি তার দায়িত্ব, সচেতনতা সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি দেওয়ার কথাও এই সংস্থা তাদের মনে গেঁথে দিতে পারে।

অশিক্ষা ও কুসংস্কারে জর্জরিত এই যুগ মানুষগুলোর কাছে বিজ্ঞানের কল্যাণময় রূপটিকে তুলে ধরতে হবে। স্বাস্থ্যরক্ষার মূল কথা-গুলো সোজা ভাষায় তাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। মানুষ প্রকৃতিরই একটা অঙ্গ—কাজেই সেই প্রকৃতির প্রত্যেকটি উদ্ভিদ এবং জীব হবে তার অন্তরঙ্গ প্রতিবেশী। তাদের রক্ষা করলে তারাও মানুষকে রক্ষা করবে। গ্রামীণ বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান-কর্মীরা তাঁদের আন্তরিকতা ও কর্মনিষ্ঠার দ্বারা গ্রামে বহু নতুন কাজের দিক নির্দেশ করতে পারেন। শহরের বড় বড় গবেষণাগারগুলোর মত বিশাল প্রাসাদ না থাকলেও তাঁরা যে কোন অংশেই শহরের বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান-কর্মীদের থেকে বিজ্ঞান-সচেতন মোটেই কম নন, তাঁদের কাজই সেই সাক্ষ্য বহন করবে।

11) গ্রামের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে আর একটি বড় সমস্যা হলো জ্বালানী সমস্যা। একদিকে বনজঙ্গলের প্রয়োজনীয়তা ও অপরদিকে জ্বালানী সমস্যার কথা মনে রেখে এমন ধরণের গাছ লাগানো যেতে পারে—যাদের 7/8 ফুট উপর থেকে কেটে নিলে কয়েক মাসের মধ্যে আবার ডাল গজিয়ে ওঠে অথবা যাদের প্রতি বছর ডাল ঝুরে নিলেও গাছের কোন ক্ষতি হয় না বরং কাঠ হিসাবে তাদের কাণ্ডের মূল্য প্রচণ্ড বৃদ্ধি পায়। যেমন—সেগুন, বাবলা, পিটুলী, শিরীষ ইত্যাদি।

12) গ্রামের এই কর্মযজ্ঞের রূপ দেওয়ার ব্যাপারে পঞ্চায়েতকে এগিয়ে আসতে হবে। সমাজ-সচেতন কিছু মানুষকে নিয়ে একটি সংস্থা তৈরি করা যেতে পারে। স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের এই কাজে লাগালে এবং ডিসেম্বর মাসটিতে স্কুলের ছেলেমেয়েদের সমাজ উন্নয়নের কাজ অবশ্যিক করলে ভাল হয়। এই কাজের জন্য তাদের প্রশংসাপত্র এবং ঐ মাসের জন্য বৃত্তি হিসাবে সামান্য অর্থ সাহায্যও দেওয়া যেতে পারে। কলেজের ছাত্ররাও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষান্তে এই কাজে যোগ দিতে পারেন। সেটাও আবশ্যিক করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পর্যন্ত সকলেই গ্রীষ্ম বা পূজাবকাশের সময় কিছু দিনের জন্য এই কাজে অংশ নিতে পারেন।

13) পঞ্চায়েতের অধীনে এমন এক সংস্থা থাকবে যার কাছে গ্রামের উৎপন্ন শস্য, মাছ, ডিম, গ্রামীণ শিল্পজাত দ্রব্য ইত্যাদি নির্ধারিত দরে বিক্রি করতে হবে। সেখান থেকে ব্যবসায়ীকে এই জিনিষ কিনে নিতে হবে। পঞ্চায়েতের কাছে একটা হিসেব থাকবে বছরে কে কত টাকার জিনিষ বিক্রি করল এবং ব্যবসায়ী বা কত টাকার জিনিষ কিনল। এর জন্য পঞ্চায়েত উন্নয়নমূলক শুল্কের ব্যবস্থা করতে পারেন। এর থেকে যে আয় হবে সেটা গ্রাম উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্পে ব্যয় করা যেতে পারে।

এই সকল প্রকল্প রূপায়ণ ও পরিচালনার জন্য গ্রামের বহু লোক কাজে নিযুক্ত হবেন। প্রতিটি পঞ্চায়েত যদি এই আদর্শ মেনে চলেন তাহলে গ্রামের মানুষের কাজের অভাব হবে না এবং তাদের গ্রামও উন্নত হবে। গ্রামের মানুষের কাজের অভাব দূর হলে শহরের মানুষের কাজের অভাব হবে না, কারণ গ্রামের মানুষের চাপ আর শহরকে বহন করতে হবে না।

দেশগড়ার মহাযজ্ঞের সূচনার মহালগ্নে প্রতিটি দেশবাসীকে তাদের আন্তরিকতা, সততা, দেশপ্রেম ও কর্মনিষ্ঠা দিয়ে মঙ্গলঘট ভরে নিতে হবে—থাকতে হবে কঠোর প্রতিজ্ঞা যা নিয়ে আসবে তাদের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যত।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতি আবেদন

বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু জনসাধারণের মধ্যে বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানচেতনা সঞ্চারের উদ্দেশ্যে 1948 খৃস্টাব্দে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ স্থাপন করেন এবং তদবধি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের মাসিক মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে যাবতীয় কুসংস্কার দূর করে তাদেরকে বিজ্ঞান-মনস্ক করাই পরিষদের একমাত্র লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্যই বাংলার সকল স্কুল, কলেজ ও গ্রন্থাগারে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা পৌঁছে দেওয়াই আচার্য বসুর অন্যতম স্বপ্ন ছিল। জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকায় সাধারণ মানুষ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে সহজবোধ্যভাবে প্রবন্ধাদি পরিবেশিত হয়ে থাকে। এতদ্ব্যতীত কিশোর বিজ্ঞানীর আসরে ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে কৌতুহলোদ্দীপক বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে আলোচনা প্রকাশিত হয়ে থাকে। পত্রিকাটি সকল শ্রেণীর মানুষ ও ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী বলে আমাদের বিশ্বাস।

আপনাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত (বার্ষিক চাঁদা 30·00 টাকা) করে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য ও সহযোগিতা করলে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হবো।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

বিজ্ঞান প্রবন্ধ

ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা*

বিশ্বরঞ্জন নাগ**

বক্তৃতার প্রারম্ভে আমি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কর্ণধারদের কৃতজ্ঞতা জানাই আমাকে 'আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু স্মৃতি বক্তৃতা' দিতে আহ্বান করবার জন্য। আচার্যের স্মৃতি সভায় কোন বিশেষ বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে সম্মানিত মনে করছি। আমার আচার্য বসুর ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য হয় নি, ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করারও কোন সুযোগ আমার আসে নি। ব্যক্তিগতভাবে ওঁকে আমি জানতে পারি নি। আচার্যকে আমি দূর থেকে দেখেছি, ওঁর বক্তৃতা শুনেছি। আমার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ওঁর কাছে গবেষণা করেছে, ওঁর ক্লাশে পড়েছে—তাদের কাছে ওঁর কথা শুনেছি। আমার এই সামান্য অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করে আচার্যকে সমুচিত শ্রদ্ধা জানিয়ে বিশেষ কিছু বলা সম্ভব নয়। আমার বক্তৃতার বিষয়ের মাধ্যমেই আমি ওঁকে শ্রদ্ধা জানাবো।

আমার বক্তৃতার বিষয় ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা। তবে আমি পরিসংখ্যান দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে ভারতে কি কি গবেষণা হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করব না। আমি আলোচনা করব সামগ্রিকভাবে ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাফল্য, সমস্যা ও সমস্যার সমাধান নিয়ে। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের বেশী আমি ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সঙ্গে যুক্ত আছি এবং বিশ বৎসর যাবৎ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাগার, শিল্পসংস্থা, সরকারী অনুদান সংস্থা ও বৈজ্ঞানিক সমিতিকে জানবার সুযোগ পেয়েছি। শিক্ষকতা ও গবেষণা আমার পেশা। তাই বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ে আমি বিভিন্ন সময়ে চিন্তা করেছি এবং আমার সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। এই সব আলোচনা থেকে আমি কিছু কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি আমি আপনাদের কাছে সেই সিদ্ধান্তগুলিই রাখছি।

ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাফল্য সম্পর্কে আমার সিদ্ধান্ত আপনাদের জানাবার আগে আমি আমার কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। পঞ্চাশের দশকে আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান কলেজে ছাত্র হয়ে যোগদান করি। পদার্থবিদ্যার তিন বিশ্বজয়ী বিজ্ঞানী তখন বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনা ও গবেষণা করছেন। আচার্য বসু রঞ্জনরশ্মি ও কেলাস বিজ্ঞানে, আচার্য সাহা নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞানে ও আচার্য মিত্র বেতারবিদ্যায় গবেষণা পরিচালনা করেছেন। আচার্য বসুর বোসন তত্ত্ব পদার্থবিদ্যার চিন্তাধারায় এক নূতন যুগের সূচনা করেছে, আচার্য সাহার তাপীয় আয়নন তত্ত্ব জ্যোতির্বিদ্যার প্রথম দশটি আবিষ্কারের অন্যতম বলে সমাদৃত, আচার্য মিত্রের বেতারবিদ্যার গবেষণা সমকালীন বিদেশের গবেষণাগারের সমতুল্য অবদান বলে স্বীকৃত। ওঁদের গবেষণার মান বোঝার মত শিক্ষা তখন আমাদের হয় নি ঠিকই, কিন্তু বিদেশাগত বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞান কলেজে যে বক্তৃতা দিতেন সেই সব বক্তৃতায় ওঁদের যে গুণগান থাকত তাতেই বোঝা যেত ওঁদের গবেষণার মান কত উঁচু। সেই সময়ে সমষ্টিগতভাবে ছাত্রদের নিয়ে বিস্তৃত গবেষণার ওঁরা সূত্রপাত করছেন। নিউক্লিয়ার পদার্থবিদ্যা চর্চা করার জন্য নূতন প্রতিষ্ঠানের পত্তন হয়েছে। বেতারবিদ্যা ও ইলেকট্রনিক্স চর্চার জন্য নূতন একটি বিভাগ সুরু হয়েছে এবং কেলাসবিজ্ঞানের গবেষণার জন্য একটি নূতন ধারার প্রবর্তন হয়েছে। সেই সময়ে গবেষণায় আর্থিক সচ্ছলতা না থাকলেও আমাদের মনে স্থির বিশ্বাস ছিল যে বিজ্ঞানে গবেষণা করে নিজের জন্য ও দেশের জন্য কিছু পাওয়া সম্ভব। আচার্যদের গবেষণার সাফল্যই ছিল এই বিশ্বাসের মূল কারণ।

আজ ত্রিশ বৎসর পরে আশির দশকে এসে আমরা দেখছি যে আচার্যরা চলে গেছেন। কিন্তু ওঁদের সমতুল্য কোন আচার্য বিজ্ঞান কলেজে নেই। এমন কোন বিজ্ঞান গবেষকের নাম আমরা করতে পারি না যাঁর গবেষণালব্ধ ফলাফল সমানভাবে আদৃত। যে সব প্রতিষ্ঠান আচার্যরা সুরু করেছিলেন সেগুলি আকারে বড় হয়েছে কিন্তু গবেষণায় সফল হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সাধারণের মনে সন্দেহ। গবেষণার জন্য অর্থ এখন অনেক সহজলভ্য। সরকারী বিভিন্ন অনুদান সংস্থা গবেষণার জন্য অর্থ বিনিয়োগ করে। পঞ্চাশের দশকে কয়েক হাজার টাকা সংগ্রহ করা সমস্যা ছিল। বর্তমানে কয়েক লক্ষ টাকা অনুদান পাওয়া কঠিন নয়। অথচ অর্থপূর্ণ গবেষণা হচ্ছে বা হয়েছে তা আমরা জোর গলায় বলতে পারি না। একথা সারা ভারতের পক্ষেই প্রযোজ্য। বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাফল্যের

---

*4ঠা ফেব্রুয়ারী '৮১ সত্যেন্দ্র ভবনে প্রদত্ত "আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু স্মারক বক্তৃতা'

**ইনস্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700009

মাপকাঠি হলো যে অজানা কোন নূতন তত্ত্ব বা তথ্য জানা গেল কিনা বা জানা তত্ত্ব বা তথ্যকে প্রয়োগ করে মানুষের কোন প্রয়োজন মেটাবার সামগ্রী তৈরি হলো কিনা। আচার্যরা নূতন তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন, কিন্তু গত তিন দশকে ভারতে কোন বিজ্ঞানী সমমানের কোন আবিষ্কার করেছেন বলে আমার জানা নেই।

একথা ঠিক যে পঞ্চাশের দশকে ভারতের শিল্প যে পর্যায়ে ছিল বা ভারতীয় বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও কারিগররা যে প্রযুক্তিবিদ্যা জানতেন তার থেকে অনেক অগ্রগতি হয়েছে। নূতন ধরণের অনেক প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনের কারিগরী ও শিল্প ভারতে এসেছে, কিন্তু একথা বলা যায় না যে এই অগ্রগতি বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল। আমার নিজের বিষয় থেকে উদাহরণ দিয়ে আমার বক্তব্য পরিষ্কার করতে পারি। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন রেডিও তৈরির বিদ্যা আমাদের জানা ছিল—কিন্তু রেডিও তৈরি করতে হলে যে সব যন্ত্রপাতি ও কম্পোনেন্ট, রেজিস্টর, ক্যাপাসিটর ইত্যাদি লাগত সেগুলি সবই বিদেশ থেকে আমদানী হতো। বর্তমানে কিন্তু রেডিওর সব অংশই ভারতে তৈরি হয়। কাজেই রেডিও শিল্পে আমাদের অগ্রগতি হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এই উন্নতি ভারতীয় বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফল বলা যায় না। রেডিও তৈরির কোন নূতন কৌশল বা রেডিওর কোন নূতন ডিভাইস আমাদের দেশে উদ্ভাবিত হয় নি। বিদেশে গবেষণার ফলে রেডিও তৈরির কার্যকৌশল কিন্তু অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। আমাদের গবেষণা এবিষয়ে ফলপ্রসূ হয় নি বলে আমরা আবার আশীর দশকে রেডিওর কম্পোনেন্ট ও ডিভাইস বিদেশ থেকে আমদানী করছি বা বিদেশের কারিগরী আমদানী করে এগুলো তৈরির চেষ্টা করছি।

আমরা দেখছি যে গত ত্রিশ বৎসরে মোটামুটিভাবে সব শিল্পেই আমরা বিদেশ থেকে প্রযুক্তিবিদ্যা আমদানী করে নূতন নূতন শিল্পসংস্থা গড়ে তুলেছি। এর ফলে আমাদের বিভিন্ন ধরণের অনেক প্রয়োজনীয় সামগ্রীই এখন দেশে তৈরি হচ্ছে। আমরা নিউক্লিয়ার পাওয়ার বা কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠাবার মত উন্নত ও জটিল কারিগরীতে অংশ নিচ্ছি। কিন্তু একথা বলা যায় না যে বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে বিভিন্ন শিল্পের কারিগরীতে যে পরিবর্তন হচ্ছে, সেই ধরণের কোন মৌলিক সংযোজন করতে পারছি। আমাদের আজও কোন শিল্পসংস্থাকে আধুনিক করতে হলে বিদেশ থেকে কারিগরীবিদ্যা উচ্চমূল্যে আমদানী করতে হয়। আমরা কোন মৌলিক কারিগরী রপ্তানী করেছি বলে আমার জানা নেই। আপাতদৃষ্টিতে আমাদের বিজ্ঞান ও শিল্পে উন্নতি হলেও আমি বলব বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আমরা সফল হই নি। আমরা কোন মৌলিক তত্ত্ব সংযোজন করি নি, কোন নূতন তথ্য উদ্‌ঘাটন করি নি বা কোন নূতন কারিগরীবিদ্যা উদ্ভাবন করি নি। গত ত্রিশ বৎসরের ভারতের গবেষণা আচার্য বসু, সাহা, রামন এঁদের মানে বিচার করলে সফল হয় নি।

প্রশ্ন ওঠে কেন আমাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা সফল হচ্ছে না এবং সফল হতে হলে কি করতে হবে? উত্তর পেতে হলে বিজ্ঞানের তিনটি দিক, তাত্ত্বিক, তথ্যগত বা পরীক্ষামূলক ও প্রযুক্তিবিজ্ঞানকে আলাদাভাবে দেখতে হবে। প্রথমে আলোচনা করা যাক তাত্ত্বিক বিজ্ঞান। বিশ্বে ও পৃথিবীতে যেসব প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটে বিজ্ঞানী পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের কার্যকারণ সূত্রগুলি আবিষ্কার করেন। এই সূত্রগুলিকে গ্রথিত করে তাত্ত্বিক বিজ্ঞানী উচ্চস্তরের মূল সূত্রের প্রস্তাব করেন যার ভিত্তিতে পরীক্ষার সূত্রগুলির ব্যাখ্যা করা যায় এবং কখনও কখনও নূতন কোন ঘটনা আবিষ্কৃত হয়। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক—তড়িতের সঙ্গে মানুষের পরিচয় বহুকালের। তড়িতের গুণাগুণ ও পারস্পরিক সম্পর্কে নিয়ে পরীক্ষা করে কুলম্ব, অ্যামপিয়ার ও ফ্যারাডে প্রমুখ বিজ্ঞানীরা কতগুলি সূত্র আবিষ্কার করেন। ম্যাক্সওয়েল এই সূত্রগুলি গ্রথিত করে একটি মূলসূত্রের প্রস্তাব করেন যা থেকে জন্ম নেয় বেতারবিদ্যা। ম্যাক্সওয়েল এই তত্ত্ব থেকে সিদ্ধান্ত করেন যে তড়িত ও চুম্বকের বলক্ষেত্র পরিবর্তনশীল তড়িত প্রবাহ থেকে তরঙ্গের মত ছড়িয়ে পড়ে। আলোক-তরঙ্গ তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গেরই একটি বিশেষ রূপ। আলোকে আমরা চক্ষুর সাহায্যে সহজেই জানতে পারি কিন্তু তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গকে অনুভব করার কোন ইন্দ্রিয় না থাকায়, প্রকৃতিতে এর অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও আমরা এই তরঙ্গকে জানতে পারি নি। ম্যাক্সওয়েলের তাত্ত্বিক গবেষণায় তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ ধরা পড়ে, এবং হার্জের পরীক্ষায় এর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। বোসন ও কোয়ান্টাম তত্ত্ব, ইলেকট্রনের তরঙ্গ তত্ত্ব, তড়িত পরিবহনের ব্যান্ড তত্ত্ব ও আপেক্ষিকতার তত্ত্ব পদার্থবিদ্যার এমনি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তাত্ত্বিক আবিষ্কার।

তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের সাফল্য দেশ-নির্ভর নয়। প্লাঙ্ক, বোর, আইনস্টাইন, বসু, ল্যাণ্ডো প্রমুখ বিজ্ঞানীরা যে কোন দেশেই জন্মগ্রহণ করে তাঁদের আবিষ্কার করতে পারতেন। ওঁদের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন ছিল পরীক্ষালব্ধ ফলাফল সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও পূর্বসূরীদের তাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলি সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা। বিজ্ঞানের পত্র-পত্রিকায় এই সব ফলাফল প্রকাশিত হয় এবং বিজ্ঞানীরা পত্রাদির মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করে সমস্যাগুলি জানতে পারেন। গত তিন দশকে ভারতে যে বিজ্ঞানীরা কাজ করেছেন তাঁদের তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের সমস্যাগুলি জানবার কোন বিশেষ অসুবিধা ছিল না। তবুও যে সর্বজনস্বীকৃত কোন উচ্চ মানের আবিষ্কার হয় নি তার কারণ উচ্চ প্রতিভাসম্পন্ন বিজ্ঞানীরাই তাত্ত্বিক বিজ্ঞানে সফল গবেষণা করতে পারেন। আমাদের দুর্ভাগ্য যে আচার্য বোসের সঙ্গে তুলনীয় প্রতিভাধর কোন বিজ্ঞানী এসময়ে ভারতে গবেষণা করেন নি। সারা পৃথিবীতেই এই মানের বিজ্ঞানী কম জন্মগ্রহণ

করেন। পদার্থবিদ্যার সমগ্র ইতিহাসে আচার্য বোসের মত বিজ্ঞানীর সংখ্যা অতি অল্প। তাত্ত্বিক বিজ্ঞানে ভারতের গবেষণা সফল হতে হলে এমনি কোন তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীকে জন্মগ্রহণ করতে হবে। এর অন্য কোন সমাধান নেই।

একথা অবশ্য ঠিক যে উপযুক্ত তাত্ত্বিক বিজ্ঞানী জন্মগ্রহণ করলেও তিনি সফল হবেন না যদি তাঁর প্রতিভার পরিস্ফুরণের পরিবেশ না থাকে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক যে কোন স্তরে জন্মেও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির উচ্চ শিক্ষালাভ ও পরে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আসার সুযোগ থাকা দরকার। বিভিন্ন দেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত গবেষণার ফলাফল সহজে জানবার আধুনিক ব্যবস্থা থাকা দরকার। দেশে ও বিদেশে বিজ্ঞানীদের সভাসমিতিতে যোগদান করা ও অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার সহজ পরিবেশ থাকা দরকার। বর্তমান কালের তাত্ত্বিক গবেষণার উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন গণকযন্ত্রেরও বিশেষ প্রয়োজন। তবে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন বিজ্ঞানীর চিন্তা-ভাবনা করার পূর্ণ স্বাধীনতা। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাধীনতা প্রতিভার পূর্ণতালাভের জন্য বিশেষভাবে আবশ্যক। সরকারী গবেষণাগারের আমলাতান্ত্রিকতা সাময়িক-কালে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রবর্তনের যে মানসিকতা দেখা যাচ্ছে তাকে রোধ করা দরকার। বিজ্ঞানীকে তাঁর গবেষণার বিষয়, গবেষণার ধারা ও গবেষণার সঙ্গী ছাত্রদের নির্বাচন করার পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। আশা করা যায় পরিবেশ ঠিক থাকলে আমাদের দেশেও সম্ভাব্যতার নিয়ম মেনে সফল তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীর দেখা পাওয়া যাবে।

এবার আলোচনা করা যাক তথ্যগত বা পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের। এই বিজ্ঞানে আমাদের মৌলিক অবদান না থাকার কারণ প্রতিভাধর বিজ্ঞানীর অভাব নয়। পরীক্ষামূলক সফল গবেষণা করার মত বিজ্ঞানী আমাদের দেশে আছেন। অনেকে এখানে সাফল্যলাভ না করলেও বিদেশে অনেক বেশী সফল হন। আমার মনে হয় ভারতে যে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানে রামনের পরে আর কোন সমমানের আবিষ্কার হয় নি তার মূল কারণ আমাদের শিল্পের নিম্নমান। বিজ্ঞানের প্রথমযুগে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় যন্ত্রপাতি ব্যবহার হত সহজ ধরণের। ফ্যারাডের তড়িচ্চুম্বকীয় ইনডাকশনের আবিষ্কারের জন্য ব্যবহার হয়েছিল শুধুমাত্র বৈদ্যুতিক সেল, তামার তার ও গ্যালভানোমিটার। রামন ব্যবহার করেছিলেন একটি সাধারণ স্পেক্ট্রোমিটার ও জোরালো আলোর উৎস। সে যুগে অন্যান্য দেশের মত ভারতে এইসব যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা ও ব্যবহার করা সম্ভব ছিল। কি পরীক্ষা করতে হবে এবং পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে পূর্ণধারণা থাকলে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানী যে কোন দেশেই সফল হতে পারতেন।

সাম্প্রতিক কালে প্রযুক্তিবিদ্যা ও যন্ত্রশিল্পের উন্নতির ফলে পরীক্ষাকেন্দ্রিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে খুব সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি ব্যবহার না করে পরীক্ষায় সফল হওয়া সম্ভব নয়। সহজে যে সব পরীক্ষা করা যায় সেইসব পরীক্ষার ফল মানুষের জানা হয়ে গেছে। এখন যে সব ঘটনার সূত্র পরীক্ষা থেকে জানার চেষ্টা করা হয় সেই সব ঘটনা নিয়ে পরীক্ষা করতে হলে অতি উচ্চমানের যন্ত্রপাতি প্রয়োজন। প্রযুক্তিবিদ্যা ও শিল্পের মান উচ্চ না হওয়ায় ঐ সব যন্ত্র আমাদের দেশে তৈরি হয় না। বহু বিজ্ঞানী প্রথমে এই ধরণের যন্ত্র নিজে তৈরি করে গবেষণার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ঐকিক প্রচেষ্টায় একাজ সম্ভব নয় বলে বিফল হয়েছেন। পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অর্থ সহজলভ্য হওয়ায় অনেকে বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আমদানী করে গবেষণার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এভাবেও সাফল্যলাভের সম্ভাবনা কম। প্রথমতঃ যন্ত্রগুলি আমদানী করতে ও চালু রাখতে বিজ্ঞানীকে অধিকাংশ সময় ব্যবহার করতে হয়। কখনও আবার যন্ত্রকে চালু রাখা সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়তঃ বিজ্ঞানী পরীক্ষার বিষয় বেছে নেন অধিকাংশ সময়ে বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকা থেকে। দেশের পরিবেশ বা শিল্পের প্রয়োজন থেকে গবেষণার বিষয় নির্বাচনের সুযোগ থাকে না। ফলে পরীক্ষার তৎকালীন তাৎপর্য থাকে না। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যাদি সাধারণতঃ কয়েক বৎসর পুরানো থাকে। তৃতীয়তঃ উচ্চমানের যন্ত্রপাতি নিয়ে গবেষণা করতে হলে কয়েক জনকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হয়। তার জন্য উপযুক্ত মানসিকতা ও নিয়মকানুন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ও গবেষণাগারে নেই। ব্যক্তিকেন্দ্রিক গবেষণাই এখনও গবেষকদের আদর্শ। এই সব কারণে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি আমদানী হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বখ্যাত পরীক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক গবেষণা গত ত্রিশ দশকে ভারতে হয় নি।

সম্প্রতি সরকারী প্রচেষ্টায় অতি উচ্চমানের যন্ত্রপাতি আমদানী করে কতগুলি সংস্থার গোড়াপত্তন হয়েছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও গবেষণাগারে। অনেকে আশা করেছেন এই সংস্থাগুলির সহায়তায় ভারতের পরীক্ষামূলক গবেষণা অনেক এগিয়ে যাবে। আগামী দশকে আমরা বুঝতে পারব এই আশার ভিত্তি কতটা শক্ত। আমার ব্যক্তিগত অভিমত হলো পরীক্ষামূলক গবেষণার জন্য সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতিই যথেষ্ট নয়। দেশের শিল্প ও কারিগরীর মানও উন্নত হওয়া দরকার। দেশের সামগ্রিক প্রয়োজন থেকে ও উচ্চমানের তাত্ত্বিক গবেষণার পরিপূরক রূপেই পরীক্ষামূলক গবেষণা গড়ে ওঠা উচিত যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন সফলতা সম্ভব নয়।

প্রযুক্তিবিজ্ঞানের গবেষণা পরীক্ষামূলক গবেষণার চেয়েও দেশের শিল্পের মানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। প্রযুক্তিবিজ্ঞানের গবেষণার সাফল্য দেশের শিল্পের উপরে পুরোপুরি নির্ভরশীল, যে গবেষণা শিল্পোন্নত দেশে সফল হয় সেই গবেষণা অনুন্নত দেশে সফল হওয়া অসম্ভব। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানীর প্রতিভার চেয়ে শিল্পের মান, শিল্পমালিকের দৃষ্টিভঙ্গীই সাফল্য বা

অসাফল্যের জন্য বেশী দায়ী। আচার্য জগদীশ বসুর বেতার-বিজ্ঞানের গবেষণার কথাই ধরা যাক। তিনিই প্রথমে পরীক্ষা করে দেখান যে বেতার-তরঙ্গ ব্যবহার করে দূরবর্তী স্থানে ঘটনা ঘটানো যায়। তারহীন সংবাদ আদান-প্রদান ব্যবস্থায় বলা যায় এই পরীক্ষাই পথ নির্দেশ করে। বিদেশে মার্কনীও সমকালে বেতার-তরঙ্গের একই ধরণের সম্ভাব্য ব্যবহার নিয়ে পরীক্ষা করেন। কালক্রমে মার্কনীর পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে বেতারবিজ্ঞান এবং এরই আনুষঙ্গিকরূপে ইলেকট্রনিকস গড়ে ওঠে। কিন্তু আচার্য জগদীশ বসুর পরে এ নিয়ে উল্লেখযোগ্য আর কোন কাজ এদেশে হয় নি।

বেতারবিজ্ঞানে পরবর্তীকালে প্রযুক্তিবিদ্যার গবেষণা না হওয়ার কয়েকটি কারণ নির্দেশ করা যেতে পারে। প্রধান কারণ হলো যে এই কাজে ভারতীয় শিল্পের কোন আগ্রহ ছিল না। গবেষণার ফলাফল শিল্পে প্রয়োগ করা বা ফলাফলকে ব্যবহার করে নূতন শিল্প গড়ে তোলার কোন ব্যবস্থা ছিল না। আমাদের তৎকালীন অর্থনৈতিক অবস্থাও এমন ছিল না যে এই গবেষণার ফল সাধারণ লোকে গ্রহণ করতে পারে। প্রযুক্তি-বিজ্ঞানে সফল হতে হলে প্রথমে দরকার—গবেষণার বিষয়বস্তুর উদ্ভব হবে দেশের শিল্পের প্রয়োজন থেকে। শিল্পের আগ্রহ থাকবে গবেষণার ফল ব্যবহার করে শিল্পকে উন্নত করার এবং দেশের সাধারণ লোকের অর্থনৈতির ক্ষমতা থাকবে শিল্পে উৎপন্ন উন্নত বস্তু ক্রয় করার। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। আমাদের ছাত্রাবস্থায় আমরা টেলিভিশানের কার্যকৌশল পড়তাম কিন্তু টেলিভিশন দেশে চালু হয় নি এবং কোন টেলিভিশন শিল্প ছিল না। তখন যদি কেউ টেলিভিশন নিয়ে গবেষণা করত তাহলে তার সাফল্যের সম্ভাবনা ছিল কম। এখন টেলিভিশন দেশে তৈরি হচ্ছে কোন্ প্রযুক্তিবিদ যদি টেলিভিশন সংক্রান্ত প্রযুক্তিবিদ্যায় কোন নূতন আবিষ্কার করেন তার আশু প্রয়োগ হওয়া সম্ভব। তার গবেষণা বর্তমানে অনেক বেশী অর্থপূর্ণ হবে। মোট কথা হলো শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ না রেখে প্রযুক্তিবিদ্যায় সফল গবেষণা করা যায় না।

প্রযুক্তিবিজ্ঞানের গবেষণায় সফল হতে হলে আমাদের ভারতীয় শিল্পনির্ভর প্রযুক্তিবিদ্যা গড়ে তুলতে হবে। গবেষণার সমস্যাকে শিল্প থেকে পেতে হবে। গবেষণাগার ও শিল্প-সংস্থাকে পরস্পরের কাছে এগিয়ে আসতে হবে। সরকার কয়েক বৎসর যাবৎ এ বিষয়ে অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু সেই চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নি। শিল্পসংস্থা ও গবেষণাগারের যোগাযোগ না হওয়ার প্রধান কারণ যে আমাদের দেশে যাঁরা শিল্পসংস্থা পরিচালনা করেন তাঁরা গবেষণার প্রয়োজন অনুভব করেন না। যা তৈরি হচ্ছে তাই বিক্রি হচ্ছে, বিদেশ থেকে কারিগরী আমদানী করে লাভজনক ব্যবসা করা যাচ্ছে এই আবহাওয়ায় আত্মনির্ভরতার কথা ভাবা শিল্পপতিদের কাছে বিলাসিতা। এঁদের অধিকাংশের এমন কিছু স্বজাত্যাভিমান নেই যে আদর্শের খাতিরে এঁরা স্বদেশে গবেষণার মাধ্যমে তাঁদের শিল্পের মান উন্নত করবেন। অবস্থার পরিবর্তন হবে সেদিন যেদিন প্রযুক্তিবিদরা দেশের সমকালীন শিল্পের সমস্যা নিয়ে গবেষণা করবেন এবং গবেষণা করে দেশের শিল্পকে লাভজনক ও উন্নত করবেন।

আমার বক্তব্য আমি এই বলে শেষ করতে চাই যে, আমরা যতদিন প্রযুক্তিবিজ্ঞানের গবেষণা দেশীয় শিল্পের সঙ্গে যুক্ত করতে না পারি এবং দেশীয় শিল্পের উন্নতি করে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি দেশে তৈরি করতে না পারি ততদিন আমাদের প্রযুক্তিবিজ্ঞান ও পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের গবেষণা সফল হবে না। তাত্ত্বিক বিজ্ঞানে আমাদের গবেষণা অবশ্য সফল হতে পারে, যদি আচার্য বসুর মত প্রতিভাধারী বিজ্ঞানী আমাদের দেশে আবার জন্মগ্রহণ করেন।

আবেদন

জ্ঞান ও বিজ্ঞানে প্রকাশের জন্য জনসাধারণ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে সহজবোধ্য ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠাবার জন্য বিজ্ঞান লেখকদের নিকট আবেদন করা যাচ্ছে। প্রবন্ধ ফুলস্ক্যাপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লিখে এবং সঙ্গে চিত্র থাকলে তা পৃথক কাগজে চীনা কালিতে এঁকে পাঠাতে হবে। সম্পাদকমণ্ডলী কর্তৃক উপযুক্ত বিবেচিত হলে যথাসময়ে তা "জ্ঞান ও বিজ্ঞানে প্রকাশিত হবে।

'সত্যেন্দ্র ভবন'
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীটকর্মসচিব
কলিকাতা-700 006

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

ঘন ইলেকট্রোলাইটের সঞ্চয়ক ব্যাটারী

মোহনলাল মুখোপাধ্যায়*

ধাতু এবং ইলেকট্রোলাইট উভয়েই উত্তম বিদ্যুৎ পরিবাহী। কিন্তু ধাতুর ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ পরিবহণ করে ইলেকট্রন, আর ইলেকট্রোলাইটের বেলায় আয়ন। এতদিন পর্যন্ত উত্তম বিদ্যুৎ-পরিবাহী ইলেকট্রোলাইট বলতে আমরা বুঝেছি জলীয় দ্রবণ অথবা দ্রবীভূত লবণ (salts)। কিন্তু অধুনা কিছু ঘন (solid) ইলেকট্রোলাইটের সন্ধান পাওয়া গেছে যাদের আয়নিক পরিবাহিতা খুব ভাল, এবং ইলেকট্রনিক পরিবাহিতা প্রায় নেই বললেই চলে। এ জাতীয় ঘন ইলেকট্রোলাইটের নাম দেওয়া হয়েছে 'অতি আয়নিক পরিবাহী'। মনে রাখতে হবে 'অতি আয়নিক পরিবাহী' এবং 'অতিপরিবাহী' আলাদা বস্তু। অতি আয়নিক পরিবহণ ঘটে ঘরের তাপমাত্রা থেকে আরম্ভ করে কয়েক-শ' ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত। অন্যদিকে অতিপরিবাহীর কাজকর্ম সবই শূন্য কেলভিনের কাছাকাছি তাপমাত্রায় ঘটে থাকে।

সম্প্রতি ঘন ইলেকট্রোলাইট নিয়ে অনেকেই গবেষণায় মেতেছেন, কেননা এ জাতীয় বস্তু থেকে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে পেস্-মেকার, ইলেকট্রনিক ঘড়ি, ক্যামেরা ইত্যাদির ব্যাটারী। এখানেই শেষ নয়। উচ্চশক্তি এবং ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যাটারী মোটর গাড়ি চালানোয় পরীক্ষামূলকভাবে ইতিপূর্বেই ব্যবহৃত হয়েছে। এ জাতীয় ব্যাটারী বৈদ্যুতিক যানবাহনে ব্যবহৃত হলে তেলের (পেট্রোলিয়ামের) খরচ কমবে। এ ছাড়া অসময়ের জন্য বৈদ্যুতিক শক্তি জমা করে রাখা যাবে এবং পরে প্রয়োজনমত ব্যবহার করা যাবে।

ঘন ইলেকট্রোলাইট তিন রকমের হতে পারে,—অজৈব ক্রিস্টালীয় ঘনবস্তু, কাচজাতীয় বস্তু এবং পলিমার। ঘরের তাপমাত্রায় এই তিন রকমের ইলেকট্রোলাইটের তুলনামূলক পরিবাহিতা দেওয়া হয়েছে 1নং তালিকায়। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে প্রথম শ্রেণীর পরিবাহিতাই সবচেয়ে বেশী। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা অজৈব ক্রিস্টালীয় ঘনবস্তুর পরিবাহিতা এবং তাদের ব্যাটারীর ইলেকট্রোলাইট হিসাবে ব্যবহারের যোগ্যতা নিয়ে আলোচনা করব।

তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঘন ইলেকট্রোলাইটের পরিবাহিতা ক্রমাগতই বাড়তে থাকে। যেমন সোডিয়াম বিটা অ্যালুমিনা। কোন কোন ক্ষেত্রে, যেমন, AgI-এর বেলায়, প্রথম ক্রমের অবস্থা রূপান্তরের সঙ্গে বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা অকস্মাৎ বৃদ্ধি পায়। আয়নিক ক্রিস্ট্যালের মত অন্তরক (insulator), যেমন NaCl, যখন গলনাংকে পৌঁছয়, তখন একই ধরণের পরিবাহিতার বৃদ্ধি দেখা যায়। 900°C-এ গলন্ত সোডিয়াম ক্লোরাইডের পরিবাহিতা 30°C তাপমাত্রায় $RbAg_4I_5$-এর পরিবাহিতার মাত্র দশগুণ বেশী। এই কারণেই সোডিয়াম-বিটা-অ্যালুমিনা, AgI এবং $RbAg_4I_5$ ইত্যাদিকে ঘন বা সলিড ইলেকট্রোলাইট আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

1নং তালিকা

বস্তুর নাম	আধানবাহক	পরিবাহিতা (25°C-এ)
ধাতু-(তামা)	ইলেকট্রন	10^6 ($\Omega^{-1}cm^{-1}$)
ক্রিস্টলীয় ঘনবস্তু (K—β অ্যালুমিনা)	K^+	10^{-1}
জলীয় দ্রবণ (0·1M KCl)	K^+ এবং Cl^-	10^{-2}
কাচ (0·75 AgI, 0·25 Ag_2MoO_4)	Ag^+	10^{-2}
পলিমার (4·5 PEO. $NaBF_4$)	Na^+	10^{-7}

PEO = পলিইথাইলিন অক্সাইড

ব্যাটারী এবং ইন্ধন কোষ (fuel cell) একই পদ্ধতিতে কাজ করে—উভয় ক্ষেত্রেই ইলেকট্রোলাইট ব্যবহৃত হয় এবং রাসায়নিক বিক্রিয়াজনিত শক্তিই বিদ্যুতে রূপান্তরিত হয়। ইন্ধন কোষের ক্ষেত্রে বাইরে থেকে ইলেকট্রোলাইট এবং তড়িদ্দ্বারে সক্রিয় অংশের সরবরাহ ক্রমাগতই চলতে থাকে; আর ব্যাটারীর বেলায় সক্রিয় অংশগুলি ইলেকট্রোলাইট এবং তড়িদ্দ্বারে মজুত থাকে—বাইরের যোগান দিতে হয় না। বর্তমান প্রবন্ধে কেবল ঘন ব্যাটারী সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে—ইন্ধন কোষ সম্বন্ধে নয়।

বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে আয়নসমূহের ব্যাপনই ঘন বস্তুর মধ্যে আয়নিক পরিবহণের কারণ। আয়নের আশেপাশে খালি জালক বিন্দু না থাকলে ব্যাপনজনিত আয়নিক পরিবহণ ঘটে না। আদর্শ ঘনবস্তুর ক্ষেত্রে যদি সমস্ত জালক বিন্দু আয়নে ভর্তি থাকে তাহলে ব্যাপন সম্ভব হয় না। অতএব ঘন পদার্থের গঠনের ত্রুটিই আয়নিক পরিবাহিতার কারণ। ঘন ইলেকট্রোলাইটের পরিবাহিতার জন্য আমরা দু-রকমের গঠন ত্রুটির কথা ভাববো

* পদার্থবিদ্যা বিভাগ, আই. আই. টি., খড়্গপুর

এক—স্থির জালক বিন্দুর সমারোহ এবং দুই—জালক বিন্দুর মধ্যবর্তী-স্থানে আয়নসমূহের অবস্থান। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে আয়নসমূহ আশে-পাশের রিক্ত জালক বিন্দুতে লাফিয়ে যেতে পারে। এই জাতীয় ব্যাপনকে আমরা আয়ন-অনুপস্থিতির গতি হিসাবে ধরতে পারি। দ্বিতীয়তঃ দুই জালক বিন্দুর মধ্যবর্তী আয়নের অপর মধ্যবর্তী
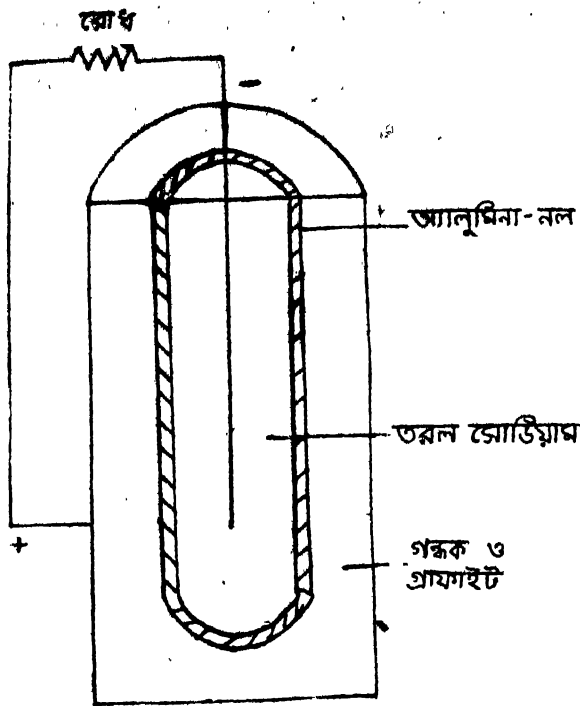
1নং চিত্র ঃ সোডিয়াম-গন্ধক ব্যাটারীর পরিকল্পনীয় চিত্র দেখানো হয়েছে। এই ব্যাটারী 300°C-এ কাজ করে।

স্থানে গমনহেতু ব্যাপন সম্ভব হ'তে পারে। বিটা-অ্যালুমিনার পরিবাহিতা এই দ্বিতীয় ক্রিয়াবিধির জন্যই ঘটে থাকে। সোডিয়াম-বিটা-অ্যালুমিনা বলতে আমরা Na_2O এবং Al_2O_3-র বিভিন্ন অনুপাতে সংমিশ্রণ বুঝি। 1নং চিত্রে সোডিয়াম-গন্ধক ব্যাটারীর ছবি বোঝানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বাইরের থেকে ইন্ধন যোগানো হয় না, সুতরাং এটা একটা ব্যাটারী। এ ব্যাটারীর অ্যানোড হলো গলিত সোডিয়াম, ক্যাথোড হলো সালফার, আর সোডিয়াম-বিটা-অ্যালুমিনা হচ্ছে ইলেকট্রোলাইট। আধানমোক্ষণ বিক্রিয়ায় সোডিয়াম আয়ন ইলেকট্রোলাইটের মধ্য দিয়ে গমন করে এবং সালফার আয়নের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে। এই বিক্রিয়ার ফলে ইলেকট্রনগুচ্ছ বহিস্থ বৈদ্যুতিক বর্তনী দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং বৈদ্যুতিক ক্রিয়া হয়ে থাকে। ব্যাটারীর মধ্যে বিক্রিয়াগুলি এই রকম ঘটে—

$$2Na \rightarrow 2Na^+ + 2e^- \quad (\text{অ্যানোড})$$

$$2e^- + S_x \rightarrow S_x^{=} \quad (\text{ক্যাথোড})$$

$$2Na + S_x \rightarrow Na_2S_x \quad (\text{মোট ফলাফল})$$
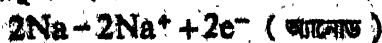
এই জাতীয় ব্যাটারীর পুনর্ভরণ সম্ভব এবং তা করতে হলে থেকে তড়িদ্বারে ভোল্টেজ দিয়ে ইলেকট্রন প্রবাহকে উল্টোমুখী করতে হবে। মনে রাখতে হবে সোডিয়াম-সালফার 300°C-এ চলে, কেন না এর অ্যানোড হলো তরল গলিত সোডিয়াম। এই ব্যাটারীর কার্যকারিতা খুবই আশা-ব্যঞ্জক। যদিও এ জাতীয় ব্যাটারী ইতিমধ্যেই গাড়ী চালানোয় ব্যবহার হয়েছে, এর আধানমোক্ষণ এবং পুনর্ভরণ সংক্রান্ত কিছু সমস্যা এখনও রয়ে গেছে।

সঞ্চয়ক সেলের ক্ষেত্রে লিথিয়াম আইওডাইড-অ্যালুমিনা ইলেকট্রোলাইট অতীব সম্ভাবনাময়। লিথিয়াম ব্যাটারীর জন্য ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক তড়িদ্বার হিসাবে TiS_2 এবং Li_xS_i
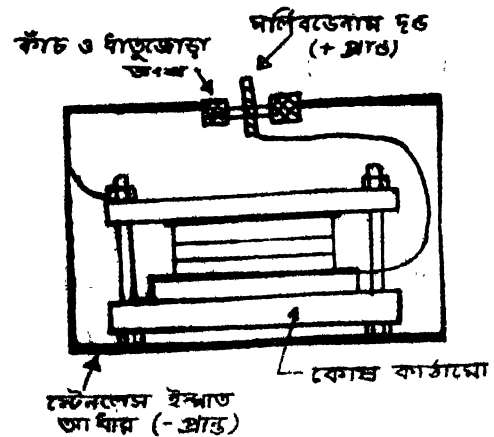
2নং চিত্র ঃ লিথিয়াম আইওডাইড অ্যালুমিনা ব্যাটারীর চিত্র দেখানো হয়েছে। এই ব্যাটারী 300°C তাপমাত্রার কাছাকাছি উষ্ণতায় কাজ করে। সাধারণ তাপমাত্রায় কাজের জন্য ছোট লিথিয়াম ব্যাটারী তৈরি সম্ভব হয়েছে।

ব্যবহার করা যেতে পারে (2 নং চিত্র)। ইলেকট্রোলাইট এবং তড়িদ্বার উভয়েই গুঁড়া পদার্থ থেকে উচ্চ চাপে বোতামের আকারে তৈরি করা যায়। নমুনাস্বরূপ তিন মিলিমিটার বেধের এবং দুই-তিন সেন্টিমিটার ব্যাসের ব্যাটারী সহজেই $5 mA/cm^2$ প্রবাহ দিতে পারে এবং তিন-শ' বার এর আধানমোক্ষণ এবং পুনর্ভরণ (discharge এবং charge) করা যেতে পারে। লিথিয়াম ব্যাটারীর শক্তিদক্ষতা, অর্থাৎ পুনর্ভরণে কতটা বৈদ্যুতিক শক্তি দেওয়া হলো এবং আধানমোক্ষণে কতটা শক্তি পাওয়া গেল—এ দুয়ের অনুপাত ইতিমধ্যেই 85% হয়েছে। অনবধানবশতঃ লঘুপাতিত হয়ে গেলেও, এ ব্যাটারী নষ্ট হয় না, বিভিন্ন তাপমাত্রায় কাজ করে, অনেকদিন অব্যবহৃত পড়ে থাকলেও নষ্ট হয়ে যায় না। এ ছাড়া 100 kwh শক্তি পেতে হলে লেড অ্যাসিড ব্যাটারীর ওজন যেখানে 4300 kg, সেক্ষেত্রে ঘন ইলেকট্রোলাইট ব্যাটারীর ওজন হবে 1000 kg-র বেশী নয়। সুতরাং লেড-অ্যাসিড ব্যাটারীর তুলনায় ঘনইলেকট্রোলাইটের ব্যাটারী যে অধিক সম্ভাবনাময় তাতে সন্দেহ নেই। তবে মনে রাখতে হবে এ জাতীয় ব্যাটারী 300°C-এর কাছাকাছি তাপমাত্রায় কাজ করে এবং এখনও এর প্রযুক্তিগত কিছু সমস্যা রয়ে গেছে।

জল থেকে জ্বালানী

সলিলকুমার চক্রবর্তী*

আগুন নেভাতে তো জল লাগে জানি, তা বলে আগুন জ্বালাতে জল! হ্যাঁ; সংবাদটা সাধারণ মানুষকে চমকে দেবার মতোই বটে। কিন্তু বিজ্ঞানীর অভিধানে "অসম্ভব" কথাটার গুরুত্ব যে নেহাৎই কম। আর সে কারণেই বোধকরি নতুন এবং পুনর্বিনিয়োগ যোগ্য শক্তির সম্ভাব্য উৎস অনুসন্ধান সম্পর্কিত গবেষণার ফল হিসাবে মাত্র বছর পাঁচ ছয় আগে আবিষ্কৃত হয়েছে এক আশ্চর্য জৈব-রাসায়নিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে আলোক-সংশ্লেষক ক্লোরোফিল পর্দার (photo synthetic chlorophyl membrane) উপস্থিতিতে, সূর্যের আলোর সাহায্যে, উপযুক্ত জৈব উৎসেচক (enzyme) মেশানো জলকে বিশ্লেষিত করে পাওয়া যাবে অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন। অক্সিজেন দহন-সহায়ক আর হাইড্রোজেন নিজে দাহ্য। এই হাইড্রোজেন গ্যাসকেই মানুষ ব্যবহার করতে পারবে ভবিষ্যতের জ্বালানী হিসাবে। সম্পূর্ণ জৈব রাসায়নিক পদ্ধতিতে সৌরশক্তিকে প্রয়োজনীয় জ্বালানীতে রূপান্তরিত করার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে এ আবিষ্কার যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

আদিম পৃথিবীর মানুষ একান্ত ভাবেই নির্ভরশীল ছিল আপন দৈহিক শক্তির উপর। প্রয়োজনের তাগিদে এবং বুদ্ধি-বৃত্তির সহায়তায়, ধীরে ধীরে মানুষ প্রকৃতির নানা উৎস থেকে শক্তি সংগ্রহ করে, নিজের কাজে লাগাতে শিখেছে। যখনই কোনও নতুন শক্তি-উৎস আবিষ্কৃত হয়েছে, তখনই সমাজ-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। শক্তির উন্নততর প্রয়োগবিধির সাথে যেন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত আছে আমাদের সামগ্রিক সামাজিক অগ্রগতি।

সভ্যতার বিজয় রথের দ্রুত অগ্রগতি অব্যাহত রাখতেই ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে মানুষের শক্তির চাহিদা। আধুনিক যন্ত্র দানবের খোরাক জোগাতে চাই অফুরন্ত শক্তি। অথচ সুদীর্ঘকাল ধরে পুরাতন উৎসগুলির ক্রমাগত ব্যবহারের অনিবার্য ফল হিসাবেই ভাণ্ডার নিঃশেষ হতে চলেছে। যে হারে কয়লা, খনিজ তৈল, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং থোরিয়ামের ব্যবহার চলছে, তাতে তথ্যাভিজ্ঞ বিজ্ঞানী মহলের ধারণা যে আগামী শতাব্দীর মধ্যভাগেই প্রচলিত শক্তি উৎসগুলির অনেকেই নিঃশেষিত হওয়ায় মানুষকে চরম শক্তি সংকটে ভুগতে হবে। 1নং তালিকায় কতগুলি পুরাতন এবং নতুন শক্তি উৎসের তুলনামূলক তথ্য পরিবেশিত হলো। বুদ্ধিমান পাঠক আশা করি, এ থেকেই বর্তমান শক্তি সমস্যার গুরুত্ব এবং নতুন শক্তি উৎস আবিষ্কারের ঐকান্তিক উপযোগিতা সম্পর্কে ... হতে পারবেন।

1নং তালিকা

উৎসের নাম	সমগ্র পৃথিবীতে মোট অবশেষ	আনুমানিক স্থায়িত্ব	মন্তব্য
1. কয়লা	10-12 ট্রিলিয়ন (10^{18}) টন	125-150 বছর	বিশেষ ভাবে পরিবেশ দূষক।
2. খনিজ তৈল	450 বিলিয়ন (10^{12}) টন	30 থেকে 35 বছর	ব্যবহার ক্রমবর্ধমান, বিশেষভাবে পরিবেশ দূষক।
3. প্রাকৃতিক গ্যাস	সঠিক পরিমাপ যোগ্য নয়।	সঠিক পরিমাপ যোগ্য নয়।	ব্যবহার ক্রমবর্ধমান, পরিবেশ দূষক।
4. উদ্ভিজ্জ-জ্বালানী বায়ো-মাস	"	পুনর্বিনিয়োগ যোগ্য উৎস	বৃক্ষ কর্তনের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে। বিস্তৃত অঞ্চল মরু কবলিত হওয়ার আশঙ্কা।
5. ইউরেনিয়াম	5·5 লক্ষ টন	30 থেকে 40 বছর	তেজস্ক্রিয়তার জন্য পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি। বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার সম্ভাবনা।
6. জল-বিদ্যুৎ	পরিমাপ যোগ্য নয়।	দীর্ঘকাল	স্থানীয় পরিবেশের উপর বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা।
7. ভূ-গর্ভস্থ তাপশক্তি	"	"	উত্তরোত্তর ব্যবহার বৃদ্ধির সম্ভাবনা।
8. সৌরশক্তি	"	অনন্তকাল	পরিবেশ-দূষক নয়। প্রযুক্তিগত এবং অর্থনৈতিক অসুবিধা সত্ত্বেও, উত্তরোত্তর ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে।
9. মহাসাগরীয় শক্তি	"		
10. বায়ু প্রবাহের শক্তি			

*ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক, রাজাবাজার শাখা।

বিশ্বের বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌গণের কাঁধে এসে পড়েছে আজ মস্ত দায়িত্ব। অবিলম্বে শক্তি-সমস্যার গ্রহণযোগ্য সমাধান খুঁজে বের করা তাঁদের কাছে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। পৃথিবীর নানা দেশে চলেছে আজ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান। জল থেকে জ্বালানী সংগ্রহের উপায় আবিষ্কারও বোধ হয় সেই বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টারই ফল। এবার আমরা সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবো।

জলকে অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন এই দুই গ্যাসীয় মৌলে ভেঙ্গে ফেলার ঘটনাটা কিন্তু নতুন নয়। সামান্য অ্যাসিড মেশানো জলে দুটো প্লাটিনামের পাত ডুবিয়ে তাদের একটাকে কোন ব্যাটারীর ধনাত্মক মেরুর সাথে এবং অপরটাকে ঋণাত্মক মেরুর সাথে যুক্ত করে দিলে, জলের দুটি অণু ভেঙ্গে গিয়ে উৎপন্ন করবে একটা অক্সিজেন পরমাণু এবং দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু। এখন ঋণাত্মক আধানযুক্ত প্লাটিনাম পাতের (ক্যাথোডের) উপর একটা জলপূর্ণ পরীক্ষা-নল উল্টে রাখলে, জলের নিম্নাপসরণের দ্বারা সেখানে সঞ্চিত হবে হাইড্রোজেন গ্যাস। বিজ্ঞানী ফ্যারাডে উদ্ভাবিত এই ঘটনার নাম তড়িৎ-বিশ্লেষণ। কিন্তু মুসকিল হচ্ছে এই যে তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় জল থেকে হাইড্রোজেন প্রস্তুতির ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ায় "ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রীর" সামিল। কয়লা অথবা তেল থেকে বহু কষ্টে উৎপন্ন বিদ্যুৎ-শক্তির অপচয়ের বিনিময়ে হাইড্রোজেন উৎপাদন, কখনই শক্তি-সমস্যার যোগ্য সমাধান হতে পারে না। এ পদ্ধতি শুধুমাত্র ব্যয়বহুলই নয়, প্রচণ্ড সময়সাপেক্ষও বটে। অথচ, পৃথিবীর ভাণ্ডারে সঞ্চিত আছে অপর্যাপ্ত জল। আর দুই অণু জল মানেই দুই অণু হাইড্রোজেন এবং তার সাথে উপরি হিসাবে এক পরমাণু অক্সিজেন।

কিন্তু কেমন করে স্বল্প ব্যয়ে সহজ উপায়ে জলের বিভাজন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা যায়? বিশ্বের বিজ্ঞানীরা ভাবনা চিন্তা শুরু করলেন বিষয়টি নিয়ে, আর তাঁদের এই সমস্যার অন্ধকারে আলোকবর্তিকা হয়ে হাজির হলো উদ্ভিদের সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়া।

মূলের সাহায্যে মাটি থেকে শোষিত জল এবং বাতাস থেকে সংগৃহীত কার্বন-ডাই-অক্সাইড সহযোগে পাতার সবুজ ক্লোরোফিলের উপস্থিতিতে গাছ সৌরশক্তিকে রূপান্তরিত করে কার্বোহাইড্রেটরূপ খাদ্যের রাসায়নিক শক্তিতে এবং সাথে সাথে নির্গত হয় অক্সিজেন।

	সূর্যালোক	
জল + কার্বন-ডাই অক্সাইড	———→ ক্লোরোফিল	জৈব যৌগ + অক্সিজেন সমূহ

উদ্ভিদবিজ্ঞানের অতি-সুপরিচিত এই সালোক-সংশ্লেষ পদ্ধতিটির দুটো বিভিন্ন পর্যায়। প্রথম, বা আলোকিত পর্যায়ে (light-stage) গাছের পাতায় উপস্থিত ক্লোরোফিল নামক সবুজ-কণা, বিকিরিত সৌর আলোককে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে তার সাহায্যে জলের অণুকে ভেঙ্গে ফেলে উৎপন্ন করে অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন। সাথে সাথে পাওয়া যায় প্রায় 68 কিলো ক্যাল পরিমাণ শক্তি, যা প্রথমে A.T.P. (অ্যাডিনোসিন-ট্রাই-ফসফেট) এবং N.A.D.P. (নিকোটিন্যামাইড অ্যাডিনোসিন ডাই-নিউক্লিয়োটাইড ফসফেট) উৎপাদন পূর্বক রাসায়নিক শক্তি হিসাবেই সঞ্চিত থাকে।

"অন্ধকার পর্যায়" (dark-stage) নামে কথিত দ্বিতীয় পর্বে এই A.T.P., N.A.D.P. এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড থেকে জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপন্ন হয় কার্বোহাইড্রেট যৌগসমূহ। এবারে প্রক্রিয়াটি আরও একটু বিশদভাবে আলোচনা করা যাক।

সূর্যরশ্মির আপতনে ক্লোরোফিল থেকে ইলেকট্রন নির্গত হওয়ায়, তার তড়িৎ ভারসাম্য নষ্ট হয়। নির্গত ইলেকট্রনসমূহ উপযুক্ত বাহক শ্রেণীর (system of carriers) সহায়তায় পরিচালিত হয়ে পুনরায় ক্লোরোফিল কণায় পৌঁছে তার তাড়িতিক সাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে এই ইলেকট্রন পরিচলন পর্যায়েই সৌরশক্তি, রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে, A.T.P. অণু গঠন করে। এর নাম বৃত্তীয় সালোক-সংশ্লেষ। অপরদিকে আপতিত সৌরশক্তির অপর এক অংশের সহায়তায় জলের অণুটি ভেঙ্গে গিয়ে উৎপন্ন হয় পরা-তড়িৎবাহী হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) এবং অপরা-তড়িৎবাহী হাইড্রক্সিল আয়ন (OH^-)। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে উত্তেজিত অবস্থায় যতগুলো ইলেকট্রন ক্লোরোফিল থেকে নির্গত হয়, তাদের সকলে পুনরায় ক্লোরোফিল কণায় ফিরে যেতে পারে না। সেইরকম কিছু ইলেকট্রন ধনাত্মক হাইড্রোজেন আয়নের সাথে যুক্ত হয়ে গঠন করে হাইড্রোজেন অণু।

$$H^+ + e^- = H$$
$$H + H = H_2$$
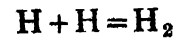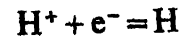
ঠিক সেই সময় ধনাত্মক হাইড্রক্সিল আয়ন কর্তৃক পরিত্যক্ত ইলেকট্রন ক্লোরোফিল কণায় পৌঁছে তার তড়িৎ-ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। এই সময়ে গঠিত হয় আর একটি A.T.P. অণু এবং তার সাথে উৎপন্ন হয় জল এবং অক্সিজেন।

$$OH^- - e^- = OH$$
$$OH + OH = H_2O + O$$
$$O + O = O_2$$
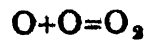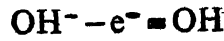
1নং চিত্রে সমস্ত ব্যাপারটা স্পষ্ট করে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে।

উদ্ভিদের সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার অনুকরণে হাইড্রোজেন উৎপাদনের কথা বিজ্ঞানীরা ভাবতে শুরু করেন 1960 খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে। এর প্রায় বছর দশেক বাদে, অর্থাৎ 1970 খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি, আমেরিকার একদল বিজ্ঞানী লক্ষ্য করলেন যে দেড় থেকে দু-ফুট উঁচু, ছোট একপ্রকার উদ্ভিদ থেকে সংগৃহীত স্পিনাচ ক্লোরোপ্লাস্ট (spinach chloroplasts) এবং হাইড্রোজিনেস (hydrogenase) সমৃদ্ধ একপ্রকার জীবাণু-নির্যাসের (bacterial extracts) সাথে ফেরেডক্সিন (ferredoxin) কিংবা ভায়োলোজেন (viologen) নামক

রং-এর দানা মিশিয়ে তার উপর দৃশ্য আলো ফেললে, মিশ্রণ থেকে হাইড্রোজেন গ্যাস নির্গত হতে থাকে। ফেরেডক্সিন নামক রং-এর দানা এক্ষেত্রে ইলেকট্রন বাহকের কাজ করে।

অতিরিক্ত স্পর্শকাতরতার দরুণ, অক্সিজেনের সংস্পর্শে, হাইড্রোজিনেসের ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে। সেজন্যে বিক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হয় নিষ্ক্রিয় নাইট্রোজেন গ্যাসের পরিমণ্ডলে। আর জল থেকে উৎপন্ন অক্সিজেনকে দূর করা হয় গ্লুকোজ এবং গ্লুকোজ-অক্সাইডের মিশ্রণের সাহায্যে।

হাইড্রোজিনেসের পরিবর্তে প্লাটিনাম-ডাই-অক্সাইড (PtO_2) নামক অজৈব অনুঘটকটিও হাইড্রোজেন উৎপাদনে সক্ষম।

অতি সম্প্রতি সুইজারল্যাণ্ডের ইনস্টিটিউট দ্য কেমি ফিজিকিউ একোল পলিটেকনিক ফেডারেলো লাওসেন (Institute de chemi physique Ecole Polytechnique Federalo Lausanne) নামক এক গবেষণা সংস্থার বরগেরেলো-ই (Borgarello-E) নামক এক বিজ্ঞানী এবং তাঁর সহকর্মীরা আলোক-প্রভাবন (photocatalysis) নামক

1নং চিত্র

একপ্রকার আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জলের অণু বিভাজনে সক্ষম হয়েছেন। তাঁরা আলোক সুবেদী গুঁড়োকে টাইটেনিয়াম ডাই-অক্সাইডের (TiO_2) উপর একই সাথে প্লাটিনাম্ এবং রুবিডিয়াম্ ডাই-অক্সাইড (RuO_2) আস্তরণ দিয়ে তাকে জারণ-বিজারণ প্রভাবক (redon catalyst) হিসাবে ব্যবহার করেন।

পদ্ধতিটির দুটি বিশিষ্ট পর্যায়। প্রথম পর্যায়ে, আলোক প্রভাবনের দ্বারা জারণযোগ্য নয়, এমন একটা বাহক (carrier) উৎপন্ন হবে আর সাথে সাথে নির্গত হবে অক্সিজেন গ্যাস। সেই বাহকটিকে তখন পরিচালিত করা হবে প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় পর্যায়ে যেখানে হাইড্রোজেন উৎপাদনকারী রাসায়নিক বিক্রিয়াটি সংঘটিত হবে। এরপর বাহকটিকে পুনরায় প্রক্রিয়ার প্রথম পর্যায়ে পাঠানো হবে যাতে তা আলোর প্রভাবে পুনর্বিজারিত হয়ে নতুন করে চক্রাকারে পদ্ধতিটিকে পুনঃ পুনঃ ঘটাতে পারে। পদ্ধতিটির ছক 2নং চিত্রে প্রদত্ত হলো।

সোভিয়েত রাশিয়া, ফ্রান্স, এবং সুইজারল্যাণ্ডের আলোক রসায়নবিদেরাও গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন যে ক্লোরোপ্লাস্টের বিনিময়ে কোনও আলোক-শোষী পিগমেন্ট (pigment) এবং কৃত্রিম ইলেকট্রন-দাতা (electron doner) ব্যবহার করে হাইড্রোজেন উৎপাদন সম্ভব।

লণ্ডনের কিংস্ কলেজের উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডেভিড হ্যল (David Hall) এইরকম তরলমিশ্রণ থেকে 2১° ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রায় প্রতি মিলিগ্রাম ক্লোরোফিলের সাহায্যে প্রতি ঘণ্টায় এক লিটার হারে হাইড্রোজেন উৎপাদনে সক্ষম হন। তরল মিশ্রণটির pH (পি. এইচ. হচ্ছে তরলের অম্লতাজ্ঞাপক রাশি) রাখা হয়েছিল 7-এর কাছাকাছি। দুর্ভাগ্যের কথা, প্রক্রিয়াটির আয়ুষ্কাল ছিলো মাত্র ছয় ঘণ্টা।

নিরবচ্ছিন্ন আলোর ক্রিয়ায় এবং অক্সিজেনের উপস্থিতিতে ক্লোরোপ্লাস্টের কার্যক্ষমতার দ্রুত অবলুপ্তিই হলো এই পদ্ধতিতে দীর্ঘক্ষণ ধরে হাইড্রোজেন উৎপাদনের প্রধান সমস্যা। অতএব, প্রচেষ্টা চলতে লাগলো কেমন করে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ক্লোরোপ্লাস্টের সন্ধান পাওয়া যায়। দেখা গেল কেনোপোডিয়াম (chenopodium) নামক একপ্রকার সাধারণ আগাছা থেকে পাওয়া ক্লোরোপ্লাস্ট অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী।

একদল বিজ্ঞানী আবার এই সময় থেকেই ভাবতে শুরু করলেন জৈব উপাংশ (biological components) থেকে ক্লোরোপ্লাস্ট সংগ্রহের পরিবর্তে কৃত্রিম কোনও রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করেও ঠিক একই ফল পাওয়া যেতে পারে কিনা। [illegible] যে অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে মিথাইল [illegible] ইলেকট্রন-বাহক হিসাবে ব্যবহার করলে

এখানে হাইড্রোজেনকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহারের সুবিধাগুলো কি কি সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

প্রথমতঃ জল, আর সূর্যের আলো, উভয় উপাদানই প্রকৃতির ভাণ্ডারের পর্যাপ্ত পরিমাণে বর্তমান। এ দুটি উপাদান সংগ্রহে যেমন কোনও ঝামেলা নেই, তেমনি নেই বিশেষ কোনও খরচ।

দ্বিতীয়তঃ এই পদ্ধতিতে আহৃত শক্তি পুনর্নবীকরণ-যোগ্য (renewable)। হাইড্রোজেনকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করলে, বাতাসের অক্সিজেনের সাথে মিশে তা আবার জল উৎপন্ন করবে।

$$2H_2 + O_2 = 2H_2O$$
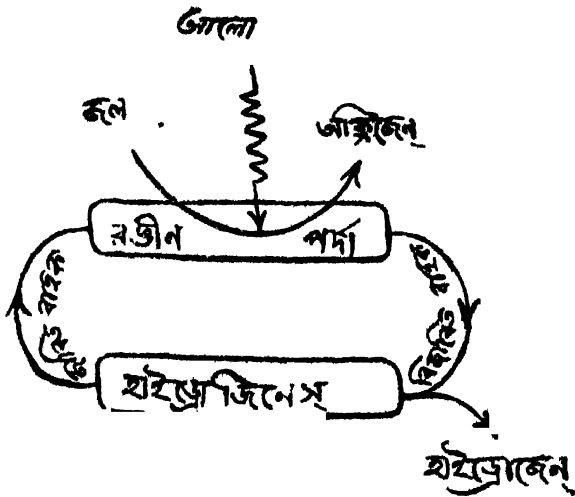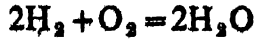
2নং চিত্র

সেই জলকে সূর্যরশ্মির সহায়তায় ভেঙ্গে ফেলে, আবার হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন ফিরে পাওয়া যাবে। অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে এই ভাঙ্গা-গড়ার খেলা। মানুষের জ্বালানীর ভাণ্ডারেও টান পড়বে না কোনও দিন।

তৃতীয়তঃ হাইড্রোজেনকে জ্বালানী হিসাবে সংরক্ষণ এবং দূরবর্তী স্থানে প্রেরণ অপেক্ষাকৃত সহজ। কঠিন, (ধাতব হাইড্রাইড হিসাবে) তরল বা গ্যাসীয় যে কোনও অবস্থাতেই হাইড্রোজেনকে সংরক্ষণ করা চলে। যেমন করে পেট্রোল, ডিজেল কিংবা কেরোসিন জাতীয় জ্বালানী এক স্থান থেকে অন্য-স্থানে নেওয়া হয়, ঠিক সেই ভাবেই অতি সহজে লরি, ট্রেন কিংবা জাহাজে করে তরল হাইড্রোজেনকে স্থানান্তরিত করা যাবে। আর ভূনিম্নস্থ পাইপলাইনের সাহায্যে সরবরাহ করা যাবে গ্যাসীয় হাইড্রোজেন। বিদ্যুৎশক্তি যখন পরিবাহী তারের মধ্য দিয়ে দূরতম কোনও স্থানে প্রেরিত হয়, তখন পরিবাহীর রোধের (resistance) জন্য বেশ কিছু পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি, পরিবহণকালেই তাপশক্তি হিসাবে নষ্ট হয়। হিসাবে দেখা গেছে যে 900 কিলোমিটারের অধিক দূরবর্তী স্থানে বিদ্যুৎ প্রেরণ আর্থিক বিচারে সুবিধাজনক নয়। অথচ, হাইড্রোজেন সরবরাহের ক্ষেত্রে এ ধরণের অসুবিধা আদপেই নেই। 1600 কিলো-মিটারের চেয়েও অধিক দূরবর্তী স্থানে পাইপের সাহায্যে হাইড্রোজেন পাঠাতে যে খরচ পড়বে তা বিদ্যুৎশক্তি প্রেরণের খরচের অর্ধেক অপেক্ষাও কম।

চতুর্থতঃ হাইড্রোজেনকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করলে, ধোঁয়া বা ক্ষতিকর গ্যাস সমূহ উৎপন্ন না হওয়ায়, পরিবেশ দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা আদপেই থাকে না। হাইড্রোজেন-চালিত যানবাহনগুলোও চলাচল করে নিঃশব্দে। ফলে শব্দ দূষণের মাত্রাও যাবে কমে।

পঞ্চমতঃ পেট্রোল, ডিজেল অথবা অন্যান্য জ্বালানী অপেক্ষা হাইড্রোজেন ব্যবহারের ফলে, তাদের বেগ হবে বর্তমান বেগের দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ।

1982 খৃষ্টাব্দের 19শে মে, টোকিওর মাসাসি টেক্নোলজিক্যাল্ কলেজের অধ্যাপক শো-ই-চি ফুরুটা এবং তাঁর সহকর্মীরা পরীক্ষা-মূলকভাবে হাইড্রোজেনকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করে যে মোটরগাড়ী চালালেন, তার সর্বোচ্চ বেগ ছিল ঘণ্টায় 135 কিলোমিটার।

শক্তি সমস্যার তীব্রতা অনুভব করে বিকল্প শক্তি উৎস অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা জোর কদমে এগিয়ে চলেছে পৃথিবীর নানা দেশে। 1981 খৃষ্টাব্দের অগাস্ট মাসে নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত হলো এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন যার মূল উদ্দেশ্যে ছিল নতুন এবং পুনর্বিনিয়োগযোগ্য সম্ভাব্য শক্তি উৎস অনুসন্ধানের উপর গুরুত্ব আরোপণ। আমাদের দেশেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী সম্প্রতি 'কেয়ার' (CARE) নামক অতিরিক্ত শক্তি উৎস সন্ধানকারী সংস্থা (Commission of Additional Resources of Energy) গঠনের সংবাদ পার্লামেন্টে ঘোষণা করেছেন। পৃথিবীতে মানব সভ্যতার অস্তিত্ব বজায় রাখার তাগিদেই মানুষকে শক্তি সমস্যা সমাধানের সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে অবিলম্বে। প্রয়োজনই যখন আবিষ্কারের জননী, তখন নিঃসন্দেহে আশা করা যায়—মানুষের শক্তির প্রচণ্ড চাহিদাই মানুষকে এই বিকল্প শক্তি উৎসের অফুরন্ত ভাণ্ডারটির উপযুক্ত চাবির সন্ধান দেবে। উদ্ভিদের সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার অনুকরণে সৌরশক্তি কাজে লাগিয়ে জল থেকে জ্বালানী নিষ্কাশন হয়তো এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারবে।

আমরা আশা ভরা বুকে অপেক্ষা করে থাকবো সেই অদূর ভবিষ্যতের জন্য যখন পর্যাপ্ত পরিমাণ শক্তির সরবরাহে আধুনিক যন্ত্র সভ্যতা উন্নততর হতে থাকবে দ্রুত গতিতে অথচ আমাদের বাসস্থান এই পৃথিবীর পরিবেশ থাকবে কলুষমুক্ত।

পতঙ্গের উদ্যান

তপতী মণ্ডল*

কীট-পতঙ্গেরও উদ্যান আছে, কথাটা ভাবতে খুবই অবাক লাগে, কিন্তু যতই অবিশ্বাস্য হোক না কেন ব্যাপারটা সত্যি। উদ্ভিদবিজ্ঞান সম্বন্ধে যাঁদের সামান্য আগ্রহ আছে তাঁরা নিশ্চই জানেন যে ছত্রাকজাতীয় উদ্ভিদেরা সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না কারণ এদের দেহে সবুজ কণা বা ক্লোরোফিল থাকে না। সেইজন্য এই জাতীয় উদ্ভিদেরা খাদ্যের জন্য অন্যান্য প্রাণীর উপর বা পচা গলিত জৈব পদার্থের উপর নির্ভর করে। এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে কিছু কীট-পতঙ্গও একই ভাবে ছত্রাকজাতীয় উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে জীবন-ধারণের জন্য। এই পতঙ্গেরা রীতিমত ছত্রাক উদ্যান তৈরি করে এবং প্রয়োজনানুযায়ী তত্ত্বাবধান করে।

কীট-পতঙ্গেরা কিন্তু যে কোন ছত্রাক নিয়ে উদ্যান তৈরি করে না। কোন একটি পতঙ্গ একটি বিশেষ ধরণের ছত্রাক নিয়েই তার বাগান প্রস্তুত করে। কোন কোন ক্ষেত্রে পতঙ্গ, ছত্রাককেই খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে আবার কোন ক্ষেত্রে ওদের অর্ধপাচিত খাদ্যকে। ছত্রাক ও পতঙ্গের সহাবস্থান সাধারণতঃ দু-ধরণের হয়। প্রথম ক্ষেত্রে, ছত্রাক পতঙ্গের খাদ্যনালীতে বাস করে এবং নানাপ্রকার রস নিঃসরণ করে খাবার হজম করতে সাহায্য করে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ছত্রাক পতঙ্গের বাসায় বসবাস করে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর সম্পর্ক নিয়ে বিজ্ঞানীরা সুদীর্ঘ কাল ধরে গবেষণা করে চলেছেন।

এক ধরণের মশা জাতীয় পতঙ্গ আছে যারা ডিম পাড়লে গাছের পাতায় বা কুঁড়িতে টিউমার (gall) তৈরি হয়। এই টিউমারের ভিতর ছত্রাকেরা একটি পুরু স্তর তৈরি করে বাস করে। একটি বিশেষ প্রকার ছত্রাককেই সর্বদা এই ধরণের টিউমারে সহাবস্থান করতে দেখা যায়। বিজ্ঞানীদের মতে এই কীটটি ডিম পাড়ার সময় এর সঙ্গে ছত্রাকের স্পোর যুক্ত থাকে। সম্ভবতঃ ছত্রাকটি পতঙ্গকে টিউমারের কলাগুলি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করতে সাহায্য করে।

সেপ্টেবেসিডিয়াম (Septebasidium) নামক ছত্রাক এবং ককসিডি (Coccidae) পরিবারভুক্ত এক শ্রেণীর পতঙ্গের মধ্যে অদ্ভুত ধরণের সহাবস্থান দেখা যায়। এই ছত্রাকটি গাছের ডালপাতায় একটি মোটা আস্তরণ সৃষ্টি করে। এই শ্রেণীর পতঙ্গ গাছের রস শোষণ করার উদ্দেশ্যে শক্তভাবে গাছের ডালে বা পাতায় আটকিয়ে থাকে। সেপ্টোবেসিডিয়ামের এই পুরু [illegible]লিকে ঝড়, বৃষ্টি এবং অন্যান্য প্রাণীর নিকট থেকে রক্ষা করে। এর পরিবর্তে ছত্রাকটি পতঙ্গের দেহে শোষক সূত্র (haustoria) প্রেরণ করে এবং খাদ্যরস সংগ্রহ করে। পতঙ্গটি একটি বাসস্থান থেকে অন্যস্থানে গেলে এর দেহাবস্থিত প্রচুর ছত্রাকের স্পোরও সেইস্থানে যায় এবং এইভাবে বিস্তারলাভ করে। এই প্রকার সহাবস্থানে উভয়েই লাভবান হয়।

সাইরেক্স, টিমেক্স ইত্যাদি ধরণের বোলতার সঙ্গে স্টিরিয়াম (Stereum), ডিডালিয়া (Daedalia) প্রভৃতি ছত্রাকের ভিন্ন প্রকৃতির সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। এই ছত্রাকগুলি সাধারণতঃ গাছের ডালপালা থেকে অর্ধবৃত্তাকার বন্ধনীর ন্যায় বস্তু প্রস্তুত করে। প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীবোলতা ভিজা কাঠের গায়ে ডিম পাড়ে। এরা সাধারণতঃ লম্বা সরু ডিম্বথলির সাহায্যে ডিম বের করে। এই ডিম্বথলির গোড়ার দিকে কতকগুলি থলির মত অংশ থাকে যার মধ্যে উল্লিখিত ছত্রাকগুলির বিশেষ ধরণের স্পোর, ওইডিয়া (oidia) জমা থাকে। ডিমগুলি বাইরে আসার সময় ঐ স্পোরগুলি এর সঙ্গে লেগে যায়। পরে ঐ স্পোরগুলি অঙ্কুরিত হয় এবং অনুসূত্রিকাগুলি কাঠকে সূক্ষ্মভাবে ছিদ্র করে প্রবেশ করে, তারপর ডিমগুলি থেকে বোলতার লার্ভা বের হয়ে ঐ পথে প্রবেশ করে। ঐ ছত্রাকগুলি কাঠকে আংশিকভাবে জারিত করে লার্ভাদের খাদ্যোপযোগী করে তোলে।

অ্যাম্বোসিয়া জাতীয় পতঙ্গ এদের দেহের মধ্যে ছত্রাক বহন করে নিয়ে বেড়ায়। কাঠে বসবাসকারী অসংখ্য পতঙ্গ এই ছত্রাকের সাহায্য ছাড়া বাঁচতে পারে না। এই সব পতঙ্গের দেহের বাইরের দিকে কতকগুলি ছত্রাকথলি (mycangia) থাকে যার মধ্যে প্রচুর ছত্রাকের স্পোর জমা থাকে। যখন এরা কোন কাঠ ছিদ্র করে তার মধ্যে প্রবেশ করে সেই সময় ছত্রাকের স্পোরগুলিও বাইরে এসে ঐ ছিদ্রের মধ্যে বিস্তার লাভ করে এবং অতি শীঘ্রই ভেলভেটের মত একটি ছত্রাক আস্তরণ সৃষ্টি করে। পতঙ্গগুলি সাধারণতঃ এই ছত্রাকের আস্তরণের কোষ থেকেই খাদ্যরস সংগ্রহ করে। এরা সাধারণতঃ গাছপালার ক্ষত, দুর্বল কাণ্ডকেই আক্রমণ করে।

সর্বাপেক্ষা বিচিত্র ধরনের ছত্রাক পালনকারী পতঙ্গ বলা যায় টারমাইটকে (termite)। যে সমস্ত টারমাইট ছত্রাকের বাগান তৈরি করে তারা সাধারণতঃ আফ্রিকা বা এশিয়ার বাসিন্দা। এরা কাঠের আসবাবপত্রাদি ছাড়াও, রবার, চামড়া বা কাগজের জিনিষ এবং শস্যাদিরও ক্ষতি করে। ম্যাক্রোটারমিস (Macrotermes)

*74, পূর্বদাস রোড, কলিকাতা 700029

এবং ওডোনটোটারমিস (Odonototermes) প্রজাতির টারমাইটেরা ছোট টিলার মত আকৃতির বাসা তৈরি করে, এইগুলি 30 ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। মাইক্রোটারমিস প্রজাতির টারমাইট আবার সম্পূর্ণভাবে মাটির তলায় বাস করে।

প্রত্যেক বাসায় এক বা একাধিক ছত্রাক উদ্যান থাকে। ছত্রাক বাগানের সংখ্যা বা আকৃতি বিভিন্ন প্রকার টারমাইটের উপর নির্ভর করে। এই বাগানগুলি সাধারণতঃ এক থেকে দুই ইঞ্চি লম্বা হয় এবং টারমাইটের বাসার ইতস্ততঃ ছড়ানো থাকে। এই ছত্রাক উদ্যানগুলি সাধারণতঃ ধূসর বা খয়েরী রঙের স্পঞ্জের মত,
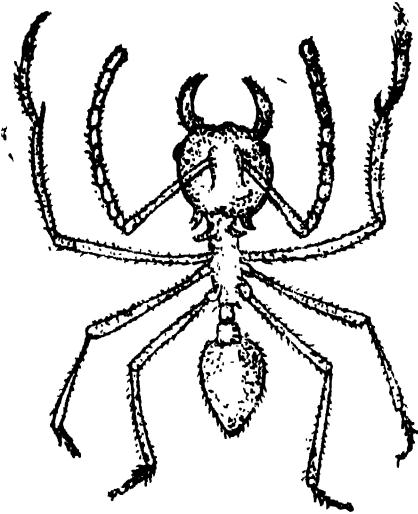
আট্টা টেক্সানা (পিপীলিকা)

ভিজা কিন্তু মজবুত। এই বাগানগুলির মধ্যে ও বাইরে অসংখ্য গোলাকার, সাদা, চকচকে বস্তু ছড়ানো থাকে। এইগুলি সাধারণতঃ ছত্রাকের কোষ দিয়ে তৈরী। এই ছত্রাকগুলি সম্ভবতঃ কাঠের সেলুলোজ অংশকে বিযোজিত করে ও টারমাইটের গ্রহণযোগ্য করে তোলে। কখনও কখনও ডানাযুক্ত টারমাইটেরা ছত্রাক বাগানের কিছু অংশ নিয়ে অন্যত্র চলে গিয়ে নতুন বাগান প্রস্তুত করে।

অনেক সময় টারমাইটদের ছত্রাক বাগানে এদের সঙ্গে সম্পর্ক বিহীন অন্যান্য ছত্রাকও জন্মায়। টারমিটোমাইসিস (Termitomyces) নামের এক ধরনের মাশরুম ছত্রাক পালনকারী টারমাইটের বাসাতেই কেবলমাত্র জন্মায়।

এই প্রসঙ্গে আর একটি সহাবস্থানের কথা উল্লেখ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। পৃথিবীর পশ্চিম গোলার্ধে এক জাতীয় পিপীলিকা আছে যাদের ছত্রাকের সঙ্গে একটি বিস্ময়কর সম্বন্ধ আছে। আট্টা টেক্সানা (Atta texana) নামক পিপীলিকা, যারা আমেরিকার টেক্সাস অঞ্চলের বাসিন্দা সম্পূর্ণভাবে ছত্রাকের উপর খাদ্যের জন্যে নির্ভর করে এবং সরাসরি ছত্রাককেই খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। এই পিপীলিকারা অপরিণত পাইন গাছের পাতা কেটে এনে ছত্রাকদের খেতে দেয়। এরা 50 ফুট পর্যন্ত প্রশস্ত এবং 20 ফুট গভীর পিপীলিকা নগরী গড়ে তোলে। শ্রমিক পিপীলিকারা ছত্রাকের জন্য গাছের কচিপাতা, ফুলের পরাগ-রেণু ইত্যাদি সংগ্রহ করে আনে। ছত্রাক বাগানগুলি ধূসর রঙের, স্পঞ্জের মত এবং মাইসেলিয়াম দ্বারা আবৃত থাকে। নতুন বাসার সন্ধানে যাবার সময় রাণী পিপীলিকা তার মুখের নীচের থলিতে ছত্রাকের সামান্য অংশ বয়ে নিয়ে যায়। কোন নতুন বাসার শুরুতে রানী পিপীলিকা
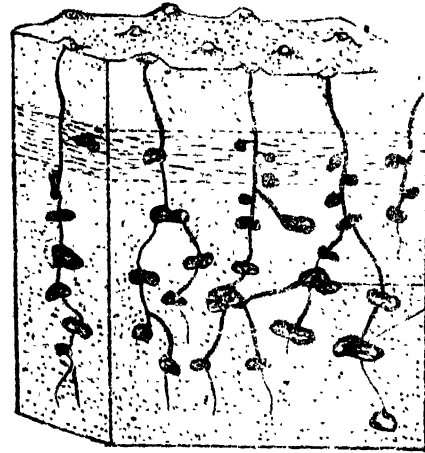
মাটির নীচে আট্টা টেক্সানার বাসা

তার মুখ নিঃসৃত লালায় প্রথম ছত্রাক বাগান সৃষ্টি করে। প্রথমে শিশু কর্মী পিপীলিকাগুলি এই ছত্রাক উদ্যানের খাদ্য খেয়ে পরিণত হয়। পরে এরা অন্যান্য ছত্রাক বাগান তৈরি করে এবং এইসব ছত্রাকের জন্যে খাদ্য সংগ্রহ করে।

আলোচ্য বিষয় থেকে বোঝা যায় যে পতঙ্গ ও ছত্রাকের মধ্যে দুই ধরণের সহাবস্থান আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে পতঙ্গেরা ছত্রাকের উপর সরাসরিভাবে খাদ্যের জন্য নির্ভরশীল আবার অপর ক্ষেত্রে ছত্রাকের দ্বারা অর্ধপাচিত খাদ্যের জন্য। এই বিষয়ে পতঙ্গেরা প্রাণী জগতের বিস্ময়ের কারণ তারা উদ্ভিদ জগতের সঙ্গে এক অদ্ভুত সহযোগিতায় জীবনধারণ করতে সক্ষম।

আগামী 2000 খৃস্টাব্দের সমস্যা

সত্যরঞ্জন পাণ্ডা*

আর মাত্র 18 বছর পর 19 শত খৃস্টাব্দকে বিদায় নিতে হচ্ছে আমাদের কাছ থেকে। এ কয়েক বছরের মধ্যে যা ঘটুক না কেন 2000 খৃস্টাব্দ আসবেই। এই খৃস্টাব্দ নিয়ে বিভিন্ন দিক দিয়ে এর মধ্যে হয়তো অনেক চিন্তা-ভাবনা সুরু হয়ে গেছে। কিন্তু যে দিন থেকে এই খৃস্টাব্দ আরম্ভ হচ্ছে সেদিন থেকে গণিতের প্রচলিত দুটি নিয়মকে বিরুদ্ধাচরণ করবে। প্রথমটি হচ্ছে লীপ-ইয়ার এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে তারিখ। বর্তমান নিবন্ধে এ-দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

লীপ-ইয়ার (leap year)— আহ্নিক ও বার্ষিক গতি দুটি পৃথিবীর আবর্তন গতি। পৃথিবী নিজ অক্ষের চারদিকে আবর্তন করা ছাড়াও সূর্যের চার দিকে আবর্তন বা পরিভ্রমণ করে। এই ভ্রমণ পথকে বলা হয় কক্ষ। কক্ষের আকৃতি উপবৃত্তাকার এবং পরিধি প্রায় 93·5 কোটি কি.মি.। পৃথিবীর নিজ অক্ষের উপর আবর্তনের ফলে হয় দিন ও রাত্রি এবং সূর্যের চারদিকে আবর্তন সম্পূর্ণ করতে পৃথিবীর যে সময় লাগে সেটাকে বলা হয় 'সৌর বছর' বা 'বছর'। 93·5 কোটি কি.মি. পৃথিবীর কক্ষ-পথের পরিধি ভ্রমণ করতে করতে পৃথিবী সূর্যকে একবার সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ করে। সময় লাগে প্রায় $365\frac{1}{4}$ দিন। কিন্তু শুদ্ধ ভাবে হিসাবে ঐ সময়ের অর্থাৎ এক বছরের পরিমাণ 365 দিন 5 ঘণ্টা 48 মিনিট এবং (45-46) সেকেণ্ড। কিন্তু সাধারণ ভাবে আমরা ধরে থাকি 365 দিন 6 ঘণ্টা বা $365\frac{1}{4}$ দিন। কিন্তু বিভিন্ন কাজ কর্ম, ও অন্যান্য হিসেবের সুবিধের জন্য 'লৌকিক বছর' (civil year) হিসেব করতে প্রথম তিন বছর ধরা হয় 365 দিন এবং চতুর্থ বছর ধরা হয় 366 দিন। তা হলে 4 বছরে মোট দিন সংখ্যা হয় 1461। এ ভাবে হিসেবে চতুর্থ বছরকে ধরা হয় "লীপ-ইয়ার" বাংলায় একে বলা হয় "পরিবছর"।

লীপ-ইয়ার গণনা—সাধারণ ভাবে খৃস্টাব্দ গণনায় যত বছর হয় সে সংখ্যা যদি 4 দ্বারা সম্পূর্ণ বিভাজ্য হয় তবে সে বছরটি হবে লীপ-ইয়ার। কিন্তু যদি বছরটি কোন শতক বা শতাব্দী হয় এবং যদি সে সংখ্যাটি 400 দ্বারা বিভাজ্য হয় তা হলে সে বছরটা হবে লীপ-ইয়ার, নচেৎ হবে না। এই নিয়ম অনুসারে 1824, 1936···, 1200, 1600, 2000, 2400,···ইত্যাদি খৃস্টাব্দগুলি লীপ-ইয়ার এবং 927, 1281, 1937, 1900,···ইত্যাদি খৃস্টাব্দগুলি লীপ-ইয়ার নয়।

2000 খৃস্টাব্দ পর্যন্ত লীপ ইয়ারের সংখ্যা—সূক্ষ্ম ভাবে বিচার করতে গেলে সৌর বছরের আসল পরিমাণ 365 দিন 5 ঘণ্টা 48 মিনিট 45 সেকেণ্ড আবার কেউ কেউ ধরেন 365 দিন 5 ঘণ্টা 48 মিনিট 46 সেকেণ্ড। যদি পরিমাপটির প্রথমটি গ্রহণ করা যায় তা হলে সেটা আমাদের লৌকিক বছর (365 দিন) থেকে 5 ঘণ্টা 48 মিনিট এবং 45 সেকেণ্ড বেশী, এবং সৌর বছর ($365\frac{1}{4}$ দিন বা 365 দিন 6 ঘণ্টা) থেকে 11 মিনিট 15 সেকেণ্ড কম, অর্থাৎ $11\frac{1}{4}$ মিনিট কম। তা হলে 4 বছরে মোট দিন সংখ্যা ($365\times3+366$) 1461 ধরলে মোট $11\frac{1}{4}$ মিনিট $\times$ 4 বা 45 মিনিট কম না ধরে বেশী ধরা হয়ে যাচ্ছে। 400 বছরে এই বেশীটি হচ্ছে (45×100) 4500 মিনিট বা 75 ঘণ্টা অর্থাৎ 3 দিন। তাই প্রতি 400 বছরে এই তিনটি দিন বাদ দেওয়া হয়, ফলে 400 বছরে মোট লীপ-ইয়ারের সংখ্যা $100-3=97$টি। সুতরাং 2000 খৃস্টাব্দ পর্যন্ত মোট লীপ-ইয়ার সংখ্যা $97\times5=485$টি।

2000 খৃস্টাব্দ কেন লীপ-ইয়ার হবে না—আগের লীপ-ইয়ারের নিয়ম অনুসারে 2000, 4 এবং 400 উভয় দ্বারা বিভাজ্য সুতরাং এটা লীপ-ইয়ার হওয়া উচিৎ। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে হিসেব করলে দেখা যাবে এই খৃস্টাব্দ লীপ-ইয়ার হতে পারছে না। এদিক দিয়ে এই খৃস্টাব্দটি কিন্তু গাণিতিক নিয়মকে বিরুদ্ধাচরণ করল। এর কারণ ও হিসেব নীচে দেওয়া হলো, যেখানে এক বছরকে ধরা হয়েছে—365 দিন 5 ঘণ্টা 48 মিনিট 46 সেকেণ্ড।

প্রথমে দেওয়া হলো 1 খৃস্টাব্দ থেকে 2000 খৃস্টাব্দ পর্যন্ত মোট দিন সংখ্যা।

$$365\times2000 \qquad 730000 \text{ দিন}$$

2000 খৃস্টাব্দ পর্যন্ত 5 ঘণ্টা করে মোট দিন সংখ্যা = $2000\times\frac{5}{24}$ 416·6666 দিন

48 সেকেণ্ড করে মোট দিন সংখ্যা = $2000\times\frac{8}{60\times24}$ 66·6666 দিন

46 $2000\times\frac{46}{60\times60\times24}$ 1 0648 দিন

*মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউশন (মেন) 39 শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা-700004

∴ 2000 খৃস্টাব্দ পর্যন্ত মোট দিন সংখ্যা = 730484·3980
= 730484·40 (প্রায়)

কিন্তু এক বছর $365\frac{1}{4}$ দিন ধরলে 2000 খৃস্টাব্দ পর্যন্ত মোট দিন সংখ্যা হয় $365\frac{1}{4}\times2000=730500$, এর পরিমাণ প্রকৃত দিন থেকে 15·602 দিন বেশী।

আবার কাজকর্ম হিসাব ইত্যাদি সুবিধার জন্য যখন 365 দিনে এক বছর ধরি তখন 2000 খৃস্টাব্দ পর্যন্ত দিন সংখ্যা হয় 365×2000 বা 730000, কিন্তু প্রকৃত দিন সংখ্যা হয় 730484·3980 (প্রায়) সুতরাং আমাদের হিসেব থেকে 484·3980 দিন বেশী। কিন্তু লীপ-ইয়ারের নিয়ম অনুসারে এটাকে ধরা হয়েছে 485 দিন তা হলে প্রকৃত (485—484·390) দিন বা ·702 দিন অর্থাৎ 16·848 ঘণ্টা বেশী ধরা হয়ে যাচ্ছে। ফলে 2000 খৃস্টাব্দটি লীপ-ইয়ার হতে পারছে না।

2000 খৃস্টাব্দের পরবর্তী লিপ-ইয়ার—2000 খৃস্টাব্দটি পরিবছর অর্থাৎ লীপ-ইয়ার হতে পারছে না 16·848 ঘণ্টার জন্য। নিয়ম অনুসারে পরবর্তী 2004 খৃস্টাব্দটি লীপ-ইয়ার হচ্ছে। কারণ এই 16·848 ঘণ্টাটি আগামী 3 বছরের মধ্যে শেষ হতে পারার জন্য পরবর্তী খৃস্টাব্দটি লীপ-ইয়ার হলো।

2000 খৃস্টাব্দ থেকে তারিখ লেখা—যেহেতু 2000 খৃস্টাব্দের শেষ দুটি অঙ্ক শূন্য সে জন্য এ খৃস্টাব্দ আরম্ভ হওয়ার পর থেকে তারিখ লেখার দিক দিয়েও বেশ অসুবিধা হতে পারে। সংখ্যার পর শূন্য (0) লেখা বা দেওয়ার পদ্ধতি আছে কিন্তু শুধুমাত্র শূন্য (0) বসিয়ে সংখ্যা লেখার পদ্ধতি নেই। তা হলে এক্ষেত্রে তারিখ লেখা হবে কি করে? যেমন 5-11-82 ইত্যাদি প্রচলিত নিয়ম অনুসারে লেখা হয় এ ক্ষেত্রে কি তাই হবে? যদি এই নিয়ম মেনে নেওয়া হয় তাহলে উক্ত তারিখটি লেখা হবে 5-11-00। কিন্তু এটা কি যুক্তিসঙ্গত হবে? যেহেতু '00'-এর আগে কোন সংখ্যা নেই সুতরাং এভাবে প্রকাশ করা ঠিক নয়। তা হলে ঐ তারিখটি লিখতে হবে 5-11-2000 হিসেবে। কিন্তু এতে দৈনন্দিন কাজকর্মের অনেক অসুবিধা দেখা দিতে পারে। সে জন্য একটা সহজ পদ্ধতির প্রয়োজন। কিন্তু 2001—2009 পর্যন্ত তারিখ লেখা হয়েছে কোন অসুবিধা হবে না, কারণ এগুলি '01, '02,···'09 পর্যন্ত লেখা চলতে পারে।

প্রস্তাব—ইউরোপে হিন্দু প্রণালী প্রচারিত হওয়ার পূর্বে রোমান প্রণালী (Roman system) প্রচলিত ছিল। এতে শূন্যজ্ঞাপক কোন সংখ্যা ছিল না। এতে প্রত্যেক সংখ্যাগুলির এক একটি আলাদা চিহ্ন ছিল। যেমন 20→XX, 31→XXI, C=100, 300→CCC, 900→CM, 1000→M, 1900→MCM, 2000→MM ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ করা যায়। যদি এই প্রণালী মেনে নেওয়া যায় তা হলে উক্ত তারিখটি হবে 5.11.XX, এটা আকারে ছোট হবে এবং লেখা ইত্যাদি ব্যাপারে অনেক সুবিধা হবে। এভাবে দুটি শূন্য পাশাপাশি না লিখে তার বদলে সোজাসুজি দু-হাজার সংখ্যার রোমান অক্ষর বসালে কোন ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না। রোমান অক্ষর আমাদের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে এখনও প্রচুর ব্যবহার করা হচ্ছে। বিভিন্ন ঘড়ি, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণী, অফিস প্রভৃতির বিভিন্ন কাজকর্ম ইত্যাদিতে তার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়।

বক-গোলক

সূর্যকুমার বর্মন*

বস্তুতঃ আমাদের গ্যালাক্সির তারকাগুলি এত দূরে দূরে আছে যে তাদের দূরত্ব প্রাত্যহিক জীবন থেকে হৃদয়ঙ্গম করা প্রায় অসম্ভব। যেমন আমাদের সূর্যের নিকট প্রতিবেশী তারকাগুলির গড়-দূরত্ব প্রায় তিন আলোকবর্ষ (1 আলোকবর্ষ=9·4605×10^{15} মিটার)। নক্ষত্রগুলির মধ্যে যে সব ফাঁক রয়েছে, সেখানে অনেক এবং অধিকাংশই অনুজ্জ্বল সূক্ষ্ম, ধূলিকণা সমন্বিত গ্যাসের মেঘ রয়েছে। যদিও মেঘগুলি সমগ্র গ্যালাক্সির ভরের মাত্র দশ শতাংশ, তথাপি তারা গ্যালাক্সির একটা গতিশীল এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কারণ তারাই হচ্ছে সেই প্রাথমিক উপাদান, যা থেকে নতুন তারকার জন্ম হচ্ছে।

ওলন্দাজ আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী বার্ট জে. বক প্রায় 34 বৎসর পূর্বে বিশেষ ধরনের আন্তঃনাক্ষত্রিক মেঘগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যেগুলিকে তাঁর নাম অনুসারে 'বক-গোলক' বলা হয়। বক-গোলকের সংজ্ঞা হিসেবে বলা যেতে পারে যে, তারা এক ধরনের আন্তঃনাক্ষত্রিক ধূলিকণা সমন্বিত মেঘ যেগুলি দৃঢ়, সুসমঞ্জস। আন্তঃনাক্ষত্রিক ফাঁকে এই গোলকগুলিই (প্রধানতঃ হাইড্রোজেন গ্যাস ধারণ করে রয়েছে) সবচেয়ে ছোট আকৃতির। বেশীর ভাগের উষ্ণতা মাত্র প্রায় দশ ডিগ্রী কেলভিন। জ্যোতির্বিজ্ঞানী বক প্রস্তাব করেন যে, এই গোলকগুলিই তারকা সৃষ্টির সম্ভাব্য পূর্ব অবস্থা। যদিও বর্তমান সাক্ষ্য বকের মৌলিক অনুমানের সত্যতা সমর্থন করার দিকে, তথাপি গত কয়েক বছরে এটা পরিষ্কার হয়েছে যে তারকা সৃষ্টির সুস্পষ্ট বস্তুগুলি গোলক নয়, আণবিক মেঘের পিণ্ডবিশেষ যেগুলি উজ্জ্বল পরিব্যাপ্ত আয়নিত গ্যাসের (যাদের H_{II} অঞ্চল বলে) সঙ্গে যুক্ত। ফলে

*পুবাটুলি, মালদহ 732101

তারকা সৃষ্টির পূর্ব অবস্থা হিসেবে বক-গোলকের গুরুত্ব কমে গেছে। তবে অন্যদিক দিয়ে যেমন—আন্তঃনাক্ষত্রিক ফাঁকে আরও অনেক বেশী ঘনত্বের বস্তুর সংবাদের উৎস হিসেবে বক-গোলকের গুরুত্ব বেড়েই চলেছে।

বক তাঁর সহকর্মী ই. এফ. রিলী-র সাহায্যে 1947 খৃস্টাব্দে দুই ধরনের আন্তঃনাক্ষত্রিক কালো মেঘের পরিচয় দেন। তার মধ্যে একটি দলের খুব সহজে পাঠ নেওয়া যায়, যেগুলিকে অনেক সময় বৃহদাকার বক-গোলক বলে। তারা খুব অস্বচ্ছ এবং গোলাকার। দ্বিতীয় দল যাদের সম্বন্ধে এখনও খুব কমই জানা আছে তারা খুবই ছোট আকারের এবং ভীষণ রকমের অস্বচ্ছ, যাদের H_{11}-অঞ্চলে অভিক্ষেপের ফলে দেখা যায়। দুই ধরণের গোলকের সম্ভবতঃ আকার থেকেও বেশী কিছু পার্থক্য রয়েছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানী বক প্রস্তাব করেছিলেন যে, বক-গোলক নিজের আকর্ষণে নিজেই সুস্থির নয়। ফলে শেষ পর্যন্ত গোলকগুলি ভেঙ্গে গিয়ে এক বা একাধিক তারকা গঠন করে। কিন্তু কোন জোরালো চাক্ষুষ প্রমাণ নেই যে, তারকা বর্তমানে গোলকগুলির মধ্যে সৃষ্টি হতে চলেছে। তাহলে ভেঙ্গে পরার জন্য যে ভৌতিক প্রয়োজনীয় রাশি, তা নির্ণয় করে এগোনো ছাড়া আমাদের পথ নেই। ধরি গোলকের ভর, ব্যাসার্ধ, আভ্যন্তরীণ উষ্ণতা জানা আছে; গোলকগুলি প্রথম কাছাকাছি মান হিসেবে সম্পূর্ণ সমরূপ এবং এগুলিকে সম্পূর্ণ গোলক হিসেবে কল্পনা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে যে মেঘের নিজ-আকর্ষণ নিজেকে চাপ দিতে উদ্যত হয়, তা তার ভর এবং ব্যাসার্ধের উপর নির্ভরশীল। ভেঙ্গে পড়ার যে প্রবণতা, তা মেঘের আভ্যন্তরীণ চাপ দ্বারা প্রাপ্ত হয়। এই চাপ গোলকের অভ্যন্তরের উষ্ণতা দ্বারা সৃষ্টি।

মনে করি গোলকের ভর এবং উষ্ণতা স্থির বলে ধরে নেওয়া হলো এবং তাহলে ব্যাসার্ধের সম্ভাব্য মানগুলি বিবেচনা করা যেতে পারে। দুই বস্তুর মধ্যে মহাকর্ষীয় বল হ্রাস পায় তাদের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতে যদি গোলকের ব্যাসার্ধ ছোট হয় তাহলে মহাকর্ষীয় আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। ব্যাসার্ধের একটা মান তাহলে আসবে, যাকে সংকট ব্যাসার্ধ বলা যায়, যখন আকর্ষণ বল আভ্যন্তরীণ চাপকে অতিক্রম করে এবং তার ফলে অধিকতর শক্তিশালী এই আভ্যন্তরীণ গতি গোলককে ভেঙ্গে দেবার দিকে অগ্রসর হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের পদার্থবিভাগের রবার্ট এউ. ডিকম্যান আটটি বক-গোলকের একটি নমুনা নিয়ে অনুসন্ধান চালান (Scientific American, June 1977, p. 66)। তাদের ভরের সীমা সৌর ভরের 19 থেকে 740-এর কিছু বেশী গুণ এবং ব্যাসার্ধের সীমা এক আলোকবর্ষ থেকে 3·8 আলোকবর্ষ। নমুনা বার্নাউ-5 ছাড়া সবগুলিরই আভ্যন্তরীণ উষ্ণতা প্রায় 10° কেলভিন, যেটা আদর্শ আন্তঃনাক্ষত্রিক কালো মেঘের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আটটি গোলকের ক্ষেত্রেই চাক্ষুষ ব্যাসার্ধ তাদের সংকট ব্যাসার্ধের চেয়ে অনেক ছোট; সুতরাং প্রদত্ত ভর এবং ব্যাসার্ধে তাদের ভেঙ্গে পড়া উচিত। তাহলে ভর, ব্যাসার্ধ এবং আভ্যন্তরীণ উষ্ণতাই যদি নিয়ন্ত্রক রাশি বলে বিবেচিত হয়, তাহলে আটটি গোলকই ভেঙ্গে পড়ার সতেজ অবস্থায় রয়েছে।

এখানে আভ্যন্তরীণ চাপ ছাড়া আরও তিনটি বাধাদানকারী কারণ—ঘূর্ণন, চৌম্বক ক্ষেত্র এবং হাইড্রোডিনামিক বিশৃঙ্খল—বিবেচনা করা যেতে পারে। মেঘ তার কেন্দ্রের চারদিকে ঘোরার ফলে যে কেন্দ্রাতিগ বল সৃষ্টি হয়, তা স্ব-আকর্ষণকে প্রতিহত করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, যদি দুটি চুম্বককে একত্রে নিয়ে তাদের সমমেরুকে চাপ দেওয়া হয়, তাহলে তাদের ক্ষেত্র প্রবলভাবে চাপকে বাধা দেয়। বক-গোলকের মধ্যে একই রকম ফল কাজ করতে পারে এবং স্ব-আকর্ষণকে প্রতিহত করতে পারে। আর, বিশৃঙ্খলা বলতে মোটামুটি ফ্লুয়িডের মধ্যে যে কোন অনিয়মিত ঘূর্ণিস্রোত গতিকে বোঝায়। যেহেতু ঘূর্ণিস্রোতের মধ্যে অবশ্যই মাঝে মধ্যে পরস্পর সংঘর্ষ ঘটে, তার ফলে মেঘের মধ্যে বিশৃঙ্খলা একটা বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে যেটা স্ব-আকর্ষণকে প্রতিহত করতে পারে। তাদের একটি বা একাধিক সম্মিলিত বল ভেঙ্গে পড়াকে আটকাতে পারে। কিন্তু পরীক্ষা থেকে জানা গেছে যে, এই বলগুলি ভেঙ্গে পড়াকে আটকানোর পক্ষে সম্ভবতঃ যথেষ্ট নয়।

তাহলে বকের অনুমান দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে অন্ততঃ একটি বক-গোলক বার করতেই হবে, যার মধ্যে একটি নতুন তারকা বা ছোট ছোট তারকা সৃষ্টি হতে চলেছে। এইরকম আবিষ্কারের সম্ভাবনা অবশ্য খুবই কম কারণ গোলকগুলির ভর খুবই কম। H_{11}—অঞ্চলে স্থাপিত একটি আদর্শ বড় আণবিক মেঘ—যেখানে স্পষ্টতঃ তারকাগুলি সৃষ্টি হতে চলেছে বলে জানা আছে—তাদের ভর সৌরভরের হাজার হাজারের অনেক দশক।

কিছুদিন পূর্বে অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডব্লউ. ই. হার্বস্ট এবং কানাডার টোরোন্টো বিশ্ববিদ্যালয়, ডি. জি. টার্নার জানিয়েছেন যে, লিন্ধ 810 নামে একটি গোলকের মধ্যে মনে হচ্ছে একটা নতুন, মাঝারি ধরণের উত্তপ্ত তারকা এবং সম্ভবতঃ আরও কিছু তারকা সৃষ্টি হতে চলেছে। লিন্ধ-810 এর ব্যাসার্ধ মনে হয় 4-5 আলোকবর্ষ, বকের নমুনায় বৃহত্তম গোলক বার্নাউ-5-এর ব্যাসার্ধের তুলনায় কিছু বড়। রেন্সেলার পলিটেকনিকের এম. এল. কুটনার আর. এল. ডিকম্যান এবং ফোরধাম বিশ্ববিদ্যায়ের কে. ডি. টুকার কিছুদিন আগে একটা পরিশ্রমদায়ক কাজ হাত নিয়েছেন। তাঁরা প্রতিফলনকারী নেবুলার সাথে যুক্ত আন্তঃনাক্ষত্রিক মেঘের আণবিক রেখাচিত্রের পাঠ গ্রহণের কাজে নেমেছেন। যদি তাঁরা কিছু কিছু এই ধরনের বস্তু পান, যাদের ভর সৌর ভরের এক-শ' থেকে কয়েক-শ' পদের, তাহলে এই সিদ্ধান্ত বাদ দেওয়া কঠিন হবে যে, বেশী ভরের গোলকগুলি বস্তুতঃ তারকা সৃষ্টির সক্রিয় অঞ্চল।

ব্যঙ্গ বিজ্ঞান

জলাতঙ্ক

গুণধর বর্মন*

জলই জীবন। সেই জল নিয়ে যদি আতঙ্ক সৃষ্টি হয় তবে জীবন কি আর থাকে? বেশী জল, কম জল অর্থাৎ বন্যা-খরার ভীতি ছাড়াও রয়েছে অসংখ্য জলবাহিত রোগের কথা এবং জলদূষণজনিত জটিল, সুদূরপ্রসারী বহুবিধ ভয়াবহতা। কিন্তু জলের নামেই আতঙ্ক বা তার শব্দ শুনলেই মৃত্যুসম যন্ত্রণা—একি ভাবা যায়? হাঁ—সেই পরিস্থিতি যাতে হয় তারই নাম 'জলাতঙ্ক' রোগ। এই অসুখ হলে মৃত্যুসম যন্ত্রণাই শুধু নয়, মৃত্যুই অবধারিত। তবে বেশী দিন ভুগতে হয় না এই যা রক্ষা। রোগলক্ষণ প্রকাশের অল্প দু-চারদিনের মধ্যেই সব শেষ। তাই এই ব্যাধির আশঙ্কা মাত্রেই অর্থাৎ রোগলক্ষণ প্রকাশের যথাসম্ভব পূর্বেই এর প্রতিকার বা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে হয়—যাকে বলে প্রোফাইল্যাক্সিস (Prophylaxis) নইলে নিস্তার নাই। রোগলক্ষণ প্রকাশের পর নিরাময়ের কোন হাতিয়ারই আজও আমাদের নেই। তবে বিজ্ঞান আজ এই ভয়াবহ রোগ নিবারণের উপযুক্ত প্রতিরক্ষণ ব্যবস্থা করতে সক্ষম। প্রত্যক্ষ যমদূতসম ভয়ংকর এই ব্যাধি সম্পর্কে জনসাধারণের কিছু বিজ্ঞানভিত্তিক চেতনা একান্তই প্রয়োজন। অবশ্য এদেশের শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী এমনকি চিকিৎসাবিদদের বৃহত্তর অংশের মধ্যেও এই ব্যাধি সম্পর্কে—বিশেষ করে এর প্রতিরোধ বা নিবারক ব্যবস্থা বিষয়ে যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর অস্পষ্টতা ও সন্দেহসংকুল মতামত রয়েছে। সেগুলির নিরশন আশু প্রয়োজন। চিকিৎসা বিজ্ঞানসহ সমগ্র বিজ্ঞান সম্পর্কে দেশজুড়ে যে অজ্ঞতা ও অস্পষ্টতা-জনিত অন্ধবিশ্বাস সংস্কারের প্রাবল্য রয়েছে তারই ফলে আজও জলপড়া, তেলপড়া, মন্ত্র, ওঝা, গুণিন, মাদুলী, কবচ প্রভৃতির কমবেশী প্রাদুর্ভাব চলেছে। সেই সঙ্গে বিজ্ঞজনের অজ্ঞতাপ্রসূত বিভ্রান্তিকর অপবিজ্ঞানের খেলা দেশের সামগ্রিক প্রগতি ও কল্যাণের পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে রয়েছে। সেই কারণেই বিজ্ঞানোন্নত, এই যুগে অনায়াসে নিবারণযোগ্য এই ভয়াবহ ব্যাধিটি যথার্থ নিয়ন্ত্রিত হওয়ার পরিবর্তে—এর ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা যেন ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আর বিজ্ঞানসম্মত প্রথায় কাজ করে অনেক দেশে এই ব্যাধিকে বশীভূত করা সম্ভব হয়েছে, ঠিক যেভাবে এদেশ থেকে ভয়াবহ গুটি বসন্ত রোগটিকে দমিত ও নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে—তাতে সন্দেহবাতিক বিজ্ঞজনেরা বা অন্য মতাবলম্বী চিকিৎসা বিশারদরা যাই বলুন!

এই রোগটি কিভাবে হয়ঃ

রোগটি আদিতে শেয়াল, কুকুর, নেকেড়ে, বেঁজি প্রভৃতি মাংসাশী পশুদের হয়, তাদের থেকে বেড়াল ও অন্যান্য উষ্ণরক্তের যে কোন গৃহপালিত বা বন্য প্রাণী এবং মানুষ আক্রান্ত হয়। তবে আমেরিকায় বিশেষ বাদুড় হচ্ছে এই রোগের উৎস। র‍্যাবডো-ভাইরাস গোষ্ঠীর র‍্যাবিস (Rabics) নামক ভাইরাসই এই রোগের কারণ। আক্রান্ত প্রাণীরাই এই ভাইরাসের আধার (Reservior) ও বাহক। একে অপরকে কামড়ে এই রোগচক্র বিস্তার করে চলে, অসুস্থ প্রাণীটি মারা যায় সুস্থরা অসুস্থ হয়। সেই চক্রের মাঝখানে হঠাৎ করেই মানুষ আক্রান্ত হয়। এ কথা প্রায় আদিম কাল থেকেই জানা যে পাগলা শেয়াল বা কুকুর কামড়ালে মানুষের জলাতঙ্ক রোগ হয়। র‍্যাবিড (Rabid) কথাটার অর্থই হচ্ছে ম্যাড বা ক্ষিপ্ত (পাগল)। এই রোগ জীবাণু সাধারণতঃ তাই করে। চিকিৎসাশাস্ত্রে এই কথা সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণ করার জন্য শুধু ধন্যবাদ নয় সমগ্র মানবজাতির পক্ষ থেকে আন্তরিক অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জানাই সেই মহামানব প্রথিতযশা অমরবিজ্ঞানী লুই পাস্তুরকে—যিনি সর্বপ্রথম রোগের প্রধান কারণ হিসাবে জার্ম-থিওরী (Germ Theory)-র কথা বলে গেছেন এবং সেই মতবাদকে তাঁর জীবনেই প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন; আর রোগের বিরুদ্ধে কৃত্রিম উপায়ে অনাক্রম্যতা শক্তি (Immunity) অর্জনের মত ও পথ তৈরি করে বিশ্বমানবতার মহান কল্যাণের পথ দেখিয়ে গেছেন এবং এই ভয়ঙ্কর জলাতঙ্ক রোগের হাত থেকে বাঁচার একমাত্র সফল উপায়ও আবিষ্কার করে গেছেন। শুধু তাই নয় সমগ্র বিজ্ঞানের প্রগতিতে জীবাণুতত্ত্ববিদ্যার (Bacteriology)

*জে. এন. রায় শিশু সেবাভবন, 58/1 এস, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা-7000 06

তিনিই প্রতিষ্ঠাতা পিতা এবং তারই মাধ্যমে প্রমাণ করে যেতে পেরেছেন যে—কেবলমাত্র জীবন থেকেই জীবনের উৎপত্তি ও বিস্তার ঘটে অন্য কোন ভাবে নয় ;—কোন দৈবশক্তি প্রভৃতির দ্বারা তা হয় না। তাঁর আগে পর্যন্ত পৃথিবীর তাবৎ জ্ঞানীগুণী মনীষী মহাপুরুষদের ধারণা ছিল যে হঠাৎ করে যে কোন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবের (কীট বা জীবাণুর) উৎপত্তি সম্ভব—যাকে তাঁরা বলতেন স্বতঃপ্রজনন (Spontaneous Generation) এবং কোন অলৌকিক মহাশক্তি বা ভগবান ইচ্ছা করলেই যে কোন সময় যে কোন স্থানে যে কোন জীব সৃষ্টি করতে পারেন বা করেছেন—(ঠিক এই মতবাদই পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ধর্মীয় শাস্ত্র ও দর্শনে প্রাধান্য পেয়েছে)। মহান বিজ্ঞানী পাস্তুর প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা সেই অন্ধ বিশ্বাসের মূলে প্রবল কুঠারাঘাত করে করে যান ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেই। তার পর থেকেই মানব সমাজে যথার্থ বিজ্ঞান-মনস্কতার শুরু ও ক্রমবিস্তার ; এখন তার (সমস্ত অন্ধবিশ্বাস সংস্কারের) মূলোৎপাটনের প্রস্তুতি।

এই রোগচক্রের বিভিন্ন ধারা ঃ

জলাতঙ্ক রোগের বিস্তৃতির ধারাকে প্রধানতঃ দুটো ভাগ করা হয়। একটি আরবান (Unban) বা পৌর (শহুরে) র‍্যাবিস, অন্যটি সীলভান (Sylvan) বা বন্য (গ্রাম্য)।

1) পৌরচক্রটি (Urban Cycle) শহরাঞ্চলে রাস্তার কুকুর দ্বারাই সংঘটিত হয়। একটি পাগলা কুকুরের কামড়ে অন্য কুকুরে বা মানুষে এই ভাইরাস সংক্রামিত হয়। ভারতে র‍্যাবিস আক্রান্ত মানুষের শতকরা 99 জনই শহুরে লোক। সামগ্রিক জনস্বাস্থ্যের দিক থেকে এটি গুরুত্বপূর্ণ। প্রতি বছর প্রায় 3 লক্ষ মানুষ কুকুর কামড়ের জন্য সারা দেশের হাসপাতাল-সমূহে আসে। তবে কত যে আসে না তার হিসাব নাই। এইটাইতো এদেশের বিশেষত্ব আর সেইখানেই ওঝা-গুণিনের কারিকুরি। সৌভাগ্য যে র‍্যাবিড কুকুর কামড়ালেও সবাই মরে না। কামড়ানর স্থান ও বিষের মাত্রার উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। তাই অনেকে বিনা চিকিৎসায় সেরে যায় আর সেইখানেই ওঝা-গুণিনের বাহাদুরি হয়। প্রকৃত পরিসংখ্যান থাকলেও পাগলাকুকুর কামড়ানোর পরে ঠিকমত চিকিৎসা না করলে 60 জন লোকই মারা যায় বলে প্রকাশিত রিপোর্ট। এইভাবে এদেশে প্রায় এক হাজার লোক প্রতিবছর র‍্যাবিড হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। তবে এদেশের 41টি টিচিং হাসপাতালে সমীক্ষা চালিয়ে জানা গেছে যে এই জাতীয় প্রায় দু-হাজার কেস হাসপাতালে ভর্তি হলে তাদের মধ্যে মাত্র একজনের যথার্থ র‍্যাবিস বা জলাতঙ্ক রোগ প্রকাশ পায়। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা এইখানেই। এতে জনস্বাস্থ্যের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি হচ্ছে শহরাঞ্চলের রাস্তার কুকুরগুলিকে সামলান দরকার। কুকুর থেকে বিড়ালও আক্রান্ত হয়ে এই রোগ ছড়াতে পারে, বানরও আক্রান্ত হয়। এইভাবে অন্যান্য গৃহপালিত বা বন্য পশুও এই রোগের শিকার হয়।

2) বন্য বা সীলভানচক্র ঃ গ্রামাঞ্চলে এই রোগের উৎস হচ্ছে বন্য মাংসাশী কিছু জন্তু। ঐ শেয়াল, নেকড়ে, বেঁজি প্রভৃতি। তবে গ্রামের রাস্তায়ও এখন কুকুরের প্রাদুর্ভাব বেড়েছে।

ইউরোপে প্রধানত খেঁকশেয়ালই এই রোগের ধারক ও বাহক। বন্য বা গৃহপালিত সব রকম পশুকেই তারা আক্রমণ করে ও রোগ ছড়ায়। মাঝে মাঝে মানুষও তার মধ্যে পড়ে। তবে ল্যাটিন আমেরিকার ব্রাজিল, মেক্সিকো, ত্রিনিদাদ, টেবাগো প্রভৃতি দেশের রক্তচোষা বাদুড় বা ভ্যামপায়ার ব্যাটস (Vampire Bats) এবং কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের পতঙ্গভুক বাদুড় দিয়ে এই রোগ বিশেষভাবে সংক্রামিত হয়। এই বাদুড়দের মধ্যে কিন্তু কোন রোগ লক্ষণ দেখা যায় না বা তারা এতে মরে না। তারা শুধু ঐ ভাইরাসের ধারক ও বাহক। অথচ তাদের কামড়ে মানুষ ও অন্যান্য পশুদের সেই রোগ হয়। এই বাদুড় নিয়ন্ত্রণ খুবই মুস্কিল। এরা থাকে গভীর জঙ্গলের পর্বতগুহায়। গুহাবাসী বাদুড়দের আস্তানার বাতাসেও এই ভাইরাস প্রচুর মাত্রায় ভেসে বেড়ায়। মানুষ বা পশুরা সেই গুহায় ঢুকলে তাদের নিশ্বাসের বায়ু মাধ্যমেই তারা র‍্যাবিজ-আক্রান্ত হতে পারে। সুতরাং সেইসব গুহায় ঢোকাও বিপজ্জনক। তাই আমেরিকার মত উন্নত দেশেও র‍্যাবিসের প্রাবল্য হয়েছে। আমাদের দেশে এই বাদুড় নাই। পৃথিবীর মধ্যে মনুষ্যবাসোপযোগী কেবলমাত্র অস্ট্রেলিয়া মহাদেশেই এই রোগ নাই। আর নেই দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে। তবে নিউজিল্যাণ্ড, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ, গ্রেটব্রিটেন এবং সাইপ্রাস দ্বীপে বিজ্ঞানসম্মত কঠোর পন্থা অবলম্বন করে তাদের দেশে এই রোগ সম্পূর্ণরূপে দমন করা গেছে বলে প্রকাশ। তারা শুধুমাত্র দেশের কুকুর ও বেড়ালকে কড়াকড়িভাবে সামলেই এই রোগকে বশীভূত করেছে। আমাদের এই হতভাগ্য দেশে সেই কাজটা কি অসম্ভব ?

র‍্যাবিস ভাইরাসের স্বরূপ ঃ

আলট্রামাইক্রোস্কোপিক অতি সূক্ষ্ম দুরন্ত এই ভাইরাসের চেহারাটাও আক্রমণাত্মক। ঠিক বুলেটেরই মত। একটা দিক সূচালো, অন্যদিক ভোঁতা, চারিদিকে রশ্মির আকারে সাজানো সজারুর ন্যায় অসংখ্য সূচাগ্র কাঁটার মত আবরণ [1নং চিত্র]। আকারে মাত্র 180×75 nm. (কমপক্ষে এক হাজার nm না হলে মাইক্রোস্কোপ দিয়েও দেখা যায় না)। ভিতরটা একটা আর. এন. এ. নিউক্লিয়িক অ্যাসিডের কোর (core) নির্দিষ্ট প্যাঁচানো হ্যালিক্স আকারে সজ্জিত, আর বাইরে লাইপো-প্রোটিনের সুবিন্যস্ত আবরণ বা ক্যাপসিড যা দিয়ে আসল ভাইরাস দেহ—ঐ আর. এন. এ. স্রাণ্ডটি সুরক্ষিত।

মূলত এরা স্নায়ুকোষ আক্রমণকারী ভাইরাস। স্নায়ুকোষের মধ্যেই এদের স্বাভাবিক বংশবিস্তার ঘটে। আক্রান্ত (কামড়ান) স্থান থেকে স্নায়ুকাণ্ড ধরেই অতি মন্থর গতিতে এরা কেন্দ্রীয়

স্নায়ুকোষ অর্থাৎ মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডস্থিত সুষুম্না কাণ্ডের দিকে এগিয়ে চলে। কেন্দ্রাভিমুখে যাবার সময় স্নায়ুপথ ধরেই এরা বাইরের দিকে মুখের গলার লালা গ্রন্থিগুলির দিকে এগোয় এবং ঐ লালার সঙ্গে প্রচুর মাত্রায় নিঃসৃত হয়। তাই কামড় বা লেহনের দ্বারাই এই রোগ অন্যজীবে সংক্রামিত হয়। চোখের অশ্রুগ্রন্থির অশ্রুথলিতে এরা এইভাবে আগেই পৌঁছে যায়। ফলে চোখের জলে এবং কনিয়া বা চোখের শ্লেষ্মাঝিল্লির কোষে
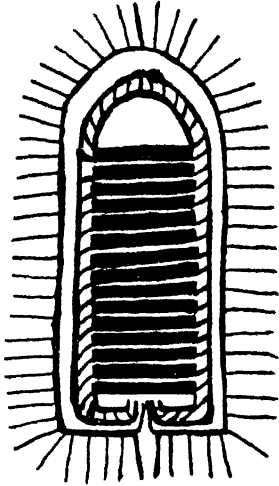
1নং চিত্র

এই ভাইরাসের অস্তিত্ব আগে থেকেই পাওয়া যায়। সেইজন্য মানুষ বা পশুতে যথার্থ রোগলক্ষণ প্রকাশের আগেই এই লালা, চোখের জল বা শ্লেষ্মাঝিল্লির কোষ পরীক্ষার বিশেষ ল্যাবরেটরী টেস্টে এই রোগ ধরা সম্ভব বলেই এখন স্বীকৃত। অবশ্য প্রাথমিক আক্রান্ত স্থান বা কামড়ানোর জায়গায় সাধারণ কোষ ও কলায় এই ভাইরাসরা প্রথম আশ্রয় নেয় এবং সেখানে তাদের প্রাথমিক বৃদ্ধির চেষ্টা করে। কিন্তু সাধারণ জীবাণুর মত রক্ত মাধ্যমে বা লসিকানলী (Lymph) দিয়ে শরীরে ছড়িয়ে পড়ে না। সেই জন্যই মস্তিষ্ক থেকে যতদূর ঐ প্রাথমিক আক্রমণের স্থান হবে শরীরে রোগ জীবাণু প্রবেশের পর যথার্থ রোগলক্ষণ প্রকাশের সময় বা ইনকিউবেশন পিরিয়ডও (Incubation) ততটা দীর্ঘতর হবে। রক্ত বা লসিকা দিয়ে রোগ প্রকাশ যত সহজ ও সত্বর হয় স্নায়ুপথে সেই জীবাণুকে এগোতে তার থেকে অনেক বেশী সময় লাগে—অর্থাৎ ঐ ইনকিউবেশন পিরিয়ডটা বেড়ে যায়। তাই মাথায়, মুখে বা ঘাড়ে কামড়ালে বিপদের আশঙ্কা বেশী কারণ মস্তিষ্ক থেকে দূরত্বটা কম, ইনকিউবেশন সময়টা তাতে কম লাগে। মাত্র 7 থেকে 10 দিনের মধ্যেই তখন রোগলক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে। না হলে সাধারণত এক মাস থেকে 3 মাস পর্যন্ত সময় লাগে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে বৎসরাধিক কালও লেগে যায়। অবশ্য আরও কতকগুলি কারণের উপর এই রোগের প্রখরতা ও ইনকিউবেশন নির্ভর করে। মস্তিষ্কের কোষ (স্নায়ু) গুলি আক্রান্ত হলেই সেখানে সাংঘাতিক প্রদাহ সৃষ্টি হয়। যাকে বলে অ্যাকিউট এনসেফালাইটিস (Acute Encephalitis) আর অল্প দু-চারদিনের মধ্যেই সবশেষ। বাঁচানো যায় না।

আগেই বলেছি পাগলাকুকুর, শেয়াল বেড়ালাদির লালা দিয়েই এই রোগের ভাইরাস ছড়ায় এবং মানুষ তাই দিয়ে আক্রান্ত হয়। রোগাক্রান্ত পশুটির রোগ লক্ষণ প্রকাশের 5/6 দিন আগে থেকেই তাদের লালায়, চোখের জলে রোগ-ভাইরাস দেখা দেয় যাতে সংক্রমণ ক্ষমতা থাকে আর তাদের মৃত্যু পর্যন্তই এই রোগ ছড়ানোর ক্ষমতা ক্রমে প্রবল হয়। তাই সমগ্র ইনফেক্টিভ পিরিয়ড বা সংক্রমণ ক্ষমতার কালটি প্রায় 10 দিন। এর মধ্যেই পশুটি মারা যায়। এই সময়ের আগে কামড়ালে কিছু হয় না।

সংক্রমণের ধারা:

1. কামড় (Bite)—পাগলা পশুর কামড়ই এই রোগ সংক্রমণের প্রধান পথ। র‍্যাবিড, কুকুর, শেয়াল, বেড়াল, বানর এমন কি খরগোসের কামড়েও এই রোগ হয়। কামড়ানোর জায়গাতে চামড়ায় বা মাংসে ঐ-রোগভাইরাস সঞ্চিত হয় ও বৃদ্ধি পেয়ে স্নায়ুপথ ধরে ভিতরে যায়।

2. আঁচড় (Scratch) ও লেহন বা চাটা (Licks)—চামড়ায় অত্যল্প আঁচড় বা চাটাতেও দেহে এই ভাইরাস সংক্রামিত হতে পারে। সুস্থ চামড়া ভেদ করে এই ভাইরাস ভিতরে যেতে পারে না বটে তবে অতি সামান্য আঘাত বা ঘর্ষণজনিত অল্প একটু ছিঁড়ে বা ছড়ে যাওয়া জায়গা পেলেই ভাইরাস সেখান দিয়ে ঢুকে যাবে। তাই সেখানে একটু লালা লাগলেই হয়—কামড়ানো দরকার নাই। মেঝে বা মাটিতে পড়ে থাকা লালার উপর খালি পায়ে চললে বা হাত ঘষলে তাতে কোন রকম কেটে যাওয়া, ছেঁড়া বা ঘষা খাওয়া অংশ থাকলেই তার ভিতর দিয়ে এই ভাইরাসের আক্রমণ সম্ভব। তবে সৌভাগ্য যে প্রত্যক্ষ সূর্যকিরণে অল্পক্ষণেই এই ভাইরাস মরে যায়।

আবার চোখ মুখ প্রভৃতির যে কোন শ্লেষ্মাঝিল্লিতে—তা অক্ষত হলেও—এই বিষাক্ত লালা লাগলেই রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা।

3. বায়ুমাধ্যম (Aerosol)—আগে বলা হয়েছে যে সব গুহায় র‍্যাবিড বাদুড় থাকে সেই গুহার বাতাসে প্রচুর র‍্যাবিস ভাইরাস থাকে। অন্য পশু বা মানুষ তার থেকে নিঃশ্বাসের বায়ু দিয়েই আক্রান্ত হতে পারে। কিন্তু ভারতে সে রকম উদাহরণ নাই। এদেশে বাদুড়, র‍্যাবিস নাই।

র‍্যাবিড কুকুরের লক্ষণ:

আক্রান্ত কুকুরে রোগ লক্ষণ প্রকাশ পেতে সময় লাগে 10 দিন থেকে 10 মাস, কখনও আরও দেরী হয়। তবে দু-বছর পরে আর সে সম্ভাবনা থাকে না, সাধারণত 2 সপ্তাহ থেকে 2 মাস সময়ই হচ্ছে কুকুরের ইনকিউবেশন পিরিয়ড। এদের এই রোগ দু-রকমে

প্রকাশ পায়—(1) ফিউরিয়াস (Furious) বা ক্ষিপ্ত অবস্থা। এটাই সাধারণ ও বেশীর ভাগ পাগলা কুকুরের লক্ষণ। কুকুরটা বিনা কারণেই যাকে তাকে কামড়ে বেড়ায়। অহেতুক উত্তেজিত হয়ে উঠে, দিকবিদিক ছোটাছুটি আরম্ভ করে, অকারণে চেঁচাতে থাকে, তাতে গলার স্বরটা বদলে যায় বা ভেঙ্গে যায় অথবা চেঁচাবার ভঙ্গী করে কিন্তু গলা থেকে স্বর বেরোয় না, মুখ দিয়ে লালা পড়তে থাকে। দু-কষ বেয়ে গেঁজলা বেরোয়, শরীর ও মাথা কাঁপতে থাকে, অস্বাভাবিক জিনিষ খাবার বা চিবোবার চেষ্টা করে যেমন লাঠি, কাঠ, মাটি, খড় ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হয় ও দিন চারেকের মধ্যে মারা যায়। (2) ডাম (Dumb) বা বোবা টাইপ। এই জাতীয় র‍্যাবিড কুকুরে কোন উত্তেজনার ভাব থাকে না। ছোটাছুটি ঘোরাঘুরিও করে না, কিছু খেতেও চায় না, লুকিয়ে কুঁকড়ে শুয়ে থাকতে চায়, তবে প্রায়ই মুখ দিয়ে লালা ঝরে। পোষা কুকুর হলে অনেক সময় প্রভুর আদর পেতে চায়। মনে হয়, তাতে আসলে সে নিরাপদ স্থানে নিশ্চিন্ত আশ্রয় চায় এবং প্রায়ই ঘুমিয়ে কাটায়, কাউকে তাড়াও করে না কামড়ায়ও না। পাগুলো অবশ বা প্যারালিসিসের মত হয়, উঠতে গেলে পড়ে যায়। দিন তিনেকের মধ্যেই মারা যায়। এরাও কিন্তু ঐ ক্ষিপ্ত গোষ্ঠীর মত সমান মারাত্মক বা ইনফেকশাস। এদের লালায় বা গেঁজলায় সমান বিষ। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে—কুকুর বা পাগলা পশুদের কিন্তু আসলে "জলাতঙ্ক" হয় না অর্থাৎ জল দেখলে তারা ভয় পায় না বা জল খেতে তাদের কষ্টও হয় না। যেমন মানুষের বেলায় ঘটে। অনেকে তাই সন্দেহজনক কুকুর বা বেড়ালকে জল দিয়ে দেখতে চায়—তারা তা খাচ্ছে কিনা। ঐ ডাম টাইপ না হলে মরার আগে পর্যন্ত এরা খাবারও খায়, জলও খায়। সুতরাং জল খেতে পারলে বা জলকে ভয় না করলে সেই কুকুর র‍্যাবিড হয় নি এমন ধারণা ভুল।

মানুষের র‍্যাবিস বা জলাতঙ্ক ঃ

মানুষে এই রোগ লক্ষণ প্রথমে খুব ধীরে ধীরেই প্রকাশ পায়। আসল রোগ লক্ষণের আগে গা ম্যাজ-ম্যাজ, ক্ষুধামন্দা, শরীর খারাপ ভাব, মাথাব্যথা, অল্প অল্প জ্বর (100°—101°F) দু-চার দিন চলে। তবে শতকরা প্রায় আশি ভাগ ক্ষেত্রে আঁচড়ানো, কামড়ানোর অর্থাৎ ভাইরাস প্রবেশের জায়গায় যন্ত্রণা বা চুলকানো অথবা অসাড়ভাব দেখা দেয় সবার আগে। তারপরই আসল প্রকোপ—বিভিন্ন স্নায়ু উত্তেজনার লক্ষণ ক্রমে মারাত্মক রূপ নেয়। প্রথমে স্পর্শকাতরতা বা sensory excitation, একটু শব্দেই উত্তেজনা, একটু ঠাণ্ডা বাতাসেই অস্থিরতা, একটু উজ্জ্বল আলোই অসহ্য। মাত্রাতিরিক্ত ঘাম, চোখ থেকে জল পড়া, মনে সদাই আতঙ্ক, রাগ, মৃত্যু ভয়, কখনও অত্যন্ত অবসাদ, হঠাৎ উত্তেজিত ভাব, হাতে-পায়ে খিঁচুনি ধরে দম বন্ধ ভাব ও মূর্চ্ছা যাওয়া, তবে সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং মারাত্মক লক্ষণ হচ্ছে কোন জলীয় জিনিষ গিলতে না পারা। জল বা কোন তরল জিনিষ গিলতে গেলেই গলার ভিতরের মাংস (মাংসপেশী) সব এমন প্রবলভাবে সংকুচিত (spasm) হয়ে পড়ে যে তাতে আর গেলাই যায় না, পরন্তু মারাত্মক যন্ত্রণা হতে থাকে। শেষের দিকে জল দেখলেই বা জলের শব্দ অথবা তার কথা শুনলেই এই অবস্থা হয়। কারণ দিনের পর দিন জল খেতে না পারায় পিপাসা থাকে প্রচুর। তাতে জলের শব্দে বা তার কথায় জল খাওয়ার ইচ্ছা হওয়া মাত্রই গলার মাসলে ভয়াবহ স্প্যাজ্‌ম্ ও যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। আর এই জন্যেই "জলাতঙ্ক" নাম। সেই যন্ত্রণার চোটে একটা বিকট চীৎকার করতে থাকে—যাকে অনেকটা কুকুর বা শেয়ালের ডাক বলেই অনেকে মনে করে। আর অন্ধ বিশ্বাসের যুগে সবাই ভাবত পেটের মধ্যে কুকুর বা শেয়ালের বাচ্চাই হয়ে গেছে। এই অবস্থা সাধারণত 2-3 দিনই চলে, কোন কোন ক্ষেত্রে 5-6 দিন পর্যন্ত। তার পর হঠাৎ প্রবল খিঁচুনির মধ্যে দম আটকেই মারা যায়। তাই সময় মত নিবারক চিকিৎসা বা প্রোফাইল্যাক্সিস-এর কথা এই রোগে এতই গুরুত্বপূর্ণ।

"বিজ্ঞানের ইতিহাস ব্যাখ্যায় আমাকে বহু দেশবাসী মনস্বিগণের নাম স্মরণ করাইতে হইত। কিন্তু তাহাদের মধ্যে ভারতের স্থান কোথায়? শিক্ষাকার্যে অন্যে যাহা বলিয়াছে সেই সকল কথাই শিখাইতে হইত। ভারতবাসী যে কেবলই ভাবপ্রবণ স্বপ্নাবিষ্ট, অনুসন্ধান কার্য কোনদিনই তাহাদের নহে, এই এক কথাই চিরদিন শুনিয়া আসিতাম। বিলাতের ন্যায় এদেশে পরীক্ষাগার নাই, সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মাণও এদেশে কোনদিন হইতে পারে না, তাহাও কতবার শুনিয়াছি। তখন মনে হইল যে ব্যক্তি পৌরুষ হারাইয়াছে, কেবল সেই বৃথা পরিতাপ করে। অবসাদ দূর করিতে হইবে। ভারতই আমাদের কর্মভূমি, সহজ পন্থা আমাদের জন্য নহে।"

— আচার্য জগদীশচন্দ্র

মেসন ও হিডেকী ইউকাওয়া

রতনমোহন খাঁ

প্রশান্ত মহাসাগরের নীলাভ জলে এক ফালি দ্বীপ—নাম জাপান। বিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, বিশেষ করে প্রযুক্তি-বিদ্যায় জাপান শুধু এশিয়ার গৌরব নয়, সারা বিশ্বের বিস্ময়। প্রযুক্তিবিদ্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ আমেরিকা জাপানী পণ্যের প্রতিযোগিতায় হার মেনে বাঁচার তাগিদে শ্লোগান দিচ্ছে জাপানী পণ্য বয়কটের। জাপানের এই অতুলনীয় উন্নতির মূলে আছে যে সব বিজ্ঞানীর নিরলস প্রচেষ্টা তাঁদের পথিকৃৎ

ডঃ ইউকাওয়া

হলেন হিডেকী ইউকাওয়া। প্লাঙ্কের কণাবাদ এবং আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ যখন সনাতন চিন্তার মূলে কুঠারঘাত করছে, সেই সময় 1907 খৃস্টাব্দে 23শে জানুয়ারী জাপানের রাজধানী টোকিওতে জন্ম হয় ইউকাওয়ার। তিনি টাকুজি ওয়াগার তৃতীয় পুত্র। লেখাপড়া শুরু হয় কিয়াটোতে এবং নিয়মমাফিক লেখা পড়ার শেষ হয় 1929 খৃস্টাব্দে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক উপাধি লাভ করে। মেধাবী ছাত্র হিসাবে যথেষ্ট সুনামের অধিকারী ইউকাওয়া ছাত্রাবস্থাতেই কৌতূহলী ছিলেন তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যায় ও কণিকা পদার্থবিদ্যায়। 1932 খৃস্টাব্দ থেকে 1939 খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কিয়াটো ও ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ করেন। 1938 খৃস্টাব্দে তিনি কিয়াটো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.এস. সি. উপাধিতে ভূষিত হন এবং 1939 খৃস্টাব্দে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন।

1935 খৃস্টাব্দে ওসাকায় থাকাকালীন ইউকাওয়ার বিখ্যাত গবেষণা-পত্রটি (On the interaction of elementary particles—Proc. Phys. Math. Soc. Japan, 17, p 48) প্রকাশিত হয়। এই পত্রে আছে নিউক্লিয় বল-সমূহের ক্রিয়ার উপর নূতন আলোকপাত এবং অজ্ঞাত এক মৌলকণার ইঙ্গিত। পরমাণুর কেন্দ্রে আছে প্রোটন অথবা প্রোটন ও নিউট্রন। নিউট্রনের ভর প্রোটনের সমান অর্থাৎ ইলেকট্রনের ভরের 1838·6 গুণ এবং এটি নিস্তড়িৎ। ইউকাওয়া পরমাণুর গহ্বরে অর্থাৎ নিউক্লিয়াসে বলসমূহের রহস্য উদঘাটনে কোয়ান্টাম তত্ত্বকে প্রাধান্য দেন। কোয়ান্টাম তত্ত্বানুসারে দুই আহিত বস্তুর মধ্যে শক্তির বিনিময় ঘটে ডিসক্রিট কোয়ান্টায়। এই কোয়ান্টাম হলো ফোটন বা শক্তির ভরহীন একক। ফোটনকে বলা হয় ভরহীন আলোর কণিকা। দুই ইলেকট্রনের মধ্যে যে বিকর্ষী বল দেখা যায়, তার মূলে আছে ফোটন। একটি ইলেকট্রন ফোটন নির্গমন করে আর অন্য একটি শোষণ করে। এই ধারণাকে ভিত্তি করে ইউকাওয়া স্থির সিদ্ধান্তে আসেন যে নিউক্লিয়াসের মধ্যে যে আকর্ষী বল ক্রিয়া করে, সেই বলের ক্রীড়নক হলো ফোটনের মত কোন কণা, তবে সে কণা ভরহীন নয়। জ্ঞাত উপাত্তের সাহায্যে গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি আভাষ দেন এই অজ্ঞাত কণা ইলেকট্রনের থেকে ভারী কিন্তু প্রোটনের থেকে হাল্কা। মোটামুটিভাবে এই ভর ইলেকট্রনের ভরের 200 গুণ। পরে এই কণার নাম হয় মেসন।

ইউকাওয়ার প্রস্তাবিত মৌলকণায় বিজ্ঞানী মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। প্রশ্ন দেখা দিল নিউক্লিয়াসের বাইরে মেসনের অস্তিত্ব নিয়ে। ইউকাওয়া তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। ফের্মির তত্ত্বের সাহায্যে তিনি দেখালেন তাঁর প্রস্তাবিত কণার আধান ধনাত্মক

বা ঋণাত্মক হতে পারে। আবার এই কণা ইলেকট্রন ও নিউট্রিনোয় রূপান্তরিত হতে পারে। ব্যোম-বিকিরণে মুক্ত মেসন থাকার সম্ভাবনা খুব উজ্জ্বল তবে এর আয়ুষ্কাল 10^{-6} সেকেণ্ড বা কম।

ইউকাওয়ার প্রস্তাবের সত্যাসত্য নির্ধারণের জন্য আরম্ভ হলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমেরিকায়, রাশিয়ায় ও ব্রিটেনে। মেসনের প্রথম সাক্ষ্য পাওয়া গেল 1837 খৃস্টাব্দে আমেরিকায় এণ্ডারসন ও নেদারমিয়ারের মেঘ-প্রকোষ্ঠের সীসক খণ্ডে। সীসার পাতে চলন পথ পরীক্ষা করে তাঁরা ঐ কণার যে ভর ও আয়ুষ্কাল পেলেন তা ইউকাওয়ার প্রস্তাবিত কণার সঙ্গে প্রায় মিলে গেল। মৌলকণার তালিকায় যুক্ত হলো আর একটি নাম। 1943-45 খৃস্টাব্দে A. I. Alikhanov ও A. I. Alikhanyan-এর নেতৃত্বে সোভিয়েত বিজ্ঞানীদল ব্যোম-বিকিরণের উপর পরীক্ষা চালানোর উদ্দেশ্যে অলাগোজ পাহাড়ে 3250 মিটার উচ্চে একটি স্থায়ী গবেষণাগার স্থাপন করে। তাঁদের পরীক্ষায় ধরা পড়ে মেসন কণা যাদের ভর ইলেকট্রনের ভরের 200, 300, 600 ও 900 গুণ। 1947 খৃস্টাব্দের ব্রিটিশ বিজ্ঞানী পাওয়েল ও তাঁর সহকর্মীরা ব্যোম-রশ্মির গবেষণায় ফটোগ্রাফিক জেলিস্তরে আবিষ্কার করেন এমন এক মেসন যা 1937-এর মেসনের থেকে ভারী এবং বহু বিষয়ে ভিন্ন ধর্মী। পাওয়েল 1937-এর—মেসনের নাম দেন মিউ-মেসন (μ-মেসন) এবং 1947-এর মেসনের নাম দেন পাই-মেসন (π-মেসন)। ঐ বৎসরেই ক্যালিফোর্ণিয়ায় বার্কলেতে সিনকোসাইক্লোট্রনে 300 মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তিতে বেরিলিয়াম, কার্বন, তামা এবং ইউরেনিয়ামের সঙ্গে আলফা কণার সংঘর্ষে মেসনের সৃষ্টি হয়। চৌম্বক ক্ষেত্রের সাহায্যে মেসন কণার আধান ও ভর নির্ণয় করে বহু রকম মেসনের সন্ধান পাওয়া গেছে।

পাই-মেসন ও মিউ-মেসন ধন-তড়িৎ, ঋণ-তড়িৎ ও নিস্তড়িত হতে পারে। প্রোটন-প্রোটন সংঘর্ষে কণিকাদ্বয়ের শক্তির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন পাই-মেসনের সৃষ্টি হয়। নিস্তড়িৎ পাই-মেসনের ভর $264{\cdot}2\ m_e$ এবং আয়ুষ্কাল মাত্র 10^{-16} সেকেণ্ড। সুতরাং জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি নিস্তড়িৎ পাই-মেসন দুটি গামা-রশ্মির ফোটন সৃষ্টি করে নিশ্চিহ্ন হয়। ধনাত্মক পাই-মেসনের (পাইঅন) ভর $273{\cdot}2\ m_e$ এবং আয়ুষ্কাল $2{\cdot}6\times 10^{-8}$ সেকেণ্ড। এই মেসনের স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষয়ের পরিণতি হলো একটি ধনাত্মক মিউ-মেসন (মিউঅন) ও একটি নিউট্রিনো। ধনাত্মক মিউ-মেসনের ভর $212\ m_e$ এবং আয়ুষ্কাল $2{\cdot}2\times 10^{-6}$ সেকেণ্ড। নিউট্রিনোর ভর শূন্য, আধান শূন্য এবং স্পিন শূন্য। ধনাত্মক মিউ-মেসনের ক্ষয় থেকে পাওয়া যায় পজিট্রন, নিউট্রিনো ও প্রতি-নিউট্রিনো। ঋণাত্মক পাই-মেসনের ভর ও আয়ুষ্কাল ধনাত্মক পাই-মেসনের সমতুল্য। এর ক্ষয় থেকে উদ্ভূত হয় ঋণাত্মক মিউ-মেসন ও নিউট্রিনো। ঋণাত্মক মিউ-মেসনের ভর ও আয়ুষ্কাল প্রায় ধনাত্মক মিউ-মেসনের সমতুল্য এবং এই কণিকার পরিণতি ঘটে ইলেকট্রন, নিউট্রিনো ও প্রতি-নিউট্রিনোতে। এসব প্রক্রিয়াগুলিকে লেখা যায়—$\pi^o \to \gamma + \gamma$, $\pi^+ \to \mu^+ + \nu$, $\mu^+ \to e^+ + \nu + \bar{\nu}$,

$$\pi^- \to \mu^- + \nu, \quad \mu^- \to e^- + \nu + \bar{\nu}.$$

এখানে m_e—ইলেকট্রনের ভর, π^o—নিস্তড়িৎ পাই-মেসন, γ—গামা-রশ্মির ফোটন, π^+—ধনাত্মক পাই-মেসন, π^-—ঋণাত্মক পাই-মেসন, μ^+—ধনাত্মক মিউ মেসন, μ^-—ঋণাত্মক মিউ-মেসন, e^+—পজিট্রন, e^-—ইলেকট্রন, ν—নিউট্রিনো, $\bar{\nu}$—প্রতি-নিউট্রিনো। পাই-মেসনের স্পিন 0 এবং মিউ-মেসনের স্পিন $\frac{1}{2}$। মিউ-মেসন ও পাই-মেসন অপেক্ষা অধিক ভরের মেসনের সন্ধান পাওয়া গেছে। এরূপ কয়েকটি মেসনের তালিকা এখানে দেওয়া হলো।

নাম	চিহ্ন	ভর	আয়ুষ্কাল	পরিণতি
থিটা-মেসন	θ^o	$800m_e$	$1{\cdot}7\times 10^{-10}$ সেকেণ্ড	$\theta^o \to \pi^+ + \pi^-$
	θ	$800m_e$		θ^- - $+\pi^o$
কে-মেসন	k^o	$965m_e$	10^{-10} সেকেণ্ড	
	$k^{\pm}$	$966{\cdot}5m_e$	$1{\cdot}2\times 10^{-8}$	$k^{\pm} \to \pi^{\pm} + \theta^o$
টাউ-মেসন		$970m_e$	10^{-8} সেকেণ্ড	$\tau^{\pm} \to \pi^{\pm} + \pi^+ + \pi^-$ $\tau^{\pm} \to \pi^{\pm} + \pi^o + \pi^o$
কাপ্পা-মেসন		$1250m_e$		$\kappa^{\pm} \to \mu^{\pm}$ + দুটি নিস্তড়িৎ কণা

ব্যোম-বিকিরণ থেকে মেসন পাওয়ায় এবং কৃত্রিম উপায়ে মেসন উৎপন্ন হওয়ায় ইউকাওয়ার তত্ত্বের গুরুত্ব বেড়ে গেল। নিউক্লিয়-রহস্যের জটিলতা হ্রাস পেল। বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেলেন এই তত্ত্বের বিস্তৃত প্রয়োগ ক্ষেত্র। দেশে-বিদেশে ইউকাওয়া হলেন সম্মানিত। দেশে পেলেন 1940 খৃস্টাব্দে জাপান অ্যাকাডেমির ইম্পেরিয়াল পুরস্কার এবং 1943 খৃস্টাব্দে ডেকোরেশন অব কালচারাল মেরিট। 1949 খৃস্টাব্দে নোবেল কমিটি তাঁকে ভূষিত করলেন নোবেল পুরস্কারে পদার্থবিদ্যায় মৌল গবেষণার জন্য। ইউকাওয়া শুধু বহু সংস্থার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত নন, নিজেও গড়ে তুলেছেন বহু সংস্থা। তাঁরই নেতৃত্বে জাপানে গড়ে উঠেছে কুশলী গবেষক গোষ্ঠী। তিনি কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের Research Institute of Fundamental Physics-এর নিয়ামক এবং ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

Emeritus Professor. 1946 খৃস্টাব্দ থেকে Progress of Theoretical Physics-এর সম্পাদনার দায়িত্ব তাঁরই উপরে ন্যস্ত। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর বহু গবেষণা-পত্র। তাঁর মূল্যবান পুস্তকগুলির মধ্যে Introduction to Quantum Mechanics, Introduction to the Theory of Elementary particles বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর বিরাট কর্মময় জীবন তাঁকে করেছে স্মরণীয় ও বরণীয়।

দুধ

প্রবীর সেনগুপ্ত*

দুধ একটি সুষম খাদ্য। এটি স্তনগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়। কিন্তু সবার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে স্তনগ্রন্থিতে দুধ কিভাবে তৈরি হয়। আগে মনে করা হতো দুধ রক্ত থেকে ফিল্টার হয়ে স্তনগ্রন্থিতে জমা হয়। কিন্তু দেখা গেল দুধের অনেক উপাদান যেমন ক্যাসিন, ল্যাকটোজ এগুলির অস্তিত্ব রক্তে থাকে না। উক্ত থিওরী সম্পূর্ণ গ্রাহ্য নয়। এরপর ধরা হতো কোষের degeneration-এ দুধ প্রস্তুত হয় অর্থাৎ স্তনগ্রন্থির অ্যালভিওলার কোষ ভেঙ্গে দুধ তৈরি হয়। এরপর যে তথ্য ধরা হয়েছিল, দুধ অ্যালভিওলার কোষের বিপাকের (true cell metabolism) ফলে উৎপন্ন হয়। বর্তমানে দেখা গেছে স্তনগ্রন্থির পূর্ণতাও দুধ দিতে পারে না যদি না হরমোন কাজ করে। প্রোলাকটিন হরমোন যেটি পিটুইটারী গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয় সেটি স্তনগ্রন্থির উপর কাজ করে। কোন গরুর দেহে এই হরমোন কম কাজ করে তবে তার দুধ দেবার ক্ষমতা কমে যায়। বাইরে থেকে এই হরমোন ইঞ্জেকসান করলে দুধ দেবার ক্ষমতা বেড়ে যায়।

দুধ দোয়ানো সবাই দেখে। আমরা হাত দিয়ে দুধ দোয়ানো দেখতে পাই। এরও কতকগুলি পদ্ধতি আছে। বাঁট টিপলেই দুধ আসবে না। যেখানে অনেক গরু আছে সেখানে হাত দিয়ে দুধ দোয়ানো অসম্ভব। তখন যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে ঋণাত্মক চাপ সৃষ্টি করা হয় যাতে দুধ বেরিয়ে আসে। এই যন্ত্রের দুটি ভাগ আছে (i) সিঙ্গেল অ্যাকশন (ii) ডাবল অ্যাকশন। প্রত্যেক যন্ত্রে বাঁট কাপ (teat cup) থাকে। সেটি গরুর বাঁটে লাগিয়ে দেওয়া হয়। এর সঙ্গে ভ্যাকুয়াম টিউব থাকে। অপর অংশ একটি পাত্রে যুক্ত থাকে, যেখানে দুধ সংগৃহীত হয়। দুধ যতক্ষণ বাঁটে থাকে ততক্ষণ নিশ্চিন্ত, বাইরে আসার পরই ত্র মাথা ব্যাথার কারণ। সংরক্ষণ কর, কোন জীবাণু আছে কিনা দেখ? মানুষের পরিপাকের উপযোগী করে তোল। মানুষের রুচির জন্য বিভিন্ন রূপ দাও।

দুধের প্রযুক্তির জন্য দুগ্ধ প্রযুক্তি বিভাগ গড়ে উঠেছে। যাদের কাজ দুধটিকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করার জন্য গবেষণা ও শিক্ষা দেওয়া। দুধের সাধারণ বর্ণ সাদা এর কারণ দুধে 'ক্যাসিন' নামে একপ্রকার প্রোটিন আছে। এটি ক্যালসিয়ামের সঙ্গে যুক্ত থাকে। দুধে বিভিন্ন ব্যাকটিরিয়া থাকলে লাল, গাঢ় হলুদ, নীল এইসব বর্ণ ধারণ করে। অনেক সময় দুধে পেঁয়াজ, রসুন, বাঁধাকপি, আঁশটে ইত্যাদি গন্ধ পাওয়া যায়। প্রাণীরা উক্ত বস্তুর মধ্যে যেটি বা যেগুলি প্রয়োজনের চেয়ে বেশী খেয়ে ফেলবে সেই সব গন্ধ দুধে পাওয়া যাবে। সবাই জানে দুধ খেতে মিষ্টি, এর কারণ দুধে ল্যাকটোজ নামক চিনি আছে। কিন্তু ব্যাকটিরিয়া এই ল্যাকটোজকে ভেঙে ল্যাকটিক অ্যাসিড করে দেয়। তখন দুধ খেতে টক লাগে। যে জন্য দুধ বেশীক্ষণ ফুটিয়ে না রাখলে টকে যায়। দুধে ফ্যাট আছে। লাইপেজ এনজাইমের ফলে ফ্যাটি অ্যাসিডে পরিণত হয়। তখন দুধ খেলে তেতো লাগে। দুধে (গরুর) ·7% লবণ থাকে। যদি কোন কারণে গরু বেশী লবণ বা লবণযুক্ত খাদ্য খায় তবে তার দুধে লবণাক্ত ভাব আসে। এবার দেখা যাক দুধে কি কি আছে। কেন এটাকে সুষম খাদ্য বলে। আমাদের খাদ্যের প্রয়োজনীয় ছয়টি উপাদানই দুধে থাকে। যেমন—প্রোটিন, গরুর দুধে প্রোটিনের ভাগ 3 90%। এই প্রোটিনের বেশীর ভাগই ক্যাসিন। এছাড়া আছে ল্যাক্টো-অ্যালবুমিন, ল্যাক্টোগ্লোবিউলিন, ল্যাক্টোমিউসিন। দুধের ছানা মানেই এই প্রোটিন অংশ। অ্যাসিড দিলেই এই ক্যাসিন অংশ ক্যালসিয়াম প্যারা ক্যাসিনেট গঠন করে। এই ক্যাসিনের মধ্যে সালফিউরিক অ্যাসিড ক্যাসিন, নাইট্রিক অ্যাসিড ক্যাসিন, ল্যাকটিক অ্যাসিড ক্যাসিন বিখ্যাত। দুধে চর্বি থাকে 3·60% কিন্তু মোষ, ছাগল, মানুষ এদের দুধে এর ভাগ বিভিন্ন। মোষের দুধে অনেক বেশী চর্বি থাকে। এই চর্বিগুলি 1μ-10μ ব্যাসের অণু হিসাবে থাকে। গুয়ারনসি (guernsey) গরুর চর্বির ব্যাস বড় থাকে। আবার হলস্টেন (holstein) জাতের গরুর চর্বির ব্যাস কম থাকে। চর্বির ব্যাস নিয়ে এত চিন্তা কেন? চর্বির ব্যাস বড় থাকলে সেটি মানুষের হজমের পক্ষে অসুবিধা আছে। দুধের চর্বির মধ্যে বিউটাইরিন, লিউটারিন, মিনিসটিন, পালমিটিন, স্টিয়ারিন, সিলিস্টন ইত্যাদি বিখ্যাত। দেখা গেছে গরুকে কোপ্রা কেক

*জয়রামপুর স্টেশন রোড, (টিপুল বাবুর বাগান), বারাসত, 24 পরগণা

নারকেলের খোল খাওয়ালে দুধে বেশী চর্বি আসে, তিসির খোল খাওয়ালে দুধের চর্বি নরম হয়ে যায়। তুলার বীজের খোল খাওয়ালে গরু শক্ত চর্বির দুধ দেয়। দুধে চিনি হিসাবে ল্যাকটোজ থাকে। এটি রক্তের মধ্যে প্রবাহিত গ্যালাকটোজ থেকে আসে। দুধ থেকে দই বা পনীর করতে হলে এই ল্যাকটোজকে ভাঙতে হবে। এজন্য আমরা 'ল্যাক্টোব্যাসিলাস' ব্যাকটিরিয়ার সাহায্য নেই। দুধে আর অধিকাংশই জল (87·3%), সুতরাং দুধে জল মেশালে আমরা প্রয়োজনীয় উপাদান কমই পাবো। ল্যাক্টোমিটারের সাহায্যে দুধের আপেক্ষিক গুরুত্ব মাপা হয়। সাধারণতঃ দুধের আপেক্ষিক গুরুত্ব 1·017—1·037 পর্যন্ত হয়। দুধে জল মেশালে এটির মান কমে। দুধে কতভাগ (শতকরা) জল মেশানো আছে সেটি

$$(100 - \frac{C.L.R + Fat\%}{36} \times 100)$$

এই তথ্য পূরণ করলেই জানতে পারবো। এখানে 36কে স্ট্যাণ্ডার্ড ধরা হয়েছে। [C. L. R-কারেক্ট ল্যাক্টোমিটার রিডিং], দুধে খনিজ পদার্থ হিসাবে Na, K, Ca, Ma ইত্যাদির ধাতুর ফসফেট, সাইট্রেট, ক্লোরাইড লবণ থাকে।

দুধে কতকগুলি বিশেষ অবস্থা থাকে। যেগুলি প্রায়ই শোনা যায়—যেমন প্যাসচুরাইজড্, স্টেরিলাইজড্, হোমোজেনাইজড্, স্ট্যাণ্ডারাইজড্, স্কিমদুধ, টোনড্, ডাবল টোনড্ মিল্ক। দুধকে চাপে ও 60°C তাপে নির্বীজন করা হয়। সেটাকে প্যাসচুরাইজড্ দুধ বলে। এতে প্রায় 98·99% ব্যাকটিরিয়া মরে যায়। দুধে উপস্থিত কিছু এনজাইম, ভিটামিন-C এরা এই পদ্ধতিতে নষ্ট হয়ে যায়। দুধকে 100°C বা তার বেশী তাপে উত্তপ্ত করলে সেই দুধকে স্টেরিলাইজড্ দুধ বলে। এতে 100% ব্যাকটিরিয়া মরে যায়। কাঁচা দুধে যে সব ব্যাকটিরিয়া স্পোর গঠন করে থাকে তারা অবশ্য এতে মরে না। আগেই বলা হয়েছে দুধে চর্বির অণুগুলি বড় থাকে। এর ফলে হজমের অসুবিধা হয়, কারণ চর্বির বড় অণুকে ছোট অণুতে পরিণত করে পিত্তরস, তারপর সেটি পরিপাক হয়। এজন্য চর্বির অণুগুলি ছোট করা ও তা সর্বত্র সমভাবে মেশানো দরকার। চর্বি উপরে ভেসে থাকে ফলে পাত্রের তলার দিকের দুধে চর্বি থাকে না। এজন্য হোমোনাইজার মেশিন রয়েছে। যেখানে উচ্চচাপে (2500-5000 পাউণ্ড / ইঞ্চি) ছোট মুখের মধ্য দিয়ে দুধ পাঠানো হয় ফলে ফ্যাটকণাগুলি 2μ-র চেয়ে ছোট হয়ে দুধে মিশে যায়। এই দুধ থেকে কোন ভাবেই ক্রীম পাওয়া সম্ভব নয়। এই দুধকে হোমোজেনাইজড্ দুধ বলে। দুধে উপাদান কতটুকু থাকবে এটা ঠিক করে দুধ প্রস্তুত করাকে স্ট্যাণ্ডারাইজড্ দুধ বলে। দুধ পাউডার থেকে দুধ প্রস্তুত করে ফ্যাট মিশিয়ে এটা করা হয়। P. F. A. নিয়ম অনুযায়ী (1976) এই দুধে কমপক্ষে 4·5% চর্বি এবং জল, চর্বি বাদ দিয়ে অন্যান্য উপাদান 8·5% থাকবে। দুধ থেকে জল দূর করে যে পাউডার করা হয় তাকে স্কিম পাউডার বলে। এই দুধ থেকে চর্বি তুলে ফেলা হয়। নাহলে দুধ বেশী দিন থাকবে না গন্ধ হয়ে যাবে। এতে 1·5% ফ্যাট থাকার কথা। এই পাউডারে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, সাইট্রিক অ্যাসিড, সোডিয়াম সাইট্রেট ইত্যাদি মেশানো হয় মোট 0·3%। স্কিম পাউডার ও জল মিশিয়ে যে দুধ প্রস্তুত করা হয় তাকে টোনড্ দুধ বলে। এই টোনড্ দুধে কমপক্ষে 1·5% ফ্যাট ও দুধের কঠিন অংশ 10·5% থাকলে তাকে ডাবল টোনড্ দুধ বলে।

দুধকে প্রযুক্তিগতভাবে লাগিয়ে ক্রীম, বাটার, আইসক্রীম, চীজ, ক্ষীর, খোয়া, রাবড়ি, কুল্পি/মালাই, দই, পনীর, ছানা, মাখন, ঘি, ল্যাসি, মিলকোজ, ঘি-রেসিডিউ ইত্যাদি আরো হরেক রকম বস্তু তৈরি করা হয়। এগুলি আগে আমাদের দেশে ক্ষুদ্র শিল্প হিসাবে ব্যবহৃত হতো। এতে সময় বেশী লাগত, অপচয়ও বেশী হতো। বর্তমানে যান্ত্রিক যুগে এইসব জিনিস প্রস্তুতের জন্য কারখানা হয়েছে। বড় বড় মেসিন বসেছে, উৎপাদন ক্ষমতা অনেক বেশী হয়েছে। বিজ্ঞানসম্মতভাবে সর্বকিছু উৎপাদন হতে থাকে। দুধের মধ্যে যেটুকু চর্বি আছে তা থেকেই ঘি তৈরি হয়। যে কারণে দুধের পরিমাণ অনুযায়ী ঘি-এর উৎপাদন অনেক কম, ঘিতে 99-99·5% ফ্যাট থাকে।

দুগ্ধবতী গরুর কতকগুলি রোগ আছে যার ফলে দুধের উৎপাদন কমে যায় এবং দুধও পানের পক্ষে ক্ষতিকর অর্থাৎ ঐসব রোগের জীবাণু মানুষে সংক্রামিত হতে পারে। ব্রুসেলোসিস (Brucellosis), টিউবারকুলোসিস, হেমারেজিক সেপটিকেমিয়া, ট্রাইকোমোনাড রোগ, গো-বসন্ত, ম্যাসটাইটিস এগুলি গরুর সাধারণতঃ বেশী দেখা যায়। ব্রুসেলোসিস একটি ব্যাকটিরিয়া-ঘটিত রোগ। ব্রুসেলোসিস অ্যাবোরটাস এই রোগের কারণ। এটি মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক রোগ সৃষ্টি করতে পারে। এই রোগের ফলে গরুর বাচ্চা সময়ের আগেই বেরিয়ে আসে। গর্ভবতীর 7-8 মাসে বেশী অ্যাবোরসান (abortions) হয়। এই জীবাণু দুধে সংক্রামিত হয়। স্তনগ্রন্থি আক্রান্ত হয়। টিউবারকুলোসিস ব্যাকটিরিয়াঘটিত রোগ। এটি গরুর যক্ষ্মা রোগের কারণ। টিউবারকল ব্যাসিলাস এই রোগের কারণ। ফুসফুস আর লসিকাগ্রন্থি বেশী আক্রান্ত হয়। স্তন, যকৃত, হৃৎপিণ্ড এগুলি আক্রান্ত হয়। রোগাক্রান্ত গরুর দুধে এর জীবাণু আসে ও তার থেকে বিভিন্ন প্রাণীতে সংক্রামিত হয়। সবচেয়ে বড় কথা এই জীবাণুর প্রতিরক্ষা ক্ষমতা ও জীবিত বস্তুতে বহুদিন বেঁচে থাকার ক্ষমতা। প্যাস্টুরেলা বোভিসেপটিকাস, হেমারেজিক সেপটিকেমিয়া রোগের কারণ। একে সিপিং রোগও বলে (shipping fever)। এতে 105°C-এর বেশী জ্বর হয় এবং blood poison হয়। প্রোটোজয়াট্রাইকোমোনাড ফিটাস, ট্রাইকোমোনাড রোগ সৃষ্টি করে। স্ত্রীগরুর জরায়ু এবং জননতন্ত্রে এই রোগ দেখা দেয়। এর ফলে গরুটি বারবার গরম হয়েছে বলে মনে হয়। গো-বসন্ত ভাইরাস ঘটিত রোগ, এটি স্তনগ্রন্থি, বাঁট, গাই ও পেটের ভিতরের দিকে কোন কোন

সময় দেখা যায় ও এতে বাঁট লাল হয়ে যায়। ম্যাসটাইটিস দুগ্ধবতী গরুর একটি মারাত্মক রোগ। দেখা গেছে যেসব গরু বেশী দুধ দেয় তাদের এই রোগ হয়। অল্প দুধ-দেওয়া দেশী গরুর মধ্যে এই রোগ নেই বললেই চলে। এই রোগে গরুর বাঁট জ্বালা করতে থাকে এবং স্বাভাবিক দুধ পাওয়া যায় না। স্টেপটোকক্কাস হলো অ্যাগাল্যাকটি রোগের জীবাণু, এর ফলে গরুর দুধ জমে যায় অথবা দুধ দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়।

পরিশেষে আর একটা কথা বলা দরকার। দুধ অ্যাম্পোটারিক, অর্থাৎ অ্যাসিড, ক্ষার উভয় ধর্মই প্রকাশ করে। অ্যাসিড মিডিয়ামে এলে, এটি ক্ষারের কাজ করে এবং অ্যাসিডধর্মিতা নষ্ট করে দেয়। অথচ কোন বায়োকেমিক্যাল বিক্রিয়া হয় না এবং দুধের মানও ঠিক থাকে। অম্বলের রোগীরা যেসব অ্যান্টাসিড খান তা পেটে গিয়ে তাপ সৃষ্টি করে। দুধের মধ্যে এসব কাজ নেই। এজন্য ডাক্তাররা অম্বলের বা গ্যাসট্রিক আলসারের রোগীকে দুধ খেতে বলেন।

ভারী জল

শুভংকর

জলের সঙ্গে আমাদের পৃথিবীর জীবনের সম্পর্ক কত নিবিড় তা তোমরা নিশ্চয়ই জান। জল ছাড়া শস্য ফলে না, ফুল ফোটে না, প্রাণীদের জীবনও বাঁচে না। পৃথিবীর তিনভাগই তো জল—এই জলের উপাদান কি? একটি জলের অণুতে থাকে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটি অক্সিজেন পরমাণু। 1934 খৃস্টাব্দে হ্যারল্ড উরে আবিষ্কার করেন ভারী জল যার অণুতে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণুর পরিবর্তে রয়েছে দুটি ডয়েটেরিয়াম বা ভারী হাইড্রোজেন পরমাণু। হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে একটি পজিটিভ আধান প্রোটন ও তার চারদিকে ঘোরে একটি ইলেকট্রন। ভারী হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রে যোগ হয় একটি নিউট্রন—ফলে তার ভর দ্বিগুণ হয়ে যায়। কারণ ইলেকট্রনের তো ভর খুবই কম—প্রোটনের 1/1850 ভাগ অথচ নিউট্রনের ভর প্রোটনের মত। তাই ভারী জলের আণবিক ওজন সাধারণ জলের চেয়ে দুটি ভারী হাইড্রোজের জন্য 2 সংখ্যাযুক্ত হয়। সাধারণ জলের আণবিক ওজন 18·016 আর ভারী জলের 20।

ভারী জলের স্ফুটনাংক 101·4°C ও হিমাংক 3·8°C। সাধারণ জলের চেয়ে যে বেশী তা বুঝতেই পারছ। সাধারণ জলের মত ভারী জল কিন্তু আর জীবন নয়, তা শরীরের পক্ষে অকেজো। ভারী জলে বীজের অংকুরোদগম হয় না। এই জল খেয়ে তৃষ্ণাও মেটে না। ডয়েটেরিয়াম ছাড়া দুটি নিউট্রনসহ ভারী হাইড্রোজেন ট্রাইটিয়ামও পাওয়া গেছে—তা তেজস্ক্রিয়। সাধারণ জলে এদুটিও রয়েছে তবে ট্রাইটিয়াম জল খুবই নগণ্য ধর্তব্যের মধ্যে নয়—কিন্তু ডয়েটেরিয়াম জল বা D_2O সাধারণ জলের দশ লক্ষ গ্রামে 200 গ্রাম মিশ্রিত থাকে অবশ্য এই মিশ্রণে সাধারণ জলের গুণ নষ্ট হয় না অথবা D_2O-র যে সব ধর্ম পৃথক, তাও জীবজগতে প্রভাব ফেলতে পারে না।

রসায়নবিজ্ঞানীদের কাছে উরের এই আবিষ্কার নিছক কৌতূহল হয়েই ছিল এবং তাই থাকত যদি না 1934 খৃস্টাব্দে নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞানের পরীক্ষায় এনরিকো ফের্মির বিস্ময়কর আবিষ্কার—কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়ার ফল প্রকাশিত না হতো।

ফের্মি ও তাঁর সহকর্মীরা ক্রমশঃ দেখছিলেন যে প্রায় সব মৌলিক পদার্থই নিউট্রন দিয়ে তেজস্ক্রিয় করা যায়—আর নিউট্রনের গতিবেগ কম হলে তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ বাড়ে। কিন্তু কেন?

তার কারণ হলো নিউট্রনেরও তরঙ্গধর্ম আছে। গতিবেগ বাড়লে নিউট্রনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমে যেমন আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমে তার কম্পাংক বাড়লে। নিউট্রনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য যত কম হয় তার আয়তনও তত কমে। 0·1 ইলেকট্রনভোল্ট শক্তির নিউট্রন যে গতিবেগ পাবে তাতে তার আকার পরমাণু কেন্দ্রের প্রায় দশ হাজারগুণ বেশী হবে; তাই মন্দগতি নিউট্রন বস্তুর মধ্যে সহজে পরমাণু কেন্দ্রে আঘাত হানতে পারবে অথবা শোষিত হবে কারণ তার আয়তনে সে অনেক পরমাণু কেন্দ্রের সংস্পর্শে আসবে।

পরমাণু কেন্দ্র কিভাবে দশ হাজারগুণ বড় কণিকাকে গ্রাস করবে? আমরা নিউট্রন কণিকার তরঙ্গই ভেবে নিয়ে একথা বলছি যে নিউট্রন কেন্দ্রে শোষিত হলে তার শক্তি লক্ষগুণ বেড়ে যাবে ফলে তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমে পরমাণু কেন্দ্রের আয়তনের মধ্যে এসে যাবে। কিন্তু তখন এই বাড়তি নিউট্রনের সংযোগে পরমাণুকেন্দ্র বেসামাল হয়ে পড়বে অর্থাৎ তা একটি তেজস্ক্রিয় অস্থায়ী অবস্থা পাবে।

যেমন—অ্যালুমিনিয়ামে-27 একটি নিউট্রন শোষণ করে যে অস্থায়ী Al-28 আইসোটোপ তৈরি করবে তা অচিরেই বীটা বিকিরণের সাহায্যে স্থায়ী সিলিকন মৌলিক পদার্থে পরিণত হবে।

এখানে ভারী জলের প্রসঙ্গ কেন আসছে? এই জন্যই আসছে যে, নিউট্রন বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ কণা তাই তার গতিবেগ কমাতে তার চেয়ে বেশী ভারী নয় এমন পরমাণুতে আঘাত করতে

হবে—দুটি বিলিয়ার্ড বলের পরস্পর সংঘর্ষে যেমনটি হয় আর কি ? সাধারণ জল অবশ্যই এই কাজ করতে পারে—দ্রুতগামী নিউট্রনের শক্তি অনায়াসেই জলে শোষিত হতে পারে—কিন্তু জলের অসুবিধা হলে তা নিউট্রনকেই অবাধে শোষণ করে নেয়। ফলে D_2O তৈরি হয়ে যায়।

জলের পরিবর্তে D_2O মন্দক হিসেবে ব্যবহার করলে নিউট্রন শোষিত হয় না অথচ তার শক্তি কমে যায়। তাই জলের পরিবর্তে ভারী জল আদর্শ মন্দক।

মন্দক হিসেবে D_2O-র উপযোগিতা হলো নিউক্লীয় রিয়্যাক্টরে তার ব্যবহার। ইউরেনিয়ামের দুটি আইসোটোপ-238 ও 235 ভরের। মন্দগতি নিউট্রনে U-235 বিভাজনে শক্তি পাওয়া যায়—অথচ স্বাভাবিক খনিজ ইউরেনিয়ামে তার পরিমাণ শতকরা একভাগেরও কম। আবার U-238-এ নিউট্রন সহজেই শোষিত হয়ে প্লুটোনিয়াম-239 তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরি করে। তাই স্বাভাবিক ইউরেনিয়ামে নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টর তৈরি করতে প্রয়োজন হয় মন্দক বা moderator যা দিয়ে নিউট্রন 0·02 ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তিতে মন্দীভূত হয়। এই সব ইলেকট্রনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বড় আকারের—তাই বিভাজন ঘটানোর পাল্লাও বেশী। আবার U-238-এ এত মৃদুগতি নিউট্রনের শোষণ হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে না।

U-235 বিভাজনে শৃংখল ক্রিয়ায় একটি নিউট্রনের আঘাতে পরমাণু কেন্দ্র বিভাজিত হয়ে শক্তি তো দেয়ই, পরন্তু একাধিক নিউট্রনও উৎপন্ন করে। D_2O অর্থাৎ ভারী জলে সে সব নিউট্রন মন্দীভূত হয়ে আবার বিভাজন ঘটায় ও শৃংখল ক্রিয়া চলতে থাকে। তাই ভারী জলের কদর আধুনিক যুগে এত বেড়েছে।

ভারতে তাই কয়েকটি ভারী জলের কারখানা তৈরি হয়েছে। ভারী জল দিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ নিউক্লিয় রিয়্যাক্টরগুলি খনিজ স্বাভাবিক ইউরেনিয়াম জ্বালানীতেই বিদ্যুৎশক্তির উৎস হবে।

বালি

মণীন্দ্রনাথ দাস*

বালির প্রধান উপাদান সিলিকা বা সিলিকন-ডাই-অক্সাইড। এর সঙ্গে মাটি, লৌহ, খটিকাদি বহু যৌগিক অবস্থায় থাকতে পারে। গ্রানাইটাদি সিলিকন প্রধান প্রস্তর কালক্রমে শীত গ্রীষ্ম, জলবায়ু ও সূর্যতাপের প্রভাবে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে বালিতে পরিণত হয়। বালি সাধারণতঃ সমুদ্রতীরে, নদীতটে ও মরুভূমিতে পাওয়া যায়। বালুকাকণা ·05 মিলিমিটার ছোট থেকে 2 মিলিমিটার পর্যন্ত বড় হতে পারে। বালির বর্ণ ধূসর, হলদে, বাদামী, লাল ও কালো রঙের হয়ে থাকে, এর কারণ বিভিন্ন পরিমাণে লৌহযুক্ত মিশ্রবস্তুর উপস্থিতি। কখনও কখনও বালির সঙ্গে সোনা, রাং, থোরিয়াম, ইউরেনিয়াম, চৌম্বক লৌহকণা ও তামড়ি (garnet) মিশ্রিত থাকে।

চুন বা সিমেন্টের সঙ্গে বালি মিশিয়ে ইট জোড়বার মশলা, কংক্রিট এবং পলাস্তারা করবার কাজ করা হয়। এছাড়া কাচ তৈরি ও চিনেমাটির পাত্র প্রস্তুত করতেও বালির বিশেষ ব্যবহার আছে। বাসন মাজতে ও জল ছেঁকে পরিষ্কার করতেও বালি ব্যবহৃত হয়।

দক্ষিণ ভারতে মালাবার ও করমণ্ডল সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে মোনাজাইট বালি পাওয়া যায়, এতে শতকরা আট-দশ ভাগ থোরিয়াম ও 0·3% থেকে 0·4% ইউরেনিয়াম অক্সাইড থাকে। এজন্য এই বালি তেজস্ক্রিয় (radio-active) পদার্থের মধ্যে বর্ণনীয়। আবদ্ধ অন্ধকার জায়গায় এই বালি ফোটোগ্রাফিক ফিল্ম বা প্লেটের উপর কয়েক দিন ছড়িয়ে রাখলে তেজোরশ্মি নির্গমনের ফলে তাতে দাগ পড়ে যায়।

একরকম আশ্চর্যজনক বালি আছে, যাকে বালুকা (singing sand) বলা হয়। এই প্রকার শব্দোৎপাদক বালি দুই হাতে ধরে চেপে জোরে ঘষলে সুন্দর সরু সুর শোনা যায়। দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডে পুল নামক স্থানে এবং প্রশান্ত মহাসাগরে হাউই দ্বীপপুঞ্জে এই ধরণের ধ্বনিজনক বালুকা আছে বলে জানা যায়। শব্দের তীব্রতা চাপ, তাপ ও আর্দ্রতার ওপর নির্ভর করে।

সবশেষে রহস্যজনক এক বালির বিষয় বলব যা জলে ডোবালেও ভিজবে না। একটি পরিষ্কার লোহার কড়া খুব উত্তপ্ত উনানের উপর স্থাপন করে তার মধ্যে প্রায় এক কিলোগ্রাম আন্দাজ বিশুদ্ধ বালি দিয়ে গরম করতে হবে। যখন এই তপ্ত বালির মধ্যে একখণ্ড কাগজ দিলে বাদামী বর্ণ ধারণ করবে, তখন ওর ভেতর তিন গ্রাম আন্দাজ মোম ফেলে দিয়ে নেড়ে চেড়ে ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। এর পর উনান থেকে ঐ কড়া নামিয়ে নিয়ে ঠাণ্ডা করলে সমস্ত বালিটা আগেকার মত ঝরঝরে হয়ে ভেঙ্গে যাবে, কিন্তু এই বালি জলে নিমজ্জিত করলে কিছুতেই আর ভিজবে না, কারণ মোম মিশ্রণের ফলে প্রত্যেক বালির কণার একটি সূক্ষ্ম তৈলাক্ত আবরণ পড়ে যায়, যার জন্য সেটি আর কোনমতেই জলসিক্ত হয় না। সকলেই এই বিস্ময়কর বালুকা দেখে আশ্চর্য হয়ে পড়ে। ইংরাজীতে একেই non-wetting sand বলে।

*[illegible], পুরুলিয়া রোড, রাঁচী, বিহার

ঘনমূল নির্ণয়ের সহজ পদ্ধতি

অলোক গুহ*

ভাগক্রিয়ার সাহায্যে ঘনমূল

ঘনমূল নির্ণয়ের এই পদ্ধতিটি খুবই সহজ এবং এই পদ্ধতির সাহায্যে যে কোন সংখ্যার ঘনমূল অতি সহজেই নির্ণয় করা যায়।

প্রথমে যে সংখ্যাটির ঘনমূল নির্ণয় করতে হবে তার এককের ঘরের মাথায় একটি বিন্দু বসাতে হবে এবং এর পর তিন ঘর অন্তর অন্তর বিন্দু বসাতে হবে। যতগুলি বিন্দু বসল ততগুলি অঙ্ক নিয়ে ঘনমূলটি গঠিত। এখন ঘনমূলের প্রথম অঙ্কটি মুখে মুখেই বের করা যায় ; যে সংখ্যাটির ঘনমূল নির্ণয় করতে হবে তার প্রথম অংশটির অঙ্ক দেখে (অবশ্যই বাঁ দিক থেকে শুরু করে)। এখন ঐ প্রথম অংশটির ঘনফল বাদ দিয়ে যা অবশিষ্ট রইল তার পাশে দ্বিতীয় অংশটি বসাতে হবে এবং একে ঘনমূলের প্রথম অঙ্কটির 30 গুণ দ্বারা ভাগ করতে হবে। ভাগফল যা হবে তা থেকে ঘনমূলের দ্বিতীয় অঙ্কটি বের করা যাবে। এখন ঘনমূলের প্রথম অঙ্কটিকে a এবং দ্বিতীয় অঙ্কটিকে b ধরলে দ্বিতীয় অঙ্ক বা b নির্ণয়ের সূত্র হবে—

$b(10a+b)$ = ভাগফল বা ভাগফল অপেক্ষা কম কিন্তু ভাগফল অপেক্ষা কখনই বেশী নয়। স্পষ্টতই উপরের সূত্র অনুযায়ী দুটি অবস্থার উদ্ভব হতে পারে। $b(10a+b)$= ভাগফল বা $b(10a+b)$=ভাগফল অপেক্ষা কম। প্রথম ক্ষেত্রে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে ভাগশেষ যা রয়েছে তাই b^3 আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে $30a$[ভাগফল—$b(10a+b)$]+ ভাগশেষের মান b^3-র সমান। কিন্তু এটি যদি b^3-র মান অপেক্ষা বেশী হয় তা হলে বুঝতে হবে বাড়তি অংশ ঘনমূলের তৃতীয় অঙ্ক নির্ণয়ের জন্য। সেক্ষেত্রে ঐ বাড়তি অংশটিকে ঘনফলের তৃতীয় অংশের ঠিক আগে এনে বসাতে হবে এবং ঘনমূলের দ্বিতীয় অঙ্কটিকে যে ভাবে নির্ণয় করা হয়েছে ঠিক সেভাবে তৃতীয় অঙ্কটিও নির্ণয় করতে হবে। তবে এখানে আগেই বের হয়ে যাওয়া দুটি অঙ্ককে একত্রে একটি অঙ্করূপে গণ্য করতে হবে অর্থাৎ ঐ দুটি অঙ্ককেই একত্রে a হিসাবে ধরতে হবে। এ ভাবে অগ্রসর হয়ে যে কোন সংখ্যার ঘনমূল আমরা নির্ণয় করতে পারি। মনে রাখতে হবে $30a$ দ্বারা ভাগ করে—যে ভাগশেষ পাওয়া যায় তা প্রকৃত ভাগশেষের একটি অংশ মাত্র। প্রকৃত ভাগশেষ নির্ণয়ের সূত্র হলো $30a$[ভাগফল $-b(10a+b)$]+ভাগশেষ $-b^3$

* 57/2, ডাঃ কে. ডি. মুখার্জী রোড, বেহালা, কলি-60

কয়েকটি উদাহরণ—

42508549-এর ঘনমূল বের কর।

স্পষ্টতই ঘনমূলটি তিনটি অঙ্ক নিয়ে গঠিত।

সমাধান—

```
     42508549|3/4/9
     27
90 ) 15508 ( 172
     90
     ----
     650
     630
     ----
      208
      180
      ----
       28
```

ভাগফল 172 থেকে ঘনমূলের দ্বিতীয় অঙ্ক নির্ণয়। মনে করি দ্বিতীয় অঙ্ক b

$\therefore$ $b(10a+b)=172$ বা 172 অপেক্ষা কম।

$\therefore$ $b(10\times3+b)$ বা $b(30+b)=172$ হলে b-এর মান স্পষ্টতই হয় 4.

কারণ $4(30+4)$ বা $4\times34=136$.

(যদি b-এর মান 5 হয় অহলে $5\times35=175$ এটি 172 অপেক্ষা বড় হয়। $\therefore$ $b=4$ হবে 5 হবে না।)

$\therefore$ ঘনমূলের তৃতীয় অঙ্ক হলো 4.

এইবার ঘনমূলের তৃতীয় অঙ্ক বের করতে হবে।

তার আগে ভাগশেষ নির্ণয় করতে হবে।

ভাগশেষ নির্ণয় : আমরা আগেই দেখেছি $4\times34=136$. এখন $172-136=36$,

এই 36-কে 90 দ্বারা $(30a)$ গুণ করলে হয় 3240, এর সঙ্গে 28 যোগ করে b^3 বা 4^3 বা 64 বাদ দিতে হবে। এই বিয়োগফলই হলো প্রকৃত ভাগশেষ অর্থাৎ $3240+28-64$ বা 3204-এর পাশে বসবে 549 (ঘনফলের শেষ অংশ)।

ঘনমূলের তৃতীয় অঙ্ক নির্ণয় :

1020 (30a)) 3204549 (3141
3060
1445
1020
4254
4080
1749
1020
729

(এখানে 34-কে a ধরা হয়েছে।)

এখন b(340+b)=3141 বা তার কম।

b=9 বসালে পাই 9×349=3141.

লক্ষ্য কর ভাগশেষ 729 হলো 9-এর ঘনফল।

∴ 42508549-এর ঘনমূল হলো 349.

ঘনমূল বের কর : 3560550183

ঘনমূল নির্ণয়

3560550183 (1527 (স্পষ্টতই ঘনমূলটি চারটি অঙ্ক দিয়ে গঠিত)
1
30) 2560 (85
240
160
150
10

ঘনমূলের দ্বিতীয় অঙ্ক : $b(10+b)=85$
বা 85 অপেক্ষা কম
$5\times(10+5)=75$

∴ দ্বিতীয় অঙ্ক 5 কারণ $6\times16=96$, 85 অপেক্ষা বড়।

ভাগশেষ হবে $[30(85-75)+10]-125=185$
∴ $310-125=185$)

তৃতীয় অঙ্ক (15 কে a ধরে)

450 (30a)) 185550 (412 (এখানে ঘনফলের তৃতীয় অংশ (550) ভাগশেষ 185-র ঠিক ডানপাশে বসল)
1800
555
450
1050
900
150

$b(150+b)=412$ বা $2(150+2)$ বা $2\times152=304$.

($b=3$ হবে না কারণ $3\times153=459$. এটি 412 অপেক্ষা বড়।)

∴ ঘনমূলের তৃতীয় অঙ্ক 2

ভাগশেষ নির্ণয় : এখানে $412-304=108$ হওয়ায়

ভাগশেষ হবে $[(450\times108)+150]-8$
বা $(48750-8)$ বা 48742.

ঘনমূলের চতুর্থ অঙ্ক নির্ণয় (ঘনমূলের চতুর্থ অংশ 183 ভাগশেষ 48742-র পাশে বসল)

4560 (30a)) 48742183 (10689
4560
31421
27360
40618
36480
41383
41040
343

(152কে a ধরে)

$b(1520+b)=10689$ বা তার কম।

এখন $b=7$ ধরলে হয় 7×1527 বা 10689.

আবার লক্ষ্য কর ভাগশেষ 343 হলো 7-এর ঘনফল।

∴ ঘনমূলটির চতুর্থ অঙ্ক হবে 7.

∴ 3560550183-এর ঘনমূল হলো 1527.

632 এর ঘনমূল বের কর (দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত)।

সমাধান—

632 (8·58
512
240) 120000 (500
1200
×

ঘনমূলের দ্বিতীয় অঙ্ক নির্ণয় $b(80+b)=500$ বা 500 থেকে কম।

এখানে b-এর মান হয় 5 কারণ $5\times85=425$ কিন্তু $6\times86=516$.

ভাগশেষ নির্ণয় : $500-425=75$.

$240\times75-125=17{,}875(18{,}000-125)$

$125=5^3$

ঘনমূলের তৃতীয় অঙ্ক : 2550) 17,875000 (7009
17850
25000
22950
2050

(8·5-কে a ধরে)

$b(850+b)$ বা $8(850+8)$ বা $8\times858=6864$.

∴ b-এর মান হলো 8 ∴ 632 এর দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত ঘনমূল হলো 8·58.

ঘনমূল বের কর : 3375

সমাধান—

3375 (15
1
30) 2375 (79
210
275
270
5

ঘনমূলের দ্বিতীয় অঙ্ক নির্ণয় :

এখানে b-এর মান 5 করায় $5\times15=75$ আবার $6\times16=96$. ∴ b-এর মান 5 হবে। ভাগশেষ নির্ণয় : $79-75=4$.

$(30\times4+5)-125=0$

∴ বুঝা যাচ্ছে এক্ষেত্রে ভাগশেষ আর থাকছে না এবং নির্ণেয় ঘনমূল হবে 15.

∴ 3375-এর ঘনমূল হলো 15.

একটু অন্য কথা

অনুরূপ

1. চতুর্দশ শতাব্দীতে ইউরোপে প্লেগ মহামারী আকারে দেখা দেয় এবং প্রায় সাড়ে সাত মিলিয়ন লোক এই রোগে মারা যায়। পরেও এই রোগের পুনরাবৃত্তি ঘটে। তাই প্লেগ দেখা দিলেই ভয়ে ও আতঙ্কে মানুষ গ্রাম-শহর ছেড়ে অন্যস্থানে চলে যেত। কিন্তু এই ভীষণ বিভীষিকা সুযোগ করে দিয়েছিল বিজ্ঞানের এক মহা-আবিষ্কারের। 1665 খৃঃ প্লেগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য নিউটন শহর ছেড়ে চলে যান গ্রামের বাগান বাড়ীতে। ঐ সময়ই বাগানের আপেল গাছ থেকে আপেল পড়া দেখে তাঁর চিন্তায় মহাকর্ষ সূত্রটি রেখাপাত করে। এই সূত্র বিজ্ঞানে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের এক বিরাট পদক্ষেপ।

2. 1908 খৃঃ পল এরলিক ও মেকিনকভ একসঙ্গে অনাক্রম্যতা (immunity)-র উপর কাজের জন্য নোবেল পুরস্কার পান। এরলিক যৌনব্যাধি ও পাগলের চিকিৎসায় যথেষ্ট সুনামের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তাঁর নিজের পাগলামো সম্বন্ধে তিনি মোটেই সচেতন ছিলেন না। তিনি এমনভাবে লিখতেন বা লেখার জন্য এমন সব চিহ্ন ব্যবহার করতেন যা প্রচলিত কোন ভাষায় ছিল না। অপরের কাছে এসবতো দুর্বোধ্য ছিলই এমনকি তাঁর নিজের কাছেও মাঝে মাঝে দুর্বোধ্য হয়ে উঠত। খাতায় বা কাগজে না লিখে বহু প্রয়োজনীয় বিষয় দরজায়, জানালায়, কাপে, গেলাসে, টেবিলে বা নিজের পোষাকে লিখে রাখতেন। হাতের কাছে কিছু না পেলে রোগীর বা সাক্ষাৎকারীর পোষাকে লিখতেন।

3. গাউস বিদ্যালয়ে তাঁর সহপাঠীদের ঠাট্টা করে বলতেন, "তোদের বলার আগেই আমার গণনা শেষ।" এর পিছনে আছে একটি ছোট্ট ঘটনা। ক্লাসে একদিন শিক্ষক 1 থেকে 100 পর্যন্ত যোগ করতে দেন। ছাত্ররা $1+2=3$, $3+3=6$, $6+4=10$, ...এইভাবে সমাধান করার চেষ্টা করতে লাগল। গাউস কিন্তু অল্প সময় পরেই শ্লেটটি ডেস্কের উপর উল্টে রাখলেন। উপর পিঠে লেখা—'Ligget se' অর্থাৎ এটি এখানে। সমান্তর প্রগতির সূত্রটি অজান্তেই কাজে লাগিয়ে সহজে ও অল্প সময়ে গাউস লিখে রেখেছিলেন সঠিক উত্তরটি—5050।

4. ম্যাসাচুসেটের হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি একবার সিদ্ধান্ত নেন-অ্যানেসথিসিয়া anaesthesia) যিনি আবিষ্কার করেছেন তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করা হবে। বিরোধ বাঁধল আবিষ্কারকের নাম নিয়ে। একদলের মতে আবিষ্কারক উইলিয়াম মর্টন, আর একদলের মতে চার্লস জ্যাকসন্। বিরোধ যখন তুঙ্গে তখন অলিভার ওয়েন্ডেল হোমস বিরোধের মোকাবিলায় প্রস্তাব দেন—দু-জনেরই অর্ধ-অবয়ব প্রতিমূর্তি স্থাপনের।

বৈজ্ঞানিক মডেল

জ্ঞানের আলো নির্মাণ

রুবী বড়ুয়া*

এখানে মডেলটির একটি নক্সা ও নির্মাণ কৌশল দেখানো হয়েছে। মডেলটি তৈরি করতে লাগবে কিছু বোর্ডপিন, কিছু

টুকরো ইলেক্‌ট্রিক তার, একটি টর্চের বাল্ব, 1·5v একটি ব্যাটারী।
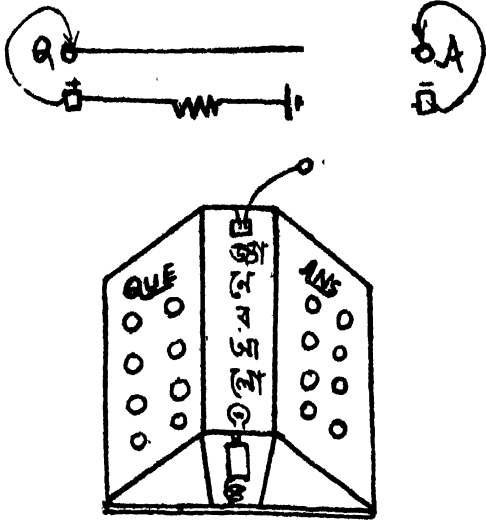
চিত্রের ন্যায় অনেকটা প্রিজম্‌ আকৃতির একটি বাক্স তৈরি করতে হবে, বাক্সের ভিতরের মধ্যভাগের একপাশে একটি ব্যাটারী বসাতে হবে। ঠিক তার উপরে টর্চের বাল্বটি থাকবে। বাক্সের এক পাশে থাকবে কিছু প্রশ্ন ও অন্যপাশে সেই প্রশ্নগুলির উত্তর। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি বোর্ডপিন দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে। প্রশ্নের বোর্ডপিনের সঙ্গে উত্তরের বোর্ডপিন টুকরো তার দ্বারা বাক্সের নীচের দিকে যুক্ত রাখতে হবে। এইবার বাক্সের মধ্যবর্তী অংশের উপরদিকে ব্যাটারীর পজিটিভ প্রান্ত থেকে একটি তার এবং নেগেটিভ প্রান্ত থেকে একটি তার বের করতে হবে

এইবার ব্যাটারীর পজিটিভ প্রান্ত থেকে নির্গত তারকে কোন প্রশ্নের বোর্ডপিনে লাগালে এবং নেগেটিভ প্রান্তটিকে সঠিক উত্তরের বোর্ডপিনে লাগালে লাইট জ্বলবে। সঠিক উত্তরের বোর্ডপিন ছাড়া লাইট জ্বলবে না। কারণ প্রতিটি প্রশ্নের বোর্ডপিন সঠিক উত্তরের বোর্ডপিনের সঙ্গে বাক্সের নীচে তার দ্বারা যুক্ত থাকায় প্রশ্নের বোর্ডপিন ও উত্তরের বোর্ডপিন ঠিক মত সংযুক্ত হলে বর্তনী সম্পূর্ণ হয় এবং লাইট জ্বলে, ভুল উত্তরের বোর্ডপিনে লাগালে বর্তনী অসম্পূর্ণ থাকে এবং লাইট জ্বলে না। এইভাবে একটি জ্ঞানের আলো তৈরি করা যায়।

11/20 আইনস্টাইন রোড, দুর্গাপুর-5

বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ও শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান প্রসার সমিতির যৌথ উদ্যোগে ৪ই এপ্রিল, 1983 শুক্রবার বিকাল সাড়ে পাঁচটায় 'সত্যেন্দ্র ভবনে' (পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700006) প্রয়াত বিজ্ঞান সাধক ডঃ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের দ্বিতীয় বার্ষিক স্মরণ-সভা অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি ডঃ সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করবেন ডঃ তারকমোহন দাস। উক্ত সভায় শ্রীঅজয় হোম "বাংলার পাখী" শীর্ষক "গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য স্মারক-বক্তৃতা" প্রদান করবেন। সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

ভেবে উত্তর দাও

শুভেন্দু ভট্টাচার্য*

[নীচের প্রশ্নগুলির একাধিক উত্তরগুলির মধ্যে সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত কর।

1. যে যন্ত্রটির সাহায্যে জলের মধ্যে শব্দ রেকর্ড করা হয়, তার নাম হলো :—
(ক) হাইগ্রোমিটার, (খ) হাইড্রোফোন, (গ) গ্রাভিমিটার, (ঘ) গ্যালভ্যানোমিটার।

2. বাতাসের আর্দ্রতা পরিমাপক যন্ত্রটির নাম হলো :—
(ক) হাইড্রোমিটার, (খ) ম্যানোমিটার, (গ) হাইগ্রোমিটার।

3. সূর্যের উচ্চতা নির্ণয়কারী যন্ত্রটি হলো :—
(ক) স্পেক্‌ট্রোমিটার, (খ) স্ফেরোমিটার, (গ) সেক্সট্যানট্।

4. মানুষের দেহের বৃদ্ধির জন্য নূতন কোষ নির্মাণে প্রয়োজন হয় :—
(ক) কার্বোহাইড্রেট, (খ) প্রোটিন, (গ) ফ্যাট।

5. ভিটামিন-'C'-র অভাবে যে রোগ হয় তার নাম হলো :—
(ক) কর্কট রোগ, (খ) বেরিবেরি, (গ) স্কার্ভি, (ঘ) রিকেট।

6. দুধ, মাখন এবং ঘিতে রয়েছে :—
(ক) ভিটামিন-B এবং ভিটামিন-C, (খ) ভিটামিন-E এবং ভিটামিন-K, (গ) ভিটামিন-A এবং ভিটামিন-D।

7. চীনা পদ্ধতিতে সূচের সাহায্যে রোগচিকিৎসা করার নাম হলো :—
(ক) অ্যানেবায়োসিস, (খ) মার্মাগং, (গ) আকুপাংচার।

8. ক্লোরোমাইসেটিন ঔষধ ব্যবহার করা হয় :—
(ক) টাইফয়েডে, (খ) কলেরায়, (গ) টিউবারকুলোসিসে।

9. থ্রম্বোসিস রোগ হলো :—
(ক) ফুসফুসের, (খ) থাইরয়েড গ্রন্থির, (গ) রক্তের।

10. ইনসুলিন থাকে :—
(ক) লিভারে, (খ) প্যানক্রিয়াসে, (গ) পিটুইটারি গ্রন্থিতে।

11. রেডিয়াস, আলনা এবং স্ক্যাপুলা হাড় হলো :—
(ক) বাহুর, (খ) পায়ের, (গ) উরুদেশের সন্ধিস্থলের।

12. কণ্ঠের হাড়ের ডাক্তারি নাম হলো :—
(ক) ফেমুর, (গ) ক্ল্যাভিকল্, (গ) ফাইবিউলা।

সঠিক উত্তর পাঠাতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।]

* 38 নন্দন পার্ক, কলিকাতা-7000 4

জানুয়ারী '83 সংখ্যার শব্দ-শৃঙ্খলের সমাধান

X	নি	উ	ট্র	ন	X	শি	রা	X	সি
X	উ	X	পি	X	X	X	X	X	স্টো
X	ক্লি	X	ক	X	লু	ই	ব্রে	ই	ল
X	য়া	X	X	X	X	X	ন	X	X
ম	স	X	X	X	X	মা	X	X	লু
র্স	X	ভে	X	প	X	র্ক	X	X	ই
X	ও	ভি	উ	ল	X	নি	ম	X	পা
X	য়া	X	X	মূ	ল	X	X	X	ন্তু
ফ	ট	X	X	লা	X	X	বে	তা	র
X	X	জে	না	র	X	X	X	প	X

উপর থেকে নীচে

1. নিউক্লিয়াস 3. সিস্টোল 4. মর্স 5 ট্রপিক 7. ভেভি 8. ওয়াট 10. লুইপান্তুর 12. তাপ 14. পলমূলার 17. ব্রেন 18. মার্কনি

পাশাপাশি

1. নিউট্রন 2. শিরা 4. মস 6. লুইব্রেইল 8. ওভিউল 9. নিম 11 বেতার 13. মূল 15. জেনার 16. ফট

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ঃ

1) কোন্ বইয়ে প্রথম বাংলা ছাপা অক্ষর ব্যবহার করা হয় ?

সুব্রত দাস
কলিকাতা-64

2) কোন্ কোন্ উদ্ভিজ্জ রেচন পদার্থ ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা হয় ?

3) কোন্ পাখী মোম পরিপাক করতে পারে, তারা কোথায় থাকে এবং কি ভাবে পরিপাক করে ?

4) পাখাবিহীন পাখী কোন্ স্থানে পাওয়া যায় এবং তার নাম কি ?

কুমারেশ মণ্ডল
তারকেশ্বর হুগলী,

উত্তর

1) গ্রামার অফ দি বেঙ্গলি ল্যাংগোয়েজ বইয়ে প্রথম বাংলা ছাপা অক্ষর ব্যবহার করা হয়।

2) উদ্ভিদের কোন রেচন অঙ্গ নাই। তাই উদ্ভিদ বর্জ্য পদার্থগুলি ছাল, ফল, বীজ, পাতা ও ফুলের পাপড়িতে জমিয়ে রাখে। ঐগুলি একসময়ে উদ্ভিদদেহ থেকে ঝরে পড়লে বর্জ্য পদার্থ বের হয়ে যায়। নীচে ছকের সাহায্যে বর্জ্য পদার্থের নাম, গাছের নাম ও গাছের কোন্ অংশ থেকে পাওয়া যায় তা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো ঃ

	বর্জ্য পদার্থের নাম	গাছের নাম	গাছের অংশ
1.	কুইনাইন	সিঙ্কোনা	গাছের ছাল
2.	আফিং	পোস্ত	বীজ
3.	মরফিন	শিয়ালকাঁটা	বীজ
4.	নিকোটিন	তামাক গাছ	তামাক গাছের পাতা
5.	ট্যানিন	হরিতকী, চাগাছ	হরিতকীর ফলের ছাল, চা পাতা।

3) কাঠঠোকরা পাখীর মত দেখতে এক প্রকার পাখী দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকে, তাদের বলে মধু-নির্দেশক (honey guide)। এরা কিচির-মিচির এবং উচ্চ রবের দ্বারা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফলে মানুষ তখন পাখীটিকে অনুসরণ করে। পাখীটির এই অদ্ভুত আচরণের কারণ হচ্ছে খাদ্য। এরা মধু অপেক্ষা মোম বেশী পছন্দ করে এবং খাঁটি মোম ও মৌচাক ভক্ষণ করে। পাখীটি বহু দূরে অবস্থিত মৌচাকের দিকে মানুষকে পথ নির্দেশ করে নিয়ে যায়। যখন মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করা হয় তখন পাখীটি চুপ করে বসে থাকে। মধু-সংগ্রহকারী চলে যাবার পরে পাখীটি মৌচাকটি ভক্ষণ করে। মধু-নির্দেশক পাখী ব্যতীত একমাত্র ব্যতিক্রম মোম-মথের (wax-moth) মধ্যে দেখা যায়। এরা মোম ভক্ষণ করার কৃতিত্বের অধিকারী। মধু-নির্দেশক পাখীদের মধ্যে মিথোজীবী ব্যাকটিরিয়া মোম পরিপাকের জন্য দায়ী। এই পাখীদের পরিপাক নালীর মধ্যে ব্যাকটিরিয়াগুলি বাস করে। তারা কতকগুলি পদার্থ হজম করতে পারে, যেগুলির সেই প্রাণীর এনজাইম দ্বারা আর্দ্রবিশ্লেষণ হয় না। জীবাণুগুলি পদার্থগুলির এমন পরিবর্তন বা রূপান্তর ঘটায় যে, সেগুলি তখন প্রাণীর দ্বারা সহজেই পাচিত হয়। প্রাণীরাজ্যে মোম ভক্ষণ করে জীবন ধারণ করা প্রায় অদ্বিতীয়। কারণ অধিকাংশ প্রাণী মোম পরিপাক করতে পারে না।

4) পাখাবিহীন পাখী নিউজিল্যাণ্ডে পাওয়া যায় এবং পাখীটির নাম কিউই।

[প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছেন বিদ্যুৎকুমার সেন্দা]

সুষমাদেবীচৌধুরাণী বিজ্ঞান গবেষণাগার

আশিসকুমার ভুঁইয়া (পত্রনবীশ)*

সাগর মেখলা ব-দ্বীপগুলির মধ্যে বৃহত্তম ব-দ্বীপ হলো সাগরদ্বীপ। এই দ্বীপে প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তিতে বসে ইতিহাস প্রসিদ্ধ গঙ্গাসাগর মেলা। এই সাগরদ্বীপে এক নির্জনতম প্রান্তে অপরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশে গড়ে উঠেছে জ্ঞানপিপাসু মানুষের জন্য বিজ্ঞানের এক আশ্চর্য গবেষণাকেন্দ্র 'সুষমাদেবীচৌধুরাণী মেরিন বায়োলজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট'।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জীববিজ্ঞানী কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রীডার ডঃ অমলেশ চৌধুরী সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত

সুষমাদেবীচৌধুরাণী বিজ্ঞান গবেষণাগার

উদ্যোগে 1966 খৃস্টাব্দে সাগরদ্বীপের এক অখ্যাতনামা গ্রাম পাথরপ্রতিমায় গড়ে তোলেন এই সমুদ্রগবেষণা কেন্দ্রটি। অমলেশ বাবু তাঁর মায়ের নামে রিসার্চ ভবনটির নামকরণ করেন। মাত্র এই কয় বছরেই গবেষণা কেন্দ্রটি বিজ্ঞানী মহলে সাড়া জাগিয়েছে। ভারত সরকার এবং ইউনেস্কো এগিয়ে এসেছেন এই ইনস্টিটিউটকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে। ইনস্টিটিউটটি সাগর-দ্বীপে গড়ে ওঠায় সাগরদ্বীপবাসীর কাছে এটি জাতীয় সম্পদ হিসাবে (gross national product) স্বীকৃতি লাভ করেছে।

ইনস্টিটিউটটি তৈরির পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য দুটি। এক সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর মৌলিক গবেষণা। এর মধ্যে থাকছে উদ্ভিদ, সমুদ্রের লবণাক্ত জল ও সামুদ্রিক জীব। উদ্ভিদ বলতে প্রকৃতির রাজ্যে সুন্দরবনের লবণাম্বুজ বনানী। এর বিজ্ঞানসম্মত নাম Halophitve Plants অথবা Mangroves। এই ম্যানগ্রোভস বলতে কেওড়া, বাইন, হেতাল, গেঁওয়া, গরাণ ইত্যাদ। এই সব উদ্ভিদের এক অদ্ভুত স্বতন্ত্র চরিত্র রয়েছে। এরা সমুদ্রের ধারে জন্মায়। এরা সব সময় লবণাক্ত জলে আংশিক নিমজ্জিত থাকে। সমুদ্রের জল এত বেশী লবণাক্ত যে অন্য কোন গাছপালা বেঁচে থাকতে পারে না। কিন্তু এই সব উদ্ভিদ শারীরবৃত্তীয় কৌশলে অনেক বছর বেঁচে থাকতে পারে। এদের মূল নদীর উভয় পার্শ্বে ভূমিক্ষয় রোধ করে। ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের রস বহুমূত্র সারায়। এছাড়া এদের ছালে নানান ভেষজ গুণও রয়েছে। কাঠে পোকা, ঘুণ ইত্যাদি কম লাগে। নুলিয়ারা তাদের জালের সুতো ও দড়িকে শক্ত করার জন্য ম্যানগ্রোভের বাকলের রসে সিক্ত করে। দুই, সাগরদ্বীপের জনগণকে বিজ্ঞান বিষয়ে সচেতন করে গড়ে তোলা। এখানকার সম্পদকে সংরক্ষণের দায়িত্বে যথাযথ কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থার সার্বিক উন্নতি সাধন করা হলো এর মুখ্য উদ্দেশ্য।

এখানে যে কয়েকটি বিষয়ের ওপর গবেষণা চলছে সে সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্যগুলো ইনস্টিটিউটের নির্মল গায়েনের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি। মিঃ গায়েন কথা প্রসঙ্গে বললেন ভারতে যে তিনটি সামুদ্রিক গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে সাগরদ্বীপে অবস্থিত সুষমাদেবীচৌধুরাণী মেরিন রিসার্চ ইনস্টিটিউট তাদের মধ্যে অন্যতম। এই রিসার্চ ভবনে গবেষণার প্রয়োজনে সহায়তা করার জন্য সুন্দরবন অঞ্চলে ম্যানগ্রোভস সম্পর্কে তথ্যাবলী সংগ্রহের কাজে ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও কারিগরী দপ্তর এগিয়ে এসেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিজ্ঞানের রীডার ডঃ অমলেশ চৌধুরী, ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও কারিগরী দপ্তরের ডঃ অমিতা বিশ্বাস, আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের

* মুড়িগঙ্গা, 24পরগণা-743392

অধ্যাপক ডঃ কে. কৃষ্ণমূর্তি, বোম্বাই-এর সেন্ট্রাল ইন্সটিটিউট অফ ফিসারীজ অ্যাণ্ড এডুকেশনের ডঃ এস. এন. ত্রিবেদী, জুয়োলজিক্যাল সার্ভে অফ ওসিনোগ্রাফির ডঃ এ. জি. বটব্যাল।

এই ইন্সটিটিউটের অধীনে ইতিপূর্বে গবেষণা করে কয়েকজন গবেষক পি. এইচ. ডি. সম্মানসূচক উপাধি লাভ করেছেন। বর্তমানে বেশ কিছু সংখ্যক তরুণ গবেষক সামুদ্রিক জীব নিয়ে গবেষণা করছেন এবং আরও কয়েকজন গবেষক সুন্দরবনে গোসাবা, সন্দেশখালি, রায়দীঘি, কুলতলী, সজনেখালি ইত্যাদি এলাকায় লঞ্চ ও স্পীডবোট নিয়ে গহন অরণ্যে বনানীগুলো বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে খতিয়ে দেখবার চেষ্টা করছেন।

সুষমাদেবী ইন্সটিটিউটের পাশে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রাম বামনখালি। এখানে গড়ে উঠেছে সাগরদ্বীপের খ্যাতনামা একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়—নাম বামনখালি মধুসূদন প্যারীমোহন পঞ্চানন বহুমুখী বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে ভাল পীচের রাস্তা চলে গেছে সাগরদ্বীপের দক্ষিণতম প্রান্তে মহর্ষি কপিলমুনি আশ্রম পর্যন্ত। যাঁরা গঙ্গাসাগরে বেড়াতে আসবেন, কচুবেড়িয়া থেকে 5 কিলোমিটার দূরে পাথরপ্রতিমাতে পথের ধারেই দেখতে পাবেন সুষমাদেবীচৌধুরাণী মেরিন রিসার্চ সেন্টার।

বিভিন্ন বিজ্ঞান সংস্থার খবর

চতুর্থ সর্বভারতীয় বিজ্ঞানক্লাব সম্মেলন

গত 28শে ডিসেম্বর থেকে 30শে ডিসেম্বর (1982) কৃষ্ণনগরের বি. পি. সি ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজিতে চতুর্থ সর্বভারতীয় বিজ্ঞানক্লাব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই সম্মেলনটি পরিচালনা করেন পূর্ব-ভারতীয় বিজ্ঞানক্লাব সংস্থা এবং আতিথেয়তায় ছিলেন নদীয়া জেলা সংযুক্ত বিজ্ঞানক্লাব সমিতি। এই সম্মেলনে 52টি বিজ্ঞানক্লাবের 195 জন প্রতিনিধি যোগদান করেন।

সম্মেলন উদ্বোধন করেন নদীয়া জেলার ফুলিয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীগোপাল চক্রবর্তী। স্বাগত ভাষণ দেন অতিথি সংস্থার সভাপতি অধ্যাপক বীরেনচন্দ্র দত্ত এবং উদ্বোধনী ভাষণ দেন প্রধান অতিথি বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ এল. এন. মণ্ডল। তিনি তাঁর ভাষণে বিজ্ঞান ক্লাবগুলিকে সমাজের সার্বিক উন্নতির দায়িত্ব নেবার জন্য আহ্বান জানান। এরপর পূর্বভারত বিজ্ঞানক্লাব সংস্থার অন্যতম উপদেষ্টা শ্রীমণি দাশগুপ্ত তাঁর বক্তব্য রাখেন। অতঃপর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রাক্তন বনসংরক্ষক (ভারত সরকার) শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী তাঁর ভাষণ দেন। তিনি তাঁর ভাষণে প্রাকৃতিক সম্পদগুলিকে আরও সহজভাবে কি কি উপায়ে কাজে লাগানো যেতে পারে তার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। সেই সঙ্গে পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে তিনি সকলকে অবহিত করেন। সভার প্রারম্ভে তাঁর একটি লিখিত প্রবন্ধ "আজকালের সমস্যা" উপস্থিত সকল প্রতিনিধিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। তারপর পূর্বভারত বিজ্ঞানক্লাব সভাপতি তথা সম্মেলনের সভাপতি শ্রীশংকর চক্রবর্তী ভাষণ দেন। তিনি তাঁর ভাষণের মাধ্যমে জানালেন অন্ধ কুসংস্কার আমাদের অগ্রগতির মূল প্রতিবন্ধক, আর এই কুসংস্কার থেকে দেশের শতকরা 90জন মানুষ (এমনকি অধিকাংশ বিজ্ঞানীরাও) মুক্ত নন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শেষ বক্তা ছিলেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে বিভিন্ন বিজ্ঞানক্লাব প্রতিনিধিরা তাঁদের লিখিত বাৎসরিক কাজকর্মের রিপোর্ট পেশ করেন এবং পাঠ করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য ছন্দবতী বিজ্ঞানক্লাবের (তমলুক) সস্তায় তৈরী (আনুমানিক 600 টাকা) গোবর গ্যাস প্ল্যাণ্ট। সম্মেলনে একটি বিতর্কের আয়োজন করা হয়েছিল; বিতর্কের বিষয় 'যেহেতু সরকার সমাজের সকল কাজকর্মের জন্য দায়বদ্ধ, তাই বিজ্ঞানক্লাবের সমাজ গঠনে কোন ভূমিকা নেই।' এই বিতর্কে বেশ কিছু সংখ্যক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এই বিতর্কে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে 2টি প্রথম ও 2টি দ্বিতীয় পুরস্কার দেওয়া হয়। এখানে উল্লেখ করা যায় বিপক্ষ দলই বিচারকদের মতে বেশী নম্বর পায়।

সম্মেলনের তৃতীয় দিনটি মূলতঃ ছিল আলোচনা সভার জন্য সীমাবদ্ধ। দুটি আলোচনার আয়োজন করা হয় ভারতবর্ষে বিজ্ঞানক্লাব আন্দোলন এবং বিজ্ঞানক্লাব কার্যে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সম্বন্ধে। আলোচনা প্রসঙ্গ Grass Root Level Work এবং বিজ্ঞানক্লাবের কার্যপদ্ধতি ও বিজ্ঞানক্লাবের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য—এই আলোচনাকালে অধিকাংশ বক্তা বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে বিজ্ঞানক্লাব কিভাবে অংশ নিতে পারে তার উপর আলোচনা করেন। এরপর বিজ্ঞানক্লাবগুলির নানারূপ সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়।

এই অনুষ্ঠানে পূর্বভারত বিজ্ঞানক্লাব সংস্থার সম্পাদক শ্রীদীপক দাঁ, অতিথি সংস্থার সভাপতি অধ্যাপক বীরেনচন্দ্র দত্ত, সম্পাদক শ্রীপ্রদ্যোৎ রায় এবং সর্বশেষে সম্মেলন সভাপতি শ্রীশংকর চক্রবর্তী সকল সাহায্যকারী সংস্থা ও ব্যক্তি, যোগদানকারী প্রতিনিধি ও শুভানুধ্যায়ীদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে সম্মেলনের তিনদিনই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ঐ অনুষ্ঠানে নৃত্যনাট্য, নাটক, (স্বরচিত) slide show, বিড়লাশিল্প ও কারিগরী সংস্থা কর্তৃক চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। এই সম্মেলন উপলক্ষে অতিথি সংস্থা একটি বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করেন এবং প্রদর্শনীতে প্রচুর দর্শকের সমাগম হয়।

চিঠিপত্র

অম্ল-কুয়াশা

ঠিক যে সময় শিল্পোন্নত দেশগুলির সঙ্গে বিকাশশীল দেশের জনমত পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে সজাগ ও সোচ্চার ঠিক সে সময় শ্রীযুক্ত উজ্জ্বলকান্তি রায় মহাশয়ের লেখা "অম্ল-বৃষ্টিপাত সভ্যতার সংকট" (জ্ঞান ও বিজ্ঞান, অক্টোবর '82) নামে এক সময়োপযোগী প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। পাঠক সাধারণের অবগতির জন্য অম্ল-বৃষ্টিপাত আলোচনার সঙ্গে অম্ল-কুয়াশার উল্লেখ খুবই প্রাসঙ্গিক ছিল। কিন্তু উক্ত প্রবন্ধে তা করা হয় নি। অম্ল-বৃষ্টিপাতের মত যান-বাহন ও কলকারখানা নিঃসৃত অম্লধর্মী ক্ষুদ্র দূষিত কণার সঙ্গে বাতাসের জলীয় বাষ্পের সংযোগে অম্ল-কুয়াশা সৃষ্টি হয়। এই অম্ল-কুয়াশা ও অম্ল-বৃষ্টিপাত যৌথভাবে বা পৃথক পৃথক ভাবে উদ্ভিদজগতের কীভাবে ক্ষতি করে সম্প্রতি তার এক পরীক্ষালব্ধ নতুন তথ্য দেন আমেরিকার ভারমন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী হাবার্ট ভোগেলম্যান (Hubert Vogelmann)। তিনি দেখান অম্ল-বৃষ্টি ও অম্ল-কুয়াশার pH মাত্রা যখন যথাক্রমে 4·1 ও 3·1 তে পৌঁছায় তখন ঐগুলি মাটির মধ্যেকারের খনিজ পদার্থ থেকে অ্যালুমিনিয়াম ও ক্যাডমিয়াম প্রভৃতি বিষাক্ত (উদ্ভিদের পক্ষে) ধাতুকে দ্রবীভূত করে ফেলে ; আর ঐ বিষাক্ত দ্রবীভূত ধাতব পদার্থগুলিকে উদ্ভিদ যখনই তাদের মূলদ্বারা শোষণ করে তখনই উদ্ভিদের মৃত্যু ঘটে।

পরিশেষে জানাই যে সম্প্রতি এক নিরীক্ষায় জানা গেছে যে বর্তমানে আগ্রায় বায়ুমণ্ডলে সালফার ডাই-অক্সাইড ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড-এর পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা কিছুটা কমে যাওয়ায় তাজমহল ও আগ্রায় লালকেল্লা বহুলাংশে বিপদমুক্ত।

জয়দেব জানা
কলিকাতা-87

গত 4ঠা ফেব্রুয়ারী '83 বিকাল 5টায় 'সত্যেন্দ্র ভবনে' আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নবম বার্ষিক স্মরণ-সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন পরিষদের সভাপতি ডঃ সূর্যেন্দু বিকাশ করমহাপাত্র। উক্ত সভায় ডঃ বিশ্বরঞ্জন নাগ 'ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা' শীর্ষক 'আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু স্মারক বক্তৃতা' প্রদান করেন। উপস্থিত সকলে সাগ্রহে বক্তৃতাটি শোনেন। বক্তৃতার শেষে পরিষদ সভাপতির ভাষণের পর সভার কাজ শেষ হয়।

বিজ্ঞপ্তি

গত 21শে জানুয়ারী 1983 বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সাধারণ এবং আজীবন সভ্যপদের চাঁদার হার 1983 খৃস্টাব্দ থেকে নিম্নোক্ত হারে বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

সাধারণ সভ্য পদের বার্ষিক চাঁদা 25.00 (পঁচিশ টাকা) এবং আজীবন সভ্যপদের এককালীন দেয় চাঁদা 300.00 (তিনশত) টাকা। তবে কোন সভ্য যদি একাদিক্রমে পাঁচ বছর সভ্য থাকেন সে ক্ষেত্রে তিনি এককালীন 200.00 (দুই শত) টাকা দিয়ে আজীবন সভ্য হতে পারবেন।

সভ্য হবার আবেদন পত্রের মূল্য প্রতিটি 25 পয়সা।

'সত্যেন্দ্র ভবন'
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট,
কলিকাতা-700006

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

বিজ্ঞপ্তি

1956 খৃস্টাব্দের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) রুলের 4নং ফরম অনুযায়ী বিবৃতি :

1. যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয় তার ঠিকানা : বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23 রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700006
2. প্রকাশনের কাল : মাসিক
3. মুদ্রাকরের নাম, জাতি ও ঠিকানা : শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য, ভারতীয়, পি-23 রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700006
4. প্রকাশকের নাম, জাতি ও ঠিকানা : শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য, ভারতীয়, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700006
5. সম্পাদকের নাম, জাতি ও ঠিকানা : শ্রীসুকুমার গুপ্ত (সম্পাদনা সচিব) (1982 খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর পর্যন্ত) ভারতীয়, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700006
6. স্বত্বাধিকারীর নাম, জাতি ও ঠিকানা : বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ (বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান), পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700006

আমি, শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য ঘোষণা করছি যে, উপরিউক্ত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

স্বাক্ষর : শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে
প্রকাশক—'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' মাসিক পত্রিকা

তারিখ : 27. 2. 83

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006 থেকে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ, 37/7, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-700 009 হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বিজ্ঞান পরিষদের আদর্শ অনুযায়ী জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার মত সমাজের কল্যাণমূলক বিষয়বস্তু সহজবোধ্য ভাষায় সুলিখিত হওয়া প্রয়োজন।
2. মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এবং পূর্ণ ঠিকানাসহ লেখকের পরিচিতি পৃথক কাগজে অবশ্যই লিখে দিতে হবে।
3. চলিত ভাষা এবং চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহৃত হবে। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্র্যাকেটে ইংরাজী শব্দটিও দিতে হবে। আন্তর্জাতিক সংখ্যা এবং মেট্রিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে।
4. মোটামুটি 3000 শব্দের মধ্যে রচনা সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়।
5. বিভিন্ন ফীচার, সমকালীন বিজ্ঞান গবেষণা ও প্রযুক্তিবিদ্যার সংবাদ এবং বিজ্ঞান-বিষয়ক সুন্দর আকর্ষণীয় ফটোগ্রাফীও গ্রহণীয়।
6. রচনার সঙ্গে চিত্র থাকলে আর্ট পেপারে চাইনিজ কালিতে সুঅঙ্কিত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন।
7. প্রত্যেক চিত্র প্রস্থে 8 সে মি. কিংবা এর গুনিতকের (16 সে. মি 24 সে. মি.) মাপে অঙ্কিত হওয়া প্রয়োজন।
8. অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব বজায় রেখে পরিবর্তন পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে।
9. প্রত্যেক প্রবন্ধ/ফীচার-এর শেষে সঠিক গ্রন্থপঞ্জী থাকা বাঞ্ছনীয়।
10. জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পুস্তক সমালোচনার জন্য দুই কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।
11. ফুলস্ক্যাপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় যথেষ্ট মার্জিন এবং প্রতি লাইনের পর বেশ কিছুটা ফাঁক রেখে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে প্রবন্ধ লিখতে হবে।
12. প্রতি প্রবন্ধের শুরুতে পৃথকভাবে প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া আবশ্যিক

সম্পাদনা সচিব
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

মার্চ, 1983
36তম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা

বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের অনুশীলন করে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও সমাজকে বিজ্ঞান-সচেতন করা এবং সমাজের কল্যাণকল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করা পরিষদের উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন লেখকদের স্বাধীন মতামত বা মৌলিক সিদ্ধান্তসমূহ পরিষদের বা সম্পাদকমণ্ডলীর চিন্তার প্রতিফলন হিসাবে সাধারণতঃ

বিষয় সূচী

বিষয়

প্রচ্ছদ—ছবিটি এঁকেছেন নোবেলবিজয়ী বিজ্ঞানী গ্ল্যাসো। সাপের মুখ থেকে লেজ নিয়ে যে বৃত্ত তার পরিধির সংখ্যাগুলি দূরত্ব জ্ঞাপক সে.মি.। বৃত্তের 2 চিহ্নিত অংশের দূরত্বে গ্রহ, নক্ষত্র সৌরজগৎ পৃথিবী যেখানে মহাকর্ষের প্রভাব বেশী। অল্পতর দূরত্বে অণু-পরমাণুতে তড়িচ্চুম্বকীয় বলের প্রতিপত্তি (3 চিহ্নিত অঞ্চল)। 4 চিহ্নিত অঞ্চলে দূরত্বের পাল্লা নিউক্লিয়াসে আবদ্ধ যেখানে তীব্র ও ক্ষীণ বলের রাজত্ব। 5 চিহ্নিত অঞ্চলে মহান একীকরণ শুরু হলো—যেখানে ইলেকট্রো ইক ও ইলেকট্রো নিউক্লিয়ার বল একীকৃত। 1 চিহ্নিত অঞ্চলের নগণ্য দূরত্বে মহাকর্ষও কি এই একীকরণের সামিল হবে? সাপের মুখ যেখানে তার নিজের লেজ গলাধঃকরণ করছে সেখানে কি সেই অতি মহান একীকরণের রূপকথার রাজ্য হতে পারে শিল্পী তাই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা: 30·00 টাকা

প্রতি সংখ্যা: 2·50 টাকা

যোগাযোগের ঠিকানা:

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা-700006
ফোন: 55-0660

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষট্‌ত্রিংশত্তম বর্ষ | মার্চ, 1983 | তৃতীয় সংখ্যা

খরা ও পশ্চিমবঙ্গ

সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র

1982-র দীর্ঘ অনাবৃষ্টির ফলে ভারতের অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, সমগ্র উত্তরপূর্ব ভারত বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গ ভয়াবহ খরার কবলিত। সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত যে সব জেলার খবর জানা যাচ্ছে তা হলো প্রধানতঃ পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, হুগলী ও চব্বিশ পরগণা। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় 40 হাজার গ্রামের মধ্যে 25 হাজার গ্রাম খরা কবলিত। সরকারী হিসাবে 240টি ব্লকের মধ্যে 181টি ব্লককে খরার মোকাবিলা করতে হবে। ফসল হানির পরিমাণ প্রায় 950 কোটি টাকা—3 কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। খরাত্রাণে সংশ্লিষ্ট ব্লক কমিটি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে এসেছেন। খরা ও বন্যা এখন পশ্চিমবঙ্গের অমোঘ ভাগ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার ইতরবিশেষ আছে। পশ্চিমবাংলার কৃষককুল প্রকৃতির এই সব বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন চিরদিন। কিন্তু এবারের খরার ক্ষতির পরিমাণ এত বেশী যে, প্রায় দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সরকারী মতে খরার ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলা করার মত আমাদের পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য আছে। অবশ্য তার সঠিক বিতরণ ব্যবস্থার উপরই সমস্যার সমাধান নির্ভর করবে।

খরাত্রাণ প্রসঙ্গে আমাদের এই প্রবন্ধের অবতারণা নয়। খরার বৈজ্ঞানিক কারণ ও তার ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকা সম্পর্কে জনসাধারণ ও পরিকল্পনাকারীদের সজাগ করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

সাধারণতঃ 750 মিমি-এর কম বৃষ্টিপাত হলে সেই অঞ্চলকে বলতে হবে খরা এলাকা। সারা বছর শতকরা 25 ভাগ কম বৃষ্টি হলে বছরটি খরায় যায় আর 50 ভাগ কম বৃষ্টিতে চরম খরা ধরতে হয়। এবারে পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে শতকরা 80 ভাগ বৃষ্টি কম হয়েছে তাই এই খরার ক্ষতির তুলনা নাই। 1970 খৃস্টাব্দে আবহাওয়া সম্পর্কীয় গবেষণায় জানা গিয়েছিল যে, আবহাওয়ার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটছে ফলে তার প্রভাব কৃষির উপরও অনিবার্যভাবে পড়বে। 1969-73 এ সহেল অঞ্চলের ও ঐ সময়ে ভারতে প্রচণ্ড খরার কারণ সম্পর্কে গবেষণায় জানা গিয়েছিল যে, আবহাওয়ার পর্যায় পরিবর্তনের সঙ্গে এই খরার সম্পর্ক আছে। এমন ইঙ্গিতও পাওয়া গিয়েছিল যে এসব অঞ্চলে ক্রমশঃ বৃষ্টিপাত কমবে। মূলতঃ দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাও খরাজনিত দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী। যেমন বর্তমান খরার দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করতে সুষম খাদ্য বন্টন ও কৃষি সাহায্য অপরিহার্য। তবু কৃষি উৎপাদনে আবহাওয়া পরিবর্তনের ভূমিকার প্রতিও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

পৃথিবীর সামগ্রিক শক্তি সম্পদ একটা ভারসাম্য বজায় রেখে চলে। যতটা শক্তি সে আহরণ করে সেই পরিমাণ খরচও করে। সূর্য থেকে পৃথিবীর প্রতি বর্গ সেমি আয়তনে মিনিটে 1·94 ক্যালরি সৌরশক্তি এসে পড়ে। সূর্য ও পৃথিবীর আপেক্ষিক স্থানপরিবর্তন অথবা কোন বিশেষ অঞ্চলে এই শক্তির পরিবর্তন হতে পারে। দৃশ্য ও অদৃশ্য শক্তি ছাড়া সৌরশক্তি মোট পরিমাণের এক লক্ষ ভাগের একভাগ বিচ্ছুরণ করে কণা, যার সংখ্যা সৌরছটা, সৌরকলঙ্কের সংখ্যা প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। এই সব কণা আবহমণ্ডলে আলো শোষণের ক্ষমতার পরিবর্তন আনে। ফলে কোথাও তাপ বাড়ে কোথাও শীত বেশী হয় অর্থাৎ আবহমণ্ডলের নিত্য ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে। এই কণাবিচ্ছুরণ থেকে বাতাসে ওজোন তৈরি হয়। 20 কিমি উর্ধ্বে এই ওজোনের পরিমাণ ক্রমশঃ বেড়ে সূর্যের কিছু আলো শোষণ করে নেয় ও সেই শক্তি নীচের আবহমণ্ডলে চালিত হয়ে আবহমণ্ডলের অস্থিরতা ঘটায়।

বছরে পৃথিবীর তাপমাত্রা এই শতকের প্রথমার্ধে $\frac{1}{4}°$ সেলসিয়াস হারে বেড়েছে। 1945 থেকে তাপমাত্রা আবার কমতে শুরু করেছে। 1969-73-এ সহেল ও ভারতের খরার কারণ গবেষণায় দেখা গেছে যে 19 8-73-এ পৃথিবীর তুষারপাতও হয়েছে সর্বোচ্চ। উত্তরমেরুর হিমপ্রবাহের আধিক্য সহেল অঞ্চলে ও মৌসুমীবায়ুর বিলম্ব হওয়ার জন্য ভারতে সে সময় খরা দেখা গেছে। আবহাওয়ার ক্ষেত্রেও নিত্যতাবাদের নিয়ম আছে। পৃথিবীর একদিকে বেশী বৃষ্টি হলে অন্যত্র অনাবৃষ্টি হবে। আবহাওয়ার তাপমাত্রা, চাপ প্রভৃতি ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রয়োগ করা যায়।

প্রাকৃতিক কারণ ছাড়াও আবহমণ্ডলের পরিবর্তনে মানুষও কিছুটা দায়ী। কলকারখানা প্রসারের সঙ্গে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ছে। 1850 এ বাতাসে এই পরিমাণ একলক্ষে 290 ভাগ থেকে 1975-এ 330 ভাগ মত বেড়েছে। কার্বন ডাই-অক্সাইড অবলোহিত রশ্মি শোষণ করতে পারে ফলে একভাগ কার্বন ডাই-অক্সাইডের জন্য $\frac{1}{100}$ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাতাসে বেড়ে যায়। বাতাসের হাল্কা কণাগুলির যে বাতাস ঠাণ্ডা করার ক্ষমতা আছে, কার্বন ডাই-অক্সাইড বাড়ার জন্য 2000 খৃস্টাব্দে শীতলীভবনের চেয়ে তাপমাত্রা বেশী পরিমাণে বাড়তে থাকবে। কেউ কেউ হিসেব করে বলছেন উত্তর গোলার্ধ ক্রমশঃ বেশী ঠাণ্ডা হবে। ফলে বাণিজ্যবায়ুর গতিতে অভাবনীয় পরিবর্তন আসবে। আবহমণ্ডল ও বায়ুদূষণ থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন যে এখনই হচ্ছে সে সম্পর্কে এদেশে কোন সুগঠিত গবেষণার কথা আমাদের চিন্তা করার প্রয়োজন আছে।

দিল্লীর ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রতিবেদনে জানা যায় যে, কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসে বাড়লে 2° থেকে 3°C বাড়তি তাপমাত্রায় ধান ও গম চাষের অসুবিধা দেখা দেবে—জল সেচের সাহায্যে সেই অসুবিধা দূর করা প্রয়োজন। উন্নত দেশগুলির খাদ্যশস্য রপ্তানীর ক্ষমতাই থাকবে না তখন ভারতকে স্বনির্ভর হতে হবে। ভূমি ও জলের সদ্ব্যবহার হবে এই স্বনির্ভরতার প্রাথমিক শর্ত। উচ্চতাপমাত্রায় ফলনশীল শস্যের চাষ ও সুগঠিত জলব্যবস্থা এখনই আমাদের গবেষণার বিষয় হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া শস্য সংরক্ষণের জন্য কীটনাশক ও অন্য ব্যবস্থাগুলির এখনই উন্নতি হওয়া প্রয়োজন।

ভারতের কৃষি গবেষণার স্থান উল্লেখযোগ্য। এবিষয়ে সন্দেহ নাই যে, বর্তমান খরার ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় গ্রামের চাষীরা উচ্চফলনশীল শস্যের চাষ বহুগুণে বাড়িয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে এবং তা সম্ভব হয়েছে কৃষি গবেষণায় এই সব উচ্চফলনশীল খাদ্যশস্য চাষের প্রচলন হওয়ায়। এই চাষে ও খরার ক্ষতি এড়াতে প্রথম প্রয়োজন হলো জল, তার যোগান দিতে পারলে খরার জন্য দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা দূর করা যেত। কিন্তু সেই জল ব্যবহার পশ্চিমবঙ্গে সীমিত—অথচ জল সম্পদ আমাদের রয়েছে প্রভূত। প্রথমতঃ বৃষ্টিজল সঞ্চয় করে রাখার সুসংবদ্ধ কোন পদ্ধতি আমাদের নেই। প্রাচীন যে সব বড় বড় পুষ্করিণী এই কাজে লাগত, তাদের অধিকাংশই এখন অকেজো। এই সব পুকুরের সংখ্যা মোট 10 লক্ষ 90 হাজার। বৃষ্টিপাত ও ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ মিলে পশ্চিমবঙ্গে বছরে ব্যবহারযোগ্য জলের পরিমাণ প্রায় 18500 লক্ষ কিউবিক মিটারের মত। পশ্চিমবঙ্গে ভূগর্ভস্থ জল আহরণের জন্য আছে 25000 কূয়ো, 2332টি গভীর নলকূপ, 3369টি অগভীর নলকূপ। পশ্চিমবাংলার 240টি ব্লকের 40 হাজার গ্রামবাসীর জন্য এই সংখ্যা নিশ্চয়ই যথেষ্ট নয়—কিন্তু যেগুলি আছে তাও কি পুরোমাত্রায় কাজ দেয়? দেয় না তার কারণ নিশ্চয়ই প্রশাসনিক অব্যবস্থা। এমন গভীর নলকূপও আছে যেখানে চার বছর আগে মূলধনী ব্যয় করে এখনও সেচের জল পাওয়া যায় না। পুকুরগুলির সংস্কার করে জলের ভাণ্ডার গড়ে তোলার দিকে বর্তমান সরকার দৃষ্টি দিয়েছেন। সবার আগে খাদ্য—এটুকু মনে রেখে উন্নয়নগুলির জন্য জরুরী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

আবহমণ্ডলের প্রাকৃতিক পরিবর্তন অবশ্যই অপ্রতিরোধ্য। তবু সভ্যতার অগ্রগতিতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ যে বাতাসে বাড়ছে তার প্রতিকারে প্রয়োজন গাছপালা বৃদ্ধি করা ও বনাঞ্চল সংরক্ষণ। তাছাড়া ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ বাড়াতেও গাছপালা প্রয়োজন। গাছপালা বেশী থাকলে ভূত্বকের ছিদ্র সংখ্যা বেড়ে যায় ও জল শোষণ ক্ষমতা বাড়ে।

উপসংহারে বলা যায় যে খরা প্রতিরোধের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাগুলি অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে না—'গ্রাম বাংলার উন্নয়নে সারা দেশেরই মঙ্গল' সরকারের এই মানসিকতায় বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী যথেষ্ট সহায়ক হতে পারে।

বিজ্ঞান প্রবন্ধ

ভারতে আগামী দশকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা*

পূর্ণেন্দুকুমার বসু**

দেশ স্বাধীন হবার পর ভারত সরকার জনসাধারণের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন করার জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রবর্তন করেন। এই কাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক প্রয়োজন হবে। উপলব্ধি করে উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন শাখা প্রসারিত করা হলো। 1950 খৃস্টাব্দে দেশে মাত্র 27টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, তার থেকে বছরে বিজ্ঞানে ও প্রযুক্তিবিদ্যায় 16,219 জন ছাত্র পাশ করত। 1980 খৃস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়াল 120 আর পাশ করা ছাত্র হলো 1,69,750। এই 30 বছরে বিজ্ঞানে স্নাতক স্তরে পাশ করা ছাত্র বেড়েছে 12 গুণ, পূর্তবিদ্যায় 10 গুণ, ডাক্তারীতে 9 গুণ আর কৃষিতে 4 গুণ। 100 জন বিজ্ঞানের ছাত্র পিছু মাত্র 30 জন ফলিত বিজ্ঞানে ছাত্র শিক্ষিত হচ্ছে। এই অসম অনুপাতের জন্য, যদিও আমরা বহু বিজ্ঞানীর সৃষ্টি করছি, আমরা তাদের ভালভাবে কাজে লাগাতে পারছি না। দেশে কৃষি ও শিল্পে দক্ষ বিজ্ঞানীর ও কারিগরের প্রয়োজন; আমরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে যেসব বিজ্ঞানী সৃষ্টি করছি, তাঁরা আশানুরূপ কাজ করতে পাচ্ছে না যার ফলে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। এর কারণ আমাদের শিক্ষা উৎপাদনমুখী নয়। 30 বছর পরে অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে এই যে আমাদের বহু বিজ্ঞানী এখন বেকার আর পক্ষান্তরে কৃষিতে এবং বিশেষ করে শিল্পে বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিতে হচ্ছে। এই সাহায্যের পরিমাণ ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে।

সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে যতটা উন্নত করার ইচ্ছা সরকারের ছিল তা সম্ভব হয় নি। উন্নতির হার পরিকল্পনাবিদরা যা ঠিক করেছিলেন তার অর্ধেক পাওয়া গেছে। যা হয়েছে তা চোখে দেখা যায় না, কারণ সবটাই জনসংখ্যার বর্ধিত হার ঠেকাতে শেষ হয়ে যাচ্ছে। প্রতি বৎসর 14 মিলিয়ন লোক যোগ হচ্ছে, আশা করা যাচ্ছে 2000 খৃস্টাব্দে ভারতবর্ষে জনসংখ্যা হবে 1 মিলিয়ন অর্থাৎ 100 কোটি।

অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিকল্পনাবিদরা কিছুটা ভুল পথে এগিয়েছিলেন। অর্থনৈতিক বা সামাজিক যে সমস্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছিল তার সঙ্গে শিক্ষার উন্নয়ন পরিকল্পনার কোন সমতা রক্ষা করার চেষ্টা করা হয় নি। যার ফলে দেশে এখন বহু সমস্যা দেখা দিয়েছে।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, এর শতকরা 75 জন লোক গ্রামে বাস করে, কৃষিই হচ্ছে প্রধান উপজীবিকা। উচ্চশিক্ষার প্রসার হলো কিন্তু এর গঠন, পঠন-পাঠন, পাঠ্যসূচী, অনুশীলন ও গবেষণার বিশেষ কোন পরিবর্তন করা হলো না, আগের ব্যবস্থাই বহাল থাকলো। এর ফলে বিজ্ঞান ও ফলিত বিজ্ঞানের ছাত্রদের অনুপাত বদলালো না। প্রতি 1000 জন বিজ্ঞানের ছাত্র পিছু জাপানে 950 জন, কানাডায় 250 জন, আমেরিকায় 250 জন, ফ্রান্সে 1:0 জন, ইংলণ্ডে 100 জন ফলিত বিজ্ঞানের ছাত্র; আমাদের দেশে এর অনুপাত মাত্র 30 জন। এই অনুপাত অবিলম্বে শোধরানোর প্রয়োজন। অথচ এর কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আমাদের জাতীয় আয়ের প্রায় শতকরা 50 ভাগ আসে কৃষি থেকে, তাই আমাদের পরিকল্পনায় জোর দেওয়া উচিত ছিল কৃষি এবং কৃষিজাত শিল্পের উপর এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় কৃষির প্রাধান্য পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা হয় নি। শিক্ষাকে আমরা সামাজিক কল্যাণ হিসাবে গত 30 বছর অবাধ প্রসার করার চেষ্টা করেছি শেষ ধাপ অবধি অর্থাৎ স্নাতকোত্তর শ্রেণী পর্যন্ত। পৃথিবীর কোন দেশে এটা করা হয় না, উচ্চপর্যায়ে সীমিত সংখ্যক ছাত্র ভর্তি করা হয়। বিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত সবাইকে শিক্ষিত করা প্রয়োজন কিন্তু তারপর সীমিত করার দরকার। আমাদের দেশে বিজ্ঞানে স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা সবার জন্য খোলা। সীমিত কিভাবে করা হবে তা নির্ভর করবে সেই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর। সীমিত শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিজ্ঞানের স্থান কি হবে, তা ঠিক করবে বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ্ ও অর্থনীতিবিদ্‌রা। আমাদের দেশে পরিকল্পনা রচিত হয় রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা আর তাঁদের সঙ্গে যুক্ত থাকেন 2/1 জন বিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদ্। সিদ্ধান্তের সময় রাজনীতিবিদ্‌দেরই প্রাধান্য। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। পরিকল্পনার বিভিন্ন স্তরে বিজ্ঞানীদের প্রাধান্য দিতে হবে।

আমাদের দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় মোট পারদর্শী লোকের সংখ্যা 1980 খৃস্টাব্দের হিসাবে 19 লক্ষ 50 হাজার।

* শিবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি বক্তৃতা, 1982.

** রাশিবিজ্ঞান বিভাগ, বিজ্ঞান কলেজ, 35, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিকাতা-19

তাদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা 2 লক্ষ 90 হাজার। এরা বেশীর ভাগ বিজ্ঞানে স্নাতক ও পূর্তবিদ্যায় ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত। মোট সংখ্যার এক পঞ্চমাংশেরও অধিক বিজ্ঞানীর কোন কাজ নেই। তা সত্ত্বেও একই হারে আজ পর্যন্ত 120টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহু ছাত্র বেরুচ্ছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে 1985 খৃস্টাব্দে মোট বিজ্ঞানীর সংখ্যা দাঁড়াবে 24 লক্ষ 66 হাজার আর বেকারের সংখ্যা হবে 3 লক্ষ 70 হাজার।

কেন এই অবস্থার উদ্ভব হয়েছে? এরা কি কৃষি বা শিল্পে কাজ করতে পারে না, সেটা ঠিক নয়, এরা অনেক কাজই করতে পারে কিন্তু তাদের জায়গাগুলি দখল করছে বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তররা এবং পূর্তবিজ্ঞানের স্নাতকরা। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'Supply Effect' অর্থাৎ উচ্চমানের লোক পাওয়া গেলে সর্বদাই তারা অগ্রাধিকার পাবে। এতে একসঙ্গে দুটি ক্ষতি হচ্ছে, উচ্চশিক্ষার খরচ বাড়ছে এবং বিজ্ঞানে স্নাতকরা উপযুক্ত হয়েও কাজ পাচ্ছে না। সুষ্ঠু পরিকল্পনার সাহায্যে এই অবস্থার আশু পরিবর্তন প্রয়োজন। অনেক মহল থেকে শোনা যাচ্ছে যদি কাজের সঙ্গে ডিগ্রীর যোগটা শিথিল করা যায় তা হলে এই অবস্থার সমাধান হতে পারে কিন্তু ভারত সরকার এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব। সারা পৃথিবীতে যে Paper Qualifications Syndrone চলেছে, আমরা তার অংশীদার হয়ে পড়েছি।

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় ঠিক করা হয়েছে যে বেকার বিজ্ঞানীর শতকরা 5 ভাগ কমানো হবে নতুন প্রকল্পে কাজ সৃষ্টি করে। এই হিসাব থেকে পাওয়া যাবে যে বিজ্ঞানে স্নাতকদের নতুন কাজের সংস্থান হবে 2 লক্ষ 31 হাজার আর পূর্তবিদ্যায় ডিপ্লোমাপ্রাপ্তদের কাজ বাড়বে 1 লক্ষ 9 হাজার। ষষ্ঠ পরিকল্পনার অর্ধেক শেষ হয়েছে এখনও জানা যায় নি ফল কি হয়েছে, যদি উপরিউক্ত হিসাব ধরেও নেওয়া যায় তা হলেও মোট পাশ করা বিজ্ঞানীদের বিরাট অংশ তখনও বেকার থাকবে। অতএব এতে কোন স্থায়ী সমাধান হবে না। এর জন্য নতুন করে ভাবনা-চিন্তা করার প্রয়োজন।

আমরা যে ভাবে বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন, অনুশীলন ও গবেষণা চালাচ্ছি তা দিয়ে আমরা দেশের সমস্যা মেটাতে পারবো না। দেশের বিজ্ঞানের শিক্ষণ বিষয় ও পদ্ধতি সেই দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক কাঠামোর উপর নির্ভর করে। আমাদের দেশের অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের পাঠক্রম ও শিক্ষণ পদ্ধতি রচিত হয় নি।

ভারতবর্ষ একটি সুপ্রাচীন মহান দেশ, এর পরিধি 3288 বর্গ কিলোমিটার, আর লোকসংখ্যা 683 মিলিয়ন। এরা বাস করে সাড়ে পাঁচ লক্ষ গ্রামে ও 150টি শহরে। লোকসংখ্যার প্রায় 75 ভাগ বাস করে গ্রামাঞ্চলে। তারা বেশীর ভাগ গরীব, মাথাপিছু বার্ষিক আয় 200 টাকার মতন, এদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ শিক্ষিত। আমরা 30 বছরের বেশী উচ্চ শিক্ষার বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসার করে এই অবস্থার উন্নতি করতে পারি নি। এর মূল কারণ আমরা গ্রামীণ সমস্যার উপর নজর দিই নি। গ্রাম থেকে শিক্ষিতরা শহরে চলে এসেছে, গ্রামের সম্পদ শহর ও শহরতলীকে সমৃদ্ধিশালী করেছে। গ্রামগুলিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার কোন প্রভাব পৌঁছয় নি। আগামী দশকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে গ্রামে নিয়ে যেতে হবে, গ্রামবাসীদের শিক্ষিত করতে হবে, তাদের সমস্যা বিজ্ঞানের সাহায্যে সমাধান করতে হবে। সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে হবে। শুধু পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে দেশের সার্বিক উন্নতি সম্ভব নয়।

আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষার ও গবেষণার প্রবণতা গ্রামের সমস্যার দিকে দিতে হবে। জল ও সূর্যের আলোর ব্যবহার, চাষে সার ও কীট-পতঙ্গনাশক পদার্থের প্রয়োগ পদ্ধতি, ফসল সংরক্ষণ পদ্ধতি প্রভৃতির উপর শিক্ষণ পদ্ধতিতেও গবেষণায় জোর দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও গবেষণাগারগুলিকে গ্রামের কাছাকাছি আসতে হবে।

আমাদের দেশে বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ কতটা সফলতা লাভ করেছে তার মাপকাঠি হচ্ছে জাতীয় সামগ্রীর বাড়ার হার আর সামগ্রীক দারিদ্র সীমার উন্নতি। 1970-71-কে মূল বৎসর হিসাবে ধরলে 1979-80-তে মাত্র 14 টাকা বেড়েছে মাথাপিছু জাতীয় সামগ্রীতে আর দারিদ্র সীমার উন্নতি হয়েছে মাত্র 29 শতাংশ। বর্তমান সমাজে বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠীর লক্ষ্য শুধু বিদেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের বাহবার দিকে। এর জন্য মূল সমস্যাগুলিকে এড়িয়ে রাশি রাশি 'পেপার' তৈরি হচ্ছে, যার সঙ্গে বাস্তবতার মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। এই ভুল মূল্যবোধের ঢেউয়ে ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক সমাজ হাবুডুবু খাচ্ছে। আন্তর্জাতিক মানের মৌলিক গবেষণার প্রয়োজন আছে ও থাকবে কিন্তু তার নামে বিদেশী কাজের অনুকরণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ও জাতীয় গবেষণাগারে যা চলছে তা বন্ধ করা দরকার।

আমাদের বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার গতিপথের পরিবর্তন করার সময় এসেছে। এর আরম্ভ হবে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে। এ বিষয়ে কি করা সম্ভব তার কিছুটা আভাস দিচ্ছি।

(ক) বিদ্যালয়ে বর্তমানে যে 'Work Experience'-এর ব্যবস্থা প্রচলিত করা হয়েছে তার গুরুত্ব দিতে হবে। মহাত্মা গান্ধীর বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে এই অংশটি নেওয়া হয়েছে। যে অঞ্চলে বিদ্যালয়টি অবস্থিত তার পারিপার্শ্বিক বৃত্তিমূলক কাজের সঙ্গে ছেলেদের পরিচিত করা দরকার এবং তাদের হাতে-কলমে কাজ শেখানো প্রয়োজন। প্রয়োজনবোধে সপ্তাহে একদিন বৃত্তিমূলক কাজ ছাত্ররা করবে।

(খ) বর্তমানে যে 10+2+3 শিক্ষার কাঠামো স্বীকৃত হয়েছে তাকে পুরোপুরি কার্যকরী করতে হবে। 10+2 সত্যিই সাধারণ শিক্ষার শেষ ধাপ বলে সকলকে মনে করতে হবে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং শিক্ষার পরিকল্পনা এমন

ভাবে করতে হবে যে ছাত্রেরা পড়া শেষ করে কোন বৃত্তিমূলক কাজ পায়।

(গ) প্রচলিত শিক্ষার সঙ্গে ধারাবহির্ভূত (informal) শিক্ষার প্রয়োজন হবে। গ্রামে এর দরকার বেশী।

(ঘ) প্রচলিত শিক্ষা সংস্থাগুলির ও বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারদের দায়িত্ব হবে অপ্রচলিত শিক্ষা সংস্থাগুলি চালানো।

(ঙ) বৃত্তিমূলক শিক্ষার (নিম্নস্তর থেকে উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত) উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা দরকার।

(চ) প্রত্যেক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি উন্নয়ন বিভাগ থাকবে। প্রত্যেক ছাত্রকে অন্ততঃ 6 মাস (3 বছরের মধ্যে) এই বিভাগে উন্নয়নমূলক কাজ করতে হবে। এই কাজ ডিগ্রী পাবার জন্য আবশ্যিক বলে ধরা হবে।

বর্তমানে ভারত সরকার ব্যাপকভাবে গ্রামীণ পরিকল্পনা রচনা করেছেন। একে পরিপূর্ণ রূপ দিতে হলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিজ্ঞানের প্রয়োগ অপরিহার্য। এই কাজ বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে শুধু শহরাঞ্চলের বৈজ্ঞানিক সংস্থার দ্বারা হবে না। ভারতবর্ষের প্রতি 400 গ্রামে একটি করে প্রযুক্তিবিজ্ঞান কেন্দ্র গঠন করতে হবে। এই সব কেন্দ্রে বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী থাকবে এবং একটি বিজ্ঞানশালাও থাকবে। এই সংস্থাকে সাহায্য করবে রাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। এদের কাজ হবে—

1. আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা কাজে পরিণত করা;

2. অনগ্রসর অঞ্চলে ছোট ছোট বৈজ্ঞানিক সংগঠন তৈরি করা, তাদের মাধ্যমে গবেষণালব্ধ বৈজ্ঞানিক তথ্য গ্রামবাসীর মধ্যে প্রচার করা;

3. যে সমস্ত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে না, তাদের জাতীয় গবেষণাগারে পাঠিয়ে সমাধান করার সাহায্য করা,

4. কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় গবেষণাগারের সঙ্গে আর গ্রামের মানুষের যোগসূত্র রচনা করা;

5. গ্রামাঞ্চলে একটি বৈজ্ঞানিক বাতাবরণ সৃষ্টি করা।

এই কাজ করতে হলে যোগ্যতা ও মানসিকতা দুয়ের প্রয়োজন। এটা গড়ে উঠবে স্কুলে, কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় তা সম্ভব নয় বলে পরিবর্তনের দরকার। পড়ার বিষয়বস্তু নতুন ভাবে ছাত্রদের সামনে ধরতে হবে। গ্রামীণ সমস্যা নিয়ে বৈজ্ঞানিক মূল তত্ত্ব বোঝাতে হবে। শিক্ষা সংস্থার কাঠামো সম্বন্ধে পূর্বে কিছু আলোচনা করেছি।

আগামী দশকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় যে সমস্যাগুলি বড় করে দেখা দেবে তার আলোচনা করছি।

1. জমি—আমাদের দেশে বলা হয় আমরা 'সবুজ বিপ্লব' করেছি (Green Revolution) কিন্তু আসলে আমরা বিচ্ছিন্ন ভাবে 2/3টি রাজ্যে কৃষি উৎপাদন কিছুটা বাড়াতে সক্ষম হয়েছি। দেশে মোট 140 মিলিয়ন হেক্টর চাষের জমি আছে। ভারতবর্ষে গম ও ধানের গড় উৎপাদন হেক্টর প্রতি 1122 কিলোগ্রাম ও 1074 কি.গ্রা., মিশরে 2400 কি. গ্রা. ও 5100 কি. গ্রা. জাপানে 2070 কি.গ্রা. এবং 6870 কি.গ্রা., আমেরিকায় 2090 কি গ্রা. এবং 5120 কি.গ্রা.। আমরা অনেক পেছিয়ে আছি। কৃষির উন্নতি সমস্ত রাজ্যে করতে হবে। গত দশকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিজ্ঞানের সাহায্যে বিচ্ছিন্নভাবে কিছুটা ফল 2/3টি রাজ্যে পাওয়া গেছে, কিন্তু আগামী দশকে উন্নতির হার 2·77 থেকে বাড়িয়ে অন্ততঃ 4·50 করতে হবে। আঞ্চলিক প্রযুক্তি বিজ্ঞান সংস্থার মাধ্যমে (Soil-Water-Crop Management) উন্নতর মাটি-জল-শস্য ব্যবস্থাপনায় খাদ্য উৎপাদনের হার বাড়ানো সম্ভব হবে। এই কাজে প্রতি রাজ্যের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সাহায্য করতে পারবে। একটি যৌথ প্রচেষ্টায় এটা সম্ভব হতে পারে।

2. জল—আমাদের দেশে বিভিন্ন নদীতে জলের পরিমাণ 188 মিলিয়ন হেক্টর মিটার, এর মধ্যে 67 মিলিয়ন হেক্টর মিটার জল ব্যবহারযোগ্য, আমরা ব্যবহার করছি এর এক তৃতীয়াংশ। বাকী জল সমুদ্রে চলে যাচ্ছে। বর্তমানে দুই তৃতীয়াংশ জমিতে সেচের ব্যবস্থা নেই। উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রথায় আগামী দশকে সেচের জমি আমরা বাড়াতে পারি। মাটির নীচে 26·86 মিলিয়ন হেক্টর মিটার জল সঞ্চিত রয়েছে। আমরা ব্যবহার করি মাত্র 8·15 মিলিয়ন হেক্টর। এ পর্যন্ত বিভিন্ন পরিকল্পনায় বিচ্ছিন্নভাবে নদীর জলের ব্যবহার বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু মাটির নীচের জল কিভাবে ব্যবহার করা যায় তার উপর বিশেষ কাজ হয় নি। আগামী দশকে বিজ্ঞানের সাহায্যে মোট জল মাটির উপরে ও নীচে কিভাবে সর্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থায় ব্যবহার করা সম্ভব তা উদ্ভাবন করতে হবে।

3. শক্তি (energy)—আগামী দশকের বৃহত্তম সমস্যা হচ্ছে শক্তি সৃষ্টি করা। আমাদের দেশে 4,50000 গ্রাম আছে এবং গড়ে লোক সংখ্যা এক হাজারের কম প্রতি গ্রামে। মোট জন সংখ্যার 60 ভাগ লোক এখানে বাস করে। এই গ্রামগুলির মাত্র 17 শতাংশ গ্রামে বিদ্যুৎ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে যেখানে বিদ্যুৎ নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না, সেই সব অঞ্চলে বিদ্যুৎ শক্তি পৌঁছে দেবার দায়িত্ব বিজ্ঞানীদের নিতে হবে। আমাদের শক্তির উৎস হিসাবে শুধু কয়লা ও পেট্রোলিয়াম হলে চলবে না আমাদের অন্য উৎসের কথা ভাবতে হবে। সুযোগমত দেখতে হবে সৌরশক্তি (solar energy), বায়ুশক্তি (wind energy) বা গোবর গ্যাস শক্তি (gobar gas plant)। এই সব অঞ্চলে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে পারলে চাষের ও কুটিরশিল্পের প্রভূত উন্নতি হবে। গ্রামবাসীর অর্থনৈতিক অবস্থার অনেক উন্নতি হবে।

4. ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প—বর্তমানে জাতীয় শিল্প উৎপাদনের শতকরা 28 ভাগ আসে ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প থেকে। এই শিল্পে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ বিশেষ প্রয়োজন। কৃষিজাত দ্রব্য বা তার বাতিল অংশ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে শিল্পজাত দ্রব্যে রূপান্তরিত হতে পারে। বর্তমানে তা করা হচ্ছে

কিন্তু একাজ অনেক বাড়ানো সম্ভব। আমি কয়েকটি ক্ষেত্রের উল্লেখ করেছি। এ ছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদ, আবহবিদ্যা ও পরিবেশ বিজ্ঞান আগামী দশকে প্রাধান্য পাবে।

বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন ও গবেষণার ধারা নতুন ভাবে ভাবতে হবে। পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা বা উদ্ভিদবিদ্যা আলাদা হিসাবে থাকবে না তাদের সংমিশ্রণে নতুন পাঠ্যসূচী তৈরি হবে, ভবিষ্যতে গবেষণা প্রত্যেকে আলাদা ভাবে করবে না 3/4 জন বিজ্ঞানী সম্মিলিতভাবে চালাবে ইত্যাদির প্রশ্ন আমাদের আগামী দশকে সমাধান করতে হবে।

আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর যদি বদল করা সম্ভব হয় তাহলে দেশে যে 20 লক্ষ বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্ রয়েছেন তাঁদের সবাইকে কাজে লাগাতে পারা যাবে এবং দেশকে সমৃদ্ধিশালী করা সম্ভব হবে।

এই সঙ্গে আমাদের আরও একটি কথা মনে রাখতে হবে যে বর্তমানে শিক্ষা ও গবেষণা যেভাবে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে তার কিছুটা বিকেন্দ্রীকরণ করা দরকার। বেসরকারী বিজ্ঞানীদের বর্তমানে সরকারী প্রকল্পে কোন সাহায্য করা সম্ভব নয়—এতে সব সময় সুফল পাওয়া যায় না। সরকারী লালফিতার অনেক কাজ জড়িয়ে যাচ্ছে যার ফলে উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। বেসরকারী সংস্থাদের বৈজ্ঞানিক কাজের দায়িত্ব দেওয়া উচিত। সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় যে সমস্ত উন্নয়ন কাজ হবে তার সঠিক মূল্যায়ন করার প্রয়োজন। এখন এর কোন ব্যবস্থা নেই।

প্রযুক্তিবিদ্যার কার্যধারা কি হবে ভারত সরকার 1983 খৃস্টাব্দে তা প্রকাশ করেছেন। যে বিষয়গুলি এতে প্রাধান্য পাবে তা হচ্ছে—(1) কাজের সংস্থান, (2) শক্তি, (3) কৃষি ও শিল্প উৎপাদন ও (4) পরিবেশ। আমি এই বিষয়গুলি আগে আলোচনা করেছি। এই প্রবন্ধে আগামী দশকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা কোন্ দিকে যাবে তার আভাস দিয়েছি। বিস্তারিত আলোচনা (1), (2), (3) তে পাওয়া যাবে।

নির্দেশনা

(1) Report of the Committee on Scientific and Technical Manpower—Department of Science and Technology, Government of India, 1981.

(2) Science and Technology in India During the Coming Decade(s)—Indian Science congress—1979.

(3) Technology Policy Statement—Department of Science and Technology, Government of India—1983.

চৌম্বক ঝড়ের কথা

চন্দন দাশগুপ্ত ও উত্তম দত্ত*

সূর্যের প্রভাবে পৃথিবীর বুকে যে সব ঘটনা ঘটে, চৌম্বক ঝড় তাদের মধ্যে অন্যতম। শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশেও এর উৎপত্তি এবং বিস্তার লাভ হতে পারে এবং সাধারণ বাহ্যিক অনুভূতিতে এর অস্তিত্ব বোঝা সম্ভব নয়। এই রহস্যময় ঘটনার কারণ, প্রকৃতি এবং প্রভাব প্রবন্ধটির আলোচ্য বিষয়।

'ঝড়' কথাটি উচ্চারণের সাথে সাথেই আমাদের মনে ভেসে ওঠে বৃষ্টি, বায়ুপ্রবাহ, বজ্রপাত—এসবের মিলিত প্রভাবে সৃষ্ট এক প্রাকৃতিক প্রলয়কাণ্ডের চিত্র। কিন্তু 'চৌম্বক ঝড়' (magnetic storm) হলো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক রহস্যময় ঘটনা—শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশেও সমগ্র পৃথিবী জুড়ে যার আবির্ভাব, বিস্তার ও পরিসমাপ্তি হতে পারে এবং উপযুক্ত যান্ত্রিক ব্যবস্থা ছাড়া যার উপস্থিতি নিরূপণ দুষ্কর। এই বিষয়টি সম্পর্কে জানতে হলে আনুষঙ্গিক যে কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করা প্রয়োজন, আগে সেগুলির আলোচনা করা যাক।

1600 খৃস্টাব্দে রাণী এলিজাবেথের (প্রথম) গৃহ-চিকিৎসক ডঃ উইলিয়াম গিলবার্ট 'De Magnete' নামে চুম্বক সম্পর্কীয় একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বর্তমান চৌম্বকবিদ্যার অধিকাংশই পরবর্তী বিজ্ঞানী হ্যালি, গস, ম্যাক্সওয়েল প্রমুখের গবেষণালব্ধ ফল হলেও পৃথিবী নিজেই যে একটি বৃহৎ চুম্বক—এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার কৃতিত্ব কিন্তু ডঃ গিলবার্টেরই। স্বভাবতঃই পৃথিবী কেন চুম্বকের মত আচরণ করে, এ বিষয়ে কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক। বিজ্ঞানীদের মতে মাত্র 24 ঘণ্টায় পৃথিবী নিজ অক্ষের (axis) চারদিকে একবার ঘুরে আসছে—ফলে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থ তরল লোহার মধ্যে ক্রমাগত আলোড়ন হচ্ছে—এরই ফলে উৎপন্ন হচ্ছে বিদ্যুৎ-প্রবাহ, আর মূলতঃ এই বিদ্যুৎ-প্রবাহের ফলস্বরূপ পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। ঘটনাটা অনেকটা সেই তারের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহের ফলে সৃষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্রের মতই।

সাধারণ দণ্ড চুম্বকের মত পৃথিবীরও দুটি চৌম্বক মেরু রয়েছে—উত্তর মেরু কানাডার উত্তরে 'বুথিয়া' উপদ্বীপে এবং দক্ষিণ মেরু আন্টার্কটিকা মহাদেশের দক্ষিণে 'ভিক্টোরিয়া' অঞ্চলে অবস্থিত। এই মেরুদ্বয়ের সংযোজক কাল্পনিক সরলরেখাকে 'চৌম্বক মধ্যরেখা' ((meridian line) এবং এই রেখার মধ্য দিয়ে এর ওপর লম্বভাবে অবস্থিত তলকে চৌম্বক মধ্যতল (magnetic meridian) বলে। কোন স্থানের চৌম্বক মধ্যতল ও ভৌগোলিক মধ্যতলের মধ্যস্থিত কোণকে সেই স্থানের 'বিচ্যুতি (declination) বলে। কোন স্থানে অবস্থিত একটি চুম্বক শলাকা যদি উল্লম্বতলে ঘূর্ণনক্ষম হয়, তবে সাম্যাবস্থায় সেটা অনুভূমিক রেখার সঙ্গে একটি কোণ সৃষ্টি করে অবস্থান করে। এর অভিমুখই ঐ স্থানে পৃথিবীর মোট চৌম্বক-প্রাবল্যের দিক্-নির্দেশ করে। এই প্রাবল্যকে অনুভূমিক এবং উল্লম্ব উপাংশে ভাগ করা যায়। আবার মোট প্রাবল্যের অভিমুখ এবং অনুভূমিক উপাংশের অভিমুখের মধ্যবর্তী কোণকে বলা হয় 'বিনতি' (dip)। বিচ্যুতি, বিনতি এবং ভূ-চুম্বকের অনুভূমিক উপাংশই হলো পৃথিবীর চুম্বকত্বের তিনটি মূল রাশি।

মুক্তভাবে ঝুলন্ত চুম্বকশলাকা যে সর্বদাই চৌম্বক উত্তর ও দক্ষিণ মেরু অভিমুখে থাকে, তা সকলেরই জানা আছে। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবেই চুম্বকশলাকার এই আচরণ। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো, পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র খুবই দুর্বল এবং এটি সর্বত্র সম-শক্তিসম্পন্নও নয়—পরীক্ষার সাহায্যে দেখা যায়, বিষুবীয় অঞ্চলে পৃথিবীর চুম্বকত্বের মান প্রায় 0·3 গাউস এবং মেরু অঞ্চলে প্রায় এর দ্বিগুণ ('গাউস' হলো কোন পদার্থের চৌম্বক ক্ষেত্র পরিমাপের একক)। আবার পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র কেবলমাত্র ভূপৃষ্ঠেই সীমাবদ্ধ নেই—বায়ুমণ্ডলের উপরেও বহু দূর পর্যন্ত তা বিস্তৃত। আশ্চর্যের বিষয় হলো, পৃথিবীর চৌম্বকত্বের পূর্বোল্লিখিত মূলরাশিগুলির মানও কিন্তু ধ্রুবক (constant) নয়—স্থানভেদে এদের মান যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়; তাছাড়া এদের দৈনিক, মাসিক, বার্ষিক, দীর্ঘকালীন ও অস্থায়ী পরিবর্তনও ঘটে থাকে। বহুকাল পূর্বে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রকৃতি কেমন ছিল, এই নিয়ে বহু বিজ্ঞানী গবেষণা করেছেন। পৃথিবীর বুকে অবস্থিত বিভিন্ন যুগের শিলাগুলির চৌম্বক ধর্ম পরীক্ষা করে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, আজ পর্যন্ত পৃথিবীর চৌম্বক মেরুদুটির অবস্থান বহুবার বদলেছে। তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, সময়ের সাথে সাথে ধীরে ধীরে চৌম্বক মেরুদুটির অবস্থান পরিবর্তিত হচ্ছে। লর্ড কেলভিনের মতে পৃথিবীর চুম্বক-ব্যবস্থাটি (magnetic system) পূব থেকে পশ্চিমে ঘুরছে এবং একবার পূর্ণ ঘূর্ণনে প্রয়োজন হচ্ছে 960 বছরের।

পৃথিবীর চুম্বকীয় মূলরাশিগুলির মাঝে মাঝে আকস্মিক ও আমূল পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়—এই ঘটনাই 'চৌম্বক ঝড়' হিসাবে পরিচিত। এই ঘটনাটির কারণ খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, আমাদের এই সৌরজগতের মধ্যমণি সূর্যের প্রভাবেই এটা ঘটে।

সূর্যের কোন আলোকচিত্র পর্যবেক্ষণ করলে এর মধ্যে কয়েকটি অন্ধকার স্থান দেখা যাবে—যাদের নাম হলো 'সানস্পট' (sunspot) বা সৌরকলঙ্ক। পারিপার্শ্বিকের তুলনায় অল্প উষ্ণতাই হলো ঐ স্থানগুলি কালো দেখাবার কারণ। সৌরকলঙ্ক-

*20/1, শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, কলিকাতা-700 054

গুলি বস্তুতঃ এক একটি প্রবল ক্ষেত্রসম্পন্ন চুম্বকের মত (এদের গড় ক্ষেত্র প্রায় 3000 গাউস) এই প্রবল চৌম্বকত্বের ফলে সৌরকলঙ্কের পদার্থকণাগুলির গতিশক্তি হ্রাস পায়—ফলে উষ্ণতাও যায় কমে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, সূর্যের অন্যান্য স্থানে চৌম্বকত্ব খুবই কম, মাত্র এক গাউসের মত। আবার, এই সৌরকলঙ্কগুলির উপরে মাঝে মাঝে ওঠে ঝড় (সোলার ফ্লেয়ার), যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো সূর্য কর্তৃক মহাকাশে প্রচুর পরিমাণে ইলেকট্রন, প্রোটন এবং অন্যান্য সৌর পদার্থকণিকা উদ্গীরণ। নোবেল-পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী আলফ্‌ভেনের মতে, এইসব সৌর পদার্থকণিকার সঙ্গে সূর্যের চৌম্বকত্ব ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত এবং সৌরঝড়ের পরবর্তী সময়ে ঐসব ছড়িয়ে পড়া পদার্থকণার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের নিজস্ব চৌম্বক ক্ষেত্রও মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে। এই সৌর পদার্থকণিকাগুলি যখন ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে আঘাত করে তখন অনিবার্যভাবেই তাদের সাথে পৃথিবীর নিজস্ব চৌম্বক ক্ষেত্রের সংঘাত ঘটে। আর ঠিক তখনই পৃথিবীর বুকে শুরু হয় চৌম্বক ঝড়। আরও একটু সহজভাবে বলা যায়, তড়িতাহিত সৌর পদার্থকণিকাগুলি যখন ঝাঁক বেঁধে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে একে সাময়িকভাবে তড়িৎ-পরিবাহী করে তোলে, তখন আবহমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে বিভব-বৈষম্য দেখা দেয়। এর ফলস্বরূপ সেখানে সাময়িক তড়িৎপ্রবাহের উৎপত্তি ঘটে। ঐ তড়িতের সঙ্গে যে চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়, সেই পরিবর্তনশীল চৌম্বক ক্ষেত্রই পৃথিবীর বুকে চৌম্বক ঝড়ের বিস্তার ঘটায়।

পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রকে বহু দেশে অবস্থিত বেশ কিছু সংখ্যক চৌম্বক পর্যবেক্ষণাগার থেকে প্রতিনিয়তই লক্ষ্য করা হচ্ছে। ভারতে এধরণের যে কয়েকটি পর্যবেক্ষণাগার রয়েছে, সেগুলির মধ্যে বোম্বাই-এর কাছে অবস্থিত আলিবাগেরটি সর্ববৃহৎ। এইসব পর্যবেক্ষণাগারে নানা সূক্ষ্ম ও সুবেদী (sensitive) যন্ত্রের সাহায্যে সহজেই চৌম্বক ঝড়ের অস্তিত্ব নিরূপণ করা যায়।

চৌম্বক ঝড়ের প্রভাবে নানারকম ঘটনা ঘটে—এদের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য হলো 'অরোরা বরিয়ালিস' (Aurora borealis) এবং 'অরোরা অস্ট্রেলিস' (Aurora australis) —তুষারাবৃত মেরু অঞ্চলের রাত্রির আকাশে অপূর্ব বর্ণচ্ছটা, সংক্ষেপে মেরুজ্যোতি। বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন, চৌম্বক ঝড়ের সময় এদের স্থায়িত্ব ও ঔজ্জ্বল্য বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। আবার অরোরার রেখা বর্ণালী (line spectrum) প্রমাণ করে যে, এটি প্রতিফলিত সূর্যালোক নয়। এই বর্ণালীতে নাইট্রোজেন, আর্গন, নিয়ন, জেনন প্রভৃতি গ্যাসের রেখা বর্ণালী পাওয়া গিয়েছে—যা থেকে বোঝা যায়, আবহমণ্ডলের মধ্যে তড়িৎমোক্ষণের ফলে সৃষ্ট আলোকের সাহায্যেই এটি তৈরী।

চৌম্বক ঝড়ের দ্বিতীয় প্রভাব হলো এর ফলে চৌম্বক শলাকার দিক্ নির্দেশক ধর্মও সাময়িকভাবে অন্তর্হিত হয়। স্থিরভাবে উত্তর-দক্ষিণাভিমুখে থাকবার পরিবর্তে এই সময় এদের অসম কম্পন হতে থাকে। এই ঘটনা চলাকালে বেতার বার্তা প্রেরণে ও গ্রহণেও চূড়ান্ত অসুবিধা হয়।

অতি সম্প্রতি মানবদেহের উপরেও পরিবর্তনশীল চৌম্বক-ক্ষেত্রের প্রভাবের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। ভারতীয় ও বৃটিশ বিজ্ঞানীদের মতে, চৌম্বক ঝড়ের সময় চৌম্বক ক্ষেত্রের যে দ্রুত অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটে, তার সঙ্গে মানুষের হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হবার মধ্যে একটি যোগসূত্র রয়ে গিয়েছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে মানুষের হৃৎপিণ্ডে এবং মস্তিষ্কে এক বিরূপ তাড়িতিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, যার ফলস্বরূপ কিছুটা ভগ্নস্বাস্থ্য লোকের মৃত্যু পর্যন্তও হতে পারে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে—চৌম্বক ঝড় যেমন পৃথিবীর বুকে সৃষ্টি করছে সমুজ্জ্বল মেরুপ্রভার, শ্বেত-শুভ্র তুষারের পটভূমিকায় যার অপরূপ সৌন্দর্য যুগ যুগ ধরে অসংখ্য ভ্রমণবিলাসীকে বিস্ময়াবিষ্ট করেছে, তেমনি নানা অবাঞ্ছিত ঘটনারও মূলে রয়েছে সে-ই।

জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, শক্তি সঞ্চয় দ্বারাই জীবন পরিস্ফুটিত হয়। তাহা কেবল নিজের একাগ্র চেষ্টা দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে। যে কোনোরূপ সঞ্চয় করে না, যে পরমুখাপেক্ষী, যে ভিক্ষুক, সে জীবিত হইয়াও মরিয়া আছে।

-জগদীশচন্দ্র

বড় যারা

সুনীতিকুমার মণ্ডল ও শুক্লা মণ্ডল*

উদ্ভিদের রাজ্যে বৈচিত্র্য অনেক। আকারে, প্রকারে, গঠনে, রূপে, রসে, গন্ধে—বৈচিত্র্যের পরিধিও বিস্তৃত। গাছ-পালা-ফুল-ফলের জগতে যারা আয়তনে তথা আকারে শীর্ষস্থানীয় তাদের সম্বন্ধে হয়তো সবাই আমরা জানি না। আজ এদের সঙ্গে একটু পরিচয় করি।

বর্তমান দুনিয়ায় দীর্ঘতম বৃক্ষ বলে যারা দাবী করতে পারে তারা হলো ট্যাক্সোডেসি (Taxodaceae) পরিবারভুক্ত সিকুয়া সেম্পারভাইরেন্স (Sequoia sempervirens)।

চিত্র-1
সিকুয়াগাছের গুঁড়ি

উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ পশ্চিম ওরেগন থেকে ক্যালিফোরনিয়া পর্যন্ত সমুদ্র উপকূল বরাবর এদের বসতি। সেখানে এই দীর্ঘকায় তরুরাজি যে নয়নাভিরাম অরণ্যানীর সৃষ্টি করেছে তার নাম রেড উড ফরেস্ট (Red wood forest), কারণ সিকুয়া সেম্পারভাইরেন্স ইংরাজীতে red wood বলে পরিচিত এবং সত্যই এদের কাঠের রং লাল। এই বিশালকায় গাছের উচ্চতা 100-105 মিটার। অনেক সময় এর থেকেও দীর্ঘ গাছ দেখা যায়। মাটি থেকে কিছুটা উপরে কাণ্ডের ব্যাস প্রায় 5 থেকে 6 মিটার হয় (চিত্র-1) এবং এই গাছগুলির বয়স দু-হাজার বছরেরও বেশী। গাছের আকৃতির তুলনায় এই গাছের পাতাগুলি কিন্তু খুবই ছোট এবং পরিবর্তিত (modified)। মূলশাখার উপর আঁশের মতো ছোট ছোট শল্ক পত্র (scale leaf) সর্পিলাকারে সাজানো থাকে। এ ছাড়া আর এক রকম পাতা আছে সেগুলি সরু এবং লম্বা (needle like) আমাদের দেশের পাইন গাছের পাতার মতো। এই পাতাগুলি গাছের পার্শ্ব শাখায় দুই সারিতে সাজানো থাকে। গাছের উচ্চতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এর ছালটিও (bark) আশ্চর্য রকমের পুরু (30 সেমি.)। তাছাড়া ছালটি পোকামাকড়, আগুন ও ছত্রাকের আক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখে। বংশ বৃদ্ধি বীজ দ্বারাই হয় তবে বীজের অঙ্কুরোদ-গমের হার খুবই কম।

ক্যালিফোরনিয়ার সায়েরা নেভাদা রেঞ্জ (Sierra Nevada Range)-এর সিকুয়াডেণ্ড্রন জায়গানসিয়াম (Sequoiadendron gigantium) বৃক্ষটি সিকুয়া সেম্পারভাইরেন্স-এর খুবই নিকটাত্মীয় এবং এটিই পৃথিবীর বৃহত্তম গাছ বলে পরিচিত কারণ এর একটি গাছ থেকে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী পরিমাণ কাঠ (greatest total bulk wood) পাওয়া যায়। এই গাছ লম্বায় 85-90 মিটার হয় এবং মাটি থেকে কিছুটা উপরে গুঁড়ির ব্যাস 8-9 মিটার মতো হতে দেখা যায়। অর্থাৎ সিকুয়া থেকে লম্বায় 15-16 মিটার কম হলেও চওড়ায় 3-4 মিটার বেশী এবং সেই জন্যই মোট কাঠের পরিমাণ এতে অনেক বেশী হয়। ন্যাশানাল পার্কের সবচেয়ে বড় বৃক্ষটিকে জেনারেল শেরমন ট্রি (General Sherman tree) বলা হয় এবং এটির বয়স 3 থেকে 4 হাজার বছর। পৃথিবীর সবচেয়ে বৃদ্ধ বৃক্ষের বয়স কিন্তু চার হাজার বছরেরও বেশী এবং সেটি হলো উত্তর আমেরিকার ইনয় ন্যাশনাল ফরেস্ট (Inyo National forest)-এর বৃস্টেলকোন পাইন (Bristlecone pine)

এবার স্থূলতম বৃক্ষের কথায় আসা যাক। এই শ্রেণীতে শীর্ষস্থানে রয়েছে আফ্রিকার এডানসোনিয়া ডিজিটাটা (Adansonia digitata)। আমাদের দেশের শিমূল গাছ যে পরিবার ভুক্ত এও সেই বোম্বেকেসি (Bombacaceac) পরিবারেরই একজন। গাছটির গড় উচ্চতা মাত্র 18 মিটার কিন্তু কাণ্ডের ব্যাস গড়ে 9 মিটার। এই গাছের গুঁড়ি এত চওড়া বলে তাকে সুরঙ্গের মতো কেটে অস্থায়ী বাসস্থান হিসাবে স্থানীয় লোকেরা অনেক সময় ব্যবহার করে। গুঁড়ির মধ্যে বৃহৎ গর্ত করে জলাধার হিসাবে

*উষা ভিলা, কলেজ পাড়া, পোঃ কালিয়াগঞ্জ, পশ্চিমদিনাজপুর, 733129

সেটি ব্যবহৃত হতেও অনেক সময় দেখা যায়। এই গাছের ফলগুলি শক্ত কাঠের মতো (woody) এবং লম্বাটে কিন্তু ভিতরের শাঁস মিষ্টি এবং সুস্বাদু। এই গাছের ছাল থেকে খুব শক্ত এক ধরনের সূতা তৈরি হয়। স্থানীয় লোকেরা দড়ি এবং কাপড় তৈরির জন্য এই সূতা ব্যবহার করে।

বাংলায় অসম্ভব অর্থে একটি প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে— 'ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যায়।'' এখন যে ফুলটির কথা বলব তার ঘায়ে শুধু মূর্চ্ছা কেন, প্রাণও অনায়াসেই যেতে পারে। হ্যাঁ, এটিই ফুলের রাজ্যে বৃহত্তম। র‍্যাফ্লেসিয়েসি (Rafflesiaceae) পরিবারভুক্ত এই উদ্ভিদটির নাম র‍্যাফ্লেসিয়া আরনোলডি (Rafflesia arnoldii)। একে প্রত্যক্ষ করতে গেলে যেতে হবে মালয়েশিয়ার পাহাড়ী জঙ্গলে। একটি অতিক্ষুদ্র পূর্ণপরজীবী উদ্ভিদ এই বৃহৎ ফুলটি ফোটায়। টেরাস্টিগমা (Terastigma) নামে একটি অঙ্গুর জাতীয় লতার শিকড়ের মধ্যে এই উদ্ভিদ বাসা বাঁধে। এর মুল, কাণ্ড ও পাতা নেই— উদ্ভিদ দেহ সরু সরু সূতার মত অঙ্গে পরিবর্তিত (modified)
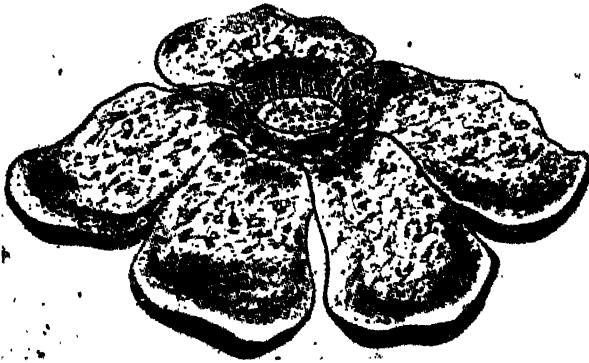
চিত্র-2

পৃথিবীর বৃহত্তম ফুল র‍্যাফলেসিয়া আরনোলডি।

হয়ে আশ্রয়দাতা উদ্ভিদের কলাতন্ত্রের মধ্যে থাকে। পূর্ণপরজীবী বলে এর দেহে সবুজকণাও নেই। ফুলের কুঁড়ির সূচনাও হয় মাটির তলায় এবং সেখানেই এটি আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। তারপর একদিন মাটি ভেদ করে বিশালাকায় ফুলটি মাটির উপর ফুটে ওঠে (চিত্র-2)। ফুলে থাকে পাঁচটি পাপড়ি। পাপড়িগুলি বেশ রসালো ও মোটা। পাপড়িগুলি লালচে বা হালকা বেগুনী-ব্রাউন রং-এর (অনেকটা মাংসের মত রং) হয় এবং তাতে ছোপ ছোপ দাগ থাকে। এক একটি ফুলের ওজন হয় 11 কিলোগ্রামের মতো এবং এর ব্যাস প্রায় 90 সেমি. (এক গজ)। এটি একটি একলিঙ্গ ফুল অর্থাৎ এর স্ত্রী ও পুরুষ ফুল আলাদা হয়। ফুলের মাঝখানে একটি আগুন লাল রং কাপের মত অংশ থাকে—সেখানেই পুংস্তবক কিংবা স্ত্রীস্তবক থাকে। শুধু আয়তন ছাড়া র‍্যাফলেসিয়া রূপে বা সৌরভে কোন দিক দিয়েই আমাদের প্রলুব্ধ করতে পারে না। ফুলটি মাটির উপর ফুটে ওঠার পর থেকেই চার-দিকে পচা মাংসের মতো দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে—আর মাংসাশী কিছু মাছি সেই গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে সেখানে ভীড় জমায়। সাধারণ ভাবে মনে হয় এদের সমাগমেই র‍্যাফলেসিয়ার পরাগ সংযোগ হয়। ফুলটি ফোটার পর পাঁচ সাত দিন তাজা থাকে তারপর আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়।

অনেক সময় কোন কোন ফকির এবং ভিক্ষুকদের হাতে একটি বেশ বড় লম্বাটে নারকেল মালার ভিক্ষাপাত্র দেখা যায়। আসলে এটি একটি ফলের অংশ মাত্র এবং পাত্র হিসাবে এর বহুল ব্যবহার আছে। এ কথা জেনে অনেকেই অবাক হবেন যে এই ফলটিই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আকারের ফল এবং এর বীজটি বৃহত্তম বীজ বলে আমরা জানি। এটি একটি তাল, নারকেল পরিবারভুক্ত (Palmae) গাছ, নাম লোডোসিয়া মালডিভিকা (Lodoicea maldivica)। আদি বাস-ভূমি ভারত মহাসাগরের সেচেলিস দ্বীপে। তালগাছের মতো লোডোসিয়ার স্ত্রী ও পুরুষ গাছ আলাদা হয়। গাছগুলির উচ্চতা সাধারণতঃ 18 থেকে 30 মিটার হয় তবে অনেক সময় এর চেয়েও বেশী লম্বা গাছ দেখা যায়। পাতাগুলি তালপাতার মত (fanshaped) কিন্তু বিরাট আকারের। মজার ব্যাপার
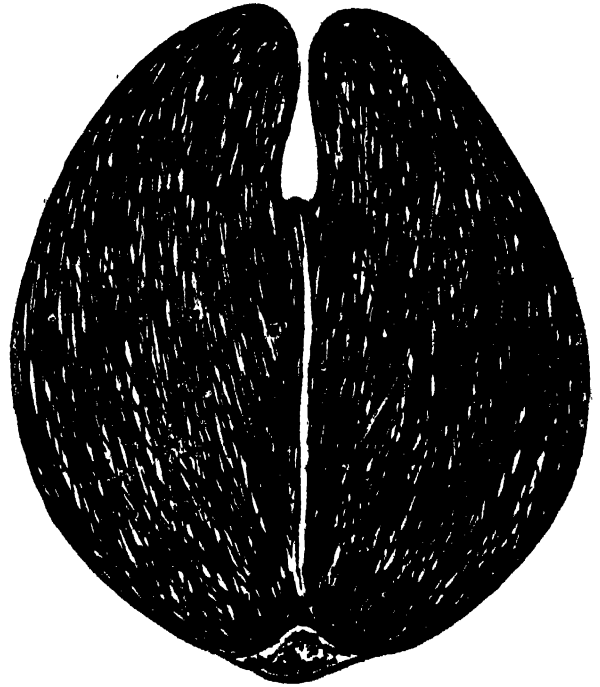
চিত্র-3

লোডোসিয়ার বীজ-ছোবড়া ছাড়াবার পর (চেহারা)।

হলো এর পাতাই আবার পাতার জগতে আয়তনের দিক দিয়ে সর্বোচ্চ স্থানে বসে আছে। বোঁটাসহ এক একটি পাতার দৈর্ঘ্য নয় মিটারের মতো হয়। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা ভাল শিবপুর বোটানিকেল গার্ডেনের বড় পাম হাউসের ঠিক মাঝখানে বেশ কয়েক বছর আগে একটি এই গাছ লাগানো হয়েছে। বছর আট/নয় আগে আমরা যখন প্রথম তাকে দেখি তখন গাছটি

নিতান্ত শিশু তবু তার পাতাগুলি যাতে সাবলীল ভাবে বাড়তে পারে তারজন্য পাম হাউসের মাথার ছাউনীর কিছু অংশ খুলে দেওয়া হয়েছিল। এবার ফল ও বীজের কথায় আসি। ফলগুলি দেখতে বিরাটাকার ডাবের মতো এবং রংও সবুজ। ফলটির পরিধি গড়ে প্রায় 1·2 মিটার এবং ওজন 15-20 কেজি। তবে এ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় যে ফলটির কথা আমরা জানি তার ওজন ছিল 27·2 কেজি। আরও অবাক কাণ্ড হচ্ছে এক একটি ফল পাকতে সময় লাগে 6-10 বছর। ফলের গঠন নারকেলের মতোই—শক্ত ছোবড়ার পর শক্ত খোলা তার ভিতর মিষ্টি শাঁস ও জল। মালাসহ বীজটি (চিত্র-3) দেখতে অনেকটা পাশাপাশি জুড়ে যাওয়া লম্বাটে দুটি নারকেলের মতো এবং এই জন্যই একে জোড়া নারকেল (double coconut) বলে। ভিক্ষাপাত্র হিসাবে এই মালারই অর্ধেকটা ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

মালাটি ছাড়ানোর পর যে বীজটি পাওয়া যায় তার ওজন হয় প্রায় নয় কেজি। সাধারণতঃ একটি গাছের বয়স তিরিশ বছর হলে তাতে ফুল আসতে আরম্ভ করে। বীজের অঙ্কুরোদগম হতেও দেড় থেকে তিন বছর সময় লাগে।

নারকেলের মালার মতোই এর মালা দিয়ে অনেক রকম সুন্দর পাত্র, কাপ, প্লেট, ফুলদানী এবং আরও নানাবিধ সৌখিন জিনিষপত্র তৈরি হয়। তাছাড়া এই গাছের পাতা ঘরের ছাউনীর জন্য ব্যবহৃত হয়। পাতার শিরা সুন্দর সুন্দর ঝুড়ি বোনার কাজে ও ঝাঁটা তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়।

মাইক্রোওয়েভ যোগাযোগ ব্যবস্থা

বাসুদেব ঘোষ*

মাইক্রোওয়েভ (microwave) কথাটির আভিধানিক অর্থ অতিসূক্ষ্ম তরঙ্গ। বিজ্ঞানের ভাষায় যে সমস্ত তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের কম্পাঙ্ক মোটামুটি 3 থেকে 300 গিগা হার্জ (1 গিগা হার্জ = 10^9 হার্জ)—তাদের মাইক্রোওয়েভ বলা হয়। কখন কখন আরো বেশী (600 গিগা হার্জ পর্যন্ত) কম্পাঙ্ককেও মাইক্রোওয়েভ বলা হয়। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (=আলোর গতিবেগ/কম্পাঙ্ক) অনুসারে মাইক্রোওয়েভের তরঙ্গদৈর্ঘ্য মোটামুটি 10 সেন্টিমিটার থেকে 1 মিলিমিটার পর্যন্ত হতে পারে। তাই অনেক সময় মাইক্রোওয়েভকে সেন্টিমিটার তরঙ্গ বা মিলিমিটার তরঙ্গ বলা হয়।

মাইক্রোওয়েভের মধ্যে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ও অসাধারণ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় যা তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের অন্যান্য কম্পাঙ্ক মণ্ডলীতে দেখা যায় না। তাই আজ বাস্তব জীবনযাত্রার বহুবিধ ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ যোগাযোগ ব্যবস্থায়, মাইক্রোওয়েভ বিপুল ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থায় মাইক্রোওয়েভের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের কয়েকটি বিশেষ কারণ আছে, যথা—

বর্ধিত সংকেত বহন ক্ষমতা

বেতার মাধ্যমে একস্থান থেকে অন্যস্থানে সংবাদ, গান, বাজনা প্রভৃতি কম্পাঙ্কের শ্রাব্য তথ্যাদি সরাসরি পাঠানো সম্ভব হয় না। কারণ অ্যানটেনার মাধ্যমে তড়িচ্চুম্বকীয় শক্তি উন্মুক্ত স্থানে বিশেষ ভাবে বিকীর্ণ করতে হলে ঐ অ্যানটেনার দৈর্ঘ্য ঐ তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সমতুল্য হওয়া প্রয়োজন। 10 কিলোহার্জ অর্থাৎ 3×10^4 মিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের কোন সংকেত পাঠানোর জন্য মোটামুটি 30 কিলোমিটার লম্বা অ্যানটেনার প্রয়োজন। বাস্তবে এটা করা সম্ভব নয়। তাই উচ্চ কম্পাঙ্ক অর্থাৎ ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বেতার তরঙ্গের সাহায্য নেওয়া হয়। এই তরঙ্গটি নিম্ন কম্পাঙ্কের তথ্যগুলি বহন করে নিয়ে যায়। তাই একে বাহক তরঙ্গ বলা হয়। আবার বিভিন্ন বেতার কেন্দ্র থেকে আগত সংকেতগুলি থেকে সঠিক বা ঈপ্সিত সংকেতটি অবিকৃত অবস্থায় বেছে নেওয়ার জন্য, ঐ বাহক তরঙ্গটির কম্পাঙ্ক শ্রাব্য সংকেতগুলির সর্বোচ্চ কম্পাঙ্কের তুলনায় অনেক বেশী হওয়া প্রয়োজন।

বোধগম্য বা অর্থপূর্ণ তথ্যের জন্য একগুচ্ছ কম্পাঙ্ক পাঠানো প্রয়োজন। যেমন সাধারণ কথাবার্তার জন্য 5 কিলোহার্জ, দূরদর্শন সংকেতের ক্ষেত্রে 6 মেগাহার্জ (1 মেগাহার্জ = 10^6 হার্জ) কম্পাঙ্ক বিস্তার প্রয়োজন। কলিকাতা দূরদর্শন কেন্দ্র 66মেগাহার্জ থেকে 72 মেগাহার্জ এই কম্পাঙ্ক মণ্ডলে কাজ করে। তেমনি পাশাপাশি কোন দূরদর্শন কেন্দ্র 72 মেগাহার্জ থেকে 78 মেগাহার্জ এই কম্পাঙ্ক মণ্ডলে কাজ করতে পারে। এগুলিকে এক একটি প্রণালী বলা হয়। বিভিন্ন বেতার বা দূরদর্শন কেন্দ্র বিভিন্ন প্রণালীতে কাজ করে। কারণ তা না হলে গ্রাহক যন্ত্রে বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে আগত সংকেতগুলির মধ্যে ব্যতিচারের সৃষ্টি হবে। সুতরাং একথা পরিষ্কার যে কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে যথেচ্ছ সংখ্যক বেতার বা দূরদর্শন কেন্দ্র স্থাপন সম্ভব নয়। কোন যোগাযোগ পদ্ধতির বহন ক্ষমতা বলতে আমরা বুঝি যে ঐ পদ্ধতিতে কত বেশী সংখ্যক প্রণালী কাজ করতে পারে। মাইক্রোওয়েভের কম্পাঙ্ক বেতার তরঙ্গের তুলনায় অনেক বেশী

*রেডিওফিজিক্স ল্যাবরেটরি, পদার্থবিদ্যা বিভাগ: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

হওয়ায় মাইক্রোওয়েভ যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রণালী ধারণ ক্ষমতা অনেক বেশী।

ইতালীয় বিজ্ঞানী মার্কনীর বেতার-যন্ত্র আবিষ্কারের পর থেকে বেতার কম্পাঙ্ক মণ্ডলের বিভিন্ন অংশ নানাবিধ কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা চলে আসছে। তাই এই অংশ নূতন নূতন কাজে লাগাতে অসুবিধা হচ্ছে। 1933 খৃস্টাব্দে একজন ফরাসী বিজ্ঞানী প্রথম মাইক্রোওয়েভ যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করেন। তারপর থেকেই চলছে মাইক্রোওয়েভের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার।

বর্ধিত দিক নির্দেশ ক্ষমতা

মাইক্রোওয়েভ যোগাযোগ ব্যবস্থায় ছোট আকারের অ্যানটেনা অধিক দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে পারে। তাছাড়া অ্যানটেনার বিবর্ধন কম্পাঙ্কের বর্গের সমানুপাতিক। সাধারণ বেতার তরঙ্গ অ্যানটেনার মাধ্যমে বিকীর্ণ করলে সাধারণতঃ চতুর্দিকে বিস্তার লাভ করে। কিন্তু অনেক সময় এমন প্রয়োজন হয় যেন বিকীর্ণ তরঙ্গ শুধু একদিকে বিস্তার লাভ করে। যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে একস্থান থেকে অন্যস্থানে এমনভাবে সংবাদ পাঠাতে হয় যে শত্রুপক্ষ এর টের না পায়। মাইক্রোওয়েভ অ্যানটেনার সাহায্যে অতি অল্প বিস্তারের তরঙ্গরশ্মি বিকীর্ণ করা সম্ভব। এতে অবাঞ্ছিত দিকে কোন বিকিরণ হবে না এবং অভীষ্ট দিকে অধিক পরিমাণ শক্তি পাওয়া যাবে। সুতরাং মাইক্রোওয়েভের সহায়তায় সংবাদের গোপনীয়তা রক্ষা সম্ভব। যেহেতু অবাঞ্ছিত দিকে অতি অল্প মাত্রায় শক্তি নির্গত হয় সেজন্য বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে প্রেরিত তরঙ্গগুলির মধ্যে ব্যতিচারের সম্ভাবনাও কমে যায়।

গোলযোগ অনাক্রমণ্যতা

মনুষ্যসৃষ্ট বা বায়ুমণ্ডলে বৈদ্যুতিক গোলযোগের জন্য উদ্ভূত তরঙ্গগুলির কম্পাঙ্ক মাইক্রোওয়েভের তুলনায় অনেক কম। তাই এই গোলযোগগুলি মাইক্রোওয়েভ যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিশেষ কোন বাধার সৃষ্টি করে না।

অধিক প্রতিফলন ক্ষমতা

র‍্যাডার (RADAR) যন্ত্রে মাইক্রোওয়েভ অপরিহার্য। র‍্যাডার একটি ইলেকট্রনিক পদ্ধতি যার সাহায্যে দূরের কোন বস্তুর (যেমন যুদ্ধজাহাজ, পাহাড়-পর্বত) উপস্থিতি নির্ণয় এবং দূরত্ব মাপা যায়। এই পদ্ধতিতে প্রেরিত তড়িচ্চুম্বকীয় স্পন্দন লক্ষ্যবস্তু থেকে প্রতিফলিত হয়ে পুনরায় প্রেরক-কেন্দ্রে ফিরে আসে। তরঙ্গদৈর্ঘ্য বস্তুর আকারের তুলনায় অনেক ছোট না হলে প্রতিফলিত শক্তির পরিমাণ খুব কম হবে। সেইজন্য মাইক্রোওয়েভ কারিগরীবিদ্যার উন্নতি না হলে র‍্যাডার পদ্ধতি সম্ভব হতো না।

গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যে যোগাযোগ

পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 100 কিলোমিটার উচ্চ একটি আয়নিত বায়ুস্তর আছে। একে আয়নমণ্ডল বলে। সূর্য থেকে আগত অতি বেগুনী রশ্মি এবং মহাজাগতিক রশ্মিগুলি বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগের গ্যাসীয় অণুগুলিকে আয়নিত করে এই আয়নমণ্ডলের সৃষ্টি করে। নিম্ন বেতার কম্পাঙ্কের তরঙ্গগুলি এই আয়নমণ্ডল থেকে প্রতিসৃত হয়ে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসে। এগুলিকে আকাশতরঙ্গ বলা হয়। সুতরাং এই বেতারতরঙ্গগুলির সাহায্যে আয়নমণ্ডলের উপরে অবস্থিত কোন বস্তুর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব নয়। মাইক্রোওয়েভ কিন্তু অনায়াসে আয়নমণ্ডল ভেদ করে চলে যায় মহাশূন্যের দিকে। তাই মাইক্রোওয়েভের সহায়তায় মহাকাশে পাড়ি দেওয়া কোন যন্ত্রযানের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা সম্ভব হয়। কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী মাইক্রোওয়েভ যোগাযোগ বন্ধনী তৈরি সম্ভব হয়েছে।

এককথায় আমরা বলতে পারি যে মাইক্রোওয়েভ, যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে। মনে রাখা দরকার যে এই পরিবর্তন হঠাৎ রাতারাতি চলে আসে নি। মাইক্রোওয়েভ শক্তি উৎপাদন প্রচলিত বায়ুশূন্য নল (দ্বিশিরা নল, ত্রিশিরা নল ইত্যাদি) দ্বারা সম্ভব নয়। সাধারণ রোধ, ধারক ও আবেশক কুণ্ডলী মাইক্রোওয়েভ কম্পাঙ্কে ব্যবহার করা যায় না। তাছাড়া মাইক্রোওয়েভ কম্পাঙ্কের বৈদ্যুতিক প্রবাহ সাধারণ পরিবাহী তারের মাধ্যমে একস্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া যায় না। মাইক্রোওয়েভের সুবিধার কথা মনে রেখে এই সমস্ত বাধার বিরুদ্ধে মানুষ চালিয়ে গেছে অদম্য প্রচেষ্টা আর অক্লান্ত পরিশ্রম। নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার উদ্ভাবন ও কারিগরীবিদ্যার প্রভূত উন্নতি সাধনের ফলেই আজকের মাইক্রোওয়েভ যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে।

হৃদ্‌রোগে কৃত্রিম হৃদয়

প্রদীপকুমার দাস*

মানবদেহ যেন একটি ছোটখাটো পৃথিবী. যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তা আছে এই ভাণ্ডে। পৃথিবীতে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য নদ-নদী। পৃথিবীকে সজীব ও সতেজ রাখাই এদের কাজ। মানবদেহে এদিকে-ওদিকে সর্বদিকে অসংখ্য শিরা-মহাশিরা-উপশিরা ধমনীর ব্যাপ্তি। দেহ মনকে সচল রাখাই এদের কাজ। এদের মধ্যে অবিরাম গতিতে প্রবাহিত হচ্ছে রক্তের স্রোতধারা। স্রোতধারার উৎস হলো হৃৎপিণ্ডের ক্রমাগত সংকোচন-প্রসারণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে হৃৎযন্ত্র আজ নানাভাবে ব্যতিব্যস্ত। কর্মব্যস্ততার সাথে মানসিক উদ্বেগ ও বিক্ষিপ্ততার চাপে ঘরে ঘরে আজ ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ, করোনারী থম্বোসিস, মায়োকার্ডিয়াল ইনফারকসান, ভ্যালভুলার ডিজিজ প্রভৃতি নানাবিধ রোগের আক্রমণ। এ সবের আশু সমাধানে সবাই আজ চিন্তিত। সুচিন্তার ফসল স্বরূপ হার্ট ট্রান্সপ্লান্টেসন বা হৃৎযন্ত্র স্থানান্তর সম্ভব হয়েছে। যিনি এ ব্যাপারে প্রথম অগ্রণী হন তিনি হলেন দক্ষিণ আফ্রিকার ডাক্তার ক্রিশ্চিয়ান বার্নাড। 1967 খৃস্টাব্দে 3রা ডিসেম্বর কেপটাউনের গ্রুট হাসপাতালে পঞ্চান্ন বছর বয়স্ক লুইস ওয়াসকানস্কির হৃৎযন্ত্র স্থানান্তর তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা সম্পন্ন করেন। দাতা ছিলেন 25 বছর বয়স্কা ডেনিস ডারভ্যাল। বলা বাহুল্য এত বড় কাজটি সমাধানের পরেও ওয়াসকানস্কি মাত্র আঠারো দিন বেঁচে ছিলেন। আর একটি উল্লেখযোগ্য হৃৎযন্ত্র স্থানান্তরিত করেন ডাক্তার ওনাল ঘান ও তাঁর সহকর্মীরা। আমেরিকার ইউজকনসিক হাসপাতালে 1979 খৃস্টাব্দের 8ই মার্চ সাতচল্লিশ বছর বয়স্কা মিসেস জীন রাস্কের দেহে দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যুর দরুণ কুড়ি বছরের একটি ছেলের হৃৎপিণ্ড স্থানান্তর করেন। এক্ষেত্রে তাঁরা ভাল ফল পান। হার্ট ট্রান্সপ্লান্টেসানের প্রধান অন্তরায় হলো ইমিউনোলজিকাল রিঅ্যাকশান বা কলাসমূহের প্রতিরোধজনিত বিক্রিয়া। এইভাবে সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হলে কতখানি সাফল্য লাভ করতে পারা যাবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। প্রথম প্রশ্ন হলো আমরা কার কাছ থেকে হৃৎযন্ত্র পেতে পারি? যদি কোন মানুষ মরার আগে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জানিয়ে যায় তার হৃৎপিণ্ড দানের কথা, তবেই মৃত্যুর পরে আমরা তা পেতে পারি। সেরকম লোক আজ পর্যন্ত অন্যান্য অঙ্গ-পতঙ্গ স্থানান্তরের ক্ষেত্রে [যেমন বৃক্ক (kidney), কর্নিয়া ইত্যাদি] কতজনকে পেয়েছি? অন্যথায় কোন জন্তুর দেহ থেকে সংগ্রহ করে কাজ হতে পারে কি না? একমাত্র মানুষের হৃৎযন্ত্রের মত কাজ করতে পারে সেরকম জন্তু হলো বাছুর, শূয়োর অথবা ভেড়ার হৃৎপিণ্ড। সেক্ষেত্রে এইসব জন্তুদের হৃৎপিণ্ড মানুষের দেহে স্থানান্তরের একমাত্র অন্তরায় ইমিউনোলজিক্যাল বেরিয়ার (immunological barrier)। অসুস্থ হৃৎযন্ত্রের বদলে সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে কাজ করতে পারে এমন কোন কৃত্রিম হৃৎযন্ত্রের কথা মানুষ অনেকদিন ধরে ভেবে আসছে। সে ভাবনা আজ কিছুটা বাস্তবায়িত হয়েছে। মানুষ তৈরি করতে পেরেছে কৃত্রিম হার্ট লাংস মেশিন। আজকাল তাই শল্য চিকিৎসকেরা হৃৎপিণ্ডের প্রায় সব ধরণের অপারেশনের সময় এই হার্ট-লাংস মেশিন ব্যবহার করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মানুষ আরও কিছুটা এগিয়ে গেছে। কৃত্রিম চামড়া, কৃত্রিম অঙ্গ-উপাঙ্গ, কৃত্রিম রক্তের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিম হৃদযন্ত্র তৈরি করতেও বেশ কিছুটা সক্ষম হয়েছে। এই ব্যাপারে প্রথম অগ্রণী হন সোভিয়েত দেশের একজন বিজ্ঞানী, ভি. পি. ডেমিকার। 1937 খৃস্টাব্দে তিনি একটা প্যাম্পিং যন্ত্র তৈরি করেন। যন্ত্রটিকে একটি বাছুরের দেহে নলের সাহায্যে বক্ষগহ্বরে বসিয়ে দেন। বাইরে থেকে শক্তি যুগিয়ে পাম্পটিকে চালু রাখার ব্যবস্থা করেন। 1958 খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি পরপর পাঁচটি একই ধরণের পরীক্ষা করেন। কৃত্রিম হৃৎযন্ত্র নিয়ে পরে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন আমেরিকার বিজ্ঞানীরা। ঐ দেশের একটি প্রতিষ্ঠান American Society for Artificial Internal Organs. এ ব্যাপারে প্রথম অগ্রণী হন। প্রতিষ্ঠানের সভাপতি পিটার সেলিসরে 1957 খৃস্টাব্দে স্থির করেন কৃত্রিম হৃদযন্ত্রের ব্যাপারে তাঁরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবেন। এরপরেই ঐ বছর 12ই ডিসেম্বরে ক্লিভল্যাণ্ড ক্লিনিকে তাঁরা প্রথম পরীক্ষা আরম্ভ করেন। প্রথমে তাঁরা একটি কুকুরের দেহে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ শুরু করেন। কুকুরের দেহ থেকে তার হৃদপিণ্ডটি বের করে নেন। পরে একটি বায়ুচালিত কৃত্রিম হৃৎযন্ত্র লাগিয়ে প্রায় 90 মিনিট পর্যন্ত কুকুরটিকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হন।

কৃত্রিম হৃৎযন্ত্রের গঠন : মানুষের হৃৎপিণ্ডে চারটি গহ্বর আছে। বাম ও ডান অলিন্দ, বাম ও ডান নিলয়। অলিন্দ-নিলয়ের সংযোগস্থলে দুটি কপাটিকা (ভাল্‌ভ) রয়েছে। এটি অলিন্দ থেকে নিলয়ের অভিমুখে রক্তের প্রবেশে সাহায্য করে, বিপরীতমুখী গতিতে বাধা দেয়। হৃৎপিণ্ডের নিলয়কে কৃত্রিমভাবে তৈরি করার জন্যে যে থলি ব্যবহার করা যেতে পারে তা রবারের নির্মিত। এর কতকগুলি সুবিধা হলো (1) জৈবনিক রসে অভেদ্য, (2) থলির মধ্যেকার রক্তকে তঞ্চন

*2/সি, নবীনকুণ্ডু লেন, কলিকাতা-700009

হতে না দেওয়া, (3) দেহের কোষ বা কলাসমূহে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করা, (4) স্থিতিস্থাপকতার জন্য দীর্ঘদিন কাজ করতে সক্ষম। সবচেয়ে ভাল কৃত্রিম রবার সিলিকন রবার। এই সিলিকন রবার দিয়ে নিলয় ও হৃৎপিণ্ডের কপাটিকা
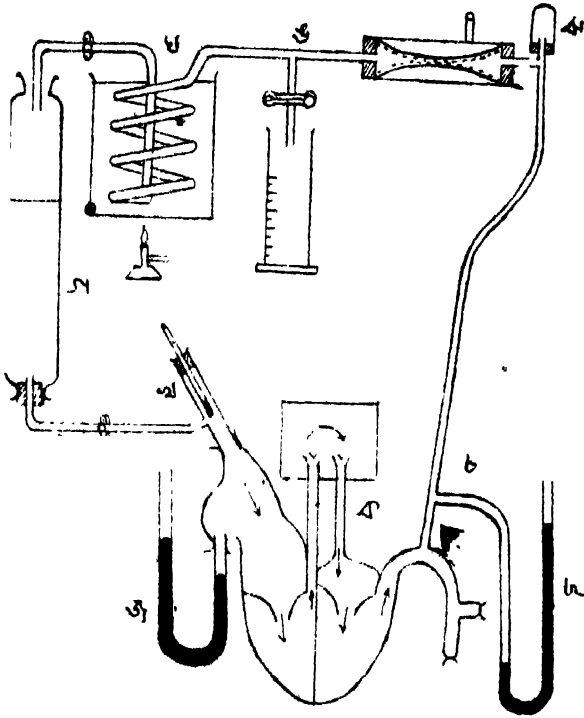
নকল হার্টলাংস যন্ত্র (Heart-Lungs Apparatus)

ক—ফুসফুস, খ—শিরার সঙ্গে যুক্ত নালিকা, গ—দূষিত রক্তের আধার, ঘ—তাপ উৎপাদক যন্ত্র, ঙ—জ্ঞাপক যন্ত্র, চ—ধমনীর সঙ্গে যুক্ত নালিকা, ছ—ধমনীর মধ্যেকার চাপ, জ—শিরার মধ্যেকার চাপ, ঝ—বায়ব আধার।

তৈরি করা হয়। আজকাল বিভিন্ন ধরণের কপাটিকার অসুখে (valvular diseases of heart) শল্যচিকিৎসকেরা এই ধরণের কৃত্রিম কপাটিকা ব্যবহার করেন। অলিন্দ-নিলয় বা কপাটিকার জন্যে সিলিকন রবার উপযুক্ত বটে। তবে একটা সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। কৃত্রিম কপাটিকা বা নিলয়ের ভিতরের তলটি খুবই মসৃণ হওয়া প্রয়োজন। অমসৃণ হলে রক্তের ফিব্রিন কণা জমে প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করতে পারে।

শক্তির উৎস: সুস্থ হৃৎপিণ্ডে সংকোচনের ফলে নিলয় থেকে রক্ত সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রসারণে শিরা-মহাশিরা থেকে প্রথমে অলিন্দে ও পরে নিলয়ে রক্ত জমা হয়। কৃত্রিম-হৃৎযন্ত্রে এই ব্যবস্থা করার জন্যে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রথম শুরু করেন এস হ্যারি নর্টন। এই কাজের জন্যে তিনি তড়িচ্চুম্বক ব্যবহার করেন। কৃত্রিম নিলয়টিকে তিনি একটা শক্ত পুরু আবরণের মধ্যে রেখে দেন। নিলয়ের অভ্যন্তরে রাখেন তৈলাক্ত পদার্থ। এর পরে পাঁচটি সলেনোয়েডের সাহায্যে চাপ প্রয়োগ করে নিলয়টিকে সংকুচিত করার ব্যবস্থা করেন। সংকোচনের ফলে সবেগে তৈলাক্ত পদার্থ বেরিয়ে যেত। সলিনোয়েডের প্রয়োগে ভাল ফল না পেয়ে বিজ্ঞানীরা এর জায়গায় ছোট ইলেকট্রিক মোটর ব্যবহার করেন। ইলেকট্রিক মোটর ঠিক ঘড়ির দোলকের মত পর্যায়ক্রমে বাম নিলয় ও ডান নিলয়কে সংকোচন করতো।

1960 খৃষ্টাব্দে আমেরিকার কয়েকজন বিজ্ঞানী কৃত্রিম হৃৎযন্ত্রকে চালু করার জন্য আর একটি অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। কৃত্রিম হৃৎযন্ত্রটিকে একটি শক্ত খোলের মধ্যে রেখে দেন। সংকোচনের সময়ে খোলের মধ্যে উচ্চচাপের বাতাস ঢুকিয়ে দেন। ঐ চাপে হৃৎযন্ত্রটি সংকুচিত হয় এবং অভ্যন্তরস্থ রক্তকে ধমনীর মধ্যে নিক্ষেপ করতে সক্ষম হয়। সংকুচিত বাতাস পরে একটি নির্গম পথ দিয়ে বেরিয়ে আসে এবং হৃৎপিণ্ডের প্রসারণে সহায়তা করে। তাঁদের ঐ কৃত্রিম হৃৎযন্ত্রকে কতকগুলি কুকুরের দেহে প্রয়োগ করে কুকুরগুলিকে প্রায় 27 ঘণ্টা বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হন। পরে কুকুরগুলি মারা যায়। কুকুরগুলির মৃত্যুর কারণ তাঁদের মতে রক্তের তঞ্চনের জন্য। তাঁরা আরও কিছু পরিবর্তন করে কৃত্রিম হৃৎযন্ত্রের সাহায্যে একটি বাছুরকে সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন প্রায় তেত্রিশ ঘণ্টা ত্রিরিশ মিনিট পর্যন্ত। তাঁরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন আরও নিখুঁতভাবে কৃত্রিম হৃৎযন্ত্র তৈরি করার জন্যে। আমরা আশা করি—তাঁদের সেই চেষ্টা অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই সার্থক হবে।

কার্ল মার্কস—মৃত্যুশতবার্ষিকীর শ্রদ্ধার্ঘ্য

কালিদাস সমাজদার*

কার্ল মার্কসের জন্মের পর 165 বছর পার হয়ে গেছে এবং তাঁর মৃত্যুর পর এই বছর 14ই মার্চ 100 বছর হলো। সারা বিশ্ব জুড়ে এই মহান দার্শনিক ও বিজ্ঞানীর মৃত্যুশতবার্ষিকী পালন করা হচ্ছে।

14ই মার্চ, 1883 খৃস্টাব্দে মার্কস তাঁর শোবার ঘর থেকে পড়ার ঘরে যান, ইজি চেয়ারে শুয়ে পড়েন এবং চিরকালের মতো অন্তিম নিদ্রায় মগ্ন হন। আমাদের যুগের শ্রেষ্ঠ মন চিন্তা থেকে বিরত হলেন এবং সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হৃদয় তার

জন্ম : 5 মে, 1818 মৃত্যু : 14 মার্চ, 1883

স্পন্দন বন্ধ করে দিল। অমানুষিক মানসিক শ্রম ও নিত্যঅভাব মানবসভ্যতার উজ্জ্বলতম ব্যক্তিদের অন্যতম এক প্রিয় মানুষের মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে দিল।

প্রাশিয়ার রাইন অঞ্চলে অবস্থিত ট্রিয়ের শহরের ব্যারিস্টার হের হাইনরিখ মার্কস এবং তাঁর স্ত্রী হেনরিয়েটা প্রেসবর্ক ছিলেন কার্ল মার্কসের জনক-জননী। চমৎকার শিক্ষা, প্রখর নীতিবোধ, সদাশয়তা ও আইনে প্রচণ্ড দক্ষতা নিয়ে পিতা হাইনরিখের ব্যক্তিত্ব ও মানস গড়ে উঠেছিল। তিনি ছিলেন এক সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত ইহুদি পরিবারের সদস্য। পরে তিনি সমাজ-সংস্কারক মার্টিন লুথারের অনুগামী হয়ে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেন। শহরে অত্যন্ত পরিচিত ও সম্মানিত এই ব্যক্তি তাঁর পরিবারে ভলতেয়ার, শিলার রুশো, লেসিং, স্পিনোজা ও কান্টের চর্চা অব্যাহত রাখেন। ইউরোপীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার সন্তান কার্লের ব্যক্তি-মানসের ওপর আরোপ করেন। স্নেহময় পিতার একখানা ফোটো সারাজীবন, এমনকি মৃত্যুকালেও মার্কসের কাছে ছিল। 1839 খৃস্টাব্দে পিতা হাইনরিখ মারা যান এবং মা হেনরিয়েটা মারা যান 1863 খৃস্টাব্দে।

মার্কস পরিবারের সঙ্গে প্রিভি কাউন্সিলর লুড্‌ভিগ ফন ভেস্টফালেন পরিবারের গভীর সৌহার্দ্য ছিল। লুড্‌ভিগের এক পুত্র ফার্ডিনাণ্ড স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হয়েছিলেন। অপর এক পুত্র এড্‌গার মার্কসের বাল্যবন্ধু ছিল। এই পরিবারের কন্যা জোহান্না বের্থা ইয়লি জেনি ফন ভেস্টফালেনকে মার্কস বিবাহ করেন 1843 খৃস্টাব্দে। পরিবারের কর্তা মার্কসকে হোমার ও শেক্সপীয়ারের রচনাবলীর সঙ্গে পরিচয় করান। সম্ভবতঃ তিনিই মার্কসের দৃষ্টি সামাজিক অবিচারসমূহের দিকে আকৃষ্ট করান।

ট্রিয়েরের মাধ্যমিক স্কুলে মার্কস পড়তেন। মাধ্যমিক স্কুলে থাকাকালেই মার্কস পরিমার্জিত বুদ্ধিচর্চার কূপমণ্ডূক জীবনের সুখী আদর্শকে ঘৃণা করতে শুরু করেন। পরিণত বয়সের চিন্তা-ধারাসমূহ তখনই তাঁর মনে "গ্রীষ্মের বিদ্যুতের মতো চমক' দিচ্ছিল। স্কুলের শেষ পরীক্ষায় লেখা, 'বৃত্তি নির্বাচনে একজন যুবকের চিন্তা' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে মার্কস লেখেন, "এমন পেশা বেছে নেওয়া জীবনের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে পেশা মানবজাতির সেবায় কাজ করার ব্যাপকতম সুযোগ উন্মুক্ত করে দেয়।...যদি কোন ব্যক্তি কেবল নিজের জন্যই পরিশ্রম করে তবে সে হয়তো জ্ঞানের ক্ষেত্রে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি, একজন মহাপণ্ডিত, একজন চমৎকার কবি হতে পারে কিন্তু সে কখনই সম্পূর্ণ হতে পারে না, একজন প্রকৃত মহৎ মানুষ হতে পারে না।'

1835 খৃস্টাব্দে মার্কস বন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়তে যান। শুরু হয়ে যায় মননকর্ম নিয়ে তাঁর হাজারো পরীক্ষা-নিরীক্ষা। 1836 খৃস্টাব্দে তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং এক অদম্য ও সর্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পঠন-পাঠনে ব্রতী হন। যাবতীয় অতীতের ধ্রুপদী নিদর্শন, নাটক, নন্দনতত্ত্ব, কাব্য, দর্শন, আইনশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, জীববিজ্ঞান, শিল্পতত্ত্ব ও বিদেশী ভাষাসমূহ তিনি

* [illegible] ইউনাইটেড হাইস্কুল, কলিকাতা-700004

পাগলের মতো পড়ে পড়ে আত্মস্থ করতে থাকলেন। একসময় ভেবেছিলেন তিনি লেখকের বৃত্তি গ্রহণ করবেন। গাথা, চতুর্দশপদী কাব্য, নানা ধরণের কবিতা, এমনকি ঐতিহাসিক নাটক ও হাস্যরসাত্মক উপন্যাসও তিনি লেখেন। কিন্তু একসময় নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে এক কঠোর রায় দিয়ে সমস্ত কবিতা ও উপন্যাসের নক্সা তিনি পুড়িয়ে ফেললেন।

অতঃপর মার্কস আরও উদ্যমের সঙ্গে বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকলেন। পর্বতপ্রমাণ বই তিনি পড়ে গেলেন। তাঁর পড়ার পরিধি ও বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা ছিল এককথায় বিস্ময়কর। মার্কস শুধু পড়েনই নি। তিনি যা পড়তেন তা থেকে বড় বড় অংশ টুকে রাখতেন এবং নিজের ভাবনা জুড়ে দিতেন।

তৎকালীন বুদ্ধিজীবী মহলে মার্কস একজন সেরা বুদ্ধিজীবী রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। বুদ্ধিজীবী মহলের মতে মার্কস ছিলেন 'একজন সত্যিকারের জীবন্ত দার্শনিক। রুশো, ভলটেয়ার, হলব্যাক, লেসিং, হাইনে ও হেগেলকে একসঙ্গে করলে (যান্ত্রিক ভাবে নয়) যা দাঁড়ায় মার্কস যেন একাই তাই। জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কস তাঁর এপিকিউরাসের দর্শন সম্পর্কে গবেষণাপত্র দাখিল করেন এবং 1841 খৃস্টাব্দে দর্শনের ডক্টরেট ডিগ্রী পান।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা সাঙ্গ করে মার্কসের ইচ্ছা ছিল বৈজ্ঞানিক কাজকর্মে আত্মনিয়োগ করা এবং বন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করা। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল প্রাশিয়ার সরকারের ঘৃণ্য শিক্ষানীতির জন্য তিনি সেই ইচ্ছা ত্যাগ করেন।

অধ্যাপনা করার আশা ত্যাগ করে মার্কস 'রাইনিশে সাইতুং' পত্রিকার সম্পাদকরূপে যোগদান করেন। এই পত্রিকায় কাজ করার সময় জনসাধারণের জীবন ও সংগ্রাম এবং দেশে দেশে তার বিকাশ ও রূপ মার্কসের মনে গভীর প্রভাব ফেলে। রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তিগুলোর জটিল সংঘাত ও পারস্পরিক প্রক্রিয়া, বিভিন্ন শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বৈষয়িক স্বার্থ বোঝবার চেষ্টা করছিলেন। ভাববাদী ও নব্য হেগেলপন্থী তরুণ মার্কসের মনের ভাববাদ থেকে বস্তুবাদে উত্তরণ ঘটে। অবশ্য মার্কসের বস্তুবাদে পৌঁছবার পথ খুব সহজ ছিল না। এক দীর্ঘ ও জটিল আত্মিক বিকাশের পথে বস্তুবাদে পৌঁছেছিলেন। বিজ্ঞান, বিশেষ করে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, যে সকল তথ্যাদি হাজির করেছিল, তার বিচার-বিশ্লেষণ করে মার্কস বস্তুবাদ ও ডায়ালেকটিকসকে একটি সুসংবদ্ধ বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গিতে রূপান্তরের প্রয়াস চালান। "হেগেলের অধিকারের দর্শনের বিচার' নামক পাণ্ডুলিপি ও অন্যান্য রচনা থেকে বোঝা যায় কিভাবে মার্কস ধীরে ধীরে মার্কস হয়ে উঠেছিলেন।

মার্কস যখন মার্কস হয়ে উঠলেন, তখন তাঁর নিজের দেশের সরকার ও অন্যান্য দেশের সরকার তাঁকে এক ভীষণ বিপজ্জনক শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। প্রাশিয়ান, ফরাসী, বেলজিয়ামের প্রতিক্রিয়াশীল সরকারগুলো মার্কসকে কোথায়ও স্থির হয়ে থাকতে দেয় নি। বছরের পর বছর মার্কস সমগ্র পরিবার সমেত এ শহর ও শহর করে বেরিয়েছেন। কোথায়ও এক বছর, কোথায়ও দুই বা তিন বছর। তারপরেই হয় নির্বাসিত হয়েছেন নতুবা তাঁর দৈনন্দিন জীবনই সেই সরকারগুলো বিপদাপন্ন করেছে।

ছাত্র জীবনের শেষে 'রাইনিশে সাইতুং' পত্রিকার সম্পাদক হয়ে কলোন শহরে আসেন, কিন্তু অচিরেই জার্মানীর কলোন শহর তাঁকে ত্যাগ করতে হয়। তিনি স্ত্রী জেনিকে নিয়ে প্যারিস শহরে গেলেন। বিপজ্জনক ব্যক্তিরূপে প্রতিভাত হয়ে মার্কস প্যারিস থেকে বহিষ্কৃত হয়ে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস্-এ এলেন। 1848 খৃস্টাব্দে বেলজিয়াম থেকে নির্বাসিত হয়ে পুনরায় প্যারিসে এলেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই প্যারিস ছাড়তে বাধ্য হন এবং পুরাতন সেই কলোন শহরেই ফিরে আসেন। এখানে মার্কস আদালতে অভিযুক্ত হন এবং পরিশেষে জার্মানী থেকে নির্বাসিত হন। ফ্রাঙ্কফুর্ট, ব্যাডেন ও পফ্লাজে অল্পদিন থাকার পর তিনি তৃতীয়বারের জন্য প্যারিসে এলেন। কিন্তু 1849 খৃস্টাব্দে ফরাসী সরকার মার্কসের বহিষ্কারের নির্দেশ দিয়ে একটি হুকুম জারি করে। আর কোন উপায়ান্তর না থাকায় ঐ বছর অগাস্ট মাসে মার্কস লণ্ডন চলে আসেন এবং সেখানেই বাকী জীবন কাটান।

তীব্র অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে মার্কস পরিবার নির্বাসনের দিনগুলো অতিবাহিত করেন। তাঁদের দারিদ্র্যের চেহারাটা ছিল এমনই যে 1852 খৃস্টাব্দে মার্কসের শিশুকন্যাটি মারা গেলে, তাকে কবর দেওয়ার মতো অর্থও তাঁদের কাছে ছিল না। দিনের পর দিন শুধু আলুসিদ্ধ খেয়ে কাটিয়েছে পরিবারটি। ভাড়া দিতে না পারার জন্য বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কখনও কখনও কয়েক সপ্তাহ ধরে মার্কস বাড়ীর বাইরে বেরোতে পারতেন না, কারণ কাপড়চোপড় তখন বন্ধকী দোকানে বাঁধা পড়ে আছে।

মার্কসের যে বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডার ছিল, তার এক কণামাত্রও যদি তিনি শাসকশ্রেণীর অনুকূলে খরচ করতেন, তবে খুব সহজেই কল্পনাতীত আরামের মধ্যে পরিবার সমেত দিন কাটাতে পারতেন। কিন্তু বিজ্ঞানকে রোজগারের উপায়ে পরিণত করাকে তিনি ঘৃণিত কাজ বলে মনে করতেন। এটা ছিল তাঁর কাছে বিজ্ঞানকে বিকৃত করার মতন। এর চেয়ে মৃত্যু ছিল তাঁর কাছে শ্রেয়।

লণ্ডনে মার্কস তাঁর একাধিক ঐতিহাসিক রচনায় বস্তুবাদী তত্ত্ব নির্ণয় করেন এবং প্রধানতঃ অর্থশাস্ত্রের চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। এই বিজ্ঞানটির ক্ষেত্রে মার্কস তাঁর 'অর্থশাস্ত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে' ও 'ক্যাপিটাল' রচনা করে মানব সভ্যতার ইতিহাসে যুগান্তর নিয়ে এলেন। অর্থশাস্ত্রকে ঢেলে সাজা এবং 'ক্যাপিটাল'কে সম্পূর্ণ করার কাজ তিনি চালিয়ে যান। রাশি রাশি নতুন তথ্য সংগ্রহ করেন এবং একাধিক ভাষা আয়ত্ত করেন। তত্ত্ব নিয়ে কাজের জন্য এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনে প্রচণ্ড পরিশ্রমের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য চূড়ান্ত রূপে ভেঙ্গে গিয়েছিল। মানব সভ্যতা যে অতি

দ্রুত এই মহাপ্রতিভারশ্মিটিকে হারাবে তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। অবশেষে আজ থেকে এক-শ' বছর আগে সুমহান এক মতবাদের স্রষ্টা লণ্ডনের হাইগেট সমাধিক্ষেত্রে তাঁর স্ত্রীর পাশে সমাধিস্থ হলেন।

মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষার বিষয়বস্তু কি? বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভাণ্ডারে তার স্থান কোথায়?

প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই নিজস্ব অনুশীলনের ক্ষেত্র রয়েছে। তা বস্তুর গতি, প্রক্রিয়ার বিভিন্ন গুণগত ক্ষেত্রসমূহ কিংবা হয়তো জাতি-নিরূপিত প্রপঞ্চ ইত্যাদি। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে অগ্রগতি এবং সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম শ্রম-বিভাজনের জন্য বিভিন্ন বিজ্ঞান আপেক্ষিক ভাবে স্বাধীন। কিন্তু বিজ্ঞান, তা সে যে অনুশীলনের মধ্যেই থাক না কেন, পরস্পরের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কহীন হতে পারে না। তারা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত।

বিভিন্ন বিজ্ঞান পৃথিবীর অখণ্ড চিত্রকে নানাভাগে ভাগ করে দেখে। মার্কসীয় দর্শন পৃথিবীর একটি অখণ্ড তত্ত্বগত প্রতিমূর্তি ফুটিয়ে তোলে। পৃথিবী একটি অখণ্ড সত্তা, আর ব্যাপক অর্থে পৃথিবীর ঐক্য কোন বিমূর্ত ধারণা নয়, বাস্তব সত্য। মার্কসীয় দর্শন যে সব মূল সর্বজনীন নিয়ম অধ্যয়ন করে তা বিভিন্ন বিজ্ঞানের দ্বারা অধীত সমস্ত বিশিষ্ট নিয়মগুলির বস্তুতঃ গতি, পরিবর্তন ও বিকাশের নিয়মগুলির সারমর্ম। প্রত্যেক জিনিসই গতিশীল, পরিবর্তনশীল এবং বিকাশমান, এই সাধারণ সত্যের সঙ্গে সঙ্গে মার্কসীয় দর্শন সিদ্ধান্ত করে যে ক্রমিক, পরিমাণগত পরিবর্তনের অনিবার্য পরিণতিরূপে দেখা দেয় গুণগত, মৌলিক পরিবর্তন।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের দৃষ্টিতে বিকাশ হলো বিরোধাত্মক প্রক্রিয়া। বস্তু ও প্রকৃতিতে অন্তর্নিহিত স্বয়ং-গতি, স্বয়ং বিকাশ, বিপরীতের ঐক্য ও সংগ্রামের প্রক্রিয়া। বিশ্বে প্রবহমান বস্তুগত দ্বন্দ্বাত্মক প্রক্রিয়ারই বৈজ্ঞানিক প্রতিবিম্ব এই দ্বন্দ্ববাদের তত্ত্ব। 'দ্বন্দ্ববাদ, তথাকথিত বিষয়গত দ্বন্দ্ববাদ, প্রকৃতির সর্বত্র বিরাজমান এবং যে গতি প্রকৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে বিপরীতের মাধ্যমে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে তারই প্রতিবিম্ব হলো বিষয়ী দ্বন্দ্ববাদ বা দ্বন্দ্বাত্মক চিন্তা।

সত্যের একমাত্র মাপকাঠি হতে পারে ব্যবহার বা প্রয়োগ। ব্যবহার বা প্রয়োগই তার বিভিন্ন রূপে প্রকৃতপক্ষে তত্ত্বগত সিদ্ধান্তগুলির যাথার্থ নির্ণয় করে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ করে বস্তুই প্রধান এবং আত্মিক দিকটি অপ্রধান।

প্রকৃতি, সমাজ ও মানুষের চিন্তা-বিকাশের নিয়ন্ত্রণকারী বিষয়মুখী নিয়মগুলির তত্ত্ব ডায়ালেকটিক্স ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আবিষ্কার করে বিশ্বকে ও তার পরিবর্তনের পথ মার্কস দেখিয়েছেন।

আমাদের এই প্রচণ্ড সামাজিক অভ্যুত্থানের যুগে মার্কস যতটা 'আধুনিক', ততটা আধুনিক সম্ভবত তিনি আগে কখনও ছিলেন না। আজ এটা স্পষ্ট যে তিনি কতদূর অবধি ভবিষ্যৎকে দেখতে পেরেছিলেন।

নিজেদের অতীত ও বর্তমানকে বোঝার ও ভবিষ্যৎকে উপলব্ধি করার আগ্রহে প্রতিটি নতুন প্রজন্ম মার্কসবাদের উত্তরাধিকারের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে এবং মার্কসবাদের মধ্যে আবিষ্কার করছে নতুন নতুন দিগন্ত।

মধু বনাম চিনি

অরুণকুমার দেবনাথ*

আলোচ্য নিবন্ধে মধু ও চিনির তুলনামূলক উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে]

মধুর সপক্ষে যুক্তি

1. মৌমাছিরা ফুলের নেক্টার গ্রন্থি থেকে এক প্রকার মিষ্ট শর্করা জাতীয় পদার্থ সংগ্রহ করে। এই নেক্টার মৌমাছির মধু থলিতে (hony sac) যায়। এই মধু থলিতে সুক্রোজ জাতীয় শর্করা আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে গ্লুকোজ লেভুলোজ ও ফ্রুকটোজে পরিণত হয়। মৌমাছিরা তখন ঐ জলসহ গ্লুকোজ, লেভুলোজ ও ফ্রুকটোজ প্রতিটি কোষে কোষে উগরিয়ে (regargitate) দেয়। এরপর মৌমাছিরা পাখনার সাহায্যে ঐ কোষে হাওয়া করতে থাকে, ফলে আর্দ্রবিশ্লেষিত গ্লুকোজ, লেভুলোজ ও ফ্রুকটোজ থেকে জলীয় অংশে কিছুটা দূরীভূত হয়। এইভাবে আর্দ্রবিশ্লেষিত ঘন নেক্টারই মধু। মৌমাছির শরীরে পরিপাক ক্রিয়ার ফলে ও চাকের মধ্যে গরম থাকার ফলে মধু ঘন ও লালবর্ণ ধারণ করে।

ইক্ষুরস, খেজুররস বিভিন্ন পদার্থকে রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা পরিশ্রুত করে চিনি প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

2. মধুর উপাদান নির্ভর করে সংগ্রহ ঋতুর উপর এবং কতকটা ফুলের উপর—এইজন্যে মধুর বাঁধাধরা উপাদান নেই। বিভিন্ন ঋতুতে ও বিভিন্ন ফুল থেকে প্রাপ্ত মধুতে উপাদানের

* গ্রাম-বেতপুল, ডাকঘর-মঙলন্দপুর, জেলা-২৪ পরগনা

সামান্য তারতম্য হয়ে থাকে। তবে উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ মধু বিশ্লেষণ করলে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত উপাদান পাওয়া যায়।

	উপাদান	শতকরা ভাগ
(ক)	জল	17%
(খ)	লেভুলোজ (Levulose)	39%
(গ)	ডেক্সট্রোজ (D. Glucose)	34%
(ঘ)	ডেক্সট্রিন (Dextrin)	1·51%
(ঙ)	প্রোটিন (Protien)	1·80%
(চ)	মোম (Bees wax)	1%
(ছ)	সুক্রোজ (Sucrose)	1.60%
(জ)	খনিজ পদার্থ	1%
(ঝ)	অ্যাসিড	0·5%
(ঞ)	অজ্ঞাত উপাদান	প্রায় 3%

খনিজ পদার্থের মধ্যে থাকে ক্যালসিয়াম [Ca (প্রতীক চিহ্ন)] আয়রণ (Fe), ম্যাগনেসিয়াম (Mg) ফসফরাস (P) সোডিয়াম (Na), সালফার (S) ইত্যাদি। অ্যাসিডের মধ্যে থাকে অ্যামাইনো অ্যাসিড, ফরমিক অ্যাসিড ইত্যাদি। চিনিতে শুধুমাত্র কেন্‌সুগার থাকে। ভিটামিন বা অন্য কোন লবণ থাকে না।

3. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মধু নিষ্কাসন করে কাচপাত্রে রেখে দিলে তা বহুদিন ভাল থাকে, রঙ ঘোরালো হয় এবং এর ভেষজ গুণ এবং ভিটামিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

বহুদিন রেখে দিলে চিনির কেন্‌সুগারের পরিমাণের সামান্য তারতম্য হয়। বহুদিন রাখার ফলে এতে ভিটামিন তৈরি হয় না। এইজন্য চিনি দ্বারা প্রস্তুত লজেন্স, মিছরী, জ্যাম, জেলী ইত্যাদিতে ভিটামিন একদম থাকে না। এইজন্য শিশুদের চিনি বা চিনিদ্বারা প্রস্তুত খাদ্য দিলে তাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

4. মধু খেলে তা কখনোই পেটের মধ্যে যেয়ে গেঁজে (Fermentation) উঠে না। মধু খুব সত্বর ও সরাসরি রক্তের সঙ্গে মিশে বলে গুঁড়া ঔষধের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে দ্রুত ও বেশী ফল পাওয়া যায়। পরিপাক ক্রিয়ার পর এর অসার অংশ কিছুই থাকে না, কারণ মৌমাছির শরীরেই এর পরিপাক ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়। মধু পেটে যেয়ে গেঁজে ওঠে না, ফলে মধু খেলে বাত বা রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় না।

চিনিকে জীর্ণ করতে পাকস্থলীকে খুব কষ্ট পেতে হয়। আমরা মিশ্র অবস্থায় চিনি গ্রহণ করি। পরে শরীরের পাকস্থলীতে উৎসেচকের (enzyme) রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে সরল অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। এইভাবে এমন এক সময় আসে যখন পাকস্থলী কেন্‌সুগারের রূপান্তর দানের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তখন চিনি বা চিনিজাতীয় পদার্থ শরীরের কোন কাজে লাগে না এবং ঐ কেন্‌-সুগার মূত্রাশয় দিয়ে বেরিয়ে যায়। এই সময় আমরা বাত, বহুমূত্র ইত্যাদি রোগে ভুগি। অপাচ্য অবস্থায় কেন্‌-সুগার মূত্রাশয় দিয়ে বেরোনোর ফলে মূত্রাশয় বিশেষভাবে আক্রান্ত হয়।

5. মধুতে চুন জাতীয় লবন আছে বলে মধু খেলে দাঁত ও অস্থির কোন অপকার হয় না বরং বিশেষভাবে উপকৃত হয়।

চিনিতে চুনজাতীয় লবণ নেই বলে চিনি খেলে দাঁত ও অস্থি কম মজবুত হয় এবং পেটে কৃমির সংখ্যা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়।

6. মধু নিম্নলিখিত রোগ সারাতে যতটা সাহায্য করে চিনি ততটা করে না।

(ক) যকৃতের দোষ।

(খ) দুর্বল পরিপাক শক্তি।

(গ) হৃৎপিণ্ডের দৌর্বল্য।

(ঘ) সর্দিকাশি।

(ঙ) কোষ্ঠকাঠিন্য।

(চ) রক্তচাপ বৃদ্ধি।

মধুর বিপক্ষে যুক্তি

1. মধুতে যে মোম থাকে তা মনুষ্য খাদ্য নয়।

2. মধুতে ভেজাল দেওয়া খুবই সহজ।

3. একবার উত্তাপ দিলে মধুর ভেষজ গুণ নষ্ট হয়।

মন্তব্য : মিছরী, চিনি এবং তদ্দারা প্রস্তুত সকল মিষ্টান্ন ত্যাগ করে টাট্‌কা ইক্ষুরস, মিষ্ট সুপক্ক ফল ও মধু ভোজন করা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল।

কুকুর-কামড়ে করণীয়

গুণধর বর্মন*

কুকুর কামড়ানো খুব সাধারণ ঘটনা। কিন্তু তাই নিয়ে কি করণীয় তার সাধারণ জ্ঞানের বড়ই অভাব। দেশময় এখন ঘাটতিরই প্রাবল্য; তার মধ্যে বড় ঘাটতি হচ্ছে এই সাধারণ জ্ঞানের। এটা বোধহয় সবদেশেই। তবে এক্ষেত্রে আমাদের দেশ নিশ্চয়ই সবার শীর্ষে—যা নিয়ে একটা শীর্ষ সম্মেলনই করা যেতে পারে। এখন কুকুর বা অন্য কোন জীবে কামড়ালে কি কি আমাদের করা দরকার—তার সাধারণ তথ্য ও আনুষঙ্গিক বিশেষ কর্তব্য এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তুলে ধরার চেষ্টা।

করণীয় :—

(ক) কুকুর—পাগলাই হোক বা সুস্থই হোক—তার কামড়ের সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত স্থানটা সত্বর যথাসম্ভব ভালভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করাটাই প্রথম অতি প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ কথা। কারণ স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান উপায়ই হচ্ছে রোগজীবাণু বা ভাইরাস যাতে সহজে শরীরে প্রবেশ করতে না পারে তার ব্যবস্থা নেওয়া। চোর বা শত্রুকে ঘরের মধ্যে ঢুকতে না দেওয়াই আত্মরক্ষার প্রধান ও প্রথম বিধি। তাই প্রথমেই চাই আক্রান্ত ঐ ক্ষতস্থানের সত্বর প্রাথমিক চিকিৎসা।

(1) এক্ষেত্রে প্রথম কথাই হচ্ছে 'কুইক ক্লিনসিং' (cleansing) বা ক্ষিপ্র নির্মলকরণ :

যেখানে কুকুর কামড়েছে ও আঁচড়েছে বা চেটেছে অর্থাৎ যেখানেই তার লালা লেগেছে বা লাগার সম্ভাবনা বলে মনে হবে সেইসব জায়গা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাবান ও জল দিয়ে ধুয়ে ফেলা। যদি হাতের কাছে সাবান না থাকে তবে শুধু জল দিয়ে জায়গাটা যথাসম্ভব ধুয়ে পরিষ্কার করা—যাতে ঐ লালা বা ধুলো যা কিছু লেগেছে তার বেশীর ভাগটাই ধুয়ে যায়। তাতে যে কোন রোগ-জীবাণু এবং ঐ র‍্যাবিস ভাইরাসও (জলাতঙ্ক রোগের বিষ) যথাসম্ভব ধুয়ে বেরিয়ে যাবে—হয়তো সম্পূর্ণ ধোয়া হয়ে যেতেও পারে। তাহলে পাগলা কুকুর কামড়ানোর বিপদের আশঙ্কাও কমে যাবে—এমনকি সেই ভয় মুছে যেতেও পারে। সাবান সোডা বা যে কোন ডিটারজেন্ট শুধুমাত্র পরিষ্কারের সাহায্য করে না, তারা জলাতঙ্ক রোগের বিষ ঐ র‍্যাবিস ভাইরাসকে সহজে নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারে। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে সাবান সোডা না পাওয়া গেলেও যখনই তা পাওয়া যাবে—তা যত দেরী করেই হোক না কেন—তখনই তার ব্যবস্থা করতে হবে। কয়েক মিনিটের মধ্যে না হলেও কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যেন তা করা হয়। এমনকি অজ্ঞতাজনিত কারণে কয়েক দিন দেরী হয়ে গেলেও যখনই এই ভুল ধরা পড়বে তখনই সেই আক্রান্ত স্থানে সাবান সোডা লাগিয়ে ধোয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। তাতে ঐ স্থানের দেহকোষে প্রবিষ্ট ভাইরাসগুলো অনেকখানি নিষ্ক্রিয় হতে বাধ্য। ফলে ঐ ভাইরাসের আক্রমণ-শক্তিটা কমে যাবে, তারা পূর্ণ বিষক্রিয়া করতে পারবে না এবং সহজে বেশী ভেতরে এগোতে পারবে না। সাধারণ সাবান ও সোডার এতখানি গুরুত্ব এখানেই। তবে সাবান সোডা লাগিয়ে বেশী জোরে ঘষাঘষি করা উচিৎ নয়—তাতে জীবাণু বা ভাইরাসরা চাপের চোটে গভীরে ঢুকে যেতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গেই জল দিয়ে জায়গাটা ধুয়ে ফেলা। সেইজন্য কুকুরের কামড়ে ভয়ে ছুটে পালাতে গিয়ে যারা পুকুরে বা কোন জলাশয়ে পড়ে যায় তাদের ঐ ক্ষতস্থান তাৎক্ষণিক ভালভাবেই ধোয়া হয়ে যায়—তাতে ভাইরাসগুলো ভেসেই যায়, ফলে তাদের অনেকেই বিনা চিকিৎসায় বেঁচেই যায়।

(2) কটারী (cautery) বা পোড়ানো (শক্তিশালী কেমিক্যালস দিয়ে)

শহরবাসীরা অনেকেই জানেন যে কুকুর কামড়ানো জায়গাটিকে তৎক্ষণাৎ কার্বালিক এ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হয়। হ্যাঁ ঠিক তাই। যথাসম্ভব পরিষ্কার করার পরেই আক্রান্ত স্থানটিতে

* জে. এন. রায় শিশু সেবা ভবন, 58/1 এস. রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা-6

কার্বলিক এ্যাসিড অল্প পরিমাণে সাবধানে লাগিয়ে দিতে হয় (টাচ্ করা)। তাতে কোষে প্রবিষ্ট ভাইরাসগুলো বেশী মাত্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। কিন্তু কার্বলিক এ্যাসিড না পাওয়া গেলে যে কোন স্ট্রং এ্যাসিডই সেই কাজ করে। সাধারণতঃ নাইট্রিক এ্যাসিডই সহজে পাওয়া সম্ভব। তাই অল্প টাচ্ করানো উচিৎ। কিন্তু কোন এ্যাসিড না পাওয়া গেলে চির পরিচিত টিঞ্চার আইডিনই যথেষ্ট উপকারী এবং অনেক ক্ষেত্রে এটাই বেশী উপকারী সেটাই আমাদের মনে থাকে না। এ্যাসিড লাগানোর এক মিনিট পর ঐ জায়গাকে স্পিরিট দিয়ে মুছতে হবে যাতে এ্যাসিডটা নিউট্রাল হয়ে যায়, নইলে স্থায়ী এ্যাসিড ক্ষত হয়ে যাবে। তবে আশ্চর্যের কথা টিঞ্চার আইডিনের গুণ এখনকার ডাক্তারবাবুরাও ভুলে যাচ্ছেন। আর বিশেষ কথা যদি মুখে কামড় হয় তবে কোনমতেই এ্যাসিড লাগান চলবে না—তাতে ওখানে স্থায়ী বিশ্রী ক্ষতচিহ্ন হয়ে যাবে। এখানে সবচেয়ে কার্যকরী হচ্ছে এ্যান্টির‍্যাবিস সেরাম (যদি পাওয়া যায়), ঐ ক্ষতস্থানে মাত্রামাফিক লাগান। আগে ধুয়ে টিঞ্চার আইডিন লাগিয়ে তারপরে ঐ সেরাম প্রয়োগ - তাতে ভাইরাসগুলো সহজেই এবং সত্বরই নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। এই এ্যান্টির‍্যাবিস সেরাম অবশ্য এই রোগ প্রতিষেধক ঔষধ হিসাবেই ব্যবহৃত হয়—টিটেনাস রোগের এ্যান্টিটিটেনাস সেরাম A.T.S.-এর মতই ইনজেকশানও দেওয়া হয়। তারই কিছুটা ঐ ক্ষতে লাগালে ভাল হয়, যদি তখন মেলে।

3) ক্ষতস্থান বড় হলে সাধারণ কাটা-ছেঁড়ার মত জায়গাটিকে সেলাই করা হবে কিনা ? (Suturing)

হাঁ—সেলাই দরকার হলে তা করতে হবে তবে তক্ষুণি নয়। জায়গাটিকে যথাসাধ্য পরিষ্কার (1নং নিয়মমতে) ও কটারী (2নং নিয়ম) করে কমপক্ষে 24 ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে সেলাইয়ের জন্য। কেননা সূচের রাস্তা ধরে ক্ষতস্থানের ভাইরাস গভীরে চলে যেতে পারে। তাতে স্নায়ুতন্তুগুলোকে ভাইরাসের আক্রমন সহজ হয়ে যাবে। তাই ঐ সময় শুধু স্থানীয় ঔষধ দিয়ে ভাল করে ব্যাণ্ডেজ করে দিতে হবে—যাতে রক্তপাত আদি বন্ধ হয় আর অ্যান্টিসেরাম পাওয়া গেলে তাই লাগাতে হবে যদি ঐ 24 ঘণ্টার মধ্যেই আসে।

4) এ্যান্টিটিটেনাস ও পেনিসিলিন :—

সাধারণ কাটা ছেঁড়ার মতই এক্ষেত্রেও পেনিসিলিন বা অন্য কোন এ্যান্টিবায়োটিক চিকিৎসা আরম্ভ করা দরকার জীবাণুদূষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। তবে এ্যান্টিটিটেনাস চিকিৎসা—এ. টি. এস. এবং টক্সইড অবশ্যই দিতে হবে।

(খ) কুকুরটির খোঁজ রাখা

(1) কুকুর কামড়ানোর পরে বড় সমস্যা হচ্ছে কুকুরটা র‍্যাবিড অর্থাৎ পাগলা রোগাক্রান্ত কিনা সেটা জানা। কুকুরটা তখন ঐ রোগাক্রান্ত না হলে আক্রান্ত মানুষের জলাতঙ্কের সম্ভাবনা নেই। আর সেটি র‍্যাবিড হয়ে থাকলে 10 দিনের মধ্যে অবশ্যই মারা যাবে। তাই কুকুরটিকে চেনা সম্ভব হলে ঐ 10 দিন পর্যন্ত তার খোঁজ নিতে হবে। এর মধ্যে সেটি যেমন করেই হোক মারা গেলেই আক্রান্ত মানুষকে এ্যান্টির‍্যাবিস চিকিৎসা করাতেই হবে। আর দশ দিনের মধ্যে না মরলে পরবর্তী চিকিৎসার দরকার নেই।

(2) আক্রান্ত কুকুরকে চিনে রাখা বা রাত্রির অন্ধকারে তাকে ঠিক মত দেখাই সব সময় সম্ভব নয়। এই রকম কুকুরের খোঁজ পাওয়া বা নেওয়া নিশ্চিতভাবে সম্ভব না হলে আক্রান্ত মানুষ বা জীবকে অবশ্যই এ্যান্টির‍্যাবিস চিকিৎসা করাতে হবে।

(3) পাগলা হওয়ার কোন লক্ষণ ছাড়াই যদি কুকুরটা 10 দিনের মধ্যেই অন্য কোন কারণে মারা যায় বা তাকে মেরে ফেলা হয় সেই রকম সন্দেহজনক ক্ষেত্রে ঐ মরা কুকুরটাকে ভেটেরিনারী কলেজে পাঠাতে হবে, তার ব্রেন (মস্তিষ্ক) পরীক্ষা করার জন্য। ল্যাবরেটরী টেস্টে যদি সেই ব্রেণ পজিটিভ হয় তবে আক্রান্ত বা তার সংস্পর্শে আসা সমস্ত লোককেই এ্যান্টি-র‍্যাবিস চিকিৎসা করাতে হবে। ভেটেরিনারী কলেজে এই পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। কুকুরের মালিক বা সাধারণ নাগরিকের যে কাউকেই একটু কষ্ট করে মরা কুকুরটাকে ঐ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে এবং পরীক্ষার অনুরোধ জানাতে হবে। অবশ্য বেসরকারী ভাবেও পশুচিকিৎসকদের অনেকে এই পরীক্ষা করে দিতে পারেন। যাঁদের কুকুর তাঁরা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য এই কাজটুকু অবশ্যই করবেন, নইলে গোটা পরিবারই বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা।

(গ) তাহলে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এ্যান্টির‍্যাবিস চিকিৎসা অবশ্যই প্রয়োজন ?

(1) যদি আক্রমণকারী কুকুরে ঐ রোগের লক্ষণ দেখা যায়।

(2) যদি কুকুরটা দশদিনের মধ্যেই মারা যায় (যে কোন কারণে)।

(3) আপাত সুস্থ কুকুর হলেও পোস্টমর্টেম পরীক্ষায় তার ব্রেন যদি পজিটিভ হয়।

(4) রাস্তায় অচেনা কুকুর কামড়ে দিলে পরে তাকে নির্দিষ্ট করা যদি সম্ভব না হয় বা তার খোঁজ-খবর না পাওয়া যায়।

(5) বিনা প্ররোচনায় হঠাৎ এসে যে কোন বন্য প্রাণী কামড়ে দিলেই এ্যান্টির‍্যাবিস চিকিৎসা করিতে হবে।

ভারতবর্ষে শুধুমাত্র সাপ, ইঁদুর আর ছুঁচোর কামড়ানো ছাড়া যে কোন প্রাণীর কামড়েই এই এ্যান্টির‍্যাবিস চিকিৎসা করার বিধি সরকারীভাবে স্বীকৃত।

(6) আপাত সুস্থ কোন জানা কুকুরের কামড়ে যদি ক্ষত গুরুতর হয় বা গুরুত্বপূর্ণ স্থানে (মুখে, মাথায় ও ঘাড়ে) হয় তাহলে দেরী না করেই এই এ্যান্টির‍্যাবিস চিকিৎসা আরম্ভ করতে হবে এবং ছয় দিনের মধ্যে ঐ কুকুরের রোগ-লক্ষণ না পেলেই চিকিৎসা বন্ধ করা উচিৎ।

(ঘ) এ্যান্টির‍্যাবিস ভ্যাকসিন ঃ—টিকা চিকিৎসা

জলাতঙ্ক রোগ নিবারণের (Prophylaxis) একটি মাত্র উপায়ই হচ্ছে পাস্তুর প্রবর্তিত ভ্যাক্‌সিন বা টিকার ব্যবস্থা। এই রোগের আশঙ্কা বা কোন রকম সন্দেহ মাত্রেই এই টিকা চিকিৎসা আরম্ভ করাতে কোন মতেই দেরী করা চলবে না। এই টিকার মূল লক্ষ্য হচ্ছে যথাসম্ভব সত্বর আক্রান্ত শরীরে এমন অনাক্রম্যতা শক্তি তৈরি করা যাতে কামড়ানো জায়গার সন্নিহিত স্নায়ুতন্তুতে ঐ রোগের ভাইরাস কোনমতে আশ্রয় না পায়। এই স্নায়ুতন্তু ধরেই তো সেই ভাইরাসরা কেন্দ্রীয় স্নায়ুকোষের দিকে অগ্রসর হয়, এবং শেষে মস্তিষ্ক কোষকেই আক্রমণ করে। স্নায়ু শাখাগুলো আগে আক্রান্ত (Infected) হয়ে গেলে তার পরে টিকার কাজ আর আশানুরূপ হয় না, অর্থাৎ তখন পূর্ণ প্রতিরক্ষা সম্ভব হয় না। তবে সৌভাগ্য যে শরীরে এই ভাইরাস প্রবেশের পরে ঐ স্নায়ুতন্তু আক্রমণের সময়টা যথেষ্ট বেশী এবং তার মধ্যেই টিকা নিয়ে অনাক্রম্যতা শক্তি অর্জনের বেশ সময় পাওয়া যায় যা অন্য কোন রোগের বেলায় হয় না। টিকার কার্যকারিতা পেতে হলে অন্য সব রোগেই শরীরে রোগ জীবাণু প্রবেশের অনেক আগেই টিকা নিয়ে অনাক্রম্যতা শক্তি অর্জন করতে হয়। শুধু র‍্যাবিসের ক্ষেত্রে তা নয়। এখানে ঐ রোগজীবাণু প্রবেশের পরই টিকা নিতে হয়। আগে দেওয়া হয় না।

এই ভ্যাক্‌সিনের স্বরূপ ঃ

এ্যাণ্টি-র‍্যাবিস ভ্যাক্‌সিনই সর্বপ্রথম মানুষের মারাত্মক রোগের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত বিজ্ঞানের দুর্জয় অভিযান। মহান বিজ্ঞানী লুই পাস্তুরই জীবাণুঘটিত ভয়াবহ রোগ নিবারণে বৈজ্ঞানিকভাবে 'টিকা' বা ভ্যাক্‌সিন চিকিৎসার জনক ও প্রচারক। একাধারে প্রখ্যাত রসায়নবিদ, জীবাণুতত্ত্ববিদ্যা (Bacteriology) ও রোগের উৎপত্তির মূলে জীবাণুতত্ত্ব (Germ Theory) ও তথ্যের প্রতিষ্ঠাতা, চিকিৎসাবিজ্ঞানসহ সমগ্র জীবন-বিজ্ঞানে কালজয়ী ধারার প্রবর্তক এবং সমগ্র জীবনদর্শনে নবদিগন্তের পথ প্রদর্শক এই মহামানবের জীবন ও কর্মধারা অতীব বিস্ময়কর। অবশ্য এই 'টিকা' চিকিৎসার ব্যাপারে আমাদের মনে আসে প্রখ্যাত চিকিৎসক এডওয়ার্ড জেনারের কথা। পাস্তুরের বহু আগে 1796 খৃস্টাব্দে ইংলণ্ডের ডাঃ জেনার বসন্তরোগের বিরুদ্ধে 'টিকা' চিকিৎসার প্রবর্তন করেন। কিন্তু জেনারের সেই কাজে প্রকৃতির রাজ্যে বিশেষ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ছাড়া বিজ্ঞানের যথার্থ উদ্ভাবনী প্রচেষ্টা বিশেষ ছিল না। দোহনরত গোয়ালিনীর সাধারণ সংলাপ থেকেই হয়েছিল তাঁর শিক্ষা। গরুর বাঁটে যে বসন্ত (Cow-Pox) হয় দোহনকালে তারই রস হাতে লেগে জলবসন্তের মত ক্ষত হয়ে গেলে সেই দোহনকারী বা কারিণীর আর গুটিবসন্তের ভয় থাকে না—এই জ্ঞান আদিতে গোয়ালাসমাজের—দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফল। জেনার তাকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে সফলভাবে প্রয়োগ করে গেছেন। আর তারই ফলে বর্তমান পৃথিবী থেকে সেই মারাত্মক গুটিবসন্ত রোগকে নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে। তবে জেনার জানতেন না ঐ রোগের আসল কারণ কি। বা সে চেষ্টাও তিনি করেন নি। ওটা যে একরকম সূক্ষ্ম জীবাণু বা ভাইরাস-ঘটিত ব্যাধি একথা তখন জানা ছিল না। তাই তাঁর টিকাচিকিৎসায় কোন জীবাণুর বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রামের চিন্তা প্রাধান্য পায় নি। আর এইখানেই পাস্তুরের যথার্থ বৈশিষ্ট্য ও মৌলিক অবদান। পাস্তুরই রোগের মূল কারণ হিসাবে জীবাণুতত্ত্বের এবং তার বিরুদ্ধে সফলভাবে টিকাচিকিৎসার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে গেছেন বৈজ্ঞানিক ভাবে। তিনি প্রথমে গরু-ভেড়ার মারাত্মক মড়ক এ্যানথ্রাক্স রোগে ও পরে পোলট্রিতে চিকেন কলেরায় ঐ সব রোগের জীবাণুকে পৃথক করে দেখাতে সমর্থ হন এবং বিশেষ পদ্ধতিতে সেই জীবাণুদের তীব্রতা অবদমিত (attenuated) করে তাই দিয়ে টিকা তৈরি করেন। পরিকল্পিত ভাবে সেই টিকা ব্যবহার করে ঐ পশুদের মড়কের হাত থেকে তাদের বাঁচাতে সক্ষম হন। তারপরে এই পাগলা কুকুরের চিকিৎসায় তিনি মন দেন। পাগলা কুকুর প্রথমে উত্তেজিত পরে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে মারা যায় দেখে তিনি নিশ্চিত বুঝতে পেরেছিলেন যে তাদের কেন্দ্রীয় স্নায়ু-তন্ত্রই মুখ্যত আক্রান্ত হয়। আর কামড়ের দ্বারা তাদের লালা দিয়েই এই রোগ অন্য শরীরে সংক্রামিত হয়। তাই তিনি পাগলা-কুকুরের মুখের লালা নিয়ে গবেষণাগারে খরগোসের মস্তিষ্কে ইনজেকশন করে দেখেন যে কিছুদিনের মধ্যে সেই খরগোস পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে মারা যায়। কিন্তু অন্য জায়গায় সেই ইনজেকশন দিলে ঠিক অনুরূপ ফল হয় না। তিনি আরও দেখেন সেই মৃত খরগোসের সুষুম্নাকাণ্ড (স্পাইন্যালকর্ড) লবণ জলে (নর্মাল স্যালাইনে) গুলে সেই জিনিষ অন্য খরগোসের মস্তিষ্কে ইনজেকশন করলে আরও তাড়াতাড়ি সেটা মারা যায়। এইভাবে পর্যায়ক্রমে 25/30টা খরগোসে ইনজেকশন করে দেখা যায় সেই জীবাণুর মারণ ক্ষমতা ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে একটি পর্যায়ে তা স্থির হয়ে থেকে যায়। ইনজেকশন-এর পরে রোগ লক্ষণ প্রকাশ বা ইনকিউবেশন পিরিয়ড এবং ঐ খরগোসের তখন মৃত্যু ঘটে সাত থেকে আট দিনের মধ্যেই একেবারে অত্যল্প নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যা প্রথমের দিকে হতো না। এই সময়-কালটাকে আর কমানো যায় না। তাই পর্যায়ক্রমে ইনজেকশন-এর পর উত্তরোত্তর শক্তিশালী ঐ ভাইরাসের শেষ পর্যায়ের দলকে তখন বলা হয় ফিক্সড্ (fixed) ভাইরাস বা চূড়ান্ত নির্দিষ্ট শক্তির ভাইরাস। আর রাস্তার কুকুর বা অন্য প্রাণীদেহে যে ভাইরাস থাকে তাকে বলা হয় স্ট্রীট (street) ভাইরাস। র‍্যাবিস-এর

এই দুই ভাইরাসের বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। স্ট্রীট ভাইরাস শেষ-পর্যন্ত স্নায়ুতন্ত্র আক্রমণ করলেও তা কুকুর বা আক্রান্ত জীবের লালায়, চোখের জলে, রক্তে ও অন্যান্য শরীর-রসে এবং মল-মূত্রাদির মাধ্যমেও নির্গত হতে থাকে। কিন্তু ফিক্সড্ ভাইরাস শুধু কেন্দ্রীয় স্নায়ুকোষ বা মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডকেই আক্রমণ করে অন্য কোথাও যায় না। লালায়, রক্তে বা শরীরের অন্য কোন রসে তাদের পাওয়া যায় না। আবার মস্তিষ্ক ছাড়া শরীরের অন্যকোন অংশে বা প্রান্ত দেশে এই ফিক্সড্ ভাইরাস ইনজেকশন করলে তা থেকে কোন রোগলক্ষণই প্রকাশ পায় না। অর্থাৎ বাইরের থেকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুকোষে তারা আসতে পারে না—যা স্ট্রীট ভাইরাস করে। কেবল মস্তিষ্কে ইন্জেকশন দিলেই তারা তীব্রভাবে মারাত্মক অথচ অন্য জায়গায় তারা নির্বিষ। এই বৈশিষ্ট্যকে পাস্তুর কাজে লাগান। তিনি ফিক্সড্ ভাইরাসের ইন্জেকশনে মৃত খরগোসের স্পাইন্যালকর্ড টুকরো টুকরো করে তাকে ভাল করে রোদে শুকিয়ে লবণজলে (নরম্যাল স্যালাইনে) তার মিশ্রণ বা সাস্পেনসন তৈরি করেন বিভিন্ন শক্তিতে অর্থাৎ মিশ্রণে মাত্রার তারতম্য করে। সেইভাবে প্রস্তুত সাস্পেনসন নিয়ে আক্রান্ত কুকুরকে পর্যায়ক্রমে বর্ধিত মাত্রায় ইঞ্জেকশন দিয়ে তিনি ঐ কুকুরদের র‍্যাবিড হওয়া থেকে বাঁচাতে সক্ষম হন। এই অবস্থায় 1885 খৃস্টাব্দে 6ই জুলাই হঠাৎ যোসেফ মাইস্টার নামে নয় বৎসরের একটি বালক সাংঘাতিক ভাবে পাগলা কুকুরের কামড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে দু-দিন পরে মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁর কাছে আনীত হয়। নিশ্চিত মৃত্যুর করাল গ্রাস তখন সেই বালকের চোখে মুখে ও শরীরের অবস্থায়। উপায়ান্তর না দেখে পাস্তুর তাঁর কুকুরদের জন্য তৈরী ঐ এ্যান্টি র‍্যাবিস ভ্যাকসিন অর্থাৎ ঐ খরগোসের স্পাইন্যালকর্ডে ফিক্সড্ ভাইরাসের সাস্পেনসন-ই প্রথম মানুষের উপর—ঐ বালক মাইস্টারের উপর প্রয়োগ করতে বাধ্য হন। তাঁর নিজস্ব প্রথায় ক্রমবর্ধিত মাত্রায় কয়েকটা ইনজেকশন দেওয়ার পরই বিস্ময়কর ভাবে বালক মাইস্টার ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হয়। যদি কোন কারণে ঐ বালক মাইস্টার না বাঁচত তবে এ্যান্টির‍্যাবিস ভ্যাকসিন শুধু নয় ঐ টিকা চিকিৎসা তথা চিকিৎসাবিজ্ঞানের ও সমগ্র জীবনবিজ্ঞানের অগ্রগমনের পটভূমিকা প্রচণ্ড ভাবে ব্যাহত হতো এবং সমগ্র বিজ্ঞানের ধারাই বিশদভাবে অবরুদ্ধ হতো। তাতে কোন সন্দেহ নাই।

যাইহোক বালক মাইস্টার বেঁচে ওঠে প্যারিস তথা সমগ্র ফ্রান্সে বিশেষ সংবাদ হয়ে পড়ে। সারা দেশে সাড়া পড়ে যায়। কারণ এর আগে পাগলা কুকুরের কামড়ে জলাতঙ্ক রোগের হাত থেকে আর কেউ কোন চিকিৎসায় কাউকে বাঁচাতে পারে নি। ফলে সারা দেশের মানুষ তখন ছুটতে থাকে বিজ্ঞানী পাস্তুরের কাছে পাগলা কুকুর, শেয়াল ও নেকড়ের কামড়ের চিকিৎসার জন্য। তাতে পয়সা আয় করতে চাইলে পাস্তুর ঐ চিকিৎসা করেই অনেক বড়লোক হয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু মানবসেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ মহান বিজ্ঞানী কি তা পারেন ? তবে জনসাধারণ তাঁর সেই অবদানের কথা ভোলেন নি। ধনী গরীব সবাই মুক্তহস্তে দান করে গড়ে তোলে সেই মহান বিজ্ঞানীর নামে—"পাস্তুর ইনস্টিটিউট"—প্রথমে ফ্রান্সে ও পরে প্রায় সব দেশেই, অবশ্য বর্তমানে সমস্ত দেশের সরকারই এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

বর্তমানে এই ভ্যাকসিন তৈরি হয় মূলতঃ ভেড়ার ব্রেন থেকেই

1. **কার্বলাইজড ভ্যাক্সিন :**—ভেড়ার মস্তিষ্কে ফিক্সড ভাইরাস নির্দিষ্ট মাত্রায় ইনজেকশন করলে পাঁচ থেকে নয় দিনের মধ্যে ঐ ভেড়ার পূর্ণ র‍্যাবিস লক্ষণ প্রকাশ পায়। প্রাণীটি পরিপূর্ণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সাধারণতঃ সাতদিনের দিনই তাকে মেরে তার ব্রেনটাকে সাবধানে বার করে নেওয়া হয়। সেই ব্রেনকে নর্মাল স্যালাইনে গুলে 1% ইমালসান বা সাসপেনসন তৈরি করা হয়। তাতে 1% কার্বলিক এ্যাসিড মিশিয়ে 37°C উষ্ণতায় 24 ঘণ্টা রাখা হয়। এতে ভাইরাসগুলো সম্পূর্ণ মরে যায়। কিন্তু তার এ্যান্টিজেনিক ক্ষমতা ঠিক থাকে—অর্থাৎ সুস্থ শরীরে তার ইনজেকশন দিলে সেই শরীরে ঐ রোগের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রতিষেধকশক্তি হিসাবে ঐ ভাইরাসের এ্যান্টিবডি তৈরী হয়। সেই সাস্পেনসনকে তখন রেফ্রিজারেটারের মধ্যে 4° থেকে 10°C এর মধ্যে সংরক্ষণ করতে হয়। সেটাই হলো এখনকার এ্যান্টির‍্যাবিস ভ্যাকসিন্। কার্বলিক এ্যাসিড দিয়ে তৈরী বলে একে বলা হয় কার্বলাইজড্ ভ্যাকসিন। কলিকাতার পাস্তুর ইনস্টিটিউট এইটাই ব্যবহার করে।

(2) **BPL ভ্যাকসিন :**—

কার্বলিক এ্যাসিডের পরিবর্তে বিটাপ্রোপিওল্যাকটোন দিয়েও ঐ ভেড়ার ব্রেন ইমালসানের ভাইরাসদের নিষ্ক্রিয় (Inactivate) করা যায়। একেই বলা হয় BPL (Beta-Propio-lactone) ভ্যাকসিন। এটি কার্বলাইজড ভ্যাকসিন থেকে বেশী শক্তিশালী বলা হয়। তাতে ঔষধের মাত্রা কম লাগে। সুতরাং ইনজেকশনএর সঙ্গে ভেড়ার ব্রেন ম্যাটার কম যায় বলে রি-অ্যাকশনও কম হয়। দক্ষিণ ভারতের নীলগিরিতে কুনুর সেন্টার পাস্তুর ইন্স্টিটিউট থেকে এই BPL ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। ভেড়ার ব্রেন থেকে তৈরি টিকায় ব্রেন টিসু থাকায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভ্যাকসিনের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, যদিও তার সংখ্যা খুবই কম - এক লক্ষ ইনজেকশনে এক থেকে 4 জনে এই প্রতিক্রিয়া কম বেশী দেখা দেয়। সাধারণ শরীর খারাপ থেকে স্থানীয়ভাবে (ইনজেকশনের জায়গায়) ব্যথা, চুলকানি, ফুলে ওঠা ও এ্যালার্জিক রিঅ্যাকসন হয়ে হঠাৎ বাড়াবাড়ি রূপও নিতে পারে, তবে এসবের চিকিৎসা ও উপশম খুব সহজ ও সত্বরই হয়। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে স্নায়ুতন্ত্রের অবসাদ বা পক্ষাঘাত (Neuroparalysis) হয়ে বেশী মাত্রায় ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া

হতে পারে। যাইহোক যেকোন রকমের প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে এ্যান্টির‍্যাবিস ইনজেকশন বন্ধ করে উপযুক্ত চিকিৎসা করতে হবে এবং বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে হবে। তবে আগেই বলেছি এই প্রতিক্রিয়ার সংখ্যা এতই কম যে তার জন্য ভ্যাকসিন চিকিৎসার বিরুদ্ধে কোন জোরালো মতবাদ থাকতেই পারে না, কারণ এ্যান্টির‍্যাবিস টিকা না নিলে বিপদ অনেক বেশী, তাতে মৃত্যু অবধারিত। এই ব্রেন টিস্যুর প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অন্যভাবে এই ফিক্সড ভাইরাসের কালচার (culture) করার চেষ্টা চলছে। তাতে তৈরী হয়েছে আরও কয়েক ধরণের ভ্যাকসিন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য :—(3) ডাক এগ (Duck egg) ভ্যাকসিন, (4) চিকেন এম্‌ব্রায়ো (Chicken Embryo) ভ্যাকসিন এবং (5) মানুষের টিস্যু কালচার ভ্যাকসিন।

ডাক এগ ভ্যাকসিন—আমেরিকায় খুবই চলে। হাঁসের ডিমের ভ্রূণের মধ্যে ঐ ফিক্সড ভাইরাসের কালচার করে এই ভ্যাকসিন তৈরি হয় কিন্তু দেখা গেছে যে শিপ-ব্রেন ভ্যাকসিনের মত এটা কার্যকরী নয় আর প্রতিক্রিয়া কম হলেও একেবারে হয় না—তা নয়। ভারতে এই টিকা নাই।

একইভাবে মুরগী ডিমের ভ্রূণে কালচার করে যে টিকা তৈরি হয়েছে তার নাম **চিকেন এম্‌ব্রায়ো ভ্যাকসিন**। তাও ব্রেনটিস্যু ভ্যাকসিনের মত কার্যকরী নয়, তাই এটাও সেদিক থেকে অচল। তবে ব্রেন টিস্যু ভ্যাকসিনে যাদের রিঅ্যাকসন দেখা দেয় তাদের ক্ষেত্রে এই দুইটির যেকোন একটি দিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হয় এবং সেইক্ষেত্রে অনেক সময় ভাল কাজ হয়। আর চিকেন এম্‌ব্রায়ো থেকে অবদমিত জীবন্ত ভাইরাস (live attenuated) ভ্যাকসিন তৈরি করা হয়েছে দু-রকমের। সেগুলি সাধারণতঃ কুকুর, গরু, বেড়াল প্রভৃতিকে আক্রান্ত হওয়ার আগেই ইনজেকশন দিয়ে তাদের র‍্যাবিস-এর বিরুদ্ধে প্রতিবেধকশক্তি তৈরি করা যায়। মানুষকেও সেইভাবে করা সম্ভব। তবে সাধারণতঃ তা করা হয় না—বিশেষ ক্ষেত্রের কর্মীদের ছাড়া। র‍্যাবিস নিয়েই যাঁরা কাজ করেন তাঁদের এই ভাবে ইমিউনাইজেশন করা হয়। অন্যক্ষেত্রে নয়।

বর্তমানে সবচেয়ে শক্তিশালী ও কার্যকরী এ্যান্টির‍্যাবিস ভ্যাকসিন তৈরি হয়েছে হিউম্যান সেল কালচার থেকে। তার নাম হিউম্যান ডিপ্লয়েড সেল স্ট্রেন ভ্যাকসিন বা HDCS (human diploid cell strain) ভ্যাকসিন। এমব্রায়োনিক লাঙস (lungs) টিস্যু থেকে নর্মাল ফাইব্রোব্লাস্ট ডিপ্লয়েড সেল সংগ্রহ করে তার কালচার করা এবং সেই সেল কালচারে ঐ ফিক্সড ভাইরাসকে কালচার করা—এক জটিল ব্যয় বহুল কঠিন কাজ। এদেশে তা সম্ভব নয়, আমেরিকা ও ফ্রান্সে দুটি কোম্পানী অবশ্য এই কাজে যত্নবান হয়ে সফল হয়েছে। খুবই শক্তিশালী কার্যকরী এবং নির্দোষ টিকা তৈরি করে বাজারে দিতে আরম্ভ করেছে। মাত্র 0·1 এম এল (সিসি) ঔষধ একটি মাত্র ইনজেকশন দিলেই পরিপূর্ণ কাজ হয়। কিন্তু এদেশে এখনও তা পাওয়া যাবে না।

6) **সবশেষে বিজ্ঞানের উন্নততর পর্যায়ের কথা :— সাবইউনিট ভ্যাকসিন।**

এই ভ্যাকসিন তৈরিতে ঐ ভাইরাসের বডির সবটাকে দরকার নাই। তাদের দেহাবরণের বাহিরে গ্লাইকোপ্রোটিন দিয়ে তৈরী যে কাঁটার মত অসংখ্য প্রোজেকশন্‌স্ রয়েছে সেগুলিতেই টিকা তৈরির আসল এ্যান্টিজেন রয়েছে বলে এখন প্রমাণিত। র‍্যাবিস ভাইরাসের দেহান্তর্গত অন্য কোন অংশই এই টিকা তৈরির এ্যান্টিজেন হিসাবে কাজ করে না। তাই টিকার মূল উদ্দেশ্য যে এ্যান্টিবডি তৈরি করা সেই ক্ষমতা ঐ ভাইরাসের যে বহিরাংশের কাঁটার মত অংশেই আছে সেই অংশটুকুকে পৃথক করে নিয়ে কাজে লাগাতে পারলে যথার্থ বিজ্ঞান সম্মত উন্নত টিকাই হবে। গোটা ভাইরাসকে দরকার নাই। কারণ ভাইরাসের দেহাভ্যন্তরের অংশ দিয়েও কিছু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই নিয়ে বিশেষ গবেষণা চলছে। এই ভ্যাক্‌সিন তৈরি হলে তার নাম হবে সাব-ইউনিট (sub-unit) ভ্যাকসিন, তাতে বিনাপ্রতিক্রিয়াতে অতি অল্প মাত্রার ইনজেকশনে সত্বরই ঐ ভয়াবহ দুরন্ত র‍্যাবিস হবে বশীভূত, সেইদিন কতদূরে জানি না!

কার্বলাইজড ভ্যাক্‌সিনের মাত্রা (শ্রেণী ও বয়স অনুসারে)

আক্রান্তের শ্রেণী	পূর্ণ বয়স্ক	শিশু (দশ বছরের নীচে) (30 কে.জি.র কম ওজন)	চিকিৎসার সময়কাল
প্রথম শ্রেণী :	প্রতিদিন 2 সি.সি.	2 সি.সি. (দৈনিক)	7 দিন
দ্বিতীয় শ্রেণী :	5 সি.সি.	2 সি.সি.	14 দিন
তৃতীয় শ্রেণী :	10 সিসি.	5 সি.সি.	14 দিন

কলিকাতা পাস্তুর ইনস্টিটিউট কেন্দ্রে এই নিয়মই নির্ধারিত।

এই ভ্যাকসিন দেওয়ার নিয়ম ও পদ্ধতি :

চিকিৎসার জন্য আক্রমণের তীব্রতা অনুযায়ী আক্রান্ত কেসগুলিকে প্রথমে তিনভাগে ভাগ করা হয়। কম বিপদ, মাঝারী বিপদ ও মারাত্মক বিপদ,— বিপদের ঝুঁকি অনুসারেই এইভাগ। সাধারণ ভাবে বলা হয় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী বা ক্লাস হিসাবে।

প্রথম শ্রেণী (Class—I) কম বিপদের আশঙ্কা। কোনমতে রক্তপাত হয়নি এমন আঁচড় কামড়, শরীরের অক্ষত স্থানে লেহন (Lick) বা লালা লাগা। তবে সদ্য কাটাছেঁড়া কোন জায়গায় লেহন করলে তাতে দ্বিতীয় শ্রেণীর বিপদ। আবার পাগলা-কুকুরের কামড়ানো গরু, মোষ, ছাগল প্রভৃতির দুধ ঠিকমত ফুটিয়ে না খেলেও এই প্রথম শ্রেণীর বিপদের সম্ভাবনা এবং সেইমত চিকিৎসারও প্রয়োজন। একইভাবে র‍্যাবিডগ্রস্ত পশুদের কাঁচা মাংস, চামড়া আদি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি যাঁরা করেন তারাও এই প্রথম শ্রেণীর বিপদভুক্ত।

দ্বিতীয় শ্রেণী (Class—II) নিশ্চিত কিন্তু মাঝারী ধরণের বিপদ।

1) মুখে ঘাড়ে মাথায় ছাড়া অন্য স্থানের কামড়ে বা আঁচড়ে যাদের রক্ত বেরিয়েছে কিন্তু ক্ষতস্থান খুব বড় নয়। আধ সেন্টি-মিটারের বেশী নয়।

2) এইরকম আঁচড়-কামড়ের সংখ্যা যখন পাঁচের কম জায়গায়।

3) যেকোন সদ্য কাটা-ছেঁড়া জায়গায় লেহন (চাটা) বা লালা লাগা। তবে ঘাড়ে মুখে মাথায় ও হাতের আঙুলে ছাড়া— (এগুলি যাবে তৃতীয় শ্রেণীতে)

আবার এই শ্রেণীর আক্রমণে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা আরম্ভ করতে যদি 14 দিনের বেশী দেরী হয়ে যায় তবে তাদের বিপদের ঝুঁকি ও চিকিৎসা বিধি হবে তৃতীয় শ্রেণীর।

তৃতীয় শ্রেণী (Class—III) চরম বিপদের ঝুঁকি।

1) ঘাড়ে মুখে মাথায় কামড়।

2) হাতে বা হাতের আঙুলে রক্তাক্ত কামড় এবং আধ সেন্টিমিটারে বেশী বড় ক্ষত।

3) বিস্তৃত ক্ষত-বিক্ষত করা কামড় (Lacerated)

4) ঘাড়ে মুখে মাথায় সদ্য কাটা-ছেঁড়া জায়গায় লেহন।

5) যেকোন সময়ে ক্ষতের সংখ্যা যখন পাঁচের বেশী।

6) শেয়াল নেকড়ে বা যেকোন বন্য প্রাণীর কামড়।

7) দ্বিতীয় শ্রেণীর কামড়ে 14 দিনের বেশী দেরী হওয়া কেস।

ইনজেকশনের স্থান ও পদ্ধতি :

পেটের চামড়ার নীচে সাবকিউটেনাস ইনজেকশন হিসাবে এই ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। পেটের ত্বকপ্রাচীরকে (Anterior abdominal wall) চারটি ভাগে ভাগ করে নিয়ে প্রতিদিন পৃথক পৃথক জায়গায় নির্দিষ্ট মাত্রায় ইনজেকশনগুলি দিতে হয় [চিত্র-1]। ইন্জেকশন অবশ্যই deep subcutaneous হতে হবে অর্থাৎ চামড়ার উপরের দিকে যেন না পড়ে অথবা নীচে মাংসপেশীতেও না যায়। পেটের চামড়াকে দুটা আঙুলে চিমটিয়ে তুলে অতি সহজে এই কাজ করা যায়। কিন্তু গর্ভবতী মায়েদের বেশী মাসের গর্ভাবস্থায় (Advanced Pregnancy) এই কাজ অসুবিধাজনক। তখন পেটের চামড়ায় না দিয়ে পিঠে দুই স্ক্যাপুলা হাড়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে
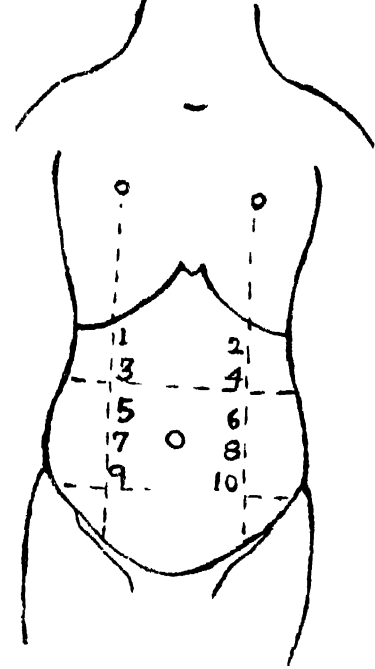
(চিত্র-1)
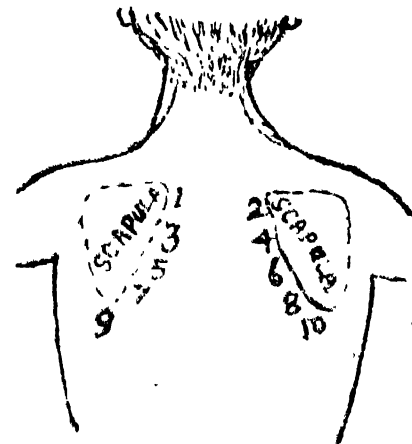
(চিত্র-2)

চামড়ার তলায় এই ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। [চিত্র-2] অথবা উরুদেশের বহিপার্শেও এই ইঞ্জেকশন চলে। গর্ভাবস্থা বলে এই ভ্যাকসিন বন্ধ করা চলবে না।

কতদিন এই অনাক্রম্যতা শক্তি (Immunity) থাকে :

এই ইঞ্জেকশন আরম্ভের কমপক্ষে তিন সপ্তাহ পরে শরীরে অনাক্রম্যতা শক্তি তৈরি হয়। তার আগে নয়, তবে একমাস পরেই পূর্ণ অনাক্রম্যতা সৃষ্টি হয়। আর সেই শক্তি থাকে ইঞ্জেকশন শেষ হওয়ার পরে 6 মাস পর্যন্ত। মারাত্মক কেসগুলিতে চৌদ্দদিনের প্রথম কোর্স ইঞ্জেকশন শেষ হওয়ার পরে 7 দিন বাদ দিয়ে একটা সমপরিমাণের বুস্টারডোজ দেওয়া বাঞ্ছনীয়। তৃতীয় শ্রেণীর বিপদে এক সপ্তাহ পর পর দুটো বুস্টার ডোজ দেওয়াই নির্দেশ।

যদি 6 মাসের মধ্যে সেই ব্যক্তি আবার আক্রান্ত হয়—তবে প্রথমবারে যদি প্রথম শ্রেণীর চিকিৎসা হয়ে থাকে আর দ্বিতীয়বারে যদি তার বিপদ দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর হয় তবে তাকে এবার (দ্বিতীয়বর্ষের) পুরা কোষ ইঞ্জেকশন নিতে হবে। কিন্তু প্রথমবারে যদি দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর চিকিৎসা হয়ে থাকে তবে এখন তাকে দুটি বুস্টার ইঞ্জেকশনই নিতে হবে 7 দিন পর পর,—ঐ দ্বিতীয় বা তৃতীয়শ্রেণীর মাত্রায়। আর দ্বিতীয়বারে প্রথমশ্রেণীর আক্রমণ হলে একটা বুস্টার ডোজ প্রথমশ্রেণীর মাত্রা অনুযায়ী নিতে হবে।

6 মাসের পরে যেকোন আক্রমণকে ফ্রেস কেস বা নতুন করেই পুরা চিকিৎসা করতে হবে।

চিকিৎসাধীন রোগীদের প্রতি নির্দেশ ঃ

এ্যান্টির‍্যাবিস চিকিৎসা চলাকালে (1) মদ খাওয়া চলবে না। আসক্ত ব্যক্তিরা ইঞ্জেকশন শেষ হওয়ার পরেও কমপক্ষে একমাস যেন মদ স্পর্শ না করেন। কারণ তাতে ঐ প্যারালিটিক প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে অথবা নিষ্ক্রিয় ভাইরাসগুলি হঠাৎ সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে। (2) এই সময়কালে মাত্রাধিক শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম পরিহার করতে হবে। (3) বেশী রাত জাগা উচিত নয়। (4) কোন স্টেরয়েড ঔষধ (Corticosteroids) বা ইমিউনোসাপ্রেসিভ এজেন্ট ব্যবহার করা উচিত নয়।

র‍্যাবিস কন্ট্রোলের উপায় ঃ

র‍্যাবিস ভাইরাস আদিতে শেয়াল, নেকড়ে, বেঁজি, ভোঁদড়, খটাশ, গন্ধগোকুল (civet cat) প্রভৃতি বন্য মাংসাশী প্রাণীদেরই রোগ অথবা তাদের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণকারী জীবাণু। এই সব প্রাণী সাধারণতঃ গভীর জঙ্গলেই থাকে। সুতরাং ভারতবর্ষের মত দেশে এই সব প্রাণীদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বা উচ্ছেদ সম্ভব নয়। কিন্তু এদেশে মানুষ আক্রান্ত হয় মূলতঃ পাগলা কুকুর থেকেই, আক্রান্ত মানুষের শতকরা নিরানব্বইটি কেসই তাই। সুতরাং এদেশে র‍্যাবিস নিয়ন্ত্রণের মূল লক্ষ্যই হবে ঐ কুকুর নিয়ন্ত্রণ, তার জন্য সহজে করা সম্ভব ঃ—

1. শহরাঞ্চলে মালিকবিহীন সমস্ত রাস্তার কুকুর নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূলকরণ।

2. সমস্ত পোষাকুকুরের রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্সের ব্যবস্থা।

3. কুকুর বেড়ালদের ইমিউনাইজেশন ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা।

4. র‍্যাবিস আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা মাত্রই সেই কুকুর বা বেড়ালকে মেরে ফেলা।

5. বাইরে থেকে আমদানী করা কুকুর বা বেড়ালকে অন্ততঃ 6 মাসকাল কোয়ার‍্যান্টাইন (quarantine) করা এবং তাদের যথাযথ ইমিউনাইজড করা।

6. সর্বোপরি জনসাধারণকে স্বাস্থ্য সচেতন করা এবং কুকুর বিড়াল পালনের যথাযথ শিক্ষা ব্যবস্থা করা।

পুস্তক পরিচয়

পদার্থ বিকিরণ বিশ্ব—সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র (শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, কলিকাতা), পৃষ্ঠা ঃ 249, মূল্য ত্রিশ টাকা।

আমরা জানি, পদার্থ ও শক্তি নিয়ে জড়জগৎ গঠিত। শক্তি যখন পদার্থ থেকে বিযুক্ত অবস্থায় থাকে, তখন তা বিকিরণের রূপ নেয়। পদার্থ ও এই বিকিরণ সম্পর্কে মানুষের অনন্ত কৌতূহল, অজস্র জিজ্ঞাসা। বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিন্তা-ভাবনার ফলে বহু প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর সঞ্চিত হয়েছে পদার্থবিজ্ঞানের ঝুলিতে। সেই ঝুলির সম্পদগুলির বেশ কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে আলোচ্য বইখানিতে। জীবনের উৎপত্তি ও বিকাশে জড়ের ভূমিকা সাম্প্রতিক কালে পদার্থবিজ্ঞানের অন্যতম উপজীব্য। বইটিতে এই বিষয়টিও বিধৃত—যদিও স্বাভাবিক ভাবেই অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিসরে।

বইটির বিষয়বস্তু পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায়গুলি হলো ঃ 'পদার্থ ও জড়জগৎ', 'বিকিরণ ও জড়জগৎ', 'কণা ও জড়জগৎ',

'বিকিরণ ও বিশ্বজগৎ' এবং 'জীবন ও বিশ্বজগৎ'। প্রথম অধ্যায়ে মূলতঃ পরমাণু-জগৎ, পদার্থের কয়েকটি বিশেষ ধর্ম ও ইলেকট্রনিক্স আলোচিত হয়েছে। পরমাণু-জগৎ সম্বন্ধে একটি সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে এই অধ্যায় থেকে। সেই তুলনায় ইলেকট্রনিক্স সম্বন্ধে আলোচনা একটু বেশি সংক্ষিপ্ত—ইলেকট্রনিক জগতের আধুনিক উপাদান 'ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট', 'মাইক্রো-প্রসেসর' ইত্যাদির উল্লেখ থাকা বোধহয় বাঞ্ছনীয় ছিল। তাছাড়া ট্র্যানজিস্টরের কার্যপ্রণালীর ব্যাখ্যাকে ঠিক নিখুঁত বলা যায় না। অধ্যায়টিতে একটি উল্লেখযোগ্য পরিচ্ছেদ : 'অতি ভারী মৌলিক পদার্থ', যেখানে ডঃ করমহাপাত্র পাঠককে পদার্থবিজ্ঞানের এক সম্ভাব্য নতুন দিগন্তের আভাস দিয়েছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে পরিবেশিত হয়েছে বিকিরণের স্বরূপ ও ধর্ম এবং পদার্থ কর্তৃক বিকিরণের নিঃসরণ বা শোষণ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রক্রিয়া। এই প্রসঙ্গে লেখক মেসার ও লেসার, রামন এফেক্ট, মোসবাওয়ার এফেক্ট, চুম্বকীয় অনুনাদ প্রভৃতি যত্ন সহকারে বর্ণনা করেছেন। এই সব বর্ণনা থেকে যেমন মূল বিষয়গুলি সম্বন্ধে ধারণা হবে, তেমনি আবার সর্বাধুনিক তথ্যাদি পর্যন্ত জানতে পারা যাবে। তবে দু'একটি ক্ষুদ্র প্রতিকূল মন্তব্য করা যেতে পারে ; যেমন, (1) সংবাদ আদান-প্রদানের জন্যে সাধারণতঃ ব্যবহৃত বেতার তরঙ্গের যে কম্পাংক 73 নং পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে, তা সঠিক নয় ; (2) 'সাইক্‌ল/সেকেণ্ড' এককের জন্যে বর্তমানে স্বীকৃত 'হার্টজ' শব্দটির ব্যবহার সঙ্গত হতো।

সাম্প্রতিক কালে এত মৌলিক কণা আবিষ্কৃত হয়েছে যে, বিজ্ঞানীরা তাদের মৌলিকত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়েছেন, সন্ধান চলেছে 'আরো মৌলিক' অল্প কয়েকটি কণার। বইটির তৃতীয় অধ্যায়ে ডঃ করমহাপাত্র পাঠককে কণা-পরিবারের সঙ্গে ভাল ভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন : এই পরিবারের যে সব সদস্য এখনো গা-ঢাকা দিয়ে আছে, ইঙ্গিত দিয়েছেন তাদের সম্বন্ধেও। পদার্থ ও কণাসমূহের সঙ্গে সম্পর্কিত যে চার ধরণের প্রাকৃতিক বলের অস্তিত্ব আছে, সেগুলিও এই অধ্যায়ে যথাসম্ভব সরল ভাবে আলোচিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে প্রধানতঃ জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়। 'সৃষ্টিরহস্য' নামক প্রথম পরিচ্ছেদে বহু তথ্য পরিবেশিত হয়েছে কিন্তু সেগুলির আলোচনা কিছুটা বিক্ষিপ্ত—মনে হয় উপস্থাপনায় যত্নের অভাব ছিল। পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে নক্ষত্র, নীহারিকা, কোয়াসার ইত্যাদি সম্পর্কে সাবলীল রচনা রয়েছে—বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে সূর্য সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয় ; যে সব বিকিরণ বিশ্বের দূর-দূরান্ত থেকে আমাদের কাছে সংবাদ বহন করে আনে, তাদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে নিষ্ঠা সহকারে। আমাদের জানা জগৎ ছাড়াও যে একটি অজানা বিপরীত জগৎ থাকতে পারে, তার সম্ভাবনার কথা উল্লেখিত হয়েছে।

বইখানির শেষ অধ্যায়ের প্রথম দুটি পরিচ্ছেদে ডঃ করমহাপাত্র সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, প্রাণশক্তি কোন অতীন্দ্রিয় পদার্থ নয়—জড়ের জটিলতর গঠনেই প্রাণের প্রকাশ।' অবশ্য এই অভিমত সম্পর্কে অল্পবিস্তর বিতর্কের অবকাশ আছে কিন্তু স্বীকার করতে হবে আধুনিক বিজ্ঞানের অঙ্গুলি-নির্দেশ এদিকেই। শেষ পরিচ্ছেদে বহির্বিশ্বে জীবনের অস্তিত্বের সম্ভাবনা আলোচিত হয়েছে।

ব্যবহৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যাখ্যা ও টীকা বইটির পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও পরিশিষ্টে রয়েছে সহায়ক রচনাপঞ্জী, ব্যবহৃত বাছাই পরিভাষা ইত্যাদি। এগুলি নিঃসন্দেহে বইটির সৌষ্ঠব বাড়িয়েছে। পরিভাষা সম্বন্ধে কয়েকটি ত্রুটি-বিচ্যুতি চোখে পড়ে ; যেমন (1) 'Electromotive force'-কে 'ইলেকট্রোমোটিভ বল' না বলে স্বীকৃত পরিভাষা অনুযায়ী 'তড়িচ্চালক বল' বলাই বোধহয় শ্রেয়ঃ ; (2) 'Temperature' বোঝাতে 'তাপমাত্রার' পরিবর্তে 'উষ্ণতা' শব্দের ব্যবহার বিধেয় ; (3) 'Transmitter'-এর অনুবাদ 'স্বন্দকারী বর্তনী' হতে পারে না, 'প্রেরক' বা 'প্রেরক যন্ত্র' বলা যেতে পারে।

যাহোক, আলোচ্য বইটি যথেষ্ট তথ্যসমৃদ্ধ এবং এতে বহু বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে, যেগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি অত্যন্ত জটিল। ডঃ করমহাপাত্র যে সেগুলির আলোচনা এড়িয়ে যান নি, তার জন্যে তাঁর সৎসাহসের প্রশংসা করতে হয়। কয়েকটি বিষয়ের ব্যাখ্যা আরো বিশদ হলে হয়তো অধিকাংশ পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করবার পক্ষে সহজ হতো। তবে লেখক বহু চিত্র ব্যবহার করে সমস্ত বিষয়গুলি প্রাঞ্জল করবার চেষ্টা করেছেন। বস্তুতঃ চিত্রের প্রাচুর্য বইটির অন্যতম আকর্ষণ। আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই ধরনের বই বাংলা ভাষায় বিশেষ নেই। আমরা বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

জয়ন্ত বসু

মাক্স প্লাঙ্ক

রতনমোহন খাঁ

প্রায় তিনশো বছর ধরে বিজ্ঞানীরা নিউটনীয় চিন্তাধারার অচল আয়তনের মধ্যেই বদ্ধ ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বহু বিজ্ঞানী সনাতন পদ্ধতির পূর্ণতা সম্বন্ধে সন্দিহান হলেও ঐ অচল আয়তনের বাইরে আসার সাহস পাচ্ছিলেন না। বিংশ

মাক্স প্লাঙ্ক

শতাব্দীর শুরুতেই অচল আয়তনের ভিত কেঁপে উঠল, দেয়াল প্রায় ভেঙ্গে গেল একটি মাত্র গবেষণালব্ধ ফলে। 1900 খৃস্টাব্দের 14ই ডিসেম্বর জার্মান ফিজিক্যাল সোসাইটি বার্লিনে ঘোষণা করলেন কৃষ্ণ বস্তুর বিকিরণ সম্বন্ধে এক নূতন তত্ত্ব। এই বৈপ্লবিক চিন্তার যিনি ধারক, যিনি সনাতন পদ্ধতির স্তম্ভমূলে প্রথম হানলেন কুঠারাঘাত তিনি হলেন মাক্স কার্ল আরনস্ট লুডিক প্লাঙ্ক।

1858 খৃস্টাব্দের 23শে এপ্রিল জার্মানের কিয়েল শহরে মাক্স প্লাঙ্ক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ছাত্র জীবনের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষ পর্যন্ত অতিবাহিত হয় মিউনিখে। এখানে অনেক কৃতী শিল্পীর সংস্পর্শে এসে তিনি শিল্পকাজ সম্বন্ধে অনুরাগী হন। কিন্তু এ অনুরাগ রূপান্তরিত হলো পদার্থবিদ্যার অনুপম শিল্পে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনায় শেষ কয় বছরে বার্লিনে এসে। এখানে শিক্ষাগুরু হিসাবে পেলেন হেলমজ্‌ ও কিরকফের মত দিক-পালদের। পদার্থবিদ্যার বহু অসংলগ্ন বিষয় তাঁকে করে তোলে আদর্শ গবেষক। মাত্র 21 বছর বয়সে পদার্থবিদ্যায় তিনি ডক্টরেট হন। তাঁর শিক্ষণের বিষয় ছিল তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যা। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠোপযোগী এক সুসংগঠিত রূপ দিয়ে তিনি বিষয়টিকে বিশেষ আকর্ষণীয় করে তোলেন। কিরকফের মৃত্যুর পর 1889 খৃস্টাব্দে তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত শূন্য পদ পূরণ করেন। তাঁর শিক্ষকতা জীবনের দীর্ঘ 37 বছর ফেড্রিক ওয়েলহেলম বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিবাহিত হয়। তাঁর সাধনার ও গবেষণার পীঠস্থান এই বিশ্ববিদ্যালয়।

ঐ সময় কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণের বর্ণালীতে শক্তি বণ্টনের সুষ্ঠু সমাধান বিজ্ঞানীরা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। কৃষ্ণবস্তু সব রকম বিকিরণ শোষণ ও বিচ্ছুরণ করতে পারে। এ বিষয়ে কিরকফের সূত্র হলো কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণের তীব্রতা বস্তুর উষ্ণতা ও বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উপর নির্ভরশীল। র‍্যালে-জীন ও ভীনের সূত্রবর্ণালীর প্রান্তসীমায় (যথাক্রমে নিম্ন ও উচ্চ কম্পাঙ্কের বিকিরণে) শক্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে মোটামুটি প্রযোজ্য। তরুণ অধ্যাপক প্লাঙ্ক বার্লিনে কার্যভার গ্রহণ করে কৃষ্ণবস্তুর উপর গবেষণায় রত হলেন। 1900 খৃস্টাব্দে প্লাঙ্ক কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণের বর্ণালীর সব অংশে শক্তি বণ্টনের সঠিক সূত্রটি আবিষ্কার করেন। তাঁর কল্পিত মডেল থেকে বিকিরণ নির্গত হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুচ্ছে বা কণায়। পরবর্তীকালে এই গুচ্ছের

বা কণার নাম হয় কোয়ান্টাম। প্রতি কোয়ান্টামের শক্তি $h\nu$, h হলো ধ্রুবক এবং ν হলো স্পন্দকের কম্পাঙ্ক। মহাকর্ষীয় ধ্রুবক G, বোলজম্যান ধ্রুবক k প্রভৃতির মত h একটি অতি প্রয়োজনীয় নিত্যসংখ্যা। এটি প্লাঙ্কের ধ্রুবক নামে পরিচিত এবং এর মান 6.63×10^{-27} আর্গ সেকেণ্ড।

পদার্থবিদ্যায় শক্তি বা অনুরূপ ধর্মের পরিবর্তন হয় নিরবচ্ছিন্ন ভাবে। সনাতন পদ্ধতিতে এটাই ছিল অবিসংবাদিত মতবাদ। প্লাঙ্কের প্রকল্প ও তাঁর অভিনব চিন্তার ফসল হিসাবে পাওয়া গেল বিচ্ছিন্নতাবাদ। বিকীর্ণ শক্তি শোষিত বা নির্গত হয় কোয়ান্টায়। অসমগতিসম্পন্ন ইলেকট্রনের শক্তি বিচ্ছুরণ বিষয়ক ম্যাক্সওয়েলের তাড়িতচুম্বকীয় তত্ত্বের এটি বিরোধী। এত বিরোধ সত্ত্বেও প্লাঙ্কের প্রকল্প পদার্থবিদ্যায় নিয়ে এল যুগান্তর। আপেক্ষিক তাপের এবং প্রতিপ্রভা ও অনুপ্রভার উপর স্টোকের সূত্রের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া গেল প্লাঙ্কের বিচ্ছিন্নতাবাদকে স্বীকার করে। 1905 খৃস্টাব্দে আইনস্টাইন বহু বিতর্কিত আলোক-তড়িৎ ফলের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিলেন এই প্রকল্পকে ভিত্তি করে। এই কাজের জন্যই আইনস্টাইনকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। দিনেমার বিজ্ঞানী নীলস বোর পরমাণুর গঠন সম্পর্কে রাদার ফোর্ডের প্রকল্পের গাণিতীয় প্রমাণ দেন শক্তি বণ্টনের বিচ্ছিন্নতাবাদকে কাজে লাগিয়ে। 1917 খৃস্টাব্দে প্লাঙ্ক সূত্রের একটি সহজ সুন্দর প্রমাণ পাওয়া গেল আইনস্টাইনের এক প্রবন্ধে। 1924 খৃস্টাব্দে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু কোয়ান্টামবাদ ও সাধারণ সাংখ্যায়নিক যুক্তি পরম্পরায় ফোটনের জন্য একটি সংখ্যায়ন বার করেন। এটি বোস সংখ্যায়ন বা বোস আইনস্টাইন সংখ্যায়ন নামে পরিচিত। অধ্যাপক বসু এই সংখ্যায়ন থেকেই প্লাঙ্ক সূত্র নির্ধারণ করেন। এরূপ নানা প্রমাণ ও ঘটনার ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো। এই অভূতপূর্ব কাজের জন্য প্লাঙ্ক 1918 খৃস্টাব্দে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

বিংশ শতাব্দীতে আধুনিক পদার্থবিদ্যার দুটি মূল স্তম্ভ একটি কোয়ান্টাম বলবিদ্যা আর একটি আপেক্ষিকতাবাদ। প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্বকেই ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা বা কোয়ান্টাম গতিবিজ্ঞান। বর্গলি, হাইসেনবার্গ, শ্রোয়েডিঙ্গার, ডিরাক, পাউলি প্রমুখ মনীষীদের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় কোয়ান্টামবাদের সুসমঞ্জস গাণিতিক রূপ সূচনা করেছে ও অগ্রগতির পথকে ত্বরান্বিত করেছে পদার্থবিদ্যার এই নব অধ্যায়ের। শেষের দিকে প্লাঙ্ক কোয়ান্টামবাদের বিভিন্ন প্রয়োগের সঙ্গে পুরাপুরি যোগাযোগ রাখতে পারেন নি। সব চেয়ে বিস্ময়কর পরিণতি হলো, তাঁরই উদ্ভাবিত সূত্র ধরে পদার্থবিদ্যার নব পথে উত্তরণের বিরূপ সমালোচকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।

প্লাঙ্ক জীবনে পেয়েছেন অনেক সম্মান। 1912 খৃস্টাব্দে প্রুসিয়ার অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের গণিত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শাখার সম্পাদক এবং 1926 খৃস্টাব্দে রয়্যাল সোসাইটির সভ্য হন। 1930 খৃঃ থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি বার্লিনের কাইজার উইলহেলম সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত এই সোসাইটির নাম ছিল ম্যাক্স প্লাঙ্ক সোসাইটি।

দর্শন ও ধর্ম সম্বন্ধে প্লাঙ্কের নিজস্ব মতবাদ থাকলেও তিনি ছিলেন বিশ্বমানব-প্রেমিক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানে নাজিদের স্বেচ্ছাচারিতা, ইহুদিদের উপর পাশবিক অত্যাচার তাঁকে বিশেষভাবে বিচলিত করে। তাই দেশ ত্যাগ না করে এসব অন্যায়ের প্রতিবাদ করাকে পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন। হিটলারের সঙ্গে সহযোগিতা না করে তার কাজের প্রতিবাদ করায় প্লাঙ্কের পারিবারিক জীবনে নেমে এসেছিল নানা দিকে বিষাদের কালো ছায়া। 1944 খৃঃ বার্লিনে তাঁর বাড়ী ও জীবন অপেক্ষা প্রিয় সংগৃহীত পুস্তকাদি ধ্বংস হয়ে যায়। ঐ বৎসরই 20শে জুলাই তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র (প্রথমা স্ত্রীর সন্তান) এরানিনকে হত্যা করা হয় হিটলারকে হত্যার ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পর প্লাঙ্ক জীবনের শেষ দু-বছর গটিনজেনে কাটান। 89 বছর বয়সে 1947 খৃস্টাব্দের 4ঠা অক্টোবর এই বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানীর মৃত্যু

আবেদন

জ্ঞান ও বিজ্ঞানে প্রকাশের জন্য জনসাধারণ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে সহজবোধ্য ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠাবার জন্য বিজ্ঞান লেখকদের নিকট আবেদন করা যাচ্ছে। প্রবন্ধ ফুলস্ক্যাপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লিখে এবং সঙ্গে চিত্র থাকলে তা পৃথক কাগজে চীনা কালিতে এঁকে পাঠাতে হবে। সম্পাদকমণ্ডলী কর্তৃক উপযুক্ত বিবেচিত হলে যথাসময়ে তা "জ্ঞান ও বিজ্ঞানে প্রকাশিত হবে।

'সত্যেন্দ্র ভবন'
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা-700 006

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পেট্রোলিয়াম

সুদীপ্ত দাশগুপ্ত*

আজকাল পেট্রোলিয়ামের নাম কে-না জানে। আজকের এই আধুনিক সভ্যতার মূল কাঠামো যে সব জ্বালানীর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে পেট্রোলিয়ামের নাম অন্যতম। এই জ্বালানীর উপর নির্ভর করেই চলছে আধুনিক যুগের নানা যানবাহন। এককথায় বলতে গেলে মানব সভ্যতার ইতিহাসে পেট্রোলিয়ামের দান অপরিসীম।

এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী পরিমাণে পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। আমেরিকায় পেট্রোলিয়ামের পরিমাণ- 20881·39 লক্ষ ব্যারল। আমেরিকার মধ্যে মেক্সিকো, কানাডা, আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়া এবং পেরুতেই অধিকাংশ পেট্রোলিয়াম উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর মধ্যে আমেরিকা ছাড়াও রাশিয়া, ব্রহ্মদেশ, জাপান, রুমানিয়া, ইরাক, ইরান, মিশর, সুমাত্রা এই কয়টি স্থানেও পেট্রোলিয়ামের পরিমাণ বেশী। সুমেরু অঞ্চলেও কিছু কিছু অংশে পেট্রোলিয়াম উৎপন্ন হয়।

মাটির অনেক নীচে বালির স্তরে থাকে অপরিষ্কার পেট্রোলিয়াম। পরে তা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় শোধন করতে হয়।

চীনদেশের তেলের ফোয়ারা।

সেই প্রাচীনকাল থেকে পৃথিবীতে পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার আসছে। শোনা যায়, যীশুখৃস্টের জন্মের প্রায় 3,000 বছর ইউফ্রেটিস নদী উপত্যকার লোকেরা পেট্রোলিয়াম ব্যবহার। পৃথিবী বিখ্যাত ভূ-পর্যটক মার্কো পোলো (1256-23) যখন চীন দেশে গিয়েছিলেন, সেখানে গিয়ে তিনি এক প্রস্রবণ দেখতে পান। প্রস্রবণ দিয়ে বেরিয়ে আসছে ফোয়ারা। তখন চীন দেশের লোকেরা এই তেলকেই জ্বালানী রূপে ব্যবহার করত। আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান উপজাতি নদীতে ভাসন্ত এক প্রকার তেলকে নানা ধরণের অসুখ সারাবার কাজে ব্যবহার করতো।

1859 খৃস্টাব্দে টিসুভিলা শহরের শ্রমিক ড্রেক (Drake) প্রায় 70 ফুট তৈলকূপ খনন করে পেট্রোলিয়াম আবিষ্কার করেন।
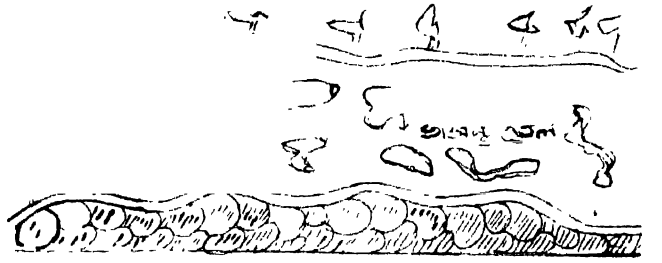
আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানরা নদীতে ভাসন্ত তেলকে নানা রোগের ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হতো।

টিসুভিলা তারপরই পেট্রোলিয়াম উৎপাদনকারী দেশ বলে চিহ্নিত হয়। তবে শোনা যায়, ব্রহ্মদেশে নাকি 1000 বছর আগে প্রথম পেট্রোলিয়াম আবিষ্কৃত হয়। অনেকে বলেন পেট্রোলিয়াম প্রথম আবিষ্কৃত হয় খৃস্টের জন্মের কিছু আগে।

1846 খৃস্টাব্দে প্রথম কয়লা থেকে জ্বালানী আবিষ্কার করেন অধ্যাপক গ্রেজনার। এই জ্বালানীর নাম কেরোসিন। উল্লেখ্য, কেরোসিন পেট্রোলিয়ামেরই একটা অংশ বিশেষ। পেট্রোলিয়ামকে কিভাবে অন্য পদার্থ থেকে পৃথক করা যাবে এ নিয়ে প্রথম চেষ্টা করেছিলেন বিজ্ঞানী মগারা। তিনি পাতন প্রক্রিয়ায় পেট্রোলিয়াম শোধন করে তা বাজারে বেচেন। 1845 খৃস্টাব্দে কর্দমাক্ত তেল থেকে জ্বালানী তেল প্রস্তুত করার প্রণালী আবিষ্কার করেন জন ইয়ং।

তবে এই সব আবিষ্কারের আগে পেট্রোলিয়মজাত অ্যাসফাল্ট আবিষ্কৃত হয় কিউবাতে, আনুমানিক 1535 খৃস্টাব্দে।

কি ভাবে পেট্রোলিয়াম উৎপন্ন হলো সে সম্বন্ধে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে। বিজ্ঞানী ট্রাইরস-এর মতে সমুদ্রের তলদেশে প্রাণী ও উদ্ভিদ কোন কারণে বহু বছর ধরে জমবার ফলে একসময় উভয়েই রূপান্তরিত হয়ে পেট্রোলিয়াম জ্বালানীতে পরিণত হয়েছে।

রুশ বিজ্ঞানী মাণ্ডেলিবের মতে অতি প্রাচীনকালে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগে প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাপ এবং বাষ্পের সঙ্গে রাসায়নিক সংযোগ হবার ফলে পেট্রোলিয়ামের উৎপত্তি ঘটে।

মেন রোড, (ইস্ট), নব ব্যারাকপুর, 24 পরগণা।

বিজ্ঞানী পোটনীর মতে শ্যাওলা প্রভৃতি উদ্ভিদ দীর্ঘ দিন ধরে সমুদ্রের তলে মাটির নীচে চাপা পড়ার জন্য কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে পেট্রোলিয়ামে পরিণত হয়। তবে বিজ্ঞানী পোটনীর মতের কোন লিখিত প্রমাণ নেই।

আর একজন বিজ্ঞানী এঙ্গেলরের মতও পোটনীর মতবাদের অনুরূপ। তবে তিনি বলেন যে মাছের তেল দিয়েও নাকি কৃত্রিম উপায়ে পেট্রোলিয়াম উৎপন্ন করা যায়। অর্থাৎ, সমস্ত বিজ্ঞানীর মত একত্র করলে আমরা দেখতে পাই, সম্ভবতঃ, পৃথিবীর ভিতর ভাগে বা সমুদ্রগর্ভে অনেক দিন ধরে প্রাণী বা উদ্ভিদ চাপা পড়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে পেট্রোলিয়ামে রূপান্তরিত হয়।

বেলে আর চুনা পাথরের স্তরে তরল পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়। অনেক সময় ভূতাত্ত্বিকেরা দেখেন যে ফাটলের গা বেয়ে চুঁয়ে চুঁয়ে তেল পড়ছে কিন্তু সেইখানে নল বসিয়েও পেট্রোলিয়ামের সন্ধান পাওয়া যায় না। কারণ কিছু কিছু সময় সছিদ্র শিলাস্তরের শিলার ফোকর দিয়ে তেল অন্য স্থানে সরে যায়। সেই সময় আবার সিস্‌মোগ্রাফ প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে পেট্রোলিয়ামের স্থান নির্ণয় করতে হয়।

পেট্রোলিয়াম খুঁজে বার করাও খুবই কষ্টসাধ্য। ফাটলের মধ্যে দিয়ে তেল চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়তে থাকলে অনুমান করা
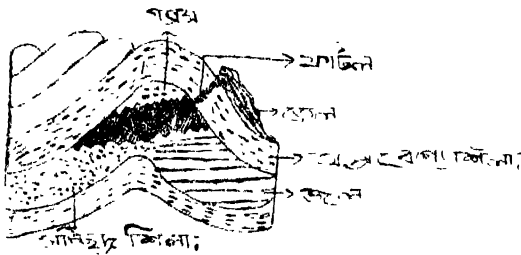
ফাটল দিয়ে তেল চুঁইয়ে পড়তে থাকলে সেখানে তেল আছে মনে করা হয়।

হয় যে সেখানে পেট্রোলিয়াম আছে। এছাড়া যেখানে আছে আগ্নেয়গিরি এবং আগ্নেয়গিরির মাথায় গোল ছাদ সেখানে বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা পেট্রোলিয়ামের সন্ধান করেন।

পেট্রোলিয়ামবহুল বেশীর ভাগ অঞ্চলেই আগ্নেয়গিরি দেখা যায়। এর কারণ হলো ভূগর্ভে পেট্রোলিয়াম সঞ্চিত হবার ফলে গ্যাসের পরিমাণ বাড়তে থাকে। এর ফলে চাপের পরিমাণও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। আর, ভূত্বকের কোন দুর্বল অংশ দিয়ে এই চাপের ফলে তেল, গ্যাস, কাদামাটি, ধোঁয়া, ভস্ম প্রভৃতি সবেগে বের হয়ে আসে। এই ভাবেই সৃষ্টি হয় সঞ্চয়জাত পর্বতের।

অ্যাসফাল্ট, মোম, কেরোসিন, বেনজাইন, পেট্রোল, ডিজেল প্রভৃতি পেট্রোলিয়ামেরই এক একটি অংশ। পেট্রোলিয়াম থেকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই সব অংশগুলিকে পৃথক করা যায়।

পেট্রোলিয়ামের মূল উপাদান হলো হাইড্রোজেন ও কার্বনের সমন্বয়ে গঠিত হাইড্রোকার্বন। সাধারণতঃ পেট্রোলিয়ামে তিন প্রকার হাইড্রোকার্বন দেখা যায়। (ক) অ্যারোমেটিক, (খ) অ্যালিসাইক্লিক, (গ) অ্যালিফেটিক।

পূর্বেই বিভিন্ন দেশের তেল সম্বন্ধে কিছু বলেছি। এখানে আরো কিছু বলছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তেলে তরল প্যারাফিনের পরিমাণ বেশী। মেক্সিকো অঞ্চলে প্রধানতঃ দু-প্রকার তেল দেখা যায়। একরকমের তেলে থাকে বেনজাইন, পেট্রোল, কেরোসিন আর অন্যরকম তেলে থাকে অ্যাসফাল্ট আর ডিজেল। রুশ দেশের তেলে প্যারাফিনের পরিমাণ কম। ইরান দেশের তেলে আবার ন্যাপথলিনের পরিমাণ কম। ভারতবর্ষের তেলে অর্থাৎ আসাম অঞ্চলের তেলগুলিতে গন্ধক নেই। কিন্তু ন্যাপথলিন যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। ব্রহ্মদেশের তেলে প্যারাফিনের মাত্রা আবার বেশী। কলম্বিয়ার পেট্রোলিয়ামে পিচ্ছিলকারী তেলের পরিমাণ কম। এই অঞ্চলের তেলে পেট্রোলের পরিমাণ বেশী।

পেট্রোলিয়ামের খনির উপরের অংশকে বলা হয় তৈলক্ষেত্র। যখন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তেলের অবস্থান জানা যায় তখন প্রধান অসুবিধা হয়ে দাঁড়ায় তেল উপরে তোলা। সাধারণতঃ প্রস্তর খণ্ডের প্রচুর নীচে তেল সঞ্চিত থাকে। অনেক সময় ভূগর্ভের প্রায় 25 হাজার ফুট নীচু কূপ খনন করতে হয় যার জন্য এত চেষ্টা করেও অনেক সময় তৈলবাহী স্তরে পৌঁছানো যায় না। 25,000-30,000 ফুট পর্যন্ত কূপ খনন না করে বেশীর ভাগ সময়ই তেল পাওয়া যায় না। এইজন্য নলকূপ খুবই দীর্ঘ হয়ে যায়। ফলে শুধু তেল তুলতেই লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে যায়। এত চেষ্টা করেও অনেক সময় ভূগর্ভে তেল পাওয়া যায় না কারণ বিভিন্ন কারণে পেট্রোলিয়াম স্থান পরিবর্তন করে। তৈল ক্ষেত্রের উপরে 150 ফুট উঁচু একটা কাঠামো বসিয়ে সেখানে নল বসানো হয়। যে স্তরে পেট্রোলিয়াম সঞ্চিত থাকে তার উপরে থাকে জলের স্তর। যদি নলের গা বেয়ে জল পড়তে থাকে তাহলে তেল নষ্ট হয়ে যায়। সেইজন্য আরেকটি নল প্রথমটির সঙ্গে জোড়া লাগিয়ে সিমেন্ট এই স্থানে ঢেলে দিতে হয় যাতে জল এই পথে কোন মতে প্রবেশ করতে না পারে। ভূগর্ভে পেট্রোলিয়াম এবং গ্যাস চাপের মধ্যে থাকার ফলে প্রবল বেগে উপরে উঠে আসতে থাকে। পরে গ্যাসের চাপ কমে গেলে পাম্পের সাহায্যে পেট্রোলিয়াম তোলা হয়।

অনেক সময় শ্রমিকদের অসাবধানতায় খনিতে আগুন লেগে প্রচুর তেল নষ্ট হয়ে যায়। কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের সাহায্যে এই আগুন নেভানো যায়। যাতে খনিতে আগুন না লাগে সেইজন্য প্রচুর সতর্কতা অবলম্বন করা হয়।

ভারতের পেট্রোলিয়াম নিয়ে আবার আলোচনা করা যাক। ভারতের পেট্রোলিয়ামের পরিমাণ খুবই কম। আনুমানিক 30·00 লক্ষ ব্যারল। বর্তমানে আসামের শিবসাগর অঞ্চলে

বিজ্ঞানীরা তৈলখনি আবিষ্কার করেছেন। ডিব্রুগড়, রুদ্রসাগর, কাম্বে, কলোস প্রভৃতি অঞ্চলে তেল পাওয়া যায়। ভারতের ভূবিজ্ঞানীরা নাগাভূমিতেও তেলের সন্ধান পেয়েছেন। জ্বালামুখীতে অম্বিকা দেবীর মন্দিরে দাহ্যগ্যাস উৎপন্ন হয়। এটি পেট্রোলিয়ামজাত। নেপালেও তেল পাওয়া যায়। বোম্বে-হাই-এ সম্প্রতি O.N.G.C. নতুন প্রকল্পটিতে গ্যাসের সন্ধান মিলেছে।

আজকাল বিভিন্ন জায়গায় পেট্রোলিয়াম তৈরি করা হয় কৃত্রিম উপায়ে। এর ফলে বিভিন্ন স্থানে পেট্রোলিয়াম উৎপাদন দিনে দিনে বাড়ছে। আলকাতরা এবং কয়লার গুঁড়ার সঙ্গে আয়রন অক্সাইড মিশ্রিত করে তাপ দিয়ে হাইড্রোজেনে আয়নিত করে পেট্রোলিয়াম উৎপাদন করা হয়।

পেট্রোলিয়ামের স্থান এই পৃথিবীতে অপরিসীম। পেট্রোলিয়ামের জ্বালানীর বিকল্পরূপে এখনও কোন জ্বালানীকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয় নি। অনেকে কয়লাকে পেট্রোলিয়ামের বিকল্পরূপে ভাবছেন। বিভিন্ন দেশে কৃত্রিম উপায়ে তেল তৈরি করা হচ্ছে। অবশ্য তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। আশা করা যাচ্ছে পেট্রোলিয়াম ভাণ্ডার নিঃশেষ হবার আগেই বিজ্ঞানীরা এর বিকল্প রূপে অন্য জ্বালানীর সন্ধান পাবেন এবং তখন হয়তো মানব জাতি সভ্যতার কাঠামোয় আরেক ধাপ এগিয়ে যাবে।

স্পাইরুলিনার পুষ্টিমূল্য

গোপালচন্দ্র দাস*

পৃথিবীজুড়ে আজ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব। এই অভাব পূরণের জন্য বিজ্ঞানীরা নানাভাবে প্রয়াস চালিয়ে পুষ্টিকর খাদ্যের নতুন উৎস সন্ধান করছেন। এবিষয়ে স্পাইরুলিনা নামক একপ্রকার শেওলাজাতীয় উদ্ভিদ তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

স্পাইরুলিনা মাক্সিমা (Splrulina maxima) নামক প্যাঁচালো সূত্রাকার নীল-সবুজ শেওলা সাধারণতঃ দক্ষিণ আমেরিকার হ্রদের ক্ষারীয় জলে, আফ্রিকায় এবং চীনে জন্মায়। ভারতে স্পাইরুলিনা গোত্রের শেওলা কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ), হায়দ্রাবাদ (অন্ধ্রপ্রদেশ), বহরমপুর (উড়িষ্যা), ফাতাপাহাড় (আসাম) এবং দিল্লীর বিভিন্ন স্থানে স্রোতহীন জলে জন্মায়। অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতির প্রায় সর্বত্রই নোনা জলে, বোম্বাইয়ের কোলাবার সমুদ্রতটে এবং মাদ্রাজের (তামিলনাড়ুর) ভিজে জমিতে এই জাতীয় শেওলা দেখতে পাওয়া যায়। এই শেওলার সূত্রাকার দেহ বোতলের ছিপি খুলবার যন্ত্রের মত প্যাঁচালো হয় বলে আগে একে Spirulina platensis বলা হতো। এত তীব্র ক্ষার জলে এরা বাস করতে পারে যে সেখানে অন্য কোন প্রাণী বা উদ্ভিদের বাস করা প্রায় অসম্ভব। pH-11-তেও এরা মোনোকালচারের মত বেঁচে থাকে। কোন কোন জলাশয়ে শেওলার মধ্যে এরাই 99% থাকে। এদের কোষস্থিত ভ্যাকুওলগুলি এই শেওলাকে জলে ভাসিয়ে রাখতে সাহায্য করে। ভাসমান অবস্থায় এদেরকে মাদুরের মত দেখায়, ফলে সংগ্রহ করাও অনেক সহজ হয়। এগুলি বালুময় তীরভূমিতে ফেলে প্রখর রোদে তাড়াতাড়ি এবং কম খরচে শুকানো যায়।

মুক্তপুকুরে বা পলিথিনের টিউবে স্পাইরুলিনার চাষ করা সম্ভব। তবে বিশেষতঃ অব্যবহৃত নোনা পুকুরে হাইড্রোইলেকট্রিক বেসিনে, কলকারখানার ব্যবহৃত জলে এবং যেসব জলাশয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড বেশী থাকে তাতে এই শেওলা ভালভাবে চাষ করা যায়।

এই শেওলা থেকে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন পাওয়া সম্ভব, এমনকি এতে সয়াবিনের চেয়েও বেশী প্রোটিন থাকে। এই প্রোটিনের গুণগত মানও বেশ উন্নত; মেথিওনিন, ট্রিপটোফ্যান এবং অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড এতে থাকে বরং লাইসিন থাকে অপেক্ষাকৃত কম। এই শেওলাতে 65% প্রোটিন, 19% শর্করা, 6% পিগমেন্ট, 4% স্নেহজাতীয় পদার্থ, 3% তন্তু এবং অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে 3% ভস্ম (ash) থাকে। স্পাইরুলিনা মাংসের পরিবর্তে এবং কৃত্রিম দুধ বা ঝোলে (soup) প্রোটিনের পরিপূরক হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং মেক্সিকোতে পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গেছে যে, যদি মুরগী বা মাছের খাদ্যের সঙ্গে এই শেওলা যুক্ত করা হয় তাহলে মুরগীর ডিমের পীতাংশ, মাংস বা মাছের রঙ আরও গাঢ় হয়। স্পাইরুলিনাপ্রধান খাদ্য খাইয়ে কোন প্রাণীর কোন বিষক্রিয়া কিংবা কোনপ্রকার অস্বাভাবিকতা দেখা যায় নি। সমস্ত সালোকসংশ্লেষী জীবে রিবিউলোজ বাই-ফসফেট কার্বঅক্সিলেজ (ribulose biphosphate corboxylase) নামক যে এনজাইম প্রচুর পরিমাণে থাকে তার উৎসরূপেও এই শেওলা ব্যবহৃত হতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকাবাসীরা একে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। স্পাইরুলিনা যে প্রোটিনের উৎস হিসাবে মানুষের খাদ্যে ব্যবহৃত হতে পারে সে বিষয়ে জাপান, ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্রে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে।

ক্লোরেলা (chlorella) এবং সেনেডেসমাস (scenedes-

*গ্রাম+পোঃ—ঘোড়শালা, জেলা—মুর্শিদাবাদ

mus) নামক যে এককোষী শেওলা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে তাদের কোষের দেয়ালগুলি স্থূলাকার এবং সেলুলোজ জাতীয় পদার্থ দিয়ে তৈরি, তাই সেগুলি সহজে হজম হয় না, কিন্তু স্পাইরুলিনার কোষের দেয়াল-গুলি সেলুলোজ দিয়ে তৈরি নয় তাই সেগুলি সহজেই হজম হয়।

যেহেতু স্পাইরুলিনা সালোকসংশ্লেষী জীব সেইজন্য তার বৃদ্ধির জন্য কার্বন ডাই-অক্সাইড, জল, অজৈব লবণ ও সূর্যের আলোর প্রয়োজন হয়। অনুকূল পরিবেশে এই শেওলার উৎপাদনও বেশ সন্তোষজনক (গমের চেয়ে দশগুণ বেশী উৎপাদন করা যায়)। তাই পৃথিবীর বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য স্পাইরুলিনার উচ্চপুষ্টিমূল্য সত্যই ভেবে দেখবার মত।

পাখির কথা

সুদীপকুমার ঘোষ*

বিশাল এই পৃথিবীতে যে কত ধরণের প্রাণী বসবাস করে তার সঠিক পরিসংখ্যান করা যেমন কঠিন ব্যাপার তেমনি তাদেরকে শ্রেণীবদ্ধ করাও এক বিরাট সমস্যার ব্যাপার। তবুও বিজ্ঞানীদের নিরলস প্রচেষ্টায় আজ কোন কিছুই থেমে নেই।

সমগ্র প্রাণীকুলকে সাধারণতঃ দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে—অমেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডী। প্রাণীকে আবার দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, প্রথম শ্রেণীটি হলো যাদের শরীরের রক্ত ঠাণ্ডা (cold blooded) এবং দ্বিতীয়টি হলো যাদের রক্ত গরম (warm blooded)। এই গরম রক্তের প্রাণীদের দুটি ভাগ আছে, একটি হলো স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং অপরটি হলো পাখি। পাখিরাই হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র পালকবিশিষ্ট প্রাণী। এদের দাঁত থাকে না এবং কেবলমাত্র ডান দিকের সিস্টেমিক মহাধমনী (right systemic arch) আছে। এরা ডিম প্রসব করে।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন পাখিদের পূর্বপুরুষ সরীসৃপ থেকেই এসেছে। তখন এদের দাঁত এবং সরীসৃপের ন্যায় লেজ ছিল। আর্কিওপটেরিক্সকে (Archaeopteryx) পক্ষীকুলের জীবাশ্ম হিসাবে ধরা হয়, কারণ এর মধ্যে কিছু সরীসৃপের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যেমন—(a) লম্বা মস্তিষ্ক, (b) অনেকগুলি কশেরুকার (vertebrae) সমন্বয়ে লেজ, (c) স্যাক্রামটি ছোট, (d) সম্মুখ পা নখরযুক্ত (e) দাঁত আছে।

সাধারণতঃ পৃথিবীতে যে সব পাখি দেখা যায় তাদের মোট প্রজাতি সংখ্যা 8650। ভারতবর্ষে প্রায় 1200 প্রজাতির পাখি দেখা যায়, যার মধ্যে 75টি গোষ্ঠী (family) এবং 20টি বর্গের (order) পাখি আছে। মোট পৃথিবীর পাখির প্রজাতি কুলকে 27টি বর্গে (order) ভাগ করা হয়েছে, এদের মধ্যে প্রথম হচ্ছে পুচ্ছবিহীন ডুবুরী পাখি, এদের বিবর্তন সবচেয়ে কম। এই শ্রেণীবিভাগের সবচেয়ে শেষ ধাপে আছে পাসে-রিফর্মিস (Passeriformes) বা শাখাচারী পাখিরা। আমাদের চেনাশোনা পাখির অধিকাংশ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সিকোনিফরমিস (Ciconiiformes) বর্গের অন্তর্গত হলো সমস্ত সারস ও বক জাতীয় পাখি, যারা জলের কাছাকাছি বাস করে। সাঁতারু পাখিরা হচ্ছে অ্যানসেরি ফরমিস (Anseri formes)। আবার কিছু পাখির কতকগুলি বিশেষ ধরণের লক্ষণ দেখা যায়, তাদের এক একটি গোষ্ঠীতে ফেলা হয়। পাসেরিফর্মিস বা শাখাবৃঢ় শ্রেণীর মধ্যে 40টি গোষ্ঠী আছে। যেমন ফ্লাইক্যাচার (Muscicapidae), সান বার্ড (Nectariniidae) ইত্যাদি।

এই পক্ষীজগৎ-এর মধ্যে খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে মানুষের বুড়ো আঙুলের মতো ছোট হামিং বার্ড আবার টাট্টু ঘোড়ার মত বড় উটপাখি আছে। বহু পাখি আছে যারা এক বিশেষ ধরণের মাংস খেয়ে থাকে. যেমন—শকুন। যে শকুন আমরা সচরাচর দেখি সেটির নাম সাদা পিঠওয়ালা শকুন বা বেঙ্গল ভালচার (Gyps bengalensis), হিন্দীতে গিধ্ ও সংস্কৃতে গৃধ্র বলে। এদের গলায় রোয়া বা পালক নেই এবং ডানার নীচে চওড়া দাগ থাকে। এরা একটিমাত্র ডিম পাড়ে। ডিমের রঙ সাদা কখন লালচে বাদামী ছিট ছিট দাগও থাকে। দাক্ষিণাত্যের শুষ্ক অঞ্চলে আর এক ধরনের শকুন থাকে এদের সাদা বা গিন্নী শকুন বা মুদ্দফরাস শকুন (Scavenger vulture) বলে। এদের আর একটি নাম হলো ফ্যারাওজ চিকেন। হিন্দীতে সফেদ গিধ দেখতে ময়লা সাদা রঙের, ঠোঁটের রঙ হলদে হয়। চিলেদের সঙ্গে এদের পার্থক্য হলো যে এদের লেজ গোঁজাকৃতি কিন্তু চিলেদের প্রান্ত ভাগ দু-ভাগে ভাগ হয়ে যায়। বাবুই পাখিকে অপূর্ব বোনার কৌশলের জন্য দর্জিপাখি বলা হয়। বাংলায় বাবুই (Ploceus philippinus), হিন্দীতে বায়া বলে। প্রজনন ঋতু ছাড়া এদের স্ত্রী ও পুরুষ চেনার কোন উপায় নেই। প্রজনন ঋতুতে এরা চি-ই-ই-ই করে ডাকে এদের বাসাগুলি দেখতে অনেকটা বকযন্ত্রের মতো। এরা একেবারে 2-4টি ডিম পাড়ে। ডিমের রঙ পরিষ্কার সাদা

*পো: ও গ্রাম-তারাগুনিয়া ভায়া, বাদুড়িয়া, 24 পরগণা

আরও দু-রকমের বাবুই কোনও কোনও অঞ্চলে দেখা যায়, যেমন—স্ট্রিয়াটেড (P. manyan) এবং ব্ল্যাক থ্রোটেড উইভার বার্ড (P. bengalensis)। আর যে পাখিকে আমরা সব সময়ই দেখছি সেটি চড়াই বা হাউস স্প্যারো (Passer domesticus), হিন্দীতে গোরাইয়া বলে। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে এই পাখি দেখা যায়। স্ত্রীচড়াই-এর দেহের রঙ বাদামী এবং পিঠের দিকটা কালচে এবং ফিকে হলুদ দাগ আছে।

সাপের আত্মরক্ষা

বিকাশকান্তি সাহা*

জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি প্রত্যেক প্রাণীকেই বাঁচতে হয় জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম করে। জীবনসংগ্রামে জয়ী প্রাণীরাই অস্তিত্ব বজায় রেখে চলে এই দুনিয়ায়। পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীই নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কিছু না কিছু আত্মরক্ষামূলক অবলম্বন গ্রহণ করে। 'সাপ' নামক যে প্রাণীটার কথা বলতে চলেছি তার কিন্তু শত্রুর অভাব নেই। এদের একনম্বর শত্রু হলো মানুষ। এছাড়া নেউল, বাজপাখি (felcon), গরুড় পাখি, পিঁপড়ে, ময়ূর, জলচরপাখি, ভালুক ইত্যাদিও এদের চরম শত্রু (বলা বাহুল্য অনেক ক্ষেত্রে সাপও সাপের শত্রু হিসেবে দেখা দেয়)।

সাপের দেহ সরু ও লম্বা হয়ে থাকে। এর ফলে এরা ইঁট, বড় ঘাস, গর্ত ইত্যাদিতে সহজেই নিজেদেরকে লুকোতে পারে। সাপের আঁশ (horny scales) এদের রক্ষা করে ইট, পাথর, কাঁটা ইত্যাদি থেকে গা বাঁচাতে।

সাপেদের ঘ্রাণানুভূতি বেশ তীব্র। এটাও কিন্তু এক বড় রকমের অভিযোজন বলা যেতে পারে। মুখের মধ্যে অবস্থিত জ্যাকবসনস্ অরগ্যান (Jacobson's organ) নামক এক প্রকারের অঙ্গ দিয়ে এরা কারও উপস্থিতি সহজেই অনুভব করতে সক্ষম হয়।

প্রকৃতিগত ভিত্তিতে সাপ দু'রকমের—এক—বিষধর সাপ, দুই—বিষহীন সাপ।

বিষধর সাপেদের আত্মরক্ষার প্রধান অবলম্বন বিষদাঁত (fang) ও বিষথলি (poison gland)। বেগতিক দেখলেই এরা শত্রুকে কামড় দেয়। সাপ কিন্তু এমনিতে নিরীহ প্রাণী। মানুষের ধারণা আছে সাপ নাকি তেড়ে যায়। এ ধারণা নিতান্তই ভুল। একে আক্রমণ করলে ভয়ে শত্রুকে কামড় দেয়। বিভিন্ন বিষধর সাপের বিষ অন্ততঃ মানবদেহে বিভিন্ন রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। বিষধর সাপের উদাহরণ হিসেবে কেউটে (Cobra), শিয়রচাঁদা (Common krait)। শাঁখামুটি (Banded krait), শঙ্খচূড়, (King cobra), সমুদ্র সাপ (Sea snakes) ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় রিঙ্গ্যালস্ কোবরা (Ringhals cobra) নামে একপ্রকারের বিষধর সাপ আছে যাদের স্পিটিং কোবরাও (Spitting cobra) বলা হয়ে থাকে। এরা শত্রুকে দেখলে বিষ ছিটিয়ে থাকে। এদের বিষদাঁতেরও সেইরকম অভিযোজন হয়ে থাকে। এরা শত্রুর চোখ লক্ষ্য করে বিষ ছোঁড়ে। পরীক্ষামূলক ভাবে দেখা গেছে যে 6 ফুট লম্বা রিঙ্গ্যালস্ কোবরা প্রায় 12 ফুট পর্যন্ত বিষ ছোঁটাতে পারে। শত্রুর চোখে বিষ পড়ার ফলে জ্বালা অনুভূত হয় এবং শত্রু অস্থায়ীভাবে অন্ধ হয়ে যায়। এই সুযোগে রিঙ্গ্যালস্ পালাতে সক্ষম হয়।

উত্তর আমেরিকায় র‍্যাটল্ স্নেক (Rattle snake) নামক একপ্রকার সাপ আছে। এরা ভয়ানক বিষধর সাপ এবং বিষদাঁতকে আত্মরক্ষামূলক অবলম্বন হিসেব ব্যবহার করে। তবে এদের লেজের দিকটার সুন্দর আকৃতিগত পরিবর্তন হয়। একে র‍্যাটল (rattle) বলে। যখন এরা চলাফেরা করে তখন এই র‍্যাটলের ঝুমঝুম আওয়াজ হয়। এইজন্য একে ঝুমঝুমি সাপও বলা হয়। আওয়াজ শুনেই প্রাণীরা পিছিয়ে আসে। যখন এরা রেগে যায়—র‍্যাট্‌ল্ খুব জোরে নড়তে থাকে এবং তীব্র আওয়াজ হতে থাকে।

সমুদ্রে যে সমস্ত সাপ আছে—তাদের বেশীর ভাগই বিষধর। এদের লেজের দিকটা হয় চ্যাপ্টা, ফলে সাঁতার দিতে সুবিধা হয়। সমুদ্রের জল লবণাক্ত হয়ে থাকে। এই লবণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এদের মুখে একপ্রকার গ্রন্থি থাকে—যার দ্বারা অতিরিক্ত গৃহীত লবণ দূরীভূত হয়ে থাকে। সমুদ্রের সাপেদের দক্ষিণ ফুসফুসের কিছু অংশ রক্তজালিকা দ্বারা ঘনাবৃত থাকে। এটি অত্যধিক অক্সিজেন শোষণে সহায়তা করে। পরীক্ষামূলক ভাবে দেখা গেছে যে এই সাপ একটানা 2 থেকে 6 ঘণ্টা জলের তলায় থাকতে পারে।

কিছু কিছু সাপ আছে খুব জোরে দৌড়াতে পারে। প্রতি ঘণ্টায় 4 মাইল অতিক্রম করে এমন সাপও আছে। Meiuert Jhagen নামে এক বিজ্ঞানী ব্ল্যাক মাম্বা (Black mamba) নামে এক ভয়ানক বিষধর সাপকে

* স্টুডেন্টস হোস্টেল, রুম নং 12, 54, হরি ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006

লক্ষ্য করে দেখেছিলেন যে এরা ঘণ্টায় 7 মাইল পথ অতিক্রম করে।

বিষহীন সাপেদের বিষদাঁত না থাকায় এদের আত্মরক্ষামূলক অবলম্বন একটু অন্যরকম হয়। লাউডগা (Green whip snake) নিতান্তই বিষহীন। এরা গাছের বাসিন্দা। যেহেতু এরা পুরো জীবনকালই গাছে অতিক্রম করে সেহেতু এদের গায়ের রং-ও হয়ে থাকে ঘন সবুজ। ফলে এরা সহজেই শত্রুর চোখ এড়িয়ে যায়।

বালিবোড়া (Red sand boa) নামে একপ্রকারের নির্বিষ সাপ আছে। নাম শুনেই বুঝতে পারি এরা বালির বাসিন্দা। এদের গায়ের রঙও একেবারে বালির মতো, ফলে সচরাচর শত্রুর চোখ এড়িয়ে যায়। দেহের রঙের সঙ্গে বাসস্থানের অনুকৃতি ছাড়াও এরা আর এক রকমভাবে আত্মরক্ষা করে থাকে। এদের লেজের দিকটা হয়ে থাকে ভোঁতা। এইজন্য এদের অনেকে দু-মুখো সাপ বলে থাকে (বলাবাহুল্য এদের মুখ একটাই)। প্রাণীরা লেজের দিকটাকে মুখ ভেবে স্বভাবতঃই একটু পিছিয়ে আসে। এই সুযোগে বালি বোড়াও ধোঁকা দিয়ে যায় পালিয়ে।

দাঁড়াস (Rat snake) নির্বিষ হলেও ভয়ঙ্কর। এরা খুব সুন্দর দৌড়াতে পারে। ভয় পেলে এরা সহজেই গাছে উঠতেও সক্ষম হয়। তবে এদের তেজই প্রাণীদের পিছিয়ে দেয়।

দক্ষিণ আমেরিকায় ফলস কোবরা (False cobra) নামে এক রকম বিষহীন সাপ আছে। এদের যখন কেউ আক্রমণ করে তখন এরা সত্যিকারের কোবরার মতো এদের ফণা ছড়িয়ে থাকে। প্রাণীরা ভয়ে কোবরা ভেবে পিছিয়ে আসে। কিন্তু স্রেফ অনুকৃতি ছাড়া কিছুই নয়।

তুতুর সাপ (Russell's sand boa) নামে এক ধরণের বিষহীন সাপ আছে। এদের গায়ের রং পুরোপুরিই চন্দ্রবোড়ার মতো। গায়ের রঙের এই অনুকৃতির ফলে অনেকেই বিষধর চন্দ্রবোড়া ভেবে পিছিয়ে আসে।

অজগর (Python) এমনিতে নির্বিষ সাপ। এদের দেহ বিশাল এবং এরা একটু নিরীহ গোষ্ঠীর। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে এবং শত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্য এরা নানা রকমের কৌশল অবলম্বন করে থাকে। কিছু কিছু অজগর আছে যারা সুন্দরভাবে কুণ্ডলী পাকিয়ে স্রেফ কলসীর মতো আকৃতি গ্রহণ করে। দূর থেকে দেখলে মোটেই এদের সাপ বলে মনে হয় না। আবার কিছু অজগর আছে যাদের গায়ের রং সবুজ এবং মেরুদণ্ড বরাবর একটু সাদা ছোপ ছোপ দাগ থাকে। এরা গাছের ডালে কুণ্ডলী পাকিয়ে মুখটা উপরের দিকে করে রাখে। সহজে তো এদের চেনাই যায় না—আবার চিনতে পারলেও ভয়ে পিছিয়ে আসতে হয়। সুন্দরবন অঞ্চলের কাঠুরে ও মধুসংগ্রহকারীদের মুখে শুনেছি অজগর জঙ্গলে এমনভাবে লম্বালম্বি শুয়ে থাকে—দেখে বোঝাই যায় না এটা সাপ, না কাঠের গুঁড়ি।

সংখ্যা-ছক

প্রজেশকুমার মল্লিক*

শব্দ-ছকের মত দেখতে হলেও এটা কোন শব্দ-ছক বা তার সমাধান নয়। এটাকে বলা যেতে পারে 'সংখ্যা-ছক'। নীচের সূত্রগুলো মেনে, যে যে ঘরে অক্ষর আছে, তার প্রত্যেক ঘরে মাত্র একটি করে অঙ্ক বসাতে হবে।

সূত্রাবলী

সাধারণ

1. কোন ঘরেই শূন্য (0) বসানো যাবে না।

পাশাপাশি

2. 'সমাধান'—এর প্রত্যেকটা অঙ্কই পূর্ববর্তী অঙ্ক থেকে দুই বেশী।
3. 'নর'—'মান' (সূত্র-8) এর অর্ধেক।
4. 'কবগ'--67 (সাতষট্টি) দ্বারা বিভাজ্য।

স	মা	ধা	ন	▨
মী	ন	র	▨	ব
ক	▨	ক	ব	র্গ
র	ত	▨	ভা	গ
ণ	ব	ম	ভু	জ

5. 'রত'—23 (তেইশ) দ্বারা বিভাজ্য।

*7, রামস্বামী স্ট্রীট, মুনি রেড্ডি পল্লীম, ব্যাঙ্গালোর 560006

6. 'ভাগ'—একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা।
7. 'নবমভুজ'—11 (এগারো) দ্বারা বিভাজ্য, একটি জোড় সংখ্যা।

উপর থেকে নীচে

8. 'সমীকরণ'—একটি পূর্ণ ঘন সংখ্যা।
9. 'মান'—সূত্র-3 ('নয়') এর দ্বিগুণ।
10. 'ধারক'—59 (উনষাট) দ্বারা বিভাজ্য।
11. 'বর্গগজ'—একটি পূর্ণঘন সংখ্যা।
12. 'তব'—একটি মৌলিক সংখ্যা।
13. 'বভাভু'—একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা।

[সঠিক সমাধান পাঠাতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।]

ভেবে উত্তর দাও

সুশান্তকুমার লক্ষণ*

(নিম্নের প্রশ্নগুলির একাধিক উত্তর দেওয়া আছে সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত কর।)

1. একটি লোক একটি লিফ্‌টে করে উঠেছে, হঠাৎ লিফ্‌টের দড়ি ছিঁড়ে গেলে লোকটি—
   (a) নিজেকে একেবারে ওজনশূন্য মনে করবে।
   (b) নিজেকে কিছুটা হালকা মনে করবে।
   (c) নিজেকে ভারী মনে করবে।

2. তারকা চিহ্নিত স্থানে উপযুক্ত সংখ্যা বসাও—
   * : 15 = 20 : 25
   (a) 10, (b) 9, (c) 12, (d) 20, (e) 18.

3. গরুর পাকস্থলীর তৃতীয় প্রকোষ্ঠটির নাম হলো—
   (a) ওমাসাম, (b) গিজার্ড, (c) রেটিকুলাম, (d) অবোমাসাম।

4. শামুক (achatina)-এর ভারসাম্য রক্ষাকারী অঙ্গের নাম হলো
   (a) স্টেটোলিথ, (b) স্ট্যাটোসিস্ট, (c) প্যাটোজিয়া।

5. ইক্ষুর রসে চিনির শতকরা পরিমাণ বের করা হয় এইরূপ যন্ত্রের নাম হলো—
   (a) স্ফিগমোম্যানোমিটার, (b) রিফ্রাক্টোমিটার, (c) অকসানোমিটার, (d) হাইগ্রোমিটার।

6. একটি বেলুনে বায়ুভর্তি করে ওজন করা হলো—
   (a) এ দুটি ওজন পরস্পরের সমান হবে।
   (b) পরের ওজন পূর্বাপেক্ষা ওজন অপেক্ষা বেশী হবে।
   (c) পরের ওজন পূর্বাপেক্ষা ওজন অপেক্ষা কম হবে।

7. ক্লোরোফিল 'A'-এর রাসায়নিক সংকেত হলো—
   (a) $C_{50}H_{72}O_4N_5Mg$,
   (b) $C_{55}H_{70}O_6N_4Mg$
   (c) $C_{52}H_{72}O_4N_6Mg$
   (d) $C_{55}H_{72}O_5N_4Mg$

8. মানুষের দুগ্ধক্ষরণের সাহায্যকারী হর্মোন হলো—
   (a) ভাসোপ্রেসিন, (b) মেলাটোনিন, (c) প্রোল্যাক্টিন, (d) এস্ট্রোজেন।

9. ডিম না পেড়ে সরাসরি বাচ্চা হয় এইরূপ মাছের নাম হলো—
   (a) ক্যাটমাছ, (b) সাইফন, (c) সাইমোগ্যাস্টার, (d) রজতকার্প।

[সঠিক উত্তর পাঠাতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে]

*পোঃ+গ্রাম—কেঞ্জেকুড়া, জেলা—বাঁকুড়া

ফেব্রুয়ারী '83 সংখ্যায় প্রকাশিত 'ভেবে উত্তর দাও'-র উত্তর

1. হাইড্রোফোন, 2. হাইগ্রোমিটার, 3 সেক্সট্যান্ট, 4. প্রোটিন, 5. স্কার্ভি, 6. ভিটামিন-'এ' এবং 'ডি', 7. আকুপাংচার, 8. টাইফয়েডে, 9. রক্তের, 10 প্যানক্রিয়াস, 11. বাদুর, 12. ক্লাভিকল।

ফেব্রুয়ারী (1983) 'ভেবে উত্তর দাও'-র সবগুলির সঠিক উত্তর পাঠিয়েছেন :

1. গোপা দাশগুপ্ত, বর্ধমান, 2. দিব্যেন্দু পানিগ্রাহী, কলিকাতা-39,
3. অপূর্ব কুণ্ডু, হুগলী, 4. শুক্লা ঘোষ, 24 পরগণা।

একটা বাদে সবগুলির সঠিক উত্তর পাঠিয়েছেন :—

1. সুব্রত কোলে, বর্ধমান, 2. সোমেন মুখোপাধ্যায়, বেলঘরিয়া

দুটি বাদে সবগুলির সঠিক উত্তর পাঠিয়েছে :—

1. দুলাল গাঙ্গুলী, হাওড়া, উৎপল কুমার কুণ্ডু, হাওড়া

বৈজ্ঞানিক মডেল

গোবর থেকে বিদ্যুৎ

ভক্তি পাল*

এখানে খুব সস্তায় বিদ্যুৎ তৈরির একটা উপায় দেখানো

গোবর-বৈদ্যুতিক কোষ
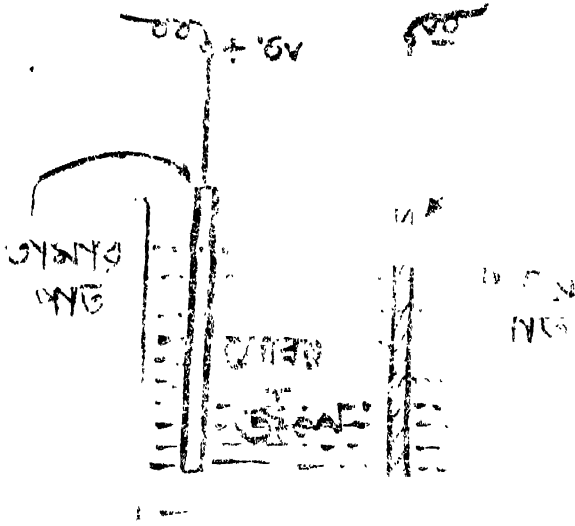
হয়েছে। এতে একটি কাঁচ বা পালিথিনের জার বা হরলিক্সের একটা শিশিতে কিছুটা গোবরকে জলে গুলে নেওয়া হয় এবং ঐ শিশি বা জারে একটি তামা ও দস্তার পাত ডুবিয়ে দিলে তামার পাত ও দস্তার পাতের মধ্যে 0·6 ভোল্ট বিভব উৎপন্ন হবে। এই রকম যত কোষ শ্রেণী সমবায়ে লাগানো যাবে বিভব পার্থক্যও তত বেশী হবে। এই কোষের ক্ষমতা কম তাই এই দিয়ে রেডিও ইত্যাদি চালানো যায়। কোষের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পাত্রের আয়তন ও পাতগুলির ক্ষেত্রফল বৃদ্ধির প্রয়োজন। প্রতি 4-5 দিন অন্তর গোবর ফেলে দিয়ে নতুন গোবর দিতে হবে। পরিত্যক্ত গোবর সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ফলে দেখা যাচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদনে কোন খরচই প্রায় নেই এবং যাদের বাড়ীতে গরু আছে তারা খুব সহজেই এটা তৈরি করে তাদের ছোটখাটো বিদ্যুৎ-চাহিদা মেটাতে পারে। চিত্রে ব্যবস্থাটা দেখানো হয়েছে।

*জনাই ট্রেনিং হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, পোঃ-জনাই, জেঃ-হুগলী।

বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের গত বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে (21.1.83) গৃহীত প্রস্তাবানুযায়ী আগামী 27শে জুন (1983) বিকাল 5টায় 'সত্যেন্দ্র ভবনে' (পি-23, রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700006) বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের বিশেষ সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। সভ্যদের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

তাং 6.5.83

সুকুমার গুপ্ত
কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

আলোচ্য বিষয়:

1. 1982 খৃস্টাব্দের পরীক্ষিত হিসাব-বিবরণী অনুমোদন
2. 1983 খৃস্টাব্দের ব্যয়বরাদ্দ অনুমোদন
3. বিধি-নিয়মাবলী সংস্কার

প্রশ্ন :

1. কয়লা দিয়ে কি মোটর গাড়ি চালানো যায় ?

অশোক মেহুয়া, মধুরপুর, হুগলী

2. কচুরিপানা নিধনে মথের ভূমিকা কি ?

পার্থ দে, সিটি কলেজ, কলিকাতা-9

উত্তর :

কয়লা দিয়ে রেল-ইঞ্জিন চালানো পুরানো ব্যাপার। কিন্তু অনেক ইঞ্জিনই কয়লা দিয়ে চলে না। তবে কয়লা দিয়ে মোটর গাড়ি চালানো বিষয়ে বিভিন্ন দেশে বহু বিজ্ঞানী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছেন। সম্প্রতি আমেরিকার মোটরস্ কোম্পানী একটা সিদ্ধান্তে এসেছেন। তাঁদের মতে কয়লা চালিত মোটর গাড়ি তৈরি সম্ভব। তাঁরা দেখেছেন কয়লাকে খুব গুঁড়ো করে যে পাউডার হবে তা ইঞ্জিনের সাহায্যে উচ্চ বাষ্পীয় চাপে ভালভাবে জ্বালানো যাবে। এ থেকে যে শক্তি উৎপন্ন হবে তা দিয়ে মোটর গাড়ি চালানো সম্ভব হবে। এই উদ্দেশ্যে ঐ কোম্পানী দুটি মডেলও তৈরি করেছেন। এই মডেলের ইঞ্জিন সাধারণ ইঞ্জিন থেকে একটু আলাদা। আবার কয়লার পাউডার নিয়ে আছে সমস্যা। যখন এই গাড়ির চাহিদা বাড়বে তখন পাউডারের দাম অপরিশোধিত তেলের থেকে প্রায় 3/4 গুণ বেশী পড়বে। তবুও যে সব দেশে প্রচুর কয়লা আছে এবং তেলের যথেষ্ট অভাব, সে সব দেশে জ্বালানী সমস্যার কিছুটা সুরাহা হবে।

2. কচুরিপানা কম্পোস্ট সার অথবা গরু ও মহিষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে কাগজশিল্প, বায়োগ্যাস ইত্যাদিতে এর ব্যবহার হচ্ছে। তবে কচুরিপানা উপকারের থেকে অপকারই বেশী করে। কচুরিপানার বংশবৃদ্ধি হয় খুব দ্রুত হারে। পুকুর, ঝিল কচুরিপানায় ভরে যায় খুব তাড়াতাড়ি। ফলে জলে আলো-বাতাস লাগতে পারে না। মাছ ও অন্য জলজ প্রাণী বা উদ্ভিদ অক্সিজেনের অভাবে মারা যায়। এখন নদীতেও কচুরিপানা জন্মে নৌকা চলাচলের অসুবিধা ঘটাচ্ছে। ভারত, শ্রীলঙ্কা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু অংশ, পূর্ব আফ্রিকা, উত্তর অস্ট্রেলিয়া, ফিজি, সুদান প্রভৃতি দেশ কচুরিপানায় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

কচুরিপানার বংশবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কমনওয়েলথের বিজ্ঞান পরিষদ অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একটি উপায় আবিষ্কার করেছেন। কাঁটাগাছ ও ক্যাকটাস এর বংশবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করার সময় তাঁরা এমন এক প্রকার মার্কিন মথের সন্ধান পেয়েছেন যা কোন ক্যাকটাসে বাসা বাঁধলে শেষ পর্যন্ত তার রস শুষে নেয় ও ক্যাকটাস মারা যায়। এছাড়াও আরো কয়েক প্রকার মথের সন্ধান তাঁরা পেয়েছেন যাঁরা এ কাজ করতে সক্ষম। কিছু কিছু পোকামাকড়ও এমনিভাবে কচুরিপানা নিধনে সক্ষম। তাই এসব জাতের মথ জলে ছেড়ে দিলে, কচুরিপানা নিধন সমস্যার কিছুটা সমাধান হবে।

[উত্তর দি]

একটু অন্য কথা

অবুঝ

এক্স-রে এখন আমাদের খুবই পরিচিত। এই রশ্মির আবিষ্কারক উইলিয়াম কোনার্ড রাণ্টজেন (1845-1923)। এই অভিনব আবিষ্কারের কথাটি জন সমক্ষে প্রচারের আগে রাণ্টজেন সাত সপ্তাহ দিন-রাত গবেষণা কক্ষে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে তাঁর কাজের সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন। 1896 খৃস্টাব্দে জানুয়ারী মাসে অবসরপ্রাপ্ত তাঁরই এক সহকর্মীর (79 বছরের বৃদ্ধ) হাতের ছবি তুলে রাণ্টজেন সাধারণের সামনে বিষয়টি তুলে ধরেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সারা বিশ্বে এক্স-রে-র জনকল্যাণমূলক প্রয়োগ ছড়িয়ে পড়ে। ঐ বৎসরই ফেব্রুয়ারী মাসে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিতযশা ডাক্তার মাইকেল পুপিন নিউইয়র্কের এক অ্যাটর্নির হাতে বিদ্ধ 40টি গুলি অপারেশন করে বার করার আগে এক্স-রে-র সাহায্যে ছবি তুলে নেন। এই অভূতপূর্ব আবিষ্কারের জন্য পদার্থবিদ্যায় প্রথম নোবেল পুরস্কার বিজয়ী হিসাবে নাম ঘোষিত হয় রাণ্টজেনের। রাণ্টজেন তাঁর কাজের বিনিময়ে এই পুরস্কারের অর্থ গ্রহণে অসম্মতি জানান। মহৎ পুরস্কারের উপর এ এক অভিনব মহত্ত্ব।

ভারী বোসন W কণার আবিষ্কার

বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন মেনে চলে এরকম কণাগুলিকে বলা হয় বোসন। ফোটন পাইমেসন বোসন শ্রেণীর। বোসন কণার স্পিন দু-গুণ করলে সমরাশি হয়। ফোটন ও পাইমেসন যথাক্রমে তড়িচ্চুম্বকীয় বল ও নিউক্লীয় বলের বিনিময় কণা। তত্ত্ববিজ্ঞানীরা বীটাবিকিরণজনিত ক্ষীণবলের বিনিময় কণার নামকরণ করেছিলেন W। এই কণা পজিটিভ বা নেগেটিভ হতে পারে অথবা উদাসীন—যার নামকরণ হয়েছে Z। সালাম ভিনবার্গ তাঁদের ক্ষেত্রতত্ত্বের গাণিতিক বিশ্লেষণে দেখিয়েছিলেন যে বিশ্বসৃষ্টির পর কোন এক সময় তড়িচ্চুম্বকীয় ও ক্ষীণবল ছিল এক। সালাম তার নামকরণ করেছেন ইলেকট্রোউইক বল। বিশ্বের এক বিশেষ তাপমাত্রায় ক্ষীণবল ও তড়িচ্চুম্বকীয় বলের মত দূরত্বের বর্গের বিপরীত অনুপাত নিয়ম মেনে চলত। এই দুটি বলের একীকরণে W কণা ছিল অপরিহার্য—যা এতদিন পরীক্ষাগারে পাওয়া যায় নি। কারণ তত্ত্বতঃ W কণার ভর হবে প্রোটনের প্রায় 80 গুণ। তাই খুব উচ্চশক্তি কণাত্বরকের প্রয়োজন ছিল। এই উদ্দেশ্যে CERN-এ প্রোটন অ্যান্টিপ্রোটন সংঘাতকারী একটি কণাত্বরক তৈরি হয়েছে। এই যন্ত্রের দুটি বিজ্ঞানীর দল UA 1 ও UA2 1983, 20 ও 21 জানুয়ারী এই যন্ত্রে W কণা আবিষ্কারের বিশদ বিবরণ দেন। W^+ কণা থেকে পাওয়া গেছে পজিট্রন ও নিউট্রিনো, W^- থেকে ইলেকট্রন ও নিউট্রিনো। এই উপজাত ইলেকট্রন বা পজিট্রন দিয়ে W কণা চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। দুটি পরীক্ষার ফলই W কণার নিশ্চিত অস্তিত্ব প্রমাণ করেছে। তার ভরও তত্ত্বের সঙ্গে প্রায় মিলে গেছে। 540 Gev এই কণাত্বরকের সাহায্যে W কণা অন্য কোন উপায়ে ক্ষয় পায় কিনা সন্ধান করা হচ্ছে। সাইমন ভ্যান ডারমীর কর্তৃক উদ্ভাবিত 540 Gev এই কণাত্বরক অ্যান্টিপ্রোটন ত্বরণে সক্ষম। Z উদাসীন কণা যথেষ্ট বিরল হলেও তার সন্ধান অচিরেই পাওয়া যাবে আশা করা হচ্ছে। শীঘ্রই আবার এই যন্ত্রে বিজ্ঞানীরা W কণার নূতন নূতন তথ্য অনুসন্ধান করবেন। W কণা আবিষ্কারের ফলে ইলেকট্রোউইক বলের তত্ত্ব প্রমাণিত হলো।

শুভংকর

পরিষদ সংবাদ

গত 3রা মার্চ পরিষদের 'সত্যেন্দ্র ভবনে' 'চক্ষুদান কি ও কেন' শীর্ষক জনপ্রিয় বক্তৃতা দেন ডাঃ শ্যামাপদ রায়চৌধুরী। অন্ধত্বের কারণ, চক্ষুদানের তাৎপর্য, চক্ষুদানের নিয়ম, অন্ধজনের প্রতি আমাদের দায়িত্ব প্রভৃতি বিষয়ে ডাঃ রায়চৌধুরীর সহজ, সরল ও সাবলীল উপস্থাপনা প্রতিটি শ্রোতাকে শুধু বিচলিত করে নি, চক্ষুদান সংকল্পে করেছে উদ্বুদ্ধ। এ প্রসঙ্গে বধিরত্ব দূরীকরণের জন্য কানের অস্থিদানের কথাও তিনি উল্লেখ করেন। এই আলোচনা সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ডাঃ গুণধর বর্মন।

কর্ণাটক রাজ্য বিজ্ঞান পরিষদের সহ-সভাপতি ও বাল-বিজ্ঞান পত্রিকার প্রধান সম্পাদক শ্রী জে. আর. লক্ষ্মণ রাও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে গণমুখী বিজ্ঞান আন্দোলনের অবস্থা, অগ্রগতি ও পটভূমি সম্বন্ধে অবহিত হবার জন্য গত ৫ই মার্চ বিজ্ঞান পরিষদের 'সত্যেন্দ্র ভবনে' পরিষদের ও পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান-কর্মী সংস্থার কিছু সদস্যের সঙ্গে ঘরোয়া আলোচনা করেন। শ্রী রাও বলেন কর্ণাটক রাজ্য সরকার রাজ্যের জনসাধারণকে বিজ্ঞানমুখী করতে খুব উৎসাহী এবং কেন্দ্রীয় সরকার থেকে তাঁরা প্রায় তিন লক্ষ টাকা সাহায্য পান। কর্ণাটক রাজ্য বিজ্ঞান পরিষদের প্রায় 140টি শাখা আছে এবং 60টি শাখা খুবই সক্রিয়। দিন দিন কর্ণাটকে বিজ্ঞান আন্দোলন বেশ জোরদার হয়ে উঠছে।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006 থেকে প্রকাশিত
এবং গুপ্তপ্রেশ, 37/7, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-700 009 হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

আবেদন

1948 সাল থেকে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা বিষয়ে পরিকল্পিত ধ্যান ধারণা পরিষদ পালন করে আসছে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রকাশনের মাধ্যমে। ইতিমধ্যে পরিষদ কিছু অমূল্য রচনা বাংলাভাষায় প্রকাশ করেছে। বর্তমান পত্রিকা প্রকাশনা ছাড়াও পরিষদ বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতার বিকাশ ঘটে। গ্রাম বাংলার পল্লীতে, আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে ও শহরের বস্তিতে, যেখানে বেশীর ভাগ মানুষ জ্ঞানের আলো থেকে এখনও বঞ্চিত, তাদের কাছে বিজ্ঞানের মঙ্গলময় রূপ তুলে ধরতে পরিষদ বদ্ধপরিকর। এইসব বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মসূচীর রূপায়নে অর্থের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অথচ পরিষদের দারুণ অর্থাভাব। তাই পরিষদ সরকার, বেসরকারী সংস্থা, ব্যবসায়ী ও সহৃদয় ব্যক্তির কাছে অর্থসাহায্যের আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছে। সাধারণ মানুষের জন্য তৈরী আচার্য বসুর পরিষদ যে কোনও সামান্য দানও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করে অবহেলিত মানুষের স্বার্থে ব্যয় করবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে পরিষদে প্রদত্ত সর্বপ্রকার দান আয়করমুক্ত।

কর্মসূচী

1. সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা সৃষ্টি করা এবং বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তোলা।
2. 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকাকে সাধারণের নিকট আরও আকর্ষনীয় করে তোলা।
3. পরিষদের মাধ্যমে গ্রামবাংলার বিজ্ঞান ক্লাবগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা এবং তাদের বিজ্ঞান ভিত্তিক জনহিতকর কাজে উৎসাহিত করা।
4. প্রতি বছরে পশ্চিম বাংলায় অন্ততঃ একবার বিজ্ঞান সম্মেলনের ব্যবস্থা করা।
5. গ্রামবাংলার বিভিন্ন মেলায় বিজ্ঞান ক্লাবগুলিকে নিয়ে পোস্টার প্রদর্শনী, বিজ্ঞানভিত্তিক সিনেমা, আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞান, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করা।
6. বছরের শেষে বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা।
7. হাতে-কলমে কারীগরী বিদ্যা শিখিয়ে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রী ও নাগরিকদের স্বনির্ভরশীল করা। ব্যয়ভার বহনের জন্য সামান্য অর্থের বিনিময়ে টি. ভি. টেপরেকর্ডার, রেকর্ড প্লেয়ার, ট্রানজিস্টার এমারজেন্সি বৈদ্যুতিক আলো, ফটোগ্রাফী বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া।
8. মাটি পরীক্ষার কাজে শিক্ষা দিয়ে গ্রামের বিজ্ঞান ক্লাবগুলিকে সাধারণ চাষীদের সাহায্য করতে উৎসাহিত করা।
9. সাধারণ মানুষের জন্য বিজ্ঞান প্রবন্ধ থেকে মৌলিক গবেষনাপত্র পর্যন্ত বাংলা ভাষায় প্রকাশ এবং জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বই ও বিজ্ঞান সাধক চরিতমালা প্রকাশ।
10. যোগব্যায়াম ও তার গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন।
11. পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারটি সুসমৃদ্ধ করে গড়ে তোলা।
12. পরিষদ ভবনে 'বিজ্ঞান সংগ্রহশালা' স্থাপন করা।
13. নির্বিচারে যথেচ্ছ গাছপালা ও বনজঙ্গল ধ্বংসের ফলে পরিবেশ দূষণ ও আবহাওয়ার মারাত্মক পরিবর্তনের ভয়াবহতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সজাগ করা।
14. নির্বিচারে বন্যপ্রাণী ধ্বংসের দরুণ বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যের বিঘ্ন ঘটার বিপদ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা।
15. যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করা।
16. শহর ও গ্রামের প্রতিটি স্কুল, কলেজ ও গ্রন্থাগারে পরিষদের মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার গ্রাহকীকরণের মাধ্যমে পরিষদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচার।

সুকুমার গুপ্ত
কর্মসচিব

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

মে, 1983

36তম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা

বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের অনুশীলন করে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও সমাজকে বিজ্ঞান-সচেতন করা এবং সমাজের কল্যাণকল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করা পরিষদের উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন লেখকদের স্বাধীন মতামত বা মৌলিক সিদ্ধান্তসমূহ পরিষদের বা সম্পাদকমণ্ডলীর চিন্তার প্রতিফলন হিসাবে সর্বক্ষেত্রে বিবেচ্য নয়।

বিষয় সূচী

প্রচ্ছদ পরিচিতি : গ্রীষ্মমণ্ডলে বনভোজন। এই বনভোজনের সংস্থান করে হাতী। দক্ষিণ-পূর্ব ভারত ও শ্রীলঙ্কার নীচু অঞ্চলের বনে হাতী উদর পূরণের জন্য গাছের ডালপালা ভাঙে, তখন মাটিতে ঝরে পড়ে কিছু কিছু টারমাইট[1]। টারমাইট পরবাসী ব্যাক্টেরিয়া ও প্রোটোজোয়া সেলুলোজকে সুগারে রূপান্তরিত করে, যা খাবার লোভে বহু পতঙ্গ ভিড় করে। পতঙ্গের ঝাঁকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভালুক[2] ও প্যাঙ্গোলিন[3]। হাতীর মলের রস হরাক[4] ও প্রজাপতির[5] প্রিয়খাদ্য। ঐ মলে গোবরে পোকা ডিম পাড়ে, বেরোয় শূককীট, জন্মায় শতশত শিশু গোবরে পোকা[6], বন-মোরগ ও মুরগী[7] এবং বেজীর[8] ভোজে লাগে এইসব গোবরে পোকা। টারমাইট মলের সেলুলোজ ও মাটির ব্যাক্টেরিয়াকে আক্রমণ করে উদ্ভিদের পুষ্টিতে আনে প্রাচুর্য। হাতীর ভুরিভোজেও পড়ে না অভাব।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : 30·00 টাকা

প্রতি সংখ্যা : 2·50 টাকা

যোগাযোগের ঠিকানা :

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা-700006
☎ : 55-0660

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষট্‌ত্রিংশত্তম বর্ষ মে, 1983 পঞ্চম সংখ্যা

ধর্মীয় মেলা—না জাতীয় লজ্জা

রতনমোহন খাঁ

ধর্ম বলতে বলা হয় যাকে ধারণ করে সমষ্টিগতভাবে বাঁচা যায়। এক সময় ছিল যখন সমাজকে কলুষতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য, নিয়ম-শৃঙ্খলে বাঁধার জন্য কতিপয় মানুষ প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যের নানা স্থানে স্থানীয় সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী ধর্ম পালনের আচার-বিধি ও অনুশাসন রচনা করেছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই মহৎ ছিল, কিন্তু ধারণ করে বাঁচতে হবে এটিই হলো পরবর্তীকালে ধর্মীয় যাজক, পীর, পয়গম্বর, পুরোহিতসহ এক শ্রেণীর লোকের কাছে বিশেষ অর্থবহ। মানুষের অজ্ঞানতা এই ষড়যন্ত্রকে কার্যকরী করতে, ঐ শ্রেণীর মানুষগুলোর হৃদয়ের অন্তর্নিহিত বাসনা ও কামনাকে চরিতার্থ করতে সাহায্য করল। দেশের অধিকাংশ সম্পদই হলো ওদের করায়ত্ত। তর্কের মধ্যে গণশিক্ষার মধ্যে সত্য প্রকাশ হতে পারে, তাই কৌশলে গণশিক্ষাকে করা হলো পঙ্গু আর প্রচার করা হলো বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। চালু হতে লাগল ধর্মের নামে নানা কুসংস্কার আর সাধারণের বিশ্বাস অর্জনের জন্য নানা ভেক ও ফিকির। বিপদে মানুষ যখন অসহায় হয়ে পড়ে, যখন কোন নিশানা খুঁজে পায় না তখনই ধর্মের কলকাঠি নড়ে উঠে, ভেক ও ফিকিরধারীদের ফাঁদে দেয় পা, শোষণ ও অপকর্মের বেহস্ত হয় রচিত।

শিক্ষার আলোকে, বিজ্ঞানের প্রয়োগ ও প্রচারে ইউরোপ ও আমেরিকা জোয়ান অব আর্কের যুগকে অনেক পিছনে ফেলে চলে এসেছে। আজ আর ডাইনী বলে অন্ততঃ গণমুক্তির বার্তাবাহককে পুড়ে মরতে হচ্ছে না। জ্ঞানের প্রসারে, তর্কের দৌরাত্ম্যে, সামাজিক সুব্যবস্থায় ভেক, ফিকির, ভেলকী, অন্ধ-বিশ্বাস বহু দূরদূরান্ত। কম্পিউটার যন্ত্রে জ্যোতিষ-বচন প্রচার মাধ্যমে পাত্তা পাচ্ছে না, রোগ নিরাময়ের জন্য শিকড়, দণ্ডা, তাবিজ, পাথর অঙ্গে ভূষিত হচ্ছে না। কিন্তু আমরা কতটা এগিয়ে এসেছি মধ্যযুগীয় অজ্ঞানতা দূরে সরিয়ে কুসংস্কারের নাগপাশ কাটিয়ে? কলকাতার মত শহরে প্রশস্ত রাজপথে সূর্যকিরণোজ্জ্বল দিবালোকে বিজ্ঞানের পুরোধা ও প্রবক্তাকে দেখি তাঁর পরিবারের কোন রোগগ্রস্ত পরিজনকে দণ্ডি কাটতে সাহায্য করছে গঙ্গাজল ছিটিয়ে, নাম করা চিকিৎসকের দু-হাতের অঙ্গুলীতে দেখি একাধিক নানা রঙের পাথর বসান আংটি, মোড়ে মোড়ে জ্যোতিষি বিপণীতে দেখি গোঁড়া রাজনীতিবিদকে পিছনে তাকিয়ে দ্রুত প্রবেশ করতে। এ অবস্থায় সাধারণ মানুষ (দেশের জনসমষ্টির বৃহত্তম অংশ) যাদের কাছে কোন সুযোগ-সুবিধা সহজে পৌঁছায় না, যারা আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণ স্পর্শ থেকে বঞ্চিত, স্বাধীনতালাভের ছত্রিশ বর্ষ পরেও গরীবী হঠাও শ্লোগানে পর্যুদস্ত, তারা তাই বাঁচতে চায় অন্ধ বিশ্বাসে ধর্মের অপশাসনকে অবলম্বন করে, যেমন বন্যার প্রবল স্রোতে ভাসতে ভাসতে দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে একজন বাঁচতে চায় সামনে ভাসমান একটি কুটোকে ধরে। সারা পশ্চিমী দুনিয়া যখন মধ্যযুগীয় সমস্ত কুসংস্কারকে দূরে সরিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের ছায়ায় নিজেদের সর্বদিকে সমৃদ্ধ করে তুলছে তখন আমরা বিজ্ঞানের সামান্য শিক্ষা, প্রয়োগ ও সুযোগ আপামর জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে অক্ষম বা এক শ্রেণীর স্বার্থে ও চাতুর্যে এ প্রোগ্রাম নিষ্ক্রিয়। ফলে হাজার হাজার মানুষ আজও প্রতারিত হচ্ছে ঐ সব স্বার্থান্বেষী মানুষের কাছে। এ সব শঠতার নিদারুণ নির্লজ্জ প্রকাশ প্রতিদিন গ্রামে, গঞ্জে, শহরে কত ঘটছে তার পরিসংখ্যান কে রাখে। ধর্মীয় মেলায় এ সব অন্যায়, অবিচারই প্রকট হয়ে ধরা পড়ে সহৃদয় মানুষের চোখে।

সতীমার মেলায়, তারকনাথের চৈত্রমেলায়, সাগরে পৌষ

মেলায়, ব্যাণ্ডেলে পীরের মেলায়, এরূপ সব মেলায় দেখা যায় পূর্ণযৌবনা নারী বন্ধ্যাত্ব মোচনে, মা পুত্রের রোগের প্রশমনে, স্ত্রী স্বামীর কল্যাণে, পিতা কন্যার বিবাহে, বেকার যুবক বেকারত্বের অবসানে পূতচিহ্নিত কোন তেঁতুল, বট, অশ্বত্থ বা ডালিম গাছে বাঁধছে লাল শালু অথবা মাটির খেলনা, দুধ পুকুরের জল (যা নিত্য শত শত লোকের স্নান ও শৌচকর্মে এবং চারপাশের আবর্জনায় অজস্র রোগের জীবাণুতে ভরপুর) করছে পান, সাধ্যের অতিরিক্ত পূজার উপাচার ও দক্ষিণা দিয়ে পুরোহিতের পাদামৃত করছে সেবন এবং তাবিজ ও মাদুলীতে ভরে তুলছে অঙ্গ। পীরের দরগায় ভোর হতে পড়ছে লাইন জলপড়া বা নুন পড়ার জন্যে। একদিকে যেমন ধর্মের নামে সব রকম রোগের উপশমের ও সব রকম বাসনা কামনার সফলতার ভুয়া গ্যারাণ্টি দিয়ে মেলায় চলে অবাধ শোষণ ও পীড়ন আবার অন্যদিকে ব্যাভিচারের সুযোগ দিয়ে বহুজনকে হতে হয় সর্বপ্রান্ত।

বর্তমানে বিভিন্ন বিজ্ঞান সংস্থার বহু কর্মী নানা মেলায় পোস্টার, বক্তৃতা, অণুবীক্ষণ যন্ত্রে জীবাণুর চেহারা প্রদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মোহমুক্তি ঘটাতে প্রয়াসী। এই শুভ বুদ্ধিতেই নির্মিত হচ্ছে 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে'র মত চলচ্চিত্র। কিন্তু ইমপ্যাক্ট কতটুকু? সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ছাড়া, মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া এসব কু-চক্রের ব্যূহ ভেদ করা সম্ভব নয়। বিংশ শতাব্দীতে মানুষ যখন সভ্যতার এক চরম লগ্নে পৌঁছাতে যাচ্ছে তখন অপসংস্কৃতি ও কুসংস্কারের ধ্বজাবাহী ধর্মীয় মেলাগুলি আমাদের কাছে জাতীয় লজ্জা ছাড়া আর কি?

[পরিষদ সংবাদে কয়েকটি মেলার প্রতিবেদন লক্ষণীয়।]

আস্ত্রন: সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের নতুন পরীক্ষাকার্য

গত 23শে মার্চ সোভিয়েট রকেটের সাহায্যে মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে 'আস্ত্রন'। এটির সাহায্যে মহাকাশ থেকে পর্যবেক্ষণের কাজ চালানো হবে। এটির কক্ষ এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যে পৃথিবী থেকে সর্বাধিক দূরত্বে থাকার সময়ে পৃথিবী থেকে তার উচ্চতা হবে দু-লক্ষ কিলোমিটার।

মহাকাশের এই মানমন্দিরটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য তার আকারের জন্য এবং ঘনসন্নিবিষ্ট ব্যবস্থাপনার জন্য। একটি ক্ষুদ্র ও গুরুভার ভিত্তির ওপরে স্থাপিত হয়েছে 80 সেন্টিমিটারেরও অধিক ব্যাসবিশিষ্ট পাঁচ-মিটার লম্বা একটি নল। তারই মধ্যে রয়েছে সাড়ে তিন টনেরও অধিক ওজনের শক্তি সরবরাহ ও পরিক্রমা-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা। এই নলটি হচ্ছে একটি টেলিস্কোপ। এটি প্রস্তুত করা হয়েছে ক্রিমিয়ার জ্যোতির্পদার্থবিদ্যা অবজারভেটরিতে। যন্ত্রটির ওজন 400 কিলোমিটারের কাছাকাছি। তার প্রধান আয়নার ব্যাস 800 মিলিমিটার।

কক্ষপথে পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরে আসতে 'আস্ত্রন'-এর সময় লাগে পাঁচঘণ্টা। তার বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী ব্যবস্থাপনার মধ্যে আছে একটি আলট্রাভায়োলেট টেলিস্কোপ ও একপ্রস্থ এক্স-রে স্পেকট্রোমিটার। এইসব যন্ত্রের সাহায্যে অতি ক্ষীণ বিকিরণের তারা সম্পর্কে এবং অতি শক্তিশালী যেসব কোয়াসার ও পাল্‌সারের ঝলকের স্পন্দন সেকেণ্ডে ছয়-হাজারেরও অধিক তাদের সম্পর্কে তথ্য লাভ করা সম্ভব হবে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, তারার উপরিতল—যেখানকার 10 লক্ষ থেকে এক কোটি ডিগ্রীর মধ্যে—সেখানে ঘটমান প্রক্রিয়া এই অসাধারণ টেলিস্কোপের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করা যাবে। আল্‌ট্রাভায়োলেট টেলিস্কোপের যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করার কাজে ফরাসী বিশেষজ্ঞরা যোগ দিয়েছিলেন।

সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের এই পরীক্ষাকার্যে পর্যবেক্ষণের প্রধান বিষয় হচ্ছে বৃষরাশির তারামণ্ডল। এই তারামণ্ডলের মধ্যে আছে দুটি ছড়ানো নক্ষত্র-সমাবেশ এবং পাল্‌সার সমেত একটি কর্কট-সদৃশ নীহারিকা। এই পাল্‌সারটি শক্তিশালী রেডিও এক্স-রশ্মি বিকিরণের উৎস।

মহাকাশের মানমন্দিরটি এমন এক উপবৃত্তাকার কক্ষে স্থাপিত হয়েছে যাতে পৃথিবী থেকে তার সর্বাধিক দূরত্ব হয় দু-লক্ষ কিলোমিটার। এটি করা হয়েছে যাতে কক্ষ-পরিক্রমার কিছুটা সময় আস্ত্রন থাকে পৃথিবীর বিকিরণ-বলয়ের বাইরে। এই বিকিরণ-বলয় তথ্য-সংগ্রাহক যন্ত্রপাতির কাজে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। বিশেষ করে সূক্ষ্ম এক্স-রশ্মি টেলিস্কোপ বিকিরণ-বলয়ের মধ্যে অচল হয়ে যেতে পারে।

মহাকাশ-গবেষণায় এক্স-রশ্মি জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধরে কাজ হয়েছে। এদিক থেকে আল্‌ট্রাভায়োলেট জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে এক্স-রশ্মি জ্যোতির্বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য আছে। সম্পূর্ণ নতুন ফল পেতে হলে এমন যন্ত্র প্রস্তুত করা প্রয়োজন যা মহাকাশে ইতিমধ্যে ব্যবহৃত যন্ত্রের চেয়ে আরো উন্নত। আস্ত্রনের এক্স-রশ্মি টেলিস্কোপে অতি-দুর্বল এক্স-রশ্মির উৎসও ধরা পড়ে। তার সুবিধাগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে তার এই ক্ষমতা যে সেটি দীর্ঘকাল ধরে তথ্য মজুদ রাখতে পারে এবং খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করতে পারে।

বিজ্ঞান প্রবন্ধ

পরীক্ষামূলক নিউরোসিস সৃষ্টি

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়*

1922 থেকে 1925 খৃষ্টাব্দের মধ্যে পাভলভের ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষামূলক নিউরোসিস সৃষ্টির চেষ্টা চলে এবং পেত্রভা রিকম্যানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে বেশ কিছু মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হয়। আধুনিক মনোরোগ চিকিৎসার ইংরিজি পুস্তকে (আমেরিকা ও ইংলণ্ড থেকে প্রকাশিত) এই ঘটনার বেশি উল্লেখ নেই। এর বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে এ পর্যন্ত কোনো আলোচনা হয়েছে বলে মনে হয় না। কাজেই আমাদের দেশের চিকিৎসকের অধিকাংশই এই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা সম্পর্কে কোনো খবর রাখেন না। পাভলভের পরাবর্তভিত্তিক মনস্তত্ত্ব (মনের অধিষ্ঠান মস্তিষ্ক—এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত) সম্পর্কে তাই আমাদের অনেকেরই ধারণা অসম্পূর্ণ; এবং পাভলভ যান্ত্রিক জড়বাদী আচরণবাদী (behaviourist) গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

পাভলভের প্রচেষ্টার আগে থেকেই মনোরোগবিদ্যাকে বিজ্ঞান-ভিত্তিক করবার চেষ্টা চলছিল। ফরাসীদেশের পিনেল ও এস্কুইরোল অষ্টাদশ শতকের যুক্তিবাদী ভাবধারার ও ফরাসী বিপ্লবের অভাবে মনোরোগীদের প্রতি অমানুষিক অবিচার-অত্যাচার নিরসনের চেষ্টা করেন ও কিছুটা সাফল্য লাভও করেন। উন্মত্ততা যে শারীরিক রোগের মতই এক ধরনের অসুস্থতা, যার অবস্থিতি মস্তিষ্কে—এই কথা বলেন জার্মানীর উইলহেলম গ্রাইফেগার। চার্লস ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদভিত্তিক মতবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বিশ্ববিখ্যাত বৃটিশ চিকিৎসক মণ্ডস্‌লে মানসিকতার ও মনোরোগের বস্তুবাদভিত্তিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন। যুক্তরাষ্ট্রের বেনজামিন রাশ (স্বাধীনতার সম্পর্কে স্বাক্ষরকারী সেই সময়কার একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি) মনোরোগকে ডাইনিবিদ্যা, প্রেতবিদ্যা, অলৌকিক তত্ত্ব ও রহস্যময়তা থেকে মুক্ত করে বস্তুবাদী তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। এই বস্তুবাদী ধারা উনিশ শতকের শেষের দিকে সাধারণ চিকিৎসাবিদ্যার সঙ্গে মিলিত হয় এবং জার্মান চিকিৎসক ক্রেইপলিন ও রুশ চিকিৎসক কোরসাকভ সাধারণ চিকিৎসা বিদ্যার নিদানতত্ত্ব ও উপসর্গ বিচার-বিধি অনুযায়ী মনের রোগের শ্রেণীবিভাগের চেষ্টা করেন। চিকিৎসকরা মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণা মুক্ত হয়ে অনেকখানি এগিয়ে এলেন বটে, কিন্তু মস্তিষ্কভিত্তিক মনোবিদ্যার প্রসার ও প্রচারের দৈন্যের জন্য মনোরোগের জটিল উপসর্গের এবং রোগীর অনেক অস্বাভাবিক ব্যবহারের বস্তুবাদী অর্থাৎ মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপভিত্তিক কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পেলেন না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ইয়োরোপ আমেরিকায় গুরুতর আর্থসামাজিক পরিবর্তন ঘটে এবং পুরনো মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের মূলে আঘাত লাগে। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের মধ্যে নিউরোসিস—বিশেষ করে হিস্টিরিয়াজাতীয় রোগের আধিক্য দেখা যায় ও যুদ্ধ পরবর্তীকালে প্রায় সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে নিউরোসিসের প্রাদুর্ভাব ও বিস্তার ঘটতে থাকে। বলা উচিত, সাধারণ চিকিৎসকরা এর আগে নিউরোসিস নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাতেন না। কিন্তু এই সময় থেকে রোগীর আধিক্য ঘটার জন্য চিকিৎসকরা রোগ উপসর্গের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য নিয়ে চিন্তা করতে থাকেন। এই সময়ে বুদ্ধিজীবীদের মনে এমন অনেক প্রশ্নের উদয় হয় যার উত্তর প্রচলিত ধর্মশাস্ত্র ও দর্শন থেকে পাওয়া গেল না। ফলে একদিকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী ধ্যানধারণা, অপরদিকে নির্জ্ঞানতত্ত্বভিত্তিক অধিমনোবিদ্যা—মার্কসবাদ ও ফ্রয়েডবাদ ক্রমশ তৎকালীন চিন্তাবিদদের আকৃষ্ট করে। মনোরোগবিদদের তৎকালীন মনস্তত্ত্বের কাঠামোর মধ্যে নিউরোসিসের বিচিত্র ও আপাত চিন্তাধারা ক্রিয়াকলাপের বস্তু-বাদাশ্রয়ী ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। তাঁরা পরীক্ষা-নিরীক্ষাভিত্তিক পথ পরিত্যাগ করে ফ্রয়েডীয় চিন্তাধারার প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। সামাজিক বৈষম্য ও দ্বন্দ্ববিরোধের কারণ নির্ণয়ে কিছু সংখ্যক সমাজবিজ্ঞানী, দার্শনিক ও অর্থনীতির ছাত্র যেমন মার্কসবাদের সাহায্য অপরিহার্য মনে করলেন, তেমনি চিকিৎসক ও মনস্তাত্ত্বিকরা মানসিক দ্বন্দ্ববিরোধ ও মনোবিকারের কারণ অনুসন্ধান করতে মনের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হলেন। মনোসমীক্ষকরা শুধু ব্যক্তিগত নিউরোসিসের ক্ষেত্রেই ফ্রয়েডীয় পদ্ধতি ও তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করেই থেমে থাকলেন না, সামাজিক ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের ক্ষেত্রেও ফ্রয়েডীয় পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ শুরু করলেন। মনের রোগের বিষয়ীগত জ্ঞান বাড়তে লাগল, কিন্তু পরীক্ষালব্ধ বিষয়গত তথ্যের পরিমাণ বিশেষ বাড়ল না। সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে সম্যক যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায় পশ্চিমী বিজ্ঞানীরা

* পাভলভ ইনস্টিটিউট, 132/1/এ, বিধান সরণি, কলিকাতা-4

পাভলভের ল্যাবরেটরীর গবেষণাপদ্ধতি ও তথ্যাদির সঙ্গে অনবহিতই রয়ে গেলেন। এর ফলে সর্বস্তরে ফ্রয়েডের অনুমানভিত্তিক 'depth psychology-র প্রসার ঘটলো (Popov & Rokhten, Psychopathology & Psychiatry; Mosow, p. 5)। ফ্রয়েডীয় সাইকোথেরাপীতে অনেকক্ষেত্রে বিশেষ ফল না পাওয়ার জন্য অথবা চিকিৎসা দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যয়বহুল হবার দরুণ পশ্চিমী চিকিৎসকরা তত্ত্বের দিক থেকে 'নির্জ্ঞানবাদী' (ভাববাদেরই এক বিশেষ রূপ) হয়েও প্রয়োগের দিক থেকে 'প্র্যাগম্যাটিক' হয়ে পড়লেন। মস্তিষ্ককে মননক্রিয়ার অধস্তর বলে স্বীকার না করেও মস্তিষ্কের উপর প্রভাব বিস্তারকারী ওষুধ প্রয়োগ করে প্রকারান্তরে বস্তুবাদী মনস্তত্ত্বকে স্বীকার করে নিলেন। 'ট্রাংকুলিলাইজার', অ্যান্টিডিপ্রেসান্ট' ইত্যাদি ওষুধ আবিষ্কৃত হবার অনেক আগেই পাভলভ শর্তাধীন পরাবর্তভিত্তিক, তথা মস্তিষ্কাশ্রিত মনস্তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন ও তাঁর সহকর্মীরা ল্যাবরেটরীতে পশুর উপর প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে প্রমাণ করেছেন যে মনোরোগের, বিশেষ করে নিউরোসিসের মূলে আছে মস্তিষ্কের কার্মিক বিশৃঙ্খলা (functional disorder)। পরীক্ষাগারে সেই নিউরোসিস সৃষ্টির বিবরণ দেবার জন্যই এই মুখবন্ধের অবতারণা।

1931 খৃস্টাব্দের 3 সেপ্টেম্বর বার্ন-এ এক চিকিৎসক সম্মেলনে পাভলভ বলেন, 'নিউরোসিস উচ্চতর স্নায়ুপ্রক্রিয়ার পথভ্রষ্ট হবার ফলে উদ্ভূত। ...প্রাণীটির পক্ষে উদ্দীপক যখন খুব জোরালো বা জটিল অথবা নিস্তেজনাপ্রক্রিয়া যখন ব্যাহত (যেমন বিশ্রাম বা ঘুমের অভাব—লেখক), কিম্বা যখন উত্তেজনা ও নিস্তেজনাপ্রক্রিয়া-সংঘাত-তীব্র (মানসিক দ্বন্দ্ববিরোধ)—তখন নিউরোসিসের সৃষ্টি হয়।' এই অবস্থায় প্রাণীর উত্তেজনা ও নিস্তেজনা দুই প্রক্রিয়ারই একই সঙ্গে বা বিভিন্ন সময়ে দুর্বলতা ঘটার ফলে বিশৃংখলা দেখা দিয়ে থাকে। প্রাণীটির মস্তিষ্কের 'টাইপ' ও সহনশীলতার তারতম্যের উপর নিউরোসিস উৎপাদন ও রোগের উপসর্গ নির্ভরশীল। এ-ছাড়া দেখা গেছে প্রাণীটিকে খাসী (castrated) করা হলেও প্রথম দিকে প্রাণীর মধ্যে নিউরোসিস দেখা দিতে পারে।

এইবার নিউরোসিস সৃষ্টির পরীক্ষার কথায় আসা যাক। তার আগে খুব সংক্ষেপে পাভলভের শর্তাধীন পরাবর্ত সম্পর্কে দু-এক কথা বলা দরকার। সব পাঠক শর্তাধীন পরাবর্ত (conditioned reflex) কথাটির সঙ্গে পরিচিত থাকলেও, সঠিক ব্যাপারটা নাও জানতে পারেন।

খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে জিহ্বার সংস্পর্শে (বস্তুত পরিচিত খাদ্য হলে দেখার বা গন্ধ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে) লালা পড়ে। ক্ষুধার্ত কুকুরের খাবার খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি কয়েকবার ঘণ্টা বাজানো যায় তবে কিছু সময়ের মধ্যে সেই কুকুরটির শুধু ঘণ্টা ধ্বনি শুনলেই লালা ঝরবে। পাভলভীয় পরিভাষায় খাদ্য শর্তহীন উদ্দীপক (unconditioned stimulus), খাদ্য সংস্পর্শে লালা নিঃসরণ শর্তহীন পরাবর্ত (unconditioned reflex)। এক প্রজাতির সব প্রাণীর পক্ষেই এই শর্তহীন পরাবর্ত জন্মগত। শর্তহীন উদ্দীপকের সঙ্গে যে কোনো ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপক (ঘণ্টা বাজানো, আলো দেখানো, গায়ে হাত বোলানো বা চাপ দেওয়া ইত্যাদি) সংযুক্ত হলে শর্তাধীন পরাবর্ত গড়ে ওঠে। উপরের পরীক্ষায় ঘণ্টাধ্বনি শর্তাধীন উদ্দীপক আর তার ফলে লালা নিঃসরণ শর্তাধীন পরাবর্ত। শর্তহীন পরাবর্ত চিরস্থায়ী এবং আগেই বলা হয়েছে, জন্মসূত্রে পাওয়া। আর শর্তাধীন পরাবর্ত অস্থায়ী, অর্থাৎ কিছু দিনের মধ্যে ঘণ্টা বাজানোর দরুণ লালার পরিমাণ কমতে কমতে একেবারে শূন্যের কোঠায় পৌঁছে যায়। যদি আবার শর্তহীন উদ্দীপক (খাদ্য) দিয়ে ঘণ্টা বাজানো হয়, খুব অল্প সময়ের মধ্যে শর্তাধীন পরাবর্তটি পুনর্গঠিত হয়। শর্তাধীন পরাবর্ত জন্মাবার কিছু পর থেকেই গঠিত হতে থাকে। সব কিছু শিক্ষাদীক্ষাই শর্তাধীন পরাবর্তের সমষ্টি। অপ্রয়োজনীয় পরাবর্ত ভেঙ্গে পড়ে, নতুন প্রয়োজনীয় পরাবর্ত গড়ে ওঠে। শুধু শর্তহীন উদ্দীপক নয়, নতুন শর্তাধীন পরাবর্তকে কেন্দ্র করেও নতুনতর পরাবর্ত গড়ে ওঠে। নিউরোসিসের উপসর্গকে আমরা বলতে পারি ত্রুটিপূর্ণ পরাবর্ত (faulty reflex)। এইবার বোধ হয় নিউরোসিস সৃষ্টির পরীক্ষাটি বিবৃত করলে পাঠকদের বোধগম্য হবে। হ্যাঁ, একটা কথা বলা হয় নি। পাভলভ ঘণ্টা বাজানোর ফলে লালা নিঃসরণকে (দূরের উদ্দীপনা বা মুখের সঙ্গে অসংস্পর্শিত উদ্দীপকের প্রভাবে) প্রাথমিক ও অতি নীচু স্তরের মানসিক প্রক্রিয়া বলে অভিহিত করেছেন। এইভাবে মানসিকতার অধঃস্তরের সন্ধান মিলেছে।

প্রথমে পেত্রভার পরীক্ষার কথা বলছি।

1932 খৃস্টাব্দে 25 আগস্ট কোপেনহ্যাগেনে এক বক্তৃতায় পাভলভ বলেন, 'পরীক্ষামূলক নিউরোসিস সৃষ্টির সঙ্গে পরীক্ষাধীন কুকুরের স্নায়ুতন্ত্রের 'টাইপ' বা প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের সম্পর্ক আছে। আমরা তিনটি মৌলিক 'টাইপকে' চিহ্নিত করতে পারি: সবল কিন্তু ভারসাম্যহীন, সবল অথচ সুসমঞ্জস এবং দুর্বল। নিউরোসিস সৃষ্টি প্রথম ও তৃতীয় টাইপের অর্থাৎ সবল-ভারসাম্যহীন এবং দুর্বলদের মধ্যে সহজেই করা যায়।' অবশ্য এই সব টাইপের মধ্যে শক্তির ও দুর্বলতার রকমফের ও তারতম্য আছে। দারুণ দুর্বল এবং ভারসাম্য রক্ষায় একেবারে অসমর্থ সবল টাইপের সংখ্যা খুবই কম। ল্যাবরেটরী পরীক্ষা-কার্যে তারাই কিন্তু উপযুক্ত।

পেত্রভা পরীক্ষা চালালেন একই সঙ্গে এই দুই বিপরীত স্নায়ুসংস্থাধর্মী কুকুর নিয়ে। প্রথমে এদের দু-জনকেই 6টি করে নতুন অভ্যাস শেখানো হলো; পাভলভের ভাষায় 6টি শর্তাধীন পরাবর্ত গঠন করা হলো। এগুলো সবই সহজ এবং কুকুর দুটির পক্ষে সমস্যামূলক নয়। এর পর বিদ্যুৎ তরঙ্গের শক্ খাদ্য-পরাবর্তের উদ্দীপক হিসেবে ব্যবহৃত হলো। কুকুর-দুটিকে খুবই ক্ষুধার্ত করে প্রথমে মৃদু তার পর ক্রমশ জোরালো

বিদ্যুৎ তরঙ্গের শকের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য দেওয়া হতে লাগল। সাধারণত বৈদ্যুতিক শক্ বেদনাদায়ক এবং এই ধরনের উদ্দীপকের ফলে প্রাণীমাত্রেরই শর্তহীন প্রতিরক্ষামূলক পরাবর্ত দেখা দিয়ে থাকে। অর্থাৎ তারা আর্তস্বরে চিৎকার করে এবং এই উদ্দীপক এড়িয়ে চলে। কিন্তু পরীক্ষাধীন কুকুর দুটির মধ্যে প্রশিক্ষণের ফলে এই উদ্দীপকে সাড়া দেওয়ার সব লক্ষণ প্রকাশ পেল। তাদের লালা নিঃসরিত হলো, তারা খাবারের থালার দিকে এগিয়ে এল। এক কথায় তাদের খাদ্য-পরাবর্ত গড়ে উঠল। পরীক্ষক বার বার এই পরীক্ষা চালাতে লাগলেন এবং ক্রমশ শকের মাত্রাও বাড়িয়ে দিলেন। কুকুর দুটির স্নায়ুসংস্থা চাপ সহ্য করতে পারল না; তারা অসুস্থ হয়ে পড়ল। সদ্য তৈরী খাদ্য-পরাবর্ততো ভেঙ্গে গেলই, আগেকার 6টি পরাবর্তের মধ্যেও বিশৃংখল অবস্থার সৃষ্টি হলো। অতি-উত্তেজনাপ্রবণ কুকুরটির নিস্তেজনা বা সহনশক্তি একেবারে নিঃশেসিত হলো। অতি-মাত্রায় চীৎকার ও লাফঝাঁপ শুরু করে দিল। অতি-নিস্তেজনা-প্রবণ (দুর্বল) কুকুরটির উত্তেজনাশক্তি পুরোপুরি চলে গেল, সে দিনরাত বসে বসে ঝিমুতে লাগল। এইভাবে পরীক্ষাগারে প্রথম 'নিউরোসিস' সৃষ্টি করলেন পেভ্‌লভ [Pavlov, Conditioned Reflexes And Psychiatry, Ed Gantt, International Publishers, New York, 1941, (pp. 73-95)]। উত্তেজনা নিস্তেজনা তীব্র সংঘাত এই নিউরোসিস সৃষ্টির কারণ। বৈদ্যুতিক শকের ফলে উদ্ভূত সহজাত আত্মরক্ষা প্রবৃত্তিকে নিরোধ করতে হচ্ছে; শুধু তাই নয় সেই ধ্বংসাত্মক উদ্দীপককে ভিত্তি করে শর্তাধীন ইতিবাচক খাদ্য-পরাবর্ত গড়ে উঠছে। দুই বিপরীত প্রক্রিয়ার পরস্পর বিরোধিতা ও সংঘর্ষে মস্তিষ্ককোষ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অতি-উত্তেজনাপ্রবণ কুকুরটির নিস্তেজনা প্রক্রিয়া ও অন্যটির উত্তেজনা-ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে।

মানুষের জীবনে এই ধরণের বিপরীত উদ্দীপকের সম্মুখীন হয়ে ভেঙ্গে পড়ার দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। সব চিকিৎসকের ডায়েরীতেই এই ধরণের নিউরোটিকের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। আমি খুব হালে দেখা এক রোগীর কথা বলছি। 50 বছরের এক তামিল ভদ্রলোক সুনামের সঙ্গে ভারতের এক অতিপরিচিত শিল্পসম্রাটের কলকাতার অফিস স্টেনোটাইপিস্টের কাজ করেছেন। বছর দুয়েক হলো তাঁর দ্রুত কাজ করার ক্ষমতা কমতে থাকে এবং তার ফলে তাঁর মনে ভীতির উদ্রেক হয়। আঙুল কাঁপা ও হাতের পেশীতে টান ধরার জন্য তিনি আগের মত দ্রুত কাজ করতে পারছিলেন না। একদিন তাঁর সাহেব অর্থাৎ উপরওয়ালা ডিক্টেশন (dictation) দিতে দিতে ধৈর্য হারিয়ে (স্টেনোর মন্দগতির জন্য) তাকে খুব অশ্লালীন ভাষায় গালাগালি দিয়ে (অবশ্য ইংরিজিতে) বেরিয়ে যেতে বললেন। স্টেনোভদ্রলোকের হাতের কাঁপুনি সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল এবং বাইরে এসে নিজের চেয়ারে বসার আগেই তিনি মেঝেতে বসে পড়লেন। চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। কাজ করার ক্ষমতা পুরোপুরি হারিয়ে ফেললেন। পেভ্‌লভের দ্বিতীয় কুকুরটির যে ধরণের উপসর্গ দেখা দিয়েছিল, তাঁরও উপসর্গ প্রায় সেই ধরণের। দুর্বল মস্তিষ্ক বছর খানেক ধরে অপমান হজম করে (এখানে উপরওয়ালার অশ্রাব্য গালাগালিতে তার মধ্যে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিমূলক পরার্বতের উদ্ভব হয়েছিল, তিনি অপমানের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য চাকরীতে ইস্তফা দেবার কথা ভাবছিলেন। কিন্তু প্রাণরক্ষার তাগিদে পারছিলেন না। অপমান মানী দুর্বলচিত্ত ভদ্রলোকটির পক্ষে বৈদ্যুতিক শকেরই সামিল) ক্রমশ সহ্যের শেষ সীমায় চলে এসেছিলেন। ঐ বিশেষ দিনের অশ্রাব্য কথাগুলো তাঁর প্রতিরক্ষা শক্তিকে নিঃশেষ করে দিল। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। যদি স্টেনো ভদ্রলোকের মস্তিষ্ককোষে উত্তেজনার আধিক্য থাকতো, মানে তিনি বদমেজাজী হতেন তাহলে হয়তো চেঁচামেচি হৈ হল্লা করে ঐদিনে তিনি টাইপরাইটারের চাবিগুলো ভেঙ্গে ফেলতেন, সহকর্মীরা অনেক কষ্টে বাড়িতে দিয়ে আসতেন। তাঁর মস্তিষ্ককোষের নিস্তেজনাক্ষমতা নিঃশেষিত হবার ফলে তিনি ভারসাম্য হারিয়ে উদ্দাম উচ্ছৃংখল হয়ে উঠতেন।

এবার অন্য এক ধরনের নিউরোসিস সৃষ্টির পরীক্ষার কথা বলছি। গবেষক ভি. ভি. রিকম্যান। একটি দুর্বলমস্তিষ্ক (নিস্তেজনাধর্মী) কুকুরকে কয়েকটি জোরালো উদ্দীপক ক্রমান্বয়ে প্রয়োগ করলেন ও তার ফলাফল দেখতে চাইলেন। উদ্দীপক-গুলো প্রয়োগ করা হলো দর্শন ও শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের উপর। প্রতিক্রিয়া অবিলম্বে ঘটল। কুকুরটি কিছু সময় অস্থিরতা ও বিচলিত ভাব প্রদর্শন করে স্থির ও শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনের পা দুটো অনেকটা প্রসারিত, মাথাটা উঁচু ও পেছনে হেলানো, চোখ দুটো বিস্ফারিত। অস্বাভাবিক চেহারা হলো কুকুরটির। সব কিছু পরাবর্ত ভেঙ্গে পড়লো, অর্থাৎ সে কোনো উদ্দীপকে আর সাড়া দিল না। দু-সপ্তাহ ধরে এই রকম এক অস্বাভাবিক অবস্থায় থাকার পর কুকুরটি স্বাভাবিক হলো; কিন্তু এর পরও ঐ সব উত্তেজনাধর্মী উদ্দীপকের যে কোনো একটা প্রয়োগ করলেই কুকুরটি অসুস্থ হয়ে পড়তো। কুকুরটির অবস্থা হয়েছিল অনেকটা স্কিজোফ্রেনিয়া রোগের 'ক্যাটাটনিক' (katatonec)-এর মত। এখানে নিউরোসিস সৃষ্টি হলো উত্তেজনাধর্মী উদ্দীপকের মাত্রাধিক্যের জন্য। মাত্রাধিক উত্তেজনা প্রতিরক্ষামূলক নিস্তেজনা ঘটিয়েছে। নিস্তেজনাপ্রক্রিয়া উচ্চমস্তিষ্ক থেকে মধ্যমস্তিষ্ক পর্যন্ত নেমে এসেছে। পরীক্ষাগারে রিকম্যান স্কিজোফ্রেনিয়া জাতীয় রোগের, অথবা চলতি কথায় যাকে 'নার্ভাস ব্রেক ডাউন' বলে, সেই রোগের অনুরূপ মডেল সৃষ্টি করলেন। 1924-এর সেপ্টেম্বর মাসে লেনিনগ্রাডে ভীষণ ঝড়-বৃষ্টির ফলে বন্যা হয়। বন্যার জল কুকুরদের ঘরে ঢোকে ও তাদের স্থানান্তরিত করতে হয়। এই সময় এই কুকুরটি আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে

মস্তিষ্কে মাত্রাধিক চাপ সৃষ্টির ফলে অসুস্থতার সৃষ্টি হয়।

প্রথমদিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষার তথ্য থেকে মনে হয়েছিল উত্তেজনা ও নিস্তেজনার আধিক্য থাকে যে সব কুকুরের মস্তিষ্ক কোষের, সেই সব কুকুরই বুঝি নিউরোসিসে ভোগে এবং আরো মনে হয়েছিল উপসর্গগুলোর বৈশিষ্ট্য নার্ভতন্ত্রের বিশেষ টাইপের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে এই সব সিদ্ধান্তের অদলবদল ঘটে। ক্রমশ নতুন তথ্যের সংযোজনে পাভলভের তত্ত্ব আরো সমৃদ্ধ হয়। পরিবেশের জটিলতা, উত্তেজনা-নিস্তেজনার সংঘাতের তীব্রতা এবং উদ্দীপকের শক্তির মাত্রাবৃদ্ধির ফলে সুষম সবল মস্তিষ্কেরও ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে। ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত ও যোগাযোগ থেকেও নিউরোসিস সৃষ্টি হয়ে থাকে। পূর্ব-অভিজ্ঞতা ও অর্জিত বিশ্লেষণীক্ষমতার সঙ্গেও নিউরোসিস সৃষ্টির অনেকখানি সম্পর্ক আছে।

পেত্রভা ও রিকম্যানের উল্লিখিত পরীক্ষার পর নতুন পদ্ধতিতে নিউরোসিস সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়। এবার শর্তাধীন পরাবর্ত সৃষ্টি করা হলো 5টি বিভিন্ন উদ্দীপক দিয়ে। একটির পর একটি উদ্দীপক দিয়ে বার বার পরাবর্ত সৃষ্টি করে পরাবর্তগুলোর মধ্যে পারম্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টি করা হলো এবং উদ্দীপকগুলোর প্রয়োগ-সময় নির্দিষ্ট করা হলো এবং পূর্বনির্দিষ্ট সময়ে 1 থেকে 5 নম্বর উদ্দীপক পর্যায়ক্রমে প্রয়োগ করে একটা ধারাবাহিকতা ও শৃংখলা গড়ে তোলা হলো। উদ্দীপকের সময় বদলালে বা ধারাবাহিকতা রক্ষিত না হলে 2নং-এর জায়গায় 4নং বা 1নং-এর সময় 5নং ইত্যাদি, অনেক সময় কুকুর অসুস্থ হয়ে পড়ছে, দেখা গেল। বাঁধাধরা অভ্যাসের ব্যতিক্রম এখানে অসুস্থতার কারণ। মানুষের বেলায় এই ধরনের অসুস্থতা বেশ কিছু ক্ষেত্রেই দেখা যায়। চাকরী থেকে অবসরগ্রহণের পর, উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে কোনো আবাসিক কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করার সময় [এক্ষেত্রে নতুন ছাত্রদের উপর 'র‍্যাগিং' (ragging) নামক প্রচলিত অভ্যর্থনার প্রয়োগ অসুখের অব্যবহিত কারণ হতে পারে], বিদেশে একেবারে নতুন পরিবেশের মধ্যে পড়ার পর, কিছু সংখ্যক লোক অসুস্থ হয়ে পড়েন।

প্রথম দিকে পেত্রভার পরীক্ষায় সংঘাতের ফলে নিস্তেজনা প্রক্রিয়ার উপর বেশি চাপ পড়েছিল। রিকম্যানের পরীক্ষায় উত্তেজনা-প্রক্রিয়ার উপর অতিমাত্রায় চাপ সৃষ্টি হয়েছিল আর এই পরীক্ষার মস্তিষ্ককোষের তৃতীয় ধর্ম-গতিময়তার উপর বেশি চাপ পড়েছে। গতিময়তা (mobility), উত্তেজনা ও নিস্তেজনা—এই তিন স্নায়ুপ্রক্রিয়ার অতিরিক্ত পীড়ন এবং গতিময়তার বেলায় শৃংখলা ভঙ্গের ফলে নিউরোসিসের মডেল সৃষ্টি মনোরোগবিদ্যার ইতিহাসে বিশেষ এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

ল্যাবরেটরির বাইরে ক্লিনিকেও দেখা গেল মানুষের নিউরোসিস হয় বিপরীতধর্মী কার্যকলাপ বা চিন্তাভাবনার সংঘর্ষে, আকস্মিক মানসিক আঘাত বা বিপর্যয়ে এবং অভ্যস্ত জীবনযাত্রার হঠাৎ পরিবর্তনে। আগেই বলেছি, পরীক্ষাগারে তথ্যসম্ভার বৃদ্ধির ফলে জানা গেল যে, মস্তিষ্কে টাইপ সব সময় রোগের উপসর্গ বা টাইপের সঙ্গে সম্পর্কিত নাও হতে পারে।

পরীক্ষামূলক নিউরোসিস সৃষ্টি করতে গিয়ে পাভলভ মনোরোগের অনেক তথাকথিত রহস্যময় উপসর্গের মস্তিষ্কধর্মী ব্যাখ্যা খুঁজে পেলেন। অস্বাভাবিক ও জটিল মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া যে অধঃস্তর মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ অবস্থা, কোষের উত্তেজনা-নিস্তেজনা ও গতিময়তার হেরফের-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—এই সত্য কুকুরের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে আবিষ্কৃত হলো। মানসিক ধর্ম ও মনোরোগীর অনেক তথাকথিত দুর্বোধ্য আচরণ ও সংলাপ যে মস্তিষ্কের নিদ্রা ও জাগরণের পরিবৃত্তিকালীন পরিবর্তন ও পরিবেশের প্রভাব সঞ্জাত -- পাভলভের পরীক্ষাগারে সংগৃহীত তথ্যের সাহায্যে সেই ধারণা প্রমাণিত হলো।

পরীক্ষাধীন কুকুর মৃদু একঘেয়ে উদ্দীপকের প্রভাবে ঘুমিয়ে পড়ে। জাগ্রত থেকে ঘুমন্ত অবস্থায় উপনীত হবার সময় ক্রমান্বয়ে তিনটি বিশেষ পর্বের উন্মেষ ঘটে। এই তিন পর্বে মস্তিষ্কের ধর্ম তিন ধরনের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে দেখা দিয়ে থাকে। 'প্রথম পর্বের নাম সমতা পর্ব (phase of equalisation), এই পর্বে মৃদু ও সবল উদ্দীপক একই রকমের সাড়া জাগায়। মস্তিষ্কের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী উদ্দীপকের শক্তির তারতম্যের সঙ্গে মস্তিষ্কের সাড়া বা প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত। উদ্দীপক যত জোরালো হবে সাড়া তত বেশি হবে। শুধু তাই নয়, পাঁচমাত্রার উদ্দীপকে যদি পাঁচ ফোঁটা লালা পড়ে, দশমাত্রা উদ্দীপকে পড়বে দশ ফোঁটা, কুড়িমাত্রায় কুড়ি ফোঁটা। এই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নিদ্রাবিস্তারের প্রথম পর্বে। পাঁচ ও পঞ্চাশ মাত্রার উদ্দীপক একই মাপের প্রতিক্রিয়া ঘটায়—হয়তো দুই ক্ষেত্রেই দশ ফোঁটা লালা ঝরে। জাগ্রত অবস্থার মত উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার অনুপাত ঠিক থাকে না। দ্বিতীয় পর্বের নাম দেওয়া হয়েছে স্ববিরোধী (paradoxical phase) পর্ব। এই পর্বে নিস্তেজনা (inhibition—ঘুমের অবস্থা) প্রথম পর্বের থেকে আরো বেশি ছড়িয়ে পড়ে, বিস্তারিত হয়। দেখা যাবে যে, হয়তো তিরিশমাত্রার উদ্দীপকে এক ফোঁটাও লালা পড়ছে না; কিন্তু কুড়িমাত্রার উদ্দীপকে পাঁচ ফোঁটা পড়ছে আর পাঁচ মাত্রার উদ্দীপকে লালার পরিমাণ বেড়ে দাঁড়াচ্ছে পঞ্চাশ ফোঁটায়। সকলেরই জানা আছে সম্মোহিত অবস্থায় সম্মোহকের মৃদু নির্দেশ জোরালো উদ্দীপকের কাজ করে। পাভলভের মতে সম্মোহিত অবস্থায় মস্তিষ্কের অবস্থা পরীক্ষাধীন স্ববিরোধী বা paradoxical phase-এর সঙ্গে তুলনীয়। সম্মোহিত অবস্থা আংশিক ঘুমন্ত অবস্থা, আর ঘুমে নিস্তেজনাপ্রবাহ গোটা মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে। পরবর্তী তৃতীয় পর্বে আরো অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে, নেতিধর্মী উদ্দীপক ইতিবাচক হয় আর লালা নিঃসরণকারী (ইতিধর্মী) উদ্দীপক

নেতিবাচক হয়ে ওঠে অর্থাৎ ঘণ্টার বা মেট্রোনমের শব্দের সঙ্গে লালা পড়ার যে পরাবর্ত গড়ে উঠেছিল, তার প্রয়োগে লালা নিঃসরণ হয় না, কুকুর খাদ্যপাত্রের দিকে তাকিয়েও দেখে না। আবার হয়তো কোনো বেদনাদায়ক উদ্দীপক—যেমন বৈদ্যুতিক শক, (যার প্রয়োগে জাগ্রত বা স্বাভাবিক অবস্থায় লালানিঃসরণ বন্ধ হয়ে যেত) প্রয়োগ করলে লালা পড়তে থাকে। এই পর্বের নাম অতিস্ববিরোধী পর্ব (ultraparadoxical phase)।

সুস্থ অবস্থায় এই পর্ব তিনটি ক্ষণস্থায়ী এবং তৃতীয় পর্বের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণী ঘুমিয়ে পড়ে। অসুস্থ (নিউরোটিক) অবস্থায় যে-কোনো একটি পর্ব কয়েক সপ্তাহ অবধি স্থায়ী হতে পারে।

এই পর্ব তিনটির অস্তিত্ব ও সেই অনুযায়ী উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার অস্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের ভিত্তিতে মনোরোগের অনেক উপসর্গের ব্যাখ্যা মিলেছে। এই তিনটি পর্বের আবিষ্কারের ফলে বোঝা গেল সবল মস্তিষ্কের উত্তেজনাভিত্তিক উপসর্গের সঙ্গে উপরে লিখিত যে কোনো পর্বের নিস্তেজনাধর্মী উপসর্গ দেখা দিতে পারে এবং আবার নিস্তেজনাধর্মী প্রাণীর উপসর্গেও উত্তেজনা প্রকাশ পেতে পারে। মানুষের হিস্টিরিয়া রোগের উদাহরণ দেখিয়ে বলা চলে যে প্রধানত দুর্বলমস্তিষ্কের অসুখ হলেও মাঝে মাঝে হিস্টিরিয়া রোগীর শারীরিক ও মানসিক উপসর্গের মধ্যে উগ্রতা শক্তির আধিক্য ও উত্তেজনা প্রকাশ পেয়ে থাকে। এ-ছাড়া, এটাও দেখা গেছে এই রোগ এবং অন্যান্য অনেক মানসিক রোগই সবল-মস্তিষ্ক প্রাণীর মধ্যেও দেখা যায়।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে জানা গেল যে শক্তি, ভারসাম্য ও গতিময়তা—মস্তিষ্কের এই তিনটি ধর্মের যে-কোনো একটির অতি-পীড়নের ফলে সবল-দুর্বল সব প্রাণীরই মনের রোগ হতে পারে। এরপর আরো অনেক জটিল ও সূক্ষ্ম ব্যাপার নিয়ে পাভলভ ও তাঁর সহকর্মীরা গবেষণা চালান। অবসেশন (obsession—আচ্ছন্ন অবস্থা) সম্পর্কিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে জানা গেল যে ঐ জটিল মানসিক রোগীর মস্তিষ্কের কিছু কোষ উত্তেজিত অবস্থায় অনড় বা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, তাই যুক্তি, বুদ্ধি দিয়ে বদ্ধমূল ধারণা দূর করা যায় না। এ-সম্পর্কে বিশদ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়।

কুকুরের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে নিউরোসিসের প্রাথমিক সূত্রগুলি আবিষ্কৃত হলো সত্যি, কিন্তু কুকুরের উপর পরীক্ষিত তথ্য মানুষের ক্ষেত্রে নির্বিচারে গ্রহণীয়, একথা কখনও পাভলভ মনে করেন নি। কুকুর তথা সব প্রাণীর ও মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের গুণগত পার্থক্য পাভলভই প্রথম উপলব্ধি করেন। সেই পার্থক্যের কথা মনে রেখে ক্লিনিকে তিনি মানুষের মনোরোগ নিয়ে গবেষণা চালান। তার ফলে গড়ে ওঠে পাভলভীয় মনোরোগবিদ্যার ভিত্তি।

শেষ করার আগে অতি সংক্ষেপে মানুষের স্নায়ুসংস্থার যে বৈশিষ্ট্য আবিষ্কারের ফলে মনোবিদ্যা, ভাষাবিদ্যা (linguistics), মনোরোগবিদ্যা, নৃবিদ্যা, সমাজবিদ্যা ইত্যাদি সমৃদ্ধ, সেই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে দু-চার কথা বলা দরকার। মানুষের মস্তিষ্কে বিবর্তনের শেষধাপে কয়েক লক্ষ বছরের পরিব্যক্তির (mutation) ফলে একটি নতুন স্তরের সংযোজন ঘটেছে। উচ্চ প্রাণী পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বাইরের জগতের সঙ্গে লেনদেন করে ও নিজেকে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে রাখে। নর-বানর ও আদিম মানুষ প্রথম দিকে এই প্রথম সাংকেতিক তন্ত্রের উপর নির্ভরশীল। পরে সোজা হয়ে হাঁটা, হাতিয়ার ব্যবহার ও দলবেঁধে হাতিয়ার তৈরি ও ব্যবহারের ফলে মানবপ্রজাতির পক্ষে পারস্পরিক ভাববিনিময়ের প্রয়োজন অপরিহার্য হয় এবং প্রথমে অঙ্গভঙ্গীসহ অসম্বদ্ধ শব্দ, পরে ধীরে অর্থপূর্ণ শব্দের সাহায্যে ভাববিনিময় করতে শেখে। ক্রমশ গড়ে ওঠে প্রণালীবদ্ধ কথ্য ভাষা। নিজের অভিজ্ঞতা অপরকে জানাতে সক্ষম হবার ফলে ব্যক্তির জ্ঞান ও বুদ্ধির ক্রমোন্নতি ঘটতে থাকে। পরে মানুষ লিখতে শেখে এবং ভাব ও অভিজ্ঞতা বিনিময় আরো ব্যাপক ও সহজ হয়ে ওঠে। উৎপাদন, সঞ্চয় ও অন্যান্য মানবিক গুণের বিকাশে ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। কথা বুঝতে ও বলতে শেখার ফলেই সমাজবদ্ধ মানুষ এই গ্রহের সব থেকে শক্তিশালী প্রজাতি হয়েছে এবং প্রকৃতির নিয়মশৃংখল অধ্যয়ন করে প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করতে শিখেছে। ভাষার সংক্ষিপ্তকরণ ও বিমূর্তকরণের ক্ষমতা মানুষকে অসীম শক্তির অধিকারী করেছে। নিম্নপ্রাণীর বিবর্তনের ফলে মানবমস্তিষ্ক সংগঠিত, কিন্তু বাক্-ভিত্তিক স্তরের—পাভলভের ভাষায় দ্বিতীয় সাংকেতিক স্তরের উদ্ভবের ফলে মানুষ পশু থেকে গুণগতভাবে অনেকাংশে পৃথক প্রজাতিতে পরিণত হয়েছে। বিচারবুদ্ধি, ইচ্ছাশক্তি, পরিবেশ পরিবর্তন ও আত্মোন্নয়নের ক্ষমতাবিশিষ্ট মানুষের জৈবধর্ম অনেকাংশে পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত এবং এই পরিবর্তন পরিমার্জন সভ্যতার ও সমাজের চাপে ঘটে থাকলেও গুণগতভাবে মানুষকে অন্য প্রজাতি থেকে স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করেছে। পাভলভীয় মনোবিদ্যা দ্বান্দ্বিক বাস্তববাদভিত্তিক, আচরণ-বাদের (behaviourism) মত যান্ত্রিক জড়বাদভিত্তিক নয়।

এই প্রসঙ্গে এত কথা না বললেও চলতো ; কিন্তু কোলম্যান, মার্ফি প্রমুখ অতিপরিচিত মনোবিদদের লেখা বইতে পাভলভকে ওয়াটসন প্রমুখ আচরণবাদীদের গোত্রভুক্ত করা হয়েছে, তাই লিখতে হলো।

শ্বেত বামন, নিউট্রন নক্ষত্র ও বিবর তত্ত্ব

সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র*

[বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আর্থার স্টানলী এডিংটনের জন্মশতবার্ষিকী স্মরণে]

শ্বেত বামন

নক্ষত্র জীবনের ক্রমবিকাশ নিয়ে বিজ্ঞানীরা যে স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন তাতে শ্বেত বামন হলো নক্ষত্রের বার্ধক্য অবস্থা। সূর্যের মত সাধারণ পর্যায়ের নক্ষত্রগুলিতে সবটুকু হাইড্রোজেন জ্বালানী নিউক্লীয় সংযোজনে হিলিয়ামে রূপান্তরিত হলে নক্ষত্র তখন লালদানবে পরিণত হয়। কেন্দ্রের প্রায় 10^{8}°C তাপমাত্রায় তখন হিলিয়ামের চেয়ে ভারী নিউক্লিয়াস গঠিত হয়। 26 প্রোটন ও 30 নিউট্রন মিলে লোহের নিউক্লিয়াস তৈরি হওয়া পর্যন্ত লালদানবের কেন্দ্রমুখী মহাকর্ষ শক্তিকে নিউক্লীয় শক্তি ঠেকিয়ে রেখে সংকুচিত হতে দেয় না। লোহার নিউক্লিয়াস তৈরি হওয়ার পর লালদানবের শক্তির উৎস নিঃশেষিত হয়ে যায়। ফলে তার মহাকর্ষীয় সংকোচন ঘটে।

1838 খৃস্টাব্দে ফ্রিডরিক উইলহেলম বেসেল 61 সিগনী নক্ষত্রের সূর্য থেকে 11 আলোক বৎসর দূরত্ব প্রায় নিখুঁতভাবে মাপতে সমর্থ হন। 61 সিগনী নক্ষত্র থেকে উজ্জ্বল সাইরাস নক্ষত্রের দূরত্ব মাপতে গিয়ে বেসেল লক্ষ্য করেন যে, তার যেন একটি উপবৃত্তাকারের কক্ষপথ রয়েছে ও 50 বছরে সে এই কক্ষপথ একবার ঘুরে আসে। তবে কি সাইরাসের চেয়ে কোন বড় আকারের নিকটবর্তী নক্ষত্রের মহাকর্ষের টানে সাইরাসের এই রহস্যজনক কক্ষপথের সৃষ্টি হয়েছে? প্রোকাইঅন নক্ষত্রের বেলায় ও তার দোলায়িত গতি থেকে বেসেলের সন্দেহ হয় এই দুটি নক্ষত্রেরই কোন অদৃশ্য সঙ্গী আছে।

1862 খৃস্টাব্দে আলভান গ্রাহাম ক্লার্ক তাঁর দূরবীনে সাইরাসের এই সঙ্গীটিকে আবিষ্কার করেন—একেবারে অদৃশ্য নয়, সাইরাসের দশ হাজার ভাগের একভাগ ঔজ্জ্বল্য নিয়ে এই নক্ষত্রটি এখন Sirius B নামে পরিচিত। সাইরাস এখন Sirius A নামে পরিচিত। আসলে এরা তারা। 1895 খৃস্টাব্দে জন মার্টিন স্কেই বার্লে' প্রোকাইন-এর সহচর অনুজ্জ্বল B জুড়িতারাটি আবিষ্কার করেন।

1915 খৃস্টাব্দে ওয়ালটার সিডনী অ্যাডামস সাইরাস B-র বর্ণালী বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেন যে সাইরাস B-এর পৃষ্ঠ তাপমাত্রা কিছু কম নয় প্রায় 8000°C। সাইরাস A ও সূর্যের পৃষ্ঠতাপমাত্রা যথাক্রমে 10000°C ও 6000°C। তুলনামূলকভাবে এত বেশী পৃষ্ঠ তাপমাত্রায় সাইরাস B এত অনুজ্জ্বল কেন? এ প্রশ্নের উত্তর এই হতে পারে যে, তার পৃষ্ঠের আয়তন সাইরাস A-র তুলনায় কম—তাপমাত্রার হিসেবে প্রায় 1/2800। তাহলে সাইরাস A থেকে B-র ব্যাস 53 ভাগের একভাগ হতে পারে অর্থাৎ প্রায় 47000 কি.মি.। এরকম আয়তন তো কোন গ্রহ নেপচুন বা ইউরেনাসের সমান। বস্তুতঃ সাইরাস B-এর ব্যাস পৃথিবীর $\frac{1}{3}$ মাত্র। এই আবিষ্কার থেকে জানা গেল যে গ্রহের কোন বিকিরণ ক্ষমতা নেই অথচ গ্রহের মত আয়তনের এই সব বামন নক্ষত্র নক্ষত্রজীবনের অভিব্যক্তির শেষ অবস্থা

আর্থার স্টানলী এডিংটন

শ্বেত বামন—নিজস্ব তাপমাত্রায় যথেষ্ট প্রখর এসব নক্ষত্র। প্রোকাইঅন B ও এই শ্রেণীর নক্ষত্র।

সাইরাস A ও B জুড়ি তারা, প্রায় সমান ভর নিয়ে এরা মধ্যবর্তী এক ভরকেন্দ্রের চারদিকে আবর্তন করে। এই ভরকেন্দ্র থেকে জানা গেছে যে A নক্ষত্রের ভর B-র প্রায় 2·5 গুণ। তবু সাইরাস B-র ভর আমাদের সূর্যের প্রায় সমান—তাই এই জন্যই অসাধারণ যে তার আয়তন অনুযায়ী ভর যথেষ্ট বেশী। ফলে সাইরাস B-র ঘনত্ব দাঁড়ায় প্রায় 35000 গ্রাম / সেমি^{3}। এই ঘনত্ব পৃথিবী কেন্দ্রের বস্তুর ঘনত্ব থেকে 3000 গুণ ও সূর্যকেন্দ্রের বস্তুর ঘনত্ব থেকে প্রায় 350 গুণ বেশী।

---

* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

আইনস্টাইনের লালসরণ ও শ্বেতবামন

1915 খৃস্টাব্দে আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকবাদ প্রকাশিত হলে ঐ তত্ত্ব অনুযায়ী দেখা গেল আলোর উপরও মহাকর্ষের কিছু প্রভাব থাকবে। আলোর ফোটনের স্থির ভর শূন্য, কিন্তু তা কখনও স্থির নয়। নির্দিষ্ট গতিবেগে সর্বদাই চলে। আপেক্ষিক তত্ত্বে মহাকর্ষ ফোটনের গতিপথ সরিয়ে দিতে সক্ষম ও তার শক্তিও কমাতে পারে।

1919, 29 মে-র সর্বগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় আফ্রিকার উপকূলের প্রিন্সাইপ দ্বীপ থেকে উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলির অবস্থান ভাল করে পর্যবেক্ষণ করা হলো। ঐ সব নক্ষত্রের আলো যদি সূর্যের দিকে সরে আসে তবে তাদের অবস্থান সূর্য থেকে দূরে সরে গেছে মনে হবে। ছ-মাস পরে সূর্য যখন আকাশের বিপরীত দিকে এবং তার মহাকর্ষ নক্ষত্রগুলির উপর কোন প্রভাব বিস্তার করছে না, তখন নক্ষত্রগুলির অবস্থান পুনরায় পর্যবেক্ষণ করা হলো। দেখা গেল অবস্থানগুলি সূর্যের মহাকর্ষের টানে দূরে সরে গেছে অর্থাৎ তাদের আলো সূর্যের টানে তার দিকে সরে এসেছে।

তাহলে আপেক্ষিক তত্ত্ব থেকে মহাকর্ষ প্রভাবে আলোর ফোটনের শক্তিও যে কমে তাও প্রমাণিত হওয়া উচিত। সূর্যের আলো সূর্যের বিপুল মহাকর্ষ শক্তির বিপরীতে যখন মহাকাশে বিকীর্ণ হয় তখন ফোটনের শক্তি কি মহাকর্ষের প্রভাবে হ্রাস পায়? এরকম হ্রাস হলে মহাকর্ষ না থাকলে সাদা আলোর যে বর্ণালী হবে, মহাকর্ষে সেই বর্ণালীর সব তরঙ্গই কমশক্তির দীর্ঘতর তরঙ্গদৈর্ঘ্য লালের দিকে অপেক্ষাকৃত সরে আসবে। একে বলা হয় আইনস্টাইনের লাল সরণ। এরকম লাল সরণ ধরতে হলে বর্ণালীর কালো ফ্রাউনহফার রেখার অবস্থান সূর্যের আলো ও সামান্য মহাকর্ষের উৎস অন্য আলোর অনুরূপ রেখার অবস্থানের সঙ্গে তুলনা করে দেখা যেতে পারে। এরকম পরীক্ষায় কোন পার্থক্যই ধরা পড়ে না, তার কারণ সূর্যের বিপুল মহাকর্ষের প্রভাবে এই ক্রিয়া একান্তই নগণ্য।

এডিংটন প্রস্তাব করলেন যে, সাইরাস B আকারে ছোট অথচ ভারী। তারপৃষ্ঠদেশের মহাকর্ষ সূর্যের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশী, তাই পৃষ্ঠদেশ থেকে মুক্ত আলোর উপর মহাকর্ষের প্রভাব পরীক্ষায় ধরা পড়তে পারে। সাইরাস B-র পৃষ্ঠ মহাকর্ষ সূর্য ও পৃথিবী থেকে যথাক্রমে 840 ও 23500 গুণ বেশী। এডিংটনের প্রস্তাবে অ্যাডামস 1925 খৃস্টাব্দে সাইরাস B নক্ষত্রের বর্ণালীতে আইনস্টাইনের লাল সরণ পরীক্ষা করে প্রমাণ করতে সক্ষম হলেন। এই পরীক্ষা থেকে সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বই শুধু দৃঢ় প্রতিষ্ঠ হলো না, সাইরাস B যে ক্ষুদে ভারী একটি অসাধারণ নক্ষত্র তাও প্রমাণিত হলো।

পৃষ্ঠ মহাকর্ষের উপরই নির্ভর করে পৃষ্ঠদেশ থেকে বস্তুর মুক্তি-বেগ কত হবে? পৃথিবী থেকে চির মুক্তির জন্য বস্তুর গতিবেগ হওয়া চাই অন্তত সেকেণ্ডে 11·25 কিমি.। সূর্যের বেলায় এই বেগ হলো 617 কিমি. আর সাইরাস B-র জন্য 3300 কিমি. অর্থাৎ আলোর প্রায় 1/90 গতিবেগ।

আগেই বলেছি লাল দানবের নিউক্লীয় উৎস ফুরিয়ে গেলে মহাকর্ষ শক্তির সংকোচন আর থামে না। পৃথিবী বা কোন গ্রহের মত অবস্থায় এসে অণু-পরমাণু অবিকৃত থেকে স্থায়ী কিছু গড়ে ওঠে না তার কারণ নক্ষত্রের বিশাল দেহের মহাকর্ষও বিপুল, তাই পরমাণু ভেঙে প্রোটন নিউট্রন ইলেকট্রন আলাদা হওয়া পর্যন্ত সংকোচন চলে। প্রোটন নিউট্রনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের চেয়ে ইলেক-ট্রনের তরঙ্গ দীর্ঘতর। তাই প্রথমেই ইলেকট্রন কাছাকাছি সরে এসে বায়বের মত বহমান পদার্থ তৈরি করে। তখন নিউট্রন প্রোটন নক্ষত্রের মোট আয়তনের মাত্র $2 \cdot 5 \times 10^{-9}$ ভাগ মাত্র দখল করে থাকে। শ্বেতবামনের পৃষ্ঠদেশে তখনও কিছু অবিকৃত পরমাণু থাকতে পারে যার উপর মহাকর্ষ তখনও প্রবল থাকে কিন্তু ঐ পৃষ্ঠের ওপরের আবহমণ্ডলে নিউক্লিয় ক্রিয়া থেকে বেঁচে যাওয়া কিছু হাইড্রোজেন মাত্র থাকে ও সামান্য সংখ্যায় পরমাণু। শ্বেতবামনের পৃষ্ঠদেশ থেকে ক্রমশ কেন্দ্রের দিকে পরমাণু ভেঙে ইলেকট্রনীয় বহমান পদার্থ বাড়তে থাকে ও সেই বায়বসদৃশ বহমান পদার্থের বাধা মহাকর্ষীয় সংকোচন থামিয়ে রাখে। সদ্যজাত শ্বেতবামনের পৃষ্ঠ-তাপমাত্রা লক্ষ ডিগ্রী ছাড়িয়ে যেতে পারে। এই তাপ ক্রমশ বিকিরণের ফলে কমতে থাকে। এমন বয়স্ক শ্বেত-বামন রয়েছে যাদের পৃষ্ঠ-তাপমাত্রা 5000°C এর বেশী নয়। কিন্তু তাপের হ্রাসে শ্বেতবামনের গঠন-বৈচিত্র্যের কিছু রদ-বদল হয় না। সাধারণ নক্ষত্রের বেলায় তার কেন্দ্রের তাপ প্রসারণের মাধ্যমে মহাকর্ষীয় সংকোচনে বাধা দেয়। ফলে তার তাপের হ্রাসে তার গঠনও পাল্টাতে থাকে। শ্বেতবামনের সারাদেহের ইলেকট্রনীয় বহমান পদার্থ চাপ সৃষ্টি করে মহাকর্ষীয় সংকোচনে বাধা দেয় বলে তাপের হ্রাসে তার দেহের গঠন বদলায় না। ক্রমশ এই তাপ কমতে কমতে নক্ষত্রটি নিভে যায় তার আর কোন বিকিরণ থাকে না—তখন তা কৃষ্ণ বামন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণ বামন অবস্থা আনতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়—তাই বিশ্বের বর্তমান বয়ঃকালে কৃষ্ণবামন তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা নেই বলা যায়। শুধু এটুকুই বলা চলে যে, শ্বেতবামন নক্ষত্র ভবিষ্যতে একদা কৃষ্ণ-বামনে পরিণত হবে।

মহাকাশে সূর্যের 35 আলোক বৎসর পরিধিতে যে প্রায় 300 নক্ষত্র আছে তাদের আটটি মাত্র শ্বেতবামন। তাই অনুমান করা যায় শতকরা দু-তিনটি নক্ষত্র বিপুল বিশ্বে শ্বেতবামন অবস্থায় আছে। শ্বেতবামন থেকে কৃষ্ণবামন অবস্থার নক্ষত্র হবে সাধারণ গ্রহের মত অক্ষয় ও শাশ্বত বস্তু।

নিউট্রন নক্ষত্র

একটি শ্বেতবামন নক্ষত্র কত ভারী হতে পারে? 1931 খৃস্টাব্দে সুব্রহ্মনীয়াম চন্দ্রশেখর বিশ্লেষণ করে দেখান যে, সৌর-ভরের 1·4 গুণ বা তার বেশী হলে কোন নক্ষত্র শ্বেতবামনত্ব

প্রাপ্তির আগেই নবতারা বা নোভা শ্রেণীর বিস্ফোরণে তার ভর হারিয়ে ফেলবে অথবা টুকরো টুকরো হয়ে গ্রহনীহারিকায় পরিণত হবে। সাধারণত সৌরভরের তিনগুণ পর্যন্ত ভারী নক্ষত্র জুড়ি তারা অবস্থায় থাকলে তার সঙ্গীর ভর কিছুটা আত্মসাৎ করে নবতারায় পরিণত হতে পারে। সৌর ভরের তিন গুণের বেশী ভারী নক্ষত্র পরিণত হবে অতি নবতারায়—যার বিস্ফোরণের উজ্জ্বলতা নোভার চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ বেশী। 1885 খৃস্টাব্দে অ্যাণ্ড্রোমেডা নীহারিকার বিস্ফোরণ অতিনব তারা শ্রেণীর।

বিশ্বে সূর্যের চেয়ে 50 থেকে 70 গুণ ভারী নক্ষত্রও দেখা যায়। অতিনবতারা বিস্ফোরণে এসব নক্ষত্র তাদের 97/98 ভাগ ভার হারিয়ে চন্দ্রশেখর সীমার মধ্যে সূর্যের 1·4 গুণ ভরের কম ওজনের নক্ষত্রে পরিণত হয়ে শ্বেতবামনত্ব পেতে পারে। কিন্তু কোন নক্ষত্রে যদি সূর্যের 1·4 গুণের পরিবর্তে 2 গুণ ভর অবশেষ থেকে যায় তখন কী হবে? তখন নক্ষত্রটির ইলেকট্রনগুলি কেন্দ্রের এমন ঘনত্বে পৌঁছুবে যে ঘনত্বে তার সত্তা অবিকৃত থাকতে পারে না। ফলে ইলেকট্রন প্রোটনের সঙ্গে মিলে নিউট্রন তৈরি করতে বাধ্য হবে। নিউক্লীয় শক্তি নিউট্রন প্রোটনকে আলাদা করে রাখবে এবং এই নিউক্লীয় শক্তিই এখন মহাকর্ষীয় সংকোচন ঠেকিয়ে রাখবে। শ্বেতবামনে অথবা সাধারণ নক্ষত্রে তড়িৎ-চুম্বকীয় শক্তিই এই সংকোচন ঠেকিয়ে রাখে, এখন নিউক্লীয় শক্তি সেই ভূমিকা নেবে। শুধু নিউট্রন দিয়ে গড়া এরকম নক্ষত্রই হলো নিউট্রন নক্ষত্র। এসব নক্ষত্রের ঘনত্ব হবে সাধারণ পদার্থের প্রায় 10^{15} গুণ বেশী।

1934 খৃস্টাব্দে ফ্রিটজ জুইকি ও ওয়াল্টার বাডে নিউট্রন নক্ষত্রের গঠন ও অস্তিত্বের সঙ্গত ব্যাখ্যা দেন—কয়েক বছরের ব্যবধানে সবিশেষ তত্ত্ব আবিষ্কার করেন রবার্ট ওপেনহাইমার ও জর্জ এম ভলকফ। তত্ত্ব অনুযায়ী নিউট্রন নক্ষত্র দৃশ্য হওয়া এজন্যই দুরূহ যে 8/10 কিমি. ব্যাসের এত ঘন কোন বস্তু দূরবীনে দেখা যাবে বিন্দুর মত। অবশ্য নিউট্রন নক্ষত্রের পৃষ্ঠ তাপমাত্রা যথেষ্ট বেশী প্রায় 10^{7}° সেঃ এর মত। এরকম তাপমাত্রায় রঞ্জেন-রশ্মির আধিক্য থাকবে। কিন্তু আবহমণ্ডল ভেদ করে দৃশ্য আলো ও মাইক্রোওয়েভ ছাড়া অন্য বিকিরণ পৃথিবীতে আসতে পারে না।

মহাকাশ গবেষণায় কৃত্রিম উপগ্রহ দিয়ে বাইরের মহাকাশের রঞ্জেন রশ্মি সন্ধান সফল হওয়ায় নিউট্রন নক্ষত্র অনুসন্ধান সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা আশান্বিত হন। 1964 খৃস্টাব্দে ক্র্যাব নেবুলায় এরকম নিউট্রন নক্ষত্র রঞ্জেন রশ্মি পরীক্ষায় ধরা পড়ে নি। 1967 জুলাইতে জোসিলিন বেল বেতার দূরবীন দিয়ে ভেগা ও অ্যালটেয়ার নক্ষত্রের মাঝামাঝি জায়গায় একটি স্পন্দমান নক্ষত্র পাল্‌সারের সন্ধান পান। অ্যান্টনী হিউইস ভেবেছিলেন এরকম মাইক্রোতরঙ্গ বুঝি ভিন্ন গ্রহের বুদ্ধিমান জীবজগৎ থেকে আসছে।

টমাস গোল্ড প্রমাণ করেন যে পাল্‌সারগুলি আসলে নিউট্রন নক্ষত্র। নিউট্রন নক্ষত্রের চুম্বকক্ষেত্র এত প্রবল যে, নক্ষত্রটি তার নিজের অক্ষের চারদিকে আবর্তনের সময় যে ইলেকট্রন নিক্ষেপ করে, তা তার চুম্বকক্ষেত্রে আটকে যায়। কিন্তু তার চুম্বকীয় অক্ষে যে সব ইলেকট্রন পড়ে তারা বাইরে নিক্ষিপ্ত হয় এবং শক্তির হ্রাস ঘটে। এই হ্রাসপ্রাপ্ত ইলেকট্রনের শক্তিই মাইক্রোতরঙ্গ রূপে ধরা পড়ে। গোল্ডের তত্ত্ব অনুযায়ী এই শক্তি বিকিরণের সঙ্গে নিউট্রন নক্ষত্রের আবর্তন বেগও কমতে থাকবে। ক্র্যাব নেবুলার পাল্‌সার জন্ম নিয়েছে অতিনবতারার বিস্ফোরণে প্রায় 900 বছর আগে। তখন তার অক্ষের আবর্তন ছিল সেকেণ্ডে প্রায় 900—আর এখন তা কমে দাঁড়িয়েছে 30-এ। শুধু মাইক্রোতরঙ্গ নয়, তত্ত্ব অনুযায়ী নিউট্রন নক্ষত্র থেকে রঞ্জেন রশ্মিও ধরা যায়। ক্র্যাব নেবুলার শতকরা 10 থেকে 15 ভাগ রঞ্জেন রশ্মির উৎস হলো তার নিউট্রন নক্ষত্র। বিশেষ পদ্ধতিতে ক্র্যাব নেবুলার পাল্‌সার নিউট্রন নক্ষত্রের দৃশ্য আলোও ধরা পড়েছে। এখন পর্যন্ত ক্র্যাব নেবুলার নিউট্রন নক্ষত্রই একমাত্র দৃশ্য নিউট্রন নক্ষত্র।

পৃষ্ঠ-মহাকর্ষ ও মুক্তিবেগ

1975 খৃস্টাব্দে প্রথম নিউট্রন নক্ষত্রের ভর মেপে দেখা হয়—vela X-1. নিউট্রন নক্ষত্রের ভর দাঁড়াল সৌরভরের 1·5 গুণ অর্থাৎ চন্দ্রশেখর সীমার ঠিক ওপরে। অবশ্য তত্ত্ব অনুযায়ী চন্দ্রশেখর সীমার নীচেও কম ভরের নিউট্রন নক্ষত্র থাকতে পারে। অতিনবতারার বিস্ফোরণের সময় তার কোন অংশে হঠাৎ প্রবল গতির চাপে ঐ অংশটির ভর কম হলেও ইলেকট্রনীয় বহমান পদার্থের কাঠামো সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে নিউট্রন নক্ষত্রে পরিণত হতে পারে। একবার তাহলে ঐ অংশটি আর আগের অবস্থায় ফিরে আসে না। তাই সৌর ভরের $\frac{1}{8}$ ভর নিয়ে নিউট্রন নক্ষত্র গড়ে উঠতে পারে ও তখন তার ব্যাস হয় প্রায় 8·2 কিমি. এর মত।

নিউট্রন নক্ষত্রের পৃষ্ঠ-মহাকর্ষ কেমন হবে? সূর্যের পৃষ্ঠ-মহাকর্ষ পৃথিবীর তুলনায় প্রায় 28 গুণ [illegible]ী। শ্বেতবামন সাইরাস B-র পৃষ্ঠ-মহাকর্ষ সূর্য থেকেও 9 গুণ বেশী কারণ তার ভর সূর্যের মত হলেও ব্যাস সূর্যের $\frac{1}{30}$। সূর্যের মত ভরের 14 কিমি. ব্যাসের (অর্থাৎ সূর্যের ব্যাসের লক্ষ ভাগের একভাগ) নিউট্রন নক্ষত্রের পৃষ্ঠ-মহাকর্ষ হবে সূর্যের প্রায় 10^{10} গুণ।

নক্ষত্রের নিজের অক্ষে আবর্তন বেগ তার বিষুব রেখা থেকে মেরুর দিকে ক্রমশ হ্রাস পেয়ে শূন্যে দাঁড়ায়। এই আবর্তনবেগ যে কেন্দ্রাতিগ বল সঞ্চার করে তা অভিকর্ষের টানের বিপরীতে। এই বলের জন্য পৃথিবীর বস্তু বিষুবরেখায় অভিকর্ষ টানের বিপরীতে সর্বোচ্চ সীমায় বেরিয়ে আসে তাই বিষুব অঞ্চল এতটা ফুলে উঠেছে। শ্বেতবামনের আবর্তন বেগ জানা না গেলেও পাল্‌সারের স্পন্দনকাল থেকে নিউট্রন নক্ষত্রের আবর্তনবেগ অনুমান করা যায়। 14 কিমি. ব্যাসের নিউট্রন নক্ষত্রের এক সেকেণ্ডে তার অক্ষে একবার আবর্তন করলে তার বিষুবরেখায় আবর্তন বেগ হবে প্রায় সেকেণ্ডে 44 কিমি., অর্থাৎ পৃথিবীর প্রায়

95 গুণ। অথচ নিউট্রন নক্ষত্রের তীব্র মহাকর্ষের জন্য কেন্দ্রাতিগ বল এমন হবে না যে সহজে তার বস্তুপুঞ্জ মহাকর্ষের টান ছাড়িয়ে উঠতে পারে। তাই এ রকম নক্ষত্রে মুক্তিবেগ হবে আলোর বেগের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ। নীচের সারণীতে সূর্য, গ্রহ, শ্বেতবামন ও নিউট্রন নক্ষত্রের মুক্তিবেগের একটি হিসাব দেওয়া হলো—

	মুক্তিবেগ কিমি./সেকেণ্ড	আলোর বেগের কত অংশ
পৃথিবী	11·2	0·0000373
বৃহস্পতি	60·5	0·00020
সূর্য	617	0·0020
সাইরাস B	3400	0 011
নিউট্রন নক্ষত্র	200 000	0·67

নিউট্রন নক্ষত্রের এই বিপুল মুক্তিবেগের জন্য আইনস্টাইনের লাল সরণও এসব নক্ষত্রের বিকিরণের বেলায় বেশী হবে। ফলে আমরা এসব নক্ষত্রে থেকে এখন যে রঞ্জেন রশ্মি পাই তা আরও ছোট দৈর্ঘ্যের হতো এবং দৃশ্য আলো বা মাইক্রোওয়েভ যা পাওয়া যাচ্ছে তা হয়তো পাওয়া দুর্লভ হতো। লাল সরণের জন্য বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য মহাকর্ষপ্রভাবে দীর্ঘতর হয়ে যায় বলেই আমরা এদের ধরতে পারি।

সৌর ভরের 3·2 গুণ ভরের নীচেই সব নিউট্রন নক্ষত্রের অস্তিত্ব 110^{14} গ্রাম/সে^{3} সর্বোচ্চ ঘনত্ব নিয়ে এরা যখন সব শক্তি নিঃশেষে খরচ করে ফেলবে, তখন তাদের কোন বিকিরণ থাকবে না। তারা পরিণত হবে কৃষ্ণনিউট্রন নক্ষত্রে; সাধারণ একটি গ্রহ বা কৃষ্ণবামন নক্ষত্রের মত মহাকাশের এক স্থায়ী বস্তুতে।

কৃষ্ণবিবর

1939 খৃস্টাব্দে ওপেনহাইমার যখন নিউট্রন নক্ষত্রের তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করছিলেন, তখনই ভেবে দেখেছিলেন সৌর ভরের চেয়ে 50/70 গুণ ভারী কোন নক্ষত্রের মহাকর্ষ এত তীব্র হবে যে নিউট্রন নক্ষত্রের নিউক্লীয় শক্তিও তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। চন্দ্রশেখর সীমায় 1·4 সৌরভরের নীচে যেমন শ্বেতবামনত্ব 3·2 সৌরভরের চেয়ে হাল্কা নক্ষত্রই শুধু নিউট্রন নক্ষত্র অবস্থা পেতে পারে। তার বেশী ভর হলে নিউক্লীয় শক্তি হার মেনে চিরবিদায় নেবে এবং তখন নক্ষত্রটির নিউট্রনীয় অবস্থা না এসে মহাকর্ষীয় সংকোচন অবাধে চলতে থাকবে। সৌরভরের চেয়ে 20 গুণ ভারী নক্ষত্র তো অতিনবতারার বিস্ফোরণে ভেঙ্গে পড়বে না। চন্দ্রশেখর সীমা লংঘন করায় শ্বেতবামনও হতে পারবে না, নিউট্রন নক্ষত্রও নয়। ফলে মহাকর্ষীয় সংকোচনে তার আয়তন কমতে থাকবে। অবশ্য যে নক্ষত্রে একবার এই প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়ে যায়, 3·2 সৌরভরের চেয়ে পরে হাল্কা হলেও তাতে আর মহাকর্ষীয় সংকোচন এড়ানো যায় না।

মহাকর্ষীয় সংকোচনে আয়তন যতই কমবে ঘনত্বও বাড়বে। ফলে পৃষ্ঠদেশের মুক্তিবেগও বেড়ে যাবে। নিউট্রন নক্ষত্রেই তো আমরা আলোর বেগের 2/3 মুক্তিবেগ হতে পারে দেখেছি। কিন্তু মহাকর্ষীয় সংকোচনের বাধাহীন অবস্থায় নক্ষত্রটির আয়তন একটি নিউট্রন নক্ষত্রের চেয়েও ছোট হয়ে মুক্তিবেগ আলোর বেগের সমান হতে পারে। এ অবস্থায় নক্ষত্রটির কী ব্যাসার্ধ হবে কার্ল সোয়ার্জচাইল্ড তা গণনা করেছিলেন বলে তা সোয়ার্জচাইল্ড ব্যাসার্ধ নামে অভিহিত।

ভারী নক্ষত্রের এরকম মহাকর্ষীয় সংকোচনে তার ভর যখন হবে সূর্যের সমান, ব্যাসার্ধ হবে মাত্র 3 কিমি.। নিউট্রন নক্ষত্রের আয়তনের মত হলে তো তার ঘনত্ব নিউট্রন নক্ষত্রের $17{\cdot}8 \times 10^{15}$ গুণ বেড়ে যাবে আর পৃষ্ঠ-মহাকর্ষ হবে তখন পৃথিবীর 15×10^{11} গুণ।

এরকম বাধাহীন সংকোচনে নক্ষত্র থেকে যে কোন পদার্থের মুক্তিবেগ আলোর বেগের সমান কেন, তার বেশীও হতে পারে। সোয়ার্জচাইল্ড ব্যাসার্ধের বেশী হলে আলোর বেগের চেয়ে বেশী মুক্তিবেগ হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু কোন ভর তো আর আলোর বেগ বা তার বেশী বেগ নিয়ে মুক্ত হবে না—তখন নক্ষত্র থেকে আর কোন পদার্থই বেরুবে না। ফলে এরকম নক্ষত্রে বাইরের কোন বস্তু পড়লে তার আর মুক্তি নাই। আলো তো ভরহীন পদার্থ। কিন্তু সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বে মহাকর্ষের বিপরীতে আলো মুক্তি পেলে তার লাল সরণ হয় বলে কিছু শক্তির ক্ষয় হয় ও মুক্ত আলোর বা বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে যায়। সাইরাস B নক্ষত্রের বেলায় অ্যাডামস্ তা প্রমাণও করেছেন। তাই সোয়ার্জচাইল্ড ব্যাসার্ধ বা তার কম ব্যাসার্ধের কোন সুসম বর্তুলাকার নক্ষত্র থেকে আলো বা বিকিরণ মুক্তি পাওয়ার সময় সব শক্তিই হারিয়ে ফেলবে। ফলে তার লাল সরণ হবে অসীম। এই অবস্থায় নক্ষত্রটি শুধু মহাকাশের বিবর নয়—যেখানে বস্তু পড়লে মুক্তি পায় না আলো বা বিকিরণেরও কোন মুক্তির উপায় নেই সেখানে, তাই এদের বলা হয় কৃষ্ণবিবর বা blackhole।

কৃষ্ণবিবর ও কৌণিক ভরবেগ

কৃষ্ণ বিবরে শুধু যে ভর থাকবে তা নয় সাধারণ নক্ষত্রের মত তার কৌণিক ভরবেগও থাকবে। কোন নক্ষত্রে কৌণিক ভরবেগের শক্তি যদি বেরিয়ে না যায়, তবে তা নিত্যতা বাদের নিয়ম মেনে চলবে। আবর্তন অক্ষ থেকে নক্ষত্রের আয়তন যত বেশী হবে, আবর্তনের বেগও তত কমবে। সব নক্ষত্রেরই আবর্তনজনিত কৌণিক ভর বেগ আছে। নক্ষত্র মহাকর্ষীয় সংকোচনে যত ছোট হতে থাকবে, তার ঘূর্ণন বেগও তত বাড়বে একটি নিউট্রন নক্ষত্র সেকেণ্ডে হাজার বার তার নিজের কক্ষের চারদিকে ঘুরতে পারে।

কৃষ্ণবিবর আরও দ্রুত আবর্তনশীল হবে। সোয়ার্জচাইল্ড তাঁর গণনায় কৃষ্ণবিবরকে আবর্তনশীল না ধরে স্থির ভেবেছিলেন, কিন্তু 1963 খৃস্টাব্দে রয়, পি, কের আবর্তনশীল কৃষ্ণ বিবরের ক্ষেত্রে দেখান যে, সোয়ার্জচাইল্ড ব্যাসার্ধ অবিকল থাকলেও নিজ অক্ষে আবর্তনের জন্য কৃষ্ণবিবরের বহির্দেশে একটি স্থির সীমা থাকবে যা কেন্দ্রাতিগ বলের জন্য বিষুব অঞ্চলের ফেঁপে ওঠা বস্তু-পিণ্ডের মত। সোয়ার্জচাইল্ড ব্যাসার্ধের বাইরে এই স্থির সীমার কোন বস্তু পড়লে শুধু বিশেষ অবস্থায় বাইরে বেরোতে পারবে। আবর্তনশীল কৃষ্ণবিবর এরকম বস্তুকে সুতোয় বাঁধা ঢিলের মত সঙ্গে নিয়ে ঘুরবে ও একসময় বাইরে ছুঁড়ে দেবে। তখন এই বস্তুটির শক্তি অনেকটা বেড়ে যাবে আর সেই শক্তি আসবে কৃষ্ণবিবরের কৌণিক ভরবেগ থেকে অর্থাৎ কৃষ্ণবিবরের আবর্তন গতি মন্দীভূত হবে। তাহলে কেউ যদি খুব সাবধানে কৃষ্ণ-বিবরের স্থিরসীমার ভেতর দিয়ে বস্তু পাঠাতে পারে তবে তা থেকে শক্তি আহরণ করা সম্ভব। এভাবে কৃষ্ণবিবর তার সবটা আবর্তনবেগ হারিয়ে ফেললে, তাতে অবশিষ্ট থাকবে শুধু ভর—আর তার স্থিরসীমা রেখাটি তখন সোয়ার্জচাইল্ড ব্যাসার্ধের সঙ্গে মিশে যাবে।

কীটবিবর ও শ্বেতবিবর

কৃষ্ণবিবরের কৌণিক ভরবেগ থেকে শক্তি আহরণের চেয়েও আর এক চমকপ্রদ ক্রিয়ার কথা বলেছেন আইনস্টাইন ও রোজেন। তাঁদের মতে আবর্তনশীল কৃষ্ণবিবরের বস্তুরাশি সংকুচিত হয়ে অন্যত্র জমতে পারে—যেমন টিউব থেকে ছোট গর্ত দিয়ে চাপের সাহায্যে টুথপেস্ট বেরিয়ে পড়ে। এই প্রক্রিয়ায় অতি অল্প সময়ে বস্তু কোটি কোটি আলোক বছর দূরে চালিত হতে পারে। বস্তুর এরকম চলাচল আমাদের পরিচিত বিশ্বে সচরাচর ঘটে না, কারণ আলোর গতিবেগের সীমায় যে কোন বস্তুর বেগ আবদ্ধ। সাধারণ দেশে এরকম কোটি কোটি আলোক বছর দূরে বস্তু চালিত হতে কোটি কোটি বছর সময় লাগবে। আমাদের পরিচিত বিশ্বে এরকম দ্রুত চলাচল ঘটতে হলে, একরকম সেতু বা সুড়ঙ্গের কল্পনা করতে হয়, যা পরিচিত জগতের সময়ের রীতিনীতি মেনে চলে না। তত্ত্ববিজ্ঞানে বস্তুর এরকম দ্রুতগতি চলার পথকে আইনস্টাইন-রোজেন সেতু বা কীটবিবর (wormhole) বলা হয়।

বস্তু যদি কীটবিবরে অতি অল্প সময়ে কোটি কোটি আলোক বছর পথ অতিবাহিত করে—তাহলে এই অস্বাভাবিক পরিবহনের অবস্থা বজায় রাখতে স্বাভাবিক সময়ের মাপে একটি পথ কল্পনা করতে হয়—যাতে মনে হবে বস্তু 10 কোটি বছর অতীতে যেন আত্মপ্রকাশ করেছে কীটবিবরের অন্য প্রান্তে। সমস্যাটি ধাঁধার মত মনে হলেও তত্ত্বের দিক দিয়ে অসম্ভব নয়। কীটবিবরের অন্যপ্রান্তের এই বস্তু হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে সম্প্রসারিত হবে ও বিকিরণ করবে। কৃষ্ণবিবরে যে শক্তি ও ভর আটকে পড়েছিল এখন তা সাধারণ উজ্জ্বল বস্তুতে পরিণত হবে। বিজ্ঞানীরা 1964 খৃস্টাব্দে এরকম বস্তুর নামকরণ করেছেন শ্বেতবিবর বা whitehole, কিন্তু এরকম শ্বেতবিবর আমরা মহাকাশে দেখতে পাই না কেন? মহাকাশের কোয়াসারগুলি কি শ্বেত-বিবর হতে পারে?

কোয়াসার ও সেফার্ট ছায়াপথ

1964 খৃস্টাব্দে হোংইচিউ 3C 48, 3C 147, 3C 196, 3C 286 প্রভৃতি কতকগুলি আধা নাক্ষত্রিক বেতার উৎসের নামকরণ করেন কোয়াসার (quasar—quasisteller radiosources)। 1963 খৃস্টাব্দে মার্টেন স্মিট দেখিয়েছিলেন যে এদের বর্ণালী রেখা অতিবেগুনিরশ্মির পাল্লায় ধরে নিলে বর্ণালী দৃষ্ট দৃশ্য আলো। এটাই প্রতিপন্ন করে যে, বহু দূরে এই সব নক্ষত্রের অবস্থান থেকে বিকিরণের লাল সরণের ফলে বিকিরণের বর্তমান তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে গেছে। দূরে থেকেও তাদের বিন্দুসম আকার এবং উজ্জ্বলতার দ্রুত হ্রাস-বৃদ্ধি থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাদের আকৃতি সাধারণ নক্ষত্রের তুলনায় অনেক ছোট।

3C 446 কোয়াসারে দু-দিনে তার উজ্জ্বলতার দ্বিগুণ হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে—এ থেকে মনে হয় তার ব্যাস 0·005 আলোক বৎসরের বেশী নয়। অথচ সাধারণ একটি ছায়াপথ যেখানে প্রায় 100 000 আলোক বছরের মত চওড়া ও তার ঘন কেন্দ্রাঞ্চল প্রায় 15000 আলোক বছর ব্যাসের সেখানে এই ক্ষুদে অথচ তীব্র বিকিরণশীল কোয়াসার-এর কোন তুলনা নাই। কোয়াসারের সঙ্গে কৃষ্ণবিবরের কি কোন সম্পর্ক থাকতে পারে? এরকম প্রশ্ন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মনে অনেক সময়ই নাড়া দিয়েছে। সোভিয়েট জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইগর নোভিকভ ও ইজরাইলের য়্যুভাল নীম্যান অনুমান করেন যে কোয়াসার হলো আসলে শ্বেতবিবর। কোন কৃষ্ণবিবরের প্রান্তের কীটবিবর দিয়ে বস্তু বেরিয়ে এসে এই সব কোয়াসাররূপ শ্বেতবিবরের সৃষ্টি করেছে।

অবশ্য কীটবিবর ও শ্বেতবিবরের অস্তিত্ব এখনও তত্ত্বের কল্পনা ক্ষেত্রেই আবদ্ধ—কিন্তু কোয়াসারের অস্তিত্ব, তার ধর্ম এখন অনেকাংশে জানা। কোয়াসারের এই অস্বাভাবিক ধর্ম যে মহাকাশে অনন্য নয় তার প্রমাণ হলো সেফার্ট ছায়াপথ। 1943 খৃস্টাব্দে কার্ল সেফার্ট এই শ্রেণীর ছায়াপথ আবিষ্কার করেন ও প্রায় এক ডজন সেফার্ট ছায়াপথ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। সেফার্ট ছায়াপথ খুব দূরে নয় এমনি কিছুটা স্বাভাবিকও বটে। তবে এই সব ছায়াপথের বিশেষত্ব হলো এদের কেন্দ্রাঞ্চল ছোট, অনুপাতে যথেষ্ট উজ্জ্বল, অস্বাভাবিক উত্তপ্ত ও সক্রিয় কতকটা কোয়াসারের মত। তাদের বেতার বিকিরণের হ্রাস-বৃদ্ধির দ্রুততা কোয়াসারের কথাই মনে করিয়ে দেয়। সেফার্ট ছায়াপথ 3C 120-এর কেন্দ্রাঞ্চল গোটা ছায়াপথের আটভাগের একভাগ–কিন্তু বাকী ছায়াপথের অংশ থেকে প্রায় তিনগুণ উজ্জ্বল। এথেকে অনেক বিজ্ঞানী অনুমান করেন দূরবর্তী

কোয়াসারগুলি কোন সেফার্ট ছায়াপথের কেন্দ্রাঞ্চল নয় তো? NGC 4151-এর মত সেফার্ট ছায়াপথের কেন্দ্রে মাত্র 12 আলোক বছর ব্যবধানে প্রায় 100 কোটি নক্ষত্র আছে।

এই সব পটভূমি থেকে স্বভাবতঃই মনে হয় মহাকাশে এক দিকে কৃষ্ণবিবর ও অন্যত্র শ্বেতবিবরের অস্তিত্ব অসম্ভব নাও হতে পারে। এ দুয়ের মিলনসেতু কীটবিবরে অজানা কোন কারণে বস্তু চলাচলের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে বলেই হয়তো কোয়াসারের উজ্জ্বলতায় হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।

বিবরতত্ত্ব ও সৃষ্টিপ্রসঙ্গ

আমাদের আবিষ্কৃত কোয়াসারগুলি রয়েছে অনেক দূরে। তাদের যে বিকিরণ আজ আমরা ধরতে পারি তা কোয়াসার থেকে বেরিয়েছে কোটি কোটি বছর আগে। তাই কীটবিবর তত্ত্বের সঙ্গে হয়তো অসঙ্গতি দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু এই সব তত্ত্বের সঙ্গে বিশ্বসৃষ্টির তত্ত্বগুলির সঙ্গতিও বজায় আছে কিনা দেখতে হবে। তা দেখতে গিয়ে আরও বৃহত্তর কল্পনার রাজ্যে আমরা এসে পৌঁছই।

বিশ্বের সম্প্রসারণের বর্তমান সীমা কি নির্দিষ্ট? কীটবিবরের মাধ্যমে সঙ্কুচিত অতীতের কোন বিবরে কি বস্তু আবার নূতন ভাবে সম্প্রসারণের জন্য তৈরি হচ্ছে? বিবর্তনশীল বিশ্বসৃষ্টিতে আদিম লগ্নে ঘটেছিল মহাজাগতিক অণ্ডের বিশাল বিস্ফোরণ। সেই সময়ের বিস্ফোরণজাত বিকিরণ, সৃষ্টির কোটি কোটি বছর পরে লাল সরণের ফলে মাইক্রোতরঙ্গদৈর্ঘ্যের পাল্লায় এখনও পাওয়া যায়। 1964 খৃস্টাব্দে আর্নো এ পেনজিয়াস ও রবার্ট ডব্লু উইলসন 7·35 সেমি. দৈর্ঘ্যের এই মহাকাশ বিকিরণ আবিষ্কার করেন। বিশাল বিস্ফোরণ তত্ত্বের পক্ষে এই বিকিরণই সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করেছে। শ্বেতবিবর বা কোয়াসার কি ছোট ছোট বিস্ফোরণ যা একদা জুড়ে গিয়ে বিশাল বিস্ফোরণের সৃষ্টি করেছিল—যার অবশেষ 7·35 সেমি. দৈর্ঘ্যের মাইক্রোতরঙ্গ বিকিরণ এখন আমরা ধরতে পারি? বিশ্ব যদি বিবর্তনশীল তবে এই বিবর্তনের শক্তির উৎস কোথায়? পদার্থবিজ্ঞানীরা বলেন বিশ্বের সম্প্রসারণে এনট্রপি বেড়ে চলেছে। কীটবিবরের মাধ্যমে বস্তুপুঞ্জের যে উত্তরণ ঘটে তাতে কি এনট্রপি হ্রাস পায় ও নূতন সৃষ্টির সূচনা হয়?

এসব প্রশ্ন আমাদের এক দর্শনের জগতে পৌঁছে দেয় যেখানে ঋগ্বেদের ঋষির পুরাতন সেই প্রশ্ন আবার নূতন আকারে ফিরে আসে—

"তখন অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব কিছুই ছিল না, বায়ুমণ্ডল ও মহাকাশ ছিল না, মৃত্যু ও অমৃত কিছুই নয়, ছিল শুধু তমসা আর তার অন্ধকারে ডুবে ছিল আদিম কালের সলিল প্রবাহ। কোথায় এর জন্ম, কোথা থেকে এল সৃষ্টি, কোথায় এর আদিম প্রকাশ, তা কে নিশ্চিতভাবে বলতে পারে? সর্বদর্শী দেবতারাও নয়, কারণ তাঁদেরও তো আবির্ভাব হয়েছে পরে।"

হরমোন উৎপাদনক্ষম জীবাণু এবং কৃষিবিজ্ঞানে তার প্রয়োগ

শ্যামল বণিক*

জীবাণুর প্রকৃতি সম্বন্ধে যাঁরা কিছুমাত্র জানেন তাঁরাই বোঝেন জীবাণু মাত্রই ক্ষতিকারক নয়। এমন অনেক জীবাণুই আছে যাদের অভাবে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারত। বর্তমানে এক শ্রেণীর জীবাণুর সন্ধান পাওয়া গেছে যাদের সুষ্ঠু প্রয়োগে মানব সমাজের অসীম কল্যাণ হতে পারে। এ ধরণের একপ্রকার জীবাণুই এই প্রবন্ধের আলোচনার বিষয়।

জীবাণু বায়ুমণ্ডলীয় আণবিক পর্যায়ের নাইট্রোজেন থেকে জটিল জৈব নাইট্রোজেন গঠন করতে পারে (জৈব কোষে প্রোটিন হিসাবে) যাকে নাইট্রোজেন বন্ধন বলে অভিহিত করা হয়। কৃষিবিজ্ঞানীদের কাছে এ তথ্য এক অমূল্য সম্পদ তাই এ নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। নাইট্রোজেন বন্ধনকারী জীবাণু ও কৃষিশস্যের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের প্রচেষ্টা এর মধ্যে অন্যতম প্রধান। এ সম্বন্ধে পত্র-পত্রিকায় অনেক আলোচনা হয়েছে, তবুও আলোচনার যথেষ্ট সুযোগ আছে।

উদ্ভিদকুলের প্রয়োজনীয় খনিজ উপাদানের মধ্যে ফসফরাস, নাইট্রোজেনের পরই স্থান পেয়ে থাকে ; যদিও একের গুরুত্ব অপরের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। জীবাণু যে প্রাকৃতিক পাথরে ফসফরাসকে দ্রবণীয় করে তা উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী করে তুলতে পারে এ তথ্য 1903 খৃস্টাব্দে প্রথম জানা গেলেও মাত্র 1948 খৃস্টাব্দের পর থেকে এ তথ্যের উপর প্রথম গুরুত্ব আরোপিত হয় যখন রুশদেশীয় মহিলা বিজ্ঞানী স্পিকডসাইয়া এবং তারপর মেনাকিনা 1950 খৃস্টাব্দে উচ্চ ক্ষমতাশালী বিশুদ্ধ ফসফেট জীবাণু মৃত্তিকা থেকে সংগ্রহ করে তার উজ্জ্বল ভাবিষ্যতের কথা ঘোষণা করেন। এরপর থেকে রুশদেশে প্রচুর গবেষণা হয়েছে এবং এর ফলে নূতন নূতন প্রজাতির জীবাণু আবিষ্কৃত হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে এইসব জীবাণুর প্রয়োগ করে প্রচুর সুফলও পাওয়া গেছে। আমাদের দেশেও এই ফসফেট জীবাণুর গবেষণা পিছিয়ে থাকে নি। বিভিন্ন দেশে কৃষিক্ষেত্রে এই জীবাণুসার প্রয়োগ করে প্রচুর সুফল পাওয়া গেলেও মার্কিন বিজ্ঞানীরা কিন্তু তা মানতে রাজি হন নি। এর জন্য বিপ্রতীপ গবেষণাও হয়েছে। মার্কিন বিজ্ঞানীরা জীবাণুসার প্রয়োগের ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহী নন, বরং তাঁরা রাসায়নিক সারকেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ মনে করছেন। এরই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ গবেষণা করে, বৃটিশ মহিলা বিজ্ঞানী মার্গারেট ব্রাউন 1972 খৃস্টাব্দে নাইট্রোজেন বন্ধনকারী জীবাণুর উদ্ভিদ হরমোন উৎপাদন ক্ষমতার সন্ধান পান। তিনি দাবী করেন যে গবেষণাগারের কৃত্রিম পরিবেশে জীবাণু উল্লেখযোগ্য পরিমাণে নাইট্রোজেন বন্ধনে সমর্থ হলেও কৃষি জমিতে তারা প্রতিযোগিতায় পেরে উঠে না, তবু তাদের প্রয়োগ করে যে সুফল পাওয়া যায় সেটা নাইট্রোজেন বন্ধনের চেয়ে উদ্ভিদ হরমোন উৎপাদনের জন্য বলাই শ্রেয়। এ সম্বন্ধে ফসফরাস জীবাণুর উপর গবেষণা চালিয়ে যে সুফল পাওয়া গেছে সে তথ্যই এ প্রবন্ধে মূল বক্তব্য।

প্রথমে দেখা যাক উল্লিখিত ফসফরাস জীবাণু কিভাবে কাজ করে। প্রাণী এবং উদ্ভিদের মতই জীবাণুর ক্ষেত্রেও ফসফরাস একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। এই ফসফরাস চাই জলে দ্রবীভূত পর্যায়ের। কিন্তু তা সবক্ষেত্রে মেলে না, ফলে জীবাণুদের বেঁচে থাকার জৈবিক প্রয়োজনে এবং বংশরক্ষার তাগিদে অন্য পথের শরণাপন্ন হতে হয়। এক একটি অদ্ভুত প্রক্রিয়ার সাহায্যে জীবাণুরা অদ্রবণীয় জৈব এবং অজৈব ফসফরাস সমৃদ্ধ পদার্থ থেকে তাদের প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে। এ সকল প্রক্রিয়া দ্বারা যে পরিমাণ ফসফরাস দ্রবণীয় হয়ে পড়ে, তা জীবাণুদের জৈবিক প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী এবং সেখানেই উদ্ভিদের লাভ, তাই সেদিকেই কৃষিজীবাণুবিজ্ঞানীদের নজর।

এখন দেখা যাক প্রক্রিয়াগুলি কি কি? এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে এই শ্রেণীর সকল জীবাণুই কিন্তু মৃতজীবী (saprophytes) অর্থাৎ একশ্রেণীর জীবাণু যখন জৈব বিপাকীয় বিক্রিয়া ঘটায়, তখন তাদের জীবকোষের অভ্যন্তরে প্রচুর পরিমাণে জৈব অ্যাসিড উৎপন্ন হয় যা নির্গত হয়ে অদ্রবণীয় খনিজ ফসফরাসকে দ্রবণীয় করে ফেলতে পারে। আর এক শ্রেণীর জীবাণু তাদের শ্বসনকাজে উৎপন্ন করে প্রচুর কার্বন ডাই-অক্সাইড। সেই কার্বন ডাই-অক্সাইড জলে দ্রবীভূত হয়ে যে কার্বনিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে তাও অদ্রাব্য পাথরে ফসফেট থেকে দ্রবণীয় পর্যায়ের ফসফরাস নির্গমনের সহায়ক। অন্য এক শ্রেণীর জীবাণু, গন্ধক জাতীয় দ্রব্যকে বিজারিত করে যে হাইড্রোজেন সালফাইড উৎপন্ন করে তা মৃত্তিকার অদ্রবণীয় ফেরিক ফসফেটের উপর ক্রিয়া করে দ্রবণীয় ফসফরাস উৎপন্ন করে। আর এক শ্রেণীর জীবাণু আছে, যারা উৎসেচক নির্গত করে অদ্রবণীয় জৈব ফসফরাস সমৃদ্ধ যোগ থেকে দ্রবণীয় পর্যায়ের অজৈব ফসফেট মুক্ত করে। কয়েক প্রকার স্বভোজী জীবাণু স্বল্প পরিমাণ খনিজ অ্যাসিডের সাহায্যে একাজ করে থাকে। কিন্তু এদের দ্বারা উৎপন্ন দ্রবণীয় ফসফরাসের পরিমাণ খুবই কম। কৃষিক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে

*35/E, পাত্রমার রোড, ভদ্রকালী, উত্তরপাড়া, হুগলী

বলিষ্ঠ ভূমিকা নেয় প্রথম শ্রেণীর জীবাণুরা। আর এই প্রক্রিয়াটি বহুগুণে বিবর্তিত হয়ে উঠে জমিতে প্রয়োজনীয় জৈব সার প্রয়োগের ফলে।

মৃত্তিকাতে ফসফরাস নানা জৈব ও অজৈব উপাদান হিসাবে পাওয়া যায়। তার মধ্যে অন্যতম মুখ্য অজৈব উপাদান-গুলি হলো ট্রাইক্যালসিয়াম ফসফেট [$Ca_3(PO_4)_2$] অ্যালুমিনিয়াম ফসফেট $AlPO_4$], ফেরিক ফসফেট [$FePO_4$] এবং অদ্রবণীয় বিজারক অ্যালুমিনিয়াম ও ফেরিক ফসফেট। জৈব উপাদান হিসাবে ফসফরাস পাওয়া যায় বিভিন্ন ইনোসিটল ফসফেটের সমাংশ, ফসফোলিপিড, নিউক্লিক অম্ল এবং ফসফেট ঘটিত এস্টার যৌগে। অ্যাসিড দ্বারা ফসফেট দ্রবণীয় হবার পথ নীচে দেখানো হলো।

$$\underset{\text{অদ্রবণীয়}}{PO_4^{-3}} \xrightarrow{H^+} \underset{\text{দ্রবণীয়}}{HPO_4^{-2}} \xrightarrow{H^+} \underset{\text{দ্রবণীয়}}{H_2PO_4^-}$$

জটিলতা এড়ানোর জন্য রাসায়নিক বিক্রিয়া উল্লেখ করা হলো না। এবার আসা যাক উদ্ভিদ হরমোন (phyto hormone) প্রসঙ্গে। উদ্ভিদ হরমোন হিসাবে যে কয়টি যৌগের সন্ধান আমরা পেয়েছি তার মধ্যে প্রধান হলো ইনডোল অ্যাসিটিক অ্যাসিড; ইনডোল বিউটিরিক অ্যাসিড, জিব্রালিন, সাইটোকাইনিন, জিব্রালিক অ্যাসিড ইত্যাদি। এই হরমোনগুলির প্রধান কাজ হলো উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা। ব্রাউনের পরবর্তী যুগে কার্বনেলসন ও সহকারী বৃন্দ কয়েকটি মৃত্তিকা জীবাণুর উপরিউক্ত দুই শ্রেণীর হরমোন উৎপাদন ক্ষমতার সন্ধান পেয়েছেন। বিভিন্ন শ্রেণীর মৃত্তিকা থেকে সংগৃহীত অতি উচ্চমানের (রাশিয়ার ফসফেট জীবাণু অপেক্ষা উৎকৃষ্ট) ফসফেট জীবাণু (phosphate solubilizing) 'ব্যাসিলাস ফারমাসের' দুটি প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে। তাদের হরমোন উৎপাদন ক্ষমতার পরীক্ষা করতে গিয়ে সাড়া পাওয়া গেছে। এই ব্যাসিলাস ফারমাস জীবাণু ইনডোল-3 অ্যাসিটিক অ্যাসিড উৎপাদন করতে সক্ষম। বর্তমানে এ সম্বন্ধে Indian Agriculturist Vol-22, 1978 এর 2য় সংখ্যায় তথ্যটি প্রকাশিত হয়েছে। জীবাণু দুটি সংরক্ষণের জন্য National Chemical Laboratory, Pune-তে National Collection of Industrial Microorganisms এ (Ref. No. NCIM-2636 এবং 2637) রক্ষিত আছে। এই জীবাণুগুলি নিশ্চিতকরণের জন্য Common Wealth Mycological Institute, Kew, Surray, U. K-তে পাঠানো হয়েছিল। তাদের code number যথাক্রমে IMI No. B-7647 এবং B-7650. মনে হয় এই ধরনের জীবাণু এক পরম শক্তিশালী জীবাণুসার রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। কারণ একদিকে এই জীবাণু উদ্ভিদকে দিবে প্রয়োজনীয় ফসফোরাসের যোগান (অদ্রবণীয় পাথুরে ফসফেট থেকে), অন্যদিকে বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় হরমোন উৎপাদন করে গাছের স্বাস্থ্যও করে তুলবে মজবুত। ফলে ফলনও বাড়বে অনেকাংশে।

জীবাণু দ্বারা মৃত্তিকার ফসফরাস সমৃদ্ধ অণুর বিবর্তনচক্র

মৃত্তিকা এবং ফসফরাস সমৃদ্ধ প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহাবশেষ

তিলাপিয়া সম্পর্কে দু-চার কথা

অরূপকুমার লক্ষ্মণ*

তিলাপিয়া মাছকে আমরা প্রায়ই বাজারে দেখি। এটি কিন্তু এ-দেশীয় মাছ নয়—বিদেশ থেকে আমদানী করা একটি মাছ। এই মাছের চাষ আমাদের দেশে বেশী দিন পূর্বে আরম্ভ না হলেও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে এই মাছ চাষের প্রচলন দীর্ঘ দিন পূর্ব থেকেই ছিল। মিশরের একটি কবরের উপরের কারুকার্য থেকে জানতে পারা যায় যে প্রায় খৃষ্টপূর্ব আড়াই হাজার বৎসর পূর্বেও সেখানে এই মাছ চাষের প্রচলন ছিল। মণ্ডপমে অবস্থিত সেণ্ট্রাল মেরিন ফিসারিজ রিসার্চ স্টেশন 1952 খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম এই মাছকে আমাদের দেশে আনে। পরে সেখান থেকে বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

তিলাপিয়ার বিভিন্ন প্রজাতি—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তিলাপিয়ার চোদ্দটির বেশী প্রজাতি দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে সাধারণত যে প্রজাতির চাষ করা হয় তাকে বলে জাভা তিলাপিয়া (Tilapia mossambica)। আরও কয়েকটি প্রজাতি যেগুলি বিভিন্ন দেশে দেখতে পাওয়া যায় যেমন কঙ্গো তিলাপিয়া (T. melanopleura), জিলি তিলাপিয়া (T. zilli), নীলের তিলাপিয়া (T. nilotica), জিঞ্জিবার তিলাপিয়া (T. hornorum) ইত্যাদি। দেহ প্রোটিনের উৎকৃষ্টতা, শরীরের বৃদ্ধি, কষ্টসহিষ্ণুতা, দ্রুত বংশ-বৃদ্ধির দিক বিচার করে বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই জাভা তিলাপিয়ার জনপ্রিয়তা দেখা যাচ্ছে।

বহিরাকৃতি—বিভিন্ন প্রজাতির তিলাপিয়ার বহিরাকৃতির কম বেশী পার্থক্য থাকে। আমাদের দেশে সাধারণত জাভা তিলাপিয়ার চাষ করা হয়ে থাকে। এদের দেহ পাশের দিকে কিছুটা চ্যাপ্টা, রং ধূসর পিঙ্গল বর্ণ, কিছুটা অলিভ আভাযুক্ত, পাখ্‌নাগুলির প্রান্ত কিছুটা হলদে। পরিণত পুরুষ মাছগুলির গায়ের রং স্ত্রীমাছগুলি অপেক্ষা কিছুটা গাঢ় হয় (চিত্র-1)।

বাসস্থান—স্বাদু জলে বাস করলেও কোন কোন প্রজাতির তিলাপিয়া লবণাক্ত জল সহ্য করতে পারে। যেমন জাভা তিলাপিয়াকে 35% লবণাক্ত জলে বাস করতে এমনকি ডিম পাড়তে দেখা গেছে। আবার কিছু প্রজাতি আছে যেমন Tilapia aurea, এদের কেবল স্বাদু জলেই দেখতে পাওয়া যায়। তিলাপিয়া উষ্ণ পরিবেশের মাছ হলেও এদের বিভিন্ন প্রজাতির তাপসহনশীলতা বিভিন্ন রকমের।

স্বভাব—তিলাপিয়া একেবারে শান্ত প্রকৃতির মাছ নয়, আবার অন্য শিকারী মাছের মত উগ্রও নয়। সময় বিশেষে এরা অন্য জাতের মাছকে সহ্য করতে পারে না। এ অবস্থায় এরা অন্য জাতের মাছের পাখ্‌নাতে ছোবল মারে। তিলাপিয়া মাছের সঙ্গে কাতলা মাছ চাষ করলে সেজন্য কাতলা মাছের বেশ ক্ষতি হয়।

খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস—তিলাপিয়া মাছেরা প্রধানত উদ্ভিদ-ভোজী। এদের বিভিন্ন প্রজাতি বিভিন্ন জলজ উদ্ভিদ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। যেমন জলজ উদ্ভিদ কণা, সুতাকৃতি
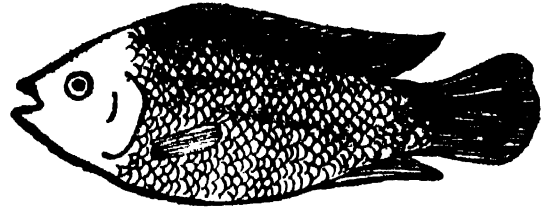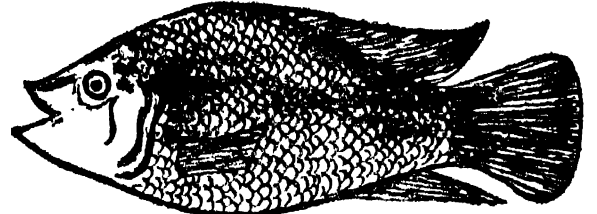
চিত্র-1

শৈবাল। আবার কোন কোন প্রজাতি মাঝামাঝি আকৃতির বিভিন্ন ধরনের জলজ আগাছাদের খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। জিলি তিলাপিয়ায় এই ধরনের খাদ্যগ্রহণের অভ্যাস থাকায় কোন কোন দেশে জলজ আগাছা নিয়ন্ত্রনে এদের কাজে লাগিয়ে বেশ সুফল পাওয়া গিয়েছে।

প্রজনন এবং অপত্য স্নেহ—স্ত্রী, পুরুষ জাভা তিলাপিয়া 2-3 মাস বয়সেই প্রজননক্ষম হয়। ডিম পাড়ার পক্ষে পর্যাপ্ত জলের উষ্ণতা থাকলে স্ত্রী মাছেরা প্রতি 2-3 সপ্তাহ অন্তর ডিম পাড়ে। যেখানে বৎসরের কোন সময়ে জলের উষ্ণতা কমে তাদের সহ্য সীমার নীচে চলে যায় তখনই কেবল তাদের প্রজনন কার্য বন্ধ থাকে। সেজন্য বিষুবরেখার কাছাকাছি দেশে এরা বৎসরের প্রায় সব সময় প্রজননক্ষম থাকে।

*গ্রাঃ+পোঃ—কেঞ্জেকুড়া, বাঁকুড়া

প্রতি হাজার বর্গমিটার জলাশয়ে 25-30টি স্ত্রী এবং 10-12টি পুরুষ মাছ ডিম পাড়ার পক্ষে উপযুক্ত। তবে পুকুরের তলদেশ নরম কাদাবালি যুক্ত হলে এদের ডিম পাড়ার জন্য বাসা তৈরি করতে সুবিধা হয়। জলের উষ্ণতা ডিম পাড়ার উপযুক্ত হলে জাভাতিলাপিয়া এবং আরও কয়েকটি প্রজাতির পরিণত পুরুষেরা জলের নীচে কাদাবালিতে 25-30 সেণ্টিমিটার ব্যাসযুক্ত এবং 5-6 সেণ্টিমিটরে গভীরতা যুক্ত থালাকৃতি গর্ত করে বাসা তৈরি করে এবং পরিণত স্ত্রীমাছদের এতে ডিম পাড়তে আমন্ত্রণ জানায়। স্ত্রীমাছের ডিম পাড়ার সময় পুরুষ মাছ সতর্ক প্রহরীর মত বাসার আশে-পাশে ঘুরে বেড়ায়। স্ত্রীমাছ এক সঙ্গে 70-250টি ডিম পাড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে এদের নিজের মুখগহ্বরে ভরে নেয়। পুরুষ মাছ তখন বাসাতে শুক্রাণু ছাড়তে আরম্ভ করলে স্ত্রীমাছ সঙ্গে সঙ্গে তাও মুখ গহ্বরে ভরে নেয়, শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর মিলন মুখগহ্বরেই সম্পন্ন হয়। 2-5 দিনের মধ্যে মুখগহ্বরেই ঐ নিষিক্ত ডিম ফুটে ডিমপোনা

চিত্র-2
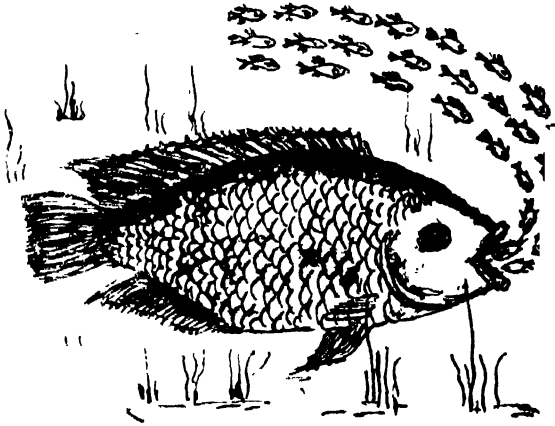
বেরিয়ে আসে এবং যতদিন পর্যন্ত না ওদের দেহের কুসুম নিঃশেষ না হয় ততদিন ওরা সেখানেই নিরাপদ আশ্রয়ে থাকে। ফলে এদের মৃত্যুর হার বেশ কম। তারপর মুখগহ্বর থেকে বেরিয়ে এসে এরা কিছুদিন মায়ের কাছাকাছি ঘুরে বেড়ায়। তখন একটু ভয় পেলেই এরা দ্রুত এসে মায়ের মুখগহ্বরে আশ্রয় নেয় যা তাদের নিকট বেশ আরামদায়ক এবং নিরাপদ। (চিত্র-2)। ডিমপোনাগুলিতে মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে অন্য স্থানে পালন করলেও কোন অসুবিধা হয় না।

তিলাপিয়ার অধিকাংশ প্রজাতিতে ডিম ফুটে ডিমপোনা বেরিয়ে আসার পদ্ধতি জাভাতিলাপিয়ার মতই। তবে কয়েকটা প্রজাতিতে এ ব্যাপারে কিছুটা পার্থক্য আছে। যেমন Tilapia heudeloti-তে স্ত্রীর পরিবর্তে পুরুষ মাছ ডিম ফোটানোর কাজটা সম্পন্ন করে। এখানে মাতার চেয়ে পিতার অপত্যস্নেহটা যেন একটু বেশী। আর স্ত্রীমাছ ডিম পেড়েই তার কর্তব্য শেষ করে। Tilapia galilia-তে স্ত্রী, পুরুষ উভয়েই এ কাজ করে, সন্তানদের লালন-পালনে উভয়ের স্নেহ সমান। আরও কয়েকটি প্রজাতি আছে যেমন Tilapia sparmani এবং Tilapia zilli-তে দেখা যায় স্ত্রী, পুরুষ উভয়েই অপত্য স্নেহটা তুলনামূলক ভাবে বেশ কম। স্ত্রী, পুরুষ কেউই মুখ গহ্বরের নিরাপদ আশ্রয়কে ডিম ফোটানোর কাজে লাগায় না। স্ত্রীমাছেরা জলের নীচে কোন কঠিন মসৃণ বস্তু বা পাথরের উপর ডিম পেড়ে চলে যায়। মুখগহ্বরের বাইরে ডিমপোনাদের নিরাপত্তা কম। সেজন্য এইসকল প্রজাতির মাছের ডিমের সংখ্যা স্বাভাবিক কারণে অন্য সব প্রজাতির তুলনায় কিছুটা বেশী।

তিলাপিয়া চাষের সুবিধা এবং অসুবিধা—অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাছচাষের প্রধান অসুবিধাগুলির মধ্যে একটি হলো এর ডিম-পোনা সংগ্রহ করা। সহজে এবং সস্তায় ডিমপোনা সংগ্রহ সেই জাতীয় মাছ চাষের সম্প্রসারণে অনেকটা সাহায্য করে। তিলাপিয়া মাছ চাষে এই ব্যাপারে কোন সমস্যা নাই। এদের ডিমপাড়ার জন্য কোন ব্যবস্থাই নিতে হয় না বরং কোন কোন ক্ষেত্রে এদের ডিমপাড়া বন্ধ করা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া এই মাছেরা জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের স্বল্পতা সহ্য করতে পারে। সেজন্য শহর এবং নগরের পয়ঃপ্রণালীর জলে এদের চাষ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। এদের কোন প্রজাতি জলের লবণাক্ততা বেশ সহ্য করতে পারে। সূতাকৃতি শেওলা (filamentous algae), এবং কিছু কিছু জলজ আগাছা নিয়ন্ত্রণে তিলাপিয়ার কোন কোন প্রজাতিদের কাজে লাগানো যায়। এইসকল বিভিন্ন কারণে এই মাছের চাষ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শীঘ্রই ছড়িয়ে পড়েছে।

অতিরিক্ত বংশবৃদ্ধি তিলাপিয়া চাষে ভীষণ অসুবিধার সৃষ্টি করে। কারণ এর ফলে মাছগুলির দৈহিক বৃদ্ধি ভীষণ কমে যায়। এই অসুবিধা দূর করার জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন মাপের ঘরের (mesh) জাল টেনে বাচ্চা মাছদের পৃথক করা আপাতদৃষ্টিতে সহজ হলেও কাজটি বেশ কঠিন। কারণ জলাশয়ের সব কয়টি স্ত্রীমাছ একই সঙ্গে ডিম পাড়ে না। ফলে আজ হয়তো জাল টেনে কিছু বাচ্চা মাছদের সরিয়ে দেওয়া গেল কিন্তু কয়েকদিন পরে দেখা যাবে যে জলাশয়টি আবার নূতন বাচ্চায় পূর্ণ হয়ে গেছে।

শাল, শোল প্রভৃতি শিকারী মাছ তিলাপিয়ার সঙ্গে চাষ করলে এ ব্যাপারে অনেকটা সুফল পাওয়া যায়। ঐ শিকারী মাছেরা তিলাপিয়ার ধানীপোনাদের খেয়ে ফেলে এদের দ্রুত বংশবৃদ্ধির হারকে অনেকটা রোধ করতে পারে।

কোন জলাশয়ে কেবলমাত্র স্ত্রী অথবা পুরুষ তিলাপিয়ার চাষ (monosex culture) করলে এ অসুবিধা অনেকটা দূর হয়। দেহের রং, জননপিড়িকা (genital papillae) প্রভৃতি বহিরাকৃতি লক্ষ্য করে তিলাপিয়ার স্ত্রী-পুরুষ নির্ণয় করা

যায়, তবে এ কাজে বেশ দক্ষতার প্রয়োজন হয়। খুব দক্ষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা বেশীর পক্ষে 80—90 শতাংশ সঠিক হয়। এভাবে স্ত্রী-পুরুষ পৃথক করে মাছ চাষ করলে বেশ অসুবিধা আছে। কারণ ভুলবশতঃ যে কয়টি স্ত্রী-পুরুষ মাছ চাষের জলাশয়ে চলে আসে তাতে সমস্ত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়।

তবে এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী সুফল পাওয়া যায় বিশেষ বিশেষ কয়েকটি প্রজাতির তিলাপিয়ার মধ্যে সংকরায়ন পদ্ধতি অবলম্বনে। নীচে কয়েকটি আন্তঃপ্রজাতি সংকরায়ন উল্লেখ করা হলো যেখানে সংকর অপত্যগুলির শতকরা 100 ভাগই পুরুষ।

(1) Tilapia hornorum পুরুষ এবং T. mossambica স্ত্রী।

(2) T. mossambica (জাঞ্জিবারস্টক) পুরুষ এবং T. nilotica (লেক আলবার্ট স্টক) স্ত্রী।

(3) T. macrochir পুরুষ এবং T. nilotica স্ত্রী।

(4) T. nilotica পুরুষ এবং T. macrochir স্ত্রী।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে শেষের দুটি সংকরায়ন ঘটানো অপেক্ষাকৃত কঠিন। উপরিউক্ত উপায়ে যে সকল ডিমপোনা এবং ধানীপোনা পাওয়া যায় তার দ্বারা তিলাপিয়ার চাষ করলে জলাশয়ে মাছের সংখ্যা অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে আর সমস্যার সৃষ্টি করে না এবং পুরুষ মাছগুলির বৃদ্ধিও দ্রুত হয়।

উৎপাদনের হার—গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে সাধারণ ভাবে চাষ করলে হেক্টর প্রতি 500 কিলোগ্রামের মত ফলন পাওয়া যায়। কিন্তু পুকুরে সার প্রয়োগ, পরিপূরক খাদ্যের ব্যবহার এবং অন্যান্য যত্ন নিলে হেক্টর 1000-2500 কিলোগ্রাম মাছের ফলন পাওয়া যায়। একক চাষ অপেক্ষা মিশ্রচাষে জলাশয়ের সামগ্রিক ফলন বৃদ্ধি পায়। একটি পরীক্ষায় দেখা গেছে ক্যাটফিশের একক চাষে হেক্টর প্রতি ফলন ছিল 1400 কিলোগ্রাম কিন্তু তিলাপিয়া এবং ক্যাটফিশের মিশ্রচাষে সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় হেক্টর প্রতি 1834 কিলোগ্রাম অর্থাৎ দেখা যায় জলাশয়ের সামগ্রিক উৎপাদন 30 3 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তিলাপিয়ার মিশ্র চাষে বিশেষ সুফল পাওয়া গেলেও আমাদের দেশে কেন্দ্রীয় অন্তর্দেশীয় মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রের একটি পরীক্ষায় কাতলা, মিল্ক ফিশ (Chanos chanos) এবং তিলাপিয়ার মিশ্রচাষের ফল কিন্তু তেমন উৎসাহজনক নয়। কারণ ঐ চাষে কাতলা মাছ নির্মূল হয়ে গিয়েছিল। মৎস্যবিজ্ঞানীদের ধারণা সম্ভবতঃ তিলাপিয়ার সঙ্গে মিশ্রচাষের জন্য তা ঘটেছে, অর্থাৎ কাতলার সঙ্গে তিলাপিয়া মিশ্রচাষের উপযোগী নয়। বর্তমানে আমাদের দেশে মৎস্যবিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখছেন যে কোন কোন জাতের মাছ তিলাপিয়ার সঙ্গে মিশ্রচাষের উপযোগী এবং কোন পরিবেশের জলাশয়ে বিশেষ করে যেখানে কার্প জাতীয় মাছের চাষ করা অসুবিধাজনক, সেখানে এই মাছ চাষ করে সুফল পাওয়া যাবে। আশা করা যায় আমাদের দেশের মৎস্যবিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে শীঘ্রই অন্যান্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মত ভারতেও এই মাছের চাষকে লাভজনক করা যাবে।

ফার্স্ট এইড শিক্ষক প্রশিক্ষণ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে স্কুল ফাইনাল বা তদূর্ধ্বমানের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ফার্স্ট এইড শিক্ষক প্রশিক্ষণ চালু করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ লাভে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের 31 শে জুলাইয়ের (1983) মধ্যে পরিষদের অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে বিস্তৃত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
'সত্যেন্দ্র ভবন'
কলিকাতা—700 006
ফোন : 55-0660

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

কবিরাজ গণনাথ সেন ও ভাবী আয়ুর্বেদের ইশারা*

মাধবেন্দ্রনাথ পাল**

জীবনকথা

অবিরাম সংগ্রাম কোন কোন মানুষকে সাফল্যের তুঙ্গে ঠেলে তুলে নিয়ে যায়, এমনই সংগ্রামীদের মধ্যে স্বর্গত কবিরাজ গণনাথ সেন অন্যতম।

গণনাথের পিতৃকুলের আদি নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ডগ্রাম। এ'দের পূর্বপুরুষগণ বারানসীধামে আয়ুর্বেদের চর্চা ও পেশায় চারপুরুষ ধরে সুখ্যাতি লাভ করেছিলেন। এই বংশের উজ্জ্বল সন্তান স্বর্গত কবিরাজ বিশ্বনাথ সেন বিদ্যাকল্পদ্রুম সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ও আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় প্রবল পারদর্শী ছিলেন। ইনিই ছিলেন গণনাথের পিতৃদেব। তাঁর মাতৃদেবী সৌদামিনী শ্রীপঞ্চমীর পূর্বদিন গণেশ চতুর্থীতে ব্রত নিয়ে সিদ্ধিদাতা গণপতির আরাধনার পর বঙ্গাব্দ 1284, 13ই আশ্বিন, শুক্রবার (ইং 1877 অক্টোবর) এ'কে বারানসীতে লাভ করেছিলেন; সেজন্য পিতামহ কবিরাজ কুঞ্জবিহারী সেন পৌত্রের নাম করেন গণনাথ।

পাঁচ বৎসর বয়সে মাতৃহারা গণনাথ 1883 খৃস্টাব্দে পিতার সঙ্গে কলকাতা আসেন। এরপর দুই বৎসরের মধ্যে গণনাথ সমগ্র 'অমরকোষ' এবং পানিনির অষ্টাধ্যায়ীসূত্র মুখস্ত করেন। এতে সকলেই আশ্চর্যান্বিত হন। মাত্র দশ বৎসর বয়সেই গণনাথ সুললিত সংস্কৃতে শ্লোক রচনা এবং সংস্কৃতে আলাপ করতে পারতেন। 1890 খৃস্টাব্দে তের বৎসর বয়সে গণনাথ সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন; গণনাথ পনের বৎসর বয়সে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন। এই সময়ে তিনি পিতার নিকট 'সুশ্রুত সংহিতা' পড়তে সুরু করেন এবং এক বৎসরের মধ্যে সমাপ্ত করেন।

তাঁর পিতা 1890 খৃস্টাব্দে যখন মারা যান, তখন গণনাথ মাত্র ষোল বৎসরের যুবক। মামলা-মোকর্দমায় বিশ্বনাথ তাঁর বিষয় সম্পত্তি হারাতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাছাড়া পিতার এমন কোন আত্মীয়স্বজন ছিলেন না, যিনি গণনাথের ভরণপোষণ করতে পারেন। এইভাবে গণনাথকে জীবনসংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়; তিনি সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব মেধায় অর্জিত বৃত্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেন। পিতার মৃত্যুর তিন মাস পরে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কৃত কলেজ থেকে তিনি যথাক্রমে দশ টাকা ও ষোল টাকার যে বৃত্তি পেতেন তার সাহায্যে তিনি সেই কলেজে পড়াশুনা চালান। 1896 খৃস্টাব্দে বৃত্তি নিয়ে তিনি ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন। আঠারো বৎসর বয়সে তিনি পিতার প্রতিষ্ঠিত টোলটি আবার খুলে দিয়ে তিনি সেখানে অধ্যাপনা সুরু করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেও শ্যামবাজারের বিখ্যাত কবিরাজ স্বর্গত কালী-প্রসন্ন সেনের নিকট আয়ুর্বেদের পাঠ সমাপ্ত করেন। মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে তিনি আয়ুর্বেদশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে উঠেন ও আয়ুর্বেদ চিকিৎসা শুরু করেছিলেন।

আয়ুর্বেদের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে বা ব্যাপারে যথোচিত জ্ঞানের অভাব বা অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। সেজন্য তিনি 1898 খৃস্টাব্দে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন; প্রতি বৎসরই বৃত্তি ও পদকাদি পেয়ে তিনি 1903 খৃস্টাব্দে বিশেষ সম্মানের সঙ্গে পাশ করে এল. এম. এস ডিগ্রীলাভ করেন। ঐ একই বৎসরে তখনকার নিয়মানুসারে কোন কলেজে অধ্যয়ন না করেই মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েটগণ B.A. ও M.A. পরীক্ষা দিতে পারত। সেই নিয়মে তিনি 1907 খৃস্টাব্দেই B.A. ও M.A. পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হন এব M.A. পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণী লাভ করেন।

প্যাথলজি ও ব্যাকটিরিওলজি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে তিনি M.D. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন ও তাঁর প্রণীত থিসিস বিশেষ প্রসংশাসহ বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রেরিত হয়েছিল। কিন্তু নিয়মানুসারে Dean of Faculty of Medicine-এর নিকট থেকে স্বভাব ও চরিত্রে তিনি যে M.D. ডিগ্রী পাবার জন্য উপযুক্ত সেই সার্টিফিকেট না পাওয়ায় তাঁর সেই ডিগ্রী আর পাওয়া হয় নি। সেই সার্টিফিকেট না পাবার কারণ বিস্ময়কর ও আমাদের কাছে এখন হাস্যকর মনে হয়। তদানীন্তন Dean কর্ণেল হ্যারিস তাঁকে এই শর্তে সার্টিফিকেট দিতে প্রস্তুত ছিলেন যে, গণনাথ আয়ুর্বেদ চিকিৎসা করা ছেড়ে দিবেন। গণনাথ সে শর্ত পালন করতে আদৌ স্বীকৃত হন নি, এবং সেজন্য

* ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকায় রেজিস্ট্রিকৃত International Association for the Study of Traditional Asian Medicine সংস্থার Indian Chapter বোম্বাই শহরে 1983-র মার্চ 6-9, তারিখে যে Asian Conference পরিচালনা করেন, সেই অধিবেশনে লেখকের 'Kaviraj Gananath Sen and Neo-Ayurveda to come' শীর্ষক যে গবেষণা-পত্রটি পাঠ করা হয়েছিল, এই নিবন্ধটি তার সংক্ষিপ্তসার।

** অতিরিক্ত জেলাশাসক, বর্ধমান

তখনকার পাশ্চাত্য চিকিৎসক সমাজে তাঁকে renegade বা বিদ্রোহী আখ্যা পেতে হয়েছিল।

তিনি 1916 খৃস্টাব্দে মাত্র 39 বছর বয়সে ভারত সরকার প্রদত্ত মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করেন; তিনি ছাড়া আর কেউ এত অল্প বয়সে এই উপাধি পান নি। কাশীর ভারত ধর্ম মণ্ডল তাঁকে 'সরস্বতী' এবং বঙ্গদেশের পণ্ডিত মণ্ডলী তাঁকে বিদ্যাসাগর উপাধি দান করেন।

তিনি 1916 খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠার পর থেকে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় ও আয়ুর্বেদীয় আরোগ্যশালার (অধুনা যে প্রতিষ্ঠান যামিনী ভূষণ রায় স্টেট আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজ নামে পরিচিত) প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং প্রতিষ্ঠাতা তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু যামিনী ভূষণের অন্তিম ইচ্ছানুসারে তিনি 1926 থেকে 1932 খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠানে প্রিন্সিপ্যাল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নিজ ব্যক্তিগত তহবিল থেকে তিনি পনের হাজারের বেশী টাকা ঐ বিদ্যালয়ে দান করেন ও কঠোর পরিশ্রম করে আশিটি শয্যা সংযোজন করেন।

গণনাথ নিখিল ভারতীয় বৈদ্য সম্মেলন, যা The All India Ayurvedic Conference নামে বেশী পরিচিত, সেই সম্মেলনের 1911 খৃস্টাব্দে এলাহাবাদ, 1923 খৃস্টাব্দে ইন্দোর এবং 1930 খৃস্টাব্দে মহীশূর অধিবেশনের প্রেসিডেন্ট পদ অলংকৃত করেন। এইভাবে তিনবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার ঘটনা অভাবনীয় সম্মান ও গৌরবের বিষয়।

1911 খৃস্টাব্দ থেকে 1920 খৃস্টাব্দের মধ্যে গণনাথ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও প্রান্তে যেমন, দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, মথুরা, পাটনা, ত্রিবান্দ্রাম, হরিদ্বার, চট্টগ্রাম প্রভৃতি শহরে আয়ুর্বেদের প্রসারের জন্য পরিভ্রমণে গেলে, সেইসব স্থানের সুধীমণ্ডলী তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন।

গণনাথ 1927 খৃস্টাব্দে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় ও শিক্ষা বিভাগে Dean of Faculty of Ayurveda হয়েছিলেন। তাঁরই কঠোর পরিশ্রমের ফলে আধুনিকীকৃত আয়ুর্বেদের পাঠক্রম চালু হয়েছিল এবং উত্তর প্রদেশ আয়ুর্বেদ চিকিৎসকদের রেজিস্ট্রেশন দিবার জন্য আয়ুর্বেদ বোর্ড গঠন করেন এবং আয়ুর্বেদ পঠন-পাঠনের স্বীকৃতি দানের জন্য পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা এই বোর্ডের উপর ন্যস্ত ছিল।

তিনি বিহারেও আয়ুর্বেদের পঠন-পাঠনের জন্য পাটনার গভর্ণমেন্ট স্কুলের (পরবর্তীকালে যা কলেজে পরিণত হয়) অ্যাডভাইসার বোর্ডের প্রেসিডেন্ট রূপে কাজ করেন। ফলে সেখানে আয়ুর্বেদের প্রসার ও প্রগতি সম্পন্ন হয়েছিল।

গণনাথ বাংলা সরকারের গভর্ণরের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে দেখা করায় অবশেষে 1937 খৃস্টাব্দে এখানে আয়ুর্বেদ কাউন্সিল ও স্টেট ফ্যাকালটি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল, এবং তিনি প্রতিষ্ঠানের ভাইস প্রেসিডেন্ট রূপে কাজ করেন। বস্তুতঃ তিনিই এই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ছিলেন। 1969 খৃস্টাব্দ থেকে প্রতিষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গ আয়ুর্বেদ পরিষদ নামে বিধিবদ্ধ হয়েছে।

তিনি 94নং গ্রে স্ট্রীটের উপর অবস্থিত জমিতে নিজের বসবাসের জন্য এক লক্ষ টাকারও বেশী অর্থে একটি প্রসাদোপম বহুতল অট্টালিকা নির্মাণ করেন। 1932 খৃস্টাব্দে পিতার নামানুসারে সেখানে তিনি বিশ্বনাথ আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন, 1930 খৃস্টাব্দে বোর্ড অব ট্রাস্ট গঠন করে দানপত্র লিখে দেন। তার উন্নতিকল্পে প্রাথমিক সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি যার মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা তা দান করা ছাড়া তিনি বাৎসরিক আট দশ হাজার টাকা দান করতেন। অধুনা এই বিদ্যালয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার অধিগ্রহণ করে সেখানে 'আয়ুর্বেদ ফার্মেসী' পঠনের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন।

গণনাথ 1944 খৃস্টাব্দে 25শে অক্টোবর পরলোকগমন করেন।

অনুসন্ধান ও গবেষণা

1916 খৃস্টাব্দে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন কালে গণনাথ যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার একাংশে তিনি নীচের কথাগুলি বলেছিলেন "The spirit of knowledge left to you by Ayurveda is the spirit of progress. It demands that you should investigate and learn, and add to the store of knowledge left to you by the ancients. Even shepherds and cowboys knowing the properties and indentification of drugs were not despised by Ayurvedic authorties. They borrowed from foreigners wherever they found it necessary...... ...So we do injustice not only to ourselves but also our forefathers when we suffer Ayurveda to stand still and allow opponents to call it stagnant. —মর্মার্থ:—"আয়ুর্বেদ আপনাদের নিকট জ্ঞানের যে ধারা রেখে গেছে তা প্রগতিরই ধারা। অনুসন্ধান ও শিক্ষালাভ করা, এবং প্রাচীন পুরোধাগণ যে জ্ঞানের কোষ বা ভাণ্ডার রেখে গেছেন, তার মধ্যে ভাব ও জ্ঞান সংযোজন করা, এই সবই সেই ধারার উদ্দেশ্য। আয়ুর্বেদীয় কর্তাব্যক্তিগণ ভেষজের প্রকৃতি ও পরিচয় জানে এমন মেষ পালক ও গো-পালকদের পর্যন্ত অবজ্ঞা করতেন না। যখনই প্রয়োজন বোধ করেছেন তখনই তাঁরা বিদেশীদের নিকট থেকে জ্ঞান ধার করে চেয়ে এনেছেন। ....সুতরাং যখন আমরা আয়ুর্বেদকে অচল করে রাখছি ও আমাদের বিরোধীপক্ষকে আয়ুর্বেদ রুদ্ধগতি এরূপ অভিযোগ করার সুযোগ করে দিচ্ছি, তখন শুধু যে আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করছি তা নয়, আমাদের পূর্বপুরুষগণের প্রতিও অন্যায় অবিচার করছি।"

1343 বঙ্গাব্দে (ইং 1937 খৃস্টাব্দে) কলিকাতা বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক যে আয়ুর্বেদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেই সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে গণনাথ এইরূপ মন্তব্য করেন : "তীক্ষ্ণধীছাত্রগণ আয়ুর্বেদ না পড়িলে আয়ুর্বেদের উন্নতি সুদূর পরাহত।" ঐ ভাষণের জন্যও তিনি আরও বলেন : "আমি কিন্তু কবিরাজ মণ্ডলীকে সাদরে আহ্বান করিয়াছি যে,—তাঁহারা আয়ুর্বেদের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য নূতন নূতন গ্রন্থ লিখিয়া দেশের উপকার করুন। আয়ুর্বেদ এক সময়ে জগতের নিকট উত্তমর্ণ ছিল—অনেক ঋণ দান করিয়া সে জগতের প্রাণদান করিয়াছে। আমাদের যদি কোন কোন বিষয়ে প্রত্যয়মূলক জ্ঞান সংগ্রহের জন্য অন্যের নিকট অধমর্ণ হইতে হয়, তাহাতে লজ্জার কারণ নাই।"

তিনি অন্যের অপেক্ষা না করে নিজেই কতকগুলি আয়ুর্বেদের উপাদেয় ও সারগর্ভ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন সেগুলির মধ্যে তিনখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশ্ব ভারতীয় বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহমালায় অন্তর্ভুক্ত আয়ুর্বেদের ইতিহাস নিয়ে রচিত "আয়ুর্বেদ পরিচয়" গ্রন্থখানি সাধারণের পক্ষে কৌতূহলোদ্দীপক ও উপযোগী। ছাত্র ও গবেষকদের জন্য তিনি "প্রত্যক্ষ শারীরম" ও "সিদ্ধান্ত নিদানম" এই দু-খানি অভিনব গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন। এই গ্রন্থ দু-খানির সার বস্তু সম্পর্কে তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে তাঁর ছাত্র-শিষ্যস্থানীয় কবিরাজ সূর্যকান্ত রায় (যিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্পেশাল অফিসার, আয়ুর্বেদ পদ থেকে অধুনা অবসর নিয়েছেন) তাঁকে বলেছিলেন, "কালক্রমে আমার বর্তমান বাসস্থান "কল্পতরু ভবন" ও বিশ্বনাথ আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয়" বিলুপ্ত হতে পারে, কিন্তু আমি 'প্রত্যক্ষ শারীরম' ও সিদ্ধান্ত নিদানম' গ্রন্থ দু-খানি ভিতর দিয়ে বেঁচে থাকব।"

1913 খৃস্টাব্দ থেকেই 'প্রত্যক্ষ শারীরম' ভারতের দিল্লী, লাহোর পুনা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, ত্রিবান্দ্রাম, পাটনা, কলকাতা প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন আয়ুর্বেদীয় শিক্ষায়তনে আয়ুর্বেদীয় অ্যানাটমি (আধুনিক অ্যানাটমির প্রাচীন শারীরবিদ্যায় অসম্পূর্ণ স্থান পূর্ণ করেছিল) পাঠ্য পুস্তক হিসাবে প্রচলিত হয়েছিল। হিন্দীতে "হিন্দী প্রত্যক্ষ শারীর ও বাংলায় 'শারীর পরিচয়' গণনাথের তত্ত্বাবধানে অনূদিত হয়ে প্রচারিত হয়েছিল।

1926 খৃস্টাব্দে গণনাথ আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতির প্রাণস্বরূপ ত্রিদোষতত্ত্বের বিশ্লেষণ ও ব্যবহারিক প্রয়োগ বিষয়ে নিদান (বা রোগ নির্ণয়) সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিদানম নামক অভিনব গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের ইংরাজি ভাষায় লিখিত ভূমিকার একাংশে এই তত্ত্ব বিষয়ে যা লিপিবদ্ধতার সার বঙ্গানুবাদ এইমত উল্লেখযোগ্য 'আমি বলতে পারি এই (ত্রিদোষ) তত্ত্ব আধুনিক ফিজিওলজীর সিদ্ধান্ত সমূহের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সঙ্গতিপূর্ণ ; মাধবের নিদান প্রণীত হবার পর থেকে শতাব্দীর পর শতাব্দী গড়িয়ে চলেছে, এবং কোন কোন রোগের উৎপত্তির ধারা ও তাদের হেতু লক্ষণ সমূহও ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। মনে হয়, এমন কি অনেক নতুন নতুন রোগেরও আবির্ভাব ঘটেছে।'

গণনাথের প্রগতিশীল ও বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি কত ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী ছিল, উপরিউক্ত মন্তব্যই তাঁর নিদর্শন।

ভাবীকালের আয়ুর্বেদের ইশারা

1916 খৃস্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন কালে গণনাথ "Ayurveda or Hindu Medicine" এই বিষয়ে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তার মধ্যে ত্রিদোষ তত্ত্বের যে ব্যাখ্যাও বিশ্লেষণ করেছিলেন, তার বাংলা সারমর্ম এরূপ লিপিবদ্ধ করা যায় : "এই তত্ত্বের প্রকৃত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করতে হলে স্বতন্ত্র একখানি গ্রন্থ রচিত হতে পারে। তবে অল্প কথায় আমি এরূপ মন্তব্য করতে পারি যে, আয়ুর্বেদীয় শাস্ত্রে 'বায়ু' শব্দে বাতাস বুঝায় না ; কেন্দ্রীয় ও অনুভূতিশীল স্নায়ুতন্ত্রের কার্যাবালীর অন্তর্গত যাবতীয় ঘটনাবলী 'বায়ু' শব্দের মধ্যে ব্যঞ্জিত হচ্ছে। 'পিত্ত' শব্দের দ্বারা দেহাভ্যন্তরস্থ পিত্তরস বুঝায় না ; থার্মোজেনাসিস' বা তাপোৎদন ও পাক-বিপাক ক্রিয়া সমূহ 'পিত্ত' শব্দের মধ্যে পরিস্ফুট হয়—এরমধ্যে পরিপাক-ক্রিয়া, রঙের রঞ্জনীকরণ, নানারূপ অন্তঃস্রাব ও বহিঃস্রাবের উপাদান, যার ফলে দেহকলার দহন কার্য নিষ্পন্ন হয়, বা এরূপ দহনকার্য জনিত নানাবিধ পদার্থ উৎপন্ন হয়, এই সবই পিত্তের প্রভাবে ঘটে। 'কফ' শব্দে স্থূলাকৃতি শ্লেষ্মা বুঝায় না,—মূলতঃ 'থার্মোট্যাক্সিস বা তাপনিয়ন্ত্রণ কার্য এবং গৌণতঃ যাবতীয় সংরক্ষণমূলক রসপদার্থ যেমন 'মিউকাস' ইত্যাদি পদার্থের গঠন বুঝিয়ে থাকে ; ···আমি স্থিরনিশ্চয় যে, আয়ুর্বেদের এই তত্ত্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করা যায়। রোগোৎপাদনবাদের লক্ষণসমূহ ও নিরাময় এবং এমন অনেক ব্যাপার যা অন্য কোনভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না, সে সব এই তত্ত্বের সাহায্যে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এমন কি অর্ধশিক্ষিত আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণ যাঁরা শুধুমাত্র এই তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল রোগের কারণ ও লক্ষণগুলি এই ভেষজা-বলী ও পথ্যাপথ্যের সূত্রাবলী মনে রাখতে পারেন, তাঁরা পর্যন্ত রোগীর শয্যাপার্শ্বে থেকে তাদের মোটামুটি ভালভাবেই উপকার করতে পারেন।"

এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা কীভাবে করা সম্ভব সে বিষয়ে এই লেখকের কিছু আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক ধারণা তার রচিত "আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে আয়ুর্বেদ' (যা পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা দপ্তর কর্তৃক 1973 খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়) গ্রন্থখানিতে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

ত্রিদোষতত্ত্বের সারমর্ম আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে এইমত উদ্ভাসিত হয়েছে ; বায়ু, পিত্ত ও কফ—এই ত্রিদোষের সাম্যাবস্থা অটুট থাকলে নীরোগ ব্যবস্থা এবং ত্রিদোষের সাম্যব্যবস্থা বিঘ্নিত হলে ও বিষম অবস্থার উদ্ভব হলে রোগের আক্রমণের পথ প্রস্তুত হয়। এদিকে স্মরণীয় যে, এই সাম্যাবস্থা স্থির নয়, বরং গতিশীল অবস্থায় বিরাজমান। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের

ধারণাতে দেখা যায় যে, দেহের অভ্যন্তরে যে ক্রিয়াকলাপ সম্পাদিত হয়ে থাকে, সেই ক্রিয়াকলাপ যাতে সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে পারে সেজন্য দেহের অভ্যন্তর একই প্রকার সম্ভাবাপন্ন আভ্যন্তরীক পরিবেশ বজায় থাকা অনিবার্য ; এইরূপ পরিবেশকে তাঁদের ভাষায় Homoestatis (গ্রীক শব্দ থেকে ব্যুৎপন্ন) বা গতিশীল সাম্যাবস্থা বলে। Homoestatis বিচলিত হলে রোগের কারণ সঞ্চারিত হতে পারে। আর যদি এই গতিশীল Homoeostatis কোন কারণে স্বাভাবিক অবস্থায় না ফিরে আসে তবে মৃত্যু অনিবার্য।

গতিশীল সাম্যভাবে দেহের সুস্থতা ও তার অভাবে রোগের কারণ সঞ্চারিত হতে পারে, আয়ুর্বেদীয় এই ধারণার সঙ্গে Homoeostatis সংক্রান্ত আধুনিক শারীরক্রিয়া তত্ত্বের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এই সাদৃশ্য বুঝবার উপায়স্বরূপ গণনাথ ত্রিদোষ তত্ত্বের যেরূপ ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছিলেন, সেখানেই তাঁর আয়ুর্বেদীয় গবেষণার মৌলিকত্ব এবং তিনিই বুঝি এই ব্যাপারে অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর এইরূপ আধুনিক বিশ্লেষণমূলক তৎপরতাই উত্তরসূরী গবেষকদের কাছে এক ভাবী আয়ুর্বেদের ইশারা দিচ্ছে এবং সেই ইশারা ভাবী আয়ুর্বেদ রচনার ক্ষেত্রে এক বিশাল ও সুউন্নত আলোকস্তম্ভের মত সন্ধানী আলোক বিকিরণ করছে ও এটাই গণনাথের সর্বোত্তম কীর্তিস্তম্ভ হয়ে থাকবে।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে আলোকচিত্র (ফটোগ্রাফি) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে বিস্তৃত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

পি-23, রাজারাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
'সত্যেন্দ্র ভবন'
কলিকাতা—700 006
ফোন : 55-0660

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

কিশোর বিজ্ঞানীর আসর

মহাকাশ গবেষণার 25 বছর ও তারপর (চিত্র—জগবন্ধু পাত্র)
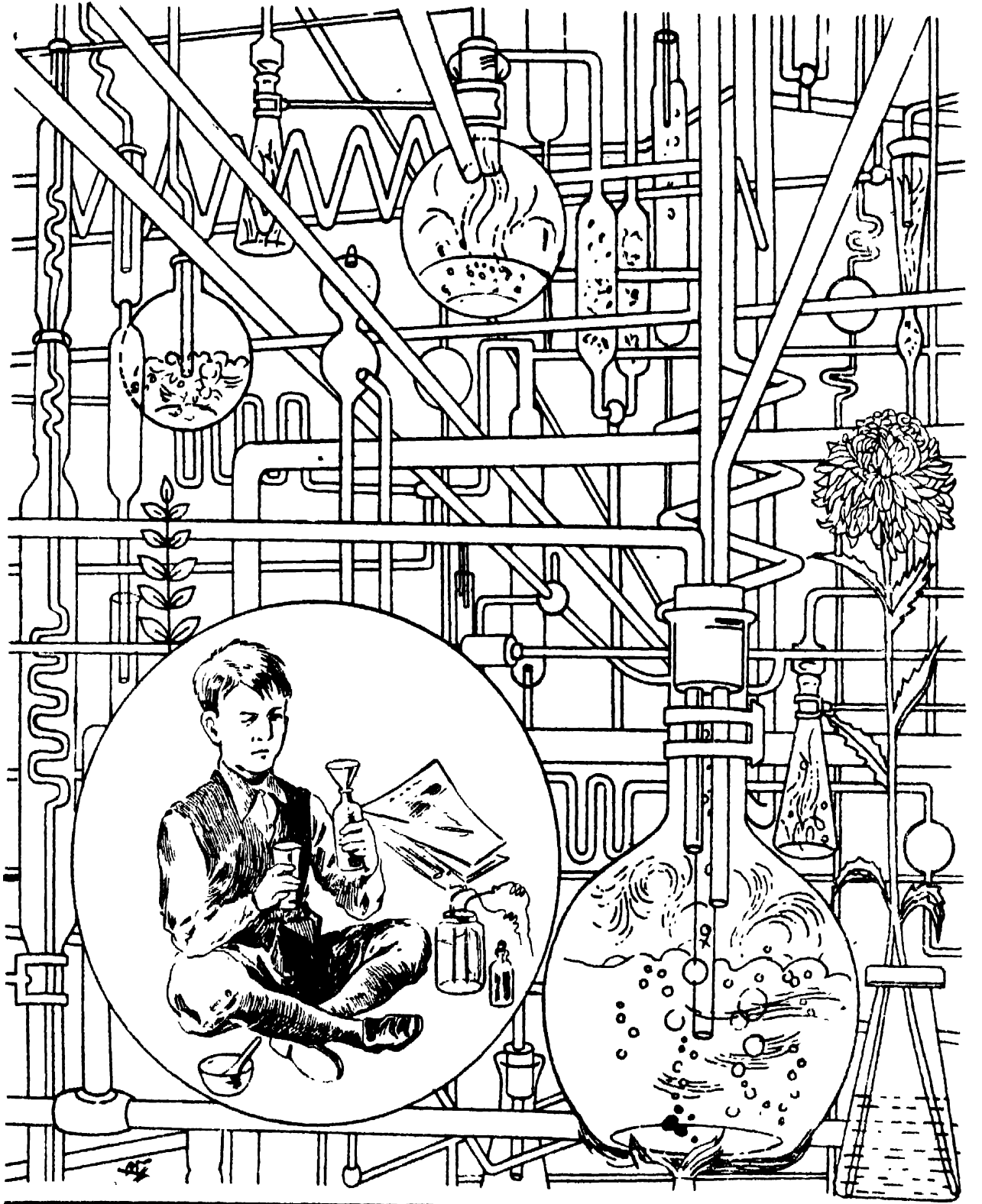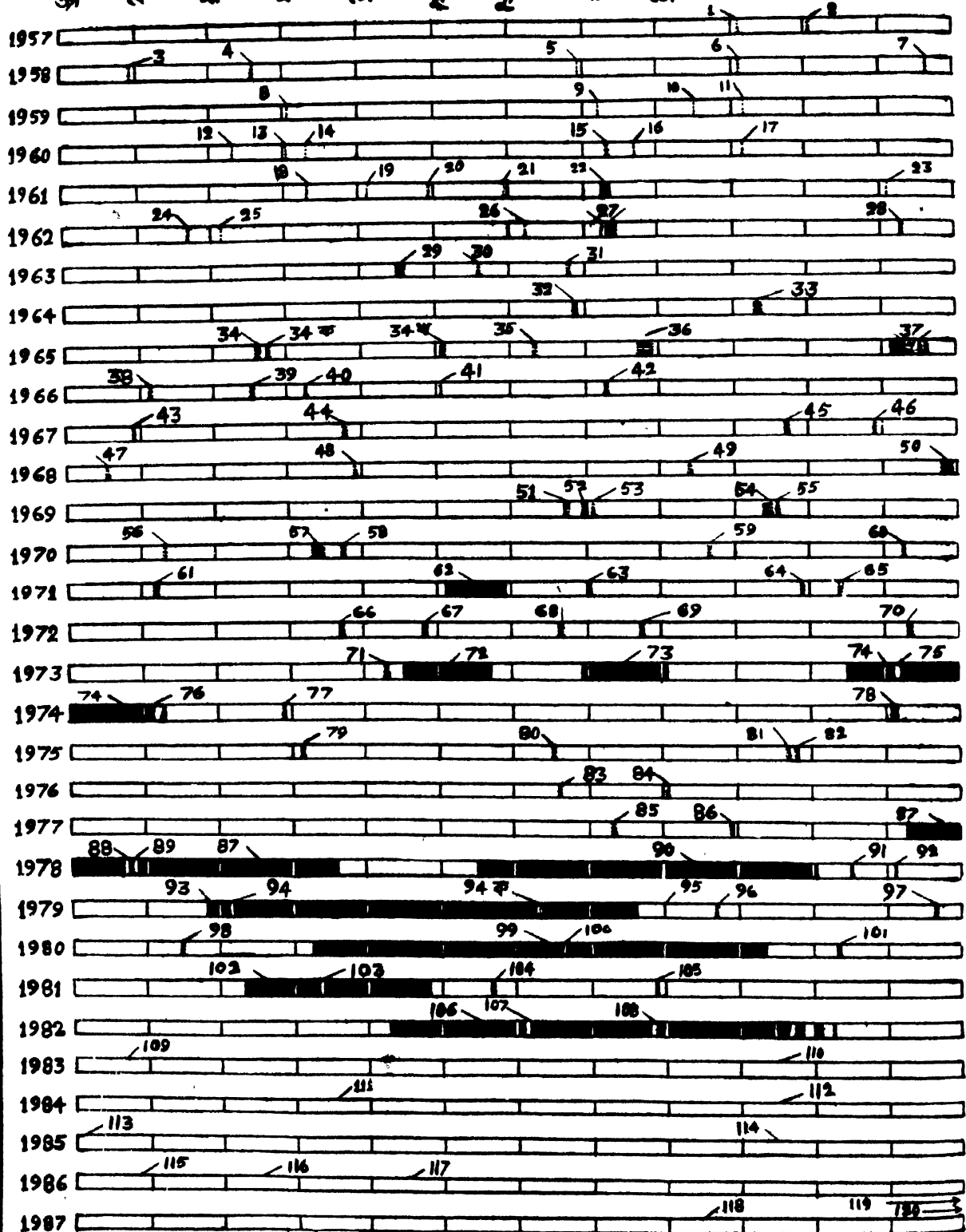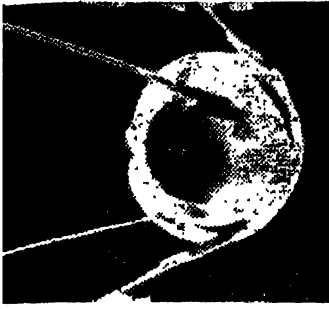
মহাকাশ গবেষণার পঁচিশ বছর ও তারপর

1. প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ-স্পুটনিক-1
2. মহাকাশে প্রথম প্রাণী—স্পুটনিক-2
3. এক্সপ্লোরার-1 ক্ষেপণ
4. ভ্যানগার্ড-I ক্ষেপণ
5. 1958-এর আমেরিকার মহাকাশ আইন স্বাক্ষরিত
6. NASA (National Aeronautics and Space Administration)-এর জন্ম
7. মহাকাশ থেকে প্রথম রেকর্ডের কথা সম্প্রচার
8. মার্কারীর মহাকাশচারী নির্বাচন
9. এক্সপ্লোরার-এর কক্ষ থেকে পৃথিবীর প্রথম আলোকচিত্র গ্রহণ
10. লুনা-2-এর প্রথম চন্দ্রাবতরণ
11. লুনা-3 কর্তৃক চন্দ্রের দূরপৃষ্ঠের চিত্র গ্রহণ
12. পাইওনিয়ার-5 প্রথম আন্তর্গ্রহ মহাকাশযান ক্ষেপণ
13. প্রথম আবহাওয়াসন্ধানী টিরোস-1 ক্ষেপণ
14. প্রথম সমুদ্রসন্ধানী ট্রানজিট-18 উপগ্রহ উৎক্ষেপণ
15. প্রথম পরীক্ষামূলক যোগাযোগকারী উপগ্রহ একো-1 ক্ষেপণ
16. স্পুটনিক-5 থেকে প্রথম জীবকণা সংগ্রহ
17. প্রথম সক্রিয় যোগাযোগকারী উপগ্রহ কুরিয়ার-18 ক্ষেপণ
18. প্রথম মানুষের মহাকাশচারণ (ওয়াই. গাগারিন)
19. প্রথম আমেরিকান শেপার্ডের মহাকাশচারণ
20. কেনেডী চন্দ্রে পদার্পণ লক্ষ্য স্থির করেন
21. মহাকাশ নিউক্লীয় শক্তির প্রথম ব্যবহার
22. টিটভের প্রথম সারাদিনব্যাপী মহাকাশচারণা
23. ডিসকভারার-26-এর উৎক্ষেপণ
24. প্রথম আমেরিকান কক্ষচারী গ্লেন
25. প্রথম কক্ষচারী সৌরমানমন্দির OSO-1
26. প্রথম বেসরকারী বাণিজ্যিক উপগ্রহ টেলস্টার-1
27. প্রথম যুগলের মহাকাশচারণা ভোস্টক ও নিকোলায়েভ, ভোস্টক-4 পোপোভিচ ।
28. ম্যারিনার-2 শুক্রকে অতিক্রম করে
29. কুপার-এর শেষ মার্কারী মহাকাশচারণ
30. প্রথম মহাকাশচারিণী ভি. তেরেস্কোভা
31. প্রথম সমলগ্নী বাণিজ্যিক উপগ্রহ সিনকম-2
32. রেঞ্জার-7 কর্তৃক চাঁদের নিবিড় আলোকচিত্র গ্রহণ
33. ভোস্কোড-1-এ একসঙ্গে তিনজন মহাকাশচারীর অভিযান
34. লিওনোভের প্রথম মহাকাশে পদচারণা

34. (ক) প্রথম মনুষ্যবাহী জেমিনী যান

34. (খ) প্রথম আমেরিকান হোয়াইট-এর মহাকাশে পদচারণা

35. প্রথম ম্যারিনার-4 কর্তৃক মঙ্গলগ্রহের নিকটবর্তী অভিযান
36. প্রথম কুপার ও কনরাডের আটদিনব্যাপী মহাকাশ অভিযান
37. জেমিনী-6 ও 7-এর মহাকাশ অভিযান। জেমিনী-7-এর মহাকাশে 2 সপ্তাহ অবস্থান।
38. লুনা-9 কর্তৃক প্রথম চন্দ্রপৃষ্ঠের আলোকচিত্র প্রেরণ
39. জেমিনী-8-এর প্রথম মহাকাশে ডকিং।
40. প্রথম জ্যোতির্বিজ্ঞান মান মন্দির OAO-1
41. সারভেয়ার-1-এর চন্দ্রাবতরণ
42. লুনার অরবিটার-1
43. গ্রীসন, হোয়াইট ও স্যাফি অ্যাপেলো-1 প্রজ্বলনে আকস্মিক নিহত
44. সোয়ুজ-1 অভিযানে কোমারভ নিহত
45. ভেনেরা-4-এর শুক্রপৃষ্ঠের তথ্য সরবরাহ
46. কসমস-186 ও 188-এর প্রথম স্বয়ংক্রিয় ডকিং
47. মনুষ্যবাহী সোয়ুজ-4 ও 5-এর প্রথম মহাকাশ ডকিং
48. গাগারিন বিমান দুর্ঘটনায় নিহত
49. জোনড্-5-এর প্রথম চন্দ্র আবর্তনকারী অভিযান
50. মনুষ্যবাহী অ্যাপেলো-8-এর চন্দ্র আবর্তনকারী প্রথম অভিযান
51. অ্যাপোলো-11 থেকে প্রথম মানুষের চন্দ্রাবতরণ
52. ম্যারিনার-6-এর সঙ্গে মঙ্গল গ্রহের সাক্ষাৎ
53. ম্যারিনার-7এর সঙ্গে মঙ্গলগ্রহের সাক্ষাৎ
54. সোয়ুজ-6, 7 ও 8-এ সাতজন মানুষের মহাকাশ অভিযান

55. অ্যাপোলো-12 যানে চাঁদের নির্দিষ্ট স্থানে মানুষের অবতরণ
56. জাপানের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ ও সুমির উৎক্ষেপণ
57. অ্যাপোলো-13-এর অসফল অভিযান
58. চীনের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ
59. লুনা-16 চন্দ্রপৃষ্ঠের নমুনা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে প্রেরণ করে
60. উহুরা এক্সরশ্মি উপগ্রহ
61. অ্যাপোলো-14 সাহায্যে মানুষের তৃতীয়বারচন্দ্রাবতরণ
62. সোয়ুজ-11-স্যালউট-4 মিশন। পৃথিবীতে পুনঃপ্রবেশ কালে মহাকাশচারী নিহত
63. অ্যাপোলো-15 থেকে মানুষের চতুর্থবার চন্দ্রাবতরণ
64. বৃটেনের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ আর-3 প্রসপেরো উৎক্ষেপণ
65. ম্যারিনার-9 মঙ্গলগ্রহের কক্ষে স্থাপন
66. অ্যাপেলো-16 যানে মানুষের পঞ্চমবার চন্দ্রাবতরণ
67. আমেরিকা ও রাশিয়ার অ্যাপোলো সোয়ুজ চুক্তি
68. ল্যাণ্ডস্যাট-1 উৎক্ষেপণ
69. কোপার্নিকাস জ্যোতির্বিজ্ঞানীয় কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ
70. অ্যাপোলো-17 যানে মানুষের ষষ্ঠ চন্দ্রাবতরণ
71. স্কাইল্যাব মহাকাশ স্টেশন উৎক্ষেপণ
72. প্রথম মনুষ্যবাহী স্কাইল্যাব মিশন
73. দ্বিতীয় মনুষ্যবাহী স্কাইল্যাব মিশন
74. তৃতীয় মনুষ্যবাহী স্কাইল্যাব মিশন
75. পাইওনীয়ার-10-এর সঙ্গে বৃহস্পতির সাক্ষাৎ
76. ম্যারিনার-10-এর সঙ্গে শুক্রের সাক্ষাৎ
77. ম্যারিনার-10-এর সঙ্গে বুধের সাক্ষাৎ
78. পাইওনীয়ার-11-এর সঙ্গে বৃহস্পতির সাক্ষাৎ
79. সোয়ুজ-18-এ প্রথম মনুষ্যযানের অসফল অভিযান
80. অ্যাপেলো-সোয়ুজ ডকিং
81. ভেনেরা-9-এর সাহায্যে শুক্রপৃষ্ঠের আলোকচিত্র
82. ভেনেরা-10 শুক্র থেকে পৃথিবীতে বেতার যোগাযোগ করে
83. ভাইকিং-1-এর মঙ্গলে অবতরণ ও প্রথম মঙ্গলপৃষ্ঠের আলোকচিত্র প্রেরণ
84. ভাইকিং-2-এর মঙ্গলাবতরণ
85. মহাকাশ সাটল কক্ষচারী এণ্টারপ্রাইজের মুক্ত অভিযান; হিও-1-এর উৎক্ষেপণ
85. স্যালুয়ুট-6 মহাকাশস্টেশন উৎক্ষেপণ
87. সোয়ুজ 26/স্যালয়ুট-6-এর 95 দিনের মিশন
88. স্যালুট-6 মহাকাশচারীদের জন্য সরবরাহকারী যান প্রোগ্রেস-1-এর উৎক্ষেপণ
89. আন্তর্জাতিক অতিবেগনি সন্ধানী এক্সপ্লোরার উৎক্ষেপণ
90. সোয়ুজ 6/স্যালয়ুট-6-এর 139·5 দিনের মিশন
91. হিও-2 উৎক্ষেপণ
92. পাইওনীয়ার ও শুক্রের সাক্ষাৎ
93. সোয়ুজ 32/স্যালুট-6-এর 175 দিনব্যাপী মিশন
94. ভয়েজার-2 ও বৃহস্পতির সাক্ষাৎ
94. (ক) ভয়েজার-2 ও বৃহস্পতির সাক্ষাৎ
95. পাইওনীয়ার-11 ও বৃহস্পতির সাক্ষাৎ
96. হিও-3 উৎক্ষেপণ
97. সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের চন্দ্র সংক্রান্ত চুক্তি
98. সৌর ম্যাক্সিমাম সন্ধানী মিশন
99. সোয়ুজ-35/স্যালুট-6-এর 184 দিনব্যাপী মিশন
100. ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ
101. ভয়েজার-1 ও শনির সাক্ষাৎ
102. সোয়ুজ টি 4/স্যালুট-6-এর 74·8 দিনের মিশন
103. মহাকাশ শাটল কলাম্বিয়ার প্রথম অভিযান
104. প্রথম অ্যারিএন উৎক্ষেপণ
105. ভয়েজার-2-এর সঙ্গে শনির সাক্ষাৎ
106. সোয়ুজ টি-5 / স্যালুট-7 মিশন
107. মহাকাশ শাটলের কার্যারম্ভ
108. দ্বিতীয় মহিলা শ্বেতলানা সাবিৎসকায়ার মহাকাশচারণ
109. অবলোহিত সন্ধানী জ্যোতির্বিজ্ঞান উপগ্রহ ইরাস উৎক্ষেপণ
110. স্পেসল্যাব-1 মিশন
111. SMM উপগ্রহ সংশোধন মিশন এস টি এস-13
112. পৃথিবীর উৎস অনুসন্ধানী উপগ্রহ স্পট-এর ফ্রান্স কর্তৃক উৎক্ষেপণ
113. স্পেস দূরবীন উৎক্ষেপণ
114. অ্যারিএন-4-এর প্রথম উৎক্ষেপণ
115. ভয়েজার-2-এর শনির সঙ্গে সাক্ষাৎ
116. হ্যালীর ধূমকেতুর সঙ্গে গিওট্টো যানের সাক্ষাৎ
117. গ্যালিলেওর উৎক্ষেপণ
118. পাইওনীয়ার-10 প্লুটোর কক্ষ অতিক্রম করবে
119. গামারশ্মি সন্ধানী মানমন্দির উৎক্ষেপণ
120. ভয়েজার-2-এর নেপচুনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে

দ্বিঅঙ্ক পাটীগণিত

বাসুদেব ঘোষ*

হাজার হাজার বছর আগে মানুষ যখন গুহা-গহ্বরে বাস করত তখন থেকেই মানুষ গুনতে শিখেছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই গণনার কাজ হাতের আঙ্গুল দিয়েই হতো। তাই ইংরেজীতে এক, দুই, তিন থেকে নয় পর্যন্ত মূল সংখ্যাগুলিকে ডিজিট (digit) বলা হয়। ডিজিট শব্দটির বাংলা মানে হাতের বা পায়ের আঙ্গুল। মানুষের হাতে দশটি আঙ্গুল। তাই দশটি মূল সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরী দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি যুগ যুগ ধরে মানুষের কাছে সুবিধাজনক মনে হয়েছে। অবশ্য মানবজাতির ইতিহাসে আরো অনেক সংখ্যা পদ্ধতির কথা উল্লেখ আছে। যেমন রোমানীয় পদ্ধতি, চীনা পদ্ধতি ইত্যাদি। আমাদের বর্তমান দশমিক পদ্ধতি খ্রীস্ট-জন্মের প্রায় তিনশো বছর আগে যে সমস্ত হিন্দুগণ উত্তর ভারতে বাস করতেন তাঁদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে। হিন্দু পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো শূন্য সংখ্যাটির প্রবর্তন। এই পদ্ধতিতে কোন ডিজিটের চরম অবস্থান (একক স্থান, দশক স্থান, শতক স্থান.........) খুব প্রয়োজনীয়। কোন সংখ্যার ডান দিক থেকে বাঁ দিকে গেলে পরপর অবস্থানগুলি 10-এর ক্রমবর্ধমান ঘাতকে (অর্থাৎ 10^0, 10^1, 10^2,...ইত্যাদি) বোঝায়। প্রচলিত নিয়মানুসারে আমরা কেবল সহজগুলিকেই লিখি।

উদাহরণ স্বরূপ ; $403 = 4\times10^1 + 0\times10^2 + 3\times10^0$

$= 4\times100 + 0\times10 + 3\times1$

ভগ্নাংশগুলিকেও অনুরূপে 10-এর ঋণাত্মক ঘাত দিয়ে লেখা যায়। যেমন $0{\cdot}403 = 4\times10^{-1} + 0\times10^{-2} + 3\times10^{-3}$

ইলেকট্রনিক কম্পিউটার 10টি যন্ত্রে ডিজিট যুক্ত দশমিক পদ্ধতি ব্যবহার না করে দুটি ডিজিটযুক্ত দ্বিঅঙ্ক (binary) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতি ব্যবহারে অনেক পরিমাণে ব্যয়সংকোচ এবং কম্পিউটারের কার্যকলাপকে অধিকতর বিশ্বাস-যোগ্য করা যায়। দশমিক পদ্ধতি ব্যবহার করতে হলে কম্পিউটারের ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশে দশটি বিভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি প্রয়োজন। যেখানে এক একটি অবস্থা এক একটি ডিজিটের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করবে। কিন্তু দ্বিসংখ্যা পদ্ধতিতে মাত্র দুটি বিভিন্ন অবস্থা দরকার এবং এটা খুব সহজে এবং নির্ভুলভাবে করা যায়। যেমন একটি ইলেকট্রনিক সুইচ হয় খোলা (on), না হয় বন্ধ (off) থাকবে। অর্ধেক খোলা বা অর্ধেক বন্ধ এরূপ হতে পারে না। একটা বৈদ্যুতিক বাতির ফিলামেন্ট হয় জ্বলবে, না হয় জ্বলবে না। আধখানা ফিলামেন্ট জ্বলবে আর বাকী আধখানা নিভে থাকবে তা কখন সম্ভব নয়। ট্রানজিসটার বা বায়ুশূন্য ভাল্‌ভ হয় তড়িৎ পরিবহন করবে না হয় করবে না। ভাল্‌ব বা ট্রানজিস্টারের সাহায্যে দুই-এর বেশী সংখ্যক বিভিন্ন অবস্থা বোঝাতে বিভিন্ন মাত্রার তড়িৎপ্রবাহ নির্ধারণ করতে হয়। এটা কিন্তু খুব বেশী মাত্রায় নির্ভুলতার সঙ্গে করা যায় না। কিন্তু দুটি বিভিন্ন অবস্থা শতকরা একশো ভাগ নির্ভুলতার সঙ্গে পাওয়া সম্ভব। তাছাড়া কম্পিউটারে যে সমস্ত ইলেকট্রনিক সুইচ ব্যবহার করা হয় সেগুলি খুব নির্ভরযোগ্য এবং অব্যর্থভাবে হাজার-হাজার বার কাজ করতে পারে। এইজন্য কম্পিউটার প্রমুখ ইলেকট্রনিক ডিজিটাল যন্ত্রপাতিতে দ্বিঅঙ্ক পদ্ধতি একচেটিয়া ভাবে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং বর্তমান কম্পিউটার যুগে দ্বিঅঙ্ক পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু জ্ঞানলাভ প্রয়োজন।

নাম থেকেই বোঝা যায় যে দ্বিঅঙ্ক পদ্ধতি মাত্র দুটি ডিজিটের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই ডিজিট দুটি হলো 0 এবং 1. অনেক সময় 0-কে বন্ধ (off) 1-কে খোলা (on) বা 0-কে মিথ্যা (false) 1-কে সত্যি (true) বলা হয়। দশমিক পদ্ধতির 10 এর বদলে এই পদ্ধতিতে 2 এর ঘাতকে ব্যবহার করা হয়।

দ্বিঅঙ্ক পদ্ধতিতে বিভিন্ন সংখ্যার গঠন

দশমিক পদ্ধতিতে 9-এর বেশী কোন সংখ্যা প্রকাশ করতে দশমিক ডিজিটগুলি আমরা বিশেষভাবে সংযুক্ত করি। 9-এর পরবর্তী সংখ্যা 10 পেতে আমরা প্রথমে দ্বিতীয় ডিজিট 1 এবং পরে প্রথম ডিজিট 0 লিখি। 11 লেখার জন্য পরপর দুটি দ্বিতীয় ডিজিট ব্যবহার করা হয়। এইভাবে আমরা অগ্রসর হই। দ্বিঅঙ্ক পদ্ধতিতেও আমরা ঠিক একই পথ অনুসরণ করি। 0 ও 1 লেখার পর আমাদের হাতে আর কোন দ্বিঅঙ্ক ডিজিট থাকে না। তাই দুই লেখার জন্য প্রথমে দ্বিতীয় দ্বিঅঙ্ক ডিজিট 1 ও পরে প্রথম দ্বিঅঙ্ক ডিজিট 0 ব্যবহার করা হয়। তিন সংখ্যাটি 11 দ্বারা প্রকাশ করা হয়। দশমিক পদ্ধতির সঙ্গে যাতে তালগোল পাকিয়ে না যায় সেইজন্য দ্বিঅঙ্ক পদ্ধতিতে কোন সংখ্যা পড়ার নিয়ম একটু আলাদা। যেমন 11-কে এক-এক পড়া হয়। দশমিক পদ্ধতিতে যেমন 99 এর পর একশো লেখার জন্য তিনটি ডিজিট ব্যবহার করা হয়, দ্বিঅঙ্ক

*পদার্থবিদ্যাবিভাগ, বেলুড় রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দির, হাওড়া-711202

পদ্ধতিতে তিনের পর চার লিখতে হলে 100 (এক-শূন্য-শূন্য) ব্যবহার করা হয়। দশমিক ও দ্বিঅঙ্ক পদ্ধতিতে কিভাবে সাত পর্যন্ত লেখা হয় তা একটি তালিকা আকারে নিম্নে দেখান হলো :

দশমিক সংখ্যা	দ্বিঅঙ্ক সংখ্যা
0	0
1	1
2	10
3	11
4	100
5	101
6	110
7	111

দ্বিঅঙ্ক সংখ্যাগুলি নিম্নে বর্ণিত উপায়ে খুব সহজে মনে রাখা যায়।

দশমিক সংখ্যাগুলি পরপর ভাবতে হয় এবং যে সংখ্যাগুলি কেবলমাত্র 0 ও 1 দিয়ে তৈরী সেগুলিকে রেখে অন্যগুলি বাদ দিতে হয়।

0, 1, ~~2~~, ~~3~~,…~~9~~, 10, 11, 1~~2~~, 1~~3~~ … 9~~9~~, 100, 101, 1~~0~~2…

তাহলে 0, 1, 10, 11, 100, 101 প্রভৃতি দ্বিঅঙ্ক সংখ্যাগুলি পরপর পাওয়া যাবে। কোন দ্বিঅঙ্ক সংখ্যার ডানদিক থেকে বাঁ দিকে গেলে পরপর অবস্থানগুলি- 2এর ক্রমবর্ধমান ঘাতকে (2^0, 2^1, 2^2……অর্থাৎ 1, 2, 4,……) বোঝায়।

উদাহরণ স্বরূপ : 101 (এক-শূন্য-এক) $=1\times2^2+0\times2^1+1\times2^0$

এতক্ষণ শুধু দ্বিঅঙ্ক পূর্ণসংখ্যার কথা বলা হলো। এবারে ভগ্নাংশের কথায় আসা যাক। দ্বিঅঙ্ক ভগ্নাংশগুলি 2-এর ঋণাত্মক ঘাত দিয়ে লেখা যায়। যেমন—

$$\cdot101=1\times2^{-1}+0\times2^{-2}+1\times2^{-3}$$

উপরের উদাহরণগুলির ডানদিক সরল করলে বাঁ-দিকের দ্বিঅঙ্ক সংখ্যাগুলির দশমিক সমতুল্য মান পাওয়া যাবে।

অতএব, দ্বিঅঙ্ক 101 = 4 + 0 + 1 = 5 (দশমিক অঙ্ক)

$\cdot101=\frac{1}{2}+0+\frac{1}{8}=\cdot625$ (দশমিক অঙ্ক)

কোন দশমিক সংখ্যাকে দ্বিঅঙ্ক সংখ্যায় পরিবর্তিত করাও মোটেই শক্ত নয়। কোন অখণ্ড দশমিক সংখ্যা দেওয়া থাকলে তাকে 2 দিয়ে পরপর ভাগ করতে হয়। এইবার অবশিষ্টগুলি শেষদিক থেকে পরপর লিখলেই অভীষ্ট দ্বিঅঙ্ক সংখ্যাটি পাওয়া যায়।

মনে করি 147 এই সংখ্যাটিকে দ্বিঅঙ্ক ডিজিটে প্রকাশ করতে হবে।

		ভাগশেষ
147 ÷ 2	= 73	1
73 ÷ 2	= 36	1
36 ÷ 2	= 18	0
18 ÷ 2	= 9	0
9 ÷ 2	= 4	1
4 ÷ 2	= 2	0
2 ÷ 2	= 1	0
1 ÷ 2	= 0	1

∴ দশমিক 147 = দ্বিঅঙ্ক 10010011

দশমিক কোন ভগ্নাংশকে দ্বিঅঙ্ক ডিজিটে লিখতে হলে ভগ্নাংশটিকে পরপর 2 দিয়ে গুণ করতে হয় এবং প্রত্যেক গুণফল থেকে পূর্ণ সংখ্যাটি বার করে পরপর লিখতে হয়।

উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক 0·125-কে দ্বিঅঙ্ক ডিজিটে লিখতে হবে।

	দ্বিঅঙ্ক সংখ্যা
0·125×2=0·250	0
0·250×2=0·500	0
0·500×2=1·000	1

অতএব দশমিক 0·125=দ্বিঅঙ্ক ·001

দ্বিঅঙ্ক পদ্ধতি ব্যবহার করতে হলে এই পদ্ধতিতে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ শিখে নিতে হবে।

দ্বিঅঙ্ক যোগ

দ্বিঅঙ্ক যোগ শেখার জন্য নিম্নলিখিত চারটি সহজ উদাহরণ মনে রাখাই যথেষ্ট।

0 + 0 = 0
0 + 1 = 1
1 + 0 = 1
1 + 1 = 10 (শূন্য, হাতে থাকে এক)

আমরা দশমিক পদ্ধতিতে অভ্যস্ত তাই চতুর্থ উদাহরণটি অচেনা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। দ্বিঅঙ্ক পদ্ধতিতে 10 (এক-শূন্য) দুইকে বোঝায়। সুতরাং এক আর এক যোগ করলে দুই হয়— এই নিয়ম দ্বিঅঙ্ক পদ্ধতিতেও সত্য। এবারে আর একটা বড় উদাহরণ নেওয়া যাক। (পাশাপাশি দশমিক সমতুল্য যোগটিও দেখান হলো)

দ্বিঅঙ্ক	দশমিক
1 0 1	5
+1 1 0	+6
1 0 1 1	1 1

দ্বিঅঙ্ক বিয়োগ

এই পদ্ধতিতে বিয়োগ শেখার জন্য নিম্নলিখিত চারটি সহজ নিয়ম মনে রাখা দরকার।

$$0-0=0$$
$$1-0=1$$
$$1-1=0$$
$$10-1=1$$

এবারে একটা বড় বিয়োগ করা যাক।

```
  1¹01          13      ( দশমিক সমতুল্য )
 -1010         -10            বিয়োগ

  0011           3
```

প্রথম স্তম্ভ ঃ $1-0=1$ দ্বিতীয় স্তম্ভের উপরে ছোট এবং নীচে বড় সংখ্যা আছে। এরূপক্ষেত্রে পরবর্তী স্তম্ভ (এখানে তৃতীয় স্তম্ভ) থেকে 1 নিয়ে নিলে উপরে 0 থাকবে। অতএব তৃতীয় স্তম্ভ ঃ $0-0=0$ চতুর্থ স্তম্ভ ঃ $1-1=0$

দ্বিঅঙ্ক গুণ

দ্বিঅঙ্ক গুণ দশমিক গুণের চেয়ে অনেক সহজে করা যায়। কারণ এখানে মাত্র চারটি নামতা মনে রাখা দরকার।

$$0\times0=0$$
$$0\times1=0$$
$$1\times0=0$$
$$1\times1=1$$

দশমিক পদ্ধতির ন্যায় বড় বড় গুণ করতে হলে দ্বিঅঙ্ক পদ্ধতিতেও একে একে গুণ করে তারপর যোগ করে গুণফল বার করা হয়।

উদাহরণ ঃ

```
     111
   ×101
   -----
     111
    000
   111
  ------
  100011
```

উৎসাহী পাঠকগণ দ্বিঅঙ্ক সংখ্যা দশমিক সংখ্যায় পরিবর্তিত করে গুণফলটি যাচাই করে নিতে পারেন।

দ্বিঅঙ্ক ভাগ

দ্বিঅঙ্ক ভাগ ঠিক দশমিক ভাগের মতই করতে হয়। কয়েকটা উদাহরণ নিলে জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

1.

```
              ভাজ্য
    10    )  1100  ( 110 ( ভাগফল )
 (ভাজক)      10
            ------
              10
              10
            ------
              00 ( ভাগশেষ )
```

2.

```
  100 ) 11011 ( 111
        100
        -----
         101
         100
        -----
          11
```

দ্বিঅঙ্ক পদ্ধতির বীজগণিত অংশটিকে উদ্ভাবকের নামানুসারে বুলিয়ান (Boolean) বীজগণিত বলা হয়। আমরা এখানে কেবল পাটীগণিত অংশটি নিয়ে আলোচনা করেছি।

কম্পিউটার যন্ত্রের প্রবেশ (input) ও নির্গম (output) দ্বারে দশমিক দ্বিঅঙ্ক পরিবর্তনকারী যন্ত্র বসানো থাকে। তাই কম্পিউটার পরিচালক দ্বিঅঙ্ক পদ্ধতি না জেনেও কাজ চালাতে পারেন। কিন্তু কমপিউটার কিভাবে জটিল থেকে জটিলতর গাণিতিক প্রশ্ন সমাধান করে সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে হলে এবং কম্পিউটার ও ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের উন্নতি সাধনের জন্য দ্বিঅঙ্ক পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা রাখা প্রয়োজন।

সমোচ্চশীলতার কূট

কালীচরণ দাস*

তরলের সমোচ্চশীলতার নীতি সম্পর্কে আমাদের একটা সুস্পষ্ট ধারণা আছে। ইউ আকৃতির নলের একপ্রান্তে তরল ঢাললে নলের দুই বাহুতে একই উচ্চতায় তরলের তল দেখা যাবে ; নলের আকৃতি বা প্রস্থচ্ছেদের ভিন্নতার উপরে সমোচ্চশীলতা নির্ভর করে না। এখানে অবশ্য একটি মজাদার পরীক্ষার বর্ণনা দেওয়া হলো যা দেখিয়ে অনেককেই অবাক করে দেওয়া যায়। প্রথম দৃষ্টিতে এটিকে একটি চমকপ্রদ কূট বলেই মনে হবে।

ছয়মিটার লম্বা ও আড়াই সে.মি. অন্তঃব্যাসবিশিষ্ট একটি স্বচ্ছ প্লাস্টিক নলকে কোন কার্ডবোর্ডের বা ধাতুর বেলনের উপর কয়েক পাক জড়ানো হলো (চিত্র-1)। নলটির একপ্রান্তে

চিত্র-1

আস্তে আস্তে গড়িয়ে গড়িয়ে রঙিন জল ঢালতে থাকলে কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে নলের দুই বাহুতে জলের উচ্চতায় ভিন্নতা রয়েছে। নলটি প্রথমেই বেশ মোটা নেওয়া হয়েছে কাজেই পৃষ্ঠটান বা সান্দ্রতা জাতীয় কোন কিছুর প্রভাব এই পরীক্ষায় স্বাভাবিক নিয়মেই উপেক্ষণীয়। অতএব পরীক্ষাটি সফলভাবে দেখাতে পারলে অনেককেই বিভ্রান্তিতে ফেলবে সন্দেহ নেই।

পরীক্ষাটিকে বিভিন্নভাবে সম্পন্ন করার জন্য অষ্টম শ্রেণীর তিনজন ছাত্র সর্বশ্রী অনিমেষ দাস, সুদীপ্ত চক্রবর্তী ও বিজয়ানন্দ মুখার্জীকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। লেখকের সক্রিয় তত্ত্বাবধানে তাদের পরীক্ষিত ফলাফলগুলি যেমন মজাদার, কূটটির ব্যাখ্যা দিতে সেগুলি তেমনি অপরিহার্য।

* কাটোয়া মহাবিদ্যালয়, কাটোয়া, বর্ধমান

পরীক্ষা—1 : চিত্র—2 অনুযায়ী প্লাস্টিক নলটিকে পাতলা কাঠের তক্তার উপরে পেরেক দিয়ে নির্দিষ্ট ব্যাসের বৃত্তাকারে বেঁধে উলম্ব দেয়ালে টাঙিয়ে দেওয়া হলো। নলটির অন্তঃব্যাস 1·4 সে. মি / A_1 চিহ্নিত মুখ দিয়ে ধীরে ধীরে আলতা মেশানো জল ঢাললে দু-বাহুতে জলের উচ্চতা A_1 ও B_1 স্থানে

চিত্র-3
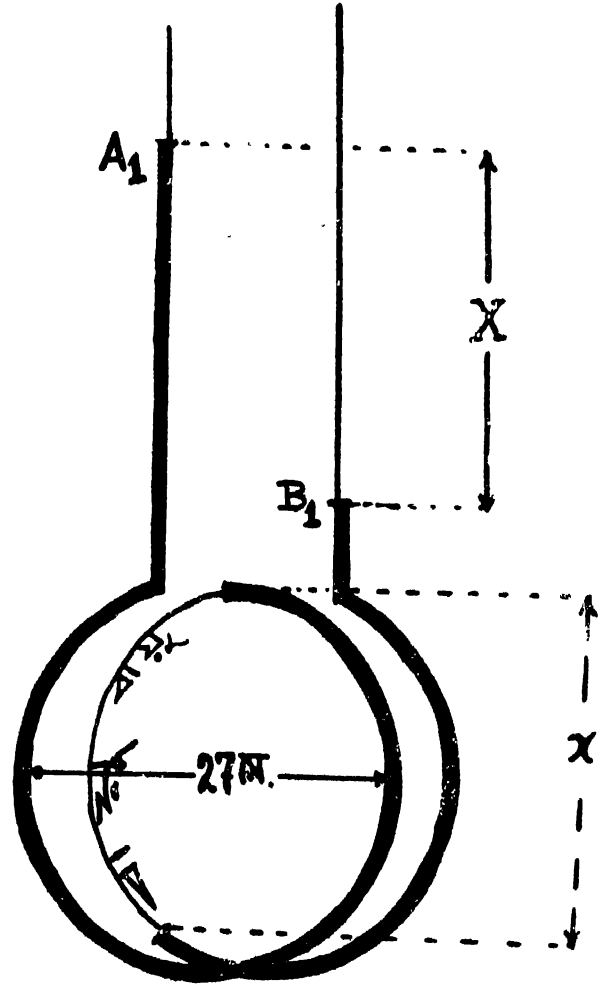
দাঁড়ালো। নলের পাকগুলি প্রথমটির উপরে দ্বিতীয়, তার উপরে তৃতীয় এভাবেই স্থাপন করা হয়েছে অর্থাৎ প্রত্যেকটি বৃত্তপাকেরই ব্যাস সমান। অবশ্য অঙ্কনের সুবিধার্থে চিত্রে পাকগুলিকে ঈষৎ ডানদিকে বিচ্যুত অবস্থায় দেখানো হয়েছে এবং জলপূর্ণ নলের অংশ মোটা ও আবদ্ধ বায়ুর অংশ হাল্কা রেখায় দেখানো হলো।

পরীক্ষা ফল : (চিত্র-2) : নলবৃত্তের ব্যাস = 27 সে. মি.
বায়ু আবদ্ধ অংশের উলম্ব উচ্চতা = x = 25·5 সে. মি.
দুই বাহুর (A_1, B_1) জলতলের অন্তর = X = 25·5 সে. মি.

পরীক্ষা—2 : পরীক্ষা 1-এর অন্তিম অবস্থা বজায় রেখে A_1 মুখে আরও জল ঢালা হলো। ফল : x = 25 সে. মি. ও X = 25 সে. মি.।

পরীক্ষা—3 : পরীক্ষা 2-এর অন্তিম অবস্থা বজায় রেখে A_1 এর পরিবর্তে B_1 মুখে ধীরে ধীরে জল ঢালা হলো। ঐ অবস্থায় (চিত্র—3) আবদ্ধ বায়ু ও আবদ্ধ জলের অংশগুলি
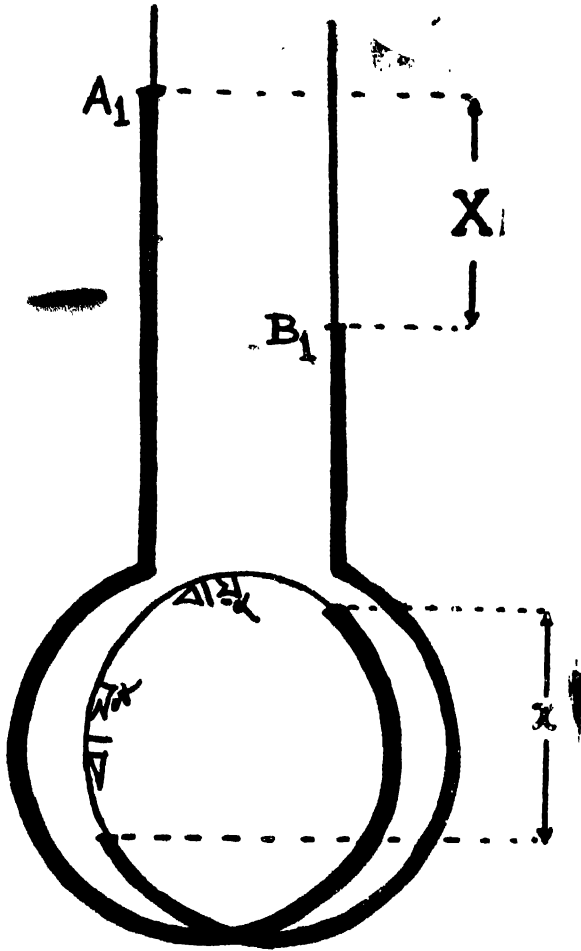
চিত্র-3

পূর্বাবস্থা থেকে সরে দাঁড়ালো। ফল : x = 7·4 সে. মি. X = 7·4 সে. মি.। বোঝা যাচ্ছে B_1 মুখে আরও জল ঢাললে X = x = 0 অবস্থায় আসবে। তাহলে সমোচ্চশীলতার নীতি আর বিঘ্নিত থাকবে না যদিও আবদ্ধ বায়ু নলের মধ্যে তখনও রয়ে গেছে যথাপূর্ব।

পরীক্ষা—4 : প্লাস্টিক নলটির বৃত্ত সংখ্যা বাড়ানো হলো। এখনও আবদ্ধ বায়ুর বিচ্ছিন্ন অংশের কার্যকরী উচ্চতা যোগ করলে (= x) তা আবার A_1 ও B_1 তলের অন্তরের সমান। অর্থাৎ x = (14 + 14) সে. মি. X = 28 সে. মি. আবদ্ধ বায়ুর দুই বিচ্ছিন্ন অংশের উলম্ব উচ্চতা সূক্ষ্মমাপে সমান হবে না। কিন্তু এক্ষেত্রে ভিন্নতার পরিমাণ এতই নগণ্য যে তা পরিমাপের ত্রুটির মধ্যেই অন্তর্হিত হয়ে গেছে।

সমাধান : নলবৃত্ত (পাক) যত সংখ্যকই হোক না কেন ব্যাখ্যা সহজীকরণের জন্য বৃত্তগুলিকে এক সমতলে অভিক্ষিপ্ত করলে সেগুলি তরঙ্গাকারে দেখানো যায় (চিত্র—4)। P বিন্দুতে
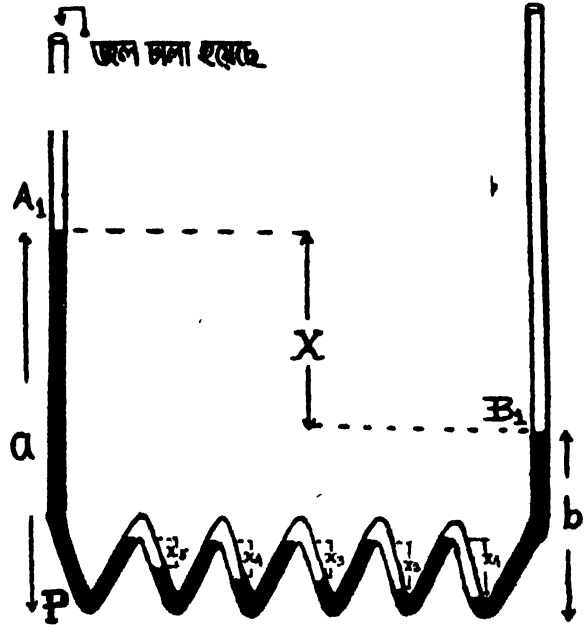
চিত্র-4

চাপের পরিমাণ দু-দিক থেকে পৃথক পৃথক বার করলে, বামদিকের a জলস্তম্ভের জন্য চাপ হয় = a + p ··(1), p এখানে বাইরের বায়ুমণ্ডলের চাপ। ডানদিকে b, x_1, x_2, ···x_n জলস্তম্ভের উদ্বৃত্ত অংশের জন্য চাপ, $b + p + x_1 + x_2 \cdots + x_n$............(2)

P বিন্দুর উপর কোন লব্ধ চাপ নেই, থাকলে সাম্যতা আসতো না, অস্থিরতা বিরাজ করতো। কাজেই ডানে ও বামে চাপ পরস্পর বিপরীতমুখী ও সমান। অতএব সমীকরণ (1) ও (2) থেকে : $a - b = x_1 + x_2 + x_n$.........(3)

x_1, $x_2 \cdots x_n$ জলের উদ্বৃত্ত উলম্ব উচ্চতা কিন্তু সেগুলিই আবার আবদ্ধ বায়ুর কার্যকরী উলম্ব উচ্চতার সমান (চিত্র—4)। 3নং চিত্রে এই বৈশিষ্ট্যগুলি স্পষ্ট দেখানো হয়েছে। আবদ্ধ বায়ুর ওজন তুলনায় নগণ্য কিন্তু বায়ুস্তম্ভগুলি বিচ্ছিন্ন জলস্তম্ভের মধ্যে চাপ পরিবহণে সহায়তা করছে। 4নং চিত্রে আবদ্ধ বায়ুর ভর মোটামুটি সমান কিন্তু বামদিকে এগোলে বায়ুর আয়তন ক্রমশঃ কমে আসছে উচ্চতর চাপের জন্য। সমীকরণ (3) তাত্ত্বিক ও পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের সমতা দেখাচ্ছে বেশ পরিষ্কারভাবেই।

মন্তব্য ঃ চিত্র—1 অনুযায়ী যন্ত্রটিকে প্রকাশ্য স্থানে রাখলে (যেমন স্কুল / কলেজের বারান্দার দেয়াল ঘেঁষে) অনায়াসেই

চিত্র-5

চমক সৃষ্টি করা যায়। বিজ্ঞান জানা লোকেরাও এটিকে কূট আখ্যা দেবেন ও মনে করবেন এখানে তরলে সমোচ্চশীলতার নীতি খাটছে না। অবশ্য যন্ত্রটিকে পিছন থেকে দেখলে (চিত্র—5) কূটটির সমাধান সূত্র অনুমান করা যথাসম্ভব সহজতর হয়ে যায়।

ভূগর্ভস্থ জলের তল সমোচ্চশীলতার নীতি অস্বীকার করতে পারে তা উপরিবর্ণিত কূট থেকেই অনুমান করা যায়। মোটা নলের (যেমন বাড়ীতে জলের পাইপ) এক প্রান্তে যথেষ্ট সংখ্যক পাক বা বক্রতা রাখলে অপর প্রান্তে জল ঢাললেও নল দিয়ে জল বেরোবে না, মনে হবে নলের মুখ জঞ্জালে বন্ধ হয়ে গেছে। পরীক্ষা করা যেতে পারে যথেষ্ট সংখ্যক বক্রতা বাড়িয়ে কত উচ্চতা পর্যন্ত জলের চাপকে আটকে রাখা যায়।

নির্দেশিকা ঃ (1) Paradoxial Manometer : The Physics Teacher, Jan 1981 ([illegible] কূটটির উল্লেখ আছে) (2) পরীক্ষাগুলি হাতে-কলমে করা হয়েছে।

শনিগ্রহের বলয়

কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়*

অলঙ্কারের কাজ সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা। দুরবীনে চোখ রেখে শনিগ্রহকে অদ্ভুত সুন্দর দেখায়। অন্য গ্রহদের তুলনায় শনি গ্রহের এই সৌন্দর্যের কারণ শনির বলয়গুলি। এই বলয় শনি গ্রহের অলঙ্কার স্বরূপ।

সম্প্রতি জানা গেছে এই অলঙ্কার বৃহস্পতি, ইউরেনাস ও নেপচুনেরও আছে। তবে অতি সূক্ষ্ম তাই পৃথিবী থেকে এদের দেখা সম্ভব হয় না। সর্বপ্রথম শনির বলয় পর্যবেক্ষণ করেন 1610 খৃস্টাব্দে ইটালীয় বিজ্ঞানী গ্যালিলিও। কিন্তু এই আবিষ্কার তাঁকে এক ধাঁধায় ফেলেছিল। বলয়গুলির ক্রমান্বয়ে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া তাঁকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। এর প্রায় 50 বছর পরে হল্যাণ্ডের জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিউইগেনসের গবেষণা ও আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানীরা শনির বলয় সম্বন্ধে নিশ্চিত হন।

1921 খৃস্টাব্দের জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পঞ্জিকাতে লেখা ছিল যে শনির বলয়গুলি কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য হয়ে যাবে। সাধারণ মানুষ এই অদৃশ্য হওয়ার অর্থ ধরে নিয়েছিল বলয়গুলি ধ্বংস হয়ে যাবে। এই ঘটনা পৃথিবীতে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। এই ধারণা হয়েছিল যে ভগ্নপ্রাপ্ত বলয় টুকরাগুলি সূর্যাভিমুখে ধাবিত হবে এবং মাঝপথে পৃথিবীর সঙ্গে সংঘাত হবে। আকাশ থেকে পতনশীল কোন বস্তু মানুষের মনে যে কী আতঙ্কের সৃষ্টি করতে পারে সে অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করেছি 1979 খৃস্টাব্দের স্কাইল্যাব পতনের সময়। সেই সময়ের মানুষের মনেও এইরূপ আতঙ্ক হয়েছিল। এমন কি সংঘাতের তারিখও হিসাব করে দেওয়া হয়েছিল। বলয়গুলির অদৃশ্য হয়ে যাওয়া কি সোরগোলই না তুলেছিল। সুতরাং বলয়গুলির অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কারণ জানা প্রয়োজন।
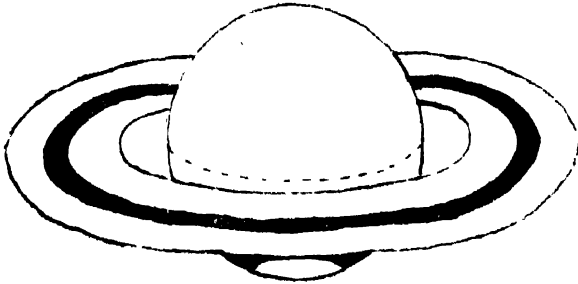
শনিগ্রহের বলয়।

শনির বলয়গুলি প্রস্থে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ কিলোমিটারেরও বেশী। সে তুলনায় এদের বেধ তিরিশ কিলোমিটারের বেশী নয়। আবার শনিগ্রহ নিজের কক্ষপথে প্রায় 27° হেলে থাকে। সেইসঙ্গে বলয়গুলিও প্রান্তিক বৃত্তের দিকে ঝুঁকে থাকে। সেজন্য যখন তারা সূর্যের দিকে আড়ভাবে থাকে তখন ঐ পুরু অংশটা (30 কিমি.) আলোকিত হয় যা পৃথিবী থেকে দেখা যায় না। আবার যখন তাদের চওড়া অংশটা সূর্যের দিকে ফেরে তখন পৃথিবী থেকে তা দেখা যায়। গ্রহটি নিজ কক্ষপথে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে সময় নেয় $29\frac{1}{2}$ বছর। তার মধ্যে দুবার সূর্য আর পৃথিবীর দর্শকের দিকে দুটি উল্টো বিন্দুতে আসে বেধের দিক, আর দু-বার আসে বলয়গুলির ব্যাপক পৃষ্ঠতলের দিক। এইভাবে বলয়গুলি মানুষের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে।
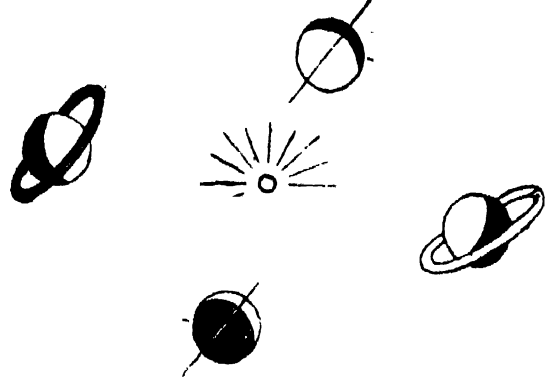
শনিগ্রহের বলয় কিভাবে অদৃশ্য হয়।

শনির বলয়ের মোট সংখ্যা আবিষ্কার বেশ চমকপ্রদ। হিউগেনস-এর আবিষ্কারের সময় থেকে প্রায় 1675 খৃস্টাব্দ পর্যন্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল শনির বলয় একটাই। 1675 খৃস্টাব্দে গিওভানি ক্যাসিনি তাঁর শক্তিশালী দুরবীনে বলয়ের মাঝখানে একটি কালোরেখা দেখতে পান। তিনি এর ব্যাখ্যা করে বলেন শনির বলয় দুটি, আর ঐ কালো অংশটি সম্পূর্ণ ফাঁকা। ক্যাসিনির নাম অনুসারে ঐ ফাঁকা অংশটির নাম রাখা হয় 'ক্যাসিনির অঞ্চল'।

এরপর 1838 খৃস্টাব্দে 'ক্যাসিনির' অঞ্চলের ভিতরের দিকের বলয়টির মধ্যে আর একটি বলয় আবিষ্কার হয়। এটি আবিষ্কার করেন জার্মান জ্যোতির্বিদ 'গটফ্রেড'। এই বলয়টিরও ভিতরের দিকে আর একটি বলয়ের সন্ধান পাওয়া যায় 1969 খৃস্টাব্দে। এর ঠিক দশ বছর পর 1979 খৃস্টাব্দে পাইওনীয়ার গ্রহযান আরও দুটি বলয়ের সন্ধান দেয়। অর্থাৎ বলয় সংখ্যা হলো ছয়টি এবং এই সময় ছয়টি বলয় আছে বলেই মেনে নেওয়া হয়। কিন্তু 1980 খৃস্টাব্দে ভয়েজার-1 গ্রহযান শনির পাশ

* 1, মনমোহন বসু স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006

কাটিয়ে যাওয়ার সময় যে ছবি তুলে পাঠায় তা মানুষের অচিন্ত্যনীয়। এই ছবি অনুযায়ী কয়েক হাজার বলয় শনির চারপাশে ঘুরছে। এই খানেই বলয়ের সংখ্যা আবিষ্কার শেষ নয়। 1981 খৃস্টাব্দে ভয়েজার-2 গ্রহযান থেকে তোলা ছবি থেকে জানা গেল বলয়ের সংখ্যা কয়েক লাখের কম নয়। ক্যাসিনির অঞ্চল ও অন্যান্য ফাঁকা জায়গাগুলিতে অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বলয় আছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার অনুযায়ী ইংরাজী বর্ণমালা দ্বারা বলয়গুলির নামকরণ করেছেন। শনির সবচেয়ে কাছের বলয়টির নাম 'D' বলয়। তার পরের বলয়টির নাম 'C' বলয়। এটি দেখতে ক্রেপ কাগজের মতো। একে ক্রেপবলয়ও বলা হয়। এটি চওড়ায় প্রায় 175000 কি. মি.। এরপর 1800 কি. মি. ফাঁকা। তারপরের উজ্জ্বল সাদা বলয়টির নাম 'B' বলয়। এটি প্রায় 25340 কি.মি. চওড়া। 'B' বলয়ের পরেই ক্যাসিনির অঞ্চল। এই ফাঁকা অংশটি চওড়া প্রায় 5000 কিমি.। পাঁশুটে সাদা রংয়ের 'A' বলয়টি ঠিক ক্যাসিনির অঞ্চলের পরেই। এটি 139000 কিমি. চওড়া। 'A' বলয়ের পরেও চার হাজার কিমি. মত জায়গা ফাঁকা। এর নাম করা হয়েছে—'পাইওনীয়ার অঞ্চল'। এর পরে একটি 'F' নামে সূক্ষ্ম বলয় আছে। আর তার পরে প্রায় দশ হাজার কিমি. দূরে 3600 কিমি. চওড়া 'G' বলয় ঘুরছে এবং সবচেয়ে বাইরের বলয়টির নাম 'E'। এটি চওড়ায় প্রায় 120000 কিমি.।

এই ভাবে নামকরণ করায় কোন অসুবিধায় পড়তে হয় নি। তবে ভয়েজার-2 গ্রহযানের তথ্য পাওয়ার পর বলয়গুলির প্রত্যেকটির নামকরণ করতে গেলে পৃথিবীর সব ভাষার সব বর্ণগুলি নিয়েও হবে কিনা সন্দেহ হয়।

ভয়েজার গ্রহযানের ছবি থেকে বলয়গুলির গঠন সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া গেছে। কিছু বলয় যেন পরস্পরে জড়িয়ে বিনুনী পাকিয়ে আছে। আবার কিছু বলয়ের উপর রয়েছে চাকার স্পোকের মত ছোপ। এ সব যে কিভাবে সৃষ্টি হলো তা অতি বিস্ময়কর ব্যাপার।

শনির বলয়গুলি যে কোন্ পদার্থে তৈরী তা এখনো সঠিক ভাবে জানা যায় নি। বিজ্ঞানিগণ মনে করেন বিভিন্ন সাইজের বরফখণ্ড দিয়ে বলয়গুলি সৃষ্টি হয়েছে।

বলয় সম্বন্ধে এতকিছু জানা গেলেও কোন গ্রহের যে কি ভাবে বলয় সৃষ্টি হয় তা আজও অজানা রয়ে গেছে। তবে মানুষের জানার আকাঙ্ক্ষা ও বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় আশা হয় অদূর ভবিষ্যতে সব রহস্য উন্মোচিত হবে।

রসায়নের শব্দকূট

কানাইলাল সাহু*

পাশাপাশি :—

1. একটি বিষাক্ত পদার্থ।
5. হাইড্রোজেনযুক্ত বিরঞ্জক যৌগ।
6. একটি অজৈব দ্রাবক।
8. রক্তসন্ত।
10. উভধর্মী অক্সাইড।
11. সমযোজী যৌগ।
12. বিরঞ্জক অ্যাসিডিক অক্সাইড।

উপর নীচ :—

1. একটি তীব্রক্ষার।
2. একটি কার্যকরী মূলক।
3. নাইট্রোজেনদ্বারা গঠিত কার্যকরী মূলক।
4. টোলেন বিকারক বা ফেলিংস দ্রবণের সঙ্গে ক্রিয়া করে এমন এক পদার্থ।
5. একটি ঋণাত্মক আয়ন (উল্টা)।
7. বাদামী বর্ণযুক্ত গ্যাস।
9. বিরঞ্জক মৌলের অণু
10. সাদা সালফাইড যৌগ।

X	1	2	3	X	4
5				X	
	6			X	
X	X		X	7	
8	9	X	10		X
11		X	12		

[সঠিক সমাধান পাঠাতে প

* এ. টি. আই, সল্ট লেক, সেক্টর-3, কলিকাতা-64

এপ্রিল'83 সংখ্যায় প্রকাশিত শব্দ-শৃঙ্খলের সমাধান-

সমাধান :—

পাশাপাশি

1. কোববাদ 2. হল্যাণ্ড 4. হাল্ট 5. শোলস 6. গিলেট 8. বেয়ার্ড 9. ডিসেম্বর 10. ওটিস 13. নখ 18. সিনেমা 19. ম্যাকাডাম 20 ম্যাকমিলান 21 ট্রেন।

উপরে-নীচে

1. কোল্ট 3. ওয়াকার 4. হাংজ 7. এডিসন 10. ওয়াটার ম্যান 11. রেনী লেনেক 13. ফ্লেমিং 14. নোবেল 15. ওডিসি 16. কোডাক 17. রোম।

X	কো	ব	বা	দ	X		ল্যা		ও
হা	ল্ট	X	শো	ল	স	X	X	X	য়া
ং	X	গি	লে	ট	X	এ	X	X	কা
জ	বে	য়া	র্ড	X	X	ডি	সে		
X	X	X	X	ও	টি	স	X	X	X
X	রে	ফ্লে	X	য়া	X		খ	X	নো
ও	নী	মি	X	টা	X	X	X	X	বে
ডি	লে	ং	X	র	X	ফ্লে	রো	X	ল
সি	নে	মা	X	ম্যা	কা	ডা	ম	X	X
ম্যা	ক	মি	লা	ন	X			ট্রে	

এপ্রিল (1983) মাসের শব্দ-শৃঙ্খলের সমাধানকারীদের নাম—

সবগুলির—মৃদুলকুমার সাউ, মীরগোদা মেদিনীপুর, দীপা ও ববিতা ঘোষ, কলিকাতা-700074

1টি বাদে—বাবলু সাধুখাঁ, খড়দহ 24 পরগণা, শর্বরী সেনগুপ্ত, কলিকাতা-86।

2টি বাদে—বিশ্বজিৎ সাহা, কলিকাতা-67, চন্দন ব্যানার্জী, কলিকাতা-30, প্রদ্যোৎ বিশ্বাস, কলিকাতা-30, রঞ্জন ভট্টাচার্য, চিত্তরঞ্জন, বর্ধমান।

3টি বাদে—জুলী রায়চৌধুরী, কলিকাতা-9, উৎপল বিশ্বাস, পাঁচপোতা 24 পরগণা, দেবজ্যোতি, সর্বানী ও দীপক সড়ঙ্গী, কাঁথি, মেদিনীপুর, দেবজিৎ ও চৈতালী মুখার্জী, কলিকাতা-700030, হিমাদ্রি দাস, কাচরাপাড়া 24 পরগণা

4টি বাদে—জয়ন্তকুমার দাস, বাঁশবেড়িয়া, হুগলী, সুমিতা, সঞ্চিতা ও দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়, গোপালপুর বাঁকুড়া, মানস কুমার দাস, গুরুপল্লী, বীরভূম।

5টি বাদে—রজত দে, বেলুড়মঠ, হাওড়া, কল্যাণকুমার পাত্র ও অশোককুমার বাদুড়ী, জগৎবল্লভপুর হাওড়া, শিবব্রত পট্টনায়ক, রামচন্দ্রপুর মেদিনীপুর, স্বরূপকুমার রায়, বসন্তবাড়, মেদিনীপুর।

6টি বাদে—কৃষ্ণেন্দু বসু, কলিকাতা-30।

7টি বাদে—সৌমেন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা-56

8টা বাদে—বিশ্বজিৎ দত্ত, ঘুটিয়াবাজার, হুগলী, অপূর্ব কুণ্ডু, তারকেশ্বর, হুগলী।

13টি বাদে—গৌতম জানা, বাগনান, হাওড়া।

অভিনব এরিয়াল

বিশ্বজিৎ দে*

বেতার প্রেরক কেন্দ্র থেকে যে সব শ্রোতা বহু দূরে থাকেন তারা তাদের গ্রাহক-যন্ত্রে দুর্বল কেন্দ্রগুলির অনুষ্ঠান ভাল ভাবে শুনতে পান না। ভালভাবে শুনতে গেলে রেডিওর উপর হাত রাখতে হয়।

এই অসুবিধা দূর করার পদ্ধতিটি এখানে বলা হলো। প্রথমে একটা তিন, চার ইঞ্চি লম্বা সামান্য মোটা, ধাতুর (লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম) পাত নিতে হবে। রেডিও ভিতরে একটা শক্ত কালো রড দেখা যায়, যার নাম ফেরিক রড। এর এক পাশে কাগজের চোঙে একটা তারের কুণ্ডলী থাকে, এই রড ও তার কুণ্ডলীর এক সে.মি. দূরে ওই পাতটি ক্ল্যাম্প দিয়ে আটকাতে হবে।

এবার পাতের সঙ্গে তার দিয়ে রেডিওর ক্যাবিনেটে একটা পয়েন্ট করে, আকাশ তারের সঙ্গে তার দিয়ে সংযোগ করলে, দুর্বল কেন্দ্রগুলি ভালভাবে শোনা যাবে। এই এরিয়াল ব্যবস্থা সাধারণ এরিয়ালের থেকে অনেক বেশী কার্যকর।

*লোকপুর, বাঁকুড়া
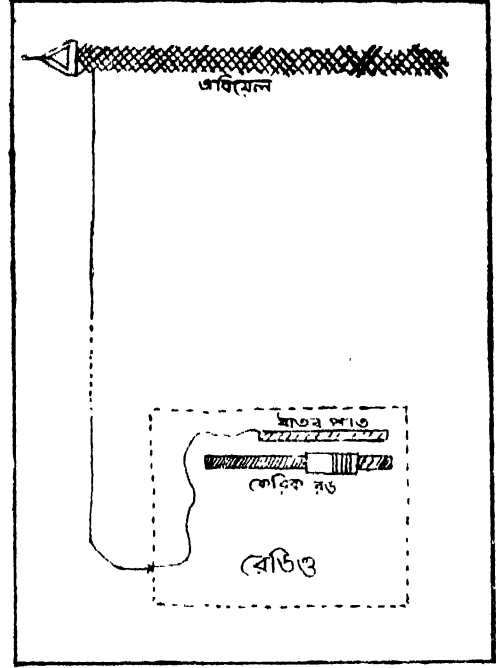
ভেবে উত্তর দাও

মলয় শীল*

(নিম্নের প্রশ্নগুলির একাধিক উত্তর দেওয়া আছে সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত কর।)

1. ভিটামিন A-এর অভাবে হয়—
a) স্কার্ভি, b) বেরিবেরি, c) রাতকানা d) রিকেট।

2. মানুষের 'গলগণ্ড' রোগ হয়, কারণ—
a) ভিটামিনের অভাব, b) টেস্টোস্টেরন হরমোনের প্রভাব, c) উৎসেচকের প্রভাব, d) খাদ্যে আয়োডিনের ঘাটতি।

3. ভিটামিন C-এর রাসায়নিক নাম—
a) অ্যাসকরবিক অ্যাসিড, b) কার্বনিক অ্যাসিড, c) অ্যাসেটিক অ্যাসিড, d) ফলিক অ্যাসিড।

4. 'অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশগতি' (inheritance of acquired characters)—এই উক্তি।
a) ভাইসম্যান, b) লামার্ক, c) গ্ল্যাডস্টোন, d) ডি. ভ্রিস।

5. কার্বহাইড্রেট যকৃত ও পেশীতে সঞ্চিত হয়—
a) গ্লুকোজ রূপে, b) ভিটামিন A হিসাবে, c) গ্লাইকোজেন রূপে, d) ফ্যাট বা চর্বি হিসাবে।

6. অ্যাড্রিনোকর্টিকোট্রফিন হরমোন (ACTH) উৎপন্ন হয়—
a) পিটুইটারী, b) অ্যাড্রিনাল, c) থাইরয়েড, d) মস্তিষ্কের কর্টেক্স গ্রন্থি।

7. কলসপত্র উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম—
a) ড্রসেরা, b) নেপেনথিস, c) ডায়োনিয়া, e) ইউট্রিকুলেরিয়া।

[সঠিক উত্তর পাঠাতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে]

* 119, জপুর রোড, কলিকাতা-700078

এপ্রিল'83 সংখ্যায় প্রকাশিত "ভেবে উত্তর দাও'-র উত্তর

1. শক্তিলাভ করা 2. অক্সিজেন 3. ধানগাছ 4. ক্যারোলাস্ লিনিয়াস 5. ইউগ্লিনা 6. এডঁরিলিয়া 7. তিনজোড়া পদ 8. ছারপোকা 9. গাছ এবং জল উভয় স্থানে 10. আন্ন. ভি. রোজেনহোফ 11. অজগর 12. পাইথন 13. পাইথন 14. কাচের একটি খেলনা সাপ 15. 35

এপ্রিল'83 মাসের 'ভেবে উত্তর দাও'-র উত্তরদাতাদের নাম

1টি বাদে—মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ধমান

2টি বাদে—প্রভাকর, বিকাশ, সুচিত্রা, শোভাকর ও অঞ্জন চন্দ্র, সাউটিয়া, মেদিনীপুর। তুহিন বাপুলী কলিকাতা-29।

3টি বাদে—দেবজিৎ মুখার্জী, কলিকাতা-30। শুভেন্দু দে কৈকালা, হুগলী। দেবাশীষ বাগচী সোনারপুর 24 পরগণা। পাপিয়া দে, সোনারপুর 24 পরগণা। মোহনলাল বিষয়ী, মেমারী, বর্ধমান। অংশুমান ও অনমিত্র চ্যাটার্জী, বৈদ্যবাটি, হুগলী। প্রদ্যোৎ বিশ্বাস, কলিকাতা-30। গৌতম মুখোপাধ্যায় কলিকাতা-34। অমিতাভ দাস, চম্পাহাটি, 24-পরগণা। জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারকেশ্বর, হুগলী। বিশ্বজিৎ সাহা, কলিকাতা-67। সান্ত্বনা পাল, উত্তরপাড়া, হুগলী।

4টি বাদে—সুমিতা, সঞ্চিতা, দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়, গোপালপুর বাঁকুড়া। দেবাশিষ ঘোষ, ডায়মণ্ডহারবার 24-পরগণা। জুলী রায়চৌধুরী, কলিকাতা-9। বাবলু সাধুখাঁ, খড়দহ, 24 পরগণা। রাধারাণী ঘোষাল, রাণাঘাট, নদীয়া। ঝাড়েশ্বর ঘোষ, বাড়অচু, মেদিনীপুর। অপূর্ব কুণ্ডু, তারকেশ্বর, হুগলী।

5টি বাদে—জয়ন্ত ঘোষ ও সুষেণ সরকার, হাবড়া, 24-পরগণা। রজত দে, বেলুড়মঠ হাওড়া। চৈতালী ঘোষাল, খড়দহ 24-পরগণা। মৃদুলকুমার সাউ, মীরগোদা, মেদিনীপুর, কৌশিকী শেঠ, চন্দননগর, হুগলী। জ্যোৎস্না রায়, কালীনগর, 24 পরগণা।

6টি বাদে—সুধাময় মাইতি, মানিক জোড়, মেদিনীপুর। অনিমেশ রায় কলিকাতা-5।

7টি বাদে—কেয়া ভট্টাচার্য, প্রফুল্লনগর, হাবড়া। রঞ্জন ভট্টাচার্য, চিত্তরঞ্জন, বর্ধমান। শবরী সেনগুপ্ত, কলিকাতা-46, সৌমেন মুখোপাধ্যায় কলিকাতা-5। বিশ্বজিৎ দত্ত, ঘুটিয়াবাজার হুগলী। কল্যাণকুমার পাত্র ও অশ্বকুমার বাদুড়ী, জগৎবল্লভপুর হাওড়া।

8টি বাদে দেবাশীষ, মৃণাল, কুমকুম, পূর্ণিমা, সিউড়ী বীরভূমি।

10টি বাদে—জয়ন্তকুমার দাস, বাঁশবেড়িয়া হুগলী।

11টি বাদে—সুব্রত দে বেলুড়মঠ, হাওড়া।

পরিষদ সংবাদ

কল্যাণীর ঘোষপাড়ার "সতীমা'র মেলা"কে কেন্দ্র করে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ও কল্যাণী বিজ্ঞান সংস্থার যৌথ উদ্যোগে ও পরিচালনায় "সমাজ ও বিজ্ঞান" বিষয়ক প্রদর্শনী মেলা প্রাঙ্গণেরই কাছে অনুষ্ঠিত হলো। একদিকে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন লাখ লাখ 'পুণ্যার্থী' দণ্ডীকাটা, ডালিম গাছে ঢেলা বাঁধা (মনস্কামনা পূরণের উদ্দেশ্যে মাটির তৈরী ঘোড়ার মত আকারের কিছু জিনিস সুতো দিয়ে সতীমায়ের মন্দিরের কাছের ডালিম গাছে বেঁধে দেওয়া হয়)। মন্দিরের বেদীর কাছে হত্যা দেওয়া ইত্যাদি অনুষ্ঠান করে চলেছেন। অপরদিকে বিজ্ঞান মেলায় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জ্যোতিষশাস্ত্র, হাতগণনা ইত্যাদির উপর নানা পোস্টার, পেটের অসুখ, শিশুদের অপুষ্টি, মানুষের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসের উপর নানা ছবি ও লেখা বিভিন্ন বিজ্ঞান সংস্থার ছেলেমেয়েরা কত সহজ সুন্দরভাবে দর্শকদের বুঝাতে ব্যস্ত। চলছে সূর্যগ্রহণের উপর তোলা স্লাইডের প্রদর্শনী, চলছে মাইক্রোস্কোপে জীবাণু দেখা। কতরকম দর্শক, কত উৎসাহ, কত প্রশ্ন।

পোস্টার, অর্থ, বই, প্রোজেক্টার ইত্যাদি দিয়ে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এবার এই বিজ্ঞান মেলাকে সমৃদ্ধতর করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। তাদের তৈরী অহেতুক সর্পভীতির উপর লেখা পোস্টারগুলো ছিল মেলার বড় আকর্ষণ।

কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবারের তৈরী কুসংস্কারের উপর লেখা পোস্টারগুলো অনেকেই পড়েছেন বেশ আগ্রহ নিয়ে। সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে দেখা নানা আকৃতির ব্যাকটেরিয়াগুলো। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক সংস্থার সদস্যদের তৈরী দুধ পুকুর, হিমসাগর (এখানকার পুণ্যার্থীরা এই দুটি পুকুরের জল পান করে, এখানে স্নান করে পুণ্যলাভের আশায়) কল্যাণীর লেক্ ইত্যাদির জল থেকে সংগ্রহ করা পেট্রিডিসের মধ্যেও রঙ-বেরঙের ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও অন্যান্য জীবাণুগুলো দর্শকরা দেখছে অবাক ভাবে।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিভাগ থেকে সংগ্রহ করা সোলার কুকার, সোলার ড্রায়ার ইত্যাদিও দর্শকদের বেশ উৎসাহ জুগিয়েছে।

এই বিজ্ঞানমেলার অভিজ্ঞতা থেকে এটুকু বোধ হয় বলা যায় যে এ ধরণের প্রদর্শনী সত্যিই বিজ্ঞান মনস্কতার প্রসারে খুব উপযোগী, মানুষের প্রচলিত ধ্যানধারণাকে বেশ নাড়া দেয়।

এই প্রদর্শনীতে অন্য যে সব সংস্থা অংশগ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে ছিল পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা, উৎস মানুষ ও প্রগতিবার্তা পত্রিকাগোষ্ঠী, কলকাতা মেডিকেল কলেজের কিছু উৎসাহী ছাত্র ও ঝাড়গ্রামের কয়েকজন বিজ্ঞানকর্মী। মেলা কর্তৃপক্ষও এই প্রদর্শনী পরিচালনায় যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

অমিতাভ রায়

সংযোজন : এই ধর্মীয় মেলায় মানুষ কেন আসে ?

এবারেও (1980) 29শে ফেব্রুয়ারী থেকে ঘোষপাড়ায় বিরাট মেলা বসেছিল।···একটি শিশুকন্যাকে নিয়ে তার মাসী হাওড়ার দানসাগর থেকে এসেছিল সতীমায়ের মেলায়। ছোট্ট মেয়েটি ঝড়বাদলে অসুস্থ হয়ে পড়লে সমবেত অনেকের পরামর্শে মেয়েটিকে হিমসাগরে (একটি এঁদো পুকুর যার নোংরা জলে হাজার লোকে স্নান করে পুণ্যলাভে) স্নান করিয়ে সতীমায়ের থানে ডালিমতলায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে রাখে। মেলাতে ডাক্তার ছিল কিন্তু দৈবশক্তির ওপর ভরসা ছিল অনেক বেশী, ফলত শিশুটি মারা যায়। মাসীর বুকফাটা আর্তনাদে মেলার বাতাস ভারী হয়। জলকাদার মধ্যে সে মৃত শিশুকে আঁকড়ে বসেছিল। শেষ অবধি পুলিশের সাহায্যে মৃতদেহ সরানো হয়।

[কল্যাণী থেকে প্রকাশিত 1980 খৃস্টাব্দের "প্রগতিবার্তা" থেকে]

অনেকক্ষণ ধরে একটা আঁ আঁ আওয়াজ কানে আসছিল। একটু এগোতেই দেখি বিশাল একটা জটলা। হিমসাগরের ঘাটের কাছে একটি সাত-আট বছরের বাচ্চা ছেলে। বোবা, একজন রুক্ষ-চুলো লোক বুক জলে দাঁড়িয়ে ছেলেটার একটা হাত ধরে ছুঁড়ে ফেলছে আরো গভীর জলে। কিছুক্ষণ এভাবে ডুবিয়ে রেখে আবার টেনে তুলছে। বোবা ছেলেটা ভয়ে, আতঙ্কে, বেদনায় বিকৃত গোঙানির মত আওয়াজ বার করছে—আঁ আঁ করে ; বুক কাঁপিয়ে দেয় সে স্বর······। কয়েক মিনিট বাদে বাদে পুকুর ধারে নিয়ে এসে ছেলেটার মুখে জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে পচা বাসি ফুল, কাদা, পাথরকুঁচি এসব। একজন ছেলেটাকে বজ্রমুষ্ঠিতে ধরে জোর করে হাঁ করাচ্ছে, অন্যজন আঙুল দিয়ে ঠেসে গলায় ঢুকিয়ে দিচ্ছে ওইসব।······ ভয়ে অত্যাচারে আধমারা হয়ে ছেলেটা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। আর সমানে নির্দয়ভাবে কিল-চড় চলছে। পাড়ের কাছে কয়েক হাজার নারী-পুরুষ দাঁড়িয়ে—প্রতিবাদহীন।

[শুধু তাই নয় এখানে নাকি অন্ধেরও চোখ খোলে, সন্তানহীন গর্ভবতী হয়, দুরারোগ্য ব্যাধি দূর হয়, যে কোন মনস্কামনাইপূর্ণ হয়।]

ফিস্ ফিস্ করে একে অপরকে জিজ্ঞেস করছে, "মা বললো বুঝি তাতো বলবেই—এর নাম হিমসাগর।" এর জলের নাকি যাদুকরী গুণ আছে। ······কি অন্ধ বিশ্বাস, এই বিশ্বাসেই বোধ হয় মানুষ আগেকার দিনে মানুষ বলি দিত। [বোবাকে কথা বলাবার এই অমানবিক প্রচেষ্টা চলে আজও]

বোম্বাই শহরের এক ধর্মীয় মেলা ও মহারাষ্ট্র লোকবিজ্ঞান সংগঠনের বিজ্ঞান অনুষ্ঠান

বোম্বাই শহরের দাদার বাত্তালায় আষাঢ়ী একাদশীর মেলাটি বোধহয় বোম্বাইএর প্রাচীনতম মেলা। বোম্বাইএর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকে এই মেলায় ভগবান বিঠ্‌ঠল রখুমাইকে (বিষ্ণু-লক্ষ্মী) দর্শন করতে এসে থাকেন। এঁদের মধ্যে ঐতিহ্যগত ভাবে শুধু বারকারিগণই (বাউলের মত একটি সম্প্রদায়) থাকেন তা নয়, শ্রমিক ছাত্র ও মধ্যবিত্তরাও মৃদঙ্গ ও খঞ্জনী সহযোগে নাচগানে যোগ দেন। চারদিকে মহারাষ্ট্রের সাধু-সন্তদের নামে জয়ধ্বনি উঠতে থাকে। 1980 খৃস্টাব্দের মেলায় 'লোকবিজ্ঞান সংগঠন' আয়োজিত একটি অনুষ্ঠান ঐ মেলায় ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে। অনুষ্ঠানটির নাম ছিল 'চমৎকার বাবাকা রহস্য বিজ্ঞান কা' (চমৎকার বাবার বিজ্ঞানরহস্য)

এই অনুষ্ঠানে কৃত্রিম জটাজুটধারী লোকবিজ্ঞানের এক সদস্য মধ্যরাত্রে ভজন ও জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে সপারিষদ আবির্ভূত হলো। সিল্কের গেরুয়া, তিলক আর ফুলের মালার আতিশয্যে 'বাবাকে' এক পরমপুরুষ' এর মত দিব্যতেজসম্পন্ন দেখাচ্ছিল। ······নিজের অবতারত্ব এবং ভগবত বিষয়ে কথামৃত বিতরণের পর ধ্যানে বসলেন, সমাধিস্থ হলেন, হঠাৎ দর্শকদের অবাক করে শূন্য থেকে বিভূতি সৃষ্টি, খালি কলসী থেকে পবিত্র গঙ্গোদক না দেখে নোটের নম্বর বলা, আগুন পান করা, ঠোঁটে ছুঁয়ে টিউবলাইট জ্বালান ইত্যাদি 'অলৌকিক' ক্রিয়াকলাপ আরম্ভ করলেন। পরক্ষণেই গেরুয়া বসন, কৃত্রিম জটা ত্যাগ করে, মেক্‌আপ মুছে পূর্বোক্ত ক্রিয়াকলাপের পেছনে যে সমস্ত কৌশল কারচুপী, ছলচাতুরী আছে তা দর্শকদের কাছে ব্যাখ্যা করলেন।

সাধারণ মানুষের অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়ে 'বাবা' 'গুরুদেব' 'সাধুরা' কিভাবে নানা কৌশলে তাদের অলৌকিকত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেন তা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করলেন এবং দর্শকদের ঐ মঙ্গল বুজরুকী থেকে দূরে থাকতে বললেন।

তাঁরা সামগ্রিকভাবে সমবেত দর্শক সাধারণের মধ্যের নানা প্রতিক্রিয়ার ব্যাপক তথ্য জোগাড় করে, অবক্ষয়, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রত্যক্ষ গবেষণার কাজও আরম্ভ করেছেন।

["খোলা চোখে ঘোষপাড়ার ধর্মমেলা" উৎসমানুষ, এপ্রিল 1982 ও "ধর্মীয় মেলায় বিজ্ঞান অনুষ্ঠান" উৎসমানুষ, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর 1981 থেকে নির্বাচিত অংশের সংকলন]

সংগ্রাহক—শান্তনু ত্রিবেদী

দ্রষ্টব্য : এপ্রিল '83 সংখ্যায় প্রকাশিত (152 পৃঃ) 'বিভিন্ন উপসমিতি'-তে গ্রন্থাগার উপসমিতিতে কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও হাতে-কলমে উপসমিতিতে সনৎ পালের নাম ভ্রমবশতঃ বাদ গেছে।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006 থেকে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ, 37/7, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-700 009 হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বিজ্ঞান পরিষদের আদর্শ অনুযায়ী জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার মত সমাজের কল্যাণমূলক বিষয়বস্তু সহজবোধ্য ভাষায় সুলিখিত হওয়া প্রয়োজন।
2. মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এবং পূর্ণ ঠিকানাসহ লেখকের পরিচিতি পৃথক কাগজে অবশ্যই লিখে দিতে হবে।
3. চলিত ভাষা এবং চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহৃত হবে। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্র্যাকেটে ইংরাজী শব্দটিও দিতে হবে। আন্তর্জাতিক সংখ্যা এবং মেট্রিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে।
4. মোটামুটি 3000 শব্দের মধ্যে রচনা সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়।
5. বিভিন্ন ফীচার, সমকালীন বিজ্ঞান গবেষণা ও প্রযুক্তিবিদ্যার সংবাদ, এবং বিজ্ঞান বিষয়ক সুন্দর আকর্ষণীয় ফটোগ্রাফীও গ্রহণীয়।
6 রচনার সঙ্গে চিত্র থাকলে আর্ট পেপারে চাইনিজ কালিতে সুঅঙ্কিত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন।
7 প্রত্যেক চিত্র প্রস্থে 8 সে. মি. কিংবা এর গুনিতকের (18 সে. মি. 24 সে. মি) মাপে অঙ্কিত হওয়া প্রয়োজন।
8 অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব বজায় রেখে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মন্ডলীর অধিকার থাকবে।
9. প্রত্যেক প্রবন্ধ ফীচার এর শেষে গ্রন্থপঞ্জী থাকা বাঞ্ছনীয়।
10. জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পুস্তক সমালোচনার জন্য দুই কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।
11 ফুলস্ক্যাপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় যথেষ্ট মার্জিন এবং প্রতি লাইনের পর বেশ কিছুটা ফাঁক রেখে পরিস্কার হস্তাক্ষরে প্রবন্ধ লিখতে হবে।
12. প্রতি প্রবন্ধের শুরুতে পৃথকভাবে প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া আবশ্যিক।

সম্পাদনা সচিব

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

আবেদন

1948 সাল থেকে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা বিষয়ে পরিকল্পিত ধ্যান ধারণা পরিষদ পালন করে আসছে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রকাশনের মাধ্যমে। ইতিমধ্যে পরিষদ কিছু অমূল্য রচনা বাংলাভাষায় প্রকাশ করেছে। বর্তমান পত্রিকা প্রকাশনা ছাড়াও পরিষদ বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতার বিকাশ ঘটে। গ্রাম বাংলার পল্লীতে, আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে ও শহরের বস্তিতে, যেখানে বেশীর ভাগ মানুষ জ্ঞানের আলো থেকে এখনও বঞ্চিত, তাদের কাছে বিজ্ঞানের মঙ্গলময় রূপ তুলে ধরতে পরিষদ বদ্ধপরিকর। এইসব বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মসূচীর রূপায়নে অর্থের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অথচ পরিষদের দারুণ অর্থাভাব। তাই পরিষদ সরকার, বেসরকারী সংস্থা, ব্যবসায়ী ও সহৃদয় ব্যক্তির কাছে অর্থসাহায্যের আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছে। সাধারণ মানুষের জন্য তৈরী আচার্য বসুর পরিষদ যে কোনও সামান্য দানও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করে অবহেলিত মানুষের স্বার্থে ব্যয় করবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে পরিষদে প্রদত্ত সর্বপ্রকার দান আয়করমুক্ত।

কর্মসূচী

1 সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা সৃষ্টি করা এবং বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তোলা।

2 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকাকে সাধারণের নিকট আরও আকর্ষনীয় করে তোলা।

3. পরিষদের মাধ্যমে গ্রামবাংলার বিজ্ঞান ক্লাবগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা এবং তাদের বিজ্ঞান ভিত্তিক জনহিতকর কাজে উৎসাহিত করা।

4. প্রতি বছরে পশ্চিম বাংলায় অন্ততঃ একবার বিজ্ঞান সম্মেলনের ব্যবস্থা করা।

5 গ্রামবাংলার বিভিন্ন মেলায় বিজ্ঞান ক্লাবগুলিকে নিয়ে পোস্টার প্রদর্শনী, বিজ্ঞানভিত্তিক সিনেমা, আলোচনা চক্র অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞান, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করা।

6. বছরের শেষে বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা।

7. হাতে-কলমে কারীগরী বিদ্যা শিখিয়ে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রী ও নাগরিকদের স্বনির্ভরশীল করা। ব্যয়ভার বহনের জন্য সামান্য অর্থের বিনিময়ে টি ভি, টেপরেকর্ডার, রেকর্ড প্লেয়ার, ট্রানজিস্টার এমারজেন্সি বৈদ্যুতিক আলো, ফটোগ্রাফী বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া।

8. মাটি পরীক্ষার কাজে শিক্ষা দিয়ে গ্রামের বিজ্ঞান ক্লাবগুলিকে সাধারণ চাষীদের সাহায্য করতে উৎসাহিত করা।

9 সাধারণ মানুষের জন্য বিজ্ঞান প্রবন্ধ থেকে মৌলিক গবেষনাপত্র পর্যন্ত বাংলা ভাষায় প্রকাশ এবং জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বই ও বিজ্ঞান সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ।

10. যোগব্যায়াম ও তার গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন।

11 পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারটি সুসমৃদ্ধ করে গড়ে তোলা।

12 পরিষদ ভবনে 'বিজ্ঞান সংগ্রহশালা' স্থাপন করা।

13 নির্বিচারে যথেচ্ছ গাছপালা ও বনজঙ্গল ধ্বংসের ফলে পরিবেশ দূষণ ও আবহাওয়ার মারাত্মক পরিবর্তনের ভয়াবহতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সজাগ করা।

14. নির্বিচারে বন্যপ্রাণী ধ্বংসের দরুণ প্রাকৃতিক ভারসাম্যের বিঘ্ন ঘটার বিপদ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা।

15 যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করা।

16 শহর ও গ্রামের প্রতিটি স্কুল, কলেজ ও গ্রন্থাগারে পরিষদের মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার গ্রাহকীকরণের মাধ্যমে পরিষদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচার।

সুকুমার গুপ্ত
কর্মসচিব

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

পরিবেশ সংখ্যা
জুন, 1983
36তম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা

বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের অনুশীলন করে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও সমাজকে বিজ্ঞান-সচেতন করা এবং সমাজের কল্যাণকল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করা পরিষদের উদ্দেশ্য।

বিষয় সূচী

প্রচ্ছদ পরিচিতি : বিশ্বপরিবেশ দিবসের প্রতীক। পরিবেশ সংরক্ষণের সহযোগিতায় প্রসারিত দুই হাত। উদ্ভিদ, প্রাণী, বাতাস ও জলের সংরক্ষণ করতে হবে আমাদের পৃথিবীকে বাস যোগ্য করতে ও করে রাখতে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : 30·00 টাকা

প্রতি সংখ্যা : 2·50 টাকা

যোগাযোগের ঠিকানা :

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা-700006
ফোন : 55-0660

জ্ঞা ন ও বি জ্ঞা ন

ষট্‌ত্রিংশত্তম বর্ষ | জুন, 1983 | ষষ্ঠ সংখ্যা

পরিবেশ ও মানবশিশুর ভবিষ্যৎ ভাবনা

বিশ্বনাথ দাস*

বর্তমান দশকের ঠিক আগের দশক থেকে পরিবেশ সংক্রান্ত এমন সব বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া শুরু হয়েছে যা নিয়ে এর আগে বিশেষ চিন্তা-ভাবনা করা হয় নি। 1972 খৃস্টাব্দের 5ই জুন গঠিত সম্মিলিত জাতীয় পরিবেশ প্রকল্প (UNEP) ঐ বছরের 15ই ডিসেম্বর সারা পৃথিবীর পরিবেশ পর্যবেক্ষণ ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সাধারণ সম্মেলনে যে প্রস্তাব গ্রহণ করে তাতে বলা হয়ঃ ...আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ পৃথিবীর পরিবেশ সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের সরকার যেন উপযুক্তভাবে সচেতন হন এবং জাতীয় কর্মসূচীতে তাদের নিজস্ব অঞ্চলভিত্তিক সমস্যাগুলি নির্ধারণ ও তার সমাধানের বিষয়টিকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেন।...

1981 খৃস্টাব্দের প্রতিবেদনে (29 এপ্রিল, 1980 গৃহীত) এই প্রকল্প তিনটি বিষয়ের উপর জোর দেওয়ার কথা ঘোষণা করেনঃ ভূ-গর্ভস্থ জল, বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ সমূহ ও মানুষের খাদ্য-শৃঙ্খল এবং পরিবেশ অর্থনীতি। ভূ-গর্ভস্থ জল যদিও সর্বদাই নতুনভাবে সমৃদ্ধ হয়ে থাকে, নির্বিচারে আহরণ করা হতে থাকলে এবং দূষণের হাত থেকে রক্ষার ব্যবস্থা না নিলে ক্রমে এই জলের পরিমাণ ও তার গুণগত উৎকর্ষের এমনই অবনতি দেখা দেবে যে তার সামাজিক অর্থনৈতিক এবং পরিবেশ-গত প্রভাব প্রতিকূল হতে বাধ্য। জলীয় মাধ্যমে বিভিন্ন দূষণকারক পদার্থের সংবহন ও তাদের রূপান্তরজনিত পরিণতি বিষয়ে আমাদের সম্যক জ্ঞানের অভাবে এবং ভূ-গর্ভস্থ জলদূষণ প্রতিরোধের উপায় ঠিকমত জানা না থাকায় সবসময় জন-সাধারণকে এ-সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া সম্ভব হয় না। এছাড়া, মানুষ নানা উদ্দেশ্যে নানা ধরনের যেসব রাসায়নিক পদার্থ উত্তরোত্তর অধিকতর পরিমাণে ব্যবহার করে চলেছে তাদের মধ্যে বেশ কয়েকটি অপেক্ষাকৃত সুস্থিত ও বিষাক্ত যৌগ জল বা খাদ্যের মাধ্যমে আমাদের শরীরে বিপাকীয় চক্রে প্রবেশ করে। কিছু ভারী ধাতু এবং রাসায়নিক যৌগের ক্রমবর্ধিষ্ণু বিষক্রিয়া ও তেজস্ক্রিয়তা দূষণ সম্পর্কে আমরা আংশিক অবহিত হলেও খাদ্যশৃঙ্খলে অনেক বিষাক্ত পদার্থেরই স্বল্প পরিমাণ উপস্থিতির কু-প্রভাব আমাদের এখনও সঠিক জানা নেই।

মানুষ ও তার পরিবেশকে উপরিউক্ত দূষণজনিত বিপদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আমাদের সচেতনতা এবং সুরক্ষা ব্যবস্থার মান বৃদ্ধির সংশ্লিষ্ট খরচপত্র ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এ যাবৎ কলকারখানা ও শহরের নানাবিধ বর্জ্য পদার্থ, ধোঁয়া ও আবর্জনা যথেচ্ছভাবে এগুলি জলে বায়ুতে বা পতিত ভূমিতে নিক্ষেপ করা হতো। বর্তমানে অনেক উন্নত দেশেই শিল্প-সংস্থাগুলি তাদের বর্জিত পদার্থ অপসারণের ব্যবস্থা নিজেরাই করে থাকে এবং এ বাবদ যা খরচ হয় তা উৎপাদন ব্যয়ের সঙ্গে তারা যোগ করে নেয়। অনেক দেশ আবার মনে করে যে মাটি, জল ও বায়ুর দূষণ যাতে কখনোই বিপদসীমার উপরে না উঠতে পারে সেজন্য শিল্প অঞ্চল বা কলকারখানাগুলি বিস্তৃততর এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়াই যথেষ্ট। এর ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশ নিজেই তার ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম হতে পারে।

বয়স্কদের তুলনায় শিশুরা যে সহজেই নানা ধরনের পরিবেশ-গত দূষণ ও পীড়নের (stress) শিকার হয়ে থাকে সে বিষয়ে বিস্তর প্রমাণ রয়েছে। জল, বায়ু ও খাদ্যবস্তুর পরিবেশগত মান স্থির করার সময় এ-ব্যাপারটি মনে রাখা অবশ্যই দরকার। আজকের শিশুরাই আগামী শতকে সমাজ গঠন ও পরিবেশ সংরক্ষণের রূপকার হয়ে উঠবে। ওদের সোনালী ভবিষ্যতের ভাবনা এখন আমাদেরই ভাবতে হবে।

1975 খৃস্টাব্দে সারা পৃথিবীতে শিশুর (15 বছরের

* বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী

কম বয়সী) সংখ্যা ছিল 143 কোটি এবং এর মধ্যে উন্নতিশীল দেশগুলিতে এই সংখ্যা ছিল মোট 115·8 কোটির মত। 2000 খৃস্টাব্দে এই সংখ্যা আফ্রিকার দেশগুলিতে 72%, এশিয়াতে 48%, দক্ষিণ আমেরিকায় 47% উত্তর আমেরিকায় 10% এবং ইউরোপে 4% বৃদ্ধি পাবে। প্রত্যাশিত মাত্রায় জন্মহার হ্রাস সত্ত্বেও জনবহুল এবং অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশগুলিতে শিশুর সংখ্যা আগামী শতকের গোড়ায় অন্ততঃ দ্বিগুণের কম (মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক) যে হবে না একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

মাতৃজঠরে ভ্রূণের গঠন ও তার যথাযথ বৃদ্ধির উপর মা যে পরিবেশে বাস করে তা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে। ভ্রূণ অবস্থায় কোষকলার দ্রুত বিভাজন ও জৈব সংস্থাপনের সময়েই তার শারীরিক ও মানসিক বিকৃতির সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী। কোন কোন রাসায়নিক পদার্থ (যেমন, থ্যালিডোমাইড) ভ্রূণের দৈহিক বিকৃতির জন্য সরাসরি দায়ী (41% নিশ্চয়তা) এরকম মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এছাড়া অপুষ্টি এবং পরিবেশগত পীড়ন—বিশেষতঃ জল ও বায়ুদূষণ ভ্রূণের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও জাতকের স্বাস্থ্য নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। 1977 খৃস্টাব্দে সারা পৃথিবীতে যে 12·5 কোটি শিশু জন্মগ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে 1·3 কোটি একবছর বয়স হওয়ার আগেই মারা গেছে এবং আরো 40 থেকে 50 লক্ষ শিশু মারা গেছে পাঁচ বছরের মধ্যেই। মানুষের গড় আয়ু 1960 খৃস্টাব্দে 36 ব. থেকে বেড়ে 1975 খৃস্টাব্দে 43 ব. হওয়া সত্ত্বেও এ-ঘটনা ঘটে চলেছে! বলা বাহুল্য, পরিবেশগত পীড়নই এর অন্যতম কারণ।

শিশুরা পরিবেশ থেকে কোন কোন ক্ষতিকারক পদার্থ সহজেই শোষণ করে নেয় এবং তাদের শরীরে দ্রুত সেই সব পদার্থ বিপজ্জনক মাত্রা অতিক্রম করে থাকে। তেজস্ক্রিয়তা জনিত বিপদ সম্পর্কেও মোটামুটি একই কথা খাটে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী উন্নতিশীল দেশে শিশুমৃত্যু বা শিশুদের স্বাস্থ্যহানির 80% কারণ হলো দূষিত জলের ব্যবহার এবং অস্বাস্থ্যকর শৌচাগার ব্যবস্থা। দূষিত জল ব্যবহারের জন্য যেমন দেখা দেয় কলেরা, টাইফয়েড, হেপাটাইটিস, বিভিন্ন ধরণের কৃমির সংক্রমণ, ইত্যাদি তেমনি উপযুক্ত বর্জ্য পদার্থ অপসারণ ব্যবস্থার অভাবে (প্রধানতঃ শুষ্ক অঞ্চলে) ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি মেনে না চলার জন্য দেখা দেয় নানা ধরণের চর্মরোগ, কুষ্ঠ এবং টাইফাস ও ট্রাকোমা। এছাড়া পচা ডোবা ও নর্দমার জলে বংশবিস্তার করে মশা, মাছি ও নানা ধরণের পোকামাকড় যারা ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, পীতজ্বর, নিদ্রাকাতরতা ইত্যাদি রোগের বীজ বহন করে থাকে। বেশ কিছু শিশু এইসব রোগের আক্রমণেও মারা যায়। অবশ্য, উপযুক্ত শিক্ষা ও চিকিৎসার অভাবেও অনেক সময় শিশুমৃত্যু ঘটতে দেখা গেছে। উদাহরণ স্বরূপ, প্রধানতঃ চিকিৎসা ব্যবস্থার অভাবেই ডিপথিরিয়া, হুপিংকাশি, ইনফ্যানটাইল প্যারালিসিস, হাম, টিটেনাস এবং টিউবারকুলোসিস্-এ প্রতি বছর পঞ্চাশ লক্ষের মত শিশু প্রাণ হারায়।

জীবিকার অন্বেষণে বা উন্নততর জীবনযাত্রার প্রলোভনে ক্রমেই বেশী সংখ্যায় মানুষ গ্রাম থেকে শহরে ও শিল্পাঞ্চলগুলিতে এসে ভীড় করছে। অর্থনৈতিক সচ্ছলতার অভাবে তারা অস্বাস্থ্যকর বস্তি এলাকায় বাস করতে বাধ্য হচ্ছে। সেখানকার নোংরা, স্যাঁৎসেতে ও আবর্জনা-আকীর্ণ পূতিগন্ধময় পরিবেশে যেসব শিশু জন্মাচ্ছে বা বাস করছে তাদের ভবিষ্যতের কথা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। এইসব বস্তি এলাকার জনসংখ্যা প্রতি বছর 10-15% হারে বেড়ে চলেছে। পরিবেশ দূষণ যদিও সাধারণভাবে সচ্ছল বা উন্নত এলাকার শিশুদের স্বাস্থ্যহানির কারণ এবং তাদের স্বাভাবিক দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধির পরিপন্থী হয়ে উঠছে, বস্তি অঞ্চলের শিশুরাই পরিবেশ পীড়নের প্রধান শিকার হয়ে থাকে।

শিশুদের পক্ষে ক্ষতিকারক বিভিন্ন দূষণকারক পদার্থের মধ্যে দূষিত বায়ুতে বর্তমান ধোঁয়া, ও সালফার ও নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ, ওজোন গ্যাস এবং জৈব লেড যৌগ, জল ও খাদ্যবস্তুর মধ্যে বিভিন্ন ধাতব যৌগ, নাইট্রেট লবণ ও টক্সিন পদার্থ এবং খাদ্যশৃঙ্খলে সংবাহিত ক্লোরিনযুক্ত হাইড্রোকার্বন সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। মাতৃদুগ্ধের মাধ্যমেও মায়ের শরীর থেকে কোন কোন রাসায়নিক পদার্থ শিশুর দেহে সংবাহিত হয়ে তার স্বাস্থ্যহানির কারণ হতে পারে।

5ই জুনের প্রতিশ্রুতি—বিশ্বপরিবেশ নির্মল রাখার বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতি অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত বাসস্থান, শিক্ষা, রোগপ্রতিরোধ ও চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং খেলাধূলার সুযোগ-সুবিধা দানের মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক সুস্বাস্থ্য রক্ষার দ্বারাই কেবল মাত্র এই শতকের শিশুদের আমরা আগামী শতকের উপযুক্ত নাগরিক করে তুলতে পারি।

বিজ্ঞান প্রবন্ধ

পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার

প্রদীপকুমার ধর*

সভ্যতার সেই ঊষালগ্নে মানুষ যেদিন প্রথম চোখ মেলে তাকাল, সে দিনে সে ছিল বড় অসহায়—তার জীবন ছিল নানা সমস্যায় জর্জরিত। বিপদসঙ্কুল জীবনযাত্রায় তার না ছিল আহারের সংস্থান, না ছিল বেঁচে থাকার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

আর আজ। হাজার বছর এগিয়ে এসেও কি আমরা সবাইকে দিতে পেরেছি বেঁচে থাকার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ? মনে প্রশ্ন জাগে, ভবিষ্যতেও কি কোন দিন পারবো?

বর্তমান মানব সমাজ আজ তিনটি প্রধান সমস্যার সম্মুখীন, যাদের সংক্ষেপে বলা হয় '3P'—যথাক্রমে population (জনসংখ্যার চাপ), pollution (দূষণ), proverty (দারিদ্র্য)। শিরোনামের সঙ্গে তাৎপর্য রেখে আজকে এই প্রবন্ধের কেন্দ্রবিন্দু হবে pollution বা পরিবেশ দূষণ।

প্রাচীন কালে মানুষের জীবনযাত্রা বর্তমানের মত স্বচ্ছন্দ না হলেও পরিবেশ ছিল বিশুদ্ধ। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে তাল রেখে যখন শহরে গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ল শিল্প-বিপ্লবের এক দুর্বার পদযাত্রা, ঠিক তখন থেকেই আমাদের এই পরিবেশ হয়ে পড়ল কলুষিত '

এতো গেল সাধারণ একটা ধারণা। pollution বা দূষণ কাকে বলে? বিজ্ঞানী ওডাম (Odum) 1971 খৃস্টাব্দে পরিবেশ দূষণের এক সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছে—

"আমাদের পরিবেশের জল, স্থল ও বাতাসের ভৌত, রাসায়নিক ও জৈব বৈশিষ্ট্যের অবাঞ্ছিত পরিবর্তন যা মানুষের জীবন ও সংস্কৃতির পক্ষে ক্ষতিকারক তাই হলো দূষণ।"

দূষণের উৎপত্তি সম্বন্ধে দু-চার কথা

বিজ্ঞানীরা প্রত্যেকে নানা রকম দৃষ্টিকোণ থেকে নানা ধরণের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাই সবার মত ভিন্ন ভিন্ন। বিজ্ঞানী কেনডাই (Kendingh, 1968), বিজ্ঞানী ওডাম (Odum, 1971), সাউথউইক (Southwick, 1976-'77), স্মিথ (Smith 1977-'78) এঁরা মোটামুটি একমত যে—

(1) অতিমাত্রায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

(2) অবৈজ্ঞানিক উপায়ে নগরী গঠন ও বনভূমির ধ্বংস-সাধন।

(3) প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগমনই পরিবেশ দূষণের প্রধান কারণ।

দূষণকারক পদার্থ (Pollutants)

আমাদের পরিবেশ যাদের উপস্থিতিতে দূষিত হচ্ছে তাদেরই আমরা দূষণকারক পদার্থ বলব। শিল্পের অগ্রগতির জন্যে ধরা যাক একটা ইস্পাতের কারখানা তৈরি হলো। এবার জ্বালানী হিসেবে কয়লা, পেট্রোলিয়াম, বিদ্যুৎ ইত্যাদি যা হোক একটা কিছু লাগবে। তারপর তাদের দহনের ফলে তৈরি হবে ধোঁয়া, কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2), কার্বনমনো-অক্সাইড ইত্যাদি এগুলো পরিবেশকে দূষিত করছে। তাই CO_2, CO ধোঁয়াকে দূষণকারক পদার্থের শ্রেণীতে সহজেই অন্তর্ভুক্ত করা যায়। দূষণকারক পদার্থ আবার নানা ধরণের হতে পারে, যেমন ধরা যাক কঠিন, তরল কিংবা গ্যাস। বিজ্ঞানী Odum 1971 খৃস্টাব্দে এদের দুটি পৃথক শ্রেণীতে ভাগ করেন—

(1) ভঙ্গুর—যে সমস্ত দূষণকারক পদার্থ ভেঙ্গে যায় এবং স্বাভাবিক ভাবেই বিভিন্ন চক্রের মধ্যে আবর্তিত হয় (নাইট্রোজেন চক্র, অক্সিজেন চক্র, সালফার চক্র) এবং পরিবেশকে কলুষিত করে, তাদের ভঙ্গুর দূষণকারক পদার্থ বলে।

(2) অভঙ্গুর—যে সমস্ত ধাতু কিংবা এমন দূষণকারক পদার্থ যা সহজে ভাঙ্গে না, তাদের এই শ্রেণীভুক্ত ধরা হয়েছে। যেমন অ্যালুমিনিয়াম ধাতু, মারাকিউরিক লবণ, DDT ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

কিছু অপরিচিত দূষণকারক পদার্থ বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছে। তা হলো—

সঞ্চিত বস্তু : (1) কলকারখানার ধোঁয়া, আলকাতরা, ধূলো-ময়লা।

বাষ্প : (2) SO_2, CO, CO_2, NO, NH_3, Cl ইত্যাদি।

যৌগ : (3) অ্যালডিহাইড (aldehyde), আর্সাইন (arsines), ডিটারজেন্ট (detergent), হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড (HF)।

ধাতু : (4) অ্যালুমিনিয়াম, দস্তা, লোহা, সীসা।

বিষাক্ত পদার্থ : (5) হার্বিসাইড (herbicides), লার্ভিসাইড।

(6) রাসায়নিক সার।

(7) কারণে অকারণে মাইক বাজিয়ে এবং কলকারখানার শব্দ দ্বারা শব্দোত্থিত দূষণ ও তাপ।

* 286/সি-ডি স্টেশন রোড, পোঃ অণ্ডাল, জেলা—বর্ধমান

(8) শহর ও গ্রামের অস্বাস্থ্যকর নোংরা আবর্জনা।

(9) তেজস্ক্রিয় পদার্থ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

পরিবেশ দূষণকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—

(1) স্বাভাবিক দূষণ (2) কৃত্রিম দূষণ।

স্বাভাবিক		কৃত্রিম
বায়ু দূষণ→		←তেজস্ক্রিয় পদার্থ দ্বারা দূষণ
জল দূষণ→	পরিবেশ দূষণ	←শব্দ দূষণ
মৃত্তিকা দূষণ→		←তাপ দূষণ

বায়ু দূষণ

মানুষ তথা সমগ্র প্রাণীকুলের বেঁচে থাকার জন্যে আমাদের প্রতিনিয়ত অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। O_2 আমাদের রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়ে প্রতিটি কোষের মধ্যে O_2 চাহিদা পূরণ করে এবং প্রতিটি জৈবনিক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে সাহায্য করে। শিল্প বিপ্লবের অগ্রগতির ফলে আমাদের দেশে গড়ে উঠেছে নানা ধরণের কলকারখানা। এই কলকারখানাগুলো থেকে প্রতিনিয়ত প্রচুর পরিমাণে ধোঁয়া, সালফার ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনো-অক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, সালফেট যৌগ নির্গত হচ্ছে আর বাতাসকে কলুষিত করছে। সেই দূষিত বাতাস যখন আমরা গ্রহণ করছি, তখন আমাদের রক্তের অক্সিজেন বহনের ক্ষমতা অনেক কমে যাচ্ছে। তার ফলে আমরা ব্রংকাইটিস প্রভৃতি রোগের শিকার হয়ে পড়ছি।

দ্বিতীয়তঃ কয়লা প্রজ্বলনের ফলে প্রচুর পরিমাণে CO_2 তৈরি হয়, তারপর শহরাঞ্চলে আজকাল হাজার হাজার যন্ত্রচালিত যানবাহন চলাচলের ফলে প্রচুর পরিমাণে হাইড্রোকার্বন (unburned hydrocarbon) তৈরি হচ্ছে। তাছাড়া নানা ধরনের নাইট্রোজেন অক্সাইড মিলে এক বিষাক্ত জটিল পদার্থের সৃষ্টি হয় যার নাম photochemical smog. এই দূষণকারক পদার্থ আমাদের জীবনে এনে দিয়েছে নানা দুরারোগ্য ব্যাধি, যেমন—(1) চোখ থেকে অনবরত জল পড়া, (2) ক্যানসার ইত্যাদি। এই পদার্থগুলো উদ্ভিদের স্বাভাবিক শস্য উৎপাদনকে ব্যাহত করে, তাছাড়া বাড়ীঘর, বাঁধ ইত্যাদি নষ্ট করে দেয়; বৈদ্যুতিক তারের আচ্ছাদন নষ্ট করে আমাদের অনেক বিপদকে ডেকে আনে। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো গাছের সালোক-সংশ্লেষ (photosynthesis) পদ্ধতিকে বিশেষভাবে ব্যাহত করে এই photochemical smog.

তৃতীয়তঃ রেয়ন শিল্প, পেট্রোলিয়াম শিল্প খনিজ তৈল শিল্পাঞ্চল থেকে যে হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S) তৈরি হয়—আমাদের দেহে বিশেষতঃ নাক, কান ও গলায় নানা ধরনের রোগ সৃষ্টি করে। তাছাড়া রঙীন বস্তুতে ফ্যাকাশে করে তার সৌন্দর্য হরণ করে।

চতুর্থতঃ ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি থেকে যে হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড তৈরি হচ্ছে তা আমাদের অস্থিতে ফ্লুরোসিস রোগের আক্রমণকে জোরদার করছে এবং ফুসফুসে ও দাঁতে নানা ধরনের রোগ সৃষ্টি করছে এবং আমাদের পরিবেশকে ক্রমশঃ কলুষিত করছে।

পঞ্চমতঃ বাতাসে মিশ্রিত অবস্থায় কিছু পরিমাণে ওজোন (O_3) আছে। মাটি থেকে 22-25 কিলোমিটার উঁচুতে এই ওজোনের পরিমাণ খুবই বেশী। এই ওজোনের স্তর সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি, যেটা পৃথিবী বক্ষে আসে তা কিছুটা শোষণ করে। তার ফলে আমরা যে পরিমাণ অতিবেগুনী রশ্মি পাই তাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। এর বেশী গ্রহণ করলে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ব। কিন্তু পারমাণবিক বিস্ফোরণ ও জেট প্লেন চলাচলের ফলে এই ওজোনের স্তর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই ওজোন স্তরের ধ্বংস সাধন যদি আমরা রোধ করতে না পারি তবে আগামী দিনে আমরা নূতন এক বিপদের মুখোমুখি হব।

স্বাভাবিক দূষণের দ্বিতীয় পর্যায় হলো—

জল দূষণ :

বিজ্ঞানী সাউথউইক বলেছেন যে জল সাধারণতঃ দু-ভাবে দূষিত হতে পারে।

(1) নানা ধরনের সার এবং শহর ও গ্রামের নোংরা আবর্জনা জলে মিশে এক বিষাক্ত জৈব পদার্থের সৃষ্টি করে। তার ফলে জল দূষণ হয়।

(2) কলকারখানার নোংরা ও নানা বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ জলে মিশে জলের স্বাভাবিক জৈব পদার্থের ধ্বংস সাধন করে, ফলে জল কলুষিত হয়।

কিভাবে জল দূষিত হচ্ছে এবং কিভাবে মানব সমাজ নূতন নূতন সমস্যার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে এবার সে কথায় আসা যাক।

শহর কিংবা গ্রামাঞ্চলে আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার ফলে প্রচুর পরিমাণে নোংরা আবর্জনা তৈরি হয় (যেমন মল, মূত্র, দ্রবীভূত জৈব ও অজৈব পদার্থ, পচা খাদ্যদ্রব্য, অজৈব লবণ, আনাজের খোসা ইত্যাদি আরও কত কি)। এই আবর্জনা কোন নদী নালা কিংবা পুষ্করিণীর জলে মিশলে জল দূষিত হয়ে পড়ে এবং ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

অজ্ঞানতাবশতঃ আমরা যদি ঐ জলে স্নান করি কিংবা ঐ জল পান করি তবে কলেরা জাতীয় রোগের শিকার হয়ে পড়ার সম্ভাবনা।

দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষের বেশীর ভাগ নদীনালাই কলকারখানার রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা দূষিত হয়। পেট্রোলিয়াম ফ্যাক্টরি, তৈল শোধনাগার, কাগজের কল ও সার কারখানা থেকে প্রচুর পরিমাণে বিষাক্ত সায়ানাইড যৌগ (compound of cyanides), ফসফরাস (phosphorous), ফিনল (phenols), অ্যামোনিয়া [amonia (NH_3)], ক্লোরিন

[Chlorine (Cl_2)] ইত্যাদি নদীর জলের সঙ্গে মিশে, জলকে দূষিত করে। মাছ ও অন্যান্য জলজ জীবের ধ্বংসসাধন করে।

কিছুদিন আগের এক ঘটনা—উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর এলাকায় নানা ধরণের শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। তাই প্রচুর পরিমাণে দূষণকারক পদার্থ তৈরী হয়। এই দূষণকারক পদার্থ শোন নদীর জলে মিশে ঐ নদীর সব রুই ও কাতলা মাছের ধ্বংসসাধন করেছিল।

তৃতীয়তঃ, দূষিত জল কখনও কখনও নদীর বাঁধ, বাড়িঘর, জলের পাইপ, কাপড়ের ফিল্টার-কে নষ্ট করে দেয়। ভাবতে অবাক লাগছে। আসলে কি হয়? জলে অনেক ব্যাকটিরিয়া, তাছাড়া থাকে জলজ উদ্ভিদ, পচা কাঠ ও নানা ধরণের আবর্জনা, যেগুলো হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস তৈরি করে। জলের মধ্যে এই গ্যাস আর গ্যাস হিসাবে থাকতে পারে না। জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি করে। এই ক্ষয়কারী অ্যাসিড সিমেন্টের বাঁধে ফাটল সৃষ্টি করে ও মানবকুলের কাছে বিপদের বার্তাবহ হয়ে পড়ে।

চতুর্থতঃ আমরা অনেক সময় ম্যালেরিয়া দমনের জন্যে বিশুদ্ধ জলেও DDT স্প্রে করি। এই স্প্রে হয়তো সাময়িক ভাবে ম্যালেরিয়া দমনে সাহায্য করে কিন্তু সেই জায়গার জল ক্রমশঃ দূষিত এবং ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

পঞ্চমতঃ সমুদ্রে ও মোহানায় জাহাজ চলাচল করে এ কথা সবারই জানা। এই জাহাজ চলাচলের ফলে প্রচুর গ্যাস ও রাসায়নিক তেল সমুদ্রের জলে মিশে যায় এবং জলের উপর এক বিশেষ ধরণের তেলের স্তর সৃষ্টি করে। এই ধরণের পরিবেশে জলজ প্রাণীরা শ্বাস গ্রহণে বাধা পায় এবং পরিশেষে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

ষষ্ঠতঃ টারবাইনকে ঠাণ্ডা করতে সাধারণতঃ জল দরকার হয়। কিন্তু কলকারখানা থেকে নির্গত গরম জল বিশেষ ভাবে বিশুদ্ধ জলকে কলুষিত করে। অনেকে একে তাপ দূষণ (thermal pollution) বলেও অভিহিত করেন। এই ধরণের গরম জলের সংস্পর্শে এসে বহু জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী মারা যায়।

স্বাভাবিক দূষণের তৃতীয় ধাপ মৃত্তিকা দূষণ

আমাদের চারদিকের মাটি যে ক্রমশঃ দূষিত হচ্ছে, সেটা আমরা নিজের চোখেই দেখতে পারছি। শহর ও গ্রামাঞ্চলে আমরা প্রতিনিয়ত নানা ধরণের দূষণকারক পদার্থ কোন এক জায়গায় ফেলছি, সেই জায়গার মাটি দূষিত হচ্ছে।

আবার আজকাল কৃষিক্ষেত্রে অধিক শস্য উৎপাদনের জন্যে নানা ধরণের রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হয়, অনেক সময় এই প্রয়োগ সঠিক ও সুপ্রযুক্ত হচ্ছে না, তার ফলে মাটি ক্রমশঃ দূষিত হয়ে পড়ছে।

তৃতীয়তঃ প্রাণীর মৃতদেহ, শস্যের বর্জ্যপদার্থ, DDT, DDE প্রভৃতি নানা ধরণের পেস্টিসাইড মাটির সঙ্গে মিশে স্বাভাবিক বাস্তুতন্ত্রকে ব্যাহত করছে এবং আমরা পরোক্ষ ভাবে নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি।

তেজস্ক্রিয় পদার্থজনিত দূষণ

এক্স-রের ব্যাপারটা এখন সবারই জানা। শুধু কি এক্স-রে, কত রকমের তেজস্ক্রিয় রশ্মি আজকাল চিকিৎসার জন্যে ব্যবহৃত হচ্ছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। কিন্তু এদের যথাযোগ্য ব্যবহার না হলে এই তেজস্ক্রিয় বস্তুগুলো মানবজাতির পক্ষে কত বিপদ ডেকে আনে, শুনলে শিহরণ জাগবে।

দ্বিতীয়তঃ হাইড্রোজেন বোমা, নিউক্লিয়ার বোমা ও পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটালে, সেখানকার তাপমাত্রা কয়েক লক্ষ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বেড়ে যায়। তার ফলে ধাতব সব জিনিষপত্র গ্যাসে পরিণত হয়। এই সমস্ত বিস্ফোরণের ফলে আমাদের আকাশ-বাতাস ক্রমশঃ দূষিত হয়ে পড়ছে।

তেজস্ক্রিয় পদার্থ যদি কোন প্রকারে দেহে প্রবেশ করে তার পরিণাম হয় বড়ই ভয়াবহ। যেমন—একটা তেজস্ক্রিয় বস্তু স্ট্রনসিয়াম (strontium) 90, যদি একবার দেহে প্রবেশ করে, তবে সেই স্ট্রনসিয়াম 90 হাড়ের মজ্জায় প্রবেশ করে এবং একাধিক রোগের কারণ দাঁড়ায়—1. অস্থি টিউমার 2. লিউকোমিয়া—ইত্যাদি।

তাছাড়া 1945 খৃস্টাব্দে হিরোসীমা-নাগাসাকীর পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে জাপানে এখনও বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হচ্ছে।

তা হলে দেখা যাচ্ছে তেজস্ক্রিয় পদার্থ সঠিক ভাবে ব্যবহৃত না হলে তা আমাদের জীবনে অভিশাপ হিসাবে দেখা দেয়।

শব্দ দূষণ (Sound pollution)

আজকাল শহর কিংবা গ্রামে কথায় কথায় মাইক বাজানো হয়। সময়ে অসময়ে উচ্চস্বরে গান ও টীকা-টিপ্পনী শুনে সবারই বিরক্তি আসে। এই ধরনের মূল্যহীন আওয়াজ আমাদের পরিবেশকে ক্রমাগত দূষিত করছে। তাছাড়া কলকারখানা, যন্ত্রচালিত যানবাহন ও জনবহুল শহরের কোলাহল পরিবেশকে কলুষিত করে।

শব্দদূষণ আমাদের শ্রবণ ক্ষমতা ক্রমশঃ হরণ করে, রাত্রিতে শান্তিতে ঘুমাতে দেয় না; অবসাদ ও নার্ভাসনেস্ প্রভৃতি রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ (Control of pollution)

বিংশ শতাব্দীর সমস্যা জর্জরিত ইতিহাসে পরিবেশ দূষণ অন্যতম। এই সমস্যা প্রতিরোধে যে ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা হয়েছে তা নীচে আলোচনা করা হলো।

বায়ু দূষণ প্রতিরোধ

আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়নের আলোকে বায়ুকে বিশুদ্ধ রাখার কিছুটা প্রচেষ্টা চলছে।

1. ধোঁয়া, কালি ও ধূলা বাতাস থেকে দূর করার জন্যে electrostatic precepitor ব্যবহার করা যেতে পারে।

2. বিভিন্ন যন্ত্রচালিত যান থেকে যে ধোঁয়া বের হয় তা যাতে বাতাসের সাথে মিশে দূষিত হতে না পারে তার জন্যে প্রতিটি অটোমোবাইল চালককে catalytic converter এবং crankage ventilation ব্যবহার করতে হবে।

3. scruber-এর সহায়তায় জল ছিটিয়ে অ্যামোনিয়া এবং সালফার ডাই-অক্সাইড দূর করা যেতে পারে।

4. প্রচুর পরিমাণে সবুজ উদ্ভিদ রোপণ করে দূষিত বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড-এর পরিমাণ কমিয়ে স্বাভাবিক করা যায়। বৃক্ষ রোপণ করলে বনজ সম্পদ রক্ষা পাবে পরিবেশ ও সুস্থ স্বাভাবিক থাকবে।

জলদূষণ প্রতিরোধ

1. বর্তমানে দূষিত জল পরিশোধনের জন্যে "Ferri-floe" ব্যবহার করা হচ্ছে।

2. আমাদের উচিৎ নোংরা আবর্জনা, মল,মূত্র ব্যবহারযোগ্য জলে না ফেলা, এতে ক্ষতি তো আমাদেরই।

3. শিল্পজাত দূষিত পদার্থ যাতে কোন নদীর জলে না পড়ে সে দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে।

মৃত্তিকা দূষণ প্রতিরোধ

1. অনেক গ্রামে গেলে দেখা যায় এখানে ওখানে গোবর স্তূপ করে রাখা আছে। এই গোবর হয়তো আর তাদের কোন কাজে আসবে না। কিন্তু এই জমা করা গোবর ক্রমশঃ আমাদের পরিবেশকে দূষিত করবে।

তাই বর্তমানে অনেক গ্রামে গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট চালু করা হয়েছে বা হচ্ছে। এতে এই গোবর জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা যাবে উপরন্তু কৃষিক্ষেত্রে একে ব্যবহার্য করা যাবে আর আমাদের পরিবেশও কলুষমুক্ত হবে।

2. বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক সার ও ফার্টিলাইজার ওষুধ বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এই সব রাসায়নিক বস্তুর সঠিক ব্যবহার না হলে মৃত্তিকা দূষিত হবে। তাই রাসায়নিক বস্তুর ব্যবহারকে সঠিক ও নিয়মিত করতে হবে।

তেজস্ক্রিয় পদার্থজনিত দূষণ ও শব্দদূষণ মানুষের সৃষ্ট দূষণ। তাই তার প্রতিরোধের একটিই উপায় হলো, এদের সংযত ভাবে ব্যবহার করা।

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট যে পরিবেশ দূষণের ফলে আমরা এক মস্ত বড় সমস্যার সমাধানের উপরই নির্ভর করবে আগামী দিনে মানব জাতির অস্তিত্ব। তাই পরিবেশকে সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখার জন্যে শুধু সরকারী ও বেসরকারী ভাবে এগিয়ে এলেই চলবে না—আমাদের সবাইকে এই কাজের অংশীদার হতে হবে।

বায়ুদূষণের কুফল ও প্রতিকার

দেবব্রত নন্দী*

আমরা, বাস করি বায়ুর সমুদ্রে। এই বায়ুমণ্ডলকে আমরা দু-ভাবে ব্যবহার করি—নিশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য তার বর্জনীয় বিভিন্ন পদার্থ ছাড়ার জন্য। শেষের ব্যাপারটাই আশঙ্কাজনক। আমরা বিভিন্নভাবে এই বায়ুমণ্ডলটিকে ডাস্টবিনের মত ব্যবহার করছি; এর ফলে জীবজগতে শ্বাসযোগ্য বাতাস ক্রমশঃই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি, শিল্পের ক্রমপ্রসার, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, শহরমুখীনতা এবং আরো উন্নত জীবনযাপনের জন্য মানুষের দুরন্ত প্রতিযোগিতা—কথাগুলি খুব গালভরা শোনালেও এগুলিই বায়ুদূষণের জন্য দায়ী।

প্রথমে জেনে নেওয়া যাক, বায়ুদূষণ কাকে বলে? বায়ুতে যে কোনো প্রকারের দূষকের উপস্থিতি যা মানুষের স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও কল্যাণের পরিপন্থী, অথবা যা মানুষ, জীবজন্তু, বা গাছপালার জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি করে বা করতে পারে অথবা যা জীবন ও সম্পত্তির অহেতুক বিঘ্ন ঘটায়—একেই বায়ুদূষণ বলে।

বায়ুদূষণের উৎস

1. **যানবাহন**—মোটরগাড়ীর ধোঁয়ায় থাকে হাইড্রোকার্বন (hydrocarbon) ও NO_2, যা ফোটোকেমিক্যাল স্মগ (photochemical smog) বা ধোঁয়াশা সৃষ্টি করে। সক্রিয় হাইড্রোকার্বনের উপস্থিতিতে নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড (NO_2) সূর্যালোক শোষণ করে ধোঁয়াশা তৈরি করে। ধোঁয়াশা তৈরির সময়ে বেশ কিছু পরিমাণ ওজোন গ্যাসও তৈরি হয়।

মোটরগাড়ীর কালো ধোঁয়ার সঙ্গে বেরিয়ে আসে বিষাক্ত সীসা আরসেনিক এবং অ্যালডিহাইডস্।

2. **শিল্প**—বিভিন্ন কলকারখানা থেকে নিঃসৃত দূষক বায়ু দূষণ করে। বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানায় ব্যবহৃত কয়লা ও জ্বালানী তেলের মধ্যে বেশ কিছু পরিমাণ গন্ধক (sulpher) থাকে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের টারবাইন ঘোরাতে যখন ঐ কয়লা বা

*বাজারপাড়া মেন রোড, পোঃ হালিসহর, 24 পরগণা, 743134

পেট্রোলিয়াম পোড়ানো হয় তখন চিমনির কালো ধোঁয়ার সঙ্গে গলগল করে বেরিয়ে আসে সালফার ডাই-অক্সাইড (SO_2).

3. **বর্জ্য পদার্থ**—আবর্জনা, পাতা, টায়ার প্রভৃতি পুড়িয়ে অনেক সময়েই বাতাসকে দূষিত করা হয়। শুধু পোড়ানোই নয়, আবর্জনা পচে গিয়ে দুর্গন্ধ গ্যাসে বাতাসকে ছেয়ে ফেলে।

4. **স্থল-জল ও অন্তরীক্ষ-যান**—কয়লা ও ডিজেলচালিত রেলইঞ্জিন এবং জাহাজ থেকে নির্গত ধোঁয়ায় থাকে SO_2, CO (কার্বন মনো-অক্সাইড), CO_2 (কার্বন ডাই-অক্সাইড)।

জেট-প্লেনের ধোঁয়াও একই রকমভাবে বায়ুকে দূষিত করে।

5. **বাণিজ্যিক ও কৃষিকার্য**—কীটনাশক ছড়ানোর ফলে বাতাস দূষিত হয়ে পড়তে পারে। গুঁড়ো কীটনাশক বায়ুতে মিশে যেতে পারে এবং তরল কীটনাশকের বাষ্পও মিশতে পারে এবং বায়ুপ্রবাহের ফলে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

6. **অন্যান্য উৎস**—প্রধান উৎসগুলি ছাড়াও বায়ুদূষণের বহু ছোটখাটো উৎস আছে যেগুলিকে নিয়ে সাধারণ মানুষ খুব একটা ভাবেন না; কিন্তু এদের সমষ্টিগত ফল মারাত্মক হতে পারে।

উৎস	শতকরা ভাগ
উদ্ভিদ সংক্রান্ত বিভিন্ন জৈব যৌগ	68·6
ধূলিকণা	29·3
সমুদ্র থেকে লবণ	1·2
অ্যারোসল (Aerosols)	0·4
যানবাহনের চাকা থেকে রবারের গুঁড়ো	0·3
সিগারেটের ধোঁয়া	0·1
প্রাকৃতিক উৎস থেকে হাইড্রোজেন সালফাইড	<0·1
সুগন্ধি দ্রব্য থেকে জৈব যৌগসমূহ	<0·1
মহাজাগতিক কণা	<0·1

[Calculated from data given by V. J. Marchesani, et al, 1970]

7. **প্রাকৃতিক উৎস**—আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদগীরণ ও বনাঞ্চলের দাবানলের ফলে বিরাট পরিমাণ গ্যাস, ধোঁয়া ও ছাই বায়ুমণ্ডলে এসে মেশে। জলাজমি ও স্যাঁতস্যাঁতে অঞ্চল থেকে উদ্ভূত মিথেন গ্যাস, ওজোনোস্ফিয়ার (ozonosphere) থেকে ওজোন, ও বজ্রপাতের ফলে তৈরী নাইট্রিক অক্সাইড ইত্যাদি প্রাকৃতিক বায়ু দূষণের উৎস। এই প্রাকৃতিক দূষণ মানুষের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।

8. **তেজস্ক্রিয় উৎস**—পারমাণবিক চুল্লী (Atomic Reactors) এই তেজস্ক্রিয় বায়ুদূষণের উৎস। এই পারমাণবিক চুল্লীর তেজস্ক্রিয় গ্যাস ও তেজস্ক্রিয় কণা α, β ও γ-রশ্মি বিকিরণ করে। শুধু পারমাণবিক চুল্লীই নয়, পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা ও পারমাণবিক বিস্ফোরকের শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের ফলেও তেজস্ক্রিয় বায়ুদূষণ সৃষ্টি হয়। বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন গ্যাসের সঙ্গে মহাজাগতিক রশ্মির প্রতিক্রিয়ায়ও তেজস্ক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

বায়ুদূষণের প্রভাব

ক) অর্থনৈতিক প্রভাব—

1. **ধাতু**—বায়ুতে সালফার ডাই-অক্সাইডের (SO_2) উপস্থিতিতে লোহা ও ইস্পাতের ক্ষয় নিম্নরূপে হয়। প্রথমে মরিচা SO_2 শোষণ করে, তারপর লোহা, সালফার ডাই-অক্সাইড ও বায়ুর অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় ফেরাস সালফেট উৎপন্ন হয়।

$$Fe + SO_2 + O_2 \rightarrow FeSO_4$$
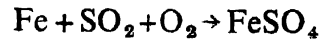
2. **ঘরবাড়ি**—ইউরোপ ও আমেরিকায় দেখা গেছে যে বৃষ্টির জলের pH (অম্লতা ক্ষারতার মাত্রা) 5·7 থেকে 3 পর্যন্ত নেমে গেছে—এর কারণ বায়ুমণ্ডলে অত্যধিক সালফার ডাই-অক্সাইডের উপস্থিতি। এই সালফার ডাই-অক্সাইড জলীয় বাষ্পের সঙ্গে মিশে তৈরী করছে সালফিউরিক অ্যাসিড। এই আম্লিক বৃষ্টি ঘরবাড়ি ও মূর্তির ক্ষতি করছে।

$$CaCO_3 \text{ (or } MgCO_3) + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 \text{ (or } MgSO) + H_2CO_3$$
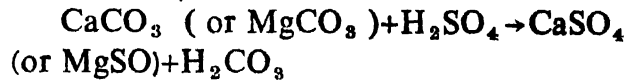
এই সালফেট খসে গিয়ে অট্টালিকা ও মূর্তিসমূহের ক্ষয় ঘটাচ্ছে।

রবার শিল্প—ধোঁয়াশা, বিশেষতঃ ওজোন, রবারের জিনিষ পত্রে ফাটল ধরিয়ে দিতে পারে। অসম্পৃক্ত প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম রবারের (যেমন—বিউটাডাইনস্টাইরিন বা বিউটাডাইন অ্যাক্রাইলো-নাইট্রাইল) ডাবল-বণ্ড ওজোনের দ্বারা আক্রান্ত হয়।

চিত্র-1
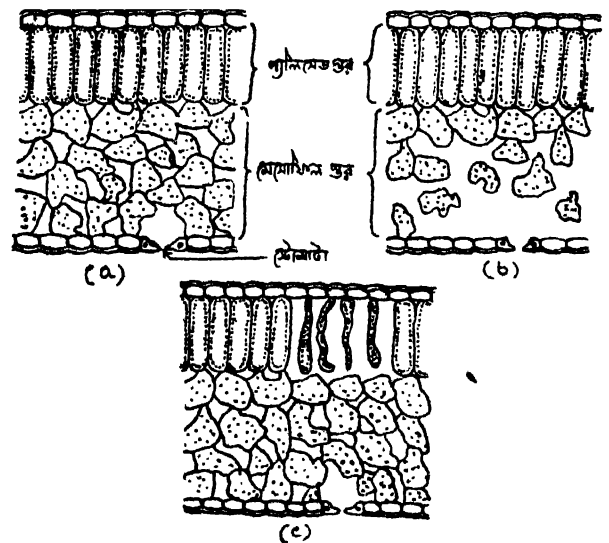
(a) স্বাভাবিক পাতার প্রস্থচ্ছেদ, (b) ধোঁয়াশা কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত স্পঞ্জী মেসোফিল কোষ, (c) ক্ষতিগ্রস্ত প্যালিসেড স্তর

4. **বস্ত্র শিল্প**—বায়ুতে অত্যধিক সালফার ডাই-অক্সাইড উপস্থিত থাকলে প্রাকৃতিক তন্তু ও নাইলনের মত কৃত্রিম তন্তু

প্রসারণশীলতা হারিয়ে ফেলে। বায়ুর সালফার ডাই-অক্সাইড ও ক্লোরিন রঙিন তন্তুর রং নষ্ট করে দেয়।

5. কৃষি ধোঁয়াশার পারঅক্সিঅ্যাসিটাইল নাইট্রেট পাতার স্টোমাটা দিয়ে প্রবেশ করে এবং স্পঞ্জী মেসোফিল কলা ধ্বংস করে দেয়। এর ফলে পাতা তামাটে রঙের হয়ে যায় (চিত্র-1)।

ওজোনও গাছের মারাত্মক ক্ষতি করে। ওজোনের বিষক্রিয়ার ফলে গাছের পাতায় দাগ দেখা দেয়।

(খ) **আবহাওয়ার উপর প্রভাব**—বায়ুদূষণ অধ্যুষিত শহর ও অপেক্ষাকৃত দূষণমুক্ত গ্রামাঞ্চলের আবহাওয়ার পরিসংখ্যানের তুলনা করলেই আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপর বায়ুদূষণের প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে।

(1) **সৌর বিকিরণ** (solar radiation)—গড়ে হিসাবে দেখা গেছে শহরগুলি পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলের চেয়ে 10% থেকে 20% সৌর বিকিরণ কম পায়। এর ফলে রিকেট ও ভিটামিন ডি-এর অভাবজনিত রোগ দেখা দিতে পারে।

(2) **কুয়াশা ও ধোঁয়াশা**—বাতাসে ভাসমান ধূলিকণা ও জলীয় বাষ্প মিশে কুয়াশা সৃষ্টি করে। দেখা গেছে শহরে গ্রামাঞ্চলের চেয়ে 100% বেশী কুয়াশা হয়। কুয়াশা এবং ধোঁয়াশা দৃষ্টির অসুবিধা সৃষ্টি করে, বিশেষতঃ যানবাহনের চালকদের কাছে।

(3) মেঘ—গ্রামাঞ্চলের চেয়ে শহরাঞ্চলের আকাশ সাধারণতঃ 5% থেকে 10% বেশী মেঘাচ্ছন্ন থাকে। এর কারণ কলকারখানা, যানবাহন ও ঘরবাড়ি থেকে শহরের পরিবেশে বেশী জলীয় বাষ্পের যোগান।

(4) **বৃষ্টিপাত**ঃ—শহরাঞ্চলে বেশী বৃষ্টিপাতের কারণ—(i) বাতাসে ভাসমান কণা বেশী, (ii) উঁচু উঁচু অট্টালিকা বায়ুপ্রবাহে বাধা দেয়, (iii) ইঁট-পাথরের প্রাচুর্যে বায়ু গরম হয়ে উপরে ওঠে যায়, (iv) বিভিন্ন দহন ক্রিয়ায় উৎপন্ন অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প। ইংলণ্ডের Rochadale শহরের বৃষ্টিপাতের পরিমাণের তালিকা দেখে এটা আরও স্পষ্ট হবে—1898-1907, 42·81 ইঞ্চি; 1907-1917, 45·83 ইঞ্চি; এবং 1918-1927, 48·65 ইঞ্চি। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার প্রতি রবিবারে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 0·37 ইঞ্চি কম হতে দেখা গেছে, কারণ সপ্তাহের অন্য ছয়দিনের চেয়ে রবিবার বাতাসে ভাসমান কণা থাকে কম।

(5) **তাপমাত্রা**—ভাসমান ধূলিকণার স্তর ও মেঘাচ্ছন্ন আকাশ শহরের উপর গ্রীনহাউস এফেক্ট সৃষ্টি করে অর্থাৎ দীর্ঘ-তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তাপতরঙ্গ ঐ মেঘ ও ধূলিকণার স্তর ফুঁড়ে বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে না, ফলে শহরের তাপের পরিমাণ প্রচণ্ড বেড়ে যায়। 1880 থেকে 1935 খৃস্টাব্দের মধ্যে জাপানের কিয়োটো শহরের গড় তাপমাত্রা 1·8°C বেড়েছে, এর জন্য দায়ী শিল্পায়ণের দ্রুত প্রসার।

(6) **কার্বন ডাই-অক্সাইডের প্রভাব**—যদি বর্তমান হারে শিল্পের প্রসার ঘটে তবে 2000 খৃঃ নাগাদ বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ 25 শতাংশ বেড়ে যাবে—এটা পরিবেশ বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা। প্রতিদিন যে হারে কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে জমা হচ্ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এমন গ্রীনহাউস এফেক্ট সৃষ্টি করবে যাতে পৃথিবী অনেক বেশী উত্তপ্ত হয়ে পড়বে। পৃথিবীর তাপমাত্রা যদি মাত্র 5°C বাড়ে তবে তা মেরুর বরফ গলিয়ে দেবে এবং সমুদ্রের জলতল আরও 500 ফুট বাড়িয়ে দেবে। এর ফলে উপকূলবর্তী বহু শহর তলিয়ে যাবে জলের তলায়।

(গ) জনস্বাস্থ্যের উপর প্রভাব

(1) **ক্লোরিন**—এই গ্যাস চোখের কনজাংটাইভাকে আক্রমণ করে ও শ্বাসনালীতে প্রদাহ সৃষ্টি করে।

(2) **ওজোন**—ওজোন গ্যাস (O_3) মাথাধরা, দৃষ্টির অসুবিধা সৃষ্টি করে ও দেহের তাপমাত্রা কমিয়ে দেয়।

(3) **আরসীন**—লোহিত রক্ত কণিকা ভেঙে ফেলে, কিডনির ক্ষতিসাধন করে ও জণ্ডিস রোগের সৃষ্টি করে।

(4) **সীসা**—নিঃশ্বাসের সঙ্গে গৃহীত সীসা অস্থিমজ্জায় জমা হয় এবং বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক চাপে উজ্জীবিত হয়ে উঠতে পারে।

(5) **কার্বন মনো-অক্সাইড**—শরীরের মধ্যে লোহিতরক্ত-কণিকার প্রতি কার্বন মনো-অক্সাইডের বিশেষ আকর্ষণ আছে। লোহিত রক্তকণিকার হিমগ্লোবিন কার্বন মনো-অক্সাইডের সঙ্গে অক্সিজেনের চেয়েও 240 গুণ বেশী সংযুক্ত হয়। এইভাবে কার্বন মনো-অক্সাইড লোহিতকণিকার অক্সিজেন বহনকার্যে বাধা দেয়। CO-বিষক্রিয়ার ফলে মাথাধরা, বমনেচ্ছা, শ্বাসকষ্ট, অজ্ঞান, এমন কি মৃত্যুও ঘটতে পারে।

(6) **নাইট্রোজেনের অক্সাইড**—নাক ও চোখ জ্বালা সৃষ্টি করে। শ্বাসনালীর সিলিয়াগুলিকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যাতে ধূলিকণা ফুসফুস পর্যন্ত চলে যায়।

(7) **সালফার ডাই-অক্সাইড**—সালফার ডাই-অক্সাইড জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে সালফিউরিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। এই সালফিউরিক অ্যাসিড চোখ, নাক ও শ্বাসনালীর সূক্ষ্ম ঝিল্লিকে আক্রমণ করে। এটি যদি ফুসফুস পর্যন্ত পৌঁছায়, তাহা হলে ব্রঙ্কাইটিস, ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, এমফাইসেমা প্রভৃতি রোগ সৃষ্টি করে।

ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসে ব্রঙ্কিয়াল নালীগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সিলিয়ার কার্য বন্ধ হয় ও গ্রন্থিকোষ থেকে অনেক বেশী শ্লেষ্মা ক্ষরিত হতে থাকে।

এমফাইসেমার ক্ষেত্রে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্রঙ্কিয়াল নালীগুলি সংকুচিত হয়। এর ফলে যখন প্রশ্বাসবায়ু নির্গত হয় তখন অ্যালভিওলাই-এর মধ্যে অতিরিক্ত বায়ু আটকা পড়ে যায়। পুনরায় যখন নিঃশ্বাসবায়ু গৃহীত হয় তখন ঐ অ্যালভিওলাইগুলি

এতো বেশী ফুলে যায় যে সেগুলি ফেটে গিয়ে পাশাপাশি অ্যালভিওলাইগুলি সংযুক্ত হয়ে যায়। এইভাবে ফুসফুসের অক্সিজেন বিনিময় ক্ষমতা ক্রমশঃ কমতে থাকে।

চিত্র-2
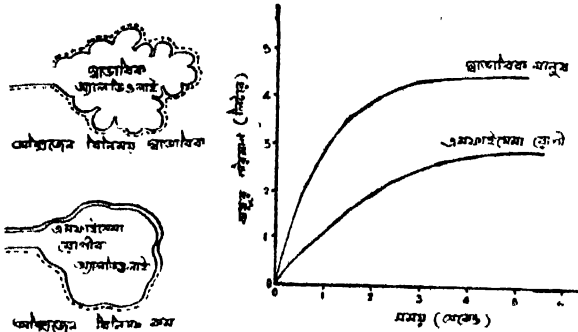
(8) **হাইড্রোজেন সালফাইড**—এর প্রভাবে বমনেচ্ছা এবং চোখ ও গলা জ্বালা করে।

(9) **অ্যামোনিয়া**—অ্যামোনিয়া বাষ্প শ্বাসনালীর উপরাংশকে আক্রমণ করে ও প্রদাহ সৃষ্টি করে।

(10) **হাইড্রোজেন সায়ানাইড**—এই বায়ুদূষক নার্ভকোষের কাজকর্মে বাধা দেয়।

(11) **অ্যালডিহাইড**—এটি শ্বাসনালীর প্রদাহ সৃষ্টি করে।

(12) 3, 4 বেঞ্জপাইরিন (BaP)—শহর ও শিল্পাঞ্চলের বায়ুতে আশঙ্কাজনক পরিমাণে এই পলিসাইক্লিক হাইড্রোকার্বন থাকে। এটি ফুসফুসের ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে।

(13) **ক্যাডমিয়াম**—বিজ্ঞানীরা বলেন বাতাসে যদি ক্যাডমিয়াম থাকে তাহলে তা হার্টের অসুখ সৃষ্টি করতে পারে।

(14) **অ্যাসবেস্টস**—আমরা অ্যাসবেস্টসকে সিমেন্ট বা প্লাস্টারের মত ক্ষতিহীন বলে মনে করি। কিন্তু আদৌ তা নয়। অ্যাসবেস্টস নিয়ে নাড়াচাড়ার ফলে অ্যাসবেস্টসের সূক্ষ্মতন্তু বাতাসে ভেসে বেড়াতে থাকে এবং তা যদি আমরা শ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করি তবে তা ফুসফুসের বিভিন্ন অসুখ, এমন কি ফুসফুসের ক্যানসার এবং পাকস্থলীর ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে।

(15) **বিকিরণ**—আলফা (α), বিটা (β) ও গামা (γ) বিকিরণ জীবকোষের ক্ষতিসাধন করে। বিকিরণ জননকোষের পরিব্যাপ্তি (mutation) ঘটিয়ে বিকৃত শিশুর জন্ম দিতে পারে।

অনেকে মাইক্রোওয়েভ দূষণ, শব্দদূষণ ও আলোকদূষণকে বায়ুদূষণের অন্তর্ভুক্ত করেন।

মাইক্রোওয়েভ দূষণ—সোভিয়েট রাশিয়ায় গবেষণার ফলে জানা গেছে যে মাইক্রোওয়েভ কর্মীরা মাথার যন্ত্রণা, ঘুম ঘুম ভাব, চুল পড়ে যাওয়া, ক্ষুধার অভাব, অবসাদ প্রভৃতিতে ভোগেন।

পরবর্তীকালে আমেরিকায় গবেষণায় জানা গেছে মাইক্রোওয়েভের প্রভাবে চোখের লেন্সের পশ্চাৎ অংশে ছানি পড়ে। চোখের লেন্সের পশ্চাৎ অংশে ছানি পড়াটা খুবই অস্বাভাবিক কিছু গবেষকের মতে মাইক্রোওয়েভের ক্রিয়ায় জীবকলার প্রসারণশীলতা কমে ও হার্টের অসুখ হতে পারে।

শব্দ দূষণ—স্পষ্টতঃই অহেতুক শব্দ বায়ু-মণ্ডলের একটি অন্যতম দূষক। উৎকট শব্দ তৈরির প্রধান উৎসগুলি হলো বিভিন্ন যানবাহন, পাব্লিক অ্যাড্রেস সিস্টেম (public address system), সাইরেন, কলকারখানা এবং সর্বোপরি জেটপ্লেন। গবেষণায় দেখা গেছে 97 থেকে 115 dB শব্দ বধিরতা সৃষ্টি করে, 90dB ও 4000cps. শব্দ রক্তচাপের তারতম্য ঘটায় এবং ফলস্বরূপ হৃৎযন্ত্রের ক্ষতিসাধন করে (Medical Tribune থেকে প্রাপ্ত তথ্য), 180dB শব্দ মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে।

জেটপ্লেনের প্রচণ্ড শব্দ পৃথিবীর আয়নমণ্ডলের (ionosphere) ক্ষতিসাধন করে। এর ফলে বিভিন্ন মহাজাগতিক রশ্মি সরাসরি ভূপৃষ্ঠে চলে আসে এবং জীবজগতের ক্ষতি করে।

আলোক দূষণ—রাতে শহরের আলো আকাশ ছেয়ে ফেলে। এর ফলে মানমন্দিরগুলি থেকে ক্ষুদ্র তারকা, ছায়াপথ (milkyway), কোয়াসার প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয় রাতে উজ্জ্বল আলো গাছপালা ও জীবজন্তুর জীবনযাপনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ

(ক) **নিয়ন্ত্রণপদ্ধতি**

(1) **নাইট্রোজেনের অক্সাইড নিয়ন্ত্রণ**

(i) **যানবাহন ও শক্তিউৎপাদন** কেন্দ্র থেকে—মোটরগাড়ীর ইণ্টারনাল কম্বাশান ইঞ্জিনে (internal combustion engine) অথবা শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রে জ্বালানীর দহনের ফলে প্রচণ্ড তাপমাত্রার (কমপক্ষে 816°C) সৃষ্টি হয়। এই উচ্চতাপমাত্রায় নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন সংযুক্ত হয়ে নাইট্রোজেনের অক্সাইড উৎপন্ন করে, যা বায়ুতে এসে মেশে। জ্বালানীর দহনে কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়াও বিষাক্ত কার্বন মনো-অক্সাইড উৎপন্ন হয়।

বিভিন্ন অনুঘটক ব্যবহার করে কার্বন মনো-অক্সাইডকে কার্বন ডাই-অক্সাইডে এবং নাইট্রোজেনের অক্সাইডকে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনে পরিণত করা যায়।

CO + জারিত অনুঘটক = CO_2 + বিজারিত অনুঘটক

NO + বিজারিত অনুঘটক = $\frac{1}{2}N_2 + \frac{x}{2}O_2$ + জারিত অনুঘটক।
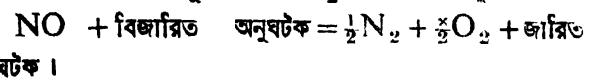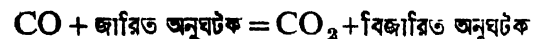
জাপানের বিজ্ঞানীরা 'Startified Charge Engine' নামে মোটরগাড়ীর দূষণমুক্ত ইঞ্জিন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন।

(ii) **নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপাদন কারখানা**—এখানকার সমস্যা হচ্ছে শোষণস্তম্ভে অশোষিত নাইট্রোজেনের অক্সাইড, যা

অবশেষে বাতাসে গিয়ে মেশে। অথচ এই নাইট্রোজেন অক্সাইডকে লাভজনকভাবে তাপশক্তি উৎপাদনের কাজে লাগানো যেতে পারে এবং দূষণমুক্তও করা যেতে পারে।

$$CH_4 + 4NO_2 \xrightarrow{\text{অনুঘটক}} 4NO + CO_2 + 2H_2O + \text{তাপশক্তি}$$
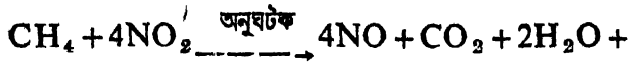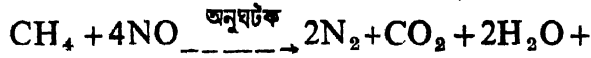
$$CH_4 + 4NO \xrightarrow{\text{অনুঘটক}} 2N_2 + CO_2 + 2H_2O + \text{তাপশক্তি}$$

(2) সালফার ডাই অক্সাইড নিয়ন্ত্রণ

কলকারখানার ধোঁয়ার সঙ্গে নির্গত সালফার ডাই-অক্সাইডকে বাতাসে ছাড়ার আগে যদি delay tank-এর মধ্যে দিয়ে পাঠানো হয় (যার pH নিয়ন্ত্রণ করা হবে), তাহলে সালফার ডাই-অক্সাইড নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে।

$$CaO + SO_2 \longrightarrow CaSO_3 \xrightarrow[O_2]{} CaSO_4$$

$$H_2S + SO_2 \longrightarrow H_2O + S$$
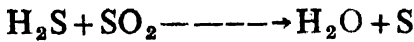
(3) কার্বন ডাই-অক্সাইড নিয়ন্ত্রণ

আরো অনেক বেশী গাছ পুঁততে হবে যাতে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা উদ্ভিদ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করতে পারে এবং বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কমিয়ে আনতে পারে।

$$6CO_2 + 12H_2O \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{আলোক}} C_6H_{12}O_6 \ (\text{গ্লুকোজ}) + 6H_2O + 6O_2$$
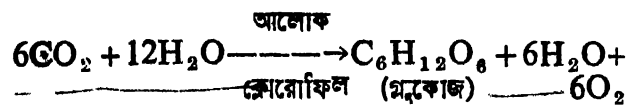
(খ) আইনগত নিয়ন্ত্রণ

বায়ুদূষণ রোধ করার জন্য যেসব আইন প্রণয়ন আবশ্যক, সেগুলি হলো—

(i) মোটরগাড়ী ও অন্যান্য যানবাহন সংস্থাগুলিকে দূষণ-মুক্ত যানবাহন তৈরি করতে বাধ্য করা।

(ii) কলকারখানাগুলিকে বাধ্য করা যাতে তারা বায়ুতে ছাড়ার আগে ধোঁয়াকে পরিশুদ্ধ করে।

(iii) জ্বালানী তেল ও কয়লার ব্যবহার কমিয়ে দূষণমুক্ত শক্তি, যেমন—সৌরশক্তি, জলবিদ্যুৎ, বায়ুপ্রবাহশক্তি, সমুদ্র ও নদীস্রোতশক্তি ইত্যাদি, ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা।

(iv) শব্দ ও আলোকের অপব্যবহার ও আতিশয্য দমন করা।

(v) সংবিধানের 48 ও 51 নম্বর ধারায় পরিবেশ সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে কিন্তু তাকে আরো জোরদার করা উচিত।

(গ) শহর পরিকল্পনা

(i) বাড়ীতে দূষণমুক্ত জিনিষপত্রের ব্যবহার বাড়ানো।

(ii) বস্তি ও খাটাল-উচ্ছেদ।

(iii) বর্তমান শহরগুলি থেকে দূরে নতুন পরিকল্পিত শহর তৈরি—যেখানে দূষণমুক্ত যানবাহনব্যবস্থা থাকবে।

(iv) Mass Transit (যাতে একটি যানে অনেক লোক বহন করা যায়) এবং Less Lransit System (যাতে জনসাধারণকে যানবাহন কম ব্যবহার করতে হয় এমন ব্যবস্থা) চালু করা।

(v) 3নং চিত্রে প্রদত্ত নক্সায় রাস্তাঘাট তৈরি করা।

চিত্র-3—জার্মান স্থপতি ও শহর-পরিকল্পক Reichow কর্তৃক পরিকল্পিত।

জনসংখ্যা ও দূষণ—জনসংখ্যা ও দূষণসমস্যা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে আনা না যায় তবে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের কোনো ব্যবস্থাই ফলপ্রসূ হবে না।

ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োলজি অব ন্যাচারাল সিস্টেমের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডক্টর ব্যারী কমোনার বলেছেন যে 2000 খৃস্টাব্দে পৃথিবীর জনসংখ্যা দ্বিগুণ হবে। এটাকে তিনি 'Crush Point' বলে অভিহিত করেছেন। এর ফলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে যাতে সমস্ত Ecosystem বা বাস্তুতন্ত্র ভেঙে পড়বে। কাজেই আমাদের বেঁচে থাকার জন্যেই আমাদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতেই হবে।

অবশেষে বলি, পরিবেশ দূষণ তখনই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব যদি সমস্ত মানুষ এ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। অন্যথায় পরিবেশ দূষণ মানবজাতির আত্মহত্যার কারণ হবে।

পরিবেশ সমস্যা ও বিজ্ঞান ক্লাব

দেবপ্রসাদ ঘোষদস্তিদার*

পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য অন্যান্য প্রাণীর অপেক্ষা মানুষের প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেকগুণ বেশী। কিন্তু বিগত কয়েক দশকের মধ্যে ভারতের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি আর তার সাথে পাল্লা দিয়ে কারিগরী শিল্পের প্রায় যথেচ্ছ সম্প্রসারণ আজ এমন পর্যায়ে এসেছে যার ফলে বিজ্ঞানের যুগান্তকারী অবদান মানুষের কাছে সংশয়রূপে দেখা দিয়েছে। বিজ্ঞানকে মানবকল্যাণে ব্যবহার করার পেছনেও যে সুষ্ঠু পরিকল্পনার প্রয়োজন তা বর্তমান পরিবেশের ক্ষয়িষ্ণু ভারসাম্যহীনতা আর একবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, ভারতবর্ষের প্রায় সবকয়টি শহরের পরিবেশই আজ দূষিত। কারণ উল্লেখ করতে গেলে একটা ফর্দ হয়ে দাঁড়ায়, যেমন—গ্যাস, ধোঁয়া, দুর্গন্ধ, নগ্নভাবে বনক্ষয় ও মরুভূমি সৃষ্টি, দূষিত পানীয় জল, বিষাক্ত কীটনাশক ওষুধের যথেচ্ছ ব্যবহার, শিল্পবর্জ্য পদার্থ, ক্ষয়প্রাপ্ত বন্যজন্তু ইত্যাদি। কাজেই পরিবেশগত সত্যকে (ecological truth) নতুন করে মূল্যায়ন করার সময় এসেছে। এই সংঘর্ষ থেকে পরিত্রাণের পথও আমাদের অজানা নয়। প্রয়োজন শুধু সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে সেগুলি ফলপ্রসূ করা। এই কাজে সফল ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসতে পারে বিজ্ঞান ক্লাবের মত সংস্থাসমূহ। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা অবশ্যই থাকা দরকার।

পরিবেশ নিয়ে ভাবনা আমাদের দেশে বরাবরই উপেক্ষিত। আর উপেক্ষিত বলেই স্বাধীনতার তিরিশ বছরের মধ্যেও একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিবেশ দপ্তর খোলার প্রয়োজনীয়তা আমাদের দেশ বোধ করে নি। সুখের কথা, অতি সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারও পরিবেশ দপ্তর সৃষ্টি করেছেন।

পরিবেশ সমস্যাকে অবহেলা করার উদাহরণ হিসাবে মাত্র দুটি ঘটনা তুলে ধরছি। এক মথুরা তৈল শোধনাগার, দুই সাইলেন্ট ভ্যালী প্রসঙ্গ। মথুরা তৈল-শোধনাগার তৈরি শুরু হয় আজ থেকে প্রায় এক দশক আগে অর্থাৎ 1973 খৃস্টাব্দে। তৈরি শেষ হলে এই শোধনাগার হবে ভারতের অন্যান্য আরও 11টি শোধনাগারের মধ্যে বৃহত্তম। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা এ-ধরণের প্রকল্প বা শিল্পের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। পেট্রোকেমিকাল শিল্প প্রসারে সর্বাপেক্ষা বেশী উপকৃত হবে চাষবাস, সেচ, জনস্বাস্থ্য ও পরিবহন। এই শোধনাগারের ভবিষ্যৎ উৎপাদনের পরিসংখ্যান দেওয়া যাক—বছরে দু-লক্ষ টন জ্বালানী গ্যাস (LPG), সাতান্ন হাজার টন ন্যাপথা, সতের লক্ষ টন হাইস্পিড ডিজেল তেল, নব্বই হাজার টন লাইট ডিজেল তেল, এক লক্ষ ষাট হাজার টন কেরোসিন ইত্যাদি। প্রকল্প ভাল। কিন্তু আপত্তি শুধু এর স্থান নির্বাচনে। কারণ এর শিকার হবে আগ্রা, মথুরা, সিকান্দ্রা, ফতেপুর, সিক্রি এলাকায় প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য। তাজমহলের উত্তর অংশে ইতিমধ্যে দাগ (stain) দেখা দিয়েছে। এই শোধনাগার থেকে উদ্ভূত সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস হলো সবচেয়ে মারাত্মক। কারণ এই গ্যাস পরে জলীয় বাষ্পের সাথে বিক্রিয়া করে উৎপন্ন করে ক্ষয়কারক পদার্থ সালফিউরিক অ্যাসিড। এই অ্যাসিড ভারী হওয়ার দরুণ নীচের দিকে নেমে আসে। তখন তাজমহলের শ্বেত পাথরের ক্যালসিয়াম কার্বনেটের সাথে বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম সালফেটে পরিণত করে।

$$2SO_2 + O_2 = 2SO_3, \quad SO_3 + H_2O = H_2SO_4$$
$$H_2SO_4 + CaCO_3 = CaSO_4 + H_2CO_3$$
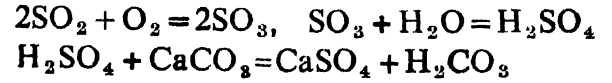
এই বিক্রিয়ার ফলে ক্রমশঃ শ্বেত পাথরের রঙ চটে যায় ও ক্ষয় হতে থাকে। বিশেষজ্ঞদের মতে এই অবস্থা চলতে থাকলে আগামী বিশ বছরের মধ্যেই আকর্ষণীয় ও অপরূপ তাজমহলের স্টোন-ক্যানসার রোগে মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে।

অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ প্রযুক্তি বিভাগের অধ্যাপক মি. শিবাজী রাও হিসেব করে দেখেছেন এই শোধনাগার থেকে ঘণ্টায় পাঁচ হাজার কিলোগ্রাম সালফার ডাই-অক্সাইড নির্গত হবে ও প্রতিদিন তিরিশ লক্ষ গ্যালন বিষাক্ত জল যমুনা নদীতে মিশবে। ফলে তাজমহলের ক্ষয় ছাড়াও যমুনা নদীর জলের উপর নির্ভরশীল বাসিন্দাদের প্রায় দশ লক্ষ লোক ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হবেন।

রাজস্থানের ভরতপুর পক্ষীসংরক্ষণাগারের পাখীরা এই শোধনাগারের বিষাক্ত কবলে পড়বে বলে আশংকা প্রকাশ করেছেন বিশিষ্ট পক্ষীবিশারদ ডঃ সালিম আলী। সর্বশেষ সংগৃহীত সরকারী খবরে জানা যায় যে, দূষণের প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রাধীন রাখার জন্য প্রায় 8 কোটি টাকা ব্যয় করে কিছু আধুনিক যন্ত্রপাতী শোধনাগারে বসানো হয়েছে। যাই হোক, শিল্পের স্থান নির্বাচনের আগে পরিবেশ বিজ্ঞানী ও সংরক্ষণবিদ্‌দের সঙ্গে সরকারের বিশদভাবে পরামর্শ করার প্রয়োজন ছিল।

কেরালার সাইলেন্ট ভ্যালী জল বিদ্যুৎ প্রকল্পও এরূপ আরেকটি মর্মান্তিক উদাহরণ। এই ধরণের অপরূপ ঘন সবুজ বনাঞ্চল পৃথিবীর খুব কম জায়গায় আছে। তাই একে বলা

*রাষ্ট্রীয় কৃষি গবেষণাগার কলিকাতা-700040

হয়—"West Coast Tropical Wet Evergreen Forest"—দেশের একমাত্র বনাঞ্চল যেখানে বিভিন্ন শস্য, বিচিত্র গাছপালা এবং নানা ধরণের পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ আছে। স্মরণ থাকতে পারে সম্প্রতিকালে এই সাইলেন্ট ভ্যালী থেকে সংগৃহীত বিশেষ এক ধরণের প্রজাতি-উদ্ভিদের সাহায্যে ইন্দোনেশিয়াতে ফসলের মহামারীকে প্রতিরোধ করা সম্ভবপর হয়। তাই এই সাইলেন্ট ভ্যালীতে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের বিরুদ্ধে যাঁরা প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন—ডঃ সালিম আলী, জ্যাফর ফুটো হ্যালী এবং পি. কে. আম্পী।

এটা কারোরই অজানা নয় যে, ভারতের শহরের মধ্যে কলকাতাতেই পরিবেশ দূষণের মাত্রা সর্বোচ্চ। বায়ু, জল ও শব্দ দূষণের বিরুদ্ধে সরকারী কর্তৃপক্ষ এখনও তেমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি. জনৈক বিশেষজ্ঞের মতে কলকাতায় বায়ু দূষণের মাত্রা এত বেশী যে, ধূমপান করেন না, এমন একজনকেও প্রতিদিন গড়ে চার প্যাকেট সিগারেটের সমতুল্য বিষাক্ত ধোঁয়া গিলতে হচ্ছে। খুব স্বাভাবিক কারণেই গলা ও ফুসফুসের ব্যাধি চতুর্গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অত্যন্ত পরিতাপ ও লজ্জার বিষয় যেখানে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশে শিল্পে দূষণ-নিরোধক ব্যবস্থার মাধ্যম দূষণকে নিয়ন্ত্রণ করছে, সেখানে কলকাতা ও শহরতলীতে অবস্থিত একান্নটি জুটমিলের মধ্যে নামমাত্র কয়েকটিতে দূষণ নিরোধক যন্ত্র বসানো হয়েছে। পরিবেশ দূষণের ফলে শ্রমিকদের মধ্যে ফুসফুসের ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা বেড়ে চলেছে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞদের মতে বায়ু দূষণের প্রতিক্রিয়া মেয়েদের শরীরে (বিশেষতঃ প্রসবের পরে) আরও মারাত্মক।

কলকাতা মহানগরীতে পানীয় জলের দূষণ সমস্যাও বেশ প্রকট। যে হুগলী নদীর জল পরিশোধিত করে কলকাতা শহরের মানুষকে পানীয় জল সরবরাহ করা হয় সেই হুগলী নদীর জলও বেশ দূষিত। এর কারণ নদীর দু-পাড়ে অবস্থিত কলকারখানা থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত দ্রব্য, গৃহস্থালীর ও নালা-নর্দমায় নোংরা জল ক্রমাগত নদীর জলকে দূষিত করছে।

কলকাতায় শব্দজনিত দূষণের প্রধান উৎস হলো পরিবহন। মোটরের তীব্র হর্ন ছাড়াও লাউডস্পীকার, রেডিও, কলকারখানার শব্দ সব মিলে একটা এমন শ্রুতিকটু আকার ধারণ করছে যা নাগরিকের মানসিক ও শারীরিক ক্ষতি বৃদ্ধির সহায়ক। হঠাৎ তীব্র শব্দে বা শব্দ দূষণের ফলে শরীরে রক্তের চাপ ও হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বৃদ্ধি পায়, হজমে বিঘ্ন ঘটে, হরমোন নিঃসরণ অস্বাভাবিক হয়, শ্রবণশক্তির হ্রাস ঘটায়, শিশুদের এবং অসুস্থ ও বয়স্কদের ঘুমের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। এছাড়া ক্রোধপ্রবণতা, মানসিক চাপ বৃদ্ধি, বদমেজাজ, অনিদ্রা ও ভীতিপ্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

বায়ু, জল, গন্ধ ও শব্দজনিত দূষণের কুফল কলকাতাবাসী মাত্রই প্রত্যেককে ভোগ করতে হচ্ছে। এ সমস্যার সমাধানে শুধু সরকারের উপর নির্ভর করলে চলবে না। প্রতিটি নাগরিককে এই সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন বেসরকারী নাগরিক সংস্থা গড়ে তোলা, যাদের কাজ হবে সরকারী যন্ত্রের সাথে সংযোগ রেখে সমস্যা সমাধানের পথ খোঁজা ও তার সমাধান করা। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, বেতার, দূরদর্শন প্রভৃতি জনসংযোগকারী মাধ্যমের সাহায্যে প্রচার, আলোচনা সভা, ছবি সহযোগে সমস্যা বোঝানো। প্রতিটি নাগরিককে দূষণের ভয়াবহতা সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে হবে। এ ছাড়া বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী নিয়ে আন্দোলন করতে হবে। পশ্চিমবাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের বিজ্ঞান ক্লাবের মত সংস্থাগুলোকে এই পরিবেশ দূষণ সমস্যা সমাধানের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। বিজ্ঞান ক্লাবগুলোর মাধ্যম বিজ্ঞান আন্দোলন গড়ে তুলে সারা ভারতে সেই সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে হবে। পরিবেশ নির্মল রাখার পবিত্র দায়িত্ব বিজ্ঞান ক্লাবগুলোকে কাঁধে তুলে নিতে হবে। পরিবেশ মন্ত্রকের সর্বতো সহযোগিতা অবশ্যই থাকা দরকার।

আন্তর্জাতিক পরিবেশ বর্ষে (1983) একটি পরিবেশ বিষয়ক মন্ত্রক সৃষ্টি করার জন্য বর্তমান সরকারকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। সেই সঙ্গে অনুরোধ জানাই ব্যাপক কর্মসূচী নিয়ে এখন থেকেই পরিবেশ বিশুদ্ধ রাখার কর্মযজ্ঞে উদ্যোগী হতে। নতুবা এমন একদিন আসবে যখন বসন্ত ঋতুতে পর্যন্ত আর একটি পাখীরও গান শোনা যাবে না।

বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে পরিষদ ভবনে (পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-6) নিম্নোক্ত জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আপনাদের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

বক্তা : শ্রীশান্তিরঞ্জন চ্যাটার্জী
বিষয় : যোগব্যায়ামের শারীরতাত্ত্বিক উপযোগিতা
সময় : বিকাল 5টা
তারিখ : 18-8-83 (বৃহস্পতিবার)

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

ওষুধ সেবন ও স্বাস্থ্য দূষণ

সৌমেনকুমার মৈত্র*

সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে কেমন গা-হাত-পা ব্যথা ব্যথা করছে। মাথাটা ধরে আছে। অস্বস্তি বোধ করছেন। তাড়াতাড়ি আরাম চান। পত্র-পত্রিকা, বেতার, দূরদর্শনের দৌলতে বেশ কিছু ওষুধের নাম আপনার জানাই আছে। সোজা চলে গেলেন ওষুধের দোকানে। পছন্দমত ওষুধ খেলেন। খানিক পরেই ব্যথা বেশ কমে গেল। শরীরের কথা ভুলে কাজে মন দিতে দেরী হলো না। কিন্তু এখানেই কি শেষ? সম্ভবতঃ নয়। কারণ এই ধরণের ওষুধ খাওয়ার অভ্যাস বেশ কিছুদিনের পুরানো হলে যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে একেবারে কিডনি নষ্ট হয়ে যাওয়ার। সম্প্রতি এই আশংকা প্রকাশ করেছেন ওরেগন বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক। তাঁরা সমীক্ষা করে দেখেছেন, যে সব ব্যক্তিরা স্থায়ীভাবে কিডনির রোগে ভুগছেন তাঁদের মধ্যে পাঁচ থেকে দশ শতাংশের মধ্যে এই বিপদের কারণ বেদনা উপশমকারী ওষুধের অতিরিক্ত ব্যবহার। এই সমীক্ষক দল বলেছেন এর ফলে কিডনির ক্ষতি এত ব্যাপক হতে পারে যে তার জন্য ডায়ালিসিসও যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন হতে পারে কিডনি বদল করার।

এই খবর নিঃসন্দেহে খুবই ভয়ের। তবে এই ভয় শুধু বেদনা উপশমকারী ওষুধ নিয়েই নয়, মারাত্মক রকমের শারীরিক ক্ষতির আশংকা ছড়িয়ে আছে বেশ কিছু অন্যান্য ওষুধের অপ-ব্যবহারের মাঝে। যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জীবাণুনাশক—, গর্ভনিরোধক—ও ঘুমের ওষুধ। সাম্প্রতিক কালে দেখা গেছে এই সব ওষুধের অপব্যবহারেতো বটেই, কোন কোন ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবে বেশ কিছু ওষুধের প্রভাব এতটাই ক্ষতিকর হতে পারে যে সেই ওষুধ নিয়ে না ভেবে পারা যায় না।

আমাদের মধ্যে যেসব ওষুবের অপব্যবহার খুবই বেশী তার শতকরা পঁচাত্তর ভাগই হচ্ছে বিভিন্ন রকম জীবাণুনাশক ওষুধ বা অ্যান্টিবায়োটিকস। আর্থিক মূল্যে এইসব দামী ওষুধের অপব্যবহারে ক্ষতির আশংকা সব থেকে বেশী। সাধারণভাবে অনেক সময়ই একটু ঠাণ্ডা লেগেছে, জ্বর হয়েছে, বা গলায় ব্যথা হয়েছে এই অবস্থায় অনেকেই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার কথা মনে করেন না নিজের বুদ্ধিতেই শরণাপন্ন হন এই সব অ্যান্টিবায়োটিকস ওষুধের। কিন্তু জানেন না এই ওষুধের অপব্যবহারের ফলে রোগ নিরাময়ের পরিবর্তে কত শত শারীরিক উপসর্গ ডেকে আনছেন অজান্তে। দেখা গেছে এই সব জীবাণু-নাশক ওষুধ যখন খাদ্যনালীতে গিয়ে পৌঁছায় তখন শুধু যে সংশ্লিষ্ট কোষের কাজে ব্যাঘাত ঘটায় ও বেশ কিছু হজম হওয়া খাদ্যবস্তু শোষণে বাধা দেয় তাই নয়, একই সাথে আমাদের অন্ত্রের বেশকিছু উপকারী জীবাণুকে ব্যাপকভাবে খতম করে। আবার এমন কয়েকটি অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ আছে যেগুলি ক্ষতি করে কিডনি ও অস্থিমজ্জার। এই ধরণের কিছু ওষুধ যদি অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের প্রয়োগ করা হয় তাহলে তার ক্ষতিকর প্রভাব গিয়ে পৌঁছায় শিশুর শরীরে।

অস্বাভাবিক শিশু জন্মের পিছনে যে কোন ওষুধের প্রভাব থাকতে পারে এমন কথা বহুদিন ছিল অজানা। আজ থেকে মাত্র পঁচিশ বছর আগেও ভাবা হতো বিকলাঙ্গ শিশু জন্মের কারণ নিতান্তই বংশগত। কিন্তু টনক নড়ল উনিশ-শ' বাষট্টি খৃস্টাব্দের একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায়। আর এই ঘটনার পিছনে ছিল 'থ্যালিডোমাইড' নামে একটি ঘুমের ওষুধ। এই ওষুধটি প্রথম তৈরি হয় জার্মানীতে 1953 খৃস্টাব্দে এবং পশ্চিম জার্মানীতে এর ব্যবহার সুরু হয় 1957 খৃস্টাব্দে। ইংল্যাণ্ডে এই ওষুধটি চালু হয় পরের বছর। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই 1959 খৃস্টাব্দে বিভিন্ন ক্লিনিকে ধরা পড়ল সতেরটি বিকৃত শিশু জন্মের ঘটনা। 1960 খৃস্টাব্দে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো এক-শ' সাতাশে এবং পরের বছর চার-শ' সাতাত্তরে। অনুসন্ধান চলল তন্ন তন্ন করে। পরিশেষে 1962 খৃস্টাব্দে এটা পরিষ্কারভাবে জানা গেল এই সব বিকৃত শিশু জন্মের মূলে রয়েছে একটি কারণ—থ্যালিডোমাইড ওষুধের ব্যবহার।

এই ঘটনার পর থেকে যে কোন ওষুধই বাজারে ছাড়ার আগে যথেষ্ট খুঁটিয়ে দেখা হয় সম্ভাব্য ক্ষতিকর দিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে প্রায় কোন ওষুধই সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ নয়। সেই অ্যান্টিবায়োটিকসের কথাই ধরা যাক। এই ধরণের ওষুধের মধ্যে বহুল ব্যবহৃত পেনিসিলিনের বিশেষ ক্ষতিকর প্রভাব আছে শিশুদের শরীরে। সাম্প্রতিক তথ্য থেকে জানা যায় গর্ভাবস্থায় এই ওষুধ ব্যবহার করার ফলে বাচ্চা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, আর যদি তা নাও হয়, বিকৃত সন্তান জন্মানোর সম্ভাবনা থাকে যথেষ্ট। দেখা গেছে শিশুদের মধ্যে শতকরা ছেচল্লিশটি জন্মগত বিকৃতির কারণ মায়েদের অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় অ্যান্টিবায়োটিকসের ব্যবহার। পেনিসিলিনের মত টেট্রাসাইক্লিন জাতীয় ওষুধও বিশেষভাবে অভাব ঘটায় ভিটামিনের, যার ফলে গর্ভাবস্থায় শিশুদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি হয় বিশেষভাবে ব্যাহত।

ওষুধের প্রভাবে কেউ বধির হয়ে যেতে পারেন একথা সহজে

* জীব-বিজ্ঞান বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড়মঠ, হাওড়া-711 202

বিশ্বাস করা নিঃসন্দেহে শক্ত। কিন্তু এই ধরনের ঘটনার কথা জানা গেছে স্ট্রেপটমাইসিন নামে আর একটি জীবাণুনাশক ওষুধ ব্যবহারকারী রোগীদের মধ্যে থেকে। দেখা গেছে এই ওষুধ অতিরিক্ত পরিমাণে ব্যবহারের ফলে শ্রবণের সাথে যুক্ত স্নায়ুর ক্ষতি হওয়ায় বধির হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে প্রবল। এর থেকে কি বলা যায় না—অ্যান্টিবায়োটিক্স ব্যবহারকারীরা সাবধান!

তবে এতেও যদি কেউ সাবধান হতে না চান, তার জন্য রয়েছে আরও চমকপ্রদ খবর। স্ট্রেপটোমাইসিন ছাড়া বাকী প্রায় সব জীবাণুনাশক ওষুধই ক্ষতি করতে পারে যকৃতের, যার ফলে সৃষ্টি হতে পারে 'জনডিস্' বা ন্যাবা রোগের। দেখা যায় অ্যান্টিবায়োটিক্স ঘটিত এই রোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ওষুধের দায়িত্ব মোটামুটি এই রকম এরিথ্রোমাইসিন—22%, কো-ট্রাইমোক্সাজোল—22%, টেট্রাসাইক্লিন—15%, অ্যাম্পিসিলিন—9%। তাহলে নিশ্চয় বুঝে নিতে অসুবিধা নেই শুধুমাত্র অ্যান্টিবায়োটিক্স জাতীয় ওষুধ শরীরের ক্ষতি করতে পারে কতটা।

এইবার আসা যাক্ ঘুমের ওষুধের কথায়; রাতের পর রাত ঘুম না হলে কোন মানুষই সুস্থ থাকতে পারেন না। আর তখন ঘুমের ওষুধের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া পথই বা কী? হাতের কাছেই আছে মরফিন, পেথিডিন, বারবিট্যুরেট, ক্যামপোজ ধরনের হরেকরকম ওষুধ। কিন্তু এই সব ওষুধ ক্রমাগত ব্যবহার করার ফাঁকে কেউ ভেবে দেখেন কি বিপদের ঝুঁকি কতটা? অবশ্যই সব ওষুধের প্রভাব এক নয়, তবে মোটামুটিভাবে বলা যায় কম-বেশী প্রায় সব ঘুমের ওষুধেরই স্নায়ুর উপর প্রভাব থাকে মারাত্মক। কোন কোন ক্ষেত্রে এই ওষুধই ব্যবহারকারীদের পৌঁছে দেয় মৃত্যুর দোরগোড়ায়।

ঘুমের ওষুধ হিসেবে বারবিট্যুরেটের ব্যবহার খুবই বেশী। আর এই ওষুধ ব্যবহারের সাথে জড়িয়ে আছে বেশ কিছু আচরণের প্রশ্ন। স্বাভাবিক মাত্রায় ব্যবহার করলে মানসিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হতে পারে। কিন্তু বেশী মাত্রায় ব্যবহারের ফলে বুদ্ধি লোপ, নিদ্রাহীনতা এবং ক্ষেত্রবিশেষে মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা থাকে রীতিমত যথেষ্ট। এই ওষুধের আর একটি বিশেষত্ব হলো এর প্রভাবে কখন কোন ধরনের শারীরিক ক্ষতি হবে তা আগে থেকে বলা বেশ শক্ত।

সেদিক থেকে মরফিন জাতীয় ঘুমের ওষুধে শারীরিক ক্ষতির পূর্বাভাষ দেওয়া তুলনামূলক ভাবে সহজ। এই ওষুধ ব্যবহারকারীদের বেশীর ভাগের মধ্যেই অসুখ, বমি বমি ভাব, সব কিছুতেই বিতৃষ্ণা এবং খেঁচুনি দেখা যায় প্রায়ই। উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, বেশী মাত্রায় মরফিন ব্যবহারে মৃত্যু এড়ানো শক্ত।

রাসায়নিক গঠনের দিক থেকে মরফিনের খুব কাছের ওষুধ পেথিডিন। কেউ প্রচণ্ড ব্যথায় ছটপট করছেন অথবা শরীরে কোথায়ও অপারেশনের পর রুগীর ঘুমের দরকার এমত অবস্থায় অনেক চিকিৎসকই পেথিডিন ব্যবহারের সুপারিশ করেন। কিন্তু মজার কথা বহু চিকিৎসক ও নার্স নিজেরাই এর থেকেও বেশী পেথিডিন ব্যবহার করেন [illegible] নেশার তাগিদে। যদিও তাঁরা বেশ ভালভাবেই জানেন এই নেশার প্রকোপে ওষুধের মাত্রা বাড়তেই থাকে এবং শেষ পরিণতি হয় অনন্ত শয্যার দিকে এগিয়ে যাওয়া।

বরং তুলনামূলকভাবে বলা যেতে পারে বিপদের সম্ভাবনা কিছুটা কম ক্যামপোজ বা ভ্যালিয়াম ব্যবহারে। মানসিক চাপ, উদ্বিগ্নতা, ভয়, ক্লান্তি ও সংশয় কাটাতে অনেকেই ব্যবহার করেন এই ওষুধ। এর প্রভাবে সহজে মৃত্যুর সম্ভাবনা কম ঠিকই তবে শারীরিক দুর্বলতা, ঘুম ঘুম ভাব, কোন কিছুতে মনসংযোগ করার ক্ষমতার ঘাটতির সাথে যে উপসর্গ বড় হয়ে দেখা দেয় তা হলো স্মৃতি শক্তিলোপ। সুতরাং ভেবে দেখা যেতে পারে কোন ঘুমের ওষুধই প্রকৃতপক্ষে নিরাপদ কিনা।

একথা ঠিক জীবাণুনাশক, বেদনানাশক ও ঘুমের ওষুধের মত গর্ভ নিরোধক ওষুধ সকলে ব্যবহার করেন না। এর ব্যবহার শুধুমাত্র মাঝবয়েসী নারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তবু এই ধরনের ওষুধের অপব্যবহারে নারীদের যে শারীরিক বিপর্যয় ঘটে তা নিঃসন্দেহে অনেকেরই মাথাব্যথার কারণ। সাম্প্রতিক হিসাবে দেখা যায় আজকের দুনিয়ায় কম-বেশী প্রায় পাঁচ কোটি নারী ব্যবহার করেন বিভিন্ন ধরনের গর্ভনিরোধক বড়ি। এই বড়িগুলি বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই আর কিছু নয়, স্ত্রী-হর্মোন।

আমরা অনেকেই জানি হর্মোন হচ্ছে এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ যা বিশেষ বিশেষ নালীকাবিহীন গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়ে রক্তের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে সারা দেহে এবং নিয়ন্ত্রণ করে নানান শারীরবৃত্তীয় কাজ।
শরীরে ভিন্ন ভিন্ন হর্মোন নিয়ন্ত্রণ করে ভিন্ন ভিন্ন কাজ। সেই দিক থেকে নারীর শরীরে ডিম্বাশয় বা 'ওভারী' থেকে নিঃসৃত হয় এস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরোন নামে দুটি হর্মোন। স্বাভাবিক ভাবে এই হর্মোন দুটি নিয়ন্ত্রণ করে নারীর জনন সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজ। কিন্তু অধিক মাত্রাতে এই হর্মোনই বাধা দেয় সন্তান সৃষ্টিতে। তাই জন্ম নিয়ন্ত্রণে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এই দুটি হর্মোন দিয়ে তৈরী নানা রকম গর্ভনিরোধক বড়ি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে নির্বিচারে এই সব বড়ি ব্যবহার কি স্বাস্থ্য সম্মত? সম্ভবতঃ নয়। কারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে এইসব বড়ির প্রভাবে সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায় ঠিকই তবে সাথে সাথে এমন সব উপসর্গ সৃষ্টি হয় যা নিয়ে না ভেবে পারা যায় না। চিকিৎসকের পরামর্শ না নিয়ে যেমন খুশী এইসব বড়ি ব্যবহার করলে মাথা ঘোরা, গায়ে ব্যথা, মোটা হয়ে যাওয়া, দুর্বল বোধ করার মত ছোটখাট শারীরিক গোলযোগ ছাড়াও বেশ ঝুঁকি থাকে একেবারে বন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার। আমাদের চারপাশে একটু খোঁজ করলে দেখা যাবে এমন বন্ধ্যা নারীর সংখ্যা খুব একটা কম নয়, যাদের বন্ধ্যাত্বের কারণ বিবাহিত জীবনের প্রথম দিকে একনাগাড়ে বহুদিন এইসব বড়ির ব্যবহার। সুতরাং এখানেও দেখা যাচ্ছে শুধুমাত্র সম্যক জ্ঞানের অভাবে, সচেতনতা কম থাকার জন্য কিভাবে ওষুধের বলি হচ্ছে মানুষ নিজেই।

আজ পরিবেশ দূষণ নিয়ে আমরা সবাই সোচ্চার। মানুষের নিজের প্রভাবে বাঁচার পরিবেশ যাতে আরো কলুষিত না হয়ে যায় তার জন্য গড়ে তোলা হচ্ছে ব্যাপক গণ সচেতনতা। কিন্তু বাহ্যিক পরিবেশের সাথে সাথে আমাদের শরীরের ভেতরের পরিবেশও যে দূষিত হয়েই চলেছে রোগ প্রতিরোধের হাতিয়ার ওষুধের অপব্যবহারে—সে ব্যাপারে আজও অনেকেই নীরব। কিন্তু ভাবা দরকার শুধু আমাদের জেনারেশনের জন্য নয়, সুস্থ ভবিষ্যতের জন্য এখন থেকেই ব্যবস্থা নেওয়া উচিত এই আর্থিক ও শারীরিক অপচয়ের বিরুদ্ধে। এখন থেকেই স্লোগান হওয়া উচিত 'রোগ সারাতে ওষুধ চাই, রোগ বাড়াতে নয়'। আর এই স্লোগানকে সার্থক করতে চাই চিকিৎসক ও জনসাধারণ সকলেরই স্বাস্থ্যসচেতনতা। চিকিৎসকদের ভাববার সময় এসেছে ন্যূনতম ওষুধে রোগের চিকিৎসা করা যায় কিনা। জনসাধারণের সতর্ক হওয়ার সময় এসেছে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া যে কোন ওষুধ ব্যবহার করা উচিত কিনা। বলা বাহুল্য, আজ ও আগামীদিনের জনস্বাস্থ্য সুস্থ না দুস্থ হবে, তা বহুলাংশে নির্ভর করছে এই সচেতনতার উপর।

পরিবেশ দূষণ ও নিউক্লীয় বিকিরণ

জয়ন্ত বসু*

গত 5ই জুন আন্তর্জাতিক পরিবেশ দিবস পালিত হল। বিজ্ঞানের প্রয়োগে মানুষের সভ্যতার অগ্রগতি যেমন একদিকে এগিয়ে চলেছে জোর কদমে, অন্যদিকে আবার মানুষের স্বার্থান্ধতায়, তার অদূরদর্শিতায় বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগে তার বাসভূমি পৃথিবীর পরিবেশ ক্রমেই দূষিত হয়ে পড়ছে। এই পরিবেশ দূষণের ফলে আমাদের অনন্য পৃথিবী যাতে শেষ পর্যন্ত বাসের অযোগ্য না হয়ে ওঠে, সেইদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই হল পরিবেশ দিবস পালনের উদ্দেশ্য।

পরিবেশ দূষণের পিছনে মূল কারণ হিসাবে রয়েছে তিনটি 'দ'—দারিদ্র্য, দুর্নীতি ও দুর্বুদ্ধি। বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক মনোভাবের সুষ্ঠু প্রয়োগ হলে এত দিনে পৃথিবীকে সম্পূর্ণ দারিদ্র্য মুক্ত করা যেত। কিন্তু ধনী দেশ ও ধনিক শ্রেণীগুলির স্বার্থান্ধতায় তা সম্ভব হয় নি। বর্তমানে যে অবস্থা, তা বোঝা যাবে একটি দৃষ্টান্ত দিলে; উন্নয়নশীল দেশগুলির মোট জনসংখ্যার অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ নিয়মিত অপুষ্টিতে ভুগছে। যেন-তেন-প্রকারেণ বেঁচে থাকাই যেখানে সমস্যা, সেখানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি কি কিছু অস্বাভাবিক? দ্বিতীয়তঃ, পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে যে সব নিয়ম দুর্নীতি কানুন আছে, সেগুলি মানতে হলে কিছু অর্থব্যয় হবে এবং মুনাফা খানিক কমবে বলে বহু শিল্পসংস্থা নানান ফন্দি-ফিকির করে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে সেগুলি এড়িয়ে চলে। এই ধরনের দুর্নীতির ফলে অনেক জায়গায় বায়ু দূষিত হচ্ছে, দূষিত হচ্ছে নদ-নদী-সমুদ্রের জল। তৃতীয়তঃ, বহু সংস্থা এবং বহু সরকারেরও এমন দুর্বুদ্ধি হয় যে, ক্ষণকালীন সুযোগ-সুবিধার জন্যে নানান ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় পরিবেশ দূষণের দিকে প্রায় চোখ বুজে; যেমন, যথেচ্ছ ভাবে গাছপালা কেটে বা বন উচ্ছেদ করে শহর পত্তন করা। এই প্রসঙ্গে বলতে হয় নিউক্লীয় বিকিরণজনিত সমস্যার কথা, কারণ এ সমস্যার পিছনে রয়েছে বিভিন্ন সরকারের কিছুটা দুর্বুদ্ধি, রয়েছে তাদের দূরদর্শিতার অভাব। আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত এই সমস্যা কেবল উন্নত দেশগুলিতেই সীমিত নয়, ভারতের মতন উন্নয়নশীল দেশেও এই সমস্যা ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠছে বা ওঠবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। বর্তমান প্রবন্ধে এই সমস্যা সম্বন্ধেই সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে।

নিউক্লিয় বিকিরণ বলতে কী বোঝায়?

পদার্থের পরমাণুর নিউক্লিয়াস থেকে যে সব রশ্মি নির্গত হয়, সেগুলিকে বলা হয় নিউক্লীয় বিকিরণ। এই বিকিরণ গতিশীল কণা হতে পারে অথবা হতে পারে বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গ। সব পদার্থের নিউক্লিয়াস থেকেই যে বিকিরণ নির্গত হয়, তা নয়। যে সব পদার্থের ক্ষেত্রে স্বতঃই এটি ঘটে, সেগুলি তেজস্ক্রিয় পদার্থ। তাছাড়া নিউক্লীয় বিভাজন, সংযোজন, ইত্যাদি প্রক্রিয়াতেও নিউক্লিয়াস থেকে বিকিরণ নির্গত হতে পারে।

আমরা জানি, তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে নির্গত রশ্মিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় আলফা রশ্মি, বিটা রশ্মি ও গামা রশ্মি (জ্ঞান ও বিজ্ঞান, এপ্রিল '83 'পরমাণুর দীর্ঘশ্বাস' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। আলফা রশ্মি দ্রুতগামী ধনাত্মক আধানযুক্ত কণার সমষ্টি; এই কণা বস্তুতঃ হিলিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াস, যা দুটি প্রোটন ও দু'টি নিউট্রন দিয়ে গঠিত। বিটা রশ্মির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কণা অপেক্ষাকৃত অনেক হাল্কা; এটি সাধারণতঃ ঋণাত্মক আধানযুক্ত ইলেকট্রন, তবে কোন কোন কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থের ক্ষেত্রে এটি ধনাত্মক আধানযুক্ত পজিট্রনও হতে পারে। গামা রশ্মি হল বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গ—এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এক্স-রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের চেয়েও ক্ষুদ্র। বস্তুকে ভেদ করবার ক্ষমতা বিভিন্ন রশ্মির ক্ষেত্রে বিভিন্ন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আলফা রশ্মি আমাদের দেহচর্ম ভেদ করতে পারে না, বিটা রশ্মি কয়েক মিলিমিটার প্রবেশ করতে পারে আমাদের দেহে, গামা রশ্মি আমাদের দেহ সম্পূর্ণ ভাবে ভেদ করে চলে যেতে পারে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াস থেকে যে নিউট্রন

* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-700 009

কণা বেরিয়ে আসে, তা হল বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ কণা এবং তার ভেদ করবার ক্ষমতা যথেষ্ট।

নিউক্লীয় বিকিরণের মারাত্মক প্রভাব

বায়ুতে তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকলে তাই থেকে নিউক্লীয় বিকিরণ বাইরে থেকে আমাদের দেহে সরাসরি ঢুকতে পারে, অথবা পানীয় বা খাদ্যের মধ্যে তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকলে তা আমাদের দেহের মধ্যে ঢুকে সেখানে বিকিরণ ছড়াতে পারে। এই ধরণের যে সব পদার্থ মলমূত্রের সঙ্গে বেরিয়ে না গিয়ে দেহের মধ্যে থেকে যায়, সেগুলি বলা বাহুল্য, অত্যন্ত বিপজ্জনক; যেমন, স্ট্রনসিয়াম-90 নামক তেজস্ক্রিয় পদার্থ দেহে ঢুকলে অস্থি-র মধ্যে গিয়ে সঞ্চিত হয়।

নিউক্লীয় বিকিরণ যে কত ক্ষতিকারক হতে পারে, তা সুস্পষ্ট ভাবে জানা গেছলো 1945 খৃস্টাব্দে জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি শহরে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে। ঐ বিস্ফোরণে যে লক্ষাধিক মানুষ নিহত হয়েছিল এবং আহত হয়েছিল আরো বেশি মানুষ, তার কারণ হিসাবে ছিল তীব্র তাপ, প্রচণ্ড ঝড়ের ঝাপটা এবং ভয়াবহ নিউক্লীয় বিকিরণ। নিউক্লীয় বিকিরণের একটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তার প্রভাব থাকে বহুকাল ধরে লিউকোমিয়া ও নানারকম ক্যান্সার ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয় মানুষ; জীবনহানি যদি নাও হয়, পঙ্গু, বিকলাঙ্গ হয়ে যায় অনেকে। 1945 খৃস্টাব্দে বোমা বিস্ফোরণের ফলে বিকিরণজনিত মৃত্যুহার সবচেয়ে বেশি হয়েছিল 1951-52 খৃস্টাব্দে। নিউক্লীয় বিকিরণ প্রজননগত ত্রুটি ঘটাতে পারে। সেজন্যে যারা নিউক্লীয় বিকিরণের সংস্পর্শে আসে, কেবল তারা নিজেরাই নয়, তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের ক্ষেত্রেও এর মারাত্মক প্রভাব দেখা দিতে পারে। বস্তুতঃ এই ক্ষতিকারক প্রভাবের সম্ভাবনা থেকে যায় বেশ কয়েক প্রজন্ম ধরে।

বায়ুমণ্ডলে বা ভূপৃষ্ঠে নিউক্লীয় বোমা বিস্ফোরণে উৎপন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থ বায়ু দ্বারা বাহিত হয়ে অনেক দূর পর্যন্ত চলে যায়। তাছাড়া তা ভূপৃষ্ঠে নেমে আসতে পারে বৃষ্টির সঙ্গে। বোমা বিস্ফোরণের পরে যে 'কালো বৃষ্টি' হয়, তাতে থাকে প্রচুর পরিমাণে তেজস্ক্রিয় পদার্থ। 1954 খৃস্টাব্দে প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হাইড্রোজেন বোমার যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিল, বায়ু দ্বারা চালিত তার তেজস্ক্রিয় ভস্মের প্রভাবে পরীক্ষাস্থল থেকে অনেক দূরে কয়েকজন জাপানী জেলে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাদের মধ্যে একজনের মৃত্যুও হয়।

নিউক্লীয় অস্ত্র প্রতিযোগিতা

নিউক্লীয় অস্ত্র প্রতিযোগিতার অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে ষাটের দশকের গোড়ার দিকে বায়ুমণ্ডলে ও ভূপৃষ্ঠে যে পরিমাণ নিউক্লীয় বোমার পরীক্ষা হচ্ছিল, তাতে কোন যুদ্ধ ছাড়াই কয়েক বছরের মধ্যে সমস্ত পৃথিবীর পরিবেশ তেজস্ক্রিয়তায় দূষিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। 'সীমিত পরীক্ষা বন্ধ চুক্তির' ফলে সেই আশঙ্কা অন্ততঃ সাময়িক ভাবে দূরীভূত হয়েছে। কিন্তু নিউক্লীয় অস্ত্রের প্রস্তুতি যে ভাবে বেড়ে চলেছে (জ্ঞান ও বিজ্ঞান, শারদীয় সংখ্যা '82, 'সভ্যতার সমাপ্তি কি আসন্ন? নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) এবং সেই অস্ত্রের সঞ্চয় বর্তমানে এত বেড়ে গেছে যে, একবার নিউক্লীয় যুদ্ধ বাধলে কেবল যে 75 কোটি লোকের তাৎক্ষণিক মৃত্যু হবে এবং 34 কোটি লোক মারাত্মক ভাবে আহত হবে, তাই নয়, সমগ্র পৃথিবীরই পরিবেশ দূষিত হবে এবং তেজস্ক্রিয়তার শিকার হবে কোটি কোটি লোক, শারীরিক ও মানসিক ভাবে পঙ্গু বহু কোটি শিশুর জন্ম হবে কয়েক প্রজন্ম ধরে (রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকেডেমী অব সায়েন্সেস-এর সাম্প্রতিক হিসাব অনুযায়ী)। সুতরাং পরিবেশ দূষণের সবচেয়ে মারাত্মক বিপদকে প্রতিরোধের সমস্যা অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত নিউক্লীয় যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে।

নিউক্লীয় চুল্লী

নিউক্লীয় বিকিরণে পরিবেশ দূষণ প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক কালে নিউক্লীয় চুল্লীর কথা প্রায়শঃই আলোচিত হচ্ছে, বেশ কিছু আন্দোলনও হয়ে গেছে এই ধরণের চুল্লীর বিরুদ্ধে। নিউক্লীয় চুল্লীতে যে ইউরেনিয়ামকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তার পরমাণুর নিউক্লিয়াসের বিভাজনের ফলে শক্তি উৎপন্ন হয়—যে শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে কাজে লাগানো হয়ে থাকে। বিভাজন প্রক্রিয়ার পর যে অবশিষ্ট থেকে যায় তা খুবই তেজস্ক্রিয়। বর্তমানে সারা বিশ্বে প্রায় 600টি নিউক্লীয় চুল্লী সক্রিয় রয়েছে—সেগুলির মধ্যে 250টি হল শক্তি উৎপাদনের জন্যে, বাকি 350টি মূলতঃ গবেষণার জন্যে। এই সব চুল্লী থেকে যে তেজস্ক্রিয় জঞ্জালের সৃষ্টি হচ্ছে, তার পরিমাণ বিপুল এবং তাকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে ফেলা এক গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। হয়তো উপযুক্ত আধারে আবদ্ধ করে গভীর সমুদ্রের নীচে রেখে দেওয়া হল, অথবা মরুভূমির মাটির অনেক নীচে পুঁতে ফেলা হল। কিন্তু ঐ জঞ্জালের তেজস্ক্রিয়তা থাকতে পারে বহু শতাব্দী ধরে। তার মধ্যে আধার ক্ষয়প্রাপ্ত হতে পারে, ভূমিকম্প বা ঐ রকম কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে তেজস্ক্রিয় পদার্থ বেরিয়ে এসে পৃথিবীর পরিবেশকে দূষিত করতে পারে। তেজস্ক্রিয় জঞ্জালের সদ্গতির জন্যে বিজ্ঞানীরা অবশ্য নানা রকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু এখনো কোন সার্থক সমাধান সম্ভব হয় নি।

নিউক্লীয় চুল্লী থেকে পরিবেশ দূষণের আর একটি সম্ভাব্য কারণ হল—দুর্ঘটনা। এই চুল্লীর মধ্যে নানান তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকে। কোন রকম দুর্ঘটনার ফলে তেজস্ক্রিয় পদার্থ বাইরে বেরিয়ে এলে পরিবেশ দূষিত হতে পারে। এই রকম বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনার খবরও পাওয়া গেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 1979

খৃস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভ্যানিয়ার থ্রী মাইল আইল্যাণ্ডের নিউক্লীয় চুল্লীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পাম্প নষ্ট হয়ে যাওয়ায় যে বিপুল পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ বেরিয়ে এসেছিল, সে খবর তো সকলেরই জানা। সংবাদপত্রে প্রকাশ, 1980 খৃস্টাব্দের 14ই মার্চ একটি দুর্ঘটনায় আমাদের দেশে তারাপুরে নিউক্লীয়ার চুল্লীর একটি নলের ছিদ্র দিয়ে তেজস্ক্রিয় জল মেঝের উপর ছড়িয়ে পড়েছিল। এই ধরণের সব খবর গোপনীয়তার অন্তরালের রাখবার চেষ্টা করা হলেও যতখানি জানা গেছে, তাতে যথেষ্ট দুর্ভাবনার কারণ হয়েছে।

তেজস্ক্রিয় জঞ্জাল ও দুর্ঘটনা ছাড়াও নিউক্লীয় চুল্লীর আর একটি ভয়াবহ সম্ভাবনা রয়েছে। নিউক্লীয় চুল্লীতে যে প্লুটোনিয়াম তৈরি হয় তা নিউক্লীয় বোমার মশলা হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। নিউক্লীয় শক্তি ও পরিবেশ সম্পর্কে যুক্তরাজ্যের রয়াল কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিউক্লীয় শক্তির প্রসার অবশ্যম্ভাবীরূপে সাহায্য করবে নিউক্লীয় অস্ত্র প্রস্তুতির সামর্থ্যের প্রসারে। আমাদের আশঙ্কা, এই সব অস্ত্রের প্রস্তুতিও এভাবে সাহায্যপুষ্ট হবে।" নিউক্লীয় অস্ত্রের প্রসার যত বাড়বে, নিউক্লীয় যুদ্ধের সম্ভাবনাও বাড়বে তত। এইরকম যুদ্ধ বাধলে তার ভয়াবহ পরিণতি কী হবে, তাতো আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, বর্তমান শক্তি সমস্যার যুগে নিউক্লীয় চুল্লীর অবদান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এজন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন প্রভৃতি উন্নত দেশগুলিতে বহু চুল্লী কার্যকর রয়েছে এবং ভারত, চীন ইত্যাদি উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এই ধরণের সব চুল্লী নির্মিত হয়েছে বা হচ্ছে। কিন্তু পরিবেশ দূষণে এই চুল্লীর যে ভূমিকা, তা নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা-ভাবনা করবার সময় এসেছে। চুল্লী সংক্রান্ত যাবতীয় সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করা, তেজস্ক্রিয় জঞ্জালের সদ্‌গতির জন্যে জোর কদমে গবেষণা চালানো ইত্যাদি কর্মসূচীর গুরুত্ব ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠছে। মনে রাখতে হবে, যথেচ্ছ ভাবে নিউক্লীয় চুল্লী গঠন বা তার ব্যবহার অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।

আধুনিক যুগে মানুষ নিউক্লীয় শক্তির রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছে, উৎপাদন করতে পেরেছে এই শক্তি। এই প্রচণ্ড শক্তিকে কল্যাণ-কর কাজে আবদ্ধ রাখবার জন্যে সব শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরই সজাগ ও সতর্ক থাকবার সময় এসেছে, কারণ তা না হলে এই শক্তি হয়তো অচিরেই সমস্ত পৃথিবীর পরিবেশকে দূষিত করে ফেলবে এবং ফ্র্যাংকেনস্টাইনের মতন হয়ে তার স্রষ্টা আধুনিক সভ্যতাকে একেবারে ধ্বংস করে ফেলবে।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

দেবজ্যোতি দাশ*

বিজ্ঞানসাহিত্যিক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের জন্মের পরে ঠিক একশো বছর অতিক্রান্ত হলো। বাংলা ভাষায় সরস ভঙ্গী, সুচারু শৈলী ও সুগম ধারায় বিজ্ঞান আলোচনার দ্বারা চারুচন্দ্র সারা জীবন ধরে বঙ্গ-সাহিত্যের বিজ্ঞান শাখাটিকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। সাধারণ জনচিত্তে বিজ্ঞানচিন্তার উন্মেষ ঘটানোর কাজে এবং দৈনন্দিন জীবনের পরিচিত ঘটনার পটভূমিকায় বিজ্ঞানের মূল তথ্যগুলি সম্বন্ধে মানবমনে সচেতনতা উৎপাদনে
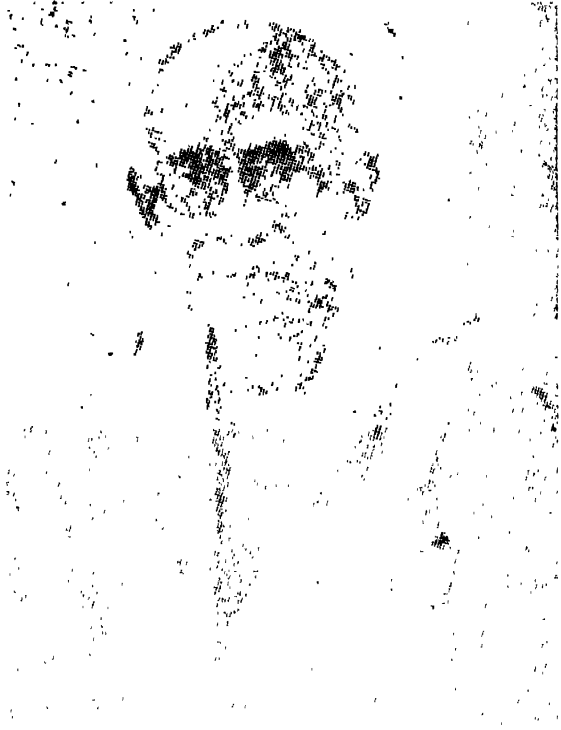
চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

তাঁর অকুণ্ঠ অধ্যবসায় ও অবিরাম প্রয়াস ছিল। বিজ্ঞানের পরিধি ছাড়িয়ে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের অন্যান্য ধারাগুলিতেও চারুচন্দ্রের অবদান উল্লেখনীয়। রবীন্দ্রচর্চা ও রবীন্দ্ররচনার প্রকাশনে অন্যতম মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে চারুচন্দ্র সমকালীন পাঠকসমাজের কাছে রবীন্দ্রনাথের সঠিক মূল্যায়ন ও পর্যালোচনার পথ সুগম করে দিয়েছিলেন। লোকশিক্ষা, গ্রামীণ শিল্প-সংস্কৃতি এবং সমবায় আন্দোলনের সংগঠনেও তাঁর অবদান ছিল।

1883 খৃস্টাব্দের 29 জুন বসন্তকুমার ভট্টাচার্যের পুত্র চারুচন্দ্রের জন্ম হয়। কলকাতার মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশানের বৌবাজার শাখা থেকে তিনি 1899 খৃস্টাব্দে প্রথম বিভাগে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সম্ভবত ঐ বছরেই মজিলপুরের শিবনাথ ভট্টাচার্যের কন্যা রাজলক্ষ্মী দেবীর সঙ্গে চারুচন্দ্রের বিবাহ হয়। 1901 খৃস্টাব্দে চারুচন্দ্র মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন থেকে এফ. এ. পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বিভাগে দ্বাদশ স্থান লাভ করেন। 1903 খৃস্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে বি.এ. (অনার্স) পরীক্ষায় এবং 1905 খৃস্টাব্দে পদার্থবিদ্যায় এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

চারুচন্দ্র 1906 খৃস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের সহকারী (অ্যাসিস্ট্যাণ্ট টু প্রফেসর অফ ফিজিক্স) পদে যোগ দেন এবং দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর ঐ কলেজে অধ্যাপনার পরে 1941 খৃস্টাব্দে সরকারী শিক্ষাবিভাগ থেকে অবসর নেন।

চারুচন্দ্র বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানসাহিত্য রচনায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখ বিজ্ঞানসাধকের যথাযোগ্য উত্তরসূরী। 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'প্রকৃতি', 'ভাণ্ডার' প্রভৃতি তৎকালীন সুপ্রচলিত পত্রপত্রিকায় তাঁর বহু বিজ্ঞানপ্রবন্ধ ছড়িয়ে আছে। ছাত্রপাঠ্য বইয়ের বাইরে তাঁর প্রথম বিজ্ঞানপুস্তক 'নব্যবিজ্ঞান' 1325 বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়—চারুচন্দ্র এই বইটিতে সংক্ষেপে উনিশ শতকের শেষ পাদ থেকে বিশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত পঞ্চাশ বছরে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, চিকিৎসাবিদ্যা, আবহবিদ্যা, নভোবিদ্যা, জীববিদ্যা ও প্রযুক্তিবিদ্যায় অগ্রগতির সরল বিবরণ দিয়েছিলেন। এরপরে 1926 খৃস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'বাঙ্গালীর খাদ্য' পুস্তিকায় চারুচন্দ্র খাদ্যের উপাদান, শ্রমের গুরুত্ব অনুসারে আহার্যের প্রয়োজনীয়তা এবং বাঙ্গালীর খাদ্যে বিজ্ঞানসম্মত পরিবর্তনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে সহজ ভাষায় তথ্যপূর্ণ ও শিক্ষাপ্রদ আলোচনা করেন। 1938 খৃস্টাব্দে প্রকাশিত 'আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু' গ্রন্থে চারুচন্দ্র সরস ও হৃদয়গ্রাহী রূপে জগদীশচন্দ্রের জীবনালেখ্য পরিবেশন করেছিলেন। অন্যদিকে 1350 বঙ্গাব্দে বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত চারুচন্দ্রের 'জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কার' পুস্তকে বেতার ও উদ্ভিদজীবন সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের গবেষণা সহজবোধ্য ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। বিশ্বভারতীর বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালায় অন্যতম পুস্তিকা রূপে প্রকাশিত 'বিশ্বের উপাদান' (1350 বঙ্গাব্দ) বইটিতে চারুচন্দ্র সহজ ভাষায় ও আকর্ষণীয় শৈলীতে অণুপরমাণুর গঠন এবং প্রোটন, পজিট্রন, নিউট্রন প্রভৃতি কণা সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ

* পদার্থবিদ্যা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা-73

আলোচনা করেছিলেন। বিশ্বভারতী থেকে এছাড়া প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর 'ব্যাধির পরাজয়' (1356) এবং 'পদার্থবিদ্যার নবযুগ' (1358)। প্রথম বইটিতে পাস্তুর, জেনার, কখ্, ব্রহ্মচারী প্রমুখ বিজ্ঞানীর আবিষ্কার, জীবাণুর শ্রেণীবিভাগ, রোগনিবারণে টিকা, কেমোথেরাপি ও পেনিসিলিনের ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে সুখপাঠ্য আলোচনা এবং দ্বিতীয় বইটিতে রঞ্জন রশ্মি, তেজস্ক্রিয়তা, পরমাণুবিদ্যা, পরমাণু বিস্ফোরণ, হাইড্রোজেন বোমা, মহাজাগতিক রশ্মি ও আপেক্ষিকতাবাদ সম্পর্কে তথ্যসমৃদ্ধ, মনোজ্ঞ অথচ সহজবোধ্য বিবরণ পরিবেশিত হয়েছে।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সূচনা থেকেই চারুচন্দ্র এর সদস্যপদ গ্রহণ করেন। দীর্ঘদিন তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সহ-সভাপতি পদও অলংকৃত করেন। পরিষদের লোকবিজ্ঞান গ্রন্থমালার প্রথম পুস্তক হিসাবে 1355 বঙ্গাব্দে প্রকাশিত চারুচন্দ্রের 'তড়িতের অভ্যুত্থান' বইটিতে চুম্বক ও তড়িৎ সম্বন্ধে আকর্ষণীয় ভাষায় আলোচনা করা হয়েছিল ; বইটির 'নিবেদন' আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর লিখিত। এর পরেই 1949-50 খৃস্টাব্দে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ থেকে বিজ্ঞানপ্রবেশ গ্রন্থমালায় চারুচন্দ্রের লিখিত চারটি বই প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে প্রথমটিতে ('প্রারম্ভ') ব্রহ্মাণ্ড, সৌরজগৎ, পৃথিবীর উৎপত্তি ও অভ্যন্তর, নিউটন, গ্যালিলিও ও আইনস্টাইনের আবিষ্কার প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনার অবতরণিকা করা হয়েছিল ; পরবর্তী তিনটি পুস্তকে ('পদার্থবিদ্যা', 1ম—3য় খণ্ড) পদার্থের ধর্ম, শক্তি, শব্দের উৎপত্তি ও প্রকৃতি, তাপের ধর্ম, আলোকের প্রকৃতি ও গতি, চৌম্বকবিদ্যা, স্থিতীয় তড়িৎ ও চলতড়িৎ প্রভৃতি বিষয় সরলভাবে বিবৃত ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 1962 খৃস্টাব্দে তাঁর 'পরমাণুর নিউক্লিয়াস' বইটিও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ থেকেই প্রকাশিত হয় ; বইটিতে পরমাণুকেন্দ্রকের গঠন, পরিবর্তন ও বিস্ফোরণ, তেজস্ক্রিয়তা প্রভৃতি বিষয়ে তৎকালীন সর্বাধুনিক তথ্য সাধারণের বোধগম্য ভাষায় পরিবেশিত হয়েছিল।

এছাড়া চারুচন্দ্রের 'বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কাহিনী' ('জিজ্ঞাসা' থেকে 1953 খৃস্টাব্দে প্রকাশিত) বইটিতে আর্কিমিডিস থেকে ব্যানটিং পর্যন্ত বহু বিজ্ঞানসাধকের আবিষ্কারের বিবরণ সরস ও সাবলীলভাবে দেওয়া হয়েছে।

প্রথম দিকের রচনাগুলিতে বিদেশী বৈজ্ঞানিক শব্দের বহুল ব্যবহার দেখা গেলেও পরবর্তীকালে চারুচন্দ্র বৈজ্ঞানিক শব্দের পরিভাষা সংকলন ও রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন এবং তাঁর 'পদার্থবিদ্যার নবযুগ', 'পরমাণুর নিউক্লিয়াস', 'তড়িতের অভ্যুত্থান', 'বিশ্বের উপাদান' প্রভৃতি গ্রন্থে বিদেশী শব্দের পরিবর্তে পরিশীলিত পারিভাষিক শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। চারুচন্দ্রের ভাষা মার্জিত ও সুস্পষ্ট, রচনাশৈলী অনুপম এবং প্রকাশভঙ্গী বিষয়ানুগ ও আকর্ষণীয়। ভারতীয় ধ্যানধারণা ও চিন্তাধারার লক্ষণীয় প্রভাব সত্ত্বেও তাঁর রচনায় সংস্কারের কলুষ অনুপ্রবেশ করেনি।

প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার সময়েই চারুচন্দ্র রবীন্দ্র পরিমণ্ডলে প্রবেশলাভ করেন। 1922 খৃস্টাব্দ থেকেই বিশ্বভারতীর প্রকাশন বিভাগের কাজে তাঁর প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। 1935 খৃস্টাব্দে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের ইংল্যাণ্ড প্রবাসকালে চারুচন্দ্রই বিশ্বভারতীর কর্মসচিবের কাজ নির্বাহ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অবসর নেওয়ার পরে 1941-42 খৃস্টাব্দে চারুচন্দ্র প্রায় দুই বছর শ্রীনিকেতনে উপসচিব পদে নিযুক্ত ছিলেন। দীর্ঘকাল তিনি বিশ্বভারতীর প্রকাশন বিভাগের সম্পাদক ও অধ্যক্ষ পদে আসীন ছিলেন। সে সময়ে রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশে তিনি অন্যতম মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন—বিশ্বভারতীর প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রথম সংস্করণে (আশ্বিন 1346) প্রথম খণ্ডের 'নিবেদন' ও 'প্রথম খণ্ডের বিজ্ঞপ্তি', দুটিই চারুচন্দ্রের লিখিত। রবীন্দ্রনাথ 'সে' নামে গল্পগ্রন্থটি (1344) চারুচন্দ্রকে উৎসর্গ করে তাঁকে সস্নেহ স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। কবিগুরুর প্রেরণায় প্রধানত চারুচন্দ্রের উদ্যোগেই বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা প্রকাশের সূচনা ঘটে। রবীন্দ্রনাথের বহু প্রেরণা ও মননের উৎস, তাঁর সাহিত্যের আনুপূর্বিক ও অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা, রবীন্দ্রমানসের বিবর্তনের ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে কবিগুরুর কৈশোর-যৌবনের অপ্রচলিত রচনাগুলির গুরুত্ব অনুধাবন করে চারুচন্দ্র ও তাঁর সতীর্থেরা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত অনীহা সত্ত্বেও 1347-48 বঙ্গাব্দে দুই খণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলীর 'অচলিত-সংগ্রহ' প্রকাশের ব্যবস্থা করেন—এ বিষয়ে ঐ দুই খণ্ডের 'নিবেদনে' চারুচন্দ্র স্বয়ং উল্লেখ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কর্মে তাঁর নানা রূপকে অন্বেষণের প্রয়াস দেখা যায় চারুচন্দ্রের 'কবিস্মরণে' বইটিতে। এছাড়া, তাঁর সম্পাদিত 'রবিপ্রদক্ষিণ', 'শতবার্ষিক জয়ন্তী উৎসর্গ' প্রভৃতি স্মারকগ্রন্থে সমকালীন সুধীজনের বহু মনোজ্ঞ রবীন্দ্রালোচনা সংকলিত হয়েছিল।

চারুচন্দ্র দীর্ঘদিন 'বসুধারা' ও 'ভাণ্ডার' পত্রিকা দুটির সম্পাদক ছিলেন। 1947-51 খৃস্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় প্রকাশক সমিতির সভাপতি পদ অলংকৃত করেন। রামমোহন লাইব্রেরীর সভাপতি পদেও তিনি বৃত হয়েছিলেন। তাঁর উদ্যোগেই ঐ সংস্থার পাঠচক্রে বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

1961 খৃস্টাব্দে চারুচন্দ্র পরলোকগমন করেন।

বিজ্ঞান সংবাদ

চুম্বকীয় মোনোপোল

ডির‍্যাক চুম্বকীয় মোনোপোল বা একমেরু চুম্বকের অস্তিত্ব তত্ত্বতঃ থাকা উচিত সিদ্ধান্ত করেছিলেন। সত্তরের দশকে রাশিয়ার বিজ্ঞানী পোলিয়াকোভ ও হুফ্‌ট্‌ প্রমাণ করেন যে তড়িচ্চুম্বকীয় বল, ক্ষীণ ও তীব্র বল—এ-তিনের একীকরণে একমেরু চুম্বকের অস্তিত্ব অপরিহার্য। একমেরু চুম্বক হবে প্রোটনের প্রায় 10^{16} গুণ ভারী কণা, তাদের স্বরণ করা দুরূহ হবে। ছায়াপথের চুম্বকক্ষেত্রের ভেতর দিয়ে অতিক্রম করেও তাদের গতিবেগ আলোর গতিবেগের 1/1000 ভাগ হবে কিনা সন্দেহ। তাদের বিপুল ভরবেগ (momentum)-এর জন্য কোথাও আটকিয়ে ফেলাও হবে দুরূহ।

হার্ভার্ডের বিজ্ঞানী প্রেসকিল কয়েক বছর আগে এক তত্ত্ব খাড়া করেছিলেন যে বিশ্বে প্রোটন ও মোনোপোলের সংখ্যা সমান সমান হবে। বিশ্বের প্রসারণের হার থেকে এই তত্ত্ব নস্যাৎ হয়ে প্রমাণিত হয় যে 10^{18} প্রোটনে একটি মোনোপোল বিশ্বে থাকতে পারে। 1981-তে ল্যাজারাইড, শ্যাফি ও ওয়ালস বিশ্বের প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে, সেকেণ্ডে 10^{-26} মোনোপোল সর্বোচ্চ সীমায় এসে পড়েছে বলেন। বিখ্যাত পার্কারের সীমা (parker bound) হলো বছরে প্রতি ফুটবল গ্রাউণ্ডের আয়তনে একটি মোনোপোল খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

স্ট্যানফোর্ড থেকে ব্লাস ক্যাব্রেরা দাবী করেছেন যে তাঁর অতিপরিবাহী কণাসন্ধানী যন্ত্রে তিনি একটি মোনোপোলের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। দু-ইঞ্চি ব্যাসের চারপাক তার জড়ানো এই যন্ত্রে কোন চুম্বক ক্ষেত্র নাই। মোনোপোলের আধানের আবেশে যন্ত্রটি সুবেদী হয়ে পড়ে ও সিগন্যাল থেকে মোনোপোলের অস্তিত্ব ধরা পড়ে।

এই আবিষ্কার নিয়ে এখনও বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত নন। রাশিয়াতে 2000 মি. নীচে পাহাড়ের মধ্যে যে 16 মি. × 16 মি. × 11 মি. আকারের বৃহৎ কণাসন্ধানী যন্ত্রে মোনোপোল ধরার চেষ্টা চলেছে তাতে রয়েছে 3132টি তরল স্ফুরণ গণনাযন্ত্র। এই যন্ত্রে এখনও কোনও মোনোপোলের অস্তিত্ব ধরা পড়ে নি।

ক্যাব্রেরার আবিষ্কার প্রশ্নাতীত না হলেও তিনি আরও শক্তিশালী যন্ত্রে তাঁর আবিষ্কারের যথার্থতা প্রমাণ করতে চান।

কেমিল্যাব থেকে হিল্ আর একটি নূতন তত্ত্ব বলেছেন তা হলো পোল-অ্যান্টিপোল প্রসঙ্গ। ইলেকট্রন-পজিট্রন যেমন পজিট্রনিয়াম গঠন করতে পারে তেমনি চুম্বকের পোল-অ্যান্টিপোল দিয়ে মোনিয়াম (monium) গঠিত হতে পারে। বিশাল বিস্ফোরণের (big bang) সময় মোনিয়াম গঠিত হয়ে থাকলে ঐ অবস্থায় তার অবস্থা ছিল উত্তেজিত। এখনও সেই উত্তেজনা কমে মোনিয়াম ভূমিস্তরে হতো নেমে আসে নি। মোনিয়াম ক্ষয় পেলে তার চুম্বকীয় উদাসীনতার জন্য পার্কারের সীমা মেনে চলার প্রয়োজন হবে না। এরকম ক্ষয়ে প্রচুর মোনোপোল পাওয়ার সম্ভাবনা।

সৃষ্টির সেই সময় থেকে আজও কি মোনিয়াম ক্ষয়ের সম্ভাবনা দেখা দেয় নি? এসব হলো তত্ত্বকথা। তবে ক্যাব্রেরার পরীক্ষা ছাড়াও আরও প্রায় 25টি দল স্বতন্ত্রভাবে মোনোপোল ধরার চেষ্টা করছেন। রাশিয়ার বৃহৎ যন্ত্রটির কথাতো আগেই বলেছি।

গত অক্টোবরে (1982) উইসকনসিন-এর উইংস্প্রেড-এ 13টি দেশের প্রায় 90 জন বিজ্ঞানী মোনোপোলের অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাতে মোনোপোলের অস্তিত্ব যেমন নস্যাৎ হয় নি তার অস্তিত্বও প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণিত হয় নি।

শুভংকর

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে আলোকচিত্র (ফটোগ্রাফি) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে বিস্তৃত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
'সত্যেন্দ্র ভবন'
কলিকাতা—700 006
ফোন : 55-0660

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

ফার্স্ট এইড শিক্ষক প্রশিক্ষণ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে স্কুল ফাইনাল বা তদুর্ধ্ব মানের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ফার্স্ট এইড শিক্ষক প্রশিক্ষণ চালু করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ লাভে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের পরিষদের অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে বিস্তৃত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
'সত্যেন্দ্র ভবন'
কলিকাতা—700 006
ফোন : 55-0660

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

বিশ্বপরিবেশ দিবস ও আমরা

রতনমোহন খাঁ

5ই জুন, 1972 খৃস্টাব্দের ঐ তারিখে সুইডেনের স্টকহোমে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ পরিবেশ দূষণ রোধের উপর একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। এরপর প্রতি বৎসরই প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রে ঐ দিনটি বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসাবে মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয় সাধারণ নাগরিককে পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে। আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে সে সব নিয়েই নিয়েই আমাদের পরিবেশ। প্রকৃতি তার স্বাভাবিক নিয়মে একটি পরিবেশ গঠন করে। সেই পরিবেশে থাকে প্রাকৃতিক ভারসাম্য। প্রয়োজনে বা লোভে মানুষ খোদার উপর করে খোদকারি অর্থাৎ পরিবেশকে করে বিকৃত। ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য হয় নষ্ট। একের অস্তিত্বের সঙ্গে যে অন্যের অস্তিত্ব পারস্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ সেই বন্ধন হয় ছিন্ন, প্রতিটি প্রজাতিরই অস্তিত্ব হয় বিপন্ন। এখন পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি স্থানে স্থল, জল ও বাতাস নানা কারণে দূষিত হচ্ছে। তাই জাতিপুঞ্জের আহ্বান—বিশ্বপরিবেশ দিবস পালনের মাধ্যমে পরিবেশকে দূষণ থেকে রক্ষা করার।

ইতিমধ্যে জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প কার্যকরী করার আহ্বান জানান হয়েছে—(i) 1981 খৃস্টাব্দে International Water Supply and Sanitation Decade-এর সূচনা। এর লক্ষ্য হলো দশ বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ 1991 খৃস্টাব্দে মার্চের মধ্যে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের পানীয় জলের ব্যবস্থা করা এবং অন্ততঃ শতকরা আশি জনের আবাসকে স্বাস্থ্যকর করে তোলা; (ii) 1982 খৃস্টাব্দে মে মাসে জেনেভায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থার সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব হলো—2000 খৃস্টাব্দের মধ্যে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করে তুলতে হবে। এসব মহৎ পরিকল্পনা বা উদ্দেশ্য অবশ্যই পরিবেশ দূষণ রোধের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

সুখের বিষয় পরিবেশ দূষণ রোধে সরকারী পর্যায়ে আমাদের দেশে কিছু কিছু কাজ আরম্ভ হয়েছে। 1974 খৃস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকার Water Prevention Act পাশ করে West Bengal Prevention And Control Of Water Pollution Board গঠন করেছেন। 1981 খৃস্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকার একটি Air Prevention and Control of Pollution Act পাশ করে একটি কেন্দ্রীয় কমিটির উপর সারা ভারতে পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের ভার দিয়েছেন। ঐ বৎসরই পশ্চিমবঙ্গ সরকার Smoke Nuisance Commission গঠন করেছেন। পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাবলীর মোকাবিলার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার 1982 খৃস্টাব্দ থেকে এই দপ্তরের দায়িত্ব দিয়েছেন একজন মন্ত্রীর উপর। কেন্দ্রীয় তথ্য সংগ্রহ কমিটির প্রতিবেদনে জানা যায় ভারতের প্রায় 140টি শহরের জনসংখ্যা এক লক্ষের অধিক। এর মধ্যে বাহাত্তরটি শহরে জল সরবরাহ, পয়োনালী, ভূগর্ভস্থ নর্দমা, স্যানিটেশানের অবস্থা খুবই বিপজ্জনক। পঞ্চাশ হাজার বা তার বেশী লোক বাস করে এরূপ শহরের সংখ্যা প্রায় 190টি। আমাদের দুর্ভাগ্য যে এই শহরগুলির মধ্যে মাত্র চারটি গড়ে উঠেছে পরিকল্পনামাফিক। গ্রামগুলিও কোন পরিসংখ্যানেই আসে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুরোধে 1973 খৃস্টাব্দে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার তত্ত্বাবধানে সারা পশ্চিমবঙ্গে জল সরবরাহ, পয়োনালী, নর্দমা, স্যানিটেশন বিষয়ে একটি পরিকল্পনার খসড়া রচনা করা হয়েছে। এর রূপায়ণে খরচ হবে 1979 খৃস্টাব্দের মূল্যমান অনুযায়ী 1550 কোটি টাকা। অর্থাভাবে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা সম্ভব হচ্ছে না। অবশ্য জল সরবরাহের কয়েকটি ছোট ছোট পরিকল্পনা কার্যকরী করা হয়েছে এবং গ্রামে পঞ্চায়েত মাধ্যমে কোথাও কোথাও নলকূপ বসানো হয়েছে। কলিকাতা ও শহরতলীতে 3500-এরও বেশী ছোট-বড় শিল্পসংস্থা আছে। সরকারী প্রচেষ্টায় বেশ কিছু সংস্থা (হাজারের কম) পরিবেশ দূষণ রোধ সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেছে। CMDA কলিকাতা ও তার আশে-

পাশে উন্নয়নমূলক কাজ করে চলেছে। প্রয়োজনের তুলনায় এইসব প্রচেষ্টা খুবই নগণ্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মত অন্য রাজ্য সরকারগুলিও কিছু কিছু কাজ করে চলেছেন। বিভিন্ন রাজ্য সরকারের কাজ ও প্রচেষ্টার মধ্যে সমন্বয় স্থাপিত হলে অধিকতর সুফল পাওয়া যেতে পারে।

বিশ্বের প্রতিটি স্থানে পরিবেশ এক নয়। তাই পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাও সর্বত্র এক নয়। দুঃখের বিষয় আমাদের পরিবেশ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা ও পরিকল্পনার সিংহভাগই পশ্চিমী দুনিয়া থেকে ধার করা। স্বনির্ভরতা ও আত্মপ্রত্যয়ের অভাব থাকলে কোন পরিকল্পনাই ঠিক ঠিক প্রয়োজনভিত্তিক হয়ে উঠে না। পরিবেশ বিষয়ে সমস্যাগুলিকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা—(i) প্রাকৃতিক, (ii) আন্তর্জাতিক, (iii) স্থানীয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে (যেমন ভূমিকম্প, ঝড়, অতিবৃষ্টি, বন্যা, আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ইত্যাদি) অনেক সময় পরিবেশ দূষিত হয়। এই দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সহজসাধ্য নয়। বিমান ও জাহাজ চলাচল, পেট্রোল জাতীয় পদার্থের পরিবহন, পারমাণবিক চুল্লী ও বোমার বিস্ফোরণহেতু তেজস্ক্রিয়তার বিচ্ছুরণ, সামরিক কার্যকলাপ প্রভৃতি কারণে বিরাট অঞ্চল জুড়ে পরিবেশ দূষিত হয়। কোন এক রাষ্ট্রের একক প্রচেষ্টায় এ দূষণ রোধ করা সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক পরিসরে সমস্ত রাষ্ট্রের যৌথ প্রচেষ্টা ও সহযোগিতার মাধ্যমেই এ দূষণ বন্ধ করা সম্ভব। কল-কারখানা, যান-বাহন, পয়োনালী ও নর্দমার অব্যবস্থা, পানীয় জলের অভাব, কৃষিতে যথেচ্ছ ওষুধ প্রয়োগ, বনাঞ্চল অপসারণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অজ্ঞানতাবশতঃ নানা কুসংস্কার, খাদ্যে ও ওষুধে ভেজাল, বৈষয়িক অসাম্য ও দারিদ্র প্রভৃতি কারণে আঞ্চলিক ভিত্তিতে পরিবেশ দূষিত হয়। এ দূষণই স্থানীয় বা সামাজিক দূষণ। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে স্থানীয় ও সামাজিক দূষণই প্রকট।

বিশ্বসংস্থা প্রতিবৎসর পরিবেশ দূষণের এক একটি দিকের সমস্যাগুলিকে বিশেষভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করে। যেমন কোন বৎসর জলদূষণ, কোন বৎসর বায়ুদূষণ বা কোন বৎসর শব্দদূষণ। এ বৎসরের স্লোগান হলো—উন্নয়নমূলক পরিবেশ সংরক্ষণ, অর্থাৎ প্রাকৃতিক সম্পদের বিজ্ঞান সম্মত ব্যবহার ও সংরক্ষণ। যদিও সামাজিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে দারিদ্রকে দূর করতে না পারলে পরিবেশ দূষণ রোধ সর্বতোভাবে সম্ভব নয়, তবুও আমাদের সীমিত শক্তি নিয়ে বিশ্বসংস্থার স্লোগানে সামিল হওয়া উচিত আমাদের স্বার্থে, আমাদেরই বংশধরদের জন্য পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে রাখতে।

বিজ্ঞান-আলোয় খাওয়ার বিধিনিষেধ

সুনির্মল রায়*

একটা কাজ বারবার করতে করতেই সেটা অভ্যাসে দাঁড়ায়, আর সেই কাজটা করার পেছনে তার পারিবারিক ও জাতিগত সংস্কার কাজ করে। একজন মানুষের জীবনে অসংখ্য সংস্কার বিধিনিষেধের বন্ধন রয়েছে। একবারও আমরা ভেবে দেখি না সংস্কারটা 'সু' না 'কু', একবারও ভেবে দেখি না সত্যিই সেই বিধিনিষেধের পক্ষে কোন যুক্তি আছে কি নেই।

খাওয়া নিয়েও নানা বিধিনিষেধ আছে। এগুলো আমরা অন্ধের মতো মেনে চলি। কেউ আবার জেদের বশে অগ্রাহ্য করে। অথচ আমরা একবারও ভেবে দেখবার চেষ্টা করি না সত্যিই সেটা মানা উচিত কি না।

তৃতীয়ায় পটল, চতুর্থীতে মূলা, পঞ্চমীতে বেল, ষষ্ঠীতে লেবু, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে বেল ও মাংসাদি, নবমীতে লাউ, দশমীতে কলমী শাক, একাদশীতে শিম, দ্বাদশীতে পুঁই, ত্রয়োদশীতে বেগুন, চতুর্দশীতে মুসুর ডাল ও মাংসাদি, অমাবস্যায় মাছ-মাংস, প্রতিপদে কুমড়ো, পূর্ণিমাতে মাছ-মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। এই বিধিনিষেধের পক্ষে যেমন বলা যায়, বিপক্ষেও তেমনি বলা যায়। হয়তো ঐ ঐ সময়ে ঐ ঐ খাবার খারাপ থাকে বা হয়তো ঐ ঐ সময়ে ঐ ঐ খাবার হজম হয় না ভাল। তবে এ যুক্তি তেমন জোরালো মনে হয় না বেশীর ভাগ বিজ্ঞানীর কাছে। আমিও দেখেছি ঐ ঐ সময়ে ঐ ঐ খাবার খেলে কোনই ক্ষতিই হয় না। অবশ্য এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসতে গেলে আরও ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার দরকার। পূর্ণিমা ও অমাবস্যার কথা একটু আলাদাভাবে ভাবতেই হয়। আলো, তাপ, শব্দ, চাপ ইত্যাদির অর্থাৎ পরিবেশের প্রভাব প্রতিটি প্রাণীর মধ্যেই অল্পবিস্তর আছে। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন তিথিতে, চাঁদ ও সূর্যের আপেক্ষিক অবস্থানও পাল্টায়, ফলে দেহ ও মনের উপর তার প্রভাবও এক এক রকম হয়। এদিক থেকে এক এক তিথিতে এক একরকম খাবার দেহে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। অমাবস্যা পূর্ণিমায় দেহে রসবৃদ্ধির কথা তো সবার জানা। তবে আবারও বলছি কোন সময়ে কোন খাবার খাওয়া সত্যি খারাপ কিনা তা জানতে হলে রীতিমতো পরীক্ষা-নিরীক্ষার দরকার। আর একজনের ক্ষেত্রে খারাপ হলেই খারাপ বলা চলবে না। কারণ সেই খারাপত্ব অন্য কারণেও তো হতে পারে। খারাপ বলা হবে তখনই যখন বেশী লোকের ক্ষতি হবে।

দিনের বিশেষ সময়ে, বিশেষ বিশেষ মাসে, বিশেষ

* গণিত বিভাগ, শিবপুর বি, ই, কলেজ, হাওড়া-3

পরিস্থিতিতেও কিছু বিধিনিষেধ আছে। এই বিধিনিষেধ-গুলোর পক্ষেই বেশী বলা যায়। কারণ ওই একই। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে, বিভিন্ন পরিবেশে দেহ ও মনের অবস্থাও বিভিন্ন থাকে যা ঐ বিধিনিষেধগুলোকে সমর্থন করার সম্ভাবনাই বেশী। আবার কিছু ক্ষেত্রে ঐ খাবার ঐ বিশেষ সময়ে খারাপ থাকে হয়তো। 'লাউ ভাদ্রমাসের পর খাওয়া ঠিক নয়' এই ধারণার সপক্ষে বলা যায় ভাদ্রমাসের পর লাউ মোটেই ভাল থাকে না। সেজনাই খাওয়া ঠিক নয়। আরও কিছু খারাপ ফল আছে কিনা সেরকম কোন পরীক্ষিত সত্য জানা নেই বিজ্ঞানীদের। অনেকের ধারণা মঙ্গল ও শনিবারে বেগুন পোড়া খাওয়া ভাল। এর সপক্ষে বিজ্ঞানীরা অবশ্য কোন জোরালো সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি। আমি নিজেও দেখেছি ঐ সময়ে ঐ খাবারের বিধির কোন অর্থ হয় না।

জ্যৈষ্ঠ মাসে ছেলের মা লাউ বা বেল খায় না। মাঘ মাসে মূলা খায় না, চৈত্র মাসে শিম খায় না। এর উপরে সেরকম কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয় নি। পরিবেশের প্রভাবের কথা উল্লেখ করে কেউ কেউ হয়তো এটাকে সমর্থনও করতে পারেন। তবে আমি যতদূর দেখেছি জ্যৈষ্ঠমাসে ছেলের মা লাউ বা বেল খেলে, মাঘ মাসে মূলো খেলে, চৈত্র মাসে শিম খেলে কোনই ক্ষতি হয় না। পরিবেশের খারাপ প্রভাব থাকতেই পারে, তবে থাকলেও যে সেই প্রভাব মারাত্মক নয় একথা জোর দিয়ে বলা যায়।

'গরম থেকে এসে ঠাণ্ডা জল খেতে নেই'—এরকম নিষেধ অনেককেই বলতে শোনা যায়। গরমের মধ্যে থেকে চলাফেরা বা ছোটাছুটি করে এলেই শরীরের মধ্যে তাপের আধিক্য ঘটে, ঘাম নির্গত হয়, রক্ত-সঞ্চালন দ্রুত হয়, শ্বাস-প্রশ্বাসের হার কিছুটা বাড়ে। তাই গরমের মধ্যে থেকে এসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলে শরীরের ভিতরের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলো ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসে এবং শরীরের তাপমাত্রা পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে। তখন জল খেলে ক্ষতি হয় না। কিন্তু যদি গরম থেকে এসেই কিছুটা জল খাওয়া যায় তাহলে শরীরের ভিতরের ও বাইরের তাপমাত্রার হেরফের হওয়ায় হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগা, বিষম লাগা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

শোবার আগে বা ঘুম থেকে উঠে জল খাওয়া ভাল—এটাও একটা প্রচলিত ধারণা। এই ধারণার সপক্ষেই সব বিশেষজ্ঞরা বলেন। আমাদের শরীরে জলের অত্যন্ত প্রয়োজন। খাওয়ার অনেক পরে বিশেষতঃ শোবার আগে বেশ কিছুটা জল খাওয়া হজমের পক্ষে ভাল। পর্যাপ্ত জল পাকস্থলীতে থাকলে খাওয়ায় যদি কোন অম্ল বা বিষাক্ত কিছু সৃষ্টি হয়ে থাকে তাকে জলের মাধ্যমে কিছুটা লঘু করা সম্ভব। তাছাড়া হজমের ব্যাপারেও সুবিধা হয়। সকালে ঘুম থেকে উঠেই কিছুটা জল খেলে পাকস্থলীতে জলের আধিক্য হওয়ায় ভিতরের অংশ ধোওয়া বা পরিষ্কার হয়ে ধীরে ধীরে মলমূত্রের মাধ্যমে বেরিয়ে যায়। তাছাড়া সকালে ঘুম থেকে উঠেই জল খেলে মলমূত্রের জন্য চাপ সৃষ্টি হয় ও ভালভাবে পরিষ্কার হয়। প্রতিটি মানুষেরই উচিত বিভিন্ন সময়ে অনেকটা জলপান করা। এর ফলে শরীরের বিভিন্ন বর্জনীয় পদার্থ বেরিয়ে গিয়ে শরীরকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করে। এর ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়। পায়খানা ভাল হয়। ক্ষুধামান্দ্যও দূর হয়।

তবে খাওয়ার সময় জল খাওয়া কিন্তু ঠিক নয়। খাওয়ার ঠিক পরেও জল খাওয়া ঠিক নয়। খাওয়ার সময় জল খেলে পাকস্থলী থেকে নিঃসরিত হজমের পাচকরস নিঃসরণ লঘু হয়ে যায় এবং ভালভাবে হজম হয় না। পক্ষান্তরে যদি খাওয়ার আধঘণ্টা থেকে একঘণ্টা পরে জল খাওয়া যায় তবে এর মধ্যে খাদ্যগুলি ঘন পাচকরসে অনেকটাই হজম হয়ে যায়। তাছাড়া এই সময় হজমের জন্য অতিরিক্ত জলের প্রয়োজন নয়। এদিক থেকে খাওয়ার আগে জল না খেয়ে পরে খাওয়াই ভাল।

'মাংস খাওয়ার পর দুধ খাওয়া ঠিক নয়'—এর সপক্ষেই যুক্তি বেশী খাড়া করা যায়। মাংস খাওয়ার পর দুধ খেলে হজম ও পরিপাক ঠিকমতো না হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। কারণ স্টমাকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ক্ষরণ হয়, যা মাংসকে পাকস্থলীতে হজম হতে সাহায্য করে, তা দুধ খেলে কম বের হয়। সেজন্য মাংস খাওয়ার পর দুধ খেলে মাংস ঠিকমতো পরিপাক হতে নাও পারে।

'রাতে ফল, তেতো, টক, শাক খাওয়াও' ঠিক নয়। পেটের রুগীদের ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কারণ টক ও শাক অম্বল গ্যাসের প্রধান তোরণদ্বার।

অনেকের মতে রাতে কম খাওয়া ভাল। আমারও তাই মত। রাতে সাধারণতঃ লোকে ঘুমায়। ঘুমোবার সময় আমাদের মেটাবোলিজম্ কমে আসে। ফলে এনজাইম ও হজমের সুবিধার জন্য নিঃসরিত পাচকরসের পরিমাণ কমে যায়। সেজন্য হজমের সুবিধার জন্য রাতে অল্প খাওয়া ঠিক। শারীরিক পরিশ্রম বেশী হলে এনজাইম ও হজমের জন্য নিঃসরিত পাচকরসের পরিমাণ বাড়ে।

সবশেষে বলছি খাওয়া নিয়ে এই বিধিনিষেধগুলো অন্ধের মতো পালন না করে পরীক্ষা করে দেখা দরকার। এগুলো পরীক্ষা করাও তেমন কঠিন নয়। আমিই তো বহুদিন ধরে এর উপরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছি। তবে কিছু কিছু ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসতে গেলে আরও ব্যাপক আরও বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা-নিরীক্ষার দরকার। এজন্য বেশ কিছু বিজ্ঞানীকে একাজে এগিয়ে আসতে হবে। আর একটা জিনিস, কিভাবে কতটা করে খাওয়া উচিত তা প্রত্যেককেই ভালভাবে জানতে হবে।

দিনের বেলায় কিছু না কিছু শারীরিক পরিশ্রম হয়। ফলে পাচকরসের নিঃসরণের পরিমাণ বেশী থাকে দিনের বেলা। তাই দিনের বেলা বেশী খেলে ক্ষতি নেই। অবশ্য খুব বেশী

খাওয়া কখনোই ঠিক নয়। পাচকরসের সীমাবদ্ধতার কথা ভেবেই একথা বুঝতে নিশ্চয় অসুবিধে হওয়া উচিত নয়। তাছাড়া বেশী খেলে বেশী খরচ তো হবেই। আর খাওয়াটা, খিদেটা অভ্যাসের উপর নির্ভরশীল। সেজন্য অল্প অল্প খেলে প্রথমে খিদে পাবে এবং অন্য অসুবিধে হবে ঠিকই, তবে কিছুদিন বাদে এটা অভ্যেস হয়ে গেলে তখন আর কোনও অসুবিধে হবে না। পৃথিবীর একজন সেরা পুষ্টিবিদ্ তো দিনের মধ্যে মাত্র একবার খান। তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন—খিদেটা স্রেফ অভ্যেসের ব্যাপার। তাই দিনে একবার খেলেও তার কোন অসুবিধে হয় না। খিদে পায় না অন্য সময়, শরীরেরও ক্ষতি হয় না কিছু। কারণ শরীরের চাহিদা অনুসারে যত ক্যালরি খাদ্য খাওয়া দরকার—তা তিনি একবারেই খান। অবশ্য সবাই যে এভাবে একবারে বেশী খেতে পারবে—এটা ভাবাটা ঠিক নয়। তাই তারা দিনে দু-বার তিনবার খেয়ে থাকেন। তাছাড়া যারা গ্যাসের রুগী তাদের তো বারে বারে অল্প অল্প করে খাওয়াটাই ঠিক, পেট একেবারে ফাঁকা রাখা উচিত নয় কখনোই।

একজন মানুষের কত ক্যালরি খাদ্য গ্রহণ করা উচিত—এ নিয়েও তর্ক-বিতর্ক। বেশীর ভাগ ডাক্তারই এজন্য এক নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্যালরি খাদ্য গ্রহণ করতে বলেছেন। তবে কতটা পরিশ্রম করলে কত ক্যালরি খাওয়া উচিত—এটা আরও ভালভাবে জানার জন্য গবেষণা চলেছে। তবে আগেই বলেছি সব জিনিসটাই অভ্যেসের ব্যাপার। তাই কম ক্যালরি খাদ্য খেলে শরীরের ক্ষতি হবে—এরকম ভাবাটাও ঠিক নয়। অভ্যেস করে নিলে আমার মনে হয় কম ক্যালরি খাদ্য গ্রহণ করেও অনেকের স্বাস্থ্য বেশ ভাল থাকতে পারে, ভাল হতে পারে, যদি তার জেনেটিক চেহারা ভাল হয়। মানুষের চেহারার একটা ছক তার দেহের কোষের জিনের মধ্যে থেকে যায়। বেশীর ভাগ সাঁওতালের এজন্যই চেহারা বেশ ভাল হয়। এজন্যই কম ক্যালরি খাদ্য গ্রহণ করা সত্ত্বেও অনেক দরিদ্র পরিবারে ভাল স্বাস্থ্যের মানুষ দেখা যায়।

যে পাখিরা উড়তে পারে না

নারায়ণ চক্রবর্তী*

সেই তেরো কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগে ক্রেটাশাস মহাযুগে প্রথম পাখির আবির্ভাব হয়েছিল পৃথিবীতে। তারপর থেকে ক্রম-বিবর্তনের ফলে তাদের আকার, আকৃতি ও আয়তনের বিপুল পরিবর্তন হয়েছে, উদ্ভব হয়েছে হাজার হাজার প্রজাতির বিভিন্ন পাখির। পাখিদের ভেতর ছোট্ট চড়াই কি টুনটুনি যেমন আছে, তেমনি আছে ক্যালিফোর্নিয়ার প্রকাণ্ড কণ্ডর।

যদিও প্রায় সব পাখিই পাখা মেলে দিয়ে স্বচ্ছন্দে আকাশে উড়তে পারে, তবু পৃথিবীতে এমন কিছু পাখিও আছে, যারা পাখা থাকলেও উড়তে পারে না। অবশ্য তার কারণও আছে, এই সব না-ওড়া পাখিদের পূর্বপুরুষরা নিশ্চয়ই লক্ষ লক্ষ বছর আগে উড়ন্ত জীবন অপেক্ষা না-ওড়া জীবনই বেশী সুবিধাজনক বলে মনে করেছিল, তাই ব্যবহার না করার ফলে পাখা দুটি শক্তিহীন হয়ে গিয়েছিল। তাদের উত্তর পুরুষরা তাই আর উড়তেই পারে না। তবে তাদের পাখা দুটি একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি, সেই পাখাকে তারা অন্য কাজে লাগায়।

না-ওড়া পাখিদের ভেতরে প্রথমেই যে নামটি মনে ভেসে ওঠে তার নাম পেঙ্গুইন। পেঙ্গুইনরা থাকে দক্ষিণ মেরুতে, কুমেরু মহাদেশে এবং দক্ষিণ গোলার্ধের হিমমণ্ডলে। এদের পাখার পালকগুলি শক্ত বা আঁশের মত হয়ে গেছে, তাই চেষ্টা করলেও পেঙ্গুইনরা আর উড়তে পারে না। তবে বরফের মত ঠাণ্ডা জলে সাঁতার কাটবার সময়ে তারা এই শক্ত, মজবুত পাখা দুটিকে বৈঠার মত ব্যবহার করে। তা ছাড়া ঐ বৈঠার মত পাখা দুটি পেঙ্গুইনদের ডাঙার ওপর দিয়ে হাঁটতেও সাহায্য করে। ব্যবহার না করার ফলে পেঙ্গুইনদের পাখার আকারও বেশ ছোট হয়ে গেছে। পেঙ্গুইনরা ডাঙার চেয়ে জলেই বেশী স্বচ্ছন্দ। এদের মাথার আর পিঠের পালকের রঙ কালো, শরীরের সামনের দিকের পালকের রঙ প্রায় সাদা। এরা যখন দুই পায়ে দাঁড়িয়ে হেলে দুলে ডাঙার ওপর দিয়ে হেঁটে যায় তখন মনে হয় যে কালো সুট পরা কোনো ভদ্রলোক যেন গম্ভীর ভাবে হেঁটে যাচ্ছে। হাঁটেও ওরা খুব ধীরে ধীরে। পেঙ্গুইনরা হাঁসের মত মুখ গলা জলে ডুবিয়ে মাছ শিকার করে খায়, কখনো কখনো মাছের জন্য গভীর জলেও ডুব দেয়।

বর্তমানে পেঙ্গুইনদের প্রায় 20টি আলাদা আলাদা প্রজাতি দেখা যায়। চর্বির লোভে তিমি-মারা জাহাজগুলি প্রতি বছর বহু হাজার পেঙ্গুইন পাখি মেরে ফেলছে বলে এই অতি প্রাচীন পাখিদের লুপ্ত হয়ে যাবার আশংকা দেখা দিয়েছে।

পেঙ্গুইনরা অত্যন্ত নিরীহ প্রাণী, জন-সমাজ থেকে বহু দূরে বরফ-জমা ঠাণ্ডায় তারা দক্ষিণ গোলার্ধের কুমেরু মহাদেশে গ্যালাপাগো দ্বীপগুলিতে, দক্ষিণ-আমেরিকা, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণতম প্রদেশে বহু কাল ধরে শান্তিতে বসবাস করে আসছে। ঠিক কোন্ কারণে তারা উষ্ণ-শোণিত প্রাণী হয়েও হিম মণ্ডলকেই বাসস্থান হিসেবে বেছে নিল তার কারণ জানা

*MF/18, শিমুলগ্রাম, পোঃ—কুলটি, বর্ধমান

যাচ্ছে না বটে, তবে ভূতাত্ত্বিকদের অনুমান এই যে অতীত মেসোজোয়িক মহাযুগে, কিংবা তারও আগে কুমেরু মহাদেশ উষ্ণ মণ্ডলেই ছিল। পরবর্তী কালে মহাদেশীয় সঞ্চরণের তত্ত্ব অনুসারে কুমেরু গণ্ডোয়ানা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং ক্রমেই দক্ষিণ দিকে সরে যেতে থাকে। গণ্ডোয়ানাও টুকরো টুকরো হয়ে বিচ্ছিন্ন ভাবে উত্তর গোলার্ধের দিকে সরে যায়। আমাদের ভারতবর্ষও কুমেরু সংলগ্ন ছিল, ভারতবর্ষ সরে আসে উত্তর দিকে। কুমেরুর শিলার সঙ্গে বিজ্ঞানীরা দক্ষিণ-ভারতের শিলার মিল খুঁজে পেয়েছেন, তাই এই প্লেটটেক্টনিক তত্ত্ব এখন বেশ জোরদার হয়েছে।

যাই হোক, কুমেরু মহাদেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার সময়ে যে-সব প্রাণীরা কুমেরুতেই থেকে গেল, পেঙ্গুইনদের-পূর্বপুরুষরা তাদের অন্যতম। এখন অবশ্য ভয়ঙ্কর শীতের দেশে থাকবার জন্য পেঙ্গুইনদের কোনো কষ্টই হয় না। ওদের চামড়ার নিচে আছে পুরু চর্বির স্তর, তা ছাড়া গরম উলের মত ঘনবদ্ধ আঁশের পালকে সারা শরীর মোড়া থাকে বলে ওদের শরীর শীতের কামড় থেকে রক্ষা পায়। চর্বির স্তরকে ব্লাবারও বলে। ব্লাবার অপরিবাহী।

উড়তে না পারার জন্য কোনো দুঃখ নেই পেঙ্গুইনদের মনে। ওরা মানুষের মত খাড়া ভাবে হাঁটে। এমপারার পেঙ্গুইনরা তিন ফুট লম্বা হয়, তাই যখন তারা খাড়াভাবে ডাঙায় হাঁটে, তখন দূর থেকে মনে হয় যেন মানুষ হেঁটে যাচ্ছে। কয়েক প্রজাতির অবৈজ্ঞানিক সাধারণ নাম হচ্ছে জ্যাকাস, ম্যাগেল্লান, লিট্‌ল, গেনটু, অ্যাডেলি, রকহপার, এমপারার। এরা নানান দৈর্ঘ্যের হয়।

সাঁতার কাটবার সুবিধার জন্য পেঙ্গুইনদের শরীরটি বেশ মসৃণ, চকচকে আর স্ট্রিম লাইন করা। এদের শরীরের হাড়গুলি নিরেট, এবং উড়তে হয় না বলে তাতে বায়ু-থলি নেই। পেঙ্গুইনদের শরীরের চর্বির স্তর বা ব্লাবার থাকে তাদের শরীরের বহিরাবরণে, এই ব্লাবার তাপ-অপরিবাহী। পালকগুলি খুবই ঘনবদ্ধ ভাবে থাকে শরীরের একেবারে বাইরের দিকে। এই সব আঁশের মত পালক পেঙ্গুইনদের শরীর খুব ভাল ভাবে ঢেকে রাখে বলে শৈত্য প্রবেশ করতে পারে না।

পেঙ্গুইনদের পায়ের পাতার আঙুলে থাকে মধ্যবর্তী পাতলা সংযোজক চর্ম, একে বলে মধ্যচ্ছদা। তবে হাঁস যেমন পায়ের মধ্যচ্ছদার সাহায্যেই জলে সাঁতার কাটে, পেঙ্গুইনরা তেমনি ভাবে সাঁতার কাটে না, ওরা সাঁতার কাটে বৈঠার মত পাখা দুটির সাহায্যে, ওদের মধ্যচ্ছদাযুক্ত পা কাজে লাগে ডাঙায় হাঁটবার সময়ে। জলে ওদের গতি বেশ তীব্র, কিন্তু স্থলে তা মন্থর।

পেঙ্গুইনরা মাছ তো খায়ই, তা ছাড়াও খায় শক্ত খোলাযুক্ত প্রাণী বা ক্রাসটেশিয়ান,—যেমন আয়েস্টার, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি। তা ছাড়া স্কুইডও খায় এরা। বৈজ্ঞানিক বিচারে স্কুইড হচ্ছে সেফালোপড শ্রেণীর প্রাণী। এই সব খাদ্য দক্ষিণ গোলার্ধের হিম মণ্ডলের সমুদ্র জলে অঢেল পাওয়া যায়।

পেঙ্গুইনরা যূথচারী, অর্থাৎ দল বেঁধে থাকে। মেয়ে পেঙ্গুইনরা একবারে একটি মাত্র ডিম পাড়ে। পুরুষ পেঙ্গুইনও ডিমে তা দেয়, এবং ডিম ফুটে বাচ্চা বার হবার পর মেয়ে-পেঙ্গুইনের মতই বাচ্চাকে যত্নের সঙ্গে বড় করে তোলে। মিলনের আগে সঙ্গিনী নির্বাচনের সময়ে দুটি পুরুষ পেঙ্গুইনের ভেতরে বিলক্ষণ মারামারি বেধে যায়, শুভ্র তুষার রক্তরঞ্জিত হয়। বিজয়ী পুরুষ পেঙ্গুইন নির্বাচিত সঙ্গিনীকে নিয়ে বরফের ফাটলে ঘর বাঁধে।

বর্তমান যুগে যে সব উড়তে না পারা পাখিদের দেখা যায়, তাদের ভেতরে বৃহত্তম পাখি হচ্ছে আফ্রিকা মহাদেশের অস্ট্রিচ পাখি। মাটি থেকে মাথা পর্যন্ত ওদের উচ্চতা হচ্ছে আট ফুট

এমপারার পেঙ্গুইন

এবং মাটি থেকে ওদের পিঠ পর্যন্ত উচ্চতা হচ্ছে প্রায় পাঁচ ফুট। অস্ট্রিচ পাখিরা যখন দ্রুত দৌড়াতে চায়, তখন বাতাসের আনুকূল্য পাবার জন্য ডানার যেটুকু অবশিষ্ট আছে তা ছড়িয়ে দেয় পালের মত বাতাস ধরবার জন্য। দৌড়াবার সময়ে অস্ট্রিচরা খুব লম্বা লম্বা পা ফেলে। ওদের পায়ে এতই জোর যে পাশের দিকে লাথি মেরে যে কোনো লোকের পায়ের হাড় ওরা অনায়াসে ভেঙ্গে দিতে পারে। তাড়া করলে ধরা পড়বার ভয়ে অস্ট্রিচরা বালুতে মুখ ও মাথা গুঁজে লুকিয়ে থাকে বলে যে সব গল্প প্রচলিত আছে, তা কিন্তু নিছক গল্পই, এর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। অত বুদ্ধিহীন নয় এই বৃহৎ পাখিরা। অস্ট্রিচকে অনেকে বাংলায় উটপাখি বলেন।

অস্ট্রিচ পাখির লেজ আর পাখার পালকগুলি খুব সুন্দর দেখতে, আর খুব মূল্যবানও। তাই আফ্রিকায় অনেকে অস্ট্রিচের পোলট্রি ফার্ম তৈরি করে অস্ট্রিচ পোষেন, ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা তৈরি করেন। বড় পাখির লেজ আর পাখার প্রান্ত থেকে হিসেব করে পালক কেটে নিলে পাখিরা ব্যথা পায় না। পাশ্চাত্য দেশে ঐ সব সুন্দর পালক খুব চড়া দামে বিকোয়।

স্বাধীন, মুক্ত অস্ট্রিচদের তুলনায় অস্ট্রিচ ফার্মের পাখিরা অনেক ভাল খাবার খেতে পায়। মুক্ত, স্বাধীন অস্ট্রিচরা সব রকমের খাদ্যই খায়—ওরা সাপ খায়, গিরগিটি-টিকটিকি খায়,

ছোট ছোট জন্তুদের ধরে খায়, আর খায় পাখি ও পোকামাকড়। তা ছাড়া এই পাখিরা সব্জিও খায়। তাড়াতাড়ি হজম করবার জন্য অস্ট্রিচরা মুরগীর ডিমের মত বড় বড় পাথর, নুড়ি ইত্যাদিও গিলে খায়।

মেয়ে-অস্ট্রিচরা ডিম পাড়ে বালুতে গর্ত করে তার ভেতরে। ডিম পাড়া হয়ে গেলে তারা সেই ডিম বালি দিয়ে ঢেকে দেয়, ঐ বালু ঢাকা গর্তই হল অস্ট্রিচদের নীড়। দিনের বেলা ঐ সব ডিমে তা দেয় আফ্রিকার উষ্ণ সূর্যকিরণ, আর রাতে ডিমে তা দেয় মা আর বাবা অস্ট্রিচ। দিনের বেলা তা না দিলেও স্ত্রী আর পুরুষ অস্ট্রিচ ডিমের ওপর কড়া নজর রাখে।

অস্ট্রিচ পাখির গলা আর পা খুব লম্বা, পায়ে বাঁকানো নখর যুক্ত থাবা আছে। পাখা আর লেজ বেশ ছোট। অস্ট্রিচরা দারুণ জোরে দৌড়াতে পারে,—দৌড়ের প্রতিযোগিতায় ওরা ঘোড়ার চেয়ে কম যাবে না।

মুক্ত, স্বাধীন অস্ট্রিচরা যূথচারী, অর্থাৎ দল বেঁধে থাকে। 30টি কিংবা তারও বেশী অস্ট্রিচ এক সঙ্গে দল বেঁধে থাকে। তারা মরুভূমির শুষ্ক জলবায়ুতে জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত। জঙ্গলে এদের জেব্রা ও কৃষ্ণসার মৃগের যূথের সঙ্গে দল বেঁধে ঘুরতে দেখা যায়।

অস্ট্রিচরা তাদের ছোট পাখা দুটি ভাঁজ করে রাখে দৌড়াবার সময়ে, তবে হাওয়ার আনুকূল্য পাবার জন্য ভাঁজ খুলে পালের মত মেলেও দেয়। আবার দৌড়াতে দৌড়াতে হঠাৎ থামবার দরকার হলেও ওরা পাখা দুটি মেলে দেয়, তখন ঐ পাখা ব্রেকের কাজ করে।

অস্ট্রিচদের দুটি আঙুলে যে তীক্ষ্ণ বাঁকানো নখর আছে তাদের সাহায্যে আত্মরক্ষা করে ওরা। ওদের লম্বা সরু গলা পালক দিয়ে ঢাকা থাকে না, ন্যাড়া ন্যাড়া। ওদের ঠোঁট গোলাকার এবং মুখের অনেকটা জায়গা জুড়ে থাকে। চোখ দুটি বেশ বড় বড়, চোখের পাতায় পক্ষ্ম আছে। শরীরের তুলনায় ওদের মাথা বেশ ছোট এবং চ্যাপ্টা ধরণের। অস্ট্রিচদের লম্বা পায়েও পালক থাকে না। লম্বা হলেও পা দুটি খুবই মজবুত এবং শক্তিশালী। ওদের লেজের দিকে পালকের স্থানে আছে ছোট ছোট লেজ আচ্ছাদন,—অনেকটা মোরগের লেজ-আচ্ছাদনের মত।

স্ট্রুথিওনিফরমেস বর্গের অস্ট্রিচ পাখিদের আফ্রিকা মহাদেশ এবং আরব দেশে দেখা যায়। এদের উচ্চতা প্রায় 280 সেন্টিমিটার হয় এবং ওজন হয় 345 পাউণ্ড। জীবিত অস্ট্রিচদের ভেতরে এই বর্গের পাখিরাই আকারে বৃহত্তম বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। স্ট্রুথিওনিফরমেস বর্গে একটি মাত্র প্রজাতিই আছে, তার পুরো বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে স্ট্রুথিও ক্যামেলো (Struthio camelo)।

তারায় তারায় : রাশি বৃশ্চিক

অরূপরতন ভট্টাচার্য*

তারায় তারায় আকাশে যত সুন্দর ছবি ফুটে ওঠে, তার মধ্যে দেখে খুশি হওয়ার মত একটা তারকাচিত্রের নাম বৃশ্চিক। ইংরেজীতে একে বলা হয় স্করপিয়াস (Scorpius)।

আকাশের গায়ে ঠিক যেন একটা বৃশ্চিক বা বিছে। দেখতে চিনতে ভুল হওয়ার কোনো কারণ নেই। পশ্চিমদিকে তার হুল দুটি, লেজের দিকটি নেমে গেছে দক্ষিণ হয়ে পূর্বদিকে। উজ্জ্বল তারা মিলে বৃশ্চিক অপরূপ, কখনোই তাকে না চেনার মত নয়।

অনেকগুলি তারা মিলে তারকার যে চিত্ররূপ, তাকে বলা হয় তারকামণ্ডল। বৃশ্চিক একটি তারকামণ্ডল, কিন্তু সে একটি রাশিও। আকাশে এরকম রাশির সংখ্যা বারো। বৃশ্চিক সংখ্যায় আট নম্বর। সূর্য আকাশে তারকাদের পটভূমিতে পশ্চিম থেকে পূর্বদিক দিয়ে একটা নির্দিষ্ট পথে প্রায় 365 দিনে এক পাক দিয়ে আসে। এই পথের উপরেই আছে বারোটা রাশি সমান দূরে দূরে। ঘড়িতে 1 থেকে 12 পর্যন্ত বারোটা অঙ্ক যেমন বসানো থাকে সমান ব্যবধানে, আকাশে সূর্যের এক বছরের ঘুরে আসার পথে রাশিরা আছে ঠিক তেমন ভাবেই।

আকাশে বৃশ্চিক রাশির মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল তারকা হচ্ছে জ্যেষ্ঠা। আকাশে খালি চোখে দেখা যায় যত তারকা, ঔজ্জ্বল্যের দিক দিয়ে তাদের বিভিন্ন মাত্রায় ভাগ করা হয়। প্রথম মাত্রায় আছে কুড়িটি তারকা। এদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা সপ্তদশ। তারাটির বিদেশী নাম অ্যানটারেস (Antares)। এটিকে বলা হয় নক্ষত্রকুলের দানব। সূর্যের তুলনায় ব্যাসের দিক দিয়ে 300 গুণ বড়।

জ্যেষ্ঠা শুধু একটা তারা নয়, এর নামে একটা নক্ষত্রও আছে। নক্ষত্র কাকে বলে?

সূর্যের চলার পথের উপরে যেমন বারোটা রাশি, তেমনি তারকাদের পটভূমিতে চাঁদের একটা আবর্তন পথ আছে—তাতে আছে 27টি নক্ষত্র। আমাদের জন্ম মুহূর্তের সঙ্গে কোনো না কোনো নক্ষত্রের সম্পর্ক আছে। চাঁদের আবর্তন পথ 27

* 103/E, কাঁকুলিয়া রোড, কলিকাতা-700029

দিনের বলে সবশুদ্ধ নক্ষত্রের সংখ্যা ধরা হয়েছে 27। তাহলে সূর্যের বার্ষিক চলার পথের উপরে 12 রাশি আর চাঁদের
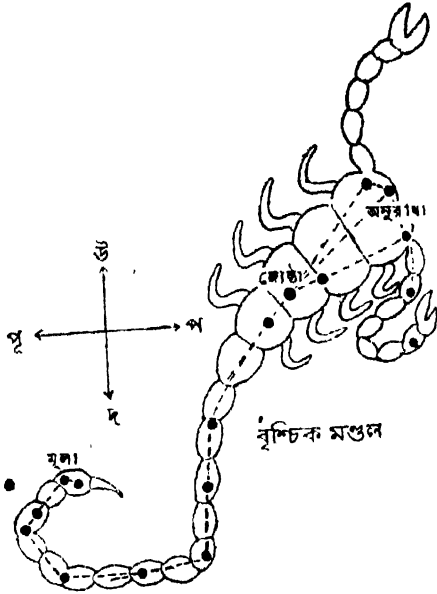
চলার পথে 27 নক্ষত্র। এই রাশি আর নক্ষত্রের তারা কিন্তু আলাদা নয়। চাঁদের পথ আর সূর্যের পথ কাছাকাছি বলে রাশির তারার সঙ্গে নক্ষত্রের তারার মিল আছে।

তাই বৃশ্চিক রাশির সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাটি নিয়ে গড়ে উঠেছে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র। জ্যেষ্ঠা অ্যানটারেস, অর্থ Rival of Mars বা মঙ্গলের প্রতিদ্বন্দ্বী। মঙ্গলের রং আর আকৃতির মিল আছে বলেই এ রকম নাম।

জ্যেষ্ঠা কোনটি ?

ছবি দেখলে নিশ্চয়ই তা বোঝা যাবে।

তা ছাড়া বৃশ্চিকের আরও দুটি তারা নিয়ে আরও দুটি নক্ষত্র অনুরাধা আর মূলা। অনুরাধা সপ্তদশ, জ্যেষ্ঠা অষ্টাদশ, মূলা উনবিংশ নক্ষত্র।

বৃশ্চিক রাশিটিকে দেখা যায় দক্ষিণের আকাশে, অনেক দক্ষিণ চেপে। আষাঢ়ের সন্ধ্যায় সে পূর্ব দিক ঘেঁষে কিন্তু শ্রাবণের সন্ধ্যার দিনগুলিতে তাকে সরাসরি দক্ষিণেই দেখা যাবে।

কি ভাবে মেলাবে ? দেখো, ছবিতে পূর্ব পশ্চিম আছে উল্টোভাবে। ঠিকভাবে মিলিয়ে নেবার সময়ে তারার ছবিকে মাথার উপরে তুলে ধরতে হবে নীচের দিকে রেখে। খেয়াল রেখো, উত্তর দক্ষিণ যেন দিক বজায় রাখে। পূর্ব পশ্চিম মিলে যাবে আপনা থেকেই।

উট-কাহিনী

সুজিতকুমার নাহা*

উটের আকৃতি নয়নসুখকর, এমন কথা বোধ হয় কেউই বলবে না। ধূসর গাত্রবর্ণ, প্রকাণ্ড কুঁজ, বেঢপ লম্বা গলা, চ্যাপ্টা নাক—সব মিলিয়ে কেমন যেন কিম্ভূতকিমাকার চেহারা! চেহারা যাই হোক, প্রচণ্ড গরম আবহাওয়ার মধ্যেও বহুক্ষণ একটানা মাল বইবার কাজে উটের জুড়ি মেলা ভার। এই কারণে, মরুভূমিতে মাল ও লোকজন পরিবহন করবার 'চাকরি' উটদের জন্য একদম বাঁধা! উট মরু-অঞ্চলের বাসিন্দা। পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার মরুভূমিতে এদের দেখতে পাওয়া যায়।

কুঁজ দিয়ে যায় চেনা

শিকারী বেড়াল নাকি চেনা যায় গোঁফ দেখে। আমি মার্জার বিশেষজ্ঞ নই, কাজেই গোঁফ-সংক্রান্ত এই ব্যাপারটি কতদূর ঠিক তা বলতে পারব না। তবে কুঁজ দেখে কিন্তু উটের স্বাস্থ্য ও ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। আসলে, উটের কুঁজ সঞ্চিত চর্বির একটা প্রকাণ্ড ডেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। খাবার-দাবার যখন বেশ সহজলভ্য তখন চর্বি জমা হয়ে কুঁজ বেশ বড়সড় আকার ধারণ করে। যখন খাদ্য হয় দুর্লভ, এই সঞ্চিত চর্বিই বাঁচিয়ে রাখে উটকে। এভাবে কিছুদিন চলতে থাকলে ধীরে ধীরে কুঁজ চুপসে ছোট হয়ে যায়। কাজেই কুঁজের আকৃতি থেকে উটের শরীর ও ক্ষমতার আভাষ পাওয়া যায় বৈকি!

আমরা সচরাচর যে উটদের দেখি তাদের সবেধন নীলমণি একটিই কুঁজ। আফ্রিকার উটেদের কিন্তু আছে দুটি কুঁজ। এরা ব্যাকট্রিয়ান (Bactrian) উট নামে পরিচিত। এক কুঁজওয়ালাদের বলা হয় অ্যারাবিয়ান (Arabian) উট, এরা এশিয়ার বাসিন্দা।

সঞ্চয় নয়, সংরক্ষণ

বেশ কিছুদিন একবিন্দু জলগ্রহণ না করেও উটের বেঁচে থাকতে পারার বিস্ময়কর সামর্থ্যের কথা সর্বজনবিদিত। কীভাবে

* 23/1, কালীচরণ দত্ত রোড, কলকাতা-700 061

এটা সম্ভব হয়? আগে এই ব্যাপারে কিছু ভুল ধারণা প্রচলিত ছিল। অনেকে মনে করতেন উটের পাকস্থলীতে আছে আলাদা একটা প্রকোষ্ঠ যার মধ্যে উট জল জমিয়ে রাখে। আবার এরকম একটা ধারণাও ছিল যে উট কুঁজের মধ্যে জল সঞ্চয় করে রাখে। বলা বাহুল্য, এই ধারণাগুলোর কোনটাই ঠিক নয়।

আসলে, দেহের মধ্যে কোন বিশেষ প্রকোষ্ঠে উট জল সঞ্চয় করে রাখে না। তবে জলের ব্যাপারে ওরা ভীষণ কৃপণ; দক্ষতার সঙ্গে করে জলের সংরক্ষণ (conservation)। ব্যাপারটা একটু ব্যাখ্যা করে বলা যাক।

প্রধানতঃ তরল বর্জ্য পদার্থের সঙ্গে এবং ঘর্মের আকারে জল দেহের বাইরে বেরিয়ে যায়। এই ঘাটতি পূরণ করবার জন্যই জল পান করতে হয়। যদি কোন উপায়ে দেহের এই জলক্ষয় বেশ কিছুটা কমিয়ে ফেলা যায় তবে কয়েকদিন জল পান না করেও চালিয়ে দেওয়া যেতে পারে বৈকি! উটদের বৃক্ক (kidney) আশ্চর্যরকমের কর্মদক্ষ। ওদের বৃক্ক যে মূত্র তৈরি করে তার মধ্যে ইউরিয়া (urea) থাকে যথেষ্ট গাঢ় (concentrated) অবস্থায়। কাজেই তুলনামূলক ভাবে অল্প জল ক্ষয় করেই উট বিষাক্ত ইউরিয়া শরীর থেকে বের করে ফেলতে সক্ষম। উটদের আরও একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উট দেহের তাপমাত্রার কিছুটা হেরফের ঘটিয়ে ঘর্মজনিত জলক্ষয় বহুলাংশে কমিয়ে ফেলতে পারে।

এছাড়া অন্য একটি উপায়ে উট জল-সমস্যার কিছুটা সুরাহা করে থাকে। সাধারণতঃ সব মরুচারী প্রাণীরাই তাদের খাদ্যের মধ্যে সংযুক্ত হাইড্রোজেনের জারণ থেকে কিছুটা জল পেয়ে থাকে। খাদ্য প্রধানতঃ তিন রকমের—প্রোটিন, স্নেহজাতীয় বা ফ্যাট, এবং কার্বোহাইড্রেট। এই তিন প্রকারের খাদ্যের মধ্যে স্নেহজাতীয় খাদ্য থেকেই তুলনামূলক ভাবে মেলে বেশী জল। খাদ্য না মিললে উট কুঁজে সঞ্চিত চর্বি ব্যবহার করে বেঁচে থাকে। চর্বি হচ্ছে স্নেহ-জাতীয় পদার্থ। কাজেই এই চর্বির থেকেও কিছুটা জল উট পেয়ে থাকে।

একেবারে একশো লিটার!

দেখা গেছে একটি তৃষ্ণার্ত উট একসঙ্গে 25 গ্যালনের (প্রায় 114 লিটার) মত জল পান করতে পারে। এই জল দেহকোষ (cell) ও তন্তুতে (tissue) সঞ্চালিত হয়। শারীরবৃত্তিক প্রয়োজনের সময় আবার এখান থেকেই জল নেওয়া হয়ে থাকে। কয়েকদিন জল না পাওয়া গেলে দেহাভ্যন্তরস্থ জল ধীরে ধীরে ব্যবহারের ফলে উটের ওজন বেশ কমে যায়। যখন জল পাওয়া যায় তখন জল পান করে মাত্র দশ মিনিটের মধ্যেই উট দেহের ওজনের এই ঘাটতি পূরণ করে ফেলতে পারে।

স্থলচর 'জাহাজ'

সমুদ্র পাড়ি দিতে যেমন প্রয়োজন হয় জাহাজের, মরুভূমি পরিক্রমা করতে ঠিক তেমনিই দরকার উটের। বালির 'সমুদ্রে' চলবার জন্য উটের দেহ যেন অর্ডার দিয়ে তৈরী! বালিতে যাতে ডোবে না যায় এজন্য পায়ের পাতা (sole) চওড়া, চ্যাপ্টা ও পুরু। বাতাসের সঙ্গে বালির কণা যাতে সহজেই ঢুকতে না পারে সেজন্য নাসারন্ধ্র লম্বালম্বিভাবে কাটা (slit-like), অন্যান্য প্রাণীর মত গোল নয়। তীব্র দাবদাহের মধ্যেও ঘন ঘন জল খাবার বায়নাক্কা একদম নেই। মরুভূমির প্রচণ্ড প্রতিকূল অবস্থায়ও উট 250 কিলোগ্রাম মাল নিয়ে দিনে প্রায় 50 কিলোমিটার পাড়ি দিতে পারে স্বচ্ছন্দে। ব্যাকট্রিয়ান শ্রেণীর কিছু উট আরও বেশী মাল (450 কিলোগ্রাম) বহন করতে সক্ষম।

এত যার গুণ, সেই উটই কিন্তু রেগে গেলে হয়ে পড়ে রীতিমত বিপদজ্জনক! ভীষণভাবে লাথি মারতে পারে বা সাংঘাতিকভাবে কামড়ে দিতে পারে সেই অবস্থায়!

ভেবে উত্তর দাও

কিশোরীমোহন দত্ত*

[নীচের শূন্যস্থান পূরণ কর। প্রতিটি প্রশ্নের নীচে তিনটি করে সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া আছে, তার ভেতর থেকেই সঠিক উত্তর বার করে নিতে হবে।]

1. মানুষের মাথার খুলিতে —— টি হাড় থাকে।
   (ক) 28 (খ) 30 (গ) 25
2. ভিটামিন 'A' এর অভাব —— হওয়ার কারণ।
   (ক) রাতকানা, (ঘ) চামরা অনুজ্জ্বল, (গ) টাক।
3. জিভের —— দিয়ে আমরা মিষ্ট স্বাদ গ্রহণ করি।
   (ক) পাশ, (ঘ) পিছন, (গ) আগা (Tip)।
4. ম্যালেরিয়া প্যারাসাইটের আবিষ্কর্তা ——।
   (ক) আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং, (খ) এ, করনর্বাগ, (গ) রোনাল্ড রস্।
5. মানুষের বৃহত্তম দেহযন্ত্র ——।
   (ক) বৃহদন্ত্র, (খ) যকৃৎ, (গ) হৃৎপিণ্ড।
6. পাগলা কুকুরের কামড়ে —— হতে পারে।
   (ক) ডিপথেরিয়া, (খ) পাইওরিয়া (গ) হাইড্রোফোবিয়া (জলাতঙ্ক)।
7. —— সবচেয়ে বড় মস্তিষ্কযুক্ত প্রাণী।
   (ক) হাতি, (ঘ) মানুষ, (গ) তিমিমাছ।
8. —— আমাদের তৃষ্ণা নিয়ন্ত্রণ করে।
   (ক) মেডুলা, (খ) গুরুমস্তিষ্ক অঞ্চল, (গ) হাইপোথ্যালামাস।
9. —— ডাল নিয়মিত ব্যবহারে নিম্নাঙ্গে পক্ষাঘাতের কারণ।
   (ক) ছোলা, (খ) মটর, (গ) খেসারী।
10. রঞ্জেন রশ্মির আবিষ্কর্তা, উইলহেম কনর‍্যাড রণ্টজেন জাতিতে ——।
   (ক) আমেরিকান, (খ) জার্মানী, (গ) ইংরাজ।

[সঠিক উত্তর পাঠাতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।]

* ১ ওল্ড পোস্ট অফিস লেন, পোঃ রাণাঘাট, নদীয়া

মে '83 মাসের 'ভেবে উত্তর দাও'-র উত্তর

1. (c) রাতকানা 2. (d) খাদ্যে আয়োডিনের ঘাটতি 3. (a) অ্যাস্কর্বিক অ্যাসিড 4. (b) লামার্ক 5. (c) গ্লাইকোজেন রূপে 6. (a) পিটুইটারী 7. (b) নেপেনথিস।

মে '83 সংখ্যার 'ভেবে উত্তর দাও'-র সঠিক উত্তরদাতাদের নাম

সবগুলি—সর্বাণী, দেবজ্যোতি, দীপক, ছন্দা ষড়ঙ্গী কাঁথি, শরণকুমার ঘোষ কাঁচরাপাড়া, পরিমল আদক আনন্দনগর, সন্দীপ দত্ত শ্রীরামপুর, চন্দনকান্তি মুখোপাধ্যায় ঝাড়গ্রাম, মানস পাত্র আমতা, রূপালী ব্যানার্জী কোন্নগর, সৌরি ঘোষ, বারাসত, রীতা, দেবজিৎ, দেবাশীষ চ্যাটার্জী বজবজ, নন্দিতা সাহা চাকদা, সেবাগ্রাম, মনোজ দাস চাকদহ, নদীয়া, সুদীপ মণ্ডল বাওয়ালী, শর্মিলা মাজি দুর্গাপুর, ভাস্করজ্যোতি পাল রিষড়া, রতন গাঙ্গুই কলিকাতা, মৃদুলকুমার সাউ মীরগোদা, তপনকুমার দাশ ও দিপালী ঘোষ, চালুয়ারী, দিব্যেন্দু দাস কলিকাতা-54, জয়ন্ত ও প্রশান্ত ঘোষ সালতিয়া, দেবজ্যোতি ও ধূর্জটি মুখার্জী কলিকাতা-30, উৎপল ও সন্তোষ বিশ্বাস পাঁচপোতা, জ্যোৎস্না রায় বাওয়ালী, বিদ্যুৎ মুখোপাধ্যায় সুখচর, দীপায়ন ও শুভ্র চক্রবর্তী বারুইপুর, গৌতম সাহা দুর্গাপুর-5, দিব্যেন্দু কুণ্ডু মনসাতলা লেন, জয়দীপ মুখোপাধ্যায় হুগলী, বিশ্বজিৎ সাহা কলিকাতা-67, কেয়া ভট্টাচার্য হাবড়া, বিপ্লব চৌধুরী গারুলিয়া, লোকনাথ বাগ আবুঝহাটি বর্ধমান, আশাবরী ঢোল দুর্গাপুর, মোহনলাল বিষয়ী মেমারী, পার্থপ্রতিম গাঙ্গুলী চুঁচুড়া, মানসকুমার দাস লাভপুর, দীপঙ্কর বারিক প্রতাপদিঘি, অনিমেষ চ্যাটার্জী কীর্ণাহার, গোপিকারঞ্জন মুখোপাধ্যায় অবিনাশপুর, মানসী ও চন্দন মাইতি এগরা, গৌতম জানা বাগনান, বিশ্বজিৎ ও নিশ্চয় ভট্টাচার্য শিবতলা, রাজু, সুমিতা, সঞ্চিতা ও দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় গোপালপুর, চৈতালী ঘোষাল খড়দহ, কৃষ্ণেন্দু ও শীর্ষেন্দু মাইতি কলিকাতা-29, শুক্লা দত্ত সোদপুর, প্রভাত প্রামাণিক, বটতলা, সৈয়দ আব্দুল ও কাশিম পানাগড় বাজার, শাশ্বতী দাশ রঘুনাথ নগর, মীরা ভট্টাচার্য কলিকাতা-14, শম্পা ভট্টাচার্য কলিকাতা-61, সুদীপকুমার চক্রবর্তী সিঙ্গুর, বুবা, বুলি, রাজু ও রুণু কলিকাতা-2

শব্দ-শৃঙ্খল

সুব্রত ভট্টাচার্য*

সংকেত :—

উপর থেকে নীচে :—

1. একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস
3. সমুদ্র-জল থেকে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।
4. ম্যালেরিয়ার মহৌষধ
6. ঘ্রাণেন্দ্রিয়
8. অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারক
9. চাষের জমির উর্বরতা বর্ধক
11. বহুরূপ বিশিষ্ট মৌল
13. মাটির অভ্যন্তরে প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার
16. এক্স-রশ্মির আবিষ্কারক
17. কলেরার জীবাণুর আবিষ্কারক।

পাশাপাশি :—

1. বাহুর অস্থি বিশেষ
2. পৃথিবীর সবথেকে উন্নত প্রাণী
5. মানবদেহের বৃদ্ধির জন্য বিশেষ প্রয়োজন
7. ভারতের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র
9. ডুবোজাহাজ
10. রাজা অসুখ
12. ফটোফিল্ম আবিষ্কারক
14. মহাকাশে প্রথম জীবন্ত প্রাণী

1		6	X	4	X	X	2	3	
	X		X	7			X		X
	X		X		X	X	8	X	17
X	X	X	X	12				X	
9					X	X		X	
	X	X	X	X	5			X	
X	10			16	X	X	X	X	
X	X	X	X		X	14		11	X
X	13	X	X		X	X	X		X
15					X	18			X

15. আলেকজাণ্ডার আবিষ্কৃত অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ
18. পরমাণুর কেন্দ্রে অবস্থিত পরা-তড়িৎধর্মী ক্ষুদ্রতম কণা।

* 2/1, মাঝের পাড়া লেন, ঠাকুরপুকুর, কলিকাতা-63

মে '83 সংখ্যার 'রসায়নের শব্দকূটে'র সমাধান

সমাধান :—

পাশাপাশি :

1. KCN, 5. HOOH (H_2O_2), 6. H_2O, 8. NaCl, 10. ZnO, 11. HCl, 12. SO_2.

উপর-নীচে :

1. KOH, 2. COOH, 3. NH_2, 4. HCHO, 5. HO (OH^-), 7. NO_2, 8. NaH, 9. Cl_2, 10. ZnS.

X	1 K	2 C	3 N	X	4 H
5 H	O	O	H	X	C
O	6 H	O	H	X	H
X	X	H	X	7 N	O
8 Na	9 Cl	X	10 Zn	O	X
11 H	Cl	X	12 S	O	O

মে '83 মাসের 'রসায়নের শব্দকূটে'র সঠিক উত্তরদাতাদের নাম

রবিশঙ্কর দাস, বারাসাত, সন্দীপ ভট্টাচার্য, ভাটপাড়া, টুলী, তপনকুমার দাশ ও দিপালী ঘোষ চালুয়ামুড়ী, অভিজিৎ
সুশান্তকুমার পাল, কল্যানগ্রাম, যমুনা ও অনুসীমা শীল গোয়াল- ও সর্বজিৎ দত্ত, হুগলী

প্রশ্ন ও

প্রশ্ন :

1. মৌমাছি ওড়বার সময় আমরা গুনগুন শব্দ শুনতে পাই ; এটা এদের গান না অন্য কিছু ?
2. লাল ফুল সমেত একটি গাছকে যথাক্রমে লাল, নীল ও সবুজ আলোতে আলোকিত করলে, পাতা এবং ফুলগুলিকে কেমন দেখাবে ?
3. কোন্ কোন্ করোটি স্নায়ুগুলি সিমপ্যাথেটিক তন্ত্রের অন্তর্গত ?

হেমন্তকুমার কোলে, আলিপুর, হুগলী

উত্তর :

1. মৌমাছি ওড়বার সময় তার ডানাদুটিকে অতি দ্রুত উপর-নীচে আন্দোলিত করে। এর ফলে ডানার নিকটস্থ বায়ুতে ঘনীভবন ও তনুভবনের সৃষ্টি হয় এবং বায়ুতে কম্পাঙ্কের তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। এই তরঙ্গই আমরা গুনগুন শব্দ রূপে শুনতে পাই।

3. লাল ফুল সমেত গাছটিকে লাল আলোতে আলোকিত করলে পাতাগুলি লাল আলো শোষণ করে নেবে, ফলে পাতাগুলি কালো দেখাবে। ফুলগুলি ঐ আলো শোষণ না করে প্রতিফলিত করবে। সুতরাং ফুলগুলির রঙের কোন পরিবর্তন হবে না।

ঐ গাছকে নীল আলোতে আলোকিত করলে পাতা এবং ফুল উভয়েই নীল আলো শোষণ করে নেবে, ফলে উভয়কেই কালো দেখাবে।অবশেষে গাছটিকে সবুজ আলোতে আলোকিত করলে পাতাগুলি আলো শোষণ করতে পারে না, ফলে প্রতিফলিত হয়ে যায়। সুতরাং পাতার রঙের কোন পরিবর্তন হবে না। কিন্তু ফুলগুলির রঙের অবশ্যই পরিবর্তন ঘটবে। লাল ফুলগুলি সবুজ আলো শোষণ করবে, কারণ লাল ফুল লাল আলো ছাড়া অন্য সমস্ত রঙের আলোকে শোষণ করবে। সুতরাং ফুলগুলি থেকে কোন আলো এসে আমাদের চোখে প্রবেশ করতে পারবে না এবং আমরা ফুলগুলিকে কালো দেখবো।

3. কোন করোটি স্নায়ুই সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রের অন্তর্গত নয়। কারণ সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুগুলির উৎপত্তি বক্ষ ও নিতম্বের (thoracic-lumber) সুষুম্না কাণ্ড (spinal cord) থেকে হয়।

[প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছেন বিদ্যুৎকুমার মেন্দা]

পরিষদ সংবাদ

বিশ্ব পরিবেশ দিবস

গত 5ই জুন '82 পরিষদ ভবনে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি ডঃ সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন শ্রীশিবচন্দ্র ঘোষ, ডঃ রতনমোহন খাঁ, ডঃ জয়ন্ত বসু প্রমুখ। শ্রীঘোষ পরিবেশ দূষণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। ডঃ খাঁ বিশ্ব পরিবেশ দিবসের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। ডঃ বসু আমাদের দেশের পরিবেশ দূষণের কারণগুলি সম্পর্কে আলোচনা করেন, মানবসভ্যতায় বিজ্ঞানের অবদান সম্পর্কে অবহিত করেন এবং এই বিজ্ঞানকে যারা ধ্বংস ও পরিবেশ দূষণের কাজে লাগাচ্ছে—তাদের তিনি সমালোচনা করেন। পরিষদের কর্মসচিব ডঃ সুকুমার গুপ্ত উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশের পরিবেশ দূষণের পার্থক্যটি দেখিয়ে বলেন—উন্নত দেশগুলি চিন্তা করছে—পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তা থেকে পরিবেশকে কিভাবে রক্ষা করা যায়, কিভাবে সমুদ্রের জলকে দূষণমুক্ত এবং ওজোনোস্ফিয়ারকে রক্ষা করা যায়। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশ প্রাথমিক দূষণ থেকে এখনও মুক্ত হতে পারে নি, আজও খাদ্যে, ওষুধে ভেজাল দেওয়া হচ্ছে, যথেচ্ছ বৃক্ষ ও বন্যপ্রাণী ধ্বংস হচ্ছে, দেশের বেশীর ভাগ মানুষ এখনও দারিদ্র সীমার নীচে—দারিদ্রই পরিবেশ দূষণের মূল কারণ। এই দূষণ থেকে এখনও যখন আমরা মুক্ত হতে পারি নি, তখন বিশ্ব পরিবেশ দিবস একদিন পালন করেই আমাদের কর্তব্য শেষ হবে না—প্রতিদিনই আমাদের পরিবেশ দিবস পালন করা উচিত। সভাপতি ডঃ করমহাপাত্র তাঁর নাতিদীর্ঘ ভাষণে পরিবেশ দিবসের কুফলগুলি আলোচনা করেন।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে পরিষদ ভবনে (পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-6) একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। বিতর্কের বিষয়বস্তু : 'বিজ্ঞানের অগ্রগতি পরিবেশ দূষিত করছে'। প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পক্ষে ও বিপক্ষে একজন করে (মোট 2 জন) প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে। 1ম, 2য়, 3য় স্থানাধিকারীকে পুরস্কার প্রদান করা হবে। এছাড়া সান্ত্বনা পুরস্কার প্রদান করা হবে। 31শে অগাস্ট (1983) নাম পাঠাবার শেষ তারিখ। শিক্ষায়তনের প্রধানের পরিচয়-পত্র সঙ্গে দিতে হবে।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

শোক সংবাদ

ডঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রসায়নবিজ্ঞানী ডঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 10ই মে '83 কলিকাতায় পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 91 বছর। তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের শিষ্য ছিলেন।

1893 খৃস্টাব্দে 23শে এপ্রিল অধুনা বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার মহাদেবপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। 1910 খৃস্টাব্দে তিনি বর্ধমান জেলার মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ

ডঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

করেন। 1913 খৃস্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে স্নাতক এবং 1915 খৃস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এস-সি পাশ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান।

"ইলেকট্রিক সিনথেসিস অব্ কোলয়েড" নামে তাঁর একটি গবেষণা-পত্র আমেরিকার কেমিক্যাল সোসাইটির একটি পত্রিকাতে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। সেই সময় তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে ভৌত রসায়ন বিভাগে অধ্যাপক পদে যোগ দেন। তিনি সত্যেন্দ্রনাথ বোস, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, মেঘনাদ সাহা এবং প্রশান্তচন্দ্র মহালনবীশ প্রমুখ বিজ্ঞানীদের সতীর্থ ছিলেন।

1919 খৃস্টাব্দে তিনি লণ্ডনের ইউনিভার-সিটি অফ কলেজ লাইব্রেরীতে প্রায় এক বছর ধরে গবেষণা করেন ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. এস-সি. উপাধি পান।

1921 খৃস্টাব্দে কোলয়ডিয়েল রসায়ন নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল, বিশেষ করে এই দ্রবণের তড়িৎ ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে কোলয়েড বিজ্ঞানীরা একমত হতে পারলেন না। ঐ বছর অক্টোবর মাসে বিলাতে ফ্যারাডে সোসাইটি ও ফিজিক্যাল সোসাইটির যুগ্ম উদ্যোগে একটি সভায় তিনি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। কোলয়েড দ্রবণে অতিকায় কণাগুলির দ্বারা যে সকল আয়ন অধিশোষিত হয় তার দ্বারা ঐ কণাগুলির যে-বৈদ্যুতিক ধর্ম দেখা যায় সে বিষয় তিনি সভায় যুক্তি সহকারে প্রমাণ করেন। এতে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন।

তিনি 1924 খৃস্টাব্দে ভারতীয় রসায়ন সভায় প্রতিষ্ঠা করেন। এর সভাপতি ছিলেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এবং তিনি ছিলেন কর্মসচিব। ঐ সময় তিনি একখানি রসায়ন পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি চার বছর ধরে এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 1934 খৃস্টাব্দে ভারতীয় মৃত্তিকা বিজ্ঞান সভার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং 1945 খৃস্টাব্দে তিনি ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থার ডাইরেক্টর নির্বাচিত হন। 1949 খৃস্টাব্দে ভারত সরকার ডঃ মুখার্জীকে স্যোসাল সায়েন্সর চেয়ারম্যান নিযুক্ত করে সেন্ট্রাল কমিটি গঠিত করেন। 1951 খৃস্টাব্দে তিনি রুড়কীর সেন্ট্রাল বিল্ডীংস রিসার্চস ইন্সটিটিউটের ডাইরেক্টর মনোনীত হন। এর চার বৎসর পর তিনি পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রশাসক নির্বাচিত হন। ডাঃ মুখার্জী 1956 থেকে 1958 খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য নির্বাচিত হন। ডঃ মুখার্জীকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কৃষি কলেজের গভর্নিং বডির প্রথম সভাপতি করা হয়।

ডঃ মুখার্জী দেশ-বিদেশ থেকে প্রভূত সম্মান অর্জন করেন। তিনি লণ্ডনের কেমিক্যাল সোসাইটি ও ভারতের এন. আই. এসের ফেলো নির্বাচিত হন। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে স্যার উপাধি দিয়েছিলেন। তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রসায়ন শাখার এবং 1952 খৃস্টাব্দে বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে মূল সভাপতি হয়েছিলেন। তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য ছিলেন।

দুলালচন্দ্র পাত্র

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006 থেকে প্রকাশিত
এবং গুপ্তপ্রেশ, 37/7, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-700 009 হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক প্রথম ষাণ্মাসিক বিষয়সূচী জানুয়ারী থেকে জুন-1983

বর্ণানুক্রমিক প্রথম ষাণ্মাসিক লেখকসূচী : জানুয়ারী থেকে জুন—1983

লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বিজ্ঞান পরিষদের আদর্শ অনুযায়ী জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার মত সমাজের কল্যাণমূলক বিষয়বস্তু সহজবোধ্য ভাষায় সুলিখিত হওয়া প্রয়োজন।
2. মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এবং পূর্ণ ঠিকানাসহ লেখকের পরিচিতি পৃথক কাগজে অবশ্যই লিখে দিতে হবে।
3. চলিত ভাষা এবং চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহৃত হবে। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্র্যাকেটে ইংরাজী শব্দটিও দিতে হবে। আন্তর্জাতিক সংখ্যা এবং মেট্রিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে।
4. মোটামুটি 3000 শব্দের মধ্যে রচনা সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়।
5. বিভিন্ন ফীচার, সমকালীন বিজ্ঞান গবেষণা ও প্রযুক্তিবিদ্যার সংবাদ এবং বিজ্ঞান বিষয়ক সুন্দর আকর্ষণীয় ফটোগ্রাফীও গ্রহণীয়।
6. রচনার সঙ্গে চিত্র থাকলে আর্ট পেপারে চাইনিজ কালিতে সুঅঙ্কিত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন।
7. প্রত্যেক চিত্র প্রস্থে 8 সে. মি. কিংবা এর গুনিতকের (16 সে. মি 24 সে. মি.) মাপে অঙ্কিত হওয়া প্রয়োজন।
8. অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব বজায় রেখে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মন্ডলীর অধিকার থাকবে।
9. প্রত্যেক প্রবন্ধ ফীচার-এর শেষে গ্রন্থপঞ্জী থাকা বাঞ্ছনীয়।
10. জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পুস্তক সমালোচনার জন্য দুই কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।
11. ফুলস্ক্যাপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় যথেষ্ট মার্জিন এবং প্রতি লাইনের পর বেশ কিছুটা ফাঁক রেখে পরিস্কার হস্তাক্ষরে প্রবন্ধ লিখতে হবে।
12. প্রতি প্রবন্ধের শুরুতে পৃথকভাবে প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া আবশ্যিক।

সম্পাদনা সচিব

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

আবেদন

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর আবক্ষ মূর্তি নির্মাণ তহবিল

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে "সত্যেন্দ্র ভবনে" (পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-6) পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর একটি আবক্ষ মূর্তি স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করবার জন্য অবিলম্বে ত্রিশ হাজার টাকার প্রয়োজন। এই মহান কাজে সহৃদয় জনসাধারণ, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য, পৃষ্ঠপোষক, শুভানুধ্যায়ীকে উদার ভাবে "আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর আবক্ষ মূর্তি নির্মান তহবিলে" অর্থদান করবার জন্য আবেদন করছি। সকল দান কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700006 এই ঠিকানায় (চেক / ড্রাফট পাঠালে Bangiya Bijnan Parishad লিখে) পাঠাতে অনুরোধ করছি

সভাপতি

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অক্টোবর, 1983

36তম বর্ষ, দশম সংখ্যা

বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের অনুশীলন করে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও সমাজকে বিজ্ঞান-সচেতন করা এবং সমাজের কল্যাণকল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করা পরিষদের উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন লেখকদের স্বাধীন মতামত বা মৌলিক সিদ্ধান্তসমূহ পরিষদের বা সম্পাদকমণ্ডলীর চিন্তার প্রতিফলন হিসাবে সাধারণতঃ বিবেচ্য নয়।

বিষয় সূচী

প্রচ্ছদ পরিচিতি : ব্যাঙ্গালোরে ন্যাশনাল অ্যায়োনটিক্যাল ল্যাবরেটরী নির্মিত বায়ুকল (Wind Mill) WP-2। জল তোলার কাজে ব্যবহার করা হয়।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : 30·00

প্রতি সংখ্যা : 2·50

যোগাযোগের ঠিকানা :

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট

কলিকাতা-700006

ফোন : 55-0660

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষট্‌ত্রিংশত্তম বর্ষ | অক্টোবর, 1983 | দশম সংখ্যা

বিজ্ঞান ও মানবিক চেতনা

শ্রীগুণধর বর্মন

জীবন ও জগতের উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতি এবং এসবের মূলগত সত্তা সমূহের স্বরূপ নির্ণয় ও তাদের পারস্পরিক কার্যকারণ ধারা সম্পর্কে চর্চা, আলোচনা, শিক্ষা, গবেষণা প্রভৃতি থেকে সংগৃহীত তথ্য ও তত্ত্ব সমূহের কথাই মানবসভ্যতার সঞ্চিত জ্ঞান-ভাণ্ডার অর্থাৎ এইগুলিই সামগ্রিকভাবে জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা। যদিও পৃথিবীতে মানবপ্রজাতির আবির্ভাব কয়েক মিলিয়ন বৎসর আগে তবে মানুষের ইতিহাস মাত্র কয়েক হাজার বছরেরই কথা। কিন্তু যে প্রযুক্তিবিদ্যাকে সাধারণ ভাবে আমরা বিজ্ঞান বলেই বলি সেই বিজ্ঞানের আবিষ্কার এবং প্রয়োগ ঘটেছে মানবপ্রজাতির সেই আদিমকালেই যখন জীবজগতের ক্রমবিকাশ বা অভিব্যক্তির ধারায় হোমোসেপিয়ান গোষ্ঠীর উদ্ভব হয় প্রায় তখন থেকেই। চতুষ্পদ বৃহৎ বানর গোষ্ঠীর কোন একদল চারপায়ে চলাফেরার অভ্যাস ত্যাগ করে দুপায়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মাথা তুলে হাঁটতে শেখে, আর সামনের পা দুটিকে হাত হিসাবে ব্যবহার করে সেই হাত দুটিকে আত্মরক্ষা ও আক্রমণের মূল হাতিয়ার হিসাবে কাজে লাগায় এবং সেই হাতে ব্যবহার যোগ্য পাথর, গাছের ডাল, জীবজন্তুর হাড় প্রভৃতিকে অস্ত্র হিসাবে প্রয়োগ করতে শেখে। সেই থেকেই ধরা যেতে পারে আদিম প্রযুক্তি বিদ্যার উৎপত্তি ও প্রয়োগ, যদিও আজকের দিনের ভাবধারায় তখন প্রকৃত জ্ঞান বলতে কিছুই ছিল না। সেই পাথর ও হাড়কে ঘষে ঘষে আরও তীক্ষ্ণ শানিত অস্ত্র বানান এবং পাথর ঠুকে বা কাঠে কাঠে ঘষে আগুন জ্বালানর পন্থা উদ্ভাবন করে সেদিনের আদিম মানবগোষ্ঠী শুধু জীবজগতের ক্রমবিকাশে এক নিদারুণ বিপ্লব সৃষ্টি করেনি আজকের দিনের যেকোন বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বা উদ্ভাবনী শক্তির চেয়েও তা ছিল সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে আরও গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড। সুতরাং সাধারণ সংজ্ঞা অনুসারে সভ্যযুগের জ্ঞানের চর্চা ও বিকাশের পদ্ধতির অনেক আগেই বিজ্ঞানের অবদান ও যথাযথ প্রয়োগ ঘটেছে এবং তারই বলে বা ফলেই সাধারণ পশু থেকে পৃথক হয়ে পশু ও প্রকৃতি সবার উপরে প্রাধান্য বিস্তার করে মানুষ সভ্যতার ধারা সৃষ্টি করেছে এবং গড়ে তুলেছে তার পরবর্তী জ্ঞান-ভাণ্ডার, শিল্পকলা, ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি ইত্যাদি। তবে সভ্যতার প্রতি স্তরেই বিজ্ঞানের যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে সেই সহজ সত্যটিকে আমরা মনে রাখিনা বা অনুভব করিনা অথবা বিশেষ কোন শক্তিশালী গোষ্ঠীর প্রভাবে সেই সত্যকে ভুলে যেতে ও ভুলে থাকতে বাধ্য হই, আর বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে যখন বা খুশী তাই বলে যাই ও করে যাই। তাই যথার্থ বিজ্ঞান-মনস্কতা হারিয়ে বিজ্ঞান সম্মত চিন্তা ও কর্মধারার বাহিরে যুক্তিহীন ও কুযুক্তিচালিত নানারকম কাল্পনিক চিন্তা ও অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে মাতামাতি করে বসেন ও বসেছেন অনেক বড় বড় বুদ্ধিজীবী জ্ঞানীগুনী জনও।

এখন অতীতের জ্ঞানভাণ্ডার একটু অনুসন্ধান করলেই দেখা যাবে এই পৃথিবী সম্পর্কে কত সীমিত জ্ঞান ছিল সেদিনের মহান জ্ঞানী-গুণীদের, কলম্বাসের আগে পর্যন্ত পৃথিবীর পশ্চিম গোলার্ধ বা আমেরিকা মহাদেশের অবস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞান ছিলনা তাঁদের, মেরুপ্রদেশতো দূরের কথা। পৃথিবীটা গোল না চ্যাপ্টা তাই জানা ছিল না। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত কিভাবে হয় তাও জানা ছিল না। দৃষ্টিগোচর আকাশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কদের নিয়ে কিছু জল্পনা কল্পনা করলেও সৌরজগৎ সম্পর্কে কোন জ্ঞান ছিলনা।

পৃথিবীটাও যে একটা গ্রহ সেই ধারণা ছিল না। উল্টে গ্রহণের (সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ) কারণ হিসাবে রাহু ও কেতু নামে দুটি কাল্পনিক গ্রহের বিস্তৃত চিন্তা করা হয়েছে। অন্যান্য জ্যোতিষ্কদের গতিপথ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জ্যোতির্বিজ্ঞানের কিছু প্রাথমিক কাজ হলেও তাদের আকার, আয়তন, দূরত্ব, গতি, দ্যুতি, দ্যুতি প্রভৃতি সম্পর্কে কোন জ্ঞানই ছিল না। অথচ মানুষ ও পৃথিবীর উপর তাদের প্রভাব নিয়ে এক উদ্ভট জ্যোতিষী বিদ্যার প্রচলন হয়ে গেছে এবং আজও দাপটে চলেছে। যাদের প্রকৃতি ও শক্তি সম্পর্কে কোন জ্ঞান বা ধারণাই নাই তাদের প্রভাব সম্পর্কে প্রচার করা অজ্ঞতা বা বাতুলতা ছাড়া আর কি হতে পারে? মহাকাশ সম্পর্ক তখন কোন জ্ঞানই ছিল না। পৃথিবীর বাহিরের বিশ্ব বহির্বিশ্ব নিয়ে অতি গোলমেলে ও কাল্পনিক ধারণাই ছিল। তাতে উর্ধ্বাকাশে কোথাও স্বর্গরাজ্য, দেবলোক, গোলোক, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি কল্পিত স্থান ও তথাকার কল্পিত প্রাণী বা দেবতাদের কল্পনা করে মানুষের মতই তাদের চরিত্র ও জীবন গাথা তৈরী করা হয়েছে। এখন যেমন মঙ্গল গ্রহে কাল্পনিক মানুষ নিয়ে কল্পবিজ্ঞানের গল্প লেখা হয়। যেহেতু উপরে তারা থাকে সেই হেতু মানুষের তথা পৃথিবীর উপর তাদের শক্তিশালী প্রভাবের কথা ভাবা হয়েছে এবং তাই নিয়ে তথাকথিত প্রাচীন জ্ঞান ভাণ্ডারে কতরকম তত্ত্ব ও তথ্যের সমাবেশ ঘটেছে। কিন্তু 25 লক্ষ বছরের বেশীকালের মানব সমাজের ইতিহাসে মাত্র 25 বছরই হল মানুষ পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাকাশে পাড়ি দিয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করতে শুরু করেছে আর যন্ত্র সাহায্যে (দূরবীণ, রেডিও-টেলিস্কোপ, কৃত্রিম উপগ্রহ, পায়োনিয়ার, ভয়েজার প্রভৃতি দিয়ে) অকল্পনীয় দূরত্বের মহাবিশ্ব থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানা সংবাদ ও তথ্য চিত্রাদি নিখুঁত ভাবে সংগ্রহ করতে পারছে। তাতে ঐ স্বর্গলোক, দেবলোক প্রভৃতির কোন সন্ধান তো মেলেনি, দেবতা প্রভৃতি কোন জীবের অস্তিত্বও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তারপর এই বিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত ভৌতজগৎ এবং জাগতিক ও মহাজাগতিক শক্তিসমূহের কোন পরিচিতি, তাদের গতি প্রকৃতি ও রূপান্তর সম্পর্কে কোন জ্ঞানই ছিল না। বস্তু জগতের মৌল উপাদান কাকে বলে তাই জানা ছিল না। প্রকৃতিজ 92টি মৌলের পরিচয় তো মাত্র কয়েক যুগের কথা। তার আগে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পাঁচটি উপাদান দিয়েই সমগ্র জগৎ ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গঠিত এইরকম কথাই ভাবতেন অতীতের জ্ঞানীগুণী পণ্ডিতগণ। পারমাণবিক শক্তি ও তেজস্ক্রিয়তা প্রভৃতির কোন জ্ঞানই তাঁদের ছিল না। আর জগৎ, বিশ্ব, ব্রহ্মাণ্ড, মহাবিশ্ব প্রভৃতি কথা বা শব্দগুলিকে পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অর্থে ব্যবহার না করে এগুলিকে প্রায় সমার্থক বা একই ভাবার্থক পদ বা কথা হিসাবেই ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র 50-60 বৎসর আগে পর্যন্ত। যাতে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় এই পঞ্চাশ-ষাট বৎসর আগে পর্যন্ত মহাবিশ্ব বা ইউনিভার্স সম্পর্কে সমগ্র মানবসমাজের যথার্থ কোন জ্ঞান ও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। ব্রহ্মাণ্ড বলতে এখন গ্যালাক্সি'কই বোঝায়। রাতে আকাশের দিকে তাকালে যে অসংখ্য তারাখচিত আঁকাবাঁকা প্রশস্ত অনুজ্জ্বল এক পথরেখা প্রায় মধ্যাকাশ দিয়ে উভয় দিগন্তে বিস্তৃত, সাধারণভাবে তাকে বলা হয় "ছায়াপথ" (Milky way)। ভারতীয় ভাষায় এর 'স্বর্গদ্বার', 'আকাশগঙ্গা' প্রভৃতি অন্য নামও আছে, সেই স্বর্গে যাওয়ার কল্পনা করে, দেবতাদের পায়ে হাঁটা রাস্তা ভেবে। তবে এই ছায়াপথই হচ্ছে 'আমাদের ব্রহ্মাণ্ড' (our galaxy)। আমাদের এই পৃথিবী ও সমগ্র সৌরজগত হচ্ছে তার অতি ক্ষুদ্রতম নগণ্য একটি অংশ। সূর্য ও সৌরজগতের কাছে পৃথিবী একটি ক্ষুদ্র অংশ। আর আমাদের এই ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডে আছে 10,000 কোটিরও বেশী নক্ষত্র যাদের অধিকাংশই সূর্যের থেকে বৃহদাকার। আর একটি নক্ষত্র থেকে আরেকটি নক্ষত্র দূরত্ব কম করে 2 আলোকবর্ষ। তাহলে কি বিশাল এই ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের আকার ও আয়তন আজকের বিজ্ঞানধর্মী বুদ্ধিজীবী মহলের কয়জনই বা অনুভব করেন যে আমরা, এই পৃথিবীর লোকেরা, এই ছায়াপথেরই বাসিন্দা? এই ছায়াপথের বিস্তৃতি ও গতি প্রকৃতির কিছুই জানা ছিল না অতীতে, এই বিংশ শতাব্দীর আগে।

এই ছায়াপথের বাহিরে মহাবিশ্ব যে আরও বহুদূর অকল্পনীয় ভাবে বিস্তৃত, অঙ্কের হিসাবে সুনির্দিষ্ট ভাবে সেই ধারণা তো মাত্র কয়েক দশক আগেই এসেছে উন্নত বিজ্ঞানের অবদানে। তার আগে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে শুধু অনন্ত অসীম বলা ছাড়া আর কোন হিসাবের কথা বা ভাবার প্রয়োগই ছিল না। ইতিমধ্যে শক্তিশালী 200 ইঞ্চি ব্যাসের দূরবীণের সাহায্যে 100 কোটির বেশী ব্রহ্মাণ্ডের ছবি তোলা সম্ভব হয়েছে। যাদের দূরত্ব দু'শো কোটি আলোকবর্ষ পর্যন্ত। তারও পরের অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে—আরও শক্তিশালী দূরবীণ হলে তাদের বিস্তৃত ছবি ও খবর পাওয়া যাবে। ঐ দূরত্বের পরেও ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থিতি পাতলা হয়ে যাচ্ছে না। কত অসীম সেই দূরত্ব! এখন পর্যন্ত যা জানা গেছে—তা হচ্ছে—দু-শত কোটি আলোকবর্ষের পথ। মনশ্চক্ষে এই দূরত্ব কি ভাবা যায়? তাহলে এই মহাবিশ্বের কাছে আমাদের এই পৃথিবী কতটুকু! সামগ্রিক ছবিতে একটি ক্ষুদ্র ধূলিকণার মত স্থানও নয় এই পৃথিবীর।

মহাবিশ্ব সম্পর্কে অতীতের জ্ঞানভাণ্ডারে এই সব বাস্তব চিত্রের কোন ধারণাই ছিল না। তবু এদেশে অতীতের মহান সাধক মনীষীদের বলিষ্ঠ ভাবে প্রচার করতে দেখা গেল যে "জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য"। এইখানে সুস্পষ্ট যে জগৎ সম্পর্কে তাঁদের যুক্তিগ্রাহ্য বাস্তব কোন জ্ঞানই ছিল না। অত্র "ব্রহ্ম" কথাটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক, প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও যুক্তিতর্কের অতীত অন্ধ-বিশ্বাসের কথা। এই পৃথিবীর সম্যক পরিচিতি এবং বিশ্বপ্রকৃতি ও মহাবিশ্বের প্রাকৃতিক শক্তি নিচয়ের যথাযথ ধারণাও যাঁদের

ছিল না। তাঁরা সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত ভাবে যত বড় জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত তেজস্বী পুরুষ হন না কেন তঁদের সেদিনের মতবাদ যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত একথা আজ অস্বীকার করার উপায় নেই। জগৎকে ছাড়িয়ে জীবনের অস্তিত্ব নাই। আর 'ব্রহ্ম' বলে যদি কিছু থাকে তবে তাঁকেও এই জগতের (মহাবিশ্বের) মধ্যেই থাকতে হবে তার বাহিরে কোন স্থান নেই। আর জাগতিক বা মহাজাগতিক যে কোন জায়গা থেকেই তাঁকে তাঁর শক্তি সংগ্রহ করতেই হবে। খেয়ালখুশীমত হঠাৎ কিছু করা—অর্থাৎ একেবারে শূন্য থেকে হঠাৎ কিছু বানিয়ে ফেলা কখনও সম্ভব নয়। ঐ জাতীয় কল্পনা সম্পূর্ণই অবাস্তব।

এর পরেই রয়েছে এই বিশ্বে জীবনের উৎপত্তি, তার ক্রম-বিকাশের কথা। কি করে এই পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব এবং কিভাবে বিভিন্ন প্রজাতির জীবসৃষ্টি ও মানুষের উৎপত্তি তা নিয়ে অতীতে ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনাদিতে যে সব কথা বলা হয়েছে তা যে সত্য নয় এবং সবই অজ্ঞতা ও কল্পনারই কথা সে তো আজ বিজ্ঞানের পরীক্ষা প্রমাণের দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে জানা গেছে। কিন্তু আসল প্রশ্ন জীবন ও জীবসত্ত্বা নিয়ে—যাকে কেন্দ্র করে ঐ "ব্রহ্ম" "আত্মা" প্রভৃতি ধারণার উৎপত্তি। বিজ্ঞান যথার্থ দক্ষতার সঙ্গে সেসবের যোগ্য উত্তরও সংগ্রহ করেছে। তারপরে ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা এমনকি রাজনীতি প্রভৃতিতে সভ্য মানুষের সংগৃহীত বিশাল অতীত জ্ঞানভাণ্ডার দিয়ে যথার্থ মানবকল্যাণ তথা সমগ্র জীবনপ্রবাহের উন্নতি ও পৃথিবীর মঙ্গলসাধনের যে কথা বলা হয় তাতে বিজ্ঞানের ভূমিকা কি—এইটাই এখনকার বড় প্রশ্ন।

মহাবিশ্বের বিশালতার কথা বিজ্ঞানের দৌলতে আজ আমরা জেনেছি এবং তার তুলনায় এই পৃথিবী নামক গ্রহটির অতি তুচ্ছতার কথাও। অতি ক্ষুদ্র এই পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব প্রায় দু'শো কোটি বছর আগে। তাতে মানব প্রজাতির উদ্ভব মাত্র কয়েকলক্ষ বছরের অর্থাৎ অতি অর্বাচীন কালের। আর তার জ্ঞানের গরিমাও সভ্যতার বাহাদুরি—আরও নগন্য সময়ের মাত্র কয়েক হাজার বছরের। সুতরাং অনাদিকালের অখণ্ড জীবন-প্রবাহের উপর সভ্যতা গর্বী মানুষের চিন্তা চেতনা ও কর্মধারার প্রভাব অদ্যাবধি যে অতি নগন্য সেকথা সহজেই বলা চলে। এই শেষের সভ্য মানুষরাই সংঘবদ্ধ-জীবনকে সুশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থায় পরিণত করতে চেয়েছে। তারই ফলে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও রাজনীতির উদ্ভব এবং ধর্ম, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ইত্যাদির সৃষ্টি আর বিজ্ঞান হচ্ছে উন্নত জীবনমানে যাওয়ার জন্য তার মননশীল ক্রিয়া উৎপাদনকারী উদ্ভাবনী শক্তি, যাতে প্রকৃতি ও বিরুদ্ধ পরিবেশকে বশে এনে জীবনপ্রবাহের প্রয়োজনে সব কিছুকে কাজে লাগান যায়। এখন অতীতের মনীষীগণ ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি প্রভৃতির মাধ্যমে মানব কল্যাণ তথা জগৎকল্যাণের যত কথা বলে গেছেন তাতে একটি কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে,—যে যার দলের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেও কোন ধর্ম, কোন দর্শন বা কোন একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদের পতাকাতলে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে কখনই একত্রিত করা যাবে না বা সবাইকে সমানভাবে বিচার করাও যাবে না। স্থান, কাল ও পরিবেশের তারতম্যে আবার একই ধর্ম, দর্শন ও রাজনৈতিক মতবাদের বিচার বিশ্লেষণ ও প্রয়োগ পদ্ধতির অসামান্য পরিবর্তন ঘটে এবং ঘটতে বাধ্য। তারপর এসবের মধ্যে যত উন্নত মতবাদই গৃহীত ও প্রচলিত হোক না কেন জীবনের ও অখণ্ড জীবনপ্রবাহের অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তিকে এবং তার বিকাশের ধারাকে নিয়ন্ত্রিত বা ইচ্ছামত পরিচালিত করার কোন শক্তিই নাই কোন ধর্মমতের, কোন দর্শনের বা রাজনৈতিক শক্তির শুধু পরিবেশগত ব্যবস্থার বিশেষ রূপায়ণে কিছু সাহায্য করা ছাড়া। মানুষ ও জগতের উন্নতির যত কথাই তাঁরা বলুন মানুষকে মানুষ করছে কে এবং কিভাবে তার উত্তর তো একমাত্র বিজ্ঞানই দিতে পারে এবং তাই দিচ্ছে। মানুষের রোগ, শোক, দুঃখ ও অভাব মোচনের যা কিছু উপায় সেতো বিজ্ঞানেরই কাজ এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের সুখ শান্তি প্রগতির যা কিছু পথ নির্ধারণ তাওতো বিজ্ঞানকেই করতে হবে। তার চেয়েও বড় কথা প্রাকৃতিক নিয়মে জীবনপ্রবাহে জীবনী শক্তির যে ক্রমবিকাশ অতি মন্থর গতিতে চলে আসছিল বিজ্ঞান আজ পারে সেই জীবনীশক্তির ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং তাকে উন্নতমানে নিয়ে যেতে। প্রজনন বিজ্ঞান ও জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি জীব বিজ্ঞানের উন্নত প্রযুক্তি বিদ্যার দ্বারা বিভিন্ন প্রজাতির গুণগত ও মানগত উন্নয়ন আজ সম্ভব,—সেই সঙ্গে সমগ্র মানব সমাজেরও। এইখানেই তো মানুষের মানবিক সত্তার বৈশিষ্ট্য। সে আজ পারে প্রকৃতির খেয়াল, খুশী ও অনুভূতিহীন চালিকা শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে। প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে বিজ্ঞানের বলে মানুষ যেমন বশে এনেছে জীবন-প্রবাহের অন্তর্নিহিত শক্তিকেও তেমন সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। বিজ্ঞানের এই কাজ তো ধর্ম, দর্শন বা রাজনীতির মত কোন একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর কথা নয় বা কোন সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়; এতো সমগ্র মানবসমাজের সমগ্র জীব প্রজাতির ও সমগ্র জগতের প্রকৃত কল্যাণের চেষ্টা। তাই বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানকর্মী ও সুস্থ চিন্তাবিদ মানুষমাত্রেই আজ যেখানে, যে কোন ধর্মমতে, দর্শনে বা রাজনীতির সঙ্গে যে ভাবেই যুক্ত থাকুন না কেন এই বিজ্ঞানের চিন্তা ও কর্মধারাকে সেখানে যথাযথ প্রয়োগ ও কার্যকরী করতে হবে। তা যদি না করা যায় তবে সেই ধর্মমত বা রাজনীতিকে পরিত্যাগ করে সুস্থ মানবতাবাদের কথাকে বলিষ্ঠ ভাবে ঘোষণা করতে হবে। সুতরাং একমাত্র বিজ্ঞানই যথার্থ সুস্থ মানবিক চেতনা সৃষ্টি করতে পারে সংকীর্ণ গোষ্ঠীদল ও সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির উর্ধ্বে। আর পৃথিবী জুড়ে মানুষে মানুষে দেশে দেশে যে নানান দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ, যুদ্ধ, হানাহানি ও হিংস্রতার মনোবৃত্তি তার মূল কারণ তো ঐ ক্ষুদ্র স্বার্থ ও গোষ্ঠী প্রাধান্যের প্রবণতা। দীর্ঘকালের কয়েক হাজার বছরের চেষ্টাতেও ধর্ম, দর্শন বা রাজনীতির কোন পথেই মানুষের এই

ক্ষুদ্র স্বার্থ ও গোষ্ঠী প্রাধান্যের মনোবৃত্তিকে সংযত করা যায়নি। বরং উত্তরোত্তর সেই সংকীর্ণ স্বার্থের মানসিকতা প্রবল হয়েই উঠছে অন্ধবিশ্বাসের, ধর্মীয় মতবাদের ভাবাবেগে উন্মত্ত সাম্প্রদায়িকতার চেয়েও আজকের রাজনীতিতে তো উগ্র গোষ্ঠী প্রাধান্যের এক হীন সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিই জোরদার হয়ে দেখা দিচ্ছে ধর্মীয় ভাবাবেগকে ছাড়িয়েও। বিজ্ঞান কি এখানে কিছু করতে পারে? হঁ্যা—সুনিশ্চিত ভাবেই পারে এবং প্রকৃত বিজ্ঞান-কর্মী ও দলমতের ঊর্ধ্বে সুস্থচিন্তাবিদদেরই সেই কাজ করতে হবে, বৃহত্তর জনমানসে বিজ্ঞানের সত্য ও তথ্যসমূহকে পৌঁছে দিয়ে তাদের মধ্যে সুষ্ঠু বিজ্ঞানসম্মত মানবিক চেতনা সৃষ্টি করে আর তারই মাধ্যমে স্বার্থান্বেষী দলীয় নেতাদের সংযত করে। এই পথেরই বিশদ আলোচনা ও সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা প্রণয়ন আজ একান্ত প্রয়োজন। সহজভাবে সবাইকে বুঝে নিতে হবে যে গোষ্ঠী প্রাধান্যের চেষ্টা তো স্বাভাবিক পশুপ্রবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়। সেই জীবন সংগ্রামে শক্তিমানের বৈশিষ্ট্যের কথা। এটাতো সুস্থ মানবিক চেতনার কথা নয়। এতো নিম্নতর পশুজীবনের স্বাভাবিক প্রবণতা। আর দুর্বলকে রক্ষা করা, অসহায়কে সাহায্য করা, নিরন্নকে খেতে দেওয়া, অসুস্থকে সুস্থ করা, আশ্রয়হীনের আশ্রয় ব্যবস্থা এবং সামগ্রিক পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে সবার উন্নত জীবনমানের পথ নির্দেশ তো কেবল বিজ্ঞানের দ্বারাই সম্ভব, গোষ্ঠীস্বার্থে উন্নত কোন ধর্মীয় মত বা রাজনৈতিক দলবাজির দ্বারা নয়।

বিজ্ঞান প্রবন্ধ

সামাজিক ভাষাবিজ্ঞানে অপরাধ-জগতের ভাষা

কৃষ্ণা ভট্টাচার্য*

বিজ্ঞানের জগতে বিশেষ একটি শাখা হিসেবে সামাজিক—ভাষাবিজ্ঞানের (Socio-linguistics) আবির্ভাব অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে ঘটলেও সামাজিক পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে ভাষাকে পর্যবেক্ষণ করার দিকটি যে ভাষাবিজ্ঞানী-দের দৃষ্টিবহির্ভূত ছিল না, তার প্রমাণ মেলে মেইয়ে (Meillet), বোয়াস (Boas), সাপির (Sapir), সোস্যুর (Saussure), ফার্থ (Firth) প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানীদের রচনায়। ইদানীন্তন কালে ভাষাবিজ্ঞানের এই শাখাটি বিশেষ বিকশিত এবং সমাজবিজ্ঞান (Sociology), মানববিজ্ঞান (Anthropology), প্রতীকবিজ্ঞান (Semioties) প্রভৃতি জ্ঞাতি বিদ্যাগুলির সঙ্গে সামাজিক ভাষাবিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্বীকৃত।

ভাষা একটি সামাজিক সত্য। একই সামাজিক ধ্যান-ধারণার অংশীদার একটি ভাষাগোষ্ঠীভুক্ত মানুষদের প্রয়োজনীয় মিথস্ক্রিয়ার (interaction) একটি অন্যতম সাধন হল ভাষা। সাধারণ ভাষাবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হল এই ভাষাকে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে আলোচনা করা। বিশদভাবে বলতে গেলে প্রথমে ভাষার উপাত্ত (data) সংগ্রহ করা; তারপর তা পর্যবেক্ষণ বিচার-বিশ্লেষণ করে বিশেষ কোনো ভাষা তথা সামগ্রিক ভাষা সম্বন্ধে নানা রূপ তথ্য উদ্‌ঘাটন করা। বিভিন্ন ভাষার উৎস ও উৎপত্তিগত পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের দ্বারা ভাষার ধারাবাহিক ইতিহাস রচনাই শুধু নয়, ভাষার একটিমাত্র সময়ের, একটিমাত্র নির্দিষ্ট অবস্থার নানারূপ প্রক্রিয়ার আবিষ্কার ও বর্ণনাও ভাষাবিজ্ঞানীর অন্যতম লক্ষ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভাষা-বিজ্ঞানের যুগন্ধর পুরুষ নোয়াম চমস্কির মতে ভাষাবিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য হল, ভাষার সেইরকম একটি ব্যাকরণ রচনা করা, যা ভাষার বিশেষ তত্ত্ব বা ধারণাটি প্রকাশ করবে। তবে মানুষের ভাষা বিষয়ে কতকগুলি সর্বজনীন তত্ত্ব বা ধারণা (language universals) জানা গেছে। বিশেষ ভাষার ব্যাকরণ সেই সর্বজনীন ধারণাগুলির যেন পরিপন্থী না হয়। বরং তা যেন মানবভাষার সর্বজনীন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বিশেষ ভাষার নিয়মগুলির যোগসূত্র সুস্পষ্ট করে তোলে।

ভাষা একটি সমসত্ত্ব (homogeneous) বস্তু। কিন্তু ভাষার সমসত্ত্বতা (homogeneity) যেমন বাস্তব, অসমসত্ত্বতাও (heterogeneity) তেমনি সত্য। ভাষার অসমসত্ত্ব (heterogeneous) স্বভাবটি অবধান করার উদ্দেশ্যে সামাজিক ভাষাবিজ্ঞানের পদক্ষেপ। ভাষার এই অসমসত্ত্বতা, সীমিত অর্থে, সমাজের স্তরভেদ ও অবস্থা বা পরিবেশভেদে ভাষার রূপভেদের মধ্যে প্রকাশিত। আর ব্যাপক অর্থে ভাষাসংযোগ পরিবেশেও (language contact situation) অসম-সত্ত্বতা পরিলক্ষিত হয়। দুই বা ততোধিক ভাষাভাষীরা যদি কোনো কারণে পরস্পরের সান্নিধ্যে আসে, তাহলে যে ভাষা-সংযোগ পরিবেশের সৃষ্টি হয়, তার ফলে দুই বা ততোধিক

* সংস্কৃত কলেজ কলিকাতা

ভাষার নানাপ্রকার ভাষা ব্যবহারগত রূপভেদ দেখা যায়। এইসব সমসত্ত্বিরোধী বৈশিষ্ট্যগুলির কারণ খুঁজতে গেলে সামাজিক ভাষাবিজ্ঞানেরই সাহায্য নিতে হয়।

একটি বিশেষ ভাষার আঞ্চলিক উপভাষিক রূপভেদ খুব স্বাভাবিক কারণেই ঘটে থাকে। বলা যায় যে, আঞ্চলিক উপভাষাগুলি পরস্পর অনুভূমিক (horizontal) সম্পর্কে যুক্ত। কিন্তু অপরদিকে সমাজগত কারণে যে উপভাষাগুলির জন্ম, সেগুলি পরস্পর উল্লম্ব (vertical) সম্পর্কে সম্পর্কিত। সমাজের বিভিন্ন ধরণের স্তরভেদের ওপর এই গোষ্ঠীভাষা বা সামাজিক উপভাষাগুলির (social dialects) ভিত্তি। লিঙ্গ বয়স, বর্ণ, বৃত্তি, অর্থনৈতিক কাঠামো, শিক্ষা ইত্যাদি ভেদে সমাজে যে বিভিন্ন প্রকারের গোষ্ঠী রয়েছে, এদের ব্যবহৃত ভাষার কিছু রূপভেদও আছে। শুধু তাই নয়, একই ব্যক্তি তার সমাজ-জীবনে নানারকমের ভূমিকা পালন করে। কখনো সে স্বামী বা স্ত্রী, কখনো বাবা বা মা, কখনো বা সে কারো ছেলে বা মেয়ে কিংবা বন্ধু. এমনি আরও কত কি। বিভিন্ন ভূমিকা পালনে তার ব্যবহৃত ভাষার রূপ বা ধরণও ভিন্ন। ভাষার এই রূপবৈচিত্র্যের বিচার-বিশ্লেষণ করতে গেলে সামাজিক স্তরবিন্যাস তথা সমাজ জীবনে ব্যক্তির ভূমিকা—সামাজিক পরিবেশ—এককথায় সমগ্র সমাজ ব্যবস্থাটি পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। ভাষার রূপভেদের সঙ্গে সামাজিক গঠনের সংযোগ স্থাপন করে ভাষার রূপভেদ ব্যাখ্যা করাই সামাজিক ভাষা-বিজ্ঞানের কাজ।

ভাষার আঞ্চলিক রূপভেদ ভাষা-ব্যবহারকারীদের অজ্ঞাতসারেই ঘটে থাকে। কিন্তু গোষ্ঠীভাষা বা সামাজিক উপভাষাগুলির জন্মের পেছনে কখনো কখনো থাকে ব্যবহারকারীদের সচেতনতা। একটি সামাজিক গোষ্ঠী (social group) সচেতনভাবে নিজেদের গোষ্ঠীস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য স্বেচ্ছায় একটি সাংকেতিক ভাষা (code language) তৈরি করে। এই ভাষা শুধুই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের কাছে বোধগম্য এবং গোষ্ঠীবহির্ভূতদের কাছে রহস্যময় ও দুর্বোধ্য। অপরাধ জগতের ভাষা নানা সংকেত ভাষার মধ্যে একটি। এই ভাষার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হল ইচ্ছাকৃতভাবে সমাজের অন্য অংশকে বিভ্রান্ত করা ও সামনে একটি ভাষার প্রতিরোধ তুলে ধরা। অবশ্য বলা দরকার যে, সব সংকেত ভাষার উদ্দেশ্য গোপনীয়তার নিশ্ছিদ্র দেওয়াল তুলে ধরা না-ও হতে পারে। যেমন আইনজীবীদের ব্যবহৃত ভাষার উদ্দেশ্য হল প্রধানতঃ নিজেদের পেশাগত মর্যাদাবৃদ্ধি।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, অপরাধজগতের ভাষাকে গোষ্ঠীভাষা বললে এর সঠিক চরিত্র ফুটে ওঠে কিনা। তাছাড়া গোপনীয়তা রক্ষা এই ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলেও অপরাধজগতের ভাষার স্বতন্ত্র কোনো পরিচয় কিনা। প্রখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী হ্যালিডে অপরাধজগতের ভাষা প্রসঙ্গে আলোচনাকালে বাংলার ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক ও পোল্যান্ডের আদাম পদগোরেস্কির কাজের উল্লেখ করেছেন এবং তাঁদের তথ্যের ভিত্তিতে এই ভাষার তথা ভাষাভাষীদের সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন।

দেখা যায় যে, প্রচলিত ভাষা আর অপরাধজগতের ভাষা—এ দুয়ের স্থান সমাজের দুই মেরুতে। প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বৈপরীত্যে অপরাধজগতের অস্তিত্ব নিজেদের বাঁচার তাগিদেই। আর এই জগতেরই দৈনন্দিন যোগাযোগের মাধ্যম হল এই বিপরীত ভাষা। পতিতা ও হিজড়াদের ভাষাও এর মধ্যে পড়ে। এরা পকেটমার, চোর, চোরাচালানী ইত্যাদি শ্রেণীর অপরাধী নয়। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান সমাজব্যবস্থার বলি এরা। নিজেদের জীবনধারণের প্রয়োজনেই এদের বিশেষ সংকেত ভাষার ব্যবহার। সেই অর্থে অপরাধজগতের ভাষার সঙ্গে পতিতা বা হিজড়াদের ভাষার সাদৃশ্য আছে।

অপরাধজগত ও তার ভাষা সম্বন্ধে এই কথাটি অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই জগৎ আমাদের সমাজেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই জগতের বাসিন্দারা কোনো আলাদা শ্রেণীর মানবজাতিভুক্ত নয়। এরা আমাদেরই লোক। আমাদের শ্রেণীবিভক্ত সমাজের ফসল এরা। অপরাধজগতের ভাষা এক-দিকে প্রচলিত ভাষা থেকে যেমন আলাদা নয় তেমনি আবার অন্যদিকে সেই ভাষার অঙ্গও নয়। প্রচলিত সমাজের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ যে প্রতি-সামাজিক গোষ্ঠীর (anti-society) মধ্যে দেখা যায়, তার ভাষাকে 'প্রতিভাষা বা বিপরীত ভাষা বলা যেতে পারে।

অপরাধজগতের ভাষার উপাত্ত সংগ্রহ বিশেষ দুঃসাধ্য হলেও এই ভাষার আলোচনা আমাদের যেমন সামাজিক উপভাষা সম্বন্ধে ধারণা করতে সাহায্য করে, তেমনি ভাষার বিভিন্ন অন্যান্য রূপের সঙ্গে এর সম্পর্ক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাজের স্তরবিন্যাস হয়ে ওঠে।

কোলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের অপরাজগতের ভাষা হিন্দীর মিশ্রণযুক্ত বাংলা ভাষা। ডাঃ ভক্তিপ্রসাদ মল্লিকের আলোচনা থেকে জানা যায় যে,অঞ্চলভেদে ও অপরাধের প্রকারভেদে এই মিশ্ররূপের তারতম্যঘটে। "একই পেশার কোনো স্থানীয় লোকেদের নিজস্ব গোপনবুলি অন্যদলের লোকেরা জানে না। ভিন্ন ভিন্ন অপরাধগোষ্ঠীর ভাষা ভিন্নতর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।" তাহলে একই কোলকাতায় বা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে স্থানভেদে ও দলভেদে বহু সংকেতের অস্তিত্ব রয়েছে, যা একদলের সংকেত হলে অন্যদলের কাছে বোধগম্য নয়।

অপরাধজগতের ভাষার গঠনকাঠামোর ধ্বনিগত, রূপগত ও শব্দার্থগত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় অপরাধ জগতের ভাষায় বাক্যরীতির নিজস্ব কোন পদ্ধতি নেই। এটি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহৃত 'নূনতম গঠনে'র (structure minima) ভাষা। কাজেই এই ধরনের ভাষাগুলির মূল্যায়ন করার সময় এদের গাঠনিক অযোগ্যতার (structural

inadequacy) কথা মনে রাখলে চলবে না। এদের ব্যবহারিক মূল্যের কথা মনে রাখতে হবে। বস্তুতই, বিপরীত-ভাষা অপরাধজগতে দৈনন্দিন যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হলেও একমাত্র অপরিহার্য মাধ্যম নয়। অপরাধজগতের প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র মাতৃভাষা আছে। দৈনন্দিন জীবনে তাদের ভাষা ব্যবহারের সময় বিপরীত ভাষা থেকে মাতৃভাষা বা অন্য কোনো ভাষায় উত্তরণ ঘটা স্বাভাবিক। এইরূপ সংকেতের মিশ্রণ বা এক সংকেত থেকে অন্য সংকেতে উত্তরণ (code switching) সম্বন্ধে ধারণা করতে গেলে অপরাধজগতের গঠন সম্বন্ধে যেমন ধারণা প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন বিপরীত ভাষা ব্যবহারকারীদের ভাষাগত যোগ্যতার (linguistic competence) পূর্ণ পরিচয় সংগ্রহ। অপরাধজগতের ভাষা-গবেষণার ক্ষেত্রে শুধু ভাষাবিজ্ঞানগত প্রয়োগকৌশল নয় প্রতীক-বিজ্ঞানের (semioties) সাহায্য নেওয়ারও যৌক্তিকতা রয়েছে। প্রতীকবিজ্ঞানের পটভূমিকায় ভাষাবিজ্ঞান তথা অপরাধজগতের ভাষাবিষয়ক আলোচনা স্বতন্ত্র প্রবন্ধের অপেক্ষা রাখে। তবু প্রসঙ্গক্রমে দু-চার কথা বলা যায়।

ভাষাবিজ্ঞানের তুলনায় প্রতীকবিজ্ঞানের পরিধি বিস্তৃততর। প্রতীকবিজ্ঞানে আলোচিত বিষয়ের সীমানার মধ্যে ভাষা একটি অংশ মাত্র। আমরা জানি যে, মানুষের নিজেকে প্রকাশ করার জন্য বা পরস্পরের সঙ্গে ভাববিনিময় করার জন্য তার ভাষা এক ও অদ্বিতীয় প্রতীক নয়। যদিও প্রতীক হিসেবে ভাষার উৎকর্ষ অনস্বীকার্য। এখন শুধুমাত্র এই ভাষাগত প্রতীকগুলির আলোচনাই হল ভাষাবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। কিন্তু অপরদিকে প্রতীকবিজ্ঞানের অন্তর্গত হল, একটি মানবগোষ্ঠীর সংস্কৃতি বা জীবনচর্যার জগৎ, সেই জগতের প্রকাশক যাবতীয় ইঙ্গিত বা প্রতীক। ভাষায় ব্যবহৃত প্রতীকগুলির প্রকৃত তাৎপর্য সেই ভাষাগোষ্ঠীর সামগ্রিক সাংস্কৃতিক প্রতীক তথা আচরণের মধ্যে বিধৃত। তাই সেই সাংস্কৃতিক প্রতীকগুলির আলোকে বিচারণ করলে ভাষাগত প্রতীকগুলির ব্যাখ্যা পূর্ণতা পায় না।*

* এ প্রসঙ্গে ডঃ ভক্তিপ্রসাদ মল্লিকের "অপরাধ জগতের ভাষা" বইখানি উল্লেখযোগ্য।

চুল প্রসঙ্গে

বিভূতি মজুমদার*

চুল প্রসঙ্গে জ্ঞান ও বিজ্ঞান, জুন, জুলাই, 1981, সংখ্যায় একটি লেখা প্রকাশের পর লেখকের কাছে অনেকে আরও বহুবিধ প্রশ্ন করেন, ব্যক্তিগতভাবে বেশ কিছু চিঠিপত্রও আসে। প্রায় সমস্ত প্রশ্নই যেখানে এসে ঠেকে, তা হলো—খুসকি ও টাক এবং এদের কারণ ও প্রতিকার। আলোচনার সময় মনে হয়েছে এই প্রসঙ্গে সাধারণ ভাবে আরও কিছু বলা প্রয়োজন। কিন্তু নানা কারণে এতোদিন আর হয়ে ওঠে নি। বস্তুতঃ বিষয়টিতে মানুষের কৌতূহলের অন্ত নেই। আশা-নিরাশায় দুলতে দুলতে অনেকেই প্রসাধন ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপনের পিছনে ধাওয়া করে ক্লান্ত হন, বিভিন্ন টোটকারও শরণাপন্ন হন। খুসকি এক সময় প্রশমিত হয় বটে, কিন্তু টাকের বিস্তার চলতেই থাকে। অবশেষে নিতান্ত হতাশাতেই এই অন্বেষায় এক সময় ক্ষান্তি আসে। সাধারণ মানুষের এই অনুচ্চারিত অন্বেষা চিরকাল ধরে চলে আসছে। মূল সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের। ইতবসরে যতদূর তথ্য সংগৃহীত হল তার ওপর ভিত্তি করে এই নিবন্ধ লেখা হলো।

খুসকি (Dandruff): স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে প্রায় সকল স্তরের মানুষেরই খুসকি একটা বিরক্তিকর উপসর্গ। এতে কিঞ্চিত জ্বালা বা চুলকানির সঙ্গে মাছের আঁশের মতো মরা চামড়া স্বচ্ছ খোসার আকারে উৎপন্ন হয়। ক্রমে সারা মাথায় ছড়িয়ে পড়ে। সময় সময় মাথা ছাড়িয়ে ঘাড় পর্যন্ত নেমে আসে, এমন কি কারো কারো ভ্রূ, নাকের খাঁজ প্রভৃতি অঞ্চলেও বিস্তারলাভ করে থাকে। এর মিহি চূর্ণ চুলের গায়ে একটা আঠালো আস্তরণ সৃষ্টি করায় চুলের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য ঢাকা পড়ে যায়। বাড়াবাড়ি হলে সামগ্রিক ভাবে বেশ কিছু চুল উঠতে থাকে—বিশেষ করে 'সিবেরিক ওলিওসা'র ক্ষেত্রে। এর কারণ নিয়ে নানা রকম মতের সৃষ্টি হয়েছে। ইটালীর ডার্মাটোলজিস্ট Pucelleni বলেছেন,

> দেখা যায় যে লাতিন আমেরিকার দেশগুলির অধিবাসীদের তুলনায় অ্যাংলো স্যাক্সন ও স্ক্যাণ্ডেনেভীয়দের মধ্যে খুসকির প্রাবল্য বেশী। এর পিছনে জাতিগত বৈশিষ্ট্য, জলবায়ু কিম্বা খাদ্যাভ্যাসের কোন্‌টা কতখানি দায়ী তা নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। কিন্তু দেখা যায় 'জলবায়ু' বা 'জাতিগত বৈশিষ্ট্য' কোনক্রমেই কারণ হিসেবে টেকে না। বরঞ্চ সকল সম্ভাব্যতার বিচারে বলা যায় খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাত্রার প্রণালীর সঙ্গে এই রোগের একটা অপ্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে।

* রিসার্চ অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগ, বেঙ্গল কেমিক্যালস্ অ্যাণ্ড ফার্মাসিটিক্যালস্ লি, 164, মানিকতলা মেইন রোড, কলিকাতা-54

জীবনযাত্রার মান যতই উন্নত হবে, মানুষ ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি (personal hygiene) সম্পর্কে ততই বেশীমাত্রায় সচেতন হন আর সেই কারণেই খুস্কি সম্পর্কেও নিজের অগোচরেই বেশীমাত্রায় সচেতন হয়ে উঠে বিব্রত বোধ করতে থাকেন।

আসলে খুস্কি একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম মাত্র, বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের প্রচার পত্রিকাগুলিতে, এমন কি মেডিক্যাল জার্নালেও খুস্কি সম্পর্কে অনেক পরস্পর বিরোধী মতামত প্রকাশিত হয়। কারণ হিসাবে একটা কথাই বলা সঙ্গত হবে যে, এক একজন পর্যবেক্ষক হয়তো এক এক ধরনের খুস্কির চরিত্র লক্ষ্য করেছেন, সাধারণে সেটাকেই সাটা বলে ধরে নিয়ে বিভ্রান্ত হন। কাজেই ব্যাপারটা সামগ্রিকভাবে একটু খতিয়ে দেখা দরকার।

সাধারণতঃ খুস্কিকে 'মরামাস' বলা হয়। 'মাস' অর্থে মাংস না বুঝে যদি ত্বকের কোষ বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলে কথাটা ঠিকই। আগেই বলা হয়েছে এটা একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। প্রশ্নটা হলো, দৃশ্যমান না অদৃশ্যমান। মাথার ত্বকের মৃত কোষগুলি যখন দৃশ্যমান হয়ে খোসার আকারে বা মাছের আঁশের আকারে উঠে আসতে থাকে তখনই আমরা খুস্কি হয়েছে বলে বিব্রত হয়ে উঠি। তার সঙ্গে যদি চুলকানো বা জ্বালা প্রভৃতি উপসর্গ থাকে তো আমরা যথার্থই ব্যস্ত হয়ে উঠি প্রতিকারের জন্যে। অন্যথায় আমরা আমাদের দৃষ্টির অগোচরে প্রতিনিয়ত সংঘটিত প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে অনেক সময় দৃশ্যমান প্রক্রিয়াটিকে নিজের অজান্তেই ডেকে আনি।

ত্বকের বিভিন্ন স্তরের কোষগুলি নিরন্তর কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় এর উৎপাদন, বৃদ্ধি এবং ক্রমশঃ বাইরের দিকে চলন,—এপর্যায়ে গতিশীল ও পরিবর্তনশীল থাকে। বহিস্ত্বকের (epidermis) নীচের কোমল স্তরে (stratemmal-phighii এবং stratum germinatum) কোষগুলি জন্মায়, বিগুণিত হয় এবং পর্যায়ক্রমে বাইরের দিকে চলতে চলতে রূপান্তরিত হতে থাকে। যেমন বাইরের দিকে আসবার জন্য চাপ সৃষ্টি হয়, তেমন তেমন কোষগুলির আকৃতির পরিবর্তন হতে থাকে এবং তারা পরস্পর পিষ্ট হয়ে চ্যাপ্টা ও কঠিনতর প্রাপ্ত হয়। সেই সময় এদের গঠনেও কিছু জৈব রাসায়নিক পরিবর্তন হতে থাকে। কোষগুলি অন্তর্লীন জলীয় অংশ ও কোষের মধ্যে প্রবাহিত শরীররসের (lymph) যোগান থেকে বিচ্ছিন্ন ও বঞ্চিত হতে থাকে। ধীরে ধীরে কেরাটিনে রূপান্তর এবং অবশেষে মৃত কেরাটিন চূর্ণ হিসেবে আমাদের দৃষ্টির অগোচরে প্রতিনিয়তই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে ঝরে পড়তে থাকে। কিন্তু যখনই কোন কারণে বহিস্তরের এই ক্ষয়িষ্ণু অংশ অদৃশ্য চূর্ণ না হয়ে খোসার আকারে দৃশ্যমান হয়, তখনই খুস্কি হয়েছে বলে ধরা হয়। খুস্কি প্রধানতঃ দুই ধরণের (1) শুষ্ক (dry dandruff) এবং তৈলাক্ত (greasy dandruff)। শেষোক্তটিকে আবার সিবোরিক (seborrhoeic) বা সাধারণ (pityriasis simplex) খুস্কি বলা হয়ে থাকে।

তৈলাক্ত খুস্কিতে সাধারণতঃ সাবান বা শ্যাম্পু দিয়ে মাথা পরিষ্কার করার পর জল শুকিয়ে গেলে তখনকার মতো ত্বকের ওপর কোন চিহ্ন দেখা যায়না। কিন্তু শুষ্ক খুস্কি হলে পরিষ্কার করার পরও ত্বকের ওপর আঁশের অনুরূপ সাদা চিহ্ন বা সূক্ষ্ম ফাটল সুস্পষ্ট দেখা যায়। তবে উভয় ক্ষেত্রেই কয়েকদিন পর আবার একেবারে ঠিক আগের অবস্থাই প্রাপ্ত হয়।

খুস্কির হেতু (aetiology of dandruff)

সাধারণ খুস্কির কারণ প্রধানতঃ তিন প্রকার—

ক) ত্বকের কিংবা দেহযন্ত্রের অন্য কোন কার্যঘটিত ব্যত্যয়

খ) জীবাণুঘটিত (microbial) এবং

গ) উভয়তঃই

এই বিষয়ে আর একজন বিজ্ঞানী আই. আই. লুবো (I. I. Lubowe) আভ্যন্তরিণ ও বাহ্যিক কারণগুলিকে শ্রেণীভুক্ত করে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। আভ্যান্তরিণ কারণ—

1) হর্‌মোনের ভারসাম্যের গোলযোগ
2) বিপাকীয় ও পুষ্টির দুর্বলতা (impared metabolic & nutritional function)
3) খাদ্যঘটিত (dietory factor)

বাহ্যিক কারণ—

1) ত্বকের জৈব রাসায়নিক পরিবর্তন
2) ব্যাকটিরিয়া ও ফাংগাস প্রভৃতির তৎপরতার আধিক্য
3) ঔষধ বা প্রসাধনী দ্রব্যের অপরিমিত ব্যবহারজনিত প্রতিক্রিয়া ও স্থানীয় প্রদাহজনক অবস্থা

শুষ্ক খুস্কির কারণ প্রধানতঃ আভ্যন্তরিক, অন্যান্য কারণগুলি একে আরও বাড়িয়ে তোলে মাত্র।

মাথার ত্বকে অন্ততঃ পাঁচশ ধরণের ব্যাকটিরিয়া এবং পনের ধরণের ঈস্ট এর সন্ধান পাওয়া গেছে। এরা দলবদ্ধভাবে চুলের গোড়ায় সঞ্চিত বা ছড়িয়ে পড়া সিবাম (sebum)-এর স্তরে বাসা বেঁধে থাকে ও নিশ্চিন্তে বংশবিস্তার করে। সিবামের ক্ষরণ বেশী হলে এদের তৎপরতাও খুব বেড়ে যায় এবং খুস্কির দাপটও বেড়ে যায়। সকলকে সমানভাবে দায়ী করা না গেলেও পিটাই রোস্পোরাম ওভেল (pityrosporum ovale) নামক ঈস্ট যে প্রধান আসামী সেটা সুনিশ্চিত ভাবে সনাক্ত করা গেছে। বহু আগেই অর্থাৎ 1874 খৃস্টাব্দে 'ম্যালাসেজ খুস্কির মধ্যে এই ঈস্টকে আবিষ্কার করেন। পরে সুইফট ও ডানবার এ সম্পর্কে গবেষণা করেন এবং প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেন। পরবর্তীকালে এটাও প্রমাণিত হয় যে এই জীবাণুগুলি ত্বকের স্বাভাবিক সুরক্ষা প্রদানকারী উপাদানগুলিকে নষ্ট করতে থাকে। যাই হোক এদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্টভাবে ব্যবস্থা অবলম্বনে সুস্পষ্ট ফল পাওয়া যাচ্ছে। খুস্কি সম্পর্কে সাধারণ ভাবে আরও কয়েকটি পর্যবেক্ষণ উল্লেখ করা উচিত।

1) শুষ্ক খুসকি সাধারণতঃ ত্বকের জৈব রাসায়নিক গোলযোগের ফলেই উৎপত্তি হয়। এই রোগে অ্যালকোহলে যুক্ত লোসন,তীব্র কোন জীবাণুনাশক ঔষধ, ক্ষারীয় সাবান, যে কোন ধরনের শাম্পু, চুলে ঢেউ খেলানোর লোসান, জোরে মাথা আঁচড়ানো বা চুলকানো ক্ষতিকারক। নন-আয়নিক বা অ্যামফোটারিক শ্যাম্পু দিয়ে মাথা পরিষ্কার রাখা এবং ত্বকের আদ্রতা নিয়ন্ত্রক স্নিগ্ধ কোন লোসন-এর বাহ্য প্রয়োগ হিসেবে ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরিক চিকিৎসাই রোগ মুক্তির পথ।

2) সাধারণ খুসকিতেও জোরে চিরুনী চালানো ক্ষতিকারক। সাধারণ সাবান বা শ্যাম্পু দিয়ে মাথা পরিষ্কার রাখার সঙ্গে সঙ্গে অ্যালকোহলযুক্ত লোসন দিয়ে সিবোরিক আবর্জনা মুক্ত রাখা ও মাঝে মাঝে জীবাণুনাশক লোসন ব্যবহারে নিশ্চিত ফল হয়।

3) সাধারণ খুসকি আট-দশ বৎসর বয়েসের নীচে কদাচিৎ দেখা যায়। বয়ঃসন্ধির সময় থেকেই এর সূত্রপাত। যৌবন সমাগমে এর বিড়ম্বনা সর্বাধিক। আবার ত্রিশ বৎসর বয়েসের পর এর প্রকোপ খুবই কম দেখা যায়। সেই কারণে খুসকিকে যৌবনের একটা উপসর্গ হিসেবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। যৌবন সমাগমে সিবেসাস গ্রন্থির পুষ্টি ও ক্ষরণ-শীলতার আধিক্যই জীবাণুদের জন্য অনুকূল পরিবেশের সুযোগ এনে দেয়। কাজেই যৌবনের প্রারম্ভ থেকেই ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস এবং মাঝে মধ্যে কিছু জীবাণুনাশক দ্রব্যের সীমিত ব্যবহারে খুসকির বিড়ম্বনা থেকে অনেকখানি মুক্ত থাকা যায়।

সাধারণতঃ বেশীর ভাগ মানুষের কাছে খুসকির চিকিৎসার অর্থ হচ্ছে, এমন কোন সুবিধাজনক বাহ্য প্রয়োগ যা ব্যবহারে অন্ততঃ আট-দশ দিনের জন্য খুসকি প্রশমিত থাকে অর্থাৎ সপ্তাহান্তে একবার ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে বরাবরের জন্য এই উপসর্গ থেকে মুক্ত থাকা যাবে। কাজেই খুসকির প্রতিকারের জন্য চিকিৎসকের চাইতে প্রসাধন নির্মাতাদের বিজ্ঞাপনেরই কদর বেশী। বাজারে বিভিন্ন ধরণের খুসকিনাশক লোশন বা শ্যাম্পু চালু আছে। এ প্রসঙ্গে দুচার কথা বলা প্রয়োজন। বিনা প্রয়োজনে কিংবা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনাবশ্যক ভাবে এগুলি ব্যবহার করা উচিত নয়। পারদ বা সিলেনিয়ামযুক্ত প্রয়োগ সাধারণতঃ এড়িয়ে চলা উচিত। ব্যবহার করতে হলে কেবলমাত্র চিকিৎসকের পরামর্শমত স্বল্প সময়ের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। রিসর্সিনল হল খুসকিনাশক আর একটি অতি প্রচলিত উপাদান। এটির ব্যবহারও খুবই সংযতভাবে ও নিয়ন্ত্রণ সহকারে হওয়া উচিত। শরীরের অনেকটা জায়গা জুড়ে বেশীদিন ধরে রিসর্সিনলের প্রলেপ থাইরয়েড গ্রন্থির স্বাভাবিক ক্রিয়া ব্যাহত করে। এর থেকে মিক্সোডিমা বা হাইপো-থাই-রয়েডিজ্‌ম্ নামক বৈকল্য ঘটেও নানারূপ জটিলতার সৃষ্টি হয়ে থাকে। এইরূপ জীবাণুনাশক দ্রব্যগুলির বহুবিধ সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া প্রমাণিত। মাত্রা ছাড়া ব্যবহার মারাত্মক পরবর্তী-ফল (after effect) এনে দিতে পারে। অবশ্য কিছু নির্দোষ ঔষধও পাওয়া যায়। যেমন বহু পুরাণো জিনিষ গন্ধক একটা ভাল জীবাণুনাশক। একবার প্রয়োগে মোল থেকে চব্বিশ ঘণ্টাব্যাপী ত্বকের অভ্যন্তরে এর ক্রিয়া বর্তমান থাকে। অ্যালকোহলে অর্ধক্ষিপ্ত গন্ধকের দ্রবণ একটা ভাল বাহ্য প্রয়োগ। কিন্তু খুসকি যেহেতু একটা রোগ, এর নিরাময়ের জন্য চিকিৎসকের নির্দেশিকাই একমাত্র নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ ব্যবস্থা।

অথ ইন্দ্রলুপ্ত কথা

টাক সম্পর্কে কথা বলতে যাবার আগে চুলের উৎপাদন ও বৃদ্ধির বিষয়ে দু-চারটি তথ্য উল্লেখ করা দরকার। কেশদণ্ডের (hair shaft) যে অংশ ত্বকের মধ্যে প্রোথিত থাকে সেই কেশমূলকে (hair root) ঘিরে বিদ্যমান হেয়ার ফলিকল্ ও পেপিলার অভ্যন্তরে কোষ বিভাজন এবং কোষের মধ্যে প্রোটিন সংশ্লেষের ফলেই কেশের সৃষ্টি ও পুষ্টি হয়। চুল এবং ফলিকল্ উপত্বকীয় উপাঙ্গ হলেও এরা চুলের গোড়ার কেশকন্দ (hair bulb) ঘিরে অবস্থানকারী ত্বকীয় পেপিলার সঙ্গে ওতপ্রোত। হেয়ার ফলিকল থেকে কি ধরনের চুল উৎপন্ন হবে তা পেপিলার ওপরই নির্ভর করে।

মানুষের মাথায় মোটামুটি সওয়া লক্ষ হেয়ার ফলিকলের মধ্যে সবগুলি সবসময় একই সঙ্গে সমান ভাবে সৃজনশীল দশায় (anagen phase) থাকে না। ফলিকলগুলির সাময়িক বিশ্রামদশায় (talogen catagen phase) দৈনিক গড়ে একশত মত চুল নিজে থেকেই উন্মুলিত হয়ে ঝরে যায়। যাদের মাথার চুলের স্বাস্থ্য ভাল অর্থাৎ টাকের আক্রমণ ঘটে নি তাদের হেয়ার ফলিকলগুলি হপ্তা তিনেকের মধ্যেই আবার বিশ্রামদশা কাটিয়ে পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে এবং নূতন কেশের উদ্‌গম ঘটায়। কোন নির্দিষ্ট ফলিকলে চুলের "উৎপাদনশীলতা—পতন—পুনরুৎপাদন" এই চক্র প্রায় তিন বছর ধরে ব্যাপ্ত থাকে। এই সময়ের মধ্যে সুকেশীদের ক্ষেত্রে সৃজনশীল দশার ব্যাপ্তি প্রায় সবটাই, বিশ্রামদশার স্থায়িত্ব বড় জোর তিন সপ্তাহ থেকে মাস তিনেক পর্যন্ত হতে পারে। টাকে আক্রান্ত মাথায় অবস্থাটা বিপরীত। অর্থাৎ এই চক্রের মধ্যেকার বিশ্রামদশার স্থায়িত্বকাল বাড়তে থাকে ও সৃজনশীল দশার স্থায়িত্বকাল কমতে থাকে এবং একসময় ফলিকলটি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তখনই সেই বিন্দুতে হয় টাকের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

চুলের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণকারী হেয়ার ফলিকলের সৃজনশীল দশায় বিরাজমান থাকা কিংবা বিশ্রামদশার নিষ্ক্রিয়তা কাটিয়ে তুলে পুনরায় তাকে সৃজনশীল দশায় ফিরে আসার জন্য দায়ী সকল সম্ভাব্য কারণ (factor) সম্পর্কে বহু গবেষক কাজ

Type alopecia)। এই বিশেষ চরিত্রের টাক চিরকাল ধরেই জানা আছে, হিপোক্রিটের সময়েও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। ললাটের দুই পার্শ্ব চুল পাতলা ও শূন্য হতে হতে মাথার ওপরের দিকে চলতে থাকে এবং চুলের সীমারেখা অবশেষে ইংরাজী 'M' অক্ষরের আকার ধারণ করে। পরবর্তী স্তরে কেশ পতন আরও বাড়তে থাকে এবং খুলির বিরাট অংশ জুড়ে বিস্তার লাভ করে। সাধারণতঃ আঠারো থেকে কুড়ি বৎসর বয়েসেই এর লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং ত্রিশ বৎসর বয়েসেই চিন্তায় প্রায় সম্পূর্ণতা পায়। এর পরে টাকের বিস্তার ঘটে অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে এবং মাথার উর্ধ্বাংশে সামগ্রিকভাবে কেশস্বল্পতার আক্রমণ চলতেই থাকে।

বেশী বিশ্লেষণের মধ্যে না গিয়ে একথা পরিষ্কার করে বলা ভাল যে অ্যালোপেসিয়া এরিয়াটার পিছনের কারণ ও প্রতিকার সম্ভব হলেও এবং সিবোরিয়া (seborrhoea) যুক্ত অ্যালোপেসিয়ার ক্ষেত্রে নিরাময়ের দাবী থাকলেও M-আকৃতির টাক (male pattern baldness)-এর সুনির্দিষ্ট কারণ বা প্রতিকারের প্রশ্নটি এখন রহস্যের প্রায়ান্ধকারে আবৃত তবে যৌনতা অর্থাৎ পুংহর্মোন (androgen)-কে প্রধানত দায়ী করা হয়। যৌনতা টাকের ক্ষেত্রে তিন ভাবে প্রভাব ফেলে —

ক) যৌন লক্ষণ হিসেবে অর্থাৎ হর্মোনের প্রভাব

খ) বংশগতি, অথবা

গ) উভয়ের মিশ্র প্রভাব.

হর্মোন ও টাকের সম্পর্ক নিয়ে বিস্তর গবেষণা চলেছে। এই সম্পর্কে J. B. Hamilton বলেছেন "male hormone stimulation is prerequisite and incitant in common baldness"। তিনি দেখিয়েছেন, বংশগতি (heridity) এবং মানবদেহে হর্মোন নিঃসরণের 'একটা নির্দিষ্ট মাত্রার' ওপর টাক নির্ভরশীল। মেয়েদের বেলায় 'এই মাত্রা' কদাচিত দেখা গেলেও পুরুষদের বেলা নিতান্তই স্বাভাবিক অর্থাৎ শুধু হর্মোনের প্রভাবই সবটা নয়। তাঁর আরও পর্যবেক্ষণগুলি বেশ চমকপ্রদ।

ক) বয়ঃসন্ধির পূর্বে খোজা করা হয়েছে এমন ব্যক্তিদের টাক হয় না।

খ) টাক সবে সুরু হয়েছে এমন অবস্থায় খোজা করা হয়েছে এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে টাকের প্রসার স্তব্ধ হয়ে গেছে।

গ) বিভিন্ন দুর্ঘটনা বা অন্য কোন কারণে বয়ঃসন্ধির আগে যৌনক্ষমতা হারিয়েছে এমন 54 জন পুরুষকে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে তাদের কারো টাক হয় নি। আবার তাদের দেহে হর্মোনের ভারসাম্য পরিবর্তন করার জন্য পুংহর্মোন প্রয়োগের পর অনেকেরই টাক পড়তে দেখা গেছে।

ঘ) বয়ঃসন্ধির পূর্বে খোজা করা হয়েছে এম 12 জনকে টেস্টোস্টেরন ইনজেকশন নিয়মিত করে দেখা গেছে 4 জনের টাক পড়া সুরু হয়েছে। এই চার জন এমন পরিবারের থেকে এসেছে যাদের পরিবারে পুরুষদের মাথায় টাক ছিল। বাকী আটজনের পরিবারে পুরুষদের টাকের চিহ্ন ছিল না।

ঙ) বংশগতির ব্যাপারে টাকের ক্ষেত্রে মাতৃকুলের প্রবণতাই পরিলক্ষিত হয়।

চ) Male type baldness-এর লক্ষণযুক্ত কয়েকজন মহিলাও ডায়াবেটিস কিংবা অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স প্রভৃতি স্থানে পুরুষসুলভ টিউমার বহন করছে দেখা গেছে।

চুলের উৎপাদন ও পিটুইটারী

A. Rook বলেছেন অ্যান্টিরিয়র পিটুইটারী প্রভাবে অ্যাড্রেনালিন গ্রান্থির ক্ষরণ চুলের উৎপাদন ও বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রন করে। সবিশেষ বলতে গেলে এই বৃদ্ধিকারক হর্মোন (growth hormone) চুলের পুষ্টি ও কেশদণ্ডের ব্যাসের নিয়ন্ত্রক এবং এর প্রভাব সারা জীবন ধরেই মোটামুটি সক্রিয় থাকতে পারে। তবে অন্য বেশ কিছু উপাদানেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। T. M. Robert এই রকমই একটি উপাদান বিশ্লিষ্ট করে ডার্মাট্রোপিক হর্মোন (dermatropic hormone) নাম দিয়েছেন। তিনি দাবী করেছেন যে, এই বস্তু প্রয়োগে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে এমন হেয়ার ফলিকল্ ও পেপিলাকে পুনরুজ্জীবিত করে চুলের পুনরুৎপাদন ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি পরীক্ষাগারে ইঁদুরের ওপর পরীক্ষা-নীরিক্ষায় সফল হয়ে মানুষের ওপরও পরীক্ষা চালান। তাঁর দাবী পঞ্চাশজন চিকিৎসকের রিপোর্ট অনুসারে এই হর্মোন প্রয়োগে টাকে চুল গজিয়েছে। নূতন চুলের আকৃতি প্রকৃতি পুরানো চুলেরই অনুরূপ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য নেতিবাচক রিপোর্টও এসেছে। সে ক্ষেত্রে রবার্টের মত হল সঠিক মাত্রা নির্ধারণের ভ্রান্তিই কারণ। এ. রুক পরিস্থিতির উপসংহার টেনেছেন এইভাবে—'that disturbances in hair pattern is caused by excessive or deficient stimulator of the hair folicle by androgens, somatrophin or by genetically determined defects in folicular response'.

যদি উপরের দাবী সঠিক হয় অর্থাৎ যথার্থ dermatropic hormone বিশ্লিষ্ট করা হয়ে থাকে, তা হলেও বংশগতির ব্যাপারটা থেকেই যাচ্ছে। হয়তো উত্তরাধিকার সূত্র প্রাপ্ত হর্মোন 'কিছু কারণ' (factor) টেকো ব্যক্তিরা বহন করেন যা তথাকথিত ডার্মাট্রোপিক হর্মোনের প্রভাবকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। তবুও মনে হয় বহু যুগের এই সমস্যাটি, হয়তো একটা কিনারায় এসে পৌঁছানোর অবস্থায় এসেছে। শেষ করার আগে আরও দু একটি কথা না বললে বিষয়টি অসম্পূর্ণ থেকে যায়, যেমন—

1) চুল কাটা বা কামানোর সঙ্গে চুলের উৎপাদন বা বৃদ্ধির কোন সম্পর্ক নাই। দেখা গেছে, কামানোর প্রথম চার-পাঁচ ঘণ্টা বৃদ্ধির হার কিছুটা বেশী হয় ঠিকই, তারপরেই আবার পুরানো হারই বহাল থাকে। দাড়ি কামানোর ফলে

চুলের উৎপাদন বা বৃদ্ধির উন্নতি লক্ষিত হলেও সেখানে নিয়মিত ঘর্ষণজনিত কারণই প্রধান বলে মনে করা সঙ্গত।

2) নিয়মিত ঘর্ষণজনিত বা অন্যকোন বাহ্য কারণে স্থানীয় উত্তেজনা বা জ্বালা সৃষ্টি করে দেখা গেছে হেয়ার ফলিকলের সৃজনশীল অবস্থা দীর্ঘায়িত হয়, চুলের উৎপাদন ত্বরান্বিত ও সতেজ হয়। নিয়মিত ম্যাসাজ একটা বহু প্রচলিত পদ্ধতি। একই কারণে সূক্ষ্ম মাত্রায় ক্যান্থারাইডিন, পিলো কার্পিন, বেঞ্জাইল নিকোটিনেট প্রভৃতি জ্বালাসৃষ্টিকারক (counter irritant) রাসায়নিক দ্রব্যের বাহ্য প্রয়োগ দীর্ঘকালব্যাপী প্রতিষ্ঠিত। এই দ্রব্যগুলি ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে ফলিকলগুলিকে দীর্ঘক্ষণধরে উত্তেজিত রাখে এবং সক্রিয় বা সৃজনশীল থাকতে সাহায্য করে।

3) যদিও চুলের যত্ন পরিচর্যা, বিভিন্ন প্রসাধনীর সুফল-কুফল একটা পৃথক ও দীর্ঘ অধ্যায় এবং এ সম্পর্কে বহু কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে তথাপি দু-একটি উৎপাদনের উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করা উচিত। যথা, ভিটামিন-বি গ্রুপের একটি উপাদান Panthenol-এর ব্যবহার আজকাল খুব দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন পরীক্ষার রিপোর্টে দাবী করা হয় এই দ্রব্যের প্রয়োগে ত্বকের স্বাস্থ্য ভাল হয় এবং চুলের ব্যাস ও ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়।

এছাড়া ভিটামিন 'এইচ' অর্থাৎ বায়োটিন, ভিটামিন 'কে' বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড, জৈব গন্ধক (biosulpher) এমন কি ভিটামিন 'বি' গ্রুপের অন্যান্য উপাদানের পক্ষে নানা দাবী করা হচ্ছে।

কিছু আধুনিক প্রসাধন প্রতিষ্ঠান প্রাকৃতিক উৎস থেকে নিষ্কাশিত নির্যাস (extract) ব্যবহারের পক্ষে প্রচার করছেন। কিন্তু প্রমাণাদি ও তথ্য সহকারে এই সব দাবী প্রতিষ্ঠিত হবার অপেক্ষা রাখে।

উল্লিখিত সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্যের বিভিন্ন অনুপাতে প্রস্তুত মিশ্রণ বা তথাকথিত হেয়ার টনিকগুলির সম্পর্কে ন্যায্য কারণেই পরস্পর বিরোধী মতামত বিদ্যমান। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু উপকার পাওয়া গেলেও কোনটিতেই সাধারণ টাক (common baldness) সেরে গিয়ে টাক মাথায় আবার আগের মতো সুন্দর চুলের শোভা বিরাজ করবে এমন নিশ্চয়তা এখনও কেউ দিতে পারে না। পরিশেষে একথাই বলা যায় যে বংশগতির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ এবং হর্মোনের ভারসাম্যের জটিল প্রভাব ও তার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সফলতা লাভ না করা পর্যন্ত সাধারণভাবে পুরুষদের মাথায় যত্র তত্র টাকের পেলব সৌন্দর্য আমাদের দেখে যেতেই হচ্ছে।

মুক্তা

শশধর বিশ্বাস*

আদিমকাল থেকে মানুষ দুর্লভ রত্নের সন্ধানে বিশ্বচরাচর তোলপাড় করছে। এইভাবে সে মাটির নিচে হীরক ও অন্যান্য রত্নের সন্ধান পেয়েছে। আবার সমুদ্রগর্ভে সে মুক্তার সন্ধানও পেয়েছে। তার অনুসন্ধানের পরিধি গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ধাবমান।

অসীম সমুদ্র সম্বন্ধে মানুষের অভিজ্ঞতা অতি সামান্য মানুষ দ্বারা আহৃত জীবিত পদার্থ থেকে জাত মুক্তাকে জান্তব রত্ন পদার্থ বলে ; ইংরাজিতে পার্ল (pearl). ফরাসী ও জার্মানীতে পারলি (pearle), স্পেন ও ইতালিয়ান ভাষায় পার্লো (pearlo) ও পার্লা (pearla) বলে। বহু প্রাচীনকাল থেকে মানুষ মুক্তার ব্যবহার করে আসছে। বিখ্যাত পণ্ডিত প্লিনি মুক্তাকে হীরার পরেই স্থান দিয়েছেন অমূল্য রত্নের মধ্যে। প্রবাল ও হস্তিদন্তের মত মুক্তা জীবদেহ হতে জাত। কৃত্রিম উপায়ে জাত মুক্তা সাধারণ মুক্তার চেয়ে দামে কম। আমাদের প্রাচীন সাহিত্য যথা— অগ্নিপুরাণ, পদ্মপুরাণ, শুক্রসার শুক্র নীতি, মৎস্যপুরাণ প্রভৃতিতে মুক্তার বর্ণনা, প্রাণীবিভাগ উৎপত্তি, বিশুদ্ধতার বর্ণনা আছে। বিদেশের বহু প্রাচীন গ্রন্থেও মুক্তার উল্লেখ আছে। বাইবেলের ওল্ডটেস্টামেন্ট ও নিউটেস্টামেন্টে মুক্তার আলোচনা হয়েছে। চীন, গ্রীস, মিশর, সিংহলের প্রাচীন সাহিত্যগুলিতে মুক্তার প্রশংসা আলোচিত হয়েছে। রোম সাম্রাজ্যে একদা এো একরকম নিয়মই ছিল যে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি ছাড়া মুক্তা ব্যবহার দণ্ডনীয় অপরাধ।

প্রাচীনকালে জহরতের মধ্যে মুক্তার স্থান ছিল শীর্ষে। বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসনে 200 গ্রেণ মুক্তা খচিত ছিল। সিংহলের মুক্তা রাজস্বের একটা দীর্ঘকালের বড় উৎস। স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপের সংগৃহীত 1250 গ্রেণের ওজনের পায়রার ডিমের মত একটি মুক্তা ছিল। জুলিয়াস সিজার মুক্তা খুব ভালবাসতেন এবং তার নিজস্ব মুক্তার সংগ্রহশালা ছিল। পরিব্রাজক টাভার্নিয়ার একদা 80,000 পাঃ এ পারস্যের শাহকে একটি মুক্তা বিক্রয় করেন। খ্রীঃ পূঃ 550 সালে রাজা বিজয় তার সিংহলের শ্বশুরকে প্রচুর মুক্তা উপঢৌকন দেন এবং সেইসময় অনুরাধাপুরের রাজপ্রাসাদ মুক্তা খচিত ছিল। বিখ্যাত শুভ্র রং-এর এবং $111\frac{1}{2}$ পার্ল গ্রেন ওজনের "লা-পাল্লিগ্রিনার"

* অবসরপ্রাপ্ত—ইউকো ব্যাঙ্ক, বড়বাজার শাখা

বিনা মাটিতে চাষ

রাধাগোবিন্দ মাইতি*

ছেলেবেলা থেকে আমরা দেখে আসছি যে গাছ জন্মায় মাটিতে। চাষীর কাছে তার মাটি আর ফসল অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মাটি না থাকলে ফসল ফলাবার কথা সে ভাবতেই পারে না। একজন বৈজ্ঞানিকের ধারণা কিন্তু তা নয়। তাঁর দৃষ্টিতে—মাটি ব্যবহার করা হয় কেবল গাছকে ধরে রাখা আর গাছের জন্য জল ও খাবার জমিয়ে রাখার জন্য। গাছের জীবনধারণের জন্য যা অত্যাবশ্যক—তা হল জল এবং খাবার। যদি গাছকে খাড়া রাখার এবং জল ও খাবার অন্যভাবে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে মাটি ছাড়াই গাছ করা যেতে পারে। বিনা মাটিতে চাষ করার স্বপক্ষে এই হল বৈজ্ঞানিক অনুসিদ্ধান্ত।

গবেষণার ফলে জানা গেছে—গাছের খাবার যে মৌলগুলি দিয়ে তৈরি হয় তাদের মধ্যে প্রধান হল নাইট্রোজেন, ফসফোরাস, পটাশ, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সালফার (গন্ধক), আয়রন (লোহা), কপার (তামা), জিঙ্ক (দস্তা), বোরণ, ম্যাঙ্গানিজ আর মলিবডেনাম। এর মধ্যে প্রথম ছটি লাগে একটু বেশি পরিমাণে, আর বাকীগুলি লাগে নামমাত্র। এই মৌলগুলি মাটিতে যথেষ্ট থাকলে এবং সঠিক পরিমাণে থাকলে গাছ বাড়ে ভাল; কম থাকলে বাড়ে না। (কোন কোন ক্ষেত্রে বেশি থাকলেও গাছের ক্ষতি হয়)। তখন এগুলি সরবরাহ করতে হয় বাইরে থেকে। গাছ তার খাবার জলে দ্রবীভূত অবস্থায় শিকড় দিয়ে শরীরের ভিতর টেনে নেয়। যদি এমন কতকগুলি রাসায়নিক এমনভাবে মেশান যায়—যার মধ্যে এই মৌলগুলির সমাবেশ সঠিক পরিমাণে ঘটে, তবে জলের সেই মিশ্রনের দ্রবণ তৈরি করে গাছকে খাওয়ালে মাটি ছাড়াই গাছ বাড়বে আর ফুল-ফল দেবে। বিনা মাটিতে চাষের এই হল প্রযুক্তিগত অনুসিদ্ধান্ত।

গোড়ায় জল দিলে তবেই গাছ বাঁচে আর বাড়ে, জলের অভাবে মরে যায়। তাই আগেকার দিনে লোকের ধারণা ছিল জলই গাছের একমাত্র খাবার। আজ থেকে প্রায় তিন শ বছর আগে 1699 খৃস্টাব্দে জন উডওয়ার্ড নামে একজন ইংরেজ এ বিষয়ে একটা পরীক্ষা করেন। তিনি একটা পাত্রে নিলেন শুধু জল আর একটা পাত্রে নিলেন মাটি ভিজিয়ে তার থেকে ছেঁকে নেওয়া স্বচ্ছ জল। তারপর দুটি পাত্রেই লাগিয়ে দিলেন পুদিনার গাছ। মাটি ভেজান জলে পুদিনা বেশ বড়সড় হয়ে বাড়তে লাগল; কিন্তু শুধু জলে লাগান গাছগুলি কিছুদিন পরে ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে মরে গেল। এই থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, জলে নয়—মাটিতেই আছে গাছের খাবার।

এইভাবে আরও বহুলোক বহু পরীক্ষা চালাতে লাগলেন। কিন্তু তখনকার দিনে উন্নত যন্ত্রপাতি ছিল না। তাই কোন পরীক্ষাই ঠিক খবরটি দিতে পারল না। উডওয়ার্ডের প্রায় একশ বছর পরেও দ্য সসারে (DE SAUSSURE) নামে এক ফরাসী বিজ্ঞানী বললেন—"গাছের শরীর মাটি, জল, হাওয়া এই তিনটি জিনিস দিয়ে তৈরি"। সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি আর সঠিক পরীক্ষা পদ্ধতির অভাবে আরও বহুদিন এ বিষয়ে কোন বৈজ্ঞানিক সত্যে পৌঁছান সম্ভব হয় নি।

1860 খৃস্টাব্দের কাছাকাছি অনেক বিজ্ঞানী এ বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্যাক্স (Sachs) ও নপ্ (Knop) নামে দুজন জার্মান। তাঁরা বিভিন্ন রাসায়নিক পৃথক ও মিশ্রভাবে নিয়ে পরিশ্রুত জলে দ্রবণ তৈরি করলেন। তারপর সেই দ্রবণ আলাদা আলাদা কাচের পাত্রে নিয়ে তাতে লাগালেন গাছ এবং পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন গাছের বৃদ্ধি। এই পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ল যে বাতাস থেকে পাওয়া কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন ছাড়াও গাছের প্রয়োজন নাইট্রোজেন, ফসফোরাস, পটাশ, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সালফার এবং আয়রন। মাত্র এই দশটি মৌল যে গাছের পক্ষে অত্যাবশ্যক—এ ধারণা চালু ছিল বহুকাল। পরে এই তালিকায় যুক্ত হয় তামা, দস্তা, বোরন, ম্যাঙ্গানীজ ও মলিবডেনাম।

জলে দ্রবীভূত রাসায়নিক সাহায্যে গাছ করার তথ্য বহুদিন কেবল পরীক্ষাগারেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই তথ্যকে ফসল ফলানর কাজে প্রথম ব্যবহার করেন গেরিক সাহেব (W. F. Gericke)। তিনি ছিলেন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক। 1929 খৃস্টাব্দের কথা। গাছের প্রয়োজনীয় রাসায়নিকগুলি সঠিক পরিমাণে জলে মিশিয়ে তিনি তাতে লাগালেন টম্যাটো গাছ। তারপর যে ব্যাপারটা ঘটল এককথায় তা বিস্ময়কর। টম্যাটো গাছ বাড়তে বাড়তে পৌঁছে গেল প্রায় 25 ফুট উঁচুতে, আর টম্যাটো ফলল গাছ ভরে। মই-এ চড়ে টম্যাটো তুলতে থাকা অবস্থায় গেরিক সাহেবের ছবি ছাপা হল খবরের কাগজে। খবর ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। ক্রমে ক্রমে ক্যালিফোর্নিয়া, ওহায়ো, ফ্লোরিডা, ইংলণ্ড, জাপান প্রভৃতি দেশে এই প্রথায় ফসল ফলানোর চেষ্টা চালু হয়ে গেল।

ভারতবর্ষও বাদ গেল না। 1946 খৃস্টাব্দে জে. শোল্টো ডগলাস (J. Sholto Douglas) নামে এক ভদ্রলোক কালিম্পংএ বিনা মাটিতে চাষের উপর পরীক্ষা সুরু করে দিলেন। দীর্ঘ গবেষণায় তিনি গেরিক সাহেবের আবিষ্কৃত পদ্ধতির অনেক

---

* বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, নদীয়া

অদল-বদল করে এ দেশের উপযোগী করে তুললেন। দুগলাস ও শ্রীবিজয় কুমার চট্টোপাধ্যায়ও এ বিষয়ে অনেক কাজ করেছেন। ডগলাস সাহেব ইংরেজীতে এবং শ্রীচট্টোপাধ্যায় বাংলাতে এ বিষয়ে একখানি করে ছোট অথচ সুন্দর বই লিখেছেন। পশ্চিমবাংলার যাঁরা বিনা মাটিতে ফসল ফলাতে চান তাঁদের জন্য এই বই দুখানি অবশ্য পাঠ্য। তাছাড়া গেরিক সাহেব থেকে সুরু করে অনেক বিদেশী লেখক এ বিষয়ে ভাল ভাল বই লিখেছেন।

বিনা মাটিতে গাছ করার উপর পরীক্ষার প্রথম পর্বে জলে রাসায়নিক মিশিয়ে তাতে গাছ লাগান হত। এই পদ্ধতির প্রধান অসুবিধা ছিল গাছকে দাঁড় করিয়ে রাখা। দু চারটা গাছ না হয় কাঠির সঙ্গে বেঁধে দেওয়া যায়। কিন্তু এই পদ্ধতিতে চাষ করতে হলে তো বহু গাছ লাগাতে হবে। অত গাছের প্রত্যেকটিকে কাঠির সঙ্গে বেঁধে বেঁধে খাড়া রাখা বেশ একটা জবরজং ব্যাপার। তাই পরবর্তীকালে জলের পরিবর্তে নেওয়া হল বালি, কয়লার ছাই, ইঁটের টুকরো, নুড়ি, পাথর প্রভৃতি। এইসব শক্ত জিনিষের উপর লাগালে গাছ শিকড়ের সাহায্যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে। এই জিনিষগুলো আলাদা আলাদা নিয়ে বা এদের দু-তিনটি একসঙ্গে মিশিয়ে গাছ লাগানর উপযোগী একটা মিশ্রণ তৈরি করা হল।

এরপর তৈরি হল উদ্ভিদ-খাদ্যের মিশ্রণ। যে মৌলগুলি গাছের জন্য খুব কম পরিমাণে দরকার সেগুলির একটি শুকনো মিশ্রণ তৈরি হল তিন গ্রাম জিঙ্ক সালফেট, নয় গ্রাম ম্যাঙ্গানিজ সালফেট, সাত গ্রাম বোরিক অ্যাসিড, তিন গ্রাম কপার সালফেট এবং দশ গ্রাম ফেরাস সালফেট মিশিয়ে। এই মিশ্রণের 200 মিলিগ্রামের সঙ্গে 40 গ্রাম অ্যামোনিয়াম সালফেট, 55 গ্রাম অ্যামোনিয়াম ফসফেট, 30 গ্রাম মিউরিয়েট অব পটাশ, 20 গ্রাম ক্যালসিয়াম সালফেট এবং 30 গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম সালফেট মিশিয়ে তৈরি হল পূর্ণ উদ্ভিদ-খাদ্য। (বিনা মাটিতে চাষের জন্য আরও নানা রকমভাবে উদ্ভিদ খাদ্যের মিশ্রণ তৈরি করা যায়)।

বিনা মাটিতে চাষের পদ্ধতি নিম্নরূপ—

প্রথমে মাটির টব, কাঠের বাক্স, লোহা বা অ্যালুমিনিয়ামের ট্রে অথবা এই ধরণের কোন জিনিষের মধ্যে 15 থেকে 20 সেন্টিমিটার পুরু করে বালি, ইঁটের টুকরো প্রভৃতি বা তাদের মিশ্রণ ভরে তাতে গাছ লাগাতে হবে। বরাবরের জন্য কোথাও বিনা মাটিতে চাষের ব্যবস্থা করতে হলে সিমেন্টের চৌবাচ্চা তৈরি করে নেওয়া ভাল। এই চৌবাচ্চা গভীরতায় হবে 30 সেন্টিমিটার এবং চওড়ায় এক থেকে সোওয়া মিটার। চৌবাচ্চার লম্বা হবে প্রয়োজনমত। চারা তৈরি করতে হবে পরিষ্কার বালিতে।

গাছ বাঁচিয়ে রাখার জন্য মাঝে মাঝে যে জল দিতে হয় সেই জলে লিটার প্রতি দু'গ্রাম হিসাবে খাদ্য-মিশ্রণ দ্রবীভূত করে দিতে হবে। মাটিতে লাগান গাছে যতবার জল দিতে হয় এক্ষেত্রে তার চেয়ে বেশী বার দিতে হবে কারণ বালি বা ইঁটের টুকরো অনেক তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়।

গোলাপ, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, বাঁধাকপি, ফুলকপি, বেগুন, লংকা, ধান, গম প্রভৃতি গাছ নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। তবু কখনও গাছ ভারী হয়ে গেলে কাঠ বেঁধে দেওয়া দরকার হতে পারে। মটরশুঁটি লাউ, কুমড়ো প্রভৃতি গাছের জন্য কাঠি পুঁতে বা মাচা বেঁধে তার উপর লতা ছড়িয়ে দিতে হয়। টম্যাটোকে এইভাবে ছড়িয়ে দিলে বেশী ফলন দেয়।

বিনা মাটিতে চাষ করতে খানিকটা ঝামেলা আছে বটে, কিন্তু মাটিতে চাষের তুলনায় এক্ষেত্রে ফলন অনেক বেশী। টম্যাটোতে তো আঠার গুণ বেশী ফলন পাওয়া গেছে। অন্যান্য ফসলের বেলা এত বেশী না হলেও ধানে পাওয়া গেছে এগার গুণ, গমে সাতগুণ, ভুট্টায় পাঁচ গুণ এবং আলুতে দু' গুণ। এই ফলাফল দেখা গেছে ডগলাস সাহেবের পরীক্ষা ক্ষেত্রে।

বিনা মাটিতে চাষের কিছু খুঁটিনাটি ব্যাপার থাকলেও এ পদ্ধতির অনেক ভাল দিক আছে। অধিকাংশ লোকের আছে ফল, ফুল, শাক-সবজি লাগানর শখ। কিন্তু এগুলি লাগানর জন্য যে জমির দরকার—তা অনেকেরই নাই। শহরবাসীদের পক্ষে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

কলকাতার মত বড় শহরের বহুতল বাড়িতে হয়ত একটু বারান্দা ছাড়া আর খোলা জায়গা নাই। অনেকের তারও অভাব। যাঁদের ছাদ আছে, তাঁরা তো ভাগ্যবান। বিনা মাটিতে চাষের পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে এঁরা সবাই কিছু কিছু গাছ করতে পারেন। তবে গাছ বাছাই-এর বেলা একটু সতর্ক হতে হবে। যাদের ছাদে বা বারান্দায় খোলা রোদ তাঁরা অধিকাংশ গাছই লাগাতে পারেন। যাঁদের বারান্দায় রোদ ছায়ার খেলা, তাঁদের এমন গাছ বেছে নিতে হবে যেগুলি বেশী রোদ ছাড়াই স্বচ্ছন্দে বাড়বে। এমন গাছও আছে যেগুলির জন্য রোদ না হলেও চলে। এসব গাছ লাগান যেতে পারে ঢাকা বারান্দায় বা ঘরের ভিতর।

অনেক সময় সামরিক বা বাণিজ্যিক প্রয়োজনে মানুষকে এমন দেশেও থাকতে হয় যেখানে মাটি নাই, আছে শুধু ধূ ধূ বালি বা খটখটে পাথর। মহাসাগরের বুকে বহু দূরে দূরে এমন অনেক পাথুরে দ্বীপ আছে যেখানে সামরিক প্রয়োজনে বাস করছেন শত শত লোক। তাঁরা প্রায়ই তাজা শাক-সব্জির মুখ দেখতে পান না। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে গ্রীনহাউস তৈরী করে তার ভিতর বিনা মাটিতে চাষের পদ্ধতিতে প্রচুর তাজা শাক-সবজি ফলান হচ্ছে এইসব দেশে মানুষের প্রয়োজনে।

বিনা মাটিতে চাষ করার আরও কয়েকটি সুবিধা আছে। মাটি নাই বলে আগাছার সমস্যা নাই; সমস্যা নাই মৃত্তিকা-বাহিত ফসলের রোগ ও পোকার। সুষম খাদ্য দিয়ে গাছ তৈরী হয় বলে এই পদ্ধতিতে তৈরী ফলও শাক-সবজি বেশ বেশী সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর। মাটি না থাকায় বাগান বেশ

ফসফরাস এবং সালফার। তবে লক্ষণীয় ভাবে অভাব আয়রন বা লোহ খনিজের। প্রাণীদেহে যে সমস্ত খনিজ অতি অল্প মাত্রায় প্রয়োজন দুধে সেগুলির প্রত্যেকটির হদিশ মেলে। প্রাণীদেহের প্রয়োজনীয় সমস্ত ভিটামিন A, B, C, D, E এবং K দুধে পাওয়া যায়। কয়েকটি স্তন্যপায়ী প্রাণীর দুধের মূল উপাদানের তালিকা দেওয়া হলো।

তালিকা—1 : বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীর দুধের গড় রাসায়নিক গঠন (শতকরা হিসাবে)

প্রাণী	স্নেহ	প্রোটিন	ল্যাকটোজ	খনিজ	জল
মানুষ	3·10	1·25	7·20	0·25	88·20
গরু	3·80	3·50	4·80	0·65	87·25
মহিষ	7·00	3·60	5·50	0·90	83·00
ছাগল	4·00	3·50	4·30	0·70	87·50
ঘোড়া	1·65	2·20	6·91	0·32	88·92
উট	5·10	3·25	4·95	0·70	86·00
চমরী গরু	6·00	5·10	5·60	0·90	82·40
বল্গা হরিণ	18·00	9·90	2·70	1·75	67·65

উপরের তালিকায় উপাদানের যা অনুপাত দেখা যাচ্ছে, তা আবার অনেকাংশে উক্ত প্রাণীর বংশের (race) উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ যে সমস্ত বংশের প্রাণীর মোট দুধের পরিমাণ বেশী হয়, তাদের দুধে স্নেহ পদার্থ কম হয়। দুধের পরিমাণ কম হলে, তাতে স্নেহ পদার্থ বেশী থাকে। দুগ্ধদানকারী প্রাণীর খাদ্যের উপরে তার দুধের উপাদানের অনুপাত নির্ভর করে না। ভাল খাদ্য ও যত্নের ফলে পশুটির মোট দুধের পরিমাণ বেশী হয় কিন্তু উপাদানের অনুপাতে বিশেষ কোন তারতম্য হয় না। অবশ্য শিশুর জন্মের পরই তার মাতৃদুগ্ধে যে ঘনত্ব থাকে, শিশুর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রেখে দুধের ঘনত্ব বেশ কিছুটা বাড়ে। স্নেহ ও অস্নেহ বস্তুর অনুপাত নির্ণয়ে ঋতুর ও কিছু প্রভাব দেখা যায়।

দুধের উপাদানের দিকে লক্ষ্য করলেই খাদ্য হিসাবে দুধের মূল্য বেশ বোঝা যায়। এই জন্য একে প্রাকৃতিক পরিপূর্ণ খাদ্য বলে অভিহিত করা হয়। মানুষের পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি খাদ্য অর্থাৎ জল, কার্বোহাইড্রেট, স্নেহ, প্রোটীন, খনিজ এবং ভিটামিন, সমস্তই একসঙ্গে দুধেই পাওয়া যাচ্ছে। তবে দুধের প্রকৃত গুরুত্ব তার প্রোটীন অংশের জন্য। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দৈনিক 60—100 গ্রাম প্রোটীন প্রয়োজন। দুধ তার অনেকটাই পূরণ করতে পারে। নিজের পুষ্টির তাগিদেই মানুষ দুধকে তার খাদ্য তালিকায় স্থান দিয়েছে।

শিশুর কাছে তার মায়ের দুধ একমাত্র সুষম আহার। এর কোন যথার্থ বিকল্প নেই। অনেকে গরুর দুধকে কোনও মানব শিশুর কাছে তার মায়ের দুধের সমতুল বলে মনে করেন। খুবই ভ্রান্ত ধারণা এটি। তালিকা থেকে এই দুই দুধের গঠনগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গরুর দুধ মানুষের দুধ অপেক্ষা প্রোটীনে সমৃদ্ধ, কিন্তু মানুষের দুধের প্রোটীন অংশে শতকরা 40 ভাগ কেসিন ও শতকরা 60 ভাগ হে-প্রোটীন আছে। কিন্তু গরুর দুধে কেসিন ও হে-প্রোটীনের অনুপাত যথাক্রমে শতকরা 82 এবং 18। গুণগত দিক দিয়ে হে প্রোটিন কেসিনের চেয়ে ভাল। এ ছাড়া হে-প্রোটিনের অন্তর্গত যে সমস্ত প্রোটিন আছে তাও গরু ও মানুষের দুধে ভিন্নতর। তফাৎ রয়েছে স্নেহ বস্তুতেও—মানুষের দুধের স্নেহ বস্তু অপেক্ষাকৃত সহজপাচ্য ও সহজ-শোষণ যোগ্য। সর্বোপরি একথা বিস্মৃত হলে চলবে না যে, মানুষের দুধ মানব শিশুর ও গরুর দুধ তার বাছুরের শারীরিক প্রয়োজন অনুসারে গঠিত।

বর্তমানে আমরা বিভিন্ন রূপ দুধের সঙ্গে পরিচিত। অনেকেই গরু ও মহিষের দুধ ব্যতীত অন্যান্য দুধের খাদ্যগুণ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন। সেই সব দুধের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করব।

1. পরিপূর্ণ দুধ (Whole milk) : তরল বা শুষ্ক গুঁড়ো যাই হোক না কেন, এতে দুধের প্রতিটি উপাদান থাকে।

2. স্কিম দুধ (Skim milk) : এই দুধ থেকে কেবল মাত্র স্নেহবস্তু বের করে নেওয়া হয় কিন্তু বাকি সমস্ত উপাদান গুলিই ঠিক থাকে। তরল বা শুষ্ক গুঁড়ো দুই ভাবেই বাজারে পাওয়া যায়। যে সমস্ত রোগীর খাদ্য তালিকায় স্নেহবস্তু বর্জনের নির্দেশ আছে, তাঁরা এই দুধ খেতে পারেন। কারণ এই দুধে শতকরা 1.5 ভাগের বেশি স্নেহ পদার্থ থাকে না।

3. শুষ্ক গুঁড়ো দুধ :—যখন প্রয়োজনের অতিরিক্ত দুধ উৎপন্ন হয় তখন সেই দুধ দীর্ঘদিনের জন্যে সংরক্ষণ ও অন্যত্র সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে দুধের জলীয় অংশ বাষ্পীভূত করে দুধ শুষ্ক করে নেওয়া হয়। এই দুধ পরিপূর্ণ বা স্কিম দুধ হতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই জলীয় ভাগ শতকরা 5 এর বেশি থাকে না। FAO (Food and Agriculture Organisation of the United Nations) এর নির্দেশ অনুযায়ী পরিপূর্ণ দুধে কমপক্ষে 26 ভাগ স্নেহপদার্থ ও স্কিমদুধে সর্বোচ্চ 1·5 ভাগ স্নেহপদার্থ থাকে। এই জাতীয় দুধে শুষ্ক করণের সময় শতকরা 30 ভাগ ভিটামিন B_{12} এবং শতকরা 20 ভাগ ভিটামিন C নষ্ট হয়। এ ছাড়া এই দুধের অন্যান্য খাদ্যগুণ ঠিক থাকে। তবে এই নষ্ট ভিটামিন আলাদা করে সংযোজন করে দেওয়া চলে।

4. টোণ্ড দুধ (Toned milk) :—শুষ্ক গুঁড়ো স্কিম দুধ, জল ও মহিষের দুধের মিশ্রণে এই দুধ তৈরি হয়। মহিষের দুধে স্নেহ বস্তুর পরিমাণ বেশি থাকে এবং দুধের ঘনত্বও বেশি।

টোণ্ড দুধ মিশ্রণটি গঠনগত দিক দিয়ে গরুর দুধের সমান করা হয়। মহিষের দুধের সরবরাহ কম থাকলে আমদানী করা চর্বি, মাখন ইত্যাদি দিয়ে টোন করা হয়। বর্তমানে ভারতে আন্তর্জাতিক কর্মসূচি অনুযায়ী স্কিম দুধ ও মাখন আমদানী করা হয়। 1946 খৃস্টাব্দে বোম্বাইতে গভর্ণমেন্ট মিল্ক স্কিম কর্তৃক সর্বপ্রথম এই জাতীয় দুধের প্রচলন হয়। বর্তমানে দিল্লী, মাদ্রাজ, কলকাতা ইত্যাদি শহরে এই দুধ বাজারে পাওয়া যায়। ডবল টোন নামে UNICEF যে দুধ চালু করেছিল তাও শুষ্ক গুঁড়ো দুধ, মাখন ও মহিষের দুধের সংমিশ্রণে তৈরি। তবে এতে স্নেহ পদার্থের পরিমাণ আরও কম (শতকরা 1·5 ভাগ) কিন্তু অস্নেহ ঘন বস্তু সামান্য বেশি (শতকরা 10 ভাগ) থাকে। গরু ও মহিষের দুধের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কমদামে টোণ্ড দুধ পাওয়া যায়।

5. সংশ্লেষিত দুধ (Synthetic milk) :--কম দামের স্কিম দুধের গুঁড়োর সঙ্গে নারকেল, সোয়াবীন ইত্যাদি ভেষজ তেল মিশ্রিত করে এই দুধ হয়। পরিপূর্ণ দুধের সমানই এর খাদ্য গুণ। স্বাদও মন্দ নয়। তবে এতে দুধের সুগন্ধ পাওয়া যায় না।

এবার দুধপান জনিত কিছু রোগ ও উপসর্গের কথা আলোচনা করব। কোন কোন সময় এইসব উপসর্গ এত প্রবল হয়ে ওঠে যে প্রাণহানির কথাও শোনা যায়। রোগের কারণ সাধারণতঃ তিন রকমের হয়—(1) ল্যাকটোজ, (2) স্নেহ বা (3) প্রোটিন অসহিষ্ণুতা।

প্রায়ই কিছু পূর্ণ বয়স্ক মানুষকে বলতে শোনা যায় যে দুধ খাওয়া তাঁদের সহ্য হয় না। দুধ খাওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর থেকেই এঁদের পেটে অস্বস্তি হয়, পেট ফাঁপে, যন্ত্রণা হয়, উদরাময় হয় ইত্যাদি।

দুধের ল্যাকটোজ অংশ পরিপাকের জন্য প্রয়োজনীয় উৎসেচকটির নাম ল্যাকটেজ। এটি অন্ত্রে উৎপাদিত হয় এবং ল্যাকটোজকে ভেঙ্গে গ্লুকোজ ও গ্যালাকটোজে সরলীকরণ করে। শিশুদের ক্ষেত্রে ল্যাকটেজ উৎসেচক প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কিন্তু শৈশবকাল উত্তীর্ণ হবার পর বহুদিন দুধপানে বিরত থাকলে ল্যাকটেজ উৎপাদনও বন্ধ হয়। সেক্ষেত্রে দুধপান করলে ল্যাকটো পরিপাক হয় না। অন্ত্রের মধ্যে ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়ায় ঐ শর্করার ফারমেনটেশন হয়। এর ফলে ল্যাকটিক এসিড ও জৈব গ্যাস তৈরি হয়। এই এসিড এবং গ্যাসই ঐ সমস্ত শারীরিক অসুবিধার কারণ ঘটায়। এ ছাড়া কোনও পূর্ণ বয়স্ক মানুষ এমন কি শিশুও যদি কোন আন্ত্রিক অসুস্থতায় থাকে তবে সাময়িক ভাবে ল্যাকটেজ উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে। ফলে সেই সময় দুধ পানের দরুণ উপরোক্ত উপসর্গ দেখা দেয়।

ল্যাকটোজ অসহিষ্ণুতা জন্মগত তথা বংশগতও হতে পারে। এইরকম একটি রোগ গ্যালাকটোসেমিয়া। গ্যালাকটোজ বিপাকের জন্য প্রয়োজনীয় উৎসেচকটি এই রোগীর দেহে তৈরী হয় না। শিশুর জন্মের পরই এই রোগের লক্ষণ পরিস্ফুট হয়। শিশুর প্রথম আহার, মায়ের দুধই তার শরীরে বিষের মতো কাজ করতে থাকে। সে বমি করে, নিস্তেজ, শীর্ণ ও পাণ্ডুর হয়ে পড়ে। গ্যালাকটোজ যকৃতে শোষিত হবার পর উৎসেচকের অভাবে তার বিপাক বন্ধ হয়ে যায়। যকৃতে গ্যালাকটোজ জমতে থাকে ফলে যকৃতটি বড় হয়ে ওঠে এবং যকৃতটি অকেজো হয়ে পড়ে। এই শিশু রোগীকে গ্যালাকটোজ অংশ ব্যতীত দুধের অন্য অংশ খাওয়ান চলে। এই রোগীর মানষিক বিকাশ হয় না এবং চোখে ছানি পড়ে।

স্নেহ অসহিষ্ণুতা জনিত উপসর্গ ও প্রায়ই শোনা যায়। অন্ত্র ও অগ্ন্যাশয়ের কোন কোন রোগের ফলে রোগীর শরীরে স্নেহ শোষণ ক্ষমতা কমে যায়। অবশ্য এই রোগের নিরাময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ এই উপসর্গও দূর হয়। এক্ষেত্রে স্কিম দুধ পান করলে কোনও সমস্যা দেখা দেবে না।

ফিনাইলকিটোন ইউরিয়া নামে বিরল বংশগত রোগটিকে দুধের প্রোটিন অসহিষ্ণুতা জনিত বলে চিহ্নিত করা যায়। দুধের একটি অ্যামিনো এসিড ফিনাইল অ্যালোনিন এর বিপাকের জন্য প্রয়োজনীয় উৎসেচকটি এই রোগীর দেহে উৎপাদিত হয় না। ফলে এই ফিনাইল অ্যালানিন ও তার অস্বাভাবিক যৌগগুলি রক্ত ও দেহকলায় সঞ্চিত হতে থাকে। এই রোগের ফলে রোগীর স্বাভাবিক মানবিক বিকাশ হয় না, স্নায়ুতন্ত্র ত্রুটিপূর্ণ হয়, চোখ নীলচে ও ত্বক বর্ণহীন হয়, শরীর থেকে ইঁদুরের গন্ধ বের হয়। ফিনাইল অ্যালানিন মুক্ত বিশেষ খাদ্য দিয়ে এই রোগীর প্রাণ রক্ষা করা হয়ে থাকে।

প্রোটিন অসহিষ্ণুতার কথা বলতে গেলে দুধ অ্যালার্জির কথা বলতেই হয়। শরীরের প্রোটিনের সঙ্গে বহিরাগত প্রোটিনের অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াকে বলে অ্যালার্জি। শিশু ও পূর্ণবয়স্ক উভয়েরই দুধে অ্যালার্জি হতে পারে। অনেক সময় উদরাময়, জিয়ারডিয়া ও অপুষ্টিতে জীর্ণ মানুষের এই অ্যালার্জি বেশী হয়। শ্বাসকষ্ট, পেটব্যথা বমি ও ত্বকের অস্বাভাবিকতা এই রোগের লক্ষণ। অনেক ক্ষেত্রে এই উপসর্গগুলি ততটা প্রবল হয় না এবং আস্তে আস্তে আপনা থেকেই দূর হয়ে যায়। শিশু যখন প্রথম মায়ের দুধ ছেড়ে অন্য দুধ খেতে শুরু করে তখন এই অ্যালার্জির বিষয় লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। দুধের অ্যালার্জি যে কোনও ব্যক্তির যে কোন সময় থেকেও হতে পারে—এবং তার প্রাবল্যও নানা ধরণের হওয়া সম্ভব।

ম্যারিজুয়ানা

ঔষধ—না—মাদক

মলয়কান্তি রায়চৌধুরী*

নেশা আজ মানব সমাজের একটি বিশেষ সমস্যা। বর্তমানে সমাজের বিভেদকামিতার মূলে এই নেশার ভূমিকা যথেষ্ট। বৃহত্তর যুবসমাজ আজ সাধারণ জীবন থেকে সরে গিয়ে অসুস্থ সমাজের সৃষ্টি করছে। এর ফলস্বরূপ হচ্ছে তথাকথিত 'হিপি' সমাজের সৃষ্টি। যদিও এর সৃষ্টির কারণ বিতর্কের বিষয়। তবুও একথা বলতে অসুবিধা নেই এই নেশার উপর আশ্রয় করেই তারা সুস্থ জীবন ভুলে গিয়ে এক অসুস্থ চিন্তা জগতে বিরাজ করছে। তাই নেশাজাতীয় সামগ্রীর সম্পর্কে কিছু জ্ঞান এবং এর বিষাক্ত ক্রিয়া সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা প্রত্যেকটি ব্যক্তির বিশেষতঃ যুবসমাজের বিশেষ প্রয়োজন। ম্যারিজুয়ানাও হচ্ছে এইরকম একটি নেশাজাতীয় গাছ। ভারতবর্ষে এই গাছের নাম গাঁজা এবং এর বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে ক্যান্নাবিস সাটিভা (Cannabis sativa)। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে যথা হিমালয়ের নিম্নাঞ্চলে পাঞ্জাবে, পশ্চিমবঙ্গে, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। বৈজ্ঞানিক দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় এই নেশাজাতীয় সামগ্রী শারীরিক বিপাক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং বিভিন্ন শারীরিক পরিবর্তন ঘটায়।

ম্যারিজুয়ানা হৃৎপিণ্ড এবং ফুসফুসের বিপাক ক্রিয়াও পরিবর্তন ঘটায়। তাই উচ্চ রক্তচাপ, করনারি আরথারস্ক্লেরসিস (coronary artherosclerosis) সেরিব্রোভাসুকলার (cerebrovascular) রোগ প্রভৃতিতে বিষম বিপত্তি ঘটায়। তাছাড়া অনবরত ব্যবহারের ফলে ম্যারিজুয়ানা ফুসফুসের বায়ু-প্রবাহে রোধ সৃষ্টি করে এবং ফ্যারিনজাইটিস (pharyngitis) সাইনিউসাইটিস (sinusitis) ব্রনকাইটিস (bronchitis) অ্যাজমা (asthma) প্রভৃতি শ্বাসপ্রশ্বাস জনিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি করে। প্রচুর ব্যবহারের ফলে ফুসফুসের ক্যানসারও হতে পারে। এর ভিতর ক্যানসার সৃষ্টিকারী মূল উপাদান হচ্ছে ডেল্টা-9-টেট্রাহাইড্রক্যান্নাবিনল (∆-9-tetrahydrocannabinol)। সিসাইল (cecile) এবং রুডলফ (Rudolph) নামে সুইজারল্যাণ্ডের এক্সপেরিমেণ্টাল ক্যানসার গবেষণাগারের (Experimental Cancer Research Institute) দুই বিজ্ঞানী দেখেন ম্যারিজুয়ানার ধোঁয়ার প্রভাবে হ্যামস্টারের (hamster) ফুসফুস কোষে 3—6 মাসে ক্যানসার সৃষ্টি হয়। এমনকি মানুষের ফুসফুসের কোষেও ক্যানসার সৃষ্টি করে। ফরেস্ট এস. টেনাণ্ট জুনিয়ার (Forest S. Tennant Jr.) নামে ক্যালিফোর্নিয়া মেডিক্যাল সেণ্টারের এক বিজ্ঞানী এবং তাঁর সহকর্মীরা দেখেন ম্যারিজুয়ানা এবং তামাকের ধোঁয়া একসঙ্গে শুধুমাত্র ম্যারিজুয়ানা বা তামাকের ধোঁয়ার থেকে বেশী ক্ষতিকারক। তাছাড়া মেক্সিকোতে আর একটা নতুন জিনিস দেখা গেল। ওখানে ম্যারিজুয়ানা গাছের ক্ষেতে আগাছামুক্ত করার জন্য প্যারাকট (paraquat) নামে আগাছাবিনষ্টকারী স্প্রে ছড়ানো হয়। এই প্যারাকট ফুসফুসে ক্যানসার সৃষ্টি করতে সক্ষম। কিন্তু পরে দেখা যায় ম্যারি-জুয়ানা গাছের সঙ্গে এই প্যারাকট মিশে থাকে। তাই প্যারা-কটের সঙ্গে মিশ্রিত ম্যারিজুয়ানা গাছের ধোঁয়াও ফুসফুসের ক্ষতি করে।

জননপ্রক্রিয়ারও ম্যারিজুয়ানার বিশেষ ভূমিকা আছে। যেমন এর ব্যবহারের ফলে পুরুষদের মধ্যে হর্মোন সৃষ্টির ক্ষমতা এবং জননাঙ্গের আকৃতি এবং ওজনও কমে যায়। তাছাড়া পুরুষদের শুক্রকোষ সৃষ্টির ক্ষমতাও কমে যায়। ইঁদুর, খরগোস এবং বাঁদরের ক্ষেত্রে দেখা গেছে ম্যারিজুয়ানা ডিম্বকোষ সৃষ্টি করার ক্ষমতাকে কমিয়ে দেয়। ম্যারিজুয়ানার নির্যাস এবং টেট্রাহাইড্রক্যান্নাবিনল বিকৃত শিশু তৈরী করে। টেট্রাহাইড্র-ক্যান্নাবিনল সন্তান পরিবেষ্টনকারী প্ল্যাসেণ্টার (placenta) ঝিল্লী ভেদ করে ভিতরের ভ্রূণের ক্ষতি করে। এমনকি স্তনের সঙ্গেও এগুলি বেরিয়ে আসে এবং শিশুর উপর বিষক্রিয়া করে। ম্যারিজুয়ানা ঘাম সৃষ্টি করা বন্ধ করে দেয় এবং শরীরের তাপমাত্রাও বেড়ে যায়।

ম্যারিজুয়ানা নার্ভের উপরও ক্রিয়া করে। মোটর নার্ভের দ্বারা সংবাদ প্রেরণে এবং মস্তিষ্কের ক্রিয়ারও পরিবর্তন ঘটায়। হারবার্ট মসকোভিজ (Herbert Moskowitz) নামে সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া গবেষণাগোরের একবিজ্ঞানী এবং তাঁর সহকর্মীরা দেখেন ম্যারিজুয়ানার প্রভাব নেশা কেটে যাওয়ার পরেও 4—8 ঘণ্টা থাকে যা অ্যালকোহলের থেকে অনেক বেশী। তাছাড়া ম্যারিজুয়ানা ব্যবহারের ফলে কাজে অনাসক্ত, ভবিষ্যত সম্পর্কে অনীহা, সুদূরপ্রসারী কাজে অক্ষমতা, মনসংযোগে অসুবিধা, কাজে অনিচ্ছা প্রভৃতি স্বভাব দেখা যায়। জন কুহেনল (John Kuchnle) নামে হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একবিজ্ঞানী এবং ডোনাল্ড ডব্লু গুডউইন (Donald W. Goodwin) নামে ক্যানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞানী

* বসুবিজ্ঞান মন্দির, কলিকাতা-700 009

দেখেন ম্যারিজুয়ানা ব্যবহারের ফলে মস্তিষ্কের আকৃতিরও পরিবর্তন হয়। ম্যারিজুয়ানাকে ঔষধ হিসাবে ব্যবহারের জন্যও চেষ্টা চলছে। যেমন গ্লুকোমাতে ভিতরের চাপ কমানোর জন্য, বমি কমানোর জন্য এবং ক্যানসারের ঔষধ হিসাবেও ম্যারিজুয়ানাকে ব্যবহারের চেষ্টা চলছে। ক্যানাবিনল নামে ম্যারিজুয়ানার একটি অংশ নার্ভ সংক্রান্ত রোগেও ব্যবহার করা হয়।

ম্যারিজুয়ানা ব্যবহারের উপকারের চেয়ে অপকারের পরিসীমাই বেশী। কারণ এই নেশার আবেশ সমাজের এক বিরাট অংশ বিশেষতঃ যুবসমাজকে যেন ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। ফলে যুবসমাজের অসীম শক্তি ভুল পথে পরিচালিত হয়ে মানবিক শক্তির অপচয় হচ্ছে। তাই এর কারণ অনুসন্ধানের জন্য আমেরিকায় 22 জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের নিয়ে একটি কমিটি তৈরী করে ম্যারিজুয়ানার ব্যবহারের দোষ-গুণ খতিয়ে দেখা হয়েছে। তাঁদের রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা গেছে মোটামুটি 22 থেকে 24 বছরের লোকেদের মধ্যেই ম্যারিজুয়ানার প্রতি আসক্তি বেশী। পরিসংখ্যানে আরও দেখা গেছে 5 কোটিরও বেশী আমেরিকান আছেন যারা একবার না একবার ম্যারিজুয়ানা ব্যবহার করেছেন। লয়েড জনস্টন (Loyd Johnston) এবং জেরাল্ড ব্যাচম্যান (Jerald Bachman) নামে মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই বিজ্ঞানী দেখেছেন 1975 খৃস্টাব্দে 6 শতাংশ, 1978 খৃস্টাব্দে 11 শতাংশ 1980 এবং 1981 খৃস্টাব্দে কমে গিয়ে যথাক্রমে 9·1 এবং 7 শতাংশ লোক ম্যারিজুয়ানা ব্যবহার করছেন। তাছাড়া আরও দেখা গেছে মদ্যজাতীয় নেশা-সামগ্রী সাধারণতঃ স্কুলের শেষে অথবা সপ্তাহের শেষে ব্যবহার করে। কিন্তু ম্যারিজুয়ানা স্কুল চলাকালীন সময়েই ব্যবহার করে। সাধারণতঃ ম্যারিজুয়ানা ব্যবহারকারী লোকেদের মধ্যে ধর্মবিমুখতা, অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত থাকা, আইন অমান্য করা, ট্রাফিক আইন না মানা প্রভৃতি বিচিত্র রকম ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করা যায়।

যদিও কিছু ব্যক্তি বিভিন্ন মানসিক ব্যথা-বেদনা, অবসাদ ভুলে থাকার জন্য বিভিন্ন রকম নেশাজাতীয় সামগ্রী ব্যবহার করে। কিন্তু আজকের অধিকাংশ যুবগোষ্ঠী যারা ভবিষ্যত সমাজের ধারক ও বাহক তারা যেভাবে কৌতূহলের বশে নেশাজাতীয় সামগ্রী ব্যবহার করে নিজেরা অন্য জগতে বিরাজ করছে তা সত্যিই চিন্তার বিষয়। তারা নিজেরাও জানে না কোন গভীরতায় তারা তলিয়ে যাচ্ছে এবং তার সাথে তারা এক দুঃস্থ সমাজের ভিত তৈরী করছে। তাই আজ সময় এসেছে ম্যারিজুয়ানা জাতীয় নেশাসামগ্রীর বিষাক্ত ক্রিয়ার কথা সবাইকে অবগত করা, যাতে এর ব্যবহারের আগে অন্ততঃ একটু চিন্তার সুযোগ দেওয়া। সত্যিই কী আমরা নিজেরাই নিজেদের সুস্থ ভবিষ্যতের মূল কেটে দিচ্ছি।

ঐন্দ্রিয়িক সমন্বয়

রমেশ দাশ*

আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির প্রত্যেকটির কাজ এক এক রকম। চোখ দিয়ে আমরা দেখি, কান দিয়ে শুনি, নাক দিয়ে গন্ধ নিই, জিভ দিয়ে আস্বাদন করি, আর ত্বকের সাহায্যে স্পর্শ, তাপ এবং যন্ত্রণার অনুভূতি পেয়ে থাকি। ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে বাহ্যবিশ্বের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শাদির বৈচিত্র্যে ভরা এই যে বিশ্ব নিখিল তার সম্বন্ধে প্রতিনিয়ত আমরা যে সব অভিজ্ঞতা লাভ করে চলেছি তা সম্ভব হচ্ছে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির জন্যই। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে তাই বলা হয় বাতায়ন, যাদের ভেতর দিয়ে বাইরের জগৎ এসে প্রবেশ করে আমাদের মনোজগতে। কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি কি একক ভাবে কাজ করে, না মিলে মিশে কাজ করে থাকে ?

যখন, একাধিক ইন্দ্রিয় একই সঙ্গে উদ্দীপিত হয় তখন স্বভাবতই তাদের সবগুলির মিলিত সংবেদনের (sensation) অভিজ্ঞতা আমাদের হয়ে থাকে। যেমন হাতে করে একটি গোলাপ নিয়ে যদি নাকের কাছে ধরি তাহলে একই সঙ্গে তার রূপ গন্ধ এবং স্পর্শ ধরা দেয় আমাদের চেতনায়।

কিন্তু যখন একটি মাত্র ইন্দ্রিয় উদ্দীপিত হয়ে থাকে তখন কী হয় ? তখন তারই সঙ্গে যুক্ত সংবেদনটি লাভ করে থাকি। যখন আমি চোখ বন্ধ করে আছি তখন যদি কেউ আমার নাকের কাছে একটি গোলাপ ফুল ধরে তাহলে আমার গন্ধেরই সংবেদন হয়, রূপ রস শব্দ কিংবা স্পর্শের সংবেদন হয় না।

কিন্তু ব্যাপারটা কি সত্যিই এতই সরল ? আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি উদ্দীপিত হলে আমাদের কি শুধুই সংবেদনের অভিজ্ঞতা হয়, আর কোন রকম অভিজ্ঞতা হয় না ?

নিছক সংবেদন শুধু অতি শৈশবেই সম্ভব যতক্ষণ না চারপাশের বস্তু সামগ্রীর সঙ্গে শিশুটির পরিচয় ঘটছে। কোন বস্তুর সঙ্গে পরিচয় ঘটার পর থেকেই তার সম্পর্কে নিছক সংবেদন আর সম্ভব নয়। তখন যা ঘটে তার নাম প্রত্যক্ষণ (perception)। গন্ধের অনুভূতিটা সংবেদন, কিন্তু যখন সেটাকে গোলাপের গন্ধ বলে বুঝতে পারছি তখন সেটা প্রত্যক্ষণ।

প্রত্যক্ষণের মধ্যে শুধু সংবেদনই থাকে না, অতীত সংবেদনের নানা রকম স্মৃতিচ্ছবিও (memory image) থাকে।

*জোড়াবাগান হেয়ার ট্রেনিং কলেজ, কলিকাতা

উদ্দীপক বস্তুটি (stimulus) আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হলে আমরা শুধু তার থেকে সংবেদনই লাভ করি না, তাকে কেন্দ্র করে অতীতে আমাদের আরো যেসব বিচিত্র সংবেদন ঘটেছিল তাদের কথাও স্পষ্ট (explicit) বা অস্পষ্ট (implicit) ভেবে আমাদের মনে পড়ে যায়। বর্তমানের সংবেদন এবং অতীতের এইসব স্মৃতিচ্ছবির সমন্বয়েই প্রত্যক্ষণের সৃষ্টি হয়। আমি চোখ বন্ধ করে আছি, এই রকম অবস্থায় একটি গোলাপ আমার নাকের কাছে ধরা হলো। অমনি আমার গন্ধের অনুভূতি (সংবেদন) হলো; বিশেষ এক রকমের গন্ধ—বুঝতে পারলাম গন্ধটা গোলাপের; সঙ্গে সঙ্গে একটি গোলাপ ফুলের ছবি, গোলাপের পাতা, গাছ ইত্যাদির ছবি—শুধু আকার নয়, তাদের রঙও—তাদের স্পর্শের কথা, এমন কি গোলাপ সংক্রান্ত আরও নানা রকমের স্মৃতি—যেমন অজস্র রকমের গোলাপ হয়, বসোরার গোলাপ জগদ্বিখ্যাত ইত্যাদি ইত্যাদিও আমার চেতনায় উঁকি ঝুঁকি মেরে যায়। এইসব কিছু মিলিয়ে যে অভিজ্ঞতাটি হয় তারই নাম গোলাপ সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষণ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে উদ্দীপক বস্তুটির প্রকৃতি অনুসারে উদ্দীপিত ইন্দ্রিয়টির বা ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকগুলি ইন্দ্রিয়ও পরোক্ষভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। পরোক্ষভাবে বলছি এই জন্যে যে এইসব অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি থেকে আমরা সরাসরি সংবেদন না পেলেও অতীতে তাদের থেকে উদ্দীপক বস্তুটিকে কেন্দ্র করে আমরা যে যে সংবেদন লাভ করেছিলাম এখন সেই সব সংবেদনের স্মৃতি আমাদের চেতনায় উজ্জীবিত হয়েছে। বাজারে বেরোচ্ছি, মেয়ে বললে—বাবা কমলালেবু নিয়ে এসো। শোনা মাত্রই আমার মনের সামনে একটি বিশেষ আকারের ও বিশেষ বর্ণের ফলের ছবি ভেসে উঠলো, তার স্পর্শ গন্ধ এবং স্বাদের কথাও মনে পড়ে গেল। আমার মেয়ে তো মাত্র একটা শব্দ উচ্চারণ করেছিল কমলালেবু—শব্দের সঙ্গে তো কানের সম্পর্ক, তার সঙ্গে তো চোখ, নাক, জিভ আর ত্বকের কোন সম্পর্ক নেই, তাহলে শোনার সংবেদন হবার সঙ্গে সঙ্গে এই অন্য ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে যুক্ত কমলালেবু সংক্রান্ত আমার অতীত অভিজ্ঞতার কথাগুলি মনে পড়লো কেমন করে?

বিজ্ঞানীরা বলেন আমাদের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ আমাদের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ আমাদের এক একটি ইন্দ্রিয়ের কাজকে (sensory activity) এবং দেহ সঞ্চালনের ভিন্ন ভিন্ন কাজকে (motor activity) নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয় এবং দেহের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ অংশের যোগ আছে। চোখ উদ্দীপিত হলে মস্তিষ্কের যে অংশটি উত্তেজিত হয়, কান উদ্দীপিত হলে, অথবা ঝুঁকে পড়ে মাটি থেকে কোন জিনিষ তুলে নিলে সে অংশটি উত্তেজিত না হয়ে সুনির্দিষ্ট অন্য একটি অংশে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। অর্থাৎ এক এক ধরণের কাজ এবং সংবেদনের জন্য মস্তিষ্কের এক একটি নির্দিষ্ট অংশ দায়ী। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো মানুষের বেলায় এই সব সুনির্দিষ্ট অংশ বা অঞ্চলগুলি ছাড়াও মস্তিষ্কের বিরাট একটা অঞ্চল দেখা যায় যা নাকি অনির্দিষ্ট। এই অনির্দিষ্ট অংশটার নাম সংযোগ-অঞ্চল (association area)। প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের সঙ্গে সংযোগ-অঞ্চলের যোগ রয়েছে। প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় এবং পেশীর (muscles) সঙ্গে মস্তিষ্কের একটি সুনির্দিষ্ট অংশ যেমন স্নায়ুসূত্রে (nerve fibres) গাঁথা, সেই রকম মস্তিষ্কের প্রত্যেকটি সুনির্দিষ্ট অংশের সঙ্গে সংযোগ-অঞ্চল ও স্নায়ুর বাঁধনে বাঁধা। 'কমলা লেবু' কথাটি উচ্চারিত হওয়া মাত্র কানের মধ্যে যে স্নায়ু তরঙ্গের সৃষ্টি হলো সেটি গিয়ে মস্তিষ্কের শ্রবণাঞ্চলে (auditory area) হাজির হয়ে তাকে সক্রিয় করে তুললো। তখনি আমি শব্দটি শুনতে পেলুম; কিন্তু এখানেই কাজটা শেষ হয়ে গেল না। শ্রবণাঞ্চল সঙ্গে সঙ্গে স্নায়বিক প্রবাহ পাঠিয়ে দিল সংযোগ অঞ্চলে। ফলে কমলা লেবুকে কেন্দ্র করে অতীতে আমার যা যা দর্শন ঘ্রাণ স্বাদ ইত্যাদির সংবেদন বা অভিজ্ঞতা ঘটেছিল তাদের স্মৃতিচ্ছবিগুলি আমার চেতনায় ভেসে উঠলো—অর্থাৎ সংবেদনটা রূপ নিল প্রত্যক্ষণে। সমস্ত ব্যাপারটাই এমন বিদ্যুৎ গতিতে ঘটে গেল যে কখন সংবেদন স্মৃতিচ্ছবির সঙ্গে মিলে মিশে প্রত্যক্ষণ হয়ে উঠেছে টেরই পেলাম না।

সুতরাং কেউ যদি বলে, আমরা কান দিয়ে শুধু শুনিই না, দেখিও, গন্ধ এবং স্পর্শও পাই তাহলে কথাটা অদ্ভুত ঠেকলেও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। প্রত্যক্ষভাবে কান দিয়ে শুধু শুনলেও কানের উদ্দীপনা আমাদের মনে দর্শন ঘ্রাণ ও স্পর্শের অভিজ্ঞতাকেও জাগিয়ে তোলে।

আসলে আমাদের জীবনে ইন্দ্রিয়গুলি এতোই ওতপ্রোতভাবে কাজ করে যে একটাকে অন্যটা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবাই যায় না। ইন্দ্রিয়গুলির সমন্বয়—অর্থাৎ ঐন্দ্রিয়িক সমন্বয় (sensory co-ordination)—এত গভীরভাবে আমাদের প্রভাবিত করেছে যে দৈনন্দিন কথাবার্তার মধ্যে আমরা পদে পদে তার প্রতিফলন দেখতে পাই। যেমন আমরা বলে থাকি—বকুলের গন্ধটি কী মিষ্টি, মেয়েটির গানটা কী মধুর, দূরে দেখছি কঠিন পাহাড়, পথের পাশে থমকে আছে গাছপালার নিরেট অন্ধকার, সে ভারি কোমল সুরে কথা বলছে, হাত দিয়ে দেখ তো কাপড়টা নরম কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ধরণের অজস্র অভিব্যক্তির মধ্যে 'পরস্পরের মধ্যেকার সীমারেখা ভেঙে চুরে ইন্দ্রিয়গুলি অভিজ্ঞতার রাজ্যে যে ঐকতানের সৃষ্টি করেছে তারই প্রকাশ দেখা যায়।

আমাদের স্মৃতিচ্ছবিগুলি সাধারণতঃ সংবেদনের তুলনায় অনেক ম্লান হয়ে থাকে। যখন একটি গোলাপ ফুল দেখি তখন তার আকার এবং রঙটি আমার চোখে জীবন্ত হয়ে ওঠে, কিন্তু পরবর্তী সময়ে তার কথা যখন মনে করি তখন সেটি আমার মনশ্চক্ষুতে রীতিমত অস্পষ্ট এবং আবছা (vague) হয়ে ধরা দেয়। কিন্তু কোন কোন মানুষ আছেন যাঁরা ভীষণ কল্পনা-প্রবণ—অনেক কবি চিত্রকর সঙ্গীত শিল্পী এঁদের দলে পড়েন—

তাঁদের স্মৃতিচ্ছবিগুলি অনেক সময় বাস্তবের মতোই সজীব হয়ে ওঠে। দশ থেকে পনেরো বছরের শিশুদের মধ্যে প্রায় ষাট শতাংশের ক্ষেত্রেই তাদের স্মৃতিচ্ছবিগুলি কখনো কখনো এতোই প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে যে সেগুলিকে তারা বাস্তব বলে ভুল করে থাকে। এই ধরণের জীবন্ত স্মৃতিচ্ছবিকে ইংরেজীতে eidetic images বলা হয়।

সুতরাং 'গোলাপ' কথাটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে কারো কারো বেলায় গোলাপ ফুল, গোলাপের গন্ধ এবং গোলাপ গাছ ইত্যাদির যে সব স্মৃতিচ্ছবি জাগরিত হয় সেগুলিও বাস্তব সংবেদনের মতোই জীবন্ত মনে হতে পারে। এক ধরণের ঐন্দ্রিয়িক সংবেদন এই ভাবে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সংবেদনকম্প বা সংবেদন প্রায় অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করে—বিজ্ঞানীরা এই ধরনের অভিজ্ঞতার নাম দিয়েছেন সহ-সংবেদন (synaisthesia)।

কারো কারো বেলায় অদ্ভুত এক ধরনের অভিজ্ঞতা ঘটতে দেখা যায়। তাকে বলা হয় বর্ণাঢ্য শ্রুতি, বা বর্ণাঢ্য চিন্তন (coloured or coloured thinking বা phycho-chromaesthesia)। কোন একটি বিশেষ ধ্বনি, সুর বা, শব্দ শুনলে বা মনে মনে ভাবলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মনে বিশেষ একটি রঙ ফুটে ওঠে। যেমন ভৈরবী শুনলে তাঁদের চেতনায় হয়তো বা ভেসে ওঠে ভোরের কাঁচা সোনা রঙটি, পূরবী শুনলে গোধূলির শান্ত ম্লান ধূসরিমা। তেমনি বিশেষ বিশেষ ঋতুর সঙ্গে কারো কারো ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ রঙ জড়িয়ে আছে—যেমন শরতের সঙ্গে নীল, হেমন্তের সঙ্গে হলুদ, বর্ষার সঙ্গে ধূসর, ইত্যাদি। সেই রকম কারো কারো বেলায় বর্ণমালার বিশেষ বিশেষ অক্ষরের বিশেষ বিশেষ রঙ আছে—কারো ক্ষেত্রে হয়তো 'ক' সবুজ 'গ' নীল, এই রকম। আবার 'উষ্ণ লাল' 'শীতল নীল', 'ভারি কালো', 'নরম সবুজ' ইত্যাদির অনুভূতিও কারো কারো হতে দেখা যায়। এ সবই সহ-সংবেদনের বহু বিচিত্র উদাহরণ।

এই ধরণের অভিজ্ঞতা কেন ঘটে বলা কঠিন। তবে মনে হয় এগুলির পেছনে কোন না কোন রকমের সান্নিধ্যের (association) প্রভাব কাজ করে। শরৎ-কে নীল মনে হবার কারণ এই হতে পারে যে শরতে চতুর্দিকে নীলের ছড়াছড়ি—আকাশ নীল, মেঘের ছায়া নীল, দূরের গাছপালা সবই নীল। তেমনি হেমন্তের রৌদ্র হলুদ, প্রান্তর জুড়ে হলুদ শস্য ক্ষেত্রের বিস্তার ; বর্ষায় সজল কালো মেঘে দিক দিগন্ত আবছা হয়ে ধূসর হয়ে থাকে ; তৃণাচ্ছন্ন সবুজ মাঠে হাঁটতে গেলে বা বসলে নরম লাগে ; অন্ধকার ভারি হয়ে বুকের উপর চেপে বসে, নীল আকাশের দিকে তাকালে চোখ দুটি জুড়িয়ে যায়। কিন্তু সকলের বেলায় তো সহ-সংবেদন ঘটে না? আবার যাদের ঘটে তাদের সকলের বেলায়ও একই রকমের সহ-সংবেদন হয় না। তারা সকলেই 'শরৎ' কথাটা শুনলে বা শরতের কথা ভাবলে যে নীল রঙের কথাই ভাববে এমন নয়, কেউ কেউ অন্য রঙের কথাও ভাবতে পারে। সুতরাং মনে হয় সমস্তটাই নির্ভর করছে ব্যক্তির মানসিক গঠন এবং তার নিজস্ব অতীত অভিজ্ঞতার প্রকৃতির ওপর। কোন এক শরতের দিনে নিতান্ত প্রিয়জনের মধুর সান্নিধ্য যদি কাউকে ভীষণ রকম আনন্দ দিয়ে থাকে আর সেই প্রিয়জনটি যদি সেদিন বেগুনী রঙের পরিচ্ছদ পরে থাকে তাহলে ভবিষ্যতে শরতের কথা মনে পড়লে হয়তো বেগুনী রঙটাই তার মনে পড়বে। সেই রকম অতি শৈশবে রঙীন বই থেকে বর্ণমালা যদি কেউ শিখে থাকেন এবং তাতে 'ক' বর্ণটি যদি সবুজ রঙে ছাপা হয়ে থাকে তাহলে বড় হয়ে তিনি 'ক' কে সবুজ ভাববেন, যেমন গাছপালা বললে আমরা সবুজ রঙের কথা, বরফ বললে সাদা রঙের কথা, রক্ত বললে লাল রঙের কথা ভাবি সেই রকম। কারো কারো ক্ষেত্রে এই ভাবনাগুলি বাস্তবের মতোই সজীব হয়ে উঠতে দেখা যায়।

আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি যে মিলেমিশে কাজ করে তার আরও অনেক প্রমাণ আছে। যেমন, স্বাদ নির্ভর করে দৃষ্টি এবং গন্ধের ওপর। নাক বন্ধ করে চোখ বুঁজে থাকা অবস্থায় কারো মুখে একটুকরো আপেল এবং পরে খানিকটা পেঁয়াজ দিয়ে চিবোতে বললে তাদের মধ্যে যে কোন তফাৎ-ই বুঝতে পারবে না। অর্থাৎ আপেল এবং পেঁয়াজের আলাদা রূপ এবং আলাদা গন্ধই তাদের আলাদা স্বাদের কারণ। নাক কান আর গলা এতোই পরস্পর নির্ভর যে ENT (Ear-Nose—Throat) নামে চিকিৎসা বিদ্যায় একটা বিশেষ শাখাই গড়ে উঠেছে। জোর সর্দি হলে কানে তালা লাগে, ভালো শোনা যায় না, খাবার বিস্বাদ লাগে। যেদিক থেকে শব্দ অথবা গন্ধ আসে সেইদিকে আমরা চোখ ফেরাই।

স্থান (space) এবং কাল (time) সম্বন্ধে আমাদের যেসব ধারণা সেগুলিও একাধিক ইন্দ্রিয়ের সহযোগিতায় গড়ে ওঠে। শুধু চোখ দিয়েই আমরা দূরত্ব ঠাহর করি না, গন্ধের স্পষ্টতা এবং শব্দের তীব্রতাও (intensity) আমাদের বস্তুর দূরত্ব সম্বন্ধে ধারণা গঠন করতে সাহায্য করে। শব্দ বা গন্ধের উৎসটি যত দূরে থাকবে তার তীব্রতা ততই ক্ষীণ হবে, আর সেটি যত কাছে থাকবে তার তীব্রতাও তত বেশী হবে। কাল বা সময় সম্বন্ধে আমাদের ধারণা গড়ে ওঠে প্রতিটি ইন্দ্রিয় থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতাগুলির পারম্পর্য (sequence) থেকে। সারা দিনে বা সারাজীবন ধরে শব্দ গন্ধ রূপ রস স্পর্শের যেসব অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করি সেগুলি একই সঙ্গে ঘটে না ; এক একটি করে, একটির পর একটি করে তারা আমাদের চেতনায় উদিত হয়। এই ভাবে আমাদের মধ্যে অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের সম্বন্ধে অর্থাৎ প্রবহমান কাল সম্বন্ধে ধারণার সৃষ্টি হয়। যে কোন অভিজ্ঞতাই আমরা লাভ করি না কেন সেগুলি স্থান এবং কালের গণ্ডিতে আবদ্ধ, অর্থাৎ প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতা কোন না কোন স্থানে এবং কোন না কোন সময়ে ঘটতে বাধ্য। তাই স্থান এবং কালকে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তি বা কাঠামো বলতে পারি, আর এই কাঠামোটা গড়ে উঠেছে বিভিন্ন

ইন্দ্রিয়ের নিবিড় সহযোগিতার ফলে, তাদের সমবেত ক্রিয়াশীলতার জন্যেই।

আসল কথাটা হলো মানুষ একটি সমন্বিত সত্তা—তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি, তার দেহ, তার মন সব কিছুর মধ্যে আছে একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। একে অন্যকে সাহায্য করে, একের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হলে অন্যের মধ্যেও তার সঞ্চার ঘটে, কোন কোন ক্ষেত্রে বেশী করে, কোথাও বা অপেক্ষাকৃত মৃদুভাবে। এই সমন্বয়ের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে মানুষের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা, তার উন্নত চিন্তা, সূক্ষ্ম দুর্বার কল্পনা, আর তার বিস্ময়কর সৃজন-শীলতার নিগূঢ় রহস্যটি। প্রাণের জগতে মানুষের দেহ-মনের সমন্বয় সব চাইতে বেশী বলেই সে সর্বোৎকৃষ্ট।

প্রবাদপুরুষ আল্‌·বেরুণী

সুকুমার গুপ্ত*

একাদশ শতকের প্রথম ভাগে লুঠেরা ভারত-বিজয়ী সুলতান মামুদের উন্মুক্ত তরোয়ালধারী অজস্র সৈনদের সঙ্গে এসেছিলেন বা আসতে বাধ্য হয়েছিলেন—ভারতপথিক, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, অসংখ্য গ্রন্থের রচয়িতা আবু রায়হান মহম্মদ-বিন আহমেদ ওরফে

আল বেরুণী

আল্‌-বেরুণী। জন্ম তাঁর 973 খৃস্টাব্দে 4ঠা সেপ্টেম্বর। বাল্যকাল কাটে মধ্য এশিয়ার খোরাজেমে যেটা এখন রাশিয়ার উজবেকিস্তান। গবেষকরা বলেন তিনি ছিলেন পারসিক। মাতৃভাষা ছিল খোরেজমী, কথা বলতেন ফার্সীতে। আর লিখতেন আরবীতে। অনন্য সাধারণ এই মানুষটিকে ইরানীরা ইরানী বলে দাবী করেন আর আরবীরা বলেন উনি আরবের অধিবাসী। আফগানিস্তান ও রাশিয়া মনে করে—তিনি ওদের আপনজন।

শৈশবে তিনি ছিলেন এক গ্রীক বিজ্ঞানীর ছাত্র। তাঁরই প্রভাবে প্রকৃতির উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতকে বৈজ্ঞানিক আলোকে দেখার আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। সেই বয়সে তিনি ফুলের মধ্যে জ্যামিতিক নকশা এবং মৌমাছির মানবসমাজের আচরণ মৌমাছির ব্যবহারে অবলোকন করেন। তাঁর দ্বিতীয় শিক্ষাগুরু ছিলেন একজন গাণিতিক ও জ্যোতির্বিদ। ইনি হলেন আবুনসর মনসুর বিন আলী বিন ইরাক জিলানী। তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিলেন টোলেমির জ্যোতির্বিদ্যা আর ইউক্লিডের জ্যামিতি। এই সময়েই গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি এবং খনিজের উপর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখার আগ্রহ তার মধ্যে প্রকাশ পায়।

17 বৎসর বয়সে গ্রহ-নক্ষত্রের দূরত্ব মাপার যন্ত্র তৈরী করেন। অল্প বয়সের মধ্যেই তিনি দেশ-বিদেশের অসংখ্য গ্রন্থের পাঠ শেষ করে ফেলেন।

খোরাজেম ছিল ছোট্ট এক সামন্ত রাজ্য, কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার পীঠস্থান—একদিকে গ্রীক জ্ঞান বিজ্ঞান ও অপরদিকে ভারতীয় দর্শন, জ্যোতিষ, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার ব্যাপক সাধনা। এখানেই আল্‌ বেরুণী বহু জ্ঞানী, বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের সংস্পর্শে আসেন। দশম শতকের শেষ ভাগে খোরাজেমে শুরু হয় যুদ্ধের তাণ্ডবনৃত্য। সেই সময় আল বেরুণীকে নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতে হয় মনের অস্থিরতা নিয়ে। তাবারিস্থানের বিদ্যানুরাগী সুলতানের অধীনে কিছুদিন রাজকর্মচারী হিসাবে কাজ করেন, তখন তাঁর বয়স 30-এর নীচে। 1017 খৃস্টাব্দে সুলতান মামুদের আক্রমণে খোরাজেম বিধ্বস্ত হয় আর বিজেতা মামুদের সঙ্গে বন্দী হিসাবে যেতে হয় বিজিতদের। এঁদেরই

* বঙ্গবাসী কলেজ, কলকাতা-700009

মধ্যে ছিলেন আল বেরুণী। যেতে হয় গজনীতে। সেখানে মামুদের দরবারে জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসাবে কাজ নিতে হয় কিন্তু বন্দীদশা থেকে মুক্তি হয়নি।

1014—1019 খৃস্টাব্দের মধ্যে গজনীর সুলতান ভারত আক্রমণ করেন 17 বার, আল বেরুণীও এসেছিলেন তাঁর স্বপ্নে দেখা ভারতে, ছিলেন 12 বছর। মানুষের সঙ্গে মিশেছেন, কাশীতে এসে 45 বছর বয়সে সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করে প্রাচীন ভারতকে জানার চেষ্টা করেছিলেন। তারই ফলস্বরূপ তিনি উপহার দিয়েছেন পৃথিবীর মানুষকে "ভারততত্ত্ব" গ্রন্থটি আর গজনীর মানুষদের উপহার দিয়েছেন বিভিন্ন সংস্কৃত বই-এর আরবী অনুবাদ।

আল বেরুণী সারাজীবন ধরে লিখেছেন বহু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। বিজ্ঞানী হিসাবে তাঁর লেখা আছে প্রায় 12000 পৃষ্ঠা। 180টি পুস্তক তিনি প্রণয়ন করেছেন। এর মধ্যে আছে ইতিহাস, ভারততত্ত্ব, ভেষজতত্ত্ব, ভূগোল ইত্যাদি; তাঁর লেখা ইতিহাস থেকে বহু পুরানো তথ্য জানা যায়। তাঁর লেখায় পাওয়া যায়—পারসিকেরা মিশর অধিকার করে ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরকে যুক্ত করার জন্য সুয়েজ খাল কাটার প্রথম পরিকল্পনা করেছিল। কাজও শুরু হয়েছিল, কিন্তু রোমানরা তা হতে দেয়নি।

তিনি আরবদেশে আজও চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক হিসাবে পূজিত হন। অস্ত্রোপচার করে সন্তান ভূমিষ্ঠ করার পদ্ধতিকে তিনি সিজারিয়ান আখ্যা দেন। দ্রব্যগুণ হিসাবে বহু বস্তুর বিবরণ দেন। গ্রীক চিকিৎসা থেকে সংগ্রহ করেন 700টি, ভারত থেকে 350টি ও সিরিয়া থেকে 400টি ভেষজ দ্রব্যের অস্তিত্ব।

মোটামুটিভাবে যা জানা যায় তাতে দেখা যায় যে তিনি 23টি বই লিখেছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর, ভূগোলের উপর 15টি, গণিতের উপর 8টি, সূর্যকিরণ ও ছায়ার বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপর 4টি, জ্যোতিষগণনার উপর 19টি; ধর্মবিশ্বাস ও লোকাচারের উপর 6টি এবং কাল ও সময় নির্ণয়ের উপর দুটি।

পৃথিবীর ব্যাসার্ধ নির্ণয়ে যে সাফল্য তিনি দেখিয়েছিলেন তা ভাবলে অবাক হতে হয়। হাজার বছর পরে আধুনিক বিজ্ঞানীরা যে ব্যাসার্ধ মাপলেন তা তাঁর দেওয়া পরিমাপের সঙ্গে মাত্র 15 কিলোমিটারের পার্থক্য। তিনি দেখিয়েছিলেন সোনার আপেক্ষিক গুরুত্ব 19.0 আর লোহার 7.92। হাজার বছর পরে এই মাপ প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে।

ভারততত্ত্ব বিষয়ক বইটির রচনা শেষ হয়েছিল 1031 খৃস্টাব্দের ডিসেম্বরে মামুদের মৃত্যুর কয়েক মাস পরে। কোনও গ্রন্থই তিনি মামুদকে উৎসর্গ করে যান নি, কিন্তু মামুদ পুত্র মাসুদ ও মাসুদ পুত্র মাওদুদকে তিনি বিভিন্ন বই উৎসর্গ করে যান। মামুদের প্রতি তাঁর ছিল অসীম ঘৃণা। মানুষের ওপর তার নির্মম আঘাত তিনি দেখেছিলেন ভারতে। মামুদের অত্যাচারে ভারতীয়দের জ্ঞান-সাধনা, শিল্প, দর্শন ও বহু মূল্যবান পুঁথি নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। হিন্দুদের শস্যশ্যামল অঞ্চলগুলো মরুভূমিতে পরিণত হয়েছিল। যেসব হিন্দুরা অবশিষ্ট রইলেন তাঁদের মনে মুসলমানদের প্রতি এক নিদারুণ ক্রোধ, বিতৃষ্ণা ও প্রতিহিংসাপরায়নতা বদ্ধমূল হয়ে রইল। ভারতীয় লোকাচারে এল ধর্মীয় গোঁড়ামি—যা থেকে আজও ভারতীয়রা মুক্ত হতে পারেনি।

সাধারণ মানুষের ওপর তাঁর ছিল অসীম ভালবাসা। জ্ঞান আহরণই ছিল তাঁর একমাত্র সাধনা। তিনি বলেছেন—অর্থের প্রয়োজনীয়তার জন্য জ্ঞানীরা ধনীদের কাছে যায় কিন্তু ধনীরা বিদ্যার মহিমা বোঝে না বলেই জ্ঞানীদের কাছে আসে না। সুলতান মাসুদ পুঁথি উপহার পেয়ে তাঁকে হাতী-বোঝাই অর্থ পাঠিয়েছিলেন কিন্তু আল বেরুণী সেই রাজকীয় দান গ্রহণ না করে বিনয়ের সঙ্গে বলেছিলেন—এই অর্থ তাঁকে বিজ্ঞান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবে তাই এই অর্থ গ্রহণ করতে তিনি অসমর্থ।

ভারততত্ত্বে ভারতের দর্শন, চিকিৎসা, লোকাচার, জ্যোতিষ, জ্যোতির্বিদ্যা, ভাষা ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে বিস্তর লিখেছেন। ঈশ্বরতত্ত্ব, মূর্তিপূজা, জন্মান্তরবাদ, জাতিভেদ, বর্ণমালা, সংখ্যা, চিহ্ন, ভূগোল সম্বন্ধে হিন্দুদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। বইটিতে আছে মোট 80টি অধ্যায়। 40টি সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা রয়েছে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম, হিন্দুদের ইতিহাস ও উপনিষদের উপর আলোচনা এই বইটিতে অনুপস্থিত। দেবদাসী কুপ্রথার জন্য তিনি জাতিকে দোষী করেন নি, তাঁর মতে এই দেশের রাজারাই ছিলেন এর পৃষ্ঠপোষক। রাজকোষে অর্থসংগ্রহই ছিল এর প্রধান লক্ষ্য।

ভারতীয়দের জন্য তিনি বেশ কিছু গ্রন্থ অনুবাদ করে গেছেন সংস্কৃত ভাষায়। ইউক্লিডের এলিমেন্টস', টোলেমির 'অ্যালমাজেস্ট' এবং গ্রহনক্ষত্রের দূরত্ব মাপার যন্ত্রবিষয়ের উপর একটি বই।

তিনি ছিলেন নির্ভীক, স্পষ্টবাদী ও যুক্তিশীল। শাস্ত্রের সবকথা তিনি অকাট্য বলে মেনে নেন নি। জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর অসাধারণ পাণ্ডিত্য থাকলেও তিনি এই শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাঁর ছিল জ্ঞানের জন্য প্রচণ্ড ব্যাকুলতা আর যুক্তির প্রতি অসাধারণ নিষ্ঠা। ইসলামে বিশ্বাসী হয়েও তিনি ছিলেন ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আলবেরুণীর মতো কলা ও বিজ্ঞানের অপূর্ব সমাবেশ লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি ছাড়া আর কারও মধ্যে দেখা যায় নি।

মধ্যযুগের বিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক, চিকিৎসক, কবি, ঔপন্যাসিক, জ্ঞানের পথে মুক্ত পথিক, যুক্তিবাদী দার্শনিক, ঐতিহাসিক মানবদরদী আলবেরুনী 1048 খৃস্টাব্দে 78 বছর বয়সে আফগানিস্থানের গজনীর মৃত্তিকাগর্ভে চিরনিদ্রায় শায়িত হন।

কিশোর বিজ্ঞানীর আসর

আর্দাসীর কারসেৎজী ওয়াদিয়া

সিদ্ধার্থ ঘোষ*

বিখ্যাত গণিতজ্ঞ প্রয়াত শ্রীনিবাস রামানুজন যখন রয়েল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন, সকলেই ভেবেছিলেন ভারতীয় হিসাবে তিনিই প্রথম এই সম্মান লাভ করলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে রয়েল সোসাইটির তৎকালীন সেক্রেটারি এ. ভি. হিল 1944 খৃস্টাব্দে দিল্লীতে এক সাংবাদিক বৈঠকে বক্তৃতার সময় জানান যে, প্রথম ভারতীয় হিসাবে আর্দাসীর কারসেৎজী ওয়াদিয়াই এই সম্মানের অধিকারী।

এই চাঞ্চল্যকর সংবাদ জানা যাওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই আর্দাসীর কারসেৎজী সম্বন্ধে অনুসন্ধান শুরু হয়। ওয়াদিয়া পদবীটি পার্শী সম্প্রদায়ের মধ্যে সুপরিচিত। 1736 খৃস্টাব্দে এই পরিবারের দক্ষ জাহাজ-নির্মাতা লাওজি ওয়াদিয়া সুরাট থেকে বোম্বাইয়ে আসেন এবং তাঁরই হাতে বোম্বাইয়ের ডক নির্মিত হয়। 1885 খৃস্টাব্দ অবধি এই পরিবারের সদস্যরাই 'মাস্টার-বিল্ডার'-এর পদে (প্রধান জাহাজ নির্মাতা) অধিষ্ঠিত ছিলেন। ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতীয় জাহাজ নির্মাতা হিসাবে ওয়াদিয়া পরিবারের অনন্য সাফল্য এক গৌরবময় ইতিহাস।

এই পরিবারেই জন্মগ্রহণ করেন আর্দাসীর কারসেৎজী 1808 খৃস্টাব্দে 6ই অক্টোবর। তাঁর পিতা কারসেৎজী রুস্তমজীও (1788-1863) বম্বে-ডক ইয়ার্ডে মাস্টার-বিল্ডার হিসাবে 1844 খৃস্টাব্দ থেকে 1858 খৃস্টাব্দ অবধি কাজ করেছিলেন। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে, 1822 খৃস্টাব্দে আর্দাসীর কারসেৎজী শিক্ষানবিশ রূপে ডকইয়ার্ডে কাজ শুরু করেন।

কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি স্টীম ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালী অনুশীলনের দিকে মন দেন। এখানে মনে রাখা দরকার যে, ভারতে নৌ-পরিবহনে বাষ্পীয় যন্ত্রের ব্যবহার সেই সবে শুরু হচ্ছে। 1819 খৃস্টাব্দে লক্ষ্ণৌর নবাব গাজি-উদ্দীন হায়দার প্রথম ভারতে স্টীম বোট ব্যবহার করেন। কিন্তু সেটি অভিনবত্বের বেশি কোন মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে নি। 1823 খৃস্টাব্দে প্রথম কলকাতার কাছে গঙ্গায় ভাসান হল স্টীম বোট 'ডায়ানা'। প্রথম 'বার্মিজ-যুদ্ধে' অংশ গ্রহণের পর 'বাষ্পীয় নৌযান' হিসাবে 'ডায়ানা' তার কার্যকারিতার চূড়ান্ত প্রমাণ দাখিল করল। ইতিমধ্যে 1825 খৃস্টাব্দে ইংল্যাণ্ড থেকে প্রথম বাষ্পীয় জাহাজ 'এণ্টারপ্রাইজ' কলকাতায় পৌঁছেছে। 1829 খৃস্টাব্দে বোম্বাইয়ে নির্মিত হয়েছে 'হিউ লিণ্ডসে' স্টীমার। (অমিতাভ ঘোষ, "ইনট্রোডাকশান্ অফ স্টিম বোটস্ ইন ইণ্ডিয়া", বুলেটিন অফ দ্য ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, 9ম খণ্ড, 1975 দ্রষ্টব্য)

আর্দাসীর কারসেৎজী অনুধাবন করেছিলেন, পাল-তোলা দাঁড়-টানা জাহাজের যুগ ফুরিয়ে আসছে। তাই নতুন যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবার জন্য বাষ্পীয় ইঞ্জিন ও নৌ-পরিবহনে তার ব্যবস্থার সম্বন্ধে আগ্রহী হয়েছিলেন। সত্যি বলতে পরবর্তী কালে জাহাজ নির্মাণ শিল্পে ভারতীয় উদ্যোগের গৌরবের যুগের ওপর যবনিকাপাতে বাষ্পীয় যন্ত্র-চালিত নৌযান ও কাঠের পরিবর্তে লোহার ব্যবহারই সবচেয়ে সহায়তা করেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে। কিন্তু ভারতীয়েরা ইংল্যাণ্ডের যন্ত্রশিল্প বিপ্লব-জাত আধুনিক প্রকৌশল রপ্ত করতে পারে নি, এবং সেই কারণেই 'ট্রাডিশানাল্' জাহাজ নির্মাণ বৃত্তিতে পিছিয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিল—এই তত্ত্ব যে উদ্দেশ্যমূলক প্রচার ছাড়া আর কিছুই নয়, তার জ্বলন্ত উদাহরণ আর্দাসীর কারসেৎজীর কর্মজীবন। অসম নীতি ও উপযুক্ত সুযোগের অভাবের জন্যই ভারতীয়রা জাহাজ-নির্মাণের আধুনিক পদ্ধতি আয়ত্ত করতে পারেন নি। 'চেঞ্জ-ওভার'-এর জন্য আবশ্যক সময় পান নি তাঁরা।

স্টীম-ইঞ্জিন নিয়ে অনুশীলন করার প্রকৃত সুযোগ পেলেন আর্দাসীর কারসেৎজী 1930 খৃস্টাব্দের পর। সরকারী অনুমোদন লাভ করে তিনি বোম্বাই টাঁকশালের প্রধান ইঞ্জিনীয়ার ম্যাক-গিল্‌ভারীর অধীনে কাজ নিলেন। ভারতবর্ষের মধ্যে কলকাতা ও বোম্বাইয়ের টাঁকশালেতেই প্রথম বড় আকারের স্টীম-ইঞ্জিন চালিত যন্ত্র বসানো হয়েছিল। এই টাঁকশালে কাজ করার সময়েই কারুর সাহায্য ব্যতীত আর্দাসীর কারসেৎজী এক অশ্বশক্তির ছোট্ট একটি স্টীম ইঞ্জিন তৈরি করেন।

শব্দটি ইংরাজী ভাষায় নেহাতই অর্বাচীন।

*26, সেন্ট্রাল রোড, কলকাতা-700 032

শিল্পায়ণের কাজে জেমস্ ওয়াটের তৈরি স্টীম ইঞ্জিনের ব্যবহার শুরু হওয়ার পর এই নতুন শব্দ এবং বৃত্তির জন্ম। 'ইঞ্জিন'-নির্মাণ থেকেই ইঞ্জিনীয়ার শব্দটি এসেছে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 'ইঞ্জিন' বলতে স্টীম ইঞ্জিনই বোঝাত। সেদিক থেকে আর্দসীর কারসেৎজী দ্বিতীয় ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার। কারণ গোলকচন্দ্র নামে এক অখ্যাতনামা বাঙালী কর্মকার 'অশিক্ষিত' মিস্ত্রী বলাই ভাল, 1828 খৃস্টাব্দের আগেই একক প্রচেষ্টায় একটি ছোট স্টীম ইঞ্জিন নির্মাণ করেছিলেন। শুধু তাই নয় 1828 খৃস্টাব্দে 9ই জানুয়ারী কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'এগ্রি-হর্টিকালচারাল' সোসাইটির প্রদর্শনীতে তিনি তাঁর তৈরি ইঞ্জিন সংযোগে পাম্প চালিয়ে জল তুলে সেবারের প্রদর্শনীর সর্বাধিক পঞ্চাশ টাকা পুরস্কারও লাভ করেন। গোলকচন্দ্রের এই বিস্ময়কর সাফল্যের পিছনে অবশ্য একটি স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের সহৃদয় সমর্থন ছিল। মানুষটি উইলিয়াম কেরী। উইলিয়াম কেরী ও তাঁর পরিজন ওয়ার্ড স্থাপিত শ্রীরামপুরের কাগজের কলের বাষ্পীয় ইঞ্জিনটির কর্মপদ্ধতি অনুশীলন করেই গোলকচন্দ্র স্টীম-ইঞ্জিনটি তৈরি করেছিলেন। (বিস্তারিত বিবরণের জন্য অমিতাভ ঘোষ 'উইলিয়াম কেরীর সমসাময়িক প্রথম ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার' অমৃত, 8ই ফেব্রুয়ারী 1980, এবং "প্রথম ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার ও উইলিয়াম কেরীর বাষ্পের ইঞ্জিন", চতুষ্কোণ, জ্যৈষ্ঠ 1384, দ্রষ্টব্য)।

প্রথম ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার না হলেও আর্দাসীর কারসেৎজী প্রথম ভারতীয় স্টীমার নির্মাতা। নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী ইংল্যাণ্ড থেকে একটি স্টীম-ইঞ্জিন তৈরি করে এনে তিনি 'ইণ্ডাস' নামে একটি স্টীমারকে জলে ভাসান 1833-এর 16ই আগস্ট। এর আগে বোম্বাইয়ে একটি মাত্র স্টীমার (হিউ লিণ্ডসে) তৈরি হয়েছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জন্য নওরোজী জামসেদজী সেই স্টীমারটির খোল নির্মাণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য আর্দসীর কারসেৎজীকে তাঁর কাজে সাহায্য করতেন একজন দক্ষ ভারতীয় কামার এবং এই কামারটির উপরেই ন্যস্ত হয়েছিল স্টীমারটির পরিচালনের ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব। পাঁচ বছরেরও বেশি এই কারিগরটির হাতে পরিচালিত স্টীমারটি একটিও দুর্ঘটনায় পড়েনি বা তার ইঞ্জিনের কোন ক্ষতি হয় নি।

বোম্বাইয়ে প্রথম গ্যাসের আলো জ্বালাবার কৃতিত্বও আর্দাসীর কারসেৎজীর। 1834 এর 10ই মার্চ তিনি ম্যাজাগাঁওয়ে তাঁর বাঙলো ও বাগানকে গ্যাসের আলোয় আলোকিত করেন। এই [illegible]র পাঁচ দিন পরে 15ই মার্চের 'বম্বে গেজেট' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, এই উপলক্ষে বোম্বাইয়ের গভর্নর Earl of clare তাঁর বাড়িতে এসেছিলেন। বাড়িতে মোট আটাশটা আলো জ্বালা হয়েছিল তাছাড়া বাগানেও বসানো হয়েছিল কয়েকটা। নিজেই তিনি তৈরি করেছিলেন 'গ্যাসো-মিটার' ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি। 1885 খৃস্টাব্দে ম্যান্টেল আবিষ্কৃত হবার আগে অবধি সরাসরি গ্যাস জ্বালানো হত বার্নারে। এই ঘটনার অনেক পরে 1866 খৃস্টাব্দে বোম্বাইয়ে শহরে গ্যাসের আলো বসে। কিন্তু তখনো গ্যাস পরিশোধনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে কটু গন্ধ পাওয়া যেত। আর্দাসীর কারসেৎজী কিন্তু গ্যাস উৎপাদনের সঙ্গে পরিশোধনের ব্যবস্থাও করেছিলেন।

সে সময়ে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ ঢালাই করার মতো কোন কারখানা তৈরি হয় নি বোম্বাইয়ে। তাই ম্যাজাগাঁওয়ে নিজের বাড়ির প্রাঙ্গনেই তিনি একটি ছোটখাট ঢালাইয়ের কারখানা স্থাপন করেছিলেন। এইখানে জাহাজের জন্য পেটাই [illegible] বহু জলের ট্যাঙ্কও তিনি নির্মাণ করেছিলেন।

বোম্বাইয়ের এলফিনস্টোন ইন্সটিটিউশানের পত্তনের পর সেখানকার গনিতের অধ্যাপক মিস্টার আলে'বারের সঙ্গে আর্দাসীরের পরিচয় হয়। বোম্বাই সরকারের অনুমতি পাওয়ার পর আলে'বারের অনুরোধে আর্দসীর তাঁকে সাহায্য করার জন্য (বিশেষ করে যন্ত্র ও রসায়ন বিদ্যায়) এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যোগ দেন।

স্টীম-ইঞ্জিনের তত্ত্ব ও প্রয়োগ বিষয়ে আরো শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য আর্দাসীর 1839-এর ডিসেম্বরে ইংল্যাণ্ডে আসেন। ইংল্যাণ্ড যাত্রা ও ইংল্যাণ্ডে একবছর বাসের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি একটি বইও লেখেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অফ ডিরেকটর্সের অনুমোদনক্রমে তিনি প্রথমে মেসার্স সীওয়ার্ডস কম্পানির টেমস নদীর প্রান্তে অবস্থিত কারখানায় যোগ দেন। মেরিন ইঞ্জিনীয়ারিং এ ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য তিনি পরবর্তী কালে বিভিন্ন কারখানায় ও জাহাজ নির্মাণের ডকে কাজ করেন। ইংল্যাণ্ডে থাকার সময়েই তিনি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের অবৈতনিক সদস্যপদ, সিভিল ইঞ্জিনীয়ার্স অ্যাসো-সিয়েশনের সদস্যপদ, 1840-এর 6ই মে সোসাইটি অফ আর্টস অ্যাণ্ড সায়েন্সের এবং ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশানের মেকানিকাল সেকশানের সদস্যপদ লাভ করেন।

অধ্যয়নের কাজ শেষ করে দেশে ফেরার জন্য তৈরি হচ্ছেন, সেই সময়ে 1840-এর 10ই জুলাইয়ের 'লণ্ডন টাইমস' পত্রিকায় একটি 'কর্মখালি'-র বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হলো। বোম্বাইয়ের স্টীম ফ্যাক্টরির যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোর্ট অফ ডিরেকটর্স চিফ ইঞ্জিনীয়ার ও ইন্সপেকটার অফ মেশিনারিজ-পদে অভিজ্ঞ ও সুযোগ্য এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করতে চাইছেন। বহু দরখাস্তকারীর মধ্যে আর্দাসীরই মনোনীত হলেন। ইংল্যাণ্ডের মাটিতেই তুলনামূলকভাবে অধিক সুযোগ প্রাপ্ত ইংল্যাণ্ডবাসী প্রতিযোগীদের পরাস্ত করে আর্দাসীর এক অনন্য সম্মান লাভ করলেন। ইঞ্জিনীয়ারিং শাখার এত উচ্চ সরকারী পদে আর কোন ভারতীয় আর্দাসীরের বহুকাল পরেও আর অধিষ্ঠিত হননি।

1841 খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকে ভারতে ফিরে আসেন আর্দাসীর। 1লা এপ্রিল নতুন কার্যভার গ্রহণ করার আগেই, 27শে মার্চ তিনি রয়াল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হলেন। জেমস ওয়াকার তাঁর নাম প্রস্তাব করেন, ডবুই কাবেট প্রস্তাবটি

সমর্থন করেন এবং জন ম্যাকমেইলি, জেমস হূর্ণে, জোসুয়া ফিল্ড, ডব্লিউ এইচ সাইক্‌স, সার জন ব্যারো, অ্যাডমিরাল এফ বিউফোর্ট এবং সার এডওয়ার্ড স্যাবাইন-এর সমর্থনে তিনি সদস্যপদ লাভ করেন। এই উপলক্ষে যে সার্টিফিকেটটি দেওয়া হয়েছিল সেটি উল্লেখযোগ্য—

ARDASEER CURSETJEE ESQUIRE SHIP BUILDER OF BOMBAY lately in England having undertaken the journey of this country at his own expense in order to perfect himself in the knowledge of the Steam Engine as applicable to Navigation and to acquaint himself with the arts and the manufactures of Europe with the view of improving his own country and his countrymen, a gentleman well versed in the theory and practise of Naval Architecture and devoted to scientific pursuits having introduced lighting by gas into Bombay where he perfected a small gas establishment aided exclusively by Native workman ; having also at his own charge built a vessel of sixty tons to which he adopted a Steam Engine sent out from this country and manufactured and fitted every other part of the machinery and navigated the vessel entirely with native workmen and Engineman, chiefly instructed and trained by himself ; and having otherwise promoted science and the useful art in his own country to which he has just returned, having while in England obtained the appointment of principal inspector of Steam Machinery to the East India Company, being desirous of becoming a Fellow of the Royal Society—

We whose names are hereto subscribed of our personal knowledge consider him as deserving of that honour, as likely to become a valuable and useful member—And we beg to recommend him from his peculiar situation, and the proofs he has given of his desire to extend natural knowledge in India.

Dated this twenty seventh day of March 1841.

রয়াল সোসাইটির অকুণ্ঠ প্রশংসা সত্ত্বেও তাঁর নতুন পদে নিয়োগ নিয়ে ঝড় উঠেছিল। বোম্বে টাইম্‌স্ আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল, 'একজন নেটিভের যোগ্যতা নিয়ে আমাদের সন্দেহ আছে, তা সে যতই শিক্ষিত ও পারদর্শী হক না। মনে রাখা দরকার, সে বোম্বাই স্টীম ফ্যাক্টরির মতো একটা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে চলেছে, তার মানে ইংরাজ কারিগরদের একটি দলকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করবে একজন নেটিভ।'

আসলে প্রায় শতাধিক শ্বেতাঙ্গকে একজন ভারতীয়ের অধীনে কাজ করার বিড়ম্বনা ভোগ করতে হবে, এ-কথা সেকালে সত্যই অভাবনীয় ছিল। তাছাড়া একই পদে কলকাতায় তখন অধিষ্ঠিত বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার কর্নেল উইলিয়াম নেয়ারন্ ফর্বেস (প্রাক্তন মিণ্ট মাস্টার সেণ্টপলস্ ক্যাথিড্রাল ও স্ট্র্যাণ্ড রোডের টাঁকশালের স্থপতি ও ইঞ্জিনীয়ার)।

বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও মধুর ব্যবহার ও যোগ্যতার সুবাদে তিনি পূর্ণ সম্মানে 1857 খৃস্টাব্দের 1লা আগস্ট অবধি এই পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর অবসর গ্রহণ করেন।

এবার তাঁর অন্যান্য কৃতিত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিচ্ছি।

1837 খৃস্টাব্দে তিনি ইংল্যাণ্ডের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির নন-রেসিডেণ্ট মেম্বার এবং 1850-এ বোম্বে মেকানিক্স ইন্সটিটিউট-এর সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন।

1851-র 16ই ফেব্রুয়ারী তিনি তাঁর পুত্র রুস্তমজী আর্দাশীর-এর তৈরি 'লাওজী ফ্যামিলি' নামে একটি 80 টনের স্টীমার জলে ভাসান। এই বাষ্পীয় পোতের সমস্ত যন্ত্রপাতি তাঁর মাজাগাঁও ভবন সংলগ্ন ঢালাই কারখানা ও কামারশালাতেই নির্মিত হয়েছিল।

[illegible]-র সেপ্টেম্বর তিনি দ্বিতীয়বার ইংল্যাণ্ড ভ্রমণে যান এবং দেশে ফেরার পথে আমেরিকা থেকে বোম্বের কারখানার জন্য বিভিন্ন ধরণের কাঠ-চেরাই যন্ত্র আমদানির ব্যবস্থা করেন। তাছাড়া সদ্য আবিষ্কৃত সেলাই কলের কার্যপ্রণালীও তিনি প্রথম ব্যাখ্যা করেন বোম্বাইয়ে। বোম্বাইয়ে ফটোগ্রাফি ও ইলেক্ট্রোপ্লেটিং-এর কাজ প্রচলনের পিছনেও তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল। 1852-এ তিনি বোম্বাইয়ে ফিরে আসেন।

1855-এ তিনি 'জাস্টিস অফ পীস্' হিসাবে নির্বাচিত হন।

স্টীম ফ্যাক্টরির কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করার পর তাঁর পঁয়ত্রিশ বছরের কর্মজীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কোর্ট অফ ডিরেকটার্স একটি ব্যতিক্রম হিসাবেই তাঁকে মাসে চারশো টাকার অবসরকালীন ভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

1859-এ তিনি তৃতীয়বার ইংল্যাণ্ড ভ্রমণে যান।

1861-তে করাচীর ইণ্ডাস ফ্লোটিলা কোম্পানীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হন কিন্তু ভগ্ন স্বাস্থ্যের দরুণ দু বছর বাদে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন।

শেষ জীবনে তিনি রিচমণ্ডে বাস করতেন এবং এখানেই 1877-এর 16ই নভেম্বর তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

1983-এর 6ই অক্টোবর আর্দাসীর কারসেৎজী ওয়াদিয়ার 175তম জন্মদিনে এই পথিকৃত ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারকে আমরা আশা করি যথোচিত মর্যাদা সহকারে স্মরণ করব। আজও তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সম্মানের আসনটি আমরা দিতে পারি নি।

(সূত্র ঃ—আর. এ. ওয়াদিয়া, 'আর্দাসীর কারসেৎজী', সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার, 14 খণ্ড, জানুয়ারি 1949, পৃঃ 268-272 এবং এ. আর. এ. ওয়াদিয়া, সায়েন্স অফ লাওজী ওয়াদিয়া, পৃঃ 52-67)

নোবেল পুরস্কারের টুকিটাকি

নারায়ণ ভট্টাচার্য*

নোবেল পুরস্কারের প্রতিষ্ঠাতা আলফ্রেড বার্নাড নোবেল 1833 খৃস্টাব্দে 21শে অক্টোবর সুইডেনের ষ্টকহোল্‌ম শহরে জন্মগ্রহণ করেন। আলফ্রেড ছাত্রাবস্থায় ইঞ্জিনীয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করেন। তাঁর বাবার একটি রাসায়নিক কারখানা ছিল। আলফ্রেড ছোট বয়স থেকেই পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে এই কারখানায় নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করতেন। একদিন এইরকম পরীক্ষা করার সময় তিনি দেখলেন যে নাইট্রোগ্লিসারিণ যদি কাঠের মণ্ড বা এই ধরনের কোন নিষ্ক্রিয় বস্তুর মধ্যে শুষে নেওয়া যায় তাহলে এই বিস্ফোরক জিনিষটির সহজে বিস্ফোরণের ভয় থাকে না। এই ভাবেই 1867 খৃস্টাব্দে তিনি মানুষের কল্যাণের কাজে ব্যবহারকারী যুগান্তকারী ডিনামাইট আবিষ্কার করেন। ডিনামাইট ছাড়াও আলফ্রেড নোবেল আরও অনেক বিস্ফোরক পদার্থ আবিষ্কার করে পেটেন্ট নেন।

আলফ্রেডের আর একটি বড় কীর্তি হলো রাশিয়ার বাকু নামক এলাকার পেট্রোলিয়াম খনি থেকে প্রথম তেল নিষ্কাশন। নানাধরণের রাসায়নিক জিনিষের পেটেন্ট নেওয়ায় এবং তেল নিষ্কাশনের পথিকৃৎ হিসেবে বার্নাড প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। 1896 খৃস্টাব্দে সানরেমো নামক জায়গায় নোবেলের মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর আগে আলফ্রেড নোবেল কমিটি নামে একটি সংস্থা তৈরি করে 90 লক্ষ ডলার দান করেন। তাঁর ইচ্ছা অনুসারে এই টাকার সুদ থেকে প্রতি বছর (1) পদার্থবিদ্যা (2) রসায়ন শাস্ত্র (3) ভেষজবিদ্যা ও শারীরতত্ত্ব (4) সাহিত্য (5) বিশ্বশান্তি এই পাঁচটি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য মৌলিক গবেষণা ও অবদানের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। সম্প্রতি কয়েক বছর ধরে অর্থনীতিতেও নোবেল পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে গত বছর এই পুরস্কারের মূল্য ছিল 2 লক্ষ ডলারের কিছু বেশি অর্থাৎ প্রায় 20 লক্ষ টাকা।

সুইডেনের নোবেল কমিটি 1900 খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং 1901 খৃস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে প্রথম নোবেল পুরস্কার দেওয়া শুরু হয়। প্রথম বছর যাঁরা এই পুরস্কার পেলেন তারা হলেন পদার্থবিদ্যায় এক্সরশ্মির আবিষ্কর্তা রয়েন্টগেন (জার্মানী), রসায়নে ভাণ্ট হফ্ (হল্যাণ্ড), শারীরতত্ত্ব ও ভেষজবিদ্যার জন্য ফন্ বেরিং (জার্মানী), সাহিত্যে সুলি প্রুধোম (ফ্রান্স) আর শান্তির জন্য সুইজারল্যাণ্ডের ডুনাণ্ট ও ফ্রান্সের পাসি।

এখানে বলা দরকার নোবেল পুরস্কার কেবলমাত্র জীবিত ব্যক্তিই পেতে পারেন; অন্য অনেক পুরস্কারের ক্ষেত্রে রীতি থাকলেও মরণোত্তর নোবেল পুরস্কার দেবার রীতি নেই। নোবেল পুরস্কারের ব্যাপারে আরও একটা ব্যাপার লক্ষণীয়। একই বিষয়ে একাধিক ব্যক্তি যে কোন বছরে নোবেল পুরস্কার বিজেতা হতে কোন বাধা নেই। আজ অবধি একই বিষয়ে এক বছরে নোবেল পুরস্কার বিজয়ীর সর্বোচ্চ সংখ্যা তিন। অবশ্য ভবিষ্যতেও এই রীতি বজায় থাকবে কিনা তা বলা যায় না।

আজ পর্যন্ত সবচেয়ে কম বয়সে যিনি এই পুরস্কার পেয়েছেন তিনি হলেন ব্রিটেনের উইলিয়াম হেনরীব্র্যাগ। ইনি 25 বছর বয়সে 1915 খৃস্টাব্দে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান। ব্র্যাগের পুরস্কার পাওয়া আরও একটি কারণে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' হয়ে আছে। সেটা হলো হেনরীব্র্যাগ ও তাঁর বাবা স্যার উইলিয়াম লরেন্স ব্র্যাগ রঞ্জনরশ্মির দ্বারা কেলাসিত বস্তুর (কৃস্টাল) গবেষণার জন্য 1915 খৃস্টাব্দে পদার্থবিদ্যায় যুগ্ম বিজয়ী হন। আজ পর্যন্ত পিতা ও পুত্র একসঙ্গে নোবেল পুরস্কার আর কেউই পান নি। তবে পিতা ও পুত্র আলাদাভাবে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন এমন ভাগ্যবানরা হলেন (1) স্যার জোসেফ জন টমসন (1906 খৃস্টাব্দে পদার্থবিদ্যা) ও তাঁর ছেলে স্যার জর্জ পেগেট টম্‌সন্ (1937 খৃস্টাব্দে পদার্থবিদ্যা), এরা দুজনেই ব্রিটিশ, (2) ডেনমার্কের বৈজ্ঞানিক নীলস্ বোর (1922 খৃস্টাব্দে পদার্থ-বিদ্যা) ও তাঁর ছেলে অয়ে বোর (1975 খৃস্টাব্দে পদার্থবিদ্যা), (3) সুইডেনের অধ্যাপক কার্ল'মান সীগভান (1924 খৃস্টাব্দে পদার্থবিদ্যা) ও তাঁর ছেলে অধ্যাপক কাই সীগভান (1981 খৃস্টাব্দে পদার্থবিদ্যা) ।

এখানে দেখা যাচ্ছে পিতা ও পুত্র দুজনেই যারা নোবেল

*425, যোধপুর পার্ক, কলিকাতা-68

পুরস্কার পেয়েছেন তাঁরা সবাই পদার্থবিদ। এটা অবশ্যই একটা যোগাযোগ ছাড়া আর কিছু নয়।

নোবেল পুরস্কারের ইতিহাসে কুরীপরিবারের নামটি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। এর কারণ হলো, এটাই একমাত্র পরিবার যাদের মা, বাবা, মেয়ে ও জামাই চারজনে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এ'দের মধ্যে পিয়ের কুরী ও মাদাম কুরী 1903 খৃস্টাব্দে পদার্থবিদ্যায় আর তাঁদের মেয়ে জামাই ইরীণ কুরী ও জোলিও কুরী 1935 খৃস্টাব্দে রসায়নশাস্ত্রে এই পুরস্কার পান। ইরীণ ও জোলিও কুরী রসায়নশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার পেলেও প্রকৃত অর্থে ছিলেন পদার্থবিদ্।

মাদাম কুরীই হলেন প্রথম নোবেল পুরস্কার বিজেতা যিনি দুবার এই পুরস্কার পাবার দুর্লভ সম্মান অর্জন করলেন। 1911 খৃস্টাব্দে তেজস্ক্রিয় রেডিয়াম আবিষ্কারের জন্য দ্বিতীয়বার রসায়নশাস্ত্রে একা একাই এই সম্মানে ভূষিত হন। দুর্ভাগ্যবশতঃ পিয়ের কুরী এর আগে 1906 খৃস্টাব্দে একটি দুর্ঘটনায় মারা যান।

নোবেল পুরস্কার আর যাঁরা দুবার পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে দ্বিতীয়স্থানে (সময় অনুযায়ী) রয়েছেন অধ্যাপক লাইনাস পলিং। এই আমেরিকান বৈজ্ঞানিক 1954 খৃস্টাব্দে রসায়নশাস্ত্রে আর 1963 খৃস্টাব্দে শান্তির জন্য এই পুরস্কার পান। বায়ুমণ্ডলে ও সমুদ্রের জলে পরমাণু বোমা পরীক্ষার পরিবেশদূষণ ও অন্যান্য কুফলের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম করে ইনি সারাবিশ্বে বিপুল জনমত সৃষ্টি করেছেন। তার সৃষ্ট 'পাগওয়াশ কমিটি' এখনও এই কাজ করে চলেছে। একই বিষয়ে প্রথম যিনি দুবার নোবেল পুরস্কার পাবার সৌভাগ্য অর্জন করেন তিনি হলেন আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন বার্ডিন। তিনি লেখাপড়া করেন ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ পরে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় আকৃষ্ট হন। 1956 খৃস্টাব্দে ট্রানজিস্টার আবিষ্কারের জন্য ব্র্যাটেন ও শকলের সঙ্গে একযোগে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান। পুনরায় 1972 খৃস্টাব্দে তিনি, তাঁর ছাত্র রবার্ট স্রীফার এবং লিওন কুপারের সঙ্গে অতিপরিবাহিতার নতুন তত্ত্বের আবিষ্কারের জন্য পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান। বার্ডিনের দ্বিতীয়বার নোবেল পুরস্কার আর একদিক থেকে স্মরণীয়। তাঁরা বি. সি. এস (বার্ডিন, কুপার ও স্রীফারের আদ্যক্ষর নিয়ে তৈরি) নামক যে তত্ত্বের আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পান সেই বিষয়ে গবেষণা করে 1956 খৃস্টাব্দে রবার্ট স্রীফার বার্ডিনের তত্ত্বাবধানে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট ডিগ্রীপান। একই বিষয়ে দুবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন এমন আর একজন বৈজ্ঞানিক হলেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক ফ্রেডরিক স্যাংগার। ইনি 1958 খৃস্টাব্দে প্রোটিনের উপর গবেষণার জন্য প্রথমবার রসায়নে এই পুরস্কার পান। এরপর ডি. এন. এ (ডি অক্সিরিবোনিউক্লিক এসিড) সম্বন্ধে নতুন তথ্য আবিষ্কারের জন্য 1980 খৃস্টাব্দে দ্বিতীয়বার রসায়নশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার পান।

একাধিকবার নোবেল পুরস্কার পাবার কথা প্রসঙ্গে আইনস্টাইনের কথা না বললে অন্যায় করা হবে। আমরা সবাই জানি অ্যালবার্ট আইনস্টাইন আপেক্ষিকতাবাদ আবিষ্কারের জন্য বিশ্ববিখ্যাত; কিন্তু অনেকেই জানেন না যে উনি এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের স্বীকৃতি হিসেবে নোবেল পুরস্কার পান নি। 1911 খৃস্টাব্দে, ফটোইলেকট্রিক এফেক্টের প্রথম বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য তিনি পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান। এই তত্ত্বের মধ্যে তিনি আলোকরশ্মি যে ফোটন কণার সমষ্টিমাত্র এই ধারণার সূত্রপাত করেন।

এটা কেবল আমারই ধারণা নয়, বিশ্বের অনেক বৈজ্ঞানিকই মনে করেন যে আইনস্টাইনকে তাঁর 'বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব' (1905 খৃস্টাব্দ) এবং 'সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের' (1915 খৃস্টাব্দ) জনক হিসাবে আরও দুবার নোবেল পুরস্কার দেওয়া উচিত ছিল।

উচিত, অনুচিতের কথা প্রসঙ্গে মনে পড়ে সেই সব বৈজ্ঞানিকদের কথা যাঁরা পদার্থবিদ হিসেবে বিশ্ববিখ্যাত, কিন্তু নোবেল কমিটির মতে ঐ সব বছরে তাঁদের চেয়েও যোগ্যতর পদার্থবিদ থাকায় বাধ্য হয়ে এ'দের রসায়নে পুরস্কার দেওয়া হয়। এ'দের মধ্যে লর্ড রাদারফোর্ড (1909 খৃস্টাব্দ), ওয়াল্টার নার্নস্ট (1920 খৃস্টাব্দ), ফ্রেডরিক সডি (1921 খৃস্টাব্দ), এস্টন (1922 খৃস্টাব্দ), হ্যারল্ড ইউরে (1934 খৃস্টাব্দ), পিটার ডিবাই (1936 খৃস্টাব্দ), অটোহান (1944 খৃস্টাব্দ), গ্লেন. টি. সিবর্গ ও এডোয়ার্ড ম্যাকমিলান (1951 খৃস্টাব্দ), গুন্সেজার (1968 খৃস্টাব্দ) ও জর্জ হার্জবার্গ (1971 খৃস্টাব্দ) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া অনেক বৈজ্ঞানিক রয়েছেন যাঁরা তাঁদের আবিষ্কার তথা মৌলিক অবদানের জন্য বিশ্ববিখ্যাত অথচ দুর্ভাগ্যবশতঃ নোবেল পুরস্কার পান নি। এ'দের মধ্যে বংশানুক্রম তত্ত্বের (হেরিডিটি) আবিষ্কর্তা রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক জন মেণ্ডেলীফ, পরমাণুর গঠন তত্ত্বের জন্য বিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক আর্নল্ড সমার ফেল্ড, চুম্বকত্বের নতুন তত্ত্ব আবিষ্কর্তা ফরাসী বৈজ্ঞানিক লাজভাঁ। বিভিন্ন ধরণের এক্সরশ্মি বিষয়ে মৌলিক গবেষণার জন্য বিখ্যাত ফরাসী পদার্থবিদ্ মোসলে, ইলেকট্রনের 'স্পিন্' তত্ত্বের আবিষ্কর্তা জার্মান পদার্থবিদ উলেনবেক ও গাউডস্মিথ ও পরমাণুর বিভাজন সম্বন্ধে মৌলিক অবদানের জন্য বিখ্যাত জন হুইলার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এ'দের মধ্যে হুইলার ছাড়া আর কেউই এখন জীবিত নেই, তাই ভবিষ্যতেও এই মারাত্মক ভুল সংশোধনের আর কোনও উপায় নেই।

আজ পর্যন্ত যে কজন মহিয়সী মহিলা বিভিন্ন বিষয়ে অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে মেরীকুরী ও তাঁর মেয়ে ইরীণ জোলিও কুরীর কথা আগেই বলা হয়েছে। এছাড়া রয়েছে আমেরিকান লেখিকা পার্ল'বাক (1938 [illegible] সাহিত্যে), মারিয়া গোপার্টমায়ার

(1963 খৃস্টাব্দে পদার্থবিদ্যায়, আমেরিকা), ডরোথি হজকিন (1964 খৃস্টাব্দে রসায়নে, বৃটেন), নেলী স্যাকস্ (1966 খৃস্টাব্দে সাহিত্যে), রোজালিন ইরালো (1977 খৃস্টাব্দে শারীর-তত্ত্ব ও ভেষজবিদ্যায়) এবং মাদার টেরেসা (1978 খৃস্টাব্দে শান্তির জন্য ভারত)। এখানে একটা জিনিষ লক্ষ্য করার মত। আলফ্রেড নোবেল তাঁর জীবিতাবস্থায় যে কটি বিষয়ে এই পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন তার সবকটি বিষয়েই এক বা একাধিক মহিলা পুরস্কার পেয়েছেন।

নোবেল পুরস্কারের তালিকা দেখলে দেখা যাবে ইউরোপ ও আমেরিকার নাগরিকরাই প্রায় প্রতিবছর এই পুরস্কার পেয়ে আসছেন। এর মধ্যে কোনও রাজনীতি আছে আমি বলছি না তবে এটাই বাস্তব ঘটনা।

এই পর্যন্ত তিনজন চীনা বৈজ্ঞানিক নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এঁরা হলেন চেননিং ইয়াং ও সুং লী (1957 খৃস্টাব্দে যুগ্মবিজয়ী) আর চাও চুং টিং (1976 খৃস্টাব্দে)। এঁরা তিনজনেই নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন পদার্থবিদ্যায় এবং আমেরিকার নাগরিক হিসেবে।

এ পর্যন্ত এশিয়া মহাদেশের নাগরিক হিসেবে যাঁরা নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদের সংখ্যা হাতে গোনা যায়। এদের মধ্যে জাপানী আছেন পাঁচজন। এঁরা হলেন হিদেকী ইউকাওয়া (1949 খৃস্টাব্দ), সিন ইতিরো তোমোনোগা (1965 খৃস্টাব্দ) এবং লিও ইসাকি (1973 খৃস্টাব্দ)। এঁরা তিনজনেই পদার্থবিদ্যায় আর ইউসিনোরি কাওয়াবাতা সাহিত্যে আর 1981 খৃস্টাব্দে অধ্যাপক কেনেচি ফুকুই রসায়ন শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার পান।

ভারতীয়দের মধ্যে চারজনই মাত্র নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এঁদের মধ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ 1913 খৃস্টাব্দে সাহিত্যে, স্যার সি. ভি. রমন 1930 খৃস্টাব্দে পদার্থবিদ্যায়, মাদার টেরেসা 1978 খৃস্টাব্দে শান্তির জন্য আর এস. চন্দ্রশেখর 1983 খৃস্টাব্দে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান। এখানে মনে পড়ে ভারতবর্ষে জন্মেও হরগোবিন্দ খোরানা আমেরিকান। 1968 খৃস্টাব্দে শারীরবিদ্যায় ডি. এন.-এর সংকেত উদ্ধার করার কাজে উল্লেখযোগ্য গবেষণার জন্য অধ্যাপক খোরানা নোবেল পুরস্কার পান। কিন্তু ভারতবর্ষ সেই সম্মানে বঞ্চিত। তাই তাঁকে এই হিসেবের মধ্যেই ধরা হয় নি।

ভারতীয় নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদের কথা প্রসঙ্গে স্বভাবতই স্যার রোনাল্ডরসের নাম এসে পড়ে। রোনাল্ড রস 1857 খৃস্টাব্দে উত্তর প্রদেশের আলমোড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। যদিও তিনি ব্রিটিশ নাগরিক ছিলেন কিন্তু 1881 খৃস্টাব্দ থেকে 1899 খৃস্টাব্দ অবধি দীর্ঘ আঠার বছর তিনি এই কলকাতায় ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসে কর্তব্যরত ছিলেন। ঐ চাকরী করার সময়ই 1898 খৃস্টাব্দে তদানীন্তন প্রেসিডেন্সী জেনারেল, বর্তমান শেঠ শুকলাল করনানী হাসপাতালে ম্যালেরিয়া রোগ নিয়ে গবেষণা করার সময় ঐ রোগের জীবাণু সংক্রমণের কারণ আবিষ্কার করেন। এরপর তিনি ব্রিটেনে ফিরে যান এবং 1902 খৃস্টাব্দে ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত গবেষণার জন্য চিকিৎসাশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার পান। তাঁর সম্মানে কলকাতাবাসী হিসেবে আমরা গর্বিত।

1901 সাল থেকে আজ পর্যন্ত 'সর্বেধন নীলমনি' পাকিস্তানের নাগরিক অধ্যাপক আবদুস সালাম 1979 খৃষ্টাব্দে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান। আবদুস সালাম অবশ্য নামেই পাকিস্তানের নাগরিক। 20 বছর বয়সে 1946 খৃস্টাব্দে তিনি পদার্থবিদ্যায় উচ্চতর গবেষণার জন্য কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। মাঝে কয়েক বছর পাকিস্তানের পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের উপদেষ্টা হিসাবে থাকা ছাড়া সুদীর্ঘ 57 বছরের 37টা বছরই কেটেছে বিদেশে, কখনও ইংল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় কিংবা ইতালীর গবেষণাগারে। অধ্যাপক সালাম তাঁর নোবেল পুরস্কারের সমুদয় অর্থ দান করেছেন ইতালীতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে; উদ্দেশ্য হল, পাকিস্তানে তাঁর জন্মস্থান নোঙ্গ এলাকার কোনো তরুণ বৈজ্ঞানিক যদি ইতালীর ঐ গবেষণা কেন্দ্রে আসেন তবে তাঁকে যেন কোনো অর্থকষ্টে না পড়তে হয়। দীর্ঘদিন দেশত্যাগী হয়েও মাতৃভূমির প্রতি এরকম দরদ ও দানের জন্য অধ্যাপক সালামের নাম নোবেল পুরস্কারের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

ভারতীয় মহাকাশচারী

প্রসেনজিৎ সরকার*

1984 খৃস্টাব্দটি ভারতের মহাকাশ বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বছর হয়ে থাকবে। আগামী বছর প্রথম ভারতীয় মহাকাশচারী হিসাবে রাকেশ শর্মা কিংবা রবীস মালহোত্রা দুইজন সোভিয়েত মহাকাশচারীর সঙ্গে যৌথভাবে মহাকাশে যাবেন। বর্তমানে দুইজন সোভিয়েত ইউনিয়নের 'নক্ষত্র নগরী' (star city) তে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। তবে শর্মা এবং মালহোত্রার সম্বন্ধে কিছু বলার আগে ভারতের মহাকাশ বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির চিত্রটি পর্যালোচনা করা যাক।

ভারতীয় মহাকাশবিজ্ঞানের জনক হলেন ডঃ বিক্রম সারাভাই। বাঙ্গালোরে ডঃ সি. ভি. রামনের সঙ্গে 'কসমিক রে' নিয়ে গবেষণা করার সময়ই তিনি ভারতের মহাকাশ বিজ্ঞানের প্রসারের প্রতি আগ্রহী হন। 'কস্‌মিক রে' এবং তার আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে আরও গবেষণার জন্য ডঃ সারাভাই 1947 খৃস্টাব্দে আমেদাবাদে একটি গবেষণাগার স্থাপন করেন। তবে এ সম্পর্কে সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয় 1962 খৃস্টাব্দে। এই বছর সরকারি উদ্যোগে মহাকাশ বিষয়ক গবেষণার জন্য একটি জাতীয় পরিষদ [Indian National Committe for Space Research] গঠিত হয়। এবং ত্রিবান্দমের 6Km. উত্তরে থুম্বায় স্থাপিত হয় নিরক্ষীয় রকেট উৎক্ষেপন স্টেশন (Equatorial Rocket Launching Station)। 1963 খৃস্টাব্দের 21শে নভেম্বর থুম্বা কেন্দ্র থেকে ছোঁড়া হয় প্রথম রকেট। এটি পাওয়া গিয়েছিল NASA-র কাছ থেকে।

1967 খৃস্টাব্দের 31শে অগাস্ট ছোড়া হয় RH-75 নামে ভারতের তৈরি নিজস্ব রকেট। '68তে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 'থুম্বার' রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্রটিকে রাষ্ট্রসংঘের হাতে অর্পণ করেন। এরপরে ফ্রান্সের বিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় ভারতীয় মহাকাশ বিজ্ঞানীরা দুইস্তর বিশিষ্ট সেন্টর (centaur) রকেট উদ্ভাবন করেন। এই রকেটের প্রথম সার্থক পরীক্ষা হয় '69 খৃস্টাব্দে 26শে ফেব্রুয়ারী।

1971 খৃস্টাব্দে ডঃ সারাভাই-এর মৃত্যুর পর থুম্বার রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্রটির নামকরণ করা হয় 'বিক্রম সারাভাই স্পেশ সেন্টার' (Vikram Sarabhai Space Centre)।

ইতিমধ্যে 'রোহিণী' সিরিজের রকেটগুলি ক্রমশ উন্নত হতে শুরু করে। ক্রমে RH-100, RH-125, RH-300 প্রভৃতি উন্নত ধরনের রকেট উদ্ভাবিত হয়। RH-100 এবং RH-125 এই দুই ধরনের রকেটের কিছু রদবদল ঘটিয়ে তৈরি করা হয় যথাক্রমে Menaka-I এবং Menaka-II নামে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণকারী রকেট। এরপরে তৈরি হয় আরও উন্নত ধরনের রকেট RH-560। এছাড়া '73 খৃস্টাব্দে প্রথম তরল জ্বালানিযুক্ত রকেটটিকে (RH-250) ছোড়া হয় থুম্বা থেকে।

এরপরে ভারত প্রবেশ করে উপগ্রহ উৎক্ষেপণের যুগে। '75 খৃস্টাব্দের 19শে এপ্রিল সোভিয়েত দেশ থেকে মহাকাশে পাঠান হয় প্রথম ভারতীয় উপগ্রহ 'আর্যভট্ট'। এরপরে '79-এর 7ই জুন ভারতের 2য় কৃত্রিম উপগ্রহ 'ভাস্কর-I' কে মহাকাশে পাঠান হয় সোভিয়েত রকেটের সাহায্যে।

1979 খৃস্টাব্দের 10ই অগাস্ট শ্রীহরিকোটা থেকে মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয় ভারতের তৈরি উপগ্রহ উৎক্ষেপণকারী রকেট SLV-3। এর পরে 1980 খৃস্টাব্দের 18ই জুলাই রোহিণী-I (RS-E-2) এবং 1981 খৃস্টাব্দের 31শে মে রোহিণী-II (RS-D-1) কে মহাকাশে পাঠানো হয়।

'81তে Apple (19শে জুন) এবং ভাস্কর-II (20শে নভেম্বর) নামে আরও দুটি উপগ্রহ মহাকাশে যায় যথাক্রমে ESA এর এরিয়েন রকেট এবং সোভিয়েত দেশের রকেটের সাহায্যে। তারপর' 82-এর জুলাইতে (10ই জুলাই) ডেল্টা-3910 রকেটের মাথায় চড়ে মহাকাশে পাড়ি দেয় INSAT-I (A) এবং '83-এর 17ই এপ্রিল মহাকাশে পাড়ি দেয় রোহিণী—D-II। সংক্ষেপে এই হল ভারতীয় মহাকাশ বিজ্ঞানের ইতিহাস। তবে এবার এবিষয়ে স্থগিত রেখে ভারতের ভাবী মহাকাশচারীদের কথা বলা যাক।

আর. শর্মা এবং আর. মালহোত্রা দুজনেই হচ্ছেন ভারতীয় বিমানবাহিনীর কর্মী। মালহোত্রা হচ্ছেন বিমানবাহিনীর উইং কম্যাণ্ডার (wing commander) এবং অপর জন হচ্ছেন স্কোয়াড্রন লীডার (squadron leader)। 1984 খৃস্টাব্দের ভারত সোভিয়েত যৌথ মহাকাশ অভিযানের (Indo-Soviet Joint space Venture) জন্য মোট 200 জনকে পার্থী হিসাবে নির্বাচিত করা হয়। এই 200 জনের থেকে বেছে নেওয়া হয় মালহোত্রা এবং শর্মাকে। তবে সর্বশেষে কিন্তু মালহোত্রা এবং শর্মার মধ্যে থেকে বেছে নেওয়া হবে মাত্র একজনকে যিনি ভারতের প্রথম মহাকাশচারী হবার সৌভাগ্য অর্জন করবেন। আর অপরজন থাকবেন "স্ট্যাণ্ড বাই" হিসাবে।

'84-এর ভারত সোভিয়েত যৌথ মহাকাশ অভিযানটি হবে আট দিন ব্যাপী এবং এতে অংশ নেবেন দুইজন রাশিয়ান এবং একজন ভারতীয় মহাকাশচারী। এই তিন মহাকাশচারী একটি

সোইয়ুজ-I নামক মহাকাশযানে করে রওনা হবেন মহাশূন্য ল্যাবরেটরি স্যালিউত-7 তে। এই মহাশূন্য ল্যাবরেটরি থেকে তারা বায়োমেডিক্যাল, মেটিরিয়াল সায়েন্স এবং রিমোট সেনসিং-এর উপরে 11টি বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন। তবে ঠিক কোন কোন পরীক্ষাগুলি করা হবে তা এখনও পর্যন্ত চূড়ান্তভাবে স্থির হয়নি। অবশ্য স্যালিউত-7-এর সাহায্যে সরাসরি বেতার এবং দূরদর্শনের অনুষ্ঠান প্রচারের পরিকল্পনাও আছে।

মহাকাশচারীদের রওনা হবার এক সপ্তাহ কিংবা তারও আগে প্রোগ্রেস (progress) নামক স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযানের মাধ্যমে এই যৌথ অভিযানের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতিকে পাঠান হবে, যা আপনা থেকেই স্যালিউত-7-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে। তারপর এই তিন মহাকাশচারী মহাকাশ স্টেশনে গিয়ে ঐসব যন্ত্রপাতি দিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার পর "সোইয়ুজ-1"-এর অবতরণ যানে করে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসবেন।

কিন্তু মহাকাশে যাবার আগে প্রয়োজন কঠোর প্রশিক্ষণ। মহাকাশের সম্ভাব্য সকল রকমের বিপদ সম্পর্কে অবহিত থাকা এবং তা থেকে অব্যাহতি পাবার উপায় প্রত্যেক মহাকাশচারীকেই জানতে হয়। তাই তাদের শিখতে হয় মহাকাশবিষয়ক যাবতীয় কলাকৌশল এবং নিতে হয় কঠোর প্রশিক্ষণ।

ট্রেনিং সেন্টারে মহাকাশের কৃত্রিম আবহাওয়া সৃষ্টি করে ট্রেনিং দেওয়া হয় ভাবী মহাকাশচারীদের। তেমনি শর্মা এবং মালহোত্রা উভয়কেই সমস্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। তারা তাদের থিওরিটিক্যাল ট্রেনিং-এ ভালভাবেই উতরেছেন এবং এই জুলাই মাসটি ছুটি কাটাতে ভারতবর্ষে ফিরে এসেছেন। জুলাই মাসটি দেশে কাটিয়ে তারা আবার অগাস্ট মাসে ফিরে যাবেন মস্কোতে। সেখানে 2য় পর্যায়ে তাদের ভারহীন অবস্থায় থাকার এবং অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি মোকাবিলা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

তবে এর মধ্যেই তারা কয়েকবার শূন্য মাধ্যাকর্ষণের স্বাদ উপভোগ করেছেন। এই শূন্য মাধ্যাকর্ষণের স্থায়িত্ব ছিল 25 সেকেণ্ড করে। অবশ্য বিমান পাইলট হিসাবে শূন্য মাধ্যাকর্ষণের স্বাদ তারা আগেও পেয়েছেন। তবে তখন তার স্থায়িত্ব মোটামুটি একসেকেণ্ডেই সীমাবদ্ধ থাকত।

এ ছাড়া প্রশিক্ষণের অঙ্গ হিসাবে তাদেরকে নিয়মিত যোগাভ্যাসও করতে হয়।

আর মাত্র কয়েকটা মাস। তারপরেই ভারতের প্রথম মহাকাশচারী হিসাবে শর্মা কিংবা মালহোত্রা যাবেন মহাকাশে। নিঃসন্দেহে সেই দিনটি ভারতের মহাকাশ বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করবে। ভারতবাসী হিসাবে আমরা সকলেই সেই বিশেষ দিনটির জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছি, তাই না?

পুস্তক পরিচয়

রতনমোহন খাঁ

অংকের ম্যাজিক : শ্রীসত্যরঞ্জন পাণ্ডা, গ্রন্থনা, 8-বি কলেজ রো, কলিকাতা—9, মূল্য—7 টাকা।

লেখক এই পুস্তকে তেইশটি ম্যাজিক উপহার দিয়েছেন, শিশুমনের খোরাক যোগাতে। ম্যাজিকগুলির মধ্যে আছে কেবলমাত্র যোগ, বিয়োগ গুণ, ভাগের কেরামতি। তাই ছোটদের ও সাধারণের কাছে বইটি সহজবোধ্য। তবে মাঝে মাঝে বিষয়বস্তুর আলোচনার প্রারম্ভে নানা কথার বিন্যাসে পরিবেশন হয়েছে ভারাক্রান্ত। এছাড়া যাদের জন্য বইটি লেখা তারা গ্রহণ করে বিচার করে না। তাই অত্যন্ত যত্নবান হওয়া উচিত শিশু উপহারে। ভাষার অসঙ্গতি, বানান ও সংখ্যার ভুল এসব ক্ষেত্রে থাকা অনুচিত। এসব ত্রুটিমুক্ত হলে বইটি শিশুদের কাছে সাদরে গৃহীত হবে এবং ম্যাজিকের মেজাজ বজায় রেখে তাদের গণিতে আকর্ষণ বাড়াবে।

মেঘের চেয়েও উঁচু মাস্তুল

ইস্পাতের ফলক-আবহ অনুসন্ধানের সহায়ক 1000 মিটার উঁচু একটি মাস্তুল। তৈরি করেছেন সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা। এই উদ্দেশ্যে এত উঁচু মাস্তুল ইতিপূর্বে কল্পনাতীত ছিল। কাঠামোটির ওজন 8,000 টন—বিখ্যাত ঈফেল টাওয়ারের চেয়েও হালকা, যদিও ঈফেল টাওয়ারের উচ্চতা এই ফলকের তিনভাগের একভাগ। ভূমিতে এই মাস্তুলের ব্যাস 10 মিটার, শিখরে 7 মিটার। প্রতি 25 মিটার পরে পরে আছে পর্যবেক্ষণ মঞ্চ। সেখানে আছে আবহবিজ্ঞানীদের নিয়ে যাবার জন্য উচ্চবেগসম্পন্ন এলিভেটর। মাস্তুলের কাঠামো হালকা ও মনোরম।

এই মাস্তুলের জন্য তৈরি করা হয়েছে এমন এক ইস্পাত যা কোনো আবহাওয়ায় নষ্ট হয় না এবং অতিমাত্রায় শক্ত। আর্দ্রতায় ও বাতাসে এই ইস্পাতের ওপরে মরিচারোধী প্রলেপ পড়ে।

দ্বিতীয় হুগলী সেতু

মানিক লাল কুণ্ডু*

বর্তমানে হুগলী নদীর উপর একটিমাত্র সেতু 'হাওড়া ব্রীজ' (অধুনা রবীন্দ্র সেতু) পশ্চিম পাড়ের হাওড়ার সঙ্গে পূর্বপাড়ের কলিকাতার যোগসূত্র অব্যাহত রেখেছে। স্মরণ থাকতে পারে যে, 1939 খৃস্টাব্দে ইহা শুরু হয় এবং 1945 খৃস্টাব্দে ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হয়। প্রায় তিন দশক ব্যবহারের পর, অপর একটি বিকল্প ও পরিপূরক সেতু কেবলমাত্র অত্যাবশ্যক নয়, অপরিহার্য বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক।

1969 খৃস্টাব্দে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 36নং আইন মোতাবেক হুগলী রিভার ব্রীজ কমিশনার্স নামে একটি স্বশাসিত সংস্থা গঠিত হয়। 1972 খৃস্টাব্দে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই সেতুর শিলান্যাস করেন।

হুগলী রিভার ব্রীজ কমিশনার্স এর উপর দ্বিতীয় হুগলী সেতুর নির্মাণ ভার ন্যাস্ত হলেও, এই সংস্থার কাজ প্রথম পর্যায়ে মূলতঃ উপদেশ ও নির্দেশ দিবার দায়িত্ব নিয়েছিল। ইহা কার্যকরী করার জন্য, এই সংস্থা মূল সেতুকে তিনটি আপাততঃ বিচ্ছিন্ন অংশে বিভক্ত করেছিল—যথা সেকসন I, সেকসন II ও সেকসন III। এই সেকসনগুলির কাজ যথাক্রমে ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট, হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাস্টকে দেওয়া হয় এবং ঠিকাদার মাধ্যমে কাজ সুসম্পন্ন করিবার ভার দেওয়া হয়। পরে, অসুবিধার কথা চিন্তা করে ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাস্টকে 1979 খৃস্টাব্দে তদারকি থেকে বাদ দেওয়া হয়। এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, সেকসনে বিভক্ত করার মধ্যে ব্যবহারিক কাজের সুবিধার কথা চিন্তা করা হয়েছিল। সেকসনগুলিতে কাজের ভাগ :—

সেকসন I হুগলী নদীর পূর্বপাড়ে কলিকাতার উপর অবস্থিত। এই অংশের বহুলাংশ জমি সমর বিভাগের অধীনস্থ। ফলে এককালীন প্রয়োজনীয় জমি গ্রহণে হুগলী রিভার ব্রীজ কমিশনার্সকে বিক্রয়ে ও হস্তান্তরে কোনই অসুবিধা ভোগ করতে হয় নি। ফলে কাজে অগ্রগতির সুবিধা হয়েছে। এই অংশের প্রধান কাজ এপ্রোচরোড ও ইন্টারচেঞ্জ। এইগুলির দৈর্ঘ্য প্রায় 8·027 কি. মি.। ইন্টারচেঞ্জ-এর কাজ ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা অভিমুখে অন্য রাস্তার সঙ্গে বাধা সৃষ্টি না করে যাবার ব্যবস্থা। বর্তমানে (এই প্রবন্ধ লিখিবার সময়) এই কাজ 52 শতাংশ সম্পূর্ণ হয়েছে।

সেকসান II হুগলী নদীর পশ্চিম পাড়ে হাওড়ার অবস্থিত। এই পাড়ের নদী তীরবর্তী জি. টি. রোডের পূর্বদিক পর্যন্ত জমির জায়গা ক্যালকাটা পোর্টট্রাস্ট ও হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির অধীনস্থ হওয়ায়, উহা বিক্রয়ে ও হস্তান্তরে বিশেষ অসুবিধা হয় নি। কিন্তু জি. টি. রোডের পশ্চিম দিকের জমি খুব ঘন বসতিপূর্ণ ও ব্যক্তি-মালিকানা থাকায় জমি দখলে অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল। যদিও হুগলী রিভার ব্রীজ কমিশনার্স কর্তৃপক্ষ ঐ সকল বাস্তুচ্যুত মালিকদিগকে মূল্য ও খেসারৎ ছাড়াও অন্যস্থানে জমি, কিস্তিতে তৈরী বাড়ী ইত্যাদি দিবার ব্যবস্থা করেছেন। এই অংশে ভায়াডাক্ট সহ মূল সেতুর সহিত সংযোগকারী রাস্তার দৈর্ঘ 8.67 কি.মি.। এই দিকের কাজ প্রায় 32 শতাংশ সম্পূর্ণ হয়েছে।

সেকসন III মূল সেতুর অংশ। প্রথমতঃ ইহা ক্যালকাটা পোর্টট্রাস্টের উপর ন্যস্ত ছিল। কিন্তু 1979 খৃস্টাব্দে প্রথম দিকে হুগলী রিভার ব্রীজ কমিশনার্স কর্তৃপক্ষ এই অংশের কাজ নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেন। ফলে, হুগলী রিভার ব্রীজ কমিশনার্স এর কাজ ও দায়িত্ব আরও বৃদ্ধি পায়।

মূল সেতু সম্বন্ধে বৈশিষ্টযুক্ত কিছু কিছু তথ্য জানা প্রয়োজন। এই সেতুকে দুটী স্তরে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমস্তর ও দ্বিতীয় বা শেষ স্তর যথাক্রমে সাব-স্ট্রাকচার বা ভিত ও শেষ স্তরকে সুপার স্ট্রাকচার বা ভিতের উপরিভাগ অংশকে বলা হয়েছে।

সাব-স্ট্রাকচার বা ভিত :—এই সাব-স্ট্রাকচার চারটি ভিত নিয়ে গঠিত। এই ভিতের প্রথম ও দ্বিতীয়টি কলিকাতার দিকে অবস্থিত। তৃতীয় ভিতটি হাওড়ার দিকে নদীর পাড় হতে জল-গর্ভে 600 ফুট দূরে ও চতুর্থ ভিতটি হাওড়ার দিকে নদীর পাড়ে অবস্থিতি করবে। প্রত্যেক ভিত নির্মাণের কাজে প্রথমে উত্তরে ও দক্ষিণে একটি করে বৃত্তাকৃতি কূপ খনন করতে হয়েছে। প্রত্যেকটি ভিতের জন্য যে দুটি করে কূপ খনন করা হয়েছে, তাদের বর্হিব্যাস ও গভীরতা, স্বাভাবিক কারণেই ভিন্ন ভিন্ন। ইহা ছাড়া বলা প্রয়োজন যে, প্রথম ভিতের কূপ দুইটি সব সময় জলপূর্ণ থাকবে। দ্বিতীয় ভিতের কূপ দুটি সম্পূর্ণভাবে শূন্য অবস্থায় ও চতুর্থ ভিতের কূপ দুটি ভিজে বালিদ্বারা ভরাট রাখা হবে।

সুপার স্ট্রাকচার বা ভিতের উপরিভাগ :—ভিতের উপর নির্মিত হবে কংক্রীটের স্তম্ভ যার উপর স্থাপিত হবে সেতুর পাটাতন। এই পাটাতনটি দুটি স্তম্ভ অর্থাৎ দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তম্ভের উপর উচ্চটান সহিষ্ণু ইস্পাতে তৈরী সমান্তরালভাবে সজ্জিত 7 মিলিমিটার ব্যাসযুক্ত সমশক্তিধর ইস্পাতের হাই টেনসিল নির্মিত তারের গুচ্ছদ্বারা ঝুলান থাকবে। এই ঝুলান ব্যবস্থা শৈলীর জন্য ইহাকে কেবল স্টেড ব্রীজ নাম দেওয়া হয়েছে। এই জাতীয় ব্রীজের বৈশিষ্ট এই যে, ইহা সম্পন্ন করিতে অনেক কম ইস্পাত ব্যবহার হয় ও ব্যবহারিক কার্যকারিতা অনেক বেশী। তা ছাড়া, এই জাতীয় ব্রীজের খরচ কম।

সেতুটি 2700 ফিট দৈর্ঘ ও 35 মি. প্রশস্ত হবে ও উভয়

* সেওড়াফুলী, ব্যাঙ্ক কলোনী, হুগলী

দিকে পথচারীদের জন্য 2.50 মিটার প্রশস্ত ফুটপাথ থাকবে। বর্তমান রবীন্দ্রসেতু 2150 ফুট লম্বা। তদানীন্তনকালে এই ব্রীজ সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ সাসপেণ্ডেড বা ক্যান্টিলিভার ব্রীজ বলে খ্যাত। দ্বিতীয় হুগলীসেতু পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘতম ও ভারতে এই ধরণের ব্রীজ প্রথম স্থান অধিকারী হবে। সেতুটির তিনটি খাটাল হবে।

এই জাতীয় ব্রীজের গুরুত্ব ও ব্যয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে দুটি বিদেশী সংস্থা যথাক্রমে লিওনার্ড উও আঁদ্র (স্লেইকস্ এ্যাণ্ড পার্টনার, একটি জার্মান সংস্থা) এবং ফ্রীম্যান ও ফক্স এ্যাণ্ড পার্টনার (ব্রিটিশ ফার্ম) উক্ত ব্রীজের, হুগলী রিভার ব্রীজ কমিশনার্স-এর পক্ষে কনসালটান্ট নিযুক্ত হয়েছেন।

1971 খৃস্টাব্দের পূর্বে যখন দ্বিতীয় হুগলী সেতুর পরিকল্পনা ব্যয় (আনুমানিক) ধরা হয়, তখন উহা 27 কোটি টাকা ধার্য হয়েছিল। পরবর্তীকালে উহা দুবার পরিবর্তন করে বর্তমানে 152 কোটি টাকায় পৌঁচেছে। এই বরাদ্দ ব্যয় ধরা হয়েছে সেতুটি 1986-87 খৃস্টাব্দের মধ্যে সম্পন্ন হবে আশা নিয়ে।

সম্প্রতিকালে দ্বিতীয় হুগলী ব্রীজ নানা কারণে খবরের কাগজে আলোচ্য বিষয় হয়েছে। কারণ, গুজব শোনা যাচ্ছিল যে, কেন্দ্র 57 কোটি টাকার বেশী আর ঋণ হিসাবে অগ্রিম দিবেন না, ফলে রাজ্য কেন্দ্রের মধ্যে একটু তিক্ততা শুরু হয়েছিল। পরবর্তীকালে, কেন্দ্রীয় সরকার আনুমানিক খরচের 152 কোটি টাকা ঋণ হিসাবে দিবার মনস্থ করায় রাজ্য সরকার তথা হুগলী রিভার ব্রীজ কমিশনার্স কর্তৃপক্ষ অনেক চিন্তার হাত হতে মুক্ত হয়েছে। কারণ, দ্বিতীয় হুগলী সেতু একটি জাতীয় পরিকল্পনা। এই সেতু সুসম্পন্ন হলে শুধু যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে এমন নয়, অত্যন্ত জরুরী বিকল্প সেতু নির্মাণ করে বহু প্রতীক্ষিত ব্যবস্থা জোরদার করবে।

প্রসঙ্গক্রমে চিন্তনীয় বিষয় এই যে, হুগলী দ্বিতীয় সেতুটি 1972 খৃস্টাব্দে শিলান্যাস হওয়া সত্ত্বেও এখনও সমাপ্তি হতে বহুদিন লাগবে। কিন্তু রবীন্দ্রসেতু 1939 খৃস্টাব্দে শুরু হয়ে 1945 খৃস্টাব্দের মধ্যে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল। তিনদশক পরে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা, যোগাযোগ সুব্যবস্থাও মালমশলার সহজলভ্যতা সত্ত্বেও দ্বিতীয় হুগলী সেতু শুরু হয়ে একদশক অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণ হতে দেরী হওয়া খুবই পরিতাপের বিষয়। পরিতাপের বিষয় এই জন্য যে, সেতু নির্মাণে বিলম্ব হেতু ও ত্বরান্বিত করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি তদারকি কমিটি গঠন করতে হয়েছে। এই উচ্চ পর্যায়ের কমিটি সেতু কি গতিতে অগ্রসর হচ্ছে তার দেখাশুনা করবে। প্রতি তিন মাস অন্তর কাজের পর্যালোচনা করবে। এই কমিটির মুখ্য উদ্দেশ্য মনে হয়, বরাদ্দ ব্যয়ের মধ্যে ও নির্ধারিত সময় সীমা কাজটির সমাধা করে সেতুটিকে জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া। 1987 খৃস্টাব্দের মধ্যে সেতুটি নির্মাণ শেষ হলে 152 কোটি টাকায় ইহা সম্ভব হবে। বর্তমান মাস পর্যন্ত এই ব্রীজের জন্য খরচ হয়েছে মোট 57 কোটি 13 লক্ষ টাকা। অত্যন্ত আনন্দের কথা যে, পুরমন্ত্রী ও হুগলী রিভার ব্রীজ কমিশনার্স সংস্থার সভাপতি শ্রীপ্রশান্ত শূর সেতুটি যথাসময়ে শেষ হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

ইনস্যাট—1 বি

1982 খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ভারতের বহু উদ্দেশ্য সাধক কৃত্রিম উপগ্রহ ইনস্যাট 1এ উৎক্ষিপ্ত হওয়ার প্রায় 150 দিন পরে অকেজো বলে মহাশূন্যে পরিত্যক্ত হয়।* এরপর এ বছর গত 31শে আগস্ট মার্কিন মহাকাশফেরি চ্যালেঞ্জার থেকে ভারতের দ্বিতীয় পর্যায়ের ত্রিমুখী উদ্দেশ্য সাধক উপগ্রহ ইনস্যাট 1 বি মহাশূন্যে ছাড়া হয়। কিন্তু উৎক্ষেপণের পর থেকেই একের পর এক বিভিন্ন আকারের দুর্ঘটনা 1193 কেজি ওজনের বহু উদ্দেশ্য সাধক উপগ্রহটিকে বিপন্ন করে ফেলে। মহাশূন্যে মুক্ত হবার পর আট ইঞ্চি লম্বা এক অজ্ঞাত বস্তু তাকে আঘাত করে। এরপর অসুবিধা দেখা দেয় সোলার প্যানেল ঠিকমত কাজ না করায়। সূর্যরশ্মি থেকে শক্তি সংগ্রহ করার জনাই ওই যন্ত্রপাতি বসান হয়েছে। কিন্তু এর আবরণ কিছুতেই বিজ্ঞানীরা খুলতে পারেন নি। উৎক্ষেপণের প্রায় এক সপ্তাহ পরে এর সৌর পাল খুলতে গিয়ে হয় বিপত্তি। কারণ এর মূল বিদ্যুৎ উৎস সৌরকোষধারক পাখনার পশ্চিম প্রান্তে আটকে যায়। হাসান কেন্দ্র থেকে তিন দিন বিজ্ঞানীরা আপ্রাণ চেষ্টা করেও সেটি খুলতে ব্যর্থ হন। তারপর তাকে মৃদু ঝাঁকুনি দেন বিজ্ঞানীরা। তাতেও প্রথম দিকে কাজ হয় নি।

এরপর উপগ্রহটি সূর্যের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার পর কিছুক্ষণ সৌরতাপ পাওয়ার পর আপনা আপনি খুলে যায় পাখনাটি। এরপর আরম্ভ হয় সৌরপাল খোলার পর্ব। ছাতার আকার বিশিষ্ট এই পাল শূন্যে উপগ্রহের সাম্য বজায় রাখে। এটি খুলতে গিয়েও বিজ্ঞানীদের অনেক বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। এসব বিপদের ফলে ইনস্যাট—1 বি এর মহাকাশ আবাসে পৌঁছাতে দিন কয়েক দেরি হয়। গত 9.9.83 তারিখে মহাকাশ আবাসে এর পৌঁছানোর কথা ছিল।

যাই হোক মহাকাশফেরি চ্যালেঞ্জারের গর্ভ থেকে বেরোবার পর বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে একটানা উনিশ দিনের সংশয় আশঙ্কাও উদ্বেগের অবসান ঘটিয়ে 9.9.83 তারিখে এটি পৌঁছে তার নির্দিষ্ট মহাকাশ আবাসে। এই অবস্থান বিন্দুটি হল পৃথিবী থেকে 35,680 কি.মি. উপরে এবং 98 ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশে। এর মধ্যে 12টি যোগাযোগ

রক্ষাকারী ট্রান্সপনডার এবং তথ্য প্রচারকারী ট্রান্সমিটার আছে। এরপর এগুলো কাজ করবে। এর মধ্যে ইনস্যাট—1 বি টেলিভিশনের ছবি চমৎকার ভাবে পাঠিয়েছে।

এর তিনটি কাজ। দূরভাষ সংযোগ, দূরদর্শন সমপ্রচার এবং আবহাওয়া নিরীক্ষণ। ইনস্যাট বি-এর বারটি চ্যানেলে আট হাজার উভমুখী দূরপাল্লার টেলি যোগাযোগকে সম্ভব করে তুলবে। ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলো দূরপাল্লা টেলিফোনের আওতায় আসবে। এই দূরভাষ ব্যবস্থা 35টি ভূকেন্দ্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকবে। এদের মধ্যে পাঁচটি বৃহত্তম কেন্দ্র হল—কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও শিলং। ইনস্যাট—1 বি-তে যে সরাসরি দূরদর্শন সম্প্রচার ব্যবস্থা আছে তার ফলে গ্রামাঞ্চলে প্রায় এক লক্ষ টি. ভি. সেটে কৃষি ও অন্যান্য শিক্ষা-মূলক অনুষ্ঠান দেখান হবে। আকাশবাণীও ব্যবহার করবে এর পাঁচটি চ্যানাল।

আবহাওয়ার ব্যাপারে এরও যথেষ্ট ভূমিকা আছে। এর মধ্যে যে আবহ ক্যামেরা আছে সেটা প্রতি আধঘন্টা অন্তর মেঘের ছবি তুলে দিল্লীর উপগ্রহ যোগাযোগ কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেবে। ওখান থেকে কাছের আবহকেন্দ্রে সেগুলি চলে যাবে। পরে ওগুলো বিশ্লেষণ করে জানা যাবে ঝড় ও বন্যার আগাম খবর। এর সাহায্যে 12-24 ঘন্টার মধ্যে সাইক্লোনের পূর্বাভাস পাওয়া যাবে। ইনস্যাট 1 বি-র মাধ্যমে সমুদ্র বক্ষের তাপমাত্রার হেরফের এর বিষয় জানা যাবে। এর ফলে সমুদ্র বক্ষে মাছের চলাচল এবং বর্ষার আগমন সময় ভালভাবে নির্ণয় করা যাবে। এর সাহায্যে বিভিন্ন কৃষি, বিমান পরিবহন এবং সমুদ্র মাছ ধরার প্রকল্পগুলো খুবই সফল হবে। এসব দিক দিয়ে ইনস্যাট 1-বি এর মহাশূন্যে ঠিকমত থেকে কাজ করা আমাদের দেশের পক্ষে খুবই মঙ্গল হবে। এর টেলিফোন, টি. ভি. এবং আবহাওয়া এই তিনটি প্রধান কাজ আমাদের কাছে হবে আশীর্বাদ স্বরূপ।

আর্য ভট্ট

বৈজ্ঞানিক মডেল

ড্যান্সিং লাইট

সত্যেন চক্রবর্তী*

আজকাল অনেক স্টিরিও অ্যামপ্লিফায়ারে (stereo amplifier)-এ ড্যান্সিং লাইট বা এক ধরনের নাচুনে আলো দেখা যায়। এগুলি গান বা বাজনার তালে জ্বলতে থাকে। এখানে এরকম একটি সার্কিট (circuit) দেওয়া হল। এটা যে কোন অ্যামপ্লিফায়ার বা রেডিও-তে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রয়োজনীয় সমস্ত পার্টস (parts) যে কোন রেডিও-র দোকানে পাওয়া যাবে। এখানে ব্যবহৃত L.E.D.-গুলি বিভিন্ন রঙের হতে পারে তবে এগুলি একই রকম সাইজের হওয়া চাই। ট্রানজিস্টারে হিট সিঙ্ক (heat sink) ব্যবহার করতে হবে। সার্কিটটি তৈরি করে এর ইনপুট যে কোন রেডিও বা অ্যামপ্লিফায়ারের সাথে যুক্ত করে প্রি-সেট (Pre-set)-টির দ্বারা L.E.D.-গুলিকে অ্যাডজাস্ট (adjust) করে নিতে হবে। পাওয়ার সাপ্লাই-এর জন্য দ্বিতীয় সার্কিটটি ব্যবহার করা যেতে পারে। যাদের বাড়িতে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা নেই তারা পাওয়ার সাপ্লাই (power supply) 9V ব্যাটারি থেকে করতে পারে।
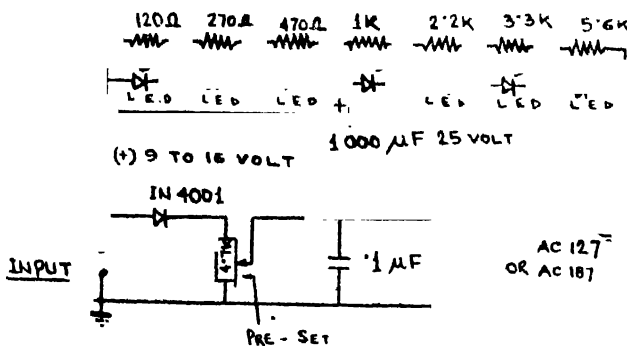
120Ω 270Ω 470Ω 1K 2·2K 3·3K 5·6K
L.E.D L.E.D L.E.D L.E.D L.E.D L.E.D L.E.D
1000 μF 25 VOLT
(+) 9 TO 16 VOLT
IN 4001
INPUT
·1 μF
AC 127 OR AC 187
PRE - SET

IN 4001
(+)VE 16 VOLT
220V A.C.
T
1000 μF 10 VOLT
T = 6 VOLT 300 mA (CENTER TAP TYPE) STEP DOWN TRANSFORMAR
পাওয়ার সাপ্লাই

* 23/15, গড়িয়াহাট রোড, কলকাতা-29

(নিম্নের প্রশ্নগুলির একাধিক উত্তর দেওয়া আছে, সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত কর)

1. ভিটামিন B_{18} এর অপর নাম—
(ক) অ্যামগডালিন (খ) ফলিকঅ্যাসিড (গ) ক্যালসিয়াম প্যাঙ্গানেট।

2. কোন যন্ত্রের সাহায্যে রক্তের চাপ মাপা হয়—
(ক) হিমোসাইটোমিটার (খ) স্ফিগমোম্যানোমিটার (গ) মনোমিটার।

3. মানুষের ফুসফুসে বায়ুকোষের সংখ্যা প্রায়—
(ক) 10 হাজার (খ) 75 লক্ষ (গ) 75 কোটি (ঘ) 75 হাজার।

4. প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের দেহে রক্তের পরিমাণ প্রায়—
(ক) 5 লিটার (খ) 10 লিটার (গ) 2 লিটার 7 লিটার

5. যক্ষ্মা রোগের জিবাণু আবিস্কার করেন—
(ক) রবার্ট হুক (খ) রবার্ট ব্রাউন (গ) রবার্ট কর্ক (ঘ) দ্যা-ভ্রিস।

6. মানুষের বৃক্কে নেফ্রনের সংখ্যা প্রায়—
(ক) 10 লক্ষ (খ) 10 কোটি (গ) 100 কোটি। (ঘ) 10 হাজার

7. প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের দেহে কত ভাগ পেশী—
(ক) 10 ভাগ (ঘ) 62 ভাগ (গ) 72 ভাগ (ঘ) 42 ভাগ।

8. ভাইরাস আবিস্কার করেন বিজ্ঞানী—
(ক) লুই পাস্তুর (খ) ইভানোভস্কি (গ) জনসন (ঘ) জেনার।

9. স্বর্ণলতার শোষক মূলের অপর নাম—
(ক) রাইজোবিয়াম (খ) শ্বাসমূল (গ) হস্টোরিয়াম (ঘ) কণিকা।

10. মানবদেহের কর্ণে অবস্থিত ভারসাম্য রক্ষাকারি যন্ত্রটির নাম—
(ক) সিস্টোলিথ (খ) ইনকাস (গ) ওটোলিথ (ঘ) র‍্যাফাইড।

মোহন লাল বিষয়া*

(পাঠকদের সঠিক উত্তর পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে

জুলাই '83 সংখ্যায় প্রকাশিত 'ভেবে উত্তর দাও'-র উত্তর

1. (গ) যকৃৎ 2. (ঘ) নিক্রোমাইসেটিস 3. (খ) ল্যাণ্ডষ্টাইণ 4. (ঘ) আর্নস্ট হেকেল 5. (খ) B. 6. (ঘ) এরিথ্রোসাইট 7. (গ) 135 মিলিগ্রাম 8. (গ) 20 মিনিট 9. (খ) সান্ধন 10. (ক) মনোসিস্টিশ 11. (ঘ) আরশোলা 12. (গ) সুন্দরী 13. (ক) D 14. (গ) ইনসুলিন 15. (ঘ) গরু 16. গ) ফাটান্যাষ্টি 17. (ক) ম্যাগনেসিয়াম 18. (ক) সিলাকাস্থ 19. (ঘ) 100 কোটি।

জুলাই '83 ভেবে উত্তর দাওয়ের সঠিক উত্তর দাতার নাম

সঠিক উত্তর দাতা :—সিলভার 54 বাখরাহাট।

একটি ভুল—1. পার্থপ্রতিম গঙ্গোপাধ্যায়, চুচুড়া, হুগলী, 2. সুদীপ্ত মণ্ডল, ধর্মতলা, 24 পরগণা, 3. প্রশান্ত কুমার দে, বুড়াশিবতলা, হুগলী।

দুইটি ভুল—1. ভাগাধর, সঞ্জয়, তাপস, অরূপ, সতিনাথ, মেমারী, বর্ধমান, 2. বিশ্বজিৎ দাঁ, কারবালা, 24 পরগণা।

তিনটি ভুল—1. শরকৃষ্ণ চট্টসূর্য, বিষ্ণুপুর বাঁকুড়া, 2. সৌরি ঘোষ নপাড়া বারাসত, 3. ইন্দ্রানী, চন্দ্রানী মাইতি, কাঁথি মেদিনীপুর, 4. সর্বানী, দেবজ্যোতি, দীপক ষড়ঙ্গ, কাঁথি মেদিনীপুর, 5. বুদ্ধদেব কাঁড়ার খিলা, হাওড়া, 6. ঝুনঝুন, বুবুন, বুনা ভানলপ ব্রীজ কলি-56, 7. অনিমেষ চ্যাটার্জী, কীর্ণাহার বীরভূম, 8. রীণা সিংহরায়, আমতা হাওড়া, 9. অঞ্জন গোস্বামী, বর্ধমান কেওর, 10. তাপস মণ্ডল, চম্পাহাটী 24-পরগণা, 11. কুণ্ডল অধিকারী, শান্তিনগর 24 পরগণা, 12. সুব্রত জানা, রামনগর, কমলা মিত্র, কাঁথি, সুশান্ত সাউ, গোবরা মেদিনীপুর, 13. মিহির, অপূর্ব ভট্টাচার্য, হালিসহর 24 পরগণা, 14. শিল্পী সাহা, হাবরা 24 পরগণা

চারটি ভুল—1. সুব্রত, জয়ন্ত মৌসুমী দাস, বাঁশবেড়িয়া, হুগলী, 2. স্বপনকুমার মণ্ডল, মেদিনীপুর, 3. দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, কোন্নগর হুগলী, 4. প্রাণতোষ, টুকু, মধুমিতা কলিকাপুর বর্দ্ধমান, 4. অমিত ও চন্দ্রিমা, ত্রিবেনী হুগলী।

*মেমারী, বর্ধমান।

খুঁজে বের করো

শরৎকৃষ্ণ চট্টসূর্য*

1	2	3	4	5	6	7	8
ই	উ	কু	ট	জ	থি	ন	নি
9	10	11	12	13	14	15	16
বা	ভা	য়ি	লে	র	লি	সু	সি

1. 'এনজাইম' কথাটি যিনি প্রথম ব্যবহার করেন তাঁর নাম হয়……যদি যোগফল হয় 10.

2. বলের এক ধরণের এককের নাম হয়……যদি যোগফল হয় 13.

3. একজন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীর নাম হয়……যদি যোগফল হয় 21.

4. বায়ুমণ্ডলের চাপকে যে একক দ্বারা প্রকাশ করা হয় তার নাম হয়……যদি যোগফল হয় 22.

5. একটি নাইট্রোজেনঘটিত উপক্ষারের নাম হয়……যদি যোগফল হয় 24.

6. নার্ভকোষের এককের নাম হয়……যদি যোগফল হয় 30.

7. এক প্রকার সংকর ধাতুর নাম হয়……যদি যোগফল হয় 31.

8. এক ধরণের কার্বোহাইড্রেটের নাম হয়……যদি যোগফল হয় 32.

9. লিপিড গঠনে অংশ গ্রহণকারী একটি উপাদানের নাম হয়……যদি যোগফল হয় 41.

10. একটি হরমোনের নাম হয়……যদি যোগফল হয় 44.

[সঠিক উত্তর পাঠাতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।]

* কাদাকুলি মহাপাত্র পাড়া. বিষ্ণুপুর বাঁকুড়া

জুলাই '83 সংখ্যায় প্রকাশিত 'শব্দশৃঙ্খলের সমাধান

পাশাপাশি : 1. ক্লোরিন, 2. অ্যাসিটোন, 5. ফলিডল, 7. ইউগ্নিনা, 11. বেনজিন।

উপর-নিচ : 1. ক্লোরোফর্ম, 2. অ্যাসিড, 3. নস্টক 4. জল, 6. রেনল্ডস্, 7. ইউরিয়া, 8. গ্লিসারিন. 9. অ্যানাবেনা, 10. অযোন।

জুলাই '83 শব্দশৃঙ্খল সমাধানের উত্তরদাতাদের নাম

সঠিক উত্তরদাতার নাম—মৃদুল সাউ, মিরগোদা, মেদিনীপুর।

একটি ভুল—1. দীপায়ন সাহা, রানাঘাট, নদীয়া, 2. সুলতা ঘোষ, বরিষা. শীলপাড়া, কলিকাতা-8, 3. কানু চক্রবর্তী বেলঘরিয়া, কলিকাতা-49, 4. মোঃ আনছুল হক, হাবড়া, 24-পরগণা, 5. পিনাকী নাথ চন্দ্র, নোনাচন্দন পুকুর ব্যারাকপুর।

দুটি ভুল—1. বিবেকানন্দ, নিত্যানন্দ, কবিতা মুখার্জী বেবী চ্যাটার্জী, উজ্জ্বল দেওঘরিয়া, 2. সিদ্ধার্থ কাড়ার, উদয় নারায়ণ, হাওড়া, 3. উৎপল বিশ্বাস, পাঁচপোতা, 24-পরগণা, 4. সুজন দাস, কাঁথি, মেদিনীপুর, 5. শুভেন্দু, দিপ্তেন্দু, দিব্যেন্দু, শীর্ষেন্দু, কৃষেন্দু, নবেন্দু, অলকেন্দু, কল্যানী, মধুরিমা, মধুছন্দা, মধুমিতা, মৃন্ময় ও হরদিত্য, হুগলী, 6. নবকাশ চন্দ্র পাণ্ডা, তমলুক, মেদিনীপুর, 7. সুব্রত, জয়ন্ত, মৌসুমী দাস, বাঁশবেড়িয়া, হুগলী, 8. দুধকুমার দাস, বারুইপুর, হুগলী।

তিনটি ভুল—1. দেবজ্যোতি ও সর্বাসী ষড়ঙ্গী, কাঁথি মেদিনীপুর 2. সুদীপ্ত মণ্ডল, ধর্মতলা-24 পরগণা, 3. সোমনাথ ভট্টাচার্য বর্ধমান, 4. বিশ্বরঞ্জন নায়েক জঙ্গলপাড়া হুগলী, 5. শর্মীলা মাঝি, দুর্গাপুর বর্ধমান, 6. কৃষ্ণ চক্রবর্তী, সাদেক আলী, দক্ষিণ চাতরা, 24 পরগণা, 7. কার্তিক চন্দ্র বাগ, বলরামবাটি, হুগলী, 8. কমল ভট্টাচার্য, আগরপাড়া 24 পরগণা, বাবলু সাধুখাঁ, খড়দহ, 9. অপু দত্ত, বর্ধমান, 10. সূর্যদেব, কেনারাম, শশাঙ্ক, অরুনাভ ঘোড়ুই, বেগমপুর, হুগলী, 11. মোঃ আনিছুল হক, হাবড়া 24 পরগণা, 12. মিহির কুমার আচার্য, ভানকা, মেদিনীপুর, 13. প্রশান্ত বর্মন, ভদ্রপুর, বীরভূম, 14. সমীর কুমার সেন, রহড়া, 24 পরগণা, 15. মিহির, অপূর্বকুমার ভট্টাচার্য, হালিসহর, 24 পরগণা, 16. সৌরী ঘোষ, নপাড়া, বারাসাত, 17. অসিত ও চন্দ্রিমা, ত্রিবেণী, হুগলী, 18. নির্মলেন্দু মাইতি, খড়গপুর, 19. সিলভার 54 বাথরাহাট, 20. রীতা, দেবজিৎ, দেবাশীষ, মিতা চ্যাটার্জী, বজবজ, 24 পরগণা।

পরিষদ সংবাদ

যোগ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আলোচনা

গত 18.8.83 তারিখে বিকাল 5টায় শতাধিক শ্রোতার উপস্থিতিতে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত যোগ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্যোগে প্রশিক্ষক ডাঃ শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় যোগ-শিক্ষা ও রোগমুক্তির উপর আলোচনা করেন। বিভিন্ন রোগের নিরাময়ে যোগ, আসন, প্রাণায়াম, সুষম খাদ্য প্রভৃতি বিষয়ে শারীরবিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনায় ও বিশ্লেষণে এবং প্রশ্নের পর প্রশ্নে সভাটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সভার বিশেষ আকর্ষণ ছিল আলোচনার সঙ্গে সভ্যদের ব্যায়াম প্রদর্শন।

[প্রতি শনিবার পরিষদে যোগশিক্ষা কেন্দ্রে সভ্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।]

বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ পালন

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে গত 4.9.83 থেকে 11.9.83 পর্যন্ত সাতদিন ধরে পরিষদের উদ্যোগে প্রথম বর্ষ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী পালন করা হয়। "একটি গাছ লক্ষ প্রাণ, নিজের পরিবেশকে দূষণ থেকে মুক্ত রাখুন, খরা, ভূমিক্ষয় ও পরিবেশ দূষণ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখুন" এই শপথ নিয়ে বেড়া সহকারে প্রায় শতাধিক গাছ পরিষদ ভবনকে কেন্দ্র করে আশেপাশের রাস্তার ধারে লাগান হয়। বৃক্ষরোপণ কর্মের উদ্বোধন করেন পরিষদের কর্মসচিব ডঃ সুকুমার গুপ্ত ও সহ-সভাপতি শিবচন্দ্র ঘোষ এবং অংশ গ্রহণ করেন স্থানীয় জনসাধারণ ও পরিষদের কর্মচারীগণ এবং বহু সভ্য।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণের দৃশ্য

[সংবাদ পরিবেশন করেছেন পঞ্চানন পাল]

শিবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-বক্তৃতা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে নবম বার্ষিক শিবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছে। সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

বক্তা : গৌরকিশোর ঘোষ

বিষয় : বিজ্ঞান, সংবাদপত্র ও সাধারণ মানুষ

স্থান : 'সত্যেন্দ্র ভবন' পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-6

তারিখ : 3 ডিসেম্বর '83 সময় : বিকাল 4টা

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006 থেকে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ, 37/7, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-700 009 হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বিজ্ঞান পরিষদের আদর্শ অনুযায়ী জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার মত সমাজের কল্যাণমূলক বিষয়বস্তু সহজবোধ্য ভাষায় সুলিখিত হওয়া প্রয়োজন।
2. মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এবং পূর্ণ ঠিকানাসহ লেখকের পরিচিতি পৃথক কাগজে অবশ্যই লিখে দিতে হবে।
3. চলিত ভাষা এবং চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহৃত হবে। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্র্যাকেটে ইংরাজী শব্দটিও দিতে হবে। আন্তর্জাতিক সংখ্যা এবং মেট্রিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে।
4. মোটামুটি 3000 শব্দের মধ্যে রচনা সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়।
5. বিভিন্ন ফীচার, সমকালীন বিজ্ঞান গবেষণা ও প্রযুক্তিবিদ্যার সংবাদ এবং বিজ্ঞান বিষয়ক সুন্দর আকর্ষণীয় ফটোগ্রাফও গ্রহণীয়।
6. রচনার সঙ্গে চিত্র থাকলে আর্ট পেপারে চাইনিজ কালিতে সুঅঙ্কিত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন।
7. প্রত্যেক চিত্র প্রস্থে 8 সে. মি. কিংবা এর গুণিতকের (16 সে. মি 24 সে. মি.) মাপে অঙ্কিত হওয়া প্রয়োজন।
8. অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব বজায় রেখে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মন্ডলীর অধিকার থাকবে।
9. প্রত্যেক প্রবন্ধ ফীচার এর শেষে গ্রন্থপঞ্জী থাকা বাঞ্ছনীয়।
10. জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পুস্তক সমালোচনার জন্য দুই কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।
11. ফুলস্ক্যাপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় যথেষ্ট মার্জিন এবং প্রতি লাইনের পর বেশ কিছুটা ফাঁক রেখে পরিস্কার হস্তাক্ষরে প্রবন্ধ লিখতে হবে।
12. প্রতি প্রবন্ধের শুরুতে পৃথক ভাবে প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া আবশ্যক।

সম্পাদনা সচিব

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

আবেদন

1948 সাল থেকে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা বিষয়ে পরিকল্পিত ধ্যান ধারণা পরিষদ পালন করে আসছে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রকাশনের মাধ্যমে। ইতিমধ্যে পরিষদ কিছু অমূল্য রচনা বাংলাভাষায় প্রকাশ করেছে। বর্তমান পত্রিকা প্রকাশনা ছাড়াও পরিষদ বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতার বিকাশ ঘটে। গ্রাম বাংলার পল্লীতে, আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে ও শহরের বস্তিতে, যেখানে বেশীর ভাগ মানুষ জ্ঞানের আলো থেকে এখনও বঞ্চিত, তাদের কাছে বিজ্ঞানের মঙ্গলময় রূপ তুলে ধরতে পরিষদ বদ্ধপরিকর। এইসব বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মসূচীর রূপায়নে অর্থের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অথচ পরিষদের দারুণ অর্থাভাব। তাই পরিষদ সরকার, বেসরকারী সংস্থা, ব্যবসায়ী ও সহৃদয় ব্যক্তির কাছে অর্থসাহায্যের আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছে। সাধারণ মানুষের জন্য তৈরী আচার্য বসুর পরিষদ যে কোনও সামান্য দানও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করে অবহেলিত মানুষের স্বার্থে ব্যয় করবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে পরিষদে প্রদত্ত সর্বপ্রকার দান আয়করমুক্ত।

কর্মসূচী

1. সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা সৃষ্টি করা এবং বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তোলা।
2 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকাকে সাধারণের নিকট আরও আকর্ষণীয় করে তোলা।
3. পরিষদের মাধ্যমে গ্রামবাংলার বিজ্ঞান ক্লাবগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা এবং তাদের বিজ্ঞান ভিত্তিক জনহিতকর কাজে উৎসাহিত করা।
4. প্রতি বছরে পশ্চিম বাংলায় অন্ততঃ একবার বিজ্ঞান সম্মেলনের ব্যবস্থা করা।
5. গ্রামবাংলার বিভিন্ন মেলায় বিজ্ঞান ক্লাবগুলিকে নিয়ে পোস্টার প্রদর্শনী, বিজ্ঞানভিত্তিক সিনেমা, আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞান, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করা।
6. বছরের শেষে বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা।
7. হাতে-কলমে কারীগরী বিদ্যা শিখিয়ে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রী ও নাগরিকদের স্বনির্ভরশীল করা। ব্যবহার বহনের জন্য সামান্য অর্থের বিনিময়ে টি ভি. টেপরেকর্ডার, রেকর্ড-প্লেয়ার, ট্রানজিস্টার এমারজেন্সি বৈদ্যুতিক আলো, ফটোগ্রাফী বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া।
8. মাটি পরীক্ষার কাজে শিক্ষা দিয়ে গ্রামের বিজ্ঞান ক্লাবগুলিকে সাধারণ চাষীদের সাহায্য করতে উৎসাহিত করা।
9 সাধারণ মানুষের জন্য বিজ্ঞান প্রবন্ধ থেকে মৌলিক গবেষণাপত্র পর্যন্ত বাংলা ভাষায় প্রকাশ এবং জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বই ও বিজ্ঞান সাধক চরিতমালা প্রকাশ।
10. যোগব্যায়াম ও তার গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন।
11 পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারটি সুসমৃদ্ধ করে গড়ে তোলা।
12. পরিষদ ভবনে 'বিজ্ঞান সংগ্রহশালা' স্থাপন করা।
13 নির্বিচারে যথেচ্ছ গাছপালা ও বনজঙ্গল ধ্বংসের ফলে পরিবেশ দূষণ ও আবহাওয়ার মারাত্মক পরিবর্তনের ভয়াবহতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সজাগ করা।
14. নির্বিচারে বন্যপ্রাণী ধ্বংসের দরুণ বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যের বিঘ্ন ঘটার বিপদ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা।
15. যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করা।
16. শহর ও গ্রামের প্রতিটি স্কুল, কলেজ ও গ্রন্থাগারে পরিষদের মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার গ্রাহকীকরণের মাধ্যমে পরিষদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচার।

সুকুমার গুপ্ত
কর্মসচিব

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ডিসেম্বর, 1983
36তম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা

বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের অনুশীলন করে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও সমাজকে বিজ্ঞান-সচেতন করা এবং সমাজের কল্যাণকল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করা পরিষদের উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন লেখকদের স্বাধীন মতামত বা মৌলিক সিদ্ধান্তসমূহ পরিষদের বা সম্পাদকমণ্ডলীর চিন্তার প্রতিফলন হিসাবে সাধারণতঃ নয়।

বিষয় সূচী

বিষয়

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : 30·00

প্রতি সংখ্যা : 2·50

যোগাযোগের ঠিকানা :

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
পি-23, রা.। রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা-700006
ফোন : 55-0660

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষট্‌ত্রিংশত্তম বর্ষ | ডিসেম্বর, 1983 | দ্বাদশ সংখ্যা

বিজ্ঞান, বিজ্ঞানী ও বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী

কালিদাস সমাজদার

"পদার্থবিদ্যা যা ভাবছে তার অনেকখানিই দার্শনিকরা আগেই বুঝেছিলেন"—পদার্থবিজ্ঞানী ম্যাক্স বর্ণ যখন এ কথা বলেন, তখন ঠিকই বলেছিলেন। হেরাক্লিটাস, এ্যানাক্সাগোরাস, পারমেনিডাস, জেনো, ডেমোক্রিটাস, সক্রেটিস, প্লাতো প্রমুখ গ্রীকদর্শনের প্রতিনিধিরা সহজ সাহসেই বহু স্বচ্ছ প্রকল্পের গোড়া পত্তন করে গেছেন। পরে বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরীক্ষা করে সেগুলো যাচাই হয়ে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। ভারতের সনাতন চিন্তানায়কেরাও বহু বিষয়ের পথপ্রদর্শক। দর্শনের এই গতিশীল সূত্রসমূহের মধ্যেই আমরা পেয়েছি ডায়ালেকটিকসের নমনীয় চিন্তা ও মৌল প্রত্যয়ের একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অত্যন্ত সফলভাবেই বিশ্বকে বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে ব্যবহার করা যায়।

দ্বান্দ্বিকতাসমৃদ্ধ এই বিশ্ববীক্ষা বা বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী খুবই সুসম্পূর্ণ ও সুসমঞ্জস। কোন রকম কুসংস্কার, প্রতিক্রিয়া বা সনাতনী ভ্রান্ত জোয়ালের কোন রূপকে ধরে রাখার বিরুদ্ধে এই দৃষ্টিভঙ্গী সতত সংগ্রামশীল। মানবজাতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এই বিশেষ বিন্যাস স্বাভাবিকভাবেই বিজ্ঞানীদের হাতে তুলে দেয় এক অমোঘ অস্ত্র। সম্পূর্ণ আলাদা প্রজাতির একদল বিজ্ঞানী তৈরি হয়। এঁরা সমাজের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই বিজ্ঞানীদের কাছে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলাফলই শুধুমাত্র বড় বিষয় নয়; কোন্ পথে সেই অনুসন্ধান অগ্রসর হবে, তাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। যে লক্ষ্যের জন্য অন্যায় উপায়ের আশ্রয় নিতে হয় সেই লক্ষ্য ন্যায়সঙ্গত নয়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভীরুতা, উৎসাহহীনতা হল প্রকারান্তরে বিজ্ঞানের প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা।

এ কথা অবশ্যই ঠিক যে ডায়ালেকটিক-বস্তুবাদী পদ্ধতি বিজ্ঞানীদের হাতে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এই হাতিয়ার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সবচেয়ে জটিল সমস্যাগুলোর সমাধান করে। কিন্তু এই পদ্ধতির প্রয়োগ বিষয়টি কি? এটা কি এই যে ডায়ালেকটিক পদ্ধতির পূর্বেই প্রস্তুত কোন নির্দিষ্ট নক্সা ব্যবহার করা হবে? সেই নক্সার মধ্যে বিজ্ঞানের প্রায়োগিক পার্টিকে কি স্থাপন করা হবে? বিমূর্ত থেকে বাস্তবে আরোহণের সব গ্রন্থি ও হঠাৎ দিক পরিবর্তন অনুসরণ করা এবং তারপরে তার সঙ্গে পূর্ণসঙ্গতি রেখে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা প্রভৃতি বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা হবে কি? অথবা বিচারাধীন বিষয় ও বাস্তবের নিয়মগুলোকে ডায়ালেকটিকের পরিভাষায় কথা বলানো হবে কি? একজন বিজ্ঞানী ডায়ালেকটিকসের ওপর মোটা মোটা কেতাব পড়লেই কি তিনি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিরাট একটা কিছু আবিষ্কার করবেন?

অতএব বিশ্লেষণ করে দেখা যাক ডায়ালেকটিক বস্তুবাদী পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের পরিধিতে কি করতে পারে? বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে জটিল মনে হলেও আদতে খুবই সরল এবং সহজ। সামান্যীকরণ করতে, সঞ্চিত সূত্রগুলো গুছিয়ে রাখতে, ডায়ালেকটিক পদ্ধতিতে তাদের ব্যবহারের যোগ্য করতে, ছড়ানো ছিটানো সাফল্যগুলোকে সুসংবদ্ধ করতে প্রকৃতি-বিজ্ঞান অবশ্যই একটা বাধ্যবাধকতা অনুভব করে। আর ঠিক এভাবেই প্রকৃতি-বিজ্ঞানের চিন্তাসমূহ তাত্ত্বিক চিন্তার উচ্চতর মহলে প্রবেশ করে। বিজ্ঞানের সামনে এখন বিষয়টি কিভাবে দাঁড়ায়? সংগৃহীত সমস্ত ফলগুলোকে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সুসংবদ্ধ করবার এবং

একটা মাত্র তত্ত্বের কাঠামোর মধ্যে তাদের ব্যাখ্যা করবার দায়িত্ব বিজ্ঞান আর অস্বীকার করতে পারে না। এই দায়িত্ব ইতিমধ্যেই আধুনিক পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা ও জীবপরিবেশবিদ্যার আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বিমূর্ত থেকে বাস্তবে আরোহণের পদ্ধতি ছাড়া এই দায়িত্ব সমাধানের অন্য কোন পথ নেই।

ডায়ালেকটিক-বস্তুবাদী পদ্ধতি গবেষকের হাতে প্রমাণিত একটা বিশেষ শক্তিশালী হাতিয়ার। গবেষণা ও গাণিতিক বিশ্লেষণ এখনও পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারে নি—এমন সব জায়গায় সমস্যা খুঁজে বের করতে এই হাতিয়ার একটা অভেদ্য সূচক। তত্ত্বগত চিন্তাকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, মননের নতুন নতুন বিন্যাস আবিষ্কারে ব্রতী করে এই হাতিয়ার। ফলশ্রুতি হিসেবে এই পদ্ধতির মননসমূহের তীক্ষ্ণ কীলকগুলো বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মর্মগত ও সঠিক সম্পর্কাবলীর গভীরে প্রবেশ করতে সক্ষম।

মানুষ তার অভিব্যক্তির পথে উন্নতির এক উচ্চতর পর্যায়ে এসে পৌছেছে। প্রকৃতির দাক্ষিণ্যের ওপর সে আর নির্ভর করে না। সৃষ্টির নয়াদিগন্ত আজ মানুষের দৃষ্টিপথে। নয়া প্রজাতির উদ্ভিদের জীবসত্তা বা প্রয়োজনীয় প্রাণীপ্রজাতি কিংবা নতুন নতুন প্রযুক্তিকৌশলসমূহ—সব কিছুই আজ মানুষের মনীষার ও সামগ্রিক শ্রমনৈপুণ্যের আওতায় এসে পড়েছে। এটা তখনই সম্ভব হয়েছে যখন মানুষ অধিবিদ্যা পরিত্যাগ করে সৃষ্টিশীল বিশ্ববীক্ষা তথা দ্বন্দ্বসমন্বয়তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ করেছে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের রহস্যঘেরা মৌলসত্তাগুলোর ওপর। বিজ্ঞানীকে আজ সেই ল্যাটিন ভাষায় লেখা প্রবাদটি স্মরণ করতে হবে—

এখানেই রোডেস দ্বীপ।
এখানেই ঝাঁপ দাও।

বিজ্ঞান প্রবন্ধ

দেশান্তরী পাখি

রণতোষ চক্রবর্তী*

প্রতি বছরই শীতের মরশুমে আলিপুর চিড়িয়াখানায় প্রচুর পাখি আসে, এবং এরা সব দর্শককেই আকৃষ্ট করে। শীত শেষে এদের আর দেখা যায় না। আসলে বিশেষ ঋতুতে নিজেদের আস্তানা ছেড়ে যে সব পাখি অন্যত্র চলে যায়—এরাই দেশান্তরী পাখি বা মাইগ্রেটরী বার্ড নামে পরিচিত। শীতে চিড়িয়াখানায় যে সব পাখি আসে এরাও দেশান্তরী—এদের মধ্যে শরাল জাতীয় পাখিই বেশী—ছোট ও বড়, দু-রকমের শরালই দেখা যায়, তবে নীল-ডানা হাঁস ও আরও কয়েক জাতের পাখিও কিছু দেখা যায়। প্রতি বছর অক্টোবর মাসের শেষ দিক থেকে এইসব পাখি চিড়িয়াখানায় আসতে শুরু করে এবং মার্চ-এর শেষ বা এপ্রিলের মাঝামাঝি চিড়িয়াখানা ছেড়ে চলে যায়।

পাখির এক স্থান থেকে অন্যত্র যাওয়ার বিষয়টি কিন্তু অজানা অতীত থেকে মানুষের নজরে এসেছে। পণ্ডিত অ্যারিস্টটল-এর দৃষ্টিও পাখির এ ধরণের আচরণ এড়ায় নি। খৃস্টানদের ধর্মগ্রন্থ ওল্ড টেস্টামেন্টেও পাখির উত্তর থেকে দক্ষিণে যাওয়ার কথা উল্লেখ আছে। অবশ্য দেশান্তর যাওয়ার ঘটনা শুধু পাখির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। পাখি ছাড়া সামুদ্রিক কিছু মাছ, তিমি, কচ্ছপ, জেব্রা প্রভৃতির মধ্যেও দেখা যায়। যদিও দেশান্তরী স্বভাব পাখির মধ্যে বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়, যেমন ছোট্ট পাখিকে এক দেশ থেকে পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগর ডিঙিয়ে প্রতি বছর অন্য দেশের একই এলাকায় একই গাছে, এমন কি একই ডালে পর্যন্ত বাসা বাঁধতে দেখা যায়। কিছুকাল কাটিয়ে "যাত্রা কর যাত্রীদল" বলে আবার হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করে ঠিক আগেকার জায়গায় পৌঁছায়। মেরু অঞ্চলের এক ধরণের গাংচিল, আর্কটিক টার্ন যেমন এক মেরু থেকে বিপরীত মেরু পর্যন্ত দেশান্তরী হতে দেখা যায়।

বছরের বিশেষ সময় পাখি কেন এই দেশান্তরী প্রবৃত্তি গ্রহণ করে এর সঠিক উত্তর বিজ্ঞানীদের কাছে এখনও অস্পষ্ট। তবে অজানা অতীত থেকে পাখির এই আচরণ নিশ্চয় এদের অস্তিত্বের সহায়ক। কেন না সারা বিশ্বে ন'হাজার প্রজাতির নানা রকমারি পাখির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই দেশান্তরীতে অভ্যস্ত। অনেকের মতে প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্তন, খাদ্যের ঘাটতি—এসব কারণ পাখিকে আস্তানা পরিত্যাগ করে দেশান্তরী হতে প্রেরণা দেয়। তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায় যে কাছাকাছি অনুকূল পরিবেশ, অর্থাৎ উপযুক্ত তাপমাত্রা বা পর্যাপ্ত খাদ্য থাকা সত্ত্বেও অনেক পাখি কেন সুদূরে পাড়ি দেয়? অনেকের মতে সূর্যের আলোর সময়ের হ্রাস-বৃদ্ধি বা ফটো পিরিয়ডিজম্-এর দ্বারা পাখি দেশান্তরের সময় বুঝতে পারে। সেই সঙ্গে এদের দেহে বিশেষ

* সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কলিকাতা-700 009

হর্মোনের পরিবর্তন ঘটে. দেহের এই সব হর্মোন নিঃসরণই এদের স্থান ত্যাগে উত্তেজিত করে। এ ছাড়া প্রজননের প্রয়োজনেও অনেক পাখি একস্থান থেকে অন্যত্র যায়। সর্বোপরি পাখি স্বচ্ছন্দে উড়তে পারে বলে দেশান্তরী হওয়া এদের পক্ষে বিশেষ সুবিধা।

আলিপুর চিড়িয়াখানা চত্বরে এই শরাল জাতীয় বহু সংখ্যক পাখি কোথা থেকে আসে এ নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা সম্ভবতঃ হয় নি। তবে অনেকের মতে এরা হিমালয়ের নানা অঞ্চল থেকে এখানে আসে। সম্ভবতঃ শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ অঞ্চল আমাদের এদিকে চলে আসে। তবে কিছু সংখ্যক পাখি অনেকের মতে হিমালয়ের উত্তরে সুদূর সাইবেরিয়া থেকেও আসে।

প্রতি বছর একই পাখি আসে কিনা, এই নিয়ে পর্যবেক্ষণও হয়েছে। কয়েক বছর আগে জুলজিক্যাল সার্ভে থেকে পাখির পায়ে বিশেষ চিহ্নিত আংটি পরিয়ে দেখা গিয়েছে যে সেই চিহ্নিত পাখি পরের বছরও চিড়িয়াখানায় আসছে।

শরাল জাতীয় পাখি যে শুধু চিড়িয়াখানা চত্বরেই আসে এমন নয়—আরও নানা স্থানেও এই শীতকাল কাটাতে এরা আসে। গত কয়েক বছর (অন্ততঃ সাত-আট বছর) ধরে হাওড়ার সাঁতরা-গাছিতে এই সব শরাল প্রচুর আসছে এবং এদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। সাঁতরাগাছি স্টেশন ঘর ও এই সারিতে রেলের একাধিক অফিস ও রেল-কোয়ার্টারের সামনের রাস্তার দক্ষিণ বরাবর বেশ বড় আকারের জলাশয় রয়েছে—এইখানে প্রতি বছর এই সব পাখি আসে। লক্ষ্য করার মত যে রেল লাইনের বিপরীত দিকেও প্রায় একই আকারের জলাশয় রয়েছে, কিন্তু এখানে পাখি বসে না। এই জলাশয়ে প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় হাঁটাপথ ও আশেপাশে জন বসতি বেশী থাকায় সম্ভবতঃ পাখি এইটিকে ত্যাগ করে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় আগে ঢাকুরিয়া লেকেও নানা দেশান্তরী পাখি আসতো, কিন্তু লেক এলাকায় ঘন বসতির জনাই সম্ভবতঃ বর্তমানে পাখি সেই স্থানকে অপছন্দ করে। এসব পাখি সাধারণভাবে মানুষ থেকে যে দূরে থাকতে চায় এ বিষয়টি চিড়িয়াখানায়ও লক্ষ্য করলে বোঝা যায়। চিড়িয়াখানার যে জলাশয়ে এরা বসে লক্ষ্য করার বিষয় কেবলমাত্র খিদিরপুর গেটের দিকের অংশেই পাখিরা থাকে—অন্য দিকে একেবারেই পাখি থাকে না। আসলে জলাশয়ের ধার পর্যন্ত যে দিকে দর্শক পৌঁছতে পারে সে দিক পাখিরা অপছন্দ করে। সাঁতরাগাছিতে একই কারণেই রেল লাইনের দক্ষিণের জলাশয়ে এদের দেখা যায়। তবে এ বছর কচুরী-পানায় ভর্তি থাকায় পাখির সংখ্যা কত হবে সেইটিই লক্ষ্য করবার। এ ছাড়া এই জলাশয়ে একদিকে গত বছর রেলের কিছু সুউচ্চ কোয়ার্টার্স (তিনতলা) তৈরি হয়েছে। এতে এই সব দেশান্তরী পাখিরা অন্ততঃ খুসী হবে বলে মনে হয় না। গত বছরেও এখানে যে সংখ্যায় পাখি এসেছে তা চিড়িয়াখানা থেকে বেশী বৈ কম নয়।

এসব দেশান্তরী পাখির সংখ্যা চিড়িয়াখানায় বা সাঁতরাগাছিতে প্রধানতঃ তাপমাত্রা ও শীতের হাওয়া অন্যতম বিষয়—বেশী ঠাণ্ডা ও পশ্চিমের বাতাস পাখির সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়।

গত কয়েক বছর আগে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ শহরেও লেখক একই শরাল জাতীয় পাখি লক্ষ্য করেছেন। রায়গঞ্জ টুরিস্ট বাংলোর বিপরীত দিকে জাতীয় সড়কের ধারে কুলিক নদীর খাল ধরে বেশ বড় আকারের ফরেস্ট বিভাগের পক্ষী আলয়ের কথা অনেকেরই জানা আছে। এখানে নানা হেরন, ফর্ক, প্রভৃতি পাখি প্রতি শীতে আসে। এই অঞ্চলের খানিক উত্তরে আরও শহরের দিকে পার্বতী গার্লস স্কুলের পেছনে পাশা-পাশি দুটি বড় আকারের পুকুর (ভাটার পুকুর) আছে। পুকুরের ধারে নারকেল গাছ দেখলেই পুকুরের বয়স অন্দাজ করা সম্ভব। মজার ব্যাপার হলো এই দুটি পাশাপাশি অবস্থিত পুকুরের একটিতে (উত্তর দিকের) আলিপুর চিড়িয়াখানায় আগত শরাল জাতীয় পাখিদের বসতে লক্ষ্য করা যায়। স্থানীয় লোকজনদের জিজ্ঞাসা করে জানা গেল মাত্র কয়েক বছর আগে থেকে এরা বসছে, এবং এদের সংখ্যাও প্রতি বছর বাড়ছে। রায়গঞ্জ শহরে কয়েক দিন থেকে এদের সুতীক্ষ্ণ স্বর রেকর্ড করে ও আচার-ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল।

আলিপুর চিড়িয়ানার পাখিদের বিষয়ে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য চিড়িয়াখানর অধিকর্তা মিঃ দাসের সৌজন্যে লেখক দিবারাত্র কাটিয়ে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করেছেন। আসলে এইসব পাখি রাতে চিড়িয়াখানা চত্বর ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। অবশ্য কোথায় যায় তা সঠিক বলা যাবে না—বিস্তারিত গবেষণার বিষয়। অনুমান করা হয় শহরতলীর বিভিন্ন মাঠে-প্রান্তরে এরা খাবার সন্ধানে যায়। কলকাতার আশেপাশে শহরতলী অঞ্চলে সন্ধ্যায় বা রাত্রিতে, বিশেষ করে শেষ রাত্রিতে এদের বিশেষ সুতীক্ষ্ণ নুপূরধ্বনীর মত আওয়াজ সহজেই শোনা যায়। চাঁদনী রাতে (যেমন পূর্ণিমা) প্রায় সারা রাত চিড়িয়াখানা চত্বরে এদের স্বর শোনা যায়। খুব ভোরে 4-30 ও এর আগে থেকে এরা চিড়িয়াখানার আসতে শুরু করে, প্রায় 5-30 নাগাদ ভোরের রক্তিম আকাশ উড়ন্ত পাখিতে চিড়িয়াখানার আকাশ প্রায় আবৃত হয়ে যায়। মনে হয় যে কোন মুহূর্তে একটির ডানা অপরটিকে স্পর্শ করবে—আসলে তা হয় না। এরা বিভিন্ন স্তরে উড়ে বলে পরস্পর থেকে দূরে থাকে এবং অনেকেই কয়েক পাক দিয়ে চিড়িয়াখানা চত্বরে নামে।, আবার সূর্যাস্তের আগে থেকেই কয়েকটি পাখি একসঙ্গে দল বেঁধে (9-15) যেন স্থান ত্যাগের কথা বলাবলি শুরু করে—এর পরই ওড়ার পালা। এদৃশ্যও দেখবার মতো। প্রতিদিন কেমন করে পথ চিনে ঠিক একই জায়গায় আসে—এটিই ভাববার! তবে অনুমান করা যায় অন্যান্য দেশান্তরী পাখি যে সব গুণাবলী দ্বারা পথ চিনে চলে এরাও একইভাবে দিনে সূর্য, গাছপালা, নদ-নদী প্রভৃতিকে চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করে। এছাড়া রাতে আকাশের গ্রহ, নক্ষত্র দেখে

নির্দিষ্ট স্থান চিনতে পারে। এছাড়া অনেকের মতে পৃথিবীর চৌম্বকত্ব বুঝবার বা যে সব আলোতে আমরা দেখতে পাই না, বা যে ধরণের শব্দ আমরা শুনতে পাই না, বর্তমানে নানা গবেষণায় দেখা গিয়েছে পাখিরা আলট্রাভায়োলেট বা পোলারাইজ্‌ড্‌ রশ্মি বুঝতে পারে, এছাড়া ইনফ্রাসাউণ্ড শুনতে পায়। এসব ছাড়া পাখি আবহাওয়ার সামান্যতম পরিবর্তন বুঝতেও বেশ ওস্তাদ। কাজেই তাপমাত্রার তারতম্যে এদের সংখ্যা অনেকটা নির্ভর করে।

আগের তুলনায় কম সংখ্যক পাখি চিড়িয়াখানায় আসছে বলে অনেকে মনে করেন—এ ধারণা একেবারে অমূলক নয়। কলকাতার ক্রমবর্ধমান শহরের বিস্তৃতি, পরিবেশ দূষণ, ক্রমবর্ধমান দর্শক— এসব নানা কারণে পাখির আগমন ব্যাহত হচ্ছে, একথা সহজেই বলা যায় (যেমন আগে ঢাকুরিয়া লেকে এইসব দেশান্তরী পাখি আসতো, বর্তমানে আসে না)। এছাড়া খিদিরপুর অঞ্চলে ঘুড়ির সুতোর বড়শী বেঁধে এসব পাখি ধরার জন্যও পাখিরা বিরক্ত হয়ে এস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হতে পারে। একই ধরণের আচার-আচরণ সাঁতরাগাছি ও রায়গঞ্জের শরাল সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

বর্তমান আধুনিক সভ্যতার বিস্তৃতির ফলে পাখির স্বাভাবিক বিচরণভূমি যেমন ক্রমশঃ সংকুচিত হয়ে আসছে, তেমনি শহুরে সভ্যতার অঙ্গ—সুউচ্চ কাঁচ-সম্বলিত অট্টালিকা, লাইট-হাউস, বা টি.ভি. টাওয়ার ইত্যাদি দেশান্তরী পাখির স্বাভাবিক যাতায়াতে নানাভাবে বাধা সৃষ্টি করছে। সর্বোপরি আধুনিকতার অভিশাপ-রূপে জল ও বায়ু দূষণের ফলেও পাখির এই দেশান্তরী প্রবৃত্তিতে বিঘ্ন ঘটছে—একথা সহজেই বলা যায়।

নোবেল বিজ্ঞানী সুব্রাহ্মণ্যম চন্দ্রশেখর

সত্যরঞ্জন পাণ্ডা*

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার, সে সময় পদার্থবিজ্ঞানের একজন অধ্যাপক তাঁকে

এস. চন্দ্রশেখর

বলেছিলেন—"আমাকে কাজ করার সুযোগ দিন, আমি পাঁচ বছরের মধ্যেই নোবেল পুরস্কার এনে দেবো।" এই অধ্যাপক তাঁর দম্ভোক্তি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন 1930 খৃস্টাব্দে। এশিয়ার প্রথম নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ঐ বিজ্ঞানী হলেন চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন (সি. ভি. রামন)। এই নোবেল পুরস্কারবিজয়ী বিজ্ঞানীর ভাগ্নে হলেন সুব্রাহ্মণ্যম চন্দ্রশেখর। 1983 খৃস্টাব্দে পদার্থবিদ্যায় যুগ্মভাবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন জন্মসূত্রে ভারতীয় এবং বর্তমান মার্কিন নাগরিক সুব্রাহ্মণ্যম চন্দ্রশেখর এবং অপর একজন মার্কিন পদার্থ-বিজ্ঞানী উইলিয়ম ফাউলার।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যাঁর নামে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়, সেই আলফ্রেড নোবেল প্রচুর অর্থের মালিক হয়েও সারাজীবন রোগ যন্ত্রণায় ভুগে জীবনের শেষের দিকে মানুষের মঙ্গলের জন্য তাঁর সমূহ অর্থ উইল করে দিয়ে যান। তখনকার দিনে এর মূল্য ছিল প্রায় 90 লক্ষ ডলার। উইলের শর্ত অনুসারে এই অর্থের সুদ থেকে প্রতি বছর জাতি-ধর্ম, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, শারীরবিদ্যা বা চিকিৎসাবিদ্যা, সাহিত্য এবং বিশ্বশান্তি পাঁচটি বিষয়ে সর্বাপেক্ষা কৃতিত্বের অধিকারীকে প্রতি বছর এই নোবেল পুরস্কার দেওয়া হবে। 1896 খৃস্টাব্দের 10ই ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। 1901 খৃস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু বার্ষিকীতে স্টকহলমে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান প্রথম শুরু হয়। ঐ বছর যাঁরা প্রথম নোবেল পুরস্কার পান, তাঁরা হলেন—পদার্থ বিজ্ঞানে জার্মান বিজ্ঞানী রয়েন্টগেন, শারীরবিদ্যায় জার্মান বিজ্ঞানী এমিল বেরিং, রসায়নশাস্ত্রে ওলন্দাজ বিজ্ঞানী ভ্যাণ্ট হফ, সাহিত্যে ফরাসী সাহিত্যিক রীন, এফ. এ. সুলি প্রুধোঁ এবং বিশ্বশান্তি ও ভ্রাতৃত্বের জন্য যুগ্মভাবে সুইজারল্যাণ্ডের জেনরি ডুনাট এবং ফ্রান্সের ফ্রেডারিক প্যাসি।

* 1, ভোলা ময়রা লেন, কলকাতা-700 004

সেই অনুসারে 1983 খৃস্টাব্দে যাঁরা নোবেল পুরস্কার পেলেন তাঁরা হলেন—পদার্থবিদ্যায় যুগ্মভাবে (জন্মসূত্রে ভারতীয়) মার্কিন বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর এবং মার্কিন বিজ্ঞানী উইলিয়ম ফাউলার, রসায়নে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হেনরি টাউবে, চিকিৎসাবিজ্ঞানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেনেটিক্স্ বিষয়ে মহিলা বিজ্ঞানী বারবারা ম্যাকক্লিন্‌ক্, সাহিত্যে ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক উইলিয়ম গোল্ডিং এবং বিশ্বশান্তির জন্য পান পোল্যাণ্ডের ওয়ালেসা।

ডঃ এস. চন্দ্রশেখর হলেন ভারতীয় বংশোদ্ভব মার্কিন নাগরিক দ্বিতীয় নোবেল বিজ্ঞানী, তার আগে 1968 খৃস্টাব্দে জেনেটিক্সের ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য শারীরতত্ত্ব ও ভেষজবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান ডঃ হরগোবিন্দ খোরানা, তিনিও জন্মসূত্রে ভারতীয় এবং মার্কিন নাগরিক। এ ছাড়াও 1913 খৃস্টাব্দে সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং 1979 খৃস্টাব্দে দুর্গত মানুষের সেবার জন্য মাদার টেরেজা নোবেল পুরস্কার পান। যা হোক কিছু কিছু বিজ্ঞানী ছিলেন বা আছেন, যাঁদের তত্ত্ব পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে নিত্য নতুন পথের হদিস দিচ্ছে কিন্তু তাঁরা নোবেল পুরস্কার লাভে বঞ্চিত। এ'রা যেন "উপেক্ষিত বিজ্ঞানী"। তবে সুইডিশ অ্যাকাদেমি খুব দেরি করে চন্দ্রশেখরের স্বীকৃতি দিলেও এই দলে ফেলেন নি। এটাই সুখের কথা। এর জন্য তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল প্রায় 20 বছরের মত। এ'রা প্রত্যেকে আমাদের গর্ব। কিন্তু তবুও যেন আমাদের একটা বড় খেদ থেকে যায়। সি. ভি. রামন এবং রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পান ভারতের মাটিতে সাধনা করে, কিন্তু অপর দু-জন ভারতীয় বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ও খোরানা এই পুরস্কার পান ভারতীয় নাগরিকত্ব ত্যাগ করে বিদেশের মাটিতে সাধনা করে।

সুব্রহ্মণ্যম চন্দ্রশেখরের জন্ম ভারতে। তাঁর আদি বাস তামিলনাড়ুতে। জন্ম 1910 খৃস্টাব্দের 19 অক্টোবর লাহোরে। তাঁর জন্ম ভারতের নামকরা এক বিখ্যাত বিজ্ঞানী পরিবারে। একদিকে তাঁর মামা হলেন নোবেল বিজ্ঞানী সি. ভি. রামন, অপর দিকে তাঁর তিন ভাইও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে খুবই খ্যাতিসম্পন্ন। এক ভাই এস. রামনাথন হচ্ছেন ত্রিবান্দমের থুম্বা মহাকাশ প্রকল্পের একজন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী, দ্বিতীয় ভাই ডঃ বালকৃষ্ণন পাণ্ডিচেরীর জিপমার হাসপাতালের শিশু বিশেষজ্ঞ ও শিশু বিভাগের নামকরা অধ্যাপক এবং তৃতীয় ভাই ছিলেন একজন বিশিষ্ট ধাতুবিদ, বর্তমানে মৃত। চন্দ্রশেখরের পাঁচ বোন, তাঁরা প্রত্যেকে থাকেন তামিলনাড়ুতে। তাঁর স্ত্রী ললিতা পদার্থবিদ্যার একজন কৃতী ছাত্রী ও পদার্থবিদ।

ছাত্রজীবনে তিনি ছিলেন খুবই মেধাবী। এই সময় তাঁর মামার সান্নিধ্যে থেকে বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধা জন্মায়। তাঁরই অনুপ্রেরণায় উদ্দীপিত হয়ে তিনি গোড়ার পাঠ শেষ করেন মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সী কলেজে। এরপর যান বিলেতে। কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে পড়াশুনা ও গবেষণা করে 1933 খৃস্টাব্দে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। মহাবিশ্বের কোটি কোটি নক্ষত্র তাঁর বাল্যজীবনকে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি এদের দিয়ে বিস্ময়ভরা দৃষ্টিশক্তি নিয়ে তাকিয়ে অনেক কিছু চিন্তাভাবনা করতেন। 1928 খৃস্টাব্দে যখন তিনি মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি কলেজে স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র, তখন থেকে এ সব বিষয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের রচনা ও তত্ত্ব পড়ে তাঁর মনে নানান প্রশ্ন জাগে, তখন থেকেই তিনি আরম্ভ করেন নতুন চিন্তা-ভাবনা। নিত্য নতুন প্রশ্নের সম্মুখীন হন, কিছু কিছু বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসেন। কেমব্রিজে পড়াশুনা করার সময় এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে কিছু কিছু সমাধান করেন, কিছু কিছু তত্ত্ব তখনকার যুগের বিজ্ঞানীরা মেনে নেন কিন্তু কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব তাঁরা মেনে নেন নি। এখানে তিনি নামকরা অনেক বিজ্ঞানীর সংস্পর্শে আসেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন স্যার আর্থার স্ট্যানলি এডিংটন এবং এডওয়ার্ড আর্থার মিলনে। পূর্বের যে সব নক্ষত্রের বিবর্তন ও সঙ্কোচন নিয়ে সিদ্ধান্ত ছিল বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের মনে, চন্দ্রশেখর একটা নতুন তত্ত্ব তুলে তাঁদের সে সব ধারণার মূলে আঘাত হানেন। সেটা তাঁদের একটা মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ। চন্দ্রশেখর মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছিলেন যে, তাঁর তত্ত্বই ঠিক। নক্ষত্রের সঙ্কোচন নিয়ে তিনি গবেষণা করে যে তত্ত্ব খাড়া করেছেন, তা অভিনব। এডিংটন ও মিলনের মতের মধ্যে নক্ষত্রের সঙ্কোচন নিয়ে বিরোধও ছিল। এই বিরোধ মেটাতে গিয়ে চন্দ্রশেখর 1934 খৃস্টাব্দে দুটি তত্ত্ব খাড়া করেন। একটি ছিল 1932 খৃস্টাব্দের নিবন্ধের মৌলিক প্রশ্ন—কোন বদ্ধ পাত্রে অসংখ্য ইলেকট্রন এবং পারমাণবিক নিউক্লিয়স রেখে যদি তার উপর ক্রমাগত চাপ দেওয়া যায়, তার ফল কি হবে? দ্বিতীয়টি ছিল—নক্ষত্রের পরিণতি নিয়ে। তিনি এসব বিষয়ে এডিংটন প্রমুখের সঙ্গে অনেক আলোচনা করার সুযোগ পেলেও স্বয়ং এডিংটনই চন্দ্রশেখরের মূল্যবান গবেষণাকে স্বীকার করেন নি। 1935 খৃস্টাব্দে 11 জানুয়ারী রয়েল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির বৈঠকে চন্দ্রশেখর তাঁর নক্ষত্র বিবর্তন তত্ত্বের কথা প্রথমে ঘোষণা করেন। এটি ছিল—একটি নক্ষত্রের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হওয়ার পর নক্ষত্রটির কি পরিণতি হয়, সেই মৌলিক প্রশ্ন নিয়ে। এই প্রশ্নের সমাধানে চন্দ্রশেখর বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের যে প্রয়োগ করেছিলেন, এডিংটন তাকে ভুল বলে মন্তব্য করেন। দীর্ঘকাল এই নিয়ে আলোচনা চালিয়েও কোন ফল হয় নি।

মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি এবং কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে অধ্যয়ন কালে তিনি নক্ষত্র, প্লাজ্‌মা এবং ম্যাগনেটো-হাইড্রো-ডাইনামিক্স্ প্রভৃতি বিষয়ে খুবই কৃতিত্বের পরিচয় দেন। 1937 খৃস্টাব্দে ট্রিনিটি কলেজের ফেলো নির্বাচিত হন এবং 27 বছর বয়সে রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট হিসাবে যোগ দেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে অধ্যাপনা ও গবেষণা শুরু করেন

1938 খৃস্টাব্দে এবং তাঁর নক্ষত্র বিবর্তনের তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর এই তত্ত্ব তখন অনেক বিজ্ঞানী মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করলেও কিন্তু কেউই এডিংটনের ভয়ে প্রকাশ্যে কোন মন্তব্য করতে পারেন নি। এতে চন্দ্রশেখর না দমে এই তত্ত্বকে আরও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মার্জিত করেন। ইতিমধ্যে তিনি জ্যোতি-পদার্থবিজ্ঞানে বেশ খ্যাতি অর্জন করেন, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক মহলেও ক্রমে ক্রমে তাঁর কিছু কিছু কাজ সমাদৃত হয়।

চন্দ্রশেখরের তত্ত্বের আগে বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রের পরিণতি নিয়ে চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে—কোন নক্ষত্র যখন শীতল হতে থাকে, তখন তার নিজের অভিকর্ষের প্রভাবে নক্ষত্রটি ছোট হতে থাকে ; এইভাবে যে ক্ষুদ্র নক্ষত্রের সৃষ্টি হয়, তাকে বলা হয় "শ্বেত বামন"। কিন্তু চন্দ্রশেখরের তত্ত্ব থেকে জানা গেল, সূর্যের থেকে প্রায় 1.4 গুণ নক্ষত্রের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড অভিকর্ষের টানে নক্ষত্রটি "শ্বেত বামন" অবস্থা লাভ না করে আরো ছোট হতে থাকে। নক্ষত্রটির আয়তন আরও ক্রমশ ছোট হবে এবং তার ঘনত্ব সর্বদাই বেড়ে চলবে। কিন্তু এডিংটন একে স্বীকার করেন নি। তিনি বলেন, সব নক্ষত্রই শেষ পর্যন্ত "শ্বেত বামন" অবস্থা লাভ করবে।

যাহোক দীর্ঘদিন পরে চন্দ্রশেখরের তত্ত্ব সমাদৃত হয়। এর উপর ভিত্তি করে তিনি নোবেল পুরস্কার পান। একদা সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানীরা যে তত্ত্ব শুনে হেসেছিলেন, সেটিরই প্রতিপাদ্য পরে "চন্দ্রশেখর সীমা" নামে পরিচিত হয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকে পৃথক অধ্যায় রূপে স্থান দখল করে নিয়েছে। তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কারের ভিত্তি ছিল বিভিন্ন ভরের সঙ্কোচনশীল নক্ষত্রের আনুমানিক ব্যাসার্ধ নিয়ে। নক্ষত্রের বিবর্তনে "শ্বেত বামনের" উৎপত্তিকে র‍্যাল্‌ফ হাওয়ার্ড ফাউলার ব্যাখ্যা করেছিলেন কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রয়োগ করে। কোয়ান্টাম তত্ত্বের সঙ্গে আপেক্ষিকতাবাদ প্রয়োগ করে চন্দ্রশেখর দেখালেন যে, চরিত্র বিচ্যুত (degenerate) ইলেকট্রন গ্যাসের চাপ বিধ্বস্ত নক্ষত্রের ভর বইতে পারে এবং "শ্বেত বামনের" সৃষ্টি হয়, যদি সেই নক্ষত্রের ভর সূর্যের ভরের 1·4 গুণের বেশী না হয়। এই সংকট ভরই "চন্দ্রশেখর সীমা" নামে বিখ্যাত। এই সীমার চেয়ে বেশী ভরের নক্ষত্র সঙ্কুচিত হয়ে অধিক ঘনত্বের নক্ষত্রে পরিণত হয়। পরে জানা গেছে, এইভাবে উৎপন্ন হয় নিউট্রন নক্ষত্র বা "কৃষ্ণ গহ্বর" (Black Hole)।

সি. ভি. রামন যে বছর নোবেল পুরস্কার পান (1930) ঠিক সেই বছরই ভারতের বুকে সূচনা হয়েছিল আর এক নোবেল বিজ্ঞানীর তত্ত্ব। যখন চন্দ্রশেখরের বয়স মাত্র কুড়ির কোঠায়, তখন তিনি স্টিমারে ভারত থেকে ব্রিটেনে যাবার সময়ে এই কাজ করেন। সেই বিখ্যাত গবেষণা ছিল "শ্বেত বামন" গঠন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে। কিন্তু এরূপ একজন বিজ্ঞানী ভারতে ফিরে এসে পুরো একটি বছর থাকার পর কোন সুযোগ না পেয়ে খুবই বেদনার সঙ্গে ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে চিরতরে চলে যান মাতৃভূমি ছেড়ে আমেরিকায়। 1953 খৃস্টাব্দে গ্রহণ করেন ওখানকার নাগরিকত্ব। দেশ ছেড়ে একাধারে পেলেন সবকিছু। কয়েক বছরের মধ্যে হন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌর পদার্থ বিদ্যার বিভাগীয় প্রধান।

বিদেশের মাটিতে তাঁর প্রতিভার প্রসার ঘটে ধীরে ধীরে। পদার্থবিদ্যায় গাণিতিক প্রয়োগ ঘটিয়ে তিনি আরও বিখ্যাত হন। এভাবে তিনি একদিকে হন একজন খ্যাতনামা গণিতবিদ এবং অপর দিকে হন প্রসিদ্ধ পদার্থ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী। এই সব বিষয়ে আছে তাঁর প্রচুর মৌলিক গবেষণা। সাম্প্রতিক কালে তিনি সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের ফলাফল সম্পর্কে গবেষণা করেন। মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া প্লাজমা পদার্থবিজ্ঞান, আলোর বিচ্ছুরণ, চৌম্বক বলবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়েও তাঁর প্রচুর গবেষণা আছে।

ডঃ চন্দ্রশেখর এখন মার্কিন নাগরিক। ভারতীয় বিজ্ঞানী যখন বিদেশের মাটিতে বসে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করলেন তখন স্বদেশের নজর পড়ল তাঁর দিকে। 1968 খৃস্টাব্দে ভারত সরকার তাঁকে দেন পদ্মভূষণ খেতাব। তিনি বিভিন্ন সময় ভারতের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখেন। তিশের দশকের গোড়ার দিকে এলাহাবাদে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দেন এবং অনেক পরে "সাহা স্মারক" বক্তৃতা দেওয়ার জন্য একবার কলকাতায়ও আসেন। 1966 খৃস্টাব্দের 24 জানুয়ারী এক ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় ডঃ হোমি ভাবা যখন মারা যান, তখন চন্দ্রশেখরকে অনুরোধ জানান হয় ভাবার জায়গায় ভারতের পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের দায়িত্ব নিতে। তিনি সৌর বিজ্ঞানী বলে পরমাণু সংস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন।

সারা জীবন গবেষণা নিয়ে কাটালেও বিভিন্ন বিজ্ঞান সংস্থার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। 1952-71 পর্যন্ত অ্যাস্ট্রো-ফিজিক্যাল জার্নালের সম্পাদক, সদস্য ছিলেন আমেরিকান ফিলোসফিক্যাল সোসাইটি, আমেরিকান অ্যাকাডেমি অব আর্ট'স অ্যাণ্ড সায়েন্স, লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থার। বিভিন্ন কাজের স্বীকৃতির জন্য পান ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ থেকে সম্মানজনক পদক ও পুরস্কার। তিনি লিখেছেন অনেক বই। সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল—'প্রিন্সিপিল্‌স্ অব স্টেলার ডাইনামিকস্', 'ইনট্রোডাকশেন টু দি স্টাডি অব স্টেলার স্ট্রাকচার' 'হাইড্রোডাইনামিকস্ অ্যাণ্ড হাইড্রোম্যাগনেটিক স্টেবিলিটি' প্রভৃতি।

অধ্যাপক চন্দ্রশেখরের বর্তমান বয়স 73। বেশীর ভাগ সময় কাটান শিকাগোয় তাঁর গবেষণায়। তাঁর জন্মদিন গেল 19.10.73 তারিখে। একজন আদর্শ মানুষ ও শিক্ষক হিসেবে এইদিন পেয়েছেন বিভিন্ন ছাত্র ও সংস্থা থেকে অনেক ভালবাসা ও শুভেচ্ছা। আবার অপর দিকে একজন প্রখ্যাত গণিতবিদ পদার্থ ও সৌর বিজ্ঞানী হিসেবে এই জন্মদিনে পেলেন শ্রেষ্ঠ উপহার নোবেল পুরস্কার। এই পুরস্কারের মূল্য যদিও

দুই লক্ষ মার্কিন ডলার, তবুও এই আর্থিক মূল্যের থেকে নোবেল পুরস্কারের সাম্মানিক মূল্য অনেক বেশি। প্রায় 43 বছর বয়সে অধ্যাপক চন্দ্রশেখর মার্কিন নাগরিকত্ব গ্রহণ করলেও এই ভারতীয় বিজ্ঞানীর অবদান ভারতের একটি বিশেষ স্থান করে দিয়েছে বিজ্ঞানের মানচিত্রে। এদিক দিয়ে তিনি ভারতেরও অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী।

অতীত ভারতের আবহাওয়া-তত্ত্ব : বরাহমিহির

কর*

মৌসুমী বায়ুর (monsoon) পূর্ব-সূচনা সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতগণ যে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, আচার্য বরাহমিহির প্রণীত 'বৃহৎসংহিতা' গ্রন্থে তার কথঞ্চিৎ নিদর্শন পাওয়া যায়। বরাহমিহিরের কাল-সম্বন্ধ মতভেদ আছে। খৃস্টপূর্বাব্দ থেকে খৃস্টীয় পঞ্চমাব্দ পর্যন্ত তাঁর আবির্ভাব-কাল নিয়ে মত প্রচলিত রয়েছে। মনে রাখতে হবে যে, প্রায় দেড় হাজার বছর আগে বৃহৎসংহিতা প্রণীত হয়েছিল।

উপনিষদের যুগ থেকে যে আবহাওয়া-তত্ত্ব আলোচিত হয়ে এসেছিল তার কিয়দংশ অতি সংক্ষেপে বৃহৎসংহিতায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে বৃষ্টিবারি মাপবার যন্ত্র যে ছিল এই পুস্তক থেকে তারও প্রমাণ পাওয়া যায় (23 অধ্যায়, 2 শ্লোক) :—

হস্তবিশালং কুণ্ডকমধিকৃত্যাম্বু প্রমাণ নির্দেশঃ।

পঞ্চাশৎ পলম ঢকমনেন মিনুঃ জলং পতিতম্ ॥

সূর্য ও চন্দ্রের পরিবেষ্টক দ্যুতি-মণ্ডল, ঊষা ও গোধূলির আলোক, অশনি, বিদ্যুৎ, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি নৈসর্গিক ঘটনাবলী যে সেকালে প্রায় নির্ভুলভাবে পরিলক্ষিত হতো এবং আবহাওয়ার পূর্বাভাস নির্ণয়ে ব্যবহৃত হতো, তদ্বিষয়ে সংশয়ের কোনো কারণ নেই। কোন্ কোন্ শুভ লক্ষণ পরিদৃষ্ট হলে সুবৃষ্টি হবে, তার সংক্ষিপ্ত মর্ম বৃহৎসংহিতার একবিংশ-অধ্যায়ে (শ্লোক 19-22) বর্ণিত রয়েছে। নিম্নে মূল এবং তার মর্মানুবাদ দেওয়া গেল, লক্ষণগুলি হিন্দু চান্দ্রমাস অনুসারে নির্দিষ্ট হয়েছে।

1500 বছর আগেকার বর্ষ-মানের সঙ্গে বর্তমান কালের পার্থক্য আলোচনায় অগ্রহায়ণ থেকে বৈশাখ—এই মাস দুটিকে নিম্নরূপ ইংরেজি মাসে পরিবর্তিত করা হলো—

অক্টোবর ও নভেম্বর—প্রভাতে ও সায়াহ্নে দিক-চক্রবালে সিন্দুর আভা, মেঘ এবং সূর্য ও চন্দ্র পরিবেষ্টক দ্যুতিমণ্ডল, নাতি-শীত। নভেম্বর ও ডিসেম্বর—প্রভাতে ও সায়াহ্নে দিক-চক্রবালে সিন্দুর আভা, মেঘ এবং সূর্য ও চন্দ্র পরিবেষ্টক দ্যুতিমণ্ডল, অনধিক নীহারপাত। ডিসেম্বর ও জানুয়ারি—জোর হাওয়া, নিস্তেজ সূর্যমণ্ডল ও চন্দ্রমণ্ডল, অতিরিক্ত শীত, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তকালে ঘন মেঘ। জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি—প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত দমকা হাওয়া, সমতল পাদদেশবিশিষ্ট ঘন মেঘ, সূর্য ও চন্দ্র পরিবেষ্টক অসম্পূর্ণ দ্যুতিমণ্ডল, তাম্রবর্ণ সূর্যমণ্ডল। ফেব্রুয়ারী ও মার্চ—মেঘের সঙ্গে জোর হাওয়া ও বৃষ্টি। মার্চ ও এপ্রিল—বিদ্যুৎ, বজ্র, বাতাস এবং বৃষ্টি। উপরিউক্ত সিদ্ধান্তগুলি সম্ভবত সুরধুনী-ধারা-ধৌত সমতল-ভূমির বহুস্থল পর্যবেক্ষণান্তে গৃহীত হয়েছিল। বর্তমানেও এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কোন কারণ উপস্থিত হয় নি।

কারো কারো মতানুসারে শীতের প্রারম্ভে অর্থাৎ অক্টোবর মাসের শেষার্ধে মেঘ পরিদর্শনপূর্বক পরবর্তী বর্ষার বারিপাতের পরিমাণ অনুমান করা যায়। বরাহমিহিরের পূর্বে কার্তিকমাসের শুক্ল-পক্ষের পর এই সমস্ত লক্ষণ আলোচনা করবে—'কেচিদ্বদন্তি কার্তিক শুক্লান্তমতীতা—' এইরূপ একটি মত প্রচলিত ছিল। গর্গ প্রমুখের মত উদ্ধৃত করে বরাহমিহির করেছিলেন সে মতের প্রতিবাদ। [গর্গ অর্থাৎ মুনিবিশেষ, যদু-বংশের পুরোহিত ও আচার্য]।

যে পরিমাণ বৃষ্টিতে পৃথিবীতে বারিচিহ্ন পড়ে অথবা তৃণের অগ্রভাগে বারিকণা সঞ্চিত হয়, প্রাচীন ভারতবর্ষে সেই দিনটিই বৃষ্টির দিন হিসেবে গণ্য হতো—

যেন ধরিত্রীমুদ্রা জনিতা ব বিন্দবস্তৃণাগ্রেষু :

বৃষ্টেন তেন বাচ্যং পরিমাণং বারিণঃ প্রথমম্ ॥

23 অধ্যায়, শ্লোক 3 ॥

এরূপ বৃষ্টির পরিমাণ নিশ্চয়ই 1/100 ইঞ্চির কম। ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যদি কোনদিন
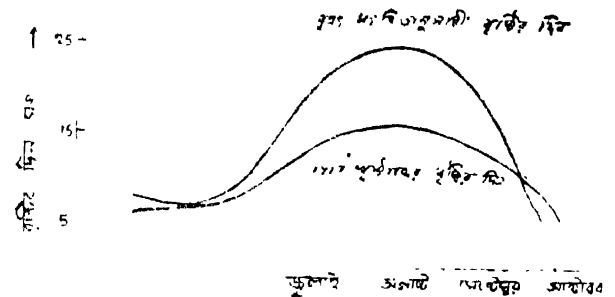
1/100 ইঞ্চি অপেক্ষা কম বারিবর্ষণ হয়, তবে সে-দিনটি আর বৃষ্টিপাতের দিন হিসেবে গণ্য হবে না। প্রাচীন ও আধুনিক বর্ষণ-দিনের এই ধরণের অদ্ভুত সাদৃশ্যে আশ্চর্যান্বিত হয়ে যেতে হয়। উপরের লেখচিত্র (graph) থেকে বিষয়টি পরিষ্কার বুঝা যাবে।

বরাহমিহির আরও বলে গিয়েছেন যে, শীতকালে যদি অতি

* 182/2, গোপাললাল ঠাকুর রোড, বনহুগলী, কলিকাতা-700 035

বৃষ্টি হয়, তাহলে পরবর্তী বর্ষায় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হবে, বড় বড় বারিবিন্দু পাওয়া যাবে না। দেখা গিয়েছে যে, উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে যেবার অধিক বৃষ্টি হয় পরবর্তী বর্ষায় বৃষ্টিপাত হয় কম। এম. ভি. উনাকর এক মৌলিক প্রবন্ধে (Indian Meteorological Department: Scientific Series Part I, No. 6 দ্রষ্টব্য) যে সকল পারস্পরিক সম্বন্ধজ্ঞাপক রাশি নির্ণয় করেছেন, তাতে পূর্বোক্ত মত আশ্চর্য রকমে সমর্থিত হয়েছে।

শ্রীযুক্ত উনাকর বলেন—বরাহমিহির যে বলেছেন, ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসের জোর বাতাস পরবর্তী জুলাই মাসে বারিপাতের অনুকূল লক্ষণ, এতে সংশয়ের বিশেষ কারণ নেই। দেখা গিয়েছে যে, গত 14 বৎসরে আগ্রার উপরস্থ 3 থেকে 7 কিলোমিটার বায়ুস্তরে পশ্চিমদিক থেকে প্রবাহিত বাতাসের যেরূপ প্রাবল্য ছিল এবং জুলাই মাসে উঃ-পঃ ভারতবর্ষে যে পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়েছিল, উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধজ্ঞাপক রাশি দাঁড়ায় +0·55। এ ধরণের পারস্পরিক সম্বন্ধ বরাহমিহিরের মতের সমর্থনে যাচ্ছে।

মৌমাছি—মধু ও পরাগ সংযোগ

দীপককুমার দাঁ*

পৃথিবীতে পতঙ্গ শ্রেণীভুক্ত প্রাণীদের এক বিরাট সংখ্যা Apoidea (super family) পরিবারভুক্ত (বর্গ—হিমেনপটেরা)। এদেরকে প্রধানতঃ দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়—(i) Solitary bees (নিঃসঙ্গ মৌমাছি); (ii) Social bees (সামাজিক মৌমাছি)। Solitary beesকে নিম্নোক্ত পরিবারে ভাগ করা হয়- 1. Split tongued (বা, Wasplike bees), 2. Mining bees, 3. Leaf cutter bees। Social bees বলতে বোঝায়—1. Bumble bees, 2. Stingless bees, 3. Honey bees.

মৌমাছি (honey bees) পতঙ্গ শ্রেণীভুক্ত। পৃথিবীতে নয় লক্ষ পতঙ্গের মধ্যে বিভিন্ন জাতের মৌমাছির সংখ্যা প্রায় 20,000। এর মধ্যে মধু সংগ্রহকারী মৌমাছিদের চারটি প্রজাতি—(1) Western honey bees (Apis Mellifera)—ইউরোপ, এশিয়া মাইনর, আফ্রিকার সর্বত্র পাওয়া যায় এবং পালন করা হয়। এর মধু উৎপাদন ক্ষমতা বেশি। (2) ভারতীয় মৌমাছি (A. C. Indica)—এটি ভারত সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে পাওয়া যায় ও পালন করা হয়। (3) Little honey bee ক্ষুদে মৌমাছি (A. Florea) এরা অল্প মধু সংগ্রহ করে এবং পরিযায়ী স্বভাব। এদের পালন করা হয় না। (4) Giant or Rock honey bee, বুনো মৌমাছি (A. Dorsata)—এরা বেশ হিংস্র; স্বভাবে পরিযায়ী, পালন করা যায় না।

ইউরোপের মৌমাছির a. mellifera-র অনেকগুলি জাত (variety) আছে। এসব বিভিন্ন জাতের মৌমাছি ইউরোপ ও ও আমেরিকা মহাদেশের (উত্তর ও দক্ষিণ) নানা স্থানে পালন করা হয়। European বা Black Bee পাওয়া যায় উত্তর ইউরোপ, গ্রেট ব্রিটেন থেকে রাশিয়ার সর্বত্র। ইউরোপের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত জাত হলো—Italian, a yellow bee। উত্তর ইটালীর পাহাড় অঞ্চলে এটি পাওয়া যায়।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই জাতকে স্থায়ীভাবে চাষ করার জন্য গবেষণা চালানো হচ্ছে। এছাড়াও আর দু'টি জাত (A. mellifera) পালনের জন্য ব্যবহৃত হয় greyish bee—(i) Carniolan পাওয়া যায় এড্রিয়াটিক সমুদ্রের পূর্ব ধারে; (ii) Caucasian পাওয়া যায় ককেশাস পার্বত্য অঞ্চলে। এই চারটি জাতের মৌমাছির নানাধরণের উপযোগিতা ও গুণাবলী আছে মৌপালনের দিক থেকে। প্রচণ্ড শীতের সময়ও Northern European bees-রা বেশী পরিশ্রম করে Southern European beesদের তুলনায়। সমস্যা হলো এদের জিভ ছোট এবং ঝাঁক (swarm) ছাড়ার প্রবণতা বেশি। আর রোগাক্রান্ত হয় সহজেই। ককেশিয়ানরা বেশ শান্ত। কিন্তু এরা বেশি প্রপোলিস (একজাতীয় পরাগমিশ্রিত আঠা) তৈরি করে চাকের স্বাভাবিক কাজে অসুবিধা ঘটায়।

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের পূর্বভাগে—ইজিপ্টিয়ান, সাইপ্রিয়ান, এবং সিরিয়ান জাতের মৌমাছি পরীক্ষামূলকভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে রপ্তানি করা হয়েছে. কিন্তু এখনও পর্যন্ত কার্যকরী হয় নি।

ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বত্র ভারতীয় মৌমাছি পালন করা হয়। এদের মূলতঃ দুটি জাতে ভাগ করা হয়—hill type, যা পাওয়া যায় হিমালয়ের পার্বত্যভূমিতে (পশ্চিমবঙ্গে জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং পর্যন্ত), এদের মধু উৎপাদন ক্ষমতা বেশি, plain type—ভারতবর্ষের সর্বত্র সমতল ভূমিতে এদের পাওয়া যায়। এদের আকৃতি hill type-এর চেয়ে ছোট; মধু উৎপাদন ক্ষমতা কম। মৌবাক্সে এদের চাষই সর্বাধিক জনপ্রিয়।

বুনো মৌমাছি (Rock bee, a. dorsata)—এদের আকৃতি ভারতীয় মৌমাছির প্রায় আড়াই গুণ। এদের হুলের বিষ তীব্র যন্ত্রণাদায়ক। এরা স্বভাবে বুনো; পোষ মানানো যায় না। যেখানে প্রচুর ফুল ফোটে, সেখানে এরা অতি অল্প সময়ে চাক বানিয়ে প্রচুর মধু সংগ্রহ করে। সুন্দরবনে এপ্রিল-মে মাসে যে মধু সংগৃহীত (প্রায় 75,000 কি. গ্রা.)—

*গোবরডাঙা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট, পোঃ খাঁটুরা, 24-পরগণা

তা এই বুনো মৌমাছির চাক থেকে। একটা চাক থেকে গড়ে 5 কে.জি. থেকে 30 কে. জি. পর্যন্ত মধু পাওয়া যায়। সুন্দরবনে ফুল শেষ হয়ে গেলে, ওরা অন্যত্র চলে যায়। 10-15 বছর আগেও পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে বড় আম, জাম, তেঁতুল, জিউলী, আমড়া ইত্যাদি গাছে এদের অনেক চাক দেখা যেত। এখন এদের চাক গ্রামাঞ্চলে দেখা যায় না বললেই চলে।

ক্ষুদে মৌমাছি—স্বভাবে পরিযায়ী; আধা মধু সংগ্রহ করে। কিছু ফল-শস্যের পরাগসংযোগ ক্রিয়ার ক্ষেত্রে এদের গুরুত্ব অপরিসীম। এরা একটা চাক তৈরি করে (আকৃতি গড়ে 10″×12″)। আজকাল এদের প্রতি যত্ন করার একটা উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। এদের বাক্সে রেখে পালন করা যায় কিনা, সেবিষয়ে গবেষণা করা হচ্ছে। গ্রাম বাংলায় এদের প্রচুর চাক দেখা যায়। এদের চাক মধুর লোভে কখনই নষ্ট করা উচিত নয়।

মধু উৎপাদন - সপুষ্পক জাতের উদ্ভিদের ফুল থেকে প্রাপ্ত পুষ্পরস (nectar) মৌমাছির শরীরের ভিতরে জটিল প্রক্রিয়ায় মধুতে রূপান্তরিত হয়। পুষ্পরস থেকে তিন ধরণের চিনির জলীয় দ্রবণ—ফ্রুকটোজ, গ্লুকোজ এবং সুক্রোজ। এছাড়া প্রোটিন, লবণ, অ্যাসিড এবং তেল জাতীয় পদার্থ এর সঙ্গে মিশে থাকে। ফুল ভেদে পুষ্পরসের মধ্যে চিনির পরিমাণ শতকরা 3 ভাগ থেকে 80 ভাগ পর্যন্ত হতে পারে। প্রাচুর্য অনুযায়ী মৌমাছিরা পুষ্পরস সংগ্রহ করে প্রধানতঃ একই জাতের ফুল থেকে মরশুম অনুযায়ী। যেমন, সরিষার সময়ে শুধু সরিষার পুষ্পরস ও পরাগ পাওয়া যাবে চাকে; লিচুর সময়ে লিচুর পুষ্পরস ইত্যাদি, অবশ্য স্থানভেদে।

মৌমাছিরা সেইসব ফুলের পুষ্পরস সংগ্রহে বেশী আগ্রহী যাতে চিনির পরিমাণ শতকরা 15 ভাগের বেশি। মধুতে জটিল রাসায়নিক গঠনযুক্ত চিনি, যেমন, সুক্রোজ মৌমাছির শরীরের পাকস্থলীর উৎসেচক রস (enzymes) দ্বারা জারিত হয়ে সরল রাসায়নিক গঠনযুক্ত চিনি ফ্রুকটোজ ও গ্লুকোজে পরিণত হয়। এ ছাড়া চিনির দ্রবণের অতিরিক্ত জলীয় অংশ বাষ্পায়িত করে (ডানার সাহায্যে, fanning) যাতে মধুতে চিনির পরিমাণ শতকরা 80 ভাগ হয়।

প্রত্যেক কলোনীতে অনুসন্ধানী ও খাদ্য সংগ্রহকারী মৌমাছি (scout bee ও forager bee) থাকে। এরা ফুল থেকে পুষ্পরস ও পরাগ সংগ্রহ করে। এদের বয়স তিন সপ্তাহের বেশি। এর আগে এরা চাকের ভিতরে অন্যান্য কাজ—যেমন, চাক পরিষ্কার, শাবকদের যত্ন নেওয়া, রাণীর পরিচর্যা এসব করে। খাদ্য সংগ্রহকারী মৌমাছি ফিরে এলে সংগৃহীত পুষ্পরস অন্য মৌমাছিদের মধ্যে ভাগ করে দেয়। একটি শ্রমিক মৌমাছি একবারে 30 থেকে 40 মি.গ্রাম পুষ্পরস সংগ্রহ করে। এজন্য কমপক্ষে 1 থেকে 1000 ফুলে ভ্রমণ করতে হতে পারে। চাকে 1 কি.গ্রাম মধু জমা করতে শ্রমিক মৌমাছিদের 40,000 50,000 বার পর্যন্ত সংগ্রহ ভ্রমণে বের হতে হয়। যদি আরও ধরা হয়, যে প্রত্যেক মৌ কলোনীতে খাদ্য হিসাবে 75 থেকে 100 কিলোগ্রাম মধু প্রয়োজন এবং অতিরিক্ত 30 থেকে 40 কিলোগ্রাম মধু মৌপালকের সংগ্রহে জমা পড়ে, তাহলে এই পরিমাণ মধু সংগ্রহ করতে মৌমাছিদের 70 লক্ষ থেকে এককোটি বার চাক থেকে বের হতে হয়। এছাড়া পরাগ সংগ্রহের জন্য অন্ততঃ এর অর্ধেক বার বের হতে হয়।

মৌমাছির কাছে পরাগ রেণুর উপযোগিতা—একটি চাকে বছরে প্রায় 30 কি.গ্রা. পরাগরেণু সংগৃহীত হয়। এই পরাগরেণু শূককীট এবং শিশু মৌমাছিদের প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের উৎস। অনেক সময় এমন অনেক উদ্ভিদ থেকে পরাগরেণু সংগৃহীত হয়, যাদের ফুলে পুষ্পরস উৎপন্ন হয় না। ফুলের পরাগরেণুর খাদ্যগুণ বিভিন্ন প্রজাতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন হলেও সাধারণতঃ এর মধ্যে 7 থেকে 40 শতাংশ প্রোটিন, 1·5 থেকে 20 শতাংশ স্নেহজাতীয় পদার্থ, 7 থেকে 12 শতাংশ জল অঙ্গার, 2·8 থেকে 10·6 শতাংশ খনিজ লবণ এবং সামান্য পরিমাণে ভিটামিন, উৎসেচক ও হর্মোন পাওয়া যায়।

কৃষি ও ফলশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে পরাগ সংযোগের গুরুত্ব—আমরা জানি, ফুলের পুংকেশর ও গর্ভকেশর-এর মিলনে নিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হলে, তা থেকে বীজ উৎপন্ন হয়। কৃষি ফসল হিসাবে ব্যবহৃত উদ্ভিদগুলির নিষেকক্রিয়াকে তিন দলে বিভক্ত করা যায়—1. স্বনিষেক (self fertilisation), যাদের উভলিঙ্গ ফুলের—একই ফুলের পরাগ রেণু ঐ ফুলের ডিম্বাণুকে সার্থকভাবে নিষিক্ত করে সফল বীজ উৎপন্ন করে; 2. আংশিকভাবে স্বনিষেক উদ্ভিদ; 3. পরনিষেকী উদ্ভিদ (cross fertilisation) যাদের সার্থক বীজ উৎপাদনে একই প্রজাতির অন্য উদ্ভিদের বা অন্য ফুলের পরাগ দ্বারা ডিম্বাণু নিষিক্তকরণ। শেষোক্ত দুই দলের ক্ষেত্রে উদ্ভিদের ডিম্বাণু নিষেক পরনির্ভর।

মৌমাছির একটি বিশেষ গুণ হলো, যে ওরা যখন একটি বিশেষ ফুলে ভ্রমণ করে, তখন পাশের অন্য ফুলে যায় না। যেমন, সরিষার ক্ষেতে মৌমাছিরা যখন ভ্রমণ করবে, তখন অন্যান্য জাতের ফুলে মৌমাছি যাবে না, যতক্ষণ সরিষার উৎস থাকবে। এজন্য নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, পরাগ-সংযোগ ক্রিয়ার ক্ষেত্রে (পরনিষেকী) মৌমাছি সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মাধ্যম। এর জন্য কৃষিফলন যেমন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি যায়, বীজের মানেরও গুণগত বৃদ্ধি ঘটে। যেমন—সরিষার ক্ষেতের ধারে মৌ বাক্স রাখলে, ফলন শতকরা 60 ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। লেবুর ক্ষেত্রে 33%, সূর্যমুখী—200-250%, শসা—150-412%, তিসি—18-26%, তুলা—10-31%, চেরী—316%, আলফা-আলফা—119%।

সবধরণের কৃষি ফলন—যেমন, লঙ্কা, উচ্ছে, বেগুন, কলা,

ধনে, লাউ, কুমড়ো, জিরে বরবটি, ধুঁধুল শসা, সজনা, সবজাতের লেবু ও তেল ইত্যাদির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ফলন বৃদ্ধি ঘটে, যদি বাগানে মৌ বাক্স রাখা যায়। ফলের ক্ষেত্রে লিচু, আম, জাম, আপেল, কমলা, ন্যাসপাতি, পীচ, আলুবোখরা, চেরী, কাজু, সফেদা, ডালিম, আঁশফল, কামরাঙ্গা, নারকেল, পেয়ারা, জামরুল, তেঁতুল, আমড়া, অলিভ, গোলাপজাম ইত্যাদি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ফলন বৃদ্ধি যেমন সুনিশ্চিত, তেমনই প্রচুর মধু-র হবে।

মধু একটি উপাদেয় খাদ্য। ভারতবর্ষে বর্তমানে 500 থেকে 800 কোটি টাকার ভোজ্য তেল বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। উন্নত মৌ পালনের দ্বারা বাড়তি তেলের উৎপাদন ঘটিয়ে এই টাকার সাশ্রয় আমরা করতে পারি।

ক্যানসার সৃষ্টিতে হর্মোনের ভূমিকা

বিদ্যুৎকুমার মেদ্দা*

কোষ গঠনের স্বাভাবিক নিয়মের বিকৃতির ফলে দেহে ক্যানসারের সৃষ্টি হয়। কিন্তু কি কারণে এই বিকৃতির সূত্রপাত, তা এখনো চিকিৎসাবিজ্ঞানে অজানা রয়ে গেছে। অবশ্য নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে জানা গেছে যে ক্যানসার সৃষ্টিতে অনেকগুলি পদার্থ সহায়ক বা নিয়ামক হিসাবে কাজ করে। ক্যানসার সৃষ্টিকারী বস্তুগুলি দুই শ্রেণীর অন্তর্গত—দেহজ এবং বহিরাগত। অনেক ক্ষেত্রেই ক্যানসার উপাদক বস্তুটি দেহজ। কিন্তু মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে দেহজ ক্যানসার-উৎপাদক পদার্থটিকে সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে যৌন হর্মোনের সঙ্গে পুরুষের প্রোস্টেট গ্রন্থির ও নারীর স্তনের ক্যানসারের সম্পর্কের ইঙ্গিত নানা পরীক্ষায় ধরা পড়েছে। দ্বিতীয় বিভাগে পড়ে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ, অত্যধিক ধূমপান, এক্স-রে, তেজস্ক্রিয়তা প্রভৃতি। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ক্যানসার রোগকে প্রধানত দু-শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম শ্রেণীর ক্যানসারগুলি 'হর্মোন-নির্ভর' অর্থাৎ এধরণের ক্যানসারের বৃদ্ধি ও বিস্তারে হর্মোনের ভূমিকা থাকতে পারে। দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্যানসারে আপাতদৃষ্টে হর্মোনের কোন ভূমিকা ধরা পড়ে না।

1896 খৃস্টাব্দে বীটসন (Beatson) নামে এক বিজ্ঞানী তাঁর গবেষণাপত্রে 'হর্মোন-নির্ভর ক্যানসার' কথাটি ব্যবহার করেন। তিনি ঋতুবন্ধের পূর্বে ডিম্বাশয় (Ovary) কেটে বাদ দিয়ে নারীর স্তনে ক্যানসারের ক্রমবৃদ্ধি রোধে সক্ষম হন। 1916 খৃস্টাব্দে লিওলোয়েব (Leo-Loeb) ইস্ট্রোজেনের পৃথকীকরণের পূর্বে স্ত্রী-ইঁদুরের স্তনে ক্যানসারের আক্রমণ লক্ষ্য করেন। 1932 খৃস্টাব্দে বিজ্ঞানী লাকাশাগ্নি (Lacassagni) ইঁদুরের স্তনে ইস্ট্রোজেন ইন্‌জেকশন দিয়ে ক্যানসার সৃষ্টি করতে সক্ষম হন; ফলে প্রমাণ হয় যে ইস্ট্রোজেন হর্মোনটি ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে। 1940 খৃস্টাব্দে হিউগিনস (Huggins) প্রমান করেন যে শুক্রাশয় (Testis) কেটে বাদ দিলে প্রোস্টেট গ্রন্থির ক্যানসারের তীব্রতা কমানো যায়। অন্তঃস্রাবী (Endocrine) গ্রন্থির পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে পিটুইটারি, অ্যাড্রেন্যাল, ডিম্বাশয়, শুক্রাশয়, জরায়ু, ফুসফুস, লিমফয়েড অঙ্গ, যকৃত, প্রোস্টেট এবং ত্বকের নিয়োপ্লাস্টিক (Neoplastic) কোষবৃদ্ধি হতে দেখা যায়।

সুতরাং একশ্রেণীর ক্যানসার আছে যার উৎপত্তি ও বৃদ্ধিতে হর্মোনের ভূমিকা থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ থাইরয়েড কেটে বাদ দিলে থাইরোট্রাফিক পিটুইটারি গ্রন্থিতে থাইরোট্রফিক কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে টিউমারের উৎপত্তি হতে দেখা যায়। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে থাইরয়েড হর্মোন প্রয়োগে টিউমারটি ধীরে ধীরে একেবারে কমে যায়। মানুষের ক্ষেত্রে স্তন, জরায়ু, ডিম্বাশয়, প্রোস্টেট ইত্যাদি যে সব অঙ্গ হর্মোনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, সেগুলিতেই ক্যানসার রোগের প্রবণতা বেশী। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, ফিনল্যাণ্ড, ইসরাইল ও ভারতের কিছু অংশে নারীর স্তনে ক্যানসার বেশী হয়; দেখা যায় যে, বিবাহিতাদের চেয়ে অবিবাহিতা মেয়েদের মধ্যেই এ রোগের প্রকোপ বেশী এবং যে সব বিবাহিতা মহিলা এ রোগে আক্রান্ত হন, তাদের অনেকেই বাচ্চাদের স্তন্যপান করান নি।

অবশ্য পুরুষদের মধ্যেও খুব অল্প সংখ্যায় স্তনের ক্যানসার হতে দেখা যায়। Lacassagni-র পূর্বোক্ত পরীক্ষা থেকেই বোঝা যায় যে স্তনের ক্যানসারে ইস্ট্রোজেনের একটা বিশেষ ভূমিকা থাকার সম্ভাবনা। ইস্ট্রোজেনের প্রধান উৎস ডিম্বাশয়; এই গ্রন্থিকে অপসারণ করলে এই ক্যানসার বৃদ্ধি বা বিস্তার অন্ততঃ কিছুটা সীমিত করা যেতে পারে। বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে, ঋতু-বন্ধের পূর্বে নারীর স্তনে ক্যানসার হলে শতকরা 40টি রোগিণীর ক্ষেত্রেই ডিম্বাশয় অপসারণ করে ঐ ক্যানসারের বৃদ্ধি কয়েক বছর পর্যন্ত রোধ করা যায়, কিন্তু এইসব রোগিণীকে ইস্ট্রোজেন ইন্‌জেকশান দিলে স্তনের ক্যানসার

*শারীরবিদ্যা বিভাগ, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-9

আবার তীব্রতর আকার ধারণ করে। অবশ্য বাকী শতকরা 60 জন রোগিণীর ক্ষেত্রে ডিম্বাশয় অপসারণের পরেও বিশেষ কোন সুফল চোখে পড়ে না; হয়তো শেষোক্ত রোগিণীদের ক্ষেত্রে স্তনের ক্যানসারের বৃদ্ধি স্ত্রীযৌন হর্মোনের উপরে নির্ভর করে না অথবা এদের রোগ এমন এক পর্যায়ে পৌছেছে যখন ঐ হর্মোনের সম্বন্ধে এদের অভিযোজন নিবিড় হয়ে যাওয়ায় হর্মোনটির উপস্থিতি অথবা অনুপস্থিতি রোগ বৃদ্ধিকে বিশেষ প্রভাবিত করতে পারে না। ঋতু-বন্ধের পরেও ডিম্বাশয় অপসারণ করলে স্তনে ক্যানসারের বিস্তার কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, কিন্তু পদ্ধতিটির প্রভাব এসব ক্ষেত্রে বড় মন্থর, সেজন্য এর প্রয়োগ খুব কমই হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে ঋতুবন্ধের পরে ডিম্বাশয় থেকে হর্মোনের ক্ষরণ খুব কমে যায়, ফলে এইসব রোগিণীর রোগবৃদ্ধির প্রধান কারণ ডিম্বাশয় নয়। বস্তুতঃ ডিম্বাশয় অপসারণের ফলে যে সব রোগিণীর বিশেষ উন্নতি দেখা যায় না তাদের অ্যাড্রেন্যাল গ্রন্থিও কেটে বাদ দিলে রোগের তীব্রতা কমতে দেখা যায়। ঋতুবন্ধের পর রোগিণীর ডিম্বাশয় এবং অ্যাড্রেন্যাল উভয় গ্রন্থিই অপসারণের ফলে যে উন্নতি হয় তার মাত্রা ঋতুবন্ধের পূর্বে শুধুমাত্র ডিম্বাশয় অপসারণের ফলাফলের সঙ্গে প্রায় সমান। এইসব রোগিণীর শতকরা 60 জনের এক বছরের মধ্যে ক্যানসারের বিস্তার দেখা যায় না এবং গড়ে দুই বছর পর্যন্ত এদের সুস্থ থাকতে দেখা যায়। এদের ক্ষেত্রে অ্যাড্রেন্যাল কর্টেক্সই ইস্ট্রোজেনের প্রধান উৎস। স্তনের ক্যানসারের রোগিণীর ডিম্বাশয় এবং অ্যাড্রেন্যাল গ্রন্থি ছেদনের পরে পিটুইটারিও অপসারণ করলে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর উন্নতি দেখা যায় এবং এই চিকিৎসার ফলে শতকরা 90 জন রোগীই গড়ে প্রায় তিন বছর পর্যন্ত সুস্থ থাকে।

আগেই বলা হয়েছে, ডিম্বাশয় অপসারণের পরে রোগিণীকে ইস্ট্রোজেন ইনজেকশান দিলে ক্যানসারের আবার বিস্তার ঘটতে থাকে। কিন্তু পিটুইটারি অপসারণের পরে ইস্ট্রোজেন প্রয়োগে ক্যানসারের বিস্তার ও বৃদ্ধি দেখা যায় না। এ থেকে বলা যায়, পিটুইটারি না থাকলে ইস্ট্রোজেন ক্যানসারের বৃদ্ধি ঘটাতে পারে না। সম্ভবতঃ পিটুইটারি থেকে বা পিটুইটারির নিয়ন্ত্রণাধীনে উৎপন্ন কোনও বস্তুর সাহায্যেই ইস্ট্রোজেন ক্যানসারের তীব্রতা বাড়ায়। কিন্তু ইস্ট্রোজেনের এই কাজের সহায়ক বস্তুটির প্রকৃতি উৎস অথবা তার ক্রিয়াপদ্ধতি এখনও অজ্ঞাত।

কোন কোন ক্ষেত্রে ইস্ট্রোজেন এবং অ্যাণ্ড্রোজেন স্তনের ক্যানসারের তীব্রতাকে অস্থায়ীভাবে রোধ করতে সাহায্য করে, অবশ্য এবিষয়ে এদের কার্যকারিতা যৌনগ্রন্থি অপসারণের চেয়ে কম। এই যৌন হর্মোনগুলির প্রয়োগ ক্যানসারের বৃদ্ধি ও বিস্তারকে প্রশমিত করে, তা এখনও অস্পষ্ট। কিন্তু পিটুইটারি ছেদনের পরে এরা ক্যানসার বৃদ্ধিকে উত্তেজিত করে না, অথবা তার বিস্তারকে প্রতিরোধও করে না।

বর্তমানে স্তনের ক্যানসারের রোগিণীদের উপরে এ-টেস্টোলোল্যাকটোন (A-Testololactone) নামে টেস্টোস্টেরোন-ধর্মী রাসায়নিক প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া গেছে, অথচ ঐ বস্তুটির এর বাইরে হর্মোনের মত কোন ক্রিয়া নেই। কর্টিজোন (Cortison) এবং এ থেকে উৎপন্ন অনেক বস্তুও স্তনের ক্যানসারের চিকিৎসায় ফলপ্রসূ। অ্যাড্রেন্যাল, ডিম্বাশয় এবং পিটুইটারি কেটে ফেলার পরেও কর্টিজোনের ক্যানসার প্রতিরোধক ক্ষমতা নষ্ট হয় না অর্থাৎ টিউমারের উপরে হর্মোনটির প্রত্যক্ষ ক্রিয়া থাকার সম্ভাবনা আছে। স্তনে ক্যানসারের রোগী পুরুষদের মধ্যে অতি অল্প। এদের শতকরা 50 জনকে শুক্রাশয় অপসারণের দ্বারা দুই বছর পর্যন্ত সাময়িক সুস্থ রাখা সম্ভব; অ্যাড্রেন্যাল অথবা পিটুইটারি ছেদনেও ভাল ফল পাওয়া যায়। পুরুষদের প্রোস্টেট গ্রন্থিতে বেশি ক্যানসার হতে দেখা যায়। এইসব রোগীর শুক্রাশয় অপসারণের পরে ইস্ট্রোজেন ইনজেকশান দিলে শতকরা 90 জন রোগী সাময়িকভাবে সুস্থ হয়ে ওঠে; পিটুইটারি এবং অ্যাড্রেন্যাল ছেদনের ফলে এই রোগের আরও দ্রুত উপশম হয়। সম্প্রতি বেকার (Baker) দেখিয়েছেন যে, জরায়ুর কোন কোন ক্যানসারে প্রোজেস্টেরন প্রয়োগে অন্ততঃ শতকরা 50 জন রোগিণীকে কিছু দিনের জন্যে সুস্থ রাখা যায়।

সার্বিক বিচারে, স্তন, প্রোস্টেট জরায়ু প্রভৃতি অঙ্গের ক্যানসারে কয়েকটি হর্মোনের ভূমিকা এবং ক্যানসারের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে হর্মোনের প্রয়োগ কিছুদিন ধরেই পরীক্ষাধীন রয়েছে। ক্যানসার নিরাময়ের অন্যতম পদ্ধতি হিসেবে হর্মোন ব্যবহারের সম্ভাবনা বেশ উজ্জ্বল।

খাদ্য হিসাবে গোলাপ

এতদিন গোলাপ ছিল বাগানের শোভা, সৌন্দর্য পিয়াসী মনের খোরাক। আজ গোলাপ খাদ্যপ্রাণসমৃদ্ধ পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবেও চিহ্নিত। রাশিয়ার ল্যাটভিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস-এর উদ্ভিদ উদ্যানে ভিটামিন রোজ বা গোলাপের চাষ শুরু হয়েছে। এর বিশেষজ্ঞরা এমন গোলাপের জাত উদ্ভাবন করেছেন যা সুন্দর ফুল দেবে এবং পুষ্টিকর ফলও দেবে। এই ফলে থাকবে লেবুর চেয়ে 30 গুণ বেশী অ্যাসকরবিক অ্যাসিড।

[ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ]

ফসল উৎপাদনে অম্লমাটির ভূমিকা

কমল চক্রবর্তী*

যে মাটির পি. এইচ (pH—অম্ল বা ক্ষার গাঢ়ত্বের বিশেষ মাপ) মান সাতের কম, সে সব মাটিকে অম্লমাটি বলা হয়। মাটির এই অম্লতার জন্য তার কোলয়েড অংশই দায়ী। ভারতের প্রায় সব রাজ্যেই অম্লমাটির সন্ধান পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং বিহারের হাজারীবাগ, রাঁচি, সিংভূম জেলা, ও উড়িষ্যার কেওঞ্জর, ময়ূরভঞ্জ ও সুন্দরগড় জেলায় এই মাটি দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মহীশূর, বোম্বে ও কেরালার বিভিন্ন প্রান্তে এই মাটি পাওয়া যায়।

দেখা গেছে ভারতের কোন মাটির pH 4·5-এর কম নয়। মাটিতে মুক্ত অম্ল না থাকলে, pH-এর মান এর নীচে আসে না। বিভিন্ন কারণে মাটির একটি কণিকার চারপাশে বিচ্ছুরিত যুগ্মস্তর সৃষ্টি হয়। কাদা মাটিতে যে জল থাকে, তা কণিকার সংস্পর্শে আসে। কাদা কণিকায় থাকে ঋণাত্মক আয়ন আর জলে থাকে ধনাত্মক আয়ন। কাদা জলের মধ্যে যদি বাইরের থেকে তড়িৎবিশ্লেষ্য পদার্থ মেশান হয় তবে যুগ্মস্তরের বিস্তার হ্রাস পায়। তড়িৎবিশ্লেষ্য পদার্থের পরিমাণ বাড়লে আর একটি জিনিস দেখা যায় যে মাটির দ্রবণের pH মাটির উপরের pH-এর সঙ্গে সমান হতে থাকে। যে সব লবণ তড়িৎবিশ্লেষ্য হিসেবে কাদা মাটিতে থাকে, তার উপর ফসলের পরিমাণ নির্ভর করে। ফসল যখন খুব পরিমাণে বাড়ে তখন এই লবণের পরিমাণেরও পরিবর্তন ঘটে এবং তাতে মাটির pH মানও পরিবর্তিত হয়। মাটিতে জলের পরিমাণ যখন কমে যায় অর্থাৎ মাটি যখন প্রায় শুকনো হয় তখন মাটির pH কমে যায় অর্থাৎ মাটিতে অম্লতা দেখা দিতে পারে। যে সব ফসল অম্লতা সহ্য করতে পারে না, সেসব ফসল এ অবস্থায় ভাল বাড়তে পারে না। তাই মাটিকে সে সময় সর্বদা ভেজা রাখতে হয়।

মাটিতে অম্লতা প্রকাশ পায় কেন? এর কারণ হচ্ছে কোলয়েড কণার হাইড্রোজেন আয়ন। মাটির অম্লতাকে মোটামুটিভাবে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই বিভাগগুলি করেছেন বিজ্ঞানী কাপেন। (1) হাইড্রোজেন আয়নের পরিমাণ বেড়ে গেলে যে অম্লতার সৃষ্টি হয় তাকে সক্রিয় অম্লতা বলে। (2) প্রশম লবণ মাটিতে মিশে যদি অম্লতা প্রকাশ পায় তাকে 'বিনিময়জাত অম্লতা' বলে। (3) প্রশম লবণ বিশ্লেষিত হলে দ্রবণে অ্যালুমিনিয়াম চলে আসে এবং তখন তাকে লবণ বিশ্লেষণজাত অম্লতা বলে এবং (4) অনেক ক্ষেত্রে প্রশম লবণ অম্লতা প্রকাশ করতে পারে না, কিন্তু ক্ষারধর্মী লবণ মেশালে অম্লতা প্রকাশ পায়। একে আর্দ্রবিশ্লেষণজাত অম্লতা বলে।

অম্লতার সঙ্গে চাষাবাদের সম্পর্ক খুব নিবিড়। মাটির pH যত কম হয়, মাটির জলে দ্রবণীয় অ্যালুমিনিয়াম ও লোহার পরিমাণ তত বেড়ে যায়। মাটির ফসফেট আয়নের সঙ্গে এগুলি যুক্ত হয়ে সেগুলি ফসফেট আয়ন সৃষ্টি করে। সাধারণত ফসফেট যৌগগুলি 6·5 থেকে 7·5 pH-এর মধ্যে বিক্রিয়া করে। এর বাইরের pH মানে ফসফেট লবণগুলি অদ্রবণীয় হয়ে যায়। অনেক সময় মাটির থেকে সিলিকেট বা হাইড্রক্সিল আয়নগুলি বিভিন্ন কারণে ফসফেট দ্বারা স্থানচ্যুত হয়। ফসফেট এইভাবে মাটিতে স্থান পেলে উদ্ভিদ তা শোষণ করে নিতে পারে।

উদ্ভিদ মাটি থেকে খাদ্য নিতে পারে যদি নাইট্রোজেন বন্ধন ঠিকভাবে হয় এবং এই কাজের জন্য pH 6·5 থাকলে ভাল হয়। মাটির অম্লতা বাড়লে মাটিতে পটাসিয়ামের পরিমাণ কমে যায় অর্থাৎ pH 6-এর নীচে হলে পটাসিয়ামের পরিমাণ কমে যায়। তখন বাইরে থেকে পটাসিয়াম লবণ মেশান যেতে পারে। pH-এর মান কম হলে অর্থাৎ বেশী আম্লিক হলে পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের পরিমাণ কমে যায় কারণ বেশী আম্লিক দ্রবণে এগুলির ক্ষরণ বেশী। সুতরাং বেশী pH মানে এগুলি বেশী থাকে। কিন্তু pH-এর মান 8·5 এর বেশী হলে ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেসিয়াম গ্রহণযোগ্য হয় না কারণ মাটির কোলয়েড থেকে সোডিয়াম ও পটাসিয়াম এসে এগুলিকে সরিয়ে দেয়। pH 6·5-এর নীচে নামলে মাটির জলে ম্যাঙ্গানীজ বেশ দ্রবীভূত হয় কিন্তু খুব বেশী পরিমাণ গাছের পক্ষে ভাল নয় কারণ তখন তা বিষের কাজ করে। আবার 6·5-এর উপর pH হলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। pH 5-এর নীচে হলে অ্যালুমিনিয়াম মাটিতে বেশী পরিমাণে দ্রবীভূত এবং একটা নির্দিষ্ট মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে তা বিষের কাজ করে। এছাড়া আরও কয়েকটি মৌল মাটিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয় এবং সেগুলিও মাটির pH-এর উপর নিজস্ব পরিমাণ বাড়ায় বা কমায়। বোরন, ম্যাঙ্গানীজ, লোহা প্রভৃতি মৌল বেশী পরিমাণে মাটির জলে দ্রবীভূত হয় এবং এছাড়া কিছু কিছু জৈব পদার্থও সৃষ্টি হয়। সাধারণত তৃণজাতীয় উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ক্ষারকের প্রয়োজন হয়। কোন কোন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে অম্লতা বেশ ক্ষতিকর। মাটির অম্লতা বাড়লে নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের ঘাটতি হতে পারে এবং তাতে গাছের খাদ্যসংগ্রহে অসুবিধা হয়। অম্লতা মাপতে pH মিটারের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। নানারকম নির্দেশক ব্যবহার করেও মোটামুটি pH জানা যায়।

*সুরেন্দ্রনাথ সান্ধ্য কলেজ, কলিকাতা-9

যে সব উদ্ভিদ বেশী অম্লতা মানিয়ে নিতে পারে তাদের মধ্যে আছে তরমুজ, স্ট্রবেরি প্রভৃতি। যারা অম্লতা মোটামুটি মানিয়ে নিতে পারে তাদের মধ্যে আছে সয়াবীন, গম, ভুট্টা, বরবটি, বাদাম, শসা প্রভৃতি এবং যারা অম্লতা খুব কম সহ্য করতে পারে তাদের মধ্যে আছে বীট, বাঁধাকপি, ফুলকপি, পিঁয়াজ, বেগুন, পালং প্রভৃতি। pH 6 থেকে 8-এর মধ্যে যে সব ফসল প্রধানত হয় তাদের মধ্যে আছে বীট, কলা, সয়াবীন, বার্লি, নারিকেল আখ এবং 5 থেকে 7 pH-এর মধ্যে হয় তামাক, বাদাম, কার্পাস প্রভৃতি।

অম্লতাকে কমাতে প্রধানত চুন ব্যবহার করা হয়। এটি ব্যবহার করার পেছনে অনেক যুক্তি আছে। এটি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং তুলনামূলকভাবে দামে সস্তা। এর প্রশমন ক্ষমতাও ভাল এবং এটি মাটিতে ধীরে ধীরে কাজ করে। চুন আবার বিভিন্ন প্রকার হয়—(1) সিলিকেটজাতীয় চুন, (2) পোড়া চুন, (3) কলিচুন এবং (4) কার্বনেটজাতীয় চুন।

দাম, সক্রিয়তা, সরবরাহ, মাটির প্রকৃতি, ফসলের প্রকৃতি প্রভৃতি বিবেচনা করেই চুন ব্যবহার করা হয় এবং সর্বদিক বিবেচনা করে দেখা গেছে যে কার্বনেটজাতীয় চুন সব থেকে বেশী উপযোগী। নাইট্রোজেনঘটিত সারের সঙ্গে কোন কোন চুন মিশে নাইট্রোজেন মুক্ত করে, কিন্তু ক্যালসিয়াম কার্বনেট বা চুনাপাথর ব্যবহার করলে এ ধরণের বিক্রিয়া ঘটে না।

কোন্ জমিতে কি পরিমাণ চুন ব্যবহার করতে হবে তা নির্ভর করে কয়েকটি বিষয়ের উপর—যেমন (1) অন্তর্ভূমির অম্লতা, (2) অম্লতার মাত্রা (3) মাটির বাফার, (4) কোন্ ফসল চাষ করা হবে, (5) মাটির গ্রথন এবং (6) চুনের প্রকৃতি। সাধারণভাবে প্রতি একর জমিতে 2 থেকে 3 টন চুন দরকার হয়। চুনের পরিমাণ বেশী হলে মাটির জৈব পদার্থ নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং চুনের সঙ্গে প্রয়োজনবোধে কিছু জৈব পদার্থও মাটিতে প্রয়োগ করা হয়। সাধারণত মাটির pH 6·5-এর মত হলে 5 বছর পর আবার চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে। অনেকে চুন দু-দফায় প্রয়োগ করতে বলেন। অর্ধেক চুন চাষের আগে এবং বাকী চুন চাষের পরে। আবার অনেকে বলেন, ফসল বুনবার একবছর আগে চুন প্রয়োগ করা বেশী কার্যকর।

চুন প্রয়োগে কয়েকটি পরিবর্তন দেখা যায়—(1) ফসলের পরিমাণ বাড়ান যায়, (2) অম্লতা দূর হয়, (3) জৈব জাতীয় পদার্থ বিযোজিত হয়, (4) ক্যালসিয়ামের পরিমাণ বাড়ে এবং (5) প্রোটিন সংশ্লেষণ ও জলের সাশ্রয়ও সহজে হয়। এছাড়া কাণ্ডের শক্তিবৃদ্ধি, নাইট্রোজেন বিশোধন প্রভৃতি ক্যালসিয়ামের জন্য ঘটে।

চুন প্রয়োগে মাটির pH দ্রুত পরিবর্তন হতে পারে। এতে জীবাণুর সংখ্যা ও তৎপরতা দুই কমে যায়। এতে গাছের শেকড় তা সহ্য করতে পারে না এবং ফলে খাদ্য শোষণ গাছের পক্ষে সম্ভবপর হয় না আর তাতে ফসলের পরিমাণ কম হয়। বেশী চুন প্রয়োগে হিউমাসের নাইট্রোজেন মুক্ত হয়ে বায়ুতে চলে যায় এবং ফলে মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ কমে যায়। এইভাবে চুনের উপর অম্লতার মাত্রা নির্ভর করে এবং তার ভিত্তিতে ফসল উৎপাদনও পরিবর্তিত হয়।

শব্দোত্তর তরঙ্গের সাহায্যে রোগ নির্ণয়

বি. দে*

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন বহুবিধ আবিষ্কার যেমন মারাত্মক ছিল তেমনিই দৈনন্দিন জীবনে মানবোপকারী বহু কিছুও এসেছে মানুষের হাতে। 'র‍্যাডার' ও 'সোনার' যন্ত্রের মতো বহুবিধ শব্দোত্তর তরঙ্গের ব্যবহার প্রথমে এরোপ্লেনের উপস্থিতি, পরে সমুদ্রের গভীরে লুকিয়ে থাকা সাবমেরিন ও লুক্কায়িত পাহাড় ইত্যাদি নিরূপণে যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে। মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রোগ নির্ণয়েও এই শব্দোত্তর তরঙ্গ যথেষ্ট সুফল দিয়েছে। চিকিৎসাশাস্ত্রে শব্দোত্তর তরঙ্গের সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন ডুমিক ভ্রাতৃদ্বয় অস্ট্রিয়াতে 1937 খৃস্টাব্দে। তবে, এ প্রয়োগ দীর্ঘদিন পরীক্ষাগারেই সীমাবদ্ধ ছিল। 1957-তে আমেরিকার রেড এবং ওয়াল্ড সর্বপ্রথম দ্বি-মাত্রিক ছবিতোলার শব্দোত্তর ক্যামেরা আবিষ্কার করেন। বুক ও মলদ্বারের রোগ নির্ণয়ে ছবি তোলার জন্য এটা সাফল্যের সঙ্গে পরবর্তীকালে ব্যবহৃত হয়। রঞ্জেন রশ্মির সাহায্যে নির্ভরযোগ্য ছবি তোলার মতোই এই 'আলট্রাসোনিক স্ক্যানার' বা 'শব্দোত্তর ক্যামেরা' ব্যবহৃত হয়।

মূলনীতি—শব্দোত্তর তরঙ্গের সাহায্যে রোগ নির্ণয়ে মূলনীতি হলো কানে শোনা যায় এমন কম্পাঙ্কবিশিষ্ট শব্দের (সেকেণ্ডে 20,000) থেকে উচ্চ কম্পাঙ্কবিশিষ্ট শব্দতরঙ্গ মানবদেহে প্রবেশ করিয়ে তার প্রতিধ্বনি নথীভুক্ত করা। দেহকলার গঠনগুলির আভ্যন্তরীণ অংশের ছবি তোলার জন্য প্রতি সেকেণ্ডে এক থেকে 2·5 মিলিয়ন সাইকেল কম্পাঙ্কবিশিষ্ট শব্দতরঙ্গ ব্যবহার করা হয়। এই উচ্চ কম্পাঙ্কবিশিষ্ট শব্দ আলোক তরঙ্গের বহুবিধ গুণসম্পন্ন যার ফলে শব্দে বাধা দানে সক্ষম দেহাভ্যন্তরীণ অঙ্গন অংশ থেকে শব্দ প্রতিফলিত ও প্রতিসৃত হয়। শব্দোত্তর তরঙ্গ উৎসমুখ থেকে শঙ্কুর আকারে দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং 90° কোণে আপতিত এই শব্দোত্তর তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে পুনরায় উৎসস্থলে ফিরে আসে।

শব্দোত্তর তরঙ্গের চারটি গুণই একে রোগ নির্ণয়ের উপযুক্ততা এনে দিয়েছে। প্রথমতঃ দেহকলার মধ্য দিয়ে একটা নির্দিষ্ট দ্রুতিতে এটি প্রবাহিত হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ দুই বিভিন্ন শব্দগুণসম্পন্ন গঠনের সীমানায় আপতিত তরঙ্গাঘাতের কিছুটা প্রতিফলিত হয়ে প্রতিধ্বনির মতো প্রেরকযন্ত্রে ফিরে আসতে সক্ষম, আর বাকীটা প্রতিহত হয় ঐ দুই গঠনের সীমানার মধ্য দিয়ে। তৃতীয়তঃ প্রতিফলিত প্রতিধ্বনির নথীভুক্তকরণ ও তার বিশ্লেষণ সম্ভব। চতুর্থতঃ শব্দোত্তর তরঙ্গের দেহাভ্যন্তরস্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্য দিয়ে গমনাগমন রুগীর কোন রকম ক্ষতি করে না (যে মাত্রায় এটি ব্যবহার করা হয়)।

কৌশল—"শব্দাঘাত প্রতিধ্বনিত হওয়ার পদ্ধতি" আর "ডপ্‌লার ক্রিয়া পদ্ধতি" নামে দুই পদ্ধতি রোগ নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়। 'শব্দাঘাত' প্রতিধ্বনির ক্ষেত্রে যেসব যন্ত্র লাগে সেগুলো হলো—(1) একটি 'টাইমার' বা 'পালস জেনারেটর' যা থেকে শব্দোত্তর তরঙ্গ পাঠানো হয়, (2) 'ট্রান্সডিউসার' নামে 'পাইজো ইলেকট্রিক' ধাতুর এক প্রেরক ও গ্রাহক-যন্ত্র যা শব্দোত্তর তরঙ্গকে দেহাভ্যন্তরে পাঠিয়ে তার প্রতিধ্বনি সংগ্রহ করে, (3) একটি 'সিগন্যাল অ্যামপ্লিফায়ার' বা সংকেত বিবর্ধক ও (4) একটি 'ক্যাথোডেরে অসিলোস্কোপ' যা বিবর্ধিত সংকেতকে ধারণ করে প্রদর্শন করে। টাইমার থেকে প্রতি সেকেণ্ডে 200 থেকে 1000 ঘাতবিশিষ্ট বৈদ্যুতিক তরঙ্গ পাঠানো হয় 'ট্রান্সডিউসারে'। দেহসংলগ্ন 'ট্রান্সডিউসার' বৈদ্যুতিক তরঙ্গকে শব্দোত্তর তরঙ্গে রূপান্তরিত করে দেহের অভ্যন্তরে চালান করে। পালস জেনারেটর থেকে ঠিক যে সময়ে ট্রান্সডিউসারে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ পাঠানো হয় সেই সময়ে অসিলোস্কোপে একটি নির্দেশ পাঠানো হয় যা যন্ত্রটিতে একটি কম্পনের সৃষ্টি করে। নির্দিষ্ট সময়ান্তর শব্দোত্তর তরঙ্গ দেহাভ্যন্তরে পাঠানো হয় এবং এই সময়ের ব্যবধান প্রতিধ্বনি 'ট্রান্সডিউসারে' ফিরে আসে। ট্রান্সডিউসার শব্দোত্তর তরঙ্গের প্রতিধ্বনিকে বৈদ্যুতিক তরঙ্গে রূপান্তরিত করে ও অ্যাম্পলিফায়ারের মাধ্যমে বিবর্ধিত করে অসিলোস্কোপের পর্দায় ফুটিয়ে তোলে এক চিত্র।

কোন স্থির অঙ্গ থেকে শব্দোত্তর তরঙ্গের যে প্রতিধ্বনি আসে তার কম্পাঙ্ক প্রেরিত তরঙ্গের সমান হয়। সচল অঙ্গের ক্ষেত্রে তা হয় না। এক্ষেত্রেই ডপ্‌লার ক্রিয়ার ব্যবহার করতে হয়। এক্ষেত্রে প্রতিফলিত শব্দোত্তর তরঙ্গের কম্পাঙ্কের পরিবর্তন বিবর্ধিত ও নথিভূক্ত করা হয়। কোন রকম বিরতি না দিয়ে একনাগাড়ে শব্দোত্তর তরঙ্গ পাঠাতে হয় এক্ষেত্রে এবং ঐ কারণে প্রেরণ ও প্রতিফলিত শব্দ গ্রহণের জন্য দুটো 'ট্রান্সডিউসার' ব্যবহার করতে হয়।

প্রদর্শন—'এ' স্ক্যান ও 'বি' স্ক্যান বা চিত্র নামে দুই পদ্ধতিতে দেহাভ্যন্তরিস্থ অঙ্গের চিত্র 'অসিলোস্কোপে' প্রদর্শন করা যায়। 'এ' স্ক্যানে 'অসিলোস্কোপ' বিন্দুর উপরের দিকে এক প্রসারণ ঘটে যা নির্দেশ করে অ্যাম্পলিচুড বা প্রাবল্যকে। বেস লাইন বা নির্ণায়ক রেখ থেকে এর উচ্চতা প্রতিধ্বনির প্রাবল্যের সমানুপাতিক ; অর্থাৎ প্রাবল্যের মাত্রা নির্দেশক হলো এই দূরত্ব। নির্ণায়ক রেখ বরাবর চিহ্নের দূরত্ব ট্রান্সডিউসার থেকে প্রতিফলনকারী অঙ্গের দূরত্ব নির্দেশ করে।

'বি' স্ক্যানে অসিলোস্কোপের নির্ণায়ক রেখ বরাবর কতকগুলো

* 25/কে, ক্রিস্টোফার রোড, কলিকাতা-700 046

উজ্জ্বল বিন্দুর সমাহার নির্দেশ করে প্রতিধ্বনিকে এবং পরিমাপ করে 'ট্রান্সডিউসা'র থেকে প্রতিফলনকারী অঙ্গের দূরত্ব। বিন্দুগুলোর উজ্জ্বলতাই প্রতিধ্বনির প্রাবল্য নির্দেশ করে। সম্প্রতি 'এম' স্ক্যান নামে এক নতুন পদ্ধতি হৃদযন্ত্রের বিভিন্ন অংশের গতিবিধি নির্ণয়ণে ব্যবহৃত হচ্ছে। 'অসিলোস্কোপ' যন্ত্রের পর্দায় প্রতিফলিত প্রতিধ্বনির দরুণ সৃষ্টি হওয়া দোদুল্যমান কতকগুলো বিন্দুর ছবি তোলা হয় এই পদ্ধতিতে।

'অ্যানালগ কনভার্টার' নামে আর এক পদ্ধতিতে হৃদযন্ত্রের 'মিট্রাল ভাল্বে'র 'অ্যানটেরিয়র কাস্প' বা 'মিট্রাল ভাল্বে'রস সম্মুখবর্তী দাঁতের ন্যায় দুই অংশের সংযোগস্থলের ছবির সঙ্গে ইলেকট্রো-কার্ডিওগ্রাম, ফোনোকার্ডিওগ্রাম, অ্যাপেক্স কার্ডিওগ্রাম প্রভৃতির তুলনামূলক বিশ্লেষণও সম্ভব। এক সাম্প্রতিক আবিষ্কার হলো একাধিক 'ট্রান্সডিউসার' ব্যবহার করে হৃদযন্ত্রের বিশেষ অংশের গতিবিধি প্রদর্শন করা ও সিনেমাটোগ্রাফিক ফিল্মে তার ছবি তোলা।

প্রয়োগ—ঔষধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে শব্দোত্তর তরঙ্গের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। রুগীর দেহে নির্দিষ্ট মাত্রায় শব্দোত্তর তরঙ্গের প্রয়োগ কোন ক্ষতি করে না বলে রোগ নির্ণয়েও রয়েছে এর ব্যাপক প্রয়োগ। তা ছাড়া, রোগ নির্ণয়ে এর প্রয়োগে কোনরকম পূর্ব প্রস্তুতিরও দরকার হয় না। রেডিওলজি বা সাধারণ চিকিৎসা পদ্ধতিতে যখন কোন মাংসপিণ্ডের অস্তিত্ব পাওয়া যায় কিন্তু বোঝা যায় না তা' টিউমার, পুঁজ জমা কোষ কিংবা অন্য কোন তরল ধারক ক্ষত তখন এই শব্দোত্তর তরঙ্গের প্রয়োগই এনে দেয় এক নির্দিষ্ট নির্দেশিকা। মাংসপিণ্ড তরল পদার্থবাহী হলে শব্দোত্তর তরঙ্গের বেগ হবে শব্দের বেগের কিছু বেশী আর ক্ষতের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় খুব একটা কৃশকায় রূপ ধারণ করবে না এই তরঙ্গ গুচ্ছ। আর যদি মাংসপিণ্ড তরল পদার্থবাহী না হয় তা হলে বহু প্রতিধ্বনি ও প্রতিফলিত তরঙ্গ পাওয়া যাবে। এই পদ্ধতিতে ফুসফুস ও বক্ষ গহ্বরের সংযোগকারী ঝিল্লী এবং উদরের নির্দিষ্ট অংশ ও বস্তীর সংযোগকারী ঝিল্লীতে জমা তরল পদার্থের অস্তিত্বও নির্ণয় করা সম্ভব। শব্দোত্তর তরঙ্গ প্রয়োগকারী যন্ত্রকে ঠিকমতো ব্যবহার করে স্পর্শতল থেকে ক্ষতের গভীরতা ও ক্ষতের পরিমাণও নির্ণয় করা সম্ভব। ক্রমাগত চিত্রগ্রহণের মধ্য দিয়ে ক্ষত বাড়ছে না কমছে তাও বলা যায় অর্থাৎ ঔষধ প্রয়োগে ক্ষতের দিন দিন কি পরিমাণ উন্নতি বা অবনতি হচ্ছে তাও নির্ণয় করা সম্ভব এ পদ্ধতিতে। যে সব রোগী হৃদযন্ত্রের বাম দিকের মহাধমনীর অস্বাভাবিক বৃদ্ধিজনিত রোগে ভুগছে তাদের জন্য ঐ পদ্ধতি যথেষ্ট সহায়ক। কারণ, অন্য কোন পদ্ধতিতে এই রোগ নির্ণয় সম্ভব নয়।

'নিডল্ বায়োপ্সি' বা 'সূচের সাহায্যে রোগ নির্ণয়' পদ্ধতিতে দেহতল থেকে ক্ষতের গভীরতা ও ক্ষতের নির্দিষ্ট স্থান নির্ণয়ে এই পদ্ধতি যথেষ্ট সহায়ক।

ইকোকার্ডিওগ্রাফি—হৃদযন্ত্রের ক্ষত নির্ধারণে শব্দোত্তর তরঙ্গের ব্যবহারকে ইকোকার্ডিওগ্রাফি বলা হয়। হৃদযন্ত্রের বাম প্রকোষ্ঠ ও বাম নিলয়ের সংযোগকারী 'মিট্রাল ভাল্ব' হৃদযন্ত্রের সংকোচনের সময় খোলে। হৃদযন্ত্রের সংকোচনের শুরুতে এই ভাল্ব বন্ধ হয়ে বাম নিলয় থেকে বাম প্রকোষ্ঠে রক্তের পশ্চাদগতি রোধ করে। আর প্রসারণের শুরুতে এই ভাল্ব পুরোপুরি খুলে যায়। তবে, প্রথমদিকে এটা বন্ধ থাকে এবং পরবর্তী প্রকোষ্ঠের সংকোচন পর্যন্ত আধখোলা অবস্থায় থাকে। হৃদযন্ত্রের 'মিট্রাল ভাল্বে'র পুরোপুরি খোলা অবস্থা (ই) ও প্রসারণের (এফ) লেখচিত্র থেকে হৃদযন্ত্রের প্রসারণের সময়ে 'মিট্রল ভাল্বে'র আধখোলা অবস্থার বেগ নির্ণয় করা সম্ভব। রুগ্ন হৃদযন্ত্রে অবশ্যই অস্বাভাবিকতা ধরা যায়। মিট্রল ভাল্বের সম্মুখের ও পশ্চাতের দুই পত্রাকার অংশ যখন দুর্বল হয়ে পড়ে যার ফলস্বরূপ হৃদযন্ত্রের বহির্মুখ সরু হয়ে যায় তাকে বলে 'মিট্রাল স্টেনোসিস' রোগ। এই রোগের ফলস্বরূপ ভাল্বের বহির্মুখের পত্রাকার অংশের গতির প্রসারণ কমে যায়, ই-এফ লেখচিত্রের হ্রাস হয় এবং হৃদযন্ত্রের প্রসারণের সময় সম্মুখবর্তী পত্রাকার অংশের এক নির্দিষ্ট পূর্ববর্তী অবস্থা ধরে রাখা যায়। বাম প্রকোষ্ঠের মিক্সোমা রোগে বাম প্রকোষ্ঠের পেশীকলা থেকে উৎপন্ন হওয়া এক টিউমার মাঝে মাঝেই মিট্রাল বা 'প্রাচোর পাগড়ী' আকৃতির হৃদযন্ত্রের ভাল্বের বহির্মুখে বাধা দান করে। ভাল্বের সম্মুখবর্তী পত্রাকার অংশের পশ্চাৎ থেকে প্রতিফলিত হওয়া একাধিক প্রতিধ্বনির সাহায্যে ঐ অবস্থা নির্ণয় করা সম্ভব এবং মিট্রাল ভাল্বের এই বাধা প্রাপ্তির দরুণ 'ই-এফ' লেখচিত্রের হ্রাস ঘটতে পারে। ইডিওপ্যাথিক হাইপারট্রোফিক আর এ্যাওরটিক স্টেনোসিস হলো হৃদযন্ত্রের পেশীকলার ঘাত বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অবস্থা যা হৃদযন্ত্রের পেশীর স্বাভাবিক গতিকে বাধাদান করে। হৃদযন্ত্রের সংকোচনের সময় মিট্রাল ভাল্বের পত্রাকার অংশের সম্মুখদিকের গতির অস্বাভাবিকতা হলো এর বৈশিষ্ট্য। আবার হৃদযন্ত্রটি দুটি পর্দাবিশিষ্ট এক থলের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। এর নাম পেরিকারডিয়াম। হেতু বিজ্ঞানের বিশেষ পদ্ধতির দরুণ এই পর্দামধ্যস্থ ঝিল্লীর মধ্যে তরল পদার্থ জমা হতে পারে। এই অবস্থাকে বলা হয় পেরিকার্ডিয়াল এফুসন্। হৃদযন্ত্রের প্রসারণ বা বৃদ্ধি থেকে বুকের রেডিওগ্রাফ পদ্ধতিতে এই রোগের পার্থক্য নিরূপণ করা অসম্ভব। কারণ উভয় ক্ষেত্রেই রেডিওগ্রাফ পদ্ধতিতে হৃদযন্ত্রের বর্ধিত ছায়া পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে, ইকোকার্ডিওগ্রাফি বিশেষ সাহায্য করে। এই পদ্ধতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হৃদযন্ত্র ও সামনের দিবাকার বক্ষ-প্রাচীর এবং পশ্চাতের ফুসফুস থেকে আগত প্রতিধ্বনি হয় অবিচ্ছিন্ন। অর্থাৎ এই অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রাপ্ত প্রতিধ্বনি হৃদযন্ত্রের বৃদ্ধির দ্যোতক। অপর দিকে পেরিকার্ডিয়াল এফুসনে হৃদযন্ত্র থেকে আগত প্রতিধ্বনি বক্ষপ্রাচীর ও ফুসফুস থেকে হয় পৃথক। এ দুয়ের মধ্যে কিছু সময়ের ব্যবধান থাকে প্রতিধ্বনিতে।

এ ছাড়া ইকোকার্ডিওগ্রাম বিভিন্ন জন্মগত হৃদরোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বাম নিলয়ের আয়তন ও কার্য, বাম প্রকোষ্ঠের আকার ও

রক্ত জমাট বাধা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করে।

ইকোএনসেফালোগ্রাফি—মাথার খুলির মধ্যেকার রোগ নির্ণয়ে শব্দোত্তর তরঙ্গের ব্যবহারকে ইকোএনসেফালোগ্রাফি বলা হয়। স্বাভাবিক ইকোএনসেফেলোগ্রাফিতে তিন ধরণের প্রতিধ্বনির চিত্র পাওয়া যায়। 'নিয়ার সাইড গ্রুপ বা 'নিকটস্থ দল' প্রতিধ্বনিতে ট্রান্সডিউমারের কাছাকাছি মাথার খুলির অংশের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। খুলির বহিরাংশের বা দূরবর্তী অংশের প্রতিধ্বনি লক্ষ্যস্থল হতে 5 থেকে 7 মি. মি. দীর্ঘ প্রতিধ্বনির চিত্র দেয় এবং অভ্যন্তর অংশের প্রতিধ্বনি লক্ষ্যস্থল হতে 9 থেকে 14 মি. মি. দীর্ঘ প্রতিধ্বনির চিত্র দেয়। মিডলাইন কমপ্লেক্স চিত্রে মস্তিষ্কের তৃতীয় প্রকোষ্ঠের দুই দিক থেকে আগত প্রতিধ্বনিরই চিত্র দেয়। উপর ও নিম্নাংশের প্রতিধ্বনিচিত্রের মধ্যে ফারাক থাকে 2 মি. মি.। এই প্রতিধ্বনির প্রসারতা মস্তিষ্কের তৃতীয় প্রকোষ্ঠের আকার নির্দেশ করে। 'ফারসাইড গ্রুপ' বা 'দূরবর্তী দল' প্রতিধ্বনিতে মাথার খুলির বিপরীত দিককার ভিতরের অংশ, বহিরাংশ ও দূরবর্তী অংশের প্রত্যঙ্গের জোড় মুখের চিত্র পাওয়া যায়।

মাথায় আঘাত লাগলে রক্ত প্রায়শঃই খুলির মধ্যে জমাট বাঁধে। একে বলে খুলিমধ্যস্থ 'হিমাটোমা'। হিমাটোমার জায়গার কাছে খুলির অভ্যন্তর ভাগ থেকে প্রাপ্ত অস্বাভাবিক প্রতিধ্বনি ও মিডলাইন কমপ্লেক্স প্রতিধ্বনি চিত্রের সঙ্গে হিমাটোমার জায়গায় জমাট বাঁধা রক্তের মধ্য দিয়ে শব্দোত্তর তরঙ্গের অনগ্রসরতার দরুণ দুর্বল ও কষ্টসাধ্য মিডলাইনে প্রতিধ্বনি চিত্রের তুলনা করে ঐ রোগ নির্ণয় করা সম্ভব। টেন্টোরিয়াম সেরিবেলি নামে এক ঝিল্লীর সাহায্যে মস্তিষ্কের খুলিকে দুই অংশে ভাগ করা যায়। এই ঝিল্লীর উপরাংশকে সুপ্রাটেন-টোরিয়াল ও নিম্নাংশকে ইনফ্রাটেন্টোরিয়াল বলা হয়। মস্তিষ্কের সুপ্রাটেনটোরিয়াল অংশে টিউমার হলে মিডলাইন কমপ্লেক্স চিত্রে এক সরণ লক্ষ্য করা যায় যা এই রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে। আর অপটিক নার্ভের স্ফীতিজনিত রোগকে বলে "প্যাপিলী-ডিমা"। অন্য রোগের সঙ্গে এটি একটি মারাত্মক অশুভ সংকেত। অন্য কোন রোগ চিহ্ন ছাড়াই এই রোগ লক্ষণকে এই চিত্রে ধরা যায় এবং রোগীকে যথাসময়ে সাবধান করা যায়।

অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ—মূত্রাশয় সম্পর্কিত রোগ=শিরার মধ্য দিয়ে চালিত 'পাইলোগ্রাফ' পদ্ধতিতে কিডনীর ক্ষত নির্ধারণ করা যায়। তবে এটা মূত্রাশয়ের কোষের ক্যানসার না পুঁজ জমা কোষ তা বোঝা যায় না। তা ছাড়া ঐ পদ্ধতিতে উভয় কিডনীর যথাযথ আকার বোঝা যায় না এবং উভয়ে সমান পরিমাণে বিকশিত কি না তা বোঝা যায় না। শব্দোত্তর তরঙ্গের সাহায্যে এই পার্থক্য নিরূপণ করা যায়। মূত্রথলির টিউমার ও পুরুষের মূত্রনালীর চতুর্দিকের গ্রন্থির বৃদ্ধি (প্রোস্টেটগ্ল্যাণ্ডের অবস্থা) শব্দোত্তর তরঙ্গের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়।

যকৃতের রোগ='এ' ও 'বি' চিত্র গ্রহণ পদ্ধতিতে শব্দোত্তর তরঙ্গ ব্যবহার করে সঠিকভাবে সিরোসিস বা যকৃতের কলার অবক্ষয় ও বৃদ্ধিজনিত রোগ, হেপাটাইটিস বা যকৃতের প্রদাহ জনিত রোগ, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক অবস্থায় টিউমার, পুঁজ জমা ক্ষত, পুঁজ জমা কোষ প্রভৃতি নির্ণয় করা সম্ভব। গলব্লাডারের আকৃতি ও গলব্লাডারে জমা পাথর নির্ণয়ও শব্দোত্তর তরঙ্গের প্রয়োগে সম্ভব।

অগ্ন্যাশয়=অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসার ও পুঁজ জমা কোষ নির্ণয় সম্ভব এই পদ্ধতিতে।

উদরের মহাধমনীর রোগ=উদরের মধ্যস্থ গতিশীল মাংসপিণ্ড মহাধমনীর বৃদ্ধির দরুণ হয়েছে না মহাধমনীর উপরেই আলাদাভাবে রয়েছে তা নির্ণয়ে শব্দোত্তর তরঙ্গ সাহায্য করে। পর্যায়ক্রমিক ছবি তুলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মাংসপিণ্ডের আকার ক্রমশঃ বাড়ছে কিনা তাও নির্ণয় করা সম্ভব। রসায়নাগার পরীক্ষা পদ্ধতি, জৈব রসায়ন পদ্ধতি, হিমাটোলজি এবং রেডিওলজি ও আইসোটোপ দিয়ে পরীক্ষা প্রভৃতির সঙ্গে শব্দোত্তর তরঙ্গের পরীক্ষা অনেক ক্ষেত্রে নিখুঁত রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে এবং সত্বর সঠিক চিকিৎসার পথ নির্দেশ করে।

মাথা কেন ধরে ?

অরুণ চন্দ্র*

মাথা ধরা কি অদ্ভুত তাই না, তার যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতিও মনে রাখার মত। এজন্যই স্বভাবত মনে প্রশ্ন জাগতে পারে 'মাথা কেন ধরে?'

এই বিশাল বৈচিত্র্যময় পৃথিবীর বুকে সুসভ্য মানুষ আজ বহু অত্যাধুনিক যন্ত্র নির্মাণ করেছে, কিন্তু মানব যন্ত্রের মত এত আশ্চর্য যন্ত্র বোধ হয় আর নাই। সেই মহান মানব যন্ত্রের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান অংশটি হলো মস্তিষ্ক বা ব্রেন (Brain)।

আচ্ছা, এবার যদি আমি একটা ছোট্টকথা জিজ্ঞাসা করি তাহলে অবশ্যই তোমরা হাসবে। বলবে এটা আবার প্রশ্ন হলো? 'রিপোর্টার কাকে বলে?'—কোথাও কোন ঘটনা ঘটলে এরা আমাদের সেগুলি খবরের কাগজ, রেডিও, টি. ভি. ইত্যাদি অফিসে সরবরাহ করে জানতে সাহায্য করে। এই রিপোর্টাররা আবার নানা ধরণের যেমন কেউ খেলার, কেউ সিনেমার, রাজনীতির খবর সংগ্রহ করে। জান, এই ধরণের রিপোর্টার আমাদের দেহেও আছে তাদেরকে আমরা রিসেপটার বা গ্রাহক কোষ (Receptor) বলি, এদের কাজও ঠিক ওদের মত, দেহের খবর সংগ্রহ করা। তাহলে, রিসেপটর এক ধরণের বিশেষভাবে গঠিত জ্ঞান ইন্দ্রিয়, যার মধ্যে সংজ্ঞা বা sense বহনকারী স্নায়ুতন্তুর প্রান্তগুলি মুক্ত বা সীমাবদ্ধ অবস্থায় থাকে। দেহে বিভিন্ন ধরণের গ্রাহক কোষ বা রিসেপটর আছে, তারা দেহের নানা উদ্দীপনা গ্রহণ করে। যেমন যে গ্রাহক কোষটি স্পর্শানুভূতি গ্রহণ করে তাকে মার্কেল ডিস্ক (Merkel's disc) বলে। আবার ক্রাউজ-এর প্রান্ত স্ফীতি বলে একটা রিসেপটার ঠাণ্ডা অনুভূতি উদ্রেক করে। আর আমাদের দেহের যন্ত্রণানুভূতি যে গ্রাহক কোষটির দ্বারা গৃহীত হয় তার নাম মুক্ত নার্ভ প্রান্ত (Free nerve ending)। এই বিভিন্ন উদ্দীপনাগুলি আবার স্নায়ুকোষের মস্তিষ্কে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে (Central nervous system) পৌঁছায়।

মাথাযন্ত্রণার ক্ষেত্রে স্নায়ুতন্ত্রের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেহের সঙ্গে বহির্জগতের সকল সংবেদনগুলি (Sensation) আমাদের দেহের স্নায়ুগুলির মাধ্যমে গৃহীত হয়ে সমন্বয় সাধন, বিভিন্ন প্রকার উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া, দেহের ভারসাম্য রক্ষা, দেহের অংশের মধ্যে সংযোগ রক্ষা, তাদের কার্যের মধ্যে সমন্বয়সাধন, বিভিন্ন প্রকার উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া, দেহের ভারসাম্য রক্ষা প্রভৃতি কার্যে সহায়তা করে এই স্নায়ুতন্ত্র।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের স্নায়ুতন্ত্রকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। একটা হলো কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র, অপরটা প্রান্তস্থ স্নায়ুতন্ত্র,
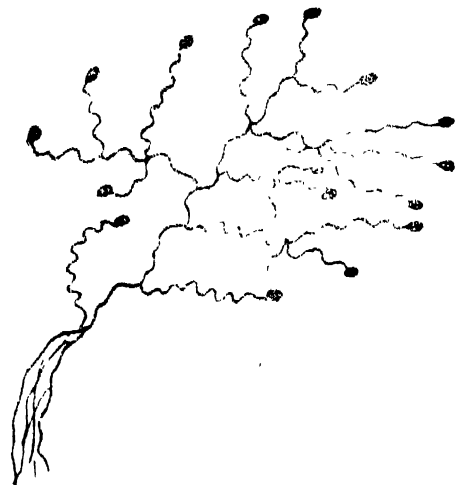
যন্ত্রণা গ্রহণকারী গ্রাহক কোষ (মুক্ত নার্ভ প্রান্ত)

(Peripheral nervous system)। এই প্রবন্ধটিতে আমাদের প্রান্তস্থ স্নায়ুতন্ত্রের ভূমিকাই মূলতঃ বেশী তাই কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সবিশেষ উল্লেখ করলাম না।

এই প্রান্তস্থ স্নায়ুতন্ত্রে সর্বমোট 43 জোড়া স্নায়ু আছে, তার মধ্যে 12 জোড়া স্নায়ুকে বলে করোটি স্নায়ু (Cranial nerves) আর বাকী 31 জোড়া হলো সুষুম্না স্নায়ু। আমাদের যে 12 জোড়া করোটি স্নায়ু আছে তার পঞ্চমটির নাম ট্রাইজেমিনাল নার্ভ (Trigeminal nerve)। এই নার্ভটি পনস্ থেকে সৃষ্টি হয় এবং মুখমণ্ডল, মুখবিবর, নাসিকা ও মস্তকের শীর্ষভাগ

* 45/2, শশীভূষণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-12

প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকে। এটি একটি সংজ্ঞা বহনকারী নার্ভ।

পূর্বেই বলেছি আমাদের 31 জোড়া সুষুম্না স্নায়ু আছে। এর মধ্যে 8 জোড়া রয়েছে গ্রীবা স্নায়ু। এই গ্রীবা স্নায়ুর মধ্যে 2য় গ্রীবা স্নায়ুটি একটি শিরঃপীড়া সৃষ্টিকারী স্নায়ু। এটি কানের পিছনের করোটি ত্বকে ছড়িয়ে থাকে।

বিভিন্ন উৎস থেকে আমাদের মাথা ধরতে পারে যেমন করোটি (Brain box) থেকে, চোখের গোলযোগে, নাসিকা
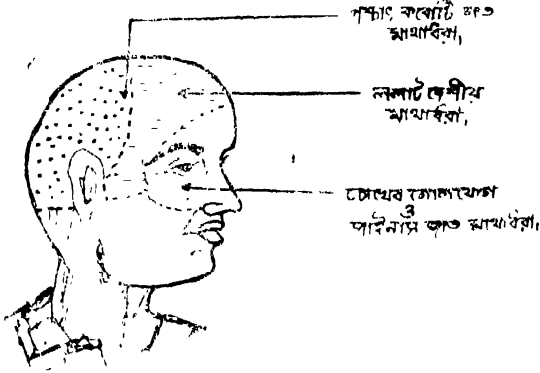
মাথা ধরার উৎস ও অঞ্চল

থেকে, রক্তচাপ বৃদ্ধির ফলে ইত্যাদি করোটিজাত মাথা ধরার ক্ষেত্রে এই ট্রাইজেমিনাল নার্ভটি ও দ্বিতীয় গ্রীবা স্নায়ুটির খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

আমাদের দেহে বিভিন্ন ধরণের যন্ত্রণার অনুভূতি হয়। তাদেরকে আমরা নানা নামে প্রকাশ করি যেমন তীক্ষ্ণ খোঁচা, হুল ফোঁটা, জ্বালা করা প্রভৃতি। এগুলি ছাড়াও আর এক ধরণের যন্ত্রণার স্থানটিতে যন্ত্রণার সাড়া না জেগে অন্য স্থানে তা প্রকাশ পায়। এই ধরণের যন্ত্রণাকে আরোপিত যন্ত্রণা (Referred Pain) বলে।

মাথাধরা প্রধানত এই ধরণের যন্ত্রণা। বেশ কিছু মাথা ধরার কারণ আমাদের ব্রেন বক্স বা করোটির অন্তর্দেশ থেকেই হয়, তারপর সেই যন্ত্রণা মাথার উপরের অংশে আরোপিত হয়। এই করোটিজাত মাথাধরা আবার করোটির বিভিন্ন অংশ থেকে হয় যেমন ললাটে বা কপালের অংশে, মাথার পশ্চাৎভাগে, চোখ ও নাকের অংশে ইত্যাদি।

আমাদের মস্তিষ্কের উপরের অংশে আন্তর করোটি আবরক বা টেনটোরিয়াম (Tentorium) বলে একটি অংশ আছে। সেই টেনটোরিয়াম উপরে আন্তর করোটি স্থানে কতগুলি যন্ত্রণানুভূতি গ্রহণকারী গ্রাহক কোষ আছে। এখন কোন কারণে যদি এই গ্রাহক কোষগুলি উত্তেজিত হয়, তবে আমাদের পঞ্চম করোটি স্নায়ু অর্থাৎ ট্রাইজেমিনাল নার্ভটি সেই উত্তেজনায় স্পন্দিত হয় এবং স্পন্দন এই নার্ভ দ্বারা বাহিত হয়ে, কানের সামনে অবস্থিত মস্তক অংশে উপস্থিত হয় ও ললাট বা কপালে মাথা ধরার সৃষ্টি করে।

আবার টেনটোরিয়াম-এর নীচে অঞ্চল থেকে যে যন্ত্রণা প্রবাহের বা উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তা দ্বিতীয় গ্রীবা স্নায়ুর দ্বারা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে প্রবেশ করে। এই উদ্দীপনা বা যন্ত্রণা প্রবাহ যখন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে পৌঁছায় তখন তা করোটির পশ্চাৎ অংশে মাথা ধরার উদ্রেক করে।

আমাদের আন্তঃকরোটি থেকে যে সকল মাথা ধরার উৎপত্তি হয় তার কারণগুলিও বিচিত্র। আমি দু-একজনের কথা আলোচনা করছি। এরা হলেন মাথা যন্ত্রণার শিকার। আমার এক বন্ধু অনুপ, চৌকস্ ফুটবলার, স্কুলে সবাই তাকে এক ডাকে চিনত। সেবার ফাইনাল পরীক্ষার আগে ও ঘোর অসুখে পড়ল। শরীরের প্রতি অনুপ অনিয়ম করত খুব। ডাক্তারেরা বললেন মেনিনজাইটিস্। প্রায় তিন মাস ভুগে ও একটু সুস্থ হলো। কিন্তু অসুখের মাস কয়েক পর থেকে দেখা দিয়েছে নতুন উপসর্গ মাথার যন্ত্রণা।

অপর ব্যক্তিটিও আমার খুবই পরিচিত, নরেন পালিত শহরের নামকরা কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মালিক, প্রচণ্ড রাশভারী ভদ্রলোক, বেশ রাগীও। হাইব্লাড প্রেসারের রোগী, মাঝে মধ্যে মাথার যন্ত্রণায় বাড়ীর সকলকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন।

এগুলি তো খুবই সাধারণ, এ ছাড়াও অনেকে বিভিন্নভাবে মাথা ধরায় ভুগে থাকেন, প্রথমে অনুপের যে মাথাধরার কথা বলেছিলাম, সেটার কারণ কি ? কারণ হলো সে যখন দীর্ঘ তিন মাস ধরে মেনিনজাইটিসে ভুগেছিল তখন বোধ হয় তার মস্তিষ্কঝিল্লীতে (Meninges) কোন রকম ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল কারণ মেনিনজাইটিস হচ্ছে মস্তিষ্কঝিল্লীর প্রদাহজনিত রোগ এবং তার ফলেই এই মাথাযন্ত্রণার সৃষ্টি। আর তার পরের ঘটনাটি তো বেশ কিছু হাইব্লাডপ্রেসার রোগীদের মধ্যেই দেখা যায়। নরেনবাবু হাইব্লাডপ্রেসারের রোগী তাই এই উচ্চ রক্তচাপই সৃষ্টি করে বিষম যন্ত্রণাদায়ক শিরঃপীড়ার। দেখলে তো আমাদের কতভাবে নানা কারণে মাথা ধরে।

এইসকল কারণ ছাড়াও, দীর্ঘদিন ধরে কোষ্ঠবদ্ধতার ফলে অনেক সময় মাথা ধরে। কারণ সেই সময় পৌষ্টিকনালীর প্রাচীর গাত্র থেকে প্লাজ্‌মা নির্গত হয়। যেটা মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহ হ্রাস করে এবং রক্তপ্রবাহের সেই অনিয়মতার দরুণ সৃষ্টি হয় মাথার যন্ত্রণার। অনেক সময় মস্তিষ্ক মেরুরস (cerebrospinal fluid)-এর চাপ বৃদ্ধি পেলেও তীব্র মাথাযন্ত্রণা দেখা যায়।

এগুলো তো গেল করোটি থেকে সৃষ্ট মাথাধরার কথা। আমরা খানিক নিজের দোষে আর খানিক প্রকৃতির অনুগ্রহে মাথাযন্ত্রণার সৃষ্টি করি। যেমন, ধরো এই প্রচণ্ড গরমে রোদে ঘুরে বেশ ভাল করে সর্দি বাধালে আর সেই সর্দি থেকে সৃষ্টি হলো সাইনাসের (Sinous), অথবা হয়ত এমন কিছু করলে যেটা প্রচণ্ড মানসিক উত্তেজনার সৃষ্টি করল বা চোখের গোলমাল।

অনেক সময় দৃশ্য বস্তুকে স্পষ্টভাবে না দেখতে পেলে খুব

বেশী পরিমাণ, চোখে অতিবেগুনী রশ্মি পড়লে মাথাযন্ত্রণার সৃষ্টি হয় অথবা একদৃষ্টিতে কোনকিছুর দিকে তাকিয়ে রইলে।

সেক্ষেত্রে, দৃশ্যবস্তুকে স্পষ্টভাবে দেখার জন্য আমাদের চোখের সিলিয়ারী পেশীকে অত্যধিক সংকুচিত হতে হয় এবং দীর্ঘসময় ধরে তা ঘটলে পেশী টানের সৃষ্টি হয় যা মাথাযন্ত্রণার উদ্রেক করে।

অন্যধারে, অতিরিক্ত পরিমাণ অতিবেগুনী রশ্মি অনেকক্ষণ চোখে পড়ার ফলে অক্ষিপট (Retina) পুড়ে যেতে পারে যা মাথাযন্ত্রণা ঘটায়।

আমরা যখন একদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরে কোন বস্তুর দিকে তাকিয়ে থাকি তখন দুটো চোখকে একই ভাবে ফোকাশ করার জন্য এক বা একের অধিক একস্ট্রাওকিউলার পেশীকে অবিরাম কাজ করতে হয় এবং এই কাজের পরিমাণ যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তখন সে ছেড়ে কথা বলে না, মাথার যন্ত্রণা ঘটিয়ে তার শোধ নেয়।

এবার সাইনাসঘটিত মাথাধরায় ফিরে আসি। অনেক সময় নাসিকার অতিরিক্ত সর্দির ফলে করোটির প্রাচীর অভ্যন্তরে যে বায়ুময় কোষগুলি থাকে সেখানে সর্দির আক্রমণ, ঘটলে যাকে আমরা সাইনাইটিস বলি, তার ফলে তীব্র যন্ত্রণাদায়ক মাথাবেদনার সৃষ্টি হতে পারে।

এই ধরণের শারীরিক বিভিন্ন কারণগুলি ছাড়াও দেহের বাইরে মানে বিশ্ব-প্রকৃতিতে নীরবে অথবা সরবে বহু ঘটনা ঘটছে। কোন কোন সময়ে তার ঢেউ এসে লাগলে আমরাও ব্যতিব্যস্ত হতে পারি। যেমন দৈনন্দিন জীবনে আমরা এমন সব ঘটনা বা পরিবেশে পড়ে যায় যা দেহে প্রচুর উত্তেজনা বা আবেগের সৃষ্টি করতে পারে সেটা অনেক সময় সৃষ্টি করে মাথা ধরার।

মাথা ধরল অসহ্য যন্ত্রণা, মাথা যেন ছিঁড়ে পড়তে চাইছে। বাড়িতে এ-ধরনের যন্ত্রণা নিবারণকারী ট্যাবলেট কিছু রাখাই থাকে। হাপুস করে জল সহযোগে মুখে পুরে দিলাম। ওঃ, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। কিন্তু এই ক্ষণিকের নিশ্চিন্তি বা আরামই কি শেষ কথা। এর সুদূরপ্রসারী ফলের কথা কি আমরা ভাবি।

আগেই বলেছি যে, এটা স্নায়ুর উদ্দীপনাজাত অসুখ। ওষুধের ক্রিয়া মাথাধরা সৃষ্টিকারী স্নায়ুগুলিকে ধীরে ধীরে সাময়িক অবশ করে, উদ্দীপনা হ্রাস করে আমরা আরাম পাই। কিন্তু এই ভাবে ক্রমাগত আমরা যদি মাথাধরার ওষুধ খাই হয়ত একদিন স্নায়ুগুলির স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা নষ্ট হতে পারে।

অনেক সময় এমনও হয় ওষুধের কার্যকারী গুণ সঙ্কুচিত রক্তনালিকাগুলিকে (Blood vessel) স্ফীত করে দেয় এবং রক্তপ্রবাহ (Circulation) স্বাভাবিক করে। রক্তনালীর এই সংকোচন ও প্রসারণ ঐ প্রত্যঙ্গগুলির যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করতে পারে।

তাই মাথা ধরলে মুড়ি-মুড়কীর মত ওষুধ না খেয়ে যতটা সম্ভব দেহের স্নায়ুগুলিকে বিশ্রাম নেবার অবকাশ দিলে ক্ষতি কি ? চোখ বুঁজে উদ্বেগ শূন্যভাবে নিজে ও স্নায়ুগুলিকে বিশ্রাম নিতে দেও বা নিদ্রার সাধনা করে দেখ না কি হয়।

কচুরীপানা

শিবনাথ খাঁ*

কচুরিপানাকে পূর্বে অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয় জলজ আগাছা বলে মনে করা হতো। একমাত্র সার এবং গরু-মহিষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা ছাড়া এর আর কোন ব্যবহার মানুষ জানতো না। শুধু তাই নয় মশা ও অন্যান্য শস্যহানিকর কয়েকটি কীট-পতঙ্গের জন্মস্থল হলো কচুরীপানাসমৃদ্ধ পুকুর, সেইজন্যে এদের সমূলে উচ্ছেদ করার চেষ্টা মানুষ করতো। কিন্তু, বর্তমানে শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা দেখা গেছে। কচুরিপানা থেকে জৈব গ্যাস পাওয়া যায়। এই জৈব গ্যাসের মূল উপাদান হল মিথেন। এই মিথেন গ্যাসই কচুরি পানা থেকে প্রাপ্ত শক্তির মূল উৎস।

কচুরিপানা উষ্ণ অঞ্চলে জন্মায়। সেইজন্যে পৃথিবীর সর্বত্র উষ্ণ অঞ্চলে কচুরিপানার অবস্থান। এর চাষের জন্যে সর্বোত্তম (optimum) তাপমাত্রা হলো 28°C-30°C, কিন্তু 20°C-35°C তাপমাত্রার সীমার মধ্যে এর বৃদ্ধি ভালই হয়। মিষ্টি জল ও গৃহস্থের আবর্জনাসমৃদ্ধ পুকুরে, খাল, বিল, ডোবা, নদ-নদী, হ্রদ এমনকি ধানজমিতেও এটি জন্মায়। এর বৃদ্ধি অত্যন্ত দ্রুত হয়। 8-10 দিনের মধ্যে এর বৃদ্ধি দ্বিগুণিত হয়। খুব সম্ভবতঃ বঙ্গদেশে এটি 1888 খৃস্টাব্দে আসে। একটি সমীক্ষায় জানা গেছে যে, বর্তমানে বিহারের অন্ততঃ 2 লক্ষ এবং পশ্চিমবঙ্গের 30 হাজার একর জমি কচুরিপানার দখলে।

কচুরিপানা থেকে প্রাপ্ত জৈবগ্যাস প্রাকৃতিক গ্যাসের বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে এবং হচ্ছে। কচুরিপানা খুব দ্রুতহারে পচে যায়। গ্রীষ্মকালে ও শীতকালে এর পচনের জন্যে সময় লাগে যথাক্রমে 3 দিন ও 4 দিন। পচনকালে মিথেন উৎপন্নকারী ব্যাকটিরিয়া সাহায্য করে। এই ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যেই জৈবগ্যাস উৎপন্ন হয়।

ফ্লোরিডার ন্যাশানাল স্পেস টেক্নোলজি ল্যাবরেটরীর বিজ্ঞানিগণ দেখিয়েছেন যে, এক কে.জি. শুষ্ক কচুরিপানা থেকে 374 লিটার জৈবগ্যাস পাওয়া যায়। এই জৈব গ্যাসের শতকরা ষাট থেকে আশি ভাগই মিথেন। কচুরিপানা থেকে উদ্ভূত এই গ্যাসের তাপন মূল্য প্রতি ঘনমিটারে (cu. metre) 5000 কিলো-ক্যালরি। এক হেক্টর জমি থেকে যে পরিমাণ কচুরিপানা পাওয়া যায় তা থেকে 70,000 ঘন-মিটারেরও বেশি জৈব গ্যাস পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে জৈবগ্যাসের জন্য কচুরিপানার প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। দুর্গাপুরের (পশ্চিমবঙ্গ) সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এ কচুরিপানা থেকে অবিরাম দাহ্য গ্যাস উৎপন্ন করার জন্যে কার্যকর একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থার কাঠামো গঠন করা হয়েছে। এর দৈনিক গ্যাস উৎপাদনের ক্ষমতা 3 ঘনমিটার। এর জন্যে প্রথমেই 1800 কিলোগ্রাম অর্ধ-শুষ্ক বড় বড় টুকরা করা কচুরিপানার প্রয়োজন। প্রতিদিন 3 ঘন মিটার জৈবগ্যাস পাওয়ার জন্যে 20তম দিনের পর থেকে প্রতিদিন 40 কিলোগ্রাম কচুরিপানা ঐ যন্ত্রে যোগ করা প্রয়োজন। এই গ্যাসের তাপমূল্য হলো প্রতি ঘনমিটারে 4895-5162 কিলোক্যালরি। ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (মাদ্রাজ), জোড়হাটের রিজিওনাল রিসার্চ ল্যাবরেটরী ও হিসারের এইচ. এ. ইউ (HAU)-তে এই ধরনের আরো গবেষণা হচ্ছে। ভারতবর্ষে কচুরিপানা থেকে বছরে $1{\cdot}334\times10^9$ কিলোক্যালরি শক্তি ও তার সঙ্গে উপরি লাভ হিসাবে কম্পোস্ট সার (যার মূল্য প্রায় 22·5 লক্ষ টাকা) পাওয়া যেতে পারে।

এই গ্যাসের সাহায্যে সরাসরি রান্না, আলো জ্বালান ইত্যাদি করা যায়। কার্বন ডাই-অক্সাইড অপসারণের পর প্রাপ্ত গ্যাসটি ইঞ্জিন, ট্র্যাক্টর ও অন্যান্য গাড়ীর জ্বালানী হিসাবেও ব্যবহৃত হতে পারে।

ভারতবর্ষে কচুরিপানার চাষের সম্ভাবনা যথেষ্ট উজ্জ্বল। বর্তমানে, বিশেষতঃ এই শক্তি সঙ্কটের যুগে যখন পেট্রোল ও কয়লার পরিমাণ ধীরে ধীরে নিঃশেষ হতে চলেছে সেই শক্তি সমস্যার সমাধানে কচুরিপানা সংক্রান্ত আরো ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন।

* 39, চাত্রা বারুইপাড়া লেন, শ্রীরামপুর, হুগলী—712201

নেকড়ে-মাকড়সা

নারায়ণ চক্রবর্তী*

নেকড়ে-মাকড়সারাও এক বিচিত্র প্রাণী। এরা অন্যান্য প্রজাতির মাকড়সাদের মতো সূক্ষ্ম জাল বুনে শিকার ধরে খায় না, এরা নেকড়ের মতোই মাংসাশী এবং নেকড়ের মতোই ছুটে গিয়ে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অবশ্য নেকড়ে-মাকড়সাদের ভেতরেও এমন কয়েকটি প্রজাতি আছে, যারা তাদের নিজেদের খোঁড়া গর্তের বাসার চারপাশে সূক্ষ্ম সিল্কের মতো জাল বুনে রাখে, অথবা সিল্কের ফাঁপা নল বানায়, যার ভেতর থেকে হঠাৎ অতর্কিতে কাছে-আসা শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই জাল অবশ্য শিকার-ধরা ফাঁদ নয়।

নেকড়ে-মাকড়সারা খুব ক্ষুদেও হয় আকারে, আবার মাঝারি আকারেরও হয়। সবচেয়ে বড় নেকড়ে-মাকড়সাদের শরীর এক ইঞ্চিরও কম, আটটি পা প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা এবং রঙ কালো অথবা নিষ্প্রভ ধূসর হয়। সারা শরীর ঢাকা থাকে শক্ত, খাড়া রোমে। ওদের চোয়াল বেশ মজবুত ও শক্তিশালী। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, নেকড়ে-মাকড়সাদের মাথায় তিন সারি চোখ আছে আর চারটে ছোট ছোট চোখ আছে সামনের দিকে চোয়ালের মূলদেশের ঠিক ওপরে। পর পর দুটি সারিতে যে দুটি বড় বড় চোখ আছে, যেগুলি অন্যান্য অ্যানাক্-নাইডের মতোই সাধারণ চোখ।

নেকড়ে-মাকড়সাদের ফাইলাস বা পর্ব হচ্ছে আরথ্রোপডা (Arthropoda) শ্রেণী: আরকনিডা (Arachnida), বর্গ: আরানিয়াই (Araneae), গোত্র আছে অনেক রকমের, যেমন: লাইকোপাইডি, পিসাউরিডি ইত্যাদি, গণ: পিসাউরা (Pisaura) প্রজাতি মাইরাবিলিস (Mirabilis)।

এখানে পিসাউরা মাইরাবিলিস (Pisaura mirabilis) প্রজাতির নেকড়ে-মাকড়সাদের কথাই বলা হয়েছে।

কুমেরু মহাদেশ ছাড়া নেকড়ে-মাকড়সাদের নানা প্রজাতি প্রায় সব মহাদেশেই ছড়িয়ে আছে। উত্তর আমেরিকাতেই আছে 125টি প্রজাতির নেকড়ে-মাকড়সা. ইয়োরোপে আছে 50টি প্রজাতি। দক্ষিণ-ইয়োরোপে লাইকোসা ট্যারেন্টুলারাও এই নেকড়ে-মাকড়সা প্রজাতিভুক্ত।

কোন কোন প্রজাতির নেকড়ে-মাকড়সাদের বেশী দেখা যায় ঝরাপাতার গাদাতে। মেঘে ঢাকা অন্ধকার দিনে অথবা রাতের অন্ধকারেই তারা বেশী কর্মতৎপর হয়। ঝরা পাতার উপর দিয়ে কেউ হেঁটে গেলে কখনো কখনো দিনের আলোতেও ওদের বিপুল সংখ্যায় ঝরা পাতার ওপর দিয়ে ছুটতে দেখা যায়।

কোন কোন প্রজাতির নেকড়ে-মাকড়সারা দিনের বেলায় নরম মাটিতে নিজের নিজের খোঁড়া গর্তে লুকিয়ে থাকে বা বিশ্রাম করে। অন্যরা ঐ গর্তের মুখ থেকে একটা সামান্য লম্বা সিল্কের ফাঁপা নল তৈরি করে, এবং তার ভেতরে লুকিয়ে থেকে শিকারের প্রতীক্ষা করে।

এইসব সিল্কের ফাঁপা নল কিন্তু শিকার ধরবার ফাঁদ নয়, বরং বলা যায় লুকিয়ে থেকে শিকারের প্রতীক্ষা করবার একটি প্রকৃষ্ট জায়গা।

প্রায় অন্য সব মাকড়সাদের মতোই নেকড়ে-মাকড়সাদেরও খাদ্য হচ্ছে ছোট ছোট পোকা-পতঙ্গ। ঐ পোকা-পতঙ্গদের ওরা তাড়া করে ছুটে এসে ধরে, ধরে ওদের শক্তিশালী চোয়াল দুটি দিয়ে। তারপর নেকড়ে-মাকড়সারা শিকারটিকে চিবুতে থাকে, ঐ প্রক্রিয়ায় মুখে প্রচুর লালা ক্ষরণ হয় এবং অবশেষে শিকারটির শরীর একটি মণ্ডে পরিণত হয়। তখন মাকড়সাটি সেই অর্ধ-তরল মণ্ডের রস চুষে চুষে খায় ওদের ছোট্ট মুখ দিয়ে। খাবার জন্য এত কষ্ট করবার কারণ এই যে ওদের মুখগহ্বর এতই ছোট যে খুব ছোট ছোট আকারের খাদ্যের অংশ ছাড়া বড় কিছু গিলতেই পারে না।

তুলনামূলকভাবে অন্যান্য প্রজাতির মাকড়সাদের চেয়ে নেকড়ে-মাকড়সাদের দৃষ্টিশক্তি বেশী। বিশেষ সময়ে পুরুষ নেকড়ে-মাকড়সাটি স্ত্রী নেকড়ে-মাকড়সার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় আর তার লম্বা পেডিপ্যালপ (pedipalp) আন্দোলিত করে আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে। কোনো কোনো প্রজাতির পুরুষ নেকড়ে-মাকড়সাদের সামনের দুটি পায়ের কিছু অংশও কালো, এই পা-দুটি ওরা পেডিপালপের সঙ্গে ওপরে-নীচে আন্দোলিত করে। আবার আর এক প্রজাতির পুরুষ নেকড়ে-মাকড়সারা ওসব সাঙ্কেতিক বার্তা না পাঠিয়ে স্ত্রী নেকড়ে-মাকড়শাটির সামনে দাঁড়িয়ে স্রেফ পাগুলি আর তলপেট কাঁপাতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে মিলনেচ্ছু স্ত্রী-মাকড়সাটি অনুরূপ সংকেত পাঠাতে থাকে।

স্ত্রী নেকড়ে মাকড়সারা ডিম পাড়ে একটি গোলাকার অথবা অর্ধ-গোলাকার গুটির ভেতরে। ঐ গুটি বিশেষ করে ওরা ডিম পাড়বার জন্যই বোনে। ডিম পাড়ার পর ঐ গুটিটি স্ত্রী নেকড়ে-মাকড়সারা তলপেটের পিছন দিকে আটকে রাখে এবং সঙ্গে নিয়ে চলাফেরা করে। হঠাৎ যদি কখনো গুটিটি তলপেট থেকে খসেও পড়ে, তাহলে তৎক্ষণাৎ স্ত্রী নেকড়ে-

* MF/18, নিমুলগ্রাম, পোঃ কুলটি, [illegible]নসোল

মাকড়সাটি তা টের পায় এবং ফিরে এসে আবার তাকে তুলে তলপেটে আটকে দেয়।

ডিম ফুটে বাচ্চা নেকড়ে-মাকড়সারা ঐ গুটির ভেতরেই কিছুদিন থাকে। আবহাওয়া অনুকূল হলে গুটিটি ফেটে যায় এবং পিল পিল করে বেরিয়ে আসে শিশু নেকড়ে-মাকড়সারা।

বাচ্চারা মায়ের পিঠে চেপে বসে এবং মায়ের সঙ্গে সঙ্গেই ঘোরে। কোনো কোনো প্রজাতির নেকড়ে-মাকড়সার এত বেশি বাচ্চা হয় যে বাচ্চারা দুই কি তিন সারিতে উঁচু হয়ে মায়ের পিঠে চেপে বসে। যতদূর জানা গেছে, মায়ের পিঠে চেপে থাকবার সময়টাতে বাচ্চারা কিছুই খায় না।

কোনো বাচ্চা যদি মায়ের পিঠ থেকে পড়েও যায় তবু মা নেকড়ে-মাকড়সাটি তার জন্য থামে না, চলতেই থাকে, বাচ্চাকে আবার পিঠে তুলে নেওয়া বা কোনো ভাবে তাকে সাহায্য করা, এ সবের কিছুই করে না সে। তখন হয় মাকড়সাশিশুটি তাড়াতাড়ি মায়ের পা বেয়ে পিঠে চেপে বসে অথবা পরিত্যক্ত হয়ে মারা যায়।

বৃষ্টি নামলে মা-নেকড়ে মাকড়সা কোথাও গিয়ে আশ্রয় নেয়, যাতে গুটিটি ভিজে না যায়। যদি কোনো কারণে গুটিটি ভিজেও যায়, তা হলে প্রথম সুযোগেই শরীর আর মাথা নীচের দিকে বেঁকিয়ে গুটিটিতে রোদ লাগায়, যাতে ওটা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। এ সব ব্যাপার ওরা করে কোনো রকম ভাবনাচিন্তা না করেই অনেকটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মত। এ সবই প্রকৃতিদত্ত সহজাত প্রবৃত্তির ফল।

নেকড়ে-মাকড়সাদের শরীরের ম্যাটম্যাটে রঙ, নিশাচর বৃত্তি এবং নরম মাটিতে গর্ত খুঁড়ে যেখানে বাস করাটাই ওদের শত্রুর হাত থেকে বহুলাংশে রক্ষা করে। ওদের প্রধান শত্রু হচ্ছে দীর্ঘপদ পতঙ্গ ম্যানটিস-ফ্লাই। এই ম্যানটিস-ফ্লাইরা নেকড়ে-মাকড়সাদের গুটির ভেতরে থাকা ডিমগুলি খেয়ে ফেলে গুটি ভেদ করে। ওদের দ্বিতীয় বড় শত্রু হচ্ছে শিকারী-ভিমরুল। এরা হুল ফুটিয়ে নেকড়ে-মাকড়সাদের চলৎশক্তিহীন করে দেয় এবং নিজেদের শূককীটদের খাওয়াবার জন্য ওদের তুলে নিয়ে যায়। এই শিকারী ভিমরুলরা খুব নীচু দিয়ে ওড়ে এবং ওড়বার সময়ে মশার মতো আঁকাবাঁকা ভাবে ওড়ে, সেই সময়ে ওরা নেকড়ে-মাকড়সাদের বাসার সন্ধান করে। নেকড়ে-মাকড়সার ভূগর্ভস্থ বাসার সন্ধান পাওয়া মাত্র শিকারী-ভিমরুলরা তার ওপর নেমে পড়ে এবং পা দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করে। শিকারী ভিমরুল একবার নেকড়ে-মাকড়সার ভূগর্ভের বাসায় পৌঁছে গেলে অতি সহজেই তাদের গায়ে হুল ফুটিয়ে একে একে তুলে নিয়ে যায় নিজের বাড়িতে।

নেকড়ে-মাকড়সারা শিকার ধরার জন্য জাল বোনে না অন্য সব মাকড়সাদের মতো, তাই ওদের দৃষ্টিশক্তি খুব ভাল হওয়া দরকার। যখন নেকড়ে-মাকড়সার বাচ্চারা ভিড় করে মায়ের পিঠে চেপে বসে একাধিক থাকে, তখন কোনো কোনো বাচ্চা পিঠে জায়গা না পেয়ে মায়ের মাথার ওপরেও চেপে বসে। কিন্তু মাথায় চাপা বাচ্চারা কখনই মায়ের দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করে না। এটাও একটা প্রকৃতিদত্ত সহজাত প্রবৃত্তি, যার ফলে মায়ের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হবার উপক্রম হলেই বাচ্চারা নিজে থেকেই পেছন দিকে সরে আসে অন্যদের ঠেলে। নেকড়ে মাকড়সা-পর্যবেক্ষণকারীরা লক্ষ্য করেছেন যে মাঝে মধ্যে মায়ের পিঠে চেপে থাকা অন্য বাচ্চা-গুলিদের ঠেলাঠেলির জন্য দুই-চারটি বাচ্চা মাকড়সা সামনের দিকে এগিয়ে আসতে বাধ্য হয় এবং মাকে প্রায় অন্ধই করে দেয় চোখ ঢেকে দিয়ে। যখনই ঐ রকম ঘটনা ঘটে, তখনই মা-মাকড়সা তার একটি পেডিপালম তুলে তার ঘন রোম দিয়ে বাচ্চাদের ঝেড়ে ফেলে দেয় মাটিতে পেছনের দিকে, কিংবা পিঠের দিকে ঠেলে দেয়।

আবেদন

নিজের পরিবেশকে দূষণ থেকে মুক্ত রাখুন।
সকল প্রকার বন্যপ্রাণী ধ্বংস রোধ করুন।
খরা, ভূমিক্ষয় ও পরিবেশ দূষণ রোধে বৃক্ষ রোপণ করুন।
খাদ্য ও ঔষধে ভেজাল দেওয়ার বিরুদ্ধে দুর্বার জনমত গঠন করুন।
সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা গড়ে তুলুন।

—কর্মসচিব

মঙ্গল অভি

কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়*

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ রাত্রির আকাশে খালি চোখে সহস্রাধিক তারার সঙ্গে লাল তারার মত মঙ্গলকেও দেখে আসছে। রূপালী উজ্জ্বল তারাদের মাঝে লাল বর্ণের হওয়ার জন্যই মানুষের কাছে মঙ্গল পেয়েছে যুদ্ধ দেবতার সম্মান। তাই তার নাম 'মার্স'। সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহদের যে প্রতীক প্রাচীনকালে সৃষ্টি করা হয়েছিল তাতে মঙ্গলের প্রতীক হয়েছিল যোদ্ধার অস্ত্র : ঢালের পিছনে বর্শা, ঠিক এইরূপ ♂। পরে এই চিহ্নটিকে লোহার প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হত।

সূর্য থেকে মঙ্গলের গড় দূরত্ব 14,20,00,000 মাইল। আর পৃথিবী থেকে 3·5 কোটি মাইল। পৃথিবী যেমন তার কক্ষ পথে প্রতি সেকেণ্ডে 18·5 মাইল বেগে ছুটে চলেছে, তেমনি মঙ্গল ছুটছে প্রতি সেকেণ্ডে 15 মাইল বেগে। এই বেগে মঙ্গলকে নিজের অক্ষে একপাক ঘুরতে সময় লাগে 24 ঘণ্টা 37 মিনিট 22·6 সেকেণ্ড অর্থাৎ মঙ্গলের দিনরাত পৃথিবীর দিনরাত অপেক্ষা আধ ঘণ্টা বেশি। এইভাবে সূর্যের চারদিকে একপাক ঘুরতে মঙ্গলের সময় লাগে 687 দিন। প্রতি 15 থেকে 17 বৎসর অন্তর মঙ্গল পৃথিবীর খুব কাছে চলে আসে। এই সময় মঙ্গলকে বেশ বড় দেখায়। সাধারণ দূরবীণের সাহায্যেও পূর্ণিমার চাঁদের মতো দেখা যায়। আগামী 1986 থেকে 1988 খৃস্টাব্দ নাগাদ মঙ্গল পৃথিবীর কাছাকাছি আসবে। পৃথিবীর তুলনায় মঙ্গল অনেক ছোট। এর ব্যাস মাত্র 4077 মাইল এবং ভর পৃথিবীর ভরের $\frac{1}{10}$ ভাগ। দূরবীণ আবিষ্কারের পর মঙ্গল সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা গেছে। মঙ্গলও পৃথিবীর ন্যায় নিজ অক্ষে তার কক্ষতলে 25° হেলে আছে। এছাড়া মঙ্গলের দুই মেরুতে দেখা গেল সাদা টুপির মতো, যাকে বিজ্ঞানীরা বললেন পৃথিবীর মতো মঙ্গলেরও মেরুতে বরফ জমে আছে। আরও দেখা গেল যে ঐ টুপি বিভিন্ন সময়ে কমে-বাড়ে। 1877 খৃস্টাব্দে মঙ্গলের দুটি উপগ্রহ আবিষ্কৃত হয়। উপগ্রহ দুটি আবিষ্কার করেন আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী আসাফ হল্। উপগ্রহ দুটি খুব ছোট ও মঙ্গলের খুব কাছে। উপগ্রহ দুটির নাম 'ফোবোস' এবং 'ডাইমোস'। ফোবোস 13·2 মাইল লম্বা এবং 9·6 মাইল চওড়া। ডাইমোস 6·6 মাইল লম্বা 5·4 মাইল চওড়া। মঙ্গল থেকে ফোবোসের দূরত্ব 3600 মাইল। মঙ্গলকে একবার প্রদক্ষিণ করতে এই উপগ্রহের সময় লাগে 7 ঘণ্টা 39 মিনিট। ফলে একই রাত্রে ফোবোস মঙ্গলের আকাশে দুবার উদিত হয় ও অস্ত যায়। ডাইমোস্ ফোবোস্ অপেক্ষা দূরে আছে। মঙ্গল থেকে ডাইমোসের দূরত্ব 10380 মাইল। ডাইমোস মঙ্গলকে 30 ঘণ্টা 18 মিনিটে প্রদক্ষিণ করে।

বিংশ শতাব্দীর আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে জানা গেল যে মঙ্গলের মেরুটুপি শুষ্ক বরফের অর্থাৎ জমাট কার্বন ডাই-অক্সাইডের। এরপর মহাকাশ অভিযানের ফলে মঙ্গল সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। মঙ্গল অভিমুখে প্রথম পাঠান হয় আমেরিকান গ্রহযান—মেরিনার-4। এটি পৃথিবী থেকে যাত্রা শুরু করে 28শে নভেম্বর, 1964 এবং মঙ্গলের 5880 মাইল পাশ দিয়ে চলে যায় 1965 খৃস্টাব্দের জুলাই মাসের মাঝামাঝি। 1969 খৃস্টাব্দের 24শে ফেব্রুয়ারী ছাড়া হয় মেরিনার-6 কে ও 26শে মার্চ যাত্রা করে মেরিনার-7। এই গ্রহযান দুটিও মঙ্গলের পাশ দিয়ে চলে যায়। এগুলি মঙ্গলের কিছু ছবি তুলে পাঠায়।

সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা মঙ্গলের মাটিতে নামবার মতো যন্ত্র তৈরি করেছেন। 1971 খৃস্টাব্দে পৃথিবী থেকে মঙ্গলগ্রহ অভিমুখে যে চারটি গ্রহযান যাত্রা করে তার মধ্যে দুটি ছিল, মেরিনার-8, মেরিনার-9। আর দুটি সোভিয়েট রাশিয়ার মারস্-2 ও মারস-3। এর মধ্যে মেরিনার-4 এর পক্ষে পৃথিবীর আকর্ষণ অগ্রাহ্য করে বের হয়ে যাওয়া সম্ভব হলো না। ঐ গ্রহযানটি সমুদ্রের বুকে আছড়ে পড়ে। মারস্-2 ও মারস্-3 ঐ বছরই মঙ্গলের কক্ষপথে পৌঁছায়। প্রথমে কক্ষপথ থেকে বিভিন্ন পরীক্ষা চালায় এবং পরে অবতরণযান নামায়। কিন্তু দুটি অবতরণযানই নামবার সময় নষ্ট হয়ে যায়। মেরিনার-9 মঙ্গলের কক্ষপথে পৌঁছায় 1971-এর নভেম্বরের মাঝামাঝি। মেরিনার-9ই মঙ্গলের এক আশ্চর্য খবর পাঠায়। এই গ্রহযানটি যখন মঙ্গলের কক্ষপথে গিয়ে পৌঁছায় তখন গোটা মঙ্গলগ্রহ জুড়ে চলছিল এক ধূলিঝড়। যার গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় প্রায় 300 মাইল। মেরিনার-9 মঙ্গলের কক্ষপথে ঘুরে ছবি পাঠাতে থাকল। ধূলিঝড় থামল 1972 খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকে। এরপর মেরিনার-9 প্রেরিত ছবিতে দেখা গেল মঙ্গলের নতুন রূপ। দেখা গেল ঝড়ে মঙ্গলের ধূলিকণা উড়ে যাওয়ার ফলেই তার গায়ে ছোপের সৃষ্টি হয়। সেখানে কোন বৃক্ষ নাই। মঙ্গলের গায়ে যে জল বয়ে যাওয়া খাল আছে, তাও মেরিনার-9 প্রেরিত ছবিতেই বিজ্ঞানীরা দেখলেন আর দেখলেন মেরুটুপি শুধু শুষ্ক বরফের নয় তাতে সাধারণ বরফও আছে।

* 1, মনমোহন বসু স্ট্রিট, কলিকাতা-700006

যখন শুষ্ক বরফ গ্যাসীয় কার্বন ডাই-অক্সাইড হয়ে উবে যায় তখন সাধারণ বরফের স্তরটিই রয়ে যায়।

মেরিনার-9 আর যে ছবিগুলো পাঠাল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মঙ্গলের সুবৃহৎ আগ্নেয়গিরি এবং গভীর গিরিখাত। মঙ্গলের সবচেয়ে বড় আগ্নেয়গিরির নাম দেওয়া হয়েছে নিকস্ অলিম্পিয়া। এর ব্যাস প্রায় 360 মাইল এবং উচ্চতা 15 মাইল। আর মঙ্গলের সবচেয়ে বড় গিরিখাতের দৈর্ঘ্য 2220 মাইল, গভীরতা প্রায় 1638 গজ আর প্রস্থ 144 মাইল।

1973 খৃস্টাব্দে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা আরও তিনটি 'মারস' গ্রহযান মঙ্গলে পাঠান। এগুলির নাম মারস্-4, মারস্-5, মারস্-6। মারস্-4 ও মারস্-5 মঙ্গলের কক্ষ থেকে ছবি পাঠায় আর মারস্-6 মঙ্গলের উপর নামতে গিয়ে নষ্ট হয়ে যায়।

ম্যারিনার প্রেরিত তথ্যগুলি পাওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা মঙ্গলগ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব অনুসন্ধানের জন্য ভাইকিং নামক গ্রহযান তৈরি করলেন। ভাইকিংকে মঙ্গলে তিনটি কাজ করার মত করে তৈরি করা হয়। যথা—

1. মঙ্গলে প্রাণের অস্তিত্ব অনুসন্ধান করা,
2. মঙ্গলের মাটি বিশ্লেষণ করা,
3. মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের সব তথ্য সংগ্রহ করা।

ভাইকিং—1 নামে যে গ্রহযানটি তৈরি হয়েছিল তাতে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়, ফলে ভাইকিং-2কে ভাইকিং-1 করে পাঠান হয় 1974 খৃস্টাব্দে 20শে অগাস্ট। গ্রহযানটি মঙ্গলে পৌঁছায় 1976 খৃস্টাব্দে 19শে জুলাই। গ্রহযানটি নেমেছিল মঙ্গলের নিরক্ষরেখার কিছুটা উত্তরে। পরে তৈরী ভাইকিং—2কে পাঠান হয় 1975 খৃস্টাব্দে 9 সেপ্টেম্বর। এই গ্রহযানটি মঙ্গলে পৌঁছায় 1976 খৃস্টাব্দের 7ই অগাস্ট। এটি অবতরণ করে ভাইকিং-1 এর অবতরণ অঞ্চলের 4440 মাইল দূরে। দুটো গ্রহযানই দুভাগে বিভক্ত ছিল। একটি অংশ মঙ্গলের কক্ষপথে ঘুরবার জন্য। এটি দেখতে অষ্টভুজের মতো। অন্যটি অবতরণ যান। এটি তিন পাবিশিষ্ট একটি স্বয়ংচালিত যন্ত্রদূত। এই অবতরণ যানকে মঙ্গলপৃষ্ঠে অবতরণ- করাতে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটের জেট্ প্রোপালশান ল্যাবরেটরীর বিজ্ঞানীদের অনেক বেগ পেতে হয়েছিল, কারণ মঙ্গলে প্রেরিত বিদ্যুৎ তরঙ্গ পৃথিবীতে এসে পৌঁছতে সময় লাগে তিন মিনিটের মত। অর্থাৎ গ্রহযান থেকে পাঠান তথ্য পৃথিবীতে আসতে তিন মিনিট আর পৃথিবীর নির্দেশ যেতেও তিন মিনিট মত সময় লাগছিল।

প্রায় অবতরণের সঙ্গে সঙ্গেই ভাইকিং-1 পাঠায় তার প্রথম ছবি। ভাইকিং-এর পাঠান ছবি থেকে মঙ্গলের অনেক নতুন তথ্য জানা গেছে। জানা গেছে মঙ্গলের আকাশ ঈষৎ লালচে ও মেঘহীন; বায়ুমণ্ডল খুব হালকা। বায়ুর চাপ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপের $\frac{1}{100}$ ভাগ মাত্র। মঙ্গলপৃষ্ঠ মরুভূমির মত। এর বর্ণ লাল।

বায়ুমণ্ডলে পাওয়া গেল 95% কার্বন-ডাই-অক্সাইড। অক্সিজেনও আছে, তবে তার পরিমাণ 1·5% এবং নাইট্রোজেনের পরিমাণ 2·7%। এছাড়া আর্গন, জেনন, ক্রিপটন প্রভৃতি গ্যাসও অল্প পরিমাণে আছে।

পৃথিবীর তুলনায় সূর্য থেকে মঙ্গলের দূরত্ব বেশী বলে মঙ্গল তাপ ও আলো দুই-ই কম পায়। ভাইকিং-1 অবতরণ অঞ্চলে তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রীর নীচেতেই থেকেছে। রাত্রের তাপমাত্রা দেখা গেছে—85°C। মেরু অঞ্চলের তাপমাত্রা প্রায় —125°C-তে নেমে যায়। গ্রীষ্মকালে বিষুব অঞ্চলের তাপমাত্রা কিছু বেশি হয়।

মাটির গঠন সম্বন্ধে যা জানা গেল তাতে মাটিতেই প্রায় 16% লোহা, 15%—30% সিলিকন, এছাড়া ক্যালসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, টাইটানিয়াম এবং গন্ধকও আছে। তবে মঙ্গলের মাটিতে অক্সিজেনের পরিমাণ পৃথিবীর মাটির তুলনায় অনেক বেশি। বিজ্ঞানীদের ধারণা লোহার পরিমাণ বেশি হওয়ার জন্য মঙ্গলের মাটির রং লাল।

এতকিছু পাওয়া গেলেও মঙ্গলে প্রাণের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় নি। ত্রিমাত্রিক প্রাণীর সন্ধান না পেয়ে ভাইকিং শুরু করে এককোষী প্রাণীর সন্ধান। দুটি পদ্ধতিতে পরীক্ষায় যা জানা যায় তাতে মঙ্গল প্রাণীহীন বলেই মনে হয়। তবে সেখানে জীবনের উপাদান নাইট্রোজেন আছে, অক্সিজেন আছে, জল ছিল তার প্রমাণ আজও বরফ আছে। সেখানে সুদূর অতীতে হয়তো প্রাণের সঞ্চার ঘটেছিল। মঙ্গল সম্বন্ধে আরও তথ্য সংগ্রহে তা জানা যাবে।

এবার মানুষের যাবার পালা। গত দশকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মঙ্গলে মানুষ পাঠাবার চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছেন। বিজ্ঞানীদের মতানুযায়ী পৃথিবীকক্ষ থেকে মানুষবাহী গ্রহযান মঙ্গল অভিমুখে রওনা হয়ে যাবে। মঙ্গলে গিয়ে ফিরে আসতে সময় লাগবে প্রায় দু-বৎসর। সম্ভবতঃ এবিষয়ে এখনও গবেষণার কাজ চলছে। আশা করি অদূর ভবিষ্যতেই মঙ্গলের বুকে পৃথিবীর বিজয় পতাকা মানুষ উড়িয়ে দেবে। সেখানে মানুষ পৃথিবীকে সন্ধ্যাতারা ও শুকতারা হিসাবে দেখবে। চন্দ্রকেও দেখবে বেশ উজ্জ্বল তারার মতো। মঙ্গল থেকে যদি মঙ্গলের উপগ্রহে এসে মানুষ নামে এবং ঐসময় যদি উপগ্রহের ঐ স্থানে রাত্রি থাকে তবে যাত্রীরা এক অত্যাশ্চর্য দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করবে। দৃশ্যটি হল আকাশে আমাদের চাঁদের চেয়ে 80 গুণ বড় আর কয়েক হাজার গুণ বেশি উজ্জ্বল একটি গোলকের কলাগুলি দ্রুত বদলে যাচ্ছে। এটিই হল মঙ্গল গ্রহ।

প্রোটিন ঘাট্‌তি কেন ?

রতনমোহন খাঁ

ভারতে ভূমির অনুপাতে জনসংখ্যা অত্যন্ত বেশী। পৃথিবীর শতকরা 24 ভাগ অঞ্চল নিয়ে যেখানে ভারত রাষ্ট্র গঠিত সেখানে দুনিয়ার আবাল বৃদ্ধ-বনিতার এক-শ জনের মধ্যে পনেরো জনই ভারতে বাস করে। বিপুল জনসংখ্যার চাপে ও খাদ্যের অভাবে স্বাধীনতার ছত্রিশ বছর পরেও ভারতে একটি স্বাস্থ্যোজ্জ্বল জাতি গঠন সম্ভব হয় নি। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধীনে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার প্রোটিন বিষয়ক উপদেষ্টা মণ্ডলী, খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং UNICEF (The United Nations Children's Fund)-এর প্রতিবেদনে প্রকাশ ভারতের জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ অপুষ্টিজনিত নানা রোগের শিকার এবং অপুষ্টির অন্যতম মূল হেতু, ভারতীয় ভোজ্যে প্রোটিনের অপ্রতুলতা। এই প্রতিবেদনকে মূলধন করে ভারতের মত দরিদ্র দেশের বহু অর্থ ব্যয়ে দেশী-বিদেশী বহু বিজ্ঞানী দেশীয় প্রধান শস্যসমূহে প্রোটিনের অনুপাত বৃদ্ধির গবেষণায় রত। এমন কি একদল বিজ্ঞানী প্রোটিন অভাবে লক্ষ লক্ষ শিশু অল্পবুদ্ধিতে পরিণত হচ্ছে বলে নানা আলোচনায় মুখর। এ কথা সত্য ভারতের অধিকাংশ মানুষ নিরামিষভোজী বা বছরে বেশীর ভাগ দিনই নিরামিষ ভোজন করে। আবার চর্বি শরীরে সঞ্চিত থাকতে পারে কিন্তু প্রোটিন জীবদেহে সঞ্চিত হয় না। এ কারণে প্রয়োজনীয় প্রোটিন প্রতিদিনই গ্রহণ করতে হয়। এখন ভারতীয় ভোজ্যে প্রোটিন ঘাট্‌তি কতটা বা আদৌ ঘাট্‌তি পড়ছে কিনা—এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পেতে হলে আমাদের দেখতে হবে প্রতিদিন একজন ভারতীয়ের কি ধরণের প্রোটিন কি পরিমাণে গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং ভারতীয় ভোজ্যে ঐ পরিমাণ প্রোটিন পূরণ হচ্ছে কি না ?

খাদ্যে পুষ্টিকর উপাদানগুলি হলো—(1) শর্করা, (2) চর্বি, (3) প্রোটিন, (4) ধাতব-লবণ, (5) ভিটামিন, (6) জল।

এসব পুষ্টিকর পদার্থগুলির মূল কাজ—

তাপ-শক্তি উৎপাদন করে	শর্করা	চর্বি	প্রোটিন
কোষ গঠন ও বৃদ্ধিতে সাহায্য করে	প্রোটিন	ধাতব-লবণ	ভিটামিন
নূতন টিসু গঠনে সাহায্য করে	প্রোটিন	ধাতব-লবণ	ভিটামিন

শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপ বজায় রাখে—প্রোটিন ভিটামিন ধাতব-লবণ জল অবশ্য কোষগঠন ও নতুন টিসুর গঠনে শর্করা এবং চর্বিরও ভূমিকা আছে। কাজের তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে প্রোটিনের প্রয়োজন সর্বত্রই। তাই প্রোটিন নিয়ে এত হৈ চৈ।

ভারতীয় পরিবেশে প্রত্যহ প্রোটিনের গড় প্রয়োজন—

পুরুষ	ওজন (55 কিগ্রা.)	প্রয়োজনীয় প্রোটিন	55 গ্রাম
মহিলা	„ (45 „)	„ „	45 „
গর্ভবতী মহিলা		„ „	100 „
স্তনদানকারী মহিলা		„ „	110 „

শিশু ও কিশোর বয়স	প্রয়োজনীয় প্রোটিন প্রতি কিগ্রা ওজন অনুসারে
0–5 বছর	3·5 গ্রাম
6–7 „	3 „
8–15 „	2·5 „
16–20 „	2 „

কয়েকটি খাদ্যে (100 গ্রাম) পুষ্টিকর উপাদানের পরিমাণ (গ্রামে)

খাদ্য	প্রোটিন	চর্বি	ধাতব লবণ	শর্করা	উৎপাদন-ক্ষম তাপশক্তি (ক্যালোরি)
চাল	7·0	·4	·7	79·0	346
ময়দা	10·0	·5	·6	73·9	348
মটর ডাল	19·0	1·1	2·2	56·5	315
ছোলা	24·0	1·4	3·5	56·7	348
মুসুর	21·0	·6	1·8	56·0	325
সোয়াবিন	43·2	19·5	4·6	20·9	432
আলু	1·6	0·1	0·6	22·6	97
বেগুন	1·4	0·3	0·3	4·0	24
নারিকেল	4·5	41·6	1·0	13·0	444
আম (পাকা)	0·6	0·4	0·4	16·9	74
কলা („)	1·2	0·3	0·8	27·2	116
মাছ (বাগদা চিংড়ি)	19·1	1·0	1·7	0·8	89
মাছ (সামুদ্রিক)	21·0	1·9	1·7	—	101
মাংস (গরু)	22·6	2·6	1·0	—	114
মাংস (ছাগল)	21·4	3·6	1·1	—	118
মাংস (মুরগী)	25·9	0·6	1·3	—	109

ডিম (মুরগী)	14·0	13·3	1·0	—	173
দুধ (গরু)	3·2	4·1	0·8	4·4	67
ডালদা	—	100		—	900

মানবদেহে প্রোটিন পোষিত হওয়ার সমস্যা আছে। বিভিন্ন খাদ্যের প্রোটিন সমভাবে পোষিত হয় না। প্রোটিনের পুষ্টিগুণ নির্ভর করে তার মধ্যে বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডের উপস্থিতির উপর। শরীরের পুষ্টির জন্য কুড়ি রকম অ্যামিনো অ্যাসিডের প্রয়োজন। দশটি অ্যামিনো অ্যাসিড শরীরের মধ্যে তৈরি হতে পারে, কিন্তু অপর দশটি খাদ্য মারফৎ গ্রহণ করতে হয়। চাল ও ময়দার প্রোটিনে গুরুত্বপূর্ণ অ্যামিনো অ্যাসিড লাইসিন কম আছে, যদিও চালে তুলনামূলক ভাবে বেশী আছে। ডালের প্রোটিনে মিথাইওনিন (methionine) অ্যামিনো অ্যাসিড কম থাকলেও লাইসিন যথেষ্ট আছে। সাধারণতঃ উদ্ভিদ-প্রোটিন অপেক্ষা জান্তব প্রোটিন অধিকতর সম্পূর্ণতার সঙ্গে পোষিত হয়। উদ্ভিদ-প্রোটিন যে কোষমধ্যে অবস্থান করে, সেই কোষের পুরু সেলুলোজের আবরণের উপর কিন্ব-পদার্থগুলির কাজে অসুবিধা হয়। তবে রন্ধন প্রণালীর উপর এগুলির সহজপাচ্য হওয়া নির্ভর করে। ডিমের প্রোটিনের প্রায় সবটাই পোষিত হয়।

এবার দেখা যাক ভারতীয় ভোজ্যে প্রোটিনের পূরণ হয় কিনা? সাধারণতঃ ভারতীয় ভোজ্যে চাল বা ময়দা, ডাল, আলু, শাক ও অন্য কিছু সবজি ব্যবহৃত হয়। অধুনা এক সমীক্ষায় ও আলোচনায় প্রকাশ—এই খাবারের মধ্য দিয়ে যে পরিমাণ প্রোটিন শরীরে প্রবেশ করতে পারে তাতে প্রোটিনের ঘাট্‌তি হওয়ার বিশেষ কারণ নেই। হিন্দুদের মধ্যে কয়েক দশক আগেও খুব একটা আমিষ ভোজ্যের প্রচলন ছিল না; অথচ তারা মোটামুটি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। এর কারণ প্রয়োজনীয় প্রোটিন পাবার মত উপযুক্ত পরিমাণে ভাত বা রুটির সঙ্গে ডাল, সবজি ও দুধ খাওয়া হতো। দুধ অবশ্য এখন দুষ্প্রাপ্য। তবুও পরিমাপমত ভাত বা রুটির সঙ্গে ডাল থাকলে ভারতীয় ভোজ্যে প্রোটিনের ঘাট্‌তি প্রায় হবে না, ঘাট্‌তি হতে পারে তাপশক্তির। তবে প্রোটিন ঘাট্‌তি কেন? ভারতীয় জনসাধারণের একটি বিরাট অংশ দারিদ্র্য-সীমার নীচে। দু-বেলা পেটপুরে খাবার মত সংস্থান তাদের নেই, তাই প্রোটিনের ঘাট্‌তি ও অপুষ্টি। প্রোটিনের ঘাট্‌তি মিটাতে হলে, দরিদ্র ভারতবাসীদের অপুষ্টিজনিত রোগের কবল থেকে রক্ষা করতে হলে, শস্যে প্রোটিনের অনুপাত বৃদ্ধি করা বা ডিম, মাছ, মাংসের উৎপাদন বাড়ানোর আগে সাধারণ খাদ্য-শস্যের উৎপাদন বাড়াতে হবে এবং এই শস্য সাধারণের ক্রয় করার মত অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

মহাকাশের রূপরেখা

সলিলকুমার চক্রবর্তী*

আকাশের স্বরূপ আবিষ্কারের চেষ্টা চলে আসছে বহুকাল থেকে। বিজ্ঞানের সকল শাখার মধ্যে জ্যোতির্বিদ্যাই (Astronomy) বোধ করি প্রাচীনতম। মহাকাশের সঙ্গে মানুষের পরিচয় কিন্তু সম্প্রতি বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। সাধারণ মানুষের কাছে আকাশ এবং মহাকাশ সমার্থক হলেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এ দুয়ের ব্যবধান বিস্তর। আমাদের গভীরতাবোধের সীমাবদ্ধতা থেকেই গড়ে উঠেছে আকাশের ধারণা। দিকবিদিকের দূরদূরান্তরে অবস্থিত নানা জ্যোতিষ্কের মধ্যে দূরত্বগত ব্যবধান আমরা অনুভব করতে পারি না। বরং মনে করি তারা সব ভিন্ন ভিন্ন দিকে অনির্দেশ্য সমান কোন এক দূরত্বে অবস্থান করছে।

ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থান থেকে পর্যবেক্ষণের ফলে যে অর্ধ-গোলকগুলি দেখা যায়, তাদের সমবায়ে গড়ে ওঠে একটা গোলক। কল্পনা-আশ্রিত, দৃষ্টি-বিভ্রমজনিত এই সুবৃহৎ গোলকটিই হলো আকাশ বা নভোগোলক (Celestial sphere)। আকাশের আছে শুধু ব্যাপ্তি। স্পষ্টতই আকাশ দ্বি-মাত্রিক।

মহাকাশ (Space) কিন্তু দৃষ্টি-বিভ্রম নয়। তার বাস্তব অস্তিত্ব আছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল জড় পদার্থ (Mass) এবং সকল শক্তি (Energy) এই মহাকাশেই বিন্যস্ত ও বিধৃত। মহাকাশ ত্রি-মাত্রিক। অনাদি অনন্ত এই মহাকাশ। তবে, আলোচনার সুবিধার্থে বিজ্ঞানীরা সমগ্র মহাকাশকে তিনটি অংশে বিভক্ত করেছেন।

1. আন্তর্গ্রহ মহাকাশ (Interplanetory space)
2. আন্তর্নক্ষত্র মহাকাশ (Intersteller space) এবং
3. আন্তর্ব্রহ্মাণ্ড মহাকাশ (Intergalectic space)

একে একে মহাকাশের এই ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলেই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে সমগ্র মহাকাশের রূপরেখাটি।

আন্তর্গ্রহ মহাকাশ—মানুষের আবাসস্থল এ পৃথিবী হচ্ছে তরল ও কঠিন পদার্থে গড়া প্রায় আট হাজার মাইল ব্যাসের একটা গোলাকাকার বস্তুপিণ্ড। তাকে ঘিরে আছে বিভিন্ন ঘনত্বের গ্যাসের আস্তরণ সমূহ, যার সামগ্রিক নাম বায়ুমণ্ডল। 1নং তালিকায় এই বায়ুমণ্ডলের কিঞ্চিত পরিচয় দেওয়া হলো।

*ইউকো ব্যাঙ্ক, দমদম ক্যান্টনমেন্ট শাখা

তালিকা নং—1

বায়ুস্তরের নাম	অবস্থান	কার্য
1. ক্ষুব্ধ মণ্ডল (Troposphere	ভূপৃষ্ঠ থেকে শুরু করে প্রায় 8 মাইল উচ্চতা পর্যন্ত	মেঘ, বৃষ্টি, ঝড়, বজ্র বিদ্যুৎ প্রভৃতির উৎপত্তিস্থল এবং পৃথিবীর আবহাওয়া নিয়ন্ত্রক।
2. স্তব্ধ মণ্ডল (Stratosphere)	ভূপৃষ্ঠের 9-10 মাইল উর্ধ্ব থেকে শুরু করে প্রায় 50 মাইল উচ্চতা পর্যন্ত।	অক্সিজেন এবং ওজন গ্যাসের সাম্য স্থাপন এবং বহিরাগত শক্তিশালী আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি শোষণ।
3. আয়ন মণ্ডল (Ionosphere)	ভূপৃষ্ঠের 51 মাইল উর্ধ্ব থেকে প্রায় 150 মাইল উচ্চতা পর্যন্ত।	দূরপাল্লার বেতার যোগাযোগের সুবিধা করণ।
4. চৌম্বক মণ্ডল (Magnetosphere)	ভূপৃষ্ঠের 400 মাইল উর্ধ্ব সীমা পর্যন্ত।	পৃথিবীকে চুম্বকত্ব দান এবং বহিরাগত চৌম্বক ও আধানযুক্ত পদার্থের বর্জন রোধ।
5. লঘু মণ্ডল (Escosphere)	ভূপৃষ্ঠের প্রায় 650 মাইল উচ্চতা পর্যন্ত।	বায়ুমণ্ডলের সর্বশেষ অংশ হিসাবে মহাশূন্য থেকে পৃথিবীর পরিবেশকে পৃথকীকরণ।

পৃথিবীর অব্যবহিত চারপাশে বিস্তৃত মহাকাশের যে অংশের মধ্যে পৃথিবী অবস্থিত তারই নাম আন্তগ্র্হ মহাকাশ। এ অঞ্চলের একচ্ছত্র সম্রাট হচ্ছে সূর্য। সূর্যকে নাভিকেন্দ্রে রেখে আপন আপন উপবৃত্তাকার কক্ষপথে তার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে মোট নয়টি গ্রহ (planets)। সূর্য থেকে ক্রমবর্ধমান দূরত্ব অনুয়ায়ী সাজালে গ্রহগুলি হলো—বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো। পৃথিবীর চেয়ে কম দূরত্বে অবস্থানকারী বুধ আর শুক্র গ্রহ দুটিকে বলা হয় অধস্তন গ্রহ (Inferior planets) আর পৃথিবী অপেক্ষা অধিক দূরত্বে অবস্থানকারী বাকী 6টি গ্রহকে বলা হয় উর্ধ্বতন গ্রহ (Superior planets)।

মঙ্গল আর বৃহস্পতিগ্রহের মাঝে মহাকাশের যে অংশ, সেখানে ছড়ানো আছে ছোট বড় অসংখ্য বস্তুখণ্ড যারা গ্রহদের মতই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। এদের বলা হয় গ্রহাণু (Asteroids)। এ পর্যন্ত প্রায় 2000 গ্রহাণুর পরিচয় বিজ্ঞানীদের তালিকাভুক্ত হলেও যুক্তিনির্ভর অনুমান অনুযায়ী এদের সংখ্যা এক লক্ষের কাছাকাছি। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা যে মহাকাশের এই অংশে অবস্থিত কোন একটা গ্রহ মহাজাগতিক দুর্ঘটনায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গ্রহাণুর রূপ নিয়েছে। নতুবা ওখানে কোন একটা গ্রহের জন্মের সম্ভাবনা অজ্ঞাত কোন বিঘ্নের দরুণ রূপায়িত হয়ে উঠতে না পারায় অজ্ঞাত সেই গ্রহের অংশগুলিই গ্রহাণুর সৃষ্টি করেছে।

দেখতে উজ্জ্বল হলেও গ্রহগুলির নিজস্ব কোনও আলো নেই। তারা সূর্যের আলোয় আলোকিত। এদের দেহ কঠিন ও তরল পদার্থে গড়া। গ্রহগুলির চারপাশে ঘূর্ণনরত উপগ্রহসমূহও আন্তগ্র্হ মহাকাশের অধিবাসী। এ পর্যন্ত মোট পঁয়ত্রিশটি উপগ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে। আন্তগ্র্হ মহাকাশে আর যারা আছে, তারা হলো অসংখ্য উল্কাপিণ্ড (Meteors) এবং অগণিত ধূমকেতু (Comets)। এই সব বস্তুসমূহের অন্তর্বর্তী অঞ্চলে আছে বস্তুর অতিলঘু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপস্থিতি যার নাম আন্তর্গ্রহ বস্তু (Interplancterry matter)। আন্তর্গ্রহ মহাকাশের বর্তমান বিস্তার সূর্য থেকে প্লুটোর দূরত্বের প্রায় দ্বিগুণ অর্থাৎ 750 কোটি মাইল। প্লুটোর চেয়ে দূরতর কোনও গ্রহ আবিষ্কৃত হলে ভবিষ্যতে এ বিস্তার আরও বাড়তে পারে। 2নং তালিকায় গ্রহগুলি সম্পর্কে কিছু তথ্য পরিবেশিত হলো।

আন্তগ্র্হ মহাকাশের সকল বস্তুর গতিবিধি এবং প্রাকৃতিক অবস্থার প্রধান নিয়ামক সূর্য। সূর্যের ব্যাস প্রায় 8 লক্ষ 65 হাজার মাইল। তার আয়তন আমাদের পৃথিবীর আয়তনের 10 লক্ষ গুণেরও বেশি। আন্তর্গ্রহ মহাকাশরূপ আধারটিতে যেন আধেয় হিসাবে বিরাজ করছে সূর্যকেন্দ্রিক একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ বিরাট পরিবার যার নাম সৌরজগৎ (Solar system)।

আন্তর্নক্ষত্র মহাকাশ—আন্তগ্র্হ মহাকাশের যেখানে শেষ, সেখান থেকেই শুরু হচ্ছে তারকাদের রাজ্য—আন্তর্নক্ষত্র মহাকাশ। মহাকাশের এই অংশ জুড়ে আছে প্রায় 10 হাজার কোটি তারা। সাধারণ ভাবে তারারা সব আমাদের সূর্যের মত নিজেদের আলোয় উজ্জ্বল এবং গ্যাসীয় পদার্থ দিয়ে গড়া। পরস্পরের কাছ থেকে তারকারা বহু দূরে দূরে অবস্থিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব মাত্র নয় কোটি তেত্রিশ লক্ষ মাইল অথচ আন্তর্নক্ষত্র মহাকাশে সূর্যের নিকটতম প্রতিবেশী তারা 'প্রক্সিমা সেন্টুরি'র (Proxima Centuri) দূরত্ব প্রায় 25 লক্ষ কোটি মাইল। সেখান থেকে আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে সময় নেয় 4 বছর 4 মাস (আলোর বেগ সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল)। আর সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো পৌঁছায় মাত্র 8 মিনিট 20 সেকেণ্ডে।

সাধারণ বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সাক্ষ্য প্রমাণকেই চূড়ান্ত বলে মেনে নিয়ে আমরা সূর্যকে অনন্যসাধারণ এবং একান্ত

বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত জ্যোতিষ্ক মনে করলেও বিজ্ঞানীদের চোখে সূর্য আন্তর্নক্ষত্র মহাকাশের অনেক তারার তুলনায় প্রায় সর্বদিক থেকেই অতি সাধারণ বৈশিষ্ট্যবর্জিত মাঝারি গোছের তারা। তবে হ্যাঁ; মহাকাশের অনন্ত শূন্যতার মাঝে সূর্য বিচ্ছিন্ন বা নিঃসঙ্গ নয়। গ্রহ, গ্রহাণু এবং উপগ্রহাদি গঠিত একটা বৃহৎ পরিবারের সে সর্বময় কর্তা। সে পরিবারটির নাম 'সৌরজগৎ'।

অন্য কোনও তারার সঙ্গে সৌরজগতের মতো তারাজগৎ যুক্ত আছে কিনা সে প্রশ্নটা বিতর্কমূলক। এ ব্যাপারে নানা মুনির নানা মত। বিজ্ঞানী জেমস্ জীনস্ (James Jeans) ও তাঁর অনুগামীদের মতে এক মহাজাগতিক দুর্ঘটনার ফলে চূর্ণীকৃত জায়গা জুড়ে তারাদের ভীড় আর তার বাইরের বৃহত্তর এলাকা ফাঁকা। একটা জোটের মধ্যবর্তী দুটো পাশাপাশি তারার দূরত্ব 4 থেকে 5 আলোকবর্ষ (1 আলোকবর্ষ $= 588 \times 10^{10}$ মাইল)। দুটো পাশাপাশি তারকা জোটের ব্যবধান কয়েক লক্ষ আলোকবর্ষ।

ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কয়েকটা তারকা জোটের নামকরণ করেছেন তাদের আপাত আকৃতি লক্ষ্য করে এবং একএকটা জোটের নাম দিয়েছেন এক একটা রাশি। (একরাশ তারা থেকে কথাটার উৎপত্তি) মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট প্রভৃতি রাশিগুলি এক একটা তারকা জোটের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

তালিকা-2

গ্রহের নাম	সূর্য থেকে দূরত্ব (মাইল)	সূর্য প্রদক্ষিণের সময় (বছর)	ব্যাস (মাইল)	ভর কিলোগ্রাম	উপগ্রহের সংখ্যা
বুধ	3·5 কোটি	0·241	3040	$\cdot 034 \times 10^{24}$	—
শুক্র	6·5 কোটি	0·615	7680	$4{\cdot}89 \times 10^{24}$	—
পৃথিবী	9·3 কোটি	1·000	8000	6×10^{24}	1
মঙ্গল	14 কোটি	1·881	4240	$0{\cdot}6 \times 10^{24}$	2
বৃহস্পতি	48 কোটি	11·864	89840	$1907{\cdot}4 \times 10^{24}$	14
শনি	88·5 কোটি	29·40	75280	$571{\cdot}2 \times 10^{24}$	10
ইউরেনাস	178 কোটি	84·01	31840	$87{\cdot}6 \times 10^{24}$	6
নেপচুন	279 কোটি	164·1	31040	$103{\cdot}2 \times 10^{24}$	2
প্লুটো	367 কোটি	247	4000	$0{\cdot}66 \times 10^{24}$	—

বৃহৎ এক তারা এবং তার অংশসমূহ নিয়েই সৌরজগতের উৎপত্তি। এরূপ দুর্ঘটনা কদাচিৎ ঘটে থাকে কাজেই অন্য কোনও তারার সঙ্গে তারাজগৎ যুক্ত থাকার সম্ভাবনা নেই। পক্ষান্তরে জ্যোতির্বিজ্ঞানী পিটার ভ্যান ডি ক্যাম্প (Peter Van de Kamp) এবং তাঁর সহকর্মীরা দাবী করেছেন যে অফিউকাস (Ophiucus) মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত 'বার্নার্ডের তারা' (Barnard's Star) নামক তারাটির চারধারে ঘূর্ণমান দুটি গ্রহ আছে যাদের প্রত্যেকটির আয়তন, সৌরমণ্ডলের সর্ববৃহৎ গ্রহ বৃহস্পতির আয়তনের কাছাকাছি। এপসাইলন অরিগি (Epsilon Aurigae) এবং সিগ্‌মা-61 (Sigma-61) তারা দুটি সম্পর্কেও অনুরূপ দাবী আছে।

আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে মহাকাশ সুসম তারকা অধ্যুষিত নয়। মহাকাশের স্থানে স্থানে তারারা আছে জোটবদ্ধ হয়ে। কোথাও জোটছাড়া নয়। জোটের মধ্যে অনেকটা

আন্তর্নক্ষত্র মহাকাশে 10 হাজার কোটি তারা ছাড়াও আছে বেশ কিছু সংখ্যক নীহারিকা (Nebule), এগুলি দেখতে ছোট ছোট মেঘের টুকরোর মতো। এরা কঠিন বস্তুর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা মিশ্রিত গ্যাসীয় পদার্থে গঠিত অত্যন্ত লঘু বস্তুপিণ্ড। এরা নানা আকার ও আকৃতির হয়ে থাকে। কতগুলো নীহারিকা বেশ উজ্জ্বল খালি চোখে বা অল্পশক্তির দূরবীন দিয়ে সহজেই দেখা যায়। এদের বলে উজ্জ্বল নীহারিকা, উদাহরণ—বৃহৎ নীহারিকা আবার কতগুলো নীহারিকাকে সরাসরি দেখা যায় না। দৃষ্টিশক্তির প্রতিবন্ধক হিসাবে এদের অস্তিত্ব বোঝা যায়। এদের বলে অন্ধকার নীহারিকা উদাহরণ অশ্বমুণ্ড নীহারিকা।

আন্তর্নক্ষত্র মহাকাশে তারা, নীহারিকা প্রভৃতির অন্তর্বর্তী স্থানে পরিব্যাপ্ত আছে বস্তুর এক অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিস্তার। যার নাম আন্তর্নক্ষত্র বস্তু (Interstelier matter)। এই আন্তর্নক্ষত্র

বস্তুই কালক্রমে ঘনীভূত হয়ে জন্ম দেয় নীহারিকার আর নীহারিকা থেকেই ক্রমশঃ উৎপত্তি হয় তারা বা তারা জগতের। আন্তর্নক্ষত্র মহাকাশের 10 হাজার কোটি তারা, আর নীহারিকাগুলোর সমন্বয়ে বিশেষ আকার ও আকৃতিতে গড়ে ওঠা বস্তুসম্ভারের নাম জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরিভাষায় ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড (Milky way galaxy)। উপর বা নীচ থেকে একটা চরকিকে দেখতে যেমন দেখায় ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডটিকে দেখতে ঠিক সেই রকম। আবার পাশ থেকে দেখলে মনে হয় যেন একটা গরুর গাড়ীর চাকা। ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের দৈর্ঘ্য বা প্রস্থ হবে প্রায় এক লক্ষ আলোকবর্ষ, তার গড় উচ্চতা পাঁচ হাজার আলোকবর্ষ আর কেন্দ্রীয় অঞ্চলের আর নক্ষত্র নীহারিকাদের সকলেই আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের সীমানার বাইরে অবস্থিত বলে তাদের নতুন নাম ব্রহ্মাণ্ড বহির্ভূত নীহারিকা (Entre-Galectic Nebule)। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুসারে এই নাক্ষত্র নীহারিকাগুলোর প্রত্যেকেই কয়েক হাজার কোটি তারকার সমষ্টিতে গড়া এক একটা ব্রহ্মাণ্ড। আর এ রকম অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সমবায়ে গঠিত এ মহাবিশ্ব বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড ছাড়া আরও তিনটি ব্রহ্মাণ্ডকে অনুকূল পরিবেশে পৃথিবী থেকে খালি চোখে দেখা যায়। 3নং তালিকায় তাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া গেলো।

তালিকা-3

ব্রহ্মাণ্ডের নাম	অবস্থান	পৃথিবী থেকে দূরত্ব	বিস্তৃতি	উপস্থিত তারার সংখ্যা
1. বৃহৎ ম্যাগেল্লানীয় মেঘ	দক্ষিণ গোলার্ধের আকাশে	1 লক্ষ 70 হাজার আলোকবর্ষ	30 হাজার আলোকবর্ষ	150 কোটি
2. লঘু ম্যাগেল্লানীয় মেঘ		2 লক্ষ 50 হাজার আলোকবর্ষ	25 হাজার আলোকবর্ষ	100 কোটি
3. অ্যাণ্ড্রোমিডা	উত্তর গোলার্ধের আকাশে	20 লক্ষ আলোকবর্ষ	2 লক্ষ আলোকবর্ষ	30 হাজার কোটি

সর্বাধিক উচ্চতা প্রায় কুড়ি হাজার আলোকবর্ষ। ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র থেকে প্রায় ত্রিশ হাজার আলোকবর্ষ দূরে আমাদের সূর্য অবস্থিত। নির্মল অন্ধকার আকাশে আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডটিকে দেখায় যেন সাদা ধোঁয়া বা মেঘের তৈরী সড়কের মতো। তাই বুঝি এর নাম ছায়াপথ বা আকাশগঙ্গা। আন্তর্নক্ষত্র মহাকাশ, আমাদের এই ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের ধারক।

আন্তর্ব্রহ্মাণ্ড মহাকাশ—আন্তর্নক্ষত্র মহাকাশের সীমানার বাইরে ব্যাপৃত মহাকাশের যে অংশ, সেখানে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের মতো কয়েক-শ কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সন্ধান পেয়েছেন। কাজেই, মহাকাশের এই অংশের নামকরণ করা হয়েছে আন্তর্ব্রহ্মাণ্ড মহাকাশ। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে অত্যন্ত শক্তিশালী দূরবীন আর ক্যামেরার সাহায্যে সংগৃহীত সাক্ষ্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন যে মেঘের টুকরোর মতো দেখতে নীহারিকাগুলো দু-ধরণের। ওদের কতগুলো লঘু গ্যাসের পিণ্ড, আর বাকী সব পরস্পরের অত্যন্ত কাছে অবস্থিত অসংখ্য তারকার সমষ্টি বিশেষ। প্রথম শ্রেণীর বস্তুগুলোকে গ্যাসীয় নীহারিকা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর বস্তুগুলোকে নক্ষত্র নীহারিকা নাম দেওয়া হয়। গ্যাসীয় নীহারিকাগুলোর আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই। তাই এদের অপর নাম ব্রহ্মাণ্ডভুক্ত নীহারিকা (Galectic Nebule)।

এ ছাড়া, আরও প্রায় দু-শ' কোটি ব্রহ্মাণ্ডের পরিচয় ইতিমধ্যেই পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক তালিকাভুক্ত হয়েছে। আর তাত্ত্বিক গণনার ভিত্তিতে অনাবিষ্কৃত আরও অনেক ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়েছে। জানা গেছে যে তারাদের মতো ব্রহ্মাণ্ড সকলও আছে মহাকাশের স্থানে স্থানে জোটবদ্ধ হয়ে। এমন এক একটা জোটকে বলা হয় ব্রহ্মাণ্ডজোট বা ব্রহ্মাণ্ডদল (Cluster of galaxies)। আমাদের ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড যে জোটের মধ্যে আছে তার নাম স্থানীয় জোট। এর মধ্যে আছে প্রায় 80টি ব্রহ্মাণ্ড। এটা একটা ছোট ব্রহ্মাণ্ড জোট।

যে সব ব্রহ্মাণ্ড জোটে উপস্থিত ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা 100 থেকে 500 এর মধ্যে তাদের বলা হয় মাঝারি জোট। যেমন, সিংহ জোট (Leo cluster)। 500 এর বেশী সংখ্যক ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে যে জোট, তাদের বলে বৃহৎ জোট। উদাহরণ—কন্যাজোট (Virgo cluster)। ব্রহ্মাণ্ডগুলির আকৃতিও আবার তিন ধরণের হয়ে থাকে।

1. কুণ্ডলিত ব্রহ্মাণ্ড—উদাহরণ—ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড, অ্যাণ্ড্রোমিডা (M-31) ব্রহ্মাণ্ড, M-32 এবং M-33 ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি। 2. অনিয়তাকার ব্রহ্মাণ্ড—উদাহরণ—বৃহৎ ম্যাগেল্লানীয় মেঘ এবং লঘু ম্যাগেল্লানীয় মেঘ। 3. উপবৃত্তাকার ব্রহ্মাণ্ড—উদাহরণ—ভোলফ্ লুণ্ডমার্ক ব্রহ্মাণ্ড।

ব্যাটারী চার্জার

সুপ্রকাশ ঘোষ*

টর্চ, রেডিও, টেপরেকর্ডার প্রভৃতি ব্যাটারী নিয়ন্ত্রিত বৈদ্যুতিক সরঞ্জামে নির্জল কোষ (dry cell) ব্যবহার করা হয়। এই নির্জল কোষের স্থায়িত্ব খুব বেশী দিনের নয়। কিছুদিন পরেই এদের কার্যক্ষমতা হ্রাস পায়, ফলে নূতন ব্যাটারী ব্যবহার করতে হয়। এই সমস্ত নির্জল কোষসমূহকে পুনরায় কাজ চালাবার উপযোগী করে তোলার উপায়ের কথা বলা হচ্ছে।

তার আগে বলা প্রয়োজন, নির্জলকোষকে নির্জল বলা হলেও তা আদৌ নির্জল নয়। এই কোষে দস্তার চোঙটি ক্যাথোড হিসাবে আর পিতলের টুপিযুক্ত কার্বন দণ্ড অ্যানোড হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই দুইয়ের মধ্যখানের শূন্যস্থান পূর্ণ করা হয় ম্যাঙ্গানীজ ডাই-অক্সাইড, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, কার্বনচূর্ণ ও জল সহযোগে প্রস্তুত লেই দিয়ে, উপরের দিকটা পীচ দিয়ে সীল করে দেওয়া হয়। এই কোষের তড়িচ্চালক বল (e.m.f.) দাঁড়ায় 1·5v থেকে 1·6v।

তড়িৎ সরবরাহের সময় ম্যাঙ্গানীজ ডাই-অক্সাইড অক্সিজেন ত্যাগ করে ও জিঙ্ক সেই অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়ে জিঙ্ক-অক্সাইডে পরিণত হয়। এই জন্যে পুরানো ব্যাটারীর দস্তার চোঙটি সচ্ছিদ্র হয়ে উঠতে দেখা যায়। যদি ব্যাটারীর চোঙটি এইভাবে সচ্ছিদ্র না হয়ে থাকে, তবেই ব্যাটারীকে আলোচ্যপন্থায় নবীকরণ করা সম্ভব। এই প্রক্রিয়ার মূল কার্যপদ্ধতি অনেকটা তড়িৎ প্রলেপনের সমধর্মী। এতে ক্যাথোড থেকে অ্যানোডের তড়িৎপ্রবাহ চালনার ফলে জিঙ্ক-অক্সাইড আয়নিত জিঙ্ক মুক্ত করে, যা দস্তার চোঙের ওপর নিস্তড়িৎ হয়ে জমা হয়, অক্সিজেন আয়নও অনুরূপে ম্যাঙ্গানীজ ডাই-অক্সাইড গঠন করে। ফলে কোষটি পুনঃকার্যক্ষম হয়।

এখানে একসঙ্গে দুটি ব্যাটারীকে চার্জ (charge) করার ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যাটারী চার্জারের ডায়াগ্রাম দেওয়া হলো।

প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি :

ক.	সিলিকন রেকটিফায়ার		BY 126
খ.	T. ট্রানসফরমার : প্রাই		230v. AC.
	সেকে :		6·3v. AC.
গ.	রেজিস্টর	1. 10ω	2 watt
		2. 150ω	1 watt

এছাড়া লাগবে একটি নিওন ল্যাম্প, ব্যাটারী বক্স, অন/অফ সুইচ, তার ইত্যাদি।
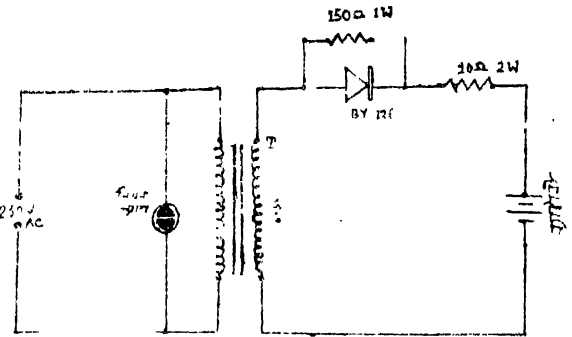
চিত্রানুসারে যন্ত্রাংশগুলি লাগালেই যন্ত্র প্রস্তুত। মনে রাখা দরকার, সম্পূর্ণভাবে discharged ব্যাটারীকে এই পদ্ধতিতে নবীকরণ করা সম্ভব নয়। ব্যাটারীর তড়িচ্চালক বল যখন 1·2v-এর নীচে নামে, তখনই এটিকে আলোচ্য পদ্ধতিতে পুনঃকার্যক্ষম করা সুবিধাজনক।

নীচে বিভিন্ন ধরনের ব্যাটারীর চার্জের জন্যে প্রয়োজনীয় সময় দেওয়া হলো :—

টাইপ নং	প্রয়োজনীয় সময়
1015	4— 6 ঘণ্টা
1035	6— 9 ঘণ্টা
1055	12—15 ঘণ্টা

সমস্ত যন্ত্রটি তৈরি করতে আনুমানিক 30 টাকা লাগবে।

*কল্যাণনগর, পোঃ—পানশিলা, 24 পরগণা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্যগণকে অনুরোধ করা যাচ্ছে তাঁরা যেন তাঁদের দেয় 1984 খৃস্টাব্দের বার্ষিক চাঁদা 25·00 টাকা 20.2.84 তারিখের মধ্যে পরিষদ কার্যালয়ে জমা দেন। নচেৎ তাঁদেরকে সব মাসের পত্রিকা দেওয়া (1984) সম্ভব হবে না। কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট,
কলিকাতা-7006

নভেম্বর '83 সংখ্যায় প্রকাশিত 'ভেবে উত্তর দাও'-র উত্তর

1. (ক) 14 ভাগ 2. (খ) M.S.H. বা মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং হর্মোন 3. (গ) ভিটামিন 4. (খ) 1·5 লিটার 5. (গ) হেপাটিক পোর্টাল শিরা 6. (খ) প্যালিঅ্যান্টোলজি 7. (গ) ইউগ্লিনা 8. (ঘ) ATP বা অ্যাডিনোসিনট্রাইফসফেট 9. (গ) 9টি 10. (ক) 28 বার।

নভেম্বর '83 'ভেবে উত্তর দাও'-র উত্তরদাতাদের নাম

সব ঠিক—ভানু চক্রবর্তী, লিলি, অমর ও আল্পনা, বর্ধমান, তাপসকুমার আলু, মেদিনীপুর দেবব্রত, অঞ্জনা, বাচ্চু, বৈরাগ্য, সমাধা, স্বাগতা, মিণ্টে, প্রদীপ, রামচন্দ্র চৌধুরী, বর্ধমান, সঞ্জয়, লতিকা সামন্ত, দেবকুমার সরকার, মাণ্টু, বর্ধমান দেবকুমার, অম্বালিকা, শুভেন্দু, মান্তু, তাপস, অশোক, টুটুন, রাজা হুগলী দেবজ্যোতি ও দেবশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, নৈহাটি, রিণ্টি শেঠ, চন্দননগর, সুদীপ্ত মণ্ডল, 24-পরগণা, বিপ্লব, পদ্মা, চম্পা সামন্ত বর্ধমান, জয় বাবুল, বাচ্চু, টিঙ্কু, সোমনাথ বসুমল্লিক, কলিকাতা-700074, মুনমুন, বুবুন, ঝুমা, কলিকাতা-56, ভাস্করজ্যোতি পাল, হুগলী।

1টি বাদে—সুশান্ত, শ্রাবণী, সানু, মেদিনীপুর, শিবশঙ্কর সমাজদার, হাওড়া, বাবলু সাধুখাঁ খড়দহ, গৌতম, অশোক শীল, কলিকাতা-4, সমীরকুমার সেন 24-পরগণা, প্রাণতোষ, মন্দিরা রায়, বর্ধমান, সর্বাণী, দেবজ্যোতি, দীপক ষড়ঙ্গী মেদিনীপুর, নিতাইচন্দ্র পাল হাওড়া-6, মলয় শীল, কলিকাতা-74, সিলভার 54, 24-পরগণা, তারক অধিকারী, স্বপন গোস্বামী রাণাঘাট, অনিমেষ ভট্টাচার্য, সমর মণ্ডল, নবনীতা মুখার্জী, মামনি, মিঠুন বিষয়ী বর্ধমান, দুখকুমার দাস, হুগলী।

নভেম্বর '83 সংখ্যায় প্রকাশিত 'শব্দ-শৃঙ্খলের' সমাধান

ফ্লো	রি	জে	ন	X	ঘা	ম
রি	X	না	X	হা	ত	X
ন	X	র	বা	র	X	না
X	কা	X	X	পে	X	সা
চু	ন	পে	ক	টো	রা	ল
ম্ব	X	X	সা	ল	X	X
ক	ন	কো	ল	জী	X	X

পাশাপাশি—1. ফ্লোরিজেন 3. ঘাম 4. হাত 5. রবার 8. চুন 9. পেকটোরাল 11. কনকোলজী।

উপর নীচ—1. ফ্লোরিন 2. জেনার 3. ঘাত 4. হারপেটোলজী 6. কান 7. নাসাল 8. চুম্বক 10. কপাল।

নভেম্বর '83 সংখ্যায় প্রকাশিত 'শব্দ-শৃঙ্খলে'র সমাধানকারীদের নাম

সব ঠিক—তাপস দাশ, দীপায়ন, শুভ্র ও জয় চক্রবর্তী, 24 পরগণা।

নভেম্বর '83 সংখ্যায় প্রকাশিত ধাঁধার সমাধান

1. দেখা যাচ্ছে 'গুণফল' 'গুণ্য' থেকে

$[6000-100-50+2]=5852$ বেশী

$\because$ 'গুণ্য' এবং 'গুণফল' দুটোই চার অঙ্কের সংখ্যা, গুণক 10 এর কম হতে বাধ্য। গুণক যদি 'k' হয় তাহলে 5852; (k−1) দ্বারা বিভাজ্য হতে বাধ্য; এবং গুণফল, $\frac{5852\times k}{(k-1)}$ এবং গুণ্য $\frac{5852}{(k-1)}$। এখন 5852; '2', '4' এবং '7' দ্বারা

বিভাজ্য অতএব 'k' (গুণক) '3', '5' অথবা '8'। '3' বা '8' হলে সর্ত পূরণ হয় না অতএব গুণ্য 1463, গুণক '5' এবং গুণফল 7315।

2. মনে করা যাক প্রথমে রামের H_1টি ঘোড়া এবং C_1টি গরু ছিল। অতএব তাদের পা ছিল (H_1+C_1) 4টি এবং শিং ছিল $2C_1$টি।

$$\text{এখন}\ \frac{\text{পা}}{\text{শিং}} = \frac{(H_1+C_1)\,4}{2C_1} = \frac{5}{1}$$

$$\therefore\ H_1 : C_1 :: 3 : 2$$

মনে করি ঘোড়া ছিল 3Pটি এবং গরু ছিল 2Pটি অর্থাৎ গরু ও ঘোড়ার মোট সংখ্যা ছিল $(3P+2P)=5P$

পরের বারে মনে করা যাক (আরো গরু ও ঘোড়া কেনার পরে) ঘোড়া হলো H_2টি এবং গরু হলো C_2টি। তখন পা ও শিং-এর অনুপাত 3 : 1 হতে হলে আগের মতই দেখা যাবে ঘোড়া ও গরুর অনুপাত 1 : 2 হতেই হবে।

অতএব মনে করি ঘোড়া (H_2) হলো 'K'টি এবং গরু (C_2) হলো '2K' টি অর্থাৎ মোট (H_2+C_2) হলো $(K+2K)=3K$টি

এখন $(H_2+C_2)-(H_1+C_1)=3K-5P=15$

$\therefore\ 5P+15-3K$ (K এবং P অবশ্যই ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা)

এই সমীকরণ থেকে 'P' এবং 'K' এর (3, 10), (6, 15), (9, 20)····· ইত্যাদি মান পাওয়া যায়।

প্রথম মান (3, 10) নিলে দেখা যাবে তার প্রথমে ছিল '9' টা ঘোড়া ও '6' টা গরু এবং পরে হয় '10' টা ঘোড়া ও '20' টা গরু। এটাই উত্তর।

অন্য সব মান নিলে গরু ও ঘোড়ার সংখ্যা মোট 15টি বাড়ে ঠিকই, কিন্তু ঘোড়া কমে যায়।

পুস্তক পরিচয়

আমাদের দৃষ্টিতে গণিত : প্রদীপ মজুমদার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, মূল্য—7 টাকা।

কোন বিষয় সম্বন্ধে সম্যক আলোচনার জন্য উৎস, গতি, প্রকৃতি ও ভবিষ্যৎ অবশ্যই বিবেচ্য। এ সূত্রে পুস্তকটি মোটামুটি নিখুঁত এবং আলোচনার উৎকর্ষে, প্রকাশভঙ্গীর নৈপুণ্যে, ভাষার সাবলীলতায় বিজ্ঞান সাহিত্যে এ এক অমূল্য সংযোজন। লেখক যদিও ভূমিকায় ইঙ্গিত দিয়েছেন—পুস্তকটি গণিতের ইতিহাস, কিন্তু আলোচনার ব্যাপ্তিতে, উপস্থাপনার সংহতিতে, স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গিতে, উপসংহার নির্ধারণের পরিপ্রেক্ষিতে পুস্তকটি গণিতের ইতিহাস নয়, শুধু বাস্তবোচিত মূল্যায়ন নয়, বরং বলা যেতে পারে গণিতের দর্শন। গণিত অনুমানগ্রাহ্য সূক্ষ্ম জগৎ, গণিত বিজ্ঞানের ভাষা, গণিত বিজ্ঞান মানসিকতা গঠনে ও যুক্তি-নির্ভর সমাজ গঠনে সহায়ক—এসব অভিব্যক্তি লেখকের মননশীলতার পরিচায়ক।

পুস্তকটিতে আছে দশটি অধ্যায়। প্রথম চারটি অধ্যায়ে গণিতের উদ্ভব, গণিতের সৃজন, গাণিতিক চিন্তার উন্মেষ, গাণিতিক তত্ত্ব ও প্রকল্পের ধারাবাহিকতার কথা যুক্তিপরম্পরায় পরিবেশিত। পরের অধ্যায়গুলি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। এখানে গণিত ও গণিতজ্ঞের সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য শিল্প ও মনস্তত্ত্বের উপর প্রভাব এবং তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ বহু উপমা ও উদ্ধৃতিসহ লেখকের নিজস্ব চিন্তাধারা সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। তবে এই প্রতিফলনে কিছু কিছু অসঙ্গতি চোখে পড়ে ও মূল্যায়নের যথার্থতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ ঘটে। নমুনা হিসাবে—"গাণিতিক সত্য কখনই পরম সত্য নয়। গণিতবিদরা সনাতন সত্যের মাধ্যম দিয়ে একটি বিশ্ব চেতনাকে অন্য একটি বিশুদ্ধ চেতনায় সংক্রমিত করেছেন। এই দুই উক্তি পরস্পর বিরোধী। ভারতে ধর্মের জন্যই গণিতের উন্নতি ও প্রচার ঘটেছিল, ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান পঙ্গু, লক্ষ্য ও মূল্যবোধ নিয়েই ধর্মের কাজ, গণিতের সঙ্কট মোচনে ও উন্নতি হ্রাসরোধে গণিতজ্ঞকে নোবেল পুরস্কার বা আন্তর্জাতিক সম্মান প্রদান অপরিহার্য, প্রভৃতি অবমূল্যায়ন বলেই মনে হয়। অসাবধানতাবশতঃ বেশ কিছু বানান ভুল আছে। এ সব সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি ছাড়া পুস্তকটি গণিতের উষা থেকে বর্তমান পর্যন্ত বহু সমস্যার পর্যালোচনায় উদ্ভাসিত।

রতনমোহন খাঁ

পরিষদ সংবাদ

গত 3রা ডিসেম্বর (1983) বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে পরিষদ ভবনে আয়োজিত নবম বার্ষিক "শিবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-বক্তৃতা প্রদান করেন শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'বিজ্ঞান সংবাদপত্র ও সাধারণ মানুষ।" সভায় সভাপতিত্ব করেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি ডঃ সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র।

ভ্রম সংশোধন—নভেম্বর '83 সংখ্যা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র 425 পৃষ্ঠায় অচিন্ত্যকুমার 'পাওা'র স্থলে হবে 'পাজা'

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক বিষয়সূচী

জুলাই থেকে ডিসেম্বর, 1983

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক লেখক সূচী

জুলাই থেকে ডিসেম্বর, 1983

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006 থেকে প্রকাশিত
এবং গুপ্তপ্রেশ, 37/7, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-700 009 হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

আবেদন

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর আবক্ষ মূর্তি নির্মাণ তহবিল

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে "সত্যেন্দ্র ভবনে" (পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-6) পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর একটি আবক্ষ মূর্তি স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করবার জন্য অবিলম্বে ত্রিশ হাজার টাকার প্রয়োজন। এই মহান কাজে সহৃদয় জনসাধারণ, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য, পৃষ্ঠপোষক, শুভানুধ্যায়ীকে উদার ভাবে "আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর আবক্ষ মূর্তি নির্মান তহবিলে" অর্থদান করবার জন্য আবেদন করছি। সকল দান কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700006 এই ঠিকানায় (চেক / ড্রাফট পাঠালে Bangiya Bijnan Parishad লিখে) পাঠাতে অনুরোধ করছি।

সভাপতি

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

আবেদন

1948 সাল থেকে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা বিষয়ে পরিকল্পিত ধ্যান ধারণা পরিষদ পালন করে আসছে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রকাশনের মাধ্যমে। ইতিমধ্যে পরিষদ কিছু অমূল্য রচনা বাংলাভাষায় প্রকাশ করেছে। বর্তমান পত্রিকা প্রকাশনা ছাড়াও পরিষদ বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতার বিকাশ ঘটে। গ্রাম বাংলার পল্লীতে, আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে ও শহরের বস্তিতে, যেখানে বেশীর ভাগ মানুষ জ্ঞানের আলো থেকে এখনও বঞ্চিত, তাদের কাছে বিজ্ঞানের মঙ্গলময় রূপ তুলে ধরতে পরিষদ বদ্ধপরিকর। এইসব বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মসূচীর রূপায়নে অর্থের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অথচ পরিষদের দারুণ অর্থাভাব। তাই পরিষদ সরকার, বেসরকারী সংস্থা, ব্যবসায়ী ও সহৃদয় ব্যক্তির কাছে অর্থসাহায্যের আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছে। সাধারণ মানুষের জন্য তৈরী আচার্য্য বসুর পরিষদ যে কোনও সামান্য দানও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করে অবহেলিত মানুষের স্বার্থে ব্যয় করবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে পরিষদে প্রদত্ত সর্বপ্রকার দান আয়করমুক্ত।

কর্মসূচী

1. সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা সৃষ্টি করা এবং বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তোলা।
2. 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকাকে সাধারণের নিকট আরও আকর্ষনীয় করে তোলা।
3. পরিষদের মাধ্যমে গ্রামবাংলার বিজ্ঞান ক্লাবগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা এবং তাদের বিজ্ঞান ভিত্তিক জনহিতকর কাজে উৎসাহিত করা।
4. প্রতি বছরে পশ্চিম বাংলায় অন্ততঃ একবার বিজ্ঞান সম্মেলনের ব্যবস্থা করা।
5. গ্রামবাংলার বিভিন্ন মেলায় বিজ্ঞান ক্লাবগুলিকে নিয়ে পোস্টার প্রদর্শনী, বিজ্ঞানভিত্তিক সিনেমা, আলোচনা চক্র অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞান, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করা।
6. বছরের শেষে বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা।
7. হাতে-কলমে কারীগরী বিদ্যা শিখিয়ে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রী ও নাগরিকদের স্বনির্ভরশীল করা। ব্যয়ভার বহনের জন্য সামান্য অর্থের বিনিময়ে টি. ভি. টেপরেকর্ডার, রেকর্ড-প্লেয়ার, ট্রানজিস্টার এমারজেন্সি বৈদ্যুতিক আলো, ফটোগ্রাফী বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া।
8. মাটি পরীক্ষার কাজে শিক্ষা দিয়ে গ্রামের বিজ্ঞান ক্লাবগুলিকে সাধারণ চাষীদের সাহায্য করতে উৎসাহিত করা।
9. সাধারণ মানুষের জন্য বিজ্ঞান প্রবন্ধ থেকে মৌলিক গবেষনাপত্র পর্য্যন্ত বাংলা ভাষায় প্রকাশ এবং জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বই ও বিজ্ঞান সাধক চরিতমালা প্রকাশ।
10. যোগব্যায়াম ও তার গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন।
11. পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারটি সুসমৃদ্ধ করে গড়ে তোলা।
12. পরিষদ ভবনে 'বিজ্ঞান সংগ্রহশালা' স্থাপন করা।
13. নির্বিচারে যথেচ্ছ গাছপালা ও বনজঙ্গল ধ্বংসের ফলে পরিবেশ দূষণ ও আবহাওয়ার মারাত্মক পরিবর্তনের ভয়াবহতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সজাগ করা।
14. নির্বিচারে বন্যপ্রাণী ধ্বংসের দরুণ বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যের বিঘ্ন ঘটার বিপদ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা।
15. যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করা।
16. শহর ও গ্রামের প্রতিটি স্কুল, কলেজ ও গ্রন্থাগারে পরিষদের মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার গ্রাহকীকরণের মাধ্যমে পরিষদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচার।

সুকুমার গুপ্ত
কর্মসচিব

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

মার্চ, 1984

37তম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা

বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের অনুশীলন করে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও সমাজকে বিজ্ঞান-সচেতন করা এবং সমাজের কল্যাণকল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করা পরিষদের উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন লেখকদের স্বাধীন মতামত বা মৌলিক সিদ্ধান্তসমূহ পরিষদের বা সম্পাদকমণ্ডলীর চিন্তার প্রতিফলন হিসাবে সাধারণতঃ বিবেচ্য নয়।

বিষয় সূচী

প্রচ্ছদ পরিচিতি : সমাজবদ্ধতার প্রবৃত্তি মনুষ্যেতর জীবের মধ্যেও কেমন প্রকট তারই চিত্র তুলে ধরা হয়েছে প্রচ্ছদে। বিবর্তনের ধারায় উচ্চ স্তন্যপায়ী প্রাণী-বর্গের (Primates-এর) অন্যতম উন্নত প্রজাতিই মানবগোষ্ঠী। উন্নত বানর (Apes—শিম্পাঞ্জী, গরিলা) থেকে ক্রমবিবর্তনের ধারায় দ্বিপদচারী নর-পূর্ব অষ্ট্রালোপিথেকাস ও নিয়ানডার্থাল গোষ্ঠীর পরবর্তী পর্যায়ে পূর্ণমানব হোমোসেপিয়ানস প্রজাতির উদ্ভব। [প্রচ্ছদের ডানদিকে উপরের কোণে এই তিন প্রজাতির দৈহিক বিবর্তনের ক্রমিক চিত্র]। সমগ্র প্রাইমেটস বর্গের (বানর, নর-পূর্ব ও নর-গোষ্ঠীর) দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সামাজিকতার অনুভূতি পরিস্ফুট। এই সমাজ বন্ধনের মূলসূত্র হচ্ছে সন্তান স্নেহ ও তার সুরক্ষার ব্যবস্থা। সন্তানের জন্যই জননীর যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণের সহজাত প্রবৃত্তি আদিম আরণ্যক জীবন থেকে বিবর্তনের ধারায় সভ্য মানব প্রজাতির সুষ্ঠু সমাজ চেতনায় রূপান্তরিত। জননী ও সন্তানকে কেন্দ্র করেই আদিম পরিবারের উৎপত্তি। তারপরে আত্মীয়তা-বন্ধনে এবং জীবন সংগ্রামের প্রয়োজনে বৃহত্তর গোষ্ঠী ও সমাজজীবনের ক্রমবিকাশ। তাতে পরিবেশ অনুসারে বিভিন্ন নিয়মকানুন, আচার-অনুষ্ঠান ও ভাষা-সংস্কৃতি প্রভৃতির ক্রমিক উদ্ভব।

প্রচ্ছদের মূল চিত্রে : জঙ্গলে একটি বেবুন পরিবারের ছবি। নবজাত শিশুসহ বেবুন জননী। স্থানান্তরকালে তাদের সুরক্ষায় আগে পিছে দুটি বয়স্ক বেবুন। সামনে পথের নিরাপত্তা পরীক্ষায় অগ্রণী ভূমিকায় এক বেবুন যুবক। আদিম পারিবারিক সম্পর্ক, শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধের একটি সুস্পষ্ট চিত্র। উন্নত মানবসভ্যতায় বর্তমান ও ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য এই একান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রিক অনুভূতি আজ কোথায় কি অবস্থায়!

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সপ্তত্রিংশত্তম বর্ষ মার্চ 1984 তৃতীয় সংখ্যা

সমাজবদ্ধতা—জীবনের সহজাত প্রবৃত্তি

নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষই শুধু সমাজবদ্ধ জীব নয়, মনুষ্যেতর সব জীবের মধ্যেই এই সমাজবদ্ধতা ভাব কম বেশী রয়েছে। জীবনের আদিমতম রূপ এককোষী জীব অ্যামিবাদের মধ্যে সেই সমাজ-চেতনা কী ভাবে কাজ করে গত ফেব্রুয়ারী (1984) মাসের জ্ঞান ও বিজ্ঞানে "মস্তিষ্কবিহীন সমাজ" প্রবন্ধে সেই কথা বৈজ্ঞানিক তথ্য হিসাবে প্রকাশিত। জীবনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে এই সমাজবদ্ধতা বা সংঘবদ্ধ জীবনের প্রবৃত্তি ও প্রক্রিয়ার নানা পরিবর্তন বা বিবর্তন ঘটেছে। তবে জ্ঞাতিত্বের টান (Kinship) যে বিশেষ আত্মীয়তার অনুভূতি সৃষ্টি করে সেটা সেই আদিম জীবন অ্যামিবাদের মধ্যেও প্রকট। অ্যামিবাদের বহু গোষ্ঠী বা প্রজাতি আছে। তবে বিপদে-আপদে ঐ জ্ঞাতিত্বের সূত্র ধরেই সামাজিকতার আকর্ষণ প্রকাশ পায়। গোষ্ঠীপার্থক্যে সামাজিক টানও পৃথক হয়ে যায়। এককোষী জীব থেকে বহুকোষী জীবে রূপান্তরে মূলত সেই একই প্রবৃত্তিই (Instinct) কাজ করেছে। জনিত্রীকোষ বিভক্ত হয়ে যেসব অপত্যকোষ (daughter cell) তৈরি হয়েছে—তারা পৃথক হয়ে দূরে সরে না গিয়ে আত্মীয়তা সূত্রে মিলিত জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয় এবং দৃঢ় সংঘবদ্ধ বহুকোষী জীবে রূপান্তরিত হয়। এই একত্রিত সম্মিলিত জীবনে বেঁচে থাকার জন্য একক কোষের যে আদিম কর্মধারা তা তো ঠিক থাকলই উপরন্তু মিলিত কোষসমূহের পারস্পরিক সহযোগিতা সুদৃঢ় করে শারীর-সংস্থানের বিভিন্ন অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন কোষের বিশেষ ধরনের পৃথক কাজের প্রয়োজনীয়তাও দেখা দেয়। সেই অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ স্থানের কোষ পৃথক ভাবে বিশেষ কাজের দায়িত্ব নেয় এবং কালক্রমে সেই কাজে তারা দক্ষ হয়ে উঠে (specialisation)। যেমন বহুকোষের মিলিত শরীরের বাইরের অংশের কোষ আত্মরক্ষার কাজে বিশেষ জোর দেয়, আর ভিতরের অংশের কিছু কোষকে খাদ্য পরিপাকে মন দিতে হয় এবং সেই ভাবে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এই ভাবে প্রত্যেক কোষের নিজের বাঁচার কাজ ছাড়া প্রয়োজন অনুযায়ী বিশেষ কাজের দায়িত্বও নিতে হয় এবং সম্মিলিত জীবনের তাগিদে শ্রম ভাগের নিয়মে আলাদা বিশেষ কাজের ভার নিয়ে নিয়মিত ভাবে তা পালন করেও চলে। এই ভাবেই বহুকোষী শরীরে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৃষ্টি। আর এটাই তো সমাজ-চেতনা ও সমাজ-ব্যবস্থার আদিম রূপ। জীবনের ক্রমবিকাশের প্রাথমিক স্তর থেকেই শরীরের প্রত্যেকটি কোষের মধ্যে তা সহজাত প্রবৃত্তি হিসাবে স্থিরীকৃত এবং বংশ-গতির ধারায় কোষমধ্যস্থ বংশাণু (Gene) বা জিনের মধ্যে জেনেটিক কোড হিসাবে তা সংরক্ষিত। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অভিব্যক্তির ধারায় বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন প্রজাতির জীব সৃষ্টি হয়ে চলে। তাতে ক্রমোন্নত জীবনের বিকাশ ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত মানব প্রজাতির উদ্ভব হয়েছে। এই বিভিন্ন প্রজাতি সৃষ্টির মূলে এবং জীবনের সামগ্রিক বিকাশে মস্তিষ্ক নামক অঙ্গ (Organ)-টির স্থান অতি নগণ্য ও অর্বাচীন। কারণ জীবদেহে এই অঙ্গটির উদ্ভব হয়েছে বহু পরে, জীবন সৃষ্টির লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর পরে। কালের দিক থেকে সমগ্র জীবন প্রবাহের বৃহত্তর অংশই যেমন মস্তিষ্কবিহীন তেমনি সংখ্যার দিক থেকেও জীব-জগতের বেশীর ভাগ প্রজাতির দেহেই এ মস্তিষ্ক নামক পৃথক অঙ্গের কোন অস্তিত্ব নেই। সুতরাং জীবন প্রবাহের স্বাভাবিক ধারায় অভিব্যক্তির ফলে উন্নত মস্তিষ্কের অধিকারী হয়ে মানব প্রজাতি যখন তাদের নিজেদের সমাজ ব্যবস্থা ও অন্যবিধ সংঘবদ্ধ জীবনের সূচনা করে তখন তার মস্তিষ্ক নামক অঙ্গটির বাহাদুরি কতখানি কাজ করেছে আর কতখানি তার সহজাত প্রবৃত্তি ঐ জেনেটিক কোডের মাধ্যমেই

ঘটেছে তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। অতীতের অনেক অতিকায় প্রাণীদের মত কোনও কারণে এই পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে যদি মানব প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যায় তবে তাতে পৃথিবীর সমগ্র জীবজগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে এমন কথা বলা যায় না। তখন হয়তো অবশিষ্ট প্রাণ-জগত থেকে নতুন প্রাণের সৃষ্টি হবে এবং অভিব্যক্তির ধারায় আরও নতুন প্রজাতিও জন্মাবে। বর্তমান মানব প্রজাতিই জীবনের ক্রমবিকাশের একেবারে শেষ পর্যায় এবং সর্বোন্নত পর্যায় বা প্রজাতি ; তাও বলা যাবে না। সুতরাং মস্তিষ্কের বিশেষ ক্ষমতায় যে স্মৃতি, মননশীলতা বা বিচারবুদ্ধি ও বিবেকের কথা আমরা বলি নিজেদের অস্তিত্ব অর্থাৎ মানব প্রজাতির সামগ্রিক অস্তিত্ব বজায় রাখা এবং তার ভবিষৎ বংশধরদের সুনিশ্চিত উন্নত জীবন-যাপনের ব্যবস্থাপনায় সেই মস্তিষ্কের বাহাদুরি কতখানি কার্যকরী হবে তা নির্ভর করছে কীভাবে তাদের সম্মিলিত সংঘবদ্ধ জীবন অর্থাৎ তাদের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ চলবে, তারই উপর। জীবনের সামগ্রিক বিকাশে সংঘর্ষ নয়, পারস্পরিক সহযোগিতা, সহিষ্ণুতা ও দায়িত্ব বোধই ব্যক্তি ও গোষ্ঠীজীবনের অস্তিত্ব বজায় রাখায় কাজের মূলমন্ত্র। সমগ্র সমাজ ব্যবস্থায় ও রাষ্ট্র পরিচালনায় সেই কথাই গুরুত্ব দিয়ে আজ ভাবতে হবে উন্নত মস্তিষ্কের অধিকারীদের। মস্তিষ্কবিহীন সমাজ কোটি কোটি বছর ধরে তাদের অস্তিত্ব ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে এই পারস্পরিক সহযোগিতা সহিষ্ণুতা এবং একনিষ্ঠ দায়িত্ববোধের দ্বারাই। আর উন্নত মস্তিষ্কের মানবসমাজ ধ্বংসের বিভীষিকায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে নিজেদের মধ্যে স্বার্থান্বেষী সংঘর্ষে মত্ত হয়ে, সহিষ্ণুতা ও পাস্পরিক সহযোগিতার আন্তরিকতা থেকে সরে গিয়ে, সর্বোপরি যেযার কাজের দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যসম্পাদনের ব্রত থেকে বিচ্যুত হয়ে। ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনে, সমাজে ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে কবে এবং কীভাবে সেই পরস্পরের আন্তরিক সহযোগিতা, পরম সহিষ্ণুতা ও একান্ত দায়িত্ববোধ বলিষ্ঠভাবে ফিরে আসবে সেই পথের নির্দেশই আজ দিতে হবে সমাজকর্তা ও দেশনেতাদের। না হলে মানব প্রজাতির ভবিষ্যত বংশধরদের নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে।

দূষিত বায়ু গমের ক্ষতি করে

অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি ছাড়াও আর একটি গ্যাস বায়ুতে থাকে—ওজোন। অধুনা আমেরিকার নিউইয়র্কস্থিত কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের 'দি বয়েস থমসন ইনস্টিটিউট ফর প্ল্যান্ট-রিসার্চ'-এ গবেষণার দ্বারা জানা গেছে বায়ুমধ্যস্থিত ওজোন গ্যাস গমের ক্ষতি করে। এই গ্যাস গাছের বয়স খুব তাড়াতাড়ি বাড়িয়ে ফেলে এবং গমের দানাও এর দ্বারা ছোট হয়ে যায়।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের দুটি স্তরে এই ত্রিপরমাণু অক্সিজেনযুক্ত গ্যাস ওজোন পাওয়া যায়। প্রথমতঃ এটি পাওয়া যায় বায়ুমণ্ডলের একেবারে উপরিভাগে যেখানে এই গ্যাস সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মিকে ছেঁকে পাঠায় পৃথিবীতে এবং এইভাবে পৃথিবী এই রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পায়। এই গ্যাস আবার পাওয়া যায় পৃথিবীর কাছাকাছি। বায়ুমণ্ডলের নীচের স্তরে, মোটর গাড়ী থেকে বহিষ্কৃত গ্যাসের সঙ্গে বায়বীয় অক্সিজেনের আলোযুক্ত রাসায়নিক বিক্রিয়ার থেকে এর জন্ম।

আমেরিকায় ফসল নষ্ট হওয়ার জন্য এই ওজোনদূষিত বাতাসকে 90 শতাংশ ভাগ দায়ী করা হয়। এই গ্যাস একক ভাবে বা সালফার ও নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড-এর সঙ্গে মিলিত ভাবে ফসলের এই ক্ষতি সাধন করে।

এই পরীক্ষার জন্য আমেরিকার সবচেয়ে জনপ্রিয় গমের জাত ব্যবহার করা হয়। মজার ব্যাপার এই জাতটিই আবার ওজোন দোষের শিকার। এই দোষের দ্বারা বিভিন্ন জাত বিভিন্ন পরিমাণে প্রভাবিত হয়। কেন এমন হয় এ নিয়েও গবেষণার প্রয়োজন আছে।

[ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ]

ধানের 'অমৃতকুম্ভ'

রতনলাল ব্রহ্মচারী*

'জেনেটিক এঞ্জিনীয়ারিং' আজকের দিনে বহু পঠিত, বহু আলোচিত বিষয়। কিন্তু একদিকে যেমন বিজ্ঞানের অতিদ্রুত অগ্রগতির ফলে, কৃত্রিম উপায়ে বাইরের জিন (gene) ঢুকিয়ে সৃষ্টির নূতন দিগন্ত খুলে দেওয়া যাচ্ছে, তেমনি আবার চরম অবহেলার ফলে অনেক বিস্ময়কর জিনিস চিরতরে লুপ্ত হতে বসেছে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বিবর্তিত হয়ে অনেক পশুপাখী, গাছপালা তাদের বিশেষ জিনগুলি অর্জন করেছে, হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ নিজেই চেষ্টা করেছে নূতন ধরণের পোষা প্রাণী, শস্য ইত্যাদি তৈরি করতে। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ওতপ্রোতভাবে এইসব প্রাণী আর উদ্ভিদের বিবর্তন।

শত শত ঘাস জাতীয় উদ্ভিদের কয়েকটি মাত্র প্রজাতি আশ্চর্য রকম ভাবে বদলে গিয়ে ধান, গম, ভুট্টা ইত্যাদিতে পরিণত হয়েছে। অতি আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার ফলে, নানা সংকর ঘটিয়ে কয়েকটি উচ্চ-ফলনশীল স্ট্রেন (strain) তৈরি হয়েছে। এই ধানগুলি আজ প্রায় সারা পৃথিবী ছেয়ে ফেলেছে, আর সেই সঙ্গে লুপ্ত হচ্ছে এশিয়ার সুপ্রাচীন অনেক জার্ম-প্লাজম (germ-plasm)। এখন আবার বিজ্ঞানীরা তৎপর হয়েছেন এই জার্ম-প্লাজমের 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে।'

সিংহলে—একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় প্রাচীন সিংহলে (300-400) বিভিন্ন রকমের ধান ছিল, যার অধিকাংশই আজ হয় বিলুপ্ত, নয়তো কোন সুদূর অঞ্চলে কয়েকটি গ্রামে টিঁকে আছে। একজন নিরক্ষর প্রান্তিক চাষী বলছেন—"আমার মনে আছে, শুধু লাল ধানেরই 123 রকমফের ছিল।" The Ecologist পত্রিকার রিপোর্টার এই চাষীকে প্রশ্ন করে জানতে পারলেন আশ্চর্য তথ্যাবলী। এই সব বিভিন্ন ধানের বিশেষ বিশেষ গুণ ছিল। কতগুলি যেন আধুনিক জেনেটিক এঞ্জিনীয়ারদের স্বপ্ন,—ইচ্ছামত gene ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যেন।

6-8 মাসে পাকে এরকম একটি ধান বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের প্রয়োজনে তৈরি হয়েছিল। এই সন্ন্যাসীরা দিনে একবার মাত্র আহার করেন, রাতে কিছুই খান না। এই দীর্ঘ সময়ে তাঁরা যেন ক্ষুধায় একেবারে কাতর না হয়ে পড়েন, তার জন্য এই ধান বেশী মাত্রায় প্রোটিনসম্পন্ন, পুষ্টিকর। আবার আর একটা ছিল মায়েদের প্রয়োজনে। তাঁদের স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি পেত ঐ চালের ভাত খেলে। আবার যারা মাঠে-ঘাটে কায়িক পরিশ্রম বেশী করতেন তাঁদের জন্য প্রচুর কার্বহাইড্রেট যুক্ত মোটা চালের বন্দোবস্ত ছিল। কোন কোন ধান ছিল খুব শুষ্ক অঞ্চলে চাষের উপযোগী, কোনটা বা বেশী জলে-ভেজা জমির জন্য, কোনটা বা পোকার অপছন্দ। সেকালে প্রতি চাষী পরিবার বেশ কয়েক রকম ধান লাগাতেন,—তাই অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি বা পোকার উৎপাত সত্ত্বেও মোটামুটি খেয়ে বেঁচে থাকবার মত ফসল তাঁরা ফলাতে পারতেন। প্রায় সর্বত্রই কাছাকাছি অরণ্য ছিল। অরণ্যসম্পদ আহরণ করা ছাড়াও চাষের পক্ষে বনের উপকারিতা তাঁরা বুঝতেন। তাঁরা (এবং ভারতের কোন কোন চাষীরা) বলেন, আগের দিনে পোকার উপদ্রব অনেক কম ছিল (অধিক ফলনের জন্য পুরস্কৃত ওড়িশার কোন কোন চাষী বলছেন, ক্রমাগত বেশী সার ও পোকা মারার ওষুধ ব্যবহারের ফলে, লাভের গুড় ঐ সার আর ওষুধ কোম্পানীই খেয়ে নিচ্ছে। এমন সময় হয়তো আসবে যখন চাষ ব্যাপারটা অলাভজনক ব্যবসা হয়ে দাঁড়াবে)। সার ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে পোকারা যেন আমন্ত্রিত হয়ে আসছে আর বংশবৃদ্ধি করছে। আগেকার ধানগাছগুলি ছিল লম্বা আর নরম, সব সময় বাতাসে আন্দোলিত হত; এখনকার ধানগাছ বেঁটে, আর শক্ত। হয়তো সেজন্যই পোকারা সেখানে আরও সহজে বাসা বাঁধে। যাহোক, সিংহলের সেই প্রান্তিক চাষীর মতে, তখনকার দিনে সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করত বিশেষ একটা পোকার শুঁককীট। ধানচারা একটু বড় হলে পঙ্ককাল সময় এই পোকার উপদ্রব ছিল সবচেয়ে বেশী। চাষীরা নারকেলের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিতেন ক্ষেতে। এক ধরণের ছাতারে পাখী এসে তা খেত এবং সেই সঙ্গে ঐ শুঁয়োপোকাদের ধ্বংস করত। এছাড়া, ছেলেমেয়েরা খেলাচ্ছলে একরকম গাছের আঠা মাখানো দড়ি ক্ষেতের মধ্য দিয়ে টেনে নিয়ে যেত। এভাবে অনেক পোকা ধরা পড়ত। অনেকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের পুরোনো গেরুয়া বসন চেয়ে এনে সেগুলি কেটে এক রকম উদ্ভিদজাত তেলের সাহায্যে রাতের বেলা আগুন জ্বালিয়ে পোড়াত।

---

* ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট, 203, বি. টি. রোড, কলিকাতা-700035

গৈরিক বস্ত্রের রং (সেটাও উদ্ভিদজাত) উজ্জ্বল শিখা জ্বালিয়ে পুড়ে যেত, তাতে অনেক পোকা ধ্বংস হত, গন্ধে অনেক পোকা পালিয়ে যেত।

ধানক্ষেতে একর প্রতি ৪টি বিশেষ ধরণের গাছ লাগানো হত। এখন জানা গেছে ঐ গাছ 'নাইট্রোজেন ফিকসিং' জীবাণুর সাহায্যে জমিকে উর্বরা করে। ঐ গাছের পাতাও মাটিতে পড়ে, পচে, জমির নাইট্রোজেন বাড়িয়ে দেয়। আবার বড় বাদুড়গুলি এসে ঐ গাছের ফল খেত এবং ওখানে মলত্যাগ করার ফলে ঐ মলও জৈব সারের কাজ করত।

ভারতে—1889 খৃস্টাব্দে Voelker ভারতের কৃষিব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করার উদ্দেশ্যে ইংল্যাণ্ড থেকে চলে আসেন। চার বছর ধরে ভারতের নানাস্থানে কৃষিকাজ দেখে-শুনে তিনি একটি বিরাট রিপোর্ট দাখিল করেন। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য বক্তব্য হল,—ভারতের কৃষিবিদ্যা এতই উন্নত যে তুলনামূলকভাবে ব্রিটেন অনেক পিছিয়ে আছে। যেখানে ভারতীয় চাষী বেশী ফসল ফলাতে পারছে না সেখানে তার প্রকৃত কারণ হল এই যে, তারা অতি দরিদ্র, শোষিত, পৃথিবীর আর কোথাও হয়তো এত সংখ্যায় চিরবঞ্চিত মানুষ নেই। অর্থাৎ, চাষীদের কৃষি-বিষয়ক জ্ঞান-বুদ্ধির দীনতা নয়, তাঁদের দুঃখজনক অবস্থাই এর জন্য দায়ী। যেখানেই এই মানুষগুলি একটু সুযোগ সুবিধা পেয়েছে সেখানেই তাঁদের বিচার-বুদ্ধি ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। Voelker এবং আরও আগে (1878 খৃস্টাব্দে) Hume কৃষিবিজ্ঞানে ভারতীয় চাষীদের গভীর জ্ঞান লক্ষ্য করে চমৎকৃত হয়েছিলেন।

ভারতের শত-শত বা হাজার হাজার দেশজ ধানের জার্ম প্লাজম লুপ্ত হতে বসেছে। আজকাল আর কার্তিকসাল, ক্ষীরসাল, গোবিন্দভোগ, মুক্তাহার, হনুমানলোটা, দুধলুচিয়া, কুমরগইরা ইত্যাদি নামও বিশেষ শোনা যায় না। শুধুমাত্র মুড়ির জন্য হামাই, হোগলা, গেরিমুঠি, গোপালভোগ, মেজুরদারি, পানকলস প্রভৃতি ধান পশ্চিমবঙ্গে এখনও পরিচিত।

ওড়িশায় খৈরী-খ্যাত সিমলিপালের অভয়ারণ্যে প্রবেশ করার আগে, আশেপাশে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে গ্রামবাসীরা মার্ত, কন্টিপার্দ, কর্ণশাল, রঙ্গী, শুঙ্গী, হুক, পিম্পুরিবাস, হলদিগুণ্ডি ইত্যাদি নানা রকমের ধান লাগিয়েছেন। মার্ত বেশী ভেজা বা জলা জায়গায় ভাল ফলন দেয়, কর্ণশাল থেকে সরু চাল হয়, রঙ্গীর সুন্দর রং থেকে তার নামকরণ, শুঙ্গী (সাঁওতালি ঃ পাতু-কোইরা)। শুঙ্গী ধানের শিষে লম্বা শুঁয়া থাকার জন্য ছাগল, হরিণ ইত্যাদির উৎপাত ঐ গাছ কিছুটা ঠেকাতে পারে; পিম্পুরি (পিঁপড়ে) আর বাস (গন্ধ) থেকে বোঝা যাবে চালটা পিঁপড়ের মত ছোট আর এতে গন্ধ (সুগন্ধ—পিঁপড়ের গন্ধ নয়) রয়েছে (এ ধরণের চালকে আমরা চিনিগুড়া নামে চিনতাম পূর্ববঙ্গে)। হলদিগুণ্ডি বা হলুদগুঁড়ি নাম, এ চালের হলুদ রং আর ছোট আকার বোঝায় (যশীপুরে এ চালের খোঁজ করতে দোকানে গুড়ো হলুদের প্যাকেট ধরিয়ে দিয়েছিল)। এছাড়া নোনা জলে জন্মায় এ রকম ধানও রয়েছে ওড়িশায়।

কটকের ধান গবেষণা কেন্দ্রের প্রাক্তন ডিরেক্টর শ্রীরিচারিয়া মহাশয় মধ্যপ্রদেশের সুদূর গ্রামে আদিবাসীদের চাষ করা নানা রকমের ধানক্ষেত পর্যবেক্ষণ করেছেন। কতগুলি দেশী জাতের ধানের উৎপাদন ক্ষমতা বিদেশী উচ্চফলনশীল ধানের মতই

শুংগী ধান

বা তার চেয়েও বেশী। সিংহলের সেই প্রাচীন চাষীর মত এই আদিবাসীরা নানা রকমের ধান চাষ করতেন এবং এগুলির বিভিন্ন গুণগত বৈশিষ্ট্য ভাল করেই জানতেন। মোকদো, চিনার, অমরজ্যোতি, রানীকাজার, হাচী, দুবরাজ, লুচাই ইত্যাদি ধানের গুণগুলি শ্রীরিচারিয়া ও শ্রীডোগরা লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

জার্ম প্লাজম সংরক্ষণ—গত শতাব্দীর শেষ দিকে আয়ারল্যাণ্ডে আলুর ক্ষেতে একটা Virus ব্যাপক ক্ষতি করে। সেদেশে সাধারণ লোকের প্রধান খাদ্যই তখন আলু। এই বিপুল ক্ষয়-ক্ষতির ফলে তখন 10 লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে মারা যান। বর্তমানে বিশ্বে যে হারে অতি অল্পসংখ্যক উচ্চ ফলনশীল ধানের প্রজাতি ছড়িয়ে পড়ছে, তাতে virus ইত্যাদির ব্যাপক আক্রমণ একটি সম্ভাব্য বিপদ। এ ঘটনা

ঘটলে তখন হয়তো আরও প্রতিরোধ শক্তিসম্পন্ন ধানের জাতের সঙ্গে সংকর সৃষ্টি করে ঐ রোগের আক্রমণ প্রতিহত করা যেতে পারে। কিন্তু সেসব ধানের জাত বিলুপ্ত হয়ে গেলে আর কিছুই করা সম্ভব হবে না। এছাড়াও নানা গুণসম্পন্ন দেশজ ধানগুলিকে নষ্ট হতে দিয়ে, পরে জেনেটিক এঞ্জিনীয়ারিং-এর সাহায্যে আবার সেগুলি নূতন করে তৈরি করার প্রচেষ্টা অর্থহীন ও হাস্যকর।

দুই লক্ষ জাতের (200,000) ধান বর্তমান পৃথিবীতে জার্ম-প্লাজম হিসাবে রক্ষা করা হয়েছে। এর মধ্যে ষাট হাজার (60,000) এশিয় ধান ফিলিপাইনে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা কেন্দ্রে রয়েছে, তিরিশ হাজার (30,000) আছে দিল্লীতে

বন্য ধান (ছোট) ও রঙ্গী ধান

আর কটকে পনের হাজারের (15,000) কিছু বেশি। উল্লেখযোগ্য যে, ফিলিপাইনের ঐ 60,000 সংগ্রহের মধ্যে একটি মাত্র ধান grassy stunt virus প্রতিরোধ করতে সক্ষম। এটি পাওয়া গেছে উত্তরপ্রদেশে। আফ্রিকান ধানের (oryra glaberrina) সংগ্রহ রয়েছে ফিলিপিনে (2575) আর ইবাদানে (1515)। (কিন্তু যদিও পৃথিবীতে আলু, রাঙ্গা আলু আর মশুর ডালের যথাক্রমে 44,000 ; 3650 ; 5400 জার্ম-প্লাজম সংগ্রহ করা হয়েছে, ভারতে এসব সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই)।

কিন্তু শুধু ধান নয়, নানা রকম ঘাসের বীজ এখনও তৃতীয় বিশ্বের অনেক লোকের খাদ্য, অন্ততঃ বিশেষ বিশেষ সময়ে। তাই এগুলি রক্ষা করাও প্রয়োজন। কোন অনুর্বর অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের সময় হয়তো এর সাহায্যেই কোনমতে বেঁচে থাকা সম্ভব। আফ্রিকার কৃষি ও পক্ষিতত্ত্ব গবেষণায় বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছিলেন লেসলি ব্রাউন (Leslie Brown)। তাঁর একটি রচনা পড়ে জানতে পারি, ইথিওপিয়া দেশে কি বিপুল

রঙ্গী ধান, বন্য ধান (মাঝে) ও লাল ঘাসের বীজ

সংখ্যক লোক ঘাসের বীজের ওপর নির্ভরশীল। এছাড়া, কৃষি ও উদ্ভিদবিদ্যার গবেষণার স্বার্থেও এসব ঘাসের সংরক্ষণ প্রয়োজনীয়।

শেভালিয়ে (Chevalier)-র মতে সাহারা মরুতেই সম্ভবত চাষযোগ্য শস্যের উৎপত্তি হয়েছিল। এখানে বুনো ধান ও খাওয়ার উপযুক্ত ঘাসের বীজ পাওয়া যেত। সাহারার পশ্চিমে সাহিলে (Sahel—প্রায় মরু অঞ্চল) দুর্ধর্ষ টুয়ারেগ বা টামাশেক জাতির লোকেরা এখনও কয়েক রকম Panicum, Eragrostis ও Echinochloa প্রজাতির ঘাসের বীজ প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করেন। Panicum বীজ 2-3 বছর রেখে দেওয়া যায়, আর তা খুব সহজপাচ্য।

পৃথিবীর নানা দুর্গম ও অরণ্যসংকুল প্রদেশে বহু প্রজাতির বুনো ধান ও মোটা দানার ঘাস রয়েছে, 'অমৃত কুম্ভগুলি' যত্ন-সহকারে রক্ষা করা কর্তব্য।

ছবিতে সিমলিপালের গভীর অরণ্যে সংগ্রহ করা একটি বুনো ধান এবং এক ধরণের পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত লাল ঘাসের বীজ দেখা যাচ্ছে। এই ঘাসের বীজ কয়েকটি আমিও সিদ্ধ করে খেয়ে দেখেছি। এসব বীজ নিয়ে কিছু রাসায়নিক পরীক্ষা করা প্রয়োজন; কারণ, জানা আছে, ইথিওপিয়ার এক ধরনের বার্লি (Barley)-তে বেশি পরিমাণ লাইসিন (Lysin) রয়েছে। কোন কোন প্রজাতির ভুট্টাতেও এই গুরুত্বপূর্ণ অ্যামিনো অ্যাসিডটি বেশি পরিমাণে পাওয়া গেছে।

মানব সভ্যতার বিকাশে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে কয়েকটি ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ, যা থেকে ধান, গম, ভুট্টা ইত্যাদি বিবর্তিত হয়ে কৃষিভিত্তিক সভ্যতা সম্ভব করে তোলে। এক অর্থে, পরবর্তী বিজ্ঞান—দর্শন—যন্ত্রসভ্যতাও তাই ঐ ঘাসেরই অবদান!

ঘাস থেকে Emmer আর তারপর আধুনিক গম—বিবর্তনের এক চমকপ্রদ নিদর্শন। পৃথিবীর ইতিহাসে হয়তো বহুবার Emmer জাতীয় ঘাসের উৎপত্তি হয়েছিল, কিন্তু বাতাসে এর ভারি দানাগুলি ছড়িয়ে যেত না, হয়তো বীজের dispersal সম্ভব ছিল না বলে সেই mutation-এর সুফল ফলে নি। প্রজাতিটি বারে বারে লুপ্ত হয়েছে, হয়তো বা পিঁপড়ে ইত্যাদির সাহায্যে অতি সীমিত ক্ষেত্রে টিঁকে ছিল। কিন্তু একসময় বুদ্ধিমান মানুষ আর এই উদ্ভিদের সমাপতন ঘটল, তখন মানুষ এর অঙ্কুরোদগম লক্ষ্য করে বীজগুলি ছড়িয়ে দিয়ে বপন করতে লাগল। আরম্ভ হল, উদ্ভিদ আর মানুষের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। এর পর থেকে আরও mutation-এর সুফলগুলি মানুষ ভোগ করতে লাগল; সযত্নে সেগুলিকে লালন-পালন করে চলল, শিকার ও সংগ্রহ (food gathering) ধীরে ধীরে চাষ-আবাদের তুলনায় গৌণ স্থান অধিকার করল। সভ্যতার বিবর্তন ঘটল।

অদৃশ্য শত্রু—ব্যাকটিরিয়া

ঝর্ণা রায়চৌধুরী*

অতি প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন রোগের আক্রমণে জনজীবন বারে বারে বিপর্যস্ত হয়েছে। পঞ্চম শতাব্দীতে পিলোপনেসিয়ান (Peloponesian) যুদ্ধের সময় প্লেগ রোগের আক্রমণে এথেন্সের অর্ধলক্ষ লোক বিশেষতঃ পেরিক্লিসের (Pericles) মৃত্যুতে গ্রীসের বিপর্যয় ঘটে। অনেকের ধারণা রোম সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ প্লেগ রোগ। এই রোগের আক্রমণে চতুর্দশ শতাব্দীতে ইউরোপে এক চতুর্থাংশ লোকের মৃত্যু হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (1914-18) যত লোকক্ষয় হয়েছিল তার দু-গুণ লোকের মৃত্যু হয়েছিল যুদ্ধোত্তর ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে। আমাদের দেশে কলেরা, বসন্ত রোগে বহু প্রাণহানি ঘটেছে, বহু জনপদ ধ্বংস হয়ে গেছে। বর্তমানে এসব রোগ নিয়ন্ত্রিত হলেও একেবারে নির্মূল হয় নি। এইসব রোগ কয়েক প্রকার আণুবীক্ষণিক জীবাণু (microbe) দ্বারা সৃষ্টি হয়। রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুরা হলো—(1) প্রোটো-জোয়া—অতি ক্ষুদ্র প্রাণী বিশেষ, (2) ব্যাকটিরিয়া—অতি ক্ষুদ্র এককোষবিশিষ্ট উদ্ভিদ, (3) ভাইরাস—সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র জীবাণু। ব্যাকটিরিয়া ও প্রোটোজোয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা গেলেও ভাইরাসকে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না।

উনবিংশ শতাব্দীতে লুই পাস্তুরের (1822-95) গবেষণার ফলে জানা যায় যে জীবাণু দ্বারা নানা রোগ সৃষ্টি হয়। 1675 খৃস্টাব্দে হল্যাণ্ডের ডেলফ্‌ট (Delft) শহরের ব্যবসায়ী ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রস্তুতকারক এ্যানটন ভন লিউয়েনহুক (Anton Van Leeuwenhoek)—1632-1723) তার প্রস্তুত অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে 1675 খৃস্টাব্দে সর্বপ্রথম অদৃশ্য একপ্রকার গতিশীল প্রাণের সন্ধান পান। তিনি এদের নাম দেন ক্ষুদ্রজীব (animalcules)। 1676 থেকে 1719 খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে লণ্ডনের রয়াল সোসাইটিকে তাঁর আবিষ্কারের বিষয় জানান। আবিষ্কারের গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাঁকে সোসাইটির সদস্য মনোনীত করা হয়। তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লস্, প্রথম জর্জ ও রাশিয়ার জার পিটার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন।

জার্মানীর জীববিজ্ঞানী কার্ল থিয়োডোর আর্নস্ট সিবোল্ডের (Karl Theodor Ernst Siebold) গবেষণা থেকে জানা যায় যে এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী এককোষবিশিষ্ট। এদের নামকরণ করা হয় প্রটোজোয়া। 1773 খৃস্টাব্দে অটো ফ্রেডারিক মূলার (Otto Fredriek Muller) অতি ক্ষুদ্র

* মডার্ন ইনস্টিটিউশন, কসবা, কলিকাতা

দণ্ডাকৃতি ও প্যাঁচানো ধরণের দু-প্রকার কোষের সন্ধান পান। পরবর্তীকালে অস্ট্রিয়ার শল্যচিকিৎসক থিয়োডোর বিলরথ (Theodore Billroth) আরো একপ্রকার ক্ষুদ্রাকৃতি গোলাকার (coccus) কোষের সন্ধান পান। জার্মান উদ্ভিদবিদ ফারডিনান্ড জুলিয়াস কন (Ferdinand Julius Cohn) এইসব কোষের নামকরণ করেন ব্যাকটিরিয়া।

ব্যাকটিরিয়া অতি ক্ষুদ্র জীবাণু। 1 ঘনইঞ্চিতে প্রায় 9×10^{12} সংখ্যক ব্যাকটিরিয়া থাকতে পারে। অতি শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া এদের দেখা সম্ভব নয়। সেজন্য দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্য আমরা যে রৈখিক একক ব্যবহার করি তার দ্বারা এদের পরিমাপ করা যায় না, এদের পরিমাপের জন্য প্রয়োজন এক ক্ষুদ্র রৈখিক একক। এই রৈখিক একককে বলা হয় মাইক্রন যা μ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এক মাইক্রন $(1\mu) = \cdot 001$ মিমি. অর্থাৎ এক মিলিমিটারের হাজার ভাগের এক ভাগ। অধিকাংশ ব্যাকটিরিয়ার দৈর্ঘ্য 2μ-10μ এবং প্রস্থ 1μ। ক্ষুদ্রাকৃতি গোলাকার ব্যাকটিরিয়ার ব্যাস $0{\cdot}4\mu$, স্ট্যাফাইলোকক্কাস (Staphylococcus) এবং স্ট্রেপটোকক্কাস (Streptococcus) ব্যাকটিরিয়ার ব্যাস $\cdot 75\mu - 1.25\mu$ দণ্ডাকৃতি (আমাশয়, টাইফয়েড) ব্যাকটিরিয়ার দৈর্ঘ্য $2\mu - 3\mu$।

ব্যাকটিরিয়ার কোষের মধ্যে স্বচ্ছ জেলির মত পদার্থকে কোষবস্তু বা সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm) বলা হয়। কোষের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত কেন্দ্রবস্তু (Nucleus)। কোষের বাইরের থাকে দৃঢ় কোষপ্রাচীর। অনেক কোষপ্রাচীর একপ্রকার পিচ্ছিল বা জেলিজাতীয় পদার্থ দ্বারা আবৃত থাকে। এই আবরণকে বলা হয় ক্যাপসুল (capsule)। ক্যাপসুল পলিস্যাকরাইড (Polysacchrides) বা পলিপেপটাইড (Polypeptide) দ্বারা গঠিত। ব্যাকটিরিয়ার কোষপ্রাচীর দৃঢ় হলেও এর কোষপ্রাচীরে কোন সেলুলোজ (Cellulose) নেই; আছে Hexosamine নামে এক প্রকার পদার্থ Glucosamine ও Maramic অ্যাসিডের যৌগদ্বারা গঠিত। বিভিন্ন ব্যাকটিরিয়ার কোষপ্রাচীরের গঠন ও রাসায়নিক উপাদানের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কোষপ্রাচীর রং করার পদ্ধতি অনুযায়ী ব্যাকটিরিয়াকে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করা যায়।

কয়েক প্রকার ব্যাকটিরিয়ার গায়ে রোমাকৃতি শুঁড় বা রোঁয়া (flagella) দেখা যায়। এই শুঁড়ের সাহায্যে ব্যাকটিরিয়া এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে। প্রয়োজন বোধে ব্যাকটিরিয়া কোষের যাবতীয় পদার্থ একত্রে জড়ো করে বীজ বা রেণুতে (spores) পরিণত হয়। রেণু জলে-বাতাসে ভাসতে ভাসতে দূর দূরান্তে চলে যেতে পারে; এবং প্রচণ্ড তাপ ও শৈত্য প্রতিরোধ করে বহুদিন নিষ্ক্রিয়ভাবে বেঁচে থাকতে পারে। উপযুক্ত পরিবেশ ও খাদ্য পেলে রেণু থেকে ব্যাকটিরিয়ার সৃষ্টি হয়।

ব্যাকটিরিয়া উদ্ভিদ জগতের অন্তর্ভুক্ত হলেও তাদের মধ্যে ক্লোরোফিল নেই। তাই তারা নিজেদের খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না। খাদ্যের জন্য তারা অপরের উপর নির্ভরশীল। সেই জন্য তারা মৃত জৈব পদার্থ অথবা পরজীবীরূপে উদ্ভিদ বা প্রাণীদেহের উপর জন্মায়। যে সব ব্যাকটিরিয়া বিনা অক্সিজেনে বেঁচে থাকতে পারে তাদের অবায়ুজীবী (anerobic) এবং যারা অক্সিজেন ব্যতীত বাঁচতে পারে না তাদের বলা হয়ে বায়ুজীবী (aerobic)।

ব্যাকটিরিয়ার জন্মের হার দ্রুত। উপযুক্ত পরিবেশে 24 ঘণ্টায় একটি ব্যাকটিরিয়া থেকে কয়েক লক্ষ ব্যাকটিরিয়ার জন্ম হতে পারে। সাধারণতঃ ব্যাকটিরিয়ার কোষ বরাবর বিভাজন হয়। অনেক ক্ষেত্রে বিভাজনের পর কোষ পৃথক হয়ে যায়। কখন কখন কোষগুলি পৃথক না হয়ে পরস্পরের গায়ে লেগে থাকে এবং দলবদ্ধ থেকে বিভিন্ন আকৃতি গঠন করতে পারে। সাধারণতঃ গোলাকার ব্যাকটিরিয়ার এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যে সব গোলাকার ব্যাকটিরিয়া আঙুরের থোকার মত জড়ো হয়ে থাকে তাদের বলা হয় স্টাফাইলোকক্কি (Staphylococci), যারা শৃঙ্খলাকারে থাকে তাদের স্ট্রেপটোকক্কি (Streptococci) এবং যারা জোড়ায় জোড়ায় থাকে তাদের বলা হয় ডিপলোকক্কি (Diplococci)।

সপ্তদশ শতকে ব্যাকটিরিয়া আবিষ্কৃত হলেও লুই পাস্তুর কর্তৃক জীবাণু ও রোগসংক্রান্ত মতবাদ প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত ব্যাকটিরিয়া আবিষ্কারের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায় নি। মৃত জীবজন্তুর দেহে নানা প্রকার প্রাণের আবির্ভাব লক্ষ্য করে অনেকের ধারণা হয়েছিল যে প্রাণের আবির্ভাব স্বতঃস্ফূর্তভাবে হয়। কিন্তু পাস্তুর প্রমাণ করলেন যে প্রাণ থেকেই প্রাণের সৃষ্টি হয়; জড় থেকে প্রাণের সৃষ্টি হতে পারে না। তাঁর পরীক্ষা থেকে জানা যায় যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু দ্বারা শর্করা দ্রব্য গেঁজে (fermentation) যায় এবং রেশমের গুটি (Silkworm) রোগাক্রান্ত হয়। এই সব রোগজীবাণু বাতাসে ভেসে থাকে এবং উপযুক্ত পরিবেশ পেলে নানা রোগ সৃষ্টি করে। পাস্তুরের পূর্বে হাঙ্গেরীর চিকিৎসক ইগনজ ফিলিস সোমেলভাইস (Ignaz Phellis Somelewiss) অনুমান করেছিলেন যে জীবাণু দ্বারা রোগ সংক্রামিত হয়। হাসপাতালে প্রসূতি রোগের (puerperal) মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি অনুমান করেছিলেন যে ধাত্রী ও চিকিৎসক দ্বারা এই রোগ এক দেহ থেকে অন্য দেহে সংক্রামিত হয়। জীবাণুনাশক ক্লোরিন মিশ্রিত জলে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করে ভিয়েনার হাসপাতালে ঐ রোগের মৃত্যুর হার কমিয়ে আনতে সমর্থ হলেও তাঁর কাজের গুরুত্ব চিকিৎসকরা উপলব্ধি করতে পারে নি। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মত পার্থক্য হওয়ায় তিনি ভিয়েনার হাসপাতাল ত্যাগ করে বুদাপেস্টের হাসপাতাল প্রসূতিরোগের মৃত্যুর হার কমিয়ে আনতে সমর্থ হন। অবশেষে 1865 খৃষ্টাব্দে তিনি মারা যান। এবং ঐ বৎসরই পাস্তুর রোগ ও জীবাণু সংক্রান্ত মতবাদ প্রকাশ করেন।

পাস্তুরের রোগ ও জীবাণু সংক্রান্ত মতবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর চিকিৎসাবিজ্ঞানে বিভিন্ন দিকে দ্রুত ও অভাবনীয় অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। ইংল্যাণ্ডে লিস্টারের প্রচেষ্টার ফলে পচন নিবারক অস্ত্রবিদ্যার (antiseptic surgery) জন্ম হয়। অন্যদিকে যাঁরা জীবাণু সংক্রান্ত গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে জার্মানীর চিকিৎসাবিদ্‌ রবার্ট ককের (Robert Koch—1843—1903) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কক কঠিন মাধ্যমে জীবাণু আবাদ (culture) করে কোন ব্যাকটিরিয়ার জীবাণু কি রোগ সৃষ্টি করে তা নির্ণয়ের জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। তাঁর গবেষণার ফলে আবিষ্কৃত হয় অ্যানথ্রাক্স (Anthrax) রোগের জীবাণু Bacillus Anthracis, তিনি 1882 খৃস্টাব্দে যক্ষ্মার রোগজীবাণু Mycobacterium Tuberculosis এবং ভারতে ও মিশরে কলেরা সংক্রান্ত গবেষণা করে 1884 খৃস্টাব্দে কলেরার জীবাণু Vibrio comma পৃথক করতে সমর্থ হন। তার কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করে 1905 খৃস্টাব্দে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। 1890 খৃঃ স্পেনের জীবাণুবিদ জেইমি ফেরান (Jaime Feran) কলেরার টিকা প্রস্তুত করতে সমর্থ হলেও পাদ্রীদের বিরোধিতায় তা প্রয়োগ করতে সমর্থ হন নি। 1892 খৃস্টাব্দে রাশিয়ার হোফকেন (Hoff kane) তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে কলেরার টিকা প্রস্তুত করেন। 1893 খৃস্টাব্দে এডউইন ক্লেবস্‌ (Edwin Klebs) ডিপথিরিয়ার রোগজীবাণু Corynebacterium diptheriae আবিষ্কার করেন। এরপর একে একে প্লেগ, ধনুস্টংকার প্রভৃতি মারাত্মক রোগের জীবাণু আবিষ্কৃত হয়। ককের গবেষণার ফলে এক নূতন বিদ্যার সূত্রপাত হয়। এই বিদ্যাকে বলা হয় জীবাণুতত্ত্ব (bacteriology), এবং কককে এই বিদ্যার জনক বলা হয়।

মানুষ ছাড়াও গৃহপালিত প্রাণীদের মধ্যে গরুর যক্ষ্মা, ঘোড়া, ছাগল ও গরুর সেপটিমিয়া ও কৃষ্ণপদ (black leg), উদ্ভিদদের মধ্যে কুমড়া জাতীয় গাছের উইল্ট রোগ, আলুর রিংরট, টম্যাটোর ক্যাংকার প্রভৃতি রোগ ব্যাকটিরিয়ার দ্বারা সৃষ্ট হয়।

সব ব্যাকটিরিয়া আমাদের ক্ষতি করে না, অনেক ব্যাকটিরিয়া আমাদের নানাভাবে উপকারও করে। কয়েক প্রকার ব্যাকটিরিয়া আমাদের অন্ত্রে পরজীবীরূপে বাস করে আমাদের সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। কয়েক প্রকার ব্যাকটিরিয়া তৃণভোজী গরু, ছাগল প্রভৃতির প্রাণীর অন্ত্রে বাস করে খাদ্যকে পরিপাক করতে সহায়তা করে। কয়েক প্রকার ব্যাকটিরিয়া মাটির উর্বরা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

জীবাণুরা খাদ্য, পানীয়, বাতাসের মাধ্যমে ও দেহের সংস্পর্শে এক দেহ থেকে অন্য দেহে সংক্রামিত হয়। কিন্তু বিভিন্ন ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণের পথ বিভিন্ন। সেইজন্য কেবলমাত্র নির্দিষ্ট পথে শরীরে প্রবেশ করে নির্দিষ্ট স্থানে উপনীত হলে ব্যাকটিরিয়া রোগ সংক্রমণে সমর্থ হয়। তাই লক্ষ্য করা যায় শ্বাসনালী, গলা, ফুসফুসের রোগ (যেমন হুপিংকাশি, ডিপথিরিয়া, নিউমোনিয়া প্রভৃতি) জীবাণু বাতাসের মারফৎ শ্বাসনালী পথে; পাকস্থলী বা অন্ত্রের রোগ (যেমন কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয় ইত্যাদি) জীবাণু খাদ্য ও পানীয়ের দ্বারা মহাস্রোত পথে টিটেনাস জীবাণু চর্মের ক্ষতের মধ্য দিয়ে ও গনোরিয়ার জীবাণু জনেন্দ্রিয়, মূত্রনালী ও নেত্রবর্মের মধ্য দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে রোগ সংক্রমণে সমর্থ। ব্যাকটিরিয়ার এক প্রকার বিষ নিঃসরণ করে রোগ সৃষ্টি করে। কোষ নির্বাচনে বিষের অদ্ভুত মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। আমাশয়, টিটেনাস, বচুটিজম রোগের বিষ নার্ভতন্তুকে আক্রমণ করে। অপর পক্ষে স্টাফাইলোকক্কির জীবাণুর বিষ Laukocidin রক্তের শ্বেত কণিকা এবং কোন কোন প্রকার স্ট্রেপটোকক্কি (Streptococci) জাতীয় জীবাণুর বিষ Hemolysins লোহিত কণিকা বিনষ্ট করতে সক্ষম।

বিষকে দু-ভাগে ভাগ করা হয়—অন্তর্বিষ (Endotoxin) ও বহির্বিষ। বিষ উৎপন্ন হবার পর যদি বিষ জীবাণুকোষ থেকে মুক্ত হয় তবে তাকে বহির্বিষ বলে আর যদি বিষ জীবাণুর কোষে সঞ্চিত থাকে তবে অন্তর্বিষ বলা হয়। এই বিষ কেবলমাত্র জীবাণুকে পেষণ করে নিষ্কাশন করা সম্ভব। বিষ শরীরে কেবলমাত্র বিষক্রিয়া করে না, অ্যান্টিজেনরূপে ক্রিয়া করে অ্যান্টিবডি উৎপাদন করতে সমর্থ। অন্তর্বিষের তুলনায় বহির্বিষের বিষক্রিয়া প্রবল এবং শক্তিশালী অ্যান্টিজেনরূপে ক্রিয়া করে। অন্তর্বিষ বহু প্রকার ব্যাকটিরিয়ার দ্বারা উৎপন্ন হলেও বহির্বিষ মাত্র কয়েক প্রকার ব্যাকটিরিয়া দ্বারা উৎপন্ন হয়।

অন্তর্বিষ জীবাণুর কোষে সঞ্চিত থাকে। কেবলমাত্র গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটিরিয়া এই বিষ উৎপাদনে সক্ষম। প্রোটিন, লিপিড পলিস্যাকারাইড যৌগ দ্বারা এই বিষ গঠিত। তাপে এই বিষ বিনষ্ট হয় না। অন্তর্বিষের ক্রিয়া লিপিডের উপর নির্ভর করে সেইজন্য যে সব ব্যাকটিরিয়া অন্তর্বিষ উৎপাদন করে তাদের বিষক্রিয়ার মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ লক্ষ্য করা যায়।

বহির্বিষ উৎপন্ন হলেই ব্যাকটিরিয়ার কোষ থেকে তা নিঃসৃত হয়। বহির্বিষ একপ্রকার প্রোটিন। বিভিন্ন বহির্বিষের প্রোটিন বিভিন্ন বিষক্রিয়া অ্যামাইনো অ্যাসিডের উপর নির্ভর করে। তাপে অ্যামাইনো অ্যাসিডের পরিবর্তন ঘটে ফলে বিষক্রিয়াও বিনষ্ট হয়, বিষ toxoid-এ পরিণত হয়। এই অবস্থায় এদের বিষক্রিয়া না থাকলেও অ্যান্টিজেন ধর্ম বর্তমান থাকে এবং অ্যান্টিবডি উৎপাদনে সমর্থ। বহির্বিষের বিষক্রিয়া সাপের বিষ বা বিষাক্ত স্ট্রিকনিন্‌ (Strychnine)-এর বিষক্রিয়ার তুলনায় লক্ষগুণ বেশী। হিসাব করে দেখা গেছে যে 10 mg. বহির্বিষ মানবজাতিকে ধ্বংস করতে সক্ষম। কিন্তু বহির্বিষের অণু বৃহদাকার হওয়ায় শরীরে এই বিষ সাধারণ বিষের তুলনায় কম পরিমাণে শোষিত হয়, সেজন্য এদের তীব্রতা কম অনুভূত হয়। নীচে বিভিন্ন বিষের তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে :

বিষের নাম	অণুর আকার	প্রাণঘাতী অনুপান মিলিগ্রাম	স্ট্রিকনিনের তুলনায় কত গুণ বিষাক্ত
স্ট্রিকনিন	ক্ষুদ্র	40	1
আরসেনিক	„	400	0·03
সাপের বিষ (Crotactin)	বৃহৎ	4	10
অন্তর্বিষ (Endotoxin)	বিষের উপাদান অতি সামান্য	400	0·1
বহির্বিষ (Exotoxin)			
ডিপথিরিয়া	বৃহৎ	0·02	2,000
আমাশয়	„	2·000,06	700,000
ধনুস্টংকার	„	0·000,06	700,000
বলুটিনাস	„	0·000,06	700,000

ব্যাকটিরিয়ার সংখ্যাবৃদ্ধি ক্ষমতা, বিস্তার ক্ষমতা (আগ্রাসী শক্তি) এবং বিভিন্ন কোষের উপর ক্রিয়া লক্ষ্য করে এদের প্রধানতঃ চারভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ

1. অনাগ্রাসী ও বিষবর্জিত—বহু ব্যাকটিরিয়া আমাদের চর্মের উপর, শ্বাসনালী ও অন্ননালী ও অন্ত্রে অবস্থান করে কিন্তু আমাদের ক্ষতি করে না ; উপরন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমাদের সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। তৃণভোজী গরু, ছাগল প্রভৃতি প্রাণীর অন্ত্রে অবস্থিত ব্যাকটিরিয়া উদ্ভিদের সেলুলোজকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করতে সাহায্য করে।

2. অনাগ্রাসী কিন্তু তীব্র বিষসম্পন্ন—টিটেনাস জীবাণু, এরা ক্ষতস্থানে অবস্থান করে কিন্তু তন্তুকে আক্রমণ করে না। কিন্তু এরা যে তীব্র বিষ উৎপন্ন করে তা দেহে শোষিত হয়ে নার্ভমণ্ডলীর উপর ক্রিয়া করে।

3. আগ্রাসী (অতি দ্রুত বিস্তৃত হয়) কিন্তু নির্বিষ—অ্যানথ্রাকস।

4. আগ্রাসী ও তীব্রবিষযুক্ত—নিউমোনিয়া, টাইফয়েড ইত্যাদি, এরা রক্তকে বিষাক্ত করে।

জীবাণু আবিষ্কৃত হওয়ার পর শরীরে বিভিন্ন জীবাণু কিভাবে লক্ষ্য করা যায় তার পদ্ধতি নির্ণয়ে বিজ্ঞানীরা সচেষ্ট হন। সাধারণতঃ কোষের মধ্যে জীবাণুদের লক্ষ্য করা যায় না ; কারণ জীবাণুরা স্বচ্ছ ও বর্ণহীন। বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করলেন যে রেশম ও পশম বস্ত্র বিভিন্ন রঞ্জকদ্রব্য শোষণ করে রঞ্জিত হয়। জীবাণু রঞ্জক দ্রব্য শোষণ করে রঞ্জিত হয় কিনা সে সম্পর্কে পরীক্ষা করে তাঁরা লক্ষ্য করলেন যে কয়েক প্রকার জীবাণু বিশেষ বিশেষ রঞ্জক দ্রব্য শোষণ করে। 1884 খৃস্টাব্দে ডেনমার্কের জীবাণুবিদ ক্রিস্টিয়ান জোয়াসিম গ্রাম (Christian Joachim Gram) জীবাণুদের রং করার এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে কিছু জীবাণু বিশেষ পদ্ধতিতে জেনসিয়ান বেগুনী (Gentian violet) প্রয়োগে বেগুনী রং ধারণ করে। যারা বেগুনী রং ধারণ করে তাদের গ্রাম-পজিটিভ (Gram-positive) এবং যারা বেগুনী রং ধারণ করে না তাদের গ্রাম-নেগেটিভ (Gram-negative) বলা হয়।

ইতিমধ্যে জীবাণু ধ্বংসের জন্য নানা প্রকার রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কৃত হলেও রোগমুক্তির জন্য তাদের ব্যবহার করা সম্ভব হয় নি, কারণ এসব রাসায়নিক পদার্থ কেবলমাত্র জীবাণু ধ্বংস করে না শরীরের নানা কোষও ধ্বংস করে। সেইজন্য বিজ্ঞানীরা এমন এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থের সন্ধান করতে লাগলেন যা দেহের কোষের ক্ষতি না করে জীবাণুদের অব্যর্থভাবে বিনাশ করতে সক্ষম। জার্মানীর পল এরলিক (Paul Ehrlich 1854-1915) এইরূপ রাসায়নিক পদার্থের নাম দেন ম্যাজিক বুলেট (magic bullet) এবং ম্যাজিক বুলেট আবিষ্কারের জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। পরীক্ষার সময় তিনি লক্ষ্য করেন যে কয়েক প্রকার জীবাণু রঞ্জক দ্রব্য কেবলমাত্র শোষণ করে না, ঐ পদার্থ শোষণ করে বিনষ্ট হয়। এই পরীক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে 1907 খৃস্টাব্দে তিনি Trypan red নামে এক প্রকার এজোরঞ্জক পদার্থ আবিষ্কার করেন। এই রঞ্জক পদার্থ নিদ্রারোগের (African Sleeping Sickness) জীবাণু Trypansome বিনাশ করতে সক্ষম। দুজন ইতালীয় বিজ্ঞানী 1902 খৃস্টাব্দে Trypansome-এর জীবাণু আবিষ্কার করেন। এই জীবাণু দ্বারা ঐ রোগ এক প্রাণীর দেহ থেকে অন্য প্রাণীর দেহে সংক্রামিত হয়।

এজোরঞ্জক পদার্থ Trypan red-এর বিষক্রিয়ার কারণ অনুসন্ধান করে এরলিক অনুমান করেন যে, রঞ্জক পদার্থের মধ্যে যে এজো যৌগ —N=N— আছে তার বিষক্রিয়ার জন্য জীবাণু ধ্বংস হয়। নাইট্রোজেনের বিভিন্ন ধর্মের সঙ্গে আরসেনিকের ধর্মের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে নাইট্রোজেনের পরিবর্তে আরসেনিক ব্যবহার করলে কি ফল পাওয়া যায় তা নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন। একের পর এক আরসেনিক যৌগ প্রস্তুত করে পরীক্ষা করতে থাকেন। অবশেষে 1909 খৃস্টাব্দে তাঁর জাপানী ছাত্র সাহাচিরো হাতার (Sahachiro Hatta) সহযোগিতায় 606 নং আরসেনিক বেনজিন যৌগ প্রস্তুত করেন। এই যৌগ Trypansome-এর উপর ক্রিয়া না করলেও সামাজিক ব্যাধি সিফিলিস রোগের জীবাণু Spirochite Pallida বিনাশ করতে সমর্থ। 1905 খৃস্টাব্দে Schauddin এই জীবাণু আবিষ্কার করেন। সে সময় লোকলজ্জার ভয়ে রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা এই রোগ গোপন রাখতেন ফলে রোগ ব্যাপকহারে সংক্রামিত হত। প্যারাসেলসাসের (Paracelsus) সময় থেকে পারাকে এই রোগের চিকিৎসার জন্য ব্যাবহার করা হলেও পারা শরীরের উপর নানা ক্ষতিকারক

ক্রিয়া করত। সে তুলনায় আরসেনিক-606 ছিল অনেক উন্নতমানের। এই আবিষ্কারের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এরলিক এর নাম দেন Salvarsan অর্থাৎ পরিত্রাতা আরসেনিক। এই আরসেনিক যৌগের রাসায়নিক নাম diamino-dihydroxy-arsenobenzene dihydrochloride, আণবিক ফরমূলা $C_{12} H_{14} O_2 N_2 Cl_2 AS_2 2H_2O$, আণবিক গঠন—

HO < >AS == A

NH₂ HCL
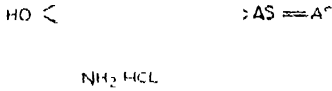
এই যৌগটি একটি রঞ্জক পদার্থ সদৃশ যার মধ্যে—N = N-এর পরিবর্তে আছে—AS = AS–। এই যৌগ Arsphenamine নামে পরিচিত। বস্তুত Arsphenamine হল গবেষণাগারে প্রস্তুত প্রথম ঔষধ। কারণ এর পূর্বে উদ্ভিদ ও খনিজ পদার্থ থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঔষধ প্রস্তুত করা হত। এই আবিষ্কারের ফলে চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়। এই বিজ্ঞানকে বলা হয় Chemotheraphy এবং এর জনকরূপে এরলিকের নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এরলিকের সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিজ্ঞানীরা নূতন নূতন ঔষধ আবিষ্কারের জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। এর ফলে 1924 খৃস্টাব্দে ম্যালেরিয়ার ঔষধ Plasmoquene বা Pamoquene এবং 1930 খৃস্টাব্দে Fritz-Mietzch কর্তৃক এটাব্রিন (attabrine) আবিষ্কৃত হয়। এটাব্রিন আবিষ্কারের পর Mietzch রঞ্জক পদার্থ সম্পর্কে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন এবং ব্যাকটিরিয়ার দ্বারা সংক্রামিত রোগের ঔষধ প্রস্তুতের জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থের সঙ্গে Para aminobenzene Salfonamide-এর বিক্রিয়া ঘটিয়ে Prontosil নামে একপ্রকার ঔষধ প্রস্তুত করেন। জার্মান রসায়নবিদ গেরহার্ড ডোম্যাগ (Gerhard Domag) ও তাঁর সহকর্মীরা Prontosil নিয়ে পরীক্ষা করে চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা করেন। তাঁরা লক্ষ্য করেন যে Haemolytic streptococcus রোগাক্রান্ত ইঁদুরকে এই ইনজেকশন দেওয়ার ফলে ইঁদুরটি আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে যায়। মানুষের উপর এই ঔষধের কার্যকারিতা পরীক্ষার জন্য তিনি তাঁর কন্যার উপর এই ঔষধ প্রয়োগ করে আশ্চর্য ফল পান। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় Prontosil শরীরের মধ্যে জীবাণু ধ্বংস করতে সক্ষম হলেও টেস্টটিউবের মধ্যে জীবাণুর উপর কোন ক্রিয়া করে না। এর কারণ অনুসন্ধান করে প্যারী ইন্সটিটিউটের বিজ্ঞানী Jacques Trefuel ও তাঁর সহকর্মীরা প্রমাণ করেন যে শরীরের অভ্যন্তরে Prontosil ভেঙে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়—দুটি অংশে বিভক্ত হয়। সক্রিয় অংশটি হল Para amino benzene। 1908 খৃস্টাব্দে ভিয়েনা ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিক বিজ্ঞানী পল গেলমো (Paul Gelmo) Sulphanilamide আবিষ্কার করলেও এই আবিষ্কারের গুরুত্ব তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি।

প্রকৃতপক্ষে Prontosil হল ব্যাকটিরিয়াজনিত সংক্রামক রোগ নিরাময়ের জন্য গবেষণাগারে প্রস্তুত প্রথম ঔষধ। এর আণবিক গঠন হল—
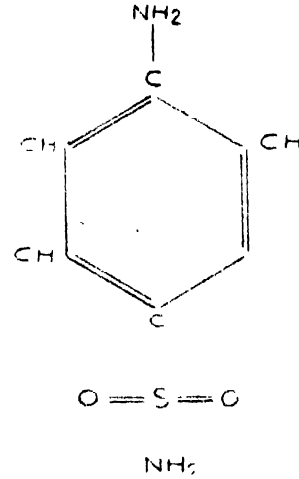
SO_2NH_2 যৌগের একটি H পরমাণুর পরিবর্তে Pyridene, Thiazole, Pyrinidene প্রভৃতি যৌগ প্রতিস্থাপিত করে 1937 খৃস্টাব্দে Sulpha pyridene, 1939 খৃস্টাব্দে Sulpha thiazole, 1941 খৃস্টাব্দে Sulpha diazene প্রভৃতি ঔষধ একে একে প্রস্তুত হতে থাকে। এদের বলা হয় সালফা ড্রাগ। 1945 খৃস্টাব্দের মধ্যে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বিভিন্ন রকমের সালফা ড্রাগ প্রস্তুত হয়। এইসব ঔষধ আবিষ্কারের ফলে নিউমোনিয়া, ম্যানিনজাইটিস প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসা সম্ভব হয়। ডোম্যাগের কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ 1939 খৃস্টাব্দে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি যুদ্ধবন্দী হওয়ায় সে বৎসর পুরস্কার গ্রহণ করতে পারেন নি। যুদ্ধের পর পুরস্কার গ্রহণের সুযোগ পান।

সালফা ড্রাগ বিভিন্ন দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ হলেও এর প্রাধান্য বেশী দিন স্থায়ী হয় নি। এর অন্যতম কারণ অ্যান্টিবায়োটিকের আবিষ্কার। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও প্রাণীরা বেঁচে থাকার জন্য, আত্মরক্ষার জন্য একপ্রকার রস নিঃসরণ করে। এই বিষাক্ত রস বিভিন্ন জীবাণু ধ্বংস করতে পারে। এদের বলা হয় অ্যান্টিবায়োটিক। অ্যান্টিবায়োটিক শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন বিজ্ঞানী ওয়াকস্‌ম্যান (Waksman)।

1929 খৃস্টাব্দে বৃটিশ বিজ্ঞানী আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং

প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন। কিন্তু 1942 খৃস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর আবিষ্কারের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায় নি। ডাঃ ফ্লোরে ও ডাঃ চেন-এর গবেষণার ফলে পেনিসিলিনের গঠন ও কার্যকারিতা নির্ণয় করা সম্ভব হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় পেনিসিলিন ব্যাবহার করে আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া যায়। এই আবিষ্কারের স্বীকৃতি-স্বরূপ ফ্লেমিং, ফ্লোরে ও চেনকে 1945 খৃস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। ম্যানিনজাইটিস, নিউমোনিয়া, সিফিলিস প্লেগ প্রভৃতি মারাত্মক রোগের চিকিৎসায় পেনিসিলিন মহৌষধিরূপে কাজ করে। পেনিসিলিন সাধারণতঃ গ্রাম-পজিটিভ ব্যাকটিরিয়ার উপর ক্রিয়া করে। পেনিসিলিন আবিষ্কারে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেকে অ্যান্টিবায়োটিক (বিশেষ করে গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটিরিয়ার উপর ক্রিয়াশীল অ্যান্টিবায়োটিক) আবিষ্কারের জন্য সচেষ্ট হন। গবেষণার ফলে 1943 খৃস্টাব্দে ওয়াকস্‌ম্যান কর্তৃক স্ট্রেপটোমাইসিন আবিষ্কৃত হয়। স্ট্রেপটোমাইসিন গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটিরিয়া বিশেষত যক্ষ্মার জীবাণু বিনাশ করতে সক্ষম। এই আবিষ্কারের জন্য 1952 খৃস্টাব্দে ওয়াকসম্যানকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও গবেষণার ফলে বর্তমানে কয়েক হাজার অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু সব অ্যান্টিবায়োটিক কার্যকারী নয় উপরন্তু বহু অ্যান্টিবায়োটিক শরীরের উপর নানা অবাঞ্ছিত ক্রিয়া করে।

সালফা ড্রাগ ও বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক ব্যাকটিরিয়ার উপর বিভিন্নভাবে ক্রিয়া করে। ঔষধের ক্রিয়া লক্ষ্য করে এদের দু-ভাগে ভাগ করা হয়। যারা সরাসরি ব্যাকটিরিয়া ধ্বংস করে তাদের বলা হয় bactericide এবং যারা ব্যাকটিরিয়াকে ধ্বংস না করে তাদের বৃদ্ধি বন্ধ করে মাত্র তাদের বলা হয় bacteriostatic। এই সব ঔষধের ক্রিয়াপদ্ধতি প্রধানতঃ 1) ব্যাকটিরিয়ার কোষপ্রাচীরের ক্ষতি করা, 2) রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা কোষের উপাদানসমূহের পরিবর্তন করা, 3) অত্যাবশ্যকীয় উপাদান ও প্রোটিন উপাদানে বাধার সৃষ্টি করা।

বিভিন্ন ঔষধ কিভাবে ক্রিয়া করে সে সম্বন্ধে সঠিকভাবে জানা না গেলেও সালফা ড্রাগ, পেনিসিলিন ও স্ট্রেপটোমাইসিনের ক্রিয়া সম্বন্ধে মোটামুটি একটা আভাষ পাওয়া গেছে।

কোষের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন ফলিক অ্যাসিডের। সালফা ড্রাগ ফলিক অ্যাসিড উৎপাদনে বাধার সৃষ্টি করে কোষের বৃদ্ধি বন্ধ করে। ব্যাকটিরিয়া প্যারাঅ্যামাইনো বেনজয়িক অ্যাসিড (Para-amino benzoic acid) সংক্ষেপে PABA-এর সাহায্যে ফলিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। সালফা ড্রাগের আণবিক গঠন PABA-এর আণবিক গঠনের অনুরূপ।

যদি ভুলবশতঃ ব্যাকটিরিয়া PABA-এর বদলে সালফোনামাইড গ্রহণ করে তবে ব্যাকটিরিয়া ফলিক অ্যাসিড উৎপাদন করতে পারে না। ফলিক অ্যাসিডের অভাবে কোষের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। অপর পক্ষে পেনিসিলিন ব্যাকটিরিয়ার কোষপ্রাচীরে যে muramic অ্যাসিড থাকে তার উৎপাদনে বাধা সৃষ্টি করে। muramic অ্যাসিডের জন্য ব্যাকটিরিয়ার কোষপ্রাচীর দৃঢ় হয়। muramic অ্যাসিডের অভাবে কোষপ্রাচীর
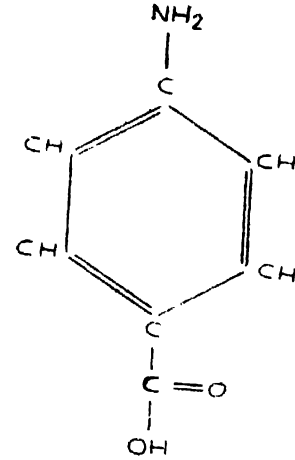
প্যারাঅ্যামাইনো বেনজয়িক অ্যাসিডের আণবিক গঠন

দৃঢ় হয় না এবং ফেটে যায়। স্ট্রেপটোমাইসিন প্রেরক RNA-এর কাজে বাধা সৃষ্টি করে কোষের প্রয়োজনীয় প্রোটিন উৎপাদন বন্ধ করে দেয়।

বিভিন্ন ধরণের ঔষধ ব্যবহার করার ফলে ব্যাকটিরিয়ার জিনের মধ্যে আসে পরিবর্তন ; সৃষ্টি হয় নূতন ধারার ব্যাকটিরিয়া যারা এইসব ঔষধের ক্রিয়া প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়। 1939 খৃস্টাব্দে বিভিন্ন চিকিৎসায় সালফা ড্রাগ সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হলেও কয়েক বৎসরের মধ্যে সালফা ড্রাগের কার্যকারিতা হ্রাস পায়। এর প্রধান কারণ হল সালফা ড্রাগ প্রতিরোধ সক্ষম নূতন ধারার ব্যাকটিরিয়ার সৃষ্টি। তাই সামান্য কারণে এই জাতীয় ঔষধ ব্যাবহার করা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। সালফা ড্রাগের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে অ্যান্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে তা ঘটতে চলেছে। তাই প্রস্তুত হচ্ছে নূতন নূতন অ্যান্টিবায়োটিক।

বিভিন্ন ঔষধ আবিষ্কারের ফলে রোগ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হলেও রোগ নির্মূল করা সম্ভব হয় নি। বিভিন্ন রোগের জীবাণু প্রতি মূহুর্তে বাতাস, খাদ্য, পানীয়ের মাধ্যমে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। উপরন্তু মশা, মাছি, পোকামাকড় দ্বারা রোগ জীবাণু একস্থান থেকে অন্যস্থানে সংক্রামিত হয়। তাই রোগ বিস্তার পরিবেশ দূষণের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। সুতরাং পারিবেশ যাতে দূষিত না হয়, রোগের বাহক মশা, মাছি প্রভৃতি যাতে জন্মাতে না পারে সেদিক সতর্ক দৃষ্টি রাখলে বহু সংক্রামক রোগ থেকে সহজেই রক্ষা পেতে পারি।

সমুদ্রের রাসায়নিক সম্পদ

আব্দুল হক খন্দকার*

কোন জিনিসের নামকরণ সম্পর্কে আজকাল আমরা যতটা সচেতন পূর্বে বোধ করি তেমন ছিল না। কেননা, এখনও দেখা যায় যে, সে নামের সঙ্গে সেই বস্তুর কোন সঙ্গতি নেই কিংবা হয়ত সে নামের স্বরূপ বস্তু-প্রকৃতির একেবারেই বিপরীত। বেগুন-(বেগুণ) এর কথাই ধরা যাক। গুণ নেই যার সেই হল "বেগুণ"—অথচ বেগুনের যে অনেক গুণ—তা কারো অজানা নেই। তরকারী হিসাবে বেগুন কত ভাবেই না আমাদের রসনা পরিতৃপ্ত করে। 'বেদানা'-র দানা থাকার কথা নয়—কিন্তু দেখা যায়, কানায় কানায় দানা দিয়ে তা পরিপূর্ণ। অন্যদিকে হয়তো অজান্তেই আবার এমন নামকরণ হয়েছে, যা সত্যই সঙ্গত এবং সার্থক। সমুদ্রের "রত্নাকর" নামটি ধরতে গেলে এমনি একটি সার্থক নামকরণ! অবশ্য নামকরণের সময় সমুদ্র যে সত্য সত্যই রত্নগর্ভা—অন্ততঃ রাসায়নিক সম্পদের দিক থেকে—তা জানা ছিল না। কেননা, একমাত্র আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিক গবেষণার সূত্রেই সমুদ্র থেকে বিভিন্ন রত্নরাজি উদ্ধার কার্য সম্ভব করে "রত্নাকর" নামটির যথার্থতা প্রমাণ করতে পেরেছে।

যা হোক সমুদ্রের জল থেকে নানা মূল্যবান দ্রব্য উৎপাদন শুধু যে নানা শিল্পের উন্নতির পথ প্রশস্ত করেছে তা নয়,—এক বিরাট রসদ পুরীর সন্ধানও আমাদের এনে দিয়েছে। কেননা আমাদের ভূপৃষ্ঠ পাঁচ ভাগের তিন ভাগেরও বেশী জল দ্বারা বেষ্টিত। কিন্তু সমুদ্রের এই জল বিশুদ্ধ নয়। যুগ যুগ ধরে বৃষ্টি ও নদ-নদীর জলে ভূপৃষ্ঠ বিধৌত হয়েছে—আর সেই জল বিশাল সমুদ্রের বুকে জমা হয়েছে। সমুদ্র-জলে দ্রবীভূত পদার্থের পরিমাণ তাই ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। কাজে কাজেই বিশুদ্ধ জলের উপাদান হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন ছাড়াও বহু মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ সমুদ্র-জলে নিহিত থাকে। সমুদ্রের জল পরীক্ষা করে অন্ততঃ 61 প্রকার মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। অবশ্য সবগুলিরই পরিমাণ যে সমান তা নয় এবং জায়গা অনুযায়ী সে পরিমাণেরও ব্যতিক্রম ঘটতে দেখা যায়। আবার এদের মধ্যে সবগুলিকেই যে সেই সমুদ্র থেকে উদ্ধার করা হয়ে থাকে তা নয়;—যাদের পরিমাণ বেশী এবং যাদের উৎপাদন লাভজনক, সেগুলিকেই কেবল সমুদ্র-জল থেকে প্রস্তুত করা হয়।

সমুদ্র-জলে সবচেয়ে বেশী পরিমাণে যে রাসায়নিক পদার্থটি থাকে তা হল—সোডিয়াম ক্লোরাইড বা সাধারণ লবণ। রসায়নশাস্ত্রে অবশ্য লবণ বলতে কেবলমাত্র আমাদের নিত্য-ব্যবহার্য লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইডকেই বুঝায় না। মোটামুটি ভাবে বলা যায়,—ক্ষার এবং অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় জল ছাড়া যে যৌগিক পদার্থটি তৈরি হয়—তাই হল লবণ। কাজেই ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, ম্যাগনেসিয়াম ব্রোমাইড, সোডিয়াম সালফেট, ক্যালসিয়াম কার্বোনেট প্রভৃতি এই লবণের পর্যায়ে পড়ে এবং রাসায়নিক সূত্রে সেগুলিও লবণ।

যা হোক, সমুদ্র-জলে এই সাধারণ লবণের পরিমাণ শতকরা 3 ভাগের চেয়েও বেশী। কোন কোন সমুদ্র বা হ্রদের জল সাধারণ সমুদ্র-জলের চেয়ে আরও বেশী লবণাক্ত হতে দেখা যায়। মরুসাগরে সাধারণ লবণের পরিমাণ শতকরা 8 ভাগ। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন যে সমগ্র সমুদ্র জলে—45,400,000,000,000,000 টনের মত লবণ আছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সমুদ্রের ধারে ধারে অগভীর জলাধার তৈরি করে জোয়ারের সময় সমুদ্র-জলে সেগুলি পূর্ণ করা হয়। বাতাস এবং সূর্যকিরণে যখন এইসকল জলাশয়ের জল বাষ্পীভূত হতে থাকে তখন জলে দ্রবীভূত নানা জাতীয় লবণ স্ফটিকাকারে সেই জলাশয়গুলির তলদেশে তলানি পড়ে। তলানিতে অবশ্য সাধারণ লবণের পরিমাণই বেশী হয়। আমাদের খাদ্য-লবণ তাই বিশুদ্ধ নয়। বিশেষ করে এতে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড কিছু পরিমাণে মিশ্রিত থাকে। লবণ তৈরি করার সময় এই তলানি পড়ার প্রাক্কালে সচ্ছিদ্র বড় বড় হাতল দিয়ে লবণকে জল থেকে পৃথক করা হয়। নিউইয়র্ক, ক্যালিফোর্নিয়া, লুসিয়ানা প্রভৃতি স্থানে সমুদ্র-জল শুকিয়ে বড় বড় লবণের পাহাড় বা স্তূপের সৃষ্টি হয়েছে। সাইবেরিয়ার দিকে সমুদ্র-জল যখন শীতকালে বরফে পরিণত হয়ে পৃথক হয়ে পড়ে, তখন অবশিষ্ট জলে লবণের পরিমাণ অত্যধিক বেড়ে যায়। কাজেই সেই জল থেকে স্বল্প খরচেই তখন লবণ তৈরি করা যায়।

লবণ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একটি অত্যাবশ্যক দ্রব্য। খাদ্যদ্রব্যে লবণের ব্যবহার ছাড়াও মাছ, মাংস, প্রভৃতি সংরক্ষণ, মাটি ও চিনা মাটির বাসনে ঝলক উৎপাদন—সাবান ও বরফ তৈরি করার কাজে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া লবণ থেকে নানা মূল্যবান রাসায়নিক দ্রব্যও তৈরি হয়। যেমন,—সোডিয়াম ধাতু, কস্টিক সোডা, সোডা, সোডিয়াম সালফেট, সোডিয়াম ফসফেট, ক্লোরিন, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রভৃতি। এসকল রাসায়নিক দ্রব্য আবার নানা শিল্পের ভিত্তি স্বরূপ। কাজেই লবণ সহজলভ্য, সস্তা এবং আমাদের বিশেষ পরিচিত হলেও আধুনিক শিল্পে, তথা সভ্যতায়, তার অবদান সত্যই অপরিসীম।

সাধারণ লবণ ছাড়াও সমুদ্র জলে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম প্রভৃতি ধাতুর ব্রোমাইড লবণ পাওয়া যায়। ব্রোমাইডে ব্রোমিন নামে একটি মূল্যবান মৌলিক দ্রব্য

* 1/4, আসাদ গেট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা—7, বাংলাদেশ

সংযুক্ত থাকে। সমুদ্র-জলে ব্রোমিনের পরিমাণ খুবই সামান্য—শতকরা 0·0065 ভাগ। তবুও আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই স্বল্প পরিমাণ সংযুক্ত ব্রোমিনকে পৃথক করে, পরিশেষে প্রচুর পরিমাণেই তা তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। প্রথমে সমুদ্র জলে হাইড্রক্লোরিক অ্যাসিড দিয়ে তার মধ্যে ক্লোরিন গ্যাস পরিচালিত করলে ব্রোমিন পৃথক হয়ে পড়ে। তারপর এই গ্যাসীয় ব্রোমিনকে বায়ুপ্রবাহের সাহায্যে চালিত করে সোডিয়াম কার্বনেট দ্রবণে দ্রবীভূত করা হয়। এই দ্রবণে পুনরায় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাহায্যে ব্রোমিনকে বিমুক্ত করে পাতন প্রক্রিয়ার দ্বারা দ্রবণ থেকে তা পৃথক করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ক্যারোলিনাতে প্রতিদিন 60,000,000 গ্যালন জল ছেঁকে ব্রোমিন প্রস্তুত করার কারখানা অনেক আগেই স্থাপিত হয়েছে। টেক্সাসের ভেলাস্কো নামক স্থানেও একটি কারখানায় প্রতিদিন 150 টন ব্রোমিন সমুদ্র-জল থেকে নিষ্কাশন করা হয়।

ব্রোমিন যদিও খুবই বিষাক্ত তবু রাসায়নিক শিল্পে অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য হিসাবে প্রচুর পরিমাণেই ব্যবহৃত হয়। জৈব রসায়নে, বিশেষ করে রাসায়নিক সংশ্লেষণে (synthesis) ব্রোমিনের ব্যবহার অত্যধিক। নানা জাতের ঔষধ, বীজবারক (antiseptic), রঞ্জক দ্রব্য, টিয়ার গ্যাস প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্যও ব্রোমিন ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া ফটোগ্রাফিতে প্রয়োজনীয় সিলভার ব্রোমাইডের অঙ্গ হিসাবে এবং কীটপতঙ্গ কিংবা ছত্রাকজাতীয় উদ্ভিদ ধ্বংস করার জন্য মিথাইল ব্রোমাইড প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য ব্রোমিনের বহুল ব্যবহার দেখা যায়।

ব্রোমিন তৈরির সময় সমুদ্র-জল থেকে উপজাত দ্রব্য হিসাবে যে ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড পাওয়া যায় তা থেকে ম্যাগনেসিয়াম নামে একটি মূল্যবান ধাতু তৈরি হয়। ধাতুর মধ্যে ম্যাগনেসিয়ামই সর্বপ্রথম যা খনি নয়, সমুদ্র থেকেই প্রথম উদ্ধার করা হয়। ম্যাগনেসিয়ামের ব্যবহার বিগত মহাযুদ্ধের পরেই বিশেষ ভাবে বেড়ে যায়। জার্মানরাই অবশ্য এ দিকের পথ প্রদর্শক। গত মহাযুদ্ধে তাঁরাই প্রথম এই হালকা ধাতুটিকে বোমারু বিমান, ট্যাংক, বন্দুক, আগুনে-বোমা প্রভৃতিতে ব্যবহার করে। মারণাস্ত্র তৈরি ছাড়াও সাধারণ বিমান, মোটরগাড়ী, বায়ুমণ্ডলের উপরিস্তরে পরিভ্রমণের জেট বিমান, নানা শিল্পে প্রয়োজনীয় সঙ্কর ধাতু প্রস্তুতের কাজে আজকাল প্রচুর পরিমাণেই ম্যাগনেসিয়াম ব্যবহৃত হয়। যেখানেই হালকা অথচ মজবুত জিনিসের প্রয়োজন সেখানেই এই ধাতুটির প্রয়োজন রয়েছে। ম্যাগনেসিয়ামযুক্ত জৈব রাসায়নিক—'গ্রীনার্ড রিয়েজেন্ট'-এর দৌলতে আজকাল নানা মূল্যবান সুগন্ধি দ্রব্য এবং ঔষধও তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

সমুদ্র-জল থেকে সহজে এবং সস্তায় ম্যাগনেসিয়াম নিষ্কাশনের যে পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়, তা হলো,—ব্রোমিন নিষ্কাশনের পর সমুদ্র-জলে চুনের জল মিশ্রিত করলে ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইড হিসাবে তলানী পড়ে। এর পর পরিস্রাবণ পদ্ধতিতে জল থেকে ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইড পৃথক করে প্রথমে শুষ্ক এবং পরে দগ্ধীভূত করলে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড পাওয়া যায়। গ্যাসীয় ক্লোরিন দিয়ে দ্রব্যটিকে পুনরায় ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইডে পরিণত করে বিদ্যুতের সাহায্যে বিশ্লিষ্ট করলে তা থেকে ম্যাগনেসিয়াম ধাতু এবং ক্লোরিন গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই পদ্ধতিতে ক্লোরিনকে উপজাত দ্রব্য হিসাবে ফিরে পাওয়া যায় বলে, পুনরায় তা ম্যাগনেসিয়াম উদ্ধারের কাজে প্রয়োগ করে, নিষ্কাশনের খরচ কমানো যায়।

ব্রোমিনের সমগোত্রীয় আর একটি মৌলিক পদার্থ আয়োডিনকেও সমুদ্র থেকে পাওয়া যায়। সমুদ্র-জল, সামুদ্রিক গুল্ম বা শেওলা, স্পঞ্জ এবং অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীর মধ্যে আয়োডিন যৌগিক পদার্থ রূপে কিছু কিছু বর্তমান থাকে, তবে সমুদ্রের গভীরে যে সকল শেওলা জন্মায় তাদের মধ্যে কোন কোনটিতে আয়োডিনের পরিমাণ অনেক বেশী থাকে। এমনি জাতের শেওলা শুষ্ক করে সেগুলিকে সাবধানে পুড়িয়ে সেই ছাই থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আয়োডিন প্রস্তুত করা যায়। এককালে এভাবেই আয়োডিন তৈরি করা হত কিন্তু আজকাল পেট্রোলিয়াম খনির লবণ জল থেকে বেশীর ভাগ আয়োডিন প্রস্তুত করা হয় বলে এভাবে আয়োডিন আর তেমন তৈরি করা হয় না।

সমুদ্রের রাসায়নিক সম্পদের মধ্যে আর একটি মূল্যবান দ্রব্য যা অধুনা বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—তা হলো সোনা। সমুদ্র জলে সোনার পরিমাণ যদিও শতকরা 0·000003 ভাগ মাত্র তবুও তা থেকে সোনা নিষ্কাশন করার এক বিরাট সম্ভাবনা সত্যই দেখা যায়। তবে আজ পর্যন্ত সোনা উদ্ধারের তেমন লাভজনক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় নি। বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণের সাহায্যে সমুদ্র-জল থেকে সোনা পাওয়া যেতে পারে তবে নেগেটিভ প্লেটে সোনা সহজে সঞ্চিত হয় না, এই যা সমস্যা। অবশ্য সে সমস্যার সমাধান শীঘ্রই ঘটে উঠা বিচিত্র নয়। কেননা, বেশ কিছুদিন আগেই কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ ফিঙ্ক ঘূর্ণায়মান নেগেটিভ প্লেটে স্বল্প পরিমাণ সোনা সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়েছেন এবং আরও অনেকে এ বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। কাজেই আশা করা যায় যে, অচিরেই সমুদ্র-জল থেকে সোনা আহরণ সম্ভব হয়ে উঠবে এবং ক্রমেই তা সহজ ও সস্তা হয়ে দাঁড়াবে। কেননা, সমুদ্র-জলে সোনার পরিমাণ দিন দিন আরও বেড়ে যাবে। অবশ্য সমগ্র সমুদ্র-জলে সোনার পরিমাণ এত বিপুল যে তা উদ্ধার করতে পারলে সোনার কৌলিন্য অনেক কমে যাবে—তার দাম ও মান সাধারণ ধাতুর পর্যায়ে নেমে আসবে।

শুধু যে সোনার পরিমাণ সমুদ্র জলে দিন দিন বৃদ্ধি পাবে তা নয়,—অন্যান্য যে সকল দ্রব্য আমাদের প্রয়োজনীয় তাদেরও বাড়তি ঘটবে—তাই সেগুলিরও উদ্ধারের সম্ভাবনা দেখা দেবে। আবার এসকল পদার্থের পরিমিত বৃদ্ধি যদি নাও ঘটে তবুও

তালিকা

প্রাচুর্যের ক্রমমান অনুযায়ী সমুদ্র-জলে দ্রবীভূত কয়েকটি মৌলিক পদার্থের পরিমাণ।

মৌলিক পদার্থের নাম	শতকরা অংশ	মৌলিক পদার্থের নাম	শতকরা অংশ
ক্লোরিন	1·890	তামা	0—0·0010
সোডিয়াম	1·0561	বোরন	0·0005
ম্যাগনেসিয়াম	0·1272	সীসা	0·0004
গন্ধক	0·0884	ফ্লোরিন	0·0001
ক্যালসিয়াম	0·0400	ভ্যানেডিয়াম	0·00003
পটাসিয়াম	0 0380	রূপা	0·00003
ব্রোমিন	0·0065	নিকেল	0·00001
কার্বন	0·0028	পারদ	0·000003
লোহা	0—0·0020	সোনা	0·000003
স্ট্রনশিয়াম	0·0013	রেডিয়াম	0·000,000,000,02

সেগুলিকে উদ্ধার করা হয়তো অসম্ভব হবে না। কেননা, সামুদ্রিক অনেক প্রাণী এবং উদ্ভিদ সমুদ্র-জল থেকে বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ তাদের দেহে সংগ্রহ করতে সক্ষম। 'গবেট' গলদা চিংড়িও সমুদ্র-জলের সামান্য তামাকেও তার দেহে সঞ্চিত করার প্রক্রিয়ায় পারদর্শী। একপ্রকার অক্টোপাসও সমুদ্র-জলের তামাকে সংগ্রহ করে তার রক্তে জমা রাখে। উদ্ভিদের নিম্নকোঠার অ্যালৃজি সমুদ্র-জলের পটাসিয়াম ও আয়োডিন আহরণ করে। ডায়াটম নামে একপ্রকার ক্ষুদে উদ্ভিদ সমুদ্র-জলের সিলিকন ও ফসফরাস সংগ্রহ করে তাদের দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধিসাধন করে। অনেক সামুদ্রিক শেওলা এবং সামুদ্রিক স্কুইড ভ্যানেডিয়াম ধাতুকে দেহভুক্ত করতে সুদক্ষ। কিন্তু কি কৌশলে এসকল প্রাণী ও উদ্ভিদ সমুদ্র জলের এমনি স্বল্প পরিমাণ দ্রব্য সংগ্রহ করে তাদের দেহে সেগুলির পরিবৃদ্ধি ঘটায় তা আজও আমাদের অজানা হলেও—বিজ্ঞানীরা আশা করেন যে, উপযুক্ত গবেষণা দ্বারা একদিন তাঁরা এ রহস্য উদঘাটন করতে সক্ষম হবেন এবং সামুদ্রিক প্রাণী ও উদ্ভিদের মত প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় সমুদ্র জল থেকে নানা রাসায়নিক পদার্থ আহরণ করতে পারবেন—এমনকি, এর চেয়েও উন্নততর কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করাও বিচিত্র নয়। সেদিন যদি ভূপৃষ্ঠের খনি থেকে খনিজ পদার্থ আহরণের পালা শেষ হয়ে যায়—তবু সমুদ্রের অফুরন্ত ভাণ্ডার যে যুগ যুগ ধরে আমাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী যুগিয়ে, তার 'রত্নাকর' নামটিকে আরও সম্যক আরও সার্থক করে তুলবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই!

আবেদন

নিজের পরিবেশকে দূষণ থেকে মুক্ত রাখুন।
সকল প্রকার বন্যপ্রাণী ধ্বংস রোধ করুন।
খরা, ভূমিক্ষয় ও পরিবেশ দূষণ রোধে বৃক্ষ রোপণ করুন।
খাদ্য ও ঔষধে ভেজাল দেওয়ার বিরুদ্ধে দুর্বার জনমত গঠন করুন।
সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা গড়ে তুলুন।

—কর্মসচিব

জৈবিক প্রজাতি প্রত্যয়

ভোলানাথ চক্রবর্তী*

পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ ও প্রাণীর বাস, যেমন মানুষ, গরু ইত্যাদি এক এক প্রকার প্রাণী এবং আমগাছ, জামগাছ ইত্যাদি এক এক প্রকার উদ্ভিদ। এই প্রত্যেক রকমের জীবদের এক একটি প্রজাতি হিসেবে গণ্য করা হয়। শ্রেণীবদ্ধকরণ বিদ্যার জন্মলগ্নে অ্যারিস্টটল প্রজাতি চিহ্নিতকরণের জন্য জীবের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। দেহগত আকৃতি, প্রকৃতি প্রভৃতি একই প্রকার হলেই তাদের একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত করা হতো। লিনিয়াসও কতকগুলি সাধারণ বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই প্রজাতি নির্ধারণ করেছিলেন। তিনি অবশ্য স্বতন্ত্র সৃষ্টিবাদে (Theory of Special Creation) বিশ্বাসী ছিলেন, ফলে তাঁর ধারণা ছিল উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিভিন্ন প্রজাতি ঈশ্বর কর্তৃক প্রয়োজনানুসারে স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি হয়েছে এবং এরা পরিবর্তনশীল নয়। পরবর্তীকালে অবশ্য সঙ্করায়নের মাধ্যমে প্রজাতির এবং ঈশ্বর কর্তৃক স্বতন্ত্রভাবে গণের সৃষ্টি হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তবে লিনিয়াস প্রজাতি সম্বন্ধে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য সমাধা করেন। প্রথমতঃ শ্রেণীবদ্ধকরণবিদ্যায় ক্রম অনুসারে বিভিন্ন স্তরের সৃষ্টি করে প্রজাতিকে সর্বনিম্ন স্তরে স্থাপন করেন। যেমন কতকগুলি প্রজাতিকে প্রধানতঃ কিছু বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করে একটি গণের অন্তর্ভুক্ত করেন। এমনিভাবে কয়েকটি গণকে একটি গোত্র, কয়েকটি গোত্রকে একটি বর্গের, কয়েকটি বর্গকে একটি শ্রেণীর এবং কয়েকটি শ্রেণীকে একটি পর্বের অন্তর্ভুক্ত করেন; অর্থাৎ বিভিন্ন স্তরগুলির মধ্যে প্রজাতি হচ্ছে মৌলিক একক এবং এর উপর ভিত্তি করেই অন্যান্য উচ্চতর স্তরগুলি গঠিত। দ্বিতীয়তঃ তিনি দ্বিপদ নামকরণের উদ্ভাবন করেন যা পৃথিবীর সমস্ত বিজ্ঞানীদ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত। এই নামকরণ পদ্ধতির মূল কথা হল সনাক্তকরণের পর প্রতিটি প্রজাতির একটি মাত্রই বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়া হবে যা গ্রীক বা ল্যাটিন ভাষায় লেখা হবে। ফলে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের বিজ্ঞানীর প্রজাতিটিকে চিনে নিতে অসুবিধা হবে না। নামের দুটি অংশ থাকবে, প্রথম অংশটি গণের নামানুসারে এবং দ্বিতীয়টি প্রজাতির নামানুসারে। যেমন—বটগাছ (Ficus bengalensis), অশ্বত্থ (Ficus religiosa), ডুমুর (Ficus hispidia) এই তিনটি উদ্ভিদই ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি কিন্তু একই Ficus গণের অন্তর্ভুক্ত। যা হউক, বিজ্ঞানী মহলে স্বতন্ত্র সৃষ্টিবাদের ধারণা আরও অনেকদিন বিদ্যমান থাকায় প্রজাতি সম্বন্ধে কোন সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব হয় নি।

চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদ গৃহীত হওয়ার পর শ্রেণীবদ্ধকরণ বিদ্যায় এক নবযুগের সূচনা হয়। আমরা জানতে পারি সমগ্র জীবজগৎ একে অপর থেকে পরিবর্তিত হয়ে অর্থাৎ বিবর্তনের মাধ্যমে উদ্ভূত হয়েছে। কাজেই সমস্ত উদ্ভিদ এবং প্রাণী-জগৎকে বিবর্তনের ধারাতেই শ্রেণীবিন্যাস করাই বিজ্ঞান সম্মত। কিন্তু ডারউইন প্রজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে যে বক্তব্য রেখেছিলেন সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণার অভাবেই এই কাজটি এত সহজ ছিল না। কেননা যে পথ ধরে প্রজাতি নূতন প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয় তা হচ্ছে প্রকরণ বা পরিবৃত্তি (variation)। ডারউইন প্রকরণের কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু কি পদ্ধতিতে প্রকরণ হয় তার সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি। মেণ্ডেলের বংশগতি মতবাদই প্রকরণের বংশগতি সংক্রান্ত প্রাথমিক ধারণা দেয়। তাঁর এই সূত্র ধরে তারপর বিভিন্ন বিজ্ঞানী প্রকরণের ভৌত ভিত্তি ও বংশধারার জটিল নিয়মাবলী আবিষ্কার করেন। বিজ্ঞানী অতঃপর স্পষ্টভাবে জানতে পারেন কি পদ্ধতিতে বিবর্তিত হয়ে একটি প্রজাতি অন্য প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়, ফলে তাঁরা প্রজাতি সম্বন্ধে যে বক্তব্য রাখেন, তা জৈবিক প্রজাতি প্রত্যয় (Biological species concept) নামে পরিচিত। বিখ্যাত বিজ্ঞানী মেয়ার প্রজাতির সংজ্ঞা দেন। তাঁর মতে "যে প্রজননান্তর প্রাকৃতিক জীবগোষ্ঠী অনুরূপ জীবগোষ্ঠী হতে জননগত ভাবে পৃথক তাকে প্রজাতি বলে (Species are groups of interbreeding natural populations that are reproductively isolated from other such groups)"। তা ছাড়া সিম্পসন, গ্র্যাণ্ট, ডবজনস্কি, স্টেবিনিস প্রমুখ বিজ্ঞানিগণও প্রজাতির সংজ্ঞা নিরূপণ করেন। তবে বিজ্ঞানী এমারসনের দেওয়া সংজ্ঞাটিতে, প্রজাতি নিরূপণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সবকয়টি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁর মতে "প্রজাতি হচ্ছে বিবর্তিত অথবা বিবর্তনরত, বংশগতীয়ভাবে এবং প্রজননগত ভাবে স্বতন্ত্র প্রাকৃতিক জীবগোষ্ঠী (a species is an evolved or evolving, genetically distinctive, reproductively isolated, natural population)"। এমারসনের সংজ্ঞায় উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করলে প্রজাতি প্রত্যয়ের ধারণা অনেকটা স্পষ্ট হবে।

প্রথমতঃ প্রজাতি হচ্ছে বিবর্তনের ফসল এবং সর্বদা বিবর্তনমুখী।

দ্বিতীয়তঃ একটি প্রজাতি অনেক বংশগত বৈশিষ্ট্য বহন করে, কিন্তু কিছু কিছু বংশগত বৈশিষ্ট্য অন্য প্রজাতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার হতে পারে। এই ধরণের বংশগত স্বতন্ত্রতা আছে বলেই এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতিকে, বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে আলাদা করা সম্ভব। তাই আজকাল প্রজাতি সনাক্তকরণের জন্য বিভিন্নমুখী বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দেওয়া হয়, ফলে, বাহ্যিক অঙ্গ-

*225, ইউনিক পার্ক, বেহালা, কলিকাতা-700 034

সংস্থান বিদ্যা, অভ্যন্তরীণ অঙ্গসংস্থান বিদ্যা, কোষতত্ত্ব, বংশগতি-বিদ্যা, প্রজননবিদ্যা, জিনতত্ত্ব শারীরবৃত্ত, বাস্তব্যবিদ্যা, ভ্রূণবিদ্যা, রেণুবিদ্যা, জৈবরসায়নবিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় থেকে পাওয়া তত্ত্বের সাহায্য নেওয়া হয়।

তৃতীয়তঃ প্রজাতির মূল শর্ত হচ্ছে প্রজননগত স্বতন্ত্রতা (reproductive isolation)। অর্থাৎ এক প্রজাতির জীবের সঙ্গে অন্য কোন প্রজাতির জননক্রিয়া সম্পন্ন হয় না অথবা দৈবাৎ কোন কোন ক্ষেত্রে জননক্রিয়ার ফলে অপত্যজীব সৃষ্টি হলেও তা নির্বীজ হয় অর্থাৎ বংশবিস্তারে সক্ষম হয় না। উদাহরণস্বরূপ গাধা ও ঘোড়ার মিলনে খচ্চরের জন্ম হয় সত্য কিন্তু খচ্চরেরা নির্বীজ এবং বংশবিস্তারে অক্ষম। তাই খচ্চর কোন প্রজাতি নয়। তারা সংকর জাতীয় প্রাণী, শ্রেণীবিন্যাসে তাদের কোন ভূমিকা নেই। সুতরাং এক্ষেত্রে গাধা ও ঘোড়ার প্রজননগত স্বতন্ত্রতা বিদ্যমান এবং তারা ভিন্ন প্রজাতি। এই প্রসঙ্গে প্রজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছুটা আলোকপাত করলে প্রজননগত স্বতন্ত্রতার গুরুত্ব স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। প্রজাতির উৎপত্তির জন্য তার একক কোন সদস্যের পৃথক কোন ভূমিকা নেই। একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত অসংখ্য জীবের সহাবস্থানকে এককথায় বলা হয় সেই প্রজাতির জীবগোষ্ঠী বা পপুলেশন এবং এই পপুলেশনই হচ্ছে নূতন প্রজাতি উৎপত্তির মঞ্চ বা ক্ষেত্র। পপুলেশন ও পরিবেশের মধ্যে অনবরত আন্তঃক্রিয়া চলছে। পরিবেশে কোন পরিবর্তন হলেই জীবেরও কোন পরিবর্তন হবে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবেশও পাল্টায়। ফলে পপুলেশনের যে অংশের পরিবেশ পাল্টায়, সে অংশের জীব ও পরিবেশের আন্তঃক্রিয়াতেও পরিবর্তন হওয়ার ফলে জিনের গঠনের বা বিন্যাসের পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তিত জিন জননকোষ সৃষ্টি, বংশগতির জটিল নিয়ম এবং পরিবেশে প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা পপুলেশনে অবস্থিত আশেপাশে সমস্ত সদস্যের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে কালক্রমে মাতৃপপুলেশন থেকে জিনগতভাবে পপুলেশনের এই পরিবর্তিত অংশ কিছুটা আলাদা হয়ে যায়। এই পর্যায়কে উপ-প্রজাতি (sub-species) বলা হয়। হাজার হাজার বছর যাবৎ কোন জীব উপ-প্রজাতি পর্যায়ে থাকতে পারে। কোন কোন সময় বিভিন্ন উপ-প্রজাতির মধ্যে জননক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় অথবা হলেও নির্বীজ জীব উৎপন্ন হয়। এই পর্যায়কেই বলা হয় প্রজননগত স্বতন্ত্রতা এবং তখনই প্রত্যেক প্রকার উপ-প্রজাতি উন্নীত হয় প্রজাতি পর্যায়ে। এই ভাবে একটি পপুলেশন থেকে সৃষ্ট নূতন প্রজাতিতে সাধারণতঃ বাহ্যিক অঙ্গের পরিবর্তনও ঘটে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে বাহ্যিক অঙ্গের পরিবর্তন নাও হতে পারে। এইপ্রকার বাহ্যিক সাদৃশ্যযুক্ত দুটি প্রজাতিকে সিবলিং প্রজাতি বলে। তবে অনেক ক্ষেত্রে একই প্রজাতির দুটি পপুলেশন ভৌগোলিক বা বাস্তুসংস্থানীয় কারণে আলাদা থাকায় তাদের মধ্যে কালক্রমে বাহ্যিক বৈসাদৃশ্য দেখা দিতে পারে এবং যার ফলে এদেরকে ভিন্ন প্রজাতি বলে মনে হয় কিন্তু এরা কোন কারণে একত্রিত হওয়ার সুযোগ পেলে অনেক সময় তাদের মধ্যে জননক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে উর্বর অপত্যজীব উৎপন্ন করে। বাহ্যিক বৈসাদৃশ্য থাকলেও প্রজননগত স্বতন্ত্রতা সৃষ্টি না হওয়ার জন্য এরা একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রজননগত স্বতন্ত্রতাই প্রজাতির সীমা নির্ধারণ করে।

তবে সমস্ত জীবজগতের ক্ষেত্রেই কিন্তু জৈবিক প্রজাতি-প্রত্যয় প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। শুধুমাত্র যৌন জননে সক্ষম জীবের মধ্যে প্রজননগত স্বতন্ত্রতা সৃষ্টি হয়ে নূতন প্রজাতির উৎপত্তি হয়। কিন্তু অনেক প্রাণী ও উদ্ভিদ আছে যারা শুধুমাত্র অপুংযনি ও অঙ্গজননের মাধ্যমেই বংশবিস্তার করে। এদের ক্ষেত্রে জৈবিক প্রজাতিপ্রত্যয় আদৌ প্রযোজ্য নয়। এই সমস্ত জীবের প্রজাতি নির্ণয়ের জন্য প্রজননবিদ্যা ব্যতীত পূর্বে উল্লেখিত অন্যান্য বিষয় থেকে পাওয়া তত্ত্বের উপর নির্ভর করা হয়। সুতরাং জৈবিক প্রজাতিপ্রত্যয় একমাত্র বিবর্তনমুখী, (জীবের জন্যই প্রযোজ্য এবং বিবর্তন কেবলমাত্র) যৌনজননক্ষম জীবের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

সানস্ট্রোক ঃ গ্রীষ্ম অঞ্চলের আকস্মিক রোগ

সুকুমার সাহা*

'স্ট্রোক' শব্দটিকে আমরা জানি। কিন্তু সানস্ট্রোক (sunstroke)? হ্যাঁ, এই শব্দটি যেন আমাদের অনেকেরই অজানা। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হিট স্ট্রোক (heat stroke)। তবে বাংলাতেই এটি বেশি পরিচিতি লাভ করেছে। বাংলা শব্দটি সর্দিগর্মী। এবার নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন, রোগটি কি।

পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার অবস্থার ওপর আমাদের মানসিক অবস্থার অনেকটাই নির্ভর করে। তাইতো অবস্থাভেদে গরম বা শীত মাত্রার একটু বাইরে গেলেই আমরা অস্থির হয়ে পড়ি। সইতে পারি না, বিরক্ত বোধ করি। জানেন কি, তবুও মানুষ 150° ফারেনহাইট উষ্ণতায়ও দিব্যি কাটাতে পারে। অবশ্য
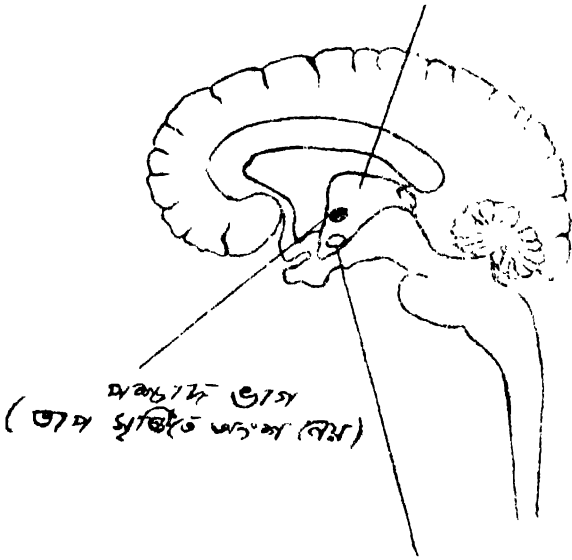
দু-একটি শর্তে। এক, চারপার্শ্বের বায়ুর সম্পূর্ণ শুষ্কতা; দুই, বায়ুতে বর্তমান পর্যাপ্ত পরিচলন স্রোত। দ্বিতীয়টি বাষ্পীভবনে বেশ সাহায্যে আসে। কিন্তু বিপরীত ক্ষেত্রেই বিপদ! অর্থাৎ বায়ুর আর্দ্রতা শতকরা এক-শ' ভাগ বা তার কাছাকাছি হলে বাষ্পীভবন একদম হতে পারে না। ফলে বিপদ ঘনিয়ে আসতেই পারে।

শরীরের বিপাকীয় হার বা বেসাল মেটাবলিক রেট (BMR)-এর ওপর উষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধির এক বিরাট অংশ নির্ভর করে। তারা একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। প্রতি ডিগ্রি ফারেনহাইট উষ্ণতা বৃদ্ধিতে শরীরাভ্যন্তরে বিপাকীয় হারের বৃদ্ধি ঘটে শতকরা 6 ভাগ। সেন্টিগ্রেড স্কেলের বিচারে প্রতি ডিগ্রি উষ্ণতা বৃদ্ধিতে বিপাকীয় হার বাড়ে শতকরা 10 ভাগ। উষ্ণতা বৃদ্ধিতে দেহের কতগুলো রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি বাড়ে। বিপাকীয় হারের গতিবৃদ্ধির মূলে রয়েছে ওই বিক্রিয়াগুলোই। আমাদের দেহের বিপাকীয় হার প্রায় দ্বিগুণও হয়ে যায়—110° ফারেনহাইট উষ্ণতায়।

অনেকক্ষণ ধরে উত্তপ্ত, সেঁতসেঁতে আবহাওয়ায় পরিশ্রম করলে শরীর ঘামতে থাকে। শরীরে একটা শুষ্কতা বা ডিহাইড্রেটেড অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। এর ফল সারকুলেটরি শক (circulatory shock) পর্যন্ত গড়াতে পারে। তবে জানা গেছে, শরীর শুষ্কতায় একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় পৌঁছানর আগেই মস্তিষ্কের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রক যন্ত্র, হাইপোথ্যালামাস চিন্তিত হয়ে পড়ে এবং চটপট কয়েকটি ব্যবস্থাও নিতে ভুল করে না। ফলে দেহের ঘর্ম ক্ষরণ হ্রাস পায়।

অথচ মানুষ দীর্ঘক্ষণ খনির ভিতর কাজ করে,—(সেখানে আর্দ্রতা প্রায় শতকরা এক-শ' ভাগ; উষ্ণতা দেহের উষ্ণতা সমান বা বেশী,) সেই ভয়াবহ পরিবেশেও দীর্ঘদিন কাজ করতে দেখা যায়। এই সময় শ্রমিকদের দেহের কতগুলো গুরুতর শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপের পরিবর্তনই দেখা যায়। এই অবস্থায় দেহের জলীয় অংশ, দেহরস (body fluid)-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। একই সঙ্গে ঘাম ও মূত্রস্থিত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় লবণের বহিষ্করণও কমে আসে। এই শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার পরিবর্তনের মূলে অ্যালডোস্টেরন নামের অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স থেকে নিঃসৃত হরমোনটির ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ।

যাই হোক হঠাৎ খুব গরম বা রোদ অর্থাৎ অনভ্যস্ত অতিরিক্ত তাপ আমাদের এ রোগে (সর্দিগর্মিতে) আক্রান্ত হতে ত্বরান্বিত করে। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে থেকে শুরু করে খেটে-খাওয়া শ্রমিকদেরও নানা কারণে সারাদিন রোদে পড়ে থাকায় ফলস্বরূপ এ রোগে আক্রান্ত হতে হয়। রোগটি সচরাচর হয় না। হলেও প্রবল আকার যেন সহজেই নেয় না। যদিও রোগটি নিয়ে বেশিদিন গাফিলতির ফল বিপদজনক—মৃত্যু। অতিরিক্ত রোদ বা গরমে আমাদের দেহ থেকে কম-বেশি ঘাম বেরোনর ব্যাপারটি আমাদের প্রায় সকলেরই জানা। শুনলে হয়ত অবাক হবেন, ত্বকস্থিত ঘর্মগ্রন্থিগুলো (sweat gland) উষ্ণ আবহাওয়ায় দিনে 14 লিটার পর্যন্তও ঘর্মক্ষরণ করার ক্ষমতা রাখে। প্রতি 1000ml. ঘামে 995ml. জল, 80-290 mg. সোডিয়াম, 30-300mg. ক্লোরাইড, 20-125mg. পটাসিয়াম, 15-60mg. ইউরিয়া, 280-330mg. ল্যাক্টিক অ্যাসিড এবং অল্প পরিমাণে ইউরিক অ্যাসিড ও ক্রিয়াটিনিন দেহ থেকে রেচিত হয়। কিন্তু রেচনে ঘামের সর্বাধিক গুরুত্ব জল ও সোডিয়াম ক্লোরাইড বহিষ্করণে। অত্যধিক ঘর্মক্ষরণের

* বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্বিদ্যালয়, মোহনপুর, নদীয়া।

ফলে জলাভাবজনিত তীব্র তৃষ্ণা, মূত্রের গাঢ়তা এবং অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পায়। আবার লবণের অভাবজনিত পেশীর খিচুনিও (cramp) দেখা যায়।

এবার আসুন এ রোগের মূল কারণটি আমরা সবাই মিলে একটু খতিয়ে দেখি। দেহের কোষগুলোতে জল ও লবণের অনুপাত স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে, সেটাই বাঞ্ছনীয়। যদি তা না থেকে লবণের হার আনুপাতিক ভাবে যে কোন রকমেই হোক কমে যায়, তবে এ রোগ হতে পারে। আগেই বলেছি, রেচনে ঘামের সঙ্গে জল ও সোডিয়াম ক্লোরাইড বেশি পরিমাণে বেরোয়। এভাবে ঘর্মপাতের ফলটি রূপান্তরিত হয় তৃষ্ণায়। যদিও ব্যাপারটি নিতান্তই আপেক্ষিক। আর তৃষ্ণা পেলে একটু জল পান করব, এটা আপনার আমার—সকলেরই আশা। সেটাই স্বাভাবিক। যথারীতি, জল খেলে আমাদের তৃষ্ণা মেটে ঠিকই, সন্দেহ নেই। কিন্তু তাতে আমাদের দেহজ কোষগুলোতে আনুপাতিক ভাবে তখন জলের পরিমাণই বেড়ে যায়। কারণ জল খেলে দেহস্থ কোষগুলোতে জলের পরিমাণ ভারসাম্যে আসলেও সোডিয়াম ক্লোরাইডের পরিমাণে তারতম্য হয় না। সর্দিগর্মীতে আক্রান্ত রোগীদের এরোগে পড়তে হয় ঠিক একই ভাবে। প্রবল রোদ থেকে ঘুরে এসে হঠাৎ অনেকটা জল খেয়ে।

এরোগে আক্রান্ত রোগীদের মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হতে দেখা যায়। এমনকি রোগীর মস্তিষ্কের কতগুলো জায়গা ফুলেও যেতে পারে মস্তিষ্ককোষে ঐ জল ও লবণের আনুপাতিক বিপর্যয়ে। ফলে রোগীর অজ্ঞান হয়ে পড়া অস্বাভাবিক কিছুই নয়। সানস্ট্রোককে কোন কোন সময় ম্যালেরিয়া বলে মনে হতে পারে। মনে রাখবেন, সে অবস্থায় আমাদের রক্ত অবশ্যই পরীক্ষা করা দরকার।

দৈহিক উষ্ণতা মোটামুটিভাবে 106° ফারেনহাইটে বা তার ওপর গেলে দেহের কতগুলো কোষের প্যারেনকাইমা নষ্ট হয়, এটি লক্ষ্য করা গেছে। এছাড়া হাইপার পাইরেক্সিয়াতে মৃত মানুষের দেহাভ্যন্তরে স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন ভাবে রক্তপাত (local hemorrhage) এবং কোষের প্যারেনকাইমা সঙ্কুচিত হয়ে যেতে দেখা যায়। অবশ্য এ অবস্থায় মস্তিষ্কের কতগুলো স্নায়ুকোষ ছিঁড়ে যাবার ভয় থেকেই যায়।

ওপরের আলোচনাতেই স্পষ্ট হল, দৈহিক উষ্ণতা কোন কোন সময় 110°F-এ পৌঁছান খুব একটা আশ্চর্যের কিছুই নয়। এই অবস্থায়ও আমাদের করণীয় অনেক আছে। প্রথমেই রোগীর দেহ অ্যালকোহল দিয়ে মুছে দিলে বেশ উপকার পাওয়া যাবে। উদ্বায়ী অ্যালকোহল বাষ্পীভবনের প্রয়োজনীয় লীনতাপ তখন রোগীর শরীর থেকে নিতে থাকে। ফলে তার শরীরের উষ্ণতা অনেক কমে। রোগীকে বরফ জলে স্নান করালেও আমরা একই ফল পেতে পারি।

কেউ বেশিক্ষণ রোদে থাকলে বা রোদ থেকে ফিরলে তখন তার শরীর স্বাভাবিক ভাবেই থাকে উত্তপ্ত। তাই সেই উত্তপ্ত শরীরকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে প্রথমেই তার দরকার একটু ঠাণ্ডা পরিবেশ। তারপর সেখানে কয়েক মিনিট বিশ্রাম। পরে তাকে জলের মধ্যে পরিমাণ মত লবণ, লেবু ও চিনি দিয়ে একটু শরবতের মত করে খাওয়ান দরকার। লেবু ও চিনির বাড়তি কোন উপকারিতা এতে নেই। প্রশ্ন হল, তবু কেন দেওয়া হয়? রোগীর কাছে বস্তুটিকে উপাদেয় করে তোলাই এর উদ্দেশ্য। শরীরকে শীতল করে স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে এটি বেশ সাহায্য করে। প্রবল আকার বুঝলে প্রথমে রোগীর শরীর মোটামুটিভাবে বরফ দিয়ে ঢেকে ফেলা দরকার। দ্বিতীয়ত, রোগীর শরীরের উষ্ণতা 101° ফারেনহাইট পর্যন্ত (অবশ্য যদি উষ্ণতা এর বেশি হয় তবেই) নামাতে ঠাণ্ডা জলে শরীর মালিশ বেশ কার্যকরী। শেষে যা করা দরকার তা হল 20-25 gm লবণ (সোডিয়াম ক্লোরাইড) রোগীকে ভাতের সঙ্গে কয়েকদিন খাওয়ানো।

অন্য কতগুলো কৃত্রিম উপায়েও আমরা দেহের বর্ধিত উষ্ণতাকে নিমেষে কমিয়ে ফেলতে পারি। এক্ষেত্রে আমাদের হাতিয়ার অ্যান্টি-পাইরেটিক্স শ্রেণীর কতগুলো ঔষধ। এদের কাজ উষ্ণতা কমানো। এরা আচরণে পাইরোজেনিক শ্রেণীর উষ্ণতা বৃদ্ধিকারী এক ধরনের প্রোটিনের বিরোধী। দৃষ্টান্ত হিসেবে অ্যাসপিরিন, অ্যান্টিপাইরিন এবং অ্যামিনো পাইরিনের কথা বলা যায়। তবে জনপ্রিয়তার বিচারে অ্যাসপিরিনের স্থান সবার ওপরে। এর ব্যবহারে দেহের উষ্ণতা স্বাভাবিকের নিচে যায় না। কিন্তু অ্যামিনোপাইরিন দৈহিক উষ্ণতা স্বাভাবিক উষ্ণতার নিচেও নামাতে সক্ষম। সানস্ট্রোককে যতটা ভয়াবহ মনে হোক না কেন আসলে কিন্তু মোটেই ততটা নয়। একথা বলবার সাহস আমাদের জোগিয়েছে 'বিজ্ঞান' ও তার অগ্রগতি। আসুন এভাবে আমরা বিজ্ঞানকে বিভিন্ন সম্ভাব্য কল্যাণকর ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়ে তার কাছে থেকে সুবিধে আদায় করে নিই। বৃথা নিজেরাই তার অপব্যবহার করে পরে নিজেরাই তাকে 'অভিশাপ' বলি। সত্যি, এর কোন যুক্তি নেই, থাকতে পারে না। বিজ্ঞান বাঁচার প্রতীক ধ্বংসের নয়।

শুভ্রতার 'যাদুকর' : আলোকীয় উজ্জ্বলক

সুজিতকুমার নাহা*

শুভ্রতার প্রতি মানুষের আকর্ষণ বোধহয় চিরন্তন। শ্বেত বস্ত্র শুচিতার প্রতীক, শ্বেত কপোত শান্তির। বইপত্রের কাগজ যদি হয় উজ্জ্বল সাদা, পড়াশোনার আনন্দ যেন যায় বেড়ে! দুগ্ধফেননিভ শয্যায় গা এলিয়ে দিতে কার না ভালো লাগে?

সাদা কাপড়, কাগজ ইত্যাদি প্রস্তুতিকালে রাসায়নিক বিরঞ্জক (chemical bleaches) সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সাদা বস্তুগুলোতে একটা হল্‌দেটে ভাব থেকে যায়। এই অসুবিধে দূর করে উপরিউক্ত সাদা বস্তুগুলোকে কীভাবে উজ্জ্বল সাদা করে তোলা যায় সেবিষয়ে বিজ্ঞানীরা বহু গবেষণা করেছেন। শুভ্রতার সন্ধানে বিজ্ঞানীদের এই নিরলস গবেষণার ফলেই আবিষ্কৃত হয়েছে 'আলোকীয় উজ্জ্বলক' (optical brightener)।

শুধু কাপড় বা কাগজ প্রস্তুতিতেই নয়, বর্তমানে বহু ডিটারজেন্ট পাউডারে, এমনকি কিছু কিছু প্রসাধন-দ্রব্যেও ব্যবহৃত হচ্ছে আলোকীয় উজ্জ্বলক। সাধারণতঃ ভিন্ন ধরণের প্রত্যেক বস্তুর জন্য পৃথক আলোকীয় উজ্জ্বলকের প্রয়োজন হয়।

আলোকীয় উজ্জ্বলকেরা কীভাবে কাজ করে তার হাল-হদিশ এবার আমরা জেনে নেব। কিন্তু তার আগে দেখা যাক সাদা বস্তুতে হল্‌দেটে ভাব নজরে পড়বার পেছনে কী বৈজ্ঞানিক কারণ আছে! স্বল্প তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের (short wavelength) বেগুনী ও নীল আলো শোষণ করবার জন্যই সাদা কাপড়-চোপড়ে একটা হল্‌দেটে ভাব আসতে পারে। এই শোষণকে পুষিয়ে দিতে বস্ত্র-ধৌতির সময়ে যদি নীলচে প্রতিপ্রভ আলোকীয় উজ্জ্বলক (blue fluorescent optical brightener) ব্যবহার করা হয় তবে বস্ত্রটিকে দুধ-সাদা বা সামান্য নীলচে-সাদা বলে বোধ হবে। অর্থাৎ হল্‌দে ভাব কেটে গিয়ে বস্ত্রটিকে উজ্জ্বল সাদা দেখাবে।

প্রশ্ন উঠবে, নীলচে প্রতিপ্রভ আলোকীয় উজ্জ্বলক কীভাবে নীল আলোর শোষণজনিত ঘাটতি পুষিয়ে দেয়। মজার কথা, এই জাতের আলোকীয় উজ্জ্বলকের আছে এক আশ্চর্য গুণ। এরা প্রধানতঃ শোষণ করে নেয় অতিবেগুনী রশ্মি (ultraviolet rays) যা আমাদের চোখে অদৃশ্য। আমরা জানি, আলো শক্তিরই প্রকারভেদ মাত্র। দৃশ্যমান আলোর মতই অদৃশ্য অতিবেগুনী রশ্মিও একপ্রকার শক্তি বা এনার্জি। কাজেই অতিবেগুনী রশ্মি শোষণ করবার ফলে আলোকীয় উজ্জ্বলকের অণুগুলো অতি শক্তিসম্পন্ন হয়ে উত্তেজিত অবস্থা (excited state) প্রাপ্ত হয়। এই উত্তেজিত অবস্থা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। অচিরেই অণুগুলো আগের অবস্থায় ফিরে যায়। অণুগুলো পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাবার সময় উদ্বৃত্ত শক্তি নীল আলোরূপে নির্গত করে। সহজ কথায়, আলোকীয় উজ্জ্বলকেরা অদৃশ্য অতিবেগুনী রশ্মির থেকে শক্তি সংগ্রহ করে দৃশ্যমান নীল আলোক-শক্তির ঘাটতি পূরণ করে।

শুভ্রতার 'যাদুকর'-দের অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপের 'যাদুমন্ত্র' এটাই!

* 23/1, কালীচরণ দত্ত রোড, কলকাতা-700 061

ডাইনোসরের খোঁজে

বিনয়কুমার ভট্টাচার্য*

এ পর্যন্ত পাওয়া বিভিন্ন জীবাশ্ম থেকে জানা যায়। আজ থেকে প্রায় 5-6 কোটি বছর আগে পৃথিবীতে দাপটের সঙ্গে প্রভুত্ব করত সরীসৃপেরা। তাই যুগটাকেও বলা হয় সরীসৃপের যুগ—ভূতাত্ত্বিক মতে যার নাম হল মধ্যযুগ বা মেসোজয়িক কাল। পাখী ও স্তন্যপায়ীদের আবির্ভাবেরও আগে বিচরণকারী ঐ সরীসৃপদের কারও কারও দৈহিক গঠন এত বিশাল ও ভয়ঙ্কর ছিল যে ভাবলে অবাক হতে হয়। সাধারণভাবে এই সব বিপুলাকৃতি সরীসৃপদেরই 'ডাইনোসর' বলা হয়। শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে Dinosauria থেকে যেটি আসলে অবলুপ্ত সরীসৃপদের একটি বিভাগের নাম। এই বিভাগে অবশ্য ছোট-বড় নানা আকৃতির সরীসৃপই আছে। জীবাশ্মগত তথ্যে দেখা যায় দৈহিক গঠন বৈচিত্র্যে ডাইনোসর বিভিন্ন শ্রেণী-উপশ্রেণীর বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত। সবচেয়ে বড় ডাইনোসর হল ব্রনটোসাউরাস,—যার দেহ দৈর্ঘ্যে প্রায় আশী ফুট, উচ্চতায় প্রায় 20-22 ফুট আর ওজনে 50 টনেরও বেশি বলে অনুমান করা হয়েছে। এর চেয়েও বড় কোন প্রজাতির ডাইনোসর থাকলেও থাকতে পারে তবে এর কাছাকাছি অনেক প্রজাতিরই অস্তিত্ব ছিল।

এদের সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যেটুকু জানা গেছে তার প্রায় সবটাই আনুমানিক ও কাল্পনিক, যার ভিত্তি হল বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রাপ্ত প্রস্তরীভূত দেহাবশেষের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। এদের কোন জাতি-প্রজাতিকে যদি আজ সশরীরে প্রত্যক্ষ করা যেত, তবে নিশ্চয়ই এই প্রাণীদের আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে আরও অনেক কিছুই জানা যেত। কিন্তু সে তো অসম্ভব চিন্তা। কয়েক কোটি বছর আগে লুপ্ত হয়ে গেছে সেই সব অতিকায় ডাইনোসর।

কিন্তু অন্বেষাই যার মূল লক্ষ্য, সেই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনও কথাই শেষ কথা নয়। নিশ্চিত অবলুপ্ত বলে মনে করা কোন কোন প্রাণীর আকস্মিক অস্তিত্ব আজও রয়েছে। এদের বলা হয় 'মিসিং লিংক' বা জীবন্ত জীবাশ্ম—যেমন—'সিলাকান্ত' জাতের মাছ, বিরাটকায় গিরগিটির মত 'স্ফেনোডন' ইত্যাদি। প্রসঙ্গক্রমে, ব্যাপারটি পর্যালোচনা করলে কিছু প্রশ্ন এসে পড়ে। এই পৃথিবীতে প্রাণীজগতে অফুরন্ত বৈচিত্র্যে মূলে রয়েছে পরিবৃত্তি (variation) প্রাকৃতিক নির্বাচনে তাগিদে পরিবেশ ইত্যাদির সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রামের জন্য অভিযোজিত বৈশিষ্ট্যই পরিবৃত্তি। আপাতদৃষ্টিতে এই সব আহরিত পরিবৃত্তির প্রকাশ খুবই সামান্য হলেও হাজার বা লক্ষ কোটি বছর ধরে সঞ্চিত পরিবৃত্তির পুঞ্জীভূত প্রকাশটা ব্যাপক হয় ও ফলে কোন এক প্রজাতি পরিবর্তিত হয়ে নতুন আর এক প্রজাতির উদ্ভব হয়। ডারউইন প্রদত্ত বিবর্তনের এই সাধারণ সূত্রটি সব ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য কিনা এ প্রশ্ন অনেকেরই। 'পরিবৃত্তির মাধ্যমে নতুন প্রজাতি' (speciation by variation)' এবং 'সরল থেকে জটিল (from simplicity to complexity) পরিবৃত্তি' ইত্যাদি হেতুগুলির পাশাপাশি বিপরীত অবস্থাও বর্তমান।

মূল কথাটি হল অভিযোজন। এই পৃথিবীর আদি থেকে শুরু করে পরিবেশের বিভিন্ন রকম পরিবর্তন বিভিন্ন সময়ে হয়েছে এবং আজও হয়ে চলেছে। কিন্তু সেই পরিবর্তনের হার ও তীব্রতা (rate and intensity) সর্বত্র সমান (uniform) বা একই রকম কখনো হওয়া সম্ভব নয়। কোনও নির্দিষ্ট সময়ে ও বিশেষ স্থানে পরিবেশের কিছু ব্যাপক অবস্থান্তর ঘটলেও অন্যত্র সেটা নাও হতে পারে। ফলে, সেই বিশেষ স্থানের অধিবাসী প্রাণীরা সংশ্লিষ্ট পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বাঁচার জন্য নতুন বৈশিষ্ট্য অভিযোজন করে থাকে ও নবতর প্রজাতির উন্মেষের সূচনা করে আর অক্ষম প্রাণীরা হয় অবলুপ্ত। অথবা, তাদের কেউ কেউ ছড়িয়ে পড়ে নানাদিকে অপেক্ষাকৃত কম বা অপরিবর্তিত পরিবেশের খোঁজে। বর্তমান পৃথিবীতেই বিভিন্ন পরিবেশযুক্ত অঞ্চল প্রচুর রয়েছে যার অনেক অংশই পুরাপুরি ভাবে মানুষের আয়ত্তের বাইরে। অনুসন্ধান করলে তেমন কোথাও হয়ত কোন আদিকালের অপরিবর্তিত প্রাণীর দেখা মিললেও মিলতে পারে।

এই ধারণাকে সম্বল করেই শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রয় ম্যাকাল-এর নেতৃত্বে প্রাণীবিজ্ঞানের সর্বাধুনিক একটি শাখা ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে যার নাম "Cryptozoology"। লুপ্ত প্রাণীদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ ও এদের পুনরাবিষ্কারের সম্ভাব্যতাই এর উদ্দেশ্য। পূর্বোল্লিখিত সিলাকান্থের আবিষ্কার এই সম্বন্ধীয় মনোভাবকে আরও সুদৃঢ় করেছে।

বস্তুতঃ প্রায় সর্বদেশের ধর্মগ্রন্থে বা লৌকিক উপকথায় নানা রকম ভয়ঙ্কর দৈত্য-দানব ইত্যাদির বর্ণনা পাওয়া যায়। এ সবের উৎস কি? নিশ্চয়ই এরা পৃথিবীতে কোনও দিন ছিল। থাকলে আজও কোথাও হয়তো আছে—এসব মনে করা অস্বাভাবিক নয়। প্রকারান্তরে এদের অস্তিত্বের কথা অনেক ভাবেই জানা গেছে। হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে বিচরণকারী ঐ সুবিশাল পায়ের ছাপের অধিকারীটি কি বা কে? অনেকের মতে তুষার মানবের অস্তিত্ব বাস্তব সত্য। চীনের ড্রাগন, ভারতীয় পুরাণের নৃসিংহ অবতার কিংবা গ্রীক কিম্বদন্তীর মৎস্যকন্যা ইত্যাদি সবই কি কাল্পনিক? তাছাড়া বহু প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে অনেক জায়গায় নানা রকম দৈত্যাকৃতি প্রাণীদের চাক্ষুষ করার দাবীও পাওয়া যায়। ইংল্যাণ্ডের লক্ নীস্ (Lock Ness) হ্রদের অনেকেরই দেখা সেই বিখ্যাত দৈত্যাকৃতি

---

* 126/1, অশোকনগর, 24পরগণা—743222

প্রাণীটির কথাও এসে পড়ে। এ বিষয়ে পর্যবেক্ষণের জন্য একটি রাজকীয় তথ্যানুসন্ধান কমিটি নিযুক্ত হয়েছে।

বর্তমান যুগে যেখানে গ্রহান্তরে প্রাণ ও সভ্যতার অস্তিত্ব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। তখন এই গ্রহেরই একদা প্রভুত্বকারী অবলুপ্ত কোন প্রাণীর প্রতিনিধির আজও জীবিত থাকার সম্ভাবনা আদৌ অসম্ভব নয়। অন্তত রয় ম্যাকাল ও তাঁর সহযোগীদের দৃঢ় বিশ্বাস তাই। তার প্রাপ্ত বিবরণ এমন কি গৃহীত ফটোও

যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন, প্রাণীটির জীবিত বা মৃতদেহ অন্ততঃ পক্ষে তার খানিকটা হাড় বা চামড়া না পাওয়া পর্যন্ত সেসব বৈজ্ঞানিকভাবে প্রামাণ্য হতে পারে না।

আফ্রিকার কঙ্গোর গভীর জঙ্গলে বসবাসকারী পিগমীরা স্থানীয় ভাষায় 'মোকেলেম্ বেম্বী' নামে ঐ অঞ্চলে এক বিশালকায় অদ্ভুত জানোয়ারের কথা বলে থাকে। সেখানকার দুর্গম নদী ও জলাভূমিতে ক্বচিৎ এদের দেখা মেলে। শুধু স্থানীয়রাই নয়, বিভিন্ন সময়ে বহু বিদেশী পর্যটক, কিছু উৎসাহী ধর্মপ্রচারক ও কয়েকজন অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানীও ওখানে ঐ বিশালাকৃতি প্রাণীর দর্শন প্রাপ্তির দাবী করেন। সমস্ত বিবরণ বিশ্লেষণ করে রয় ম্যাকাল জীবটিকে নিশ্চিতভাবে ডাইনোসর (সঙ্গের ছবি দুটির কোন একটি) বলে সিদ্ধান্ত করেন। মোটামুটি ভাবে এদের আবাসস্থল নির্ণীত হয়েছে কঙ্গোর লিকুয়োলা আর বাই নদীর অপর প্রান্তে টেলে হ্রদের অরণ্য সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল জলাভূমির দুর্গম অঞ্চল। বিগত কয়েক বছর ধরেই সেখানে অক্লান্ত ভাবে দুঃসাধ্য অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন সেই বিদেশী রয় ম্যাকাল তাঁর দলবল নিয়ে। লক্ষ্য তাঁর একটাই—জীবিত বা মৃত, অন্ততঃ একটা ডাইনোসরকে সংগ্রহ করা। তাঁর এই ঐকান্তিক আশা সফল হোক, উদঘাটিত হোক নানা অজানা তথ্য। আর একবার প্রমাণিত হোক এই সত্য যে, কালের অমোঘ নিয়মেও সব কিছুই একেবারে হারিয়ে যায় না। বিবর্তনকে ফাঁকি দিয়েও কেউ কেউ আজও তার অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে।

বিজ্ঞান কখনও থেমে থাকে না। একদিন এ বিষয়ে আরও আলোকপাত হবেই।

বার্ধক্য ও বিভিন্ন মতবাদ

অসিতকুমার দাস*

আমাদের জীবদ্দশাকে যে কটি ভাগে ভাগ করা হয়, সেগুলো হল—শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্য। বার্ধক্যের পরেই আসে মৃত্যু। কিন্তু এই মৃত্যুকে কি জয় করা যায় না? মৃত্যুকে জয় করা যাবে যদি বার্ধক্যকে রোধ করা যায়। বার্ধক্যকে রোধ করতে হলে আগে আমাদের জানতে হবে বার্ধক্যের কারণ কি। বার্ধক্য কি একটি ব্যাধি? এই প্রশ্নের সমাধান এখনো হয় নি। বার্ধক্যের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন ভাবে। বার্ধক্যের কারণ সম্বন্ধে বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন মতবাদগুলো এই প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।

আমাদের জীবদ্দশাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্য। আমাদের জীবদ্দশার এই পাঁচটি ভাগের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সময় হল যৌবন। যৌবনকে জীবনের স্বর্ণযুগও বলা যায়। কারণ এই সময়ে আমাদের স্বাস্থ্য থাকে সুন্দর, সুঠাম ও সর্বাধিক কর্মক্ষম। তাই, সবাই চায় যৌবনকে দীর্ঘায়িত করতে।

সময়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে দেহের পরিণত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রমশঃ অবনতিকেই আমরা বার্ধক্য বলে অভিহিত করতে পারি। এই বার্ধক্যের সর্বশেষ পরিণতি হল মৃত্যু। আবার এই বয়সজনিত বার্ধক্য বিভিন্ন প্রাণীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম। যেমন—ইঁদুর বাঁচে 2 থেকে $2\frac{1}{2}$ বছর এবং মানুষ বাঁচে 80 থেকে 100 বছর। কিন্তু কেন এই বার্ধক্য? আগে এই বার্ধক্যের কারণ সম্বন্ধে কেউ উৎসুক ছিল না। কিন্তু আজকাল বহু বিজ্ঞানী এই বার্ধক্যের কারণ সম্বন্ধে আগ্রহ দেখাচ্ছেন এবং এই বিষয়টি নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

অ্যামিবা, ব্যাকটিরিয়া প্রভৃতি এককোষী জীবের মৃত্যু নেই বলে বলা হয়। কারণ ব্যাকটিরিয়া, অ্যামিবা প্রভৃতি জীব পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হলে কোষ বিভাজনের মাধ্যমে দুটি নতুন ব্যাকটিরিয়া ও অ্যামিবাতে পরিণত হয়। কোন কোন প্রতিকূল পরিবেশে তাদের মৃত্যু হয় কিন্তু বার্ধক্যজনিত কারণে তাদের মৃত্যু হয়েছে বলে এখনো জানা যায় নি।

* চৌধুরীপাড়া, পোঃ হালিশহর, 24পরগণা

উপযুক্ত মাধ্যমে গবেষণাগারে ব্যাকটিরিয়াকে অনির্দিষ্টকালের জন্য পালন করা হয়। স্তন্যপায়ী প্রাণীকলাকে টিস্যু-কালচার (tissue culture) পদ্ধতিতে পালন করা যায়, কিন্তু অনির্দিষ্টকালের জন্য নয়। উপযুক্ত মাধ্যমে কোষ বিভাজন ঘটে এবং কিছুদিন পরে এমন একটি সময় আসে যখন আর কোষ বিভাজন হয় না ও পরিশেষে কোষগুলোর মৃত্যু ঘটে।

বহুকোষী জীবরা মরণশীল। তবে দেখা যায় যে সব জীবের বৃদ্ধি অসীম অর্থাৎ সারা জীবন ধরে যাদের বৃদ্ধি ঘটে তাদের মধ্যে বার্ধক্যের চিহ্ন ফুটে ওঠে না। যেমন বহুবর্ষজীবী গাছ তার জীবদ্দশায় মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বেড়েই চলে, তবে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধির হার কমতে থাকে। গাছের মধ্যে বার্ধক্যের কোন নিশ্চিত চিহ্ন ফুটে ওঠে না। ক্যালিফোর্নিয়াতে 4000 বছরের পুরানো পাইন (Pines aristata) গাছ পাওয়া গিয়েছে। সাধারণতঃ রোগের ফলে অথবা বন্যা, ঝড়, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে গাছ মারা যায়। কিন্তু, একবর্ষজীবী বা দ্বি-বর্ষজীবী গাছের ক্ষেত্রে আলাদা। এক্ষেত্রে এই সব গাছ প্রথমদিকে খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে কিন্তু
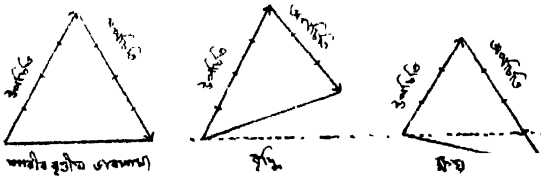
উপচিতি এবং অপচিতির মধ্যে পরিমাণ সংক্রান্ত সম্পর্ক

যখন ফুল ও ফল হয় তখন এদের বৃদ্ধি কমে যায় এবং একসময় বৃদ্ধি বন্ধ হয়। তখন পাতার ক্লোরোফিল কণা কমে যায় এবং বিপাকীয় হার বৃদ্ধি পায় (এগুলো এইসব গাছের বার্ধক্যের লক্ষণ) ও অবশেষে মৃত্যু ঘটে। মাছ ও সরীসৃপদের আজীবন বৃদ্ধি ঘটে। তবে, বৃদ্ধি বেশী হলে এদের প্রকৃতির সঙ্গে অভিযোজন ক্ষমতা এবং রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা কমে যায়।

স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সময়ের বৃদ্ধির পরে তাদের আর বৃদ্ধি ঘটে না। মানুষের বৃদ্ধি ঘটে সাধারণতঃ 25 বছর পর্যন্ত। এই সময় পর্যন্ত অপচিতির (catabolism) থেকে উপচিতির (anabolism) পরিমাণ বেশী হয়। এর পর থেকে কয়েক বছর উপচিতি এবং অপচিতি সমান তালে চলে। 30 বছরের পর থেকে তার মধ্যে বার্ধক্যের লক্ষণ একটু একটু করে দেখা দেয়। এই সময় থেকেই উপচিতির থেকে অপচিতির পরিমাণ বেশী হতে থাকে। এখন বলা যেতে পারে বার্ধক্যের লক্ষণগুলো কি? বার্ধক্যের লক্ষণ হল—পেশীকলার শক্তি হ্রাস, বৃক্কের মূত্র তৈরি করার ক্ষমতা হ্রাস, মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন হ্রাস, হৃদযন্ত্রের কার্যক্ষমতা হ্রাস, ফুসফুসের কার্যক্ষমতা হ্রাস ইত্যাদি। দেখা গিয়েছে একজন 30 বছরের যুবকের তুলনায় একজন 75 বছরের বৃদ্ধের মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন হ্রাস পায় 80%, হৃদযন্ত্রের কার্যক্ষমতা হ্রাস পায় 70%, শক্তি হ্রাস পায় 56%।

পি, শঙ্কর রাও এবং উদয়কুমার কয়েরকাজের তথ্য থেকে জানা যায় 20 থেকে 30 বছরের যুবকের চেয়ে 70 থেকে 90 বছরের বৃদ্ধের হৃদযন্ত্রের রক্ত সঞ্চালন ক্ষমতা 50% কমে যায়, বৃক্কের মধ্যে রক্ত সঞ্চালন কমে 60%, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হৃদস্পন্দনের মাত্রা কমতে থাকে। আরও একটি জিনিষ লক্ষ্য করা যায় 30 বছরের যুবকের হৃদযন্ত্রের পেশীকলার মধ্যে রঙীন দানাদার কোনরকম পদার্থ পাওয়া যায় না, কিন্তু 70 থেকে 90 বছরের বৃদ্ধের হৃদযন্ত্রের পেশীকলার মধ্যে 5% থেকে 10% অদ্রবণীয় রঙীন দানাদার পদার্থ পাওয়া যায়।

পি. শঙ্কর রাও-এর তথ্য থেকে আরও জানা যায়—

	30 বছরের যুবকের	90 বছরের বৃদ্ধের
বৃক্কের কার্যক্ষম নেফ্রনের সংখ্যা =	10,00,000	500000
24ঘণ্টায় মূত্র তৈরি হয় =	1,500 ml	500 ml
মূত্র ঘনীভূত করার ক্ষমতা =	1·035 sp. gravity	1·020 sp. gravity

তাছাড়াও বৃদ্ধের বৃক্কের কার্যক্ষমতা যুবকের তুলনায় হ্রাস পায় 50%।

কিন্তু, কেন এই বিভিন্ন অঙ্গের কার্যক্ষমতা হ্রাস? এ সম্বন্ধে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর মতামত হল—যে সব বিশেষ কোষ দিয়ে শরীরের বিভিন্ন অংশ তৈরী সেই সব কোষের সংখ্যার হ্রাস ও কিছু কিছু অঙ্গের ওজনের হ্রাস।

বার্ধক্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ—

1. প্রথম মতবাদটি হল যে সমস্ত জীবের বৃদ্ধি খুব দ্রুত এবং খুব দ্রুত পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হয় সে সমস্ত জীব তাড়াতাড়ি বার্ধক্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই সব জীবের বিপাকীয় হারও বেশী হয়।

2. দ্বিতীয় মতবাদটির নাম ক্লিঙ্কার থিওরি (Clinker theory)। এই মতবাদটি হল—বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ জীব-কোষের মধ্যে জমা হয়। এই সমস্ত পদার্থ কোষের কার্যক্ষমতাকে কমিয়ে দেয়। যেমন—বৃদ্ধলোকের পেশীকলা, হৃদ্‌যন্ত্র ও স্নায়ুতে এক ধরণের রঞ্জক পদার্থ পাওয়া যায়। কিন্তু, একটি কথা থেকেই যায়, কোষ কেন এই সব ক্ষতিকারক বর্জ্য পদার্থকে বের করে দিতে পারে না? দেখা গিয়েছে প্রাণী-কোষের আবরণীর বাইরে যে প্রোটিন থাকে সেখানে কোলাজেন (collagen) নামে প্রোটিন তন্তু থাকে। কোলাজেন একধরণের fibrous protein। এই কোলাজেন যখন প্রথম তৈরি হয় তখন খুব নমনীয় (flexible) এবং দ্রবণীয় থাকে। কিন্তু, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পলিপেপ্‌টাইড্ চেনগুলো (polypeptide chain) যার দ্বারা

কোলাজেন প্রোটিন স্তর তৈরী) পরস্পরের সঙ্গে দৃঢ় ভাবে আবদ্ধ হয় তাতে কোলাজেন প্রোটিন স্তর হয়ে ওঠে অনমনীয় ও অদ্রবণীয়। ফলে, কোন কোন পদার্থের কোষ থেকে বাইরে আসা বা কোষ অভ্যন্তরে প্রবেশ করা (কোলাজেন প্রোটিন স্তর ভেদ করে) সহজসাধ্য হয়ে ওঠে না।

3. তৃতীয় মতবাদ অনুযায়ী কিছু কিছু প্রকৃতিবিদের ধারণা পরিবেশও এই বার্ধক্যের জন্য অনেকটা দায়ী। রঞ্জন-রশ্মি (x-ray) ও মহাজাগতিক রশ্মি (cosmic ray) আমাদের দেহকোষের প্রচুর ক্ষতিসাধন করে থাকে। এ ক্ষেত্রে ডঃ হাওয়ার্ড জে কার্টিসের পরীক্ষাটির উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। সাধারণতঃ পরীক্ষাগারে ইঁদুর বেচে থাকে দুই থেকে আড়াই বছর। ডঃ হাওয়ার্ড. জে. কার্টিস সমবয়সের 18টি ইঁদুরের বাচ্চা যোগাড় করলেন। তার মধ্যে 9টি-কে রঞ্জন-রশ্মি প্রয়োগ করা হল, বাকী 9টি-কে কিছুই করা হল না। দেখা গেল 14 মাস পরে যে 9টি ইঁদুরকে রঞ্জন-রশ্মি প্রয়োগ করা হয় নি তারা সবাই জীবিত, শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত আছে। কিন্তু, যে 9টি ইঁদুরকে রঞ্জন-রশ্মি প্রয়োগ করা হয়েছিল, 14 মাসের মধ্যে তাদের 6টি-ই মৃত এবং বাকী 3টি বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত।

4. চতুর্থ মতবাদটি হল—নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী স্যার ম্যাকফারলেন বার্নেটের মতে যে সমস্ত প্রাণী কোষের ক্ষতিগ্রস্ত DNA মেরামতের হার যত বেশী তাদের বার্ধক্যও হয় তত বিলম্বিত। দেখা গিয়েছে অতিবেগুনী রশ্মি, রঞ্জন-রশ্মি ও অন্যান্য কারণের সাহায্যে ক্ষতিগ্রস্ত DNA-কে কিছু কিছু উৎসেচক মেরামত করে। এই DNA মেরামত না হলে দেহকোষে 'মিউটেশন' হয় ; ফলে, জিন (gene) ত্রুটিযুক্ত প্রোটিন অণু তৈরি করে এবং কোষের কার্যক্ষমতা কমে যায়, অবশেষে কোষটি মারা যায়। ঠিক এই ভাবেই মস্তিষ্ক, স্নায়ুতন্ত্র প্রভৃতিতে কোষের সংখ্যা কমে আসে যেখানে কোষ বিভাজন দ্বারা কোষের সংখ্যার বৃদ্ধি হয় না।

নীচে আর. ডব্লু. হার্ট ও আর. বি. সেটলোর 1974 খৃস্টাব্দের পরীক্ষার হিসাবটি দেখলেই উপরিউক্ত ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে।

নাম	গড়-জীবন কাল বছর	তুলনামূলক ভাবে DNA মেরামত ক্ষমতা
মানুষ	70	50
হাতী	60	47
গরু	30	43
ধেড়ে ইঁদুর	3	13
ইঁদুর	2	9

তবে একটি কথা ঠিক যে বার্ধক্য জীবদেহে বংশগতভাবে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। দেখা যায় দীর্ঘজীবী পিতামাতার সন্তানরাও দীর্ঘজীবী হয়। বার্ধক্য নিয়ে এখনো প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে এবং চলছেও। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো একদিন সম্ভব হবে যৌবনকে দীর্ঘায়িত করতে এমনকি বার্ধক্যকেও রোধ করা সম্ভব হতে পারে।

পুস্তক পরিচয়

প্রাচীন ভারতীয় গণিতের ইতিবৃত্ত—নন্দলাল মাইতি, প্রকাশক—ফার্মা কে. এল. এম. লিঃ, 257বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-700012। মূল্য—30·00 টাকা। পৃষ্ঠা—264

বইটিতে 18টি অধ্যায় আছে। গোড়ার ছয়টি অধ্যায় প্রাচীন ভারতের কালক্রমে বিভিন্ন যুগের গণিতের প্রসারের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। পরের ছয়টি অধ্যায়ে আর্যভট্ট, বরাহমিহির প্রমুখ প্রাচীন গাণিতিক দিকপাল ও তাঁদের সমকালীন অন্যান্য গাণিতিকদের অবদানের বিবরণ দেওয়া আছে। শেষের ছয়টি অধ্যায় পাটীগণিত, বীজগণিত প্রভৃতি গণিতের বিভিন্ন শাখায় কি ভাবে প্রসার হয়েছিল তা এক একটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। বইটির সর্বশেষে একটি 'নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী' দেওয়া হয়েছে ও সবশেষে আছে নির্ঘণ্ট। এসব বাদেও বইয়ের শুরুতে আছে অবতরণিকা এবং তারও আগে ভূমিকা দেওয়া আছে।

ভূমিকাটিতে বেশ কিছু নতুন কথা আছে। বলা আছে ভারত ইতিহাসে প্রাচীন যুগের পরিচয় পাওয়া যায় পুরাণে, সাহিত্যে, গণিতে। কিন্তু বইটিতে কোন আলোচনাতেই তদানীন্তন কালে ইতিহাসের কোন ইঙ্গিত দেওয়া হয় নি। এমন কি গণিতের প্রগতির ধারায় ইতিহাসটি বইটিতে সুস্পষ্ট হয় নি।

বইটির উর্নাবরণের পাতায় আছে 'গ্রীক গণিতে যে তিনটি সমস্যা দীর্ঘদিন অসমাধানিত ছিল, এটি তার মধ্যে একটি। প্রকৃত কাল-নির্ণয় করা না গেলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই সমস্যাটির সমাধান প্রাচীন ভারতীয় গণিতজ্ঞরা অন্তত তিন হাজার বছর পূর্বে করেছিলেন'। যে অর্থে 'গ্রীক গণিতের

তিনটি সমস্যা দীর্ঘদিন অসমাধানিত ছিল' সে অর্থে তার সমাধান হয় না। এটি এই শতাব্দে প্রমাণিত, ব্যতিক্রম সম্ভব নয়। তবে অন্য অর্থে সমাধান পাওয়া গেছে। কাজেই এখানে বক্তব্যে গণিতের দৃষ্টিতে ত্রুটি আছে। অবশ্য এইরূপ ত্রুটি আরও কোন কোন জায়গায় আছে, স্থানাভাবে সবগুলি উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জীতে ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের Positive Sciences Hinduism, এ. কে. বাগের Mathematics in Ancient and Medieval India প্রভৃতি বইয়ের নাম বাদ পড়েছে, এগুলি না থাকলে ভাল হতো। অবশ্য লেখক গ্রন্থপঞ্জীকে নির্বাচিত ঘোষণা করে এ ত্রুটি এড়িয়ে গেছে।

বইটিতে বিশেষ পরিশ্রমে প্রাচীন গণিতের অনেক তথ্য দেওয়া হয়েছে। ভারতের প্রাচীন গণিতের আগ্রহীরা এবং গণিতের শিক্ষক ও গবেষকরা এসব তথ্যে উপকৃত হবেন। ভবিষ্যতে গণিতের প্রকৃত ইতিহাস লেখায়ও এসব তথ্য বিশেষ সাহায্য করবে।

একজন বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পক্ষে পরিশ্রম করে এই তথ্যগুলি একত্রে লিপিবদ্ধ করা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। বইটি সহজ বাংলায় প্রকাশ করায় যাঁরা মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান চর্চা চান লেখককে তাঁরা সাধুবাদ জানাবেন।

মহাদেব দত্ত*

*বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-700009

ধাতুর বদলে ফাইবারগ্লাস

ইউক্রাইনের খারকভ কন্‌স্ট্রাকশন ইঞ্জিনীয়ারিং ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা ফাইবারগ্লাস উৎপাদনের প্রকৌশল ও বিশেষ যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করেছেন। এই ফাইবারগ্লাস ব্যবহার করা হবে ঠাণ্ডা ও গরম জল সরবরাহ করার এবং উত্তপ্ত করার ব্যবস্থার জন্য।

একটি মৌলিক দুই-স্তর-বিশিষ্ট পাইপের নক্‌শা তাঁরা প্রস্তুত করেছেন। ভিতরের স্তরটি প্রস্তুত হয়েছে তরল পদার্থের অব্যাহত প্রবাহের উপযোগী যে-কোনো উত্তম উপকরণের সাহায্যে—যথা, গ্লাস, ফ্লুয়োপ্লাস্টিক ইত্যাদি। তার ওপরে গ্লাসফাইবার প্যাঁচানো হয়। পলিমার ফিলামেন্ট কেসিং-এর বিন্যাস পাইপকে করে তোলে শক্তসমর্থ ও নমনীয়। এই পাইপ উচ্চ জলের চাপ সহ্য করতে পারে এবং সহজেই বাঁকানো যায়।

নতুন এই দুই-স্তর-বিশিষ্ট পাইপে কোনো ক্ষয় হয় না এবং কখনো মরিচা ধরে না। খারকভের বসতবাড়ি এলাকায় প্রথম এই পাইপলাইন স্থাপন করা হবে। ব্যাপকভাবে এই পাইপ ব্যবহৃত হলে লক্ষ লক্ষ রুবলের সাশ্রয় হবে।

ফাইবারগ্লাসের সাহায্যে নির্মিত শক্তপোক্ত কাঠামো অতিমাত্রায় নির্ভরযোগ্য হয়ে থাকে এবং বিরূপ পরিবেশেও তার কোনো ক্ষতি হয় না। প্রযুক্তিবিদ্যার এ এক নতুন ক্ষেত্র। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, রাসায়নিক উৎপাদনে এবং পরিবাহক নির্মাণে ফাইবারগ্লাস ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

কাঠের ছত্রাক থেকে প্রোটিন

গাছের গুঁড়িতে প্রায়ই ছত্রাক পাওয়া যায়। এস্তোনিয়ার (সোভিয়েত বাল্‌টিক প্রজাতন্ত্র) বিজ্ঞান আকাদেমীর প্রাণীবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা ইনস্টিটিউটের গবেষকরা এই ছত্রাক নিয়ে কাজ করছেন। তাঁরা আবিষ্কার করেছেন, কোনো কোনো প্রজাতির ছত্রাকে মূল্যবান গুণ থেকে গিয়েছে—তা হচ্ছে প্রোটিন উৎপাদনের ক্ষমতা। এখন জানতে হবে কোন্ প্রজাতির ছত্রাক স্বাভাবিকভাবে ছত্রাক উৎপাদন করতে পারে এবং কী অবস্থায় প্রোটিন সবচেয়ে ভালোভাবে বৃদ্ধি পায়।

ইনকিউবেটরের মধ্যে পূর্ব-নির্ধারিত তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা বজায় রাখা হয়। এই ইনকিউবেটরে ছত্রাক স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। টেস্ট টিউবের মধ্যে তাদের খাওয়ানো হয় লিগ্‌নিন। এটি একটি যৌগ পদার্থ যেটি পাওয়া যায় বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদের কোষে। বিজ্ঞানীরা প্রস্তাব করেছেন, কাঠের কারখানা থেকে যে বর্জিত পদার্থ পাওয়া যায় তা ব্যবহার করে ছত্রাক-পুষ্ট পশুখাদ্য উৎপাদন করা যেতে পারে। হিসেব করে দেখা হয়েছে, একটি মাঝারি আকারের কারখানায় এই নতুন প্রযুক্তি-বিদ্যার সাহায্যে বছরে 10,000 টন পশুখাদ্য উৎপন্ন হতে পারে।

কিশোর বিজ্ঞানীর আসর

সত্যেন্দ্রনাথ বসু (জীবনের শেষ দিক)

নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়*

ঢাকায় ফিরে যাওয়ার আগেই তাঁর বন্ধুরা তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদের জন্য দরখাস্ত দিতে পরামর্শ দিলেন। তাঁর ডক্টরেট ডিগ্রী ছিল না তাই বন্ধুরা তাঁকে বললেন আইনস্টাইনের কাছ থেকে একটা সুপারিশ যোগাড় করে নিতে। প্রস্তাবটি আইনস্টাইনকে চমকে দিয়েছিল, কারণ তাঁর ধারণায় ঐ পদে নিযুক্ত হওয়ার পক্ষে সত্যেন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বই যথেষ্ট জোরালো বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। বাস্তবক্ষেত্রে কিন্তু আইনস্টাইনের সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও পদটিতে ডঃ ডি. এম. বোসকে নিযুক্ত করা হয়। তিনি ঐ নিযুক্তি প্রত্যাখ্যান করলেন এবং তখন 1927 খৃস্টাব্দে পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকের পদটি সত্যেন্দ্রনাথকে দেওয়া হয়।

তাঁর কর্মজীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ের এখানেই হল সূত্রপাত। 1926 থেকে 1944 পর্যন্ত বিস্তৃত এই কালটি অতিবাহিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। মোটামুটি একটা লম্বা সফরে ইউরোপের বেশ কয়েকটি আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় ও ল্যাবরেটরীর কাজ পর্যবেক্ষণ করার পর একটি মধ্যযুগীয় স্তরের বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সদ্য ফিরে আসা। সুতরাং শুরু হল বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান প্রয়োগে দেশবাসীর সেবা করার প্রয়াস। তাই নজরটা পড়ল বিজ্ঞানের কোন জটিল সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে জনসাধারণের উপকারে লাগে এমন কিছু করার দিকে। তিনি যখন কর্মজীবনে প্রবেশ করেন তখন এদেশে ছিল বিজ্ঞানের অঙ্কুরোদগমের কাল। তাঁর দৃঢ়মত ছিল যে কোন অ্যাপারেটাসের ক্রিয়া পুরোপুরি বুঝতে হলে সেটা নিজের হাতে তৈরি করা উচিত। থিওরি এবং এক্সপেরিমেন্ট দু-দিকেই সমান দক্ষতা থাকায় গাণিতিক ফর্মুলা রচনা ও ল্যাবরেটারীর কর্মপদ্ধতি কোন ক্ষেত্রেই ধরাবাঁধা কিছু মেনে নিতে গররাজি ছিলেন। যেমন তিনি গ্রন্থ ঘেঁটে সমাধান খুঁজে নেওয়ার চেয়ে গাণিতিক সমীকরণগুলি নিজেই তৈরি করে নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন তেমনই তাঁর নিজের এক্সপেরিমেন্টের কাজে ব্যবহারের যন্ত্রপাতির নক্শা নিজেই করে নেওয়ার উপর জোর দিতেন। ঢাকায় ফিরে এসে তিনি এক্সপেরিমেন্টাল ফিজিক্সের ক্ষেত্রে কোমর বেঁধে নেমে পড়লেন। রোটেশন এবং পাউডার ফোটোগ্রাফীর জন্য তিনি এক্স-রে ডিফ্র্যাকশন ক্যামেরা নিজে নক্শা করে তৈরি করেন। অতিরিক্ত লাওয়ে (Laue) প্রতিফলন নিয়ে কাজ করার দিকে যখন ঝোঁক বাড়ল তখন তিনি ব্র্যাগ-ধরণের এক্স-রে স্পেকট্রোমিটার সূক্ষ্ম নিরীক্ষণের উপযোগী করে নিজেই বানিয়ে ফেললেন। চোঙাকৃতি ক্যামেরায় চিহ্নিত লাওয়ে ফোটোগ্রাফের প্রতিফলনের তলের সূচকগুলিকে আলাদা করে চিনে নেওয়ার একটা সহজ পদ্ধতিও তিনি বের করে ফেলেন। সম্ভবতঃ কৃস্ট্যাল কাঠামোর ওপর কাজ ভারতে তাঁরই নেতৃত্বে প্রথম হয়। তাঁর নিরত চেষ্টা ছিল তাঁর আশেপাশে K. S. Krishnan, S. R. Khastagir, K. Banerjee এবং অন্যান্যদের মত কর্মঠ, প্রতিভাশালী এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন সহকর্মীদের একটা দল একত্রিত করার। ব্যবহারিক গবেষণায় তাঁর নিজস্ব একটি ধারা প্রবর্তিত করার চেয়ে তাঁর স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যে তিনি পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সীমিত সামর্থ্য দিয়েই তাঁর সকল সহকর্মীকে নিজ নিজ বিশেষ গবেষণার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে বেশী সচেষ্ট ছিলেন। কেমিস্ট্রির প্রতিও ছিল তাঁর প্রবল টান। সম্ভবতঃ এই প্রবণতা তাঁর মধ্যে জেগে ওঠে প্রোফেসর হেরমান মার্কের সংস্পর্শে যাঁর কাছে বার্লিনে তিনি প্রায়ই যেতেন। ঢাকায় জৈব রসায়ন গবেষণার জন্য তাঁর একটা নিজস্ব সেল ছিল। পি. কে. দত্তকে সহায়স্বরূপে নিয়ে তিনি জৈব রসায়নের ক্ষেত্রেও অনেক মূল্যবান কাজ করে গেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ল্যাবরেটরীগুলিতে যখন এক্স-পেরিমেন্টের কাজ পুরোদমে চলতে লাগল তখন তিনি ফিরে এলেন তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার এলাকায়, প্রায় দশ বছর পরে।

1936 থেকে 1945 খৃস্টাব্দের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ D^2 স্ট্যাটিসটিক্স, ক্লাসিকাল লরেঞ্জ ইকোয়েশন সমাধানের মাধ্যমে আয়োনোস্ফীয়ারে রেডিও তরঙ্গের পূর্ণ প্রতিফলন, লরেঞ্জ গ্রুপ, ডিরাক ইকোয়েশন এবং জেমান (Zeeman) এফেক্ট, শ্রোডিঙ্গারের হাইড্রোজেন অণুর ক্ষেত্রে তরঙ্গ-সমীকরণ প্রভৃতি নিয়ে এমন কতকগুলি উচ্চাঙ্গের কাজ করলেন যেগুলি তাঁর অসামান্য গাণিতিক নৈপুণ্যের সাক্ষ্য বহন করছে।

* 91, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-700019

তাঁর অতি বিরাট প্রতিভাকে এত বিভিন্ন দিকে সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করার এক অত্যদ্ভুত ক্ষমতা সত্যেন্দ্রনাথের ছিল। বস্তুতপক্ষে তাঁর প্রকৃতি ছিল সূক্ষ্মানুভূতি, মননশীলতা এবং অবসরপ্রিয়তার সংমিশ্রণ। তাঁকে কাজে নামানোর জন্য সর্বদাই প্রয়োজন হত কোন ব্যক্তির গণিত বা পদার্থবিজ্ঞানের কোন দুরূহ সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁর কাছে উপস্থিত হওয়ার। একবার তাঁকে কাজে নামাতে পারলে তিনি সমাধান না খুঁজে পাওয়া পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করে যেতেন, তখন বিশ্রামের কোন প্রশ্নই উঠত না।

সত্যেন্দ্রনাথ ঢাকায় ছিলেন প্রায় পঁচিশ বছর। সহকর্মী ও ছাত্র সকলের কাছেই তিনি পেয়েছিলেন ভালবাসা ও শ্রদ্ধা। ঢাকানিবাসীরাও তাঁকে নিয়ে গর্ব করত। কিন্তু শেষের দিকে রাজনীতিক আবহাওয়ার ছায়া এসে সরস্বতীর মন্দিরটিকেও গ্রাস করল। তলায় তলায় যে সাম্প্রদায়িকতার শিকড় মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল তাতে তিনি খুব বিচলিত হলেন। ঠিক এই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে খয়রা অধ্যাপকের পদটি খালি হয় ঐ পদে অধিষ্ঠিত অধ্যাপক বি. বি. রায়ের মৃত্যুর কারণে। সত্যেন্দ্রনাথকে ঐ পদগ্রহণে আহ্বান জানান হলে তিনি তা গ্রহণ করলেন এবং চিরদিনের জন্য ঢাকা ত্যাগ করলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের কর্মজীবনের তৃতীয় পর্যায় আরম্ভ হল 1945 খৃস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এবার আর একা একা কাজ নয় শুধু হল সকলকে নিয়ে কাজ। কর্মের ধারাটি বদলে ফেললেন তিনি। পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিজ্ঞান শাখার সর্বেসর্বাও করা হল তাঁকে। তাই তাঁর আগ্রহের আচ্ছাদন গিয়ে পড়ল বিজ্ঞানের প্রায় সব কটি শাখার ওপরে। তিনি ছিলেন এক অবিশ্বাস্য বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী।

"সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে দূরবর্তী প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর অনুসন্ধান থেকে লব্ধ মূল শিক্ষা হল দ্ব্যর্থহীন উত্তর প্রদানকারী পরীক্ষার সাহায্যে প্রকৃতির সম্মুখে আমাদের প্রশ্ন উত্থাপন করার ক্ষমতার বস্তুগত জ্ঞানের অভিন্নতা স্বীকার।"

নীলস বোরের এই সূত্রটি তাঁর মনে গেঁথে গেল। স্বভাবতই জ্ঞানবারিধিতে ডুব দিয়ে অজানা রত্ন আহরণে মনোনিবেশ করলেন তিনি। কিছু সংখ্যক তরুণ, উৎসাহী এবং নিষ্ঠাবান গবেষক ছাত্র তাঁর চারপাশে এসে জড় হল এবং পদার্থবিজ্ঞান ও গণিতের উচ্চতর বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলোচনাচক্র চালাতে আরম্ভ করল। কোন সমস্যার দুরূহতাকে তাঁর সামনে চ্যালেঞ্জ হিসাবে উপস্থিত করতে পারলেই তিনি তার সমাধান খুঁজে বের না করা পর্যন্ত বিশ্রাম শব্দটিকে ভুলে যেতেন। কোন মৌলিক নিবন্ধ তাঁর হাতে পড়লে তিনি প্রথমেই তার উদ্দেশ্য, মূল প্রতিপাদ্য এবং লেখকের বক্তব্য সব বুঝতে চেষ্টা করতেন। তারপর কাগজ পেনসিল নিয়ে বসে যেতেন বিষয়টিকে নিজের মত করে সাজিয়ে নিতে এবং শেষে সমাধান বের করেই ছাড়তেন। প্রায়ই দেখা যেত যে তাঁর অনুসৃত পন্থাটি এবং ফল সেই নিবন্ধের তুলনায় সরল হয়েছে।

একটি সেমিনারে যোগ দিয়ে আইনস্টাইনের ইউনিফায়েড ফীল্ড থিওরীর নানাদিক সম্বন্ধে আলোচনা শুনে সত্যেন্দ্রনাথ সেদিকে আকৃষ্ট হলেন। বিশেষজ্ঞরাও এর সমীকরণগুলির সমাধান খুঁজে পান নি, একথা শুনেই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন কাজটিতে। এতে 64টি অতীব কঠিন সমীকরণের সমাধান বের করা দরকার হল। একমুখী নিষ্ঠাসহকারে কাজটি শেষ করলেন তিনি সাফল্যমণ্ডিত হয়ে। তাঁর এই কাজটির গুরুত্ব উপলব্ধি করেই শ্রোডিঙ্গার একে অনন্যসাধারণ আখ্যা দিয়ে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। 1953-55-এর মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ইউনিফায়েড ফীল্ড থিওরী সম্বন্ধে পাঁচটি মূল্যবান নিবন্ধ লেখেন। এতে তাঁর গণিতে কি অসাধারণ দখল ছিল তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যদিও 1924 খৃস্টাব্দের মত সাড়াজাগানো স্বীকৃতি এক্ষেত্রে তিনি পান নি। প্রথম দুটি নিবন্ধে সমীকরণগুলি সাধারণ সমাধান দেওয়া হয়েছে এবং পরের তিনটিতে থিওরীটির সবিস্তার আলোচনা এবং সংশ্লিষ্ট গাণিতিক ফলগুলি দেওয়া আছে। তিনি নিবন্ধগুলি আইনস্টাইনের কাছে পাঠালেন। জবাব এল যে বসুর এই সমাধান পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঠিক কিভাবে কাজে লাগানো যাবে সেটা বোধগম্য হচ্ছে না এবং আইনস্টাইন একটি প্রবন্ধে বিষয়টি নিয়ে বিশদ আলোচনাও করলেন। আইনস্টাইনের তোলা প্রশ্নগুলির উত্তর বিস্তারিত ভাবে লিখে ফেললেন সত্যেন্দ্রনাথ এবং আপেক্ষিকতা তত্ত্বের অর্ধ-শতাব্দী পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত আসন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে আইনস্টাইনের সঙ্গে স্বয়ং দেখা করে আসবেন মনস্থ করলেন। যেদিন সেই মহাজ্ঞানীর মৃত্যুসংবাদ এসে পৌঁছল সেদিন সত্যেন্দ্রনাথ দুঃখে এত অভিভূত হয়ে পড়লেন যে তাঁর লিখিত ব্যাখ্যাটির একমাত্র কপিটি ছিঁড়ে ফেলে দিলেন।

ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে সত্যেন্দ্রনাথের মত এত বড় একজন গণিতজ্ঞ গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দুটি মাত্র সুবিদিত উচ্চকোটির অবদান রেখে গেছেন—একটি স্ট্যাটিসটিক্স এবং অন্যটি ইউনিফায়েড ফীল্ড থিওরী বিষয়ক। মধ্যবর্তী কালের ব্যবধান প্রায় ত্রিশ বছর। এর উত্তর হল এই যে তিনি ছিলেন বৈচিত্র্যময় সর্বদক্ষতা এবং চিরতরুণ সজীবতার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। সেটাই তাঁকে এই ত্রিশটি বছর ব্যবহারিক পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র, খনিজবিজ্ঞান, জীববিদ্যা, মৃত্তিকাবিজ্ঞান এবং প্রত্নতত্ত্বের নানামুখী কাজে ডুবিয়ে রাখে। খয়রা ল্যাবরেটরীতে তাঁর পূর্বসূরী ছিলেন এক্স-রে স্পেকট্রোস্কোপিস্ট। তাঁর ছাত্ররা এখন অধ্যাপক বসুর নির্দেশেই নিজ নিজ লাইনে কাজ করে যেতে লাগল। এখানে একটি বিশিষ্ট যোজনার অন্তর্ভুক্ত ছিল থার্মো-লুমিনেসেন্স বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কাজটি। যন্ত্রাদি উদ্ভাবনে তাঁর আগ্রহ ও দক্ষতার

একটি দৃষ্টান্ত হল তাঁরই নক্সা ও নির্দেশ অনুসারে নির্মিত র‍্যাপিড স্ক্যানিং স্পেকট্রোফোটোমিটারটি। 1954 খৃস্টাব্দে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ক্রিস্ট্যালোগ্রাফিক কনফারেন্সে তিনি এই যন্ত্রটির নির্মাণ কৌশল প্রদর্শন করেন। পরবর্তীকালে ইউরোপের অনেকগুলি নামকরা ল্যাবরেটারীতে অনুরূপ যন্ত্র ব্যবহৃত হতে থাকে। 1953 খৃস্টাব্দে তিনিই বর্তমান লেখককে (শ. দ. চ) এদেশে নির্মিত প্রথম রেডিও কার্বন ডেটিং যন্ত্রটি স্থাপিত করতে উদ্বুদ্ধ করেন। এটি তিনি নিজ অর্থ ব্যয় করে নিজ তত্ত্বাবধানে তৈরি করিয়েছিলেন এবং এর দ্বারা অনেকগুলি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও প্রত্নতাত্ত্বিক নমুনার বয়স নির্ধারণের কাজ সম্পন্ন করা হয়। প্রাকৃতিক উষ্ণ প্রস্রবণগুলির তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপের কাজের তিনিই উদ্যোক্তা। ব্যালনিওলজী এবং ব্যালনিওথেরাপিতে এর গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের অভিপ্রায় অনুসারে বক্রেশ্বরে স্বাস্থ্যনিবাস গড়ে ওঠে তাঁরই উদ্যমে। এক্স-রে রাসায়নিক বিশ্লেষণ এবং ক্যাটায়ন বিনিময় পদ্ধতিতে ভারতীয় খনিজ মৃত্তিকাগুলির বিশদ পরীক্ষণ করে তাঁরই গবেষক ছাত্ররা।

জৈব রসায়ন ক্ষেত্রে তিনি এমিটিন ও কুইনিন সংশ্লেষণ সম্বলিত একটি শ্রমসাধ্য কাজ হাতে নেন, কিন্তু তিনি কাজটি শেষ করার পূর্বে বিদেশে সাফল্য অর্জিত হয়। ইলেকট্রনিক শিল্পে জারমেনিয়ামের গুরুত্ব বিবেচনা করে তিনি ভারতের গন্ধক খনিজগুলির জারমেনিয়ামের সুসংবদ্ধ অন্বেষণ চালান। তাঁর সহপাঠী অজৈব রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক পি. বি. সরকারের সহযোগিতায় তিনি নেপাল থেকে আনীত স্ফালেরাইট খনিজের একটি নমুনা থেকে অপেক্ষাকৃত সরল উপায়ে জারমেনিয়ামের পৃথকীকরণে সক্ষম হন।

1951 খৃস্টাব্দ থেকে সত্যেন্দ্রনাথ প্রায় প্রতি বছরেই ইউরোপে যেতে আরম্ভ করেছিলেন। 1951 খৃস্টাব্দে তিনি জার্মানীতে গিয়ে অধ্যাপক ওয়াল্টার বোথে, অটো হাকসেল, জে. এইচ. ডি. জেনসন এবং এইচ. মাইয়ের লাইবনিৎসের সঙ্গে হাইডেলবার্গে সাক্ষাৎ করেন। অধ্যাপক অটো হান, ভেরনের হাইসেনবার্গ এবং হুটারমানসের সঙ্গে দেখা করতে গোটিংগেনেও যান। 1953 খৃস্টাব্দে হাঙ্গেরীর বুডাপেস্টে বিশ্ব সাধারণ নিরস্ত্রীকরণ ও শান্তি কংগ্রেসে যোগ দিতে আহূত হন। সোভিয়েত রাশিয়া, ডেনমার্ক এবং চেকোস্লোভাকিয়া থেকেও আমন্ত্রণ আসে। এই সুযোগে তিনি জেনেভা, প্যারিস, কোপেনহেগেন, জুরিখ এবং প্রাগ ঘুরে আসেন। জুরিখে অধ্যাপক পাউলি এবং কোপেনহেগেনে নীলস বোরের সঙ্গে মিলিত হন। তাঁর পরবর্তী ভ্রমণ হল ইংলণ্ডে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন অব সায়েন্সের মিটিং-এ যোগ দিতে 1956 খৃস্টাব্দে। দু-বছর বাদে লণ্ডনে আবার আসতে হয় রয়্যাল সোসাইটির মিটিং-এ যোগ দিতে যখন তাঁকে ঐ সভার সদস্যপদ দেওয়া হয়। 1962 খৃস্টাব্দে সুইডেনে এবং সেখান থেকে মস্কোয় শান্তি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে যান। ঐ বছরেই অগাস্ট মাসে নিমন্ত্রিত হয়ে জাপানে যান বিজ্ঞান ও দর্শনের একটি সেমিনারে যোগ দিতে।

1956 খৃস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করে বিশ্বভারতীর উপাচার্যের পদ গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল 62 বছর। কালক্ষেপ না করে কাজে নামলেন তিনি। বিশ্বভারতীর কাঠামো পুনর্বিন্যাস করে বিজ্ঞানের কোর্স চালু করে তৈরি হল এক সার্বিক যোজনা। বিজ্ঞানের কয়েকটি সুপরিচিত শাখায় উন্নত শিক্ষণ এবং গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু দুঃখের বিষয় শান্তিনিকেতনের প্রবীণেরা তাঁর উদ্দেশ্যকে ঠিক বুঝতে না পেরে শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্যের পরিপন্থী বলে আশঙ্কা করলেন। তীব্র বাধা এল তাঁদের তরফ থেকে। বিশ্বভারতীতে বিজ্ঞান পাঠনের উন্নতি বিধানের চেষ্টায় সেখানেই হল যবনিকাপাত। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ও প্রীতির সম্পর্কই তাঁকে এই কাজে অনুপ্রেরিত করেছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বপরিচয় গ্রন্থখানি সত্যেন্দ্রনাথকেই উৎসর্গ করেছিলেন। যাই হোক, বিশ্বভারতীতে তাঁর নাতিদীর্ঘ অবস্থিতি অচিরেই শেষ হয়ে গেল। ছাত্র, মিত্র এবং ভক্তদের সানন্দ অভ্যর্থনার মধ্যে পুনরায় ফিরে এলেন কলকাতায় সত্যেন্দ্রনাথ।

আত্মপ্রচার এবং স্বার্থসিদ্ধি, এই দুটি ছিল তাঁর একেবারেই অজানা। নামের শেষে যুক্ত এম-এস-সি ডিগ্রীটুকুতেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। খ্যাতিকে তিনি ততটাই বরণ করে নিয়েছিলেন যতটা অ্যাসিসির সন্ত ফ্রান্সিস করেছিলেন দারিদ্র্যকে। কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে এসে স্নাত হলেন তিনি সম্মান ও স্বীকৃতির অফুরন্ত ধারায়। নিম্নের তালিকা থেকে এর একটা আন্দাজ পাওয়া যাবে।

1. ফাউণ্ডেশন ফেলোশিপ অব ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল সায়েন্স অ্যাকাডেমি [1935]
2. ডি. এস. সি [সাম্মানিক] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় [1957]
3. ডি. এস. সি [সাম্মানিক] যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় [1957]
4. ডি. এস. সি [সাম্মানিক] এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় [1957]
5. এফ. আর. এস, রয়্যাল সোসাইটি, লণ্ডন [1958]
6. দেশিকোত্তম, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় [1961]
7. ডি. এস. সি, ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট [1963]
8. ডি. এস. সি. [সাম্মানিক] দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় [1964]

তাঁর অধিকৃত বহু বিশিষ্ট পদ এবং দপ্তরের মধ্যে কয়েকটি এইরূপ ঃ—

1. বিভাগীয় সভাপতি, গণিত এবং পদার্থবিজ্ঞান, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশন [1929]

2. সভাপতি, ইণ্ডিয়ান ফিজিক্যাল সোসাইটি [1945-48]

3. সাধারণ সভাপতি, ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস, নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত 31তম অধিবেশন [1944]

4. সভাপতি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সেস অব ইণ্ডিয়া [1949-50]

5. সদস্য, রাজ্যসভা, ভারতীয় সংসদ [1952-58]

1958 থেকে 1974 পর্যন্ত কালটি হল কর্মজীবনের শেষ পর্যায়। এই সময়ের মধ্যে তিনটি পঞ্চবার্ষিকী মেয়াদ পূর্ণ করেছিলেন তিনি জাতীয় অধ্যাপকের গৌরবময় পদে। একেবারে নতুন ধারায়, অতি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধরনে তিনি কাজ করতে শুরু করলেন। কথাবার্তায় এবং ব্যবহারে তিনি হয়ে গেলেন বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় শিক্ষার্থী তরুণ ছাত্র এবং উৎসাহী গবেষকদেরই একজন। বার্ধক্যের স্পর্শে অধিকতর স্নেহপরায়ণ, পক্ককেশের প্রাচুর্যে শোভিত এই মানুষটিকে দেখে মনে পড়ত গির্জার পাপশ্রোতা পুরোহিতকে যাঁর কাছে সবাই নির্দ্বিধায় মনের গোপন কথা ব্যক্ত করতে পারে। যে কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে তাঁর নির্দেশাকাঙ্খী হলেই পাওয়া যেত তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ।

বিজ্ঞানের মৌলিক তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে গভীর এবং সুস্পষ্ট ধারণা ছিল তাঁর প্রধান বিশেষত্ব। এখন তিনি এই পরিণত সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হলেন যে পদার্থবিজ্ঞানের মূল চরিত্রটিই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পালটে গেছে। তার পরিধি এখন এত বিস্তৃত যে তাকে আর বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা কেন্দ্রের গজদন্তমিনারের আওতায় আবদ্ধ রাখা যায় না। দিগন্তপ্রসারী প্রজ্ঞাদৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হল প্রকৃতির আবরণ উন্মোচনে। এই প্রবন্ধ লেখককে (শ. দ. চ.) তিনি আহ্বান জানালেন তাঁর হিলিয়াম সন্ধান অভিযানে যোগ দিতে। ভবিষ্যতের অপচয়হীন বিদ্যুৎ-প্রসারণের কাজে হিলিয়ামের প্রয়োগ প্রতিশ্রুতিময়। পশ্চিমবঙ্গে বক্রেশ্বরের উষ্ণপ্রস্রবণগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে হিলিয়ামের অস্তিত্ব পূর্বেই লক্ষ্য করা গিয়েছিল। সেখানে তাঁর তত্ত্বাবধানে একটি ল্যাবরেটরী স্থাপিত হল। তিনি নিজে এই কাজে আগ্রহ না দেখালে এবং খুঁটিনাটি সব ছকে না দিলে অন্য কোন ব্যক্তির প্রভাব এবং উদ্যম কোনটাই ফলপ্রসূ হত না। তাঁর দেহান্তে এই কাজের ভার নিয়েছেন ভারত সরকারের পরমাণুশক্তি বিভাগ।

প্রতিভার কুহকে সকলকে যেন মোহিত করে রেখেছিল তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব। সাধারণ মানুষের কাছে তিনি ছিলেন এক বিস্ময়, কাল্পনিক পুরুষের এক জীবন্ত বিগ্রহ। প্রায়ই দেখা যেত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বোদ্ধা সত্যেন্দ্রনাথ সঙ্গীতের কোন ঘরোয়া বৈঠকে নিমীলিত নেত্রে বসে আছেন। মনে হত ঘুমিয়ে পড়েছেন, বলা বাহুল্য অনেককে হতাশ করে। কিন্তু অনুষ্ঠানান্তে চোখ মেলে তিনি পরিবেশককে গভীরভাবব্যঞ্জক, প্রাসঙ্গিক এমন সব প্রশ্ন করতেন যে শ্রোতাদের তাক লেগে যেত। যন্ত্রসঙ্গীতই ছিল তাঁর বিশেষ প্রিয় এবং এসরাজে তাঁর হাত ছিল দক্ষ বাদকের তুল্য। স্বীয় গৃহের এক নিভৃত কোণে অশ্রুঝরা নেত্রে এসরাজ বাদনরত অবস্থায় অনেকেই তাঁকে দেখেছেন।

চারুশিল্পও তাঁকে আকর্ষণ করত নিবিড় ভাবে। প্রায়ই তিনি যামিনী রায় প্রমুখ ওস্তাদ চিত্রকরদের সঙ্গে মুঘল ছবির সূক্ষ্ম কমণীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। সঙ্গীতের আসরে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কিংবা চিত্রপ্রদর্শনীতে যোগ দেওয়ার নিমন্ত্রণ তিনি কদাচিৎ প্রত্যাখ্যান করতেন।

তাঁর সদাসক্রিয় মস্তিষ্কে যেন চেতন এবং অচেতনের এক অদ্ভুত গভীর একত্ব ঘটেছিল। দৃষ্টির তারতম্যে কখন ধরা পড়ত রূপকথার বিশাল দৈত্যের অবয়বে এক সরল শিশুর সত্তা, কখনও বা এই বিরাট প্রতিভাধর ফুটে উঠতেন একেবারে সাধারণ মানুষের স্বভাব নিয়ে। বাইরে থেকে অনেক সময় তাঁকে আলস্যে নিমজ্জিত মনে হত কিন্তু সেই আচ্ছন্নতা সর্বদাই ছিল সচেতনতায় ভরা। একবার কলকাতার সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে বক্তৃতা দিচ্ছেন অধ্যাপক নীলস বোর। সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথের ক্লান্ত চোখ দুটি নিমীলিত। নিদ্রিতই দেখাচ্ছিল তাঁকে। ব্ল্যাকবোর্ডে লিখতে লিখতে হঠাৎ একসময় অধ্যাপক বোরের হাত গেল থেমে। কোথায় যেন আটকে গেছেন তিনি। সভাপতির দিকে চোখ ফিরিয়ে তিনি বলে উঠলেন—"হয়তো অধ্যাপক বোস আমাকে এখানে সাহায্য করতে পারবেন।" বাক্যটি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ চোখ মেললেন এবং গাণিতিক জটিলতাটি অবলীলাক্রমে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েই আবার ডুবে গেলেন তাঁর ধ্যানতন্দ্রায়। আর একবার এই একই স্থানে অধ্যাপক ফ্রেডেরিক জোলিও কুরীর বক্তৃতায় সভায় সভাপতিত্ব করছেন তিনি। ইংরাজীতে বক্তার পরিচয় দানান্তে আসন গ্রহণ করেই তিনি যথারীতি চোখ দুটি বন্ধ করলেন। অধ্যাপক জোলিও কুরী ভাল ইংরাজী বলতে পারতেন না তাই তাঁর ফরাসী ভাষা ইংরাজীতে তর্জমা করতে পারে এমন একজন লোক চাইলেন তিনি। কেউ এগিয়ে এলো না। অধ্যাপক বোস চোখ খুলে উঠে দাঁড়ালেন এবং অধ্যাপক জোলিও কুরীর বক্তৃতার প্রত্যেকটি বাক্যের অনুবাদ করে দিলেন অনবদ্য ইংরাজীতে।

সত্যেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এক মিশ্রিত মনোভাব। তাঁর মধ্যে যুগপৎ অবস্থান করত এক স্বপ্নদ্রষ্টা এবং বাস্তব দুনিয়ার একটি মানুষ। জীবনকে তিনি দেখিয়েছিলেন বিবিধ দশায়—তার রোদ ঝলমলে চেহারা এবং বেদনাভরা আঁধার, দুটোই। অনেক আঘাত পেয়েছিলেন তিনি, অনেক ধাক্কা সহ্য করতে হয়েছিল তাঁকে। ক্ষণিকের জন্য হতচকিত হলেও তিনি এগিয়ে গেছেন অতীতকে

মুছে ফেলে এবং ভবিষ্যতের পরোয়া করে না করে। এক খাঁটি আধ্যাত্মিক মানসিকতার মাধ্যমেই তিনি সেই আন্তর আনন্দ ও মিষ্টতা লাভ করেছিলেন যা তাঁকে সক্ষম করেছিল যথেচ্ছাচারী দুনিয়ার অবজ্ঞা উপহাসকে হেসে উড়িয়ে দিতে। আত্মজয়ই ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ জয়।

তাঁর জীবন হয়ে উঠল দীপ্ততাং মন্ত্রের সেবায় তৎপর। সহচরদের কাছে তিনি ছিলেন শক্তির স্তম্ভস্বরূপ। তাঁর অটল ভালবাসা ও সহানুভূতিই তাদের রোগ নিঃসঙ্গতা এবং হতাশা-নৈরাশ্যের জাল থেকে বেরিয়ে আসার পথ করে দিত। তাদের চেতনাকে জাগ্রত করে, বিশ্বাসকে বলিষ্ঠ করে, ভালবাসাকে নিবিড় করে এবং সাহসকে ইস্পাত-কঠিন করে শিখিয়েছিলেন নির্ভয়ে জীবনের বিকটতম চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে। তাঁর জন্মই হয়েছিল যেন শুধু বিলিয়ে দিতে কিছু পেতে নয় আর সর্বোপরি তাঁর অন্তরে ছিল সেই দুর্লভ পবিত্রতা যাকে বিচ্যুত করার ক্ষমতা না ছিল খ্যাতির না ছিল দুর্ভাগ্যের। কিভাবে বিখ্যাত হওয়া যায় তা তাঁর ভালই জানা ছিল কিন্তু জীবনভর খ্যাতির উজ্জ্বল আলোকে এসে দাঁড়াতে তাঁর ছিল চরম অনীহা। দয়াল প্রকৃতি, বলিষ্ঠ দেশপ্রেম, অসামান্য বুদ্ধি এবং মধুর সংবেদনশীলতা এইগুলিই ছিল তাঁর বিরাটত্বের মূল সুর।

1974 খৃস্টাব্দের 1লা জানুয়ারী তাঁর 80 বছর পূর্তি উপলক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের ব্যবস্থা করেছিল। বোস স্ট্যাটিসটিকসের 'সুবর্ণ জয়ন্তী' উদযাপনই ছিল তার বিশেষ কারণ। সারা জগতে নিমন্ত্রণ গেল। গণ্যমান্য বিদগ্ধেরা গ্রহণও করলেন সেই নিমন্ত্রণ। স্পষ্টতঃই এটা ছিল একান্তভাবে মনীষীদের সমাবেশ। সমকালীন বিজ্ঞানের ওপর বোস সংখ্যায়নের প্রভাব সম্বন্ধে বিশ্বমতের মূল্যায়ন করাই এর উদ্দেশ্য। বোস ইনস্টিটিউটের বক্তৃতা হলে সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীরা সেদিন একত্রিত। চোখ ধাঁধানো সব নাম ছিল বক্তাদের তালিকায়। কিন্তু সেদিন একরাশ সাদা চুলে ঢাকা মাথাওয়ালা মার্কা-মারা সেই মানুষটির সামনে সবাইকে যেন খুবই ক্ষুদ্র মনে হচ্ছিল। তিনি উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন কিন্তু তাঁকে বসে বসেই ভাষণ দিতে অনুরোধ করা হল। চারপাশে ফ্ল্যাশ বাল্ব ও ক্যামেরার তৎপরতার মাঝখানে তিনি ভাষণ দিলেন। কোনরূপ পূর্বপ্রস্তুতি বিনাই সুললিত ভাষাকে বাহন করে নির্গত হল এক বৈদগ্ধ্য-মণ্ডিত বাণী। স্মৃতি মন্থন করে বলে গেলেন সেই পুরনো দিনের কথা যখন বিধির অলক্ষ্য হস্তক্ষেপে রচিত হয়েছিল চারপৃষ্ঠার সেই নিবন্ধটি যার দৌলতে এইদিন সমবেত হয়েছেন একজায়গায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এতজন বরেণ্য বিজ্ঞানীরা। একজন ভবিষ্যদ্বক্তার মত তিনি তাঁর ভাষণ শেষ করলেন এই বলে, 'যে মানুষটি এতগুলি বছর পার করে এসেছে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আর দেখেছে শেষপ্রান্তে এসে যে তাঁর কাজ আদৃতই হয়েছে তাঁর আর বেশী বেঁচে থাকার প্রয়োজন নেই। একটি সুদীর্ঘ একনিষ্ঠ জীবনের এটাই তো সফল পরিণাম।'

পরের কয়েকটি সপ্তাহ তাঁর কাটল ঠাসা প্রোগ্রামে। সেমিনারে অংশগ্রহণ, প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন, সাংস্কৃতিক সভায় বক্তৃতা দান, সবকিছু তাঁরই সম্মানে আয়োজিত। কিন্তু তাঁর বৃদ্ধ শরীর এতটা ধকল সামলাতে পারল না। সীমাতিরিক্ত পরিশ্রম করে ফেলেছিলেন তিনি। বিরামহীন অনুষ্ঠানে অবসন্ন দেহটি রক্ষো নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাগ্রহণ করল। বার বার হতে লাগল শ্বাসকষ্ট। রোগের গুরুত্ব এবং তার পরিণতি কি সে বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল চিকিৎসকদের চেয়েও বেশী। 4ঠা ফেব্রুয়ারী 1974 খৃস্টাব্দের সকালে অবিচলিত ভাবে বরণ করে দিলেন মরণকে। নিকট আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী এবং ছাত্রদের—যাদের তাঁর প্রতি ছিল অসীম ভালবাসা ও শ্রদ্ধা—উপস্থিতিতে তাঁর মরদেহকে আহুতি দেওয়া হল কেওড়াতলা শ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লীতে।

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বোসের মৃত্যুতে একটা যুগের ঘটল অবসান। যে যুগটা ছিল সেই সব বিরাট পুরুষদের যাঁদের হাতে বিজ্ঞান গড়ে উঠেছিল ভারতে। আমরা তাঁর খুব নিকটে ছিলাম বলেই বোধহয় তাঁর মহত্বকে ঠিক ঠিক ধরতে পারি নি। হিমালয়ের অন্যান্য চূড়াগুলিকে ছাপিয়ে কতটা উঁচু হয়ে উঠেছে এভারেস্ট শৃঙ্গটি তা ধরা পড়ে দূর থেকে নিরীক্ষণ করে। তাঁর ভাবধারাকে ভবিষ্যতের মধ্যে প্রবিষ্ট করে দিয়েছিলেন তিনি নিজেই। এখন তাঁর অভিলাষকে প্রস্ফুটিত করার দায়িত্ব বর্তেছে আমাদেরই ওপরে।

বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের যোগব্যায়াম কেন্দ্রের যোগচিকিৎসা বিভাগে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করা হয়।

শিক্ষক—ডাঃ শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (যোগব্যায়ামের জাতীয় বিচারক)

যোগাযোগের সময় : শনিবার বিকাল 3টা থেকে 5টা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা-700006

বিশ্ব রহস্য—রবীন্দ্রভাবনায় ও বিজ্ঞানে

ভোলানাথ গঙ্গোপাধ্যায়*

বিজ্ঞানের প্রতি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের যে কিরূপ আগ্রহ ছিল এবং তিনি যে কতখানি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলির সত্যতা উপলব্ধি করেছিলেন তা তাঁর কাব্য রচনার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। এই নিবন্ধে এরূপ কয়েকটি কবিতার উল্লেখ করা হলো।

শক্তি ও বস্তু পরস্পর রূপান্তরশীল, শক্তি ঘনীভূত হয়েই বস্তুরূপে প্রকাশিত—আইনস্টাইনের এই মতবাদের তাৎপর্য উপলব্ধি করে তিনি 'চঞ্চলা' শীর্ষক কবিতায় তা এইভাবে ব্যক্ত করেছেন।

নিঃসীম শূন্যে অনন্তকাল ধরে যে মহাজাগতিক তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরণ প্রবাহ চলেছে তার গতির ছন্দে যে তরঙ্গ উঠছে তা পুঞ্জীভূত হয়ে বস্তু সৃষ্টি করছে।

হে বিরাট নদী
অদৃশ্য নিস্তব্ধ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি
স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে
বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুকণা উঠে জেগে।

এর পরের অংশটিতে এবং 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়' কবিতাতে তিনি মহাবিস্ফোরণের পরবর্তী অবস্থা বর্ণনা করেছেন।

সীমাহীন অন্ধকারে আলোক বিকিরণকারী ঘূর্ণমান নীহারিকার জন্ম। নীহারিকা থেকে কোটি নক্ষত্রের গ্রহ-উপগ্রহের উৎপত্তি এবং ছায়াপথের সৃষ্টি, মহাকর্ষের প্রভাবে ছায়াপথের কেন্দ্রবিন্দুর চারিদিকে এক একটি সৌর জগতের পরিক্রমণ প্রভৃতির ইঙ্গিত বহন করে। সকলেই প্রকৃতির সূক্ষ্ম নিয়মে বাঁধা পড়ে চলতে শুরু করে।

জগতের গঙ্গোত্রী শিখর হতে
শত শত স্রোতে
উচ্ছ্বসিল অগ্নিময় বিশ্বের নির্ঝর
স্তব্ধতার পাষাণ হৃদয়
শতভাগে গেল বিদীরিয়া।

*　　*　　*

অগ্নিময় মিলন হইতে
জন্মিতেছে আগের সন্তান
অন্ধকার শূন্য মরু মাঝে
শত শত অগ্নি পরিবার
দিশে দিশে করিছে ভ্রমণ

*　　*　　*

—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়

আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া ওঠে বর্ণস্রোতে
ধাবমান অন্ধকার হতে
ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে
স্তরে স্তরে
সূর্য্য চন্দ্র তারা যত
বুদ্‌বুদের মত।

—চঞ্চলা

*　　*　　*

চক্রপথে ভ্রমে গ্রহতারা
চক্র পথে রবি শশী ভ্রমে
শাসনের গদা চক্রলয়ে
চরাচর রাখিলা নিয়মে।

—'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়'

এই বিশ্বে চরম স্থিতি (absolute rest) বলে কিছু নেই। অণু-পরমাণু থেকে এই বিশ্বের সকল বস্তুই চলমান। 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থ থেকে কবিগুরু স্বয়ং এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

হে বলাকা, তুমি মন থেকে স্তব্ধতার আবরণ উঠিয়ে দিয়ে গেলে। এই আবরণ মায়ার জালের মত ছিল, তাই স্তব্ধতার ভিতর যে গতি ছিল তা আগে দেখিনি।

এই নদী, বন, পৃথিবী বসুন্ধরার মানুষ সকলে এক জায়গায় ছুটে চলেছে। তাদের কোথা থেকে সুরু কোথায় শেষ তা জানি না। আকাশে তারার প্রবাহের মতো, সৌর জগতের উপগ্রহের ছুটে চলার মতো, এই বিশ্ব কোন্ নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে প্রতি মুহূর্তে কত মাইল বেগে ছুটে চলেছে। কেন তাদের এই ছুটাছুটি জানি না, কিন্তু ধাবমান নক্ষত্রের মতো তাদের একমাত্র বাণী—'এখানে নয় এখানে নয়।'

হে হংসবলাকা,
আজ রাত্রে মোর কাছে খুলে দিলে স্তব্ধতার ঢাকা।
দেখিতেছি আমি আজি
এই গিরিরাজি
এই বন, চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়,
দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায়।
নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে
চমকিছে অন্ধকার আলোর স্পন্দনে।

অতি ধীরে অবিরাম পরিবর্তনের ফলে সরলতম জীবদেহ থেকে জটিলতম জীবদেহের ক্রমবিকাশ ঘটিত অভিব্যক্তিবাদকে পুরোপুরি সমর্থন করে কবি 'সমুদ্রের প্রতি' ও 'চঞ্চলা' কবিতায় তা ব্যক্ত করেছেন।

মনে হয় যেন মনে পড়ে
যখন বিলীনভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে

*বিরক্তিসদন, মনসাতলা পোঃ চুঁচুড়া, হুগলী

অজ্ঞাত ভুবনভ্রূণমাঝে ; লক্ষ কোটি বর্ষ ধরে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে। সেই জন্ম-পূর্বের স্মরণ
গর্ভস্থ পৃথিবী'পরে সেই নিত্য জীবন স্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের অতিক্ষীণ আভাসের মতো
জাগে যেন সমস্ত শিরায়।

—সমুদ্রের প্রতি

আজি মনে পড়ে সেই কথা—
যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে
প্রাণ হতে প্রাণে।

—চঞ্চলা

সূর্যই জীবের আত্মা সূর্যই জীবের প্রাণধারাকে অব্যাহত রেখেছে। উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় সৌর শক্তিকে জীবকুলের জন্য খাদ্যে শৃঙ্খলিত বারে এবং তা স্থৈতিক শক্তিরূপে সঞ্চিত হয়। এইভাবে জীবের বিপাকীয় ক্রিয়ার শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। সূর্যকিরণে ফুল ফোটে তা ফটোন্যাস্টিক চলনের ইঙ্গিতবহ।

ভিক্ষাবৃত্তি করে না তপন
পৃথিবীরে চাহে সে যখন
সে চাহে উজ্জ্বল করিবারে
সে চাহে উর্বর করিবারে
জীবন করিতে প্রবাহিত
কুসুম করিতে বিকশিত।

—অনুগ্রহ

প্রাণের রহস্য আজও অনাবিষ্কৃত। আধুনিক বিজ্ঞান ডি এন এ পর্যন্ত এগিয়েছে কিন্তু প্রাণ কি করে এলো বৈজ্ঞানিকেরা এখনও তা খুঁজে বের করতে পারেন নি।

'সূর্য থেকেই প্রাণের উদ্ভব ও উৎসার'—ঋগ্বেদের সাবিত্রী-মন্ত্রের এই কল্পনাটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাবিত্রী' ও 'বৃক্ষবন্দনা' কবিতায়, অপরূপভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

এ প্রাণ তোমারি এক ছিন্ন তান, সুরের তরণী
আয়ুস্রোতমুখে
হাসিয়া ভাসায়ে দিলে লীলাচ্ছলে, কৌতুকে ধরণী
বেঁধে নিল বুকে।

—সাবিত্রী

ধ্যান বলে তোমার মাঝার
গেছি আমি, জেনেছি—সূর্যের বক্ষে জ্বলে বহ্নিরূপে
সৃষ্টিযজ্ঞে যেই হোম তোমার সত্তায় চুপে চুপে
ধরে তাই শ্যামস্নিগ্ধরূপ। ওগো সূর্যরশ্মিপায়ী,
শত শত শতাব্দীর দিন ধেনু দুহিয়া সদাই
যে তেজে ভরিলে মজ্জা মানবেরে তাই করি দান।

—বৃক্ষবন্দনা

অতএব প্রাণের উৎস সন্ধানে কবিগুরুর এই ভাবনা নিয়ে চিন্তা করা যেতে পারে।

উপসংহারে বলতে হয় কবিগুরু তাঁর দার্শনিক দৃষ্টির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অপরূপ সমন্বয় ঘটিয়েছেন। পদার্থবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান সম্পর্কে গভীর জ্ঞান না থাকলে এভাবে স্বচ্ছন্দে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলিকে কাব্যরূপ দেওয়া সম্ভবপর নয়।

নতুন জাতের মুরগী

ইজতনগরের কেন্দ্রীয় পক্ষী অনুসন্ধান কেন্দ্রের প্রচেষ্টায় একটি নতুন জাতের মুরগী পাওয়া গেছে। এই জাত গত চার বছর যাবৎ ডিম দিতে এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। 1981-82-তে ভারত সরকারের কৃষি মন্ত্রকের পরীক্ষার রিপোর্ট অনুযায়ী উপরিউক্ত সংস্থার উৎপাদিত একটি মুরগী 247টি ডিম দিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। 'হেন ডে এগ প্রোডাকশন' হিসেবে এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। আরেকটি জাত 264 ডিম দিয়েও এই হিসাবে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।

এই প্রতিযোগিতায় দেশের বিভিন্ন সংগঠন দ্বারা 38টি জাত অংশ নেয়। ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের অন্তর্গত ইজতনগরের কেন্দ্রীয় পক্ষী অনুসন্ধান সংস্থার বিজ্ঞানিগণের প্রচেষ্টায় উৎপাদিত মুরগীর এই নতুন জাতগুলি নিঃসন্দেহে এদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে অন্যান্য জাতের তুলনায়।

[ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ]

বেকারেলের ভুল

চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়*

ঘটনাটা 1896 খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকে। কিছুদিন হল প্রফেসর রণ্টগোন তাঁর যুগান্তকারী এক্স-রশ্মি আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেছেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীতে সমস্ত প্রান্তের বিজ্ঞানীরা এই অদৃশ্য রশ্মিটিকে নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা শুরু করেছেন। ঠিক এই সময়ে ফ্রান্সে হেনরী বেকারেল লুমিনিসেন্স্ (luminescence) নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন। তিনি দেখেছিলেন কিছু কিছু বস্তুর উপর উজ্জ্বল রৌদ্রকিরণ পড়লে তা আরো উজ্জ্বল এক ধরণের আলো প্রভা দেয়।

প্রফেসর রণ্টগোন, তাঁর প্রথম এক্স-রে নলে যে স্থান দিয়ে সেই অদৃশ্য রশ্মি বেরিয়ে আসছিল তার কাচের গায়ে এক ধরণের সবুজাভ হলুদ আলোক লক্ষ্য করেন। কিন্তু না তিনি বা অন্য কোন বিজ্ঞানী এই ঘটনার কোন ব্যাখ্যা দিতে সচেষ্ট হন। অনুসন্ধিৎসু বেকারেলকে এই ঘটনা ভীষণভাবে আকৃষ্ট করে। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌছান যে লুমিনিসেন্সেরই অপর রূপ ফ্লুরেসেনস (fluorescence)। ঠিক একই সঙ্গে তাঁর মনে হল যে তাহলে যে কোন ফ্লুরেসেন্ট বস্তু থেকে এই অদৃশ্য রশ্মি বেরিয়ে আসা সম্ভব। ভাবা মাত্রই তিনি কাজ শুরু করে দিলেন। এটা জানা ছিল যে এক্স-রশ্মি ফোটোগ্রাফিক প্লেটকে আক্রমণ করে। সেই সময়ে যে সমস্ত ফ্লুরোসেন্ট বস্তুর কথা জানা ছিল তার মধ্যে ঘটনাচক্রে ইউরেনিয়াম সালফেট নিয়ে কালো কাগজে মোড়া ভাল ফোটোগ্রাফিক প্লেটের উপর রেখে সেটিকে রৌদ্রকিরণে রেখে দিবেন। তিনি ভাবলেন, যদি তাঁর ধারণা ঠিক হয় যে ঐ ফ্লুরোসেন্ট বস্তু থেকে শুধু দৃশ্য আলোই নয় অদৃশ্য রঞ্জন রশ্মিও নির্গত হওয়া সম্ভব এবং ঐ রশ্মি কালো কাগজের আবরণ ভেদ করে ফোটো প্লেটে রেখাপাত করবে। আর যদি তা ঠিক না হয় তবে ফোটো প্লেট অবিকৃত থাকবে। কয়েক ঘণ্টা পর যখন তিনি ফোটো প্লেটটি পরীক্ষা করলেন ও অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তিনি সেখানে ইউরেনিয়াম যৌগের প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করলেন। পরীক্ষাটি বেশ কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করার পর অবশেষে তাঁর এই নূতন আবিষ্কারের কথা বিশ্ববাসীকে জানাবার জন্য ছোট্ট একটি প্রবন্ধ লিখে ফেললেন। প্রবন্ধের মূল কথাটি এই রকম যে, উজ্জ্বল রৌদ্রকিরণে রাখা ইউরেনিয়াম সালফেট থেকে নির্গত অদৃশ্য রশ্মিই রঞ্জন রশ্মি।

কিন্তু শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা তাঁদের নূতন আবিষ্কারের কথা সকলকে জানানোর আগে বারবার তার পুনরাবৃত্তি করে তার ফল সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলেই সকলের কাছে প্রকাশ করেন। তাই বেকারেলও সেই প্রবন্ধটি প্রকাশ করতে দেবার আগে আর একবার পরীক্ষাটি করে নিতে মনস্থ করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সেদিনটা ছিল মেঘলা, সারাদিন তিনি প্লেটের উপর ইউরেনিয়াম যৌগটি রেখে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু না, সূর্যদেব যেন বেকারেলের ভুলটি সংশোধন করার জন্যই একবারও মুখ দেখালেন না। সমগ্র জিনিষটি ঐ অবস্থাতেই তিনি তার অন্ধকার ঘরে ড্রয়ারে রেখে দিলেন। পরের দিন পরীক্ষা করতে গিয়েও সেই একই আকাশের অবস্থা। এরপর কিছুদিন বেকারেল অন্যান্য ব্যাপারে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কয়েকদিন পর হঠাৎ তাঁর কি মনে হল ফোটোপ্লেটটি তিনি পরিবর্ধন করলেন আর অত্যন্ত আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন সেই ইউরেনিয়াম খণ্ডটির পরিষ্কার ছবি। তবে কি কেউ তাঁর অজান্তে এটিকে সূর্যকিরণে রেখে ছিল? আর একটি নূতন ফোটোপ্লেট নিয়ে ইউরেনিয়াম খণ্ডটি রেখে সেটিকে এবার অন্ধকারে রাখা হল। এবারেও বস্তুটির পরিষ্কার ছবি পাওয়া গেল। তিনি বারবার এই পরীক্ষা করে অবশেষে বুঝতে পারলেন তাঁর পূর্বেকার ভুল।

তারপর এল সেই 1896 খৃস্টাব্দের 26শে ফেব্রুয়ারী। সেদিন সমগ্র বিশ্ববাসী জানল তাঁর আবিষ্কারের কথা। এক নূতন ঘটনা—ইউরেনিয়াম থেকে সব সময় স্বতস্ফূর্ত ভাবে নির্গত হয় এক অদৃশ্য রশ্মি, যা এক্স-রশ্মির সঙ্গে কোন কোন দিক থেকে একই রূপ। এই ঘটনাই পরবর্তীকালে তেজস্ক্রিয়তা নামে পরিচিত হয়।

*পাহাড়হাটী জি. এম হাইস্কুল পোঃ + গ্রাঃ—পাহাড়হাটী জেলা—বর্ধমান

আমি চিরদিনই গতানুগতিক পথে চলার মনোভাবকে অবিবেচনার কাজ বলে প্রতিবাদ করে থাকি। বিদেশী ভাষাই আমাদের দেশে সাক্ষরের সংখ্যা বৃদ্ধির অন্তরায়। বিদেশী ভাষা শিক্ষার বাহন হলে মুখস্থ করবার প্ররোচনা দেয় ছাত্রদের এবং এর ফলে তাঁদের মৌলিক চিন্তার প্রসার ঘটতে বাধার সৃষ্টি হয়।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ

গণিতের মিল্টন—অয়লার

নন্দলাল মাইতি*

মিল দেখলেই তুলনার কথা মনে আসে। অবশ্য যে কোন তুলনার মধ্যে সর্বৈব মিল থাকে না, কখনো হয়তো ভেতরের দিক থেকে মিল বেশী দেখা যায়, আবার কখনো বা বাইরের দিক থেকে। কবি মিল্টন ও গণিতজ্ঞ অয়লারের মধ্যে কম বেশী এই দু-রকম মিল দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, একজন কবি আর আর অপরজন গণিতজ্ঞ। তা হলেও প্রতিভার গভীরতা ও বহির্জীবনের দিক থেকে বিচার করলে উভয়ের মধ্যে বেশ সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।

ইংরেজী সাহিত্যে সেক্সপীয়ার ও মিলটন মহাপ্রতিভাশালী কবি। জনপ্রিয়তার বিপুলতায় তাঁদের গৃহস্থালীর কবি বলা হয়। গণিতে আর্কিমিডিস-নিউটন-গাউসের পরই অয়লারের স্থান। মিলটন শেষ বয়সে অন্ধ হয়ে যান, কিন্তু তাতে তাঁর কাব্য-প্রতিভা পঙ্গু হয় নি। অন্ধ হয়ে যাবার পর তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য প্যারাডাইস লস্ট (Paradise Lost) রচিত ও প্রকাশিত হয়। অয়লার গাণিতিক গবেষণায় গভীর মনোনিবেশ ও পরিশ্রমের ফলে একটি চোখ হারান এবং পরে অন্ধ হয়ে যান। কিন্তু তা হলেও তাঁর গাণিতিক গবেষণা, আবিষ্কার ও রচনা ব্যাহত হয় নি। জীবনের শেষ সতেরো বছর অন্ধ হয়েও চার-শ' গবেষণাপত্র ও অনেক গ্রন্থ রচনা করেন ; বছরে প্রায় আট-শ' পাতা করে লেখা সারা জীবন করে গেছেন। মিলটন ও অয়লার একাধিকবার বিবাহ করেন এবং অন্ধ হয়ে যাবার পরেও।

সুইজারল্যাণ্ডের সম্মান ও প্রতিষ্ঠা বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে বারনাউলি পরিবার। আর অয়লার সেই সম্মান ও প্রতিষ্ঠা আরো দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করেছেন। 1907 খৃস্টাব্দে বেসেলের নিকট তাঁর জন্ম। বাবা চেয়েছিলেন ছেলেকে ধর্মতত্ত্বে শিক্ষিত করে তুলতে। কিন্তু অয়লারের ওই দিকে মন ছিল না, গণিতের প্রতি তাঁর আজন্ম আগ্রহ ও আকর্ষণ। গণিতের প্রথম পাঠ বাবার কাছে। অতি অল্প বয়সে মাত্র পনেরো বছর বয়সে বেসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করেন, আর এখানেই জন বারনাউলির মত গণিতজ্ঞের কাছে পাঠ নেবার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। মাত্র আঠারো বছর বয়স থেকেই তিনি গবেষণাপত্র প্রকাশ করতে থাকেন। আর মাত্র উনিশ বছর বয়সে ফ্রেঞ্চ একাদামি দ্য সায়েন্স থেকে একটি গাণিতিক সমস্যা সমাধানের জন্য পুরস্কার লাভ করেন। তারপর জীবনে বহুবার এখান থেকে পুরস্কার পান। সে আর এক ইতিহাস।

বন্ধু ও সহপাঠী ডানিয়েল ও নিকোলাস বারনাউলির সহযোগিতায় তিনি রাশিয়ার সেন্ট পিটার্স'বার্গ-এ গমন করেন। রাজদরবারে সম্মান ও প্রতিষ্ঠালাভ কেন্দ্র করে একটি চমৎকার কাহিনী আছে। ওই সময় বিখ্যাত কোষকার ও দার্শনিক দিদেরো রাজদরবারে ছিলেন। কিন্তু তাঁর অধর্মীয় মন্তব্যে বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হয়ে সম্রাজ্ঞী ক্যাথরিন অয়লারের আগমন বার্তা ঘোষণা করে প্রচার করেন যে, এক বিখ্যাত গণিতজ্ঞ গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে প্রমাণ করবেন ঈশ্বর আছেন। এই প্রসঙ্গে অয়লারের উক্তিটি উদ্ধৃত করা হলো :

Monsieur, $\frac{a+b^n}{n}=x$, done Dien eaiste, repondez ! "অর্থাৎ $\frac{a+b^n}{n}=x$, অতএব ঈশ্বর আছেন ; আপনার কিছু বক্তব্য আছে।"

1733 থেকে 1741 পর্যন্ত অয়লার রাশিয়ায় ছিলেন। তারপর দীর্ঘ পঁচিশ বছর বার্লিনে ছিলেন। ইতিমধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত একটি সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে অসুখে পড়ে 1735 খৃস্টাব্দে একটি চোখ হারান। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই সমস্যা সমাধান করতে প্রখ্যাত গণিতজ্ঞরা মাসের পর মাস কাটান, কিন্তু অয়লার মাত্র তিন দিনে সমাধান করেন।

বার্লিনে এসে প্রুশিয়ার রাজার ভাইপোর শিক্ষার ভার নেন। তাছাড়া ফ্রেডারিক দি গ্রেট-এর আহ্বানে তিনি রাজ্যের নানা সমস্যা সমাধানে অংশ গ্রহণ করেন ; যেমন—জীবনবীমা, খাল জলসেচ ইত্যাদি ব্যাপারে সাহায্য করেন। কিন্তু বার্লিনে থাকলেও রাশিয়ার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছেদ হয় নি ; পঁচিশ বছরে অন্তত এক-শ' গবেষণাপত্র প্রেরণ করেন।

1766 খৃস্টাব্দে অয়লার রাশিয়ায় ফিরে এলেন। তখন রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী বিশ্ববিশ্রুত বিদ্যোৎসাহিনী ক্যাথরিন। এখানে আসার কিছুদিন পরেই তিনি অন্ধ হয়ে যান। তারপর তিনি সতের বছর বেঁচে ছিলেন এবং সক্রিয় ছিলেন। বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন অয়লার। বহু কবিতা ছিল তাঁর কণ্ঠস্থ, ভার্জিলের ঈনিড মহাকাব্য অনর্গল মুখস্থ বলে যেতে পারতেন। গণিতের নানা সূত্রে যেন তাঁর ছবির মত চোখের সামনে ভেসে উঠত। মনে মনে অঙ্ক কষায় একমাত্র গাউস ছাড়া আর কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না।

অয়লারের গাণিতিক সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি ছিল একান্ত নিজস্ব। এমনটি অন্যান্য গণিতজ্ঞদের ক্ষেত্রে সাধারণত দেখা যায় না। বেশীর ভাগ সময় বিশেষ একটি সমস্যাকে কেন্দ্র করে তা থেকে উদ্ভূত নানা সমস্যার সমাধান করতেন।

দেকার্তে, নিউটন ও কোসীর মত তিনি গণিতে নতুন শাখা সৃষ্টি করতে পারেন নি সত্য, কিন্তু গণিতে এমন গভীর ব্যুৎপত্তি ও প্রয়োগ ক্ষমতা সচরাচর দেখা যায় না। গণিতের প্রায় সব

*ঠাকুরাণীচক, হুগলী, পিন—712613

শাখাতে তাঁর নাম দেখা যায়। তাঁর নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক সূত্র; অয়লার বহুমাত্রিক রাশিমালা, অয়লার ধ্রুবক, অয়লার সমাকলন, অয়লার রেখার সঙ্গে তাঁর নাম জড়িত।

অয়লার আধুনিক গণিতের ভাষা সৃষ্টি করেছেন। ত্রিকোণমিতির অপেক্ষকের প্রতীক তাঁর সৃষ্টি; তাঁর প্রচেষ্টায় অনেক সূত্রের সরলীকরণ সম্ভব হয়েছে; ত্রিভুজের কোণের প্রতীক A, B, C দ্বারা এবং বাহুর প্রতীক a, b, c তিনিই প্রবর্তন করেন; দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধানের জন্য $X = Vp + Vq + Vr$ ধরে পদ্ধতি আবিষ্কার করেন অয়লার। তিনিই প্রথম 3·14159...এর প্রতীক হিসাবে π (পাই) ব্যবহার করেন। লিবনিজ ও জন বারনাউলির মধ্যে ঋণাত্মক সংখ্যার লগারিদম আছে কিনা এই বিতর্কের তিনিই অবসান ঘটান।

বিপুল সংখ্যক গবেষণাপত্র রচনা থেকে তাঁর গণিত, পদার্থবিদ্যা ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় অধিকারের কথা জানতে পারা যায়। গণিতে অবকলন সমীকরণ, বৈশ্লেষিক ও অবকলন জ্যামিতির বক্ররেখা ও ক্ষেত্রফল সম্পর্কিত গবেষণা, সংখ্যাতত্ত্ব, শ্রেণী ইত্যাদি তাঁর প্রতিভায় পুষ্ট ও বর্ধিত হয়েছে। তিনি প্রথম তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার সূত্রপাত করেন; সৃষ্টি করেছেন বৈশ্লেষিক বলবিদ্যা আর স্থির বস্তুর বলবিদ্যা। কেবল সংস্কার ও প্রবর্তকের ভূমিকাই তাঁর ছিল না; সৃজন করেছেন অনেক, গণিত পাঠ্য-পুস্তকও কম ছিল না। সারা ইউরোপে এক-শ' বছর ধরে এগুলি পঠিত হয়েছে।

সে-সময় অয়লার গ্রন্থ, চিন্তা-ভাবনা, গাণিতিক গবেষণা ও প্রেরণা দিয়ে সমগ্র ইউরোপ আচ্ছন্ন করে ছিলেন। এই প্রসঙ্গে একজন গণিতের ঐতিহাসিক বলেন,—he could at the end of life consider as his pupils all the mathematicians of Europe."*
নাটকীয়ভাবে সেন্ট পিটার্সবার্গে তাঁর আবির্ভাব, আর তিরোভাবও তেমনি নাটকীয়ভাবে—1783 খৃস্টাব্দে 7ই সেপ্টেম্বর। সন্ধ্যার আহার শেষ। পাইপ মুখে গাণিতিক আলোচনা করছেন, —সেদিনের উল্লেখযোগ্য দুটি ঘটনা নিয়েও কথাবার্তা হচ্ছে। ঘটনা দুটি: মন্টগলফারদের বিষয়, আর ইউরেনাস গ্রহ আবিষ্কার। হঠাৎ কথাবার্তা বন্ধ, আলোচনা স্তব্ধ। অয়লার চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হলেন।

* Mathematical Thought from Ancient to Modern Times M. Kline, Ovford.

ভেবে উত্তর দাও

মোহনলাল বিষয়ী*

নিম্নের প্রশ্নগুলির একাধিক উত্তর দেওয়া আছে, সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত কর :—

1. ভিটামিন B_{17}-এর অপর নাম
(ক) থায়ামিন, (খ) কোলিন, (গ) অ্যামিগডালিন, (ঘ) বায়োটিন।

2. আলোক রশ্মির ঔজ্জ্বল্য স্থির করার যন্ত্রের নাম
(ক) আর্ক ইণ্ডিকেটর, (খ) ফটোমিটার, (গ) অকসোগ্রাফ, (ঘ) ক্রোমোমিটার।

3. মানবদেহের হৃৎপিণ্ডের ওজন প্রায়
(ক) 100 গ্রাম, (খ) 500 গ্রাম, (গ) 300 গ্রাম, (ঘ) 1000 গ্রাম।

4. উদ্ভিদের বৃদ্ধি প্রতিরোধকারী হরমোন
(ক) অক্সিন, (খ) কাইনিন, (গ) STH, (ঘ) ডরমিন।

5. একজন স্বাভাবিক পুরুষের দাড়িতে কটা চুল থাকে
(ক) 25 হাজার, (খ) 25 লক্ষ, (গ) 5 লক্ষ, (ঘ) 5 কোটি।

6. সবচেয়ে দ্রুতগতি সম্পন্ন প্রাণী
(ক) চিতাবাঘ, (খ) বাজপাখি, (গ) মাছি, (ঘ) হরিণ।

7. মানবদেহের ওজনের কত শতাংশ মস্তিষ্কের ওজন
(ক) 10 শতাংশ, (খ) 20 শতাংশ, (গ) 0·02 শতাংশ, (ঘ) 2 শতাংশ।

8. কোন্ যন্ত্রের সাহায্যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের বায়ু মাপা হয়
(ক) রেসপিরোমিটার, (খ) টেনসিমিটার, (গ) হাইড্রোমিটার।

9. মানুষের ক্ষেত্রে ডিম্বাণু শুক্রাণুর দ্বারা নিষিক্ত হবার কতদিন পরে শিশুর জন্ম হয়
(ক) 500 দিন, (খ) 200 দিন, (গ) 280 দিন, (ঘ) 340 দিন।

10. থাইরক্সিন হরমোন প্রথম সংশ্লেষ করেন বিজ্ঞানী
(ক) ডারউইন, (খ) কোরেন্স, (গ) শেরম্যাক, (ঘ) হ্যারিংটন।

11. কৃত্রিম জিন প্রথম প্রস্তুত করেন
(ক) মেণ্ডেল, (খ) হরগোবিন্দ খোরানা, (গ) লিস্টার, (ঘ) রুবেন।

12. মানবদেহের ক্ষুদ্রতম অস্থিটির নাম ;
(ক) রেডিয়াম, (খ) ফ্রন্টাল, (গ) মেলিয়াস, (ঘ) স্টেপিস।

13. কেঁচোর গমন পদ্ধতির নাম ;
(ক) পেরিস্টালসিস, (ঘ) ট্রিপিং, (গ) পেরিস্টালটিক, (ঘ) লুপিং।

14. হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের গতি পরীক্ষা করার যন্ত্রটির নাম ;
(ক) স্টেথোস্কোপ, (খ) টেনসিওমিটার, (গ) ভিস্কোমিটার, (ঘ) সেন্ট্রিফিউজ।

15. ধানগাছের কাণ্ডছিদ্রকারী পোকার নাম ;
(ক) গুটিপোকা, (খ) লেদাপোকা, (গ) মাজরাপোকা।

সঠিক উত্তর পাঠাতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।]

*মেমারী, বর্ধমান

ফেব্রুয়ারী '84 সংখ্যার 'ভেবে উত্তর দাও'-র উত্তর

1. (iv) মরফিন, 2. (ii) মৌমাছি, 3. (ii) ছত্রাকঘটিত রোগ, 4. (i) আয়োডিন, 5. (ii) জগদীশচন্দ্র বসু, 6. (iv) টাইফয়েড 7. (iii) আইজ্যাক পিটম্যান, 8. (iv) কচ্ছপ (350) প্রায়, 9. (i) হামিংবার্ড (ইকুয়েডর দেশে), 10. (ii) স্টীম ইঞ্জিন, 11. (i) $C_6H_5NH_2$, 12. (iii) কোরাণ্ডাম (Al_2O_3) 13. (iii) γ (রশ্মি), 14. i) পিকনোডি, 15. (i) টেকটোনাগ্র্যাণ্ডিস, 16. (ii) ডালটন, 17. (iv) র‍্যাডন, 18. (iii) সিরাম (28000 ফুট) প্রায়, 19. (i) অডিওফোন, 20. (iii) অন্ধদের পড়ার পদ্ধতি।

ফেব্রুয়ারী '84 সংখ্যায় 'ভেবে উত্তর দাও'-র উত্তরদাতাদের নাম—

সব ঠিক—তাপস দাশ, মেদিনীপুর

1টা বাদে—মঙ্গলদূত, দীপু এবং শাঁস, হুগলী। পার্থপ্রতিম গঙ্গোপাধ্যায়, হুগলী।

2টা বাদে—মহাদেব পণ্ডিত, বর্ধমান।

3টা বাদে—বনশ্রী দত্ত, হাওড়া। সমীরকুমার সেন, 24-পরগণা। সর্বাণী ষড়ঙ্গী, অনির্বাণ মিশ্র, দেবজ্যোতি ষড়ঙ্গী, মেদিনীপুর।

শব্দ-শৃঙ্খল

তপনকুমার মণ্ডল*

সূত্র :

1. 1921 খৃস্টাব্দে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিজ্ঞানী।

*	*	*	1 আ					
*	*	*	2 চা			*	*	*
*	*	3	র্য			*	*	*
*	4		স				*	*
*	*	5	ত্যে					
*	*	6	ন্দ্র			*	*	*
*	*	*	7 না				*	*
*	*	*	8 থ		*	*	*	*
*	*	*	9 বো			*	*	*
*	10		সে		*	*	*	*
11			র			*	*	*
*	*	*	12 জ্ঞা		*	*	*	*
13			ন	*	*	*	*	*
*	*	*	14 ও				*	*
*	*	*	15 বি				*	*
*	*	16	জ্ঞা			*	*	*
17			ন	*	*	*	*	*

2. 'হিস্ট্রি অফ ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু'-এর লেখক
3. ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ।
4. বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারক।
5. ছন্দের জাদুকর।
6. মেঘনাদ।
8. মরুভূমি।
10. অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারক।
12. যাঁর প্রচুর জ্ঞান।
13. কালার ফটোগ্রাফ আবিষ্কারক।
15. বিশ্ববিখ্যাত জার্মান সুরকার।
16. যাঁরা বিজ্ঞান সাধনা করেন।
7. অ্যাটম বোমা বিস্ফোরণ করা হয়।
9. 'পাঁচ' পারমাণবিক সংখ্যাবিশিষ্ট মৌল।
11. ফাউনটেন পেনের আবিষ্কারক।
14. দিয়াশালাই-এর আবিষ্কারক।
17. হার্মোনিয়াম-এর আবিষ্কারক।

* 19/A, ভূষণ ব্যানার্জী লেন, কলিকাতা-700007

(সঠিক সমাধান পাঠাতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে)

ফেব্রুয়ারী '84 সংখ্যার 'শব্দ-শৃঙ্খলে'র সমাধান

আ	ই	ন	স্টা	ই	ন	X	ম	য়	সা
X	সু	র	মা	X	X	X	X	X	লো
X	বৈ	ম	ত	ন্ত্র	X	X	কা	X	ক
X	ই	X	X	X	কু	মে	রু	X	স
X	রা	কু	X	X	ই	X	থা	X	ং
হে	ন	রী	ক্যা	ভে	ন	ডি	স	X	শ্লে
লি	X	X	X	X	ট	X	X	বি	ষ
ক	র	X	শ্ব	স	ন	X	শৈ	X	X
প্টা	X	ব	X	X	X	X	বা	X	X
র	জ	ন	X	ম	ন্ট	গো	ল	ফা	র

পাশাপাশি :

1. আইনস্টাইন, 4. ময়সা, 6. সুরমা, 7. বৈমতন্ত্র, 9. কুমেরু, 11. হেনরী ক্যাভেনডিস, 12. বিষ, 13. কর, 14. শ্বসন, 17. রজন, 18. মন্ট গোলফার।

উপর-নীচ :

2. ইসুবেইরান, 3. নরম, 5. সালোক সংশ্লেষ, 8. কারুথাস, 9. কুইনটন, 10. কুরী, 11. হেলিকপ্টার, 15. শৈবাল, 16. বন।

ফেব্রুয়ারী '84 সংখ্যার 'শব্দ-শৃঙ্খলে'র সমাধানকারীদের নাম—

2টা বাদে—মঙ্গলদূত, চিরঞ্জীব, নীলরতন এবং তামস, হুগলী। 3টা বাদে—দেবজ্যোতি ষড়ঙ্গী, সর্বাণী ষড়ঙ্গী, অনির্বাণ মিশ্র, মেদিনীপুর।

গত বৎসরের শারদীয় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রকাশিত (1983) শ্রীযুগলকান্তি রায় মহাশয়ের লিখিত 'এবার আসরে আসরফ' শীর্ষক প্রবন্ধটির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

প্রবন্ধটি পড়ে বিস্ময় ও দুঃখ বোধ করছি। প্রবন্ধকার কি উদ্দেশ্য নিয়ে লিখেছেন জানি না। তবে প্রবন্ধটি পড়ে আমার মনে হল কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির ব্যক্তিগত আচার-আচরণের সমালোচনা ও নিন্দা করা। ঐসব ব্যক্তি বিশেষের নাম উল্লেখ না করলেও তাঁদের যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে তা থেকে ঐসব ব্যক্তিকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর মত বিশিষ্ট পত্রিকায় এই ধরনের ব্যক্তিগত কুৎসা প্রচারমূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করা আমার মতে কখনও বাঞ্ছনীয় নয় এবং শোভনীয়ও নয়।

বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের কোন বিরোধ নাই। বিজ্ঞানের লক্ষ্য সত্যকে জানা, ধর্মের লক্ষ্যও সত্যকে জানা। তাই কোন বিজ্ঞান সাধক যদি ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মীয় আচার-আচরণ করেন, তাহলে সেটাকে সর্বক্ষেত্রেই গর্হিত বা অবৈজ্ঞানিক মনে করা অনুচিত। কোন বিজ্ঞান সাধকের ধর্মীয় আচার আচরণ সম্পূর্ণ তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। প্রবন্ধটির লেখক যদি ব্যক্তি বিশেষের পরিচয়ের উল্লেখ না করে সাধারণ ভাবে ধর্মীয় কুসংস্কারের সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে আলোচনা করতেন তাহলে আমার কোন আপত্তির কারণ থাকত না।

সত্যেনজিৎকুমার শেঠ
21, বলরাম দে স্ট্রীট, কলিকাতা-6

লেখকের উত্তর : গত শারদীয় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' আমার যে প্রবন্ধ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে তাতে প্রকৃত ধর্ম নিয়ে কোন আক্রমণাত্মক কথা নেই। ধর্মের মূল লক্ষ্য শুধুমাত্র গুহ্যরহস্য হিসাবে কোন সত্যকে সংকীর্ণ স্বার্থে জানা নয়, সেই সত্যের বলে সমগ্র মানব সমাজ তথা জীবজগতকে রক্ষা করা ও জীবনের সামগ্রিক প্রগতির পথ প্রস্তুত করা। জীবনকে সর্বভাবে মুক্ত ও সুন্দরতর করে যা ধরে রাখতে পারে—তাইতো ধর্ম। তাই অজ্ঞতাজনিত অন্ধবিশ্বাস দিয়ে তৈরী কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠানই ধর্ম নয়। জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিবাদী জীবনযাত্রাই প্রকৃত ধর্ম হওয়া উচিত। অতীতের অপরিণত জ্ঞানের যুগে ধর্মের নামে যেসব বাধ্যতামূলক আচার সংস্কার সেদিনের ধর্মীয় নেতা ও সমাজকর্তাগণ (অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের সংকীর্ণ গোষ্ঠী স্বার্থেই) গড়ে তুলেছিলেন তাতে প্রকৃত মানব-কল্যাণের জন্য বিজ্ঞানের চিন্তাধারা ও প্রয়োগ পদ্ধতি সুদীর্ঘকাল ব্যাহতই হয়েছে—এতে কোন ভুল নেই। বিজ্ঞানোন্নত বর্তমান যুগে বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত (বা একদা প্রতিষ্ঠিত) ব্যক্তিগণ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় পরিবেশের চাপে, নিছক দীর্ঘ-আচরিত অভ্যাস বশেই যখন অবৈজ্ঞানিক, এমনকি বিজ্ঞানবিরোধী চিন্তাধারায় ও কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়েন এবং ঐ বিশিষ্ট পদমর্যাদার জন্যই তাঁদের বক্তব্য, মন্তব্য ও কার্যক্রম-গুলিকে বিশেষ 'বিজ্ঞানীয়' বক্তব্য ও কর্মধারা বলে উদ্দেশ্যমূলক প্রচারের কাজে লাগান হয় তখন অন্ধ-সংস্কারাচ্ছন্ন এই দেশে বৃহত্তর জনমানসে বিজ্ঞান-চেতনা সৃষ্টিতে এবং দেশের সমগ্র বৈজ্ঞানিক কর্মপ্রবাহে যে প্রচণ্ড বাধা আসে ও চলেছে সেকথা অস্বীকার করার উপায় আছে কি? তাই ব্যক্তিগত আক্রমণের কোন উদ্দেশ্য নিয়েই ঐ প্রবন্ধ লেখা হয় নি। তবে বিজ্ঞান বিষয়ের বিশিষ্ট পদাধিকারীগণ এখনও কিভাবে অন্ধবিশ্বাস নিয়ে এদেশে অপবিজ্ঞান ছড়াচ্ছেন এবং বিজ্ঞানের সামগ্রিক অগ্রগতিকে ব্যাহত করছেন—তারই কিছু নজির তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। ইতি—যুগলকান্তি রায়

পরিষদ সংবাদ

15ই মার্চ, 1984 বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে 'সত্যেন্দ্র ভবনে' ডঃ শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় 'নতুন বোসন কণার সন্ধানে' শীর্ষক লোকরঞ্জক বক্তৃতা স্লাইড সহযোগে প্রদান করেন।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মূর্তি নির্মাণ তহবিল
চাঁদাদাতাদের তালিকা

নাম	টাকা
শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ, মেদিনীপুর	500·00
,, গৌরকিশোর ঘোষ, কলিকাতা	100·00
,, সঞ্জিতা সেন, পুরুলিয়া	50·00
,, সীমা ঠাকুর, বর্ধমান	30·00
,, অজিতকুমার ব্যানার্জী, জামসেদপুর	20·00
,, বি. আর. নাগ, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা	15·00
,, বিজনকুমার মজুমদার, খড়্গপুর	10·00
,, বিজন মজুমদার, মেদিনীপুর	10·00
,, আচার্য শ্রীসৎ, কলিকাতা	10·00
,, তারকনাথ ভড়, কলিকাতা	10·00
,, ভোলানাথ সেনগুপ্ত, কলিকাতা	10·00
,, শ্যামাপ্রসাদ সিংহরায়, কলিকাতা	10·00
,, দীপালি কুণ্ডু, কলিকাতা	10·00
,, রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, কলিকাতা	10·00
,, আশিস গঙ্গোপাধ্যায়, কলিকাতা	10·00
,, তপোনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা	10·00
,, তপন ঘোষ, কলিকাতা	10·00
,, অমল চক্রবর্তী, কলিকাতা	10·00
,, মানস বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা	10·00
,, জিতেশ চক্রবর্তী, কলিকাতা	10·00
,, সমরেন্দু দাশ, কলিকাতা	10·00
,, বিজয়চাঁদ দত্ত, কলিকাতা	10·00
,, মোহনচাঁদ বড়াল, কলিকাতা	10·00
,, প্রাণগোপাল ভট্টাচার্য, কলিকাতা	10·00
,, এ. এন. দাঁ, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা	10·00
,, এম. কে. দাশগুপ্ত, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা	10·00
,, এম. বর্মন, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা	5·00
,, ডি. চট্টোপাধ্যায়, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা	5·00
,, এস. কে. চ্যাটার্জী, বিজ্ঞান কলেজ	5·00
,, মহীতলাল মুখার্জী, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা	5·00
,, আর. এন. মিত্র, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা	5·00
,, মাদারচন্দ্র আশ, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা	5·00
,, বীরেন্দ্রকুমার সিং, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা	5·00
,, শিবদাস বর্ধন রায়, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা	5·00
,, দীপ্তিমান রায়চৌধুরী, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা	5·00
,, প্রজ্ঞান চট্টোপাধ্যায়, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা	5·00
,, পি. কে. বাসু, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা	5·00
,, এ. দাশগুপ্ত, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা	5·00
,, এ. এন. চক্রবর্তী, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা	5·00

নাম	টাকা
শ্রীআর. এন. দত্ত, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা	5·00
,, এইচ পাড়িয়া, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা	5·00
,, পি. কে. সাহা, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা	5·00
,, পি. কে. রায়, কলিকাতা,	5·00
,, শঙ্কর দত্ত, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা	5·00
,, এ. কে. সেন, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা	5·00
,, এন. কে. দাসচৌধুরী, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা	5·00
,, পি. এল. ধর ভৌমিক, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা	5·00
,, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা	5·00
,, এ. কে. দত্ত, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা	5·00
,, এস. কে. রায়, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা	5·00
,, এম. এস. বাসু, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা	5·00
,, এন. এন. পুরকায়েত, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা	5·00
,, টি. বি. বিশ্বাস, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা	5·00
,, পরেশ চ্যাটার্জী, কলিকাতা	5·00
,, মনোরঞ্জন সাহা, কলিকাতা	5·00
,, তপন মালাকার, কলিকাতা	5·00
,, অমিয় গড়াই, কলিকাতা	5·00
,, শ্যামল ঘোষাল, কলিকাতা	5·00
,, সন্তু সরখেল, কলিকাতা	5·00
,, সুদেষ্ণা দাস, কলিকাতা	5·00
,, মুনমুন দেউটী, কলিকাতা	5·00
,, কার্তিকচন্দ্র সাহা, কলিকাতা	5·00
,, মধুসূদন ঘোষ, কলিকাতা	5·00
,, চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, কলিকাতা	5·00
,, নিরাপদ শেঠ, কলিকাতা	5·00
,, অজিতকুমার পাঠক, কলিকাতা	5·00
,, সুখেন দাস, কলিকাতা	5·00
,, বরুণকুমার ঘোষ, কলিকাতা	5·00
,, তপনকুমার প্রধান, কলিকাতা	5·00
,, সুমিতকুমার মিত্র, কলিকাতা	5·00
,, রতনকুমার দাস, কলিকাতা	5·00
,, দেবীশঙ্কর তিওয়ারী, কলিকাতা	5·00
,, পীযূষকান্তি চৌধুরী, কলিকাতা	5·00
,, কালীশঙ্কর ব্যানার্জী, কলিকাতা	5·00
,, কানাইলাল ব্যানার্জী, কলিকাতা	5·00
,, উৎপল ডাওয়াল, কলিকাতা	5·00
,, গৌরী ব্যানার্জী, কলিকাতা	5·00
,, ঊর্মি ভট্টাচার্য, 24-পরগণা	5·00

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006 থেকে প্রকাশিত
এবং গুপ্তপ্রেশ, 37/7, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-700 009 হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বিজ্ঞান পরিষদের আদর্শ অনুযায়ী জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার মত সমাজের কল্যাণমূলক বিষয়বস্তু সহজবোধ্য ভাষায় সুলিখিত হওয়া প্রয়োজন।
2. মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এবং পূর্ণ ঠিকানাসহ লেখকের পরিচিতি পৃথক কাগজে অবশ্যই লিখে দিতে হবে।
3. চলিত ভাষা এবং চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহৃত হবে। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্র্যাকেটে ইংরাজী শব্দটিও দিতে হবে। আন্তর্জাতিক সংখ্যা এবং মেট্রিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে।
4. মোটামুটি 3000 শব্দের মধ্যে রচনা সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়।
5. বিভিন্ন ফীচার, সমকালীন বিজ্ঞান গবেষণা ও প্রযুক্তিবিদ্যার সংবাদ এবং বিজ্ঞান বিষয়ক সুন্দর আকর্ষণীয় ফটোগ্রাফীও গ্রহণীয়।
6. রচনার সঙ্গে চিত্র থাকলে আর্ট পেপারে চাইনিজ কালিতে সুঅঙ্কিত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন।
7. প্রত্যেক চিত্র প্রস্থে 8 সে. মি. কিংবা এর গুনিতকের (16 সে মি 24 সে. মি.) মাপে অঙ্কিত হওয়া প্রয়োজন।
8. অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব বজায় রেখে পরিবর্তন পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে।
9. প্রত্যেক প্রবন্ধ ফীচার এর শেষে গ্রন্থপঞ্জী থাকা বাঞ্ছনীয়।
10. জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পুস্তক সমালোচনার জন্য দুই কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।
11. ফুলস্ক্যাপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় যথেষ্ট মার্জিন এবং প্রতি লাইনের পর বেশ কিছুটা ফাঁক রেখে পরিস্কার হস্তাক্ষরে প্রবন্ধ লিখতে হবে।
12. প্রতি প্রবন্ধের শুরুতে পৃথকভাবে প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া আবশ্যিক।

সম্পাদনা সচিব

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বিজ্ঞান পরিষদের আদর্শ অনুযায়ী জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার মত সমাজের কল্যাণমূলক বিষয়বস্তু সহজবোধ্য ভাষায় সুলিখিত হওয়া প্রয়োজন।
2. মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এবং পূর্ণ ঠিকানাসহ লেখকের পরিচিতি পৃথক কাগজে অবশ্যই লিখে দিতে হবে।
3. চলিত ভাষা এবং চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহৃত হবে। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্র্যাকেটে ইংরাজী শব্দটিও দিতে হবে। আন্তর্জাতিক সংখ্যা এবং মেট্রিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে।
4. মোটামুটি 3000 শব্দের মধ্যে রচনা সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়।
5. বিভিন্ন ফীচার, সমকালীন বিজ্ঞান গবেষণা ও প্রযুক্তিবিদ্যার সংবাদ এবং বিজ্ঞান বিষয়ক সুন্দর আকর্ষণীয় ফটোগ্রাফীও গ্রহণীয়।
6. রচনার সঙ্গে চিত্র থাকলে আর্ট পেপারে চাইনিজ কালিতে সুঅঙ্কিত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন।
7. প্রত্যেক চিত্র প্রস্থে 8 সে. মি. কিংবা এর গুণিতকের (16 সে মি 24 সে. মি.) মাপে অঙ্কিত হওয়া প্রয়োজন।
8 অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব বজায় রেখে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মন্ডলীর অধিকার থাকবে।
9. প্রত্যেক প্রবন্ধ ফীচার এর শেষে গ্রন্থপঞ্জী থাকা বাঞ্ছনীয়।
10. জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পুস্তক সমালোচনার জন্য দুই কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।
11. ফুলস্ক্যাপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় যথেষ্ট মার্জিন এবং প্রতি লাইনের পর বেশ কিছুটা ফাঁক রেখে পরিস্কার হস্তাক্ষরে প্রবন্ধ লিখতে হবে।
12 প্রতি প্রবন্ধের শুরুতে পৃথকভাবে প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া আবশ্যিক।

সম্পাদনা সচিব
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

এপ্রিল, 1984
37তম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা

বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের অনুশীলন করে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও সমাজকে বিজ্ঞান-সচেতন করা এবং সমাজের কল্যাণকল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করা পরিষদের উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন লেখকদের স্বাধীন মতামত বা মৌলিক সিদ্ধান্তসমূহ পরিষদের বা সম্পাদকমণ্ডলীর চিন্তার প্রতিফলন হিসাবে সাধারণতঃ বিবেচ্য নয়।

বিষয় সূচী

বিষয়

প্রচ্ছদ পরিচিতি :

শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের পুকুরের বিখ্যাত ভিক্টোরিয়া আমাজোনিকা নামক পদ্মজাতীয় উদ্ভিদের অপরূপ পত্রবিন্যাস। (ভিতরের প্রবন্ধে বিস্তৃত বিবরণ, পৃষ্ঠা 140)

কিশোর বিজ্ঞানীর আসর

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : 30·00

প্রতি সংখ্যা : 2·50

যোগাযোগের ঠিকানা :

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট

কলিকাতা-700006

ফোন : 55-0660

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সপ্তত্রিংশত্তম বর্ষ | এপ্রিল, 1984 | চতুর্থ সংখ্যা

নিউক্লীয় যুদ্ধের বিপক্ষে

সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র

গত বৎসর হিরোসিমা দিবসে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে নিউক্লীয় অস্ত্রসজ্জার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এক নীরব শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরে শোভাযাত্রার শেষে যে পথসভা হয়েছিল সেখানে নিউক্লীয় যুদ্ধের বিপক্ষে বক্তব্য শুনতে বহু ট্রেনযাত্রী অধীর আগ্রহে তাঁদের যাত্রা বিলম্বিত করেও থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের প্রশ্ন ছিল নিউক্লীয় যুদ্ধ কি আসন্ন ?

হিরোসিমা নাগাসাকিতে একদা নিউক্লীয় বোমায় যে বিপর্যয় ঘটেছিল এই শোভাযাত্রা, এই প্রতিবাদ, তার স্মৃতির প্রতীক হলেও আজকের নিউক্লীয় অস্ত্রসজ্জার বিরুদ্ধেই এই জেহাদ। নিউক্লীয় যুদ্ধ আসন্ন না হলেও যুদ্ধের আশঙ্কা অমূলক নয়। আশঙ্কা আছে বলেই বৃহৎ শক্তিগুলি পরস্পরের সন্দেহ নিরসনে কয়েকটি সন্ধির আশ্রয় নিয়েছে। SALT-I, SALT-II, INF, START ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নামে অস্ত্রসজ্জা কমাতে, অস্ত্রশস্ত্রের উপর খবরদারি করতে রাজ্যগুলির নানারকম সন্ধির চেষ্টায় সাধারণ মানুষ কিন্তু আশ্বস্ত হতে পারে নি। কারণ বড় রাষ্ট্রগুলি বিশেষত রাশিয়া ও আমেরিকা তাদের নিউক্লীয় অস্ত্রসম্ভার বাড়িয়েই চলেছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিশেষজ্ঞের মতে 1980-তে পৃথিবীতে মোট 50,000 নিউক্লীয় অস্ত্র মজুত হয়েছে—এদের শক্তি প্রায় 13000 মেগাটন। পরের বছরগুলিতে আরও কিছু অস্ত্র মজুত হয়ে থাকবে। 1982-তে রাশিয়ার অন্তত 8000 ও আমেরিকার 9000 হাইড্রোজেন বোমা মজুত ছিল। রয়েল সুইডিস একাডেমির একটি পত্রিকার মতে এইসব অস্ত্র যদি পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের প্রধান শহরগুলির উপর পড়ে। তবে শুধু শক্ ওয়েভের চাপে অন্তত 75 কোটি মানুষ মারা যাবে।

বিখ্যাত বিজ্ঞানী অ্যাণ্ডেই শাখারভ বলেছেন একটি মিসাইল আক্রমণে অন্তত আড়াই লক্ষ প্রাণ হারাবে। হিরোসিমার 17 কিলোটন বোমার তুলনা 400 কিলোটনের হাইড্রোজেন বোমার কাছে অকিঞ্চিৎকর। একটি হাইড্রোজেন বোমার শকওয়েভে অন্তত 40000 মানুষের মৃত্যু ঘটবে।

নিউক্লীয় বোমা বিস্ফোরণে তাপীয় বিকিরণ ও নিউক্লীয় ভস্ম জনবহুল অঞ্চলে অধিকতর বিপর্যয় ঘটাবে। নিরাপদ বিকিরণ মাত্রা 300 রনজেনের বেশি বিকিরণ একটি বিস্ফোরণে প্রায় হাজার বর্গ কিলোমিটার আয়তনে ছড়িয়ে পড়বে। কোটি কোটি মানুষ এই বিকিরণের বলি হবে। জীব ও উদ্ভিদ জগতের 'জীন' ও বংশানুক্রম এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে।

প্রতিবেশ (ecology) নিয়ে যে সমস্যার সৃষ্টি হবে, শাখারভ তার আভাসও দিয়েছেন :

এক : নিউক্লীয় বিস্ফোরণের আগুনে অধিকাংশ বনজঙ্গল পুড়ে যাবে ধোঁয়ায় আবহমণ্ডলের স্বচ্ছতা নষ্ট হবে—অক্সিজেনে ঘাটতি পড়বে। ফলে এই একটি কারণেই পৃথিবী ধ্বংস হতে পারে। কম করে হলেও এরকম ঘটনায় পৃথিবীর প্রতিবেশগত, আর্থিক ও মানসিক ভারসাম্য অনেকাংশে নষ্ট হবে।

দুই : উঁচু আকাশের বিস্ফোরণে ওজোন স্তর নষ্ট হবে—সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে তখন পৃথিবীকে রক্ষা করা যাবে না। ABM মিসাইলের হাইড্রোজেন বোমায় ও রাডার বিধ্বংসী বোমায় এরকম উঁচু আকাশের বিস্ফোরণ অনিবার্য।

তিন : যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।

চার : খাদ্য উৎপাদন, সরবরাহ, জল সরবরাহ, ময়লা নিষ্কাশন, জ্বালানী ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সরবরাহ, ওষুধ-কাপড়-চোপড় সরবরাহ ও উৎপাদন সবকিছুই ব্যাহত হবে। লক্ষ লক্ষ আহত মানুষের চিকিৎসা সেবা কেই বা করবে ?

পাঁচ : বিস্ফোরণের পরোক্ষ ফলগুলি তো আরও মারাত্মক। ক্ষুধা ও মহামারীতে আরও হাজার হাজার মানুষের প্রাণ যাবে।

এমন আশঙ্কাও আছে যে নতুন নতুন কিছু ব্যাধির প্রকোপ দেখা যাবে যা আজ আমরা কল্পনাও করি নি।

ছয়ঃ সামাজিক কোন শান্তি থাকবে না। চোর, ডাকাত, গুণ্ডাদের উপদ্রবে একটা আতঙ্কিত পরিবেশের সৃষ্টি হবে। অপরাধ তখন সমাজের একটি অঙ্গ হয়ে দাঁড়াবে। অপরাধীরা নির্ভয়ে বলবে 'তুমি আজ মর, আমি কাল মরব'।

সংক্ষেপে বলতে গেলে যে কোন নিউক্লীয় যুদ্ধ আমাদের সভ্যতা ধ্বংস করবে, মানুষ প্রাগৈতিহাসের যুগে ফিরে যাবে, কোটি কোটি মানুষ মরবে আর কিছুটা হলেও মানুষ তার জৈব সত্ত্বা হয়তো হারিয়ে ফেলবে এমন কি পৃথিবীর মানুষ হয়তো লোপ পেয়ে যাবে।

শাখারভের মতে নিউক্লীয় যুদ্ধ কোন শত্রুর বিরুদ্ধে নয়, এ যুদ্ধে জেতবার প্রশ্ন নেই—আছে শুধু সার্বিক ধ্বংসের ছায়া। তাই শুধু সন্ধির নামে যুদ্ধ এড়ানো যাবে না। নিউক্লীয় অস্ত্রসম্ভার সংযত করতে হবে। মিসাইলের সংখ্যা কমিয়ে ফেলতে হবে। সাধারণ মানুষকে অস্ত্রসজ্জার খুঁটিনাটি সব বিবরণ জানিয়ে দিতে হবে। যে কোন সাধারণ অশান্তি-জনিত ছোটখাট যুদ্ধ থেকেই নিউক্লীয় যুদ্ধের সূচনা হওয়া সম্ভব। নীলস বোর একদা উন্মুক্ত সমাজ ও মানবিক অধিকারে কথা বলেছিলেন। এই অধিকার সনদ (যাতে রাশিয়া সহ 35টি দেশ 1975 খৃস্টাব্দে স্বাক্ষর করেছিল) বলেছিল বিবেকের স্বাধীনতা থাকবে, দেশ ও বিদেশের সব খবরই মানুষের কাছে পৌছে দেওয়া হবে, যে কোন দেশে যে কোন মানুষের বসবাসের অধিকার থাকবে। ধর্মের স্বাধীনতা ও মনোপীড়ন থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে। অশান্তি ও ছোটখাটো যুদ্ধ এড়াতে সেই সনদই রক্ষাকবচ হতে পারে। একথা বুঝবার সময় এসেছে, যে নিউক্লীয় যুদ্ধে জয় অবশ্যম্ভাবী নয় যাতে সার্বিক ধ্বংসই শুধু সম্ভব তা থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে সব রাষ্ট্রকেই নিরস্ত্রীকরণ মানতে হবে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আরও হৃদ্য করতে হবে।

এই সম্পর্ক যে ক্রমশঃ তিক্ত হচ্ছে তার প্রমাণ হল আমেরিকা ও রাশিয়া এই দুই রাষ্ট্রের পরোক্ষ সংঘর্ষ। 1983 খৃস্টাব্দে রাশিয়া বছরে 150—200 ICBM তৈরি করেছে। ফলে এখন তার নিউক্লীয় অস্ত্রসম্ভার আমেরিকাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

হেনরী কিসিংগার একবার প্রশ্ন করেছিলেন নিউক্লীয় অস্ত্রসম্ভারে কে বড় কে ছোট তাতে কি কিছু আসে যায়? কেউ ব্যবহার তো করতে সাহস করবে না।

আমেরিকার অস্ত্র শক্তি পৃথিবীর জনসংখ্যার মাথাপিছু $\frac{1}{2}$ টন TNT-র সমান আর রাশিয়ার 2 টন TNT-র সমান। এইসব অস্ত্র আপাতত ব্যবহার না হলেও তার ভয় থেকে তো অব্যাহতি নেই। সোলঝেনিৎসিন বলেছেন অন্তত অধিকতর শক্তিমান রাষ্ট্র অস্ত্রের ব্যবহার থেকে অন্য পক্ষকে নিরস্ত করতে পারবে।

যুদ্ধের সূচনা দেখা গেলে অধিক শক্তিশালী রাষ্ট্র অন্তত বিরোধী পক্ষকে বলতে পারবে আর এগোলেই তোমাদের ধ্বংস করব।

তাই অধিক শক্তি সংগ্রহ করার সুবিধা আছে। মরনিহান বলেছেন, যে রাষ্ট্র পৃথিবী তিনবার ধ্বংস করতে পারে সে অন্য রাষ্ট্রের চেয়ে নিশ্চয়ই শক্তিমান যে মাত্র দুবার পৃথিবী ধ্বংস করতে পারে।

এই অজুহাতে শক্তি যদি বাড়তে থাকে তবে কোন্ অশুভ মুহূর্তে নিউক্লীয় যুদ্ধের সূচনা হবে তার ইঙ্গিত দেওয়া যাবে না—তবে কী ঘটবে শাখারভের উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী থেকে তার কিছু আভাস পাওয়া যাবে। তখন সার্বিক ধ্বংসের ভেতর দিয়ে সভ্যতার ঘটবে অবলুপ্তি। বিজ্ঞানেরও সমাধি ঘটবে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের ঈশ্বর তন্ত্র ফিরে আসা বিচিত্র নয়।

বার্নার্ড মালামুদের লেখা God's Grace বা ঈশ্বরের দয়া উপন্যাসে সেই যুগের একটি প্রতীক তুলে ধরা হয়েছে। উপন্যাসের বিষয় হল নিউক্লীয় যুদ্ধে ধ্বংসের পর কেলভিন কোন্ তাঁর শিক্ষিত শিম্পাঞ্জী এক সহচরকে নিয়ে একটি জাহাজে পাড়ি দিলেন—পৌছলেন এক অজানা দ্বীপে যেখানে বাঁদর, বেবুন, শিম্পাঞ্জীদের বাস। কোন্ সেখানে এইসব অধিবাসীদের নিয়ে নতুন সভ্যতা গড়ে তুলতে চাইলেন। সঙ্গী তাঁর সেই শিক্ষিত শিম্পাঞ্জী গোটলোব যে ইংরাজী বলতে পারে তার কৃত্রিম বসানো কণ্ঠনালীর সাহায্যে। কোন্ তার নতুন নামকরণ করলেন বাজ্। এমনকি কোন্ এক বাচ্চা শিম্পাঞ্জীর পিতৃত্বও লাভ করলেন—উদ্দেশ্য হল নতুন এক সভ্যসমাজ গড়ে তোলা। বাজ ও কোন্ মিলে মনুষ্যেতর একটি সমাজ গড়ার প্রাণপণ চেষ্টা করলেন। কিন্তু লুপ্ত সেই মানবসমাজ ও সভ্যতার ছায়াও আর ফিরে এল না। বাজ তাই একদিন তার আপ্তবাক্য উচ্চারণ করল আমি বাজ নাম চাই না—আমি সেই শিম্পাঞ্জী গোটলোবই থাকব। গোটলোব জার্মান শব্দটির অর্থ 'ঈশ্বর স্তুতি'।

সভ্যতার বিলোপে বিজ্ঞান কিভাবে ধ্বংস হবে ও প্রাগৈতিহাসের অন্ধকার যুগ ফিরে আসবে—নিউক্লীয় যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী এই অমোঘ ফল সম্পর্কে গ্রন্থকার এই উপন্যাসে সামান্য ইঙ্গিত দিয়েছেন বলা যায়। সত্যি কী ঘটবে তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় বর্তমান সভ্যতার আয়ুষ্কাল বিলম্বিত করতে হলে নিউক্লীয় অস্ত্রের ভাণ্ডার শূন্য করাই একমাত্র পথ। এ বিষয়ে সারা পৃথিবীর সুস্থ চিন্তাবিদদের সঙ্গে এদেশেও বলিষ্ঠ জনমত তৈরি প্রয়োজন।

সাহা-তাপ-আয়নন তত্ত্ব এবং বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে সাহা-সমীকরণ

নন্দদুলাল সেনগুপ্ত*

ভৌত-বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানের প্রায় সব ছাত্র-ছাত্রীরাই জ্ঞাত আছেন অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক অবদান তাপ-আয়নন তত্ত্ব (Thermal Ionisation Theory)। কিন্তু কেবলমাত্র জ্যোতির্পদার্থবিদ (Astrophysicists) এবং ঐ বিষয়ে গবেষণারত ব্যক্তি ভিন্ন এই তত্ত্বের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সাধারণভাবে কেউই বিশেষ অবগত নন। যদিও সাহা-তাপ-আয়নন তত্ত্বের প্রথম গবেষণা-পত্র 1920 খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু পঞ্চাশের দশক থেকে এই তত্ত্বের ব্যাপকভাবে পুনর্বিবেচনা এবং নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে এই তত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ হয়। এই অনুশীলনের স্রোত বর্তমান কালেও কোন রকম হ্রাস পায় নি। অবশ্য এর অন্যতম প্রধান হেতু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ—কারণ সেই সময়ে বহু বিজ্ঞানী ধ্বংসের কাজে ব্যস্ত ছিলেন, নূতন সৃষ্টির অবসর এবং পরিবেশ ছিল না। যুদ্ধোত্তর যুগে ধ্বংসের প্রয়োজনে নবাবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি ও নিখুঁত পরিমাপের পদ্ধতি পুনরায় নূতন জ্ঞান সঞ্চয়ে এবং সৃষ্টিতে—বিশেষতঃ জ্যোতির্বিজ্ঞানে প্রয়োগের অবকাশ মিলল। প্রায় সেই সময় থেকে সাহা তত্ত্বে বিজ্ঞানীদের নূতন ভাবে মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। সেটা শুধু জ্যোতির্পদার্থবিদ্যায় নয়—পদার্থবিদ্যার অপেক্ষাকৃত নবজাত শাখা প্লাজ্‌মা পদার্থবিদ্যাতেও (Plasma Physics)। পঞ্চাশের দশকের শেষার্ধ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত জ্যোতির্পদার্থবিদ্যা এবং প্লাজ্‌মা পদার্থবিদ্যার প্রায় সমস্ত পুস্তকে এবং সমালোচনামূলক প্রবন্ধে সাহা-তাপ-আয়নন তত্ত্ব এবং সাহা-সমীকরণ একটি বিশেষ অংশ জুড়ে আছে। বর্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য : প্রথমতঃ যতদূর সম্ভব কৌশলী-বিদ্যা পরিহার করে মূল সাহা-তাপ-আয়নন তত্ত্বের আলোচনা করা এবং বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে এর গুরুত্ব যৎকিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ করা। কারণ সাহা-তত্ত্ব সম্বন্ধে সাধারণ বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীরা স্থূলভাবে অবগত থাকলেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই তত্ত্বের তথা এই বিষয়ে তাঁর গবেষণা-পত্রগুলির অভিনবত্ব এবং বিজ্ঞানী হিসাবে অধ্যাপক সাহার মহত্ব, বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট প্রকাশ করার মতন কোন সমালোচনামূলক প্রবন্ধ নেই। যদিও অধ্যাপক সাহার জীবনী ইংরেজী এবং বাংলা ভাষাতেও প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু কোথারও বিজ্ঞানে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদানের সাধারণ বোধগম্য আলোচনা নেই। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য : সাহা-তাপ-আয়নন তত্ত্বের নূতন প্রয়োগক্ষেত্র প্লাজ্‌মা পদার্থবিদ্যার সাহা-সমীকরণের অবতারণা করা ; সেই সূত্রে বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে যে সব পরিবর্ধন ও পরিবর্তনের প্রয়োজন এবং জ্যোতির্পদার্থবিদ্যায় ও প্লাজ্‌মা পদার্থবিদ্যায় এর যে সব প্রয়োগ, সেইগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা।

অধ্যাপক সাহার তাপ প্রভাবিত আয়নন তত্ত্বের মূল্য যথাযোগ্য উপলব্ধি করতে হলে প্রথমতঃ জ্যোতির্বিজ্ঞানের তৎকালীন যে পর্যবেক্ষণমূলক এবং তত্ত্বীয় পরিবেশে এই তত্ত্বের আবিষ্কার হয়েছিল, সেই সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানের প্রয়োজন। বর্তমান শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত তারকা, ছায়াপথ, নক্ষত্রমণ্ডলী ইত্যাদি বস্তুগুলি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ের একমাত্র উৎস ছিল—সেইগুলি থেকে আগত আলোক এবং এই আলোক বর্ণালীর (Optical Spectrum) পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ (Analysis)। আলোক বর্ণালী বিদ্যুৎ-চুম্বক তরঙ্গমালার (Electro-magnetic Waves) অতি ক্ষুদ্র এক অংশ মাত্র। গত শতাব্দীর প্রথম থেকেই পৃথিবীতে অবস্থিত পরীক্ষণাগারে, পদার্থবিদরা বর্ণালীর পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ থেকে সুস্পষ্টভাবে জানতেন—ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুর (Atoms) নিজস্ব নিঃসরণ (Emission) এবং শোষণ (Absorption) বর্ণালী আছে। পরমাণুদের বর্ণালীর বিশেষত্ব এই রেখা সমষ্টি (Line Spectrum)। এই বর্ণালীর রেখাগুলির অবস্থিতি এমন সুনির্দিষ্ট যে এ থেকে কোন বিশেষ পরমাণুর উপস্থিতি নির্ভুলভাবে বলে দেওয়া যায়। সুতরাং তারকাদের বর্ণালী পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে মোটামুটিভাবে তাদের মৌলিক উপাদান সম্বন্ধেও ধারণা করা যায়। এখানে বিশেষ উল্লেখ্য বিষয়, এর প্রথম প্রয়োগে নিঃসরণ বর্ণালী (Emission Spectra) থেকে শোষণ বর্ণালী (Absorption Spectra) বেশী উপযোগী হয়েছিল। ফ্রানহফার (Fraunhofer) 1815 খৃস্টাব্দে সর্বপ্রথম সূর্যালোক বিশ্লেষণ করে আবিষ্কার করেন যে, এই উজ্জ্বল বর্ণালীর ভিতর অজস্র আলোকহীন রেখা (Dark Lines) বর্তমান। এই রেখাগুলিকে বলা হয় ফ্রানহফার রেখা। এই সব রেখার

* টাটা ইনস্টিটিউট অব ফাণ্ডামেন্টাল রিসার্চ, বোম্বাই-400005

অনেকগুলিকেই পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ পরমাণুর শোষণ রেখা (Absorption Lines) হিসাবে সনাক্ত করা যায়। সূর্যের অভ্যন্তরে আলোকের উৎপত্তির পর সূর্যের বহির্মণ্ডলের অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণ পরিবেশে ঐ আলোকের শোষণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সহজে সূর্যের বহির্মণ্ডলের উপাদান সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে ধারণা করা যায়। এই আবিষ্কারই জ্যোতিপদার্থবিদ্যার গোড়া-পত্তন।

এর পর থেকে নিঃসরণ এবং শোষণ বর্ণালী সংক্রান্ত আরও বিস্তারিত পরিমাণমূলক পর্যবেক্ষণ চলে, আর এই অনুসন্ধান হয় শুধু সূর্যকে নিয়ে নয়, অন্যান্য তারকাদের অনুরূপ ধর্মাবলী সম্বন্ধেও। গত শতাব্দীতে তারকাদের সম্পর্কে এই পর্যবেক্ষণের ফলে তারকাদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য শ্রেণী ভাগ সেকীর (Secchi's Type) মতে 1866 খৃস্টাব্দে। এই শ্রেণীভাগ তারকাদের আলোকের রঙভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। I-লোহিত তারা, II-হরিদ্রা তারা, III-হরিদ্রাভ লোহিত তারা এবং IV-উজ্জ্বল লোহিত তারা (Deep red)। কিন্তু লকইয়ার এবং পিকারিং-এর (Lockyer and Pickering) 1890 খৃস্টাব্দের আবিষ্কারের ফলস্বরূপ, শ্রেণী বিভাগের আরও নির্ভরযোগ্য উপাদান হলো কোন একটি বিশিষ্ট গোষ্ঠীর শোষিত রেখাদের শোষণের পরিমাণ। মোট 10,000-এর অধিক তারকাদের বর্ণালী পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের পর এই শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতির পরিণতি হয় শেষ পর্যন্ত হার্বার্ড অনুবর্তিতাতে (Harvard Sequence)। এর অন্য উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবক রাসেল (Russell) 1898, (হেনরী-ড্রাপার তালিকা, 1909)। সেই অনুসারে এদের নামকরণ হয়, O,B A,F,G,K,M···I। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি অবিচ্ছিন্ন (Continuous) অনুবর্তিতা, যথা B শ্রেণী থেকে A শ্রেণী সোজা এক ধাপে নয়, অনেক তারকা আছে যাদের স্থান B ও A শ্রেণীর মধ্যে—তাদের ধর্ম B শ্রেণীর ধর্ম থেকে ক্রমবর্ধমান ভাবে A শ্রেণীর ধর্মে পরিণত। সূর্য এই শ্রেণী বিভাগে GO (হরিদ্রা) গোষ্ঠীর তারা, আধুনিক বর্ণ শ্রেণীতে সূর্য G2V তারা। এই তালিকাকে সাধারণ ভাবে এক মাত্রিক (Linear) তালিকা বলা হয়। এর পর রাসেল হার্টংস্প্রুঙ (Rusaell-Hertzsprung) 1905-1914 খৃস্টাব্দে দ্বিমাত্রিক (Two Dimensional) তালিকার প্রস্তাবনা করেন। এই তালিকার তারকাদের উপরিউক্ত ধর্মাবলীর সঙ্গে তাদের ঔজ্জ্বল্যের পরিমাণও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী যুগে এই দ্বিমাত্রিক তালিকা তারকাদের আভ্যন্তরীণ ও বহির্ভাগের গঠন এবং ভৌতিক অবস্থার অবগতির বিশেষ সহায়ক হয়। কিন্তু আমাদের আলোচনায় এর প্রয়োগ অতি সীমিত, সুতরাং এই প্রসঙ্গে এই সামান্য উল্লেখই যথেষ্ট।

উপরের অনুচ্ছেদে যে সমস্ত বর্ণালীর (নিঃসরণ এবং শোষণ) উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি শুধু নিরপেক্ষ পরমাণুর (Neutral Atom) নয়, আয়নিত পরমাণুরও। যেমন আয়নিত He^+, Ca^+,···, অর্থাৎ যথাক্রমে He, Ca,···ইত্যাদি পরমাণু থেকে একটি ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কোন ক্ষেত্রে একাধিক ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হওয়াও সম্ভব। এডিংটন (Eddington) 1917 খৃস্টাব্দে তারকাদের আভ্যন্তরীণ গঠন তত্ত্বে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করেছিলেন—'তারকাদের অভ্যন্তরে যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা যথা—উষ্ণতা (Temperature) এবং চাপের পরিমাণ ইত্যাদি, তাতে কিছু কিছু পরমাণু নিরপেক্ষ অবস্থায় না থেকে আয়নিত হয়ে আছে'।

এই ভূমিকার পর সোজা অধ্যাপক সাহার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের বিষয় উত্থাপন করা যায়। প্রথম প্রবন্ধটি সূর্যের বর্ণমণ্ডল (Solar Chromosphere) সম্বন্ধে 1920 খৃস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেখা। পর পর আরও কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 'তারকা বর্ণালী সম্বন্ধে ভৌতিক তত্ত্ব' 1921 খৃস্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে ফাউলারের (A. Fowler) পরীক্ষণাগার থেকে লেখা। অধ্যাপক সাহা তারকাদের বহির্মণ্ডলের ভৌত অবস্থা চর্চার প্রয়াসে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। পরমাণুরা আয়নিত হয় তাদের ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হবার জন্য। আর ভৌত রসায়ন শাস্ত্রের (Physical Chemistry) অন্যতম প্রধান অংশ অণুদের (Molecules) পরমাণু বা মূলকে (Radical) বিচ্ছিন্নতার অনুসন্ধান করা এবং তৎসংক্রান্ত বিভিন্ন পরিবর্তনের পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিচার করা। ভৌত রসায়নে বিচ্ছিন্ন বিক্রিয়ায়, বিভিন্ন উপাদানের আপেক্ষিক গাঢ়ত্ব (Relative Concentration) তাপ-সাম্য অবস্থায় (Thermal Equilibrium) সুনির্দিষ্ট মাত্রায় পৌছায়। গাঢ়ত্বের পরিমাণ পারিপার্শ্বিক উষ্ণতার মাত্রা ও চাপের পরিমাণের উপর নির্ভর করে এবং নের্ন্স্টের (Nernst) সূত্রের সাহায্যে তাদের আপেক্ষিক মূল্যায়নও সুনির্দিষ্ট ভাবে করা যায়। অধ্যাপক সাহা উপলব্ধি করলেন, এই একই সূত্র আয়নিত অবস্থার উপাদান পরমাণু, আয়ন এবং ইলেকট্রন-দের তাপ-সাম্য অবস্থায় প্রযোজ্য না হবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। আয়ননও একটি বিচ্ছিন্নতা—ভৌত রসায়নে বিচ্ছিন্নতার কাজে যেরূপ একটা নির্দিষ্ট শক্তির শোষণ বা উদ্ভব (Evolution) হয়, সেইরূপ আয়ননের জন্যও ঠিক বিভিন্ন পরমাণুদেরও নির্দিষ্ট শক্তির শোষণের প্রয়োজন। সহজ ভাষায়, ভৌত রসায়নের বিচ্ছিন্নতা প্রথাকে আরো বিস্তার করে অধ্যাপক সাহা আয়নন প্রক্রিয়াকে জুড়ে দেবার প্রয়াসী হলেন। আর এর ফলস্বরূপ পরিমাণগত পরিণতি গণনায় প্রবৃত্ত হলেন। এই গণনায় তিনি মাত্র কয়েক মাস পূর্বে প্রকাশিত এগার্টের (Eggert, 1919) প্রণালীর অনুসরণ করেছিলেন (এই দুই প্রবন্ধের আপেক্ষিক সমালোচনা উপসংহারে করা হবে, অন্য প্রসঙ্গে)। অধ্যাপক সাহা ধ্রুপদী ভৌত-রসায়নের নের্ন্স্টের সম-চাপ বিক্রিয়ার (Reaction

Isobar) ধ্রুবক সংখ্যা হিসাব করেছিলেন। এই ধ্রুবক সংখ্যাটি বিভিন্ন উপাদানের আপেক্ষিক গাঢ়ত্ব এবং চাপের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং তিনি আয়ননের গাঢ়ত্ব, উষ্ণতা ও চাপের পরিমাণের মধ্যে একটি সুষ্ঠু সমীকরণ রচনা করলেন।

উদাহরণ স্বরূপ সর্বাপেক্ষা সহজ অবস্থায় আয়নন প্রক্রিয়া লেখা যায়—

$$Ca \rightleftharpoons Ca^{+} + e - U$$
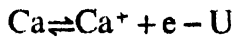
এখানে U প্রতি গ্রাম-পরমাণুতে (Gramme-atom) উদ্ভূত (Liberated) শক্তির পরিমাণ। আর বিক্রিয়ার গতি উভয় দিকে, অর্থাৎ যে পরিমাণে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে, ঠিক সেই পরিমাণে পুনর্মিলন হচ্ছে। কিন্তু যতক্ষণ পারিপার্শ্বিক অবস্থা যথা উষ্ণতা এবং চাপের পরিমাণ পরিবর্তন না হচ্ছে ততক্ষণ Ca^{+}-এর গাঢ়ত্ব (x) অপরিবর্তনীয়। নের্ন্‌স্টের সমচাপ বিক্রিয়ার ধ্রুবক থেকে নিম্নলিখিত সমীকরণটি তিনি লিখেছিলেন

$$\log \frac{x^2}{1-x^2} P = -\frac{U}{4 \cdot 571T} + 2 \cdot 5 \log T - 6 \cdot 5$$

এখানে P সমষ্টির চাপের পরিমাণ, T হল উষ্ণতা, 6·5 সংখ্যাটির আবির্ভাব Ca, Ca^{+} এবং e-দের রাসায়নিক ধ্রুবকের সমষ্টি থেকে। এই সমীকরণ থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় x, P এবং T-দের মধ্যে যে কোন দুটির পরিমাণ জানা থাকলে তৃতীয়টির পরিমাণ কত হবে—অর্থাৎ যে কোন একটি অপর দুটির অপেক্ষক (Function)। এই অপেক্ষকটি লিখবার জন্য অধ্যাপক সাহা বিক্রিয়ার মূল উপাদান পরমাণু, আয়ন এবং ইলেকট্রনদের মধ্যে কেবলমাত্র ধ্রুপদী ভৌত-রসায়নের পরিমাণগত মূল সূত্রে (Law of Mass Action) প্রয়োগ করেছিলেন। আর স্বাভাবিক ভাবে তারকার বহির্মণ্ডলে অধিক উষ্ণতায় ঐ উপাদানগুলি আদর্শ (Ideal) গ্যাস ধরে অগ্রসর হয়েছিলেন। এই অপেক্ষকই প্রয়োগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উপযোগী। প্রথমতঃ গুণগত ভাবে তারকাদের আলোক বর্ণালী বিশ্লেষণ করার সময় বর্ণালীর রেখা পরমাণুর বা এক (ক্ষেত্রবিশেষে একাধিক) আয়নিত পরমাণুর বর্ণালী, সেটি বর্ণালীর শ্রেণী বৈশিষ্ট্য থেকে স্থির ভাবে সনাক্ত করে নিতে হবে (উপরের অপেক্ষক একাধিক আয়নিত ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ পরিবর্ধন করে লেখা প্রয়োজন)। পরমাণুদের বিশিষ্ট বর্ণালী শ্রেণীগুলির একটি যদি কোন তারকার বর্ণালী শ্রেণীতে উপস্থিত থাকে, তবে নির্ভুল ভাবে বলে দেওয়া যায় সেই পরমাণু নিরপেক্ষ বা আয়নিত (এমনকি কোন্ মাত্রায়), কোন্ অবস্থায় ঐ তারকায় বর্তমান। পরন্তু সাহা-তত্ত্বের পরিণতি হিসাবে, কোন তারকায় কোন একটা বিশিষ্ট বর্ণালী শ্রেণীর অনুপস্থিতি থেকে ঐ জাতীয় পরমাণু ঐ তারকায় নাই, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঠিক হবে না। কারণ হয়ত ঐ তারকার ভৌত অবস্থা, (যথা উষ্ণতা ও চাপের পরিমাণ ইত্যাদি) সাহার নিজের ভাষায়, উদ্দীপক (stimulus) নয় অর্থাৎ ঐ বর্ণালী শ্রেণী নিঃসরণ বা শোষণের অনুকূল নয়। যেমন Rb, Cs ইত্যাদি কয়েকটি পরমাণুর নিরপেক্ষ বর্ণালী সূর্যের বর্ণালীতে সাধারণতঃ নেই, কারণ ওদের আয়নন শক্তির মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম, তবে সূর্যের বহির্মণ্ডলে এরা সম্পূর্ণ আয়নিত হয়ে আছে, যেহেতু সেখানে উষ্ণতা বেশী। অপরপক্ষে সাহা-তত্ত্বের পরিণতি হিসাবে অপেক্ষাকৃত স্বল্প উষ্ণতায় এই বর্ণালী রেখাগুলির আবির্ভাব হতে পারে। রাসেল (Russell) সৌর-কলঙ্কে সেগুলি আবিষ্কার করেছিলেন। আবার যে সমস্ত পরমাণুর আয়নন শক্তির মাত্রা খুবই বেশি যথা H (13·5 eV), He (24·5eV), তাদের পক্ষে আয়নিত হবার সম্ভাবনা খুবই কম, সৌর বহির্মণ্ডলে এরা নিরপেক্ষ অবস্থায় আছে।

সাহা-তাপ-আয়নন তত্ত্বের মূল সিদ্ধান্ত হিসাবে বলা যায়:— (i) অধিক উষ্ণতা এবং ইলেকট্রনের অপেক্ষাকৃত নিম্ন আংশিক চাপ আয়ননের গাঢ়ত্ব বৃদ্ধির সহায়ক; (ii) অল্প উষ্ণতা এবং ইলেকট্রনের অপেক্ষাকৃত উচ্চ আংশিক চাপ আয়ননের প্রতিবন্ধক। এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, সাহা-তত্ত্ব পরমাণুদের আয়নিত হবার ব্যাখ্যা নয়, পরন্তু আয়নিত অবস্থা সমর্থন করে পরমাণু, আয়ন এবং ইলেকট্রনের মধ্যে তাপ-সাম্যের ফলস্বরূপ ভৌতিক অবস্থার অনুসন্ধান ও গুণগত এবং পরিমাণগত বিশ্লেষণ করবার নির্দেশক। পূর্বোল্লিখিত হার্বার্ড-অনুবর্তিতা পরিপূর্ণ রূপ লাভ করেছিল প্রায় এক শতাব্দীর নিরবিচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণের পর; অধ্যাপক সাহা এই পদক্ষেপে হার্বার্ড-অনুবর্তিতাকে একটা ভৌততত্ত্বভিত্তিক রূপ দেন। সাহা-তত্ত্বের ফলস্বরূপ হার্বার্ড-অনুবর্তিতা তারকাদের মধ্যে একটি ক্রমিক হ্রাসের অনুবর্তিতা। স্বাভাবিক ভাবেই এই অনুবর্তিতার তারকাদের রাসায়নিক উপাদান প্রায় এক জাতীয়, O থেকে B, B থেকে A ইত্যাদি শ্রেণীতে ক্রমশঃ উষ্ণতার মাত্রা কম।

সাহা-তাপ-আয়নন তত্ত্বের পরবর্তী যুগের আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার পূর্বে এই প্রসঙ্গে আরও দুটি বিষয় সংক্ষেপে উত্থাপন করা প্রয়োজন। কারণ এই দুটি বিষয়ের প্রায় সম্পূর্ণ বিকাশের সঙ্গে পরবর্তী যুগের সাহা-তত্ত্বের সম্প্রসারণ নিগূঢ় ভাবে জড়িত। প্রথমতঃ সূর্যের বহির্মণ্ডলের আলোক-বর্ণালী পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে শোষণের ফলে অনেক অংশই তৎকালে মানুষের অগোচরে ছিল। তাই তিনি তাঁর প্রবন্ধে (1921) উল্লেখ করেছিলেন যদি কোন দিন মানুষ এই নিয়ন্ত্রণকে পরিক্রম করে সূর্য বর্ণালীর 1000 অ্যাংস্ট্রম পর্যন্ত বিশ্লেষণ করতে পারে, তবে নিশ্চয়ই অনেক নূতন বর্ণালীশ্রেণী, বিশেষতঃ উত্তেজিত (Excited) পরমাণুর বর্ণালী আমাদের গোচরে আসবে। ঐ বিষয়ে প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ শ্যাপলীর (Shapely) সঙ্গে তাঁর আলোচনা শুনেছি (1946)। তাঁর এই স্বপ্ন কিছুদিনের মধ্যে সফল হয়েছিল, গভীর দুঃখের বিষয় তখন আর তিনি ইহলোকে নাই। দ্বিতীয়তঃ, যদিও সাহা-তাপ-আয়নন তত্ত্বের

উৎপত্তি জ্যোতির্বিদ্যাপ্রসূত, তথাপি পরীক্ষণাগারে এই তত্ত্বের ফলাফল সোজাসুজি পরীক্ষা করা অসম্ভব নয়। তিনি একদিন স্নাতকোত্তর ক্লাশে (1939) আমাদের নিকট দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন যে, এই কাজের জন্য তাঁকে বিদেশে নের্ন্‌স্টের পরীক্ষণাগারের সাহায্য নিতে হয়েছিল। পরবর্তীকালে দেশেও তিনি এই পরীক্ষায় চেষ্টা করেছিলেন। বর্তমান যুগে এই পরীক্ষা প্লাজ্‌মা পদার্থবিদ্যায় বিশ্বের বিভিন্ন পরীক্ষণাগারে পর্যবেক্ষণমূলক অনুসন্ধানের সঙ্গে নিগূঢ়ভাবে জড়িত।

সাহা-তত্ত্বের পরবর্তী যুগের আরম্ভ হয় দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে, তত্ত্বীয় ও পর্যবেক্ষণ ফলপ্রসূত। আর এই দুটি একত্রিত হয়ে পদার্থবিদ্যায় নূতন শাখা প্লাজ্‌মা-পদার্থবিদ্যায় বর্তমান যুগের সাহা সমীকরণে। নূতন তাত্ত্বিক বিবেচনা সুরু হয় সাহার তাপ-আয়নন-তত্ত্বের প্রথম প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হবার পর পরই। ফাউলার (R. H. Fowler) 1923 খৃস্টাব্দে সাহা-তাপ-আয়নন-তত্ত্বের মূল সূত্রটি সাংখ্যায়নিক গতি-বিজ্ঞানের একটি সমস্যা হিসাবে দেখতে চেষ্টা করেন। সাংখ্যায়নিক গতি-বিজ্ঞানে ফাউলারের নবাবিষ্কৃত পদ্ধতি, আয়ননজনিত বিচ্ছিন্নতা-সাম্য (Dissociation Equilibrium) অবস্থায়, তিনি (ফাউলার) প্রয়োগে রত হন। সেই থেকে সাহা-তত্ত্বের নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সৃষ্টি। কারণ সাংখ্যায়নিক গতি-বিজ্ঞানের বিচারে কোন সমস্যা দেখতে হলে ঐ সমস্যার সঙ্গে জড়িত বিভাজন অপেক্ষকের (Zustandssumme বা Partition Function) প্রশ্ন ওঠে। আর বন্ধনহীন পরমাণু ও আয়নের ক্ষেত্রে এই অপেক্ষকের গণনাতে নানান প্রতিবন্ধকতার সূত্রপাত হয়। অপর পক্ষে যুদ্ধোত্তর যুগে নবাবিষ্কৃত অপেক্ষাকৃত নিখুঁত পরিমাণের যন্ত্রাদির সাহায্যে এবং নবোদ্ভাবিত পদ্ধতি দ্বারা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ আরম্ভ হয়। এই প্রচেষ্টার ফলে জানতে পারা গেল যে, সাহা-তত্ত্বের স্বাভাবিক পরিণতিস্বরূপ আকাঙ্খিত ফলাফলে কিছু অমিল আছে। এটি অনেক ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পরিমাণগত কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে গুণগতও। এই দুই অসঙ্গতির কিছুটা সুরাহা হয় প্রায় সম-সাময়িক কালে প্লাজ্‌মা পদার্থবিদ্যার চর্চাতে।

সহজ ভাষায় প্লাজমা পদার্থবিদ্যায় মুখ্য আলোচ্য বিষয়, বহিঃস্থ বিদ্যুৎ-চুম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে (বা অনুপস্থিতিতে), সমষ্টিগতভাবে নিরপেক্ষ পরমাণু, আয়ন ও ইলেকট্রনদের গতি, গাঢ়ত্ব, অন্তঃস্থ বিদ্যুৎ-চুম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন ইত্যাদির অনুসন্ধান করা। সাহা তাপ-আয়নন-তত্ত্বে পরমাণু, আয়ন ও ইলেকট্রনদের মধ্যে শুধুমাত্র পরস্পরের সংঘর্ষণ প্রক্রিয়ার অবতারণা আছে। কিন্তু প্লাজ্‌মা পদার্থবিদ্যায় আলোচ্য বিষয় আরও বিস্তারিত যথা সমষ্টিগতভাবে আয়ন ও ইলেকট্রনদের পরস্পর মিথষ্ক্রিয়া (Interaction), তাদের বিদ্যুৎ-চুম্বক ক্ষেত্রে বিচরণ ও তাদের বিকিরণ ইত্যাদি। সুতরাং জ্যোতিপর্দার্থবিদ্যায় যে পরিস্থিতিতে অধ্যাপক সাহা তাপ-আয়নন তত্ত্বের প্রস্তাবনা করেছিলেন, তার সঙ্গে প্লাজ্‌মা পদার্থবিদ্যার অতি নিকট সম্পর্ক। ঐ তত্ত্বে সর্বাপেক্ষা সহজ ভৌত অবস্থার ধারণা করে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। প্রকৃত ক্ষেত্রে অবস্থা সাধারণতঃ সরল নয়—তা থেকেই এই তত্ত্বের ফলাফলের ব্যতিক্রম। প্লাজ্‌মা পদার্থবিদ্যার প্লাজমা-বর্ণালী শাখা জ্যোতিপর্দার্থবিদ্যার সঙ্গে বিশেষ সংশ্লিষ্ট। এই শাখার প্রধান আলোচ্য বিষয় প্লাজ্‌মা থেকে বিদ্যুচ্চৌম্বক রশ্মির বিকিরণ। সাহা-তত্ত্বে আয়ন ও ইলেকট্রনদের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়ার অবতারণা করা হয় নাই, বস্তুতঃ এদের মধ্যে কুলম্ব (Coulomb) মিথষ্ক্রিয়া সুদূর প্রসারিত। এর ফলস্বরূপ পরমাণুদের অন্তর্নিহিত ইলেকট্রনদের বদ্ধ শক্তিমাত্রার আপেক্ষিক সংখ্যার (Population density of bound states) পরিবর্তন, শক্তিমাত্রার প্রসার (Broadening of energy states) আর আয়নন শক্তিমাত্রার হ্রাস (Lowering of ionisation potential) ঘটে থাকে। এদের সর্বপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি হচ্ছে উপরিউক্ত বিভাজন গণনার অনেক প্রতিবন্ধকতার অপসারণ। সুতরাং অধ্যাপক সাহা বন্ধনহীন আয়ননের শক্তিমাত্রা ধরে যে গণনা করেছিলেন, তার সংশোধন প্রয়োজন। আবার গুণগতভাবে এই সুদূর প্রসারিত মিথষ্ক্রিয়ার ফলে বর্ণালীতে নিষিদ্ধ রেখার (Forbidden lincs) আবির্ভাব সম্ভব। বিকিরণ শুধুমাত্র মুক্ত পরমাণু বা আয়নদের নয়—পারিপার্শ্বিক আয়ন ও ইলেকট্রনদের উপর নির্ভরশীল।

প্লাজ্‌মা পদার্থবিদ্যায় নের্ন্‌স্টের সূত্রের অবতারণা না করে, বিদ্যুৎ-আধানের অক্ষয়তা (Conservation of electric charge) স্বীকার করে, সমষ্টির হেলমোলট্‌জ, মুক্ত শক্তির (Helmohltz Free Energy) সর্বনিম্ন মান থেকে, ভিন্নমাত্রার আয়নেদের আপেক্ষিক গাঢ়ত্বের অনুপাত হিসাব করা হয়, একার ও ক্রোল (Ecker and Kroll, 1965)

$$\frac{n_{z-1}\, n_e}{n_z}$$

$$2\left(\frac{2\pi mkT}{h^2}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{B_z}{B_{z-1}} \exp.\left[-\frac{E_{z-1}(\infty)}{kT}\right]$$

এখানে n_e ইলেকট্রনের সংখ্যা প্রতি একক ঘনফল, n_z কোন পরমাণুর z মাত্রায় আয়নের অনুরূপ সংখ্যা, B_z তার আভ্যন্তরিক (Internal) বিভাজন অপেক্ষক, $E_z(\infty)$ তার আয়ননের শক্তি, আর প্রক্রিয়ার নির্ধারিত উষ্ণতা T। প্লাজ্‌মা পদার্থবিদ্যার বর্তমান যুগে এটিকে বলা হয় সাহা-সমীকরণ। [মতান্তরে বোল্‌ট্‌জ্‌মান-সাহা (Boltzmann-Saha) সমীকরণ, কারণ সাহা তত্ত্বের মূল সংজ্ঞার সঙ্গে বোল্‌ট্‌জ্‌মানের বন্টন সূত্রও ধরে নেওয়া হয়েছে।]

এ ভিন্ন তাপ-গতিবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেও একটি প্রশ্ন ওঠে, সাহা-তত্ত্বে সম্পূর্ণরূপে তাপ-সাম্য স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে এই তাপ-সাম্যতা বিচার্যের বিষয়। প্লাজ্‌মা পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন ভৌত পরিবর্তনের বিশ্লেষণ করে

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে যে, পরমাণু, আয়ন এবং ইলেকট্রনদের পারস্পরিক সংঘর্ষের প্রভাব যদি বিকিরণজনিত বিভিন্ন পরিবর্তনের প্রভাবের উপর প্রাধান্য লাভ করে, তবেই তাপ-সাম্যতা সম্ভব হতে পারে—আর তাহাও সার্বিক ভাবে নয়, স্থানীয় তাপ-সাম্যতা (Local thermodynamic equilibrium) রূপে। সৌর বহির্মণ্ডলে তাপ-সাম্যতা সম্পূর্ণ স্বীকার্য নয়। এই সমস্ত কারণে, সাহা-সমীকরণের গণনায় আয়নের গাঢ়ত্বের মাত্রা প্রকৃত মাত্রা থেকে কম। সেই হেতু আধুনিক কালে সাহা-সমীকরণের কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের বিভিন্ন প্রয়াস চলছে। অপরপক্ষে সাহা সমীকরণের অবতারণা না করে আয়ন ও ইলেকট্রনদের পরস্পর মিথষ্ক্রিয়ার সংশ্লিষ্ট হেল্‌মোলট্‌জ্‌ মুক্ত শক্তির রাশি ধরে কেউ কেউ অগ্রসরের প্রয়াসী হয়েছেন। গণনার দিক থেকে, কম্পিউটারের সাহায্য সত্ত্বেও, এটি অত্যন্ত কষ্টসাপেক্ষ।

উপসংহারে সাহা-আয়নন-তত্ত্ব সম্পর্কে সাধারণতঃ অনোল্লেখিত ঐতিহাসিক প্রশ্নের উত্থাপন করা এবং সেই সূত্রে সামান্য মন্তব্যের প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গদ্বয়ের আলোচনার উদ্দেশ্য—প্রথমতঃ অধ্যাপক সাহার বৈজ্ঞানিক অনুশীলনী, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর পাণ্ডিত্য ও তাঁর বৈজ্ঞানিক দূরদৃষ্টির দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা। দ্বিতীয়তঃ সেই সূত্রে আনুষঙ্গিক বিষয়ে বর্তমানে দেশের বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গীর উপর আলোকপাত।

গত বিশের দশকে যখন সাহা-তত্ত্বের এবং সাহা-সমীকরণের প্রয়োগে জ্যোতিপর্দার্থবিদ্যার বিভিন্ন জটিল প্রশ্নের উত্তর মিলল, তখন তৃতীয় দশকের প্রথম দিকে ইউরোপের দু-এক জন বিজ্ঞানী প্রশ্ন তুলেছিলেন—এখন এই তত্ত্বের সঙ্গে শুধু অধ্যাপক সাহার নাম থাকবে কেন, বিশেষতঃ যখন এগার্ট নের্ন্‌স্টের চাপ-সাম্য বিক্রিয়ার ধ্রুবককে প্রথম ব্যবহার করেছিলেন আয়নিত অবস্থায় Fe আয়নের গাঢ়ত্বের পরিমাপের জন্য? প্রথমেই উল্লেখ করেছি, অধ্যাপক সাহা তাঁর প্রবন্ধে পরিষ্কার লিখেছেন, তিনি এগার্টের (উপরে বর্ণিত) প্রবন্ধের প্রণালী অবলম্বন করে অগ্রসর হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বিশদভাবে বিচার করতে হলে এগার্টের প্রবন্ধের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন। ঐ প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল—'স্থির তারকার গ্যাসের বিচ্ছিন্ন অবস্থা' (Über den Dissoziationzustand der Fix sterngase, Dec. 1919)। আলোচ্য বিষয় ছিল Fe পরমাণু কত মাত্রা পর্যন্ত আয়নিত (Order of ionisation) অবস্থায় পরস্পরের মধ্যে তাপ-সাম্য সম্ভব, যখন পারিপার্শ্বিক উষ্ণতা $10^{6\circ}-10^{7\circ}k$ এবং চাপের পরিমাণ $\sim 10^7$Atm.। যদিও এই প্রচণ্ড চাপ এবং উষ্ণতা কেবলমাত্র তারকাতেই সম্ভব কিন্তু এগার্টের প্রবন্ধে জ্যোতিপর্দার্থবিদ্যায় সম্ভাব্য প্রয়োগের উল্লেখ ভিন্ন ঐ প্রবন্ধের ফলাফল কোন কোন তারকায় কি পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য তার বিশ্লেষণের কোন বিশেষ প্রচেষ্টা নেই। এতদ্ভিন্ন নের্ন্‌স্টের সূত্র ব্যবহার করবার জন্য বিক্রিয়া শক্তির পরিমাণ প্রয়োজন। এর জন্য আয়নন শক্তির ব্যবহার না করে এগার্ট, তার সমস্যায় প্রয়োজন মতন আয়নন শক্তির পরিমাণে উপনীত হবার জন্য নানান কল্পিত সংখ্যার আশ্রয় নেন। এই ত্রুটি বাদেও এগার্টের মূল প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ই ছিল একটা প্রায় কাল্পনিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। উপরন্তু অধ্যাপক সাহা তাঁর প্রবন্ধে এগার্টের প্রণালীর ব্যবহার করেছিলেন কিন্তু নের্ন্‌স্টের সূত্র প্রয়োগের প্রধান প্রয়োজনীয় উপাদান বিক্রিয়ার শক্তির পরিমাণের জন্য যেখানে সম্ভব সরাসরি পরীক্ষাগারে লব্ধ আয়নন শক্তির ব্যবহার করেছিলেন। অন্যথায় পরমাণুর বর্ণালী বিশ্লেষণ করে ঐ শক্তির পরিমাপ হিসাব করেছিলেন এবং সাধারণভাবে এর নির্দেশ দিয়েছিলেন। এখানে আরও মন্তব্য করা উচিত লিণ্ডেমান (Lindemann, 1919) কর্তৃক হাইড্রোজেনের আয়নন এবং আয়নের গাঢ়ত্ব গণনার প্রথা অধ্যাপক সাহা প্রবর্তিত (1920) প্রথার অনুরূপ (তাঁর 1921 খৃস্টাব্দের প্রবন্ধে এর উল্লেখ আছে)। কিন্তু লিণ্ডেমানের উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্রের ঝটিকার সহিত সৌর বহির্মণ্ডলের উদ্‌গমনের সম্পর্ক। লিণ্ডেমানের আলোচনা শুধুমাত্র হাইড্রোজেন আয়ননেই সীমাবদ্ধ ছিল। বর্ণালীর কোন উল্লেখের প্রয়োজন ছিল না।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, অধ্যাপক সাহা তারকাদের বিভিন্ন উষ্ণতা ও চাপের পরিমাণ অনুসরণ করে ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুর আয়ননের গাঢ়ত্বের হিসাব করেছিলেন। এর পরিণতিস্বরূপ সহজভাবে তৎকালীন জ্যোতির্বিদ্যায় তারকাদের বর্ণালীর পর্যবেক্ষণ-প্রাপ্ত প্রায় এক শতাব্দীর সঞ্চিত ফলগুলির একটি সুন্দর, সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দিতে পেরেছিলেন। পরমাণুদের আয়নিত অবস্থাকে ভৌত-রসায়ন প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা বা তাকে পরিব্যাপ্ত করে জ্যোতিপর্দার্থবিদ্যায় প্রয়োগ ও তার পরিণতি এবং জ্যোতিপর্দার্থবিদ্যায় এই ফলাফলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অধ্যাপক সাহার বিশেষ পরিষ্কার ধারণা ছিল। আর এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে গড়ে উঠেছে জ্যোতিপর্দার্থবিদ্যায় একটি বিশেষ অপরিহার্য অঙ্গ। এই কারণেই এর নাম সাহা-তত্ত্ব এবং পরবর্তী যুগে তা থেকে সাহা-সমীকরণ। এই আপত্তির সমাধান করতে গিয়ে উনসোল্ড (Unsöld) লিখেছেন, "M. N. Saha erkante kurz darauf ihre enorme Bedeutung für die theorie der Sternspektren und erscheint daher volkommen gerechtfertigt, das sie seine Namen trägt." (Physik der Sternatmostopharen. [তারকার বর্ণালী তত্ত্বে তাপ প্রভাবিত আয়ননের গভীর ও পরিব্যাপ্ত তাৎপর্য অতি অল্প সময়ের মধ্যে বুঝতে পারবার মতো দূরদৃষ্টি এম. এন. সাহার ছিল সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর নামই এই তত্ত্বের সঙ্গে জড়িত হওয়া উচিত।] সাহা এই দূরদৃষ্টি

পেয়েছিলেন কারণ বিজ্ঞানের কয়েকটি শাখায় তাঁর অসাধারণ বুৎপত্তি ছিল—প্রধানতঃ পদার্থবিদ্যার আলোক বর্ণালী শাখা (Spectroscopy), জ্যোতির্বিজ্ঞান (বিশেষতঃ তারকাদের বর্ণালী), তাপ-গতিবিদ্যা এবং ভৌত রসায়ন।

এই প্রসঙ্গে আরো উল্লেখযোগ্য বিষয়, এই বিষয়ে সাহার প্রথম প্রবন্ধ 1920 খৃস্টাব্দে। এই প্রবন্ধে উল্লেখিত ফ্রাঙ্কের (Frank) পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয় 1917 খৃস্টাব্দে, উপরিউক্ত এগার্টের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 1919 (Dec.) খৃস্টাব্দে। (স্মরণ করা দরকার তখন 'এয়ার মেল' ছিল না।) সুতরাং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সাহা প্রথম প্রবন্ধ প্রস্তুত করেছিলেন। আবার এই প্রবন্ধে অনেক তালিকা (Tables) আছে যাদের প্রস্তুতির জন্য প্রচুর তথ্য সংগ্রহের এবং গণনার (Calculations) প্রয়োজন হয়েছিল। [সেটা কমপিউটারের যুগ নয়, তখন কলিকাতায় এই কাজের জন্য স্বহস্তে চেম্বার্স বা ঐ জাতীয় কোনও গাণিতিক তালিকা (Mathematical Tables) ব্যবহার ভিন্ন উপায় ছিল না।] এখানে সামান্য ঐতিহাসিক মন্তব্য বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না—1917 খৃস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগ আরম্ভ হবার পরই অধ্যাপক সাহাকে ফলিত গণিত বিভাগ থেকে পদার্থবিদ্যা বিভাগে স্থানান্তরিত করবার পরে তাঁকে স্নাতকোত্তর ক্লাশে তাপ-বলবিদ্যা অধ্যাপনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁর এক উক্তিতে পড়েছি—"সেই থেকে ঐ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ আসে, ধীরে ধীরে গভীর ভাবে মনোনিবেশ আসে।"

এই আলোচনার সূত্র ধরেই দ্বিতীয় প্রসঙ্গের অবতারণা করা যায়। তাপ প্রভাবিত আয়নিত তাপ-সাম্য অবস্থায় নের্নস্টের ভৌত-রাসায়নিক সমচাপ প্রভাবিত বিক্রিয়ার সমীকরণের কি রূপ হবে এবং তার ফলে আয়নদের গাঢ়ত্ব পারিপার্শ্বিক উষ্ণতা এবং চাপের পরিমাণের উপর কি ভাবে নির্ভর করবে এটুকু দেখিয়েই, অধ্যাপক সাহা ক্ষান্ত হন নি। পরন্তু এর পরিণতি হিসাবে তিনি তারকাদের বহির্মণ্ডলের গঠন তাদের ভৌতিক অবস্থা, যথা উষ্ণতা ও চাপের পরিমাণ ইত্যাদি গণনা করেছিলেন। আর তাঁর তত্ত্বপ্রসূত পরিমাণের সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষিত অবস্থার সঙ্গে মিল পরিষ্কার নক্সা করার মতন তিনি প্রস্তুত করেছিলেন। আবার যেখানে অমিল, সেখানে অন্য কি ভৌতিক কারণ থাকতে পারে তার আলোচনা করেছিলেন। এক কথায় তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রকৃতির রহস্য উৎঘাটন করা। তাই মানমন্দিরে পর্যবেক্ষণের ফলাফলের শুধু গুণগত রূপেই নয় তাদের পরিমাণেরও ব্যাখ্যা দিবার তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

এখানে এই আলোচনার উদ্দেশ্য আমাদের দেশের বর্তমান তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যায় যাঁরা গবেষণা করেন, তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলি স্থূলভাবে দুই পর্যায়ে ভাগ করা যায়। 'প্রথমতঃ, যে সমস্ত প্রবন্ধে বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ নূতন ভাবধারা প্রবর্তন করে। এর সংখ্যা সারা পৃথিবীতে অতি বিরল। দ্বিতীয়তঃ; প্রচলিত ভাবধারার সূত্র ধরে বিজ্ঞানের পরীক্ষণাগারে লব্ধ নূতন নূতন আবিষ্কারের গুণগত এবং পরিমাণগত ব্যাখ্যা করা অথবা বিভিন্ন বিভাগের সংগৃহীত জ্ঞানের একটি সামঞ্জস্য রূপ দান করা বা একত্রীভূত করা। এ জন্য বিষয়বস্তুগুলির গুণ এবং পরিমাণ সম্পর্কে পরীক্ষণাগারে প্রাপ্ত জ্ঞানের সঙ্গে নিগূঢ় পরিচয় থাকা দরকার। অধুনা আমাদের দেশের বেশির ভাগ তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যায় গবেষণা-পত্রে পরীক্ষণাগারে বা পর্যবেক্ষণাগারে লব্ধ জ্ঞানের (বিশেষতঃ পরিমাণগত) যথাযথ সম্পর্কের বিশেষ অভাব। সাহা-তত্ত্বের গবেষণা-পত্রগুলি অপরিহার্য রূপে স্মরণ করিয়ে দেয়—'তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার গবেষণা-পত্র শুধুমাত্র ফলিত গণিতের একটি সমস্যার সমাধানে আবদ্ধ নয়'। এর প্রধান উদ্দেশ্য প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনের; সেহেতু বিজ্ঞানাগারে আহরিত গুণগত এবং পরিমাণগত জ্ঞানের সম্যক উপলব্ধি প্রয়োজন। আর ঠিক এই অভাবের জন্যই বোধহয় আমাদের দেশে তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যায় উল্লেখযোগ্য যে সমস্ত গবেষণা হয়, সেগুলি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না।

অধ্যাপক সাহার এই অবদান কত সুদূর প্রসারিত, তার উপলব্ধি হবে তাঁর প্রবন্ধের মূল উপাদানের উপর দৃষ্টি রাখলে। পরমাণুদের আভ্যন্তরিক অবস্থার উপর কিভাবে সুদূর বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত তারকাদের ভৌত অবস্থা ওতপ্রোতভাবে নির্ভর করে, তা তিনি বিজ্ঞানীদের নিকট উপস্থাপিত করেছিলেন। তিনিই প্রথম বিজ্ঞানীসমাজে এর উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন; আর তা শুধু গুণগতভাবেই নয়, পরিমাণগতভাবেও। তৎকালীন নবাবিষ্কৃত [illegible]বোর-রাদারফোর্ডের পরমাণু তত্ত্ব এবং তার পরিমাণগত ফলাফল তিনিই প্রথম জ্যোতির্বিজ্ঞানে প্রয়োগ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানে সম্পূর্ণ নূতন এক দৃষ্টিভঙ্গী এনেছিলেন।

পরিশেষে সাহা-তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলির অন্য এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য গুণ—এর বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা এত সরল এবং স্বাভাবিক যে, কোন বিজ্ঞানের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী, যাঁদের পরমাণু তত্ত্বের মোটামুটি জ্ঞান আছে, তাঁদের নিকটও অধ্যাপক সাহার এই মৌলিক প্রবন্ধগুলি বোধগম্য হবে। এর প্রস্তাবনা কত স্বাভাবিক, তা সহজেই অনুধাবন করার জন্য বিশেষ আনন্দের সঙ্গে জানাই যে, বর্তমান প্রবন্ধের কয়েকটি বাক্য তাঁর মূল গবেষণা-পত্রের বঙ্গানুবাদ মাত্র। অবশ্য এরূপ সুপাঠ্য, সাবলীল ও স্বতস্ফূর্ত অবতারণা শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল রচনার বিশেষত্ব। সুতরাং এ বিষয়ে যদি কেউ উৎসুক হন এবং সাহা-তাপ-আয়নন-তত্ত্বের মূল প্রবন্ধ পড়বার জন্য আগ্রহী হন, তবেই আমার উদ্দেশ্য সার্থক মনে করব।

[এই প্রবন্ধের বিষয়ে আমাকে আমাদের সহকর্মী ডঃ এম. এস. ভার্দে এবং ডঃ এস. পি. তরফদার বিশেষ সাহায্য করেছেন, সেজন্য তাঁদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।]

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের একটি ভাষণ

[ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরিতে কৃষ্ণান স্মারক বক্তৃতা]

ভাবানুবাদ—শ্যামল গণ*

প্রিয় ডিরেক্টর ভার্মা এবং আমার সামনে অনেক চেনামুখ বন্ধুদের দেখতে পাচ্ছি, তাঁদের প্রত্যেককে আলাদা নাম না করে সবাইকে বলছি যে, আজ এই স্মরণীয় দিনে আপনাদের সামনে কিছু বলার সুযোগ পেয়ে নিজেকে যথেষ্ট সম্মানিত বোধ করছি। ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরির সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্যে আমি নিজেকে বিশেষ গৌরবান্বিত মনে করি যেখানে, ডঃ ভার্মা যা বললেন, কঠিন শ্রম ও মেধা দিয়ে নানাবিধ সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে তরুণের দল সমবেত হয়েছেন। তাঁরা তৈরি করছেন গবেষণার জন্য উঁচুমানের সূক্ষ্ম নানান যন্ত্রপাতি অথবা উদ্ভাবন করছেন নতুন কোন বাণিজ্যিক কৌশল যাতে দেশের যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারকরা তথা সারা দেশের মানুষ লাভবান হবেন। এতে প্রচুর বিদেশী মুদ্রারও সাশ্রয় হবে এবং কালক্রমে দেশবাসীর সমূহ উপকার হবে। আমরা এই সমস্যাটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। আমার এখনো মনে আছে যে বিগত বেশ কয়েক বছর আগে বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে যখন আমরা জীবন শুরু করেছিলাম, মেধাবী ও উচ্চাভিলাষী যুবাদের সামনে তখন এমন কোন সুযোগ সুবিধে ছিল না। শুধু কয়েকটি সরকারী কলেজে ছিটেফোঁটা সুযোগের ব্যবস্থা ছিল। কেবল একটিমাত্র সংস্থা ছিল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কাল্টি-ভেশন অফ সায়েন্স। স্থাপন করেছিলেন একজন চিকিৎসক, হ্যাঁ একজন দেশপ্রেমিক চিকিৎসক—যিনি দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেছিলেন এবং দেশীয় প্রতিভাসমূহের স্ফুরণের সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন। তিনিই অর্থ সংগ্রহ করে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপন করেছিলেন। সেখানে শুধু বিজ্ঞানের নবতর অগ্রগতির সংবাদই আলোচিত হত তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে কিছু কাজের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

তবে কেবলমাত্র গবেষণার জন্য ল্যাবরেটরির সম্পদ ব্যবহার করার প্রশ্ন ছিল না। মোটামুটি শ' খানেক বছর আগে অনেকে ভাবতে শুরু করলেন কি করে বিজ্ঞানের প্রতি কুসংস্কারে আচ্ছন্ন উদাসীন দেশবাসীর দৃষ্টিভঙ্গীকে আধুনিক করে তোলা যায়, কি করে মানুষের চোখ, বা শুধু কোন কিছু দেখবার জন্যই সৃষ্টি হয় নি, উপলব্ধি করতে সমর্থ হবে প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর কারণগুলি।

ডাঃ সরকার নিজেই ছিলেন ইতিহাস। পাশ্চাত্য অ্যালোপাথির চিকিৎসায় শিক্ষিত হয়ে তিনি ডাক্তারী শুরু করেছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই মনে হল হোমিওপ্যাথি প্রথায় চিকিৎসা করলে আরো ভালভাবে রোগ নিরাময় হতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত যত্ন নিয়ে পরীক্ষা শুরু করলেন এবং ওষুধের কর্মক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে যথেষ্ট সাহসের সঙ্গে শুরু করলেন চিকিৎসার কাজ। ফলে তৎকালীন চিকিৎসক সমাজ কর্তৃক পরিত্যাজ্য হওয়ার ঝুঁকি নিলেন কারণ তিনি ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাবিদ্যার স্নাতক। স্বভাবতই যে সমস্ত চিকিৎসকরা হোমিওপ্যাথিকে নিরাপদ মনে করতেন না, সবাই তাঁর বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগলেন। যাই হোক, তিনি ক্ষান্ত দিলেন না। তিনি তখন মেডিসিন ফ্যাকাল্টির ডীন। তিনি ঐ শ্রেণীভুক্ত থাকাটাই বহাল রেখে তাঁর উদ্দীপনার সঙ্গে কিছু অর্থসংগ্রহ করে ল্যাবরেটরিসহ একটি ছোটখাটো বাড়ী বানিয়ে ফেললেন।

স্যার আশুতোষ তখন তরুণ যুবক, সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে গণিতে তাঁর গবেষণার বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। আমাদের ছাত্রাবস্থার পাঠ্য বইতে তাঁর নামের উল্লেখ দেখেছি। ভয়ের সমীকরণের তিনি একটি নিজস্ব দুর্দান্ত ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী। গবেষণায় নিজেকে নিয়োজিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, দেশ তখনকার বিজ্ঞানীদের জন্য এমন কোন ব্যবস্থা করতে পারে নি, প্রগতি বা উন্নতির কোন পথ তখন বিজ্ঞানীদের সামনে উন্মুক্ত ছিল না। সুতরাং তিনি আইন পড়তে গেলেন। আইনের ব্যবসা তখন যথেষ্ট সম্মানিত পেশা। কিন্তু কৌশলেই হোক, আর ঘটনাক্রমেই হোক আমাদের দেশে বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে সমবেত আইন-জীবীদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। বিখ্যাত আইনবিদ এবং গণিতজ্ঞ স্যার আশুতোষ বিজ্ঞান শিক্ষায় বিপ্লব এনেছিলেন। শুধু তিনি নন অন্তত আরো দুজন বিশিষ্ট আইনজীবী, যাঁদের মূর্তি বিজ্ঞান কলেজের সামনে স্থাপিত আছে, তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং চমৎকার অর্থ সাহায্য দিয়ে তখনকার বিজ্ঞানচর্চাকে সম্ভব করে তুলেছিলেন।

আমাদের পূর্ববর্তী সময়ে ছাত্ররা মূলতঃ সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভর করতেন। আমাদের দেশের বিজ্ঞানের ইতিহাসে শুধু দুটি নাম ছিল এর বিশেষ ব্যতিক্রম— জগদীশচন্দ্র বোস এবং প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তাঁরা স্বীয় প্রচেষ্টায় নিজেদের গবেষণাকর্ম চালিয়ে গিয়েছিলেন—বিদেশে গিয়ে বিজ্ঞানের পাঠ গ্রহণ করেছিলেন এবং দেশে ফিরে পাশ্চাত্য শিক্ষার সাধারণ দেশীয় যন্ত্রাদির সাহায্যে কাজকর্মের ধারায় এক নতুন দিশা খুঁজে পেয়েছিলেন। বিজ্ঞানের আলোয় উদ্ভিদের প্রাণ রহস্য উদ্ঘাটনের ব্যাপারে স্যার জগদীশের নাম লেখা আছে। ঔষধাদি এবং মূল শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক—সালফিউরিক অ্যাসিড ইত্যাদি তৈরির প্রথম প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্যার পি. সি. রায়ের নাম। কিন্তু তখন তরুণ বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের পাঠ শেষ করে বেশীর ভাগই আবার আইনের দিকে ঝুঁকতে লাগলেন এই সময় দেশের ইতিহাসে এক

বিরাট পরিবর্তন এল। এল দেশবিভাগ—এল স্বদেশী আন্দোলন। পড়াশোনার ব্যাপারে সময় দেওয়াকে অনেকে অর্থহীন ভাবতে লাগলেন। কিন্তু অন্যদিকে একই সঙ্গে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য সম্পূর্ণ পরনির্ভরশীলতা গেল না। নিত্যকার প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের ব্যাপারে স্বনির্ভরতার জন্য আন্দোলনও গড়ে উঠল। ফলে আধুনিক শিল্পের কলাকৌশল শিক্ষার জন্য ছাত্ররা পাড়ি দিলেন বিদেশে। শিখতে গেলেন কিভাবে তৈরি হয় সুতো, কিভাবে নির্মিত হয় কলকারখানা, কিভাবেই বা গড়ে তোলা যায় রাসায়নিক শিল্প ইত্যাদি। আবার কেউ কেউ গেলেন নির্ভেজাল বিজ্ঞানের পাঠ গ্রহণ করতে। তাঁদের আকাঙ্খা এবং অভিলাষ ছিল যে, দেশে ফিরে কিছু কলকারখানা গড়ে তুলবেন। কিন্তু তৎকালীন শাসকদের কাছ থেকে এব্যাপারে কোনরকম সমর্থন বা সাহায্য মিলল না। পরন্তু চলল নিপীড়ন—অত্যাচার—বিদ্রোহ। সেই সময় যাদবপুরে মাতৃভাষায় সম্পূর্ণ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হল। সেখানে অনেকে এগিয়ে আসলেন শিক্ষার অগ্রগতির জন্য উজাড় করে দিলেন যথাসর্বস্ব।

হ্যাঁ, ভাল কথা, ঠিক সেই সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী পরিবর্তন করে বিজ্ঞান শিক্ষাকে একটা আধুনিক চেহারা দেবার চেষ্টা হলো। ডিগ্রী প্রাপ্তির যাথার্থতা প্রমাণের জন্য ছাত্রদের পরীক্ষাগারে কাজ করা শুরু হলো। এমন কি বিজ্ঞানে প্রথম ডিগ্রী পাওয়ার জন্যও দু'বছরের ব্যবহারিক ক্লাশ করতে হতো। সেই সময় কলকাতার অন্যান্য কলেজে যাদের যথেষ্ট সুযোগ ছিল না, বিজ্ঞান শিক্ষায় প্রকৃত উৎসাহী এবং উদ্যমী সেইসব ছাত্রদের জন্য ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পরীক্ষাগারগুলির দরজা খোলা ছিল। সেখানে তখন পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা ইত্যাদির প্রারম্ভিক ব্যবহারিক ক্লাশের একটি কোর্স চালু করা হয়েছিল। অনেক ছাত্র সেখানে কাজ করতেন। এতশত আপনাদের বলছি এ জিনিষটাই বোঝাবার জন্যে যে, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের মূলধন তখন সত্যই ছিল যৎসামান্য। আমরা শুধু ভেবেছিলাম, যাই হোক, এইখানে বৈজ্ঞানিক কর্মধারার শুভ সূচনা হল্যে। কিন্তু কাজটা বেশীদূর এগোতে পারে নি। কারণ মূলতঃ অর্থাভাব।

মহেন্দ্র সরকার মারা গেলেন। তখনো ল্যাবরেটরির অবস্থা তথৈবচ। 1913 খৃষ্টাব্দ নাগাদ আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পর্বের ছাত্র। তখন অনেক নতুন ঘটনা ঘটেছিল। নতুন কিছু অনুদান এসেছিলো—নতুন কিছু মানুষ এগিয়ে দিয়েছিলেন সাহায্যের হাত। এই সময় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের আমন্ত্রণ করে কলকাতায় নিয়ে আসা শুরু হলো। ডঃ গণেশ প্রসাদ, রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হলেন।

তৎকালীন দুই প্রখ্যাত আইনবিদ,—স্যার তারকনাথ পালিত এবং স্যার রাসবিহারী ঘোষ এগিয়ে এলেন তাঁদের অনুদানের ভাণ্ডার নিয়ে। ইতিহাসে তাঁদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এ সময়েই প্রথম অধ্যাপক নির্বাচনের কাজ শুরু হলো। যথেষ্ট কৌতূহলের বিষয়—অনুদান গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে যখন অধ্যাপকদের নির্বাচন করা হচ্ছিল—তার মধ্যে একটি ধারা তৎকালীন শাসকদের বিরক্তি উৎপাদন করেছিল। শর্তটি ছিল এই যে, অধ্যাপকদের নির্বাচন অবশ্যই ভারতীয়দের মধ্য থেকেই করতে হবে। আইনের দৃষ্টিতে ভারতীয়দের সংজ্ঞা বিবেচনা করলে অভারতীয়দের পক্ষে এই পদগুলি চিরকালই বাধা হয়ে থাকবে। আসলে তখন বেশীর ভাগ বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানের পদগুলি ইউরোপীয় অথবা স্কটদের দখলে ছিল। শুধু উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ছিল দুটি নাম—যাঁদের কথা একটু আগে উল্লেখ করেছি—স্যার জগদীশ বোস এবং স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়। এঁরা ছাড়া বেশীর ভাগ অধ্যাপক ছিলেন ইউরোপীয়। তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতার রেকর্ড তেমন কিছু আহামরি ছিল না। কিন্তু বিজ্ঞান বিষয়ে ভারতীয়দের শিক্ষা প্রদানের জন্যে সেটুকুই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হত। 'যাই হোক ইতিমধ্যে কিছু পরিমাণ অর্থ বিজ্ঞান শিক্ষার কারণে ব্যয়িত হয়েছে। ছাত্রাবস্থায় কিছু মূল্যবান যন্ত্রপাতির দিকে আমরা সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতাম। সেগুলি অত্যন্ত যত্নে মোড়কে রাখা থাকত আলমারীর মধ্যে। যেমন ধরা যাক Echelon Grating বা আরো কিছু যন্ত্রপাতি। সেগুলো কখনো সখনো পড়াবার সময়ে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে টেবিলে রাখা হত এবং পরে দ্রুততার সঙ্গে আলমারীর মধ্যে যথাস্থানে রেখে দেওয়া হত। ভাবখানা এমন ছিল যে, কেউ ছুঁলেই বুঝিবা এর বারোটা বেজে যাবে এবং এতগুলো টাকা জলে যাবে। এই ছিল তখনকার দিনের বিজ্ঞান।

সংস্কার হলেও এ সমস্ত জিনিষের প্রতি দৃষ্টিপাত করার সময় সম্মানের সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, এসব সমস্যা এবং এ ধরনের যন্ত্রাদি তখন ভারতের মাটিতে তৈরি হত না এবং আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যেই এগুলি সযত্ন সঞ্চিত থাকত—এগুলি সবসময় প্রশংসার দাবী রাখে।

1913 খৃস্টাব্দ নাগাদ আমরা তখনও ছাত্র। স্যার পি. সি. রায় তখন অ্যামাইন নাইট্রাইড নিয়ে গবেষণা করছেন এবং স্যার জে. সি. বোস তাঁর ম্যাগনেটিক ক্রিস্টালোগ্রাফ নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত। এ সময়েই অনুদানগুলি এসেছিল এবং অনুদান সম্বলিত পদগুলির সম্ভাব্য যোগ্য লোকের সন্ধান করছিলেন স্যার আশুতোষ। তিনি একজন মেধাবী তরুণকে লক্ষ্য করেন, যিনি বিজ্ঞানী হিসেবে নয়, কলকাতায় এসেছিলেন অর্থ বিভাগের একজন অফিসার হিসেবে। অফিসের সময়ের বাইরে সমস্ত সময়টুকুই তিনি ল্যাবরেটরিতে কাটানো পছন্দ করতেন। আমি স্যার সি. ভি. রামনের বিজ্ঞান জগতে প্রবেশের প্রথম দিককার কথা বলছি। তিনি স্বেচ্ছায় বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য উদ্যোগ নিয়ে-

ছিলেন। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে তিনি সমস্ত রকম সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারতেন। তাঁর বাসস্থানের ব্যবস্থাও তিনি অ্যাসোসিয়েশনের খুব কাছাকাছি এমন একটা জায়গায় করেছিলেন যাতে যখন তখন প্রয়োজনে পেছনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারতেন। সূর্যাস্তের পরে বহুক্ষণ পর্যন্ত তিনি কাজ করতেন।

...স্যার আশুতোষ এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি তখন ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি। যখন তুলনামূলক ভাবে অন্যান্য কলেজের অনেক অধ্যাপকদের কাছে তাঁর নামটা পরিচিত ছিল না, তখন তিনি বলেছিলেন যে এই তরুণ ছেলেটির ভবিষ্যৎ সুদূরপ্রসারী। আমার মনে আছে, একদিন আমি যখন স্যার আশুতোষের সঙ্গে দেখা করতে যাই, তাঁর নতুন নিয়োগের কথা শুনে আশ্চর্য হয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন—'আমি জানি যে সে অনেক দূর পর্যন্ত যাবে'।

আমরা আশ্চর্যই হয়েছিলাম। আমরা প্রায়ই ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে যেতাম এবং কাজকর্মে উদ্যোগী হিসেবে তাঁর কথা শুনতে পেতাম। বিজ্ঞানের যে কোন ছাত্রের মতই প্রতিদিন সকালে সন্ধ্যায় কাজ করতেন। তিনি তখন গবেষণা করছিলেন, আপনারা যাকে বলেন, অসদৃশ ব্যবর্তন (asymmetric diffraction)-এর উপর এবং পর্যবেক্ষণগুলি সমাধা করে ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিনে প্রকাশ করেছিলেন। এইসময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য পাশ করা আগ্রহী ছাত্রদের নানাবিধ সমস্যা দিতেন সমাধানের জন্য। স্যার সি. ভি. রামন নিজে ছিলেন একজন নিখুঁত পর্যবেক্ষক। একটা উদাহরণ দিই। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে তখন বস্তুর স্থিতিস্থাপকতার প্রভাব প্রদর্শনের জন্য একটা অত্যন্ত পুরোনো যন্ত্র ছিল। যন্ত্রটিতে দুটি বল ছিল। বল দুটিকে ওপরে টেনে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হত। নীচে নামার সময় সংঘর্ষের জন্য বল দুটি বিপরীত দিকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত লাফ দিয়ে ফিরে যেত। কোন্ বলটা কত দূরে গিয়ে স্বস্থানে ফিরতে পারে দেখে বলা হত দেখ—এই বলটা অমুকটার চেয়ে বেশি স্থিতিস্থাপক। যন্ত্রটি ছিল খুবই পুরোনো।

স্যার সি. ভি. রামন এই স্থিতিস্থাপক বল দুটিকে নিয়ে একটির ওপর আর একটিকে নিবদ্ধ করে লক্ষ্য করলেন চওড়া দিকটার থেকে না শুনে তলার দিক দিয়ে শুনলে সংঘর্ষকালে উদ্ভূত শব্দ অন্য রকমের শোনায়। শব্দটা দীর্ঘায়িত হয় এবং আরো ধাতব শোনায়। তাঁর ঔৎসুক্য বেড়ে গেল। যন্ত্রটার মধ্যে যে সমস্ত উপাদান ছিল তার থেকে কেউ কোনদিন ভাবেন নি যে, বল দুটির সংঘর্ষের সময় শব্দের উৎপত্তি এবং বহমানতায় অসমতা আছে। কিন্তু তিনি কৌতূহলী হয়েছিলেন এবং পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। যেহেতু তিনি গণেশপ্রসাদের মত ওস্তাদ গণিতজ্ঞ ছিলেন না, সেজন্য এ বিষয়ে তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। সেই সময় তাঁরা পরস্পর বন্ধু ছিলেন। বিখ্যাত হবার আগে সাধারণত সবাই বন্ধু থাকে—ঝগড়া করে কেবল পরে। অতএব তখনও যথেষ্ট বন্ধুত্ব থাকার ব্যাপারটা নিয়ে গণেশপ্রসাদের সঙ্গে আলোচনা হল। গণেশপ্রসাদ বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়লেন এবং সমস্যাটি নিয়ে একজন তরুণ ছাত্রকে ভাবতে বললেন। ফল : সুধাংশু ব্যানার্জীর ডক্টরেট প্রাপ্তি হল।

হ্যাঁ, তিনি সমস্যাটা সমাধান করেছিলেন। তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কী ভাবে বলগুলিকে ক্ষুদ্র তরঙ্গ সমূহের উৎস হিসেবে ব্যাখ্যা করতে হবে। একে অপরের থেকে ঠিকরে আসা ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলিকে বিশ্লেষণ করে এবং পরে বল দুটিকে একত্রে সংযুক্ত ঘটালে কী ভাবে একপ্রকার যুগ্ম-উৎস (double source) উৎপন্ন হয়, তার ব্যাখ্যা করলেন এবং ঠিক একটা চুম্বকের মত চুম্বক রেখার উপস্থিতি লক্ষ্য করলেন যেগুলি একদিকে অন্যদিকের তুলনায় বেশী বল নিয়ে এগিয়ে আসে। বিশ্লেষণ করে তিনি নির্ণয় করলেন, কেন এই ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি তুলনামূলক ভাবে একদিকে বেশী বলশালী। স্যার সি. ভি. রামনের ক্ষুরধার পর্যবেক্ষণ শক্তি সম্বন্ধে বলতে গিয়েই এই কথাগুলি বললাম। কী ভাবে অতি সাধারণ জিনিষগুলোর থেকে কিছু জিনিষ বেছে নিতেন যা নিয়ে ভাবনা-চিন্তার অবকাশ থাকে এবং কীভাবে দুর্বোধ্য গণনার সাহায্যে পৌঁছে যেতেন অচিন্তনীয় চমৎকার সিদ্ধান্তে, ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। কিছু জিনিষ আমি এখনও মনে করতে পারি। যেমন ধরা যাক—বীণার সুর থেকে wolf note প্রদর্শন বা কোন বিশেষ critical কম্পনের সময় কম্পনকাল দীর্ঘ করার অসুবিধা অথবা ধরা যাক, পাতলা ফিল্মের রং-এর বিষয় ইত্যাদি। অনেকে দেখেছেন যে, আলোচনায় সময়েই যুক্তিতর্কের মাধ্যমে তিনি সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তরুণদের দিয়ে দিতেন সমাধানের জন্য। এতে তরুণরা খুব খুশী ছিলেন। তাঁরা ভাবতেন যে, তাঁদের বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শনের জন্য অন্ততঃ যা হোক কিছু দেওয়া হচ্ছে যেখানে তাঁরা শিক্ষকবৃন্দের পদতলে বসে শেখা নবলব্ধ বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে প্রয়োগ করতে পারবেন। এই ভেবে তাঁরা কৃতজ্ঞ বোধ করতেন। শিক্ষকরা সাধারণত কোন সমস্যা দিতেন না। সমস্যা চলে আসত—নিজেদেরই সংগ্রহ করতে হত। এভাবে অনেকের নাম ছড়িয়ে পড়ত। আমার মনে আছে কী ভাবে আমরা সুশীল মিত্র বা ফণী ঘোষের প্রশংসা করতাম। অন্বেষক হিসাবে তাঁরা জীবন শুরু করেছিলেন এবং স্যার সি. ভি. রামনের থেকে এঁরা প্রেরণা পেতেন। তাঁরা শুধু ওঁর সঙ্গে যুক্ত থাকতেন না, নিজেদের ক্ষমতারও যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছিলেন। পরবর্তীকালে আয়নোস্ফিয়ার অধ্যয়নের ক্ষেত্রে সুশীল মিত্র একজন পথপ্রদর্শকরূপে গণ্য হয়েছিলেন। ওয়্যারলেসের উপর সর্বপ্রথম তাঁর কাছ থেকে

পাঠ নেওয়ার কথা তাঁর অনেক ছাত্রদের এখনো মনে আছে। মাইক্রোওয়েভ বিষয়ে ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরিতে পুরস্কার দেওয়া হত। তিনি এই তরঙ্গ বিষয়ে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং শেষে সাফল্যের সঙ্গে 'ফেলো' নির্বাচিত হয়েছিলেন। মৃত্যুর আগে তিনি রয়্যাল সোসাইটিরও ফেলো হয়েছিলেন। ফণী ঘোষ যথেষ্ট সাংগঠনিক শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনিই ফলিত পদার্থ বিভাগ শুরু করেছিলেন যা ইতিমধ্যেই একটা সম্মানজনক স্তরে পৌঁছেছে। প্রতিবছর সেখান থেকে ছেলেরা বেরিয়ে বিভিন্ন শিল্পে ও সরকারী দপ্তরে ঢুকছে। যাই হোক স্যার সি. ভি. রামন থেমে থাকেন নি, চালিয়ে গিয়েছিলেন। কয়েকটি বিশেষ ব্যাপার তিনি নিজেই পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, যেমন—সমুদ্রের বর্ণ। সাগরের নীল জলের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হয়েছিল যে, এ নিছক নীলবর্ণ আকাশের প্রতিফলন নয়। এভাবেই শেষে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন বিখ্যাত 'রামন-এফেক্ট'। এই আবিষ্কারের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন আর এক তরুণ, নাম কৃষ্ণান। তিনি ছিলেন অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির মানুষ। যখন অধ্যাপক সোমারফেল্ড এসেছিলেন এবং পদার্থবিদ্যার নবতর প্রগতির বিষয়ে ভাষণ দিয়েছিলেন তখন এই ছাত্রটির বৈদগ্ধ্যের পরিচয় আমরা পেয়েছি। এই বক্তৃতার তিনি যে নোট নিয়েছিলেন, পরে সেগুলি প্রকাশনার ক্ষেত্রে অধ্যাপক ঐ নোটকে অত্যন্ত উপযোগী এবং মূল্যবান ভেবেছিলেন। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে তাঁর কাজ চলতে লাগল এবং ওখানকার স্বল্প পরিসরেই সেই রহস্যময় বর্ণের সমস্যা নিয়ে কাজ করতে করতে রামন আন্দাজ করলেন যে, কেবল বর্ণের বিক্ষিপ্ততা নয়, তরঙ্গের প্রকৃতিরও পরিবর্তন হতে পারে। তিনি নানান জনকে এই সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছিলেন। উদাহরণ দিলে অনেক উজ্জ্বল ব্যক্তিদের কথা বলতে হয়, যাঁরা এই সমস্যার উপর কাজ করেছিলেন কিন্তু সমাধানে পৌঁছতে পারেন নি। শেষে তিনি লক্ষ্য করলেন যে, তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন ঘটছে। কিন্তু যথার্থ কি যে ঘটছিল—যে কোন কারণে হোক তা সম্যক বুঝে উঠতে পারছিলেন না। এ বিষয়ে প্রকাশিত প্রথম নিবন্ধটিতে এই পরিবর্তনের বিষয়টি বেশ অস্পষ্ট ছিল। কম্পটন-এফেক্টের (Compton effect) মত একটি কথা তিনি বলেছিলেন। 'কম্পটন-এফেক্ট' তখন সবেমাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। অতিবেগুনি রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিবর্তনের বিষয়টিও তখন জানা গেছে। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের ঐ সামান্য যন্ত্রপাতি এবং ঐ সাধারণ Spectrograph যন্ত্রটি, (যেখানে এক-শ' ঘণ্টারও বেশী সময় ধরে কাজ চলেছিল), তার উপর নির্ভর করে 'রামন-এফেক্ট' যে শেষ পর্যন্ত আবিষ্কারের সাফল্য অর্জন করল তার পিছনে ছিল কেবলমাত্র তাঁর সযত্নলালিত পরিশ্রম। এর সঙ্গে কৃষ্ণান নিরলসভাবে পরিশ্রম করেছিলেন। নিজের প্রতি তাঁর কোন মনোযোগ ছিল না। অবিরাম কাজ এবং ক্রমাগত অতিবেগুনি রশ্মির বিচ্ছুরণের ফলে তাঁর চোখ দুটো প্রায় নষ্ট হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। যাই হোক, অবশেষে তা ভারতবর্ষের জন্য বয়ে আনল খ্যাতি। 'রামন-এফেক্ট' আবিষ্কৃত হলো এবং স্যার সি. ভি. রামন এত উৎসাহী এবং উদ্যমী হয়ে পড়লেন যে, যখন যেখানে নতুন কিছুর সন্ধান পেতেন—নানান সমস্যার আলোয় তাকে দেখতে শুরু করলেন। সমস্ত সুযোগ-সুবিধা কেন্দ্রীভূত করে সে সম্পর্কে কাজ করতে লাগলেন এবং গবেষণাগুলিতে কৃতকার্য হতে লাগলেন। এই সময় সর্বদা সাথে থাকতেন কৃষ্ণান—সব সময় কর্মে অবিচল।

অবশ্য কেউ কেউ মনে করতেন যে এটাকে 'রামন-কৃষ্ণান প্রভাব' বলা উচিত। কিন্তু যুগ্ম-নাম শুনলে রামন নিজে অত্যন্ত চটে যেতেন। কিছু বিদেশী এই বিষয়টাকে 'রামন-স্মেকাল এফেক্ট' বলে চালাতে চাইলেন। জার্মানরা মনে করল যে, স্মেকাল সমবিষয়ে এই ধরণের ঘটনার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু তিনি হাতে-কলমে কোন কাজ করেন নি। রামনের এ বিষয়ে প্রথম কাজও পরমাণুর উপর নয়—অণুর উপর। যাই হোক, জার্মানরা এ বিষয়টাকে 'রামন-স্মেকাল প্রভাব' বলে চালিয়ে যেতে লাগলেন। এতে রামন বেশী বেশী করে চটে গেলেন। অতএব 'রামন-এফেক্ট' ছাড়া অন্য কোন নামে আর ডাকার উপায় রইল না। রাশিয়ানরা আবার বলতে শুরু করলেন যে, ক্যাণ্ডস্‌বার্গ এবং ম্যাণ্ডেল্‌স্টামই সর্বপ্রথম এই প্রভাব লক্ষ্য করেছিলেন। আমার মনে হয়, তাঁরা এ ধরণের একটা দাবী করেছিলেন যে, উক্ত প্রভাব কঠিন পদার্থেও তাঁরা পর্যবেক্ষণ করেছেন। কিন্তু রামন এবং তাঁর ছাত্রকুল প্রচণ্ড উৎসাহে সমগ্র পৃথিবীকে বোঝাতে সমর্থ হয়েছিলেন যে, তাঁদের পরিলক্ষিত প্রভাব সম্পূর্ণ নতুন ধরনের—যা এতদিন পর্যন্ত অজ্ঞাত—যা কিনা স্টোক্‌স্ কিংবা র‍্যালে কারোর চিন্তায় ধরা পড়ে নি এবং এ বিষয়ে যথেষ্ট পরিষ্কার প্রমাণ আছে। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে অতি সাধারণ যন্ত্রাদির সাহায্যে শত শত পরীক্ষাই সম্পন্ন করা হয়েছে। সযত্নে রাখা পরিত্যক্ত পুরোনো যন্ত্রই হোক বা বিজ্ঞান কলেজে স্নাতকোত্তর শিক্ষার জন্য আনা নতুন যন্ত্রপাতি হোক, স্যার সি. ভি. রামন এই জিনিষটা প্রমাণ করেছিলেন যে, নতুন যন্ত্রপাতির প্রয়োজনীয়তা থাকলেও যদি কেউ অদম্যভাবে সমস্যা সমাধানের জন্য আন্তরিক চেষ্টা করে, তাহলে অসামান্য প্রচেষ্টায় সাধারণ যন্ত্রপাতি দিয়েই তা সম্ভব হতে পারে। বিদেশ থেকে কখন যন্ত্র আসবে তার জন্য হা-পিত্যেস করে বসে থাকতে হবে না, যদি তুমি প্রকৃতই উদ্বিগ্ন হও, তাহলে তা করতে পারো। রামন এবং কৃষ্ণান এভাবেই একসঙ্গে কাজ করেছিলেন। কিছুকাল পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সদ্য প্রতিষ্ঠিত পদার্থবিদ্যা বিভাগে যখন রীডার পদের প্রয়োজনীয়তা দেখা গেল, রামন কৃষ্ণানকে তাঁর ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে সর্বোত্তম বলে সুপারিশ করলেন এবং কৃষ্ণানকে সেখানে নেওয়া হলো।

কৃষ্ণান আসলেন এবং কয়েক মাস ধরে ভাবলেন যে,

রামন-প্রভাবের উপরই কাজকর্ম করা যাক, কিন্তু পরে সে চিন্তা ত্যাগ করলেন। তখন তিনি একটু নতুন সমস্যায় হাত দিলেন যে বিষয়ে তিনি তাঁর স্বাক্ষর রেখে গেছেন। চুম্বকীয় অসদৃশতার (asymetric) পরিমাপ এবং স্ফটিকের (crystal) বিষয়ে তাঁর ছাত্ররাও বিষয়টিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। গতকাল এখানে তাঁর অন্যতম ছাত্র এবিষয়ে কিছু আলোকপাত করছিলেন। তবে আপনাদের মনে থাকা উচিত, যে, তারা নতুন প্রণালীর সাহায্যে নতুন জিনিষ উদ্ভাবন করলেও বিদেশ থেকে তাঁদের দ্রাবক যন্ত্র (liquefier) ইত্যাদি আনতে হয়েছিল।

প্রথম পরিমাপক যন্ত্রটি মোটা সুতো (course fibre) দিয়ে তৈরি ছিল। সাধারণ কিছু যন্ত্রপাতি দিয়ে পরিমাপ করা হয়েছিল। সেই পরীক্ষা আর একবার প্রমাণ করল যে, সত্যি যদি তোমার সমস্যা থাকে এবং সমাধান চাও, তাহলে একটা চমকপ্রদ সূচনা করার জন্য তুমি কোন না কোন পথের সন্ধান পেয়ে যাবে। অবশ্য এমন কথা আমি বোঝাতে চাই না বা বলতে চাই না যে, এগুলি অপ্রয়োজনীয়। অথবা সাহায্য এবং অনুদানের ব্যাপারে আমি সরকারকে বিরত করতে চাই না। কিন্তু যে কথা আমি বলতে চাই তা হল: এই ধরনের সাহায্য দান শুরু হওয়ার আগে দেশে যে পরিমাণের সুযোগ সুবিধা বর্তমান ছিল, তার দ্বারা অনেকে দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ পেয়েছেন। তখনকার দিনে কেবল একান্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদিই বাইরের থেকে আনা হত।

বর্তমানে শিল্পে অগ্রগতি ইত্যাদির কারণে বিদেশ থেকে যন্ত্রাদি আমদানীর গুরুত্ব ক্রমে দ্বিতীয় শ্রেণীর। কারণ ইতিমধ্যেই বিশাল সংখ্যক প্রযুক্তিবিদ দেশেই শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছেন।

আমাদের ছাত্রাবস্থায়, মনে আছে, অধ্যাপকরা তাঁদের যন্ত্র-নির্মাতা কারিগরদের অতীব মূল্যবান সম্পদ হিসেবে জ্ঞান করতেন। যেমন ধরুন, স্যার জে. সি. বোসের একজন অত্যন্ত কুশলী কারিগর ছিলেন। তিনি খুব সূক্ষ্ম ও চমৎকার কাজ করতে পারতেন। যেহেতু স্যার সি. ভি. রামন তাঁর ও অন্য দু-একজনের প্রতি একটু ঈর্ষান্বিত দৃষ্টি দিয়েছিলেন, তিনি তো চটে লাল। অতঃপর, যিনি একটু বেশী ভাতা ইত্যাদির লোভে স্বেচ্ছায় ওখানকার চাকরী ছেড়ে দিয়ে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে যোগ দিয়েছিলেন, শুধু তাকে নিয়েই স্যার সি. ভি. রামনকে তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। কিন্তু জে. সি. বোস এই ঘটনা ভুলতে পারেন নি। ক্ষমাও করতে পারেন নি।

আমি এখন এই সোজা সরল ছোট্ট গল্পগুলি বলছি শুধুমাত্র এ কথাই মনে করিয়ে দেবার জন্য যে প্রায় সত্তর-আশি বছর আগে আমাদের দেশে এইরকম কারিগরদেরও খুব অভাব ছিল। দু-একজন এধরনের লোককে গবেষণাগারে নিজেদের অধীনে রাখবার জন্যে আমরা দস্তুরমত ঝগড়া করতাম। এখন বাজারে প্রযুক্তিবিদ্‌দের প্রাচুর্য এবং তাঁদের যোগ্য চাকরী দেবার ব্যাপারটা এখন সমস্যায় পর্যবসিত হয়েছে। অতএব এখন বর্তমান সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার করে কেউ যদি কোন সমস্যা সমাধানে ব্রতী হন, তাহলে এযাবৎ হাজার হাজার শিক্ষণপ্রাপ্ত প্রযুক্তিবিদ্‌দের সেই কাজে সঠিকভাবে প্রয়োগ করলে দেশের অনেক সমস্যার সমাধান হবে।

আমি এসব কথা বলছি সেই সব মহান ব্যক্তিত্বের স্মরণ করার জন্য, যাঁরা আমাদের দেশে বিজ্ঞানের শুভসূচনার প্রত্যুষের দিনগুলিতে অত্যন্ত ক্ষুদ্র সামর্থ নিয়ে তাঁদের জীবন শুরু করেছিলেন। তাঁদের হাতে রসদ ছিল অতি সামান্য কিন্তু কল্পনাশক্তি ছিল প্রবল। নব উন্মেষশালিনী এই প্রতিভাধরদের ছিল অদম্য ধৈর্য্য, যাঁরা নিজেরাই নিজেদের সমস্যার সমাধান করতেন। দৃঢ় পায়ে সামনের লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হবার জন্যে তরুণদের উৎসাহ দিতেন এবং বিজ্ঞানের উদাহরণ হিসেবে নিজেদের উপস্থিত করতেন ছাত্রদের সামনে।

মানচিত্রে ভারতবর্ষের স্থান এঁদের দ্বারাই অঙ্কিত হয়েছে। বন্ধুগণ, আমি অনেকক্ষণ অনেক কথা বললাম। যেহেতু আমি কৃষ্ণান স্মৃতি বক্তৃতা দিতে এসেছি—কে. এস. কৃষ্ণানের তৎকালীন যথার্থ ছবিটা তুলে ধরার জন্য এই কথাগুলি বললাম—যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে অনাড়ম্বরভাবে শুরু করেছিলেন তাঁর অন্বেষণ—যিনি ভালবাসতেন ছাত্রদের, ছাত্রমণ্ডল পরিবৃত্ত হয়ে জীবনযাপন করতেন একজন ভারতীয় গুরুর মত। সেখানে কৃষ্ণান শুধু এগিয়েই যান নি, তিনি সমস্যা সমাধান করেছেন—নতুনতর সমস্যা খুঁজে পেয়েছেন। এই ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরির তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। আজ এখানে আমরা সমবেত হয়েছি। কিন্তু সারা ভারতবর্ষে তাঁর ছাত্ররা ছড়িয়ে আছে। তাঁর নিজের ছাত্ররা যাঁরা কাজ পেয়েছিলেন—কাজ করেছিলেন। তাঁরা সমস্যার গভীরে যেতে পেরেছিলেন। শিক্ষকের দ্বারা কমবেশি অনুপ্রাণিত হয়ে এঁরা দেশকে উপহার দিয়েছেন গবেষণালব্ধ কিছু মূল্যবান সম্পদ—আর দিয়েছেন ভারতের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু মানুষ ও পথনির্দেশ। তাঁদের নিয়েই সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল গবেষণাগারের পর গবেষণাগার। সেইসব জায়গায় তরুণেরা শিক্ষাপ্রাপ্ত হবার পর সমস্যা নিরসনের জন্য বিভিন্ন স্থানে নিযুক্ত হয়ে চলেছেন।

আমাদের নানান সমস্যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—সারা জুড়ে আমরা যেন চারিত্রিক ঘূর্ণাবর্তে পড়েছি—কেন না আমরা শুভারম্ভে যথেষ্ট ভাল সূচনা করতে পেরেছিলাম কিন্তু যে কোন কারণেই হোক শেষ করছি তৃতীয় শ্রেণীর মত যদিও আমরা এইসব মেধাবী তরুণদের তৈরি করতে পেরেছি কিন্তু একই সময়ে গবেষণা এবং শিল্পের অগ্রগতিতে আশানুরূপ ফললাভে ব্যর্থ হয়েছি। কিন্তু কেন? যদি আমাদের তরুণ বয়সের দিনগুলির কথা ধরি, তখন অনেকে

কতকগুলি কারণ দেখাতেন—আঙুল দেখাতেন জাপানের দিকে। তখন একটা গান প্রচলিত ছিল যে, ঐ অর্ধসভ্য জাতিও স্বাধীনতার বড়াই করতে পারত কিন্তু আমাদের তাও ছিল না ইত্যাদি। হেমচন্দ্র সম্পর্কে, উৎসর্গ করা সেই গান। যা হোক, জাপানীরা পাশ্চাত্য প্রথা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন এবং দূরদর্শী কিছু দেশনায়ক বিদেশ থেকে জ্ঞান আহরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ফল: শ'খানেক বছরের মধ্যে বিজ্ঞানের ইতিহাসে জাপান সম্মানজনক আসন লাভ করল। বিগত যুদ্ধে জাপান বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল, আগ্রাসীর পদতলে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কেবলমাত্র নিজেদের প্রচেষ্টায় আজ জগৎ সভায় অন্যতম শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে এবং প্রথম সারির উৎকর্ষ অর্জন করেছে।

হ্যাঁ, অনেক সময় আমি ভারতবর্ষের কথা ভাবি—যে ভারতবর্ষ প্রায়ই অনেকের আগে দূরবর্তী জিনিষটা দেখতে পেত—যে ভারতবর্ষের মানুষের কাছে অনেক দেশের আগেই সূর্যোদয় প্রতিভাত হয়েছে। কিন্তু সেই ভারতবর্ষ কেন তার পূর্বসূরীদের দর্শনের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হচ্ছে? কেনই বা ভারতবর্ষ পূর্বেকার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে পারছে না এবং একটি সম্মানজনক স্থান রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে?

আমি এইসব প্রশ্নগুলো রেখে যাচ্ছি ইতিহাসের কাছে, রেখে যাচ্ছি নতুন প্রজন্মের তরুণদের কাছে—যাঁরা মনে করেন এই সমস্ত ভগ্ন বৃদ্ধদের কাছে আর কিছু পাওয়ার নেই। বাংলায় এখন বিশেষ করে একটা কথা শোনা যাচ্ছে—প্রজন্মের ফাঁক। হ্যাঁ—ফাঁক আছে, এটা অস্বীকার করে কোন লাভ নেই এবং এটা একটা চ্যালেঞ্জ। ভারতীয় প্রতিভাদের কাছে পরম্পরায় এই চ্যালেঞ্জটা রয়ে গেছে; এত জনবল, এত প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যে বলীয়ান আমরা। বিজ্ঞানের ইতিহাসে আমাদের রয়েছে একটা চমৎকার ঐতিহ্য। তবু দেশটা কেন আজও তৃতীয় শ্রেণীর রয়ে যাচ্ছে? তরুণ বন্ধুদের কাছে এই প্রশ্নগুলি রেখে আজ আমি এখানেই শেষ করছি।

রহস্যময় তারাজগৎ

সলিলকুমার চক্রবর্তী*

'আজি যত তারা তব আকাশে
আমার মন প্রাণ ভরি প্রকাশে"—

এ শুধু কবির বাণী নয়। নির্মল আকাশের নিঃসীম নীলিমায় অগণিত রূপালী জ্যোতিষ্কের উজ্জ্বল উপস্থিতি, যুগ যুগ ধরে অনুপ্রাণিত করেছে বিজ্ঞানীদেরও। দূর দূরান্তের তারকাদের মিটিমিটি হাসির মাঝেই যে ব্রহ্মাণ্ডের অপার রহস্য লুকিয়ে আছে, বিজ্ঞানীদের এ অনুমানও অনেক দিনের। মহাকাশের স্তব্ধ নীল যবনিকাখানি উন্মোচনের প্রচেষ্টাও চলে আসছে তাই স্মরণাতীত কাল থেকে। বিজ্ঞানের সকল শাখার মধ্যে জ্যোতির্বিদ্যাই (Astronomy) বোধ করি প্রাচীনতম।

মহাকাল অনাদি অনন্ত। তবু, আলোচনার সুবিধার জন্য মহাকাশের বিশেষ অংশকে বিজ্ঞানীরা বিশেষ ভাবে নামাঙ্কিত করেছেন। সে অনুসারে সমগ্র মহাকাশ তিন ভাগে বিভক্ত। যথা,—

1. অন্তর্গ্রহ মহাকাশ (Interplanetory space)।
2. আন্তর্নক্ষত্র মহাকাশ (Interstelter space)।
3. আন্তর্ব্রহ্মাণ্ড মহাকাশ (Intergalactic space)।

আন্তর্গ্রহ মহাকাশের একচ্ছত্র অধিপতি হচ্ছে সূর্য। সূর্যকে নাভিকেন্দ্রে (focus) রেখে, তার চারধারে বিভিন্ন উপবৃত্তাকার কক্ষপথে অবিরাম ঘুরে চলেছে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো,—এই নয়টি গ্রহ, প্রায় একলক্ষের কাছাকাছি সংখ্যক গ্রহাণু, (asteroids) অসংখ্য উল্কাপিণ্ড (meteors) এবং অগণিত ধূমকেতু (comets)। গ্রহগুলোর চারপাশে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরে চলেছে উপগ্রহ সমূহ। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত উপগ্রহের মোট সংখ্যা 35।

আন্তগ্র্হ মহাকাশের বর্তমান বিস্তার সূর্য থেকে দূরতম গ্রহ প্লুটোর দূরত্বের দ্বিগুণ অর্থাৎ প্রায় 750 কোটি মাইল। তবে প্লুটোর চেয়ে দূরতর কোন গ্রহ আবিষ্কৃত হলে ভবিষ্যতে এ বিস্তার আরও বাড়তে পারে।

আন্তর্গ্রহ মহাকাশের যেখানে সমাপ্তি সেখান থেকেই শুরু হচ্ছে তারকাদের রাজ্য—আন্তর্নক্ষত্র মহাকাশ। জ্যোতির্বিজ্ঞানী দের মতে নক্ষত্র বা তারকারাই হচ্ছে মহাকাশের অধিবাসী। ভর, শক্তি, পরিদৃষ্ট সংখ্যা, সব ব্যাপারেই তারারা যেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। গ্রহ, গ্রহাণু, উপগ্রহ, উল্কা, ধূমকেতু প্রভৃতি আর যা কিছু আছে মহাকাশে, সব যেন 'দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক।'

সাধারণভাবে তারকারা সব আমাদের সূর্যের মতো নিজস্ব আলোয় উজ্জ্বল এবং গ্যাস ও প্লাজমা (পদার্থের চতুর্থ অবস্থা) দ্বারা গঠিত। সাধারণ বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে এবং ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সাক্ষ্যপ্রমাণকেই চূড়ান্ত বলে মেনে নিয়ে আমরা সূর্যকে অনন্যসাধারণ, একান্ত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত মনে করলেও, বিজ্ঞানীদের কাছে সূর্য একটা মাঝারি গোছের তারা বই কিছু নয়।

তবে, অন্যান্য তারার তুলনায় সূর্য পৃথিবীর অনেক কাছে, (মাত্র 9 কোটি 33 লক্ষ মাইল দূরে) অবস্থিত বলেই তাকে এত বড় দেখায়। তাছাড়া, সূর্যের সঙ্গে আমাদের পৃথিবীর এক বিশেষ সম্পর্কের বন্ধন আছে যা অন্য কোন তারার সঙ্গে নেই। মহাকাশে এমন অনেক তারা আছে যাদের তুলনায় আয়তন, উত্তাপ ও ঔজ্জ্বল্যের বিচারে সূর্য নেহাতই নগণ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ,—সূর্যের ব্যাস যখন 8 লক্ষ 65 হাজার মাইল, তখন এপসাইলন অরিগি (Epsilon Aurigae) নামক তারাটির ব্যাস প্রায় তার 3000 গুণ। অর্থাৎ শেষোক্ত তারার আয়তন, সূর্যের আয়তনের 2700 কোটি গুণ। সূর্যের বাইরের দিকের তাপমাত্রা প্রায় 6000 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ; আর শীতের আকাশের অতি সুপরিচিত কালপুরুষ (Orion) মণ্ডলের অন্তর্গত মৃগশিরা (Meissa) নামক তারাটির বাইরের দিকের তাপমাত্রা প্রায় 35,000 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। ঐ কালপুরুষ মণ্ডলের অপর একটা তারা বাণরাজ (Rigel)-এর ঔজ্জ্বল্য সূর্যের ঔজ্জ্বল্যের প্রায় 21000 গুণ। সূর্যের নিকটতম প্রতিবেশী তারার নাম প্রক্সিমা সেনচুরি (Proxima Genturi) পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব প্রায় 25 লক্ষ কোটি মাইল। আলোর গতিবেগ সেকেণ্ডে 1 লক্ষ 86 হাজার মাইল ধরে হিসাব করলে সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো পৌঁছতে সময় লাগবে 8 মিনিট 20 সেকেণ্ড আর ঐ তারাটি থেকে আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে সময় নেবে 4 বছর 4 মাস।

সূর্যের পক্ষে মর্যাদা হানিকর অনেক তথ্য বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেও একথা সত্যি যে, মহাকাশের অনন্ত শূন্যতার মাঝে সূর্য বিচ্ছিন্ন বা নিঃসঙ্গ নয়, সে গ্রহ-উপগ্রহাদি অসংখ্য জ্যোতিষ্ক গঠিত একটা বৃহৎ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এবং নিজেই সেই পরিবারের একচ্ছত্র সম্রাট। এই পরিবারটির নাম সৌরজগৎ। অন্য কোন তারকার সঙ্গে সৌরজগতের মত কোন 'তারাজগৎ' সংযুক্ত আছে কিনা সে প্রশ্নটি এখনও বিতর্কমূলক। এ ব্যাপারে নানা মুনির নানা মত। বিজ্ঞানী জেমস জীনস্ (James Jeans) ও তাঁর অনুগামীদের মতানুযায়ী এক মহাজাগতিক দুর্ঘটনার ফলে বৃহৎ এক তারা এবং তার চূর্ণীকৃত অংশসমূহ নিয়েই সৌরজগতের উৎপত্তি। এ রকম দুর্ঘটনা কদাচিৎ ঘটা সম্ভব। কাজেই অন্য কোন তারার সঙ্গে সংযুক্ত তারা জগতের অস্তিত্ব না থাকার সম্ভাবনাই বেশী। পক্ষান্তরে জ্যোতির্বিজ্ঞানী পিটার ভ্যান ডি ক্যাম্প (Peter Van de Kamp) এবং তাঁর সহকর্মীরা দাবী করেছেন যে অফিউকাস (Ophiucus) মণ্ডলের অন্তর্গত 'বার্নার্ডের তারা' নামক

* ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক, দমদম ক্যান্টনমেন্ট

তারাটির চারপাশে ঘূর্ণমান দুটি উপগ্রহ আছে এবং তাদের প্রত্যেকটির আয়তন, সৌরজগতের সর্ববৃহৎ গ্রহ বৃহস্পতির আয়তনের কাছাকাছি। এপ্‌সাইলন্ অরিগি এবং সিগ্‌মা—61 (Sigma-61) তারা সম্পর্কেও অনুরূপ দাবী আছে।

পৃথিবীর কোন এক স্থান থেকে খালি চোখে দেখতে পাওয়া যায় 2 থেকে 3 হাজার তারা সারা বছর ধরে সমস্ত জায়গা থেকে যত তারা দেখতে পাওয়া যায় তাদের সংখ্যা হবে সর্বাধিক 7 থেকে 8 হাজার। আর শক্তিশালী দূরবীণের সাহায্যে দৃশ্যমান তারা সমূহের সর্বোচ্চ সংখ্যা বিজ্ঞানীদের মতে 10 কোটির কাছাকাছি। আমাদের অনুভূতির সীমাবদ্ধতার দরুণ সরাসরিভাবে তার চেয়ে বেশী সংখ্যক তারা দেখা সম্ভব নয়, তা সে দূরবীণ যত শক্তিশালীই হোক কিন্তু তাত্ত্বিক গণনার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আন্তর্নক্ষত্র মহাকাশে তারকার মোট সংখ্যা হবে 10 হাজার কোটি।

দীর্ঘকাল ধরেই বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে মহাকাশে তারকাদের বিন্যাস বা বণ্টন সুসম। মহাকাশের ভিন্ন ভিন্ন দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে তারাদের ঘনত্বের কিছু কিছু হেরফের থাকলেও, বিশাল পরিপ্রেক্ষিতে তা মোটামুটি সমান। বিজ্ঞানীদের সে ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুযায়ী মহাকাশ সুসম তারা অধ্যুসিত নয়। মহাকাশের স্থানে স্থানে তারকারা আছে জোটবদ্ধ হয়ে। কোথাও জোটছাড়া নয়। জোটের মধ্যে অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে তারাদের ভিড় কিন্তু জোটের বাইরে বৃহত্তর এলাকা হচ্ছে ফাঁকা। একটা জোটের অন্তর্গত দুটি পাশাপাশি তারার মধ্যবর্তী ব্যবধান যেখানে 4 থেকে 5 আলোকবর্ষ, (1 আলোকবর্ষ $=588\times10^{10}$ মাইল) সেখানে দুটি পাশাপাশি তারকা জোটের ব্যবধান লক্ষ লক্ষ আলোকবর্ষ। ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণ কয়েকটি তারকাজোটের নামকরণ করেছেন তাদের আপাত আকৃতি লক্ষ্য করে। তাঁদের ভাষায় এক একটা নক্ষত্র জোটের নাম এক একটা রাশি (একরাশ তারা থেকে কথাটার উৎপত্তি)। মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট প্রভৃতি রাশিগুলিই হলো এক একটা তারকা জোটের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

তারকার শ্রেণীবিভাগ—প্রায় দু-হাজার বছর আগে বিখ্যাত গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিপারকাস্ (Hipparchus) খালি চোখে অসংখ্য তারকা পর্যবেক্ষণ করে ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য অনুসারে তাদের মোট 6টি শ্রেণীতে ভাগ করেন এবং সর্বপ্রথমে তিনিই তারকা-মানচিত্র (steller map) প্রস্তুত করেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে উন্নতমানের দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করে দেখা গেলো যে দুটি ক্রমিক শ্রেণীর তারকার ঔজ্জ্বল্যের অনুপাত (2·512)। এই হিসাব অনুযায়ী প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত একটা তারার ঔজ্জ্বল্য ষষ্ঠ শ্রেণীভুক্ত একটা তারার ঔজ্জ্বল্যের প্রায় 100 গুণ। আধুনিক কালে আরও অনুজ্জ্বল তারাদের দেখা সম্ভব হয়েছে এবং তারকাদের শ্রেণী বাড়তে বাড়তে 22তম শ্রেণীতে পৌছেছে। আশা করা যায় আগামী কয়েক দশকের মধ্যেই এই সংখ্যা 28তম শ্রেণীতে পৌছবে এবং তার ফলে সূর্যের ঔজ্জ্বল্যের 10^{22} ভাগের একভাগ ঔজ্জ্বল্যসম্পন্ন তারাকদেরও দেখা সম্ভব হবে।

তারকার ভৌতধর্ম—বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রে তারকাদের আলো বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে তারকাপৃষ্ঠ অনেকটা আদর্শ কৃষ্ণ বস্তুর (perfect black body) ন্যায় সবরকম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট নিরবচ্ছিন্ন বর্ণালী (continuous spectrum) উৎপন্ন করে। তার মাঝে মাঝে থাকে অন্ধকার রেখা সমূহ যাদের বলা হয় ফ্রানহফার রেখা (Fraunhaffer lines)। এ থেকে প্রমাণ করা গেছে যে পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রাপ্ত মোট 103টি মৌলিক পদার্থের সবকয়টিই তারকাপৃষ্ঠে উপস্থিত আছে।

সব তারার বর্ণালী একরকম নয়। তারার আলোর বর্ণালী সমূহকে মোট সাত ভাগে ভাগ করে তাদের যথাক্রমে O, B, A, F, G, K, এবং M এই সাতটা অক্ষর দিয়ে সূচিত করা হয়। নীচের তালিকায় এই সাত শ্রেণীর বর্ণালীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো।

সারণি—1

বর্ণালী শ্রেণী	তারকার বর্ণ	শ্রেণীভুক্ত তারকার নাম	তারকার ভর সৌরভর এককে	তাপমাত্রা ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড
O	গাঢ় নীল	থিটা		
		অরিয়নিস	40	35,000
B	ফিকে নীল	চিত্রা	15	20,000
A	সাদা	সিরিয়াস্	2·3	9,500
F	সবুজ	প্রকিয়ন	1·4	7,000
G	হলুদ	সূর্য	1·0	5,800
K	কমলা	সিগমা		
		এরিদানি	0·7	4,500
M	লাল	ক্রুগের	0·3	3,500

কোন তারার রং নির্ভর করে তার উপরিপৃষ্ঠের তাপমাত্রার উপর। ভিন্‌সের অপসরণ সূত্র (Wine's Displacement Law) থেকে এ সিদ্ধান্তের সমর্থন মেলে। আগে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে তারকাদের রাসায়নিক উপাদানের তারতম্যই হচ্ছে বর্ণালীর প্রকারভেদের কারণ। 1922 খৃস্টাব্দের বিখ্যাত ভারতীয় বিজ্ঞানী ডক্টর মেঘনাদ সাহা পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ যে তারকাদের রাসায়নিক উপাদান মোটামুটি এক। উপরিপৃষ্ঠের তাপমাত্রার পার্থক্যই তাদের বর্ণালীর প্রকারভেদের কারণ।

বিজ্ঞানী সাহা প্রদত্ত আয়নীভবন তত্ত্বের (Theory of Ionisation) সাহায্যে অসংখ্য তারকাপৃষ্ঠের তাপমাত্রা পরিমাপ করা সম্ভব হয়েছে।

কোন তারার উপরিপৃষ্ঠের তাপমাত্রা সঠিকভাবে নির্ণয়ের পর বিজ্ঞানী H. N. Russel এবং তাঁর সহকারীবৃন্দের দেওয়া সূত্রের সাহায্যে তারকার উপাদানসমূহের শতকরা পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। অধিকাংশ তারকায় উপস্থিত পদার্থের 80 ভাগই হাইড্রোজেন, শতকরা 19·6 ভাগ হিলিয়াম, আর বাকী শতকরা 0·4 ভাগ হচ্ছে অন্যান্য উপাদানসমূহ।

বেশীর ভাগ তারার ব্যাসার্ধ সূর্যের ব্যাসার্ধের 10 ভাগের একভাগ থেকে শুরু করে, সূর্যের ব্যাসার্ধের 20 গুণ পর্যন্ত হয়ে থাকে। এদের বলা হয় ক্ষুদে তারা বা বামন (dwarf)। নিঃসন্দেহে আমাদের সূর্য একটা বামন পর্যায়ের তারা। যে সব তারার ব্যাসার্ধ সূর্যের ব্যাসার্ধের 50 গুণ থেকে শুরু করে 100 গুণ, তাদের বলে বৃহৎ তারা (giants) যেমন, ক্যাপেলা (Capella)। আর যে সব তারার ব্যাসার্ধ সূর্যের ব্যাসার্ধের 200 গুণ কিংবা তারও বেশী তাদের বলে অতি বৃহৎ তারা (super giants), উদাহরণ বেটেলগুজ (Betelguse)।

যে তারার ভর যত বেশী, তার উপরিপৃষ্ঠের তাপমাত্রা এবং তার ঔজ্জ্বল্যও তত বেশী। সবচেয়ে বেশী তাপমাত্রা যুক্ত 0 শ্রেণীভুক্ত এক একটা তারকার ভর সূর্যের ভরের প্রায় 50 গুণ।

পক্ষান্তরে, শীতলতম M শ্রেণীভুক্ত তারাদের ভর সূর্যের ভরের 10 ভাগের এক ভাগ। তারকাদের গড় ঘনত্ব প্রতি ঘনমিটারে 10 কিলোগ্রাম থেকে প্রতি ঘনমিটারে 5000 কি.গ্রা. পর্যন্ত হতে পারে।

তারকার জন্ম ও মৃত্যু—বিশ্বের অধিকাংশ বস্তুরই যেমন উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, তারকাদেরও তেমনি জন্ম ও মৃত্যু আছে। তারকাগুলির মধ্যবর্তী স্থানে মহাকাশ জুড়ে ভেসে আছে পদার্থের এক অতি সূক্ষ্ম হালকা বায়বীয় সত্তা। এর নাম আন্তর্নক্ষত্র বস্তু (intersteller matter)। সূর্যের ভরের একহাজার গুণ বা তার বেশী ভর-সম্পন্ন হলে, এই আন্তর্নক্ষত্র বস্তু আপন মহাকর্ষীয় আকর্ষণে ক্রমশঃ ঘনীভূত হতে থাকে। তখন সঙ্কোচনের দরুণ তার তাপমাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। একসময় প্রচণ্ড বিস্ফোরণে সেই মেঘসদৃশ বস্তু কতগুলি খণ্ডে চূর্ণীকৃত হয়। জন্ম নেয় কতগুলি তারকা। সেই তারাদের প্রত্যেকের সঙ্কোচন তখনও অব্যাহত থাকার ফলে এত প্রচণ্ড তাপ সৃষ্টি হয়, যে তারা প্রত্যেকেই আলোক বিকিরণ ক্ষমতাসম্পন্ন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কে পরিণত হয়। তাদের আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা যখন এক কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বা তারও বেশী হয়, তখন শুরু হয়ে যায় কেন্দ্রীন সংযোজন বিক্রিয়া (nuclear fussion reaction)। এর ফলে চারটি করে হাইড্রোজেন পরমাণু একত্রিত হয়ে উৎপন্ন করে এক একটা হিলিয়াম পরমাণু এবং সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হয় প্রচুর পরিমাণ শক্তি, যার সাহায্যে তারকারা কয়েক কোটি বছর ধরে তাপ ও আলোক বিকিরণে সক্ষম থাকতে পারে। এ অবস্থায় তারকাদের ব্যাসার্ধ থাকে অল্প। শতকরা নব্বই ভাগ তারকাই এই বামন পর্যায়ের অন্তর্গত।

এরপর, তারকা কেন্দ্রের সমস্ত হাইড্রোজেন যখন নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন তাদের কেন্দ্রভাগ সংকুচিত হতে থাকলেও, বহির্ভাগ স্ফীত হতে থাকে এবং তাদের উপরিপৃষ্ঠের তাপমাত্রা এবং ঔজ্জ্বল্যও হ্রাস পেতে থাকে। এর ফলে জন্ম নেয় বৃহৎ বা অতি বৃহৎ তারা। এদের আয়ুষ্কাল অপেক্ষাকৃত কম। অন্তর্ভাগের সংকোচন ও বহির্ভাগের প্রসারণ প্রক্রিয়াটি আরও কিছুকাল চলার পর অতি বৃহৎ তারকায় বিস্ফোরিত হয়। বহির্ভাগের পদার্থসমূহ চূর্ণীকৃত হয়ে মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে, আন্তর্নক্ষত্র পদার্থ হিসাবে। অবশিষ্ট কেন্দ্র ভাগটির দশা, আয়তনের তারতম্য অনুসারে নিম্নলিখিত তিন প্রকারের হতে পারে—

(1) মূল তারকাটির ভর, সৌরভরের দ্বিগুণ বা তার কাছাকাছি পর্যন্ত হলে, বিস্ফোরণের পর অবশিষ্ট কেন্দ্র ভাগটি হবে সৌর ভরের 0·12 গুণ ভর-সম্পন্ন ক্ষুদে তারা। আভ্যন্তরীণ জ্বালানী নিঃশেষিত হওয়ায়, তারকাটি ধীরে ধীরে শীতল হতে থাকবে। তার রং সাদা থেকে হলুদ, হলুদ থেকে লাল, এভাবে পরিবর্তিত হতে হতে একসময় কালোতে পরিণত হবে। তখন আর তার আলো বিকিরণের কোন ক্ষমতাই থাকবে না। হয়তো বা সেটা পরিণত হবে কোন গ্রহ, উপগ্রহ অথবা উল্কা পিণ্ডে।

(2) যদি মূল তারকাটির ভর সৌরভরের পাঁচগুণের কাছাকাছি হয়, তবে বিস্ফোরণের পর তার ভর হবে সৌরভরের প্রায় দ্বিগুণ। অথচ, তার ব্যাসার্ধ হবে খুব কম (10 কিলোমিটারের কাছাকাছি)। ফলে জন্ম নেবে অতি উচ্চ ঘনত্ব-সম্পন্ন নিউট্রন তারকা (neutron star)। নিউট্রন তারাদের চারপাশে সৃষ্টি হয় অতি উচ্চ প্রাবল্য (10^{12} গাউস) সম্পন্ন শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র। যদি তাদের চৌম্বক অক্ষ (magnetic axis) ঘূর্ণন অক্ষের (axis of rotation) সঙ্গে আনত থাকে, তবে, তারাগুলি থেকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর ঝলকে ঝলকে শক্তি নির্গত হতে থাকবে অদৃশ্য তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের আকারে। এরকম তারকার বৈজ্ঞানিক নাম পালসার (pulser)।

(3) যদি মূল তারকার ভর, সৌরভরের 5 গুণের বেশী হয়, তবে বিস্ফোরণের ধাক্কা এত প্রবল হয় যে, কেন্দ্রভাগটির সংকোচন চলতে থাকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত। কেন্দ্রটির ব্যাসার্ধ যত কমে, তার উপরিপৃষ্ঠের মাধ্যাকর্ষীয় ত্বরণ তত দ্রুত বৃদ্ধি পায়। শেষে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় যে উপরিপৃষ্ঠের তীব্র আকর্ষণের দরুণ এমনকি ফোটনের আকারেও কোন শক্তি তা থেকে নির্গত হতে পারে না। এরূপ বস্তুর নাম কৃষ্ণ গহ্বর (black hole)। যে কোন বস্তু তার দিকে অগ্রসর

(পরের অংশ 140 পৃষ্ঠায় দেখুন)

ভিক্টোরিয়া আমাজোনিকা—পৃথিবীর বৃহত্তম জলজ উদ্ভিদ

এণাক্ষী বিশ্বাস (রায়চৌধুরী)*

অনেকেরই জানা নেই বটগাছ প্রসিদ্ধ শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে কত রকমের বিচিত্র উদ্ভিদ রয়েছে। ভিক্টোরিয়া আমাজোনিকা তার মধ্যে অন্যতম। এই উদ্ভিদটির সুবৃহৎ পাতাগুলি পুকুরের শোভা বৃদ্ধি করে। যদিও বছরের সবসময় দেখতে পাওয়া যায় না। কারণ উদ্ভিদটি বর্ষজীবী। এই সুবৃহৎ উদ্ভিদটি নিমফিয়েসী গোত্রের অর্থাৎ পদ্মজাতীয় উদ্ভিদের অন্তর্গত। এর আদি বাসস্থান দক্ষিণ আমেরিকাতে। 1801 খৃস্টাব্দে উদ্ভিদবিজ্ঞানী হ্যানকে বলিভিয়াতে এই উদ্ভিদটিকে প্রথম আবিষ্কার করেন। অতঃপর 1820 খৃস্টাব্দে বনপ্ল্যাণ্ড আর্জেন্টিনাতে অবস্থিত করিয়েন্টসে দেখতে পান। 1832 খৃস্টাব্দে পোপেগ আমাজন নদীতে এই অতিকায় জলজ উদ্ভিদটি দেখতে পান এবং নামকরণ করেন ইউরাইল আমাজোনিকা। অতঃপর 1836 খৃস্টাব্দে স্যার রবার্ট এইচ সোমবার্ক বৃটিশ গিয়েনার বারবিস নদীতে দেখতে পান। তিনিই এই উদ্ভিদটির একটি নমুনা সংগ্রহ করে ইংল্যাণ্ডে উদ্ভিদবিজ্ঞানী ডঃ লিণ্ডলের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি উদ্ভিদটি বর্ণনা করেন ও লণ্ডনের কিউ গার্ডেনে চাষ করার চেষ্টা করেন। দীর্ঘ বার বছর চেষ্টার পর অবশেষে সাফল্য লাভ করলেন। ভিক্টোরিয়া আমাজোনিকার ইতিহাসে 1849 খৃস্টাব্দটি স্মরণীয় বছর। এই বছরেই লণ্ডনের কিউ গার্ডেনে প্রথম ফুলটি প্রস্ফুটিত হয়, ব্যাসে প্রায় 15 ইঞ্চি, মহাসমারোহে মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে উপহার দেওয়া হয়। আর তাঁরই সম্মানার্থে এই অভিজাত উদ্ভিদটির নামকরণ হয় ভিক্টোরিয়া আমাজোনিকা বা ভিক্টোরিয়া রিজিয়া।

জলাশয়গুলিতে পাতাগুলি সুবৃহৎ থালার মত দেখতে লাগে। সেজন্য দক্ষিণ আমেরিকাতে চলিত ভাষায় ওয়াটার প্লেটার বলে। তাছাড়া এখানকার অধিবাসীরা এই উদ্ভিদটির বীজ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে সেজন্য আর একটি জনপ্রিয় নাম ওয়াটার কর্ণ।

(139 পৃষ্ঠার পরের অংশ)

হলেই প্রবল মাধ্যাকর্ষীয় আকর্ষণের দরুণ তা কৃষ্ণ গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবে চিরকালের মতো।

পৃথিবীর বিভিন্ন মানমন্দিরে শক্তিশালী দূরবীণে চোখ লাগিয়ে রাতের পর রাত অতন্দ্র প্রহরীর মতো সজাগ আছেন বিশ্বের বিজ্ঞানীকুল। তারকারাজ্যের অনেক রহস্য আজও জানা বাকি। যে কোন মুহূর্তে, পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে চাঞ্চল্যকর সংবাদ পৌঁছতে পারে। নতুন করে ভাবনা-চিন্তা শুরু হবে আবার। আকাশের কুলবালা রূপসী নক্ষত্রমালার অনেক অজানা তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ায় ব্রহ্মাণ্ডের রহস্যও হয়তো জানা যাবে।

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ইংরেজদের রাজত্বকাল চলেছে। তখন লণ্ডনের কিউ গার্ডেনে সাফল্যের পর 1851 খৃস্টাব্দে 9ই সেপ্টেম্বর ডঃ ওয়ালিচ ইংল্যাণ্ড থেকে এই উদ্ভিদটির বীজ কলিকাতায় উদ্যানের জন্য প্রেরণ করেন। 6ই নভেম্বর বীজ বপন করা হয়। 1853 খৃস্টাব্দের 13ই মে অঙ্কুরোদগম হয়। তারপর উদ্যানে দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির পর 1923 খৃস্টাব্দে ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে ডঃ সি. সি. ক্যাল্ডারের তত্ত্বাবধানে উদ্ভিদটির নতুনভাবে চাষ করার চেষ্টা করা হয় এবং কয়েক বছর উদ্যানের জলাশয়গুলি অপূর্ব সুষমামণ্ডিত হয়ে ওঠে। অতঃপর আবার কয়েক বছর নীরবতার পর 1937 খৃস্টাব্দে ডঃ কে. পি. বিশ্বাসের তত্ত্বাবধানে আবার জলাশয়গুলি ভিক্টোরিয়া আমাজোনিকায় পূর্ণ হয়ে ওঠে।

বিশালাকার পাতা কতকটা কানা উঁচু প্রায় গোলাকার থালার মত জলাশয়ের শোভা বিস্তার করে। পরিমাপে পাতাগুলির ব্যাস প্রায় 5 ফুট থেকে 7 ফুট হয়, কখনও কখনও আরও বেশি হয়। কানাগুলির উচ্চতা প্রায় 2 ইঞ্চি থেকে 8 ইঞ্চি হয়। পাতাগুলি জলের উপর ভাসমান অবস্থায় থাকে। পাতার উপরের ত্বক তৈলাক্ত ও গাঢ় সবুজ বর্ণের হয়। তৈলাক্ত হওয়ার দরুণ পাতার উপর জল জমতে পারে না। বৃষ্টির জল পড়লে হাওয়ার দোলাতে পত্রের স্থিতিস্থাপকতাসম্পন্ন কানাগুলি দুলতে থাকে। ফলে জল পাতার উপর থেকে বাইরে পড়ে যায়। পত্ররন্ধ্র বা স্টোমাটা উপরের ত্বকেই থাকে, নীচের ত্বকে থাকে না। এই পত্ররন্ধ্র শুধু গ্যাসই নির্গত করে না আবার তা গ্রহণ করে এবং সালোকসংশ্লেষ শ্বাসকার্য, বায়ু থেকে জলীয় বাষ্প গ্রহণ এবং অতিরিক্ত জল বাষ্পাকারে নির্গত করতে সাহায্য করে। পাতার ভিতর প্রচুর বাতাবকাশ আছে যা পাতাকে ভেসে থাকতে সাহায্য করে। [এই পাতার চিত্র প্রচ্ছদে প্রদত্ত]।

পাতার নীচের ত্বক বেগুনী সবুজ বর্ণের হয় এবং শিরাবিন্যাস উল্লেখযোগ্য। পত্রবৃন্তের কেন্দ্রবিন্দু থেকে কতকগুলি মোটা শিরা কিনারার দিকে বিস্তৃত। এই শিরাগুলি সরু সরু শিরা দ্বারা যুক্ত হয়ে কতকগুলি কম্পার্টমেন্টে বিভক্ত হয়েছে। এই শিরাগুলির ভিতর বায়ুনালী আছে এবং বাইরে শক্ত কাঁটা দ্বারা ব্যাপৃত।

ইংল্যাণ্ডের অন্যতম স্থপতি স্যার যোসেফ প্যাক্সটন ভিক্টোরিয়া আমাজোনিকা পাতার নিম্নতলের শিরাবিন্যাস দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে লণ্ডনের বিখ্যাত ক্রিস্টাল প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। উক্ত প্রাসাদটি 1851 খৃস্টাব্দ থেকে 1936 খৃস্টাব্দ পর্যন্ত লণ্ডন শহরের একটি দ্রষ্টব্য স্থান হিসাবে পরিগণিত ছিল। পরবর্তীকালে এই বিখ্যাত প্রাসাদটি অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়।

*ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সেকশন, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, বোটানিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, 1, সদর স্ট্রীট, কলিকাতা-700016

আরও চিত্তাকর্ষক ঘটনা এই বিশালাকার পাতার উপর সাত-আট বছরের ছেলে অনায়াসেই বসে থাকতে পারে ডুবে যায় না। এর কারণ—(1) এই উদ্ভিদটির প্রস্থচ্ছেদ করলে দেখা যাবে প্রচুর অতিরিক্ত বায়ুথলি ও বায়ুনালী আছে যা সবসময় পাতাকে জলের উপর হাল্কা হয়ে ভাসতে সাহায্য করে; (2) পত্রবৃন্তটি পাতার কেন্দ্রবিন্দুতে যুক্ত হওয়াতে পাতাটিকে ধরে রাখার যান্ত্রিক ক্ষমতা অনেক বেশী; (3) এখানে আর্কিমিডিসের প্লবতা ধর্ম সূত্রটি কার্যকরী; (4) পাতার নিম্নতলের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিরাবিন্যাস ও বায়ুনালীর উপস্থিতি বা পাতাকে দৃঢ়তা প্রদান করে।

পত্রবৃন্ত ও পুষ্পবৃন্ত খুব লম্বা হয় না কারণ ভিক্টোরিয়া আমাজোনিকা অগভীর জলাশয়ে হয়। দেখা গেছে আমাজন নদীর গভীরতা যেখানে দু-ফুট ও দোঁআশ মাটি সেখানেই এই উদ্ভিদটির প্রাচুর্য। এগুলির গায়ে প্রচুর কাঁটা থাকে এবং প্রস্থচ্ছেদে দেখা যায় প্রচুর বাতাবকাশ আছে।

এই উদ্ভিদটির কাণ্ড বলতে রাইজোম। এটি বেশ মাংসল ও নরম হয় এবং টিপলে জল ও বাতাস বের হয়ে আসে। সুতরাং এর মধ্যে অতিরিক্ত বাতাস থাকার ফলে জলের মধ্যে থেকেও এরা বায়ুর অভাব বোধ করে না। রাইজোমে কতকগুলি পর্ব আছে। এই পর্বের উপর দিকে পত্রবৃন্ত ও নীচের দিকে অস্থানিক মূল থাকে।

ফুলের কথা বলতে গেলে বলতে হয় কিছুটা পদ্ম ফুলের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। তবে ফুলের সময় ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি। ফুলের সাইজও অনেক বড় হয়। ফুল জলের উপর তল থেকে কিছু উপরে থাকে। ফুলগুলি ব্যাসে প্রায় 8 ইঞ্চি থেকে 15 ইঞ্চি হয়। প্রথমে ন্যাসপাতির সাইজের কুঁড়ি হয়। প্রথমদিন কুঁড়ি ফোটার সময় ক্রীম সাদা হয় এবং ধীরে ধীরে রঙ পরিবর্তিত হয়ে গোলাপী রঙ হয়। ফুলগুলি সন্ধ্যার সময় প্রস্ফুটিত হয়। সম্পূর্ণ ফুটে গেলে পাপড়িগুলি বাইরের দিকে বেঁকে যায়। ফুলের বৃতি গর্ভাশয়ের নীচে যুক্ত হয়। সংখ্যায় চারটি হয়। বাইরের দিকের রঙ পার্পল হয় ও বৃতির ভিতরের রঙ সাদা হয়। বৃতি সংখ্যায় অগণিত হয়। পুংকেশরও অসংখ্য হয় তবে দুই রকমের থাকে ফার্টাইল ও স্টেরাইল। গর্ভাশয় বৃতির টিউবের সঙ্গে যুক্ত থাকে। সন্ধ্যার পর ফুলের মিষ্টি সুবাস অনেক দূর থেকে পাওয়া যায়। মিষ্টি সুবাসের সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া থেকে ফুলের তাপমাত্রা 10° সেণ্টিগ্রেড বেড়ে যায়। এর কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গেছে এই তাপ ও সুবাসের উৎসস্থল গর্ভপত্রের শীর্ষে যে গাঢ় লাল বর্ণের সিগমা আকৃতির যে অতিরিক্ত অংশ আছে—তা শ্বেতসারসমৃদ্ধ এবং এই শ্বেতসারের সঙ্গে বাতাসের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলেই এই তাপ ও সুবাস উৎপন্ন হয়।

রাত্রিতে পতঙ্গের দ্বারা পরাগ সংযোগ হয়। পরাগ সংযোগের পর ফুলটি জলাশয়ের তলদেশে চলে যায়। সেখানেই ছয় সপ্তাহের পর ফল পাকে। ফলগুলি গোলাকার ও কাঁটাযুক্ত হয়। ফলগুলির বাইরের অংশ পচে গিয়ে মটর দানার মত বীজ

ভিক্টোরিয়া আমাজোনিকা পাতার নিম্নতল

বেরিয়ে আসে। বীজ সাধারণতঃ ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ মাসে হয় এবং ওজনে প্রায় 300 মিলিগ্রামের মত।

বীজগুলিকে প্রথমে পাত্রের মধ্যে অঙ্কুরোদগম করানো হয়। দেখা গেছে বীজ থেকে প্রথম পাতাটি বের হয় সেটি সূচ্যাকার হয়, কোন ফলক থাকে না। দ্বিতীয় পাতাটি ভল্লাকার বা ল্যানসিওলেট, তৃতীয় পাতাটি বর্শাকার হয়। চতুর্থ পাতাটি পেনটেট আকৃতির হয় ও কাঁটা থাকে। অঙ্কুরোদগমের পর এটিই প্রথম কাঁটা। এর পর এটি জলাশয়ে রোপণ করা হয়।

প্রসঙ্গ– মহাবিশ্ব

প্রবীরকুমার আদিত্য*

কোন মেঘমুক্ত গ্রীষ্ম অথবা শীতের সন্ধ্যায় আকাশের দিকে তাকালে হঠাৎ বিস্ময়ে চমক লাগে। মহাকাশের রাজ্যে এ কোন্ দীপাবলি! আকাশের আনাচেকানাচে কে যেন অসংখ্য বাতি জ্বেলে দিয়েছে। মনে পড়ে যায় কবিগুরুর গানের কলি 'আকাশ ভরা সূর্য তারা, বিশ্বভরা প্রাণ···'। শুধু কবিগুরু কেন যুগ যুগ ধরে কবিদের মনে, বিজ্ঞানীদের মনে, দার্শনিকদের মনে এবং সাধারণ মানুষের মনে বিস্ময় জেগেছে। যুগ যুগ ধরে 'সুদূরের পিয়াসী' মানুষ বেড়িয়ে পড়েছে অজানা মহাবিশ্বটাকে জানতে। আলোচ্য প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হল মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব এবং তার পরবর্তী পর্যায় সম্বন্ধে পর্যালোচনা করা।

এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রথম দিনটার কথা একবার কল্পনা করা যাক। হঠাৎ এক ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে মহাবিশ্ব উঠলো কেঁপে; অসম্ভব উজ্জ্বল আলোতে ভরে গেল চারদিক। বিশালকায় সব জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা থলথলে জেলির মতো ধাতুপিণ্ডে পরিণত হল। অসহনীয় তাপ এবং ঔজ্জ্বল্য হাইড্রোজেন মেঘের কমনীয় আলোয় পরিণত হল। এই হাইড্রোজেন মেঘের মাঝে জন্ম নিলো বিশালকায় সব নীহারিকা, প্রতিটি নীহারিকাতে সৃষ্টি হল অসংখ্য নক্ষত্র এবং তাদের ঘিরে অসংখ্য গ্রহ-উপগ্রহ। এইরকম একটি গ্রহ—এই পৃথিবীর বুকে জীবনের আবির্ভাব ঘটলো। নানা বিবর্তনের পথ পেরিয়ে জন্ম নিল মানুষ।

এই কল্পনা বা ধারণা গড়ে উঠবার অনেক আগে থেকে মানুষ বহু কিছু ভাবতে শুরু করেছিল। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল এক শাশ্বত চক্রাকার মহাবিশ্বের (Cyclic eternal universe) কথা বলেছিলেন। খৃস্টধর্মাবলম্বী পাশ্চাত্যের দার্শনিকরা মনে করতেন, মহাবিশ্বের সৃষ্টি মহাশূন্য থেকে এবং এর সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং অবিনশ্বর ভগবান (A divine creation out of nothing by an eternal God)। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রের সৃষ্টি সম্বন্ধে অনেক তথ্য ইম্যানুয়েল কান্ট (1724-1804) লিখিত বিখ্যাত বই General Natural History And Theory of the Heavens (Allegemeine Naturgesichte Und Theorie Des Himmels) থেকে জানা যায়, এই মহাবিশ্বে গ্রহ-নক্ষত্র এক বিশাল ঘূর্ণায়মান গোলকের আকারে রয়েছে। দুটি নক্ষত্রের মধ্যবর্তী স্থান সম্পূর্ণ শূন্য, কিন্তু আদি মুহূর্তে এরকম ছিল না। তখন সমগ্র মহাবিশ্বে শক্তি-পদার্থে (potential matter) পরিপূর্ণ ছিল, যা এই গ্রহ-নক্ষত্র সমূহকে গতিশীল হতে সাহায্য করেছে। কান্ট মনে করতেন, এই সকল গ্রহ-নক্ষত্র, সকল পদার্থই মহাবিশ্বের সৃষ্টির সময় একটি প্রাথমিক পদার্থ থেকে সৃষ্টি হয়েছে।

বিভিন্ন গবেষণার পর, জ্যোতির্বিদগণ সৃষ্টির আদিমুহূর্তে যে প্রচণ্ড তাপের সৃষ্টি হয়েছিল, তা নির্ধারণ করেছেন। এর পরিমাণ হল পনেরো শত হাজার মিলিয়ন ডিগ্রী কেলভিন ($1{\cdot}5\times10^{12}\,{}^{\circ}k$)। এই প্রচণ্ড তাপে তখন মহাবিশ্বে যে কণিকা বিপুল পরিমাণে ছিল তা হল পাই-মেসন, যার ওজন হল কোন নিউক্লীয় কণিকার ওজনের 7 ভাগের 1 ভাগ। এই পাই-মেসন কণিকাগুলি তীব্রভাবে একে অপরের মধ্যে বিক্রিয়া করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই পাই-মেসনের নিরন্তর আদান-প্রদানই নিউক্লিয়াসসমূহের ধারণ শক্তির মূল কারণ।

একটা প্রশ্ন মনে হয় সব সময়ই সবার মনে জাগে, কি থেকে আদি বস্তুর উৎপত্তি ঘটেছিল। এর স্পষ্ট উত্তর আজ পর্যন্ত মেলে নি। এ বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত (1918) জগৎবিখ্যাত পদার্থবিদ ম্যাক্স্ প্ল্যাঙ্ক (1858-1947) বলেছেন এই মহাবিশ্বে অদ্ভুত কোন পদার্থ নেই। সকল পদার্থের জন্ম এবং গঠন প্রকৃতি একটি শক্তি থেকে। এই শক্তিই পারমাণবিক কণাসমূহকে দিয়েছে প্রাণের স্পন্দন (ইলেকট্রনের ঘূর্ণন)। কিন্তু এই শক্তি পিছনে আছে একটি চৈতন্যময় বুদ্ধিমান আত্মা এবং এই আত্মাই সমস্ত বস্তুর মূল উৎস।

বিশাল বিশাল সব নীহারিকা অনিয়মিতভাবে ছড়িয়ে আছে এই মহাবিশ্বের বুকে। এক একটি নীহারিকায় জড়ো হয়েছে কয়েক কোটি নক্ষত্র। সূর্য যে নীহারিকাতেই অবস্থিত, তার নাম Milkyway Galaxy। এই বিশাল প্যাঁচালো নীহারিকাতে আছে প্রায় 200 বিলিয়ন সংখ্যক নক্ষত্র। সূর্য এই প্যাঁচালো নীহারিকার একটি বাহুতে অবস্থিত। নীহারিকার সঙ্গে সঙ্গে সৌরজগৎও ঘুরছে এবং একবার সম্পূর্ণ ঘুরতে সময় লাগে 250 মিলিয়ন বছর। নীহারিকা স্থানীয় বিভাগের (local group) এক অন্যতম সদস্য। প্রায় 20টি নীহারিকা নিয়ে এই স্থানীয় বিভাগ গঠিত হয়েছে। Milkyway নীহারিকা ছাড়া অপর যে বৃহৎ নীহারিকাটি আছে তা হল Andromeda Nebula, এটিও প্যাঁচালো আকৃতির। এদের মধ্যে দূরত্ব 2 মিলিয়ন আলোকবর্ষ। স্থানীয় বিভাগের অন্যান্য নীহারিকাগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বলে, এদের 'খর্বাকৃতি' (dwarf) নীহারিকা বলে চিহ্নিত করা হয়। এই খর্বাকৃতি নীহারিকাদের মধ্যে দুটি আমাদের কাছাকাছি অবস্থিত, প্রায় 150,000 আলোকবর্ষ দূরত্বে রয়েছে। এদের একটি 'বৃহৎ ম্যাজেলেনিক মেঘ' এবং

---

* 93/1/D, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা-700.09

অপরটি 'ক্ষুদ্র ম্যাজেলোনিক মেঘ' (Large and small Magellanic cloud) নামে পরিচিত।

মহাবিশ্বের সকল নীহারিকাই প্যাঁচালো আকৃতির হয়। এদের মধ্যে কিছু চ্যাপ্টা, আবার কিছু অসম আকৃতির। প্রতিটি নীহারিকার গড় আকার 600 হাজার ট্রিলিয়ন মাইল এবং দুটি নীহারিকার মধ্যে গড়-দূরত্ব 20 মিলিয়ন মাইল। জ্যোতি-বিজ্ঞানীরা এই সব বিরাট বিরাট সংখ্যা ব্যবহারের পরিবর্তে আলোকবর্ষ একক উদ্ভাবন করেছেন। এক বছরে আলো যতদূর যেতে পারে, তাই হল এক আলোকবর্ষ। আমরা জানি আলোর গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে 186,000 মাইল। মোটামুটি এক আলোকবর্ষ হলো 6 ট্রিলিয়ন মাইলের সমান এবং দুটি নীহারিকার মধ্যে গড়-দূরত্ব হল প্রায় 3 মিলিয়ন আলোকবর্ষ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে মহাবিশ্বটা কত বড়, এর আয়তনই বা কত? সাধারণতঃ মহাবিশ্বকে বর্তমানে অসীম (infinite) রূপে মনে করা হয়। সৃষ্টির আদি মুহূর্তের মহাবিশ্বও অসীম ছিল। কিন্তু অপরপক্ষে মহাবিশ্বকে সসীম (finite) বলে মনে করা হয় শুধু তাই নয়, হুবল ধ্রুবকের (Hubble constant) সাহায্যে বর্তমান মহাবিশ্বের পরিধি 125 হাজার মিলিয়ন আলোকবর্ষ বলে নির্ণীত হয়েছে।

এবার একটা অবিস্মরণীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা বলা যাক, যা থেকে আমরা সৃষ্টির পরিষ্কার বৈজ্ঞানিক তথ্য পেতে পারি। ভেস্টো মেল্‌ভিন স্লীফার (Vesto Melvin Slipher) নামে এক আমেরিকান জ্যোতির্বিদ তার দূরবীক্ষণ যন্ত্রে দেখলেন প্রায় প্রত্যেক নীহারিকাই প্রচণ্ড গতিবেগে ছুটে চলেছে, কয়েকটির গতিবেগ ঘণ্টায় কয়েক মিলিয়ন মাইল। এছাড়াও তিনি যে বিস্ময়কর ঘটনাটি লক্ষ্য করলেন তা হল, প্রায় প্রতিটি নীহারিকাই পৃথিবী থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে। স্লীফার তাঁর পর্যবেক্ষণ থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে সারা মহাবিশ্বের নক্ষত্র, গ্রহ ইত্যাদি কোন এক বিশেষ বিন্দু থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে এবং আমাদের পৃথিবী অবস্থিত রয়েছে সেই বিশেষ বিন্দুটিতে।

স্লীফার আবিষ্কারের পরবর্তী দশকে মিলটন হিউম্যাসন (Milton Humason) এবং এডউইন হুবল্ (Edwin Hubble) উইলসন পর্বতের শীর্ষে অবস্থিত 100 ইঞ্চি দূরবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। স্লীফারের আবিষ্কার সমর্থিত হল। হিউম্যাসন এবং হুবল্ বললেন যে, ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সব নীহারিকাই প্রচণ্ড বেগে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে। সবচেয়ে দূরে যে নীহারিকাটি আছে তা ঘণ্টায় প্রায় 900 মিলিয়ন মাইল বেগে ছুটে চলেছে।

নীহারিকা অর্থাৎ নক্ষত্র, গ্রহ ইত্যাদি পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, এই ব্যাপারটা বিজ্ঞানীদের কাছে জটিলতার সৃষ্টি করলো। যদি সকল গ্রহ-নক্ষত্র সূর্য তথা পৃথিবী থেকে দূরে সরে যায়, তবে নিশ্চয়ই আমরা মহাবিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থান করছি। ঠিক এই একই ধারণা আজ থেকে 500 বছর আগেকার জ্যোতির্বিদরাও পোষণ করতেন। আসলে এই ধারণাটি ভ্রান্ত। কারণ পরবর্তী কালে আমরা জেনেছি যে, অন্য যে কোন নীহারিকার যে কোন গ্রহ থেকে যদি আমরা মহাবিশ্বকে দেখি, তখনও আমরা একই ঘটনা দেখব অর্থাৎ দেখব বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্র ঐ গ্রহ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আসলে এই মহাবিশ্বে কোথাও কোন নির্দিষ্ট কেন্দ্র বলে কিছু নেই।

যদি প্রশ্ন ওঠে এই মহাজাগতিক বিস্ফোরণ ঘটেছিল কবে, এর উত্তর খুঁজতে গেলে একটা ধারণাকে স্পষ্ট করতে হবে সবার আগে। আমরা দেখেছি এই মহাবিশ্বের প্রতিটি গ্রহ, নক্ষত্র একে অপরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। গতকাল যেখানে ছিলাম, আজ সেখান থেকে চলে এসেছি আরো দূরে। এখন যদি আমরা সময়কে ক্রমশঃ পিছু হটাতে থাকি তবে নিশ্চয়ই নীহারিকা সমূহ পরস্পর পরস্পরের কাছে এগিয়ে আসবে এবং এক সময় ভয়ানক বিস্ফোরণে তারা সবাই একাকার হয়ে যাবে। প্রচণ্ড চাপ এবং ট্রিলিয়ন ডিগ্রী তাপ উৎপন্ন হবে। সমগ্র মহাবিশ্ব উজ্জ্বল আলোতে ভরে উঠবে। এখন যদি নীহারিকার গতিবেগ এবং বর্তমানে তারা একে অপরের থেকে কতদূরে আছে, তা নির্ণয় করা যায়, তাহলে অতি সহজেই বলা যাবে, কবে এই মহাজাগতিক বিস্ফোরণ ঘটেছিল। নীহারিকার গতি এবং দূরত্ব নির্ণয় করে বর্তমান মহাবিশ্বের সর্বশেষ যে বয়সের হিসাব পাওয়া গেছে, তা হল প্রায় 20 বিলিয়ন বছর। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে। এটাই মহাবিশ্বের বয়স বলে ধরে নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ এই মহাজাগতিক বিস্ফোরণের আগে এই মহাবিশ্বে এরকম বিস্ফোরণ কবার ঘটেছিল তা আমরা জানি না। সুতরাং সর্বশেষ বিস্ফোরণের পর থেকে এই মহাবিশ্ব 20 বিলিয়ন বছর পার হয়ে এসেছে।

20 বিলিয়ন বৎসর মানে কত? এক বিলিয়ন বৎসরই বা কত? এগুলি এত বৃহৎ বৎসরের সমষ্টি যে মানুষের তা কল্পনা করতেও কষ্ট হবে। এক মিলিয়ন বৎসরই হল 10 লক্ষ বৎসরের (10^6 বৎসর) সমান। আবার এক বিলিয়ন বৎসর হল 1000 মিলিয়ন বৎসর বা 10^9 বৎসর। সুতরাং 20 বিলিয়ন বৎসর হল 20×10^{10} বৎসরের সমান।

বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের সৃষ্টি তার বিভিন্ন পরবর্তী অবস্থা-গুলিকে বেশ সহজবোধ্য করার জন্য একটা মহাজাগতিক ঘড়ির কথা চিন্তা করেছেন, যেখানে 24 ঘণ্টাকে ধরা হয় মহাবিশ্বের সৃষ্টির আদি মুহূর্ত থেকে একেবারে খাস বর্তমান পর্যন্ত। ধরা যাক প্রচণ্ড বিস্ফোরণে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি হল ঠিক মধ্যরাত্রে অর্থাৎ রাত বারোটায়। এর ঠিক 20 মিনিট পরে সৃষ্টি হল নীহারিকা, নক্ষত্র এবং গ্রহ। এরপর বাকি রাতটা এবং পরদিন সারা বেলাটা বয়ে গেল এদের গঠনকার্যে। বিকেল চারটের সময় সৃষ্টি হল আমাদের সূর্য, পৃথিবী এবং

(পরের অংশ 144 পৃষ্ঠায় দেখুন)

আন্ত্রিক রোগ

শ্যামসুন্দর বর্মন*

আন্ত্রিকরোগ এ বৎসর এক মহামারীর রূপ নিয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তবে আন্ত্রিক রোগ বলতে কোন একটা রোগকেই বোঝায় না। অন্ত্রের যাবতীয় রোগকে সামগ্রিকভাবে আন্ত্রিক রোগ বলা উচিত। তাদের সংখ্যা অনেক। কারণ অন্ত্র একটি দীর্ঘ বিস্তৃত অঙ্গ। তার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রোগ হয়। পাকস্থলীর শেষপ্রান্ত থেকে মলদ্বার পর্যন্ত তার বিস্তৃতি। দৈর্ঘ্যে প্রায় $7\frac{1}{2}$ মিটার বা 25 ফুটের বেশী। খাদ্য পরিপাক, পাচিত খাদ্যাংশের শোষণ বা আত্তীকরণ এবং অপাচ্য ও শোষণাতিরিক্ত বর্জ্যখাদ্যবস্তুকে মল হিসাবে নিষ্কাশনই এই সুদীর্ঘ অঙ্গের ধারাবাহিক কাজ, এই কাজের এক বা একাধিক অংশে ব্যাঘাত হলে বদহজম, বমি, অতিরিক্ত পায়খানা ও আনুষঙ্গিক আরও কিছু উপসর্গ দেখা দেয়। সাধারণ কথায় তাকে উদরাময় বলে। বহিরাগত জীবাণুদের আক্রমণে এবং অন্য কিছু কারণেও অন্ত্রের বিভিন্ন স্থানের রোগ হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের প্রাথমিক লক্ষণ ও উপসর্গগুলি একই রকমের থাকে। তাতে একস্থানের রোগকে অন্য স্থানের রোগ থেকে পৃথক করা কষ্টকর হয়। আবার একই সঙ্গে অন্ত্রের বিভিন্ন স্থানের রোগ একই সময়ে দেখা দিতে পারে। সেইজন্য সুদীর্ঘ বিস্তৃত এই অঙ্গের রোগ নির্ণয়ে ও চিকিৎসায় অনেক সময় জটিলতা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। তাই এই রোগ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে হলে আগে অন্ত্রের শারীরস্থানিক পরিচিতি, বিস্তৃতি ও তার সাধারণ কর্মপদ্ধতির কিছুটা জানা দরকার। সেই বিষয়ে একটি সাধারণ চিত্র এখানে দেওয়া হল।

পাচনতন্ত্রে পাকস্থলীর (Stomach) নিম্নভাগ বা শেষপ্রান্ত থেকে পায়ু বা মলদ্বার পর্যন্ত অংশকেই অন্ত্র (Intestine) বলে। আকার অনুসারে এর দুটি ভাগ, প্রথমটি ক্ষুদ্রান্ত্র (Small intestine) আর পরেরটিকে বৃহদন্ত্র (Large intestine) বলে। এই ক্ষুদ্রবৃহৎ আকার অবশ্য ঐ পৌষ্টিকনলটির (Intestinal tube) বাইরের ঘের বা পরিধি দেখেই ঠিক হয়েছে। ক্ষুদ্রান্ত্র অপেক্ষা বৃহদন্ত্রের পরিধি কিছু বেশী। তবে দৈর্ঘ্যের দিক দিয়ে ক্ষুদ্রান্ত্র অনেক বড়। এর দৈর্ঘ্য প্রায় 6 মিটার আর বৃহদন্ত্র মাত্র দেড় মিটার। পাকস্থলীর সঙ্গে যুক্ত ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশের নাম 'গ্রহণী', ইংরাজীতে ডুওডেনাম (Duodenum), তার দৈর্ঘ্য 25 সেন্টিমিটার (প্রায় দশ ইঞ্চি)। এই অংশটি ইংরাজী 'C' অক্ষরের আকার নিয়ে উদরগহ্বরের পশ্চাৎ দেয়ালে নির্দিষ্টভাবে যুক্ত। ক্ষুদ্রান্ত্রের অবশিষ্ট অংশের $\frac{2}{5}$ ভাগের নাম জেজুনাম ও পরের $\frac{3}{5}$ অংশের নাম ইলিয়াম।
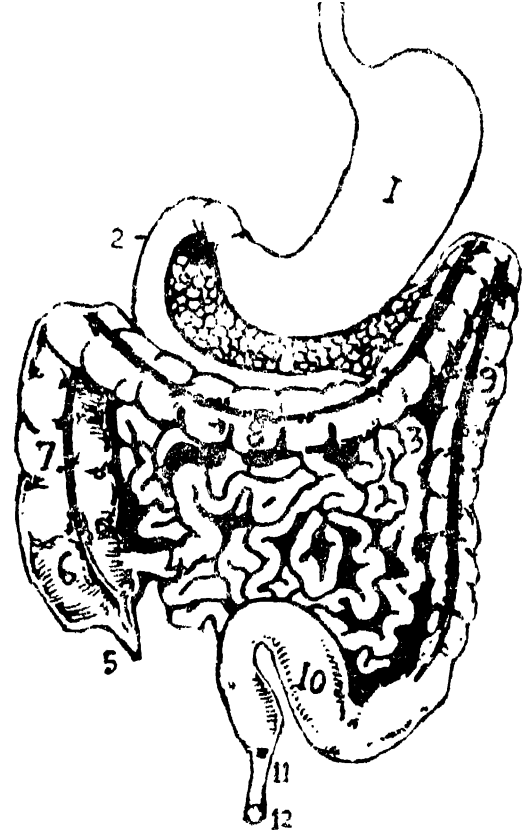
পৌষ্টিক নালীর শারীরস্থানিক পরিচিতি

1—পাকস্থলী, 2—গ্রহণী (ডুওডেনাম), 3—জেজুনাম, 4—ইলিয়াম, 5—অ্যাপেণ্ডিক্স, 6—সীকাম, 7—ঊর্ধ্বগামী-কোলন, 8—আড়াআড়ি কোলন, 9—নিম্নগামী কোলন, 10—পেলভিক কোলন (আসল মলভাণ্ড), 11—মলনালী, 12—মলদ্বার।

এই ইলিয়ামের শেষ প্রান্তই বৃহদন্ত্রের প্রারম্ভিক অংশ সীকাম (Caecum) এর সঙ্গে যুক্ত। খাদ্য পরিপাকের বেশীর ভাগ কাজ এবং পাচিত খাদ্যের শরীরাভ্যন্তরে শোষণের প্রধান অংশ এই ক্ষুদ্রান্ত্রেই হয়। সীকাম থেকেই বৃহদন্ত্রের সুরু। তবে সীকামের নিম্নাংশে প্রায় কড়ে আঙুলের আকার ক্ষুদ্র সরু নল বিশিষ্ট অংশ লেজের মতই ঝুলে রয়েছে। সেটি বৃহদন্ত্রের প্রাথমিক অংশ। নাম এপেণ্ডিক্স (Appendix)। এটি

(143 পৃষ্ঠার পরের অংশ)

অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ। রাত 11·53 মিনিটে মাছেরা জলে খেলে বেড়াতে শুরু করলো। মধ্যরাত্রির ঠিক 2 মিনিট আগে অর্থাৎ 11·58 মিনিটে অতিকায় জীবেরা জন্ম নিল। এর ঠিক 60 সেকেণ্ড পরে তারা পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে গেল। সবশেষে মধ্যরাত্রির ঠিক এক সেকেণ্ড আগে অর্থাৎ 11টা 59 মিনিট 59 সেকেণ্ডে এলো সেই শুভ মুহূর্তটি, জন্ম নিল প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ।

---

* সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন, 88/2, রফি আমেদ কিদোয়াই রোড, কলিকাতা-13

আসলে একটি উপাঙ্গ। সীকাম থেকে খাদ্যাংশ এই এপেণ্ডিক্স ঢুকে যেতে পারে। তবে সেগুলিকে আবার সীকাম দিয়েই বেরোতে হবে। এর কোন শারীরবৃত্তীয় কাজ বা প্রয়োজনীয়তা মনুষ্যদেহে নেই। কিন্তু নিম্নতর প্রাণীতে এই উপাঙ্গটির পাচন কাজে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। অভিব্যক্তি বা জীবপ্রজাতির ক্রমবিবর্তনের ধারায় মানবদেহে এই এপেণ্ডিক্স-এর উপস্থিতি তাই এক গুরুত্বপূর্ণ জৈবিক বিবর্তনের সাক্ষ্য। মনুষ্য শরীরে কোন কাজ না করলেও এই ক্ষুদ্র বন্ধ নলটি কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মারাত্মক বিপদ সৃষ্টি করতে পারে, যাকে বলে এপেণ্ডিসাইটিস। যাই হোক এই সীকাম ও এপেণ্ডিক্স থেকেই বৃহদন্ত্র আরম্ভ হয়েছে উদর-গহ্বরের দক্ষিণ দিকের একেবারে নিম্নাংশে, শ্রোণীচক্র বা নিতম্ব অস্থির (Hipbones) সুরক্ষিত কোটরে, এনাটমিতে যার নাম Right Iliac Fossa বা অন্ত্রের দক্ষিণ দিকস্থ খাত (Ditch)। এই খাত ধরেই সীকাম থেকে সোজা উপরের দিকে বৃহদন্ত্রের গতি উদরগহ্বরের পশ্চাৎ দেয়ালের সঙ্গে স্থিরভাবে আবদ্ধ হয়ে লিভার (যকৃৎ) ও কিডনীর (মূত্রযন্ত্র= বৃক্ক) নিম্নপ্রান্ত পর্যন্ত। বৃহদন্ত্রের এই অংশের নাম Ascending (উর্দ্ধগামী) কোলন (Colon), তারপর যকৃতের নিম্নাংশ থেকে ক্ষুদ্রান্ত্রের উপর দিয়ে উদর-গহ্বরের সোজা আড়াআড়ি ভাবে বাঁদিকে চলে গেছে বাম কিডনী ও প্লীহার নিম্নাঞ্চল পর্যন্ত। বৃহদন্ত্রের এই অংশের নাম আড়াআড়ি (Transverse) কোলন, এই অংশটি উদরগহ্বরে দোদুল্যমান। এটি বামপ্রান্তে পৌঁছে প্লীহার নীচ থেকে পরিপূর্ণ বাক নিয়ে উদরগহ্বরের বামপ্রান্ত ধরেই সোজা নীচের দিকে নেমেছে। বৃহদন্ত্রের এই অংশের নাম Descending (নিম্নগামী) কোলন। তারপর বাম দিকের শ্রোণীচক্র গহ্বরে পুনঃপ্রবেশ করে বৃহদন্ত্র কিছুটা স্ফীতকায় হয়ে কিঞ্চিৎ দক্ষিণমুখী কোণাকুণি পথ নিয়েছে। এই স্ফীতকায় অংশটি শেষ মলভাণ্ড, এর নাম পেলভিক (Pelvic) কোলন, এর পরের অংশেই স্বল্প পরিসর মলনালী (Rectum), আর তারপরেই মলদ্বার।

আগেই বলেছি সমগ্র বৃহদন্ত্রে দৈর্ঘ্য প্রায় $1\frac{1}{2}$ মিটার, পাচনতন্ত্রের বিশিষ্ট অংশ হয়েও এই বৃহদন্ত্রে কিন্তু প্রত্যক্ষ পরিপাকের কোন কাজ হয় না। আসল খাদ্যবস্তুর শোষণ বা আত্তীকরণ (Assimilation) কাজেও বৃহদন্ত্র বিশেষ সাহায্য করে না, এই কাজ মূলত হয় ক্ষুদ্রান্ত্রে। তবে পাচিত খাদ্য উপাদানের জলীয় অংশটা (আসল জলটাই) বৃহদন্ত্রে পরিপূর্ণ ভাবে শোষিত হয় এবং মলকে নির্দিষ্টভাবে ঘনীভূত বা শক্ত করে। সেই জল শোষণের সময় খাদ্যবস্তুর সঙ্গে বিভিন্ন লবণ জাতীয় যেসব উপাদান ঐ জলে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে সেগুলিও শরীরে শোষিত হয়। আর একই ভাবে খাদ্য উপাদানের পাচিত গ্লুকোজ জাতীয় অংশের কিছু শোষণ বা আত্তীকরণও এই অংশে হয়। কিছু ভিটামিনও (যেগুলি মূলতঃ জলে দ্রবণীয়) এখানে শোষিত হয়। বাইরে থেকে মলনালী দিয়ে কিছু জল, দ্রবণীয় লবণ ও গ্লুকোজ বৃহদন্ত্রে প্রবেশ করিয়ে দিলে সেগুলিও অনুরূপভাবে শরীরে শোষিত হয়ে যায়। কিন্তু অন্য কোন খাদ্য উপাদান নয়। বৃহদন্ত্র তাই অপাচ্য পরিত্যক্ত খাদ্যাংশের সাময়িক ধারক বা রক্ষণস্থল অর্থাৎ মলাধার, ইংরাজীতে কোলন (Colon)। এই অপাচ্য খাদ্যাবশিষ্টের উপস্থিতির জন্যই এই অঞ্চলটি বিভিন্ন জীবাণুর (ব্যাক্টিরিয়া ও প্রোটো-জোয়ার) স্বাভাবিক বিচরণস্থল (Natural habitat)। এরা ঐ বর্জ্য খাদ্যাংশ খেয়ে বেঁচে থাকে। তার জন্য শরীরের কোন ক্ষতি করে না। বরঞ্চ সাহায্য করে। জীবাণুরা তাদের প্রয়োজনীয় উপাদানের জন্য ঐ খাদ্যাংশের উপর সন্ধানক্রিয়া (Fermentation) আরম্ভ করে। তাতে বিভিন্ন গ্যাসের সৃষ্টি হয় এবং বৃহদন্ত্রের শৈষ্মিকঝিল্লী থেকে প্রচুর শ্লেষ্মা (কফ জাতীয় জিনিষ) নির্গত হয়। ঐ গ্যাসে বৃহদন্ত্রের নলটি স্থানে স্থানে ফুলে উঠে এবং তার নিশ্চল দেয়ালে একটা বহির্মুখী গতি (Peristalsis) সৃষ্টি হয়। এতেই আসে মলত্যাগের বেগ। আর গ্যাস ও শ্লেষ্মার উপস্থিতিতে মলাশয় থেকে মল নির্গমন সহজ হয়। অন্যদিকে জীবাণুরা নিজেদের বাঁচার জন্যই তাদের প্রয়োজনীয় অনেক ভিটামিন নিজেরা তৈরি করে—যে ক্ষমতা মানুষ ও উচ্চতর প্রাণীদের নেই। ঐ জীবাণুদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভিটামিন আশ্রয়দাতার শরীরে শোষিত হয় এবং তার শরীর রক্ষায় সাহায্য করে। এই মিথোজীবী জীবাণুগুলি হঠাৎ মারা গেলে (যেমন শক্তিশালী এ্যাণ্টিবায়োটিক ঔষধ প্রয়োগে হয়) শরীরে দারুন ভাবে ভিটামিনের অভাবজনিত কুফল দেখা দেয়। তাই ব্রড স্পেকট্রাম এ্যাণ্টিবায়োটিক ঔষধ সেবনের সঙ্গে বা পরেই ভিটামিন দিতে হয়। এই সকল কারণেই বহিরাগত রোগ জীবাণু দল কোন রকমে বৃহদন্ত্রে আশ্রয় পেলে তাদের সহজবৃদ্ধি ও দীর্ঘস্থায়ী বসবাসের সুবিধা হয়, ক্রনিক আন্ত্রিক রোগের বিশেষ করে আমাশারোগের সূত্রপাত ও দীর্ঘ স্থায়িত্বের কারণ এই খানেই।

আন্ত্রিক রোগের জীবাণু পরিচিতি—আন্ত্রিক রোগের জীবাণুদের শ্রেণী ও গোষ্ঠী হিসাবে কয়েকটি ভাগে পৃথক করতে হয়। তার মধ্যে ব্যাকটিরিয়া ও প্রোটোজোয়া এই দুই শ্রেণীই প্রধান। অবশ্য কিছু ছত্রাক ও ভাইরাসরাও এই রোগ ঘটায়। আর এ দেশে কৃমিজাতীয় পরজীবীদের উৎপাতও কম নয়। তারাও বিভিন্ন রকমের আন্ত্রিক রোগ সৃষ্টি করে। অন্য কারণে উদ্ভূত আন্ত্রিক রোগের মধ্যে জন্মগত ত্রুটি, খাদ্যের বিষক্রিয়া, বিভিন্ন স্থানের কোষ ও কলার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি বা টিউমার ও ক্যান্সার এবং শরীরের অন্যস্থানের রোগের সংক্রমণ, প্রতিক্রিয়া ও বিষক্রিয়ার কথাও মনে রাখতে হবে। অন্ত্রে সাধারণভাবে বসবাসকারী এবং সাধারণ রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটিরিয়াদের একত্রে এণ্টারোব্যাকটিরিয়া পরিবার বলা হয়। এদের তিনটি বিশেষ গোষ্ঠী আছে। এক—ই. কোলাই গোষ্ঠী বা কোলিফর্মস্, দুই—শিগেলা গোষ্ঠী বা ডিসেণ্টি গ্রুপ, তিন—সালমোনেলা গোষ্ঠী

বা টাইফয়েড গ্রুপ। আর অসাধারণ মারাত্মক আক্রমণকারীদের মধ্যে কলেরা গোষ্ঠী বা কমাব্যাসিলাস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বিভিন্ন গোষ্ঠীর, জীবনচক্র, আক্রমণধারা ও রোগলক্ষণে সাদৃশ্য আছে, তবে পার্থক্য ও বৈসাদৃশ্যও কম নয়।

1. ই. কোলাই—(এসকেরিসিয়া কোলাই) গোষ্ঠীর মধ্যে অনেক প্রজাতি আছে। এরা সবাই মানুষ ও অন্য প্রাণীদের অন্ত্রে (মূলত বৃহদন্ত্রে) স্বাভাবিক বাসিন্দা এবং এদের অধিকাংশই সাধারণভাবে নিরাপদ। তবে কোন কারণে শরীরের সাধারণ বা স্থানীয় প্রতিষেধক ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে গেলে অথবা অন্য জীবাণুর সহায়তা পেলে এরা সবাই মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করতে পারে। অন্য প্রজাতিদের মধ্যে সাইট্রোব্যাক্টর, প্রোটিয়াস, সিউডোমোনাস প্রভৃতি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য। আন্ত্রিক রোগ ছাড়া অন্য রোগেও এদের বিশেষ ভূমিকা আছে, বিশেষভাবে প্রোটিয়াস ও সিউডোমোনাসের, তবে ই. কোলাইর নিজের বংশটাই সবচেয়ে বড়, এদেরও বহু উপদল আছে। মূলত বৃহদন্ত্রের বাসিন্দা হলেও শরীরের অভ্যন্তরে ও বাইরে অন্য অংশেও এদের পাওয়া যায়, বিশেষ করে মূত্রনালীতে। মলের সঙ্গে বা মূত্রের সঙ্গে নির্গত হয়ে মাটিতে, জলে, পচনশীল উদ্ভিদ বা প্রাণীদেহে এরা কিছুদিন বাঁচতে পারে, তবে বেশী দিন নয়। তাই পানীয় জল পরীক্ষায় ই. কোলাইর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পানীয় জলে এদের উপস্থিতি প্রমাণ করে মানুষ বা অন্য প্রাণীর মল, মূত্রের সঙ্গে সদ্য সংমিশ্রণের কথা এবং তজ্জনিত বিপদের সম্ভাবনা।

শিশুদের উদরাময় (Infantile diarrhoea) রোগে মল পরীক্ষা করে 1885 খৃস্টাব্দে এস্কেরিস এই ব্যাকটিরিয়া প্রথম আবিষ্কার করেন। দীর্ঘদিন এই রোগ 'শিশু কলেরা' নামে পরিচিত ছিল। অবশ্য কলেরা রোগের আসল জীবাণু 'কমাব্যাসিলাস' আবিষ্কার করেন কক 1883 খৃস্টাব্দে। আগেই বলা হয়েছে ই. কোলাই-র অধিকাংশই নিরুপদ্রব। কিন্তু এদের কিছু উপদল বিশেষ অবস্থায় বা বিশেষ শক্তি অর্জন করে আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিয়ে রোগ সৃষ্টি করে। আন্ত্রিক রোগ সৃষ্টিকারী এই উপদলের সংখ্যা এখন কম করে 25। মূলত দু-বছরের কম বয়সের শিশুদের এরা বেশী আক্রমণ করে। তবে বড় ছেলেমেয়ে বা বয়স্করাও মাঝে মাঝে আক্রান্ত হয়। এই ই. কোলাইদের বলা হয় প্যাথোজেনিক বা রোগ সৃষ্টিকারী। আন্ত্রিক আক্রমণ ছাড়াও মূত্রাশয়, মূত্রনালী এবং রক্তবাহিত হয়ে শরীরের অন্যস্থানে মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করতে পারে এরা। বিশেষ করে মস্তিষ্কে মেনিনজাইটিস রোগ।

2. শিগেলা গোষ্ঠী—রক্তামাশা বা ডিসেন্ট্রি রোগের প্রধান জীবাণু। অবশ্য এই রোগের অন্য প্রধান জীবাণু হচ্ছে বিশেষ প্রোটোজোয়া এ্যামিবা। 1896 খৃস্টাব্দে জাপানে আন্ত্রিক মহামারী চলাকালে বিজ্ঞানী শিগা এই জীবাণু (ব্যাকটিরিয়া) আবিষ্কার করেন বলে তাঁরই নাম অনুসারে শিগেলা নামকরণ। জীবনচক্র, আক্রমণের ধারা ও বিষক্রিয়াদি অনুসারে এদের এখন চারটি গ্রুপে ভাগ করা হয়। গ্রুপ 'এ', 'বি', 'সি', 'ডি'। প্রত্যেক গ্রুপের অধীন অনেক 'টাইপ' আছে, আবার অনেক টাইপের বেশ কিছু 'সাব টাইপ' আছে। এদের প্রত্যেকের জীবনচক্র ও বিষক্রিয়ার যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। বিজ্ঞানী শিগা প্রথমে যাদের খোঁজ পেয়েছিলেন তারা হচ্ছে 'এ' গ্রুপের টাইপ-1। তাই এদের এখন বলা হয় শিগেলা শিগী। এরাই সবচেয়ে মারাত্মক মহামারী সৃষ্টি করতে পারে অতি অল্প সময়ে।

ডিসেন্ট্রি ব্যাকটিরিয়ার 'বি' গ্রুপের আবিষ্কর্তা—ফ্লেক্সনার, 1900 খৃস্টাব্দে—ফিলিপাইন্স্-এ। এই গ্রুপকে তাই বলা হয় সিগেলা ফ্লেক্সনারী। 'সি' গ্রুপের আবিষ্কর্তা—বয়েড 1931 খৃস্টাব্দে—ভারতে; 'ডি' গ্রুপের আবিষ্কারক সোনেই—1915 খৃস্টাব্দে—ডেনমার্কে। আবার পূর্বোক্ত 'এ' গ্রুপের টাইপ-2 ব্যাকটিরিয়াদের বিশেষ ধর্ম নির্ধারণ করেন স্মিজ। তাই সেগুলি স্মিজ-ব্যাকটিরিয়া বা শিগেলা-স্মিজ নামে পরিচিত। প্রথমেই আবিষ্কারকদের নামেই এদের নামকরণ হয়েছে, পরে এদের বিষক্রিয়া অনুসারে শরীরে (রক্তে) যে পৃথক পৃথক নির্দিষ্ট এ্যান্টিবডি পাওয়া যায় সেই বিশেষ ধর্ম (Serotype) অনুসারে এদের বিভিন্ন গ্রুপ, সাবগ্রুপ, ও টাইপে ভাগ করা হয়, তাদের গুণগত পরিচিতি অনুসারে।

3. শালমোনেলা গোষ্ঠী—এই দলের বিখ্যাত প্রজাতি হচ্ছে শালমোনেলা টাইফি এবং শালমোনেলা প্যারাটাইফি যারা যথাক্রমে টাইফয়েড ও প্যারাটাইফয়েড রোগের কারণ, এই রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে আন্ত্রিক লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায় এবং মূলত আন্ত্রিক পথেই জীবাণুরা শরীরে প্রবেশ করে, তাই এদের অপর নাম আন্ত্রিক জ্বর (Enteric Fever)। অবশিষ্ট প্রজাতিরা পুরাপুরি আন্ত্রিকরোগ (Gastro enteritis) এবং খাদ্যে বিষক্রিয়া (Food Poisoning) তৈরি করে, এদের সংখ্যা অজস্র। আর মানুষ ছাড়া অন্য বহু মেরুদণ্ডী প্রাণীর অন্ত্রে এদের পাওয়া যায়। 1972 খৃস্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের এক সমীক্ষায় 3848টি শালমোনেলা প্রজাতি পাওয়া গেছে। মানুষ থেকে পশু এবং পশু থেকে মানুষের মধ্যে এরা যাতায়াত করে। তবে খাঁটি টাইফয়েড জীবাণুরা কেবলমাত্র মনুষ্য দেহেই বাস করে, ও রোগ সৃষ্টি করে।

কলেরার জীবাণু কমাব্যাসিলাস মহামারীর সময় ছাড়া স্থানীয় সংক্রামক রোগ (Endemic) হিসাবে অনেক সময় সাধারণ আন্ত্রিক রোগেরই সমতুল্য। এদের মধ্যে প্যারাহিমো-লিটিকাস প্রজাতি খাদ্যে বিষক্রিয়া জাতীয় আন্ত্রিক রোগই ঘটায়। সমুদ্রউপকূলবর্তী লবণাক্ত জল অঞ্চলেই এদের প্রাদুর্ভাব।

আন্ত্রিক রোগ সৃষ্টিকারী প্রোটোজোয়াদের মধ্যে অ্যামিবা (Entamoeba Histolytica) ও জিয়ার্ডিয়াই প্রধান, তবে কিছু ম্যালেরিয়া জ্বরেও পুরোপুরি আন্ত্রিক লক্ষণ প্রকাশ পায়।

আর এ দেশে আন্ত্রিক রোগে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে বিভিন্ন কৃমি গোষ্ঠীর—সেকথাও মনে রাখা দরকার। তারা একক বা অন্য জীবাণুদের সঙ্গে মিলে এমন উপদ্রব ও উপসর্গসমূহ সৃষ্টি করতে পারে যার কোন্‌টি প্রাথমিক কারণ বলা কষ্ট হয় এবং একই সঙ্গে এক অঞ্চলের অনেকে (বিশেষত শিশুরা) আক্রান্ত হয়ে সংক্রামক রোগের চেহারাও নিতে পারে।

সাধারণতঃ মলপরীক্ষা করেই জীবাণুদের সনাক্ত করা হয়। কিন্তু কোন রোগীর মল একবার মাত্র পরীক্ষা করেই পাওয়া কোন জীবাণুকে সেই রোগের আসল কারণ বলে স্থির করা সব সময় সম্ভব নয়। কারণ আক্রমণকারী বা তখনকার রোগ সৃষ্টিকারী সেই জীবাণু মলে অনেক সময় পর্যাপ্ত মাত্রায় থাকে না। অথচ অন্ত্রের সাধারণ বসবাসকারী অন্য জীবাণুরা যেকোন সময়ের মলে পাওয়া যেতে পারে। একইভাবে রক্ত বা সেরাম পরীক্ষায় (Serotyping) পুরাতন দীর্ঘস্থায়ী স্বাভাবিক আন্ত্রিক জীবাণুদের অ্যাণ্টিজেনিক রি-একশান (Reaction) সহজে ও স্বাভাবিক ভাবেই পাওয়া যায়। তা দিয়েও বলা যায় না সেটা তখনকার আক্রমণকারী জীবাণু কিনা। এই সঙ্গে আমাদের দেশে ল্যাবরেটরী পরীক্ষার স্বাভাবিক ত্রুটি ও অসুবিধাগুলির কথাও গুরুত্বসহকারে মনে রাখা দরকার।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান আন্ত্রিক মহামারীর প্রাথমিক অনুসন্ধানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঐ মারাত্মক শিগেলা শিগী ব্যাকটিরিয়া পাওয়া গেছে। তবে সর্বত্র নয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে ঐ এণ্টারো-প্যাথজেনিক ই. কোলাই গোষ্ঠীর রয়েছে এবং রয়েছে অন্য ব্যাকটিরিয়া ও অ্যামিবারা। যেহেতু শিগেলা শিগী বহুবার পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আন্ত্রিক মহামারী সৃষ্টি করেছে, তাই এবারে কোন কোন রোগীর মলে তার উপস্থিতি দেখে তারাই একমাত্র কারণ বলা কষ্টকর। কারণ সংক্রামক রোগের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসাবে যে যোগাযোগ মাধ্যমের বিশিষ্ট ভূমিকা অর্থাৎ যে মাধ্যম দিয়ে জীবাণুরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সহজে ছড়িয়ে পড়ে, তা নির্দিষ্টভাবে প্রমাণ করা যায় নি। বহু দূরে দূরে অবস্থিত বিভিন্ন জেলার, প্রত্যক্ষ মাধ্যমহীন অঞ্চল সমূহে এবার বিচ্ছিন্নভাবে আন্ত্রিক রোগ দেখা দিয়েছে। তাই একই জীবাণু এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গেল কী করে তা খুঁজে দেখা ও প্রমাণ করা একান্তভাবে প্রয়োজন। অন্যথায় বলতে হবে এই জীবাণুই এবারের আন্ত্রিক মহামারীর একমাত্র কারণ নয়। অন্য প্রাথমিক কারণ কিছু রয়েছে, আর শিগেলা শিগী স্বাভাবিক আন্ত্রিক জীবাণু হিসাবে উপস্থিত মাত্র।

যাই হোক এই রোগের বর্তমান প্রকোপ ও তার পুনরাক্রমণ ঠেকাতে হলে সামগ্রিকভাবে ডিসেন্ট্রি রোগের মূল কারণ দূর করার কাজে কিছু আশু ও দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে এই আন্ত্রিক রোগের প্রাদুর্ভাব বর্তমান পৃথিবীর মূলত অনুন্নত দেশ সমূহে এবং তারও অনুন্নত অঞ্চল সমূহেই প্রবল। অশিক্ষা ও দারিদ্র্যজনিত নিম্নতর জীবনযাপন ও জীবনধারণের নিম্নতর মান এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশেই এই রোগের মূল কারণ। যে কোন কারণেই সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা বিঘ্নিত হলে এবং অস্বাস্থ্যকর ঘন বসতির ফলে আর সাধারণ পরিবেশ দূষিত হলে—বিশেষ করে স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য ও পানীয় জলের সমস্যা প্রকট হলে—এই রোগের হঠাৎ বিষময় প্রকোপ দেখা দেয়। তাই যুদ্ধ, উদ্বাস্তু সমস্যা, জেলখানা, ক্যাম্পজীবন, মেলা, বড় উৎসব প্রভৃতিতে হঠাৎ একত্রে বহুলোকের সমাগম ও একত্রে খাদ্য পানীয় গ্রহণের দ্বারা ঘনীভূত বসবাসের ফলে ডিসেন্ট্রি ও অন্যবিধ আন্ত্রিক রোগের মারাত্মক প্রাদুর্ভাব ঘটে। আমাদের দেশে শহরে ও শহর সংলগ্ন অবহেলিত অস্বাস্থ্যকর বস্তী অঞ্চলে এবং পানীয় জলের অভাবক্লিষ্ট দরিদ্র পল্লী অঞ্চলই তাই বারে বারে এই রোগে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়। পশ্চিমবঙ্গে এবারের আন্ত্রিক মহামারীর প্রধান কারণ এইখানেই। সমস্যা সমাধানের জন্য রোগ চিকিৎসার ঔষধের ব্যবস্থাই বড় কথা নয়। কারণ জীবাণু ধ্বংসকারী নির্দিষ্ট ঔষধ ছাড়াই সাধারণ লাক্ষণিক চিকিৎসায় এই রোগে বৃহত্তর অংশ আয়ত্তে আসে। অল্প কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ ঔষধের প্রয়োজন হয়। বেশী দামী ও বেশী কার্যকরী অ্যাণ্টিবায়োটিক ঔষধের প্রয়োগ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাই বাহুল্যমাত্র এবং তার অনেক ক্ষেত্রে বিপজ্জনকও। বাস্তবে এই রোগ দমনে সর্বাগ্রে চাই সবার জন্য শুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের উন্নতি, সাধারণ খাদ্য দূষণের প্রতিকারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সর্বোপরি বৃহত্তর জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান, চিন্তা, চেতনা ও অভ্যাস চর্চা।

এই উদ্দেশ্যে সরকারী ও বেসরকারী অনেক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যেসব কথা প্রচার করা হয়েছে তা খুবই প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ। যেমন (1) পানীয় জল ফুটিয়ে খাওয়া, (2) খাবার আগে সাবান দিয়ে ভাল করে হাত-মুখ ধোয়া (বিশেষ করে বাচ্চাদের খাওয়ানর আগে), (3) রাস্তায় বা হাটে-বাজারে খোলা বিক্রি পূর্ব-প্রস্তুত খাবার বা কাটা ফলাদি খাওয়া বন্ধ করা, (4) যেখানে সেখানে মলত্যাগ না করা এবং উন্মুক্ত স্থানে বাচ্চাদের মলাদি না ফেলা, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে জলাশয়ের নিকট, (5) মাছির উপদ্রব কমান এবং (6) ব্যবহার্য সমস্ত জলকে জীবাণুমুক্ত করার ব্যবস্থা ইত্যাদি। তবে তাত্ত্বিক প্রচারের দিক থেকে এগুলি যত সহজ ও সত্যিই প্রয়োজনীয় হোক তার ব্যবহারিক দিক কতটা সহজ ও বাস্তবসম্মত সেটা বিশেষ করে ভেবে দেখতে হবে।

প্রথম কথা—পানীয় জল ফুটিয়ে জীবাণুমুক্ত করা সহজ হলেও সকলের সারাদিনের অন্য ব্যবহার্য জলের কতখানি কি করা যাবে? কারণ যে শিগেলা শিগী ব্যাকটিরিয়া নিয়ে এখন হৈ-চৈ পড়েছে তাকে যদি মূল কারণ ধরা যায় তবে তার আক্রমণ ক্ষমতা যে সাংঘাতিক! মারাত্মক টাইফয়েড

রোগের জীবাণু যে কোন শরীরে রোগ সৃষ্টি করতে হলে কমপক্ষে একসঙ্গে এককোটি (10^7) জীবাণুর প্রয়োজন। তার কমে রোগলক্ষণ প্রকাশ পায় না। আর মারাত্মক কলেরা জীবাণু কম করে দশকোটি (10^8) কোন শরীরে প্রবেশ না করলে কলেরা রোগ হয় না। স্বেচ্ছাসেবীদের উপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে একসঙ্গে দশকোটি তাজা কলেরা জীবাণু খাইয়ে সবার মধ্যে রোগ সৃষ্টি করা যায় নি। তাদের মাত্র শতকরা 25 জনের রোগলক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। অবশিষ্ট শতকরা 75 জনই ঐ জীবাণুকে হজম করে ফেলেছে। (সাধারণ শরীরের এমনি সহজাত প্রতিষেধক শক্তি)। আর শিগেলা শিগীর বেলায় ঘটনা অন্যরূপ। মাত্র একশতটি ব্যাকটিরিয়া কোনরকমে পেটে ঢুকলেই মারাত্মক রোগলক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে। কি সাংঘাতিক এর বিষক্রিয়া এবং আক্রমণ ক্ষমতা! তাই সাধারণ মুখ-হাত ধোয়া, স্নান করা, বাসনমাজা, কাপড়কাচা, ঘরমোছা এবং শৌচকার্যাদি অন্যান্য প্রয়োজনে যে জলের দরকার তা কিভাবে জীবাণুমুক্ত করা যাবে সেটাই এক্ষেত্রে বড় সমস্যা। কারণ ঐ জল দূষিত হলে তার থেকে যে কোন ভাবে মাত্র একশতটি জীবাণু যে কোন সময়ে শরীরে ঢুকে পড়তে পারে আর বিপদ ঘটাতে পারে। সুতরাং শুধুমাত্র পানীয় জল ফুটিয়ে খেলেই শিগেলা শিগীর বিরুদ্ধে কোন নিরাপত্তা হয় না।

আর মহামারীর সময় সারা দেশজুড়ে সবাইকে জল ফুটিয়ে খাওয়ার উপদেশ দেওয়া কতটা বাস্তবসম্মত? যে দারিদ্র্য ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশই এই আক্রমণের মূল কারণ সেই বৃহত্তর অসচ্ছল পরিবারে অবিরত জল ফোটানর মত জ্বালানী সংগ্রহ সম্ভব নয়। অন্য জলের সমস্যাও এ বছর অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে। দীর্ঘ কয়েক মাস অনাবৃষ্টির ফলে প্রকৃতি নির্ভর জলসম্পদ শুকিয়ে উঠেছে। তারই উপর অবৈজ্ঞানিক পন্থায় কৃষি সম্প্রসারণের উম্মাদনায় জলের ব্যবহার বহুগুণ বেড়েছে। শহরতলীসহ গ্রামাঞ্চলে নানাভাবে শিল্প প্রসারে জলের প্রয়োজনীয়তা ও তার দূষণের সমস্যাও ক্রমেই বাড়ছে। বারমাস চাষের ব্যবহারে সেচকার্যে খালবিল বড় জলাশয় এমন কি সাধারণ গৃহস্থের পুকুরগুলিও এ বছর শুকিয়ে ফেলা হয়েছে। ছোট নদীগুলির একই অবস্থা। বড় নদীগুলির উপরের দিকে সেচের জন্য ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে বৃহৎ জলাধার তৈরির ফলে তার নিম্নাংশ শুকনো ও ভরাট হয়েই চলেছে। আবার সেচের জন্য ব্যাপক হারে অগভীর নলকূপ বসিয়ে ভূগর্ভস্থ সাধারণ জলস্তরটিকেও নিঃশেষ করা হয়েছে। দেশজুড়ে অগভীর নলকূপগুলির বেশীর ভাগই এবছর অকেজো হয়ে পানীয় জলের সমস্যাকে প্রবলতর করেছে। তাতে একদিকে চাষ নষ্ট, অন্যদিকে বৃহত্তর জলসঙ্কট। এই অস্বাভাবিক জলসঙ্কটই এ বছর ব্যাপক জলদূষণ ও আন্ত্রিক রোগের প্রধান কারণ। তাই ব্যাকটিরিয়া আক্রমণের গুরুত্বটা পরবর্তী পর্যায়ের গৌণ কারণ, প্রথম কারণ নয়। যে কোন ভাবেই হোক রোগের সূত্রপাতে স্বল্প পরিমিত জলাশয় বা খানা ডোবাগুলিতে সেই রোগজীবাণু ধারাবাহিক ভাবে ক্রমান্বয়ে জমে উঠে মহামারীর আকার নিচ্ছে।

আবার এই কৃষি সম্প্রসারণের মাতামাতিতে গ্রামাঞ্চলের সাধারণ পতিত জায়গা, বড় বড় রাস্তার দু-ধার, নদী খালবিলের পার্শ্বস্থ অঞ্চল, এমন কি শ্মশান ও পশুচারণ ভূমি সবই কেটেকুটে চাষের কাজে এমন ভাবে লাগান হয়েছে যাতে বুনো গাছপালা জন্মাবার কোন সম্ভাবনাই নেই। গাছ যা ছিল সব কেটে শেষ করা হচ্ছে। সাধারণ বনাঞ্চল বলতে কিছু নেই। সরকারী সংরক্ষিত বনাঞ্চলও নিরাপদ নয়। গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণের জ্বালানী সমস্যার এইটাই বড় কারণ। দীর্ঘ অনাবৃষ্টির মূলেও এই ব্যাপক বৃক্ষধ্বংস অন্যতম কারণ। আবার ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণও এই কারণেই কমে যাচ্ছে। সুতরাং আন্ত্রিক মহামারীর মূলে যে ব্যাপক, জটিল পারিপার্শ্বিক ও পরিবেশগত সমস্যা রয়েছে তার বিজ্ঞানসম্মত সমাধানের চেষ্টা না হলে এই রোগের ভবিষ্যৎ আক্রমণ ঠেকান যাবে না।

তবে প্রকৃতির নিয়মে সব মহামারীই একদা আপনা থেকে প্রশমিত হয়। অধিকাংশ মহামারী রোগের একটা স্থানীয় কাল বা সীজন (Season) আছে। সেই সময়কালের পরে তা আপনিই থেমে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে তা একবর্ষকাল পর্যন্ত কমবেশী গড়াতে পারে। সেইরকম ভাবের একটা ভাগ্যবাণী ঘোষণা সরকারি ভাবে করা হয়েছে, যা বিজ্ঞানসম্মত যুগে একান্ত বেদনাদায়ক। রোগের আক্রমণে সাধারণভাবে শরীরে সেই রোগের বিরুদ্ধে একটা প্রতিষেধক শক্তি বা অনাক্রম্যতা (Immunity) তৈরি হয়। সাধারণ জনসংখ্যার বেশীর ভাগ লোকের মধ্যে সেই অনাক্রম্যতা শক্তি তৈরি হলেই সেই রোগের প্রাদুর্ভাব কমে যায়। বর্তমান যুগে কৃত্রিম উপায়ে টিকা বা ভ্যাকসিন দিয়ে বৃহত্তর জনগণের মধ্যে এই অনাক্রম্যতা শক্তি অর্জন সম্ভব। আন্ত্রিক রোগ সমূহের বিরুদ্ধেও তা করা যায়। কিন্তু তার যথার্থ প্রস্তুতি এখনও এদেশে নেই। সাধারণ জনস্বাস্থ্য বিশেষ করে ব্যাপক সংক্রামক রোগগুলির বিরুদ্ধে আগে থেকে রোগ নিবারণ বা প্রতিষেধকের ব্যবস্থা যে রোগের চিকিৎসার চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ (Prevention is better than cure)—সেই আদর্শবাণী কবে এদেশে কার্যকরী হবে?

গ্যালিলিও গ্যালিলি

রতনমোহন খাঁ*

দু-হাজার বছরের প্রাচীন ভূকেন্দ্রীয় ধ্যান-ধারনাকে পুরোপুরি নস্যাৎ করে কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রীয় মতবাদকে যিনি পরীক্ষালব্ধ তথ্যের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, বস্তুর গতি ও স্থিতি সম্বন্ধীয় সুপ্রাচীন অ্যারিস্টটলীয় মতবাদকে সম্পূর্ণ ভুল প্রতিপন্ন করে যিনি আধুনিক বলবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যার সূচনা
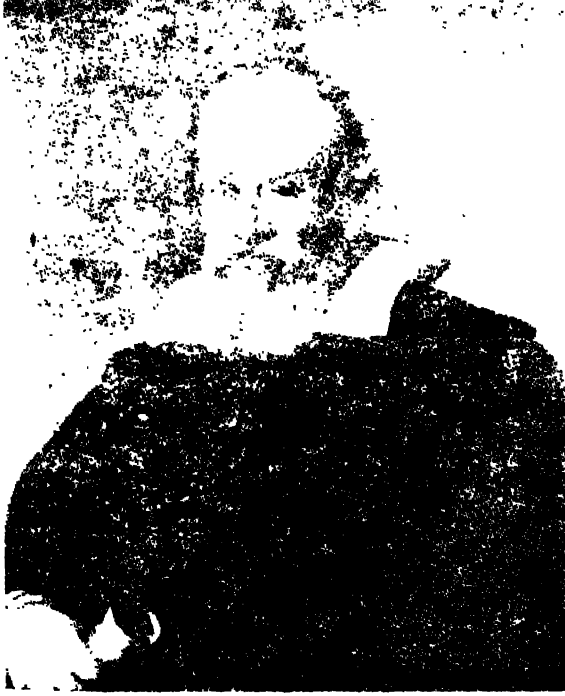
গ্যালিলিও গ্যালিলি

করেছিলেন, যিনি রজার বেকনের পরীক্ষালব্ধ তথ্যের গাণিতিক যুক্তি-নির্ভর বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধানের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন, তিনি হলেন গ্যালিলিও গ্যালিলি।

গ্যালিলিও ইটালীর পিসা নগরে 1564 খৃস্টাব্দে 18ই ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। ঠিক ঐদিনই রোমে বিখ্যাত ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী মিকেলাঞ্জেলোর মৃত্যু হয়। আবার আর একটি কাকতালীয় ঘটনা হলো 1642 খৃস্টাব্দে 8ই জানুয়ারী ফ্লোরেন্সের নিকট গ্যালিলিওর মৃত্যুর দিনেই সুদূর ইংলণ্ডের লিনকনসায়ারে নিউটনের জন্ম হয়। একদিকে কলা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের বিরাট গৌরবময় অধ্যায় আর অন্যদিকে বিজ্ঞানের উজ্জ্বল সম্ভাবনা। এ-দুয়ের মধ্যে সেতু বন্ধন করেছিলেন গ্যালিলিও। পিতা ভিন্সেঞ্জিও গ্যালিলি এক দরিদ্র সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান ছিলেন। গণিত ও সঙ্গীতে ছিল তাঁর অনুরাগ। পিতার এসব গুণ গ্যালিলিও যেন জন্মসূত্রেই পেয়েছিলেন। গণিত, সঙ্গীত ও চিত্রাঙ্কন ছিল তাঁর খুব প্রিয়। ভ্যালোম রোসার ধর্মীয় আবাসিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় গ্যালিলিওর। শৈশবেই সাহিত্যে ও গণিতে তাঁর বিশেষ অনুরাগ ও আসক্তি পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পিতাকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন বিজ্ঞান-শিক্ষকের বাৎসরিক মাহিনা ছিল 60 স্কুডি (প্রায় 215 টাকা) আর একজন চিকিৎসাবিদ্যার শিক্ষকের বাৎসরিক মাহিনা ছিল 2000 স্কুডি (প্রায় 7167 টাকা)। স্বীয় পরিবারের দারিদ্র্যের কথা, সামাজিক মর্যাদার কথা ভেবে ভিন্সেঞ্জিও পুত্রকে পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য ভর্তি করে দেন। এই বিদ্যা অর্জনে গ্যালিলিওর কোন উৎসাহ ছিল না।

1582 খৃস্টাব্দে একটি ঘটনা গ্যালিলিওর জীবনে বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। বয়স তখন মাত্র আঠারো বছর। একদিন পিসার গির্জার ভিতর ছাদ থেকে ঝোলান ব্রোঞ্জের প্রদীপের দোলন লক্ষ্য করে তাঁর মনে হলো একবার দুলতে কত সময় লাগে মাপতে হবে। দোলনের দিকে লক্ষ্য রেখে এক হাতে অপর হাতের নাড়ীর স্পন্দন গুণে তিনি নিজেই স্তম্ভিত হলেন। দেখলেন প্রদীপটি জোরে বা আস্তে যেভাবেই দুলুক না কেন, প্রতি বারেই প্রদীপটির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আসতে একই সময় লাগছে। বাড়ীতে এসে সুতোয় ভারী বস্তু ঝুলিয়ে একই ফল পেলেন। কিন্তু গণিতে বিশেষ জ্ঞান না থাকায় এর কারণ ব্যাখ্যা করতে পারলেন না। গণিত শিক্ষার সুযোগ এসে গেলো আকস্মিকভাবে। অসটিলিও রিসি নামে এক বিখ্যাত গণিতবিদের জ্যামিতি শিক্ষণে তিনি মুগ্ধ হন ও তাঁরই সহায়তায় অবসর সময়ে গণিতের উপর পড়শুনা করতে থাকেন। চিকিৎসাবিদ্যার ক্লাস ফাঁকি দিয়ে প্রায়ই তিনি গণিতের ক্লাসে বসে থাকতেন। অবশেষে পিতা তাঁকে গণিত পড়তে অনুমতি দেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি গণিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ

* 10, গ্যালিফ স্ট্রীট, ব্লক—6, স্যুট—71, কলিকাতা-700003

করেন। তারই ফল হিসাবে পাওয়া গেল—দোলকের ধর্মের গাণিতিক ব্যাখ্যা, প্রতিষ্ঠিত হলো দোলকের সমগতীর (isochronism) তত্ত্ব, প্রচারিত হলো—দোলকের দোলনকাল পিণ্ডের ভরের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে সুতোর দৈর্ঘ্যের উপর ও পৃথিবীর আকর্ষণজনিত ত্বরণের উপর। হিউজেন্স পরে এই তত্ত্ব ঘড়ি নির্মাণে কাজে লাগান।

1586 খৃস্টাব্দে উদ্‌স্থিতির তুলাদণ্ডের (hydrostatic balance) উপর প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম বিজ্ঞান প্রবন্ধ, এরপর প্রকাশিত হয় 1588 খৃস্টাব্দে ঘনবস্তুর ভারকেন্দ্রের উপর প্রবন্ধ। এসব কাজের জন্য গ্যালিলিওর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে ও ছাব্বিশ বছর বয়সে 1589 খৃস্টাব্দে মাত্র মাসিক কুড়ি টাকা মাহিনায় পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অধ্যাপনা ও গবেষণায় উৎসর্গিত হলো জীবন। বলবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যা বিষয়ে আরিস্টটলীয় ধ্যানধারণা যে সম্পূর্ণ ভুল তা ধীরে ধীরে উম্মোচিত হলো এবং প্রকৃত সত্যের বিকাশ ঘটল। পতনশীল বস্তুর গতি ভরের উপর নির্ভর করে না, এই সত্যটি তিনি প্রমাণ করলেন সবার সামনে লিনিং টাওয়ারে। এই স্তম্ভের চূড়া থেকে তিনি একটি ছোট বল ও তার এক-শ' গুণ ভারী আর একটি বলকে একসঙ্গে ছেড়ে দিলেন। গ্যালিলিওকে অনেকে পাগল ভাবত, তাই সবাই ভাবল এটাও তাঁর এক পাগলামী। অধিকতর ভারী বস্তু আগে মাটিতে পড়বে, এতে আর সন্দেহের কি আছে? কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা সেরা পণ্ডিতদের ভুল ভেঙ্গে গেল, দুটি বস্তুই সশব্দে একসঙ্গে স্তম্ভের পাদদেশে পতিত হলো। গতিবিজ্ঞানের ধারা বদলে গেল। গ্যালিলিওর খ্যাতি অনেকের ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়াল। পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বৎসরের মেয়াদ শেষ হবার আগেই তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। ঐ সময়েই তাঁর পিতারও মৃত্যু হয়। একদিকে অর্থাভাব অন্যদিকে সংসারের পুরো দায়িত্ব, ফলে গবেষণা ও পড়াশুনায় এলো অনেক বাধা। এই দুর্দিনে ভেনিসের মন্ত্রণাসভা তাঁকে পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয় বৎসরের মেয়াদে গণিতে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত করে।

গ্যালিলিও দীর্ঘ আঠারো বছর পাদুয়াতে কাজ করেন। এখানেই দূরবীণ তৈরি করে পর্যবেক্ষণ করেন সৌরমণ্ডল ও বিভিন্ন তারামণ্ডল। গ্যালিলিও দূরবীন যন্ত্রের প্রকৃত আবিষ্কারক নন। 1609 খৃস্টাব্দে তিনি শুনলেন হল্যাণ্ড দেশে জ্যানসেন ও লিপারসে নামে দুই চশমা বিক্রেতা একটি নলে দুটি আতস কাচ লাগিয়ে দূরের বস্তুকে কাছে দেখার এক খেলনা বানিয়েছে। গ্যালিলিও খুব বিচলিত হলেন। আলোর তত্ত্বগুলি খুঁটিয়ে ভাবতে ভাবতে নলের একদিকে উত্তল ও অপরদিকে অবতল লেন্স লাগাবার চিন্তা মাথায় এল। দূরবীন তৈরি হলো দূরের গ্রহ-নক্ষত্রাদি কাছে ধরা দিল। ভেনিশের বহু সম্ভ্রান্ত ও প্রবীণ ব্যক্তি দূরবীনে চোখ রেখে দূরের জাহাজকে সামনে দেখে স্তম্ভিত হলেন। পাদুয়ায় গ্যালিলিওর চাকুরী স্থায়ী হল এবং মাহিনাও দ্বিগুণ বেড়ে গেল। উৎসাহের সঙ্গে গ্যালিলিও দূরবীনে আকাশপথে পাড়ি জমালেন। চাঁদের কলঙ্কের কারণ জানা গেল, বহু দিনের বহু রূপকথার অবসান ঘটল। চাঁদে আছে পাহাড়, আছে খাদ। কোন কোন পাহাড়ের উচ্চতা পাঁচ থেকে সাত মাইল। এগুলিই হলো চাঁদের কলঙ্ক। তিনি আরো সিদ্ধান্তে এলেন যে, পৃথিবী থেকে যেমন চাঁদকে দেখায়, চাঁদ থেকেও পৃথিবীকে অনুরূপ দেখাবে। গত দু-দশকে চাঁদের মাটি থেকে নভোশ্চরেরা স্বচক্ষে এদৃশ্য দেখেছেন। 1610 খৃস্টাব্দে 7ই জানুয়ারী থেকে 13ই জানুয়ারী ক্রমাগত বৃহস্পতির দিকে দূরবীন রেখে গ্যালিলিও আবিষ্কার করলেন—পৃথিবীর যেমন উপগ্রহ চাঁদ, বৃহস্পতির ঐরূপ চারটি উপগ্রহ আছে। কোপারনিকাস বলেছিলেন—মানুষের যদি দৃষ্টিশক্তি বহুগুণ বেড়ে যায়, তবে শুক্র ও মঙ্গল গ্রহের চাঁদের মত হ্রাস-বৃদ্ধি চোখে পড়বে। গ্যালিলিও তাঁর দূরবীনে এই হ্রাস-বৃদ্ধি পরীক্ষা করে নিশ্চিৎ হলেন যে—কোপারনিকাসের মতবাদ সম্পূর্ণ অভ্রান্ত। গ্যালিলিওর দূরবীন যথেষ্ট শক্তিশালী না হওয়ায় শনির বলয় পুরোপুরি ধরা পড়ে নি। 1611 খৃস্টাব্দে দূরবীনে সূর্যকে একটানা কিছুদিন লক্ষ্য করে বেশ কিছু কালো দাগ ধরা পড়ল। দাগগুলি সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। কখনও কখনও কতকগুলি মিশে যায় আবার কখনও একটি ভেঙ্গে অনেকগুলি হয়। আরো বিস্ময়ের ব্যাপার হলো দাগগুলি ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয় ও আঠাশ দিন পর আবার দেখা দেয়। এই নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে গ্যালিলিও সিদ্ধান্ত এলেন—সূর্য নিজ মেরুদণ্ডের উপর আঠাশ দিনে একবার ঘুরছে। ছায়াপথের রহস্যও ভেদ হলো। অসংখ্য তারার সমাবেশই হল ছায়াপথ। আপাতদৃষ্টিতে অনেক তারা একটি তারা বলে মনে হলেও দূরবীণে যুগ্মতারা হিসাবে দেখা গেল।

পাদুয়াতে আঠারো বছর শিক্ষকতা ও গবেষণা করেও গ্যালিলিওর মন ভরল না। শিক্ষকতাকে বাদ দিয়ে পুরোপুরি গবেষণায় লিপ্ত হবার জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। 1610 খৃস্টাব্দে তাঁর শিষ্য ও বন্ধু টস্‌কানির গ্রাণ্ড ডিউক দ্বিতীয় কসমো ফ্লোরেন্সে আসার জন্য অনুরোধ জানালেন। গ্যালিলিওর জন্মস্থল পিসানগরী ফ্লোরেন্সের কাছেই। গ্যালিলিও জন্মস্থানের আকর্ষণে বাঁধা পড়লেন। কিন্তু এটিই তাঁর জীবনের মারাত্মক ভুল। পাদুয়া ছিল পোপের প্রভাবমুক্ত আর অন্যদিকে টস্‌কানি ছিল রোমান ক্যাথলিক পোপের অধীনে। গ্যালিলিওর শত্রুরা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ছাড়ল না। পোপের কাছেই নালিশ গেল—গ্যালিলিও বাইবেল বিরোধী মতবাদ প্রচার করছেন। তিনি কোপানিকাসের সূর্যকেন্দ্রীয় মতবাদে বিশ্বাসী, অ্যারিস্টটলীয় মতের বিরোধী। 1615 খৃস্টাব্দে পোপ পঞ্চম পল গ্যালিলিওকে রোমে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আদেশ দিলেন। গ্যালিলিও মহামান্য পোপকে তাঁর আবিষ্কারগুলির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ মোচনে কিছুটা সার্থক হলেন। এতে গ্যালিলিওর উৎসাহ বেড়ে

গেল। রোমেই তিনি যন্ত্রপাতির সাহায্যে তাঁর আবিষ্কারগুলি ব্যাখ্যা করতে ব্যস্ত হলেন। বিরোধীরা আর সহ্য করতে পারল না। পোপের উপর তারা নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করতে লাগল। পোপ ঘোষণা—করলেন—কোপার্নিকাসের মত বাইবেল বিরোধী, কোপার্নিকাস ও কেপলারের বইয়ের প্রচার ও বিক্রয় আইনবিরুদ্ধ। গ্যালিলিওর উপর আদেশ হলো—তাঁর দীর্ঘদিনের গবেষণালব্ধ মতসমূহের প্রচার ও শিক্ষণ দণ্ডনীয়। ভগ্ন হৃদয়ে গ্যালিলিও ফ্লোরেন্সে ফিরে এলেন। গ্যালিলিও ধর্মদ্বেষী ছিলেন না, কিন্তু ধর্মে তাঁর অন্ধবিশ্বাস ছিল না। যা সত্য বলে বুঝেছিলেন তা ত্যাগ না করে, তিনি নীরবে গবেষণায় লিপ্ত হলেন। বলবিদ্যা ও উদস্থিতিবিদ্যা সম্পর্কে বহু মূল্যবান গবেষণা এই সময়ই সম্পাদিত হয়।

1623 খৃস্টাব্দে কার্ডিনাল বার্বেরিনো অষ্টম উর্বান নামে পোপ-পদে অভিষিক্ত হন। বার্বেরিনো ছিলেন গ্যালিলিওর বন্ধু। গ্যালিলিও রোমে এসে নতুন পোপকে অভিনন্দন জানালেন এবং ধূমকেতু বিষয়ে প্রকাশিত গ্রন্থ Il Saggiatore পোপের নামে উৎসর্গ করলেন। পোপ সন্তুষ্ট হলেন। কোপার্নিকাস ও টলেমীর দুই বিপরীত মতবাদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য গ্যালিলিও তাঁর গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশের বাসনা বহুদিন থেকেই মনে মনে পোষণ করছিলেন। পোপের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে 1632 খৃস্টাব্দে টলেমী ও কোপার্নিকাসের জ্যোতিষ সম্পর্কে কথাবার্তা (Dialogue concerning the two chief systems of the world, the Ptolemic and the Copernican) নামক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থটি ফ্লোরেন্স থেকে প্রকাশিত হয়। কাল্পনিক চরিত্রের তিন ব্যক্তির কথোপকথনের মধ্য দিয়ে অতি সুন্দরভাবে গ্যালিলিওর নিজস্ব মতবাদটি এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয়েছে। স্যালভিয়াতি, সিমপ্লিসিও ও সাগ্রেদো এই পুস্তকের তিন প্রধান কাল্পনিক চরিত্র। প্রথম জন কোপার্নিকাস মতাবলম্বী, দ্বিতীয় জন গোঁড়া অ্যারিস্টটলপন্থী আর তৃতীয় জন নিরপেক্ষ বিদূষক। এই গ্রন্থ অ্যারিস্টটলপন্থীদের রোষে ঘৃতাহুতির কারণ হলো। তারা প্রতিনিধি পাঠিয়ে পোপের কাছে অভিযোগ জানাল—গ্যালিলিও পূর্বতন পোপের নিষেধাজ্ঞা শুধু অমান্যই করেন নি, সিমপ্লিসিও চরিত্রটি প্রকৃতপক্ষে পোপকে অপদস্থ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে রোমের ইনকুইজিশন (Inquisition) থেকে তলব এলো। ইনকুইজিশন ধর্মদ্রোহীদের জন্য বিচারালয়। উচ্চপদস্থ ধর্মপ্রচারকগণ এখানের বিচারক। গ্যালিলিও অসুস্থতার জন্য কিছুদিন সময় চাইলেন, তাও মঞ্জুর হলো না। 1633 খৃস্টাব্দে 14ই ফেব্রুয়ারী গ্যালিলিও রোমে পৌঁছলে, তাঁকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়। যে বিচারে পর্যবেক্ষণমূলক জ্যোতিষের রূপকার দিনেমার টাইকো ব্রাহেকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়েছিল, গিওর্ডানো ব্রুনোকে ছয় বৎসর কারাবদ্ধ রেখে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল, বিচিত্র রামধনুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকর্তা এন্টোনিও ডমিনিসের কারাগারে মৃত্যু হয়েছিল, সেই বিচারের প্রহসন শুরু হলো 1633 খৃস্টাব্দের জুন মাসে সত্তর বছরের বৃদ্ধ বিজ্ঞানী গ্যালিলিওকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে। 21শে জুন থেকে 24শে জুন পর্যন্ত লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে এই ভয়াবহ বিভৎস বিচার। বস্ত্রাদি খুলে দৈহিক অত্যাচার ছিল এই বিচারের অন্যতম পদ্ধতি। সম্ভবতঃ বিজ্ঞান-তপস্বী গ্যালিলিও বার্ধক্যের জন্যেও এই অত্যাচার থেকে রক্ষা পান নি। দারুণ দুশ্চিন্তায় গ্যালিলিও ভেঙ্গে পড়েন। তার উপর কন্যার বার বার কাতর অনুরোধে গ্যালিলিও নতজানু হয়ে মার্জনা ভিক্ষা করেন ও অপরাধ স্বীকার করে এক প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করেন। বিচারকগণ তাঁর প্রতি নিম্নলিখিত আদেশ দেন।

(i) গ্যালিলিও পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে যে মত ও বিশ্বাস প্রচার করে এসেছেন তা প্রত্যাহার করতে হবে।

(ii) সারাজীবন না হলেও কিছুদিন কারাবাস করতে হবে।

(iii) প্রতি সপ্তাহে সাতটি অনুতাপসূচক প্রার্থনা করতে হবে।

গ্যালিলিও বাইবেল স্পর্শ করে নিম্নরূপ শপথ বাক্য উচ্চারণ করতে বাধ্য হন। "সূর্যকেন্দ্রীয় মতবাদ আদৌ সত্য নহে। আমার এতদিনের বিশ্বাস ও ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ। ভবিষ্যতে এরূপ অসত্য প্রচার কোনমতেই করব না।" কথিত আছে এই প্রতিজ্ঞাপত্র পড়ার পরেই গ্যালিলিও এক বন্ধুকে চুপি চুপি বলেছিল—পৃথিবী তবুও সচল। এই বিচারের পর গ্যালিলিও কিছুদিন রোমে অবরুদ্ধ ছিলেন। কিন্তু লজ্জায়, ক্ষোভে, অপমানে তাঁর শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। তখন সীনা নামক স্থানে তাঁকে পাঠান হয়। সীনা থেকে আরসেট্রীতে তাঁর পল্লীকুটিরে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়। এখানে তাঁর স্নেহময়ী কন্যা মাত্র ছয়দিন পিতার সেবাশুশ্রূষা করে তাঁরই বুকে মাথা রেখে চিরদিনের মত ঘুমিয়ে পড়ে। ভগ্নস্বাস্থ্য, জরাগ্রস্ত গ্যালিলিও এত দুঃখের মধ্যেও তাঁর বিজ্ঞান সাধনা থেকে বিরত হন নি। এ অবস্থাতেই গ্যালিলিও তাঁর সারা জীবনের পরিণত চিন্তা-ভাবনা দিয়ে বলবিদ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থটি রচনা করেন। এই গ্রন্থেই গতিসম্বন্ধীয় নিয়মগুলি সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই গ্রন্থখানিই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ। লা গ্রাঞ্জ এই গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—এই কাজের জন্য গ্যালিলিও জীবদ্দশায় কোন খ্যাতি পান নি, যেমন পেয়েছিলেন আকাশ গবেষণায়। কিন্তু সত্যকার গৌরব রয়েছে এই বলবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণায়। গতি, ত্বরণ, বল প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা নিউটনের নামে প্রচলিত হলেও এগুলি গ্যালিলিওর গ্রন্থ থেকে যে গৃহীত তাতে সন্দেহ নেই। গ্যালিলিওই গতিবিজ্ঞানের জনক। গ্রন্থখানি গ্যালিলিও প্রকাশ করতে সাহস পান নি। তাঁর এক ছাত্র হল্যাণ্ডে 1638 খৃস্টাব্দে এই গ্রন্থটি প্রকাশ করে।

গ্যালিলিওর জীবনের শেষ কয় বছর বড়ই করুণ, বড়ই মর্মস্পর্শী। 1637 খৃস্টাব্দে নজরবন্দী অবস্থায় তিনি সম্পূর্ণ

অন্ধ হয়ে যান। এই সময় তিনি এক বন্ধুকে লিখেছিলেন—"তোমার প্রিয়বন্ধু এখন সম্পূর্ণরূপে অন্ধ। এই বিশ্ব, অনন্ত নভোমণ্ডল, যার সম্বন্ধে বহু সত্য আমার আবিষ্কারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেসব এখন আমার কাছে রুদ্ধ। ভগবানের এই ইচ্ছায় আমি সন্তুষ্ট।' মহাকবি মিলটন ঊনত্রিশ বছর বয়সে ইটালী ভ্রমণ কালে এই অন্ধ জ্ঞানোবৃদ্ধের সঙ্গে দেখা করেন। ভাগ্যের কি পরিহাস—মিলটনও বৃদ্ধ বয়সে অন্ধ হয়ে যান। তাঁর বহু রচনায় এই অন্ধ ঋষিকল্প বিজ্ঞানীর স্মৃতি অস্পষ্টভাবে চিত্রিত। অবশেষে 1642 খৃস্টাব্দে 8ই জানুয়ারী মৃত্যু গ্যালিলিওর সমস্ত দুঃখের অবসান ঘটায়। তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর বিরোধীরা তাঁর স্মারক স্তম্ভ নির্মাণ করতে দেন নি। কিন্তু তিনি নিজেই তাঁর অমূল্য কাজে স্মারক স্তম্ভ রচনা করে চির অমর হয়ে আছেন।

হিরোসিমা দিবস

হিরোসিমা দিবস উপলক্ষ্যে আগামী 6ই আগস্ট (1984) সোমবার বেলা 2টায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ভবন (পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-6) থেকে গান ও পোস্টারসহ মৌন মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। সকল বিজ্ঞান ক্লাব, সমাজসেবী সংস্থা, সাংস্কৃতিক সংগঠন, স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের এই মিছিলে অংশগ্রহণের জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

শ্রীশিবচন্দ্র ঘোষ	ডঃ জয়ন্ত বসু	ডঃ সুকুমার গুপ্ত
আহ্বায়ক	সভাপতি	কর্মসচিব
হিরোসিমা দিবস উদযাপন কমিটি	বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ	বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ		

এফ. আর. এস এবং ভারতীয় বিজ্ঞানী

কমল চক্রবর্তী*

রয়্যাল সোসাইটি বলতে লণ্ডনের বিখ্যাত রয়্যাল সোসাইটিকে বোঝায়। এটি গ্রেট ব্রিটেনের সবচেয়ে পুরানো এবং সমগ্র ইউরোপের পুরানো এক বিজ্ঞান সংস্থা। এটির জন্ম 1660 খৃস্টাব্দ বলে চিহ্নিত করা হয়। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যাঁদের মৌলিক অবদান আছে তাঁদেরই সাধারণত এই সংস্থার সদস্যপদ দেওয়া হয়। এই সংস্থার সদস্যদের এফ. আর. এস. (F.R.S অর্থাৎ Fellow of Royal Society) বলা হয়। এ পর্যন্ত 24 জন ভারতীয় বিজ্ঞানী এই সংস্থার সদস্যপদ পেয়েছেন।

ভারতে প্রথম যিনি এই উপাধিতে ভূষিত হন তিনি হলেন আর্দাসীর কার্সেৎজী। ইনি ইঞ্জিনীয়ারিং-এ 1841 খৃস্টাব্দে এই উপাধি লাভ করেন। এর পর বহু বছর আর কোন ভারতীয় এই উপাধি পান নি। এক দীর্ঘ নীরবতার অবসান হল 1918 খৃস্টাব্দে যখন শ্রীনিবাস রামানুজন অঙ্কশাস্ত্রে দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে এই উপাধি পেলেন। এর পর অল্প কয়েক বছরের মধ্যে তিনজন ভারতীয় এই উপাধি লাভ করলেন এবং প্রত্যেকেই পদার্থবিদ্যায় কাজের জনাই তা পেলেন। এই তিনজনের প্রথমজন হলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। তিনি 1920 খৃস্টাব্দে পদার্থবিদ্যার কাজের জন্য এই উপাধি লাভ করেন, যদিও পরবর্তীকালে তিনি উদ্ভিদবিদ্যার জন্য বিশ্বে অধিক খ্যাতি লাভ করেন। এর পর 1924 খৃস্টাব্দে সি. ভি. রামন পদার্থবিদ্যার জন্য এই উপাধি পান এবং 1930 খৃস্টাব্দে তিনি পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান। তৃতীয় জন হলেন মেঘনাথ সাহা। ইনি পদার্থবিদ্যার কাজে 1927 খৃস্টাব্দে এই সংস্থার সদস্য হন। 1927 খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এই নিয়ে মোট পাঁচজন এই সংস্থার সদস্য হলেন। এর পর যিনি এই সংস্থার সদস্য হন তিনি হলেন বীরবল সাহানি। তিনি 1936 খৃস্টাব্দে জীবাশ্ম সংক্রান্ত বিজ্ঞানে কাজের জন্য এই উপাধি পান। তার পর আবার পদার্থবিদ্যার জন্য দু'জন এই সংস্থার সদস্যপদ পেলেন এবং তাঁরা হলেন কে. এস. কৃষ্ণান (1940 খৃস্টাব্দে) এবং হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা (1941 খৃস্টাব্দে)।

1942 খৃস্টাব্দের মধ্যে রসায়ন শাস্ত্রের জন্য কোন ভারতীয় এই সংস্থার সদস্য মনোনীত হন নি এবং প্রথম যিনি রসায়নে এই উপাধিটি পেলেন তিনি হলেন শান্তিস্বরূপ ভাটনগর (1943 খৃস্টাব্দে)। এর পরের বছর অর্থাৎ 1944 খৃস্টাব্দে জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যার জন্য আবার সদস্য হলেন বিজ্ঞানী এস. চন্দ্রশেখর। তিনি 1983 খৃস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তবে তিনি বর্তমানে মার্কিন নাগরিক। 1945 খৃস্টাব্দে পরিসংখ্যান বিদ্যায় (Statistics) কাজের জন্য সদস্য হলেন প্রশান্তচন্দ্র মহালনবীশ। অর্থাৎ পর পর তিনবছর তিনজন ভারতীয় বিজ্ঞানী এই সংস্থার সদস্য হবার সৌভাগ্য অর্জন করলেন। এর 12 বছর পর অর্থাৎ 1957 খৃস্টাব্দে আবার একজন বিজ্ঞানী ভূবিদ্যার জন্য এই উপাধি লাভ করলেন এবং তিনি হলেন বিজ্ঞানী ডি. এন. ওয়াদিয়া। এর পর 1958 খৃস্টাব্দে পদার্থবিদ্যায় দু-জন ভারতীয় একই সঙ্গে সদস্য হলেন। এ'রা দু-জনেই পশ্চিমবাংলার লোক। এ'রা হলেন বিজ্ঞানী শিশিরকুমার মিত্র এবং বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু। এর পর 1960 খৃস্টাব্দে আবার রসায়নে এই উপাধি পেলেন টি. আর. শেষাদ্রি।

উদ্ভিদবিদ্যায় (Botany) প্রথম সদস্য হলেন পঞ্চানন মহেশ্বরী 1965 খৃস্টাব্দে। এর পর 1967 খৃস্টাব্দে পরিসংখ্যানে এই উপাধি পেলেন সি. আর. রাও। প্রশান্তচন্দ্র মহালনবীশের পর ইনি দ্বিতীয় ভারতীয় যিনি পরিসংখ্যানে এই উপাধি পেলেন। এর পর আবার 1970 খৃস্টাব্দে সদস্য হলেন এম. জি. কে. মেনন, পদার্থবিদ্যার কাজের জন্য। এর পর উদ্ভিদবিদ্যায় পর পর দু-বছর অর্থাৎ 1972 এবং 1973 খৃস্টাব্দে এই সংস্থার সদস্য হলেন দু-জন। 1972 খৃস্টাব্দে হলেন বি. পি. পাল এবং 1973 খৃস্টাব্দে হলেন এম. এস. স্বামীনাথন।

1977 খৃস্টাব্দে জি. এন. রামচন্দ্রন, জৈব-রসায়নে কাজের জন্য এই উপাধি পেলেন এবং 1980 খৃস্টাব্দে ভূবিদ্যায় পেলেন বিজ্ঞানী দেবেন্দ্রলাল। এর পর যিনি এই সংস্থার সদস্য হলেন, তিনি হলেন অক্তার সিং পেন্টাল। ইনি 1981 খৃস্টাব্দে ওষুধ বা মেডিসিনের ওপর কাজ করে এই সম্মান লাভ করেন। সবশেষে যিনি এই সম্মান লাভ করেন, তিনি হলেন অধ্যাপক ওবেদ সিদ্দিকী। ইনি 1984 খৃস্টাব্দের 15ই মার্চ এই সংস্থার সদস্য হলেন জেনেটিক্সের ওপর কাজের জন্য। তিনি এর আগে 1976 খৃস্টাব্দে ভাটনগর পুরস্কার পান জৈব বিজ্ঞানের কাজের জন্য। বর্তমানে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর সহ-সভাপতি এবং ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর সদস্য।

এই আলোচনা থেকে মোটামুটিভাবে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের নাম ও তাঁদের বিষয় সম্বন্ধে জানা গেল এবং দেখা গেল যে পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে বেশী সংখ্যক বিজ্ঞানী এই সংস্থার সদস্য হয়েছেন। যাঁরা এই সংস্থার সদস্য হতে পেরেছেন, তাঁরা প্রকৃতপক্ষেই বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় নিজেদের কাজের জন্য স্বীকৃত হয়েছেন। ভারতের আরও অনেক বিজ্ঞানী তাঁদের কাজের জন্য এই সংস্থার সদস্য হতে পারবেন এ আশা আমরা করতে পারি।

---

* সুরেন্দ্রনাথ সান্ধ্য কলেজ, রসায়ন বিভাগ, কলিকাতা-700009

স্বপ্ন ও বিজ্ঞান

অমিয় রায়*

আমি যদি কাউকে বলি, আজ এই যে বিজ্ঞানের অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে, তার যদি দু-খানা পা থাকে, তবে একখানা পা সে নিঃসন্দেহে স্বপ্নের ঘাড়ের উপর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিশ্বাস হলো না তো? ...হয়তো বা বলবে যা অচেতন মনের কাণ্ডকারখানা তা আবার সত্যি হয় নাকি? স্বপ্ন, স্বপ্নই, তার সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন সম্পর্কই থাকতে পারে না।...আমিও বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু যা সত্যি তা অবিশ্বাস করে কোন লাভ আছে? তাকে আঁকড়ে থাকার মধ্যে হয়তো জেদ থাকতে পারে কিন্তু বাহাদুরী একেবারেই নেই। এবার আসল কথায় আসা যাক।

বেনজিন যে অ্যারোমেটিক যৌগের (aromatic compond) জনক তা আজ বিজ্ঞানসেবী মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করবেন। আর এই অ্যারোমেটিক যৌগের গুরুত্ব বিজ্ঞানের কাছে তথা আমাদের ব্যবহারিক জীবনে যে কত বেশী তা বলে শেষ করা যায় না। জার্মান রসায়নবিদ্ কেকুলে (F. A. Kekule) বেনজিন বলয়-কাঠামো (Bengene ring structure) প্রথম উদ্ভাবন করেন। কিন্তু যদি আমাদের জিজ্ঞাসা আর একটু এগিয়ে যায়, তবে আমরা জানতে চাইব, কেমন করে তিনি এটার ধারণা পেলেন? সে প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে 'স্বপ্ন'। না স্বপ্নের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া নয়, খুঁজে পাওয়া। তিনি একদিন বেনজিন-এর গঠন সম্পর্কে ভাবতে ভাবতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে স্বপ্ন দেখলেন, একটা সাপ তার লেজকে গালে করে শুয়ে আছে। ব্যাস পেয়ে গেলেন বেনজিন বলয়-কাঠামো, যার পরের কথা আমার আর না বললেও চলবে।

আর একটা যুগান্তকারী স্বপ্ন নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। তা লাভ করলো নোবেল পুরস্কার 1922 খৃস্টাব্দে। আমি বলতে চাইছি আধুনিক পরমাণু তত্ত্বের ভিত্তিস্থাপক ডেনমার্কের নোবেল পুরস্কারজয়ী—নীলস বোরের আধুনিক পরমাণু মডেলের আবিষ্কারের কথা। যে পরমাণু মডেলের খোঁজে তিনি বহু বছর অতিবাহিত করেছেন, তা একদা পাওয়া সম্ভব হয়েছিল ছোট্ট একটি স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি একদিন স্বপ্নে দেখলেন, জ্বলন্ত গ্যাসের সূর্যের উপর তিনি বসে আছেন। গ্রহগুলি তার চার পাশ দিয়ে সোঁ-সোঁ শব্দ করে ছুটে চলেছে। ছুটতে ছুটতে ভেঙে যাচ্ছে ক্রমাগত। আর সেই সূর্যকে তারা প্রদক্ষিণ করছে। তার সঙ্গে তারা যেন এক একটা সূক্ষ্ম সুতো দিয়ে বাঁধা। হঠাৎ গ্যাস জমে কঠিন হয়ে গেল। আর সেই মুহূর্তে তাঁর নিদ্রা ভঙ্গ হলো। তিনি বুঝলেন,—স্বপ্নে যেটা দেখলেন সেটাই পরমাণু মডেল। আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে সেই পরমাণু মডেলের দান অনস্বীকার্য। এবার ভাব তো পরমাণু মডেলের সঙ্গে সৌরজগতের সাদৃশ্যের উৎসটা কোথায় রয়ে গেছে?

আর একটা স্বপ্নের কথা বলা যাক। সেটা 1940 খৃস্টাব্দের ঘটনা। আমেরিকায় বেল টেলিফোন কোম্পানীর এক ইঞ্জিনীয়ার, যখন খবরের কাগজে পড়লেন, লণ্ডনে বোমা পড়ছে; অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। এই ঘটনার পর এক শরতের রাত্রিতে তিনি স্বপ্ন দেখলেন, তিনি যেন একটি যন্ত্রের নক্শা আঁকছেন, যা দিয়ে বিমান বিধ্বংসী কামানকে কোন কামানের পূর্ব নির্দিষ্ট পথে চালনা করা যায়। ফলে বিমানের গতির হ্রাস-বৃদ্ধিকে উপেক্ষা করে কামানের গোলা তাকে ধ্বংস করবেই। নিদ্রাভঙ্গ হলে—স্বপ্নে-আঁকা নক্সাটি এঁকে ফেললেন। পরিণতি লাভ করল একটি সেটে। যাতে সর্বপ্রথম ব্যবহার করা হল—রেডার। প্রখ্যাতনামা গুণকশাস্ত্রবিদ নবার্ট ভীনার (1894—1964) সেই সেট তৈরির বাণিজ্যিক প্রকল্পের অধিকারী হলেন।

সময় নিয়ে ভাবনা

এম. এ. আজিজ মিয়া**

'সময় নিয়ে ভাবনা' একটি নতুন প্রকল্প। বিগত জাতীয় বিজ্ঞান সপ্তাহ উপলক্ষে শরীয়তপুর মহকুমায় অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান মেলা ও প্রদর্শনীতে শরীয়তপুর সরকারী মহাবিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগ থেকে এটি প্রদর্শিত হয়েছে। অনেকেই একে পাগলামী মনে করে উপদেশ দিয়েছেন—এ ভাবনা ভাবনা। আবার অনেকেই একে নিরর্থক ভাবনা মনে করেন নি। তবে যে যা বলুক এ ভাবনা ভাবাবেই। এ ভাবনা আবহমান কাল ধরে বিজ্ঞানীদের ভাবিয়েছে এবং অনাগত ভবিষ্যতেও ভাবাবে। কেন না এটি কার্য-কারণ সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত। আমি বিজ্ঞানী নই—তবুও এ ভাবনা আমাকে রেহাই দিচ্ছে না। কিন্তু কেন ভাবনা? সে কথাই আমি বলতে চাই, প্রকাশ করতে চাই। তাই প্রথমেই আসে সময় কি? পরপর দুটি সংঘটিত ঘটনার

* গ্রাঃ—অশ্বিনী পল্লী, বারাসত, 24-পরগণা

** পদার্থবিদ্যা বিভাগ, শরীয়তপুর সরকারী মহাবিদ্যালয়, বাংলাদেশ

বিস্তৃতিকে আমরা সময় বলি। এটি একটি স্কেলার রাশি। এ পরিসরে আমি এর এককের দশমিক পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করছি।

আমরা জানি মৌলিক ভৌত রাশিসমূহের মধ্যে সময় অন্যতম। এককের পদ্ধতি তিনটি। সি. জি. এস. এফ সি. এস. ও এম. কে. এস. তিনটি পদ্ধতিতেই সময়ের একক সেকেণ্ড। এখন কথা হলো এক সেকেণ্ড সময় কতটুকু ? পৃথিবী অনবরত সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। এ ঘূর্ণনের ফলে প্রত্যহ সূর্যকে আমরা একবার মাথার উপর দেখতে পাই। সূর্যের এ অবস্থানে উত্তর দক্ষিণে যে কাল্পনিক রেখা টানা হয়েছে তাকে মধ্যরেখা বলে। এ মধ্যরেখাকে পরপর দু'বার অতিক্রম করতে পৃথিবীর যে সময় লাগে তাকে সৌরদিন বলে। কিন্তু বিভিন্ন ঋতুতে সৌরদিনের তারতম্য হওয়ায় বৎসরের 365 দিন 6 ঘণ্টাকে গড় সৌরদিন বিবেচনা করা হয়। 1956 খৃস্টাব্দে বৈজ্ঞানিক কাজের জন্য সেকেণ্ডের সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয় 1900 খৃস্টাব্দের সৌর বৎসরের $\frac{1}{31556925 \cdot 9747}$ অংশকে। যদিও বর্তমানে পারমাণবিক ঘড়ি অনুসারে 133 পারমাণবিক ভরবিশিষ্ট সিজিয়াম (Cs–133) পরমাণুর কম্পাঙ্কের ভিত্তিতে সেকেণ্ডের মান ধরা হয়। 1964 খৃস্টাব্দে একে অস্থায়ী ভাবে সময়ের একক হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা হাইড্রোজেন বা অন্য কোন মৌলের পরমাণুর কম্পাঙ্ককে অধিক সুবিধাজনক সময়ের একক হিসাবে পরিগণিত করা যাবে বলে মনে করেন।

কিন্তু যেভাবেই বিবেচনা করা হোক না কেন এ পদ্ধতি দশমিক পদ্ধতি নয়। এক দিনের 24 ভাগের এক ভাগকে বলা হয় এক ঘণ্টা, এক ঘণ্টার 60 ভাগের এক ভাগকে বলা হয় এক মিনিট এবং এক মিনিটের 60 ভাগের এক ভাগকে বলা হয় এক সেকেণ্ড। এর কোনটি দশমিক পদ্ধতির ধারার পড়ে না। বিগত 1940 খৃস্টাব্দ থেকে সারা বিশ্বে মেট্রিক পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়েছে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বা বৈজ্ঞানিক পরিমাপে এ পদ্ধতি যে কত সুবিধাজনক তা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। অবশ্য অস্বীকার করার উপায় নেই যে, পৃথিবীর বার্ষিক পরিক্রমণ কাল 365 দিন 6 ঘণ্টাকে কোন মতেই এ পদ্ধতিতে আনা যাচ্ছে না। তবে সৌরদিনকে একটি একক বিবেচনা করে দশমিক পদ্ধতির অন্যান্য উর্ধ্ব বা নিম্ন একক সমূহ নির্ধারণ করা যেতে পারে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে আমাদের দীর্ঘদিনের ব্যবহৃত সময়ের একক বাদ দিয়ে নতুন পদ্ধতির প্রচলনের দিকে যেতে আমাদের সংস্কারে বাঁধতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানে কোন সংস্কার থাকা ঠিক নয়। তাই অন্যান্য রাশির দশমিক পদ্ধতির এককের ন্যায় অনতিবিলম্বে সময়ের এককসমূহ দশমিক পদ্ধতির ভিত্তিতে হওয়া উচিৎ। তাতে কাজ করা কাজ মাপার এবং অন্যান্য সময় সংক্রান্ত হিসেবনিকাশের জটিলতা কমে যাবে। আমরা সময়ের সূক্ষ্ম পরিসরের সঙ্গে পরিচিত হয়ে অল্প সময়ে অধিক কাজ সম্পন্ন করে আমাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করার প্রয়াস পাব। কারণ বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির এযুগে আমাদের অতি অল্প সময়ে অধিক কাজ সম্পন্ন করা দরকার। একথা আজ কাউকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। তা আধুনিক যন্ত্র প্রকৌশল, আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান বা দৈনন্দিন জীবনের যে কোন দিকেই হোক না কেন।

সময়ের একক নিয়ে জটিলতার পথে না গিয়ে বর্ণিত সময়ের একক সমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন 1 কিলো মিনিটকে একদিন, 1 হেক্টো মিনিটকে এক মেট্রিক ঘণ্টা, এক মেট্রিক মিনিট, ডেসিমিনিট, সেণ্টিমিনিট, মিলিমিনিট বা মেট্রিক সেকেণ্ড ইত্যাদি। তবে এক্ষেত্রে এক হেক্টো মিনিট বা মেট্রিক ঘণ্টায় হবে 2 ঘণ্টা 24 মিনিটের সমান এবং এক মেট্রিক সেকেণ্ড হবে প্রায় প্রচলিত এক সেকেণ্ডের এক দশমাংশ। অবশ্য এখন সমস্ত ঘড়ির কারখানাগুলোকে নতুন করে যন্ত্রাংশ তৈরি করতে হবে এবং আমাদেরকে নতুন পদ্ধতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। তখন আমার বিশ্বাস সময়ের দশমিক পদ্ধতির প্রচলনের ফলে অধিক সুন্দর বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য গড়ে তোলার সহায়ক হবে। নিম্নে প্রস্তাবিত সময়ের একক সমূহের সঙ্গে প্রচলিত সময়ের এককের সম্পর্ক দেখানো হলো :—

প্রস্তাবিত সময়ের একক	প্রচলিত সময়ের এককের সঙ্গে সম্পর্ক
1 টেরামিনিট $= 10^{9}$ দিন	$27 \cdot 379 \times 10^{5}$ বৎসর
1 মাইগামিনিট $= 10^{6}$ দিন	$27 \cdot 379 \times 10^{2}$,,
1 মেগামিনিট $= 10^{3}$ দিন	$27 \cdot 379 \times 10^{1}$,,
1 কিলোমিনিট $= 10^{0}$ বা 1 দিন	24 ঘণ্টা
1 হেক্টো মিনিট বা 1 মেট্রিক ঘণ্টা $= 10^{-1}$ দিন	2 ঘণ্টা 24 মিনিট
1 ডেকা মিনিট $= 10^{-2}$	14 মিনিট 24 সেকেণ্ড
1 মেট্রিক মিনিট $= 10^{-3}$ দিন	1 মিনিট 26·4 সেকেণ্ড
1 ডেসি মিনিট $= 10^{-4}$ দিন	864×10^{-2} সেকেণ্ড
1 সেণ্টি মিনিট $= 10^{-5}$ দিন	864×10^{-3} ,,
1 মিলি মিনিট বা মেট্রিক সেকেণ্ড $= 10^{-6}$ দিন	864×10^{-4} ,,
1 মাইক্রো সেকেণ্ড $= 10^{-12}$ দিন	864×10^{-10} ,,
1 ন্যানো সেকেণ্ড $= 10^{-15}$ দিন	864×10^{-13} ,,
1 মাইক্রো মাইক্রো বা পিকো সেকেণ্ড $= 10^{-18}$ দিন	864×10^{-16} ,,

অভিনব স্পীকার

সৌমিত্র মজুমদার*

টেপ-রেকর্ডার, রেডিও কিংবা রেকর্ড-প্লেয়ারে যে স্পীকার থাকে সে কথা তো আমাদের সকলেরই জানা। চিত্রে যে স্পীকারটিকে এঁকে দেখালাম, তা দেখে যে কেউই সহজেই নিম্নের নিয়মগুলি মেনে চলে তৈরি করে নিতে পারবে।

স্পীকারটি বানাতে হলে যে বস্তুগুলির প্রয়োজন সেগুলি হচ্ছে যথাক্রমে :—

(1) একটি মাঝারি মাপের শক্ত আর্ট-পেপার।

(2) একটি পাতলা কাঠের নতুবা প্লাস্টিকজাতীয় কোন কিছু দিয়ে তৈরী বাক্স (B)।

(3) একটি দণ্ড-চুম্বক (L)।

(4) বেশ দীর্ঘ অন্তরিত তামার তার।

(5) ব্লেড, কাঁচি ও আঠা প্রভৃতি।

প্রস্তুত প্রণালী—সর্বপ্রথমে শক্ত আর্টপেপারটিকে ব্লেড-কাঁচির সাহায্যে কাটা-ছেঁড়া করে আঠা লাগিয়ে জুড়ে এমন ভাবে চোঙাকৃতি (চিত্রে—P) করতে হবে, যেন চোঙটির পিছনটা চিত্রানুরূপ (MN) হয়। অতঃপর উক্ত 'MN' অংশে সরু তার পেঁচিয়ে (চিত্রের মতন) একটি সলেনয়েডের মত কুণ্ডলী তৈরি করতে হবে। কুণ্ডলীটি এমনভাবে বানাতে হবে যাতে পাক জড়ানো তারের দু-প্রান্ত (চিত্রে S এবং T) দু-দিকে থাকে। তারপর চিত্রানুযায়ী চোঙটিকে 'B'-বাক্সের ভেতরে আটকাতে হবে। এবার বাক্সের পিছনে মাপমত ফুটো করে দণ্ডচুম্বকটাকে (L) প্রবেশ করাতে হবে ঠিক সোজাসুজি ভাবে M'-এর নীচ পর্যন্ত। ব্যাস, হয়ে গেল স্পীকার তৈরির কাজ। এর পর কিভাবে এটা প্রয়োগ করতে হবে, সে ব্যাপারে বলছি। এবার S এবং T (তারের শেষের দু-প্রান্ত) কোন রেকর্ড-প্লেয়ার, রেডিও কিংবা টেপ-রেকর্ডারের পিক-আপে সংযুক্ত করালেই স্পীকারে গান শোনা যাবে। জরুরি কথা, দণ্ড-চুম্বকের শক্তি যত বাড়ানো যাবে, স্পীকারের আওয়াজও সমানুপাতে বাড়তে থাকবে।

* 73, পূর্বাচল পল্লী, রহড়া (খড়দহ), 24-পরগণা

ভেবে উত্তর দাও

মোহনলাল বিষয়ী*

নিচের প্রশ্নগুলির একাধিক উত্তর দেওয়া আছে, সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত কর :—

1. কোন প্রোটিন অণু রক্ত জমাট বাঁধাতে সাহায্য করে ;
(ক) পেপসিন, (খ) ফাইব্রিনোজেন, (গ) লাইপেজ, (ঘ) অ্যামাইলেজ।

2. মানুষখেকো মাছ ;
(ক) হর্সফিস, (খ) ডগফিস, (গ) পিরানহা।

3. কোন্ প্রাণীর হৃৎপিণ্ডকে ভেনাস হৃৎপিণ্ড বলে ;
(ক) আরশোলা, (খ)-মৎস্য, (গ) তিমি, (ঘ) পক্ষী।

4. পেলাগ্রা প্রতিরোধক ভিটামিন ;
(ক) B_5, (খ) D, (গ) B_1, (ঘ) A।

5. হস্টোরিয়ান কোন্ উদ্ভিদে দেখতে পাওয়া যায় ;
(ক) রায়া, (খ) স্বর্ণলতা, (গ) সূর্যশিশির, (ঘ) মনোট্রোপা।

6. সবচেয়ে দীর্ঘজীবী প্রাণী ;
(ক) বাঘ, (খ) সিংহ, (গ) কচ্ছপ, (ঘ) জিরাফ।

[সঠিক উত্তর পাঠাতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।]

* কেমুরী, বর্ধমান

মার্চ '84 সংখ্যার 'ভেবে উত্তর দাও'-র উত্তর

1. (গ) অ্যামিগডালিন, 2. (খ) ফটোমিটার, 3. (গ) 300 গ্রাম, 4. (ঘ) ডরমিন, 5. (ক) 25 হাজার, 6. (গ) মাছি, 7. (ঘ) 2 শতাংশ, 8. (ক) রেসপিরোমিটার, 9. (গ) 280 দিন, 10. (ঘ) হ্যারিংটন, 11. (খ) হরগোবিন্দ খোরানা, 12. (ঘ) স্টেপিস, 13. (গ) পেরিস্টলটিক, 14. (ক) স্টেথোস্কোপ, 15. (গ) মাজরাপোকা।

মার্চ '84 সংখ্যায় 'ভেবে উত্তর দাও'-র উত্তরদাতাদের নাম

2টা বাদে—খোকন দাস ও শিখা দাস, মুর্শিদাবাদ, মমতা চট্টোপাধ্যায়, হাওড়া—6, শুভাজিত মিত্র মজুমদার, কলিকাতা-32, কমল ভট্টাচার্য, 24-পরগণা, চম্পক দে ও চঞ্চল দে, মেদিনীপুর।

3টা বাদে--জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, কলিকাতা-56, রুপালী ব্যানার্জী, হুগলী।

4টা বাদে—গোপালচন্দ্র মাল, হুগলী। জয়ন্তকুমার দাস, শীর্ষেন্দু রায় ও কৃষ্ণেন্দু রায়, হুগলী। সোমা অধিকারী, নদীয়া।

5টা বাদে—কমলকৃষ্ণ ঘরামী, 24-পরগণা। গৌতম পালিত, কলিকাতা-90। সুদীপ্ত মণ্ডল ও সৌকত মণ্ডল, 24-পরগণা। দেবব্রত ও বিশ্বপ্রিয় চ্যাটার্জী, বাঁকুড়া। দুলাল গাঙ্গুলী, হাওড়া-711306।

6টা বাদে—মহাদেব পণ্ডিত, বর্ধমান।

শব্দ-শৃঙ্খল

অচিন্ত্যকুমার পাঞ্জা*

পাশাপাশি :—

2. মৃতজীবী উদ্ভিদ ;
3. শ্বাসনালীর সম্মুখে থাইরয়েড গ্রন্থির নিম্নপ্রান্ত ও বক্ষের উরঃফলকের পিছনে অবস্থিত গ্রন্থি ;

■	1	■	2			6	■
3				■	■	7	
4		■	■	5			■
	■	■	■	■	■	■	11
	■	9	■	10			
8			■		■	■	
■	■	12			■	15	■
13			■	14			■
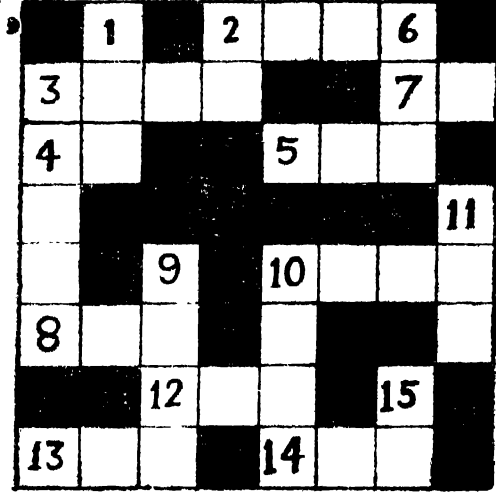
4. জেনেভা পদ্ধতিতে জৈব যৌগের নামকরণের সময় চিহ্নটি কোন নামে পরিচিত ;
5. একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস ; যা স্যার ডবলু, র‍্যামসে আবিষ্কার করেন ;
7. অবাত শ্বসন হয় এমন একটি মৃতজীবী উদ্ভিদ ;
8. যুক্তরাষ্ট্রের প্রচলিত মুদ্রা ;
10. দাঁতের উপরে সাদা অংশকে বলে ;
12. টাইপরাইটারের আবিষ্কারক ;
13. মুখমণ্ডলের একটি অস্থি ;
14. হল্যাণ্ডের একটি প্রচলিত-মুদ্রা, যা একটি হ্যালোজেন মোল, এটি কততম মোল ;

উপর-নীচ :—

1. C. G. S. পদ্ধতিতে বলের একক ;
2. পোগোনেটাম কোন্ জাতীয় উদ্ভিদ ;
3. 'থাইরক্সিন' হরমোন কোন্ গ্রন্থি থেকে নির্গত হয় ;
6. একটি সপুষ্পক ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ ;
9. 'পেরিপ্লানেটা আমেরিকানা' বৈজ্ঞানিক নামটি কোন্ পতঙ্গের ;
10. বায়োস্কোপের আবিষ্কারক ;
11. মানুষের হৃৎপিণ্ডের একটি প্রকোষ্ঠ ;
15. 'ম্যাঙ্গিফেরা ইণ্ডিকা' দ্বিপদ নামটি কোন্ ফলের ;

সঠিক সমাধান পাঠাতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

* গ্রাম—পার্বতীপুর, তমলুক, মেদিনীপুর

মার্চ '84 সংখ্যার 'শব্দ-শৃঙ্খলে'র সমাধান

(1) আইনস্টাইন, (2) চার্চিল, (3) আর্যভট্ট, (4) জেমস ওয়াট, (5) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, (6) ইন্দ্রজিৎ, (7) নাগাসাকি, (8) থর, (9) বোরন, (10) জানসেন, (11) ওয়াটারম্যান, (12) জ্ঞানী, (13) লিপম্যান, (14) ওয়াকার, (15) বিথোফেন, (16) বৈজ্ঞানিক, (17) দ্যবেইন।

মার্চ '84 সংখ্যার 'শব্দ-শৃঙ্খলে'র সমাধানকারীদের নাম

সব ঠিক—কাবেরী সাহা, কলিকাতা-55, মমতা চট্টোপাধ্যায়, হাওড়া-6। দেবজ্যোতি, দীপক, সর্বাণী, ছন্দা ষড়ঙ্গী, মেদিনীপুর। সমীরকুমার সেন, 24 পরগণা। সেখ মোবারক আলি, হুগলী।

1টা বাদে—গৌরী রায়, কলিকাতা-28, দুলাল গাঙ্গুলী, হাওড়া-1। জয়ন্তকুমার দাস, শীর্ষেন্দু রায় ও কৃষ্ণেন্দু রায়, হুগলী। শুভজিত মিত্র মজুমদার, কলিকাতা-12। উৎপল বিশ্বাস, 24 পরগণা। তামস, সুব্রতা, অশোকা, তুলিকা, হুগলী। টুলটুল ঘোষ, 24 পরগণা, গোবিন্দচরণ মাইতি, মেদিনীপুর।

2টা বাদে—কমল ভট্টাচার্য, 24 পরগণা। মহাদেব পণ্ডিত, বর্ধমান। দীপায়ন সাহা, নদীয়া।

3টা বাদে—গৌতমকুমার পালিত, কলিকাতা-90। ভিকৃষ্ণা রাও, মেদিনীপুর। মজর শীল, কলিকাতা-30। সৈয়দ আক্রাম্ল ওয়াসিম, বর্ধমান।

4টা বাদে—গোপালচন্দ্র মাল, হুগলী। মধুমিতা দত্ত, 24 পরগণা। তারক দে, অহীন সরকার, নিতাই কুণ্ডু, উজ্জ্বল কুণ্ডু, মাতঙ্গিনী কুণ্ডু, হুগলী। সঞ্চিতা, শিবকৃষ্ণ, তরুণ, অভিজিৎ, দীনবন্ধু ও কৃপাসিন্ধু, বাঁকুড়া।
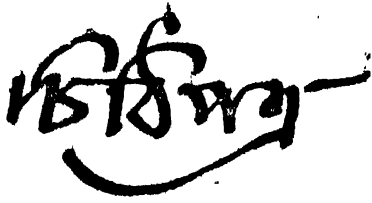
শারদীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞানে (1983) দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে—শ্রীরঞ্জনলাল ব্রহ্মচারীর "কী নিয়ে গবেষণা করব" এবং সুবীরকুমার সেনের "খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে"। দুটি রচনার মধ্যে বিষয়বস্তুর কিছু সাদৃশ্য আছে। শ্রীব্রহ্মচারী অন্যান্য গবেষণার সঙ্গে বাস্তুবিদ্যা নিয়ে এদেশে এবং আফ্রিকায় প্রভূত গবেষণা করেছেন। বাস্তুবিদ্যা ছাড়া সহজে সাধন করবার আর একটি বিষয়, এর সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছে। সেটি হলো ইথলজি বা আচরণবিজ্ঞান। তিনি নিজে নিরলস গবেষক। গবেষণা কার্যে সুবিধা এবং বাধা দুই-ই তাঁর জানা আছে। সুতরাং সহজ-সাধ্য গবেষণার জন্য তরুণদের জীববিদ্যার অন্যতম নূতন শাখা-বিজ্ঞানের চর্চা করতে পরামর্শ দিয়েছেন। শ্রীসেন তাঁর প্রবন্ধে "ইথলজি বা বিহেভিয়ার স্টাডি" নিয়ে আর একটু বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি সহজ গবেষণার আরো দু-একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। আশা করি তরুণ বিজ্ঞানীরা বিশেষ করে মফঃস্বলের বাসিন্দারা ঐ দুই প্রবন্ধ পড়ে উৎসাহিত হবে। এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞান ক্লাবের সভ্যরা অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারেন। বিজ্ঞান হিসাবে না হলেও প্রাণীদের আচরণ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ চিরকালেই অবহিত আছে।

শ্রীব্রহ্মচারী হস্তী সম্বন্ধে গবেষণা করেন। মধ্যযুগের সংস্কৃতে হস্তী সম্বন্ধে একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। কিছুকাল পূর্বে সংবাদপত্রে দেখেছিলাম সেই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি নাকি পাওয়া গিয়েছে। শ্রীব্রহ্মচারী এ গ্রন্থখানি সম্বন্ধে অবহিত আছেন কিনা জানি না। প্রাণী আচরণ নিয়ে আলোচনা যে একটা গবেষণার পর্যায়ে পড়ে এটা অনেকেই জানেন না। উক্ত প্রবন্ধ দুটি পড়ে জানা গেল এটি জীববিদ্যার একটা শাখা বিজ্ঞানের পর্যায়ে পড়েছে। উল্লিখিত প্রবন্ধদ্বয়ে দেখি হার্ডিং (Harding) বিলেতে এক-শ' বছর আগে এধরণের আলোচনা করেছিলেন। তারপর লরেঞ্জ, টিনবার্গেন ফন্‌ফ্রীশ প্রমুখ বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে গবেষণা করায় শাখাটির মর্যাদা বেড়ে গেছে। আমাদের দেশেও কিন্তু এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং অনেকদিন আগেই হয়েছে। শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তের (বিবেকানন্দের ভাই) রচিত একখানি পুস্তকের নাম "পশুপাখীর আচরণ বৃত্তি"। এটিকে পুরোপুরি ইথলজির পুস্তক বলা যেতে পারে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এ পুস্তকের প্রচার নেই। মহেন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম 1868 খৃস্টাব্দে। অল্প বয়স থেকেই তিনি ভারত এবং ভারতের বাইরে বহু জায়গায় ভ্রমণ করেছেন। 1905 খৃস্টাব্দ নাগাত ভারতে ফিরে আসেন। ভ্রমণ সূত্রে দু-একটি প্রাণীর আচরণ সম্বন্ধে লক্ষ্য করবার সুযোগ পান এবং লিপিবদ্ধ করে রাখেন। বইটি লিখিত হয় 1346 সালে অর্থাৎ 44 বৎসর আগে। কিন্তু প্রকাশিত হয় মাত্র 28 বৎসর আগে। গ্রন্থের মধ্যে একটি ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে শ্রীদত্ত লিখেছেন খৃস্টাব্দটা সম্ভবতঃ 1894 অর্থাৎ 89 বৎসর আগে। শ্রীদত্তকে তাহলে হার্ডিং-এর সমসাময়িক প্রাণী-আচরণবিজ্ঞানী বলা যেতে পারে। অস্ট্রিয়ার লরেঞ্জ দাঁড়কাকের আচরণ পর্যবেক্ষণ করেছেন। দত্ত বানর কুকুর ও অশ্বের আচরণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। লরেঞ্জের অভিজ্ঞতাগুলিকে চমকপ্রদ বলা হয়েছে এবং শ্রীসেন প্রাণী আচরণগুলিকে রোমাঞ্চকর আখ্যা দিয়েছেন। দত্তের বিবৃত ঘটনা-গুলির প্রতি দুটি বিশেষণই প্রযোজ্য। তিনি আচরণগুলি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লক্ষ্য করেছেন এবং স্নায়ুবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান অনুযায়ী বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছেন। প্রাণীদের উচ্চারিত শব্দের পারম্পর্য বৈশিষ্ট্য এবং ঐ অর্থবহ আওয়াজের সঙ্গে মানব শিশুর অর্থবহ আওয়াজের সাদৃশ্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। বছরখানেক আগে পুস্তকটি আমার হস্তগত হয়। এটিকে ভ্রমণ কাহিনী মনে করেছিলাম, এটি বিজ্ঞানের পুস্তক তখন বুঝতে পারি নি।

আচরণবিজ্ঞান প্রসারের জন্য শ্রীব্রহ্মচারী কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করেছেন এবং এই সব গবেষণার জন্য আর্থিক সাহায্য প্রাপ্তির উৎসের হদিসও দিয়েছেন। আশ্চর্যের বিষয় শ্রীদত্তও পুস্তকের উপসংহারে অনুরূপ কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করেছেন। প্রস্তাবগুলি হলো— 'প্রত্যেক বিদ্যাপীঠ বা জেলাতে উদ্ভিজ্জ শিক্ষা উদ্যান ও পশুতত্ত্ব উদ্যান থাকবে, এইরূপ বিদ্যাপীঠে ভর্তি হতে ইউনিভার্সিটি সার্টিফিকেটের আবশ্যক নাই, ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ ও আগ্রহ উদ্ভূত করবার জন্য মাসিক বৃত্তি নেওয়া আবশ্যক'। এইরূপ আরো কয়েকটি প্রস্তাব আছে। হায়, পূর্বে যদি এইসব প্রস্তাবের কিছুটা গ্রহণ করা যেত তাহলে এতদিনে ইথলজির বেশ খানিকটা অগ্রসর হত।

হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
25/এ, নিমতলা ঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা-6

পরিষদ সংবাদ

কলিকাতা পুস্তক মেলায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের স্টল

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচারের জন্য কলিকাতা পুস্তক মেলায় বিজ্ঞান পুস্তক, বিজ্ঞান পত্র-পত্রিকা, পোস্টার, বিজ্ঞানীদের চিত্র প্রদর্শনীর স্টল খোলা হয়েছিল। মেলা চলেছিল 24শে ফেব্রুয়ারি থেকে 11ই মার্চ (1984) পর্যন্ত। 24শে ফেব্রুয়ারি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন পরিষদ সভাপতি ডঃ জয়ন্ত বসু। পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর রচনা সংকলন ও দ্বিজেশ রায়ের অ্যালবার্ট আইনস্টাইন সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কর্মধারার প্রতি লক্ষ লক্ষ মানুষ আকৃষ্ট হয়।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের তৃতীয় বার্ষিক স্মরণ-সভা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ও গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান প্রসার সমিতির যৌথ উদ্যোগে 8ই এপ্রিল (1984) বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের 'সত্যেন্দ্র ভবনে' প্রয়াত বিজ্ঞান সাধক গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের তৃতীয় বার্ষিক স্মরণ-সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতি এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি ডঃ জয়ন্ত বসু ও প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। অনুষ্ঠানে 'জৈব আলো' শীর্ষক 'গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা স্লাইড সহযোগে প্রদান করেন ডঃ কান্তিলাল চৌধুরী।

প্রারম্ভে পরিষদের কর্মসচিব ডঃ সুকুমার গুপ্ত গোপালচন্দ্রের জীবনের নানা কাহিনী বিবৃত করেন। প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র বলেন—গোপালচন্দ্র সারাজীবন একনিষ্ঠ ভাবে বিজ্ঞান সাধনা করে গেছেন—দেখেন সবাই কিন্তু তিনি দেখতেন বিশেষভাবে—যা একমাত্র বিজ্ঞান সাধকরাই পারেন। বিজ্ঞান চেতনার শিক্ষা আমরা গোপালচন্দ্রের কাছ থেকে যা পেয়েছি—তা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

সভাপতির ভাষণে ডঃ জয়ন্ত বসু বলেন—গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ছিলেন স্বভাব বিজ্ঞানী। নিষ্ঠা, অধ্যবসায় এবং কৌতূহলের ত্রিবেণী সঙ্গম তাঁর মধ্যে হয়েছিল। বিজ্ঞান প্রচারে তিনি একক ভাবে যা করেছেন—তা বিস্ময়কর। গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান প্রসার সমিতির সম্পাদক ডাঃ অনিলবরণ দাস, শ্রীরবীন বল, শ্রীরমেন মজুমদার, শ্রীনীহাররঞ্জন ভট্টাচার্য, শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ দিবাকর মুখোপাধ্যায়, শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ গোপালচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

পঞ্চানন পাল

দ্রষ্টব্য : 1. 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' ফেব্রুয়ারি (1984) সংখ্যায় 'সত্যেন বসুর চিন্তাজগতের পরিবেশ ও একাকীত্ব' প্রবন্ধে এই পত্রিকার 51 পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে দ্বিতীয় লাইনে Time Magazine-এর আগে 'বোম্বাই থেকে' হবে না। এইখানে হবে 'New York, U.S.A. থেকে'।

2. ঐ প্রবন্ধে 56 পৃষ্ঠায় প্রথম স্তম্ভের চতুর্থ অনুচ্ছেদে ছাপা হয়েছে—'আমাদের দেশে তখন এই ক'জন বিজ্ঞানী, আর জনসংখ্যার স্বাভাবিক চারিত্রিক চাঞ্চল্যও (Fluctuation) বিশেষ লক্ষণীয়। তাছাড়া একজনের ঘুম পেলে তাকে সময় মত জাগাতে আর তো কেউ নেই'—এই অংশটি প্রবন্ধকারের পাণ্ডুলিপিতে নিম্নলিখিত রূপ আছে :—'আমাদের দেশের তখন এইটুকু বিজ্ঞানী জনসংখ্যার স্বাভাবিক চারিত্রিক fluctuation বিশেষ লক্ষণীয় হয়ে পড়েছে। তাছাড়া একজনের ঘুম পেলে আর একজন তাকে সময়মত জাগানোর আর কেউ নেই।'

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মূর্তি নির্মাণ তহবিলে চাঁদাদাতাদের তালিকা

নাম	টাকা	নাম	টাকা
শ্রীসুভাষচন্দ্র দে, কলিকাতা	300·00	শ্রীপরেশচন্দ্র জেন, কলিকাতা	25·00
„ মৃণালকান্তি মজুমদার, কলিকাতা	125·00	„ উৎপল আইচ, কলিকাতা	25·00
„ অঞ্জলা চৌধুরী, কলিকাতা	100·00	„ বাদল আইচ, কলিকাতা	25·00
„ দীপককুমার দাস, কলিকাতা	100·00	„ ডি. বসাক, কলিকাতা	25·00
„ প্রাণতোষ সাহা, কলিকাতা	51·00	„ রবীন্দ্রনাথ সরকার, কলিকাতা	11·00
„ ডলি রায়, কলিকাতা	50·00	„ নরেন্দ্রনাথ রায়, কলিকাতা	10·00
„ শুভাশীষ বসু, 24-পরগণা	30·00	„ হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা	10·00
„ রণজিৎ দাস, কলিকাতা	25·00	„ রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা	10·00
„ অখিল দাস, কলিকাতা	25·00	„ দীপক সাহা, কলিকাতা	5·00

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006 থেকে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ, 37/7, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-700 009 হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

আলোকচিত্র (ফটোগ্রাফী)
প্রশিক্ষণের
দ্বিতীয় কোর্স
সেপ্টেম্বর 1984
মাস থেকে শুরু হবে।

যোগাযোগ করুন :-

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-700006.
ফোন : 55-0660

লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বিজ্ঞান পরিষদের আদর্শ অনুযায়ী জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার মত সমাজের কল্যাণমূলক বিষয়বস্তু সহজবোধ্য ভাষায় সুলিখিত হওয়া প্রয়োজন।
2. মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এবং পূর্ণ ঠিকানাসহ লেখকের পরিচিতি পৃথক কাগজে অবশ্যই লিখে দিতে হবে।
3. চলিত ভাষা এবং চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহৃত হবে। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্র্যাকেটে ইংরাজী শব্দটিও দিতে হবে। আন্তর্জাতিক সংখ্যা এবং মেট্রিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে।
4. মোটামুটি 3000 শব্দের মধ্যে রচনা সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়।
5. বিভিন্ন ফীচার, সমকালীন বিজ্ঞান গবেষণা ও প্রযুক্তিবিদ্যার সংবাদ এবং বিজ্ঞান বিষয়ক সুন্দর আকর্ষণীয় ফটোগ্রাফীও গ্রহণীয়।
6. রচনার সঙ্গে চিত্র থাকলে আর্ট পেপারে চাইনিজ কালিতে সুঅঙ্কিত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন।
7. প্রত্যেক চিত্র প্রস্থে 8 সে. মি. কিংবা এর গুনিতকের (16 সে. মি. 24 সে. মি.) মাপে অঙ্কিত হওয়া প্রয়োজন।
8. অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব বজায় রেখে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মন্ডলীর অধিকার থাকবে।
9. প্রত্যেক প্রবন্ধ ফীচার-এর শেষে গ্রন্থপঞ্জী থাকা বাঞ্ছনীয়।
10. জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পুস্তক সমালোচনার জন্য দুই কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।
11. ফুলস্ক্যাপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় যথেষ্ট মার্জিন এবং প্রতি লাইনের পর বেশ কিছুটা ফাঁক রেখে পরিস্কার হস্তাক্ষরে প্রবন্ধ লিখতে হবে।
12. প্রতি প্রবন্ধের শুরুতে পৃথকভাবে প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া আবশ্যিক।

সম্পাদনা সচিব

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

পরিবেশ সংখ্যা
মে-জুন, 1984
37তম বর্ষ, পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যা

বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের অনুশীলন করে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও সমাজকে বিজ্ঞান-সচেতন করা এবং সমাজের কল্যাণকল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করা পরিষদের উদ্দেশ্য।

বিষয় সূচী

প্রচ্ছদ পরিচিতি

ডানদিকের নিচের অংশে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতীক। পরিবেশ সংরক্ষণের সহযোগিতায় প্রসারিত দুই হাত। চারাগাছটি শুধু উদ্ভিদ বা বনসম্পদ নয়, সমগ্র জীব জগতের প্রতীক। প্রাণী ও উদ্ভিদ পরস্পরের সহায়ক ও পরিপূরক। উদ্ভিদ বিনা প্রাণীর অস্তিত্ব সম্ভব হবে না।

প্রচ্ছদের প্রধান অংশে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল। গেঁও, গরান, বাণী, গর্জন প্রভৃতি লবণাক্ত জলে অপরূপ বৃক্ষরাজির সমাবেশ, বাঁদিকের অংশ—সমুদ্রের জোয়ারে ভরা বৃক্ষমূল ও বিস্তৃত বনতল। আর ডানদিকের উপরের অংশে ভাটার পরে উন্মুক্ত ঐ বৃক্ষরাজির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জালকাকার শিকড়ের অপূর্ব সমারোহ। এই শিকড়ের বৈশিষ্ট্যই উপকূল অঞ্চলের ভূমিক্ষয় রোধ করে। বিস্তৃত বিবরণ—ভিতরের প্রবন্ধে। (ম্যানগ্রোভ পৃষ্ঠা 186)

কিশোর বিজ্ঞানীর আসর

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : 30·00

মূল্য : 4 00

যোগাযোগের ঠিকানা :

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট

কলিকাতা-700006

ফোন : 55-0660

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সপ্তত্রিংশত্তম বর্ষ | মে-জুন, 1984 | পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যা

পরিবেশ-চিন্তনের বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য

গুণধর বর্মন

বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় ব্যবহৃত 'পরিবেশ' কথাটি আসলে প্রতিবেশকেই বোঝায়। অবশ্য তাতেও সম্যক অর্থবোধ হয় না। প্রতিবেশ মানে প্রতিবেশী বা প্রতিবাসীদের সমন্বিত অবস্থা অর্থাৎ সন্নিহিত স্থানে বসবাসকারীদের বিষয়। এর মধ্যে মানুষসহ যাবতীয় পশুপাখী বা প্রাণিজগতের অবস্থিতি যেমন আছে, তেমনি বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদজগতের ক্ষুদ্রতম জীব বা জীবাণুদের কথাও রয়েছে। নির্দিষ্ট অঞ্চলে স্বাভাবিকভাবে বসবাসকারী সমগ্র জীবকুলের কথা নিয়েই প্রতিবেশ, যাকে বলে ইকো-সিস্টেম (Ecosystem) বা বাস্তব্য ব্যবস্থা। এই বাস্তব্য অর্থাৎ (জীবের) বসবাসের উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য একদিকে সেখানকার জল ও বায়ুমণ্ডলের কথা, অন্যদিকে তত্রস্থ ভূমি বা স্থলভাগের বৈশিষ্ট্যের কথাও অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত। তারই সঙ্গে রয়েছে সূর্যরশ্মির প্রভাব তথা স্থানীয় উষ্ণতাদি বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি ও পারিস্থিতির প্রশ্ন। জল ছাড়া জীবনের অস্তিত্ব হয় না। কারণ জলেই জীবনের আদি বিকাশ। তাই এই পৃথিবীতে জলের সঙ্গে জীবনের ওতপ্রোত সম্পর্ক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাতাসের প্রয়োজনীয়তাও অনুরূপ। আর মাটি ও সূর্যালোক তো জীবনধারণোপযোগী যাবতীয় শক্তির আদিম মৌল উৎস। অবশ্য ইংরেজী environment কথাটিকে বাংলায় পরিবেশ বা প্রতিবেশ করার সময় তার সঙ্গে আর একটি প্রতিশব্দ যোগ করা হয়েছে—'পরিগম'। গমন কথা থেকেই এই পরিগমের উদ্ভব। কোন স্থানের জীবকুল তাদের সাধারণ জীবনযাপনের জন্য যতদূর গমন করে বা ঘুরে বেড়ায় সেই অঞ্চল বা পরিস্থিতির কথাই পরিগম বা তাদের environment। মানুষ ও উচ্চ প্রাণীরা বহুদূর বা বেশ কিছুদূর ঘুরে বেড়াতে পারে, ক্ষুদ্র প্রাণী এককোষী জীব প্রোটোজোয়া বা জীবাণুরাও কিছুদূর পর্যন্ত ঘোরে, তবে পরবর্তী উদ্ভিদরা আপাত স্থির অচল দেখালে কি হবে, সমগ্র জীবনচক্রে তাদেরও গতি রয়েছে—যেমন আলোর সন্ধানে, পরাগরেণু সংযোজনে, কাণ্ড, শাখা, মূলশিকড়, পাতা, ফল ও বীজাদির বৃদ্ধি ও গতির মাধ্যমে, একটা বিশেষ অঞ্চল পর্যন্ত তাদের সহজে ছড়িয়ে পড়ার কর্মধারা দেখা যায়। তাই পরিগম কথাটা সেই দিক থেকে সুসংবদ্ধ পরিবেশেরই কথা।

সুতরাং পরিবেশ দূষণ বা পরিবেশ সংক্রান্ত কোন আলোচনার মধ্যে রয়েছে কোন নির্দিষ্ট অঞ্চল বা সীমার মধ্যেকার ভূ-প্রকৃতি, জল, বায়ুমণ্ডল ও সূর্যালোকের প্রভাবসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিস্থিতির এবং তদঞ্চলের যাবতীয় জীবকুলের প্রাণী ও উদ্ভিদসমূহের—পারস্পরিক সম্পর্কের কথা অর্থাৎ জীবনচক্রে জীবকুলের বিভিন্ন প্রজাতির পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও ও সহযোগিতার কথা—কখনও খাদ্য-খাদক সম্পর্ক নিয়ে, কখনও পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের সংযোজন-বিয়োজনের মাধ্যমে সবার বেঁচে থাকা ও তত্রস্থ প্রাকৃতিক ভারসাম্যের প্রশ্নই বিশেষ গুরুত্বের। সেই সঙ্গে অবশ্যই আছে মানুষ নামক প্রজাতিটির বিশেষ ধর্ম—যাকে বলে সর্বোন্নত জীবনধর্ম—মানুষের সেই মননশীলতার প্রভাব অর্থাৎ তার মানসিক অথবা মানবিক অনুভূতি ও প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মধারার কথা। মানুষের এই মনন জগতের কার্যকারিতাই পূর্বোক্ত পার্থিব পরিবেশের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে ও করেছে, যার মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার কথাই বর্তমানে উল্লেখযোগ্য। কারণ এরই প্রভাবে প্রকৃতিরাজ্যে বিবিধ বিপর্যয় এখন দ্রুতহারে ঘটে চলেছে। অথচ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাই মানুষের সভ্যতা বিকাশে ও উন্নত জীবনমানের অত্যাবশ্যক পথপ্রদর্শক। তবে সুস্থ মানবিক চেতনা ও যথার্থ উন্নত মননশীলতার মাধ্যমে সেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা পরিচালিত হচ্ছে কিনা—সেটাই বিশেষ বিচার্য বিষয়। মানুষের সার্বিক মননশীলতার একটি অংশেরই প্রকাশ হয় এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে। তার অবশিষ্টাংশ ছড়িয়ে আছে সাধারণ ইন্দ্রিয়াতীত বিস্তৃত মনোজগতে। তাতে আর একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিবেশ গড়ে উঠেছে মানব-

প্রজাতির গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজজীবনে—যা বাইরের পরিবেশ থেকে আলাদা। মানুষের এই অন্তর্পরিবেশের কথাও এই প্রসঙ্গে মোটেই কম গুরুত্বের বিষয় নয়। বরঞ্চ উভয় পরিবেশই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, একের প্রভাব অন্যের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জটিলতায় ধারাবাহিকভাবে চলেছে প্রাকৃতিক সম্পদের নিত্য হ্রাস, তারই ফলে মানুষের মনোরাজ্যে ঘনীভূত হচ্ছে আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরতার সঙ্কীর্ণ প্রয়াস। আর সামগ্রিক পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ছে ভবিষ্যতের ভাবনাহীন তাৎক্ষণিক স্বার্থসিদ্ধির বিষময় প্রভাব। অনিয়ন্ত্রিত জনবৃদ্ধি এখন হয়ে উঠেছে প্রকৃতির অভিশাপ। তার উপর প্রকৃতির ভারসাম্য ও সুস্থ পরিবেশ রক্ষায় বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনার আজ একান্ত অভাব। তাই সমাজের ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত মনোজগতের কথা বাদ দিয়ে সামগ্রিক পরিবেশের পর্যালোচনা কখনও পরিপূর্ণ হতে পারে না, কারণ এইখানেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে অবস্থিত সেই কৃত্রিম পথে দ্রুত পরিবেশ বিপর্যয়ের মূল সূত্র। গণমানসের সাধারণ চিন্তাপ্রবাহে বদ্ধমূল অজ্ঞতা, অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কার ও 'যেনতেন প্রকারেণ' স্বার্থসিদ্ধির সঙ্কীর্ণ মানসিকতাকে যথাসম্ভব বলিষ্ঠতায় অপসারিত করতে না পারলে সামগ্রিক পরিবেশ দূষণ ও তার বিধ্বংসী পরিণামের পথরোধ করা যাবে না।

এখানে আরও দুটি কথার বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন। তার একটি হচ্ছে—জীবনের সঙ্গেই এই পরিবেশ কথাটির অবিচ্ছেদ্য ঘনিষ্ঠ সংযোগ। জীবন যেখানে নেই সেখানে পরিবেশের প্রশ্নও নেই। মহাবিশ্বের শুধু বৃহত্তর নয় বৃহত্তম অংশই (তার শতকরা 99·9 শতাংশের বেশীর ভাগই) জীবনের অস্তিত্ব বা তার আশু সম্ভাবনা থেকে আজও বহু দূরে। তাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সেই বৃহত্তম অংশে আমাদের পরিভাষায় এই পরিবেশের কোন স্থান নেই। তবে ঐ সকল ক্ষেত্রে সর্বত্রই থাকবে ঐ environment কথাটা—যা আমাদের পরিবেশ বা প্রতিবেশ থেকে নিশ্চিতভাবেই আলাদা কথা—যদি না—বা যতদিন না—ঐসব রাজ্যের কোথাও আমরা যেতে পারি—বা—যেতে চাই—অথবা যাওয়ার মত যথার্থ সম্ভাবনাটুকুও তৈরি করতে পারি।

আর অপর গুরুত্বপূর্ণ কথা—জীবনের আদিম উৎপত্তি—তৎকালীন পৃথিবীর এক বিশেষ পরিবেশে বিশিষ্ট পরিস্থিতিতে। সেদিনের পৃথিবীর জল, স্থল, বায়ুমণ্ডল ও উপরিস্থ সূর্যসহ বিভিন্ন মহাজাগতিক শক্তিসমূহের প্রভাব ছিল ভিন্ন ধরণের ও ভয়াবহ। আজকের পরিবেশের তুলনায় তা ছিল জীবনের বা জীবজগতের প্রতি একেবারেই অকরুণ। বর্তমান পৃথিবীতে বসে সেই নিষ্করুণ ভয়াবহতার কথা মনশ্চক্ষে যথার্থ কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। প্রাকৃতিক বা মনুষ্যকৃত কোন বিধ্বংসী প্রক্রিয়াই আজ, সেদিনের পৃথিবীর সর্বব্যাপী নিষ্প্রাণ ভয়ঙ্করতার ধারেকাছেও যেতে পারে না। সেই অকল্পনীয় বিভীষিকাময় পৃথিবীর নির্জীব মৌল উপাদান সমূহের মধ্যে ধারাবাহিক রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন জটিল রাসায়নিক যৌগের সৃষ্টি ও তাদের গঠন কাঠামোর বিবিধ বিবর্তন ঘটাকালে বিশেষ এক পরিস্থিতিতে জীবনের সক্রিয় (এবং স্বয়ংক্রিয়) মৌল উপাদান আদিম জীবনসত্তা নিউক্লিয়িক অ্যাসিড (ডি. এন. এ. ও আর. এন. এ.) এবং প্রোটোপ্লাজম তৈরি হয়েছে। তখন সামগ্রিক পরিবেশের কাছে কত তুচ্ছ কত অসহায় ছিল আদিম সেই জীবনকণা! তবু সব বীভৎস ভয়ঙ্করতা ও পরিবেশের বিধ্বংসী আক্রমণ সহ্য করেই সে বেড়ে উঠেছে এবং গড়ে তুলেছে ধারাবাহিক জীবনপ্রবাহ, নিরবচ্ছিন্নভাবে বয়ে এনেছে সেই জীবনধারাকে প্রায় দু-শত কোটি বছরের বেশী কাল। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে পৃথিবীপৃষ্ঠে আরও কত জীবনধ্বংসী ভয়ঙ্কর দুর্যোগ সব ঘটেছে। অসহায় অতি নগণ্য আদিম সেই জীবনসত্তা আপন শক্তিতে সহ্য করেছে সবই, ধ্বংস হয়ে যায় নি। বরঞ্চ ক্রমে সে প্রকৃতি রাজ্যে নানা সহনশীলতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। পরিবর্তনশীল পরিবেশের অবিরাম ঘাত-প্রতিঘাতে সেই আদিম জীবনকণার অভ্যন্তরে ক্রমান্বয়ে ঘটেছে বিবিধ সংযোজন ও বিয়োজনের বিক্রিয়া। সেই সব বিক্রিয়াজনিত ফলাফল ঐ অক্ষয় জীবনকণার গঠন-কাঠামোর এবং গুণগত কর্মে ধীরে ধীরে এনেছে স্থায়ী পরিবর্তন বা বিবর্তনের ধারা। তারই মাধ্যমে সেই জীবনসত্তা ও সামগ্রিক জীবনধারা বলিষ্ঠভাবে এগিয়েই চলেছে যে কোন বিরুদ্ধ পরিবেশকে জয় করার দুর্দম শক্তি অর্জন করে ক্রমোন্নত জীবনের পথে ধারাবাহিক বিবর্তনের বা অভিব্যক্তির ধাপে ধাপে। তাতে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির জীব—প্রাণী ও উদ্ভিদ, জীবনচক্রে পরস্পরের সহায়ক হয়ে, মূল জীবনসত্তাকে আরও শক্তিশালী করে। এই বিভিন্ন প্রজাতির জীবের অস্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য ও বিকাশের ধারা নিখুঁত দক্ষতায় নিয়ন্ত্রিত হয় সেই আদিম জীবনসত্তার বিবর্তিত রূপ,—নির্দিষ্ট প্রজাতির বংশাণু বা প্রজাতিগত 'জিনে'র দ্বারাই যথাযথভাবে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে। সেই বংশাণু বা জিনের মধ্যে শুধুমাত্র সেই পরিস্থিতির বংশগতির ধারা নয় তাদের মধ্যে সঞ্চিত রয়েছে সুদূর অতীতের সেই আদিম জীবনের অভিজ্ঞতার পুষ্ট সুসংবদ্ধ কর্মপন্থার ইঙ্গিতসমূহ। আর তাই চালনা করে তাদের বর্তমানকে। অদ্যাবধি সেই বিবর্তনের শেষ ধাপে (বলা উচিত বিশেষ এক ধাপে) মননশীল মানব প্রজাতির উদ্ভব। এই মননশীলতার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধর্ম ও শক্তি অন্য কোন জীবে নেই। এইখানেই মানব প্রজাতির বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষতা। এরই বলে সে ক্রমে বিশ্বপ্রকৃতিকে জানতে পেরেছে। শুধু বর্তমান নয়, সুদূর অতীত থেকে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত অনেক কিছু জানা ও ভাবা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে এবং তাই দিয়ে প্রকৃতির উপর প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তারে সে সক্ষম হয়েছে। যে জীবনসত্তা এতকাল প্রকৃতির ভয়ে ছিল ভীত

সম্ভব,—মননশীল মানবপ্রজাতি সৃষ্টির পরে সেই নিষ্করুণ ভয়াল প্রকৃতির উপর সে ধীরে ধীরে এনেছে আধিপত্য। তবে এই প্রজাতির সামগ্রিক অস্তিত্বের ব্যাপারে এই মননশীলতার দক্ষতা কতখানি কার্যকরী হবে তা কেবল অনাগত ভবিষ্যতই বলতে পারবে। কারণ সেই অমিত শক্তি জীবনসত্তার ধারাবাহিক প্রবাহের ও বিবর্তনের গতি এইখানে—এই মানব প্রজাতির মধ্যেই শেষ হয়ে যাচ্ছে বলে ভাবার কোন কারণ নেই। তার গতিও বিবর্তনের ধারা ক্রমান্বয়ে আরও এগিয়ে চলবে বা চলাই স্বাভাবিক। তাতে বর্তমানের মনুষ্য অপেক্ষা আরও উন্নত প্রজাতির জীবসৃষ্টিও সম্ভব,—যারা যে কোন বিধ্বংসী পরিবেশের ভয়াবহতাকে সহজে সয়ে নিতে পারবে এবং সব বিরুদ্ধ পরিবেশকে জয় করে এগিয়ে নিয়ে যাবে জীবনের জয়রথকে এই পৃথিবীর ক্রমজীর্ণ অভাবক্লিষ্ট পরিবেশ ছাড়িয়ে মহাবিশ্বের দিকে দিকে। বিবর্তনের সেই সম্ভাব্য প্রগতির ধারায় আজকের মানুষের কি পরিণতি হবে সেই প্রশ্নও তো স্বাভাবিক ভাবেই আসে। তাই বিজ্ঞানোন্নত প্রগতিশীল চিন্তাধারার বলিষ্ঠ মননশীলতা ও সুস্থ বিচারবুদ্ধির প্রকৃষ্ট পরীক্ষা আজ মানব প্রজাতির সামনে। যে মস্তিষ্কশক্তির প্রভাবে উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রবর্তন সে করেছে তাই দিয়ে নিজেদের ও সামগ্রিক পরিবেশের ধ্বংসসাধন সে করে চলবে, না সামগ্রিক উন্নয়নের কাজে তার জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে লাগাবে ?

মনে রাখতে হবে সুদূর অতীতে প্রকৃতির বিরুদ্ধ পরিবেশকে জয় করার চেষ্টায় এই জীবনপ্রবাহে আবির্ভূত হয়েছিল দৈহিক শক্তিতে মহাবলী বহু অতিকায় প্রাণীগোষ্ঠী—ডাইনোসরস। কালক্রমে তারা ধরাপৃষ্ঠ থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে আত্মরক্ষার বিচার বুদ্ধির অভাবেই। দৈহিক বলপ্রয়োগে তাৎক্ষণিক স্বার্থসিদ্ধির শক্তি তাদের ছিল। কিন্তু ছিল না ভবিষ্যত বংশধরদের রক্ষার কোন ব্যবস্থা। সে প্রয়োজনীয়তা তারা অনুভব করতেই পারে নি। আর পরিবর্তিত পরিবেশে যথার্থ অভিযোজনের চেষ্টা না করে নিজেদের মধ্যে হিংস্র হানাহানির প্রাবল্যে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করেই চলেছিল। বিশ্বপ্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে বিধ্বংসী বিপর্যয় সমূহের সম্ভাবনা যেমন তাদের জানা ছিল না, তেমনি নিজেদের সীমিত পরিবেশে জীবনধারণোপযোগী উপাদান সমূহ কতখানি আছে তার সম্যক পরিচিতিও তাদের ছিল না। তাই সুদীর্ঘকাল—প্রায় 20 কোটি বছর (যেখানে বুদ্ধিমান মানুষের প্রভাব 20 হাজার বৎসরও নয়—তার সভ্যতার গর্ব তো আরও অকিঞ্চিতকর কালের) অতিদর্পে সেই মহাকায় প্রাণীরা পৃথিবীব্যাপী বিচরণ করেও কালক্রমে চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। একই অঞ্চলের তৃণভোজী ও মাংসাশীদের মধ্যে প্রবল সংঘর্ষে বহু প্রাণ বিনষ্ট হয়। আর সীমিত পরিবেশে প্রয়োজনীয় খাদ্যাভাবে দৈহিক বল ও আকৃতি উভয়ই ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেয়ে চলে। তারপর নিজেদের বংশধরদের রক্ষা ও লালনপালনের কোন স্বাভাবিক ব্যবস্থা না থাকায় অন্য প্রজাতির আক্রমণে তাদের ডিম ও বাচ্চাগুলি ব্যাপকহারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইতিমধ্যে ভূপৃষ্ঠে ব্যাপক বিধ্বংসী পরিবর্তন আসে—দীর্ঘস্থায়ী হিমপ্রবাহ, জলোচ্ছ্বাস, সমুদ্রতল উত্থিত হয়ে পর্বতশ্রেণী ও শুষ্ক প্রান্তরের অভ্যুত্থান প্রভৃতি ঘটে। সেই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অভিযোজনের দক্ষতা না থাকায় দীর্ঘ রাজত্বকারী অতিকায় মহাবলীর দল একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়েই যায়। এইতো জীবন সংগ্রামের প্রত্যক্ষ শিক্ষা। তবে তাতেও আসল জীবনসত্তার ধারাবাহিক প্রবাহ থেমে যায় নি। পরন্তু সেই অভিজ্ঞতা থেকে নতুন শক্তিতে বলীয়ান হয়ে অগ্রসর হয়েছে সে—একদিকে দৈহিক শক্তি অপেক্ষা মস্তিষ্কশক্তি বিকাশের চেষ্টায়, অন্যদিকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রথম থেকেই সুরক্ষার ব্যবস্থায় স্তন্যপায়ী জীবগোষ্ঠী সৃষ্টির মাধ্যমে। বর্তমান মানবপ্রজাতি তারই বিশিষ্ট অভিব্যক্তি। তার মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটেছে ও ঘটছে ক্রমান্বয়ে। প্রাকৃতিক নিয়মে তার সন্তান রক্ষার ব্যবস্থা অতি উন্নত প্রথায়। আর পৃথিবীর যে কোন স্থানের পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন ক্ষমতাও তার অপরিসীম, যা অন্য কোন প্রজাতিই পারে না। এতে প্রকৃতিগত পরিবেশের দয়ার উপরই সে সম্পূর্ণ নির্ভর করে না। সেই পরিবেশে নিজের প্রয়োজনমত পরিবর্তন সাধনের জ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা তার করায়ত্ত। নির্দিষ্ট পরিবেশে কিছু উপাদানের অভাব অনুভব করলে তার সংগ্রহ বা উৎপাদন সে যেমন করতে পারে, ধ্বংসপ্রাপ্ত বা ধ্বংসোন্মুখ পরিবেশের পুনর্গঠন ও উন্নয়নও তার পক্ষে আজ সম্ভব। তার চেয়েও বড় কথা জীবনের আদি বিকাশের তত্ত্বও সে জেনেছে। আদি জীবনসত্তা ও প্রজাতিগত বংশাণু-র গঠন-কাঠামো ও তাদের বিশদ কর্মক্ষমতার কলাকৌশলও আজ মানুষের জ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার আয়ত্তের মধ্যেই ধীরে ধীরে চলে আসছে। বংশাণু ও আদি জীবনসত্তার গঠন-কাঠামো ও ধর্মে পরিবর্তন সাধনে আজ সে উৎসাহী। জীবনপ্রবাহের এই সামগ্রিক জ্ঞানের অনুভূতিশূন্য বৃহত্তর জনসাধারণ যেমন স্বাভাবিক ভাবেই মনে করে মানুষই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব এবং এইখানেই জীবনপ্রবাহের চরম পরিণতি, এর পরে জীবনের আর কিছু নেই, তেমনি বিশিষ্ট চিন্তাবিদ বিজ্ঞানীদের অনেকেও ভাবেন এই মানব প্রজাতিই বুঝি জীবন-বিকাশের চরমতম অবস্থা—শেষ স্থিতিশীল (static) পর্যায়, এর আর বিবর্তন হবে না। এইখানেই সব ধ্বংস হয়ে যাবে। এগুলি জীবন ও জগৎ সম্পর্কে অতীতের স্থিতিশীল চিন্তাধারারই প্রতিফলন। কিন্তু সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও তার প্রতিটি উপাদানই যেখানে স্বাভাবিকভাবে সদাগতিময় ও পরিবর্তনশীল আর তারই অংশ হিসাবে সৃষ্ট স্বয়ংক্রিয় জীবসত্তার বিকাশের ধারাও অদ্যাবধি যেভাবে মহাকালের গতির মতই নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হয়ে এসেছে হঠাৎ তার সেই গতিতে ও বিবর্তনে স্তব্ধতা বা পূর্ণচ্ছেদ আসবে কেন ? মহাকালের অবিরাম গতির মতই জীবনপ্রবাহের স্বাভাবিক ক্রমিক গতিও কখনও থেমে যেতে পারে না, পিছিয়ে যেতেও পারে না, চিরতরে স্তব্ধ বা বন্ধ হয়েও

যাবে না। তার আরও বিবর্তন আসবেই। মননশীলতার প্রতাপান্বিত মানুষ আজ সেই কথাটাই ভাবুক! ভাবুক এখন কি তার কর্তব্য! সেই বিবর্তনের ধারায় অতীতের বিবেক-বুদ্ধিহীন অতিকায় প্রাণীদের মত সে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, না প্রখর বুদ্ধিমত্তার অধিকারী হয়ে তাদের থেকেও বেশীকাল এই পৃথিবীপরে এবং প্রয়োজনে বহির্বিশ্বে তার সদর্প অস্তিত্ব বজায় রাখবে ও প্রসার করবে? বর্তমানে তার সামনে যে সঙ্কট সেটা শুধু প্রাকৃতিক পরিবেশগত স্বাভাবিক বিপর্যয়ের কথা নয়, মানুষের উন্নত মননশীলতায় আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের কুফল বা তার অপপ্রয়োগের কথাই আজ বড় সঙ্কট হয়ে দেখা দিয়েছে। এইখানে তার মানসিক প্রস্তুতি ও সেই পরিবেশের কথাই আজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তার সেই সার্বিক মনোজগতের পরিবেশ এখন কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে? একদিকে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে বৃহত্তর গণমানসে যে যার ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির চাহিদায় প্রাকৃতিক সম্পদ সমূহকে যদৃচ্ছ ধ্বংস করে চলার ব্যাপক লোভের প্রবৃত্তি, অন্যদিকে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থের প্রাধান্য বজায় রাখা বা তা জাহির করার চেষ্টায় বিজ্ঞানের ধ্বংসাত্মক অপ-প্রয়োগের মানসিকতা আজ প্রবল। সুতরাং বৃহত্তর জনমানসে যথার্থ বিজ্ঞানচেতনা এবং তারই পরিশীলিত আলোয় সুস্থ মানবিক অনুভূতি সৃষ্টি করে ক্ষুদ্রস্বার্থের মোহ কাটিয়ে উন্নত বিজ্ঞানের কলাকৌশলকে সার্বিক কল্যাণে নিয়োগের বলিষ্ঠ জনমত তৈরি করা ছাড়া আজ আর গত্যন্তর নাই।

এই সুস্থ বিজ্ঞানসম্মত বিস্তৃত গণচেতনা সৃষ্টিতে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে দেশ ও সমাজ পরিচালনায় প্রত্যক্ষ ক্ষমতায় রত নেতা ও কর্মীদের কর্মধারা। এঁদের অধিকাংশের মধ্যেই যথার্থ বিজ্ঞানের অনুভূতি একান্তভাবেই অনুপস্থিত। বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব ও তথ্যের কথা এঁরা জানলে বা বললেও নিজেদের ব্যবহারিক জীবনে তা যথার্থ প্রয়োগের চেষ্টা তাঁদের নেই, তাই বিজ্ঞানের অপব্যবহারই তাঁরা করেন ও করান। পরিবেশ দূষণ রোধে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তাই এদেশের প্রশাসন কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত নেতা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে শিল্পপ্রসার ও প্রযুক্তিবিজ্ঞানের উন্নয়নে পরিবেশ দূষণ অবশ্যম্ভাবী ভাবে হবেই। কি মারাত্মক বিবৃতি! এতে যে দেশের বৃহত্তর জনসমাজে সুস্থ বিজ্ঞান-মানসিকতা তৈরিতে বাধা আসবে—সেকথা তাঁরা অনুভব করেন না। আসলে দীর্ঘ কায়েমী স্বার্থপুষ্ট ভাগ্যবাদী চিন্তার দাসত্ব থেকে তাঁদের মানসিক মুক্তি ঘটে নি। বিজ্ঞান ও শিল্পপ্রসারে পরিবেশের পরিবর্তন ঘটবে নিশ্চয়ই, কিন্তু তা 'দূষণ' হবে কেন? পরিবেশকে শিল্পজনিত দূষণরোধের ব্যবস্থা যে বিজ্ঞানের মধ্যেই রয়েছে এবং তার জন্য সরকারীভাবে গৃহীত কিছু আইনের পদ্ধতিও রয়েছে প্রশাসন কর্তৃত্বে থেকে সেগুলিকে কার্যকরী করা যায় না কেন? ঠিক একই ভাবে খাদ্যে ভেজাল, মাদক দ্রব্যের উৎপাদন ও প্রসার প্রভৃতি মর্মান্তিক জনস্বাস্থ্যহানিকর মানবতাবিরোধী নির্মম দুর্নীতি দমনেও এদেশের প্রশাসন কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়েই চলেছেন। তার জন্য যে বলিষ্ঠ ব্যাপক সংঘবদ্ধ জনমত তৈরি করা দরকার তা হয়ে উঠছে না বলেই। তাই বিষাক্ত যুদ্ধাস্ত্র ও পরমাণু বোমা তৈরির বিরোধিতা অপেক্ষা এদেশে সাধারণ শিল্পজনিত বায়ুদূষণ, জলদূষণ, ক্ষুদ্র ব্যক্তি স্বার্থের লোভে খাদ্যে ও ঔষধে ভেজাল, মাদকদ্রব্যের প্রসার, বনসম্পদ ধ্বংস, অজ্ঞতাজনিত বাসস্থানের নোংরা পরিবেশ, যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ, অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কারের প্রাবল্য বিশেষ করে রোগের চিকিৎসায় ও ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টায়, বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনার অভাবে অবৈজ্ঞানিক পন্থায় কৃষি সম্প্রসারণ ও অন্য খাদ্যদ্রব্য ও শিল্পাদি উৎপাদনের চেষ্টা, আর সামগ্রিক অর্থাভাবে পানীয় জলের অভাব, জলনিকাশী ও শহরাঞ্চলের পয়ঃপ্রণালীর দুরবস্থা, নোংরা বস্তীর বিস্তার প্রভৃতি দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাগুলি অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এগুলি নিজেদেরই করতে হবে। আর প্রশাসন কর্তৃপক্ষকেই এতে অগ্রণী হতে হবে। সমগ্র জীবনবোধ নিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রপরিচালনায় বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা সূত্রের সমন্বয় এদেশের রাষ্ট্রনেতা ও প্রশাসন কর্তৃপক্ষের কোথাও অদ্যাবধি দেখা যায় নি। বিজ্ঞানের এক একটা দিকের বিশেষ বক্তব্য মুখস্থ করা বুলির মতই তাঁরা বলে চলে যান। কিন্তু যথার্থ অনুভূতি ও আন্তরিকতার অভাবেই সেগুলি কার্যকরী হয় না। সেইভাবে সমাজতত্ত্ব ও রাজনীতির সঙ্গে অর্থনীতির প্রসঙ্গ জড়িয়ে যখন যে যার দলীয় স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টায় জনমত তৈরিতে জোর দেন, তখন সামগ্রিক বিজ্ঞানের চিন্তা-ধারা তাতে দমিত ও দলিত হয়ে ক্ষুদ্র গোষ্ঠীস্বার্থের কথাই প্রাধান্য পায়। ফলে বিজ্ঞানের সার্বিক কল্যাণের পথও অবরুদ্ধ হয়। কারণ বিরোধী গোষ্ঠী একই বিষয়ে বিরুদ্ধমত পোষণ ও প্রচার করে সমগ্র জনসমাজে দলবদ্ধ অসহিষ্ণুতার মনোবৃত্তিই প্রবল করে তোলে। তাতে গোষ্ঠীগত সেই ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়ে সামগ্রিক মনোজগতের পরিবেশকে দূষিত ও বিধ্বংসী করে তোলে এবং তাই হয়ে চলেছে। এই মনোজগতের পরিবেশকে শুদ্ধ ও উন্নত করে তুলতে না পারলে বহির্জগতের পরিবেশের যথার্থ উন্নয়ন বিঘ্নিত হবেই। সুতরাং মানব প্রজাতির বর্তমান ও ভবিষ্যতের কল্যাণ ও প্রগতির কথা ভেবে বিজ্ঞানসম্মত সুস্থ বলিষ্ঠ সংঘবদ্ধ জনমত তৈরি করতে হলে বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্মীদের সর্ববিধ রাজনীতি বা গোষ্ঠীগত দলীয় চিন্তাধারার ঊর্ধ্বে নিরপেক্ষ বক্তব্য ও কর্মপন্থা গড়ে তুলতে হবে—যথার্থ বিচক্ষণতা ও একান্ত আন্তরিকতার সঙ্গে। "ধ্বংস নয়—শান্তি চাই"—কথাটি কোন বিশেষ গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে নয়; সেটি সর্বদেশের সর্বমানবের সামগ্রিক মঙ্গলের কথা। তাই কোন বিশেষ দেশ বা গোষ্ঠীকে আক্রমণ করে বা বক্রোক্তি করে বক্তব্য রাখলে সেই দেশ ও

[পরের অংশ 165 পৃষ্ঠায় দেখুন]

শহরের চারপাশে সবুজ বেষ্টনী চাই

তারকমোহন দাস*

ইউনেসকোর (UNESCO) প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান বিভাগের পক্ষ থেকে রিচি ক্যালডর উত্তর আফ্রিকা ও উত্তর-পশ্চিম এশিয়ার মরুভূমিগুলির পর্যালোচনা এবং সেখানকার প্রাচীন সভ্যতাগুলির উত্থান-পতনের কারণ অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই সমস্ত অঞ্চলে একটি নয়, বিভিন্ন যুগে পনেরটি মানব সভ্যতা সমৃদ্ধির চূড়ান্তে পৌঁছে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। মানুষের শোচনীয় নির্বুদ্ধিতা, হঠকারিতা ও দূরদৃষ্টিহীনতার ফলেই তা ঘটেছে। রিচি ক্যালডরের ভাষায়—'মানুষ প্রকৃতির ওপর করেছে অমানুষিক শোষণ, প্রকৃতি হয়েছে অতি দ্রুত রিক্ত, নিঃশেষিত, ফুরিয়ে গেছে মানুষের খাবার, বেঁচে থাকবার রসদ, সভ্যতাগুলি শেষ পর্যন্ত ধূলায় মিশে গেছে'।

এই সব সভ্যতা গড়ে উঠেছিল টিউনিসিয়া, লিবিয়া, মিশর, সিনাই মরুভূমি হয়ে মেসোপটেমিয়া পারস্য, আফগানিস্তান ও সিন্ধু উপত্যকায়। এই সব অঞ্চলেই গ্রীক, রোমান, ফারাওদের ও সুমেরিয়ানদের সমৃদ্ধ সভ্যতার কল্পনাতীত বিরাট শস্যাগারগুলি ছিল, বিরাট জনসংখ্যা সমৃদ্ধ নগরীগুলি গড়ে উঠেছিল। সিন্ধু নদীর উপত্যকায় অপূর্ব স্থাপত্য কৌশল-সমৃদ্ধ হরপ্পা মহেঞ্জোদারোর সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল।

এই সব সভ্যতার ধ্বংসের প্রধান কারণগুলি হল,—সে যুগে কয়লা বা পেট্রোলিয়াম ছিল না, জনসংখ্যার অনুপাতে জ্বালানীর প্রয়োজনে বড় বড় বৃক্ষের উৎপাটন, জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সবুজের আচ্ছাদন না বাড়ান, ভুল সেচ ব্যবস্থা, জলাধারগুলির রক্ষার ব্যবস্থা না করা এবং তথাকথিত শত্রুকে জব্দ করতে গিয়ে পরস্পরের এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদের চূড়ান্ত বিনাশ। এইসবগুলি মানুষের এক শোচনীয় অবিমৃশ্যকারিতার পরিচয় বহন করছে। প্রকৃতির কাছ থেকে অস্বাভাবিক হারে বাড়তি সুবিধা আদায় করতে গিয়ে প্রকৃতির ভারসাম্যকেই তারা বিপর্যস্ত করে ফেলেছিল,—অর্থাৎ যে ডালে তারা বসেছিল সেই ডালটাকেই শেষ পর্যন্ত কেটে ফেলেছিল। এই সমস্ত সভ্যতা গড়ে উঠতে হাজার হাজার বছর সময় লেগেছিল, কিন্তু ধ্বংস হয়ে ধূলায় মিশে যেতে বেশী সময় লাগে নি,—কয়েক দশক, বড় জোর কয়েক শতক সময় নিয়েছিল।

পৃথিবীর দু'শো কোটি বছরের জীবনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে কয়েকটি নির্দিষ্ট নিয়ম বা সূত্র কঠোরভাবে পালনের মাধ্যমেই পৃথিবীতে জীবন টিকে আছে, জীবনের সমৃদ্ধি ঘটেছে,—উদ্ভিদ ও প্রাণীর সুষম অনুপাতের সূত্রটি তার মধ্যে অন্যতম। জীবন নিরবচ্ছিন্নভাবে শক্তির ব্যবহার করে থাকে। উদ্ভিদ এই শক্তি সংগ্রহ করে থাকে সূর্যের কাছ থেকে,—তাদের বিচিত্র সালোকসংশ্লেষ ক্রিয়ার মাধ্যমে। মানুষ সমেত প্রতিটি প্রাণী এই শক্তি সংগ্রহ করে উদ্ভিদের কাছ থেকে, উদ্ভিদের তৈরী খাদ্যের মাধ্যমে। উদ্ভিদ যতটা শক্তি সংগ্রহ করে তার শতকরা 90 ভাগই সে নিজে ব্যবহার করে এবং অপচয় করে থাকে—অতি সামান্য মাত্র শক্তি অবশিষ্ট থাকে প্রাণীদের জন্য। তাই অঙ্কের নিয়মে এটা দেখা যায় মানুষ সমেত একভাগ মাত্র প্রাণীর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তার চারপাশে অন্ততঃ 99গুণ উদ্ভিদের অস্তিত্ব সযত্নে রক্ষা করা দরকার—না হলে ঐ একভাগ প্রাণীর পর্যাপ্ত শক্তির সঙ্কুলান হবে না। প্রকৃতির মধ্যে সৌরশক্তি সংগ্রহ ও বণ্টনের একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে, অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে বরাবরই রক্ষিত হয়ে এসেছে সকল প্রাণীর দ্বারা, নইলে তারা আজ টিকে থাকতে পারত না। কেবল মানুষের বেলায় দেখা যায় তার ব্যতিক্রম। উদ্ভিদ ও প্রাণীর এই 99 : 1 সুষম অনুপাতটির তাৎপর্য মানুষের চোখে কোনদিনই তেমন বড় হয়ে ধরা পড়ে নি। (কেন ধরা পড়ে নি সেটাই আশ্চর্যের বিষয়) এবং এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন থাকার ফলে আমরা আজ

(164 পৃষ্ঠার পরের অংশ)

গোষ্ঠীর বৃহত্তর জনগণের ব্যাপক সহযোগিতা পাওয়া সহজ হয়ে ওঠে না। তাতে সমগ্র পৃথিবীর শান্তি কামনায় বলিষ্ঠ সংঘবদ্ধ জনমত গঠনও সম্ভব হবে না। সেই কাজ তাই কোন রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে সম্ভব নয়। স্বেচ্ছাসেবী অরাজনৈতিক সংগঠনের বিচক্ষণ একনিষ্ঠ কর্মীদেরই এই কাজে আজ বলিষ্ঠভাবে এগিয়ে আসতে হবে। আর দেশের প্রশাসন কর্তৃপক্ষ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যদি যথার্থই মানুষের তথা সমগ্র দেশের সার্বিক কল্যাণ আন্তরিকভাবে চান তবে এই বিষয়ে উদ্যোগী শক্তিশালী নিরপেক্ষ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে অকুণ্ঠভাবে সর্ববিধ সাহায্য করতে তাঁরা এগিয়ে আসবেন। না হলে বিভিন্ন ভাবে ঘোষিত তাঁদের "শান্তির ললিত বাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস"।

---

* লাইফ সায়েন্স সেন্টার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

এমন এক সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মধ্যে জড়িয়ে পড়ছি যা থেকে মনে হয় বেরিয়ে আসা খুবই শক্ত। এই সম্পর্কে একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে,—পৃথিবীতে প্রতিদিন জনসংখ্যা বাড়ছে আড়াই লক্ষ, সুতরাং প্রতিদিন এই বাড়তি মানুষের ওজনের 99গুণ বেশী পরিমাণে সবুজের আচ্ছাদন বাড়িয়ে যাওয়া দরকার, কিন্তু হিসাব নিলে দেখা যাবে যে এক-শ' বছর আগে পৃথিবীর স্থলভাগে সবুজের অংশ যা ছিল তার শতকরা 25 ভাগ আজ কমে গেছে এবং এই সময়ের মধ্যে জনসংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণেরও বেশী। এই হিসাবটি আমাদের দেশের পক্ষেও সত্য এবং আরও বেশী প্রকট। সুতরাং এটা বলা যায়,—আমরা এমন একটা যুদ্ধ করছি যা কোন দিন জিততে পারব না।

আমাদের জীবন-দর্শনের বৈশিষ্ট্য হল, আমরা সকলেই মনে করি, পৃথিবী যেন একটি মাত্র প্রাণীর জন্য তৈরি হয়েছে, একটি মাত্র প্রাণীর নিজস্ব সম্পত্তি,—তার নাম মানুষ। পৃথিবীর সকল গাছপালা ও পশুপক্ষী মানুষের আজ্ঞাধীন দাস মাত্র, তাদের যত খুশী ও যেমন খুশীভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, ধর্মগ্রন্থ বাইবেলও এইভাবে মানুষকে বোঝান হয়েছে, মানুষকে যথেচ্ছ প্রভুত্ব করবার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আসল কথাটা হল মানুষ ও পশু-পাখি, সবুজ উদ্ভিদের ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল প্রতিবেশী মাত্র, মানুষের নিয়মে ও প্রয়োজনে প্রকৃতি চলে না, প্রকৃতির নিয়মেই মানুষকে চলতে হয়। এই পরম সত্যটি না বোঝার জন্য মানুষ সভ্যতার সূচনা থেকেই চরম দুঃখকষ্ট পেয়ে এসেছে, আজও তার দুঃখ-দারিদ্রের বিন্দুমাত্র উপশম হয় নি। প্রকৃতির নিয়মেই শক্তি সংগ্রহ যোগানের দায়িত্ব উদ্ভিদের ওপর ন্যস্ত, প্রকৃতির নিয়মেই উদ্ভিদ বাতাস থেকে দূষিত গ্যাস ও ক্ষতিকর ধূলিকণা সংগ্রহ করে পরিবেশের দূষণ মুক্ত করে এবং অক্সিজেন যোগ করে বায়ুর উপাদানের সমতা রক্ষা করে। প্রকৃতির নিয়মেই উদ্ভিদ মাটির তলা থেকে প্রচুর জল শোষণ করে বাতাসে যোগ করে,—বাতাসের আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করে। বাতাসের তাপমাত্রা হ্রাস করে, বৃষ্টিপাত ঘটায়, শিকড়ের সাহায্যে ভূমিক্ষয় রোধ করে মাটির উর্বরতা শক্তি রক্ষা করে এবং সেই সঙ্গে পলি জমে নদীর জল ধারণের ক্ষমতাকে নষ্ট হতে দেয় না,—বন্যার আশঙ্কা তাতে দূর হয়। একটি সদ্যোজাত শিশু তার মাতার ওপর যতটা নির্ভরশীল মানুষ তার থেকেও বেশী নির্ভরশীল সবুজ উদ্ভিদের ওপর,—কেননা ধাত্রীর সাহায্যে নিয়েও শিশুর প্রাণরক্ষা করা যায়, কিন্তু সবুজ উদ্ভিদের কোন বিকল্প নেই। শহরেই হোক আর গ্রামেই হোক, প্রকৃতির নিয়মেই সবুজ উদ্ভিদের ছত্রছায়ায় মানুষকে বেঁচে থাকতে হবে।

মানুষ মূলতঃ একটি পরজীবী (parasite) প্রাণী। মানুষ মাত্রই শোষক। এই পরজীবী চরিত্রের যে যে সীমাবদ্ধতা বিশ লক্ষ বছর আগে মানুষের জন্মলগ্নে বিদ্যমান ছিল তা আজও পুরোপুরি অটুট আছে, তার একটিও শৃঙ্খল মানুষ ভাঙতে সমর্থ হয় নি। তাই আজ এটা স্পষ্ট করে বলা দরকার আমরা যতদিন পর্যন্ত না বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড ও মাটির জল থেকে শর্করা উৎপাদনে সমর্থ হচ্ছি, যতদিন পর্যন্ত না স্বল্প শক্তি ব্যয়ে ব্যাপক হারে অক্সিজেন উৎপন্ন করতে পারছি এবং যতদিন পর্যন্ত না উদ্ভিদ ছাড়াই পরিবেশের দূষণ রোধ, ভূমিক্ষয় ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং আবহাওয়ার সমতা রক্ষায় সমর্থ হচ্ছি, ততদিন পর্যন্ত আমাদের উদ্ভিদের আধিপত্য স্বীকার করে নিতেই হবে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর সুষম অনুপাতটি সযত্নে রক্ষা করতেই হবে। তাদের ঐ আধিপত্যে হস্তক্ষেপ করার অর্থই হল ক্ষুধা, দারিদ্র ও ধ্বংসের কবলে নিজেদের সমর্পণ করা। অতীতে এই ধরনের বিপর্যয়ের কবলে মানুষ বহুবার পড়েছে যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানেও এটা ঘটছে পুরো মাত্রায়ই। একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি চলছে।

তাই বিগত দুই দশক ধরে এটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে পৃথিবীর প্রতিটি বড় বড় শহরে নূতন উদ্যমে গাছপালা রোপণের আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছে। শহরকে ঘিরে একটা সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলবার ব্যাপক আয়োজন করা হচ্ছে। নূতন উদ্যমে সবুজের আস্তরণ বাড়াবার ফলে দিল্লী ও সিঙ্গাপুর শহরে ইতিমধ্যেই বাঞ্ছিত ফল পাওয়া গেছে।

কয়েকমাস আগে সিঙ্গাপুরে এক আন্তর্জাতিক জীববিজ্ঞানের কনফারেন্সে যোগদানের জন্য গিয়েছিলাম। সেই সূত্রে সিঙ্গাপুর শহরের পরিবেশ উন্নয়নের মূল বিষয়গুলি দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। বর্তমানে সিঙ্গাপুর শহরের পরিবেশ দূষণের পরিমাণ বিস্ময়কর মাত্রায় হ্রাস পাবার প্রধান কারণই হল রাস্তার দু-পাশে তৃণ ও বৃক্ষরাজির সঘন অবস্থান। সবুজ গাছপালার এমন ব্যাপক ও সুষম ব্যবহার আর অন্য কোন শহরে আমার চোখে পড়ে নি। পথের দু-পাশেই ঘন সন্নিবিষ্ট বৃক্ষরাজি ও তৃণাচ্ছাদিত বিস্তৃত আস্তরণ। তারপর বাড়িঘর, বহুতল সপিং সেন্টার, আধুনিক হোটেল, অফিস। এই গাছপালাগুলিকে নিয়মিত ভাবে দেখাশুনা করা হয়। দু-বেলা ফোয়ারার সাহায্যে চলন্ত জলের গাড়ি থেকে জল দেওয়া হয়। বহু মনোরম অর্কিডের আবাসস্থল এই সিঙ্গাপুর। অর্কিডের ব্যাপক ব্যবহারের জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে, বহু উদ্যান আছে অর্কিড চর্চার জন্য। বৃক্ষ ছাড়াও রাস্তার দু-পাশে ঘাসের আস্তরণ বিছিয়ে রাখাও সিঙ্গাপুরের রাস্তাগুলির বৈশিষ্ট্য। রাস্তাগুলি সবুজ ঘাসের স্নিগ্ধ গন্ধে ভরপুর থাকে,—অটোমোবাইলের ধোঁয়ার গন্ধে নয়।

কিন্তু কলকাতায় অবস্থা কি হচ্ছে? কলকাতা শহরের ঠিক মাঝ বরাবর সে বিস্তৃত সবুজ গড়ের মাঠে আছে যাকে বলা হয় কলকাতার ফুসফুস তার বেশীর ভাগই আজ ধ্বংস হতে বসেছে। উত্তর ও পশ্চিম ভাগ ধ্বংস হচ্ছে হকার আর মিলিটারী ব্যারাকের দৌরাত্ম্যে। পূর্ব ভাগ ধ্বংস হচ্ছে স্থায়ী প্রদর্শনী ও মেট্রো রেলের হাতে, আর দক্ষিণ ভাগ ধ্বংস

হচ্ছে দ্বিতীয় হুগলী সেতুর লেজের দাপটে। দ্বিতীয় হুগলী সেতু শেষ হয়ে এসেছিল প্রিন্সেপ ঘাটের কাছ বরাবর, তাকে আবার ওপরে তুলে, ফ্লাইওভারের অজস্র শাখা-প্রশাখা সৃষ্টি করে গড়ের মাঠের এক বিস্তৃত সবুজ অংশ বিনষ্ট করে ফেলা হয়েছে। ফ্লাইওভার সম্পর্কে আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা হল একতলায় একটা নারকীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়, একটা স্থায়ী জঞ্জাল পূর্ণ বাজারের সৃষ্টি হয়, গড়ের মাঠের মূল ভূমিকাই তাতে বিফল হবে। ফ্লাইওভারের বদলে মাঠের ওপর দিয়ে রাস্তাগুলি করা যেতে পারত, তাতে বহু অর্থ, সময় ও শ্রমের সাশ্রয় হত। আসলে আজও পর্যন্ত কোন উন্নয়ন কাজে পরিবেশ বিজ্ঞানীদের ডাকা হয় না। তাদের মতামতের আদৌ কোন মূল্য বা গুরুত্ব দেওয়া হয় না, কিন্তু তার ফলে উন্নয়নের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। বিগত তিন দশক ধরে এই শহরের প্রসার যেমন বাড়ছে ঠিক সেই অনুপাতেই এই শহরের মধ্য ভাগে এবং শহরকে ঘিরে যে সবুজের বেষ্টনী ছিল তা সম্পূর্ণ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

বিগত কয়েক বছর ধরে CMDA-এর উদ্যোগে National Environmental Engineering Research Institute (NEERI) আমাদের কলকাতা শহরের অবস্থা সম্পর্কে যে সমীক্ষা করেছেন তা থেকে জানা যায় এই শহরের বাতাসে যে পরিমাণ দূষিত পদার্থ জমা হচ্ছে তা অত্যন্ত ভয়াবহ। হাওড়া সহ কলকাতা শহরের বাতাসে প্রতিদিন 1305 টন অত্যন্ত বিপজ্জনক দূষিত পদার্থ এসে মিশছে, এর মধ্যে শতকরা 44 ভাগই নানা রকম ক্ষতিকর পদার্থের সূক্ষ্ম ভাসমান কণা (solid particulate) যার মোট ওজন 560 টন। এইসব সূক্ষ্ম কণার মধ্যে কয়লার গুঁড়া, ঝুল, কালি ও নানা রকম বিষাক্ত ধাতব পদার্থ রয়েছে,—যা শরীরে ক্যানসার রোগ সৃষ্টি করতে পারে এবং মারাত্মক অ্যাজমা সহ ফুসফুস ও শ্বাসনালীর নানা রকম রোগ সৃষ্টি করতে পারে। বাতাসের 1305 টন দূষিত পদার্থের শতকরা 34 ভাগ হল অতি বিষাক্ত কার্বন মনোক্সাইড, যার মোট ওজন 450 টন, শতকরা 9 ভাগ বা 123 টন সালফার ডাইঅক্সাইড। শতকরা 8 ভাগ বা 102 টন হাইড্রোকার্বন এবং শতকরা 5 ভাগ বা 70 টন অক্সাইডস অব নাইট্রোজেন। প্রতিদিন এই বিপুল পরিমাণ মারাত্মক দূষিত পদার্থ শহরের বাতাসে এসে জমা হচ্ছে অথচ তা থেকে বাতাসকে বিশুদ্ধ করবার কোন রকম ব্যবস্থাই নেই। প্রতিদিন এই শহরে 370 টন সূক্ষ্ম ধূলিকণা বাতাস থেকে ঝরে মাটির ওপর জমা হচ্ছে। শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহমান হুগলী নদীতে অজস্র কলকারখানা ও গৃহস্থের বাড়ী থেকে অতি বিপুল পরিমাণ আবর্জনা এসে মিশছে। এই জলে জীবাণু ও দূষিত পদার্থের পরিমাণ এত বেশী যে আন্তর্জাতিক মান অনুসারে তা ব্যবহারের সম্পূর্ণ অযোগ্য।

এই শ্বাসরুদ্ধকর ভয়ঙ্কর অবস্থা থেকে মুক্ত হবার দুটি প্রধান উপায় আমাদের সামনে খোলা আছে। একটি হল দূষিত পদার্থ যেখানে সৃষ্টি হচ্ছে সেখানে সেটা বন্ধ করা, ট্রিটমেন্টপ্ল্যান্ট বসিয়ে জল ও বাতাসকে যথাসম্ভব দূষণমুক্ত করা। দ্বিতীয়টি হল শহরের চারপাশে একটি চওড়া ঘন সবুজ বেষ্টনী (green belt) গড়ে তোলা। তাছাড়া শহরের মধ্যে গড়ের মাঠ ও অন্যান্য জায়গায় পরিকল্পিত ভাবে সবুজের অভিযান শুরু করা। এই দুটি কাজই একসঙ্গে করতে হবে। কেননা খুব সার্থকভাবে ট্রিটমেন্টপ্ল্যান্ট কাজ করলেও শতকরা 20-25 ভাগের বেশী দূষিত পদার্থকে নিষ্ক্রিয় করা যাবে না,—আর সব জায়গায় এই প্ল্যান্ট চালু করাও সম্ভব নয়। সুতরাং সবুজ বেষ্টনীর ওপর আমাদের সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং এটি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য এবং স্বল্প ব্যয় সাপেক্ষ, পৃথিবীর প্রত্যেকটি জনবহুল শহরেই এটা করা হচ্ছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিদিন শহরের বাতাসে যে পরিমাণ দূষিত পদার্থ জমা হচ্ছে তার 44% বা 560 টন হল সূক্ষ্ম কণিকা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি কলেজে এই সম্পর্কে একটি গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে, তাতে দেখা যায় বিরাট বৃক্ষগুলির এই কণিকা সংগ্রহের ক্ষমতা অত্যন্ত বিপুল, তারা পাতার দু-পিঠেই এই কণিকাগুলি আটকে রাখে। বিভিন্ন বৃক্ষের এই ক্ষমতা বিভিন্ন রকম। তাঁদের প্রকাশিত তালিকা দেখে বলা যায় কি কি প্রজাতির বৃক্ষ সবুজ বেষ্টনী তৈরির সময় সবচেয়ে কার্যকর হবে। এই সবুজ বেষ্টনীর মধ্যে অবশ্যই ছোট-বড় অনেক জলাশয় রাখতে হবে এবং এই জলাশয়গুলিতে মাছের চাষ করতে হবে। কেন না জৈব পদার্থের নিষ্ক্রিয়করণে ও আবর্তনে এই জলাশয় ও মাছের বড় রকম ভূমিকা আছে। প্রতিদিন এই শহরে যে বিপুল পরিমাণ আবর্জনা সৃষ্টি হচ্ছে তার কিছুটা যদি দূষণমুক্ত করে জলাশয়গুলিতে ব্যবহার করা যায় তাহলে তা মাছের চমৎকার খাদ্য হতে পারে, গাছের সার হিসাবেও তা ব্যবহার করা যেতে পারে। এই সবুজ বেষ্টনীর মধ্যেই জলশোধনের ব্যবস্থাগুলি করা যেতে পারে। এই বিষয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে বেশ কিছু কাজকর্ম হচ্ছে, তাদের কাছ থেকে এই বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যেতে পারে।

সবশেষে এই প্রবন্ধ লেখকের মন্তব্য হল,—হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর পরিণতির হাত থেকে যদি এই কলকাতা শহরকে বাঁচাতে হয় এবং এই শহর ও শহরতলীর লক্ষ লক্ষ নিরাপরাধ অধিবাসীদের অবধারিত ভয়াবহ যন্ত্রণাদায়ক বিকৃতি ও মৃত্যুর হাত থেকে যদি রক্ষা করতে হয় তাহলে এই শহরের চারপাশে একটি সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই। যে কোন পরিকল্পনা থেকে এই বিষয়টি অগ্রাধিকার পাবার অপেক্ষা রাখে।

কীটনাশক ঔষধ ও পরিবেশ দূষণ

পরিবেশ দূষণে বর্তমানে অনেকেই কীটনাশক ঔষধের ভূমিকা সম্বন্ধে অবহিত। 1939 খৃস্টাব্দে ডি. ডি. টি.-র আবিষ্কার এবং 1942 খৃস্টাব্দ থেকে ব্যাপক ব্যবহার কীটদমনে যুগান্তকারী অবদান বলে গণ্য হয়, আবিষ্কর্তা ডঃ মুলারকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়। 1944 খৃস্টাব্দে উইনস্টন চার্চিল এই রাসায়নিক দ্রব্যকে 'miraculous powder' নামে অভিহিত করেন। ডি. ডি. টি.-র ব্যবহারে একমাত্র ভারতবর্ষেই 1933—35 খৃস্টাব্দে দেড় লক্ষ লোকের ম্যালেরিয়ার মৃত্যু, 1966 খৃস্টাব্দে 1500-তে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু পরিবেশ দূষণে এর সক্রিয় ভূমিকা এবং জনস্বাস্থ্যে ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়ার দরুণ, পশ্চিমের অনেক দেশ যথা সুইডেন, গ্রেট বৃটেন, কানাডা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ডি.-ডি.-টি. ব্যবহার আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ডি. ডি. টি. আবিষ্কারের পর তিন শতাধিক বিভিন্ন রাসায়নিক কীটনাশক ঔষধ আবিষ্কার হয়েছে এবং কৃষি ও জনস্বাস্থ্যে এদের ব্যবহার ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে, সেই সঙ্গে পরিবেশ দূষণ ও বিষক্রিয়ার সমস্যা।

1958 খৃস্টাব্দে কেরল ও তামিলনাড়ু রাজ্যে মিথাইল প্যারাথায়নের সঙ্গে দৈবাৎক্রমে মিশ্রিত গম ব্যবহার করে বহুলোকের মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনার পর ভারত সরকার কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে সচেষ্ট হয়ে কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার সংক্রান্ত আইন ও নিয়মাবলী রচনা করেন। 1955-59 খৃস্টাব্দের মধ্যে হেক্সাক্লোরোবেনজিন দ্বারা সংশোধিত গম বীজ খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে তুরস্কে বহু লোকের মৃত্যু ঘটে। 1976 খৃস্টাব্দে 7500 লোক পাকিস্থানে ম্যালেরিয়া দমন প্রকল্পে নিযুক্ত ছিল। সাধারণতঃ নিরাপদ বলে বিবেচিত ম্যালাথায়ন ব্যবহার করা হয়েছিল। ম্যালাথায়ন প্রস্তুতির সময় অন্য কোন রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণের দরুণ বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, ফলে 2700 লোক অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং পাঁচজনের মৃত্যু ঘটে।

দক্ষিণ আফ্রিকার এক কৃষি মহাবিদ্যালয়ে, 38 জন ছাত্র ও শিক্ষক কয়েক মাস ধরে আন্ত্রিক গোলযোগ ও জ্বরে মধ্যে মধ্যে ভুগতেন। কারণ জানা গেল অরগানোফসফরাস ঘটিত ঔষধ ঠিকমত সাবধানতা অবলম্বন না করে ব্যবহার করা। 1971-72 খৃস্টাব্দে ইরাকে অরগানোমারকিউরিক রাসায়নিক ঔষধ দ্বারা শোধিত গম বীজ খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে 5500 লোক অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং 280 জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। প্রতি বৎসর পৃথিবীতে আনুমানিক পাঁচ লক্ষ লোক কীটনাশক ঔষধের বিষক্রিয়ার দরুণ অসুস্থ হয় এবং এর মধ্যে অনেকেই মৃত্যুবরণ করে বা মানসিক ভারসাম্য হারায়। কৃষি উৎপাদন ও পশুপালনে এবং কীটপতঙ্গ বা অন্য জীববাহিত পশুর ও মানুষের বিভিন্ন ব্যাধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও কোন কীটনাশক ঔষধই বিপদহীন নয়। যখন কোন প্রাণী বা প্রাণীগোষ্ঠীর উপর প্রভাব দেখা যায়, তখন সহজেই অনুমান করা যায় অন্য অনেক প্রাণী এমনকি মানুষের শরীরেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। কীটপতঙ্গ দমনের জন্য অরগানোফসফরাস ও কার্বামেট জাতীয় রাসায়নিক ঔষধ যে প্রক্রিয়ায় তাদের মৃত্যু ঘটায়, মানুষ ও অন্য প্রাণীর শরীরে সেই একই ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

এই কারণে কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইন প্রণয়ন করার প্রয়োজন আছে এবং সে বিষয়ে পৃথিবীর প্রায় প্রতি রাষ্ট্রই ব্যবস্থা নিয়েছে। এই আইনের মূল উদ্দেশ্য :—

(1) যে লোক এই ঔষধ প্রস্তুত, প্যাকিং, পরিবহন ও গুদামজাত করার কাজে নিযুক্ত তাদের রক্ষা করা।

(2) এমন ভাবে প্যাকিং করা যাতে করে কোন উপায়ে এই ঔষধ প্যাকেজ থেকে বের হয়ে খাদ্য, পশুখাদ্য প্রভৃতির সঙ্গে না মিশে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

(3) যে লোক কীটনাশক প্রয়োগের কাজে লিপ্ত থাকবে তার উপযুক্ত রক্ষণ ব্যবস্থা।

(4) নিম্নমানের ঔষধ বিক্রয় বন্ধ করা।

(5) কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগ-করা খাদ্যদ্রব্য বা পশুখাদ্য যাতে গ্রহণকারী মানুষ বা পশুর শরীরে বিষক্রিয়া সৃষ্টি না করে তার নির্দেশাবলী প্রস্তুত করা।

(6) জল, বায়ু, পরিবেশ ঔষধ প্রয়োগের ফলে যাতে দূষিত না হয় সে বিষয়ে সতর্কতার ব্যবস্থা করা।

(7) উপরিউক্ত ব্যবস্থার ফলে, যাতে কীটনাশক ঔষধের আবিষ্কার ও প্রয়োগের উপর অযথা অসুবিধার সৃষ্টি না হয়।

(Pesticides and Human Welfare Eds. D. L. Gunn and J.G.R. Stevens, Oxford University Press, 1976 পুস্তক থেকে গৃহীত)। বলা যেতে পারে মোটামুটি ভাবে ব্যবহারের উপর অর্থাৎ যাঁরা প্রস্তুত ও প্রয়োগ করবেন এবং যাঁরা কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগ-করা খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করবেন, তাঁদের স্বার্থেই এই নিষেধ বা নিয়মাবলী সৃজন করা হয়েছে। পরিবেশ সমস্যার উপর সে রকম দৃষ্টি দেওয়া হয় নি।

বিষক্রিয়ার তীব্রতার সম্বন্ধে তথ্য নির্ধারণ করা হয় খরগোস বা ঐ জাতীয় 2-3টি প্রাণীর উপর পরীক্ষামূলকভাবে বীক্ষণাগারে। এর জন্য আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় এবং প্রাণীগুলিও এমনভাবে নির্বাচন করা হয় যাতে তারা একই প্রজাতির, একই রকমের এবং মোটামুটি একই রকম স্বাস্থ্যের।

* 6/1/A, বেলতলা রোড, কলিকাতা-700026

অন্য প্রাণীর উপর বিশেষ করে যে পরিবেশে ব্যবহার করা হবে সেখানের পরিবেশে অন্য যেসব জন্তু আছে এবং পরিবেশের অবস্থা যে পরিবর্তনশীল সে বিষয়ে কোন নজর দেওয়া হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে মাছের উপর কীটনাশক ঔষধের প্রভাব নির্ভর করে জলের গতি, অক্সিজেনের পরিমাণ, পি. এইচ., মাছের আয়তন, বয়স প্রভৃতির উপর, কিন্তু গবেষণাগারে পরীক্ষার মাধ্যমে এই তথ্য পাওয়া সম্ভব নয়

বিষক্রিয়ার তীব্রতা নিরূপণে যে সব পরীক্ষা অল্প সময়ের সীমাবদ্ধ, কিন্তু দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে কি খারাপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে তার মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। ধীরে ধীরে শরীরে কীটনাশক ঔষধের বিষক্রিয়া শুরু হলে বাড় বা বৃদ্ধির অস্বাভাবিকতা, মানসিক ব্যবহার এমন কি প্রজনন ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটে। যথা ডি ডি টি শরীরের চর্বিতে বা স্নেহজাতীয় পদার্থে জমে। যখন পাখীরা প্রজননের জন্য ডিম পাড়ে তখন তার শরীরের জমানো স্নেহজাতীয় পদার্থ ডিমে প্রবেশ করে, সেই সঙ্গে সেই পদার্থে জমা ডি ডি টি, ফলে ডিমের উপরের খোলা, যা মূলতঃ ক্যালসিয়াম জাতীয় পদার্থ দিয়ে তৈরী, খুবই পাতলা হয় এবং সহজে ভেঙ্গে যায়, কেননা ডি ডি টি-র ক্যালসিয়াম মেটাবলিজমের উপর প্রভাব আছে। Rachel Carson "Silent Spring" বই-এ পাখীর সংখ্যার স্বল্পতা এবং তার মূলে যে কীটনাশক ঔষধের বিষক্রিয়ার প্রভাব আমাদের নজরে আনেন জোরালো ভাষায় এবং আমাদের সচেতন করে পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে। সুতরাং বিষক্রিয়া নিরূপণের পরীক্ষালব্ধ তথ্য পরিবেশ দূষণের বিষয়ে কোন সাহায্য করে না, উপরন্তু নিরর্থক বলে বিবেচিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

পরিবেশ দূষণের দরুণ জীব জগতের ক্ষতির গুণ ও সংখ্যাগত পরিমাণ সঠিকভাবে সংগ্রহ করা খুবই কঠিন। কেননা প্রত্যক্ষ জ্ঞান খুবই সীমিত। কীটনাশক ঔষধ ব্যবহারের দরুণ পরিবেশ দূষণও জীবজন্তুর উপর তার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সমীক্ষা আফ্রিকার কিছু দেশে 20 বৎসর ধরে অভিজ্ঞ গবেষক দ্বারা করান হয়েছে। টেট্‌সি (tsetse) পোকা বিনাশের জন্য, যে পোকার মাধ্যমে মানুষের নিদ্রালু অসুস্থতা (sleeping sickness) বিস্তার লাভ করে, এনডোসালফান ও ডাইঅলড্রিন স্প্রে করা হয় এরোপ্লেনের সাহায্যে। যদিও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি, তাহলেও ঔষধ প্রয়োগের ফলে জীবজন্তুর মৃত্যু সম্বন্ধে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। সেই তথ্য সংক্ষেপে পরিবেশন করা হলো। (তালিকা পরের পৃষ্ঠায় দেখুন)

এতে N.R.D.C. 161 একটি পরীক্ষামূলক কীটনাশক ঔষধ যার কার্যকারিতা টেট্‌সি পোকার উপর ডি ডি টি থেকে 1000 গুণ বেশী কার্যকরী, সুতরাং অল্প মাত্রায় প্রয়োগে কাজ হয়।

এই পরিসংখ্যানের উৎস :—Pesticide Management, Centre for Overseas Pest Research, U. K. Overseas Development Administration.

কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগে মাছের উপর প্রতিক্রিয়া এবং মৃত্যু খুব দ্রুত ঘটে। 1957 খৃষ্টাব্দে পলাশীতে আখের মাজরা পোকা দমনের জন্য যখন এরোপ্লেনের সাহায্যে উপর থেকে কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা হয়েছিল, প্রয়োগের দোষ কিংবা অসাবধানতাবশতঃ পুষ্করিণী, বিল বা গঙ্গানদীতে কীটনাশক ঔষধ প্রবেশ করার ফলে মাছের মৃত্যু দেখতে পাওয়া যায়। সাম্প্রতিক কালে সুভাষ সরোবরে মাছের ব্যাপক মৃত্যুর কারণ হিসাবে কীটনাশক ঔষধের প্রভাবকে দায়ী করা হয়।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান লেকে ট্রাউট মাছের উপর সমীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে মাছের শরীরে ডি ডি টি, ডাইঅলড্রিন প্রভৃতি ক্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বন সহজে বহুগুণ জমতে পারে, অর্থাৎ বিজ্ঞানীদের ভাষায় এদের শরীরে বায়োম্যাগনিফিকেশন (biomagnification) হয়। লেকমিশিগানের জলে মোটামুটি 0·000006 পি. পি. এম. ডি ডি টি এবং 0.000002 পি. পি. এম ডাইঅলড্রিন ছিল, কিন্তু মাছের শরীরের ডি. ডি. টি.-র পরিমাণ 18·8 পি পি এম এবং ডাইঅলড্রিন ছিল 0·26, অর্থাৎ ডি. ডি. টি. শরীরে জমেছে $3{\cdot}3 \times 10^6$ গুণ এবং ডাইঅলড্রিন $1{\cdot}3 \times 10^5$ গুণ।

কীটনাশক ঔষধের দরুণ জল দূষিত হতে থাকলে ভবিষ্যতে সুদূরপ্রসারী কি পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তা ডঃ হার্লবার্টের ক্যালিফোর্নিয়ার টুলে হ্রদে (Tule Lake) গবেষণা থেকে উপলব্ধি করা যায় (Hurlbert, S. H. Residue Reviews 57, 82, 1973)। জাতীয় বন্যপ্রাণী আশ্রয়ে (National Wildlife Refuge) পাঁক, জল ও মাছের মধ্যে অরগানোক্লোরিনের পরিমাণের আধিক্যের ফলে মাছ খেয়ে যেসব পাখী বেঁচে থাকে, তাদের সংখ্যা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। বিভিন্ন জলজ উদ্ভিদের সংখ্যাও ক্রমশঃ কমতে থাকে। অমেরুদণ্ডীপ্রাণীর সংখ্যাও কমে এবং বিভিন্ন অনিষ্টকারী পোকা ও জীবের (worm) উপদ্রব বাড়তে থাকে। বিভিন্ন ধরণের মাছের যে বৈচিত্র্য দেখা যেত, তা হ্রাস পেতে থাকে, কচ্ছপের বিনাশ হয়। সরীসৃপ ও উভচর প্রাণীর সংখ্যা কমে যায়। হ্রদ ক্রমশঃ সবুজ শ্যাওলায় ঢাকা পড়ে। হ্রদের স্বাভাবিক আকর্ষণ কমে যায় উপরন্তু এই হ্রদকে পরিহার করার লক্ষণ দেখা যায় মানুষ ও জীবজন্তুর মধ্যে। টুলে হ্রদে ইকোসিস্টেমে অরগানোক্লোরিনের সুদূরপ্রসারী প্রভাব সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যায়।

দিল্লীতে 'ওকলার' কাছে যমুনার ধারে ডিডিটি প্রস্তুত করার যে কারখানা আছে তার নির্গত দ্রব্যের ফলে যমুনার জলের দূষণ ও মাছের উপর প্রভাব বহুজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু অন্য রাষ্ট্রের মতো এদেশে পরিবেশ দূষণের উপর যথার্থ সচেতনতা এখনও আসে নি অন্ততঃ কীটনাশক ঔষধের প্রভাব সম্বন্ধে। পরীক্ষাগারে রাসায়নিক পদার্থের যেসব গুণাবলী নির্ধারণ করা হয়, দেখা গিয়েছে যে প্রকৃতিতে তার কিছুটা

তালিকা

রাসায়নিক পদার্থ	প্রয়োগ	রাষ্ট্র	কুফল
ডাইএল্ডিন (Diealdrin)	প্রয়োগের পর রাসায়নিক ঔষধ যা থেকে ছিল (residue)	জাম্বিয়া	স্তন্যপায়ী জন্তুর মৃত্যু (যেমন, হায়েনা সমেত)
	প্রয়োগ মাটি এবং উপর থেকে (aerial and ground)	বোৎসানা কেনিয়া নাইজেরিয়া	পাখী, সরীসৃপ, উভচর প্রাণী, মাছ, অমেরুদণ্ডী প্রাণীর মৃত্যু, অনেক জীবের অবলুপ্তি
এণ্ডোসালফান (Endosulphan)	উপর থেকে প্রয়োগের সময় এবং প্রয়োগের পর থাকা অংশ (aerial and residue)	নাইজেরিয়া আপার ভোল্টা	স্তন্যপায়ী জীব, পাখী, সরীসৃপ, উভচর, মাছ এবং স্থলে ও জলে অবস্থানকারী অমেরুদণ্ডী প্রাণীর মৃত্যু
এণ্ডোসালফান	উপর থেকে প্রয়োগ, অতি সূক্ষ্ম কণা রূপে (aerials ultra low volume)	জাম্বিয়া বোৎসানা জিম্বাওয়ে	মাছের মৃত্যু, মাছের ও প্রয়োজনীয় উপকারী জন্তুর উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া
এন. আর. ডি. সি 161 (NRDC 161)	উপর থেকে প্রয়োগের পর থাকা অংশ (aerial residue)	আইভরি কোস্ট	জলজ অমেরুদণ্ডী প্রাণীর মৃত্যু, কীটপতঙ্গের মৃত্যু এবং কিছু প্রজাতির সম্পূর্ণ ধ্বংস
এন. আর. ডি. সি 161 (N.R.D.C. 161)	উপর থেকে প্রয়োগের সময়	বোৎসানা	বহু কীটপতঙ্গের মৃত্যু

পরিবর্তন ঘটে, উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে গামা-বি. এইচ. সির. ভৌত গুণাগুণ নিয়ে যখন পরীক্ষা করা হয়, তখন বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল না যে এর পরিব্যাপ্তি উত্তর মেরু, গ্রীনল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে যেখানে এই কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার করা হয় নি, সেখানে তার উপস্থিতি যন্ত্রে ধরা পড়বে।

ছত্রাক ও ব্যাকটিরিয়ার দরুণ আক্রান্ত শস্যবীজকে রোগমুক্ত করতে এবং চারা অবস্থায় ছত্রাকের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য জৈব পারদঘটিত ঔষধের ব্যবহার বিংশ শতাব্দীর বিশ দশক থেকে চালু আছে। এই ব্যবস্থা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পশ্চিমী দেশে চালু ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর ও উন্নতিকামী দেশগুলিতে এর প্রচলন শুরু হয়েছে।

যদিও অতীতে বিষক্রিয়ার নজির বড় একটা নজরে আসে নি বা গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। পারদঘটিত সংশোধিত বীজ পাখিতে খেলে পাখির অসুস্থতা বা মৃত্যু ঘটে যার কথা আগে বলা হয়েছে। পাখিদের অসুস্থতা, যন্ত্রণাকাতর অবস্থা ও মৃত্যুর নজির দেখে সুইডেনে 1966 খৃস্টাব্দ থেকে পারদঘটিত পেস্টিসাইড ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। মার্কিন সরকারের পরিবেশ সুরক্ষা সংস্থা 1976 খৃস্টাব্দে অনুরূপ ব্যবস্থা নেন। সুখের বিষয় বর্তমানে বীজ সংশোধনে পারদঘটিত ঔষধের ব্যবহার ক্রমশঃ সীমিত হচ্ছে, বস্তুতঃ এখন একটিমাত্র পদার্থই বাজারে বিপনন করা হয়।

গাছের পাতায় বা মাটিতে রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করা

হয়। গাছের উপর ব্যবহার করলেও অধিকাংশই শেষ পর্যন্ত মাটিতে জমা হয়। মাটিতে প্রয়োগ বা প্রবেশের পর গ্যাসীয় অবস্থায় বায়ুমণ্ডলে মিশে যেতে পারে, মাটির কাদা-কণা কিংবা হিউমাস দ্বারা অবিশোধিত অবস্থায়, জলের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে মাটির গভীরে নেমে যায়, মাটিতে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটায়, কিংবা জীবাণু দ্বারা বিশ্লেষিত হতে পারে। তিন ধরনের কীটনাশক ঔষধ যথা অরগানো ক্লোরিন, অরগানো ফসফরাস ও কারবামেট-এর মধ্যে প্রথমোক্ত দ্রব্য সহজে বিনষ্ট হয় না—অন্য দুটির বিষক্রিয়া তীব্র হলেও কার্যকারিতা স্বল্পদিন স্থায়ী। আর একটি কীটনাশক ঔষধ অজৈব রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার আগে ছিল এখনও বোধ করি কিছু পরিমাণ আছে, বিশেষ করে 24-পরগণার সবজি চাষীদের মধ্যে সেটি হচ্ছে 'প্যারিসগ্রীন' (কপার আরসিনেট) লেড আরসিনেট, ক্যালসিয়াম আরসিনেট। এই রাসায়নিক দ্রব্য মাটিতেই থেকে যায়, বিনাশ পায় না, জলের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে ভূগর্ভের জলের স্তরেও যেতে পারে। ছত্রাকনাশক ঔষধের মধ্যে তামঘটিত রাসায়নিক পদার্থের মধ্যেও সামান্য পরিমাণ আরসেনিক থাকে। সাম্প্রতিককালে 24-পরগণা জেলার কোন কোন এলাকায় নলকূপের জলে আরসেনিকের মাত্রাধিক্য দেখা গিয়েছে এবং সে কারণে মানুষের শরীরে বিভিন্ন ব্যাধিরও সৃষ্টি হয়েছে হয়তো এই কারণেই। অরগানো ক্লোরিনের মাটিতে অবস্থান বা রূপান্তরিত হওয়া সম্বন্ধে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। যদিও এই ধরনের রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহারই বেশী, বিশেষ করে মাটিতে অবস্থিত উই, কাটুই পোকা, ঘুরঘুরে পোকা প্রভৃতির দমনের জন্য। পরীক্ষালব্ধ তথ্য থেকে জানা যায় এগুলি উপরের মাটিতে 3-4 মাসের বেশী থাকে না। অনুমান করা হয় যে মাটিতে জলের মধ্য দিয়ে নীচে চলে যায় বা পুকুর, নদী প্রভৃতিতে প্রবেশ করে।

বর্তমানে যেসব ঔষধ গাছের, পশুর বা জনস্বাস্থ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়, সেই ঔষধের বিষক্রিয়া সম্বন্ধে অনেকে সজাগ। কিন্তু যেসব কারখানায় এই ঔষধ প্রস্তুত হয়, কিংবা তার কার্যকরী রাসায়নিক অংশ (active ingradient) গুঁড়া, জলে গোলা পাউডার, দানাদার ঔষধ (granules), ইমালসান প্রভৃতি করা হয় সরাসরি ব্যবহারের জন্য, সেইসব কারখানা থেকে বর্জ্য পদার্থ, তরল বা গ্যাসীয়, কোথায় যায়, কিভাবে পরিবেশ দূষণ করে সে সম্বন্ধে সজাগ নই। ঔষধ প্রস্তুতের কারখানা (formulation plant) বর্তমানে এমন স্থানে অবস্থিত যে চারপাশে লোকালয়, পুষ্করিণী বা গাছপালার সমাবেশ আছে। কিছু কারখানা নদীতীরেও অবস্থিত। পরিবেশ দূষণে এদের ভূমিকা কি সে বিষয়ে আরও গবেষণালব্ধ তথ্য দরকার। কীটনাশক ঔষধের প্রভাব মানব ও পশুর শরীরে সুদূরপ্রসারী। মৃত্যু ছাড়া, দুর্বলতা, অঙ্গবৈকল্য, মানসিক ভারসাম্য হারান, বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম প্রভৃতি কীটনাষক ঔষধের বিষক্রিয়ার হয়।

এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞানী মহলে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে যে কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার কি বন্ধ করা হবে। ডি. ডি. টি. বা অন্য অরগানো ক্লোরিনের ব্যবহার হয় সেই জাতীয় পোকার দমনে যার মাধ্যমে মানুষ ও পশুর অনেক রোগ ছড়ায় যথা, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, এনকেফালাইটিস, পীতজ্বর (yellow fever), নিদ্রালু অসুস্থতা (sleeping sickness) প্রভৃতি। এইসব রোগ দরিদ্র ও উন্নতিকামী উষ্ণপ্রধান দেশে ব্যাপক দেখা যায় এবং ক্ষতিও করে বেশী। এই জাতীয় কীটনাশক ঔষধের কার্যকারিতা দীর্ঘদিন স্থায়ী এবং মূল্য অনেক কম, সেজন্য এদের ব্যবহার খুবই বেশী। তাছাড়া এদের ব্যবহার ব্যবহারকারীর পক্ষে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। জনস্বাস্থ্যের পক্ষে প্রত্যক্ষ ক্ষতির কারণ হয় না। সেজন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এ ধরনের কীটনাশক ঔষধের ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞার প্রস্তাব সমর্থন করেন না। কেননা দরিদ্র দেশে জনস্বাস্থ্যের জন্য ব্যয়বহুল বিকল্প ঔষধ, যা ব্যবহারকারীর পক্ষে বিপজ্জনক এবং বিশেষ ব্যবস্থার ও সতর্কতার প্রয়োজন, তা প্রয়োগ করা সম্ভব হবে না। ডঃ মেলানবি মন্তব্য করেছেন যে উন্নতিকামী দেশে ডি. ডি. টি.-র ব্যবহার নিষেধ করলে অসংখ্য লোক ম্যালেরিয়া বা অন্য রোগে মারা পড়বে, সেক্ষেত্রে পরিবেশ দূষণের জন্য যে ক্ষতি হবে তা সহ্য করতে হবে। (Dr. Mellanby in Pesticides and Human Welfare Chapter 18, D. L. Gunn and J. G. R. Stevens (editors). Oxford University Press).

ভারতীয় বিজ্ঞানী ডঃ দেশমুখ ও ডঃ গুপ্ত এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে ডি. ডি. টি.-র দীর্ঘস্থায়ী কার্যকারিতা এবং সহজে বিনষ্ট না হওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এর উপকারিতা ক্ষতিকারকতার চেয়ে অনেক বেশী। সেজন্য ডি. ডি টি.-র ব্যবহার শুধু কৃষিতে নয়, জন ও পশু স্বাস্থ্য সংরক্ষণে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যায়। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ডঃ বোরলোগ এই মত প্রকাশ করেছেন যে কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার আইন করে বন্ধ করে দিলে, রোগ ও পোকার আক্রমণের দরুণ শস্যহানির পরিমাণ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ পর্যন্ত হতে পারে, এবং খাদ্যশস্যের দাম 4-5 গুণ বাড়বে। (Norman Borlaug, 1972 Mankind and Civilisation at another cross-road in balance with nature—a biological myth. Bioscience 22 : 41—44).

এই পরস্পর সংঘাত দৃষ্টিভঙ্গী ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে আমাদের কর্তব্য কি ? বিজ্ঞানীদের সুচিন্তিত অভিমতগুলি সংক্ষেপে একত্রিত করলে এই দাঁড়ায় :—

(1) কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার সীমিত করতে হবে এবং তা হবে প্রয়োজনভিত্তিক।

(2) কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে এবং যথাযথ প্রয়োগের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে যাতে আবহাওয়া বা পরিবেশ যতদূর সম্ভব কম দূষিত হয়।

(3) ঔষধ নির্বাচনে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যতদূর সম্ভব কম বিষক্রিয়া, অথচ একই ধরণের কার্যক্ষমতা বিশিষ্ট ঔষধ নির্বাচন করতে হবে।

(4) ঔষধ প্রস্তুত, পরিবহন, গুদামজাত করা এবং ব্যবহার করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে আরও জানা যায় যে কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার করা ছাড়া অন্য পন্থা অবলম্বনের সুযোগ আছে, যদিও সেই ব্যবস্থা এখনও পরীক্ষামূলক অবস্থায় রয়েছে। ব্যবসায় ভিত্তিক সম্ভাব্যতা এখনও যাচাই করে দেখা যায় নি। সেগুলি হচ্ছে :—

(1) জৈব প্রক্রিয়া—অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গের শত্রু প্রকৃতিতে আছে, যার ফলে জীবজগতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রাখা সম্ভব হয়। সেই উপকারী পোকা নির্বাচন করে, পরীক্ষাগারে বংশবৃদ্ধি করিয়ে প্রকৃতিতে ছাড়তে হবে অনিষ্টকারী পোকার ধ্বংসের জন্য।

(2) এমন রাসায়নিক পদার্থ আছে যারা কীটপতঙ্গকে আকৃষ্ট করে, যথা, sexhormone, pheromone. কৃত্রিম পন্থায় ল্যাবরেটারীতে এ ধরণের দ্রব্য সৃজন করা সম্ভব এদের ব্যবহার করলে পোকাকে কোন জায়গায় একত্রিত করে নষ্ট করা সহজেই সম্ভব।

(3) অনেক রাসায়নিক দ্রব্য আছে, যা ভেষজ থেকে উদ্ভূত এবং কৃত্রিম উপায়েও ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত করা যায় যাদের গন্ধে পোকা দূরে চলে যায় (repellant), কিংবা পোকার গাছ খাবার প্রবৃত্তি থাকে না (antifeedant)।

(4) বিশেষ ব্যাকটিরিয়াম (Bacillus thuringensis) এবং পোকার ভাইরাস (insect virus)-এর মাধ্যমে পোকা দমন করা সম্ভব।

(5) আত্মঘাতী ব্যবস্থা—কৃত্রিম উপায়ে নির্বীর্য পুরুষ পোকা পোকার দলে ছেড়ে দেওয়া (introduction of male sterile insect) যার ফলে অনিষ্টকারী পোকার বংশ ধীরে ধীরে অবলুপ্তি পাবে।

বর্তমানে এইসব ব্যবস্থা যাতে মাঠে ব্যবহার করা যায় সে সম্বন্ধে গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা জোরদার করতে হবে এবং এদের প্রয়োগ যাতে প্রসার লাভ করে সেদিকে সক্রিয়ভাবে সচেষ্ট হতে হবে। এইসব প্রথায় পরিবেশ দূষণের সমস্যা দেখা দেবে না।

মানসিক সুস্থতার দূষণ

আরতি দাশ*

পরিবেশ দূষণ কথাটির সঙ্গে আজকাল সকলেই খুব পরিচিত। যে পরিবেশে মানুষ বাস করে সেখানে মুক্ত বায়ু, আলো, রৌদ্রতাপ, বিশুদ্ধ জল এবং যাদের উপরে মানুষ অন্নবস্ত্র ইত্যাদির জন্য নির্ভরশীল সেই বনস্পতি, কৃষিজ দ্রব্য প্রভৃতি স্বাভাবিক অবিকৃত অবস্থায় হওয়া একান্ত প্রয়োজন। মানুষের ব্যবহৃত কৃত্রিম দ্রব্যাদি, কলকারখানার ধোঁয়া ও বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ, যানবাহন ও জ্বালানী থেকে উদ্ভূত ধোঁয়া ও গ্যাস, পারমাণবিক পরীক্ষা ও বিস্ফোরণের তেজস্ক্রিয় রশ্মি ও কণা, সবকিছুই পরিবেশকে দূষিত করে চলেছে।

মানসিক স্বাস্থ্যের অক্ষুণ্ণতার জন্যে যে পরিবেশের প্রয়োজন বর্তমান বিশ্বে তার দূষণ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষণের প্রায় সমতুল্য হয়ে চলেছে। মনোবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদের কাছে এর গুরুত্ব অপরিসীম। মানসিক সুস্থতার জন্যে প্রয়োজন এমন পরিবেশ যা মানুষের মনের চাহিদাগুলির (psychological needs) মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে এবং সমাজস্বীকৃতভাবে বিভিন্ন প্রক্ষোভের যথাযথ প্রকাশের মাধ্যমে তাকে পরিজন ও সমাজের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ আচরণের উপযুক্ত করে গড়ে তোলে।

শারীরিক সুস্থতার ব্যাপারে আমরা সকলেই খুব সতর্ক, কিন্তু দৈনন্দিন বহু তুচ্ছ কারণে মানুষের মনের গভীরে কত অবাঞ্ছনীয় অসুস্থতার বীজ উপ্ত হয়, সে সম্বন্ধে সাধারণ জনচিত্তে সচেতনতার প্রায়ই অভাব দেখা যায়।

সভ্যতার ক্রমবিকাশ একদিকে যেমন মানুষকে কৃষ্টি, সংস্কৃতি শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্যে অগ্রগতির পথে নিয়ে যায়, তেমনি অনিবার্যভাবেই তৈরি করে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিগুলির অবদমন, কৃত্রিম আচরণ এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য-বিধানের অক্ষমতা। সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক দিয়েই সুস্থ নাগরিকের প্রয়োজন। বর্তমানের একটি শিশু ভবিষ্যতের দায়িত্বশীল নাগরিক, তাই প্রতিটি শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের উপরেই ভবিষ্যৎ সমাজ নির্ভরশীল। কেবলমাত্র শারীরিক অসুস্থ কোন ব্যক্তির জীবনে অনেক ব্যর্থতা, বেদনা, হতাশা ও অসাফল্য থাকলেও সাধারণত সমাজের চোখে তার জীবনের মূল্য সম্পূর্ণ নষ্ট হয় না ; কিন্তু সুগঠিত দেহ, ধীশক্তি ও অগাধ পাণ্ডিত্য এবং আরও অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও মানসিক অসুস্থতা যে কোন ব্যক্তিকে সমাজ জীবনের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে মূল্যহীন এবং প্রকারান্তরে ভারস্বরূপ করে তুলতে পারে। সেজন্যেই মনোবিজ্ঞানীরা সুস্থ মানসিকতা গঠন ও অব্যাহত রাখার জন্যে যথাযোগ্য পরিবেশ গড়ে তুলতে প্রয়াসী।

জন্মের পর থেকে ক্রমশ বিকাশপ্রাপ্ত একটি শিশু তার শৈশব অতিক্রম করে পৌঁছয় বয়ঃসন্ধিক্ষণে এবং পরিশেষে উত্তীর্ণ হয় প্রাপ্তবয়সে। এই দীর্ঘ পথে তার প্রধান সঙ্গী তার মা-বাবা এবং পর্যায়ক্রমে ভাইবোনেরা অন্যান্য আত্মীয়-পরিজন এবং পরে খেলার সঙ্গীরা, স্কুল-কলেজের সতীর্থ ও শিক্ষকেরা এবং পরিশেষে বৃহত্তর কর্মজীবনের সহকর্মীরা।

বয়স্ক ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্যের সুষ্ঠু গঠন নির্ভর করে শৈশবে মা-বাবার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের দৃঢ় ভিত্তির উপরে। ভবিষ্যৎ জীবনে একটি শিশুর আশাবাদী বা নৈরাশ্যবাদী, উদার বা রক্ষণশীল, সহানুভূতিশীল অথবা অসহিষ্ণু হওয়ার কারণও শৈশবের পরিবেশে নিহিত।

মানসিক সুস্থতা বলতে মূলত বোঝায় সুষ্ঠু ও সুসমঞ্জস প্রক্ষোভের বিকাশ (emotional development)। এই বিকাশ শৈশব ও কৈশোরের গৃহ-পরিবেশের উপরে একান্ত ভাবে নির্ভরশীল। শৈশবের পরিবেশ যৌবনের প্রকৃতির নির্ধারক। শৈশবে শিশুর প্রক্ষোভ কেন্দ্রীভূত হয় মা-বাবার উপরে। তাই তাঁদের জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধ, শিশুর প্রতি আচরণ, শাসন ও স্নেহ প্রভৃতি প্রতিটি বিষয়ই শিশুর সুষ্ঠু প্রক্ষোভ জীবন (emotional life) গঠনের সহায়ক। পরিবেশের ভিন্নতা শিশুর সহজাত প্রকৃতির তারতম্য অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলে। যেমন সাধারণ শিশুদের তুলনায় তীক্ষ্ণধী শিশুরা পরিবেশের অসঙ্গতিতে অপেক্ষাকৃত সহজেই প্রভাবিত হয় এবং তার ফলে তাদের মধ্যে মানসিক অপসঙ্গতির প্রবণতা দেখা দিতে পারে। অন্য দিকে অল্পধী শিশুদের প্রতি বয়স্কদের বৈষম্যমূলক আচরণে তাদের মনে হীনমন্যতার (inferiority feeling) ভাব সৃষ্টি হতে পারে।

অনেক সময়েই বিশেষ করে মা-বাবার সামঞ্জস্যহীন আচরণ গৃহের পরিবেশকে শিশুর সুস্থ মানসিক বিকাশের পরিপন্থী করে তুলতে পারে। এ ধরনের অসমঞ্জস আচরণ নানাবিধ হতে পারে।

প্রয়োজনাতিরিক্ত কঠোর শৃঙ্খলা ও শাসন শিশুর ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক বিকাশকে রোধ করে। সামঞ্জস্যহীন শাসনে শিশুর আত্মবিশ্বাস বাধা পায়। শিশু শাসনের ভয়ে সদাসন্ত্রস্ত থাকে। এর ফলে সহজাত প্রকৃতি অনুযায়ী কেউ কেউ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে দুর্বিনীত, অবাধ্য শিশুতে পরিণত হয়, কেউ বা ভীতসন্ত্রস্ত প্রকৃতির হয়ে শাসন মেনে নেয় এবং ভবিষ্যৎ জীবনেও কোন দায়িত্ব নিতে সাহস করে না।

মা-বাবার অতিরিক্ত আদরে শিশু চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে ব্যবধান থাকার সম্ভাব্যতা শেখে না। অতিরিক্ত আদরে সে পরশ্রীকাতর, স্বার্থপর ও দুর্বিনীত হয়ে ওঠে ; ভবিষ্যৎ জীবনে কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন হলে না পাওয়ার ব্যর্থতায় তার মানসিক ভারসাম্য ক্ষুণ্ন হবার আশঙ্কা থাকে।

* মনোবিদ্যা বিভাগ, বেথুন কলেজ, কলিকাতা-700 006

শিশুর প্রতি অবহেলা ও ঔদাসীন্য দেখানো হলে স্বজনদের সঙ্গে তার একাত্মতা থাকে না, আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে না, নিজেকে সে অপ্রয়োজনীয় ভারস্বরূপ বলে মনে করে, ফলে সে নিজেকে সঠিক মূল্যায়ন করতে পারে না। এরকম শিশু বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন নিজস্ব মানসিক জগৎ সৃষ্টি করে তার মধ্যে বাস করতে থাকে এবং ভবিষ্যৎ জীবনেও সে সহজে কোথাও নিজের স্থান করে নিতে পারে না।

শিশু সম্বন্ধে মা-বাবার অতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকলে সেই আকাঙ্খা চরিতার্থ করতে তাঁরা শিশুর সামনে অত্যুচ্চ পারদর্শিতা ও কৃতির আদর্শ নির্দিষ্ট করে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে অবিরত শিশুর উপরে মানসিক চাপের সৃষ্টি করেন। ক্রমাগত নিজের ক্ষমতার বাইরে কাজ করতে করতে শিশু মানসিক উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় ভুগতে থাকে। তার জীবনে শিশুসুলভ খেলাধূলা, চাপল্য ও ক্রিয়াকলাপের অবকাশ না থাকায় মানসিক বিকাশ বাধা পায়, কোন কোন ক্ষেত্রে মানসিক ভারসাম্যও সম্পূর্ণ নষ্ট হতে পারে।

শিশুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মা-বাবার অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা শিশুর স্বাভাবিক শারীরিক বিকাশে ব্যাঘাত ঘটায় এবং অনাবশ্যক পরিচ্ছন্নতা বা স্বাস্থ্যের নীতি পালনের ফলে শিশু ক্রমশ বাতিকগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে এবং তার ভবিষ্যৎ জীবন দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন হতে পারে। এর সব চেয়ে বড় কুফল এই যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অতিরিক্ত সাবধানতা শিশুকে সঙ্গীদের কাছে হাস্যাস্পদ করে তোলে, ফলে সে কালক্রমে বন্ধুসঙ্গ এড়াবার চেষ্টা করে নিঃসঙ্গ থাকে। সর্বদা অপরিচ্ছন্নতা বা অসুস্থতার ভয়ে সে কখনই সহজ ও স্বাভাবিক থাকতে পারে না।

শিশুর প্রতিটি কাজের ত্রুটি ধরলে, সমালোচনা করলে, বা তাকে নিজের দায়িত্বে কোন কাজ করতে বাধা দিলে শিশু ক্রমে নিজের উপরে আস্থা ও আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে; ফলে ভবিষ্যৎ জীবনেও সে বড়দের সাহায্য ছাড়া কোন কাজের দায়িত্ব নিতে ভয় পায়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে শিশু মা-বাবার প্রতিটি কাজ সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে এবং পরের মতামত সম্বন্ধে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে।

মা অথবা বাবার অবচেতন মনে নিজের জীবনের ব্যর্থতার গ্লানি থাকলে নিজের শিশুর সাফল্যে তাঁরা ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে পড়তে পারেন। ফলে শিশুর সাফল্যে আনন্দিত হওয়ার পরিবর্তে বরং তাঁরা তার সমালোচনা করতে থাকেন। এক্ষেত্রে শিশু নিজের প্রতি আস্থা হারায় এবং নিজের কাজের প্রশংসা ও সমর্থনের আশায় অন্যত্র দৃষ্টি ফেরায়। চরম ক্ষেত্রে শিশু প্রশংসার আশায় অসৎ সংসর্গেও দ্বিধা করে না।

অনেক সময়ে মা ও বাবা শিশুকে জোর করে তার সাধ্যাতিরিক্ত সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন কাজ করাতে চান; যেটা শিশুর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং কখনও বা অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে। এই প্রচেষ্টার ফলে শিশুর নিজস্ব স্বাধীনতা খর্ব হয় এবং সমস্ত উদ্যম ও পরিশ্রমই সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন করার চেষ্টায় ব্যয়িত হওয়ায় মন সর্বদাই অসন্তোষে ভারাক্রান্ত থাকে। কোন কোন শিক্ষক এই ধরণের ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করেন, এতে শিশুরা সদাশঙ্কিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে থাকে এবং শিক্ষা ব্যাহত হয়। নিখুঁত (perfect) হওয়ার চিন্তায় শিশুর কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটে। সে স্নায়বিক চাপে ভুগতে থাকে এবং চরম ক্ষেত্রে নিখুঁত না হওয়ার আশঙ্কায় কোন কাজ শুরু করার ক্ষমতাই লোপ পায় (abulia)!

মানসিক সুস্থতার পরিবেশ সবচেয়ে দূষিত হয় শিশু তার প্রাপ্য স্নেহ ও ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হলে। কোন কারণে শিশুর মনে মা ও বাবার ভালবাসা সম্বন্ধে অভাববোধ থাকলে শিশুর মানসিক সুস্থতা ক্ষুন্ন হবার সম্ভাবনা। শিশু তার মা, বাবা, ভাইবোন ও অন্যান্য নিকটজনের স্নেহ ও ভালবাসার উত্তাপে সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষ হয়ে গড়ে ওঠে। তাই স্নেহ ভালবাসার অভাববোধ মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। যে ব্যক্তি শৈশবে নিজের গৃহে স্বচ্ছন্দ বোধ করে নি সে তার ভবিষ্যৎ জীবনে কোথাও স্বচ্ছন্দ হতে পারে না। যথোপযুক্ত ভালবাসা শিশুর মনে এনে দেয় নিরাপত্তা বোধ এবং নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা যা তার সুসমঞ্জস ব্যক্তিত্ব গঠনের সহায়ক।

মা ও বাবার পারস্পরিক তিক্ত সম্পর্কও শিশুর মনকে বিচলিত করে নিরাপত্তাবোধের অভাব সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়া মা বা বাবার আবেগজীবনের অপসঙ্গতি থাকলে গৃহের পরিবেশ সুস্থ মানসিকতা গড়ে তোলার পক্ষে প্রতিবন্ধক হতে পারে। অকারণ উদ্বেগ, উত্তেজনা, আদর ও শাসনের মধ্যে পরিমিতিবোধের অভাব, নিজের সম্বন্ধে অহমিকা অথবা হীনমন্যতা এবং শিশুর প্রতি অযৌক্তিক আচরণ শিশুর মনকে বিচলিত করে, ফলে শিশু সঠিক আচরণের পথ খুঁজে না পেয়ে মা বাবার ভালবাসার মধ্যে ঐ ধরণের অসঙ্গত, ভারসাম্যহীন আচরণেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

কৈশোর যৌবনে পরিচ্ছন্ন কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সংস্পর্শ এবং বলিষ্ঠ ও সুস্থ মানসিকতা ও ব্যক্তিত্বের সাহচর্য অনেক ক্ষেত্রে শৈশবের অসঙ্গতি দূর করে সুষ্ঠু ও সুসম মানসিকতা গঠনে সাহায্য করে। অপরদিকে এর বিপরীত পরিবেশ মানসিক অপসঙ্গতিকে তীব্রতর করতে পারে। সুস্থ মানসিক স্বাস্থ্য গঠনে স্কুলের পরিবেশ ও সঙ্গীদের ভূমিকাও তাই গুরুত্বপূর্ণ।

এছাড়া বর্তমানে দৈনন্দিন জীবনে নানা তুচ্ছ কারণে ছোটদের মনে যে উদ্বেগ সৃষ্টি হয় তা যথাসম্ভব দূর করা প্রয়োজন। কর্মরতা মায়ের সন্তানরা মায়ের সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হয়ে অসম্ভব মানসিক উদ্বেগ ভোগ করে এবং তাদের মনে অসহায়তা-বোধ জন্মায়। মা-বাবার একমাত্র সন্তান হলে সেই শিশুরা সমবয়স্ক সঙ্গীর অভাবে অনেক সময়েই নিঃসঙ্গ, অসামাজিক ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গড়ে ওঠে। বাল্যে আকাঙ্খিত স্কুলে ভর্তি করার বিষয়ে মা-বাবার উদ্বেগ শিশুর মনেও সংক্রামিত হয়। এছাড়া ক্লাসে অসাফল্যের গ্লানিও ছোটদের মনকে স্পর্শ করে গভীর

ভাবে। দৈনন্দিন জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত থেকেও আজকাল ছোটরা মুক্ত নয়। অনিশ্চিত যানবাহনের ফলে স্কুলে ঠিক সময়ে পৌঁছানোর প্রাত্যহিক দুশ্চিন্তা তাকে উদ্বেগাকুল করে তোলে এবং এই উদ্বেগ ভবিষ্যৎ জীবনে তার ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করতে পারে। আজকাল মা-বাবা ও একটি-দুটি সন্তান নিয়ে ছোট ছোট পরিবারে ছোটরাও বড়দের নানা সমস্যা ও উদ্বেগের অংশীদার হয়ে পড়ে। তাই হাসিখুশী, নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন শিশুর দেখা পাওয়া এমনই বিরল হয়ে পড়ছে।

সুস্থ মানসিকতার পরিপন্থী পরিবেশে প্রতিপালিত শিশুরাই ভবিষ্যৎ জীবনে শিক্ষাক্ষেত্রে অসামাজিক, অন্তর্মুখী, অসঙ্গত আচরণকারী শিক্ষার্থী, কর্মক্ষেত্রে অসন্তুষ্ট, অভিযোগপ্রবণ কর্মী, বেদরদী কর্তৃপক্ষ, দাম্পত্য জীবনে ব্যর্থ স্বামী-স্ত্রী, ব্যক্তিগত জীবনে সামঞ্জস্যহীন আচরণকারী মাতাপিতা এবং বৃহত্তর সামাজিক জীবনে মানসিক ভারসাম্যহীন নাগরিকে পরিণত হয়।

তাই প্রয়োজনাতিরিক্ত স্নেহ, শাসন, ঔদাসীন্য, অবহেলা ও উচ্চাকাঙ্খার ভারে শিশুমনকে ভারাক্রান্ত না করে প্রয়োজনীয় ভালবাসা দিয়ে প্রক্ষোভের সুসম বিকাশের পথ সুগম করে বাঁচবার আনন্দ বাঁচতে শেখানোই সুষ্ঠু মানসিকতা গঠনের উপায়।

বায়ু-দূষণ নিবারণ

মনোজকুমার মিত্র*

বিশ্বে যত বড় বড় শহর আছে সেগুলিতে বায়ু-দূষণ এক বড় সমস্যা। কলকাতা শহরে এ সমস্যা সম্ভবত সবথেকে বেশি এবং এই বায়ু-দূষণ ঠেকানোর চেষ্টা বা কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া এখানে সবচেয়ে কম হয়েছে। ফলটা হয়েছে এই যে কলকাতার বাতাস ধোঁয়া ধুলো এবং দূষিত গ্যাসে বিষাক্ত হয়ে আছে এবং প্রতিনিয়ত এই দূষণের পরিমাণ এবং বিষাক্ততা বাড়ছে।

অবস্থা দেখে মনে হওয়া বিচিত্র নয় যে, কলকাতা এক বে-ওয়ারিশ শহর। যেহেতু কলকাতার বায়ু-দূষণের প্রতি সঠিক নজর দেওয়া হয় নি, তাই এখনকার বায়ু-দূষণ প্রতিরোধ করতে গেলে এই মুহূর্তেই ব্যবস্থা নেওয়া দরকার—এবং যেহেতু পূর্বে থেকে বায়ু-দূষণ প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় করা হয় নি, তাই এখন সেই অ-ব্যয়িত সকল টাকা একত্রে একবারেই ব্যয় করতে হবে এবং তার পরিমাণ যে খুব বড় হবে সে কথা বলাই বাহুল্য।

পরিবেশ-দূষণ বিভিন্নভাবে হতে পারে—জল দূষিত হয়ে, বায়ু দূষিত হয়ে, অধিক পরিমাণে শব্দ সৃষ্টি হয়ে। এর কোনটাই অবহেলার যোগ্য নয়। শব্দ দূষণের ব্যাপারটা হয়ত এখনও বিশেষ গুরুত্ব পায় নি আমাদের দেশে। আমরা পরিবেশ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নই, এটা তার একটা কারণ হতে পারে। তবে কালীপুজোর সময়ে চারিদিকে পটকার আওয়াজ, মাইকের তারস্বরে চীৎকার, কানে তালা-লাগা বাসের হর্ন, রেলের তীব্র হর্ন বাঁশি ইত্যাদিতে মাঝে মাঝে আমরা ব্যাপারটা অনুভব করতে পারি। পাতাল রেল তৈরি হচ্ছে, পাতাল রেল স্টেশনের শব্দ-দূষণ খুবই বেশি, এটা কলকাতাবাসীরা শীঘ্রই টের পাবেন।

জল-দূষণের সমস্যাও আমরা এতদিনে বেশ বুঝতে পেরেছি। জল-দূষণের জন্য পেটের রোগ এবং স্বাস্থ্যহানি আমাদের কাছে এক সমস্যা—যা অতিক্রম করা বেশ কঠিন ব্যাপার।

পরিবেশ-দূষণের মধ্যে বায়ু-দূষণই সর্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা। কারণ প্রশ্বাসের সঙ্গে আমরা প্রতিমুহূর্তে বাতাস টেনে নিচ্ছি ফুসফুসে। এই বাতাস যদি বিশুদ্ধ না হয়, তবে তার ফল যে ভয়াবহ হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

একটি সংবাদপত্র বিশেষজ্ঞের অভিমত তুলে ধরেছেন, "যেখানকার বাতাসে হাইড্রোজেন সালফাইড-এর পরিমাণ বেশি সেখানকার লোকেদের প্রথমটা মাথা ধরবে, পরে দেখা দিতে পারে পক্ষাঘাত। যেখানে সালফার ডাই-অক্সাইড বেশি সেখানে হবে হাঁপানী ও শ্বাসের রোগ। যে অঞ্চলের বাতাসে ধূলিকণা ভীত সেখানে হৃদরোগীর সংখ্যা বাড়তে পারে। আর বাতাসে ঝুল-জাতীয় বস্তুর আধিক্য ডেকে আনতে পারে মারাত্মক ফুসফুসের ক্যানসার রোগকে" (সত্যযুগ—6-11.81)।

বাতাস দূষিত হয় সারাবছর সারামাস প্রতিটি মুহূর্তে। যদি বায়ু প্রবাহ থাকে, তবে দূষিত বাতাস সরে গিয়ে বিশুদ্ধ বাতাস এসে খানিকটা ক্ষতিপূরণ করতে পারে। এই বায়ু-প্রবাহ সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতি-নির্ভর। শীতকাল বাদে সারাবছর কলকাতা শহরের উপর দিয়ে বাতাস কম-বেশি বয়ে যায়, তাতে দূষিত বাতাস কিছু পরিমাণে বিশুদ্ধ বাতাসের সঙ্গে মিশে বায়ু-দূষণ খানিকটা হয়ত কমে। ঝড়ের বেগে বাতাস প্রবাহিত হলে দীর্ঘ সময় পরে বাতাসের দূষণ বেশ কমে যায়, বিষাক্ত বাতাস সরে যায় এবং পাশের বিশুদ্ধ বাতাস এসে স্থান পূরণ করে।

এছাড়া, বর্ষাকালে বৃষ্টিপাতের ফলে, বৃষ্টির জলে বাতাসের বিষ খানিকটা ধুয়ে যায় এবং বাতাস কিছু পরিমাণে শুদ্ধ হয়ে ওঠে। কিন্তু এসবই সাময়িক এবং প্রকৃতি নির্ভর। দূষিত বাতাস বিশুদ্ধ করার এক নিয়মিত ব্যবস্থা থাকা দরকার। মানুষকে নিজের হাতেই সে ব্যবস্থা করে নিতে হবে।

শীতের দিনে যখন বাতাস স্থির, সন্ধ্যায় কুয়াশার সঙ্গে ধোঁয়া মিলে চারিদিক ধোঁয়াশায় ভরে যায় এবং শুকনো আবহাওয়ার জন্য গাড়ির চাকায় ধুলো ওড়ে তখন অবস্থা খুবই ভয়াবহ। যাঁরা এই ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরা হাড়ে হাড়ে তা উপলব্ধি করেছেন। শীতের সন্ধ্যায় একবার বিবাদী বাগে এলেই এটা স্পষ্ট বোঝা যাবে।

বায়ু-দূষণ রোধ করতে হলে দুটো ব্যবস্থা নিতে হবে। এক, বাতাস যাতে দূষিত হতে না পারে তার ব্যবস্থা করা অর্থাৎ বায়ু-দূষণের উৎস বন্ধ করা বা উৎস-স্থানেই দূষণ প্রতিরোধ করা। দুই, যে-বাতাস দূষিত হয়ে পড়েছে তা বিশুদ্ধ করার ব্যবস্থা নেওয়া।

এই ব্যবস্থা যেহেতু ব্যাপকভাবে নিতে হবে সেজন্য এই ব্যবস্থা হতে হবে জটিলতা মুক্ত সহজ এবং অল্প ব্যয়সাপেক্ষ।

বায়ু-দূষণ প্রতিরোধ করার জন্য আমি একটা সহজ পরীক্ষা করেছি, এবং পরীক্ষালব্ধ ফল আশাপ্রদ। এটা একটা প্রাচীন ব্যবস্থার নবরূপ বলা যায়। এই ব্যবস্থা যে-কোন শহরের বায়ু-দূষণ নিবারণের পক্ষে সহায়ক হবে।

বাতাসে যেসকল পদার্থ বায়ু-দূষণের সৃষ্টি করে সেগুলি হল—(1) কণা, (2) কার্বন মনোক্সাইড, (3) সালফার অক্সাইড, (4) হাইড্রো-কার্বন, (5) নাইট্রোজেন অক্সাইড ইত্যাদি।

এর সবগুলিই কম-বেশি জলে দ্রবীভূত হয়। সেজন্য যদি এইসকল দ্রব্য-মিশ্রিত-বাতাস জলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করা যায় তবে, এই সকল পদার্থের একটা বড় অংশ জলে গুলে গিয়ে বা ভিজে গিয়ে, জলের মধ্যে থেকে যাবে এবং যে-বাতাস জল পরিক্রমণ করে বেরিয়ে আসবে তা কাম্য বিশুদ্ধতায় পৌঁছবে।

আমাদের দেশে ধূমপানের জন্য হুঁকার ব্যবহার প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। এতে ধোঁয়া জল পরিক্রমণ করে আসে

বলে ধোঁয়ার মধ্যস্থ ক্ষতিকর পদার্থের একটা অংশ জলে দ্রবীভূত হয়ে যায় এবং ধূমপানকারী যে ধূম গ্রহণ করেন তা—সিগারেট বিড়ি, চুরুট ইত্যাদির চেয়ে কম ক্ষতিকর।

হুঁকার এই ধোঁয়া যদি একাধিকবার জল-পরিক্রমণ করিয়ে আনা যায় তবে দেখা যাবে যে, শেষ পর্যায়ে কয়েকবার জল পরিক্রমা করার পর, ধোঁয়ার অস্তিত্ব আর নেই। এমন কি তামাকের যে গন্ধ তা অবধি অন্তর্হিত হয়েছে। তামাকের যে ধোঁয়া, কল্কে থেকে হুঁকোর নলের মধ্য দিয়ে জলের ভিতরে প্রবেশ করেছে, তার অস্তিত্ব ক্রমে বিলীন হতে হতে ধূমপান-অভিলাষীর কাছে যা বেরিয়ে আসছে তা অনেকটা বিশুদ্ধ বাতাস।

এই পদ্ধতিটিই নগরের বাতাস পরিশুদ্ধিকরণের কাজে ব্যবহার করা যাবে।

জল ছাড়া অন্য আরো রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে দিয়ে বায়ু প্রবাহিত করলে বাতাস পরিশুদ্ধ করা যায়, এবং বায়ুর শুদ্ধির মান তাতে আরও বাড়বে কিন্তু সেরকম পদ্ধতি ব্যয়বহুল হবে। বায়ু-পরিশুদ্ধি যে স্তরে উঠলে বাতাস ব্যবহারযোগ্য এবং নিরাপদ হবে, তা বায়ুর জল-পরিক্রমণ দ্বারাই অল্পায়াসে এবং অল্প ব্যয়ে লাভ করা যাবে।

একটি গোলাকার বা চৌকো অর্ধস্বচ্ছ পলিথিন পাত্র দেওয়া হল। পাত্রটি লম্বালম্বিভাবে সমান আটটি প্রকোষ্ঠে ভাগ করা। ইচ্ছা করলে প্রকোষ্ঠ-সংখ্যা আরও বেশি করা যেতে পারে। এই প্রকোষ্ঠগুলিকে জল দিয়ে এমনভাবে ভরতে হবে যেন জলের গভীরতা হবে মোট উচ্চতার অর্ধাংশ, বাকি স্থানটুকু ফাঁকা থাকবে। অসমবাহু সম্বলিত ইউ (U) আকৃতির নল দ্বারা পাশাপাশি প্রকোষ্ঠগুলি সংযুক্ত থাকবে। সংযোগকারী নলের ক্ষুদ্র-বাহু থাকবে প্রথম প্রকোষ্ঠের ফাঁকা অংশে এবং নলের দীর্ঘ বাহু থাকবে দ্বিতীয় তথা পরবর্তী প্রকোষ্ঠের জল-তলের বেশ খানিকটা নিচে। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ ঠিক এমনি ভাবে অসমবাহু নলদ্বারা পরবর্তী, তথা তৃতীয় প্রকোষ্ঠের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। অসমবাহু নলের ছোট বাহু পূর্বের মতোই দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠের ফাঁকা অংশে থাকবে এবং বড় বাহু তৃতীয় প্রকোষ্ঠের জল-তলের খানিকটা নিচে বাড়ানো থাকবে। ঠিক এই রকমে তৃতীয়ের সঙ্গে চতুর্থ, চতুর্থের সঙ্গে পঞ্চম……..ইত্যাদি, অসমবাহু নল দ্বারা যুক্ত হবে।

এবার যদি শেষ প্রকোষ্ঠের শেষ নলটির সঙ্গে বৈদ্যুতিক সাকসন ফ্যান-মোটর তথা পাম্প লাগানো হয় তবে, প্রকোষ্ঠগুলির ভেতরকার বাতাস এই সাকসন পাম্প টেনে বাইরে বের করে আনবে ফলে পূর্ববর্তী প্রকোষ্ঠগুলির ভিতরের বাতাস পরবর্তী প্রকোষ্ঠগুলিতে সঞ্চালিত হবে এবং এইভাবে প্রথম প্রকোষ্ঠের বাতাস শেষ প্রকোষ্ঠে চলে আসবে এবং বাইরে বেরিয়ে আসবে। প্রথম প্রকোষ্ঠে বাইরে থেকে দূষিত বাতাস ঢুকবে এবং এক একটি প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করার ফলে জলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হবার কালে বায়ুর দূষিত অংশগুলি জলে রয়ে যাবে এবং শেষ প্রকোষ্ঠ দিয়ে নির্গমনের কালে বিশুদ্ধ বাতাস বের হবে। [পরের পৃষ্ঠায় চিত্র]

প্রথম কক্ষের প্রথম নলটির বাইরেরর দিকে একটি চোঙা লাগানো থাকবে এবং সেটি সূক্ষ্ম নাইলন নেট দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে, যাতে খুব বড় কণা বা পতঙ্গ ইত্যাদি ঢুকতে না পারে। নলটির অপর দিকটি কক্ষের ভিতরকার জলের মধ্যে ডুবানো থাকবে। শেষ কক্ষের শেষ নলটির একটি মুখ কক্ষের ভিতরকার ফাঁকা স্থানে থাকবে, এবং অন্য মুখটিতে বিদ্যুৎচালিত সাকশন ফ্যান (বা পাম্প) লাগানো থাকবে। যদি সাকশন ফ্যান চালানো হয় তবে, জোরে বাতাস শোষণ করার জন্য কক্ষগুলির ভিতরের বাতাস টেনে বার করবে। প্রথম কক্ষে টেনে নেওয়া বাইরের দূষিত বায়ু শেষ কক্ষের নল দিয়ে বের হবার সময় বিশুদ্ধ বাতাস হিসেবে বের হবে। বাতাসের দূষিত অংশ বহুল পরিমাণে জলে গুলে গিয়ে সেখানেই থেকে যাবে।

রাস্তার পাশে যেসকল লাইটপোস্ট আছে, এই বাতাস-বিশুদ্ধিকারক তথা "বাবিকা" একটি ছোট যন্ত্র, যা লাইটপোস্টের উপরে স্থাপন করা যাবে। বাবিকা চালানোর বিদ্যুৎ এই সকল লাইট পোস্ট থেকেই সংগ্রহ করা যাবে। জল সরবরাহের যে পাইপ রাস্তা দিয়ে গেছে, বাবিকার জন্য সেই পাইপ থেকে জল সরবরাহ পাওয়া যাবে। লাইট পোস্টের উপর ফিট করার জন্য উপযুক্ত ফিটিংস ব্যবহার করতে হবে। এই সকল ব্যবস্থার জন্য ব্যয়ও খুব বেশি পড়বে না।

বাবিকা কার্যবিবরণী

প্রথম যে নলটি বাবিকার পলিথিন পাত্রের প্রথম কক্ষে ঢুকবে সেটির একটি মাথা প্রথম কক্ষে অবস্থিত জলের ভিতর অবধি যাবে। দ্বিতীয় প্রান্তটি বাইরে একটি চোঙের সঙ্গে লাগানো থাকবে। শোষিত বাতাস এই চোঙ দিয়ে ভিতরে ঢুকবে। চোঙের মুখ সূক্ষ্ম নাইলন নেট দ্বারা আবৃত থাকবে যাতে পোকা-মাকড়, পতঙ্গ বা ছোট পাখি ইত্যাদি ভিতরে ঢুকে যেতে না পারে।

প্রথম কক্ষ থেকে বাতাস দ্বিতীয় কক্ষে যাবার সংযোগকারী নল থাকবে, এবং ঠিক একই ভাবে দ্বিতীয় থেকে তৃতীয়, তৃতীয় থেকে চতুর্থ ইত্যাদি হয়ে অষ্টম বা শেষ কক্ষে বাতাস এসে পৌঁছবে। প্রতিবারেই এক কক্ষ থেকে আর এক কক্ষে যাবার সময় বাতাস জলের ভিতর দিয়ে পথ অতিক্রম করবে। এর ফলে এক একটি কক্ষ ত্যাগের সময় বাতাস পূর্বাপেক্ষা-বিশুদ্ধ হয়ে উঠবে। অষ্টম বা শেষ কক্ষ থেকে বাতাস বের হয়ে বাইরে আসবে একটি শোষক-পাম্পের (সাকশন পাম্পের) টানে। প্রথম কক্ষে বাতাস চোঙ দিয়ে ঢুকবে এবং শেষ কক্ষ দিয়ে বাতাস বেরিয়ে যাবে। মধ্যবর্তী কোন কক্ষ দিয়ে বাতাস বের হওয়া বা ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য নল এবং পলিথিন পাত্রের সংযোগগুলি ভাল করে আটকে দিতে হবে।

বাবিকা দিন রাতের সকল সময় চলবে। দূষিত বাতাস পলিথিন পাত্রের বিভিন্ন কক্ষের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করার

সময় তার কলুষ পদার্থ জলের মধ্যে ধুয়ে কিছু পরিমাণে থেকে যাবে। ফলে জল ক্রমে ঘোলা বা নোংরা হয়ে উঠবে এবং ধীরে ধীরে বাতাস পরিশুদ্ধ করার মত আর বেশি ক্ষমতা থাকবে না। এজন্য নিয়মিত ভাবে পলিথিন পাত্রে জল প্রবেশের ও নির্গমের ব্যবস্থা রাখতে হবে। একটি পাইপ দিয়ে কক্ষে জল ঢুকবে এবং অন্য একটি পাইপ নিচে লাগিয়ে জল বের করে দিতে হবে। প্রবেশ এবং নির্গম নলের জলের প্রবাহ এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যে, কক্ষের ভিতরের জল সর্বদাই একটা নির্দিষ্ট জল-তল রক্ষা করে চলবে।

1. কণা—বাতাসে ভাসমান ধূলি, পাট বা তুলোর আঁশ বা অন্যান্য ভাসমান পদার্থ বাবিকার সাহায্যে শতকরা একশত ভাগই অপসারিত হয়ে যাবে। বাতাসে ধূলিকণা ইত্যাদির উপস্থিতি তথা শতকরা হার বিশেষ ভাবে গণ্য।

2. কার্বন মনোক্সাইড কলকাতার বাতাসে আছে প্রায় 66 শতাংশ (তথ্য, আকাশবাণী কলকাতা—4.6.81)। কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস শরীরের পক্ষে খুব ক্ষতিকর। এই গ্যাস জলে গলে যায় বা মিশ্রিত হতে পারে। একাধিকবার পলিথিন
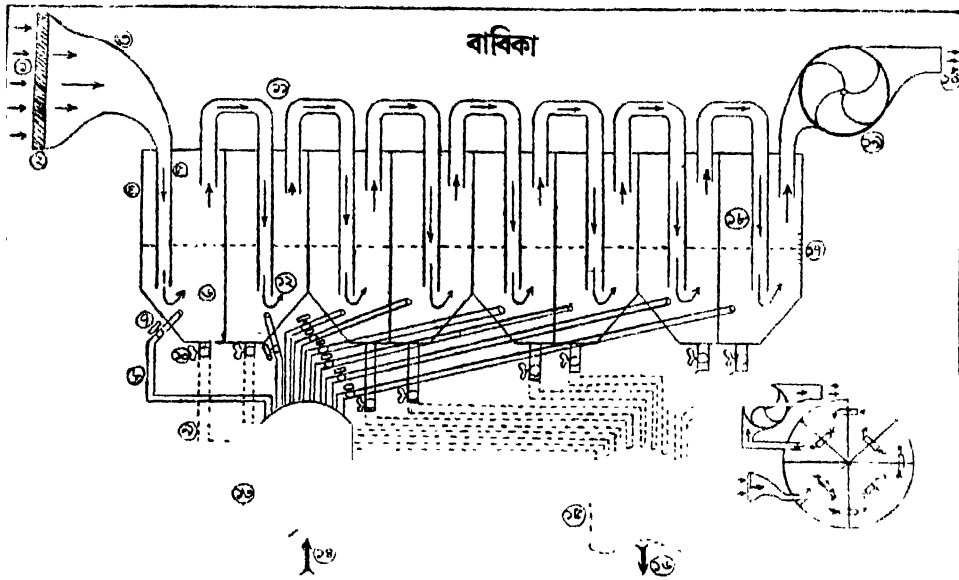
বাবিকা (বাতাস বিশুদ্ধিকারক)—(1) দূষিত বাতাস বাবিকায় ঢুকছে, (2) নাইলন নেট, (3) চোঙ, (4) অর্ধস্বচ্ছ পলিথিন পাত্র, (5) বায়ু প্রবেশের নল, (6) জল, (7) জল প্রবেশ নিয়ন্ত্রক (8) জল প্রবেশের সরু নল, (9) জল নির্গমের সরু নল, (10) জল নির্গম নিয়ন্ত্রক, (11) এক কক্ষ থেকে অন্য কক্ষে বায়ু প্রবেশের নল, (12) জলের ভিতর দিয়ে বায়ু প্রবাহ, (13) জল সরবরাহের প্রধান পাইপ, (14) জলপ্রবাহ, (15) জল নির্গমের প্রধান পাইপ, (16) জল নির্গম, (17) জল-তল, (18) পলিথিন পাত্রের বায়ুপূর্ণ অংশ, (19) বিদ্যুৎ চালিত শোষক (সাকশন) পাম্প, (20) বিশুদ্ধ বাতাস, (21) প্রদর্শিত বাবিকার গঠন (এমনি গোলাকার, আটটি প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট) প্ল্যান।

পলিথিন পাত্রের বিভিন্ন কক্ষ থেকে সরু সরু নল এসে একটি অন্য মোটা নলে যুক্ত হবে, জল সেখান থেকে নিচে নেমে নর্দমায় পড়বে। আর অন্য একটি মোটা নল দিয়ে পলিথিন পাত্রে জল সরবরাহ হবে এবং সরু নলযোগে পলিথিন পাত্রের সব কক্ষে যাবে।

শহরের যেসকল অঞ্চলে বাতাস দূষিত হচ্ছে, সেই সকল অঞ্চলে প্রতিটি লাইটপোস্টে একটি করে বাবিকা চালু রাখতে হবে। এটি একটি অতি সাধারণ যন্ত্র-ব্যবস্থা হলেও এর কার্যকারিতা যথেষ্ট। যেমন :—

কক্ষের জলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হবার কালে এর বেশ একটা বড় অংশ জলে গুলে গিয়ে জলেই থেকে যাবে এবং বাতাস দোষমুক্ত হবে।

এছাড়া সালফার অক্সাইড, হাইড্রো কার্বন, নাইট্রোজেন অক্সাইড ইত্যাদিও জলে কিছু পরিমাণে গুলে যায়, এবং একাধিকবার জলের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হবার কালে বেশ কিছু পরিমাণে জলে গুলে গিয়ে বাতাস পরিশুদ্ধ হয়ে উঠবে।

এই ব্যাপারে প্রাথমিক পরীক্ষায় যথেষ্ট উৎসাহজনক ফল লক্ষ্য করা গেছে। এই ব্যবস্থা যদি শহরে তৎপরতার সঙ্গে

ব্যবহার করা হয় তবে দ্রুত এবং কার্যকর ফললাভ হবে বলে আশা করা যায়।

কলকাতা শহরে ধোঁয়া একটা প্রধান সমস্যা। উনুন, কলকারখানার চিমনি এবং ডিজেল, পেট্রোল গাড়ি ইত্যাদি হল ধোঁয়ার উৎস। বর্তমানে ডিজেল জেনারেটর এর সঙ্গে যোগ হয়েছে। শহরে প্রায় একলক্ষ তিন হাজার গাড়ি আছে পেট্রোল চালিত এবং প্রায় পনেরো হাজার ডিজেল চালিত গাড়ি। গত দুই বছরে প্রায় দশ হাজার গাড়ি বেড়েছে রাস্তায়। এইসব মিলিয়ে বায়ু-দূষণ যে কি পরিমাণে বেড়েছে তা অনুমান করা

বায়ু দূষণ মাপা হচ্ছে স্থান : ধর্মতলা চৌরাস্তার মোড়, কলকাতা 3 ফেব্রুয়ারী 1984, বিকাল 3-15

খুব কঠিন নয়। অথচ বায়ু-দূষণ রোধ করার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা খুব কমই গ্রহণ করা হয়েছে। গত দুই বছরে প্রায় দশ হাজার গাড়ি বাড়লো—দশ হাজার গাছও হয়ত লাগানো হয়েছে, কিন্তু তবু অনেক রাস্তার সব সময়েই যেন মনে হয় ধোঁয়ায় ভরা। জনৈকা বিদেশিনীকে গত বছর কলকাতা "কেমন লাগছে জিজ্ঞাসা করতেই বললেন, এই নিয়ে চারবার কলকাতায় এলাম, কিন্তু এবারে যেন বেশি ভিড় আর ধোঁয়া কলকাতাকে প্রায় গ্রাস করে ফেলেছে।"

কলকাতায় অনেক সমস্যা আছে—রাস্তায় জল জমা, পরিবহণ, পাতালরেল, সরু এবং অবিন্যস্ত পথঘাট, বাসস্থান ইত্যাদি ; কিন্তু সবচেয়ে জরুরী এবং কঠিন সমস্যা হল বায়ু-দূষণ। বর্ষার জমা জল বের করে দেবার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে—কিন্তু বায়ু-দূষণ ? এর জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ? গাছ লাগানো ভালই—কিন্তু শুধু কিছু গাছ লাগালেই অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি বা পরিবর্তন হবে না। জল জমলে লোকে দুর্ভোগ ভোগে কয়েক দিন। বায়ু-দূষণের জন্য প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্ত দুর্ভোগ ভুগতে হচ্ছে—ব্যাপারটা যে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে জড়িত।

কোন কবি হয়ত লিখবেন, বাতাস তুমি কি কেবলি ধোঁয়া ? বাতাস দূষিত হলে যে-ব্যবস্থা নেওয়া যায় সেসম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা গেল। কিন্তু যে সকল কারণে বায়ু-দূষণ ঘটছে তার উৎসগুলি যদি নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তবে বায়ু-দূষণ কমে যাবে। বায়ু দূষিত হচ্ছে প্রধানত ধুলো এবং ধোঁয়ায়। ধোঁয়ার মধ্যে নানাপ্রকার গ্যাস থাকে যা শরীরের ক্ষতি করে।

ধুলো এবং ধোঁয়া নিবারণ করার জন্য পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে যন্ত্র তৈরি করে ব্যবহার করতে হবে।

ধুলোর উৎস হল—কয়লা পোড়া ছাই, রাস্তার পাশে তুলে রাখা নর্দমার কাদা-শুকানো ধুলো, রাস্তা এবং ফুটপাথ খোঁড়ার জন্য ইট মাটির গুঁড়ো ইত্যাদির ধুলো এবং তুলো পাট ইত্যাদির অংশ। এগুলি গাড়ি চলাচলের সময় চাকায় লেগে বাতাসে উড়তে থাকে। খুব হালকা বলে একবার ধূলিকণা বাতাসে উড়লে সহসা মাটিতে নামে না।

রাস্তার ধূলি দূর করার জন্য পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে পরিবহণযোগ্য একটি "পথ ধূলি-শোষক" যন্ত্র তৈরি করতে হবে। তবে পথে যাতে কয়লার ছাই এবং নর্দমার কাদা শুকিয়ে পড়ে না থাকে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে সবার আগে।

এই পথধূলি শোষক যন্ত্রে একটি পলিথিনের জলপাত্র থাকবে। একটি ফ্রেমের ভিতর লরির উপরে এটি রাখা হবে। জল পাত্রের অর্ধাংশ জলে ভরা থাকবে। একটি মোটা নলের একমুখ পাত্রের জলে ডোবানো থাকবে অন্যমুখ নরম ফ্লেক্সিবল্ পাইপের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। নরম পাইপের অন্য মুখ রাস্তা থেকে ধূলি শোষণ করে নেবে, এজন্য এর প্রান্তে একটা ছোট খাঁচা থাকবে রাস্তা থেকে পাইপের মুখের সামান্য দূরত্ব বজায় রাখার জন্য এবং পাইপের মুখ যাতে আটকে না যায় সেজন্য নাইলনের সূক্ষ্মজাল দিয়ে পাইপের মুখটা ঢাকা থাকবে। রাস্তায় পড়ে থাকা কাগজের টুকরো, পাতা ইত্যাদি তা না হলে নলের মুখ আটকে দিতে পারে।

পলিথিন জলপাত্রের সঙ্গে আর একটি পাইপ লাগানো থাকবে যার একটা মুখ থাকবে পাত্রের ভিতরে ফাঁকা অংশে। পাইপটির অন্য মুখ লাগানো থাকবে একটি জোরালো ডিজেল চালিত সাকশন পাম্পের সঙ্গে। এই সাকশন পাম্প চালালে পাত্র মধ্যস্থ বাতাস টেনে বার করে দেবে এবং ফলে পলিথিন পাত্রে লাগানো অপর দিকের নরম পাইপ দিয়ে ধূলি সহ বাতাস জলপাত্রে প্রবেশ করবে। পাইপের যে মুখ দিয়ে বাতাস জলপাত্রের ভিতরে ঢুকছে সেই মুখের কাছে পথের উপর যে ধূলি জমা আছে তা ব্রাশ দিয়ে নাড়িয়ে উড়িয়ে দিলে যন্ত্র তা জল পাত্রের মধ্যে শুষে নেবে এবং পাত্রে ঢুকে তা জলে ভিজে সেখানে থেকে যাবে।

জল পাত্রের তলা এমন ঢালুভাবে তৈরি হবে যে ভিতরের কাদা ইত্যাদি এসে নির্গমনলের মুখে জমবে এবং নির্গমনল খুলে মাঝে মাঝে প্রয়োজন মত ভিতরের ময়লা বের করে দিতে হবে। রাস্তার ধুলো জলে ভিজে এই কাদা, ময়লা তৈরি হবে।

যে-সকল লরি জল সরবরাহ করে সেগুলি যেমনভাবে জল সংগ্রহ করে, এই পথ ধূলি-শোষক তেমনি ভাবেই নরম নলের সাহায্যে পলিথিন জলপাত্রে প্রয়োজনীয় জল সংগ্রহ করবে।

ধোঁয়ার প্রধান উৎস—(ক) কয়লা পোড়ানো ধোঁয়া :— কলকাতায় বর্তমানে প্রায় 91 লক্ষ লোকের বাস অর্থাৎ গড়ে উৎপাদন খুবই কম, কারণ প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আছে। কলকাতায় উল্টো, মনে হয় ধোঁয়া উৎপাদন প্রাত্যহিক—বিশেষ করে প্রভাতী কর্তব্য। কয়লা সবচেয়ে সস্তা জ্বালানি—এই বলে বিজ্ঞাপন প্রচার করে সরকার ধোঁয়া উৎপাদনে উৎসাহই দিচ্ছেন।

গৃহস্থের উনুন ছাড়া কয়লা পুড়িয়ে অনেক কলকারখানায় দিনরাত কাজ হয়—সেই ধোঁয়া দিনরাত বাতাসে মেশে।

(খ) কেরোসিন—কেরোসিন পুড়িয়ে ধোঁয়া বা গ্যাস উৎপাদন করে থাকে কেরোসিন স্টোভ কুপি/লম্ফ বা বাতি, হ্যারিকেন ইত্যাদি। ফিতেযুক্ত যে সব কেরোসিন কুকার রান্নার
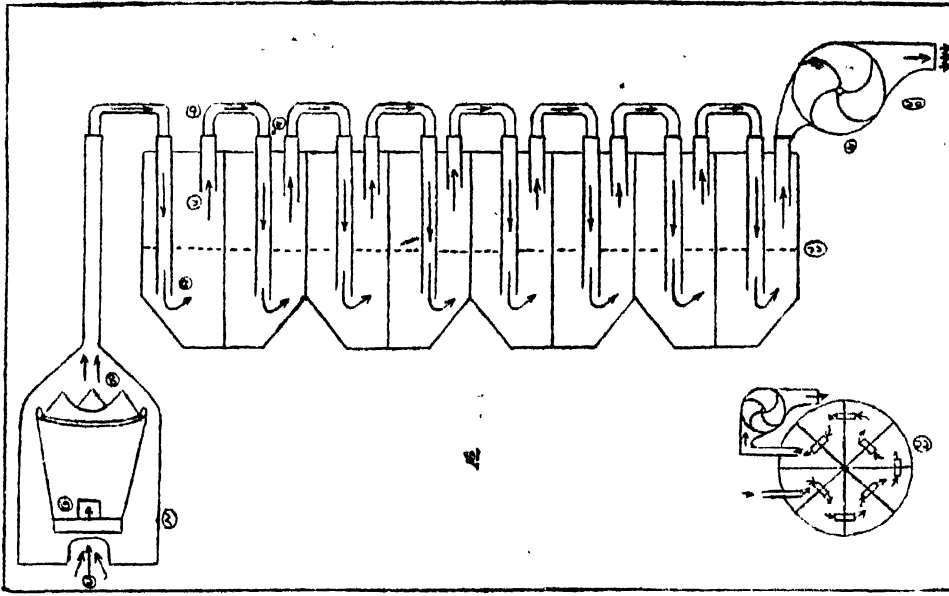
খ—উনুনের ধোঁয়া নিবারণ পদ্ধতি—(1) উনুনের ধাতব ঢাকনার মুখ দিয়ে বাতাস ঢুকছে, (2) উনুনের ধাতব ঢাকনা, (3) উনুনের ভিতরে বাতাস ঢুকছে, (4) উনুন থেকে বাতাস এবং ধোঁয়া বের হচ্ছে, (5) ধোঁয়া জল পরিক্রমণ করছে, (6) ধোঁয়া পলিথিন পাত্রস্থ প্রথম কক্ষের বায়ুপূর্ণ অংশ পার হয়ে দ্বিতীয় কক্ষে যাবার নলে ঢুকছে, (7) পৃথক পলিথিন নল দ্বারা পাশাপাশি কক্ষের সংযোগ—এই নল সহজে খোলা বা লাগানো যাবে, (8) পলিথিন পাত্রের নলের মুখ—এখান দিয়ে পাত্রে প্রয়োজনীয় পরিষ্কার জল ভরা বা নোংরা জল বের করে দেওয়া যাবে, (9) হাতে চালানো বা বিদ্যুৎ চালিত শোষক (সাকশন) পাম্প, (10) ধোঁয়াহীন বিশুদ্ধ বাতাস নির্গম, (11) জল-তল, (12) বায়ুবিকার গঠন (প্ল্যান)।

পনেরো লক্ষ পরিবার এবং কম করে 14 লক্ষ উনুন রোজ ধোঁয়া ছাড়ে, অধিকাংশ আবার দুই বেলা। এই সকল উনুন সকালে সূর্যোদয়ের সময়ে এবং সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের কালে প্রায় সবগুলি একই সঙ্গে ধরানো হয়। বিশেষ করে শীতের দিনে সন্ধ্যা বেলায় যে কঠিন অবস্থা হয় তা শহরবাসী সবাই দেখতেই পান। সমস্ত দিন ধরে ধুলো ময়লা এবং ধোঁয়া নানা উৎস থেকে বাতাসে মিশতে থাকে, সন্ধ্যাবেলা যখন তার সঙ্গে একই সময়ে কয়েক লক্ষ উনুন ধোঁয়া সংযোগ করে তখন তা ধূম্র-নরক তৈরি করে।

কেরোসিন সরবরাহ নিয়মিত এবং প্রচুর হলে কয়লার ব্যবহার কমবে এবং ধোঁয়া কম হবে। বোম্বাই শহরে রান্নার জন্য ধোঁয়ার পর ফুঁ দিয়ে নেভানো হয় তা থেকে অত্যন্ত কটু-গন্ধপূর্ণ ধোঁয়া বের হয়, যা সহ্য করা যায় না। এমন কি পাশের বাড়ির লোকেরা অবধি স্টোভ নেভানো টের পান এবং বিরক্ত হন। তবে বর্তমানে গ্রাভিটি স্টোভ যা বিভিন্ন কোম্পানি বাজারে বের করেছেন বিভিন্ন নাম দিয়ে সেগুলি অনেক সুবিধাজনক অন্তত নেভানোর কালে এই প্রকার উৎকট গন্ধের উৎপাত একেবারেই নেই।

(গ) পেট্রোল, ডিজেল—প্রায় দেড় লক্ষ মোটরগাড়ি, লরি, টেম্পো, মোটর সাইকেল ইত্যাদি ধোঁয়া ছাড়ছে পেট্রোল বা ডিজেলের। এছাড়া ডিজেল ইঞ্জিন, ডিজেল জেনারেটর ইত্যাদিও আছে।

যারা ভুস্ করে অন্যের নাকের উপর ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে মোটর গাড়িতে চড়ে ছোটে তারা যে ঘুরিয়ে নিজের নাকের উপরেই ধোঁয়া ছাড়ছে তা এতদিনে বোধকরি বেশ উপলব্ধি করা গেছে।

(ঘ) রাসায়নিক ধোঁয়া—বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন জায়গায় রাসায়নিক বিক্রিয়াজনিত ধোঁয়া উৎপন্ন হয়। অ্যাসিডে সোনা পোড়ানো বা এই ধরনের অন্যান্য কাজে অ্যাসিড ব্যবহারের জন্য ধোঁয়া, কারখানার রাসায়নিক ধোঁয়া ইত্যাদি বাতাসকে দূষিত করছে।

এসকল ছাড়া বিশেষ করে কলকাতা শহরে বায়ু-দূষণের অন্য উৎস হল—আবর্জনা স্তূপীকৃত হয়ে থেকে যে উৎকট গন্ধ ছাড়ে তা খুব অসহনীয়। আবর্জনার বিষবায়ু দূর করতে হলে নিয়মিত এবং দ্রুত আবর্জনা অপসারণ করতে হবে। শৌচাগারগুলি নিয়মিত 'যত্নে' পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। নগরবাসিগণের প্রয়োজন মেটে 'অন্তত' ততোগুলি শৌচাগারও তৈরি করতে হবে।

উনুনের ধোঁয়া নিবারণ করতে হলে বাবিকা (বাতাস বিশুদ্ধি কারক) জাতীয় ছোট হাতে চালানো সহজ যন্ত্র ব্যবহার করতে
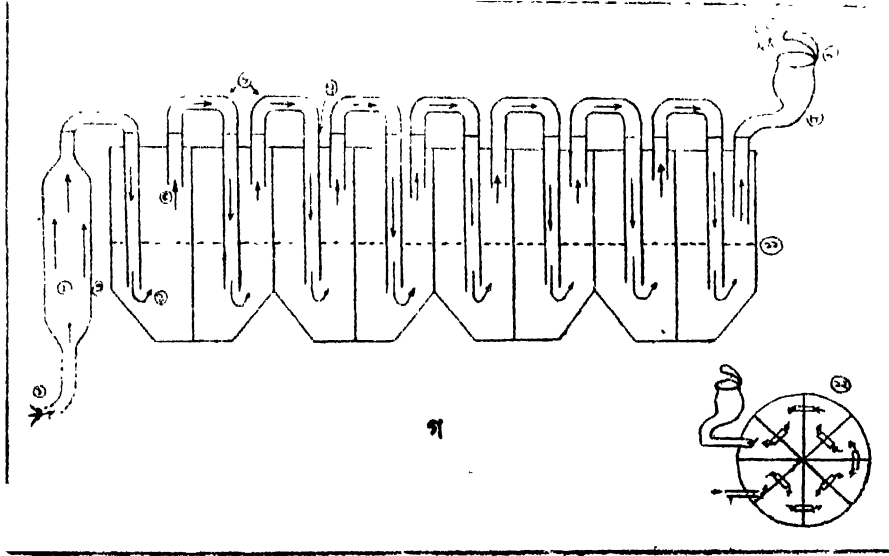
গ—মোটরগাড়ি ইত্যাদির ধোঁয়া নিবারণ—(1) মোটরগাড়ি ইত্যাদি থেকে পেট্রোল বা ডিজেল-পোড়া ধোঁয়া বেগে ধাবিত হচ্ছে নিগম নল (এক্সস্ট পাইপ) দ্বারা সাইলেনসারের দিকে, (2) সাইলেনসারের ভিতর দিয়ে পরিত্যক্ত ধোঁয়া বেগে বাইরের দিকে যাচ্ছে, (3) মোটরগাড়ি ইত্যাদির সাইলেনসার, (4) ধোঁয়া জল পরিক্রমণ করছে, (5) ধোঁয়া পলিথিন পাত্রস্থ প্রথম কক্ষের বায়ুপূর্ণ অংশ পার হয়ে দ্বিতীয় কক্ষে যাবার নলে ঢুকছে, (6) পৃথক পলিথিন নলদ্বারা পাশাপাশি কক্ষের সংযোগ—এই নল সহজে খোলা বা লাগানো যাবে, (7) পলিথিন পাত্রের নলের মুখ—এখান দিয়ে পাত্রে প্রয়োজনীয় পরিষ্কার জল ভরা বা নোংরা জল বের করে দেওয়া যাবে, (8) নিগম নল, (9) নিগম নলের ঢাকনা—বায়ুপ্রবাহ বন্ধ থাকলে ঢাকনা আপনি বন্ধ থাকবে, (10) ধোঁয়াহীন বিশুদ্ধ বাতাস, (11) জলতল, (12) বাবিকার গঠন (প্ল্যান)।

(ঙ) বিভিন্ন দাহ্য পদার্থ—বিভিন্ন সময়ে নানা স্থানে অনেক প্রকার দাহ্য পদার্থ পোড়ানোর ফলে ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়। যেমন—টায়ার পোড়ানো, কাঠ আর আবর্জনা পোড়ানো। এর সঙ্গে যোগ হচ্ছে, ঘুঁটে, মোমবাতি ইত্যাদি পোড়ানো। বদ্ধ ঘরে সিগারেট পোড়ানো ধোঁয়াও বায়ু-দূষণের একটা উৎস। কলকাতায় রোজ কয়েক লক্ষ সিগারেট পোড়ে।

টায়ার, বিদ্যুতের ইনসুলেটেড (আবরণ লাগানো) তার, কাঠ, খড়, ন্যাকড়া বা অন্যান্য বিবিধ জিনিস যত্রতত্র পোড়ানো বন্ধ করতে হবে। উন্মুক্ত এবং অ-নিয়ন্ত্রিত আগুন জ্বালানো চলবে না।

হবে প্রতিটি উনুনের জন্য। এতে ধোঁয়া নিবারিত হবে এবং কোন ধোঁয়া বাতাসে মিশতে পারবে না, ফলে বায়ু-দূষণ রোধ করা যাবে।

কলকারখানার যে চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে সেখানে ধোঁয়ার চিমনিতে "বাবিকা" লাগানো হবে, এতে ধোঁয়া নিবারিত হয়ে বায়ু-দূষণে বন্ধ হবে। রাসায়নিক ধোঁয়া উৎপাদনকারী কলকারখানাগুলিকেও একই ব্যবস্থা নিতে হবে।

অ্যাসিডে সোনা পোড়ানো ধরণের কাজে উনুনের ধোঁয়া-নিবারণকারী যন্ত্র অর্থাৎ বাবিকা ব্যবহার করতে হবে।

পেট্রোল বা ডিজেল চালিত গাড়ি, জেনারেটর বা অন্য কোন যন্ত্র বা ধোঁয়া উৎপাদন করে তাদেরও বাবিকা জাতীয় পরিবহন-যোগ্য যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে, এতে ধোঁয়া নিবারিত হবে এবং বায়ু-দূষণ প্রতিরোধ করা যাবে। এই সকল গাড়ি বা যন্ত্রগুলিতে লাগানো থাকবে যে বাবিকা, সেই সকল বাবিকার ব্যবহৃত জল নিয়মিত পালটাতে হবে। যেমন, গাড়ির ক্ষেত্রে রোজ অথবা যখনই জ্বালানি তেল ভরা হবে তখনই 'বাবিকার' জল পালটানো বাধ্যতামূলক করতে হবে।

দূষিত বায়ু বা ধোঁয়া বাবিকার প্রকোষ্ঠগুলি অতিক্রম করার সময়ে যদি (1) প্রথম চারটি প্রকোষ্ঠে জলের মধ্য দিয়ে, (2) পরবর্তী দুটি প্রকোষ্ঠে অ্যালকোহল (alcohol)-এর মধ্য দিয়ে, এবং (3) শেষ দুটি প্রকোষ্ঠে পুনরায় জলের মধ্য দিয়ে দূষিত বায়ুকে অতিক্রম করানো যায়, তবে বায়ুর বিশুদ্ধির পরিমাণ আরো বহুলাংশে বাড়বে। কারণ, যে সকল পদার্থ বা গ্যাসের মিশ্রণে বাতাস দূষিত হয় তার প্রায় সবগুলিই বেশ ভাল পরিমাণে অ্যালকোহলে দ্রবীভূত হয় বা গলে যায়। ফলে যে বাতাস, যথাক্রমে—জল, অ্যালকোহল এবং জল-প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করার পর বাবিকার বাইরে আসবে তার বিশুদ্ধির পরিমাণ হবে অনেক বেশি। তবে সাধারণভাবে এটা করার দরকার নেই, কারণ এতে খরচ বাড়বে প্রচুর। কারখানা বা এই ধরণের প্রতিষ্ঠানাদির ক্ষেত্রে এটা কাজে লাগানো যেতে পারে। সাধারণ উত্তাপ (temperature), চাপ (pressure), না রেখে যদি চাপ এবং উত্তাপ প্রয়োজন মত নিয়ন্ত্রণ করা যায় তবে বিশুদ্ধির মান আরো বহুলাংশে উন্নীত হবে।

বাবিকার ভিতর দিয়ে বায়ু চালিত হবার জন্য জলের সংস্পর্শের ফলে বাতাস শীতল হয়ে আবহাওয়া কিছুটা শীতল করবে। শহরময় প্রচুর গাছ লাগিয়ে শহরের বাতাসে অক্সিজেনের অভাব যথাসম্ভব পূরণ করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

এই সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বায়ু-দূষণ প্রতিরোধ করা যাবে এবং শহর সহজ বাসযোগ্য হবে। এই ব্যবস্থায় ব্যয় কম, ঝামেলা কম, জল বিনামূল্যে লভ্য এবং যেহেতু বায়ু-দূষণ ব্যাপারটি প্রতিটি মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী ইত্যাদির ক্ষেত্রে একান্তভাবে নিবিড় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সেজন্য এটুকু উদ্যোগ শহরস্থ প্রত্যেককেই নিতে হবে।

হয় শহর ছাড়তে হবে, নয় বায়ু-দূষণ প্রতিরোধ করতেই হবে। আমেরিকায় বায়ু-দূষণ, জল-দূষণ এবং শব্দ-দূষণ আইন করে যথাসম্ভব কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু তবুও যারা ধনী তারা শহরের বাইরে গ্রামে বাস করে, এই সকল দূষণ বিশেষ করে বায়ু-দূষণের হাত এড়াবার জন্য।

আবেদন

- নিজের পরিবেশকে দূষণ থেকে মুক্ত রাখুন।
- সকল প্রকার বন্যপ্রাণী ধ্বংস রোধ করুন।
- খরা, ভূমিক্ষয় ও পরিবেশ দূষণ রোধে বৃক্ষ রোপণ করুন।
- খাদ্য ও ঔষধে ভেজাল দেওয়ার বিরুদ্ধে দুর্বার জনমত গঠন করুন।
- সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা গড়ে তুলুন।

—কর্মসচিব

কেশোরাম রেয়ন কারখানা ও স্থানীয় মানুষজন

রবীন চক্রবর্তী*

"মরে গেলাম—বাঁচান আমাদের"

—দূষণ আক্রান্ত মানুষের কাতর আবেদন

কলকাতা থেকে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার উত্তরে হুগলী নদীর পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত বিড়লাদের বিরাট রেয়ন কারখানা। নাম কেশোরাম ইণ্ডাস্ট্রিজ অ্যাণ্ড কটন মিলস লিমিটেড। দৈনিক 7 টন রেয়ন উৎপাদন হয় এই কারখানায়। কারখানার নামের মধ্যে রেয়ন শব্দের উল্লেখ নেই। ইচ্ছে করেই রাখা হয় নি। অকারণে নয়। যারা এক আধটু খবর রাখেন জানেন সারা বিশ্বেই রেয়ন কারখানাগুলি বিশেষভাবে কুখ্যাত দূষণ সৃষ্টিকারী বলে। শুধু কারখানা চত্বরেই নয়। দূষণ ছড়ায় আশপাশের জনবসতিতেও।

নাম যাই হোক স্থানীয় লোকজন একে 'কেশোরাম রেয়ন' বলেই ডাকেন। হুগলী জেলার মগরা থানার নয়াসরাই গ্রামে অবস্থিত এই কারখানা। গায়ে লাগোয়া রেল স্টেশন কুন্তিঘাট। ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া লাইনে ত্রিবেনী স্টেশনের পরেই। কারখানার ধারে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাম রঘুনাথপুর। আশেপাশে আরও গ্রাম আছে। শোরপুর, রামনর, গোপালপুর, মধুসূদনপুর, মালির-বেড়, নারিচা ইত্যাদি।

কুন্তিঘাট স্টেশনে দাঁড়ালে ডানধারে নজরে পড়ে বড় বড় লোহার স্ট্রাকচার সরু মোটা অজস্র পাইপের বেড় দিয়ে মাথা তুলে রয়েছে। সব ছাড়িয়ে ওঠা-চিমনীর মাথা থেকে নির্গত হচ্ছে সাদা ও ঘোলাটে ধোঁয়া। হুস্‌হাস্‌ শব্দ ভেসে আসে কারখানা থেকে। এখান ওখান থেকে বেরিয়ে আসছে পেঁজা তুলোর মত ধোঁয়া। দেখতে আর পাঁচটা কারখানার মতই। ব্যতিক্রম যা তা হল স্টেশনে পা দিলেই নাকে এসে লাগে অ্যাসিডের তীব্র ঝাঁঝ এবং মৃদু মিষ্টি গন্ধ। এটাই হল গোটা এলাকার সবচেয়ে বড় অভিশাপ। বাতাসের এই ঝাঁঝালো গন্ধে মিশে আছে বেশ কয়েকটি গ্যাস ও অ্যাসিড বাষ্প। যেগুলি মানুষ এবং আশপাশের গাছপালা ও জীবনের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক। এর মধ্যে আছে কার্বনডাই সালফাইড (CS_2), সালফার ডাই-অক্সাইড ও ট্রাই-অক্সাইড (SO_2 ও SO_3), হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S) এবং সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4)।

স্টেশন থেকে নেমে দু-একজনের সঙ্গে কথা বললেই পরিষ্কার হয়ে যায় কি ভয়ানক অবস্থা বিরাজ করছে এখানে। ছেলে বুড়ো সবার মুখে এক কথা—'মরে গেলাম, বাঁচান আমাদের। শরীর স্বাস্থ্য মন টাকা পয়সা সব দিক দিয়ে মরে গেলাম আমরা'। একটু ধাক্কা খেতে হয় শুরুতে। ব্যাপারটা বুঝে উঠতে খানিক সময় লাগে। তারপর পরিষ্কার হয়ে যায় সব। রোগ-ব্যাধিতে জর্জরিত এই এলাকার মানুষ। কয়েকটি বিশেষ ধরনের রোগের শিকার এখানকার মানুষজন। যার উৎস কারখানা নিঃসৃত গ্যাস। আক্রান্ত মানুষের শ্বাসনালী, ফুসফুস, হৃদযন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র, পাকস্থলী, চক্ষু। হরেক রোগ ছড়িয়ে পড়েছে কারখানার কর্মী স্থানীয় বাসিন্দা এবং শিশুদের মধ্যে। গা বমি বমি, অবসাদ, ক্ষুধামান্দ্য, গ্যাসট্রাইটিস, ব্রঙ্কাইটিস, রক্তবমি, যৌন অসাড়তা, পঙ্গুত্ব, দৃষ্টি-হীনতা, মানসিক ভারসাম্যহীনতা ইত্যাদি ঘরে ঘরে মানুষের।

রেয়ন কারখানার কাছেই ত্রিবেণীতে অবস্থিত ব্যাণ্ডেল থার্মাল পাওয়ার স্টেশন। সংক্ষেপে এর নাম বি. পি. টি. এস। এ দুয়ের পাশাপাশি অবস্থান পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলেছে। এ দুয়ের যোগাযোগ রাজযোটক হয়েছে বলা যায়। বি.পি.টি. এস. নির্গত কালো ধোঁয়ার মধ্যে রয়েছে সূক্ষ্ম ছাই ও ধূলোকণা। কেশোরামের SO_2 ও SO_3 গ্যাস বাতাসের জলীয় বাষ্পের সহযোগে অতি সহজে H_2SO_4 অ্যাসিডে পরিণত হয় এই সূক্ষ্ম ধূলোকণার উপস্থিতিতে। বিন্দু বিন্দু অ্যাসিড কণা ছড়িয়ে পড়ে বাড়ী ঘর দুয়ারে এবং মানুষের শ্বাসনালী থেকে ফুসফুসের অ্যালুভিওলি অবধি। এপিথেলিয়াল লেয়ারের কোষগুলি অবিরাম লড়াই করে চলে এই আক্রমণ প্রতিরোধে। অসুস্থ হতে দেরী হয় না আক্রান্ত ব্যক্তির।

এখানেই শেষ নয়। দরিদ্র মানুষজন চরম ক্ষতির শিকার। চারপাশের ক্ষেতের মাটি, পুকুরের জল অ্যাসিডে সম্পৃক্ত। ক্ষেতের ফসল অর্ধেকেরও কম হয়। গাছে ফুল এলে ঝরে পড়ে। বসতবাড়ী সংলগ্ন আম, নারিকেল, কুল, কাঁঠাল গাছ বন্ধ্যা হয়ে গেছে। পুকুরের জল মাছের বাসের অযোগ্য। বাড়ীর টিনের চাল অল্প দিনেই ঝাঁঝরা হয়ে যায়। দেয়াল অ্যাসিডে ক্ষয়ে ঝরে পড়ে। জানালার শিক, পেন্ট একেবারেই টেঁকে না। জামাকাপড় ছেঁড়ে তাড়াতাড়ি। বইখাতার কাগজ অ্যাসিড বাষ্পে অল্পদিনেই ঝুরঝুরে হয়ে যায়। এবেলা মাজা বাসনে অন্যবেলায় কালো কালো ছোপ ধরে যায়। এ সবই বিন্দু বিন্দু ক্ষতি। সমস্ত ক্ষতি যোগ করলে পরিমাণ বিশাল দাঁড়ায় এবং তা কারখানায় উৎপাদিত মূল্যের বহুগুণ।

এ হিসেব করবে কে? কারখানায় কাজ করেন প্রায় হাজার চারেক লোক। চারপাশে বাস প্রায় হাজার পঞ্চাশেক মানুষের। এই বিরাট এলাকার মানুষের কর্মক্ষমতা ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে। ক্ষেতে কাজ করেন যাঁরা তাঁরা অনেক বেশী পরিশ্রম করেন। কিন্তু রেয়ন কারখানার একজন শ্রমিকের মত কাতর হয়ে পড়ে না ক্লান্তিতে। জীবনী-শক্তি ক্ষীয়মান। লোকেদের ক্লান্তি, অবসাদ, উদ্যমহীনতা, খিটখিটে রুক্ষ মেজাজ সবই ওই কারখানার অবদান। শুধু কারখানার কর্মীরাই নন। স্থানীয় মানুষজনও এর শিকার। বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্ত ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। দেহ-মনে পঙ্গুত্ব নিয়ে গড়ে উঠছে একটি বিরাট জনগোষ্ঠী। এ ক্ষতির পরিমাপ হবে

---

*ফলিত পদার্থ বিদ্যাবিভাগ, বিজ্ঞান কলেজ কলিকাতা-9

কোন্ নিরিখে ? কিন্তু এত ক্ষতি স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে, যে বস্তুটি উৎপাদনের জন্য তার প্রকৃত প্রয়োজন কতটুকু ? যদি এ প্রশ্নটি খতিয়ে দেখবার থাকত কেউ আমাদের সমাজে ! না, এ প্রশ্ন আমাদের চলতি সমাজ ও অর্থনীতিতে শুধু অবান্তর নয় রীতি বিরুদ্ধও।

সারা দিনে একজন মানুষের প্রয়োজন দেড় কেজির মত খাদ্য। আড়াই কেজির মত জল আর বাতাস প্রয়োজন কাজের মাত্রা ও ধরন ভেদে পনের থেকে ষাট কেজির মত; অর্থাৎ দেহকে ব্যবহার করতে হয় অনেক বেশী পরিমাণ বাতাস। ফলে বাতাসে খুব অল্প মাত্রার দূষণ থাকলেও একত্রিত হয়ে অনেক বেশী ক্ষতি করতে পারে দেহের।

আসলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কারা তার ওপর নির্ভর করছে কোন্ প্রশ্ন কিভাবে বিবেচিত হবে। এসব ক্ষেত্রে সমাজের সবচেয়ে দুর্বল অংশের মানুষ সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। তাই তাদের সমস্ত অধিকার অবলীলায় পদদলিত করা যায়। নিয়ে নেওয়া যায় তাদের চাষের জমি, পানের জল, নিঃশ্বাসের বাতাস। অন্য দিকে মালিকের মুনাফা অক্ষত রাখতে সজাগ প্রশাসন সরকার। তাই এতবড় কারখানা যেখানে সে এলাকা থাকে পঞ্চায়েতের এলাকা বলে চিহ্নিত। অর্থাৎ গ্রাম। না হলে মালিকের দেয় খাজনাটা যে বেড়ে যায় অনেকটা।

তা বলে কোম্পানী বা সরকারের সদিচ্ছা নেই এমন নয়। কারখানা প্রতিষ্ঠার সময় স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে কোম্পানীর চুক্তি হয়—তারা জমি থেকে উৎখাত ব্যক্তিদের চাকুরী দেবে। স্থানীয় এলাকায় শিক্ষা বিস্তার এবং উন্নয়নে সাহায্য করবে ইত্যাদি। এরা কথা রাখেন নি এমন নয়। কয়েকজনকে চাকুরী দিয়েছেন। কারখানার গা ঘেঁষে একটা প্রাইমারী স্কুল করে দিয়েছেন। তাদের বছরে এগারোশ টাকা অনুদান দেন।

এই স্কুলের হেডমাস্টারের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তাঁর স্কুলের এবং ছেলেদের বিষয় খোঁজখবর নিতে, জানালেন—তিনি এসেছেন বছর পাঁচ-ছয়। প্রথম এসে বেশ অসহায় বোধ করেছিলেন ছেলেদের কথা ভেবে। বললেন—গ্যাস যখন খুব বেশী ছাড়া হয় স্কুলে ছুটির ঘণ্টা বাজিয়ে দেওয়া হয়। ছেলেরা পড়ি-মরি করে ছুট লাগায় নিরাপদ দূরত্বের সন্ধানে। তিনি এসেই কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবাদ জানিয়ে পত্র দিয়েছিলেন। 'এতে ফল হয়েছে।' ব্যঙ্গের হাসি হেসে জানালেন—'স্কুলের জন্য কোম্পানীর বরাদ্দ কিছু বেড়ে গেছে।'

হ্যাঁ, এভাবেই সমস্যার মোকাবিলা করছেন কোম্পানী কর্তৃপক্ষ। বেগতিক দেখলেই কিছু ক্ষতিপূরণ (!) দিয়ে দেন। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ল, কি কারুর চোখ গেল, বা কারুর পুকুরের জল খুব বেশী অ্যাসিডিক হয়ে গেল—প্রতিবাদ জানিয়ে খানিক ঘোরাঘুরি করলে কয়েকশো টাকা মিলে যেতে পারে। তবে অবশ্য কোন অফিসিয়াল ডকুমেন্টের ভিত্তিতে নয়। ফলে স্থানীয় মানুষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ গেছে বেড়ে। এ ওর নামে ঘুষ খাওয়ার অভিযোগ তুলেছেন নির্দ্বিধায়।

কারখানার চারপাশ জঘন্য নোংরা। উন্নয়ন বলতে বুঝেছেন অফিসার কলোনী এলাকার উন্নয়ন। স্থানীয় লোকজন পরে বুঝেছেন কথাটা। আর একটি কাজ করেছেন কর্তৃপক্ষ। মানুষের ধর্মকর্মে মন ফেরানোর জন্য একটা মন্দির গড়ে দিয়েছেন। লোকে এটাকে বিড়লা মন্দির বলে জানে। চেষ্টা হয়েছে যথাসম্ভব সুন্দর করে গড়ার। তবে কলঙ্ক ঢাকতে পারেন নি। মন্দিরের মাথায় ধাতু নির্মিত চূড়াগুলি ঘন কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে অ্যাসিড বাষ্পে।

সরকারী আইন হয়েছে দূষণ ঠেকাতে। 1974 খৃস্টাব্দে ওয়াটার পলিউশান অ্যাক্ট এবং 1981 খৃস্টাব্দে এয়ার পলিউশান অ্যাক্ট। এই আইনের বলে সর্বসাধারণের স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব সরকার নিজের হাতেই রেখেছেন। আপনারা কেউ দূষণে আক্রান্ত হয়ে যদি এই আইনের আশ্রয় নিয়ে দূষণ সৃষ্টিকারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে চান, আপনি সেটা পারবেন না। করবেন সরকার। অবশ্যই তারা যদি মনে করেন।

কেশোরাম রেয়ন স্থাপিত হয়েছে 1959 খৃস্টাব্দে। পঁচিশ বছর হল কেশোরামের মানুষ এই গ্যাস চেম্বারে আবদ্ধ হয়ে রয়েছেন। বহু আবেদন-নিবেদন, বিক্ষোভ, আন্দোলন করেছেন। সেসব ঘটনার বহু নথিপত্র দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দা কয়েকজন। গণ প্রতিরোধ একসময় খুব জোরদার হয়ে উঠেছিল। তাঁরা গঠন করেছেলেন কেশোরাম গ্যাস রেসিস্টান্স কমিটি। কিন্তু কোম্পানীর নানান কূট চালে এই প্রতিরোধ ভেঙে গেছে।

সেই ষাট খৃস্টাব্দ থেকেই কেশোরামের বিষয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়ে আসছে। অবস্থার এতটুকু হেরফের হয় নি। আশ্বাস দিয়ে চলেছেন সকলে। গত বছর কোম্পানী সালফিউরিক অ্যাসিডের চিমনির উচ্চতা খানিক বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাতে অবস্থার তারতম্য হয় নি এতটুকু। গত বছর স্থানীয় লোকজন পশ্চিমবঙ্গের পরিবেশ বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীভবানী মুখার্জীকে এনে দেখিয়ে নিয়ে গেছেন এখানকার অবস্থা। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন দেখবেন ব্যাপারটা।

সরকারী উদ্যোগ সম্পর্কে একটি ঘটনার উল্লেখ করি। এখন থেকে পঁচিশ বছর আগে ভারত সরকার রেয়ন শিল্পে স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য তিন জনের একটি কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটির রিপোর্ট, 'ভিসকোস রিপোর্ট' নামে পরিচিত। এতে বলা হয়েছিল রেয়ন শিল্পে সংশ্লিষ্ট লোকেদের মধ্যে 75 রকম রোগের লক্ষণ দেখা যায়। কারখানার পরিবেশই কোন না কোন ভাবে এজন্য দায়ী। এই কমিটি অনেকগুলি

সুপারিশ রেখেছিলেন অবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য। [দ্রষ্টব্যঃ The Gas Chamber on Chambal—V. T. Padmanaran, 1983 / প্রাপ্তিস্থান A-38, Housing Board Colony, Sankar Nagar, Raipur, M. P.] এর মধ্যে অনেকগুলি কারিগরী পরামর্শ এবং শপ ফ্লোরে পালনীয় স্বাস্থ্যবিধি ছিল। আর বলা হয়েছিল কাজের সময় কমিয়ে 5 ঘন্টা করার সুপারিশ এবং তাও একনাগাড়ে আড়াই ঘন্টার বেশী নয়।

1950 খৃস্টাব্দে ভারতে একটি মাত্র রেয়ন কারখানা ছিল। আজ সেখানে 10টি। মোট প্ল্যান্টের সংখ্যা 12টি। প্রায় চল্লিশ হাজারের মত লোক কাজ করে এই কারখানাগুলিতে। বছর বছর রেয়নের উৎপাদন বাড়ছে দ্রুত হারে। নীচে একটা হিসেব দেওয়া হল।

বছর	উৎপাদন (টন)
1950-51	2,100
1960-61	43.800
1970-71	98,100
1977-78	1,29,200

অনেক পুরাণো কথা এসব। অবস্থা যেমন ছিল তেমনই চলছে। ভারতে রেয়ন শিল্পের অগ্রগতি অব্যাহত। হয়তো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন ক্ষেত্রের তুলনায় একটু বেশী গতিতেই! ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। এদের জন্য বিশেষ কিছু করা যায় নি। অসুবিধে রয়েছে হয়তো। উপরিউক্ত রিপোর্টের একখানা কপিও খুঁজে পাওয়া যায় না কোথাও। হয়তো এটাই সবচেয়ে বড় অসুবিধে বা বাধা।

শেষ যেদিন কেশোরাম রেয়ন এলাকায় গিয়েছিলাম তার আগের দিন রাত্রের ঘটনাটা বলি। সন্ধে নাগাদ রঘুনাথপুর গ্রামে ঢুকে দু-একজনের সঙ্গে আলাপ শুরু করতেই পাশের দু-চারটি চালা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন বৃদ্ধ যুবা মহিলা শিশু মিলে জনা কুড়ি মানুষ। একজন মহিলা তার কোলের বাচ্চাটি এগিয়ে ধরে বললেন—'আমার সাত মাসের এই বাচ্চাটা কাল রাতে মরেই যেত। অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল কাল মাঝরাতে। —ওই কারখানার গ্যাসে।' —বলে আঙুল দেখালেন কারখানার চিমনীগুলির

ভারতে বহু অত্যাবশ্যক শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদন ক্ষমতা অব্যবহৃত পড়ে আছে সকলেই জানেন। জানেন কি রেয়ন শিল্পে তার ব্যবহারের হার? —এক নজরে নীচের হিসেবটায় চোখ বুলিয়ে নিন।

	উৎপাদন ক্ষমতা (টন)	প্রকৃত উৎপাদন (টন)	ক্ষমতা ব্যবহারের শতকরা হার
ভিসকোস ফিলামেন্ট ইয়ার্ন	40,385	41,970	103,92
রেয়ন টায়ার ইয়ার্ন	20,050	16,359	81,59
ভিসকোস স্টেপল ফাইবার	89,000	85,054	85,57

দিকে। বয়স্ক একজন বুঝিয়ে বললেন ব্যাপারটা। 'আগের দিন রাত্রে দেড়টা নাগাদ ছেড়েছিল গ্যাস। ঘরের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে আসছিল আমাদের সবার। কয়েকজন বৃদ্ধ ও শিশু অসুস্থ হয়ে পড়েন। একে একে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসেন অনেকে। দম নিতে জড়ো হন দূরের খোলা মাঠে। রাত তখন প্রায় দুটো। রাগে দুঃখে ক্ষোভে হঠাৎ জেগে ওঠে সবার অনেকদিনের সুপ্ত চেতনা। স্ত্রী-পুরুষ সকলে মিলে রওনা হন ফ্যাক্টরীর উদ্দেশ্যে। ফ্যাক্টরী গেটে এসে বিক্ষোভ জানাতে থাকেন সোচ্চারে। রাত তখন দুটো বেজে গেছে। কর্তৃপক্ষ যথারীতি আশ্বাস দেন প্রতিবিধানের। ফিরে আসেন সকলে। অবস্থা আজও বদলায় নি।

কিন্তু এভাবে চলতে পারেনা অনন্তকাল। কষ্টে থাকা এই মানুষদের কথা ভাববার দায়িত্ব হয়তো আছে বাইরের লোকজনেরও। একদিক দিয়ে সামাজিক চাপ সৃষ্টি করা প্রয়োজন কারখানা কর্তৃপক্ষের উপর। আর এক দিকে এই দূষণ সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি অনুসন্ধানের জন্য এগিয়ে আসা দরকার দেশের বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের। আসুন যোগাযোগ গড়ে তুলি এমন একটি অমানবিক অসুস্থ পরিবেশের মোকাবিলায়।

ম্যানগ্রোভ—এক আশ্চর্য উদ্ভিদ জগৎ

অনিলবরণ ভূঁইঞা*

প্রাকৃতিক পরিবেশে উদ্ভিদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পৃথিবীর বুকে সহস্র প্রাণপ্রাচুর্যের পিছনে যে শক্তি প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে সেই অফুরন্ত শক্তির ধারক হল উদ্ভিদ। যুগ যুগ ধরে এই সম্পদটি সমগ্র প্রাণীকুল তথা মানুষকে জুগিয়ে এসেছে খাদ্য ও নির্মল প্রাণবায়ু, তৈরি করে দিয়েছে উপযুক্ত পরিবেশ। ম্যানগ্রোভ বা মাঙ্গল এই উদ্ভিদকুলেরই এক বিশেষ গোষ্ঠী। স্থলভাগে আমাদের চারদিকে যেমন বিভিন্ন প্রজাতির গাছ রয়েছে তেমনি সমুদ্র ও স্থলভাগের সন্ধিস্থলে রয়েছে এই ম্যানগ্রোভ জাতীয় গাছ। বড় বড় নদীর মোহনা অঞ্চলে এই শ্রেণীর উদ্ভিদেরই প্রাধান্য।

সারা বিশ্বে প্রায় 47,800,00 হেক্টর জায়গা জুড়ে ছোট-বড় বহু বনাঞ্চল সৃষ্টি করেছে এই মাঙ্গল উদ্ভিদ। এর অর্ধেক পরিমাণ রয়েছে এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে, বাকি অংশ ছড়িয়ে আছে আফ্রিকা ও পশ্চিমী দেশগুলোতে। ভারতবর্ষের উপকূল ভাগে প্রধানত, দক্ষিণবঙ্গ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, গোয়া, কর্ণাটক, উড়িষ্যা ও কেরালায় এই বনাঞ্চল কমবেশি গড়ে উঠেছে। বড় বড় নদী যেমন, মহানদী, গোদবরী, কৃষ্ণা, কাবেরীর মোহনা অঞ্চলে বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে এই গাছের অপেক্ষাকৃত গভীর জঙ্গল রয়েছে। তবে এই জাতীয় উদ্ভিদে ভরা আমাদের সুন্দরবনই হচ্ছে বিশ্বের বিস্ময়। পরিসরের দিক থেকে কিংবা সম্পদ প্রাচুর্যে এর সমতুল্য কোন বনাঞ্চল পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। সমগ্র সুন্দরবনের দুই-তৃতীয়াংশ রয়েছে বাংলাদেশে বাকি এক-তৃতীয়াংশ পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় অববাহিকায় সৃষ্টি করেছে এক অনন্য সাধারণ অরণ্যভূমি। পশ্চিমে হুগলী নদী থেকে পূর্বে হরিণডাঙ্গা নদী পর্যন্ত চব্বিশ পরগণার সমগ্র নিম্নাঞ্চল জুড়ে এর বিস্তৃতি। মেদিনীপুরের দক্ষিণাংশে কাঁথি মহকুমার বিস্তীর্ণ নদীপ্রান্তর, মোহনা ও উপকূল অঞ্চল এবং সন্নিহিত উড়িষ্যার উপকূল অঞ্চল জুড়ে এই জাতীয় বনাঞ্চলের একদা প্রাচুর্য ছিল। কিন্তু অবৈজ্ঞানিক পন্থায় এতদঞ্চলের ভূমির অপব্যবহার করায় এই অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত। এতে প্রায় 59 প্রকার প্রজাতির গাছ রয়েছে আমাদের দেশে। তাদের মধ্যে গেঁও, গরাণ, বাণী, হেঁতাল, গর্জন, কেঁওড়া, খলসে, কাঁকড়া, পশুর, গোলপাতা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

সুন্দরবনের সুন্দরী গাছ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বাংলাদেশে। পশ্চিমবঙ্গের এই অরণ্যে বিক্ষিপ্তভাবে কোন কোন অংশে ছড়িয়ে রয়েছে। পরিবেশের তারতম্য অবশ্য এর কারণ। সাধারণত যেখানে জলে লবণের ভাগ বেশি থাকে সেখানে সুন্দরী ভালভাবে বৃদ্ধি পায় না। ভাগীরথী, দামোদর, কংসাবতী, হলদি প্রভৃতি নদীবাহিত মিষ্টি জলের প্রবাহ কমে যাওয়ায় তাদের মোহনায় জলে লবণের ভাগ বেড়ে চলেছে তাই এদের মোহনাগুলে ও দু-ধারের বনাঞ্চলের পরিবর্তন এবং ভূ-প্রকৃতির অবক্ষয় ঘটে চলেছে।

ম্যানগ্রোভের বৈশিষ্ট্য—প্রতিকূল পরিবেশে এদের অভিযোজন বা খাপ খাইয়ে নেওয়ার পদ্ধতি যেমন অভিনব তেমনি বংশ বৃদ্ধির প্রণালীতেও রয়েছে বিশেষত্ব। সব মিলিয়ে এই সকল উদ্ভিদের জীবন ধারা বড়ই বিচিত্র। সমুদ্র উপকূলবর্তী লবণাক্ত মাটিতে অক্সিজেনের পরিমাণ অত্যন্ত কম, হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস প্রচুর এবং আর্দ্রতার ভাগও অনেক বেশি, এই ধরনের পরিবেশে এই বিশেষ জাতের গাছ ছাড়া অন্য গাছ বাঁচতে পারে না। 'শ্বাসমূল' বা 'নিউমেটোফোর' এদের একটি অপরিহার্য অঙ্গ যার সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন গ্রহণ করে। আবার কোন কোন গাছে শ্বাসমূলের বিকল্প হিসেবে 'লেন্টিসেল' নামক এক বিশেষ অঙ্গ কাণ্ডের গোড়ার দিকে দেখা যায়। সবচাইতে আশ্চর্যের বিষয়, এই সকল উদ্ভিদ নোনা জলে তাদের সমস্ত জৈবিক প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে কোন কোন গাছ বিশেষ এক অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নোনা জল থেকে মিষ্টি জল পৃথক করে নিতে পারে। জাইলেম কলার মধ্যে চাপের এক বিরাট তারতম্য ঘটিয়ে এই কাজ পরিচালনা করে। কিছু কিছু প্রজাতির গাছে ভিন্ন ধরনের পদ্ধতিও দেখা যায়। পাতায় অবস্থিত লবণগ্রন্থির মাধ্যমে কিছু মাত্রায় লবণ নিঃসৃত করে জৈবিক প্রক্রিয়ায় সমতা আনে। আবার কোথাও মূলের সাহায্যে শোষিত অতিরিক্ত লবণকে কম ঘনত্বে পরিণত করে জমিয়ে রাখতে বিশেষ ধরণের পাতা রয়েছে। সেই সকল পাতাগুলোতে বেশি পরিমাণ জল ধারণ করার ক্ষমতা থাকে এবং অপেক্ষাকৃত স্থূল হয়। তারপর পাতাগুলো বয়সের ভারে একসময় ঝরে পড়ে এবং সেই সঙ্গে অতিরিক্ত লবণও গাছ থেকে বেরিয়ে যায়। বাষ্পমোচনও এদের খুব পরিমিত, স্থলভাগের গাছের তুলনায় প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। জলের নোনা ভাগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রক্রিয়াও তুলনামূলক ভাবে হ্রাস পায়। এই ভাবে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে এইসকল উদ্ভিদ নোনা জলের পরিবেশে নিজেদের সুন্দর ভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছে।

বংশবৃদ্ধির ধরন-ধারণও এদের আলাদা। সাধারণত জরায়ুজ অঙ্কুরোদগমের মাধ্যমে নতুন গাছের সৃষ্টি হয়। গাছেই ফলের মধ্যে বীজের অঙ্কুরের বিকাশ ঘটে তারপর মাটিতে পড়ে বৃদ্ধি পায়। জলে পড়লে ঢেউ বা স্রোতের টানে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভেসে যায়, কোন একসময় মাটির সংস্পর্শে এলে তা ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে। এর ফলে এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে এই প্রজাতির বিস্তার লাভ ঘটে।

* সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, 35, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিকাতা-700 019

এই মাঙ্গল উদ্ভিদসমৃদ্ধ অরণ্যভূমি এমন এক ঘরোয়া পরিবেশ সৃষ্টি করে যেখানে অতি ক্ষুদ্র ব্যাকটিরিয়া থেকে বৃহৎ স্তন্যপায়ী পর্যন্ত বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত প্রাণীর এক সুন্দর সহাবস্থান দেখা যায়। পরস্পরের মধ্যে কিছু দেওয়া-নেওয়ার মাধ্যমে এক সুসংহত সম্পর্ক বজায় রেখে জলচর, খেচর, উভচর, বৃক্ষবাসী, কর্দমবাসী বহুবিধ প্রাণী একত্রে জীবনধারণ করে। মানুষের বহুমুখী প্রয়োজনে এই অপরূপ সমন্বয় ও সম্পদের অবদান তো অতুলনীয়। প্রচুর পরিমাণে জ্বালানী আহৃত হয় এইসকল বন থেকে। বাড়ি-ঘর, নৌকা প্রভৃতি তৈরির কাজে, নদীর বাঁধ মজবুত করতে কাঠের ভূমিকা তো অনস্বীকার্য। এছাড়া রয়েছে বনজ মধু, বন্য প্রাণী, পাখি ও পাখির ডিম এবং জলাভূমিতে অপূর্ব মৎস্য সম্ভার, কাগজ তৈরির কারখানার এই সকল গাছের ছালও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিভিন্ন দেশে কিছু কিছু উদ্ভিদের ফল ও বীজ খাদ্য হিসাবে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে। এদের অনেক বীজ থেকে তেল সংগ্রহ করে রান্নার কাজেও ব্যবহৃত হচ্ছে।

ভৌগোলিক কারণে এই বনসম্পদের প্রয়োজনীয়তাও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বীপ বা উপকূল ভাগকে ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে এবং বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এই সকল উদ্ভিদের মূলের শাখা-প্রশাখা খুব ঘন ভাবে বৃদ্ধি পায় এবং মাটির ভিতরে চাদরের মত এক আস্তরণ সৃষ্টি করে, ফলে অধিক পরিমাণ মাটি বেঁধে রাখার ক্ষমতা অন্যান্য গাছের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশী। তাই ঢেউ বা স্রোতের প্রবল টানে ভূমিক্ষয় হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। অন্য দিকে জোয়ারে জলমগ্ন অঞ্চলে সমুদ্রের খাড়ি, খাল, নোনাচাতরের কর্দমাক্ত জলাভূমিতে এই গাছগুলির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঠেসমূলগুলো জালকাকারে বিস্তৃত হয়ে (প্রচ্ছদের ছবি) জলস্রোতকে কিছুটা বাধা দেয় এবং নীচে পলি জমার সহায়তা করে নতুন ভূভাগ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। সুতরাং উপকূলের ভূমি সংরক্ষণে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এই ম্যানগ্রোভের। কিন্তু সেই বৈশিষ্ট্যকে কাজে না লাগিয়ে সমুদ্র উপকূলে অন্য গাছ লাগানর চেষ্টাই সরকারি ভাবে হয়ে চলেছে। তাতে সুবর্ণরেখার মোহনা থেকে আরম্ভ করে সুন্দরবন পর্যন্ত উপকূল ভাগের ভূমি অবক্ষয় ক্রমশই বেড়ে চলেছে। আর আঞ্চলিক জলবায়ু নিয়ন্ত্রণেও এই গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অভাব প্রকট হয়ে উঠছে।

নদীর মোহনার বিশাল জলভাগের উর্বরতা বৃদ্ধিতে এই উদ্ভিদের ভূমিকা তো অনবদ্য। গাছের পাতা, ফুল, ফল ইত্যাদি মাটিতে পড়ার পর ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয়ে প্রাথমিক পচনক্রিয়া শুরু হয়। তারপর ব্যাকটিরিয়ার ব্যাপক প্রভাবে জটিল জৈব পদার্থ সমূহ ভেঙ্গে জীবনের বিভিন্ন স্তরে অতি প্রয়োজনীয় সরল উপাদানে রূপান্তরিত হয়, যার কিছু অংশ আবার মূল দিয়ে শোষণ করে নেয় ; বাকি অংশ বনসংলগ্ন জলভাগকে জৈবিক সারে পুষ্ট করে তোলে এবং জলমধ্যস্থ প্রাথমিক খাদ্যবস্তু অণু-উদ্ভিদকণা বা ফাইটোপ্ল্যাংটনের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। খাদ্য শৃঙ্খলের নিয়মানুসারে ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয় অণু-প্রাণীকণা বা জুয়োপ্ল্যাংটন যার উপর নির্ভর করে ঐ জলভাগে মৎস্যকুল গড়ে ওঠে। তাছাড়া পারস্পরিক খাদ্য সম্পর্ক অনুসারে যে বিভিন্ন জাতের পাখী ও অন্যান্য জীবকুল এই ম্যানগ্রোভ জঙ্গলের স্থায়ী বাসিন্দা ছিল তাদের বিষ্ঠাদি বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ এতদঞ্চলের ভূমি ও জলভাগে নানা জৈবিক পরিবর্তনে সাহায্য করে ভূমিকে উর্বরা এবং জলজ প্রাণীদের বংশবিস্তারে সাহায্য করত। এইসব মিলিয়ে বঙ্গোপসাগরের এই বিশেষ অগভীর অঞ্চলই কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মৎস্য সম্পদে ভরা ছিল, যে জাতীয় মাছ আর কোথাও পাওয়া যায় না। উদাহরণ স্বরূপ এই অঞ্চলের ইলিশের সঙ্গে চিল্কা হ্রদ বা বোম্বাই অঞ্চলের ইলিশের কোন তুলনাই হয় না।

উপকূলবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের অধিকাংশই মৎস্য ও কৃষিজীবী। এই বিরাট সম্প্রদায়ের জীবিকা এই সম্পদের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। সব মিলিয়ে এই বনাঞ্চল আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্ত করে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। তাই সবচাইতে পরিতাপের বিষয়, অবহেলা ও অনাদরে এত প্রয়োজনীয় বনসম্পদ ধীরে ধীরে লুপ্ত হতে চলেছে। অপরিকল্পিত জনপদ বিস্তার ও অবিন্যস্ত জীবিকার তাগিদে, কৃষি সম্প্রসারণের চাহিদায় বহু বন ধ্বংস করা হয়েছে। তার উপর রয়েছে নানা ভাবে পরিবেশ দূষণের প্রকোপ। কলকারখানা, তৈল শোধনাগার থেকে নিক্ষিপ্ত অপরিশোধিত বহু রকমের দূষিত তরল পদার্থ, কৃষিকার্যে ব্যবহৃত কীটনাশক দ্রব্য এবং নগর আবর্জনার পর্বতপ্রমাণ স্তূপ, এ সবই নদীর জলের মাধ্যমে এই বনাঞ্চলের সংস্পর্শে আসে।

বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন পেট্রোলিয়ামজাত দূষিত পদার্থ এই সকল উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ভাবে বহু প্রতিকূল পরিবেশের চাপে এই বনসম্পদের পরিসর ধীরে ধীরে সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে আর সেই সঙ্গে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রাও সমস্যাসঙ্কুল হয়ে উঠছে। এই উদ্ভিদ না থাকলে যেমন নদীতে মাছের ফসল ফলবে না, তেমনি শুধু বাঁধ দিয়ে দামাল সমুদ্রের ঢেউয়ের আগ্রাসী ভাব থেকে কৃষিযোগ্য জমিও রক্ষা করা যাবে না। তাই উপকূলবর্তী অঞ্চলে এই গাছপালার ঘনবসতি একান্ত প্রয়োজন যা দিয়ে ভূমিক্ষয় রোধ করা সম্ভব হবে, বাঁচবে চাষ-আবাদের যোগ্য ভূমি আর সেই সঙ্গে জল ও স্থল ভরে উঠবে বহু মূল্যবান সম্পদে এবং তা থেকে মানুষই সবচাইতে বেশী লাভবান হবে। তাই এই জাতীয় বনাঞ্চল বাড়িয়ে তোলা এবং তা যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করা আমাদের সবারই দায়িত্ব। প্রকৃতির যে সুনির্দিষ্ট নিয়ম চালু আছে তাতে মানুষকে এক সঙ্গে ঘর বাঁধতে হয়েছে কীটপতঙ্গ, পশুপক্ষী ও হিংস্র সরীসৃপের সঙ্গে, আর তারই মাঝে দাঁড়িয়ে আছে মহান শক্তিদাতা উদ্ভিদ। সময় থাকতে যদি আমরা সচেতন না হই, আশঙ্কা অমূলক নয় যে, চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখি একসময় প্রাণীজগতকে দাঁড়াতে হবে, তাতে প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষেরও রেহাই নেই।

শক্তির ব্যবহার ও পরিবেশ

সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র*

সভ্যতা বিকাশের আদিমযুগে যখন সমাজ ছিল কৃষি-নির্ভর পরিবেশ ছিল পরিচ্ছন্ন, কলকারখানা এসব ছিল না বলেই মানুষ বিশুদ্ধ বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে পারত। বেশীদিনের কথা নয় এই শতকের তিন চার দশকেও এদেশের গ্রামাঞ্চলে ছিল বিশুদ্ধ পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। তবু তা পুরোপুরি পরিচ্ছন্ন বলা যাবে না। কারণ শুকনো কাঠের জ্বালানী পুড়লে তার ধোঁয়া থেকেও বাতাস অপরিচ্ছন্ন হত, তবে তা ছিল সীমাবদ্ধ। মানুষ যখন থেকেই সামান্যতম শক্তি ব্যবহার আরম্ভ করেছে—তখনই আরম্ভ হয়েছে পরিবেশ দূষণ। কারণ যে কোন শক্তির উৎস ব্যবহারযোগ্য করতে হলে তার রূপান্তর করতে হয়। যেমন সৌরশক্তি সালোক-বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদ জগৎ পুষ্ট করে—সেই উদ্ভিদ জগৎ থেকে প্রাণিরা পুষ্ট হয়! উদ্ভিদ থেকে দহন ক্রিয়ায় উত্তাপ পেতে হলেও এরকম রূপান্তর ঘটে। যে কোন মাধ্যমেই শক্তির রূপান্তর ঘটুক না কেন তাপ-গতিবিদ্যার নিয়মে এই রূপান্তরে এনট্রপি বাড়ে তাই শক্তির যে কোন রূপান্তরের অমোঘ ফল হবে এই বাড়তি এনট্রপিজনিত দূষণ।

তেল থেকে দূষণ—কয়লা, তেল ও গ্যাস ক্রমশ ব্যবহারের ফলে পরিবেশ দূষণের মাত্রা ক্রমশ বেড়েছে। এই দূষণ নানা ভাবে ঘটতে পারে। প্রথমেই তেল নিষ্কাশন ও পরিবহনের কথা ধরা যাক। ড্রিল করার সময় তেলের কূপে হঠাৎ ফাটল দেখা দিলে তা থেকে তেলের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন নতুবা ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ সমুদ্রোপকূলবর্তী সান্টা বারবারা অববাহিকার তৈলকূপের 1969-এর দুর্ঘটনার কথা বলা যায়! এর ফলে উপকূলবর্তী পাখী, সমুদ্রের প্রাণীজগৎ যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, এখনও তার জের চলেছে। লুসিয়ানার তৈলকূপের 1970-এ এরকম একটি দুর্ঘটনায় সমুদ্রের কোটি কোটি টাকার মাছ নষ্ট হয়েছিল। তৈল শোধনাগার থেকেও পরিবেশ দূষণের সম্ভাবনা থাকে। একটি পরিবেশ সংক্রান্ত রিপোর্টে অভিযোগ আছে যে, মিসিসিপি নদীতে রোজ প্রায় আড়াই টন বিষাক্ত সীসা, তৈল শোধনাগার থেকে জঞ্জাল হিসেবে ফেলা হচ্ছে। তাছাড়া তাপ, তেল, ফেনল, হাইড্রোজেন সালফাইড, ভারী ধাতু, অন্য জৈব ও অজৈব পদার্থ এসবও আছে।

পরিবহনের সময় সমুদ্রে তেলের জাহাজ ডুবলে বা ভেঙ্গে পড়লে সামুদ্রিক প্রতিবেশ (ecology) ও পরিবেশ (environment) কী ভাবে ধ্বংসের সম্মুখীন হয় তার নমুনা 1967 খৃস্টাব্দে টোরী কেনিয়ন জাহাজ দুর্ঘটনার কথা ব্রিটিশ রিপোর্টে পাওয়া যায়। এই দুর্ঘটনায় প্রায় 95000 টন তেল সমুদ্রে নষ্ট হয়েছিল। এখন পর্যন্ত এভাবে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় সমুদ্রে 80 লক্ষ টন তেল জমা হয়েছে।

তেলের সংস্পর্শে প্রচুর সামুদ্রিক প্রাণী মারা পড়ে। তাছাড়া তেলের দুর্গন্ধে কিছু সামুদ্রিক প্রাণীর খাবার এমন নষ্ট হয় যে তারা না খেয়ে মারা পড়ে। তেলের প্রভাবে সামুদ্রিক প্রাণীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে এমন কি ক্যান্সারও আক্রমণ করে। সমুদ্রজাত খাবার এভাবে দূষিত হলে মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে সমাজে ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়তে পারে এই অভিমত দিয়েছেন ডঃ ম্যাকক্রুমার।

গ্যাস থেকে দূষণ—গ্যাস উৎপাদন ও পরিবহনে বিশেষ দূষণের সম্ভাবনা নাই। তবে তরল গ্যাস রাখার বিপদ আছে—তাতে দুর্ঘটনায় পরিবেশ দূষণের আশঙ্কা থাকে। ওহিও, ক্লীভল্যাণ্ডে 1944 খৃস্টাব্দে একটি দুর্ঘটনায় 12 লক্ষ গ্যালনের মত তরল গ্যাস যা আয়তনে 100 ঘনফুট বায়ব গ্যাসের সমান সারা শহরে ছড়িয়ে পড়েছিল। শহরের ময়লা নিষ্কাশন নলে তরল গ্যাসের বাষ্পীভবনে ঘটেছিল বিস্ফোরণ—তাতে 30 একর আয়তনের ময়লা নিষ্কাশন ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়েছিল। 10টি কারখানা, 80টি বাড়ী, 200 মোটর গাড়ী ধ্বংস হয়েছিল। 133 জন নিহত ও 300 জন আহত হয়েছিল।

যথেষ্ট প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিলে এরকম দুর্ঘটনা এড়ান যায়—তাই গ্যাস থেকে সাধারণত পরিবেশ দূষণের আশঙ্কা নাই।

কয়লা থেকে দূষণ—কয়লা থেকে দূষণ খনি থেকেই আরম্ভ। খনি শ্রমিকদের ব্ল্যাক লাংস ডিজিজ হওয়ার সম্ভাবনা। এক্স-রশ্মি পরীক্ষায় তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

গভীর খনি থেকে সালফিউরিক অ্যাসিড বেরিয়ে স্থানীয় জল দূষিত করে। অগভীর খনি থেকে ভূপৃষ্ঠে ফাটল, জলের দূষণ প্রভৃতি ঘটতে পারে।

কয়লা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন বা কলকারখানায় ইঞ্জিন চালানো এসব থেকে বায়ুতে দূষণ ঘটে। দূষিত পদার্থের মধ্যে থাকে কার্বন মনোক্সাইড, কয়লার গুঁড়ো, সালফার অক্সাইড, অদগ্ধ হাইড্রোকার্বন, নাইট্রোজেন অক্সাইড।

এই দূষণের উৎসগুলি হলো পরিবহন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, শিল্প সংস্থা, অব্যবহৃত জঞ্জাল ও বিবিধ। আমাদের দেশে এই সব উৎসের কোনটি থেকে কতটা দূষণ ঘটে তার কেন হিসেব নেবার কথা কেউ ভাবেন নি। অন্যান্য দেশে এসব খতিয়ান নিয়মিত রাখা হয়। 1970 খৃস্টাব্দে আমেরিকাতে কয়লা ব্যবহারে এই সব উৎস থেকে বায়ু কতটা দূষিত হয়েছে তার একটি হিসেব পরের পৃষ্ঠায় সারণীতে দেওয়া হলো। একক ধরা হয়েছে লক্ষ টন।

বায়ুদূষণের এই পরিমাপ থেকে তার ফল কি হতে পারে তার আভাসও বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন। সালফার ডাই-অক্সাইড ও কয়লার গুঁড়ো 10 লক্ষে $\frac{1}{4}$ ভাগ থাকলে মানুষের অসুস্থতা বাড়ে এমনকি মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। নাইট্রোজেন

* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-700009

সারণী

	CO	কয়লার গুঁড়ো	SOx	HC	NOx
পরিবহন	1111·0	7·0	10·0	195·0	117·0
বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদি	8	68	265	6	100
শ্রমশিল্প	114	131	60	55	2
অবশিষ্ট জঞ্জাল	72	14	1	20	4
বিবিধ	168	34	3	71	4
1970 মোট	850	270	220	190	70

[Council on Environmental quality 1972]

অক্সাইড থেকেও শ্বাসকষ্ট ঘটতে পারে। আমাদের বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে নাইট্রোজেন অক্সাইডের বিক্রিয়া জটিল পদ্ধতিতে ওজোন ও ধোঁয়াশা সৃষ্টি করে—ফলে মানুষের হাঁপানী রোগ বাড়ে, শ্বাসের কষ্ট হয়। সাধারণ মানুষের উপর হাইড্রোকার্বনের ক্ষতিকর প্রভাব না থাকলেও হাঁপানী ও ব্রঙ্কাইটিস রোগীর অসুখ এর প্রভাবে বেড়ে যায়।

কয়লার দহনে সামান্য সীসা, পারদ, ক্যাডমিয়াম, বেরিলিয়াম, নিকেল, প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। মানুষের দেহে বিষক্রিয়ার এই পরিমাণ একটা মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে অসুখের সৃষ্টি করে।

তাপীয় দূষণ—বিদ্যুৎ উৎপাদনে যে কয়লার ব্যবহার, তাতে শক্তি উৎপাদনের দক্ষতা শতকরা 30 থেকে 40 ভাগ। বাকী ষাট-সত্তর ভাগ তাপের আকারে বিনষ্ট হয়। এই নষ্ট তাপ থেকেই ঘটে তাপীয় দূষণ। অবশ্য এই তাপের শতকরা 45 ভাগ শীতলকারী জলে শোষিত হয় আর বাকী 15 ভাগ ধোঁয়ার সঙ্গে বাতাসে মিশে যায়। আমেরিকার ফেডারেল পাওয়ার কমিশনের মতে প্রত্যেক দশকে বিদ্যুৎ উৎপাদন দ্বিগুণ হবে ফলে তাপীয় দূষণও দ্বিগুণ বাড়বে। জলে তাপীয় দূষণের ফল হবে জলজ প্রাণীর শারীরতত্ত্বে বিশেষত প্রজননতন্ত্রের সঙ্গে জড়িত জীবনচর্যার বিকৃতি ঘটবে। তাপীয় দূষণ জলের শোষিত অক্সিজেন হ্রাস করে—ফলে অনেক প্রাণী বাঁচতে পারবে না। আবার এই অবস্থায় যে সব শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদ স্বচ্ছন্দে বেশি পরিমাণে বাড়তে পারবে—তাদের অবস্থান জলের বিশুদ্ধতাই কেবল নষ্ট করবে। জল প্রবাহের পথ বন্ধ হয়ে মাছের স্বচ্ছন্দ যাতায়াত ব্যাহত হবে। কোন কোন মাছ বাড়তি তাপমাত্রায় ডিম ফোটাতে পারে না সেসব মাছের বংশ লোপ পেয়ে যাবে। তাপীয় দূষণে প্রাকৃতিক জল যত বেশি বাষ্পীভূত হবে ততই বেশি লোনা ও খনিজে সমৃদ্ধতর হবে। এরকম জলে রাস্তাঘাটের ক্ষয়ের পরিমাণ বাড়বে—সমুদ্রের জাহাজেরও ক্ষয় হবে বেশি।

নিউক্লীয় রিয়্যাক্টর থেকেও এই তাপীয় দূষণ ঘটে থাকে। তাই বিশেষজ্ঞদের মতে বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে 2000 খৃষ্টাব্দে আমেরিকা যেসব নিউক্লীয় ও তাপীয় বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করবে তা থেকে সে দেশের জলভাগের পৃষ্ঠদেশ বর্তমান উষ্ণতা থেকে 20°F বেশি উষ্ণতায় উত্তপ্ত হয়ে উঠবে।

পরিবহনজনিত দূষণ—পরিবহনের জন্য বিভিন্ন যানে ডিজেল, পেট্রোলিয়াম ব্যবহৃত হয়, এইসব যান থেকে যে পরিবেশ দূষণের আশঙ্কা—তার মূলে আছে সালফার অক্সাইড, হাইড্রোকার্বন অবশেষ, নাইট্রোজেন অক্সাইড।

এইসব দূষণের প্রতিরোধে যেসব ব্যবস্থা নেওয়া যায় তা হল পরিচ্ছন্ন জ্বালানী অর্থাৎ গ্যাসের ব্যবহার। ভবিষ্যতে হাইড্রোজেন জ্বালানী ব্যবহার সম্ভব হলে এই সমস্যার কিছু সমাধান হবে। মিয়ামী ইঞ্জিনীয়ারিং টীম হাইড্রোজেন জ্বালানীতে একটি টয়োটা স্টেশন ওয়াগন চালিয়ে প্রমাণ করেছেন যে সামান্য NO_x ছাড়া বায়ু দূষণ হওয়ার কোন সম্ভাবনা এই জ্বালানীতে নেই।

দূষণ প্রতিরোধের আর একটি উপায় হল এঞ্জিনে প্লাটিনামের মত অণুঘটক রূপান্তরকারী ব্যবহার করা। প্লাটিনাম দূষণ গ্যাস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও অন্যান্য নির্দোষ গ্যাস তৈরি করতে পারে। অবশ্য প্লাটিনামের মত দামী ধাতু ব্যবহার একটি ব্যয়বহুল সমস্যা।

আবহাওয়া ও দূষণ—শক্তির ব্যবহারে আবহাওয়ার পরিবর্তন একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। শতাধিক বছর ধরে এ নিয়ে গবেষণা চলছে। গৃহপালিত পশুর চারণভূমি ক্রমশ লোপ পেয়ে মরুভূমির সৃষ্টি হয়েছে। সব দেশেরই সমতল ভূমিতে মনুষ্যকৃত পরিবর্তনের ফলে মোট তাপ ও জলের সঞ্চয়ের বেশ পরিবর্তন ঘটেছে।

সূর্যের দৈনিক গতি থেকে পৃথিবীতে যে তাপ আসে তা থেকেই জীবজগতের জীবনচর্যা গড়ে ওঠে। সূর্যের মোট তাপের শতকরা 30 ভাগ মহাদেশের মেঘ ঊর্ধ্ব আবহমণ্ডলের ওজোন স্তর প্রভৃতিতে ছড়িয়ে পড়ে। 20 ভাগ আবহমণ্ডলে ধরা পড়ে। তার কিছু অংশ এই মণ্ডলের ওজোনস্তরে, জলকণায়, ধূলিতে, মেঘের বাষ্পে আটকা পড়ে। বাকী 50 ভাগ পৃথিবীতে পড়লেও স্থলে ও জলে তার কিছু অংশ শোষিত হয় আর কিছু অংশ প্রতিফলিত হয়ে আবহমণ্ডলে ফিরে আসে। পৃথিবী পৃষ্ঠের তাপে সমতা আনে সৌরতাপ। যখনই পৃথিবী সৌর তাপে বেশি উত্তপ্ত হয়, তখন তা ঠাণ্ডা অবস্থা থেকে বর্ধিত হারে তাপ বাইরে বিকিরণ করে। আবার তাপ কমলে এই হারও কমে যায়। আবহাওয়ার এই সমতার ভিত্তি হল সৌরতাপের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে পৃথিবীর বায়ু, জল, সমুদ্রপ্রবাহ, জোয়ার-ভাটা প্রভৃতির ক্রিয়ার সমন্বয়। মূলত পৃথিবী সূর্য থেকে বছরে যতটা তাপ পায় ততটাই বাইরে ছড়িয়ে দেয়।

তাপীয় শক্তির এই ভারসাম্য রয়েছে বলেই আবহাওয়া আমাদের অনুকূল। কিন্তু ভবিষ্যতে মানুষের কৃতকর্মের জন্যই এই ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে। ফলে আঞ্চলিক ভিত্তিতে স্থানীয় আবহাওয়া (microclimate) ও শক্তির বহুল ব্যবহারে

বিশ্ব আবহাওয়া (macroclimate) বিশেষ ভাবে বিপর্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা।

স্থানীয় আবহাওয়া কী ভাবে দূষিত হয়? তার প্রথম ধাপ হল একটি অঞ্চলের গাছ নির্মূল করার ফলে সেখানে মাটির তাপ প্রতিফলনের শক্তি কমে যায়। ফলে বৃষ্টিপাতের তারতম্য ঘটে। নির্বিচারে বনাঞ্চল নষ্ট করার এই প্রতিফল আমরা পেতে আরম্ভ করেছি। ভূমিক্ষয়ের ফলে আমাদের জলের ভাণ্ডারেও টান পড়ছে। উষ্ণতা ক্রমশঃ বাড়ছে, তাই সারা পৃথিবীর আবহাওয়া দূষিত হচ্ছে। 2000 খৃস্টাব্দে এই উষ্ণতা প্রায় 2°F বাড়বে। শুধু তাপীয় দূষণে এই তাপমাত্রা বাড়ছে কিনা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। একদল বিজ্ঞানীর ধারণা কলকারখানা ও যানবাহন থেকে নিঃসৃত ধূলোময়লা আবহমণ্ডলে এত জমছে যে তা সৌরতাপ প্রতিফলিত করে পৃথিবীকে বরং শীতলতর করছে। অন্য একদল বিজ্ঞানী বলেন বায়ুমণ্ডলে অত্যধিক কার্বন ডাইঅক্সাইড সঞ্চিত হওয়ার ফলে সৌরতাপ বেশি পরিমাণে পৃথিবীপৃষ্ঠে সঞ্চিত হয়ে তাপ বাড়িয়ে দিচ্ছে। কারণ বায়ুমণ্ডলের ওজোনস্তরে ছুস্ব তরঙ্গগুলি পৃথিবীতে চলাচল করতে পারে কিন্তু তাপতরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে যায়। কার্বন ডাইঅক্সাইড এই ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটিয়ে তাপ শোষণ করে পৃথিবীকে উষ্ণতর করবে, তাছাড়া প্রাণীজগতের স্বাভাবিক তাপযুক্ত হয়ে ভবিষ্যতের পৃথিবী হবে বেশি উত্তপ্ত।

উষ্ণতা বাড়বে কিনা এ নিয়ে মতান্তর থাকলেও নিশ্চিত বলা যায় যে, শক্তির যতই অধিক ব্যবহার হচ্ছে ততই আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটছে। ফলে ঋতুচক্রে বিপর্যয় দেখা যাচ্ছে। এ সম্পর্কে গবেষণা এখনও অসম্পূর্ণ থাকলেও শক্তির ব্যবহার থেকে বায়ুমণ্ডল তথা আবহাওয়া যে দূষিত হচ্ছে সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই।

জল দূষণ

রতনমোহন খাঁ*

জল, স্থল ও বাতাস—এই তিন নিয়ে পৃথিবীতে চলে জীবনের রথ। জীবের ক্রমবিকাশে মানুষ এসেছে অনেক পরে, মাত্র 15 লক্ষ বছর আগে। কিন্তু এই মানুষই একমাত্র কৃত্রিম উপায়ে পৃথিবীর ইকোসিস্টেমে ধরিয়েছে ভাঙ্গন। জীব ও জড় পরস্পর এক নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ। প্রাকৃতিক নিয়মে পরস্পরের মধ্যে থাকে এক ভারসাম্য। এটাই হলো স্থানীয় পরিবেশ বা স্বাভাবিক পরিবেশ এবং পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হলো ইকোসিস্টেম। ইকোসিস্টেমের ফলেই বজায় থাকে প্রাকৃতিক ভারসাম্য।

সারা বিশ্ব চরাচরে আছে নিয়মের রাজত্ব। সে নিয়ম লঙ্ঘন করার স্পর্ধা মানুষই অর্জন করেছে। মানুষ তার বুদ্ধিবলে অন্যান্য জীবজগৎ থেকে নিজেকে করেছে পৃথক, রচনা করেছে স্বকীয় পরিবেশ, নষ্ট করেছে বহুস্থানের প্রাকৃতিক ভারসাম্য। প্রকৃতির আপন খেয়ালে জড় ও জীবের মধ্যে গড়ে উঠে সুষ্ঠু সহাবস্থান। কৃত্রিম উপায়ে পরিবর্তন ঘটালে ঐ সহাবস্থানে ছেদ পড়ে, বহু জীবের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়, জড়ের মধ্যেও সামগ্রিক সাম্যতা নষ্ট হয়। এরই নাম পরিবেশ দূষণ। সময় সময় প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায় পরিবেশ দূষিত হয়। ঐ দূষণ প্রতিরোধ করার মত ক্ষমতা আমাদের নেই। কিন্তু বর্তমানে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায় যতটা তার অনেক গুণ বেশি হচ্ছে মানুষেরই কৃতকর্মে। তাই প্রশ্ন জাগে—কেন এই নির্বুদ্ধিতার শিকার হচ্ছি আমরা বারে বারে? দূষণের মাত্রা বৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন হচ্ছে দুনিয়ার বুদ্ধিজীবী মানুষ তবুও দূষণের পথ পরিত্যক্ত হচ্ছে না কেন? এর সঙ্গত উত্তর বোধ হয় জনসংখ্যার অবাধ ও অকল্পনীয় বৃদ্ধি এবং মানুষের অপরিসীম লোভে বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ।

সারা পৃথিবীতে বছরে গড়ে 100 জনে দু-জন করে জনসংখ্যা বাড়ছে। বর্তমানে পৃথিবীতে জনসংখ্যা প্রায় 467 কোটি। মাত্র চার বছর পরেই এই সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় 500 কোটিতে। আমাদের ভারতের জনসংখ্যা বর্তমানে প্রায় 74 কোটি। জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার বিবেচনা করে Population Reference Bureau-এর প্রতিবেদনে প্রকাশ 2000 খৃস্টাব্দে ভারতের জনসংখ্যা হবে 100 কোটির মত। এই কলকাতা সহরে জনসংখ্যার চাপ কিভাবে বাড়ছে তা আমাদের নিত্যকার অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পারি। জনসংখ্যার বিস্ফোরণই সৃষ্টি করেছে নিদারুণ খাদ্যসমস্যা, বাসস্থানের সমস্যা, পানীয় জলের সমস্যা, বর্জ্য পদার্থ দূরীকরণের সমস্যা।

খাদ্যের মোকাবিলা করতে অধিক ফসল ফলাও আন্দোলন জোরদার হচ্ছে। বনাঞ্চল উচ্ছেদ করে, গোচারণ ক্ষেত্রে লোপ করে, মজা নদী, নালা, পুষ্করিণী ভরাট করে চাষের জমি বাড়ানো হচ্ছে। তার উপর চালাও প্রচারের মাধ্যমে নানাবিধ রাসায়নিক সারের যথেচ্ছ ব্যবহারে উৎসাহিত করা হচ্ছে। বিশ্বক্ষুধার কাছে সুদূরপ্রসারী অবলুপ্তি বা কুফলের কথা বা চিন্তা গুরুত্ব পাচ্ছে না।

বাসস্থানের সমস্যা ও আমাদের সাধের নগরী কলকাতার ইকোলজিকে সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। সল্টলেক, ভাঙ্গুর, যাদবপুর, সোনারপুর প্রভৃতি এলাকায় বিরাট অঞ্চল ছিল জলা বা ভেড়ী। বছরে প্রায় 8500 টন মাছ উৎপন্ন হতো এইসব ভেড়ী থেকে। জনসংখ্যার চাপে নগর উন্নয়নের নামে এসব জলাভূমির বিরাট অংশ বাস্তুতে বা চাষের ও কারখানার জমিতে পরিণত হয়েছে। জনসংখ্যা গুণোত্তর শ্রেণীতে বাড়ছে আর সেই সঙ্গে সহরের ভিতরের ও বাইরের খোলা জায়গা ইট পাথরে ঢেকে ফেলা হচ্ছে। এরই সঙ্গে পরিবহনের জন্য, যাতায়াতের জন্য যানবাহন বেড়েছে, নিত্য বর্জনীয় পদার্থ বেড়েছে, ফুটপাতের বাসিন্দা বেড়েছে, পরিকল্পনা সম্মত ও পরিকল্পনা বহির্ভূত ছোট বড় কলকারখানার প্রসার ঘটেছে। সর্বমিলে জল, স্থল ও বায়ুদূষণে কলিকাতা মহানগরী মৃত্যুপুরীতে পরিণত হচ্ছে। কম-বেশি এসব সমস্যা ভারতের অন্যান্য সহরেও আছে। আইনী ও বেআইনী জমি দখলে বোম্বাই ও দিল্লীর ইকোলজি চিন্তার কারণ হয়েছে। গত কুড়ি বছরে বৃহত্তর দিল্লীর জন্য আশেপাশের প্রায় 75,000 একর চাষের জমি দখল করা হয়েছে। এসব জমি শুধু দিল্লীর সবজির অভাব মেটাতো তাই নয়, দিল্লীর ইকোলজিকে স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করত। বোম্বাই সহরে কলকারখানা, যানবাহন, গৃহস্থবাড়ী প্রভৃতি থেকে জল ও বাতাসকে দূষিত করার মত নির্গত পদার্থের পরিমাণ প্রায় প্রতিদিনে 1400 টন। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে কলকাতায় শীতকালীন ধোঁয়াটে বাতাসে দূষিত কণার পরিমাণ প্রতি ঘন মিটার প্রায় 0·70 মিলিগ্রাম। সাবধানতা অবলম্বন করায় যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও জাপানের সর্বাধিক শিল্পসমৃদ্ধ সহরগুলিতেও বাতাসে এরূপ দূষিত কণার পরিমাণ যথাক্রমে 0·07 মিলিগ্রাম, 0·09 মিলিগ্রাম ও 0·08 মিলিগ্রাম।

গ্রামেও জনসংখ্যার চাপে বাসস্থানের তাগিদে যথেচ্ছভাবে জমি ও পড়ো-জমি বাস্তুতে পরিণত করা হচ্ছে। গৃহনির্মাণ, সড়ক জ্বালানী প্রভৃতি নানা কাজের জন্য বন-জঙ্গল বৃক্ষাদি নির্মূল করা হচ্ছে। গত ত্রিশ বছরে উন্নত ভারত গঠনের অজুহাতে 4·5 মিলিয়ন হেক্টরের মত বনাঞ্চলকে ধ্বংস করা হয়েছে। বনাঞ্চলের সঙ্গে আছে বৃষ্টি, বন্যা, ভূমিক্ষয়, বন্যপ্রাণী ও ইকোলজির চক্রাকার সম্পর্ক। অদূরদর্শিতার ফলে গত সত্তর দশকেই ত্রিশ মিলিয়ন হেক্টরের মত কৃষিযোগ্য জমি বিধ্বংসী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং প্রতি বছরে প্রায় ছয়হাজার মিলিয়ন টনের মত ভূমি ক্ষয় হয়েছে। এই ভূমি সবুজ

* 10, গ্যালিফ স্ট্রীট, ব্লক-6, ফ্ল্যাট-71, কলিকাতা-700 003

বিপ্লবের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। আবার চাষের জন্য গভীর ও অগভীর নলকূপের সাহায্যে যত্রতত্র ভূগর্ভস্থ জল তোলার ফলে গ্রামাঞ্চলে স্নান ও পানীয় জলের অভাব নিত্য বেড়েই চলেছে এবং আবহাওয়ার উপরও এর প্রভাব প্রতিফলিত হচ্ছে। বিশেষ করে ফাল্গুন থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত বহু গ্রামে এই জলাভাব যে মর্মান্তিক আকার ধারণ করে তা ভুক্তভোগী ছাড়া উপলব্ধি করা অসম্ভব। দারিদ্র ও অজ্ঞতা হেতু নিত্য বর্জ্য পদার্থের বিজ্ঞানসম্মত অপসারণের ব্যবস্থা না করায়, রাসায়নিক সার প্রয়োগে সাবধানতা অবলম্বিত না হওয়ায়, পড়ো-জমি ও বনভূমি নিঃশেষিত হওয়ায় গ্রামের নির্মলতা এখন কবির কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। বিশ্বসংস্থার সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমাদের প্রচার বিভাগ বন-সংরক্ষণ, বন্য পশু সংরক্ষণ, নানা দূষণ রোধের জন্য প্রচার মাধ্যমের অর্থ ব্যয়ের ঘাট্‌তি নেই, কিন্তু প্রচার ও কাজের মধ্যে দেখা যাচ্ছে বিরাট ফারাক।

জনসংখ্যা যত বাড়ছে দুনিয়ায় বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতাও তত বাড়ছে। অন্য দিকে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরণ্যক জীবনের সারল্যকে দূরে সরিয়ে নিত্য নব প্রয়োজনীয় জিনিষের এবং নানা বিলাস দ্রব্যের চাহিদা বাড়ছে। এই সব চাহিদা মিটাতে বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে গড়ে উঠছে সর্বত্র কলকারখানা, ঘটছে শিল্পের প্রসার, বাড়ছে যানবাহন ও অস্বাস্থ্যকর ঘিঞ্জি জনপদ। চাহিদার প্লাবনে এসব পত্তনের কুফলের কথা, দূষণরোধে নানা পন্থা অবলম্বনের কথা অগ্রাধিকার পাচ্ছে না। ফলে বিষাক্ত ধোঁয়া, বিষাক্ত বিকিরণ, নানা অনিষ্টকর বর্জ্যনীয় বস্তু জল, বাতাস ও স্থানীয় পরিবেশ দূষিত করছে, জনস্বাস্থ্য বিপন্ন হচ্ছে, ইকোসিস্টেম ব্যাহত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক সমীক্ষায় প্রকাশ দামোদর নদীর তীরে গত কয়েক দশকে প্রচুর ক্ষুদ্র ও ভারী শিল্প গড়ে উঠেছে। অধিকাংশ শিল্প সংস্থাই কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের Pollution Control Act-গুলি মোটেই মানছে না। দামোদরের জল ঐসব কারখানার পরিত্যক্ত বস্তুতে দূষিত। অথচ দুর্গাপুর—আসানসোল—ধানবাদ অঞ্চলের প্রায় পনেরো লক্ষ লোক দামোদরের জলের উপরই নির্ভর করে। আসানসোল, বরাকর, উখরা অঞ্চলে কাঁচা কয়লা সাধারণ মানুষ জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করায়, বিদ্যুতের অভাব মিটাতে যথেচ্ছ ডিজেল-ইঞ্জিন ব্যবহার করায় বায়ু দূষণ, জলদূষণ, শব্দদূষণ ছাড়াও গঞ্জের দিকে ঐ বিরাট অঞ্চল ধোঁয়াশায় ঢাকা পড়ে। ফলে ঐ অঞ্চলে ব্রঙ্কাইটিশ, ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, চোখ ও গলা জ্বালা প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। দামোদরের জল ব্যবহার করায় স্থানীয় লোকেরা পেটের অসুখ, জনডিস, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

এছাড়া আছে আমাদের মধ্যে আদিম পাশববৃত্তি, অন্যের উপর আধিপত্য বিস্তারের অদম্য ইচ্ছা। জনসংখ্যা বৃদ্ধি এই ইচ্ছাকে গতিশীল করে আরো ঘনীভূত করে। ফলে নানা ছলে ঘটে স্বার্থের সংঘাত, মানবতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্বকে তুচ্ছ করে মাথাচাড়া দেয় সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীস্বার্থের কথা। এ কারণেই আজ উন্নত, অনুন্নত সব রাষ্ট্রই যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের নামে বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগে উন্মত্ত। বহু বিজ্ঞানীর সাধনায় বিজ্ঞানের পারমাণবিক ও মহাকাশযুগে উত্তরণ মানব সভ্যতার ইতিহাসে যেমন স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় তেমনি সমগ্র পৃথিবীকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাওয়ার মত হাতিয়ারগুলি সমগ্র মানবতাকে করেছে সন্ত্রস্ত এবং ভবিষ্যতের চিন্তায় উদ্‌ভ্রান্ত।

সবকিছু বিবেচনা করে একথা কি নিশ্চিত করে বলা যায় না বিস্ফোরিত জনসংখ্যাই সব দূষণের মূল, অন্যগুলি এর আনুষঙ্গিক? তাই সব দূষণ রোধে, মানুষের সঙ্গে অন্য সব প্রজাতি সংরক্ষার্থে এবং সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখতে সমাজসেবী ও বিজ্ঞানীদের কাছে জনদূষণ রোধ এক চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। সুখের বিষয় বিশ্ব সংস্থা জনসংখ্যা সীমিত করার প্রয়োগে জোরদার প্রচার চালাচ্ছে। সম্প্রতি ভারত সরকারও সপ্তম যোজনায় পরিবার পরিকল্পনাকে ঢেলে সাজাতে এবং জনবৃদ্ধির হারকে শতকরা একে নামাতে বদ্ধপরিকর। লক্ষ্যে পৌঁছলেও এই শতকের পর কুড়ি বছরের মধ্যেই ভারতের জনসংখ্যা হবে 190 কোটির মত। তাই আশাবাদী হয়েও ভাবতে হয় এই জনস্ফীতি রোধ কি স্বাভাবিক পথে সম্ভব?

ভাইরাস ব্যাধি দূরীকরণে 'টিসু কালচার'

ত্রিবেন্দ্রামের কেন্দ্রীয় কন্দ ফসল অনুসন্ধান কেন্দ্রে মেরিস্টেম টিপ কালচার পদ্ধতিতে ব্যাধিবিহীন গাছ তৈরি করা হচ্ছে। মেরিস্টেমের ডগা বা 'টিপ' যা 0·5 মিমি. লম্বা, 'মুরাসিজ' এবং 'স্কুগ' মিডিয়ম-এ বিশেষ ভাবে কালচার করে এতে শিকড় গজানো গাছ রাখা হয়। 28 রকম বংশাণু বিশিষ্ট গাছ এবং 5টি চাষোপযুক্ত জাত এবং 2টি লোকপ্রিয় জাত এই পদ্ধতিতে নতুন ব্যাধি বিহীন রূপে তৈরি করা হয়েছে 1982 খৃস্টাব্দে।

[ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ]

পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পরিবেশ অর্থনীতি

বিশ্বনাথ দাস*

পরিবেশ সংরক্ষণ ও তার গুরুত্ব—মানব সমাজের অস্তিত্ব এবং বিকাশের মূলে রয়েছে নানা ধরণের উৎপাদনমুখী উদ্যোগ। সেইসব ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে আমরা পরিবেশের উপর এমন সংঘাত সৃষ্টি করে চলেছি যা প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের উপর বিপজ্জনক প্রভাব ফেলছে। অন্যদিকে আবার আমরা প্রয়োজনের তাগিদে জল, মাটি, খনিজ দ্রব্যাদি, উদ্ভিদ এবং মনুষ্যেতর প্রাণীজগৎ—এইসব প্রাকৃতিক সম্পদের উপর একান্ত ভাবে নির্ভরশীল হওয়ায় এদের উপরও চাপ সৃষ্টি করে চলেছি।

এ যাবৎ মনে করা হতো যে উপরিউক্ত সম্পদগুলি অফুরন্ত, কারণ এদের মধ্যে অনেকগুলি আপনা থেকেই পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসতে সক্ষম। কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পেরেছি যে এই ফিরে আসা ব্যাপারটি একটি স্বভাব-মন্থর এবং জটিল প্রক্রিয়া। কোন একটি প্রাকৃতিক সম্পদকে যদি অত্যধিক পরিমাণে আহরণ করা হতে থাকে তাহলে তার সঞ্চয় ভাণ্ডারে অবশ্যই টান পড়বে এবং এর ফলে এক সময় ঐ সম্পদটির বিলুপ্তি ঘটাও বিচিত্র নয়। বায়ু এবং জল—এই দুই সম্পদের ক্ষেত্রে আবার আমাদেরই স্ব-কৃত কার্যকলাপের ফলে এদের দূষণের মাত্রা এমন পর্যায়ে পৌঁছতে পারে যাতে তা রোধের উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে অচিরেই পরিবেশের গুণগত মানের মারাত্মক অবনমন ঘটবে এবং সেই সঙ্গে মানুষের বেঁচে থাকাই অসম্ভব হয়ে উঠবে। পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব এই কারণেই এবং দেরীতে হলেও আমরা এ ব্যাপারে যে সজাগ হয়েছি সেটা খুবই আশার কথা।

পরিবেশ অর্থনীতি—কি এবং কেন—পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব আরো সঠিকভাবে বুঝতে গেলে সর্বাগ্রে যা প্রয়োজন তা হলো পরিবেশের অবক্ষয়জনিত আর্থিক লোকসান ও পরিবেশ সংরক্ষণ বাবদ ব্যয় এবং যে কোন উৎপাদনমুখী বা উন্নয়নমূলক কাজের লাভের অঙ্ক কতখানি তা খতিয়ে দেখা। এই বিষয়টিকেই আমরা পরিবেশ অর্থনীতি বলতে পারি।

পরিবেশ সম্পর্কিত আর্থিক মূল্যায়ন ব্যাপারটি কিন্তু আদৌ সহজসাধ্য নয়। কারণ, পরিবেশের উপর কোন কোন উন্নয়ন-মূলক উদ্যোগ—যেমন পেট্রোল বা ডিজেল-নির্ভর পরিবহন ব্যবস্থা প্রচলনের কিংবা কোন রাসায়নিক কারখানা চালানোর ক্ষতিকারক প্রভাব সনাক্ত করা এবং তার মাত্রিক পরিমাপ করা কিছুটা সহজ হলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে এরূপ সম্ভব হয় না। তবুও প্রচলিত বিভিন্ন উদ্যোগ এবং বিকল্প উন্নয়ন প্রকল্পগুলির পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে যথাযথ অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। এর ফলে আশা করা যায়, প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ যে মূল্যহীন বস্তু অর্থাৎ হরির লুটের বাতাসা নয় সে বিষয়ে একটা সাধারণ সচেতনতা গড়ে উঠবে এবং আমরা বুঝতে পারবো যে ঐসব সম্পদের অনর্থক অপচয় ও দূষণ এড়িয়ে চলাই সকল উদ্যোগের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। পরিবেশের গুণগত মানের বিপজ্জনক অবনমন ঘটে যাওয়ার পর তাকে দূষণমুক্ত অবস্থায় ফিরিয়ে আনার চেয়ে যে সেটাই বেশি কাম্য এ কথাটা পরিবেশ অর্থনীতিই কেবল আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারে।

পরিবেশ সমীক্ষা এবং অর্থনৈতিক তথ্য—বর্তমানে পরিবেশ অর্থনীতি নিয়ে যে বিতর্ক দেখা দিয়েছে তার কেন্দ্রীয় বিষয়টি হলো এই যে পরিবেশ ক্ষয় এবং দূষণের জন্য যে লোকসান হচ্ছে তার বোঝা যারা বহন করছে তারা সংশ্লিষ্ট উন্নয়নমূলক উদ্যোগের সুফলটুকু ভোগ করতে পারছে কিনা। এই বিতর্কের অপর মুখ্য বিষয় হলো—যারা পরিবেশ ক্ষয়কারী উদ্যোগটির সুফল ভোগ করছে কেবলমাত্র তাদের কাছ থেকেই পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যয় কিভাবে আদায় করা সম্ভব তার উপায় উদ্ভাবন করা।

পরিবেশ ক্ষয় বা দূষণজনিত লোকসান এবং সংরক্ষণ বাবদ ব্যয়ের যেসব হিসাব পাওয়া গেছে তার থেকে দেখা যায় যে এক ব্যারেল পেট্রোলিয়াম অর্থাৎ খনিজ তেল সমুদ্রের জলে পড়ে গেলে তা পরিষ্কার করতে দশ হাজার টাকার মত খরচ হয়ে থাকে। 1974 খৃস্টাব্দে জাপানের সিতো অন্তঃসমুদ্রে মিজুশিমা তৈল শোধন কারখানার একটি তেলবাহী জাহাজে 8 মিটার দীর্ঘ ফাটল দেওয়ায় প্রায় 50,000 ব্যারেল তেল জলে পড়ে গিয়েছিল। এর জন্য সমুদ্রের জল দূষণমুক্ত করতে 50 কোটি টাকার মত খরচ হয়েছিল। কলকারখানায় কোন বড় রকমের দুর্ঘটনা ঘটলে সংশ্লিষ্ট পরিবেশ পরিচ্ছন্ন করতে কি পরিমাণ ব্যয় হতে পারে সেটাও মোটামুটি জানা যায়। ইতালীর সেভেসো রাসায়নিক কারখানায় দুর্ঘটনার ফলে যেসব পদার্থ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল তার ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে পরিবেশকে মুক্ত করতে প্রায় 100 কোটি টাকা খরচ করতে হয়েছিল।

দুর্ঘটনা ছাড়াও পৃথিবীর বুকে আমাদের বিবিধ কার্যকলাপের উপজাত দ্রব্য এবং বর্জ্য পদার্থ হিসাবে যেসব দূষণকারক পদার্থ পরিবেশে প্রবেশ করছে তাদের ক্ষতিকারক প্রভাব নিয়ে উন্নত দেশগুলিতে বেশ কিছু অর্থনৈতিক সমীক্ষা চালানো হয়েছে। একটি প্রতিবেদনে দেখা যায় যে কেবল মাত্র বায়ুদূষণের জন্য জনগণের শারীরিক অসুস্থতা বা মৃত্যুজনিত উৎপাদন হ্রাস, স্বাস্থ্যরক্ষা খাতে বর্ধিত ব্যয়, শস্যহানি এবং শস্যের গুণমানের অবনমনজনিত ক্ষয়ক্ষতির মাধ্যমে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বছরে 200 থেকে 3,500 কোটি টাকার মত খরচ বেড়েছে। চব্বিশ রকমের দূষণকারক নিয়ে একটি ফরাসী সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে যে এদের জন্য মোট জাতীয় উৎপাদনের (GNP)

* কৃষি-রসায়ন ও মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী-741235 নদীয়া

শতকরা 3·4—4·2 ভাগ ব্যয় হতে পারে। এই বিপুল পরিমাণ ব্যয়ের সিকিভাগ হলো বায়ুদূষণের জন্য এবং আর এক সিকিভাগের জন্য দায়ী শব্দদূষণ। কানাডা, ইতালী, গ্রেট ব্রিটেন এবং উত্তর আয়ারল্যাণ্ড থেকেও অনুরূপ তথ্য পাওয়া গেছে। ঐসব দেশেও দূষণজনিত কারণে মোটামুটি 3 থেকে 5 GNP লোকসান হতে দেখা গেছে। একটি সাম্প্রতিক সোভিয়েত সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে সে দেশের বায়ুদূষণের কারণে স্বাস্থ্য খাতে অতিরিক্ত ব্যয় এবং জনগণের কর্মক্ষমতা হ্রাসের মাধ্যমে জন প্রতি বছরে গড়ে 380 টাকা এবং পশুচারণ ভূমি ও শস্যক্ষেত্রের ক্ষতির মাধ্যমে হেক্টর প্রতি 1300—1350 টাকা লোকসান হচ্ছে।

বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ, যেমন রাস্তাঘাট নির্মাণ, বসতি বিস্তার, কৃষি ভূমি সম্প্রসারণ, কলকারখানা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির জন্য ব্যাপকভাবে গাছপালা সংহার, ভূমিক্ষয়, আবাদী জমির [illegible] বা ভারি ধাতু-দূষণের কবলে পড়া এবং প্রান্তিক জমিতে অনুপযুক্ত চাষ-ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে যেসব আর্থিক ক্ষতি হয়ে থাকে সেসবও পরিবেশ অর্থনীতির আওতায় পড়ে। এছাড়া ক্রমেই বেশি পরিমাণ জমি মরুর কবলে পড়ার ফলে যে ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে সেটাও এর মধ্যে ধরা যায়। প্রাকৃতিক সম্পদের অপরিকল্পিত ব্যবহার বা দূষণের জন্য প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ যেসব ক্ষতি হয়ে থাকে আর্থিক মাপকাঠিতে সেগুলি পুরোপুরিভাবে পরিমাপ করা এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয় নি। এর প্রধান কারণ হলো এই যে পরিবেশ অবক্ষয়ের প্রভাব দেশ কাল এবং মানবসমাজের বিভিন্ন স্তরে অসমভাবে অনুভূত হয়ে থাকে। এছাড়া, বৃহৎ উদ্যোগসমূহের ভৌতিক, জৈবিক ও সমাজ-অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া এবং সংশ্লিষ্ট পরিবেশ বিধ্বংসী প্রভাবগুলির বিষয়গত পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করা সম্ভব হলেও সেগুলির আর্থিক মূল্য নির্ধারণ করার ব্যাপারে আবার সমস্যা দেখা দেয়। উদাহরণতঃ, দূষণজনিত কারণে একজন মানুষের স্বাস্থ্যহানি বা মৃত্যু হলে কতখানি আর্থিক ক্ষতি হল এটা হিসাব করার সময় যদি ঐ ব্যক্তি অবশিষ্ট জীবনকালে (গড় !) যত উপার্জন করতে পারতো কেবল এটুকুই ধরা হয় তাহলে ব্যাপারটি যে আদৌ সঙ্গত হল না একথা বলাই বাহুল্য।

বর্তমানে সমৃদ্ধ দেশগুলিতে পরিবেশ পরিকল্পনা খাতে জাতীয় উৎপাদনের অন্ততঃ শতকরা 1 থেকে 2 ভাগ (1—2 GNP) বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে। এর বেশির ভাগই ব্যয় হয় দূষণ প্রতিরোধে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে। উন্নতিকামী দেশে স্বাভাবিক কারণেই এ বাবদ অনেক কম টাকা ধরা হয়। সেই সামান্য টাকার সিংহ ভাগই আবার খরচ হয়ে যায় পানীয় জল সরবরাহ ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা উন্নত করা বা কার্যকরী করার ব্যাপারে। আমাদের দেশে অতি সম্প্রতি পরিবেশ সম্পর্কে বিপুল উৎসাহ ও সচেতনতা দেখা গেলেও জাতীয় স্তরে পরিবেশ পরিকল্পনা খাতে যে টাকা ব্যয় করার কথা ঘোষিত হয়েছে তার পরিমাণ 0·5 GNP অপেক্ষাও কম। অথচ বিশেষজ্ঞদের অভিমত, আমাদের মত দেশে এ বাবদ অন্ততঃ 0·5—1·0 GNP ব্যয় করা একান্ত প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, এর কিছু অংশ অবশ্যই কলকারখানা, পারমাণবিক চুল্লী ইত্যাদিতে সংঘটিত সম্ভাব্য দুর্ঘটনাজনিত দূষণ প্রতিরোধে এবং অপর অংশ প্রধানতঃ প্রাকৃতিক সম্পদ (বন্য প্রাণী, বনাঞ্চল, নদীর নাব্যতা ও জলের মান ইত্যাদি) সংরক্ষণে কাজে লাগানো উচিত। 1978 খৃস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে বন্যার সময় দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের নিকাশী নালার দূষিত জল দামোদরের জলের সঙ্গে মিশে যাওয়ার ফলে প্লাবিত অঞ্চলে বিষক্রিয়ার দরুণ শস্যহানি, গবাদিপশুর মৃত্যু এবং জলাশয়গুলির মাছের বংশ প্রায় নির্মূল হয়ে গিয়েছিল। এটাকেও এক ধরনের দুর্ঘটনা বলা চলে। এরূপ ক্ষেত্রে জরুরী ভিত্তিতে প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বনও পরিবেশ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

পরিবেশ অর্থনীতির গুরুত্ব বুঝতে গেলে এই সহজ কথাটা জানা দরকার যে পরিবেশ পরিকল্পনা খাতে যে অর্থ বিনিয়োগ করা হয় তার সবটা তো বটেই, এমনকি তুলনায় অনেক বেশি অর্থমানের সুফল এর থেকে লাভ হয়ে থাকে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশ সংরক্ষণ সংস্থা হিসাব করে দেখেছে যে 1977 খৃস্টাব্দে সবরকম উৎস স্থল থেকে কার্বন ও বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক ধূলিকণা (যা সাধারণতঃ বাতাসে ছেড়ে দেওয়া হতো) দূর করার ব্যবস্থা বাবদ যত টাকা খরচ হয়েছিল তার প্রায় দেড়গুণ আর্থিক লাভ হয়েছে স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়-সংকোচের মাধ্যমে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে কেবলমাত্র দূষণমুক্ত পানীয় জল সরবরাহ এবং পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের দ্বারা কলেরা, আন্ত্রিক রোগ, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের 50—60 ভাগেরও বেশী কমিয়ে ফেলা যায়। এর ফলে একদিকে যেমন জাতীয় স্তরে চিকিৎসা খাতে ব্যয় (বিদেশী ওষুধ কেনা বাবদ) কমে, অন্যদিকে স্বাস্থ্যের উন্নতির মাধ্যমে জনগণের কর্মক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ GNP-এর মান বাড়তে পারে।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ প্রতিরোধ সম্পর্কে কঠোর জাতীয় নীতি অবলম্বনের ফলে কোন কোন উন্নত দেশে শিল্পক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা—যেমন চক্রীয়ভাবে মাল-মশলার পুনর্বিনিয়োগ এবং স্বল্প বর্জ্য পদার্থ আদৌ উদ্গীরণ করে না এমন সব পদ্ধতির প্রচলন ও উদ্ভাবন হচ্ছে। এর ফলে অনেক সময় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি আর্থিক দিক দিয়েও লাভবান হচ্ছে। এটা হলো পরিবেশ অর্থনীতির পরোক্ষ প্রভাব। জলের চক্রীয় ব্যবস্থায় পুনরায় ব্যবহারের মাধ্যমে সুইডেনের কাগজমণ্ড উৎপাদক কারখানাগুলির দূষণকারিতা এবং উৎপাদন ব্যয় দুই-ই যথেষ্ট কমে গেছে। বায়ু-দূষণ

প্রতিরোধের দিকে জোর দিতে গিয়ে নরওয়ের ফেরোসিলিকন কারখানাগুলি তাদের উৎপাদন ব্যয় শতকরা 8–12 ভাগ কমাতে সমর্থ হয়েছে। ফিনল্যাণ্ড, ফ্রান্স, চীন, কানাডা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশেও এরকম বহু উদাহরণ রয়েছে।

পরিবেশ বিষয়ক আইন প্রণয়ন এবং কোন কোন দ্রব্যের উৎপাদন ও বিপণনের উপর সরকারী বিধি-নিষেধ আরোপের ফলে কয়েকটি শিল্পসংস্থা আবার ঐসব দেশে দুরবস্থার মধ্যে পড়েছে। কারখানার উপযুক্ত বিকল্প স্থান নির্বাচনের জন্য এরা স্বদেশের বাইরেও চেষ্টা চালাতে বাধ্য হচ্ছে। কেবল সহজলভ্য প্রাকৃতিক সম্পদ, কাঁচামাল, শ্রমিক ইত্যাদি অর্থনৈতিক সুবিধার কথা ভেবেই নয়, প্রধানতঃ পরিবেশ দূষণ এড়িয়ে চলার জন্যই জাপানের অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদক শিল্পসংস্থাগুলি বিদেশে কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তাদের অ্যাসবেস্টস এবং পারদঘটিত ও কীটনাশক রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের কারখানাগুলি অনেকটা একই কারণে ব্রাজিল, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশে স্থাপন করেছে। এইসব বিদেশী উদ্যোগ শিল্পে অনুন্নত আশ্রয়দাত্রী দেশগুলির GNP কিছুটা বাড়িয়ে তুললেও সংশ্লিষ্ট কারখানাগুলির পরিবেশ দূষণজনিত ক্ষতির দিকটাও যে অচিরে প্রকট হয়ে উঠবে এ বিষয়ে এখন আর সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। পরিবেশ আইনের পরিপ্রেক্ষিতে পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র, পরিবহন সংস্থা, তৈল শোধনাগার, বিমান-বন্দর প্রভৃতি সরকারী উদ্যোগগুলিও বর্তমানে সংকটের মধ্যে পড়েছে।

পরিবেশ অর্থনৈতিক সমস্যা—আগেই বলা হয়েছে, পরিবেশের তথা প্রাকৃতিক সম্পদ সমূহের গুণমানের উপর বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কার্যক্রমের প্রতিক্রিয়ার অর্থনৈতিক মূল্যায়ন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। যে সবক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রভাবের সার্বিক মূল্যায়ন সম্ভব নয় সেখানে সংশ্লিষ্ট লাভ-লোকসানের আপেক্ষিক মাত্রা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা উচিৎ। এর ফলে জাতীয় পরিকল্পনার রচনা অনেকটা ন্যায়সঙ্গত এবং তার রূপায়ণ বাস্তবায়িত হতে পারে। তবে সব রকমের দূষণকারক পদার্থের সম্ভাব্য উৎস, তাদের রূপান্তর ও পরিণতি এবং ক্ষতিকারক প্রভাব সম্পর্কে আরও বিশদ গবেষণা হওয়া দরকার। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির পক্ষে অবশ্য অনেকটা অর্থনৈতিক কারণেই সমৃদ্ধ দেশগুলির গবেষণালব্ধ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং সুপারিশ অনুযায়ী পরিবেশ কর্মসূচী স্থির করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

পরিবেশ অবক্ষয়ের ক্ষতিকারক প্রভাব প্রকট হওয়ার পরে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই প্রভাব দূর করা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ কিংবা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এর চেয়ে উন্নততর জ্ঞানের ভিত্তিতে দূষণের হাত থেকে পরিবেশকে রক্ষা করার পরিকল্পনা নেওয়া অর্থনৈতিক বিচারে অনেক বেশি কাম্য।

উপসংহার—বিভিন্ন তথ্য থেকে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে পরিবেশের গুণগত উৎকর্ষতা লাভের মাধ্যমে এমন সব সুফল অর্জন করা যায় জাতীয় অর্থনীতির উপর যাদের কোন ঋণাত্মক প্রভাব নেই। পরিবেশ পরিকল্পনার বিভিন্ন সুফলের মধ্যে রয়েছে মানুষ এবং গবাদিপশুর মৃত্যুহার বা অসুস্থতার উল্লেখযোগ্য হ্রাস, উন্নততর শ্রমোৎপাদন, নতুন শিল্পপদ্ধতি ও কারিগরী উদ্ভাবন, নানা ধরণের বর্ধিত সুযোগ-সুবিধার প্রবর্তন, ইত্যাদি। অবশ্য, বিদেশী লগ্নীর সাহায্যে গড়ে তোলা শিল্প-উদ্যোগ কোন দেশের অর্থনীতির উপর ধনাত্মক প্রভাব সৃষ্টি করবে কিনা সেটা নির্ভর করবে সংশ্লিষ্ট পরিবেশ অর্থনৈতিক উৎপাদকগুলির উপর।

পরিবেশ অর্থনীতি, পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারটিকে অন্যান্য জাতীয় সমস্যা—যেমন পরিবহন ও যোগাযোগ, জনস্বাস্থ্য, গৃহ-নির্মাণ ও পুনর্বাসন ইত্যাদির সঙ্গে সমদৃষ্টিতে দেখতে সাহায্য করেছে এবং এর ফলে সুসমঞ্জস পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে। আন্তর্জাতিক বায়ু ও জলদূষণ, জীবনের মূল্য নির্ধারণ প্রভৃতি কয়েকটি জটিল ব্যাপারে পরিবেশ অর্থনীতি সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম হলেও অর্থনীতিশাস্ত্রে এই নবতম শাখাটি যে এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। বরং এমন কথাও বলা যায় যে পরিবেশ অর্থনীতি কার্যতঃ কোন দেশের সমগ্র অর্থনীতিকেই নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম।

পরিবেশ দূষণে নিউক্লীয় বিকিরণের ভূমিকা

জয়ন্ত বসু*

আমাদের দেশে পরিবেশ দূষণ বলতে স্বভাবতঃই প্রথমে মনে আসে—কলকাতার মতন শহরের রাস্তাঘাটে জঞ্জালের পাহাড়, বস্তি এলাকাগুলিতে যত্রতত্র আবর্জনা, গ্রামাঞ্চলে পুকুর, ডোবা প্রভৃতি জলাশয়ে অজস্র ময়লা, এইরকম সব উপাদান কিভাবেই না আমাদের পরিবেশকে দূষিত করছে! এই ধরনের দূষণ থেকে পরিবেশকে মুক্ত রাখা নিঃসন্দেহে সর্বাগ্রে বিবেচ্য।

তবে একথাও মনে রাখতে হবে যে, শিল্পনির্ভর সভ্যতার বহু সুফলের পাশাপাশি যে কয়েকটি কুফল দেখা যায়, তাদের অন্যতম হল পরিবেশ দূষণ। উন্নত দেশগুলিও তাই এ থেকে মুক্ত নয়। বস্তুতঃ নানান দ্রব্যের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যেসব বর্জনীয় পদার্থের উৎপত্তি হয়, সেগুলি বহু ক্ষেত্রে পরিবেশকে দূষিত করে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে, কল-কারখানার চিমনি থেকে যে প্রচুর ধেঁায়া বের হয়, তা বায়ুমণ্ডলকে কলুষিত করে তোলে। পরিবেশ দূষণ একেবারে বন্ধ করা সম্ভব নয়, কিন্তু যাতে তা মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়, সেজন্যে সবরকম চেষ্টা করা একান্ত দরকার।

পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে যা মারাত্মক হতে পারে, তা হল নিউক্লীয় বিকিরণ। জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে অ্যাটম বোমা বিস্ফোরণের ফলে যে নিউক্লীয় বিকিরণের সৃষ্টি হয়েছিল, তার ভয়াবহ প্রভাবের কথা আমরা প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর জানি। সাম্প্রতিক কালে নানান কারণে এই ধরণের বিকিরণ থেকে বিপদের সম্ভাবনা অনেকখানি বেড়ে গেছে। এই বিপদ সম্পর্কে শুধুমাত্র বুদ্ধিজীবী মহল এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও প্রশাসকগণের সচেতন হওয়াই যথেষ্ট নয়, সাধারণ মানুষকেও এ সম্পর্কে সচেতন, সজাগ ও সতর্ক হতে হবে। নিউক্লীয় বিকিরণ এবং তা থেকে পরিবেশ দূষণের সম্ভাবনা বর্তমান প্রবন্ধের উপজীব্য।

নিউক্লীয় বিকিরণের প্রকৃতি, উৎপত্তি ও প্রভাব

নিউক্লীয় বিকিরণ সম্পর্কে কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয় প্রথমে আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রকৃতি—পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে নিউক্লিয়াস নামে একটি অতি ক্ষুদ্র কণা থাকে, একথা আমরা অনেকেই জানি। নানারকম বিক্রিয়ার ফলে নিউক্লিয়াস থেকে যেসব শক্তিশালী রশ্মি ও কণা নির্গত হয়, সেগুলিকে বলে নিউক্লীয় বিকিরণ। এই বিকিরণকে চার ভাগে ভাগ করা যায়; আল্‌ফা রশ্মি, বিটা রশ্মি, গামা রশ্মি ও নিউট্রন কণা। বস্তুতঃ আল্‌ফা এবং বিটা রশ্মিও গতিশীল কণার সমষ্টি। আল্‌ফা রশ্মিও ধনাত্মক আধানযুক্ত আলফা কণা বা হিলিয়ামের নিউক্লিয়াসের সমষ্টি; আর বিটা রশ্মি বিটা কণার সমষ্টি—এই কণা ঋণাত্মক ইলেকট্রন বা ধনাত্মক পজিট্রন হতে পারে। নিউট্রন হচ্ছে বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ কণা। গামা রশ্মি হল অত্যন্ত ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গ; তবে একে ফোটন কণার সমষ্টি হিসাবেও ভাবা চলে।

উৎপত্তি—রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি কয়েকটি প্রকৃতিজাত পদার্থের নিউক্লিয়াস স্বতঃই ভেঙ্গে যেতে পারে এবং তখন সেই নিউক্লিয়াস থেকে আলফা কণা, বিটা কণা বা গামা রশ্মি নির্গত হয়। এইরকম নিউক্লীয় বিকিরণকে বলা হয় তেজস্ক্রিয় বিকিরণ। যে পদার্থ থেকে এই বিকিরণ নির্গত হয়, তাকে বলে তেজস্ক্রিয় পদার্থ। আধুনিক কালে ত্বরণ যন্ত্র, নিউক্লীয় চুল্লী ইত্যাদির সাহায্যে মানুষ কৃত্রিম ভাবেও বহু তেজস্ক্রিয় পদার্থের সৃষ্টি করেছে।

পরিবেশ দূষণের দিক থেকে বিচার করলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিউক্লীয় বিক্রিয়া হচ্ছে নিউক্লিয়াসের বিভাজন ইউরেনিয়াম-235 নামক পদার্থটির অপেক্ষাকৃত ভারী নিউক্লিয়াসের যখন বিভাজন হয় অর্থাৎ কোন গতিশীল কণার সঙ্গে সংঘর্ষে নিউক্লিয়াসটি প্রায় সমান ভরের দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে যায়, তখন সেই নিউক্লিয়াস থেকে নিউট্রন কণার নিঃসরণ হয়। এই নিউট্রনের অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে অ্যাটম বোমা ও নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টর বা নিউক্লীয় চুল্লীর ক্ষেত্রে—শৃঙ্খল বিক্রিয়ায় (Chain reaction) বহু নিউক্লিয়াসের বিভাজন হওয়ায় প্রভূত শক্তি ও বিপুল সংখ্যক নিউট্রনের সৃষ্টি হয়। অন্যান্য বিক্রিয়াতেও নিউট্রন কণার সৃষ্টি হতে পারে; যেমন বেরিলিয়ামের নিউক্লিয়াসে আলফা কণা এসে আঘাত করলে নিউট্রন নিঃসৃত হয়। যা হোক, নিউক্লীয় বিভাজনে নিউট্রনের সঙ্গে গামা রশ্মিও নির্গত হয়। বিভাজনের ফলে যে প্রায় 60 রকম নতুন নিউক্লিয়াস তৈরি হতে পারে, সেগুলি সবই তেজস্ক্রিয়। এগুলি থেকে বিটা কণা এবং অনেক ক্ষেত্রে গামা রশ্মিও নির্গত হয়।

প্রভাব—নিউক্লীয় বিকিরণ বস্তুকে ভেদ করে এগোতে পারে। তবে আলফা কণার এই ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে কম; একে শোষণ করবার জন্য কয়েক খণ্ড কাগজই যথেষ্ট। আমাদের দেহের ত্বকের মধ্যে আলফা কণা যৎসামান্য প্রবেশ করতে পারে বলে বাইরে থেকে এই কণা দেহের উপর এসে পড়লে বিপদের সম্ভাবনা কম। কিন্তু আলফা কণার কোন উৎস যদি খাদ্যের সঙ্গে বা অন্য কোন ভাবে দেহের মধ্যে প্রবেশ করে, তবে তা যথেষ্ট ক্ষতিকর হতে পারে। বিশেষতঃ প্লুটোনিয়ামের মতন এমন কয়েকটি উৎস রয়েছে, যেগুলি দেহের মধ্যে প্রবেশ করলে বিশেষ বিশেষ অঙ্গে সঞ্চিত হয় এবং সেখানে ক্রমাগত আলফা কণা নিঃসরণের ফলে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা।

*সাহা ইনস্টিট্যুট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা

বস্তুকে ভেদ করবার অপেক্ষাকৃত বেশি ক্ষমতা রয়েছে বিটা কণার। অ্যালুমিনিয়াম প্লেট ব্যবহার করে এই কণাকে শোষণ করতে হলে কয়েক মিলিমিটার পুরু প্লেটের দরকার। বিটা কণা আমাদের দেহকলাকে ভেদ করে কয়েক মিলিমিটার পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারে। সেদিক থেকে এটি খুব বিপজ্জনক নয়। তবে বিটা রশ্মির উৎস দেহের সংস্পর্শে থাকলে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া ঐ উৎস যদি কোন পথে দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহলে তা ক্ষতির কারণ হতে পারে।

গামা রশ্মি ও নিউট্রন কণার ভেদ করবার ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি। দেহকলা ভেদ করে এগুলি দেহের অনেক গভীরে প্রবেশ করতে পারে। সেজন্যে এগুলি প্রাণিদেহের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক।

গত শতাব্দীর শেষ দিকে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের আবিষ্কারের স্বল্প কালের মধ্যেই মানুষের শরীরের উপর তার ক্ষতিকারক প্রভাব জানতে পারা গেছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায়, স্বনামধন্যা মাদাম কুরী তাঁর স্বামী বিশিষ্ট বিজ্ঞানী পিয়ের কুরীর জীবনচরিতে লিখেছেন যে, তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাব জানবার জন্য পিয়ের কুরী কয়েক ঘণ্টা রেডিয়ামের সামনে তাঁর হাত উন্মুক্ত করে রেখেছিলেন; ফলে তাঁর হাতে একটি ক্ষতের সৃষ্টি হয়—অনেকটা পুড়ে যাওয়ার ক্ষতের মতন—সেই ক্ষত সারতে বেশ কয়েক মাস সময় লেগেছিল।

বিভিন্ন নিউক্লীয় বিকিরণ যে প্রাণিদেহের ক্ষতি করতে পারে, তার কারণ সেগুলি দেহকোষের অণু বা পরমাণুর সান্নিধ্যে এলে তার আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটাতে পারে, যেমন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে অণুকে ভেঙ্গে মুক্ত পরমাণুর সৃষ্টি করতে পারে এবং অণু বা পরমাণুকে উত্তেজিত বা আয়নিত করতে পারে। নিউট্রনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, তা দেহের অ্যামিনো অ্যাসিডের নাইট্রোজেন-14 পরমাণুকে কার্বন-14 পরমাণুতে রূপান্তরিত করতে পারে। দেহকোষের অণু-পরমাণুর উপর বিকিরণের এই ধরনের সব প্রভাবের ফলে দেহের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ ব্যাহত হয় এবং দেহ অসুস্থ হয়ে পড়ে।

নিউক্লীয় বিকিরণের প্রভাবে দেহের ক্ষতি কতখানি হয়, তা নানান বিষয়ের উপর নির্ভর করে—যেমন, বিকিরণের পরিমাণ ও প্রকৃতি, কতক্ষণ ধরে বিকিরণ দেহের উপর আপতিত হয়েছে, দেহের কোন্ অংশের উপর বিকিরণ এসে পড়েছে, ইত্যাদি। এই সব ক্ষেত্রে বিকিরণের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য যে একক সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয়, তার নাম হল 'র‍্যাড' (Rad : Radiation Absorption Dose)। যতখানি বিকিরণ এক গ্র্যাম পদার্থের উপর পড়লে 100 আর্গ (erg) শক্তি শোষিত হয়, তাকে বলে এক র‍্যাড। অবশ্য কেবলমাত্র শক্তি শোষণ দিয়ে দেহকোষের উপর বিকিরণের প্রভাব প্রকাশ করা যায় না—যেমন এক র‍্যাড আলফা কণার প্রভাব এক র‍্যাড গামা রশ্মির প্রভাবের তুলনায় প্রায় 10 গুণ। এজন্য অনেক সময় 'রেম' (Rem : Roentgen Equivalent Man) নামে আর একটি একক ব্যবহার করা হয়। এক র‍্যাড গামা রশ্মি (বা এক্স রশ্মি) মানুষের দেহে যে ক্ষতিসাধন করে, ততখানি ক্ষতি সাধনের জন্য অন্য বিকিরণের যে পরিমাণের প্রয়োজন, তাকে বলে এক রেম।

প্রাণিদেহের উপর বিকিরণের প্রভাব মূলতঃ দু-রকম : (1) সোম্যাটিক (Somatic) বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পর্কিত—যে মানুষের উপর বিকিরণ আপতিত হয়েছে, এক্ষেত্রে তার দৈহিক অসুস্থতা দেখা দেয়; (2) জেনেটিক (Genetic) বা প্রজনন ঘটিত—ঐ মানুষের দেহে অসুস্থতার প্রকাশ হয় না, তার ভবিষ্যৎ বংশধরদের দেহে দেখা দেয় ক্ষতিকর ফল। অবশ্য দুটি ফল একসঙ্গেও কাজ করতে পারে। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মানুষটি নিজেও অসুস্থ হয় আবার তার বংশধররাও বিকিরণের প্রকোপ থেকে রক্ষা পায় না।

সোম্যাটিক ফল সম্বন্ধে মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে, বিকিরণের পরিমাণ 100 র‍্যাডের কম হলে তার ফল বিশেষ লক্ষণীয় নয়, 100 থেকে 200 র‍্যাড হলে নানারকম অসুস্থতা দেখা দিলেও কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা, 200 থেকে 600 র‍্যাড হলে রক্তের পরিবর্তন, রক্তক্ষরণ ইত্যাদি হয়ে শতকরা 80 ভাগ পর্যন্ত ক্ষেত্রে 2 মাসের মধ্যে মৃত্যুর সম্ভাবনা, 600 র‍্যাডের বেশি হলে ঐ সময়ের মধ্যে মৃত্যুর হার শতকরা 80 থেকে 100 ভাগ। শেষোক্ত দুই ক্ষেত্রে যারা বেঁচে থাকে, তাদের অনেকেই লিউকেমিয়া (রক্তের ক্যানসার), ফুসফুস বা থাইরয়েড গ্রন্থির ক্যানসার ইত্যাদি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে জীবন্মৃত অবস্থায় দিন কাটায়।

নিউক্লীয় বিকিরণের মারাত্মক প্রভাব থাকলেও একথা বলা দরকার যে, মানুষ নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় এই বিকিরণকে নানান কাজে লাগিয়েছে। কয়েকটি রোগের চিকিৎসা ও রোগ নির্ণয়ে, তাছাড়া কৃষি এবং শিল্পেও এর সার্থক প্রয়োগ হয়েছে। এসব কাজের জন্য পরিবেশ যে দূষিত হয় না, তা নয়, তবে এখনো পর্যন্ত সেই দূষণের পরিমাণ অকিঞ্চিৎকর।

নিউক্লীয় বোমা ও পরিবেশ দূষণ

নিউক্লীয় বিকিরণের ফলে পরিবেশ যে দূষিত হতে পারে, সে সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ সর্বপ্রথম অবহিত হল 1945 খৃস্টাব্দে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি সহরে অ্যাটম বোমা বিস্ফোরণের পর। ঐ দুটি বোমা বিস্ফোরণে যে লক্ষাধিক মানুষ প্রায় তাৎক্ষণিক ভাবে নিহত হয়েছিল, তাদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশের মৃত্যু হয়েছিল নিউক্লীয় বিকিরণের প্রভাবে। তাছাড়া যারা সেই তেজস্ক্রিয় পরিবেশে বেঁচে ছিল, তাদের অনেকেই পরবর্তী কালে দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগেছে, পঙ্গু হয়ে গেছে অনেকে। গর্ভস্থ শিশুও রক্ষা পায় নি তেজস্ক্রিয়তার প্রকোপ থেকে— বহু শিশু বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মেছে।

হিরোশিমা ও নাগাসাকির তেজস্ক্রিয়তার অভিশাপ বয়ে যারা আজও বেঁচে আছে, তাদের বলা হয় 'হিবাকুশা'।

হিরোশিমায় যে অ্যাটম বোমা ফেলা হয়েছিল, বায়ুমণ্ডলে সেই রকম বোমা বিস্ফোরণের ফলে নিউক্লীয় বিকিরণের কথা একটু আলোচনা করা যাক। এই বিকিরণকে সাধারণতঃ দু-ভাগে ভাগ করা হয়। বিস্ফোরণের এক মিনিটের মধ্যে যে বিকিরণের সৃষ্টি, তাকে বলা হয় প্রারম্ভিক বিকিরণ (Initial radiation)। পরবর্তী সময়ে উৎপন্ন বিকিরণকে অবশিষ্ট বিকিরণ (Residual radiation) বলে। প্রারম্ভিক বিকিরণের মধ্যে যে সব আল্‌ফা কণা ও বিটা কণা থাকে, সেগুলি বায়ু ভেদ করে বেশিদূর এগোতে পারে না এবং ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত এসে পৌঁছয় না। গামা রশ্মি ও নিউট্রনের ভেদ করবার ক্ষমতা খুব বেশি; তারা ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছে বেশ কিছুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে এবং স্বল্প সময়ের জন্য স্থানীয় পরিবেশকে মারাত্মক ভাবে কলুষিত করে তোলে। বিজ্ঞানীরা বলেন, কয়েক মিনিটের মধ্যে যদি 400 র‍্যাড বিকিরণ মানুষের দেহে এসে পড়ে, তবে মৃত্যুর সম্ভাবনা শতকরা 50 ভাগ। সেই হিসাবে দেখা যায়, বিস্ফোরণের জায়গা থেকে প্রায় 1500 মিটার পর্যন্ত দূরত্বে যারা থাকে, অন্য কোন ভাবে নিহত না হলেও গামা রশ্মি ও নিউট্রনের প্রকোপে তাদের প্রায় অর্ধেকেরই মৃত্যু অবধারিত।

বোমা বিস্ফোরণের এক মিনিট পর থেকে যে বিকিরণ নির্গত হয়—যাকে অবশিষ্ট বিকিরণ বলে, তার উৎস বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় কণা। এইসব কণা দীর্ঘকাল ধরে পরিবেশকে দূষিত করতে পারে। এই প্রসঙ্গে কণাগুলির অর্ধজীবন (Half life) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ নির্গত হতে থাকে বলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার তেজস্ক্রিয়তা কমে যায়। কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থের কথা বিবেচনা করলে যে সময় পরে তার অর্ধেক পদার্থ তেজস্ক্রিয় থাকে, তাকে বলা হয় পদার্থটির অর্ধজীবন। নিউক্লীয় বোমার বিস্ফোরণে যে সব তেজস্ক্রিয় কণা উৎপন্ন হয়, তাদের অর্ধজীবন এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ থেকে শুরু করে বহু হাজার বছর পর্যন্ত হতে পারে।

এইসব তেজস্ক্রিয় কণার সৃষ্টি হতে পারে তিন ভাবে। প্রথমতঃ, বোমার মূল জ্বালানী ইউরেনিয়াম-235 বা প্লুটোনিয়াম-239-এর বিভাজনের ফলে যে নানান নতুন নিউক্লিয়াস উৎপন্ন হতে পারে, সেগুলি সবই তেজস্ক্রিয়। সেগুলি থেকে বিটা কণা নির্গত হয়ে সেগুলি অন্য নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলে 'বিটা ক্ষয়' (Beta decay)। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উৎপন্ন নিউক্লিয়াসও তেজস্ক্রিয় হয়। সাধারণতঃ এই রকম তিন ধাপ বিক্রিয়ার পর স্থায়ী নিউক্লিয়াসে রূপান্তর ঘটে। বিটা ক্ষয় প্রক্রিয়ায় বিটা কণার সঙ্গে গামা রশ্মিও নিউক্লিয়াস থেকে নির্গত হতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, অ্যাটম বোমার বিস্ফোরণে যে সব নিউট্রনের সৃষ্টি হয়, সেগুলি ভূপৃষ্ঠে বিভিন্ন পদার্থের উপর আপতিত হয়ে সেগুলিকে তেজস্ক্রিয় পদার্থে রূপান্তরিত করতে পারে। ভূপৃষ্ঠের মৃত্তিকার শতকরা তিন ভাগ হল সিলিকনের একটি সাধারণ আইসোটোপ—যাকে বলা হয় সিলিকন-30 অর্থাৎ যার ভরসংখ্যা-30। নিউট্রনের সঙ্গে সংঘাতে এটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ সিলিকন-31-এ রূপান্তরিত হয়। এর অর্ধজীবন 3 ঘণ্টার কিছু কম। নিউট্রনের সঙ্গে বিক্রিয়ায় মৃত্তিকার যে উপাদান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তা হচ্ছে সোডিয়াম। সোডিয়াম 24 নামে যে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপটি উৎপন্ন হয়, তা থেকে বিটা রশ্মি এবং শক্তিশালী গামা রশ্মিও নির্গত হয়। এই আইসোটোপের অর্ধজীবন প্রায় 15 ঘণ্টা। বোমা বিস্ফোরণের কাছাকাছি যে সব গৃহাদি থাকে, সেগুলি কেবল ধূলিসাৎই হয় না, সেগুলির কয়েকটি উপাদান—যেমন লোহা, কাঁচ ইত্যাদি—নিউট্রনের আঘাতে তেজস্ক্রিয় হয়ে যেতে পারে।

তৃতীয়তঃ, অ্যাটম বোমার জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত ইউরেনিয়াম-235 বা প্লুটোনিয়াম-239-এর বেশ কিছু অংশে বিভাজনে অংশগ্রহণ করে না; সেগুলি চারধারে ছড়িয়ে পড়ে পরিবেশকে দূষিত করে। স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তার ফলে সেগুলি থেকে আলফা কণা নির্গত হয়। ইউরেনিয়াম-235-এর অর্ধজীবন 70 কোটি বছর আর প্লুটোনিয়াম 239-এর অর্ধজীবন 24 হাজার বছর। এগুলি দীর্ঘকাল পরিবেশকে কলুষিত করে, অবশ্য এগুলি থেকে নিউক্লীয় বিকিরণের হার খুব কম হওয়ায় বাইরে থেকে এগুলি তেমন কিছু বিপজ্জনক নয়। কিন্তু যদি এগুলি আমাদের দেহের মধ্যে ঢুকে পড়ে, তবে তা মারাত্মক হতে পারে; যেমন, নিঃশ্বাসের সঙ্গে যদি এই সব তেজস্ক্রিয় পদার্থ আমাদের ফুসফুসে প্রবেশ করে, তবে তার ফল মারাত্মক হতে পারে।

অ্যাটম বোমা-বিস্ফোরণের পর উৎপন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি কেবল যে কাছাকাছি জায়গাগুলিতে সীমাবদ্ধ থাকে, তা নয়। বিস্ফোরণের পর যে ধূসর ধোঁয়ার স্তম্ভ এবং তার উপর বিরাট ছত্রাকার মেঘের সৃষ্টি হয়, তাইতে বহু তেজস্ক্রিয় কণা থাকে। ধূলি-কণার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে সেগুলি বায়ুস্রোতে বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। পরে যখন তেজস্ক্রিয় ধূলিকণাগুলি ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে, তখন সেই ঘটনাকে বলা হয় 'ফল-আউট' (Fall out)। ঐসব ধূলিকণার সঙ্গে স্ট্রনসিয়াম-90, আয়োডিন-131, সিজিয়াম-137 প্রভৃতি এমন সব তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ থাকে, যেগুলি জীবজগতের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক।

অ্যাটম বোমার পর হাইড্রোজেন বোমা, নিউট্রন বোমা ইত্যাদি যে সব আরও ভয়াবহ নিউক্লীয় বোমা উদ্ভাবিত হয়েছে, সেগুলির বিস্ফোরণেও নিউক্লীয় বিকিরণ ও বহু তেজস্ক্রিয় পদার্থের উৎপত্তির ফলে পরিবেশ দূষিত হয়ে যায়। হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে অ্যাটম বোমা ফেলার পর পরীক্ষামূলক ভাবে বহু

নিউক্লীয় বোমার বিস্ফোরণ হয়েছে—বায়ুমণ্ডলে, সমুদ্র বা হ্রদের জলে, ভূপৃষ্ঠের গভীরে। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের ফলে যে হারে পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছিল, তাতে কোন রকম যুদ্ধ ছাড়াই অচিরে সমস্ত পৃথিবীর জীবজগতের সমূহ বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। সুখের কথা, মাত্রাতিরিক্ত বিস্ফোরণের পরীক্ষা বন্ধের চুক্তি (Threshold test ban treaty) ইত্যাদির মাধ্যমে অবস্থা কিছুটা সামলে দেওয়া গেছলো। কিন্তু নিউক্লীয় বিপদের মেঘ তো কাটেই নি, বরং সম্প্রতি যেন আরও ঘনঘটা দেখা যাচ্ছে।

বিশ্বে এখন নিউক্লীয় অস্ত্রের সংখ্যা 50 হাজারেরও বেশি। এমন বহু বোমা রয়েছে, যেগুলির এক-একটির ধ্বংসক্ষমতা হিরোশিমায় নিক্ষিপ্ত বোমার তুলনায় কয়েক হাজার গুণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নিয়ন্ত্রণে এত নিউক্লীয় বোমা জমা হয়েছে যে সেগুলির ধ্বংসক্ষমতাকে যদি হিরোশিমা-বোমার ধ্বংসক্ষমতার হিসাবে প্রকাশ করা হয়, তাহলে বলা যেতে পারে—প্রতি মিনিটে একটি করে হিরোশিমা-বোমার বিস্ফোরণ ঘটালে (অর্থাৎ প্রতিদিনে 1440টি করে বিস্ফোরণ) ঐ সঞ্চিত বোমাগুলি শেষ হতে সময় লাগবে 2 বছর 3 মাস। তাছাড়া শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নই নয়, আরও অন্ততঃ 4টি দেশ 'নিউক্লীয় ক্লাবে'র সদস্য। তথ্যজ্ঞ মহল বলছেন, বর্তমানে কমপক্ষে 35টি দেশের ক্ষমতা রয়েছে নিউক্লীয় অস্ত্র তৈরি করবার।

যদি কোন ভাবে নিউক্লীয় যুদ্ধ বেধে যায়, তাহলে তাৎক্ষণিক ভাবে কোটি কোটি মানুষ তো নিহত হবেই, উপরন্তু নিউক্লীয় বিকিরণের প্রভাবে সমস্ত পৃথিবীর পরিবেশ দূষিত হবে। মোটামুটি হিসাবে বলা যায়, অন্তত 1 কোটি মানুষ প্রাণঘাতী ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হবে, 2 কোটি স্ত্রীলোক বন্ধ্যা হবে এবং যুদ্ধের পরবর্তী কালে $1\frac{1}{2}$ কোটি শিশু প্রজননগত ত্রুটির ফলে বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মগ্রহণ করবে। মনে রাখতে হবে, এই হিসেব যথেষ্ট কমের দিকের হিসেব, কারণ একবার নিউক্লীয় যুদ্ধ বাধলে তার পরিণতিতে জল-স্থল-অন্তরীক্ষের একটি বিরাট অংশে তেজস্ক্রিয়তা মারাত্মক রকম বেড়ে যাবে এবং মনুষ্যজাতির উপর তার প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী।

নিউক্লীয় অস্ত্র সম্পর্কে আরও একটি বিষয় চিন্তা করবার আছে। বহু অস্ত্র মজুত থাকলেও নতুন নতুন অস্ত্র বানানোর বিরাম নেই। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, আগামী 5-6 বছরে আরও 17 হাজার নি[illegible] অস্ত্র বানানোর পরিকল্পনা রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। [illegible] ঘাবু বিমান থেকে বলা হচ্ছে Advanced T[illegible] সংক্ষেপে ATB), উন্নততর ক্রুই[illegible] [illegible]dvanced Cruise M[illegible] [illegible]র চেষ্টা হচ্ছে।

দরকার হবে বহু নতুন নিউক্লীয় বোমার। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এইরকম বোমার বিস্ফোরণেই কেবল নয়, প্রস্তুতি-প্রতিক্রিয়াতেও পরিবেশ দূষণের বিপদ রয়েছে। যেমন ধরুন, খনি থেকে যে ইউরেনিয়াম আকরিক পাওয়া যায়, তা থেকে ইউরেনিয়াম নিষ্কাশন করবার সময় যে আবর্জনার (Waste) সৃষ্টি হয়, তা তেজস্ক্রিয়। আবার ঐ ইউরেনিয়াম থেকে বোমার উপযোগী জ্বালানি তৈরি করবার কাজেও তেজস্ক্রিয় আবর্জনা উৎপন্ন হয়। এইসব আবর্জনা থেকে নির্গত নিউক্লীয় বিকিরণ যদি জীবমণ্ডলে (Biosphere) প্রবেশ করতে পারে, তাহলে জীবজগতের পক্ষে ভয়াবহ ক্ষতির সম্ভাবনা। অবশ্য একথা ঠিক যে, নিউক্লীয় চুল্লীর জন্যও এই রকম আবর্জনার সৃষ্টি হয়—সে কথা আমরা একটু পরে আলোচনা করবো, কিন্তু এখনও পর্যন্ত সমর আয়োজনের জন্য তেজস্ক্রিয় আবর্জনার পরিমাণ তুলনায় বহু গুণ বেশি। নিউক্লীয় যুদ্ধ যাতে না বেধে যায়, সেজন্য যেমন বিশ্ববাসীকে সচেতন থাকতে হবে, তেমনি যাতে নিউক্লীয় অস্ত্রের প্রস্তুতি বন্ধ হয়, সেদিকেও সচেষ্ট হতে হবে কারণ এই প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে কেবল যুদ্ধের সম্ভাবনাই বাড়ে না, যুদ্ধ না বাধলেও পরিবেশ দূষণের বিপদ বেড়ে যায়।

নিউক্লীয় চুল্লী ও পরিবেশ দূষণ

মানুষের সভ্যতার ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে প্রচুর পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন, এবং এই শক্তির চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে। বহুকাল ধরে মানুষ প্রয়োজনীয় শক্তি পেয়েছে মূলতঃ কয়লা, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি জ্বালানীর রাসায়নিক শক্তি থেকে এবং কিছুটা জলের গতীয় শক্তি থেকে। আধুনিক কালে মানুষ শক্তির একটি নতুন উৎসের সন্ধান পেয়েছে। সেই উৎস হল ক্ষুদ্র পরমাণুর ভিতরের ক্ষুদ্রতর নিউক্লিয়াস। অ্যাটম বোমায় যে নিউক্লীয় শক্তি ভয়াবহ ধ্বংসের কারণ হয়েছে, নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টর বা নিউক্লীয় চুল্লীতে সেই শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে উৎপন্ন করে মানুষ তাকে শান্তির কাজে লাগিয়েছে। নিউক্লীয় শক্তির রূপান্তরে যে বিদ্যুৎ-শক্তির উদ্ভব হয়, বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থায় তার ভূমিকা ক্রমেই উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠছে। কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই এখন নিউক্লীয় চুল্লী থেকে 50 হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমান বিশ্বে মোট প্রায় 600টি নিউক্লীয় চুল্লী রয়েছে—এগুলির মধ্যে 250-এর কিছু বেশি শক্তিদানকারী চুল্লী (Power reactor), বাকিগুলি গবেষণামূলক চুল্লী (Research reactor)। নিউক্লীয় চুল্লী গঠনের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে আশানুরূপ অগ্রগতি না হলেও একাধিক চুল্লী চালু হয়েছে, অদূর ভবিষ্যতে আরও কয়েকটি তৈরি করবার পরিকল্পনা রয়েছে।

যা হোক, অ্যাটম বোমা বিস্ফোরণের মূলে রয়েছে যে নিউক্লীয় বিভাজন প্রক্রিয়া, সেই একই প্রক্রিয়া কার্যকর হয় [illegible]উক্লীয় চুল্লীতে, তবে এক্ষেত্রে বিশেষ উপায়ে বিভাজনের হার

নিয়ন্ত্রিত হয়। নিউক্লীয় বিভাজনের ফলে বিকিরণ নির্গত হয় এবং নানান তেজস্ক্রিয় পদার্থের উৎপত্তি ঘটে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, নিউক্লীয় চুল্লীর একটি ক্ষতিকর ভূমিকা থাকতে পারে এবং সেই ভূমিকা পরিবেশ দূষণ সম্পর্কিত।

চুল্লী থেকে নিউক্লীয় বিকিরণ যাতে বাইরে আসতে না পারে, সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখা হয়। কিন্তু চুল্লীতে ব্যবহৃত নিউক্লীয় জ্বালানী থেকে শক্তি উৎপাদনের পর যে অবশেষ থাকে এবং যাকে চুল্লী থেকে বের করে দিতে হয়, তা খুবই তেজস্ক্রিয়। অনেক সময় ঐ অবশেষ থেকে ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়ামকে নিষ্কাশন করে নিয়ে তাকে আবার নতুন ভাবে ব্যবহার করা হয়। এই নিষ্কাশন প্রক্রিয়াতেও বহু তেজস্ক্রিয় আবর্জনার সৃষ্টি হয়। এসব ছাড়াও খনিজ আকরিক থেকে ইউরেনিয়াম নিষ্কাশন, ইউরেনিয়ামকে চুল্লীর উপযোগী জ্বালানীতে পরিণত করা ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলিতেও প্রচুর তেজস্ক্রিয় আবর্জনা উৎপন্ন হয়। এই আবর্জনা কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় অবস্থায় থাকতে পারে।

জ্বালানীর তেজস্ক্রিয় অবশেষ এবং বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় আবর্জনা যাতে পরিবেশকে দূষিত না করে, সেজন্য নানান ব্যবস্থা আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আবর্জনা যদি কঠিন অবস্থায় থাকে এবং স্বল্প মাত্রায় তেজস্ক্রিয় হয়—যাকে বলে নিম্ন মাত্রার আবর্জনা (Low-level waste), তাহলে তাকে বিশেষ বিশেষ নির্বাচিত স্থানে মাটির কয়েক ফুট নিচে পুঁতে ফেলা হয়। উচ্চ মাত্রার আবর্জনাকে (High level waste) ভূগর্ভস্থ বড় বড় ইস্পাতের চৌবাচ্চায় বন্ধ করে রাখা হয়; সাধারণতঃ এই চৌবাচ্চার চারপাশে থাকে কংক্রীটের আবরণ। অনেক সময় উচ্চ মাত্রার তেজস্ক্রিয় আবর্জনা থাকে তরল দ্রবণ রূপে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই তরলকে কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হয়া হয়, কারণ তাহলে আয়তন কমে যায় এবং আবদ্ধ করে রাখবার পক্ষে তা সুবিধাজনক। এজন্যে কোন কোন ক্ষেত্রে তরল পদার্থ থেকে জলকে বাষ্পীভূত করে বের করে দেওয়া হয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে আবার তেজস্ক্রিয় তরলের সঙ্গে উপযুক্ত পদার্থ মিশিয়ে বিশেষ প্রক্রিয়ায় ফসফেট কাঁচ বা বোরোসিলিকেট কাঁচ তৈরি করা হয়; ঐ কাঁচের মধ্যে তেজস্ক্রিয় কণাগুলি আবদ্ধ থাকে।

তেজস্ক্রিয় আবর্জনাকে যেখানে বদ্ধ করে রাখা হয়, সেখান থেকে বাইরের পরিবেশে নিউক্লীয় বিকিরণ নির্গত হচ্ছে কিনা, তা পরীক্ষা করবার জন্য নিয়মিত আয়োজন থাকে। কোন স্থানে ত্রুটি ধরা পড়লে তা সংশোধনের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা হয়।

উচ্চ মাত্রার তেজস্ক্রিয় আবর্জনাকে যে ইস্পাতের চৌবাচ্চায় আবদ্ধ করে রাখা হয়, তা হল আবর্জনা অপসারণের মধ্যবর্তী ধাপ। পরবর্তী সময়ে ঐ আবর্জনাকে উপযুক্ত আধারে রেখে এমন কোন স্থানে তাকে ফেলে দিতে হবে যাতে সেই আবর্জনা থেকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ কোন সময়েই না জীবমণ্ডলে প্রবেশ করতে পারে। এই উদ্দেশ্যে গভীর সমুদ্রের তলদেশ, পরিত্যক্ত খনির গহ্বর ইত্যাদি স্থান নির্বাচন করা হয়েছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে এসব স্থানকে যথেষ্ট নিরাপদ মনে করা হচ্ছে না। ভূপৃষ্ঠের অন্ততঃ 250 মিটার নিচে ভূগর্ভে পাথরের মধ্যে এমন সব স্তরের সন্ধান করা হচ্ছে, সেগুলি কয়েক হাজার বছর ধরে অপরিবর্তিত রয়েছে। আশা করা হচ্ছে, ঐ রকম স্তরের মধ্যে গর্ত করে যদি তেজস্ক্রিয় আবর্জনাপূর্ণ আধার রেখে দেওয়া হয়, তাহলে বহু হাজার বছরের মধ্যে তাই থেকে কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থ জীবমণ্ডলের পরিবেশে এসে মিশতে পারবে না এবং সেই সময়ের মধ্যে আবর্জনার তেজস্ক্রিয়তা যথেষ্ট পরিমাণে কমে যাবে।

তেজস্ক্রিয় আবর্জনার সমস্যা সমাধানের জন্যে বহু গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। এই খাতে সত্তরের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যয়ের হার আগেকার তুলনায় প্রায় 20 গুণ বেশি হয়েছে। তবে এ কথা স্বীকার করতে হবে, যে বিপুল পরিমাণ আবর্জনা ক্রমেই সঞ্চিত হচ্ছে, তাকে স্থায়ীভাবে অপসারণের সুষ্ঠু সমাধান এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

তেজস্ক্রিয় আবর্জনা ছাড়াও আর একটি কারণে নিউক্লীয় চুল্লী থেকে পরিবেশ দূষণ ঘটতে পারে—কোন না কোন দুর্ঘটনায় চুল্লী থেকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে। এরকম কয়েকটি দুর্ঘটনা ইতিমধ্যে ঘটেছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, 1979 খৃস্টাব্দের 28শে মার্চ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়ার থ্রী মাইল আইল্যাণ্ডে নিউক্লীয় চুল্লীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পাম্প নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বিপুল পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ বাইরে চলে আসে। তেজস্ক্রিয়তার বিপদ থেকে রক্ষার জন্য কাছাকাছি সমস্ত জনবসতি থেকে লোকজনকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল। সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী আমাদের দেশের তারাপুরের একটি নিউক্লীয় চুল্লীতে এক দুর্ঘটনা ঘটেছিল 1980 খৃস্টাব্দের 14ই মার্চ। একটি পাইপের ছিদ্র দিয়ে তেজস্ক্রিয় জল বেরিয়ে এসে মেঝের উপর ছড়িয়ে পড়েছিল।

নিউক্লীয় চুল্লীর জীবনকাল প্রায় 40 বছর। তারপর যখন তা অকেজো হয়ে যায়, তখনো তার অনেক অংশ বহুকাল ধরে তেজস্ক্রিয় হয়ে থাকে। সেজন্য সেখান থেকে নিউক্লীয় বিকিরণ বেরিয়ে যেতে পরিবেশকে দূষিত না করে, সেদিকে নজর রাখা দরকার।

উপরিউক্ত কারণগুলির জন্য অনেকে নতুন নতুন নিউক্লীয় চুল্লী প্রস্তুতির বিরুদ্ধে মত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন, এতে পরিবেশ দূষণের বিপদ অনেকখানি বেড়ে যায়। এজন্য নিউক্লীয় চুল্লীর বিরুদ্ধে কয়েকটি আন্দোলনও হয়েছে। যেসব অঞ্চলে নতুন চুল্লী বসানোর কথা, কোন কোন ক্ষেত্রে

সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা সম্ভাব্য বিপদের আশংকায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাছাড়া বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞের ধারণা, নিউক্লীয় চুল্লীর সংখ্যা যত বাড়বে, নিউক্লীয় যুদ্ধের সম্ভাবনাও তত বেড়ে যাবে কারণ ঐ চুল্লীর জ্বালানী থেকে নিউক্লীয় বোমার মালমশলা পাওয়া যায়।

অন্যদিকে নতুন নিউক্লীয় চুল্লী প্রস্তুতির পক্ষেও প্রবল অভিমত রয়েছে। ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক—সব দেশের সরকারই একে কার্যতঃ সমর্থন করেন। নিউক্লীয় বিকিরণে যে দেশ সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, সেই জাপানে বর্তমানে 23টি নিউক্লীয় চুল্লী থেকে 15,600 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে এবং 2000 খৃস্টাব্দের মধ্যে আরো বহু চুল্লী নির্মাণ করে এই বিদ্যুতের পরিমাণকে 5-6 গুণ বাড়াবার পরিকল্পনা রয়েছে সে দেশের সরকারের। নতুন নিউক্লীয় চুল্লীর গঠন যাঁরা সমর্থন করেন, তাঁদের বক্তব্য হল—দেশের ক্রমোন্নতির জন্য আরও শক্তির দরকার এবং শক্তির জন্য অন্য কোন নতুন কার্যকর ব্যবস্থা উদ্ভাবিত না হওয়া পর্যন্ত নিউক্লীয় চুল্লীর বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাঁদের ধারণা, যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করলে চুল্লী থেকে পরিবেশ দূষণের তেমন কিছু বিপদ নেই। তাঁরা বলেন, নিউক্লীয় যুদ্ধ বাধবে কি বাধবে না, তা নির্ভর করে মূলতঃ বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর--নিউক্লীয় চুল্লীর সংখ্যা দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত হবে না।

আমাদের মনে হয়, উপরিউক্ত দুটি অভিমতের মধ্যেই কিছু যুক্তি আছে। বর্তমানে শক্তির চাহিদা মেটানোর জন্য নতুন নিউক্লীয় চুল্লীর প্রয়োজনীয়তা আছে কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সেগুলি থেকে পরিবেশ দূষণের আশংকাও রয়েছে। সুতরাং নতুন চুল্লী তৈরি করা যেতে পারে কিন্তু যথেচ্ছভাবে নয়, যথেষ্ট শর্ত সাপেক্ষে। আগে প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার যাতে ঐ চুল্লী থেকে পরিবেশ কলুষিত না হয়—বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে তো বটেই, সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গেও আগে এ বিষয়ে খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করতে হবে এবং নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সব রকম সাবধানতা সুনিশ্চিত না হলে কোন কারণেই নিউক্লীয় চুল্লী চালু করা উচিত নয়। তেজস্ক্রিয় আবর্জনার স্থায়ী অপসারণের যে সমস্যা রয়েছে, তা সমাধানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালাতে হবে। যদি অদূর ভবিষ্যতে এই সমাধান না পাওয়া যায় অথচ আবর্জনা (এবং সেই সঙ্গে পরিবেশ দূষণের সম্ভাবনা) ক্রমশ বাড়তেই থাকে, তাহলে চুল্লী প্রস্তুতির হার কমিয়ে আনতে হবে এবং শেষে এই প্রস্তুতি একেবারে বন্ধ করে দিতে হবে।

উপসংহার

মানুষের রোগের চিকিৎসায় এবং কৃষি, শিল্প ইত্যাদিতে যে তেজস্ক্রিয় পদার্থ তথা নিউক্লীয় বিকিরণ ব্যবহৃত হয় মানুষের পক্ষে তাকে 'আশীর্বাদ' বলা যায়। এই বিকিরণ থেকে পরিবেশ দূষণের মাত্রা এমন নয় যে, তাতে দুশ্চিন্তার কোন কারণ আছে।

নিউক্লীয় বোমা নিঃসন্দেহে মানুষের কাছে নিছক 'অভিশাপ'। বহু মানুষকে এ কেবল হতাহতই করে না, এ থেকে নির্গত বিকিরণ পরিবেশকেও মারাত্মক ভাবে দূষিত করে। ভবিষ্যতে যদি নিউক্লীয় যুদ্ধ বাধে, তাহলে পরিবেশ এমন দূষিত হবে যে, যুদ্ধের পর যে ক'জন মানুষ বেঁচে থাকবে, তাদের পক্ষে পৃথিবী হয়ে উঠবে বাসের অযোগ্য।

নিউক্লীয় চুল্লীকে নিছক আশীর্বাদ বা নিছক অভিশাপ বলা যায় না। শক্তির উৎস হিসাবে এটি মানুষের কাছে আশীর্বাদ কিন্তু তেজস্ক্রিয় পদার্থের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণে এর সম্ভাব্য ভূমিকার কথা বিবেচনা করলে এটিকে অভিশাপ বলে মনে হতে পারে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, এই চুল্লী মানুষের কাছে মূলতঃ আশীর্বাদ হয়ে থাকবে যদি না এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তেজস্ক্রিয় পদার্থ তথা নিউক্লীয় বিকিরণ পরিবেশকে মাত্রাতিরিক্ত ভাবে দূষিত করে।

ফুসফুস ও চামড়ায় ক্যানসার হচ্ছে

বিভিন্ন প্রকল্পের কর্মীরা নানারকম মানসিক ব্যাধিতেও ভুগছেন। এর প্রধান কারণ হল চাকুরিতে নিরাপত্তা বোধের অভাব এবং পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার অক্ষমতা। তাছাড়া, ভয়, হতাশা, বাসস্থানের সমস্যা, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক প্রভৃতির চিন্তা তো আছেই। কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞান ও কারিগরি বিভাগ দুর্গাপুরের পরিবেশ সমস্যার উপর একটি রিপোর্ট দাখিল করেছেন। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ দল এই রিপোর্টে প্রকল্পগুলি থেকে নির্গত গ্যাসের মাত্রা একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় রাখার সুপারিশ করেছেন। বিভিন্ন স্থানে বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা ছাড়াও বিশেষজ্ঞ দল প্রকল্পের কাছাকাছি জায়গায় প্রচুর বৃক্ষ রোপণের কথাও বলেছেন।

[সূত্র : স্টেটসম্যান, 29.9.83]

শব্দ-যন্ত্রণা ও তার ফলাফল

উদয়ন ভট্টাচার্য*

শুনশান রাত। আদি মানব ও আদি মানবী—আদম ও ইভ পাশাপাশি শুয়ে আছে। আদম ঘুমে বিভোর। পাশে ইভ দু-চোখের পাতা এক করতে পারছে না। যতবার ঘুমোবার চেষ্টা করছে আদমের প্রচণ্ড নাসিকা গর্জনে তার জমে আসা ঘুম ভেঙ্গে যাচ্ছে। মাথার ওপর গাছ-গাছালীর ফাঁকে ক্লান্ত তারাদের দেখা যাচ্ছে। ক্লান্ত ইভও অবশেষে একটা কাজই করে বসলো। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন আদমের পাঁজরে গুঁতো দিয়ে বললে : ঘুমোতে দেবে? আদম আশ্চর্য হয়ে বললে : ঘুমোও—আমি আবার কি করলাম? ইভের বিরক্তি মিশ্রিত উক্তি : টের পাবে কি করে? ঘুমোলে যে তুমি মরা। তোমার নাকের ডাকে বার বার আমার ঘুম ভেঙ্গে যাচ্ছে। বাইরের মসিকৃষ্ণ অন্ধকার আদমের লজ্জা ঢেকে নিলো।......কলহ বেশি দূর গড়ায় নি। নতুবা মানবজাতির ইতিহাসের শুরুতেই যতি পড়তো।

নাসিকা গর্জনের শব্দও ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়—বিরক্তি উৎপাদন করে। আর অনিয়ন্ত্রিত কোলাহল? তার বেলা তো কথাই নেই। পরিবেশ দূষণের সাধারণতঃ দুটো দিক নিয়েই আমরা সবিশেষ চিন্তিত। তা হল : বায়ু দূষণ ও জল দূষণ। পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রে এই দুটোর ওপর সাধারণতঃ বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। এছাড়া অপর একটি দূষণ আমাদের কান ঝালাপালা, প্রাণ ওষ্ঠাগত এবং রাতের নিদ্রা হরণ করে নিচ্ছে সে সম্পর্কে আমরা ততটা সচেতন নই। সেই দূষণটি হল : শব্দ দূষণ বা কোলাহল।

শব্দ সৃষ্টিকারী উৎসের কম্পনের ফলে শব্দ সৃষ্টি হয়। উৎসের নিয়মিত পর্যায় বৃত্ত (Regular Periodic) গতির ফলে যে শব্দ সৃষ্টি হয় তা সুরযুক্ত। উৎসের অনিয়মিত ও ক্ষণস্থায়ী কম্পনের ফলে যে শব্দ সৃষ্টি হয় তাকে এক কথায় বেসুরা শব্দ বা কোলাহল বলা হয়। এই বেসুরা শব্দ যেমন পীড়াদায়ক তেমন পরিবেশকে দূষিত করে। শব্দ সাধারণতঃ বায়ুর স্বাভাবিক চাপ ও কুড়ি ডিগ্রী সেলসিয়াসে তিন-শ চল্লিশ মিটার যায় প্রতি সেকেণ্ডে। বিভিন্ন মাধ্যমে শব্দের গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে কিরূপ তা এক নং সারণীতে দেওয়া হল। মাধ্যমের স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity) শক্তির তারতম্যই শব্দের গতিবেগের তারতম্যের প্রধান কারণ। তার সঙ্গে আছে মাধ্যমগুলি ঘনত্ব (Density) ও উষ্ণতার প্রভাব।

স্থিতিস্থাপকতা যত বেশি, শব্দের গতিবেগও তত বেশি, আবার ঘনত্ব গতিবেগ কমায় বলে উষ্ণতা বৃদ্ধিতে গতিবেগ বাড়ে, কারণ উষ্ণতা বৃদ্ধিতে বস্তুর ঘনত্ব কমে। শব্দ সৃষ্টিতে মাধ্যমে কোন কম্পনশীল কণার এক সেকেণ্ডে যতবার পূর্ণ দোলন হয় তাকে বলা হয় কম্পাঙ্ক। মানুষের কান সব রকম কম্পাঙ্কের শব্দ শুনতে পায় না। সেকেণ্ডে কুড়ি থেকে কুড়ি হাজার কম্পাঙ্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ শব্দ মানুষ শুনতে পায়। শব্দের কম্পাঙ্ক এর বেশি বা কম হলে সেই শব্দ মানুষের কাছে অশ্রুত থাকে। যদি কোন ব্যক্তির কানের কাছে হাত নাড়ানো যায় তবে সে হাত নাড়ানোর ফলে যে শব্দের সৃষ্টি হবে তা শুনতে পাবে না। কারণ ওই শব্দের কম্পাঙ্ক সেকেণ্ডে কুড়ির চেয়ে কম। মানুষের কথাবার্তার জন্য শব্দের কম্পাঙ্ক সেকেণ্ডে ষাট থেকে তের হাজারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

সারণী—1

মাধ্যম	গতিবেগ / মিটার সেকেণ্ড
	উষ্ণতা
বায়ু	340 (20 ডিগ্রী সেলসিয়াস)
জল	1420
ইট	3000
কংক্রীট	3300
কাঁচ	4100
অ্যালুমিনিয়াম	5100
ইস্পাত	5200

[সূত্র : Environmental Protection by E. T. Chanlell]

শব্দ কতটা জোরে হচ্ছে বুঝাতে বিজ্ঞানে প্রাবল্য বা তীব্রতা কথাটি ব্যবহার করা হয়। শব্দ তরঙ্গ যখন অল্প সময়ে বেশি পরিমাণ শক্তি আমাদের কানে পৌঁছে দেয় তখন বলা হয়ে থাকে শব্দ খুব জোরে হচ্ছে। অতি আস্তে করা শব্দ, ধরা যাক ফিস্‌ফিসিয়ে কথা—আমাদের কানে যে শক্তি পৌঁছে দিয়ে শ্রবণ অনুভূতি জাগায় তার পরিমাণ হল 10^{-16} ওয়াট/বর্গ সেকেণ্ড। আমাদের কানের শ্রবণ শক্তির সর্বোচ্চ মাত্রা 10^{14} ওয়াট/বর্গ সেকেণ্ড বা এক-শ চল্লিশ ডেসিবেল (Decibel—dB)। শব্দের প্রাবল্য বোঝাতে ডেসিবেল (dB) এককটি ব্যবহার করা হয়। শব্দের প্রাবল্য মাপতে অডিয়মিটার ব্যবহার করা হয়। শ্রবণ প্রারম্ভিক মাত্রা শূন্য ডেসিবেল ধরে শহরে ও বাসগৃহের বিভিন্ন পরিবেশে যে কোলাহল ওঠে তার একটি তালিকা—দুই এবং তিন নম্বর সারণীতে দেওয়া হল।

শব্দ দূষণের প্রধান উৎস হলো তিনটি। যথা—(1) বিভিন্ন ছোট বড় কলকারখানা এবং যন্ত্রপাতি, (2) পরিবহন (স্থল পথ এবং আকাশ পথ), (3) বিভিন্ন কাজকর্মের ফলে সৃষ্ট শব্দ।

শহর ও শিল্পপ্রধান অঞ্চলে দিনরাত বিভিন্ন ধরণের শব্দ

* পলাশবাড়ী, পোঃ আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ী

সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন ভারী শিল্প, ছোট-বড়-কলকারখানা, রেলওয়ে ইয়ার্ড, ট্রাম-বাস-লরী প্রভৃতি যানবাহন, বিমান বন্দর ইত্যাদি থেকে অনবরত নানা ধরণের তীক্ষ্ণ শব্দ সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া শহর অঞ্চলে প্রতিদিন লাখো-লাখো লোকের উপচে পড়া ভিড়ের বিচিত্র গমগম শব্দও কম যন্ত্রণাদায়ক নয়। শব্দ যন্ত্রণায় সবচেয়ে ব্যতিব্যস্ত শহর ও শহরতলীর জনগণ। আর

সারণী—2

বাসগৃহের বিভিন্ন উৎস থেকে উত্থিত শব্দ

উৎস	পরিমাণ / ডেসিবেল (dB)
ছেঁড়া পাতা নড়ার সরসর শব্দ	10—15
ফিস্ফিসিয়ে কথা বলার "	15—20
সাধারণ কথাবার্তার শব্দ	55—65
স্বাভাবিক রেডিওর আওয়াজ	45
জোরে ,, ,,	70
রেস্তরাঁর আওয়াজ	70—80
জোরে কথা বলার শব্দ	90
বাজির সুতীব্র শব্দ	90—120

যারা বিভিন্ন কলকারখানার কর্মী তাদের তো কথাই নেই। কোলাহল পরিমাপক যন্ত্র নিয়ে সমীক্ষা করে দেখা গেছে ভারতের প্রধান প্রধান শহরগুলিতে উত্থিত শব্দ মানুষের শ্রবণ সীমার ওপরে উঠে গেছে। কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও দিল্লীতে কোলাহলের মাত্রা এক-শ ডেসিবেল ছাপিয়ে গেছে।

সারণী—3

বিভিন্ন যানবাহন থেকে উত্থিত শব্দ

উৎস	পরিমাণ / ডেসিবেল (dB)
যাত্রিবাহী বড় মোটর গাড়ি	92
লরী	94
ট্যাক্সী	89
	90
স্কুটার	87
মোটর সাইকেল	92
ট্রাম	85
গ্যাস ড্রিল	90
লাউড স্পীকার	110
এয়ার হর্ন	120
জেট প্লেন	140

অবাঞ্ছিত শব্দের ক্ষতিকারক প্রভাব কেবল মাত্র ব্যক্তি বিশেষের ওপর বর্তায় না। এর ক্ষতিকর প্রভাব সুদূর প্রসারী। অবাঞ্ছিত শব্দ—কেবলমাত্র বধিরতাই সৃষ্টি করে না, মস্তিষ্কক্ষরণ-জনিত ব্যাধি, হার্টের বিভিন্ন রোগ, গ্যাসট্রিক আলসার, স্মৃতি ভ্রংশ, ক্লান্তি, অনিদ্রা প্রভৃতি রোগের অন্যতম কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। বৃটেনে শব্দ সংক্রান্ত এক সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে, সহ্য সীমার উর্ধ্বে শব্দ শ্রবণ করার ফলে বৃটেনের জনগণের মধ্যে নিউরোসিস (স্নায়ুঘটিত) রোগের সংখ্যা বেড়ে গেছে। দেখা গেছে প্রতি চারজন পুরুষ ও তিনজন স্ত্রীলোকের মধ্যে একজন করে নিউরোসিস্ রোগে ভুগছে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের প্রারম্ভের মুখে আমেরিকার বিভিন্ন অফিসের কাজকর্মের হার অত্যন্ত কমে যায়। এর অন্যতম কারণ দিনরাত অবিশ্রান্ত অবাঞ্ছিত শব্দের সৃষ্টি। প্রচণ্ড শব্দ করে দিনরাত আকাশ পথে পরিভ্রমণরত বোমারু বিমান, সাইরেনের কর্কশ আওয়াজ এবং রাস্তা দিয়ে প্রতি মুহূর্তে ছুটে চলা ভারী ভারী ট্রাক এবং বিভিন্ন যানবাহনের গতায়াত অবাঞ্ছিত শব্দের কারণ। অনবরত এইসব পীড়াদায়ক শব্দের মধ্যে কাজ করবার ক্ষমতা অত্যন্ত হ্রাস পায়। এর ফলে উৎপাদনের পরিমাণ যথেষ্ট কমে যায় এবং রাষ্ট্রের ক্ষতির পরিমাণ অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যায়। বর্তমানে অবাঞ্ছিত শব্দের ব্যাপক বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন অফিসের কর্মীগণের কর্মক্ষমতা যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে।

সারণী—4

কাজের সময়/ঘণ্টা		শব্দ গ্রহণ সীমা/ডেসিবেল
8	—	90
6	—	92
4	—	95
3	—	97
2	—	100
$1\frac{1}{2}$	—	102
1	—	105
$\frac{1}{2}$	—	110
$\frac{1}{4}$ বা কম	—	115

[সূত্র : E. Protection by E. T. Chanlell]

ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ-এর এক সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে ভারতের কয়েকটি শহরের বধিরতার যে হার প্রকাশ পেয়েছে তাতে দেখা যায়, দিল্লীতে ঐ হার 9·5%, কোলকাতায় 10% এবং মাদ্রাজে 10·5%। এই বধিরতার অন্যতম কারণ অবাঞ্ছিত শব্দের উদ্বেগজনক বৃদ্ধি। ফরাসী বিজ্ঞানী জিন বয়ার পরীক্ষা করে দেখেছেন, অফিসের কোলাহল যদি কুড়ি ডেসিবেল কমানো যায় তা হলে কর্মচারি-গণের কর্মক্ষমতা নয় ভাগের মতো বেড়ে যাবে এবং বানান ভুলের সংখ্যা শতকরা ঊনত্রিশ ভাগ কমে হবে। দীর্ঘক্ষণ বেশি শব্দের মধ্যে কাজ করা যায় না। কাজের সময় যত কম

হবে অপেক্ষাকৃত ততবেশি শব্দের মধ্যে কাজ করা সম্ভব হবে। সারণি চার-এ সেই চিত্রই পাওয়া যাবে অর্থাৎ কতটা সময় কতবেশী শব্দসংকুল ক্ষেত্রে কাজ করা যায়।

অবাঞ্ছিত শব্দের নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। কল-কারখানার কর্মীগণের বিশেষ করে বেশি সর্তকতা নেওয়ার প্রয়োজন। যে সব কল-কারখানায় নব্বই ডেসিবেল-এর বেশি শব্দ উত্থিত হয় সেখানকার কর্মীদের অবশ্যই কানের ঢাকনা (ear muffs) ব্যবহার করা উচিত। নব্বই ডেসিবেলের কম শব্দ উত্থিত হলে কানের নিরাপত্তার জন্য কানের ছিপি (ear plugs) ব্যবহার করা প্রয়োজন। এছাড়া পুরানো যন্ত্রপাতি যতদূর সম্ভব কারখানা থেকে নির্বাসন দিতে হবে। যন্ত্রপাতি যত পুরানো হবে তা থেকে তত বেশি অবাঞ্ছিত শব্দ সৃষ্টি হবে। কোলাহল নিবারণ করার জন্য শিল্প সমৃদ্ধ অঞ্চল ও শহর অঞ্চলে বৃক্ষ রোপণের ব্যাপক পরিকল্পনা নেওয়া উচিত। কারণ, অবাঞ্ছিত শব্দ বৃক্ষরাজি বেশ কিছুটা শোষণ করে নেয়। বিভিন্ন ধরণের গাছ কি পরিমাণ শব্দ শোষণ করে তার একটি তালিকা সারণী 5-এ দেওয়া হলো।

সারণী—5

বিভিন্ন গাছের শব্দ শোষণ ক্ষমতা

গাছের নাম	শব্দ শোষণের পরিমাণ/ ডেসিবেল
বিলাতী ঝাউ (casurina)	10
কাজু বাদাম গাছ	8
নারকেল	8
নিম	10
পাম	9
আম	9
তেঁতুল	9

[সূত্র : Science Today, August '82

অবাঞ্ছিত শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারী আইন রয়েছে। কলকারখানায় কর্মরত কর্মীদের ক্ষেত্রে বেশ কিছু ব্যবস্থা আছে। অনবরত শব্দের মধ্যে কাজ করার ফলে শ্রবণ শক্তি কমে গেলে ক্ষতি পূরণ দেবার ব্যবস্থাদিও আছে। কিন্তু যথাযথ ভাবে আইন মানা হচ্ছে কিনা তা দেখবার লোক কোথায়? অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান সমস্যায় আমরা ব্যতিব্যস্ত। এই নিদারুণ বেকারিত্বের যুগে একটি চাকুরি পাওয়া লটারীতে প্রথম পুরস্কার পাওয়ার সামিল! সুতরাং চাকুরী পাওয়া নিয়ে কথা। সেই চাকুরীগত কারণে ভবিষ্যত জীবনের অনাগত অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটির কথা কে আর আগাম ভাবে! সুতরাং ঝুঁকি নিয়ে, প্রাণ হাতে করে কাজ করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন কলকারখানায় নিযুক্ত কর্মচারীদের সময় ব্যবধানে শ্রবণ শক্তি হ্রাসের একটি তালিকা সারণী—6-এ দেওয়া হলো।

সারণী—6

বিভিন্ন বয়সে এবং সময় ব্যবধানে শিল্পে নিযুক্ত কর্মচারীবৃন্দের শ্রবণ-ক্ষমতা

বয়স	কাজের সময়সীমা / বছর			
	0—5	6—10	11—15	16—20
	গড় শ্রবণ সীমা / ডেসিবেল			
21—25	20	28·5	—	—
26—30	25	33·1	58·3	—
31—35	22·5	47·4	57·5	—
36—40	—	47·4	59·7	—
41—45	—	—	60·0	—
46—50	—	—	—	52·5

মন্তব্য : শ্রবণ সীমার হার বৃদ্ধি শ্রবণ ক্ষমতার হ্রাস অর্থাৎ ব্যাস্তানুপাতিক—একটি বাড়লে অপরটি কমে।

[সূত্র : Industrial Medicine Division, Central Labour Institute, Bombay]

এই প্রসঙ্গে একটি হিসেবও নেওয়া যেতে পারে। বিভিন্ন কলকারখানায় যদি অবাঞ্ছিত শব্দ কমানোর জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থাদি নেওয়া যায় তবে, তবে কি পরিমাণ ব্যয় হবে। সে হিসেব দেওয়া হলো সারণী—7-এ। এই সারণীতে দেখা যাবে কোন কোন কারখানায় এক ডেসিবেল শব্দ কমানোর জন্য ব্যবস্থা নিলে সর্বাধিক ব্যয় সাত হাজার টাকা ছাপিয়ে যাবে। আবার কোন কোন কারখানায় ব্যয়ের পরিমাণ অতি সামান্য দাঁড়াবে।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রবণ ক্ষমতা কমে আসবে। এটিই স্বাভাবিক নিয়ম। আগামী শতাব্দীর শুরুতে পৃথিবীর মোট লোকসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ হবে বৃদ্ধ। পঁয়ষট্টি বছর ছুঁই ছুঁই করবে তাদের বয়স। এই বিপুল সংখ্যক বৃদ্ধের প্রায় এক সপ্তাংশ বিরাজ করবে ভারতে। এছাড়া দেখা গেছে প্রতি ছ-বছর অন্তর কোলাহল দ্বিগুণ হয়। এইভাবে কোলাহলের মাত্রা বাড়তে থাকলে আগামী দু-হাজার খৃস্টাব্দে পঞ্চাশ বছরের ঊর্ধ্বে এমন একজনকেও পাওয়া যাবে না যার স্বাভাবিক শ্রবণ ক্ষমতা আছে।

সুতরাং মাত্রাতিরিক্ত কোলাহল নিয়ে এখন চিন্তা-ভাবনা করার সময় এসেছে। একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে—সুস্থ-স্বাস্থ্য-সমৃদ্ধ জীবনে মানসিক শান্তির গুরুত্ব অপরিসীম এবং এর জন্য কোলাহল বর্জিত স্বাভাবিক পরিবেশ কাম্য। প্রসঙ্গতঃ বহু ব্যবহৃত পুরানো আপ্ত বাক্যটি স্মরণীয় : Silence is golden—নিঃশব্দতা স্বর্ণময়।

সারণী—7

বিভিন্ন কলকারখানায় শব্দ কমানোর ব্যবস্থা গ্রহণে সম্ভাবিত ব্যয়ের পরিমাণ

কারখানা	শব্দের হ্রাস (ডেসিবেল)	ব্যয়	ডেসিবেল প্রতি ব্যয়	কর্মচারী প্রতি ব্যয়
(1) কাপড়ের কল— দু'শটি তাঁত আছে এমন, কারখানার পরিমাপ : 40 × 30 × 5 মি. কর্মচারী সংখ্যা—50 জন	20 (105-85)	1,40,000 টাকা	7,000 টাকা	2,800 টাকা
(2) পাঞ্চ মেসিন মেসিনের সংখ্যা—22টি কর্মচারী সংখ্যা—57	13 (98-85)	34,760 টাকা	2,700 টাকা	615 টাকা
(3) টাম্বলিং ব্যারেল (Tumbling Barrel)	20 (105-85)	20,000 টাকা	1,000 টাকা	200 টাকা
(4) বায়ুচালিত যন্ত্র	15 (105-90)	7·50 টাকা	50 টাকা	—

[সূত্র : Environmental Engineering Division, Central Labour Institute, Bombay]

উদ্ভিদ জীবন বিপন্ন

কৃষি, শিল্প, সমৃদ্ধির নামে যেভাবে নির্বিচারে অরণ্য সম্পত্তি নষ্ট করা হচ্ছে তাতে করে এই শতকের শেষেই 2,30,000 প্রজাতির উদ্ভিদের মধ্যে 50,000 প্রজাতিই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। গত ডিসেম্বর মাসে নতুন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক জেনেটিক কংগ্রেসের সম্মেলনে এই কথাটি বলেন বিশ্ববিখ্যাত উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ও, এচ, ফ্রাঙ্কেল। ডক্টর ফ্রাঙ্কেল বলেছেন, বন নষ্ট করে উচ্চ ফলনশীল শস্য চাষ করার ফলে ধান, গম, আখ, রবার, টম্যাটো, কলা ও কমলালেবুর জিনগত পরিবর্তন এমনই হচ্ছে যে এগুলি থেকেও আর উচ্চ ফলন পাওয়া যাবে না। তিনি বলেন মানুষ ও পশুর খাবার, ওষুধ, জ্বালানী সবকিছুর জন্য বন সংরক্ষণ অবশ্যই দরকার। তাছাড়া, এখনও যে সমস্ত গাছ আছে, যে সমস্ত শস্য চাষ করা হয় সেগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে এবং তার থেকে ভাল ফল পেতে গেলে অরণ্য সম্পদ রক্ষা করা দরকার।

[সূত্র : টাইমস অফ ইণ্ডিয়া, 18.12.83]

বায়ুমণ্ডল ও দূষক

অবুঝ

1972 খৃস্টাব্দে 5ই জুন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সুইডেনের স্টকহোমে পরিবেশ দূষণ রোধে কিছু প্রকল্প গ্রহণ করে। এরপর প্রতি বৎসরই ঐ দিনটি প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রে পরিবেশ দিবস হিসাবে পালিত হয় পরিবেশ দূষণ মুক্ত করার কিছু কিছু প্রোগ্রামকে কার্যকরী করার শপথ নিয়ে। নানা দূষণের মধ্যে বায়ু দূষণ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্রবন্ধ বায়ুমণ্ডল ও তার রাসায়নিক দূষক সমূহের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকামাত্র।

বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর

	স্তর	সমুদ্রতল থেকে উচ্চতা	উষ্ণতা	কতিপয় তথ্য
1.	ট্রপোস্ফিয়ার বা ঘনমণ্ডল	প্রায় 10 কিমি.	ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উষ্ণতা কমতে কমতে 10 কিমি. উচ্চতায়, $-60°C$.	সমগ্র বায়ুমণ্ডলের ভরের $\frac{3}{4}$ অংশ এই স্তরে আবদ্ধ। ঘূর্ণি, ঝড়, মেঘ আবহাওয়ার পরিবর্তন প্রভৃতি ঘটায়, পরিবেশ অশান্ত। বিষুব অঞ্চলে এই স্তরের উচ্চতা প্রায় 19 কিমি. এবং মেরু অঞ্চলে ঐ উচ্চতা প্রায় 9 কিমি।. সমুদ্র পৃষ্ঠে বায়ুর চাপ 664 থেকে 805 Hg.
2.	স্ট্রাটোস্ফিয়ার বা সূক্ষ্মমণ্ডল	10—20 কিমি. (30 কি.মি. পর্যন্ত)	$-60°C$	শান্ত অবস্থা
3.	মেসোস্ফিয়ার বা অন্তর্মণ্ডল	20--80 কিমি.	উষ্ণতা বাড়তে বাড়তে 30—50 কিমি. উচ্চতায় $0°C$-তে আসে। তারপর কমতে কমতে $-65°$ থেকে $-100°C$-এ নামে।	অতিবেগুনী ও এক্স-রশ্মি শোষণের জন্য উষ্ণতা বাড়ে। তারপর O_3 গঠনে তাপমাত্রা কমে যায়। ওজোন স্তর আমাদের পৃথিবীকে বর্মের মত রক্ষা করছে সূর্য থেকে বেরিয়ে আসা অনেক অনিষ্টকর রশ্মিকে বাধা দিয়ে।
4.	থার্মোস্ফিয়ার	80 কিমি উপরে	দ্রুত উষ্ণতা বাড়তে বাড়তে 200 কিমি. উচ্চতায় $900°C$ এবং 300 কিমি. উচ্চতায় $1000°C$।	থার্মোস্ফিয়ার ও আয়নোস্ফিয়ারের মধ্যে পার্থক্য টানা যায় না।
5.	আয়নোস্ফিয়ার বা আয়নমণ্ডল	60 কিমি. উপরে	উষ্ণতা বাড়ার কারণ অতিবেগুনী রশ্মি ও এক্স-বিকিরণ শোষণ	অত্যধিক আয়নিত হওয়ায় রেডিও তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়।
	D স্তর	70 „ „		
	E „	100 „ „		
	F_1 „	200 „ „		
	F_2 „	300 „ „		
6.	এক্সোস্ফীয়ার বা বহির্মণ্ডল	550 „ „		বাতাস নেই বললেই চলে।

অ্যাপোলো 16 মিশনে বহির্মণ্ডলে আয়নিত হাইড্রোজেনের মেঘ ধরা পড়েছে। এরূপ ধারণা করা হচ্ছে যে অতিবেগুনী রশ্মি জলের অণুকে ভেঙে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন আয়নে রূপান্তরিত করে। হালকা হাইড্রোজেন আয়ন বহির্মণ্ডলে চলে আসে আর ভারী অক্সিজেন অণু ঘনমণ্ডলে নেমে আসে। ফলে ঘনমণ্ডলে অক্সিজেনের অনুপাত ঠিক থাকছে, শুধু সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার জন্য নয়।

বায়ু মণ্ডলের স্বাভাবিক রাসায়নিক গঠন

		উপাদান	পরিমাণ
1.	ঘনমণ্ডলে অপরিবর্তিত	O_2	20·946% ± 0·002
2.	গাঢ়তা বিশিষ্ট	N_2	78·084% ± 0·004
3.	উপাদান	CO_2	0·033% ± 0·001
4.		Ar	0·934% ± 0·001
5.	সামান্য পরিবর্তিত	Ne	18·18 ppm ± 0·04
6.	গাঢ়তা বিশিষ্ট	He	5·24 ppm ± 0·04
7.	উপাদান	Kr	1·14 ppm ± 0·01
8.		Xe	0·087 ppm ± 0·001
9.		H_2	0·5 ppm
10.		CH_4	2·0 ppm
11.		NO_2	0·5 ppm ± 0·1

		উপাদান	পরিমাণ
12.	পরিবর্তনশীল গাঢ়তা	SO_2	0–1 ppm²
13.		NO	0–0·02 ppm²
14.		NH_3	অতি সামান্য
15.		O_3	0·07–0·02 ppm
16.		O^+	300 কিমি. উপরে
17.		He	1200–3500 কিমি উপরে
18.		H^-	3500 কিমি. উপরে

ppm বলতে প্রতি মিলিয়নে অংশ

প্রাকৃতিক ঘটনায় বা মানুষের কর্মে নানা উপাদান বায়ুর সঙ্গে মিশে বায়ুর বিশেষ করে ঘনমণ্ডলের স্বাভাবিক অবস্থার কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটায়। যখন এই পরিবর্তন জীবজগতের ক্ষতির কারণ হয়, তখনই বলি বায়ু দূষিত হয়েছে। যেসব বস্তু এই দূষণ ঘটায় তারাই দূষক।

বায়ু দূষণের রাসায়নিক উপাদান

শ্রেণী বিভাগ

	মুখ্য শ্রেণী	উপশ্রেণী	বিশেষ উপাদান
1.	অজৈব গ্যাস	নাইট্রোজেনের অক্সাইড	NO_2. NO
2.		সালফারের অক্সাইড	SO_2, H_2SO_4
3.		অন্যান্য	NH_3, CO, H_2, Cl_2, H_2, ফ্লোরাইড, H_2S, O_3
4.	জৈব গ্যাস	হাইড্রোকার্বন	C_6H_6, C_4H_8, CH_2, CH_4 ইত্যাদি
5.		অ্যালডিহাইড, কিটোন	অ্যাসিটোন, ফরম্যালডিহাইড
6.		অন্যান্য	অ্যাসিড, অ্যালকোহল, পলিনিউক্লিয়ার যৌগ ইত্যাদি
7.	এরোসোল	ঘনবস্তুর কণাকারে	ধোঁয়া, ডাস্ট
8.		তরল কণা	ফিউম, তৈলকুয়াসা, পলিমেরিক ক্রিয়াজনিত উৎপাদিত বস্তু

নিঃসৃত বায়ু দূষক

		দূষণীয় বস্তু
1.	মোটর যান গ্যাসোলীন ইঞ্জিন	NH_3, CO, NO, NO_2, SO_2 বেনজোপাইরিন, অ্যালডিহাইড, হাইড্রোকার্বন, জৈব অ্যাসিড, পার্টিকুলেট

নিঃসৃত বায়ু দূষক

	উৎস	দূষণীয় বস্তু
2.	ডিজেল ইঞ্জিন	CO, NO, NO_2, SO_2 অ্যালডিহাইড, হাইড্রোকার্বন, পারটিকুলেট
3.	স্টোরেজ ট্যাঙ্ক, অটোমবাইল পূরক ট্যাঙ্ক, তৈলাগার, কারবুরেটর	গ্যাসোলিন
4.	শিল্পে, বাণিজ্যে, গৃহ কাজে শক্তিকেন্দ্রে চুল্লী, দহন প্রভৃতি	CO_2, CO, ধোঁয়াশা, SO_2 পারটিকুলেট

বায়ুমণ্ডলে দূষণীয় বস্তুর রাসায়নিক ক্রিয়া

	ক্রিয়াশীল উপাদান	সাধারণ বিক্রিয়া	লব্ধ দ্রব্য
1.	SO_2, O_2, অণুঘটক	$SO_2 + O \rightarrow SO_3 \rightarrow H_2SO_4$	সালফিউরিক অ্যাসিড, এরোসোল
2.	অলিফিন, SO_2, নাইট্রোজেন অক্সাইড, O_2, সূর্যকিরণ	$SO_2 + ROO \rightarrow RO + SO_3 \rightarrow H_2SO_4$	সালফিউরিক অ্যাসিড, এরোসোল
3.	স্টাইরিন, হ্যালোজেন, সূর্যকিরণ	$C_6H_5-CH=CH_2+Cl_2$	চোখের পীড়াদায়ক
4.	নাইট্রিক অ্যাসিড, O_2	$2NO+O_2+2NO_2$	নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড
		ফোটোলিসিস	
5.	নাইট্রোজেন অক্সাইড	$NO_2 \rightarrow NO+O$	নাইট্রিক অক্সাইড, অক্সিজেন পরমাণু
6.	অ্যালডিহাইড	$R-COH \rightarrow R\cdot + H\dot{C}O$	Alkyl, acyl
7.	কিটোন	$R_1R_2CO \rightarrow R + R\dot{C}O$	Alkyl, acyl
8.	Alkyl-nitrates	$RONO \rightarrow RO.+NO$ $\rightarrow R. + NO_2$	Alkyl, Alkoxyl, নাইট্রিক অক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড
9.	নাইট্রাস অ্যাসিড	$HNO_2 \rightarrow HO. + NO$ $\rightarrow H + NO_2$	Hydroxyl-radicals, হাইড্রোজেন পরমাণু, নাইট্রিক অক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড
		তাপীয় বিক্রিয়া	
10.	ওজোন, অলিফিনস্	$O_3+R_2C=CR_2 \rightarrow R'RO$ ROO	Alkyl, Alkoxyl, Formyl
11.	অক্সিজেন পরমাণু, হাইড্রোকার্বন	$O+RH \rightarrow R\cdot + HO$	Alkyl, hydroxyl
12.	অক্সিজেন পরমাণু, অ্যালডিহাইড	$O+RCO.H \rightarrow R\dot{C}O+HO$	Acyl, hydroxyl
		জৈব শৃঙ্খল বিক্রিয়া	
13.	Alkyl, অক্সিজেন	$R\cdot+O_2 \rightarrow ROO$	Peroxyalkyl.
14.	Peroxyalkyl, অক্সিজেন	$ROO\cdot+O_2 \rightarrow RO.+O_3$	Alkoxyl, ওজোন
		মুক্ত রেডিক্যাল ও বিক্রিয়া	
15.	অক্সিজেন পরমাণু,	$O+O_2 \rightarrow O_3$	ওজোন
16.	অক্সিজেন পরমাণু, SO_2	$O+SO_2 \rightarrow SO_3$	সালফার ট্রাইঅক্সাইড
17.	ওজোন, অলিফিনস্	$O_3+ : C=C : \rightarrow R-COH$	অ্যালডিহাইড কিটোন, Ozoxides.
18.	ওজোন, NO	$O_3+NO \rightarrow NO_2+O_2$	নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড
19.	ওজোন, NO_2	$O_3+NO_2 \rightarrow N_2O_5 \rightarrow HNO_3$	নাইট্রিক অ্যাসিড

এরূপ আরো অনেক বিক্রিয়া ঘটে।

পাণিনি ঃ আদর্শ বিজ্ঞানানুগ কৃতি

প্রভাসচন্দ্র কর*

অধ্যাপক Stcherbatski* লিখেছেন—'The ideal scientific work for India is the grammer of Panini'** ; এ কথাগুলি উদ্ধৃত করে দিয়েছেন নেহরু—তাঁর Discovery of India গ্রন্থখানিতে। এখন, পাণিনি কে ছিলেন ?

পাণিনির পূর্বপুরুষগণকে 'পণিন্‌' পর্যায়ভুক্ত ধরে নেওয়া হয় : কারণ পণিন শব্দটি থেকে 'পাণিনি' শব্দটি ব্যুৎপত্তি লাভ করেছে। তাঁর অপর নাম—'শালাতুরীয়'। কানিংহাম (—Ancient Geography of India) বলেছেন যে, এই So-Lo-Tu-Lo লাহোর ছাড়া অন্য কোন জায়গা নয়, বর্তমানে Attock সন্নিহিত জনবিরল ক্ষুদ্র গ্রাম।

পাণিনিকে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি দাক্ষীপুত্র নামে অভিহিত করেছেন। তা থেকে সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, পাণিনি-মাতা 'দাক্ষী' দেবী। কথাসরিৎসাগরে যাঁকে পাণিনিগুরু রূপে বর্ণিত দেখা যায় তাঁর নাম—বর্ষ। (ব্যাকরণের পূর্বাচার্যগণের নাম—সেনক, গালব, আপিশালি, শৌনক, ভরদ্বাজ প্রমুখ ; স্বয়ং পাণিনি এই পূর্বসূরীদের কাছে ঋণ স্বীকার করে গিয়েছেন)।

তাঁর কাল

'Weber ও Max Müller পাণিনিকে খৃঃ পূঃ 350 অব্দের লোক বলে সিদ্ধান্ত করেছিলেন। Keith প্রমুখ কয়েকজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত এখনও সজোরে সেই মত ধরে বসে আছেন। স্বর্গত ডঃ সার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার ও Goldstücker এমত নিরাকৃত করে প্রচার করেন যে পাণিনি খৃঃ পূঃ 500 অব্দের পরবর্তী হতেই পারে না। গোল্ড স্টুকারের ধারণায় পাণিনি খৃঃ পূঃ 800 অব্দে আবির্ভূত হয়েছিলেন।···সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের মতে নিরুক্তকার যাস্কের পূর্ববর্তী পাণিনি, খৃঃ পূঃ 2400 অব্দের লোক।···Dr. Belvalkar-এর মতে পাণিনির আবির্ভাব সময় খৃঃ পূঃ 700–650 অব্দ।

Michael Grant তাঁর প্রামাণ্য গ্রন্থে (—From Alexander to Cleopatra : The Hellenistic

---

* Rusian Academy of Sciences প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 1727 খৃস্টাব্দে। প্রাচ্য বিষয়ে রাশিয়ানদের আগ্রহ—ঔৎসুক্য ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে। তথাকথিত Asiatic Museum-এ একত্রিত করা হয়—বই, পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি 1818-তে। প্রাচ্য-বিষয়ক Oriental Faculty স্থাপিত হয় 1858-তে ; আসলে এটা—প্রাচ্যের ভাষাগোষ্ঠী, সাহিত্যাদি ও ইতিহাসের সুধী-সমাবেশ (faculty)।

নাগরী হরফ-সমন্বিত প্রথম মুদ্রণ যন্ত্র স্থাপিত হয়েছিল St. Peters-Berg নগরে, আলেকজাণ্ডার-এর রাজত্বকালের মধ্য ভাগে, যাঁর মৃত্যু 1825-তে। গত শতাব্দীর মধ্য ভাগে Prof. Böhtlingk-এর বিখ্যাত অভিধানখানি এই মুদ্রণ-যন্ত্রটির অন্যতম প্রধান সুকর্ম।

সেই থেকে পালি ও সংস্কৃতের অনুশীলন এখানে হতে থাকে, বিশেষজ্ঞ Vasiliev এবং তারপর Minayev, ইনি পালিভাষায় অনুশীলনকারী। শেষোক্তের শিষ্য উপরিউক্ত অধ্যাপক মহোদয়, যিনি পাণিনি সম্বন্ধে এই ইঙ্গিতবহ অভিমত প্রকাশ করে গিয়েছিলেন ; এঁর অন্য কৃতি—

Er Kenntniss—Theories Und Logik Nach De Lehre Der Spateren Buddhism of Stcherbatsky. Aus. I. Russ Übers. V. Otto Strauss (Neubiberg, 1924) [অর্থাৎ পরবর্তী বৌদ্ধধর্মীয় মতবাদের তত্ত্ব ও যুক্তি বিষয়ক জ্ঞান]। —Indian Historical Quarterly, March 1925, pp. 168, 169, 171, 197.

** নামটি অন্য দেশেও দেখতে পাওয়া যায়, যেমন—Dragoco Report 8, 1956 p. 128-এ রয়েছে Domenico La Face and Panini.

* 182/2, গোপাললাল ঠাকুর রোড, কলিকাতা-700035

World p. 84)* লিখেছেন—…'a fifth century Sanskrit Grammarian from Taxila, Panini by name,…

"পাণিনি সূত্রমধ্যে যে 'যবনানী' শব্দটি পাওয়া যায়… সংস্কৃত যবন শব্দদ্বারা Ionian গ্রীকগণ লক্ষিত হয়ে থাকেন। Keith (—A History of Sanskrit Literature pp. 425–426)…এখনও সন্দেহ করতে ছাড়েন না যে, পাণিনি আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পরবর্তী কালে সূত্র রচনা করেছেন। …'Yavana must be at least as old as the ninth century before Christ' (—Dr. Belvalkar: Systems of Sanskrit Grammar p. 25)."

আজকাল পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত—পাণিনি খৃস্টপূর্ব অষ্টম শতকে বর্তমান ছিলেন। পাণিনি ও কৌটিল্যকে খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর লোক ধরে নিয়েছিলেন গণপতি শাস্ত্রী। এছাড়া Bohtlingk এবং G. Bühler-এর মতো জার্মান পণ্ডিতগণের রয়েছে নিজস্ব মতবাদ।

ঋক সাম যজুঃ ও অথর্ব বেদের উল্লেখ রয়েছে পাণিনিতে। মহাভারতের মূল উপাখ্যানের সঙ্গে পাণিনি ছিলেন পরিচিত। আদি কবি বাল্মীকির গ্রন্থের সঙ্গে পাণিনির ছিল পরিচয়। অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ ও রঘুবংশ রচনায় পাণিনি—ব্যাকরণের সাহায্য নিয়েছিলেন স্বয়ং মহাকবি কালিদাস, যাঁকে শ্রীঅরবিন্দ বিশেষিত করেছিলেন 'ভারতবর্ষের হৃদ্দেশ'-রূপে। পাণিনীয় গ্রন্থে বুদ্ধ ও বৌদ্ধগণের কোনই উল্লেখ না থাকায় এটা ধরে নেওয়া স্বাভাবিক যে, পাণিনির আবির্ভাব প্রাক্ বৌদ্ধযুগে। পাণিনির গ্রন্থে 'চরক' নাম পাওয়া যায়।

গ্রন্থমধ্যে কয়েকটা বিশেষ শব্দ

ভেষজ, ভৈষজ্য, ঔষধ ও অগদঙ্কার প্রভৃতি পাণিনি উল্লিখিত অনেক শব্দাদি তৎকালীন চিকিৎসাশাস্ত্রের উৎকর্ষ-জ্ঞাপক। অগদঙ্কার (অর্থে চিকিৎসকগণ) চিকিৎসার জন্য ভৈষজ্য প্রস্তুত করতেন।

'হল্য' ক্ষেত্রের অভাব ছিল না।' হলে থাকতো লোহার ফাল কুশী। যজ্ঞে ব্যবহৃত হতো সোমরস, সোমসৃৎ— যজমান নিমন্ত্রিতগণকে কুণ্ডে কুণ্ডে সোমলতার রস পানের ব্যবস্থা করতেন। অযজ্ঞীয় স্থানে অন্য মদ্যের প্রচলন ছিল।

পরশু (কুঠার), শক্তি অস্ত্র, কবচ, পরিখা খনন ইত্যাদির উল্লেখ পাণিনিতে রয়েছে। দুর্গ তখনকার দিনে ছিল কিনা তা জানা যায় নি। যে কর্মকারগণ ভস্ত্রা (অর্থাৎ ভিস্তি) দ্বারা লৌহ সামগ্রী প্রস্তুত করতো, পাণিনি তাদের আখ্যা দিয়েছেন ভাস্ত্রিক। দধি-মিশ্রিত অন্ন, উপদংশ (চাটনি), উদশ্বিৎ (ঘোল), ক্ষীর, হৈয়ঙ্গবীন (ঘি) ইত্যাকার কোন জিনিষেরই অভাব ছিল না পাণিনির কালে।

বীণা তখন দুর্লভ ছিল না। 'গ্রৈবেয়ক' অর্থে নারী-কণ্ঠহার। স্ত্রীলোকের কর্ণে শোভাবর্ধন করতো 'কর্ণিকাযুগল'। সদ্যপ্রস্তুত তাঁত-বসনের নাম ছিল 'নিষ্প্রবাণি'। ছিল 'কন্থা'। "রঞ্জনশিল্পও সে যুগে বর্তমান ছিল। 'কাষায়' বস্ত্রের ত কথাই নাই। লাক্ষা, গোরোচনা, শকল ও কর্দম (রঙ বিশেষ) সহযোগে বস্ত্র রঞ্জিত করা হত। পরবর্তীকালে নীল, পীত, হরিদ্রা ও মহারজন দ্বারা রঞ্জন করার পরিচয় কাত্যায়ন দিয়েছেন।" নিষ্ক, কার্ষাপণ শ্রেণীর মুদ্রার কথা পাণিনির ব্যাকরণে দেখা যায়।

পাণিনিতে উল্লেখ রয়েছে 'ঈশ্বর'। এখন, ঋগ্বেদে (10/130/3 মন্ত্রে) প্রতিমা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে প্রতিমূর্তি অর্থে। পাণিনীয় যুগের পূজাও মূর্তিপূজা। এ সম্পর্কে পাণিনীয় সূত্রদ্বয় 5/3/99 এবং 5/3/109 দ্রষ্টব্য। ভাষ্যকারগণের ব্যাখ্যা অনুসারে প্রমাণিত হচ্ছে যে, পাণিনির সময়ে দেব-দেবী মূর্তির প্রচলন ছিল।

উপরিউক্ত তথ্যাদি আমরা জানতে পারি শুধু এক পাণিনির সুচারু গ্রন্থখানি থেকে। আগেই বলা হয়েছে যে, বিজ্ঞানসম্মত শিল্পাদির (যেমন রঞ্জন শিল্প) আভাস রয়েছে গ্রন্থখানির মধ্যে। আর এতে কি নেই? বৈয়াকরণ পাণিনি, উপরন্তু পরিব্রাজক ছিলেন।

পাণিনির অমর অবদানের স্বীকৃতি

বর্তমান ইন্দোর শহর থেকে চল্লিশ মাইল দূরে প্রসারিত ছিল অশেষ গুণালঙ্কৃত বিদ্যোৎসাহী ভোজরাজার রাজত্ব। সম্ভবত 800 বছর আগে ছিল তাঁর রাজত্বকাল। তাঁর রাজধানী ছিল ধারা নগরী। (Epigraphia Indica-তে আছে যে) সেখানকার কোন একটি মন্দিরে পাণিনির মূলসূত্রগুলির কথা সম্পূর্ণ আকারে মন্দির গাত্রে ইষ্টক ফলকের উপর নিপুণভাবে উৎকীর্ণ ছিল।

সকলেরই জানা আছে যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে ছিল ষড়্ দর্শন এবং বেদ চতুষ্টয়, কিন্তু তাঁর অনন্য কৃতির জন্য পাণিনিকেও 'দর্শন' আখ্যায় ভূষিত করে ভারতবর্ষীয় দর্শন-সংখ্যা সাতে দাঁড় করানোর পক্ষে কেউ কেউ আছেন; তাঁদের যুক্তি এই যে, 'দর্শন শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ চিন্তা করলে যা বুঝায় তদনুসারে' এই ধরণের আখ্যা অমূলক হবে কি?

* ঠিক বুঝা গেল না। গ্রন্থকার কি এতে খৃঃ পূঃ বুঝাতে চেয়েছেন? কারণ গ্রন্থখানির ভূমিকায় লেখা রয়েছে, কোন বিশদ উল্লেখ না থাকলে বুঝতে হবে খৃষ্টপূর্ব।—লেখক।

সংস্কৃত ভাষার প্রতি অনুরাগ : পণিনির বিজ্ঞানী সুলভ মনোবৃত্তি

বিশ্বকে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ অবদান সংস্কৃত ভাষা : '…the venerable mother from whom the University's Address (লাতিন) and the language which I now speak (ইংলিশ) trace alike their Origin'.—বলেছিলেন Sir Maurice Gwyer

প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ কেউ এ ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েছেন বা হয়েছিলেন, যেমন পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ নীলরতন ধর মহোদয় নজির টেনেছেন এইভাবে—"In Sanskrit, the Indians had a language capable of expressing with accuracy the most subtle shades of meaning…" DR.F. Sherwood Taylor : A Short History of Science. বিজ্ঞানী মেণ্ডেলেইয়েফ এ ভাষার প্রতি কতদূর শ্রদ্ধাশীল ছিল তা সকলেরই জানা আছে। আর আইনস্টাইন যে অধ্যাপকের কাছে প্রায়ই যেতেন তাঁর নাম Maurice Winternitz, খ্যাতনামা সংস্কৃত ভাষাবিদ। সুতরাং অধ্যাপক রামন যে সংস্কৃতের পক্ষ নিয়ে নিজেকে মহিমান্বিত করে যাবেন তাতে আশ্চর্যান্বিত হবার কি আছে ?

'The enthusiastic praise by Sir C. V. Raman, given to Sanskrit in his evidence before the Sanskrit Commission and his advocacy of Sanskrit as the national language……'

যে বিজ্ঞানসম্মত ভাষাতে চরক-সুশ্রুত শ্রেণীর গ্রন্থ রচিত হয়ে চিকিৎসা শাস্ত্রে জগদ্বরেণ্য স্থান আজও অধিকার করে রয়েছে এবং ভবিষ্যতে থাকবে সেই ভাষার স্বকীয়ত্বে এখানকার ভেষজশাস্ত্রর পরিভাষার* উপরে যথেষ্ট প্রভাব থাকবে তাতে আর সন্দেহ নেই।

'ব্রহ্ম হতে আরম্ভ করে বৃক্ষায়ুর্বেদ এবং কৃষি, অশ্ব ও হস্তিশাস্ত্র নিয়ে সর্ববিষয়ে নানাবিধ আলোচনা পুস্তকাকারে সংস্কৃত সাহিত্যে নিবদ্ধ হয়েছে, আর সংস্কৃতের আয়ুর সম্বন্ধে ত কথাই নাই'।

উপসংহার

অকারণ সংস্কৃত ভাষা-প্রশস্তি এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। কিছুটা বিষয়ান্তরে আমরা গিয়ে পড়েছি। এহেন সুপ্রাচীন, সুললিত ও ঐতিহ্যমণ্ডিত ভাষার প্রাণ প্রতিষ্ঠায় যে মনীষীর অন্যতম অবদান সব চাইতে বেশি মূল্যবান হিসেবে পরিগণিত তিনি আর কেউ নন—তিনি অনন্য পাণিনি, যাঁর ব্যাকরণ অতিমাত্রায় বিজ্ঞানভিত্তিক। তাঁর অপরিসীম মননশীলতায় সংস্কৃত ভাষা-বিজ্ঞান নিগূঢ়রূপ পরিগ্রহ করেছিল সেই সুপ্রাচীন যুগে। তিনি তাঁর কৃতিতে অবিস্মরণীয়রূপে বিজ্ঞানী না হয়ে পারেন কি ? এই অতুল বিজ্ঞানী-মনের যথার্থ অভিব্যক্তি প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ রাশিয়ান অধ্যাপক মহোদয়কে বিনম্র শ্রদ্ধায় বিস্ময়াপ্লুত করেছিল। পাণিনির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার্ঘটি যেমন স্বতঃস্ফূর্ত, প্রকৃত মূল্যায়ন ; এটি যেন বিশ্ববাসীর পক্ষ থেকে ব্যক্তির নিবেদন।

* এ বিষয়ে প্রামাণ্য ও তথ্যভূয়িষ্ঠ নিবন্ধ—প্রকাশিত হয়েছিল, যে পত্রিকায় তার নাম—Surgery, Gynecology & Obstetrics, Vol. 126. pp. 1327–23, June 1968, Copyright 1968 by The Franklin H. Martin Memorial Foundation.

নিবন্ধটির নাম The Influence of Sanskrit on Modern Medical Vocabulary। এতে লেখক Asoke K. Bagchi MBBS (Cal), FNS (Vienna) etc. নিম্নোক্ত বইগুলির উল্লেখ করেছেন—

C. C. Mettler : History of Medicine p. 332, Philadelphia : Blackiston 1947.

G. Stowell and J. E. Mason : Book of Knowledge Vol. IV p. 251 London : Waverly Book Co. 1959.

K. Walker : The Story of Medicine pp. 28–29
New York : Oxford University Press. 1955.

গাছ বাঁচাও

সুকুমার ভৌমিক*

বিগত কয়েক বছরের মধ্যে প্রবল জনস্ফীতি ও প্রযুক্তি বিদ্যায় মানুষের অভাবনীয় কৃতিত্বের ফলে, মানুষ তার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার জন্যে যথেচ্ছ ভাবে বৃক্ষ নিধন করছে। জল, হাওয়া আর মাটির বিশুদ্ধতা রক্ষা আর সংরক্ষণ সম্বন্ধে মানুষ যে শুধু চূড়ান্ত উদাসীন শুধু তাই নয়, মানুষেরই যথেষ্ট শোষণে ভূপৃষ্ঠ আজ ক্ষতবিক্ষত, বায়ু দূষিত। ফলস্বরূপ আত্মপ্রকাশ করেছে ভয়াবহ পরিবেশ দূষণ।

একসময় অনেকেই বলত রূপশ্রী বাংলার প্রাকৃতিক শোভার তুলনা হয় না। পাহাড়ে ছিল ঘন সবুজ অরণ্য, আর ছিল নয়নাভিরাম শোভায় বিকশিত পুণ্য বনভূমি। আজ কিন্তু সেই মোহিনীময়ী বাংলার সবুজ রূপটি ধ্বংসের মুখে। নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন করে গড়ে উঠছে শহর-শিল্পাঞ্চল, গড়ে উঠছে ব্যক্তিগত মুনাফাখোর কিছু ব্যবসায়ীর বন ধ্বংসকারী কাঠের ব্যবসা, জীবজন্তুর ব্যবসা ও অবাঞ্ছিত ইটের ভাটা। উদ্ভিদ জগৎ ব্যবহৃত হচ্ছে শিল্পে ও জ্বালানীতে। স্থূল প্রয়োজনের জন্য নিশ্চই এসবের দরকার আছে। কিন্তু ভাব তো একবার চারপাশে শুধু কংক্রীটের স্তূপ, না আছে এতটুকু সবুজ গাছপালা মানসিক ভারসাম্যের জন্য যা অপরিহার্য। গাছ থেকে আমরা কি পেতে পারি সেটা আশা করি বলার অপেক্ষা রাখে না।

আমরা জানি গাছ তার সবুজ পাতায় ক্লোরোফিলের মাধ্যমে এবং সূর্যের আলোর সাহায্যে বায়ু থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) শোষণ করে নেয় এবং তা থেকে কার্বন আত্মসাৎ করে নিজের পুষ্টি সাধন করে, আমাদের খাদ্য জোগায়—আর অক্সিজেন (O_2)-কে ফিরিয়ে দেয় বায়ুমণ্ডলের ভাণ্ডারে। মানুষ এবং অন্যান্য জীবজন্তু সেই অক্সিজেন প্রশ্বাসের সঙ্গে টেনে নিয়ে তার বিপাকীয় ক্রিয়া সম্পন্ন করে এবং দম বন্ধকারী কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ফিরিয়ে দেয় বায়ুমণ্ডলে ; অর্থাৎ আমরা বলতে পারি পৃথিবীতে অক্সিজেন গ্যাস তৈরির মহান কারখানা হচ্ছে উদ্ভিদ জগৎ। সুতরাং গাছেরাই আমাদের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ করে। কিন্তু যে হারে বৃক্ষ নিধন চলছে—তাতে ভবিষ্যতে নিঃশ্বাস নেবার অক্সিজেনটুকু থাকবে তো ?

বৃক্ষ কমে যাওয়ার ফলে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই কার্বন ডাই-অক্সাইড অবলোহিত রশ্মি শোষণ করতে পারে, ফলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বাড়বে। বাতাসে কার্বন ডাই-এর পরিমাপ 0·03 থেকে 0·06% হলে পৃথিবীর তাপমাত্রা 3° সে. বেড়ে যাবে। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন গত আশি বছরে পৃথিবীর কার্বন ডাই-অক্সাইড 10 শতাংশ বেড়েছে। বৃক্ষ নিধনের হার এভাবে বজায় থাকলে, কার্বন ডাই-অক্সাইডের বৃদ্ধির হার এভাবেই বৃদ্ধি পাবে, ফলস্বরূপ আগামী শতকের শেষের দিকে গ্রীনল্যাণ্ড, দক্ষিণ মেরুর হিমবাহ (1 কোটি 45 লক্ষ বর্গ কিলোমিটার)-গুলি গলে গিয়ে মানবজাতির এক নিদারুণ দুর্বিপাক ডেকে নিয়ে আসবে—ঘটবে জলস্ফীতি—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ার সঙ্গে বাড়ছে বাতাসের তাপমাত্রা, নাটকীয়ভাবে কমছে বায়ুর আর্দ্রতা, কমে যাচ্ছে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ। তাইতো কোন কোন বছর সর্বগ্রাসী খরা, জলকষ্ট মুখব্যাদান করে আত্মপ্রকাশ করছে।

দিল্লীর ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর প্রতিবেদনে জানা যায় যে এই তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে উচ্চ ফলনশীল ধান ও গম চাষের অসুবিধা দেখা দেবে।

নির্বিচারে অবৈজ্ঞানিক ভাবে বৃক্ষ নিধন করতে থাকলে বাড়বে ভূমিক্ষয়। ফলে একদিকে নদীর বাঁধ যেমন হয়ে উঠছে ভঙ্গুর তেমনি ভূমিক্ষয়ের ফলে মাটি ধুয়ে নদীতে গিয়ে পড়ছে, নদীর গভীরতা কমে যাচ্ছে। কমছে জলের প্রবাহমাত্রা। ফলে বর্ষাকালে বন্যার প্রকোপ দেখা যাচ্ছে। যদি আমাদের এই বিধ্বংসী বন্যার কবল থেকে রক্ষা পেতে হয় তবে নদী-খালের নিকটবর্তী আর একটি গাছ কাটার আগে আমরা যেন দশবার চিন্তা করি। পরিবেশবিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করেছেন,—গাছপালার বদলে অসংখ্য পাথরের রাজপথ, পাকা বাড়ি, কলকারখানার স্থাপিত হওয়ায় শহরাঞ্চলের উষ্ণতা ক্রমশই বাড়বে ; তার ফলে সেখানকার বাতাস হয়ে উঠবে অত্যন্ত অস্বস্তিকর ও ক্লান্তিদায়ক। শুধু তাই নয় উষ্ণতার ভারসাম্য নষ্ট হওয়ায় পৃথিবীর ঋতু পরিবর্তনে আনবে না সামগ্রিক বিপর্যয় তারই বা গ্যারান্টি কোথায় ?

প্রকৃতির খামখেয়ালীপনার জন্য চাষের ক্ষেত্রে আজ আমাদের বেশি করে ভূগর্ভস্থ সঞ্চিত জলের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। তাই প্রয়োজন ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ বৃদ্ধি। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন গাছপালা বেশি থাকলে ভূত্বকের ছিদ্র সংখ্যা বহুল পরিমাণে বেড়ে যায় এবং সেই সঙ্গে বাড়ে ভূমির জল শোষণ ক্ষমতা।

শুধু কি তাই—সমীক্ষায় দেখা গেছে মরুভূমির সংলগ্ন সবুজ এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে গাছের অভাবে মরুভূমি আস্তে আস্তে ঐসব জায়গায় তার করাল হস্ত প্রসারিত করছে। উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে উত্তর আফ্রিকার ভূমধ্য সাগরের তীরবর্তী 'কার্থেজ' অঞ্চলগুলি ছিল কিঞ্চিত শুষ্ক কিন্তু উর্বর। পর্যাপ্ত শস্যের ফলন হতো ঐ সব অঞ্চলে। কৃষি জমি বৃদ্ধির জন্য অবৈজ্ঞানিকভাবে বনাঞ্চল কাটার ফলে ঐ অঞ্চলের বেশির ভাগই সাহারা মরুভূমি গ্রাস করেছে। তেমনি হয়েছে আমাদের রাজস্থান অঞ্চলে। পৃথিবীর পরিবেশ

* কোয়াঃ নং 224, এইচ. এফ. সি. হলদিয়া, মেদিনীপুর

বরাবরই অল্পবিস্তর দূষিত গ্যাস আর ক্ষতিকর সূক্ষ্ম ধূলিকণার চাদর দ্বারা আবৃত ছিল। কিন্তু মানুষ আর উদ্ভিদের পারস্পরিক সহাবস্থানের ফলে ঐসব দূষিত পদার্থ মনুষ্য জাতির কেশস্পর্শ করতে পারে নি। কৃষিবিজ্ঞানীরা দেখেছেন গাছ তার পাতার অসংখ্য রন্ধ্র দিয়ে ঐসব দূষিত গ্যাস আর ক্ষতিকর সূক্ষ্ম ধূলিকণা দেহের মধ্যে আত্মসাৎ করে এবং কোষের মধ্যে জটিল বিপাক-ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে। সেই সঙ্গে কিছু কিছু ভাসমান ধূলিকণা গাছের পাতাকে অবলম্বন করে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয় এবং ভারী হয়ে ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল পরিবেশবিজ্ঞানীরা দেখেছেন বাতাসে যত দূষিত পদার্থ আছে তার প্রায় 40% ঐ ভাসমান সূক্ষ্ম ধূলিকণা।

এখন যদি আমরা একটি মাঝারি ধরণের গাছের কথা চিন্তা করি; তার সমস্ত পাতার (উপর ও নীচের উভয় তল) মোট ক্ষেত্রফল হবে প্রায় ·1 বর্গ কিলোমিটার। সুতরাং একবার চিন্তা কর তো ঐ গাছটি কত পরিমাণ বিষপান করে পরিবেশকে মাতৃস্নেহে আগলে রেখেছে!

বিভিন্ন কলকারখানা, যন্ত্র, লাউডস্পীকার, যানবাহন প্রভৃতি থেকে ক্রমাগত শব্দের সৃষ্টি হচ্ছে, এই শব্দ মানুষকে এনে দেয় বধিরতা, আনে নানা ধরণের স্নায়বিক রোগ, হৃদরোগ। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন এই সব শব্দের অনেকটাই গাছে প্রতিফলিত হয়ে নষ্ট হয়ে যায় এবং শব্দের কম্পাঙ্ক অনেকাংশে কমে যায়। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে গাছ কেটে পরোক্ষভাবে আমরা শব্দ দূষণের মাত্রা বাড়িয়ে তুলছি এবং পর্যাপ্ত বৃক্ষরোপণ দ্বারাই অভিশপ্ত শব্দ দূষণের হাত থেকে আত্মরক্ষা করা যায়।

বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন গোটা হিমালয় পর্বতমালার উচ্চতা ধীরে ধীরে কমে আসছে, ক্ষয়ে যাচ্ছে তার শরীর। বহুমুখী আক্রমণের চাপে ক্রমশ বিধ্বস্ত হচ্ছে। জনপদ গড়ে তোলা, ডিনামাইট দিয়ে পাথর ফাটিয়ে রাস্তা তৈরি করা, এছাড়াও আছে হিমালয়ের বুক থেকে সরিয়ে ফেলা গাছপালা যা তাকে ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে। এই হিমালয়ের উপর নির্ভর করে আছে গাঙ্গেয় ভূমির 58 কোটি মানুষ। সুতরাং হিমালয়কে বাঁচানোর জন্য চাই সবুজ অরণ্যানী যা তাকে বৃষ্টির হাত থেকে, ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবে। সমতলের লোকজন এর জন্য মূলত দায়ী করছেন পাহাড়ীদের; কেননা তারা বন কেটে সাফ করছে। এই ধ্বংসের জন্য সরকারী অনুমতিপ্রাপ্ত ঠিকাদার, ব্যবসাদারসহ বেআইনী চোরাকারবারীরাই দায়ী, দরিদ্র আদিবাসীরা নয়।

কলকারখানায় ধূম্রোৎপাদ সম্পর্কে সরকারী ব্যবস্থা

অমরেশ মান্না*

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে মানুষ তার আহার, বাসস্থান, পোষাক-আশাক, সবই পরিবর্তন করেছে, এক কথায় তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ বদল করেছে। আলোচ্য প্রসঙ্গ পরিবেশ, পশ্চিমবাংলার বায়ু। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হয় প্রাণীজগৎ যে বায়ু সমুদ্রে নিমজ্জিত তা জীবকুলের পক্ষে উপযোগী করে রাখার জন্য 1905 খৃস্টাব্দে স্মোক নুইসেন্স দপ্তরের কলেবর 1978 খৃস্টাব্দে আরও বৃদ্ধি ও ক্ষমতাশালী করা হয়। যার ফলে আজ কোন কলকারখানা গড়ে ওঠার আগে তাকে স্মোক নুইসেন্স-এর অনুমতির জন্য অপেক্ষা করতে হয়। শিল্পপতির আবেদনে এই দপ্তরের পরিদর্শক শিল্প প্রতিষ্ঠানে যান এবং তাদের প্রাথমিক কাজ শিল্পগুলি কোন ধূম্র জঞ্জাল বাতাসে মিশিয়ে দিচ্ছে বা দিতে পারে কিনা তা দেখা, যদি দেখেন ধূম্র বিষোদগার হতে পারে বা হচ্ছে তখন তাকে বলা হয় বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করতে। সর্বোপরি প্রয়োজন মত দীর্ঘচোঙ তৈরি করতে যার দ্বারা এই ধূম্রবিষ বাতাসের মিশ্রণে লঘু হতে লঘুতর অবস্থায় পৃথিবীর বুকে নেমে আসে। আবার কখনও বা বিশেষ ধরণের শোষকের ভিতর দিয়ে পাঠিয়ে, কখনও বা পুনঃদহন-ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রায় দূষণ ক্ষমতাহীন অবস্থায় বাতাসে ছেড়ে দেওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়। সমস্ত ক্ষেত্রে শিল্পপতিরা এই উপদেশ মেনে নেন তা নয়, এই দপ্তরের বিধি অনুযায়ী অবাধ্য শিল্পপতিদের জরিমানা, জেল, এমনকি কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার ক্ষমতা আছে। আবার পরিবেশ সচেতক নাগরিকের আবেদনক্রমে এই দপ্তর ঐ অঞ্চলের সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন। এই দপ্তর শুধুমাত্র মালিক শ্রেণীর কথায় অন্ধবিশ্বাস না করে অধুনা তীব্র সংবেদনশীল যন্ত্রপুষ্ট পরীক্ষাগার স্থাপন করেছেন, যার দ্বারা বিভিন্ন কারখানা বায়ুদূষক গ্যাসের ঘনত্ব পরিমাপ করা হয় এবং এই পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দপ্তরে নির্দেশ দেওয়া হয়।

সমীক্ষায় দেখা গেছে মোট দূষণের ত্রিশভাগ করে কল-

* ধূম্রোৎপাদ আযোগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কারখানা ; 10 ভাগ করে গাড়ী, বাকী 60 ভাগ করে সাধারণ মানুষ তার নিত্য প্রয়োজনে। সমীক্ষায় আরও দেখা গেছে বায়ু দূষণে 10 বৎসরের কম ও 50 বৎসরের বেশী বয়স্ক মানুষ বেশী অসুবিধায় পড়েন। বিশেষ করে শীতকালে যখন ভূপৃষ্ঠের বায়ুর তাপমাত্রা কম থাকে।

কিন্তু উপরিউক্ত মোট দূষণের 40 ভাগ দেখার দায়-দায়িত্ব এই দপ্তরের, বাকি 60 ভাগ রোধের দায়িত্ব সাধারণ মানুষের।

বায়ু দূষণ সমস্যার গুরুত্ব এখনও পর্যন্ত আমরা আমাদের হাজার সামাজিক সমস্যার মধ্যে হিসাব করি না। এটা পরিতাপের বিষয়। কিন্তু আমরা সমস্ত পরিবেশ সচেতন মানুষ জানি দূষিত বায়ু সেবনের ফলে ধীর পদক্ষেপে অথচ নিশ্চিতভাবেই দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হব যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মৃত্যু। ঠিক সেই কারণে এই দপ্তর কোন প্রকার কালবিলম্ব বরদাস্ত করেন না। কারণ তারা জানেন বা জনসাধারণের স্মৃতিপটে আজও বিলীন হয় নি সেই মর্মান্তিক বীভৎস ঘটনাবলী যার অপর একমাত্র মূল নায়ক ছিল বায়ু দূষণ।

1880 খৃস্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত বহুবার বিক্ষিপ্ত ভাবে পৃথিবীর মানুষ যার শিকার হয়েছে। মনে পড়ে 1952 খৃস্টাব্দে লণ্ডন শহরকে ধোঁয়াসার জালে আবদ্ধ রেখেছিল দীর্ঘ 4-5 দিন, যার পরিণতিতে 4 হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়ে ছিলেন। নিউইয়র্ক শহর আক্রান্ত হয়েছে, কম করে তিন বার, সুইডেনে অম্লবৃষ্টি হয়েছে, তারমধ্যে অনেক ক্ষেত্রে পরিমাপ করা সম্ভব না হলেও অন্তত 1952 খৃস্টাব্দে লণ্ডনের দুর্ঘটনার সময় ধোঁয়াসার মধ্যে সালফার ডাইঅক্সাইড বিষের পরিমাণ ছিল ·28 পি. পি. এম। এই সব ঘটনার কথা স্মরণ রেখে স্মোক নুইসেন্স দপ্তর খুবই আত্মসচেতন, কারণ তারা জানেন ভারতবর্ষে বায়ু দূষণের ক্ষেত্রে সবার পুরভাগে কলিকাতা মহানগরী—গুণীজনের ভাষায়, মাছ দূষিত জলে থাকলে যে অবস্থা হয় আমরা সে রকম দূষিত বায়ুতে ডুবে আছি এবং যার স্রষ্টা এই মানবকুল, তাই দার্শনিকের কথায়—আমরাই আমাদের শত্রু।

এই সমস্যার সমাধান করা এই দপ্তরের একার পক্ষে সম্ভব নয়, তারা তাদের দায়িত্ব ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে মিলিয়ে করে চলেছেন। তাদের আহ্বান পরিবেশ সচেতন সাধারণ মানুষের কাছে, তাঁরা যেন বায়ু দূষণ প্রতিরোধের অব্যর্থ ঔষধ বৃক্ষকুলকে অর্থাৎ বনজসম্পদকে যত্নসহকারে পালন করেন, তাহলে মানবকুল মূল রোগের অন্তত 80 ভাগ নিরাময়ের নিশ্চিত পথ পাবে।

পরিশেষে কবির কথায় বলা যায়—একজন অভিজ্ঞ মালী কখনই তার বাগানের ঝরাপাতাগুলিকে পুড়িয়ে ফেলবে না, কারণ সে জানে গাছের ঝরে যাওয়া পাতাগুলিকে না জ্বালিয়ে একটা চৌবাচ্চায় জমা করে উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি করলে সেই পাতাগুলি পরে ঐ গাছেরই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যের রূপ নেবে।

এপ্রিল '84 সংখ্যার 'ভেবে উত্তর দাও'-র উত্তর

1. (খ) ফাইব্রিনোজেন, 2. (গ) পিরানহা 3. (খ) মৎস্য, 4. (ক) B_6, 5. (খ) স্বর্ণলতা 6. (গ) কচ্ছপ।

উত্তরদাতাদের নাম

সব ঠিক—বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, কলিকাতা-31, চিত্তরঞ্জন সেনাপতি, মেদিনীপুর, দেবাশীষ ও সৌমেন মণ্ডল, 24 পরগণা, গুরুদাস চক্রবর্তী, হাওড়া, কমল ভট্টাচার্য 24 পরগণা, দুলাল গঙ্গোপাধ্যায়, হাওড়া-6, পার্থ গঙ্গোপাধ্যায়, হুগলী, প্রশান্ত, সুশান্ত ও চিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গাপুর-4, উজ্জ্বল, মাতঙ্গিনী, অহীন, তারক, হেমাঙ্গিনী, চঞ্চল, নীতিশ, সঞ্জীব কুণ্ডু, হুগলী, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, রূপালী ব্যানার্জী, কোন্নগর, সুজিত মুখোপাধ্যায়, কলি-42, চম্পা দে, 24 পরগণা, রঞ্জিত ও মৌসুমী ঘোষ, নন্দিনী গোস্বামী, হুগলী, গোপাল, অনিমেষ দাস, বর্ধমান, তাপস কান্তি দাস, মেদিনীপুর, প্রণীত মুখার্জী, কলি-9, দেবজ্যোতি, সর্বাণী, দীপক, ছন্দা, মহুলী, ধ্রুবজ্যোতি সাউটা, আশিস নন্দী মুর্শিদাবাদ, খগেন্দু মাইতি, মেদিনীপুর, সুভজিত মিত্র মজুমদার, কলি-32, দেবব্রত, বিষ্ণুপ্রিয়, শিবশঙ্কর বাঁকুড়া, শান্তনু গাঙ্গুলী, সুতনু ব্যানার্জী, অপস চ্যাটার্জী বর্ধমান।

1টা বাদে—পবিত্র গাঙ্গুলী, হাওড়া-4, রমেন মল্লিক, বর্ধমান, কৃষ্ণেন্দু, দিব্যেন্দু, শীর্ষেন্দু, শুভেন্দু, অমিতা, অমিষ্ঠ, শম্পা মাইতি, কলি-29, মহাদেব পাণ্ডত, বর্ধমান, অভিষেক পোদ্দার, কলি-6, জয়দীপ, জয়মালা, রত্নদীপ, রত্নমালা কুইলা, বিশ্বজিৎ মিত্র ও শিলাদিত্য চক্রবর্তী, মেদিনীপুর, হিমাদ্রী দাশ, অমিতাভ, সুকুমার দাশ, 24 পরগণা, অমিতাভ পাথিরা, প্রতাপচন্দ্র পাত্র, চঞ্চল রায়, সুদীপ্ত মণ্ডল, মেদিনীপুর, সমর রায়, কলি-2, মমতা, অপর্ণা, সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, হাওড়া-3, রবীন্দ্রনাথ রায়, বর্ধমান, কমলকৃষ্ণ ঘরামী, 24 পরগণা, অশোকা, জুলিকা, তামস, সুব্রতা, হুগলী, সুরজিৎ; ডলি দাশ, মজনু মৈত্র; মুর্শিদাবাদ মহুয়া; অরিজিৎ; সৌম্যজিৎ মাইতি; গৌর জানা; মেদিনীপুর।

এপ্রিল '84 সংখ্যার 'শব্দ-শৃঙ্খলে'র সমাধান

■	ডা	■	ম	নো	ট্রে	পা	■
থা	ই	মা	স	■	■	ই	ষ্ট
ই	ন	■	■	নি	ও	ন	■
র	■	■	■	■	■	■	নি
য়ে	■	আ	■	এ	না	মে	ল
ড	লা	র	■	ডি	■	■	য়
■	■	শো	ল	স	■	আ	■
ম্যা	ক্সি	লা	■	ন	ব	ম	■

পাশাপাশি—(2) মনোট্রেপা; (3) থাইমাস; (4) ইন, (5) নিওন; (7) ইস্ট; (8) ডলার, (10) এনামেল; (12) শোলস; (13) ম্যাক্সিলা; (14) [ক্লোরিন] নবম।

উপর-নীচ—(1) ডাইন, (2) মস, (3) থাইরয়েড, (6) পাইন, (9) আরশোলা, (10) এডিসন, (11) নিলয় (15) আম।

এপ্রিল '84 সংখ্যার 'শব্দ-শৃঙ্খলে'র সমাধানকারীদের নাম—

সব ঠিক—গুরুদাস চক্রবর্তী, হাওড়া, রূপালী ব্যানার্জী কোন্নগর, অনিমেষ দাস, বর্ধমান, তুহিন বোরাল, কলি-35, কাবেরী সাহা, কলি 55, সুরজিত দাস, ডলি দাস, মঙ্গলা মৈত্র, মুর্শিদাবাদ, সেখ মোবারক আলী, হুগলী, তরুণকুমার রায়, হাওড়া, সঞ্জয়, সুভাশীষ শীল, কল্লোল ঘোষ, চম্পা দে, হুগলী, মাধুরী, অঞ্জলি, মমতা চট্টোপাধ্যায়, হাওড়া-3, শান্তনু গাঙ্গুলী, সুতনু ব্যানার্জী, তাপস চ্যাটার্জী বর্ধমান, কমল ভট্টাচার্য, 24-পরগণা, জয়ন্ত দাস, শীর্ষেন্দু, দিব্যেন্দু রায়, হুগলী।

1টা বাদ—দেবাশিস মজুমদার, 24-পরগণা উজ্জল, মাতঙ্গিনী, মৃণাল, উৎপল কুণ্ডু. আশীষ নায়ক, চিণ্ময় খাঁ, হুগলী, সুজিষ্ণু মুখোপাধ্যায়, কলি-42, অমিতাভ, সুকুমার দাস, সুদীপ্ত মণ্ডল, 24 পরগণা, ঋতেন্দু মাইতি, মেদিনীপুর, প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুল সাহা, বীরভূম, শুভজিত মিত্র মজুমদার, কলি-32, সর্বানী, দেবজ্যোতি, দীপক, ছন্দা, ষড়ঙ্গী, মেদিনীপুর, শেখর সিংহরায়, তাপস, সুব্রতা, তুলিকা, অশোকা, হুগলী, সৌম্যশুভ্র ঘোষাল, সুবীর বোস, কলি-4, মহুয়া, অরিজিৎ, সৌম্যজিত মাইতি, গৌর জানা, সুপ্রিয়া মণ্ডল, মেদিনীপুর।

ধাঁধা

প্রজেশকুমার মল্লিক*

নীচের ভাগ অঙ্ক দুটির ভাজ্য কত? (একটি অক্ষর / সংযুক্ত অক্ষর দিয়ে সব সময়ই একটি মাত্র অঙ্ক বোঝানো হয়েছে।) ["ক"<"বি"]

প্রথম

```
--)-----(--ন
    --
  ─────────

      -ন-
      -ন-
```

দ্বিতীয় → "ক"<"বি"

```
)-----(
  --
───────

 ক - বি
 বি বি বি
```

[সমাধান 216 পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

*5, মহেশ্বরাম্মা টেম্পল স্ট্রীট, মুনি রেড্ডি, বাঙ্গালোর-560006

ধাঁধার সমাধান (1ম ভাগ)

(1) 'জ্ঞা'-এর মান যাই হোক না কেন 'জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা' 111 অথবা 222 দ্বারা বিভাজ্য হতে বাধ্য। অতএব ভাজক নিশ্চয়ই 111 অথবা 222 এর দুই সংখ্যার কোন উৎপাদক অর্থাৎ '37' অথবা '74'

(2) 'ন'-এর কোন মানের জন্যই (74×'ন')=(— ন —) হয় না। (37×'ন')=(— ন —) হতে পারে একমাত্র 'ন'=4 হলে। ∴ ভাজক=37 এবং 'ন'=4

(3) প্রথম বিয়োগের রূপ (Pattern) থেকে বোঝা যাবে ভাগফলের প্রথম সংখ্যা '2', ∴ বিয়োগ করা হয়েছে 74 (37×2)। অতএব 'জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা-এর উপরের সংখ্যাটি অন্তত পক্ষে '260'।

(4) ভাজক '37' হলে 'জ্ঞা' '3'-এর বেশী হতে পারে না। '1' হলে বিয়োগ ফল (কম পক্ষে 260—111) তিন অঙ্কের সংখ্যা হয়ে যায়; '2' হলে 'ন'-এর মনে মেলানো সম্ভব হয় না [সূত্র (2)] ∴ জ্ঞা=3, অন্য অঙ্কগুলি সহজেই বের করা যাবে।

*** (1) সূত্র মেনে '37' এবং '74'-এর নামতা সামনে রাখলে দ্বিতীয় ভাগটির সমাধান সহজেই হবে। (ভাজক=74 এবং ভাগফল=149)।

পরিষদ সংবাদ

লোকরঞ্জক বক্তৃতা

বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে 26.4.84 তারিখে ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল 'ব্যবহারিক অপরাধ বিজ্ঞান' শীর্ষক লোকরঞ্জক বক্তৃতা প্রদান করেন এবং বক্তৃতা শেষে দ্বিতীয় কোর্সের টি. ভি-প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সকল শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

আন্ত্রিক রোগ সম্বন্ধে আলোচনা সভা

বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে 5.5.84 তারিখ আন্ত্রিক রোগ সম্বন্ধে একটি আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়, এতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ অংশ গ্রহণ করেন।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মূর্তি নির্মাণ তহবিলে চাঁদাদাতাদের তালিকা

নাম	টাকা
শ্রীসূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র, কলিকাতা	51·00
" দেবাশীষ বসু, কলিকাতা	15·00
" দয়ানন্দ সেন, কলিকাতা	15·00
" রত্নেশ্বর সেনগুপ্ত, কলিকাতা	10·00
" বিদ্যুৎ গুপ্ত, কলিকাতা	10·00
" বিশ্বনাথ সরকার, কলিকাতা	10·00
" সুকুমার দাশ, কলিকাতা	10·00
" অশোক বসু, কলিকাতা	10·00
" গণেশ পারিয়া, কলিকাতা	10·00
" শিখরেন্দু চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা	10·00
" অসিত ঘোষ, কলিকাতা	10·00
" মুরারী সেন, কলিকাতা	10·00
" গোকুলগোবিন্দ বিশ্বাস, কলিকাতা	10·00
" সুরদীপ দত্ত, কলিকাতা	10·00
" আদিনাথ বসু, কলিকাতা	10·00
" অমর নাথ ভড়, কলিকাতা	10·00
" ভূপেন্দ্র নাথ সান্যাল, কলিকাতা	10·00
" রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, কলিকাতা	10·00
" রামতনু দাশ, কলিকাতা	10·00
" দেবব্রত পাণ্ডা, কলিকাতা	10·00
শ্রী ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা	10·00
" সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, কলিকাতা	10·00
" সলিল চৌধুরী, কলিকাতা	10·00
" অচিন্ত্যপ্রিয় ভট্টাচার্য, কলিকাতা	10·00
" বসন্ত কুমার ঘড়া, কলিকাতা	10·00
" রামনাথ তেওয়ারী, কলিকাতা	10·00
" মোহিত চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা	10·00
" দেবব্রত ভট্টাচার্য, কলিকাতা	10·00
" শচীদুলাল দে, কলিকাতা	10·00
" পুরুষোত্তম চক্রবর্তী, কলিকাতা	10·00
" মিহির কুমার চক্রবর্তী, কলিকাতা	10·00
" দেবব্রত ঘোষ, কলিকাতা	10·00
" সমীর সরকার, কলিকাতা	10·00
" নিত্যরঞ্জন দাস, কলিকাতা	10·00
" সুজিত দে, হুগলী	5·00
" সুশান্ত কুমার গুহ, কলিকাতা	5·00
" নিরঞ্জন দাস, কলিকাতা	5·00
" সুবীর রায়, কলিকাতা	5·00
" নির্মল কুমার মজুমদার, কলিকাতা	5·00
" তাপসী চক্রবর্তী, কলিকাতা	5·00

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক প্রথম ষাণ্মাসিক বিষয়সূচী

জানুয়ারী থেকে জুন—1984

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক প্রথম ষাণ্মাসিক লেখকসূচী

জানুয়ারী থেকে জুন 1984

॥ বৃক্ষরোপণ ॥

বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন গাছই বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন জমিয়েছে। তাই গাছের অনেক পরে প্রাণী ও তারও ঢের পরে মানুষ এসেছে এই পৃথিবীতে।

আজ শহরগুলোতে অক্সিজেনের বড় অভাব পড়েছে। কলকারখানা, উনুন, মোটর গাড়ি ইত্যাদির ধোঁয়ায় শহরের মানুষ প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারে না। শ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে ঢুকছে কার্বনডায়োক্সাইড, বিভিন্ন ক্ষতিকারক গ্যাস ও নানান রাসায়নিক যৌগ। এর প্রতিকার কি? শহর থেকে বাস, মোটর, কলকারখানা তো তুলে দেওয়া যায় না। তবে? বায়ুমণ্ডলের বিষপান করে বিশুদ্ধ অক্সিজেন দিতে পারে একমাত্র গাছ, তাই আমাদের গাছ লাগাতে হবে। এবছর গোটা জুলাই মাসটা ধরেই বৃক্ষরোপণ উৎসব চললো কলকাতা ও কলকাতার শহরতলী জুড়ে। শুধু শহরতলীই নয়, গোটা রাজ্য জুড়েই সারা পড়ে গিয়েছিল বনসৃজনের, বৃক্ষরোপণের। রাজ্যের পৌরদপ্তর, সি, এম, ডি, এ, বনসৃজন দপ্তর, পরিবেশ দপ্তর, শিক্ষা বিভাগ ও বিভিন্ন সংস্থাগুলি মিলে এবছর বর্ষায় বহু সংখ্যক গাছ লাগিয়েছেন। তোমরাও নিশ্চয়ই এই উৎসবে যোগ দিয়েছো। তবে গাছ লাগানোর ব্যাপারে আর একটা কথা মনে রাখতে হবে। শুধু লাগালেই হবে না। তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও কিন্তু নিতে হবে নিজে। বেড়া দিতে হবে। আগামী প্রখর গ্রীষ্মে জল দিতে হবে। পোকা মাকড়, গরু ছাগল বা দুষ্টু বাচ্চাদের হাত থেকে গাছ বাঁচানোর দায়িত্ব নিতে হবে। আমাদের পৌরমন্ত্রী এবার চীনদেশে গিয়েছিলেন। সেদেশে প্রত্যেকটি মানুষ পাঁচটি করে গাছ লাগান। তোমরা কটা করে গাছ লাগিয়েছো? তার মধ্যে কটা গাছ বাঁচলো? জানতো গাছেরা খুব সংবেদনশীল হয়। যে লোক গাছকে যত্ন করে, সে কাছে গেলে গাছ ভাল থাকে। কিন্তু যে শুধু অকারণে গাছের পাতা ছেঁড়ে, ফুল ছেঁড়ে, ডাল ভাঙ্গে, সে কাছে গেলেই গাছ ভয়ে কাঁপতে থাকে। গাছকে না ভাল বাসলে গাছ বাঁচে না বা বড় হয় না। এগুলি সবই বৈজ্ঞানিক সত্য। আমাদের দেশে গাছকে মানুষের সঙ্গী সাথীর মত মনে করা হতো। তুলসী, বট, অশ্বত্থ ইত্যাদি গাছকে পুজো করারও প্রথা ছিল। এগুলো সব আমাদের দেশের মানুষের বৃক্ষ প্রীতিরই পরিচায়ক।

(জনসংযোগ বিভাগ, সি, এম, ডি, এ, ৩এ, অকল্যান্ড প্লেস, কলকাতা-১৭ থেকে প্রচারিত)

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জুলাই-অগাস্ট, 1984

37তম বর্ষ, সপ্তম-অষ্টম সংখ্যা

বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের অনুশীলন করে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও সমাজকে বিজ্ঞান-সচেতন করা এবং সমাজের কল্যাণকল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করা পরিষদের উদ্দেশ্য।

বিষয় সূচী

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : 30·00

মূল্য : 4·00

যোগাযোগের ঠিকানা :

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা-700006
ফোন : 55-0660

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সপ্তত্রিংশত্তম বর্ষ | জুলাই-অগাস্ট, ১৯৮৪ | সপ্তম ও অষ্টম সংখ্যা

নৈতিকতার অভাবই অনগ্রসরতার প্রধান কারণ

গুণধর বর্মন

বিজ্ঞানের অবদানেই মানবসভ্যতার তথা মানবতার ক্রমবিকাশ। প্রায়-বানরগোষ্ঠীর প্রাক্-মানব ও আদিমানব প্রজাতি যখন গাছের ডাল, পাথর, হাড় প্রভৃতিকে হাতিয়ার করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে ও পরে আগুনের ব্যবহার, কুটির নির্মাণ, কৃষি প্রভৃতি শিখে ক্রমোন্নত জীবনধারায় সভ্যতার সূচনা করে তার প্রত্যেক স্তরেই তাকে ভাবতে হয়েছে কেমন করে তার হাতিয়ার ও আনুষঙ্গিক কর্মধারাকে আরও উন্নত করা যায়। গাছের ডাল থেকে কেমন করে ভাল লাঠি বা পরিবহনের সরঞ্জাম বানান যায়, পাথরকে কেমন ধারালো ও সূচালো অস্ত্রে পরিণত করা যায়, আগুন কেমন করে ইচ্ছামত তৈরি করা যায় ও তাকে বিভিন্ন কাজে লাগান যায় ইত্যাদি বিষয়গুলি সুনিশ্চিতভাবে বিজ্ঞানমনস্কতা ও আদিম বিজ্ঞানের কাজ। আর সেই থেকেই সভ্যতার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ। তার আগে সভ্যতা-সংস্কৃতির কোন অস্তিত্ব নাই। তাই গবেষণা-ঘরে বসে পদার্থ ও ভৌত শক্তি সমূহের উৎপত্তি, বিনাশ বা তাদের রূপান্তরের চর্চাই শুধু বিজ্ঞান নয়, মানুষের সমগ্র জীবনমানকে নিরাপদ ও সমৃদ্ধ করে তাকে আরও উন্নত স্তরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাই বিজ্ঞানের কাজ। সুতরাং মানুষের সামগ্রিক চিন্তা ও বুদ্ধিকে পশুবৎ আবেগের উত্তেজনা এবং অজ্ঞতাজনিত অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত করে তার যাবতীয় কর্মধারাকে ভ্রান্তিমুক্ত সঠিকপথে চালনার পদ্ধতি ও প্রয়াসই হচ্ছে প্রকৃত বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানচর্চা। এই চর্চার মূল লক্ষ্য তাই একদিকে অজানা বিশ্ব-প্রকৃতিকে জানার চেষ্টা, অন্যদিকে সেই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সমগ্র জীব ও জগতের যথাযথ রক্ষা, তার কল্যাণ সাধন ও জীবনকে উন্নতমানে নিয়ে যাওয়া। শুদ্ধ তাত্ত্বিক চর্চায় অনেক সময় তাৎক্ষণিক ব্যবহারিক ফল হয়তো পাওয়া যায় না তবে তাতে যে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের অনুভূতি ও সত্যানুসন্ধানের প্রেরণা থাকে কালক্রমে তাই হয় বিজ্ঞান প্রসারের সহায়ক ও উন্নত জীবনমানের দিশারী। এখানে অবশ্যই মনে রাখতে হবে এই বিজ্ঞানচর্চা মানুষের সমগ্র মননশীলতার একটি বিশিষ্ট অংশমাত্র, তবে এটি সেই মননশীলতার শক্তিশালী প্রকরণ। এরই বলে আদিম মানুষ অন্য পশু থেকে পৃথক হয়ে সর্বোন্নত জীবে পরিণত হয়েছে। সাধারণ পশু কেবলমাত্র বাঁচার চেষ্টাই করে ও জানে। সেই কাজের সবটাই তার জন্মগতভাবে নিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তিসমূহের (Genetically conditioned instincts) দ্বারা পরিচালিত, তাতে তার বিশেষ চিন্তার কোন ছাপ থাকে না। খাদ্যসংগ্রহ, বংশবিস্তার ও আঞ্চলিক অধিকার বা বাসস্থানের ব্যবস্থাই তাদের একমাত্র করণীয়। এতে ভালমন্দ প্রশ্ন নেই, ভূত-ভবিষ্যতের ভাবনা নেই। তাৎক্ষণিক প্রয়োজনেই সবকিছু করে। পরে কি হবে তার জন্য পশুদের মাথাব্যথা নেই। এইখানেই মানুষের বৈশিষ্ট্য। কাজ করতে গেলে মানুষকে ভাবতে হয়। অবশ্য একই ধরণের কাজ অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। তবে শুধুমাত্র প্রবৃত্তির তাড়নায় সে সবকিছু করে না। জন্মগতভাবে তার ভাবার ক্ষমতা রয়েছে। প্রত্যেক কাজের পিছনে তার বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি দিয়ে সে ভাল মন্দ বিচার করে। সেই তার মননশীলতা। তারই বলে জন্মগত প্রবৃত্তির তাড়নাকে সে সংযত করতে পারে। ক্রমাগত সেই অভ্যাস তার চরিত্রের স্থায়ীগুণ বা ধর্ম হয়ে দাঁড়ায়। গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে—সেই আদিমকাল থেকেই প্রত্যেক সমাজে এই ভাল আর মন্দের নির্দিষ্ট রূপরেখা ও তার বিশেষ মান বা মূল্যবোধ ঠিক করা হয়। আর তাই দিয়ে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়দায়িত্ব এবং কর্তব্য নির্ধারিত হয়। একেই বলে নৈতিকতা ও কর্তব্যজ্ঞান। সমাজের সবাইকে বাল্যকাল থেকেই সেই নীতিবোধ ও কর্তব্যের কথা শেখান হয় এবং তা মেনে চলতে বাধ্য করা হয়। যে তা করে না তাকে সমাজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। সবাই তখন তাকে ঘৃণার চোখে দেখে। এই নীতিবোধ ও কর্তব্যজ্ঞানই মানুষকে মানুষ করেছে। এর অভাবে সে দ্বিপদচারী পশুমাত্র।

পরবর্তীকালে এই নীতিবোধ থেকেই আইন-শৃঙ্খলা এবং

সমাজে পারস্পরিক আচরণের বিধিবিধান তৈরি হয়েছে। তার থেকেই ক্রমোন্নত সভ্যতা-সংস্কৃতি ও উন্নত রাষ্ট্রব্যবস্থার উৎপত্তি। অন্য কথায় সভ্যতা-সংস্কৃতির মূল নিয়ামক শক্তিই হচ্ছে এই নীতিজ্ঞান। বিজ্ঞানের যথার্থ উন্নতি এবং প্রসারেও এই নৈতিকতার গুরুত্বই সমধিক। এই নীতিবোধ বাদ দিয়ে কোন সমাজের যথার্থ উন্নতি সম্ভব নয়। বিপরীত ভাবে কোন উন্নত সমাজে সামগ্রিক নীতিবোধের মান ও মূল্যায়ন হ্রাস হলে সেই সমাজের বা দেশের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী।

বর্তমানে উন্নত দেশ বলতে সহজেই বোঝায় সেটি বিজ্ঞানোন্নত দেশ এবং স্বাভাবিক ভাবে সভ্যতা-সংস্কৃতিতেও তারা উন্নত। সেসব দেশের উন্নতির মূলে রয়েছে সারা দেশ জুড়ে বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ এবং তাকে কাজে লাগানর চেষ্টা। দেশের পরিচালক ও চিন্তাবিদগণ দেশে বিজ্ঞানের চিন্তা ও চর্চাকে ব্যাপক ও উন্নত করার জন্য সবাই আন্তরিকভাবে সচেষ্ট। শুধু বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্মী নয়, সাধারণ বুদ্ধিজীবীদের বৃহত্তর অংশ সেই কাজে যথাসাধ্য সাহায্য করে। আর দেশনেতাগণ তাঁদের মতামত ও সাহায্যকে যথার্থ গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করে ও কাজে লাগায়। বিজ্ঞানীদের কাজে অবাঞ্ছিত বাধা যাতে না আসে তার উপযুক্ত পরিবেশ সবাই মিলে তৈরি করে। এই কাজে সম্মিলিত নৈতিক মান অতি উচ্চ স্তরের। পরস্পরের সাহায্যের জন্য সবাই আন্তরিকভাবে প্রস্তুত। পদে পদে সন্দেহ ও দুর্নীতির দাপট সেখানে নেই। সহযোগিতার মাধ্যমে গুণগত উৎকর্ষের যে প্রতিযোগিতা রয়েছে, তাতে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বা সংকীর্ণ দলবাজির স্থান নেই। তাই তারা দ্রুত বিজ্ঞানে উন্নত।

আর অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ মানেই সেসব দেশ বিজ্ঞান-চর্চায় অনগ্রসর, তাদের অনেকের প্রাকৃতিক সম্পদ-প্রাচুর্য থাকলেও যথার্থ বিজ্ঞান-মানস ও বিজ্ঞানচর্চার অভাবে সেগুলি যথাযথ কাজে লাগান হয় না অথবা তার বেশীর ভাগই অজ্ঞতা ও অযত্নে নষ্ট করেই ফেলা হচ্ছে। এদেশের নেতাগণ রাজনীতির দলবাজি এবং গোষ্ঠী প্রাধান্যের চেষ্টায় যত মত্ত, দেশে বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রয়োগ ও প্রসারে তাঁরা সেরকম আগ্রহ ও নিষ্ঠা দেখান না, বা এই কাজে সবার মিলিত আন্তরিক প্রচেষ্টা কোথাও দেখা যায় না। নেতাদের অধিকাংশের মধ্যে বিজ্ঞানচেতনার একান্তই অভাব। তাঁদের বিজ্ঞানের জ্ঞান শুধু পরীক্ষায় পাশ বা বক্তৃতা করার জন্যই কোন রকম নোট মুখস্থ করা বিদ্যা অথবা অপরের কাছ থেকে লিখে নিয়ে কিছু বুলি আওড়ান ছাড়া আর কিছুই না। বিজ্ঞানের সুস্পষ্ট ধারণা ও অনুভূতি বলতে তাঁদের কিছুই নাই। বর্তমান দুনিয়ায় বিজ্ঞানের যে অভাবনীয় উন্নতি ও ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে সে বিষয়ে অনুন্নত দেশের বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান-কর্মীদেরও অধিকাংশই যথাযথ খোঁজ রাখেন না। বিজ্ঞানের এক শাখার লোক অন্য শাখা সম্পর্কে প্রায় অজ্ঞ। আর ল্যাবরেটরী বা বিভাগীয় কাজকর্মের বাইরে এসে তাঁরা এমন বিজ্ঞানবিরোধী অন্ধবিশ্বাস সংস্কারের কাজ করে চলেন তাতে তাঁদের ভিতরে যে যথার্থ বিজ্ঞান-চেতনার একান্তই অভাব তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। সেই জন্যই এইসব দেশে প্রকৃত বিজ্ঞান-চর্চা ও বিজ্ঞান প্রসারের উপযুক্ত পরিবেশই গড়ে উঠছে না। তা হলে সে দেশের দ্রুত উন্নতি কি করে সম্ভব ?

সবচেয়ে মারাত্মক পরিস্থিতি হচ্ছে এই সব দেশে সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিচালন-কর্তৃত্ব যাঁদের হাতে তাঁরা মুখে যা বলেন কাজে তা করেন না,—তাঁদের ঘোষিত নীতি ও আদর্শের সঙ্গে বাস্তব কাজের মিল খুঁজে পাওয়া ভার। তাঁদের এই ত্রুটি ও অযোগ্যতা ঢাকবার জন্যই তাঁরা অপরের ত্রুটি নিয়ে অপপ্রচার ও কুৎসা রটনায় এমন মেতে ওঠেন যে ভাল কাজ করার সময় আর পান না। নীতি থেকে বিচ্যুতি যে দুর্নীতি, কথায় ও কাজে মিল না থাকা যে চরিত্রহীনতা, শুধু চালাকির দ্বারা যে মহৎ কাজ হয় না—এসব অনুভূতি ঐ নেতাদের মন থেকে যেন লুপ্ত হয়ে গেছে। উন্নত দেশের সাধারণ মানুষও তাদের কথার মর্যাদা রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে, যে যার কর্তব্য পালনে কখনও অবহেলা করে না,—কোন কাজে তারা ফাঁকি দেয় না। তাদের উন্নতির মূল চাবিকাঠি এইখানেই।

নীতিহীন, আদর্শচ্যুত, স্বার্থপর নেতাদের কাজকর্মের বিষক্রিয়া সারা দেশের বৃহত্তর জনসমাজে সহজে ছড়িয়ে পড়ে। জনসাধারণের মনে ন্যায়-অন্যায়বোধ, পারস্পরিক কর্তব্য ও সুস্থ মানবতার অনুভূতিগুলি নষ্ট হয়ে যায়। সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতি প্রবল হয়ে ওঠে। কোন আইন ও নীতি-বোধকে তোয়াক্কা না করে পশুবৎ স্বার্থসংঘর্ষের হিংস্রতা ও গোষ্ঠীপ্রাধান্যের সংঘাত দেশময় অস্থিরতা ও আতঙ্কের সৃষ্টি করে —যেন সেই আদিম অরণ্যচারী উলঙ্গসমাজের পরিস্থিতি। এইখানেই বিজ্ঞানসম্মত নীতি নির্ধারণের প্রশ্ন, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় বিজ্ঞান-চিন্তার গুরুত্ব। দীর্ঘকালের প্রচলিত নীতিরীতির ও মূল্যবোধের যদি কোন পরিবর্তন প্রয়োজন হয় তবে তাকে সুস্থ বিচার বুদ্ধি দিয়েই করতে হবে। অন্ধ আবেগের উত্তেজনা বা গোষ্ঠীস্বার্থের হিংস্রতা দিয়ে নয়। আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সেই রকম এক জটিল আবর্তের মধ্যে উপস্থিত।

উন্নয়নশীল দেশ নামেই এখন আমরা পরিচিত। বিজ্ঞান প্রসারের অনেক কাজ দেশজুড়ে আরম্ভ হয়েছে এ কথাও সত্য। কিন্তু সেই কাজে সবার নিষ্ঠা ও আন্তরিক প্রেরণার অভাব একান্তভাবে অনুভূত হচ্ছে। উন্নত সমাজ ও রাষ্ট্র গড়তে হলে যে বলিষ্ঠ নীতি ও আদর্শের প্রয়োজন এবং তা কার্যকরী করতে যে সৎ উৎসাহী কর্মী ও আদর্শ চরিত্রের নেতা দরকার—সেই সবের যেন বড় অভাব। সামগ্রিক নীতিবোধ, কর্তব্যজ্ঞান এবং প্রকৃত মানবতার অনুভূতিগুলি জলাঞ্জলি দিয়ে অন্ধ তামসিকতার রাজনীতিই দেশের সবকিছু এখন নিয়ন্ত্রণ করছে। সুস্থ চিন্তার সৎকর্মী এবং আত্মত্যাগী বলিষ্ঠ চরিত্রের ব্যক্তিরা সেই রাজনীতিতে

[পরের অংশ 219 পৃষ্ঠায় দেখুন]

বিজ্ঞান প্রবন্ধ

মৌলিক কণা ও ক্যুআর্ক

সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র*

গণিতে সিমেট্রী বা প্রতি সাম্য বিষয়ের চর্চা বেশ প্রাচীন বলা যায়। বিশেষত উনিশ শতকে সোফুস লী (Sophus Lie—1842-99) যথেষ্ট গবেষণা করেছিলেন। পরবর্তী শতকে পদার্থ বিজ্ঞানে লীর ধ্যান-ধারণার বিশেষ প্রতিফলন ঘটেছে। ছোট ছোট সংখ্যা গুণনের ফলে যেমন বড় সংখ্যায় পরিণত হয়—তেমনি ছোট ছোট প্রতি সাম্যের গুণফল বৃহৎ প্রতি সাম্যের সৃষ্টি করতে পারে। ক্রস্ট্যাল ল্যাটিস হল এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ক্রস্ট্যালের প্রতিসম গঠন-বৈচিত্র্যের আড়ালে থাকে লক্ষ লক্ষ প্রতিসম একক পরমাণুর সংযোগ। একই রকম ধারণা কি মৌলিক কণার বেলায় প্রয়োগ করা যায়? মৌলিক কণাগুলির শ্রেণীভেদে কিছু প্রতিসাম্য লক্ষ্য করার পর এই প্রশ্ন দেখা দিল।

10^{-23} সে. থেকে বেশী স্থায়ী মৌলিক কণাগুলি অন্তর্ভুক্ত করে মৌলিক কণার সারণী তৈরি হয়েছে। ঐ সারণীতে কণার শ্রেণীভেদে ভর, স্পিন, আধান, জীবৎকাল প্রভৃতি পাওয়া যাবে। 10^{-23} সে. এর কম জীবৎকালের আর যে সব কণা পাওয়া গেছে ঐ সারণীতে তার উল্লেখ নাই। [সারণী পরের পৃষ্ঠায়]

বিচিত্র কণা—মৌলিক কণার সারণীতে কোন কোন কণার বৈচিত্র্য সংখ্যা শূন্য নয়, এসব কণা বিচিত্র বা অপরিচিত কেন? 1940 খৃস্টাব্দ থেকেই নভোরশ্মি মেঘকক্ষে নেওয়া ছবিতে এরকম কিছু কিছু অপরিচিত কণার সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছিল। 1947 খৃস্টাব্দে জর্জ রচেস্টার ও ক্লিফোর্ড বাটলার মেঘকক্ষে V আকারের কণাপথ আবিষ্কার করেন যার উৎস হল কোন অপরিচিত উদাসীন কণা। $\pi^- + p$ বিক্রিয়ার এরকম কণার জন্ম। মেঘকক্ষে দেখা গেল হঠাৎ π^- অন্তর্হিত হয়ে কয়েক সেমি.ব্যাপী ফাঁকা জায়গার, পরে আবার π ও p-এর V আকার গতিপথের আবির্ভাব। এই ঘটনার ব্যাখ্যা হল $\pi^{\mp} p$ জুড়ে গিয়ে কোন উদাসীন অপরিচিত বা বিচিত্র কণার উৎপত্তি হয়েছে আবার সেই কণা $\pi^- 3p$ কণায় ক্ষয় পেয়েছে। মেঘকক্ষের ফাঁকা জায়গাটুকু উদাসীন কণার গতিপথ—যা ধরা যায় না। সারণীর K মেসন ও হাইপেরনগুলি এই গোষ্ঠীর। এই নতুন কণাগুলি তীব্র নিউক্লীয় বলে অংশ নেয়—তাই তারা হেডরন শ্রেণীভুক্ত। হেডরণ কণা তীব্র বল ছাড়াও অন্য বলে অংশ নিতে পারে। এদের ভেতর মেসন শ্রেণী হল বোসন কণা অর্থাৎ স্পিন শূন্য। হাইপেরন ও নিউক্লিয়ন হল ফের্মিঅন এদের ভেতর Ω-র স্পিন $\frac{3}{2}$, অন্যগুলির স্পিন $\frac{1}{2}$।

K ও হাইপেরন কণাগুলি বিচিত্র কেন? একটা উদাহরণে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। নীচের বিক্রিয়াটি নেওয়া যাক।

$$\pi^- + p \rightarrow \Lambda \rightarrow \pi^- + p$$

Λ-কণা যেন এই বিক্রিয়ায় $\pi^- 3p$-এর ক্ষণিক মিলনফল—যেন দুটি পতঙ্গ উড়ে এসে একসঙ্গে জুড়ে বসল আবার দু-দিকে উড়ে গেল। সময় বৈপরীত্য সমতার নিয়ম অনুযায়ী এই ঘটনা কিছু বিস্ময়ের নয়। কিন্তু বিপত্তি হল অন্যত্র, কারণ $\pi^- p$ থেকে Λ-র জন্ম হয় প্রায় 10^{-23} সে. সময়ে অর্থাৎ আলো নিউক্লীয় পাল্লা (10^{-15} মি.) অতিক্রম করতে যে সময় নেয় তার সমান সময়ে। তীব্র বিক্রিয়াজনিত ক্রিয়ার

[218 পৃষ্ঠার পরের অংশ]

হয় স্থান পাচ্ছেন না বা তার থেকে দূরে সরে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। কারণ স্বার্থান্বেষী তামসিক চরিত্রের প্রাধান্যই সেখানে, যারা সুস্থ মতামত গ্রহণে মোটেই আগ্রহী নন। এমন কি দেশের উন্নয়নে বিজ্ঞানী ও যথার্থ বিজ্ঞানকর্মীদের মতামতকেও তারা কোন গুরুত্বই দেন না। দেশে বিজ্ঞান প্রসারে, জনসাধারণের মধ্যে সুস্থ বিজ্ঞান মানস প্রস্তুতিতে, জনকল্যাণে বিজ্ঞানের প্রয়োগে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের মত উন্নত সারস্বত প্রতিষ্ঠানের মতামত ও সাহায্য নেওয়া এবং এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য ও উন্নত করার কোন ইচ্ছা ও চেষ্টা দেশের কর্ণধার পরিচালক মণ্ডলীর মধ্যে দেখা যায় না। শিক্ষা-সংস্কৃতির নীতি নির্ধারণে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের যে গুরুত্ব তাও উপেক্ষিত হয়েই চলেছে। এই নৈতিকতার অভাবই যে সারা দেশে বিশৃঙ্খলা ও অনগ্রসরতার প্রধান কারণ সেই কথা কি দেশের বর্তমান নায়ক শ্রেণী আন্তরিক ভাবে অনুভব করবেন?

---

*সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলকাতা-700009

মৌলিক কণার সারণী

শ্রেণী	কণা	চিহ্ন	ভর	আধান সংখ্যা	স্পিন	বৈচিত্র্য সংখ্যা	জীবৎকাল
	গ্র্যাভিটন	g	0	0	2	0	∝
	ফোটন	γ	0	0	1	0	∝
লেপ্টন	নিউট্রিনো	$v_e\ \tilde{v}_e$	0	0	$\frac{1}{2}$	0	
		$v_\mu\ \tilde{v}_\mu$	0	0		0	
	ইলেকট্রন	e^+e^-	0·511	+1 −1		0	
	মিউঅন	$\mu^+\mu^-$	105·66	+1 −1		0	$2{\cdot}2\times10^{-6}$
	পাইঅন	$\pi^+\pi^-$	139·57	+1 −1	0	0	$2{\cdot}6\times10^{-8}$
		π^0	134·56	0	0	0	$0{\cdot}8\times10^{-16}$
মেসন	কেঅন	K^+K^-	493·67	+1 −1	0	+1 −1	$1{\cdot}2\times10^{-8}$
		$K^0\tilde{K}^0$	497·67	0	0	+1−1	$0{\cdot}9\times10^{-10}$
	ইটা	η	548·8	0	0	0	$2{\cdot}5\times10^{-19}$
নিউক্লিয়ন	প্রোটন	$p\ \bar{p}$	938·28	+1 −1	$\frac{1}{2}$	0	∝
	নিউট্রন	$n\ \bar{n}$	939·57	0	$\frac{1}{2}$	0	918
হ্যাড্রন	ল্যামডা	$\Lambda\ \Lambda$	1115·60	0	$\frac{1}{2}$	−1+1	$2{\cdot}6\times10^{-10}$
বেরিয়ন	সিগমা	$\Sigma^+\ \tilde{\Sigma}^+$	1189·37	+1 −1	$\frac{1}{2}$	−1+1	$0{\cdot}8\times10^{-10}$
		$\Sigma^0\ \tilde{\Sigma}^0$	1192·47	0	$\frac{1}{2}$	−1+1	$5{\cdot}8\times10^{-20}$
		$\Sigma^-\ \tilde{\Sigma}^-$	1197·35	−1+1	$\frac{1}{2}$	·1+1	$1{\cdot}5\times10^{-10}$
হাইপেরন	কাসকেড জাই	$\Xi^0\ \Xi^0$	1314·9	0		−2+2	$2{\cdot}9\times10^{-10}$
		$\Xi^-\ \tilde{\Xi}^-$	1321·3	−1+1		−2+2	$1{\cdot}7\times10^{-10}$
	ওমেগা	$\Omega^-\ \Omega^-$	1672·2	−1 +1	$\frac{3}{2}$	·3+3	$1{\cdot}1\times10^{-10}$

বিপরীত কণা (যদি থাকে) কণার পাশে পৃথক দেখান আছে। আধান সংখ্যা প্রোটন আধানের এককে ও জীবৎকাল সেকেণ্ডে দেওয়া হয়েছে। ভর Mev এককে।

পক্ষে এই সময় যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু Λ কণা ক্ষয় পেয়ে π^- p-এর জন্ম দিতে অনেক বেশী সময় লাগে প্রায় $2{\cdot}6\times10^{-10}$ সে। এই বিচিত্র ঘটনা থেকেই এদের নামকরণ হয়েছে বিচিত্র কণা। 1953 খৃষ্টাব্দে মারে গেলম্যান ও কাজুহিকো নিশিজামা এই বৈচিত্র্যের একটি সহজ ব্যাখ্যা দেন। K মেসন হাইপেরন কণা বিচিত্র, কারণ তাদের বৈচিত্র্য সংখ্যা

শূন্য নয়। আমরা প্রোটনের জীবৎকাল অসীম ধরে থাকি—তা পজিট্রনে কেন ক্ষয় পায় না তার কারণ হল এরকম বিক্রিয়ায় বেরিয়ন সংখ্যার নিত্যতা বজায় থাকে না। তেমনি $n+\bar{\nu} \rightarrow p+e^-$-এরকম বিক্রিয়া ঘটে না তার কারণ এতে লেপটন সংখ্যার নিত্যতা থাকে না। বেরিয়ন ও লেপটন সংখ্যার নিত্যতার পিছনে এই অভিজ্ঞতাই আমরা কাজে লাগাই—নতুবা ভরবেগ, শক্তি বা কৌণিক ভরবেগের নিত্যতার নিয়মের মত এখানে কোন তাত্ত্বিক যুক্তি নেই। বেরিয়ন সংখ্যা, লেপটন সংখ্যা এরা যেন একটা লেবেলের কাজ করে যা দিয়ে আমরা অন্য সব বিক্রিয়া যাচাই করে নিতে পারি।

বিচিত্র কণার জীবৎকাল অসীম নয় কিন্তু 10^{-23} সে. এককে এরা যথেষ্ট দীর্ঘজীবী। এর উপর ভিত্তি করে এদের একটা নূতন লেবেল দেওয়া যায় তা হল বৈচিত্র্য। বেরিয়ন ও লেপটন সংখ্যার মত বৈচিত্র্য সংখ্যা নিতান্তই কাল্পনিক। এর মূলে কোন বল বা ক্ষেত্র নাই। কণার আভ্যন্তরীণ ধর্ম হল বৈচিত্র্য সংখ্যা—কিন্তু তা মৌলিক কণা জগতের অনেক ধর্মই প্রভাবিত করে। যে কোন বিক্রিয়ার বৈচিত্র্য সংখ্যা নিত্য থাকে—যেমন

$$p+\pi^- \rightarrow K^0+\Lambda$$

অথবা $$p+\phi \rightarrow \Xi^0+p+K^0+K^+$$

$$\Lambda\Lambda+p \rightarrow n+p+\tilde{K}^0$$

অথবা $$K^-+p \rightarrow K^++\Xi^-$$
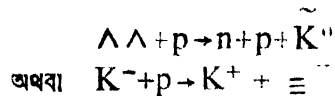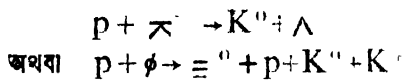
বৈচিত্র্য সংখ্যার নিত্যতাবাদের বৈশিষ্ট্য হল তীব্র ও তড়িচ্চুম্বকীয় বলে এই নিত্যতা বজায় থাকলেও ক্ষীণ বলে তা বজায় থাকে না। যদিও তীব্র বল থেকে বিচিত্র কণার উৎপত্তি, তার ক্ষয় ঘটে ক্ষীণ বলের ক্রিয়ায়। তীব্র বল বিচিত্র কণা উৎপাদনে যে সময় নেয় ক্ষীণ বলে তার ক্ষয় ঘটে 10^{13} থেকে 10^{15} গুণ বেশী সময়ে!

মৌলিক কণা ও আইসোটোপিক স্পিন

মৌলিক কণাজগতে কিছু কিছু এমন কণা আছে যাদের জীবৎকাল 10^{-23} সে. থেকেও কম তাদের বলা হয় অনুনাদ কণা। পরমাণু যেমন উত্তেজিত অবস্থায় সামান্য ভর বেশী নিয়ে অবস্থান করে, অনুনাদ হল নিউক্লীয় কণার তেমন উত্তেজিত অবস্থা। এরকম সামান্য ভরের পার্থক্যের দুটি কণাকে একটি কণার দুটি অবস্থা বলা যায়।

নিউট্রন ও প্রোটনের ভর পার্থক্য তাদের ভরের মাত্র শতকরা 0·1 ভাগ আর তাদের কাছাকাছি ভরের কোন কণা নেই। তা হলে এই দুটি কণার পার্থক্য কি? পার্থক্য শুধু আধানে—কিন্তু তীব্র বলের কাছে দুটি কণাই সমান। পদার্থবিদ্‌রা তাই নিউট্রন ও প্রোটনকে নিউক্লিয়ন N বলেন। n ও p হল N-এর আধান অনুযায়ী দুটি অবস্থা। প্রোটন স্পিন অনুযায়ী দুটি অবস্থায় থাকতে পারে। চুম্বক ক্ষেত্রে রাখলে প্রোটনের এই স্পিন অনুযায়ী সামান্য ভরের ইতর বিশেষে প্রোটনের দুটি অবস্থা পাওয়া যায়। এই ধর্মের অনুকরণে প্রোটন ও নিউট্রনের দুটি অবস্থা পাওয়া যায়। এই ধর্মের অনুকরণে প্রোটন ও নিউট্রনের আধান বোঝাতে আইসোটোপিক স্পিন-এর আশ্রয় নেওয়া হয়। নিউক্লিয়নের আইসোটোপিক স্পিন $\frac{1}{2}$ অর্থাৎ তার $2\times\frac{1}{2}+1=2$টি অবস্থা নিউট্রন ও প্রোটন।

পাইঅনের আইসোটোপিক স্পিন 1, তার তিনটি অবস্থা $\pi^+\ \pi^-\ \pi^0$। K মেসনের $\frac{1}{2}$, Ξ এর $\frac{1}{2}$, Σ-এর 1

তীব্র বলের বিভিন্ন বিক্রিয়ায় আইসোটোপিক স্পিন নিত্য থাকে। তবে ক্ষীণ বলের ক্রিয়ায় এই নিত্যতা বজায় থাকে না—যেমন

$$\Lambda \rightarrow P+\pi^- \text{ অথবা } n+\pi^0$$
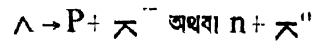
তড়িচ্চুম্বকীয় বলের ক্রিয়াতেও আইসোটোপিক স্পিন নিত্য থাকে না।

অষ্টাঙ্গিক মার্গ

n ও p-এর মত একটি কণাগোষ্ঠীকে একই কণার বিভিন্ন অবস্থায় বর্ণনা করা যায়। আটটি বেরিয়ন নিয়ে বুদ্ধের অষ্টাঙ্গিক
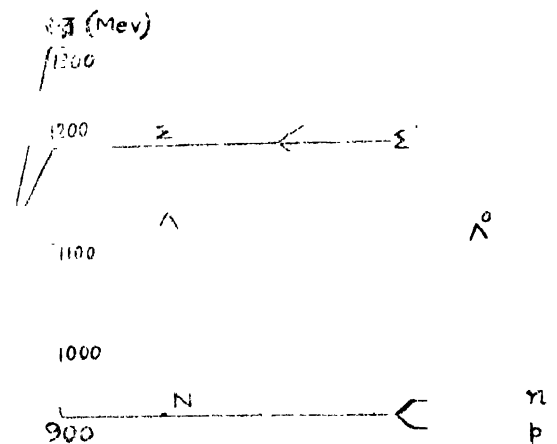
1 নং চিত্র

মার্গের অনুসরণে এরকম অষ্টমূর্তির একটি যুক্তিসঙ্গত পরিকল্পনা করা যায়। এই আটটি বেরিঅন হল n, p, Σ^+, Σ^0, Σ^-, Λ, Ξ^0, Ξ^-; এদের স্পিন $\frac{1}{2}$ বেরিঅন সংখ্যা 1 কিন্তু বৈচিত্র্য সংখ্যায় পার্থক্য আছে। এই কণাগুলির ভর 400 Mev-এর মধ্যে। 1নং চিত্রে দেখা যাবে যে একটি বেরিঅন β কাল্পনিক কোন আধা তীব্র বলের ক্রিয়ায় N, Λ, Σ, Ξ গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে, দুর্বলতর তাড়িচ্চুম্বকীয় বলে এদের প্রত্যেকটি আবার সামান্য ভরের পার্থক্যে বিশ্লিষ্ট হয়। বেশি ভরের কণায় এই চিত্রে বৈচিত্র্য সংখ্যা ক্রমশ বাড়ে। নিম্নভরের কণা N বিচিত্র নয়—তাদের বৈচিত্র্যসংখ্যা শূন্য। একটি

কণার বিভিন্ন অবস্থার এরকম কণা গোষ্ঠী মেসনের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়।

1960 খৃস্টাব্দে মারে গেলম্যান ও য়ুভাল নীম্যান এই আটটি বেরিয়ন অষ্টাঙ্গিকে সাজাতে সক্ষম হন। 2নং চিত্রে আইসোটোপিক স্পিনের সঙ্গে বৈচিত্র্যের সম্পর্ক এরকম অষ্টাঙ্গিকে দেখান হয়েছে। এই চিত্রে উপরের সারিতে n, p ; মধ্যের সারিতে $\Sigma^+ + \Sigma^0 \Sigma^-$
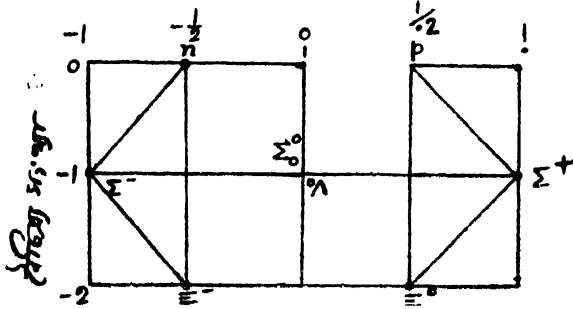
2নং চিত্র

আইসোটোপিক স্পিন মান

ও নীচের সারিতে রয়েছে Ξ^- Ξ^0। Λ কণার আইসোটোপিক স্পিন শূন্য, কেন্দ্রে তাই তার অবস্থান Σ^0-র সঙ্গে দেখান হয়েছে। Σ-এর আইসোটোপিক স্পিন সংখ্যা 1, তার $2\times1+1=3$টি মান $-1,\ 0,\ +1$। N ও Ξ-এর ঐ সংখ্যা $\frac{1}{2}$ অর্থাৎ $-\frac{1}{2}$ ও $+\frac{1}{2}$-এর দুটি কণা যথাক্রমে n ও p এবং Ξ^- ও Ξ^0।

উপরের সারির কণার বৈচিত্র্য শূন্য, মাঝের সারির বৈচিত্র্য -1 ও নীচের সারির -2। অনুভূমিক রেখার কণাগুলির মধ্যে অর্থাৎ n ও p বা Σ^- ও Σ^0 ইত্যাদির সামান্য ভর পার্থক্যের জন্য তড়িচ্চুম্বকীয় বল দায়ী। কিন্তু উল্লম্ব রেখায় N, Σ, Ξ কণাগুলির বিপুল ভর পার্থক্য তথা বৈচিত্র্য সম্ভব হয়েছে তীব্র বলের একটি অংশের জন্য। তির্যক রেখায় দেখলে কণাগুলি যেমন n, Σ^0 কিংবা Σ^- Ξ^- একই আধানবিশিষ্ট।

সবচেয়ে বিস্ময়কর হল 10^{-10} সে. আয়ুর হাইপেরন ও স্থায়ী পদার্থের উপাদান নিউট্রন, প্রোটন এই চিত্রে মনে হচ্ছে যেন একই কণার বিভিন্ন অবস্থা। তীব্র বল ও তড়িচ্চুম্বকীয় বলের প্রভাবেই যেন এই অবস্থান্তরগুলি ঘটেছে। তড়িচ্চুম্বকীয়, ক্ষীণ ও বৈচিত্র্য সৃষ্টিকারী তীব্র বল যদি না থাকত তবে এই চিত্রের সব কণার ভর সমান হত। তাই বলা যায় বলগুলিই কণাটির প্রতিসাম্য বিনষ্ট করে তাদের আটটি মূর্তিতে প্রকাশ করেছে। $\frac{3}{2}$ স্পিন বিশিষ্ট বেরিয়নগুলি ও একই ভাবে একটি কণার দশমূর্তি প্রমাণ করা যায়। মেসনগুলিও এরকম একটি ষটকোণ চক্রে প্রকাশ করা যায় যাতে মনে হয় একটি কণা নয়টি মেসনে পরিণত হয়েছে। অবশ্য তাছাড়াও কিছু কণা একক অবস্থায় পাওয়া যাবে—যাদের কোন অবস্থান্তর নেই।

ক্যুআর্ক : স্বাদ ও বর্ণ

বিভিন্ন কণাগোষ্ঠী এক একটি কণার বিভিন্ন অবস্থা ও তাদের প্রতিসমচিত্রে ক্রিস্টালের মত প্রকাশ করা যায়। তাহলে মৌলিক কণার গঠন বিন্যাসে মৌলিক কোন একক কণা থাকা সম্ভব। 1963 খৃস্টাব্দে গেলম্যান ও জর্জ জুইগ প্রস্তাব করেন যে হেডরন কণা তিনটি প্রাথমিক কণার সমবায়ে গঠিত—এই কণার নাম দেওয়া হল ক্যুআর্ক। লেপটন-এর কোন গঠন-বিন্যাস নাই বিন্দুর মত। ক্যুআর্কও বিন্দুর মত বস্তু, তার গঠন বিন্যাস নেই।

ক্যুআর্ক হল ফের্মিঅন কণা অর্থাৎ তার স্পিন সংখ্যাদ্বিগুণিত হলে বিষম পূর্ণ সংখ্যা হয়। দুই বা তিনটি ক্যুআর্ক মিলে হেডরন তৈরি হয়। মেসন বোসন কণা অর্থাৎ তার স্পিনসংখ্যা দ্বিগুণিত হলে সম্পূর্ণ সংখ্যা হয়। তাই ক্যুআর্ক অ্যান্টিক্যুআর্ক দুটি মিলে মেসন তৈরি করতে পারে। বেরিয়নের মত ফের্মিঅন তৈরি করতে তিনটি ক্যুআর্ক প্রয়োজন—অ্যান্টিবেরিয়নের বেলায় তিনটি অ্যান্টিক্যুআর্ক।

তিনটি ক্যুআর্ক ও তিনটি অ্যান্টিক্যুআর্কের জোড়া $3\times3=9$ রকমে হতে পারে অর্থাৎ 9 রকমের মেসন থাকা সম্ভব। প্রতিসম গোষ্ঠীর গুণফলের বড় সংখ্যা দুটি ছোট সংখ্যার যোগফল হিসেবে প্রকাশ করা যায় যেমন $3\times3=9=8+1$।
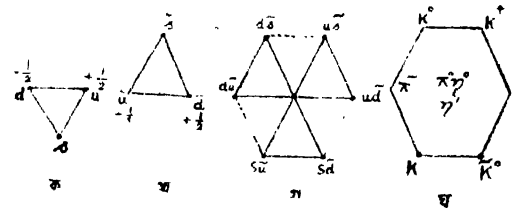
3নং চিত্র

ক্যুআর্ক প্রতিসাম্য। ক—2নং চিত্রের মত ক্যুআর্ক তিনটি, বৈচিত্র্য ও আইসোটোপিক স্পিনের দুটি অক্ষে সাজানো যায়। খ—তিনটি অ্যান্টিক্যুআর্ক, (ক) ত্রিভুজের বিপরীত প্রতিফলন গ—ত্রিভুজ প্রতিসমের (ক) ও (খ) এর গুণফল 2নং চিত্রের মত ষটকোণচক্র ঘ—(গ) চিত্রের ক্যুআর্ক অ্যান্টিক্যুআর্ক থেকে মেসনের ষট্‌কোণচক্র যাতে নয়টি মেসনের একটি একক η ও অন্য আটটি মেসন 2নং চিত্রের মত একটি কণারই অবস্থান্তর দেখানো হয়েছে।

বাস্তবে 9 রকম মেসনের একটি একক অবস্থা ও অন্য 8টি একগোষ্ঠীর একটি কণার বিভিন্ন অবস্থা। বেরিয়ন 3টি ক্যুআর্কের সমন্বয়ে গঠিত ও $3\times3\times3=27$ রকমের হতে পারে। যা ছোটসংখ্যায় যোগফলে প্রকাশ করা যায় $1+8+8+10$। এরকম একক বেরিয়ন ও তিনটি দলের বেরিয়ন দেখা যায় যাদের একটি দলের দশটি কণা একটি কণার অবস্থান্তর। 3নং চিত্রে 8টি বেরিয়নের এরকম একটি দলের কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া আরও একটি 8টি বেরিয়নের দল আছে।

মৌলিক কণার সারণীতে উল্লেখ নাই এরকম ক্ষীণজীবী মৌলিক কণা এই সব দলের অন্তর্গত।

ক্যুআর্ক থেকে একক আধানের কণা তৈরি সম্ভব হলে ক্যুআর্কের আধান হবে ভগ্নাংশ $\frac{1}{3}$ অথবা $\frac{2}{3}$। বেরিয়ন তৈরি করতে ক্যুআর্কের বেরিয়ন সংখ্যা হবে $\frac{1}{3}$ (অ্যান্টিক্যুআর্ক-এর $-\frac{1}{3}$)। বিচিত্র কণার উপাদান বলে তার বৈচিত্র্য সংখ্যা হবে এক।

তিনটি ক্যুআর্কে লেবেল আলাদা u (up), d (down) s (strange) এই লেবেল হল ক্যুআর্কের স্বাদ বা flavour, u ক্যুআর্কের আধান $\frac{2}{3}$, d ও s-এর $-\frac{1}{3}$, s-এর বৈচিত্র্য -1; 3টি অ্যান্টিক্যুআর্কের আধান ও বৈচিত্র্য হবে বিপরীত :

প্রোটনের উপাদান হল দুটি u ও একটি d ক্যুআর্ক এদের সমন্বয়ে প্রোটনের স্পিন $\frac{1}{2}$, আধান $+1$, বেরিয়ন সংখ্যা $+1$ ও বৈচিত্র্য শূন্য। অনুরূপভাবে অন্যান্য বেরিয়ন কোন্ কোন্ স্বাদের ক্যুআর্কে গঠিত তা বোঝা যায়। যেমন $n=udd$, $\Sigma^+=uus$. $\Sigma^0=uds$, $\Sigma^-=dds$, $\Xi^0=uss$, $\Xi^-=dss$, $\Lambda=uds$ মেসনের উপাদান হল $\pi^+=u\tilde{d}$, $K^+=u\tilde{s}$ ইত্যাদি।

s ক্যুআর্কের ভর u ও d থেকে বেশি বলে বেশি বৈচিত্র্য সংখ্যার হেডরন কেন বেশি ভারী তা ব্যাখ্যা করা যায়। Σ Ξ ও Ω হাইপেরনে যথাক্রমে একটি, দুটি ও তিনটি s ক্যুআর্ক আছে তাই তাদের ভর আনুপাতিক হারে ক্রমশ বেশি।

প্রশ্ন উঠতে পারে ক্যুআর্ক জুড়ির মেসন কী ভাবে ক্ষয় পেয়ে দুটি লেপটন মিউঅন ও নিউট্রিনোতে পরিণত হয়? তখন ক্যুআর্ক কোথায় যায়? এর ব্যাখ্যা হল ক্ষীণ বিক্রিয়ায় ক্যুআর্কের স্বাদ পরিবর্তিত হতে পারে। তাই $\pi^+=u\tilde{d}$ ক্ষীণবলের ক্রিয়ায় $d\tilde{d}$ বা $u\bar{u}$-তে পরিণত হয় এবং ক্যুআর্ক ও তার অ্যান্টিক্যুআর্ক বিনষ্ট হয়ে প্রথমে W বোসন ও ঐ বোসন থেকে মিউঅন ও নিউট্রিনো উৎপন্ন হয়। নিউট্রন ক্ষয়ে ক্ষীণ বলের ক্রিয়ায় একটি d ক্যুআর্ক u-তে পরিণত হয়। বিচিত্র কণা থেকে বৈচিত্র্যহীন কণার জন্ম ও ক্ষীণ বলের ক্রিয়ায় s ক্যুআর্ক থেকে W বোসনের মাধ্যমে u বা d-তে রূপান্তরের ফলে ঘটে থাকে।

তীব্র বিক্রিয়ায় ক্যুআর্কের স্বাদের পরিবর্তন হয় না—কারণ তীব্র বলই ক্যুআর্কগুলিকে কণার মধ্যে বেঁধে রাখে।

ক্যুআর্কের সঙ্গে লেপটন কণার সম্পর্ক কী? তত্ত্ববিদদের ধারণা যে এই দুয়ের যোগসূত্র থাকা উচিত অন্তত চারটি লেপটন কণা ইলেকট্রন e, ν_e, μ, ν_μ-এর মত চারটি ক্যুআর্ক থাকা সম্ভব। তাহলে আর একটি স্বাদের ক্যুআর্ক নেই কেন? 1964 খৃস্টাব্দে সেলডন গ্ল্যাসো ও জেমস জেরুকেন চতুর্থ স্বাদের চার্ম ক্যুআর্কের অস্তিত্ব ভবিষ্যদ্বাণী করেন। এই ক্যুআর্ক c চার্ম সংখ্যা $+1$ ও আধান সংখ্যা $\frac{2}{3}$। চার্মের নিত্যতা একটি নূতন ধারণা—বৈচিত্র্যের মত। এই নিত্যতা তীব্র ও তড়িচ্চুম্বকীয় বিক্রিয়ায় বজায় থাকলে ও ক্ষীণ বিক্রিয়ায় নিত্য নয়। অ্যান্টিক্যুআর্ক $\tilde{c}$-এর চার্ম -1।

1974 খৃস্টাব্দে স্যামুয়েল চাও চুং টিউ ও বার্টন রিখটার স্বতন্ত্রভাবে একটা বিস্ময়কর কণা আবিষ্কার করেন। একটি স্পিন 1, বৈচিত্র্যহীন উদাসীন মেসন—কিন্তু ভর প্রোটনের প্রায় তিনগুণ (·3097 Mev)। আয়ন, ইলেকট্রন মিউঅন ও অন্য পরিচিত কণাতে এর ক্ষয় হয়। কিন্তু এর জীবৎকাল 10^{-20} সে. বৈচিত্র্যহীন হেডরনের পক্ষে প্রায় 1000 গুণ বেশী। এর নামকরণ করা হয় ψ, এর উপাদান দুটি ক্যুআর্ক $c\tilde{c}$। পূর্বে $s\tilde{s}$ জুড়ি দিয়ে গড়া ϕ কণার জীবৎকালও দেখা গিয়েছিল সাধারণ হেডরন-এর প্রায় দশগুণ বেশি।

চারটি স্বাদের ক্যুআর্ক সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর দেখা গেল 1977 খৃস্টাব্দে প্রোটন-প্রোটন সংঘাত পরীক্ষায় নতুন একটি দীর্ঘস্থায়ী কণার জন্ম হচ্ছে। প্রায় 10000 Mev ভরের এই কণার নাম Υ আপসাইলন। এই কণার উপাদান হল টপ (t) ও বটম (b) নামে দুটি নতুন ক্যুআর্ক। প্রায় 9800 Mev ভরের γ লেপটন কণা ও ν_τ নিউট্রিনো এই নতুন দুটি ক্যুআর্কের সঙ্গে সমতা রেখেছে।

ছয়টি স্বাদের ক্যুআর্কের প্রত্যেকটির তিনটি বর্ণ বা কালার আছে। ক্যুআর্কের বর্ণ ধারণা করার কারণ হল কোন কোন কণা যেমন Ω^--এ sss ক্যুআর্ক মিলে স্পিন $\frac{3}{2}$। কিন্তু একই স্পিনের দুটি কণা পউলি নীতি অনুযায়ী এক কোয়ান্টাম অবস্থায় থাকতে পারে না। 1964 খৃস্টাব্দে অসকার গ্রীনবার্গ প্রস্তাব করেন যে একটি ক্যুআর্কে তিনটি বর্ণ R (Red), G (Green), B (Blue) আছে। সাধারণ দৃশ্য বর্ণের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। ফলে ক্যুআর্কের সংখ্যা দাঁড়াল 18। Ω^- কণার একই স্পিনের দুটি s দুটি ভিন্ন বর্ণের হলে পউলির নীতি বজায় থাকে। কোন কণার তিনটি ক্যুআর্ক তিন বর্ণের থাকে $R+G+B=$ সাদা অর্থাৎ কণাতে আর কোন বর্ণ থাকে না। অ্যান্টিক্যুআর্ক-এর বর্ণ অ্যান্টিকালার অর্থাৎ মেসনে রেড-অ্যান্টিরেড। গ্রীন-অ্যান্টিগ্রীন ও ব্লু-অ্যান্টিব্লু এরকম পরিবর্তনশীল জোড়া বর্ণ মিলে মেসনকে বর্ণহীন রাখে। লেপটন অবশ্যই বর্ণহীন। পরের পৃষ্ঠায় সারণীতে লেপটন ও ক্যুআর্কের তালিকা ও ধর্ম দেওয়া হল।

গ্লুওন ও বন্ধন শক্তি

ক্যুআর্কগুলি কণাতে কোন্ বলে বাঁধা থাকে? এর সঠিক উত্তর এখনও পাওয়া না গেলেও অনুমান করা হয়। কোন অজানা বলের ক্ষেত্র যা ক্যুআর্কের চার্জ বা কালার-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নতুন ধরণের বিনিময় কণার বিনিময়ে ক্রিয়াশীল হয়।

	লেপটন			কৃ্যআর্ক				
কণা	ভর Mev	স্পিন p	আধান	স্বাদ	স্পিন 1	আধান	বৈচিত্র্য	চার্ম
ν	0	$\frac{1}{2}$	0	d	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{3}$	0	0
e	·511	$\frac{1}{2}$	−1	u	$\frac{1}{4}$	$+\frac{2}{3}$	0	0
ν_μ	0	$\frac{1}{2}$	0	s	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{3}$	−1	0
μ^-	106	$\frac{1}{2}$	−1	c	$\frac{1}{2}$	$+\frac{2}{3}$	0	+1
ν_τ	0	$\frac{1}{2}$	0	t	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{3}$	0	0
τ^-	1800	$\frac{1}{2}$	−1	b	$\frac{1}{2}$	$+\frac{2}{3}$	0	0

এই আভ্যন্তরীণ তীব্র বলের মৃদু প্রকাশ ঘটে নিউক্লীয় বলে যুকাওয়া যার বিনিময় কণা ধরেছিলেন মেসন। কৃ্যআর্কে'র তীব্র বলের বিনিময় কণা কাল্পনিক গ্লুওন। আধানের বিপরীতে তিন রকমের কালার ও আটটি গ্লুওন দিয়ে কৃ্যআর্কের তীব্র বিক্রিয়া চলতে পারে। গ্লুওনের নিঃসরণ বা শোষণে কৃ্যআর্কে'র কালার বা বর্ণ পরিবর্তন ঘটে। তীব্র বলের সঙ্গে বর্ণের এই সম্পর্ক আছে—লেপটনকণা বর্ণহীন তাই তীব্র বিক্রিয়ায় তাদের ভূমিকা নেই।

আটটি গ্লুওন, ছয়টি কৃ্যআর্ক' প্রত্যেকের তিনটি বর্ণ মিলে আঠারোটি কৃ্যআর্ক', আঠারোটি অ্যান্টিকৃ্যআর্ক', ছয়টি লেপটন এই পঞ্চাশটি মৌলকণা নিয়ে এখন বিশ্ব কল্পনা করা হচ্ছে। তাছাড়া আছে গ্র্যাভিটন ও ফোটন।

কৃ্যআর্ক' নিয়ে সবচেয়ে যে সমস্যা তা হল কোন পরীক্ষাগারে কণা ভেঙে কৃ্যআর্ক' পৃথক করা যায় না। তা পৃথক করতে হলে যে শক্তির প্রয়োজন তা কোন ত্বরণযন্ত্রে এখনও পাওয়া সম্ভব হয় নি। তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীরা বলেন কৃ্যআর্ক' সংশ্লিষ্ট তীব্র বল কৃ্যআর্কে'র দূরত্ব বাড়লে বাড়তে থাকে। তাহলে একটি কৃ্যআর্ক'কে কণা থেকে তো কখনো বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হবে না।

আবার কেউ কেউ বলেন ছয়টি কৃ্যআর্ক-এর পরে আরও নতুন নতুন কৃ্যআর্ক' থাকতে পারে লেপটন কণাও আবিষ্কার হতে পারে। তাই এর শেষ কোথায় তা কেউ বলতে পারে না।

তবে আমাদের জগতের জন্য দুটি স্বাদের কৃ্যআর্ক' u ও d এবং দুটি লেপটন e ও ν_e এবং তাদের চারটি বিপরীত কণাই প্রধান উপাদান। তাছাড়া গ্লুওন; ফোটন, গ্র্যাভিটন, W± ও Z এবং সব রকমের কণা জগতের বিক্রিয়া এই আটটি কণা দিয়ে ব্যাখ্যাও করা যায়। তার কারণ দুটি বেরিয়ন n ও p এবং দুটি লেপটন e ও ν_e দিয়ে আমাদের জগৎ বা অনুরূপ জগৎ গড়ে ওঠার কোন অসুবিধা নাই।

কোয়াসারের কথা

সলিলকুমার চক্রবর্তী*

মানুষ যেদিন দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আকাশের শোভা দেখে তন্ময় হতে শিখলো, সেদিন থেকেই বুঝি শুরু হল সভ্যতার পথে তার দৃঢ় পদক্ষেপ। প্রতিদিন সূর্যোদয়ের মধ্যে সে আবিষ্কার করলো জন্মের মহিমা আর সূর্যাস্তের মধ্যে মৃত্যুর দুর্জ্ঞেয় অন্ধকার। আকাশের বিচিত্র তারাদের মাঝে সে যেন খুঁজে পেল তার আশা-আকাঙ্খা ভয়, ভীতি, ভূত ও ভবিষ্যতের বিধাতাকে। গ্রহ, নক্ষত্র, জ্যোতিষ্করাজির মধ্যে সে মাঝে মাঝে আতঙ্ক ও অশুভের ইঙ্গিত দেখেছে বটে, কিন্তু তাদের মধ্যেই সে পাঠ করেছে উজ্জ্বল আশা ও ভবিষ্যতের বাণী। মানুষের কল্পনার অভিযান জ্যোতির্বিদ্যার মধ্যে দিয়ে যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনটি বোধ হয় আর কোনও বিষয়ে নয়।

আনুমানিক পঞ্চাশ বছর আগে দূরবর্তী নক্ষত্রজগতের আলোক বর্ণালী পরীক্ষা করতে গিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাপারটি ধরা পড়লো তা হচ্ছে বর্ণালী রেখার লাল-সরণ (Red shift)। ডপ্লারের নীতি অনুযায়ী এ থেকে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে, নক্ষত্র জগৎগুলি পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে এবং বিশ্ব ক্রমশঃ স্ফীত হচ্ছে। 1960 খৃস্টাব্দে নাগাদ টমাস্ ম্যাথিউস (Tomas Mathews) এবং অ্যালান স্যানডেজ (Alan Sandese) শক্তিশালী রেডিও-দূরবীণের সাহায্যে দূর আকাশে আবিষ্কার করলেন ঠিক তারা নয় অথচ তারাদের মত দেখতে অর্ধনাক্ষত্রিক কতকগুলো উজ্জ্বল বস্তুর উপস্থিতি। সাধারণ নক্ষত্রজগৎ ও নীহারিকার লাল-সরণের মাত্রার চেয়ে এদের লাল-সরণের পরিমাণ ছিল অনেক বেশী। গাণিতিক ভাষায় লাল-সরণের পরিমাণ নির্ণীত হয় নীচের সমীকরণ থেকে।

$$Z = \frac{\lambda' - \lambda}{\lambda}$$

যেখানে, Z = লাল- সরণের পরিমাণ।

λ = বেগরহিত স্বাভাবিক অবস্থায় জ্যোতিষ্ক থেকে আসা আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য।

λ' = জ্যোতিষ্কের বেগজনিত পরিবর্তিত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য।

কোয়াসার বলতে তারার মত দেখতে সেই সব অত্যুজ্জ্বল মহাজাগতিক বস্তুকেই বোঝায় যাদের লাল-সরণের পরিমাণ খুব বেশী। হাব্‌লের সূত্রানুযায়ী জ্যোতিষ্কের লাল-সরণের মাত্রা বেশী হওয়ার অর্থ, তাদের অপসরণ বেগ অত্যন্ত বেশী এবং তারা বহুদূরে অবস্থিত।

আসলে, ইংরেজী "Quasi-Stellar Radio Sources" এই শব্দগুলোর আদ্যক্ষরগুলো নিয়ে "কোয়াসার" QUASARS কথাটা তৈরি, যার আভিধানিক অর্থ দাঁড়ায় 'অর্ধনাক্ষত্রিক' বেতার তরঙ্গের উৎস"।

বিশ্বসৃষ্টির একেবারে গোড়ার দিকের অবস্থা কোয়াসার সৃষ্টির অনুকূল না থাকায় সেই আদিমযুগে কোয়াসাররা সংখ্যায় ছিল নগণ্য। বর্তমানে টিঁকে থাকা সমস্ত কোয়াসারের একটা স্ন্যাপ শট নিলে দেখা যেত যে, অন্ততঃ 35000 কোয়াসার তাদের বিশিষ্ট ঔজ্জ্বল্যে তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ বিকিরণ করে চলেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে এক একটি কোয়াসারের ঔজ্জ্বল্য কয়েক কোটি নক্ষত্র দিয়ে গড়া একটি গোটা নক্ষত্র জগতের ঔজ্জ্বল্যের 50 থেকে 100 গুণ।

সাধারণ নক্ষত্রের বেলায় লাল-সরণের পরিমাণ কখনই 0·002 এর বেশী হয় না। কিন্তু কোয়াসারের ক্ষেত্রে খুব কমের দিকেও এই লাল-সরণের মান 0·158। শক্তিশালী অতিবেগুনী (Ultraviolet) রশ্মি বিকিরণ করা, কোয়াসারদের অপর এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

কোয়াসারে সংখ্যা ও বণ্টন-ব্যবস্থা

কোয়াসারের সংখ্যা সঠিক কত এবং মহাবিশ্বের পরিমণ্ডলে তারা কেমন ভাবে ছড়িয়ে আছে, তা নিয়ে শুরু হয়েছে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং বিচার-বিশ্লেষণ। কোয়াসারদের পরম ঔজ্জ্বল্যের (Absolute Luminosity) প্রভেদ প্রকাশ করতে বিজ্ঞানী লুয়েটেন (Lueten) লালসরণের প্রভেদ-পাল্লাকে মোট ছ-ভাগে ভাগ করেছেন। প্রত্যেক বিভাগের কোয়াসারের ঔজ্জ্বল্য পরবর্তী বা পূর্ববর্তী বিভাগের কোয়াসারের ঔজ্জ্বল্য অপেক্ষা এক একক কম বা বেশী। নীচের তালিকায় লাল-সরণের এই পাল্লা অনুযায়ী 20,000টি কোয়াসারের বণ্টন-ব্যবস্থা দেখানো হয়েছে।

তালিকা নং—1

লাল-সরণের পাল্লা	কোয়াসারের সংখ্যা	শতাংশ
0·16—0·25	1000	5
0·25—0·40	1000	5
0·40—0·63	3000	15
0·63—1·00	4000	20
1·00—1·58	7000	35
1·58—2·51	4000	20

সর্বশেষ পাল্লার (1·58—2·51) কোয়াসারদের ঔজ্জ্বল্যের ক্রম সর্বপ্রথম পাল্লার (0·16—0·25) কোয়াসারদের থেকে 5গুণ বেশি অর্থাৎ এরা এক-শ' গুণ বেশী উজ্জ্বল। উপরের তালিকা অনুযায়ী সর্বশেষ পাল্লার মোট 4000টি কোয়াসার আছে।

* 41/42, দমদম রোড, কলিকাতা-700030

এর অর্থ,—যে দূরত্ব সীমায় লাল-সরণের মান যথাক্রমে 1·58 এবং 2·51, সেই দুই দূরত্বের সমান ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট দু'টি গোলক কল্পনা করলে তাদের অন্তর্বর্তী খোলকে (shell) মোট 4000 কোয়াসার ছড়িয়ে আছে।

স্মীট (Smitt)-এর হিসাব অনুযায়ী এই খোলকের আয়তন 729×10^{27} ঘন-আলোকবর্ষ। স্যানডেজ এবং লুইটেনের গবেষণায় আরও প্রমাণিত হয় যে মহাবিশ্বে কোয়াসারদের বণ্টন সুষম নয়। আমাদের থেকে যত দূরে বিশ্ব-সীমার দিকে তারা সরে যাচ্ছে এবং যতই তারা অনুজ্জ্বল প্রতীয়মান হচ্ছে কোয়াসার ঘনত্ব ততই যেন বেড়ে যাচ্ছে।

বিশ্বের বর্তমান বয়স 10·1 বিলিয়ন (1 বিলিয়ন $= 10^9$) বছর ধরে নিলে দেখা যাচ্ছে যে, বিশ্ব সৃষ্টির 1·5 বিলিয়ন বছর পরে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় 8·5 বিলিয়ন বছর আগে সর্বোজ্জ্বল কোয়াসারগুলো (2·51 লালসরণ বিশিষ্ট) থেকে বিকিরণের সূত্রপাত হয়। পরবর্তী কয়েক বিলিয়ন বছরের মধ্যেই অধিকাংশ কোয়াসারের জন্ম হয়। কোয়াসারের আয়ুষ্কাল সম্ভবতঃ 1 বিলিয়ন বছরের বেশী নয়। এ ধরনের হিসাব ও যুক্তি থেকে মার্টেন স্মিট (Marten Smitt) এবং তাঁর সহকর্মীরা অনুমান করেন যে, বিশ্বসৃষ্টির আদিপর্বে কোয়াসাররা আত্মপ্রকাশ করলেও আজকে তারা আর সকলে কোয়াসাররূপে বেঁচে নেই। যারা আছে তাদের সংখ্যা 35000-এর বেশি নয়। বাকীরা সম্ভবতঃ সাধারণ নীহারিকা বা নক্ষত্রজগৎ হিসাবে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে রয়েছে।

ঔজ্জ্বল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি

তীব্র অতিবেগুনী বিকিরণ, প্রশস্ত বর্ণালীরেখা ও অত্যধিক লাল-সরণ ছাড়াও কোয়াসারের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল তার ঔজ্জ্বল্যের পর্যায়ক্রমিক হ্রাস-বৃদ্ধি। দৃশ্যমান আলো এবং রেডিও-তরঙ্গ এই দুই বিকিরণের ক্ষেত্রেই তীব্রতর হ্রাস-বৃদ্ধি সুস্পষ্ট। 1963 খৃষ্টাব্দে হার্লান স্মিথ (Harlan Smith) এবং ডোরিস্ হফ্লাইট (Doris Hoflight) 1887 খৃষ্টাব্দ থেকে পুরাণো ফটোগ্রাফিক প্লেট পরীক্ষা করে দেখান $3C_{273}$ কোয়াসারটির ঔজ্জ্বল্য প্রতি 13 বছর অন্তর প্রায় 0·7 ক্রম করে বদলে গেছে। অ্যালান স্যানডেজ লক্ষ্য করেন $3C_{48}$ কোয়াসারের বেলায় প্রতি দু'বছরে ঔজ্জ্বল্যের ক্রম পরিবর্তনের মান 0·4। মাত্র 20 দিনে ঔজ্জ্বল্য বদলে যাচ্ছে, এমন একটা দ্রুত পরিবর্তনশীল কোয়াসারের দৃষ্টান্ত $3C_{345}$।

ঔজ্জ্বল্যের এ জাতীয় হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করলেন যে, কোয়াসারের যে অংশ থেকে আলো আসছে সমগ্র কোয়াসারের আয়তনের তুলনায় সেই অংশের আয়তন খুবই ছোট। ব্যাপারটা স্পষ্ট করে বোঝার জন্য মনে করা যাক একটা আলোক-উৎসের ব্যাস 10 আলোকবর্ষ। উৎসটির সামনের অংশ থেকে আমাদের কাছে আলো পৌঁছবার 10 বছর বাদে পিছনের অংশ থেকে আলো এসে পৌঁছবে। এই সময়ের মধ্যে তার তীব্রতার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটলেও সেটা আমাদের কাছে ধরা পড়বে না। যদি না সেই তীব্রতা পরিবর্তনের পর্যায়কাল 10 বছরের বেশী হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, উৎসের ব্যাসের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে আলো পৌঁছাতে যে সময় নেয়, সেই সময় ঔজ্জ্বল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির পর্যায়কাল অপেক্ষা অবশ্যই কম। এই যুক্তিতে $3C_{273}$ কোয়াসারটির ব্যাস 13 আলোকবর্ষের চেয়ে কম হওয়ার কথা। অথচ বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুযায়ী উজ্জ্বল নক্ষত্র জগতের ব্যাস কম করেও 5000 আলোকবর্ষ। সুতরাং কোয়াসারেরা নিজেরাই স্বয়ংসম্পূর্ণ অথবা বড় কোনও নক্ষত্র জগতের অন্তর্ভুক্ত বস্তু, ঔজ্জ্বল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি থেকে তা পরিষ্কার করে বলা সম্ভব হচ্ছে না।

কোয়াসার মডেল

কোয়াসারের দৃশ্যমান আলোক এবং রেডিও বর্ণালী বিকিরণ ক্ষমতা, তীব্রতার হ্রাস বৃদ্ধি প্রভৃতির সঠিক ব্যাখ্যা দেবার জন্য ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির দুই বিজ্ঞানী গ্রীনস্টাইন (Greenstien) এবং স্মিট (Simtt) কোয়াসারের যে মডেলটির প্রস্তাব করেন, তার কিছু বিবরণ দেওয়া দরকার।

বর্ণালী বিশ্লেষণের ফলে নিঃসৃত রেখার চরিত্র থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে, বিকিরণ আসছে 15000 ডিগ্রী কেলভিন
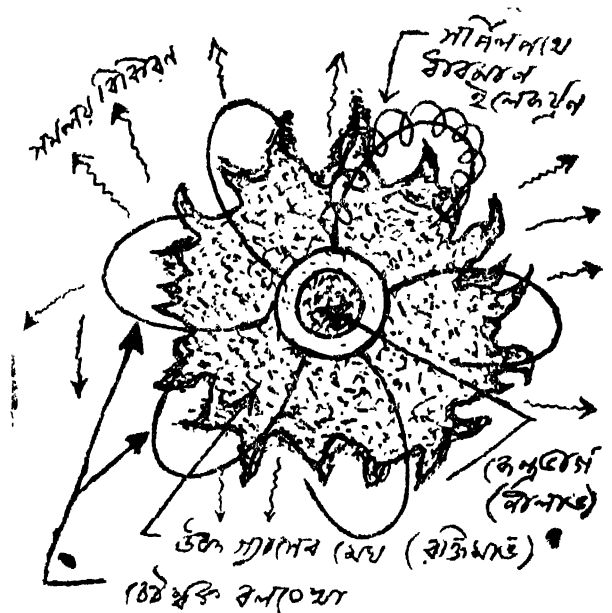
কোয়াসার মডেল, 1·1 আলোকবর্ষ ব্যাসযুক্ত।

উষ্ণতা বিশিষ্ট এক লঘু আয়নিত গ্যাসের মেঘ থেকে। এই গ্যাসীয় মেঘের গোলকটির ব্যাস কয়েক আলোকবর্ষ এবং মোট ভর প্রায় দশ লক্ষ সৌরভরের সমান। কোয়াসারের কেন্দ্রদেশ ও তার অব্যবহিত বাইরে উষ্ণ গ্যাসের বলয়কে বেষ্টন করে আছে

উচ্চশক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন ও চৌম্বক ক্ষেত্রের একটা কিরীট। এই কিরীট থেকেই সমলয় পদ্ধতিতে নির্গত হয় রেডিও-বিকিরণ। কিরীটের চৌম্বক বলরেখার চারপাশে সর্পিল পথে শক্তিশালী ইলেকট্রন সমূহের ধাবিত হওয়ার ফলেই এই বিকিরণ।

কোয়াসারের প্রচণ্ড শক্তি সৃষ্টি ব্যাপারটা বোঝাবার জন্য যে সব তত্ত্বীয় দিক বিচার করা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে আছে নাক্ষত্রিক সংঘর্ষ, মহাকর্ষ ভঙ্গ, অতিনোভার বিস্ফোরণ, চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে মহাকর্ষ শক্তির কণিকা শক্তিতে রূপান্তর, কেন্দ্রবস্তুর কোন বিশেষ প্রক্রিয়াজনিত শক্তি প্রভৃতি। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, এ ব্যাপারে পুরোপুরি সন্তোষজনক সর্ববাদীসম্মত মতবাদ এখনও গড়ে ওঠে নি। কোনও কোনও বিজ্ঞানী আবার এমনও মন্তব্য করেছেন যে, পদার্থবিদ্যার পরিচিত নিয়মকানুন কোয়াসারের বেলায় একেবারেই অচল।

কোয়াসার-শক্তির একাংশ কিভাবে শক্তিশালী ইলেকট্রন সৃষ্টি করে রেডিও-বিকিরণকে সম্ভবপর করে তোলে তা বোঝাবার জন্য হয়েল (Hoyle) ও ফাউলার (Fowler) তারকার দেহে শ্লথন-স্পন্দন (Relaxation Oscillation) নামক এক স্পন্দনের কথা চিন্তা করেছেন। তারকার অভ্যন্তরস্থ কেন্দ্রবস্তুর কোন একটি প্রক্রিয়া পর্যায়ক্রমে চালু হয়ে এ জাতীয় শ্লথন-স্পন্দন সৃষ্টি করে। স্পন্দনের যে অবস্থায় তারকাটি স্ফীত হতে থাকবে সে অবস্থায় সংঘাত-তরঙ্গের (Shock-waves) উদ্ভব হয়। সেই তরঙ্গের অভিঘাতে ইলেকট্রনরা ক্রমশঃ প্রায় আলোকের সমান বেগসম্পন্ন হয়। আর তা থেকেই উদ্ভব হয় রেডিও বিকিরণ।

মহাকাশের দূরতম প্রান্তের ভ্রাম্যমান অধিবাসী এই উজ্জ্বল কোয়াসারদের রহস্য সম্পূর্ণ উন্মোচনের জন্য হয়তো বা প্রয়োজন হবে নূতন নিয়ম, নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও সম্পূর্ণ নূতন ধরনের গাণিতিক বিচার-বিশ্লেষণ। তারই জন্য নিরলস গবেষণায় ব্যস্ত রয়েছেন দেশ-বিদেশের হাজারো বিজ্ঞানী। যে কোনও মুহূর্তে চাঞ্চল্যকর কোনও খবর এসে পৌঁছতে পারে পৃথিবীর যে কোনও প্রান্ত থেকে। আমরা তারই অপেক্ষায় আছি।

কোয়াল অবজেক্ট—চিরন

শিবনাথ খাঁ*

কেউ বলেন ধূমকেতু, কেউ বা বলেন গ্রহাণু, কেউ বা বলেন নেপচুনের উপগ্রহ। হ্যাঁ, যে জ্যোতিষ্কের কথা বলছি তার নাম "চিরন"। মাত্র 7 বছর আগে এর আবিষ্কার হয়। এই জ্যোতিষ্কটি সম্বন্ধে এখনও খুব বেশি জানা সম্ভব হয় নি।

জ্যোতিষ্কটির আবিষ্কারক হলেন মার্কিন জ্যোতির্বিদ চার্লস. টি. কোয়াল (Charles. T. Kowal)। 1977 খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসে যখন তিনি 122 সেমি. Schmidt telescope-এর সাহায্যে ক্যালিফোর্নিয়ার মাউন্ট প্যালোমার মানমন্দির থেকে সৌরমণ্ডলের দূরতম প্রান্তে নিষ্প্রভ ধূমকেতুর খোঁজ করছিলেন তখন হঠাৎই এই জ্যোতিষ্কটি তাঁর ফটোগ্রাফিক প্লেটে ধরা দেয়। ঐ ফটোগ্রাফগুলি তিনি 1 নভেম্বর (1977) ব্লিঙ্ক (blink) মাইক্রোসকোপ যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করেন এবং ঐ জ্যোতিষ্কটিকে সনাক্ত করেন। এই ফটোগ্রাফগুলি, যেগুলি তিনি অক্টোবর মাসে তোলেন সেগুলি ছিল ট্রোজান (Trojan) জ্যোতিষ্কমণ্ডলের ফটোগ্রাফ। তিনি এর ঔজ্জ্বল্য তুলনা করে দেখেন যে, এটির ঔজ্জ্বল্য প্রায় 18তম মানের তারার ঔজ্জ্বল্যের সমান।

এর আপেক্ষিক গতিবেগ খুবই মন্থর। ট্রোজান জ্যোতিষ্কমণ্ডলের ক্ষেত্রে যে গতি ধরা হয় তার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ গতিবেগ এই চিরনের। সূর্য থেকে এর গড়-দূরত্ব 13·7 অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট।** এ পর্যন্ত ঐ অঞ্চলে কোন ধূমকেতুর সন্ধান মেলে নি। সেই কারণে চার্লস কোয়াল তাঁর আবিষ্কৃত জ্যোতিষ্কটিকে বরাবর গ্রহ-ই বলে এসেছেন।

আমেরিকার স্মিথসোনিয়ান অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল অবজারভেটরী (Smithsonian Astrophysical Observatory)-এর ব্রায়ান জি. মার্সডেন (Brian G. Marsden) এই জ্যোতিষ্কটির কক্ষপথ এবং প্রদক্ষিণকাল নির্ণয় করেন। মার্সডেনের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী চিরনের প্রদক্ষিণকাল 50·7 বৎসর। সূর্য থেকে এর নিকটতম দূরত্ব বা অনুসূর হল 8·5 অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট এবং দূরতম দূরত্ব বা অপসূর হল 18·9 অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট। অর্থাৎ এর গড়-দূরত্ব হল 13·7 অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট। বর্তমানে সূর্য থেকে এর দূরত্ব হল 13·7 অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট।

এস. অয়েলকাওয়া (S. Oi kawa); ই. এভারহার্ট (E. Everhart); এইচ স্কল (H. Scholl) এবং ব্রায়ান জি. মার্সডেন একটি সমীক্ষায় দেখান যে, এর কক্ষপথ অস্থায়ী। এই অস্থায়ী কক্ষপথের জন্য চিরনের ভবিষ্যৎ কি? চিরনের

** সূর্য থেকে পৃথিবীর গড় দূরত্ব 92,900,000 মাইল

* 39, বারুইপাড়া লেন, পোঃ চাতরা, হুগলী

শেষ পরিণতি প্রসঙ্গে এঁ'রা বলেন যে, এর শেষ পরিণতি হয় শনি, ইউরেনাস বা বৃহস্পতির মতো গ্রহের সঙ্গে সংঘর্ষে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে যাবে অথবা সৌরজগৎ থেকে স্থায়ীভাবে সৌরজগতের বাইরে উৎক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। এর আকৃতি এবং গঠনপ্রকৃতি সম্বন্ধে খুব কমই জানা গেছে। গবেষকরা বলেছেন যে, এর ব্যাস মোটামুটিভাবে 160 কি.মি থেকে 640 কি.মি এর মধ্যে একটা কিছু হবে। তবে এঁ'রা নিঃসন্দেহ যে, চিরন বুধগ্রহের চেয়ে অনেক ছোট। সে কারণে একে গ্রহাণু বলাই বোধ হয় সঙ্গত।

চিরন আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে সবচেয়ে বড় কক্ষপথের গ্রহাণুটির নাম 944-Hidalgo। এর প্রদক্ষিণকাল 14 বৎসর এবং সূর্য থেকে এর সবচেয়ে বেশি দূরত্ব অর্থাৎ অপসূর হল 9·64 অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট। কিন্তু চিরনের প্রদক্ষিণকাল এর চেয়ে প্রায় সাড়ে তিন (3·5) গুণ এবং অপসূর প্রায় দুই (2) গুণ বেশি।

চিরনকে যদি ছোট গ্রহ হিসাবে ধরা হয় তাহলে এটি জার্মান জ্যোতির্বিদ জোহান বোডে-র (Johan Bode) দেওয়া গ্রহের দূরত্ব নির্ণয়ের সূত্র মানে না। কিন্তু অপরাপর নয়টি গ্রহের ক্ষেত্রে এটি সুপ্রযুক্ত। এই সূত্রটি কি? সূত্রটি হল এই যে, সূর্য থেকে গ্রহগুলি পরপর এক ছন্দে সাজানো আছে। সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বকে একক হিসাবে এখানে ধরা হয় এবং সব কটি গ্রহের দূরত্ব মোটামুটি ভাবে একটি সূত্র থেকে পাওয়া যায়। সূত্রটি হল:

$$Dn = \frac{(4+3\times 2^{n-1})}{10}$$

এখানে, Dn = সূর্য থেকে বিবেচ্য গ্রহের দূরত্ব।
n = গ্রহটির ক্রমিক সংখ্যা।

বুধের ক্ষেত্রে n-এর মান 0 এর পর থেকে পরপর যেমন সৌরজগতে সাজানো আছে সেই অনুযায়ী 1, 2, 3, 4 ইত্যাদি হবে। অর্থাৎ এই সূত্রানুযায়ী চিরনকে গ্রহ বলা যায় না।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যে সব ধূমকেতু সূর্য থেকে বেশ দূরে এবং যাদের আকৃতি চিরনের ন্যায়, তাদের গ্রহাণু থেকে আলাদা করা খুবই শক্ত। সেই কারণে চিরণ ধূমকেতু কিনা তা এই মুহূর্তে বলা যায় না। তবে 1996 খৃস্টাব্দে যখন এটি অনুসূরে অর্থাৎ সূর্য থেকে নিকটতম দূরত্বে আসবে তখন এই ব্যাপারে অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটন হবে।

1978 খৃস্টাব্দে চিরন এবং হ্যালির ধূমকেতু উভয়েই ইউরেনাসের কক্ষপথের কাছাকাছি ছিল, তখন একটি ঘটনা লক্ষ্য করা গেছে যে, চিরণের উজ্জ্বলতা (Brightness) হ্যালির ধূমকেতুর চেয়ে আড়াইশো (250) গুণ বেশি। একদল গবেষক বলছেন যে, এটি (চিরন) যদি ধূমকেতু হয় তাহলে শনি ও ইউরেনাসের মধ্যবর্তী অঞ্চলে চিরনের ন্যায় আরো ধূমকেতু থাকবে এবং তারা এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হচ্ছে না কেন? বর্তমানে আমেরিকায় এমন দূরবীণ আছে যার দ্বারা চিরনের চেয়ে সাত (7) গুণ নিষ্প্রভ জ্যোতিষ্কও ধরা যাবে।

কয়েকজন জ্যোতির্বিদ মনে করেন যে, মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝে অবস্থিত গ্রহাণুপুঞ্জ থেকে চিরনের উৎপত্তি হয়েছে এবং এক সংঘর্ষ অথবা বৃহস্পতি ও শনির টানের ফলে এটি শনি ও ইউরেনাসের মধ্যবর্তী এক কক্ষপথে চলে আসে। কিন্তু, এর বিরুদ্ধে মত হল যে, যদি এই হয় তাহলে বৃহস্পতি ও শনির মধ্যে এক বিশেষ সংখ্যার চিরণের ন্যায় গ্রহাণু দেখা যেত শনি ও ইউরেনাসের মধ্যে নয়। এ পর্যন্ত একমাত্র Hidalgo ছাড়া আর কোন গ্রহাণুই এই অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয় নি।

আবার কয়েকজন গবেষক মনে করেন যে, শনি ও ইউরেনাসের মধ্যবর্তী অজানা এক গ্রহাণুপুঞ্জের সদস্য হল এই চিরন। যেমন মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে আছে। কিন্তু, এর বিরুদ্ধে যে জোরালো যুক্তিটি রয়েছে তা হল এই যে, চিরণ যদি শনি ও ইউরেনাসের মধ্যবর্তী গ্রহাণুপুঞ্জের সদস্য হয় তাহলে এই অঞ্চলে চিরন আবিষ্কৃত হওয়ার সাত বৎসর পরেও ঐ গ্রহাণুপুঞ্জের অন্যান্য সদস্যরা আবিষ্কৃত হল না কেন?

জ্যোতির্বিদ হ্যারিংটন (Harrington) এবং ফ্লানডার্ন (V. Flandern) সিদ্ধান্ত করেন যে, চিরন এবং সৌরমণ্ডলের নবম গ্রহ প্লুটো হল নেপচুনের দুটি উপগ্রহ। এই সিদ্ধান্তে আরও বলা হয়, এক বিশাল ভরের কোনো মহাজাগতিক বস্তু কোনো এক সময় নেপচুনের খুব কাছ দিয়ে চলে যায় এবং ঐ বস্তুটি যে টাইডাল ফোর্স-এর (Tidal Force) সৃষ্টি করে তার ফলে চিরন এবং প্লুটো নেপচুনের আকর্ষণ কাটিয়ে বাইরে চলে আসে। এর সপক্ষে আরো যুক্তি দিয়ে বলা হয় যে, নেপচুনের আরো দুটি উপগ্রহ Triton এবং Nereid-দের কক্ষপথ বেশ অদ্ভুত ধরণের অর্থাৎ এদের কক্ষপথ ঠিক অন্যান্য গ্রহের উপগ্রহের কক্ষপথের মত নয়।

কয়েকজন জ্যোতির্বিদ আবার বলেন যে, চিরন হলো শনি অথবা ইউরেনাসের মুক্তিপ্রাপ্ত উপগ্রহ।

এ পর্যন্ত চিরন সৌরজগতে রহস্যাবৃত জ্যোতিষ্কদের মধ্যে অন্যতম। এর সাবিক চরিত্র না জানা পর্যন্ত সাধারণভাবে আপাততঃ একে "কোয়াজ অবজেক্ট" নামে অভিহিত করা হচ্ছে। 1996 খৃস্টাব্দে যখন এটি সূর্যের খুব কাছে আসবে তখন আরো তথ্য জানা যাবে এবং এও জানা যাবে যে চিরন আসলে কি?

পাটের পচন ও মাইক্রোব্‌সের ভূমিকা

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়*

তন্তু জাতীয় শস্যের মধ্যে পাট একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রধান শস্য। যদিও এর চাষ ভারত এবং পাকিস্তানেই মোটামুটি সীমাবদ্ধ। কিন্তু তন্তু জাতীয় দ্রব্যসামগ্রী সারা পৃথিবীতেই ব্যবহৃত হয়। পাটের তন্তু থেকে দড়ি, ব্যাগ, বস্তা থেকে আরম্ভ করে, উন্নত জাতের তন্তু দিয়ে জামা-কাপড়ও প্রস্তুত হয়। সে কারণে লক্ষ্য রাখা উচিত যাতে পাটের পচন (retting) খুব উত্তম ভাবে করা যায়। এই পচনের উপর নির্ভর করে তন্তু কতটা মোলায়েম ও শক্ত হবে। এই প্রবন্ধে পাটের পচন কি ভাবে হয়, কিভাবে করা উচিত এবং তাতে জীবাণুদের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে।

উৎকৃষ্ট তন্তু কাকে বলে :—(1) দৈর্ঘ্য (length), (2) দৃঢ়তা (strength), (3) রং (colour), (4) সূক্ষ্মতা (fineness), (5) অনমনীয়তা (stiffness) প্রভৃতি বৈশিষ্টগুলি নিয়ে তন্তুর উৎকৃষ্টতা হয়। এর মধ্যে দৃঢ়তা, সূক্ষ্মতা ও অনমনীয়তাকে প্রধান ধরা হয়।

এই উৎকৃষ্টতার পিছনে দু-ধরনের ফ্যাক্টর (factor) বা কারণ উপাদান রয়েছে—(1) যা আমাদের আয়ত্তের মধ্যে (controlled factor) ; যেমন, পাটের জাত, চাষবাসের ধরন, সার প্রয়োগ, রোগের প্রকোপ, পচনের জল ও তন্তু নির্গমন পদ্ধতি, (2) যা আমাদের আয়ত্তের বাইরে (uncontrolled factor)।

আবহাওয়ার অবস্থা এবং মাটির ধরন (soil type)। প্রথম ফ্যাক্টরের মধ্যে জল হল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ—যা উৎকৃষ্ট তন্তুর জন্য প্রয়োজন। পচনের জল (retting water) তন্তুর রং, দৃঢ়তা প্রভৃতির উপর সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে।

পচন পদ্ধতি (retting process)—পাটের পচন এমন একটি পদ্ধতি যা পাটের কাণ্ড থেকে তন্তু (fiber) বের করার আগে সম্পন্ন হওয়া দরকার। এর মূল কথা হল তন্তুগুলি থাকে পাটের কাণ্ডের গায়ে, 'বার্কে' (bark)। পচনের ফলে আস্তে আস্তে পাট তন্তু আলগা হয় এবং কাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। এই সময় কাণ্ড থেকে পেকটিন (pectin), আঠাল বস্তু (gum) এবং অন্যান্য পদার্থ নির্গত হয়। এর ফলেই তন্তুগুলি আলগা হয়ে পড়ে।

দু-ভাবে পচন পদ্ধতি পরিচালনা করা হয়।

1. ক্যামিকেল (chemical)-এর ব্যবহার। 2. জীবাণুর (microorgainsm) ব্যবহার।

কিন্তু আমাদের দেশে অতিরিক্ত মূল্যের জন্য ক্যামিকেল সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয় না। ভারত এবং পাকিস্তান সাধারণতঃ জীবাণুর সাহায্যেই পচন পদ্ধতি পরিচালনা করে।

পাট কাটার পর জমিতেই দু-দিন রেখে দেওয়া হয়। পাতাগুলি ঝরানোর জন্য। পাতাবিহীন লম্বা লম্বা কাণ্ডগুলো 30 থেকে 60 সেমি. গভীর জলের মধ্যে এক থেকে চার দিন রেখে দেওয়া হয়। কাণ্ডগুলোর উপর ধইনচা, অতসী প্রভৃতি বিছিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া নারকেল পাতা, শটীপাতা কচুরিপানা প্রভৃতিও বিছিয়ে দেওয়া হয় যাতে তাপমাত্রা সবসময় সমান থাকে। ঐ পাতাগুলো দিনের বেলায় সূর্যের অতিরিক্ত তাপ থেকে কাণ্ডগুলোকে রক্ষা করে এবং রাতের বেলায় ঠাণ্ডার প্রকোপ থেকেও রক্ষা করে। সবসময় একই রকম তাপমাত্রা রাখার উদ্দেশ্য হল জীবাণুগুলো সুষ্ঠুভাবে বংশবিস্তার করতে পারে। কিন্তু কখনই কলাপাতা ব্যবহার করা উচিত নয় কারণ কলাপাতা ট্যানিনে সমৃদ্ধ যা তন্তুগুলোর উৎকর্ষতা ব্যাহত করে। পাটকাণ্ডের গুচ্ছগুলোকে কাঠের, নারকেল গাছের কাণ্ড, সিমেন্টের ব্লক দিয়ে জলে ডোবান হয়। এখানেও কখনই কলাগাছের কাণ্ড ব্যবহার করা উচিত নয়। হাল্কা জল ব্যবহার করা হয় উৎকৃষ্ট তন্তুর জন্য। ঈষৎ নোনা জলেও কাজ চলে কিন্তু ভারী জল কখনই ব্যবহার করা উচিত নয়। জল কম থাকলে পচনের সময় বেশী লাগে। পাটে ট্যানিন থাকে, পচনের সময় এই ট্যানিন নির্গত হয় এবং জলের লোহার (iron) সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটায়, তাতে তন্তুর উপর কালো বা শ্যামলা দাগ পড়ে। এটা হয় যদি একই জল বার বার ব্যবহার করা হয় এবং জল যখন অল্প থাকে। কলা-গাছ বা পাতা ব্যবহারেও শ্যামলা দাগ দেখা যায়। এই শ্যামলা দাগ জৈব এবং অজৈব অম্ল দ্বারা দূর করা হয়। এছাড়া টক জাতীয় ফল যেমন তেঁতুল ব্যবহারেও এই দাগ তোলা যায়। তন্তুগুলো জলে ভিজে থাকা অবস্থায় এটা করা উচিত, না হলে অধিক পরিমানে তেঁতুল ব্যবহার করতে হবে

সংক্ষিপ্ত পচনের জন্য কতকগুলি প্রধান উপাদান

জলের অম্লতা বা ক্ষারত্ব	পচনের সময় (দিন)
5·0	10
4·5	12
জলের উষ্ণতা	
34°	7
36°	8
জমিতে সার প্রয়োগ	দিন
360 কেজি/হেক্টর	9
270 " "	10
গাছের বয়স 45 দিন	7
60 "	8

* উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী-741205

তন্তু নির্গমন পদ্ধতি

পচন শেষ হলে তন্তুগুলি পাটের কাণ্ড থেকে নির্গত করা হয়। কাণ্ডগুলি কাঠের দণ্ডের (mallets) দ্বারা মৃদু আঘাত করা হয় এবং তার ফলে তন্তুগুলো বাইরে বেরিয়ে আসে। পচন সম্পূর্ণ হয়েছে কিনা দেখবার জন্য প্রত্যেক গোছা থেকে একটি পাট কাণ্ড তুলে পরীক্ষা করতে হয়। তন্তু আলগা হয়ে গেলে তবেই নির্গমন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। পচন বেশী হলে দুর্বল তন্তু তৈরি হয়। আবার কম পচন হলে যদিও তন্তুগুলো খুব দৃঢ় হয় কিন্তু spining quality-র ক্ষতি হয়।

মাইক্রোবসের ভুমিকা :—নিম্নলিখিত জীবাণুগুলি পচনে সাহায্য করে।

মাইক্রোঅর্গানিজম	গ্রুপ
ব্যাসিলাস সাবটিলিস (Bacillus subtilis)	ব্যাকটিরিয়া
ব্যাসিলাস পলিমিক্সা (Bacillus polymyxa)	ঐ
ক্লসট্রিডিয়াম টারশিয়াম (Clostridium tertium)	ঐ
ক্লসট্রিডিয়াম ফেলসিমিয়াম (Clostridium felsimium)	ঐ
ফোমা (Phoma)	ছত্রাক
অ্যাসপারজাইলাস নাইজার (Aspergillus niger)	ঐ
মিউকর (Mucor)	ঐ
ম্যাকরোফোমিনা ফ্যাজিওলিনা (Macrophomina phaseolina)	ঐ

যেহেতু পাটগুলি জলে ডোবান থাকে তাই সেখানে অবাত-ব্যাকটেরিয়াদের (Anaerobic bacteria) প্রভাব বেশী। আবার অম্লধর্মী জলে ছত্রাকের প্রভাব বেশী দেখা যায়। উপরিউক্ত জীবাণু ও ছত্রাকের মধ্যে একমাত্র ক্লসট্রিডিয়াম ছাড়া আর সকলে পেকটিন ও হেমিসেলুলোজ নির্গত করতে সাহায্য করে। কারণ এই সমস্ত জীবাণু ও ছত্রাকে পেকটেজ ও হেমিসেলুলেজ জাতীয় উৎসেচক থাকে। সুতরাং উৎকৃষ্ট ও অধিক পরিমাণে তন্তু পেতে হলে পাটের পচন পদ্ধতি যাতে নির্ভুল হয় সেদিকে যথেষ্ট নজর রাখা উচিত।

মাতৃদুগ্ধ শিশুর পক্ষে কতটা প্রয়োজনীয়

সুবোধকুমার দত্ত

প্রকৃতি কেমন যুগ যুগ ধরে সহজ, স্বাভাবিক উপায়ে নবজাত শিশুর পুষ্টির ব্যবস্থা করে আসছে। এই প্রকৃতিসৃষ্ট মাতৃদুগ্ধ বা বিশ্বের প্রত্যেকটি শিশুর কাছে অমৃততুল্য খাদ্য। বিশেষ করে ভারতের মতো গরীব দেশে যেখানে শতকরা 70-80 ভাগ লোকই দরিদ্র, তাদের শিশুরা কৃত্রিম দুধ বা বিকল্প দুধের কথা চিন্তাই করতে পারে না। তারা পুরোপুরিভাবে মাতৃদুগ্ধের উপরই নির্ভরশীল। মাতৃদুগ্ধই তাদের জীবনধারণের একমাত্র সম্বল। একটি সুস্থ ও সবল শিশুর দৈনিক মাতৃদুধের প্রয়োজন প্রায় 425 মিলিলিটার যা থেকে সে তার দৈনিক প্রয়োজনীয় 700—1000 কিলোক্যালোরি তাপশক্তি পেতে পারে।

শিশু বিশেষজ্ঞের মতে দুধ শিশুদের পক্ষে সহজপাচ্য খাদ্য—বিশেষ করে মায়ের দুধ। প্রসবের পর প্রথম 3 দিন স্তনগ্রন্থি থেকে যে উচ্চ প্রোটিন এবং খনিজ লবণযুক্ত ঘন হলুদাভ দুধ নিঃসৃত হয় তাকে বলে কোলোস্ট্রাম (colostrum)। এটি নবজাত শিশুদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। 3 দিন পর থেকে প্রোটিনের মাত্রা ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং শর্করা (carbohydrate) ও স্নেহজাতীয় (fat) উপাদানের মাত্রা বাড়তে থাকে। প্রায় একমাস পর এটি পরিপূর্ণ (mature) মাতৃদুগ্ধে পরিণত হয়।

মায়ের দুধে প্রোটিনের পরিমাণ গরুর দুধ অপেক্ষা কম, কিন্তু শর্করার পরিমাণ বেশী। প্রাথমিক অবস্থায় শিশুর অন্ননালী থাকে সরল প্রকৃতির, তাই সে অধিক প্রোটিনযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে অক্ষম। এই পরিস্থিতিতে মায়ের দুধ তার পক্ষে অপরিহার্য। Barbara Hall of the Nuffield Institute of Comperative Medicine, London-এর এক সমীক্ষা থেকে জানা গেছে যে,—স্তন পান করার শেষের দিকে স্তন থেকে নিঃসৃত দুধের গাঢ়ত্ব এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় যখন শিশু দুধ খাওয়া বন্ধ করতে বাধ্য হয়। এর কারণ এই নয় যে, শিশুর খিদে নেই বা স্তন গ্রন্থি থেকে দুধ নিঃসৃত হচ্ছে না কারণ দেখা যায় তখন সে অপর স্তনে আনন্দ সহকারে দুধ খেতে পারে। তাই প্রাথমিক অবস্থায় কম প্রোটিনযুক্ত মায়ের দুধই প্রয়োজন।

নীচের ছক থেকে মায়ের দুধ এবং গরুর দুধের উপাদানের তুলনামূলক পার্থক্য দেখা যায় :—

উপাদান	মায়ের দুধ	গরুর দুধ
1. প্রোটিন (Im%)		
i) ক্যাসিনোজেন	0·4	2·7
ii) ল্যাকট্যালবুমিন	0·3	0·4
iii) ল্যাকটোগ্লবিউলিন	0·2	0·2
2. ল্যাকটোজ (Im%)	7·0	4·8
3. ফ্যাট (Im%)	3·8	3·7
4. খনিজ লবণ (mg%)	200	750
5. ফসফেট (Img%)	0·013	0·1
6. ভিটামিন	C. D. Nicotinic acid বেশী	C.D. Nicotinie acid কম
7. জল	৮8.0	88.0

ছোট্ট শিশুর দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য মাতৃদুগ্ধের অবদান অপরিসীম। মাতৃদুগ্ধ সেবনে অভ্যস্ত শিশুদের দেহে ল্যাক্টোব্যাসিলাস বাইফিডাস নামক একধরনের উপকারী ব্যাকটিরিয়া পাওয়া যায়—এরা চিনি জাতীয় জটিল খাদ্যকে ভেঙ্গে সরল খাদ্যে পরিণত করে।

যে শিশু মায়ের দুধ খেতে অভ্যস্ত তাদের প্রথম একমাস উদরাময়, আমাশয় ইত্যাদি রোগ হয় না। এর একমাত্র কারণ মায়ের দুধের মাধ্যমে শিশু এ সময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে IGA (Immunoglobulin) অ্যান্টিবডি পায়। এই IGA শিশুদের উদরাময়ের হাত থেকে রক্ষা করে।

মাতৃদুগ্ধ যেমন পুষ্টিকর তেমনি বিশুদ্ধও। দুগ্ধপানে শিশুকে পরিশ্রম করতে হয় না বললেই চলে, তাছাড়া দুগ্ধপান করিয়ে এবং দুগ্ধপান করে, মা এবং বাচ্চা উভয়েই শারীরিক এবং মানসিক দিক দিয়ে পরিতৃপ্তি লাভ করে। অধিকতর মানসিক উদ্বেগে মায়েদের দুধের পরিমাণ কমতে থাকে, যার প্রভাব পড়ে শেষ পর্যন্ত তার বাচ্চার উপর। এক্ষেত্রে শিশু অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগতে পারে।

কখনও মা যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, ক্যান্সার প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগলে সেক্ষেত্রে বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানো উচিত নয়। সেক্ষেত্রে বিকল্প দুধের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু বিকল্প দুধের সঙ্গে মেশান জল যেন সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত হয়। তাছাড়া অনেক কৃত্রিম দুধে (Farex, Lactogen প্রভৃতি) যে পলিস্যাকারাইড (Polysaccharides) খাদ্যকণা থাকে তা পরিপাক করার মত উৎসেচক (enzyme) শিশুদের দেহে থাকে না। ফলে অজীর্ণ রোগ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা বেশী। মাতৃদুগ্ধে ভিটামিন D এবং C এর মাত্রা গরুর দুধ অপেক্ষা বেশী। তারা যথাক্রমে রিকেট (ricket) এবং স্কার্ভি রোগ (scurvy) প্রতিরোধে সক্ষম।

চাতরা কুটির, চাতরা, পোঃ-শ্রীরামপুর, জিলা-হুগলী

কৃত্রিম দুধ খাওয়ানোর ফলে শিশুদের অস্বাভাবিক মোটা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু মাতৃদুগ্ধ সেবনে এই ভয় অনেকাংশে কম। শিশুকে দুধ পান করিয়ে মা দুরারোগ্য ব্যাধি 'স্তন ক্যান্সার'-এর সম্ভাবনা থেকে মুক্তি পেতে পারেন।

প্রথম 6—7 মাস পর্যন্ত শিশুর আদর্শ খাদ্যই মাতৃদুগ্ধ। কিন্তু তারপরে প্রোটিনের চাহিদা বাড়লে মাতৃদুগ্ধ শিশুর শারীরিক দিক দিয়ে যথেষ্ট নয়। গরুর দুধ, নরম ভাত, ডিম, ফলের রস ইত্যাদিও একান্ত প্রয়োজনীয়। মাতৃদুগ্ধে লৌহজাতীয় খনিজ পদার্থ না থাকায় প্রথম 5—6 মাস যকৃতে (Liver) সঞ্চিত লৌহজাতীয় খনিজ পদার্থ এই অভাব পূরণ করে এবং শিশুকে রক্তাল্পতার (anaemia) হাত থেকে রক্ষা করে। তাই ঠিক এই 5-6 মাস পর থেকে শিশুকে উপরিউক্ত খাদ্যগুলি থেকে এটি সংগ্রহ করতে হয়।

অবশেষে এটাই বলা যায় যে, মাতৃদুগ্ধই শিশুর পক্ষে অন্যান্য দুগ্ধ অপেক্ষা শ্রেয়। 'সুস্থ ও সবল শিশুই জাতির ভবিষ্যৎ'। কিন্তু বর্তমান সভ্যতার অগ্রগতিতে মানুষ আধুনিক জীবন-যাপনে অভ্যস্ত। জন্মানোর পর তাদের বাচ্চারা পায় না মায়ের সান্নিধ্য, পায় না মাতৃস্তন্য, তার পরিবর্তে তারা পায় 'স্প্রিং-চালিত দোলনা' এবং কৃত্রিম দুধসহ ফিডার-বট্‌ল'।

কিন্তু সুখের বিষয় বর্তমানে ভারতে এবং এমন কি পাশ্চাত্য দেশেরও অধিক সংখ্যক মায়েরা তাদের নির্বুদ্ধিতা বুঝতে পেরেছেন। ফলে তাঁরা নিজের বাচ্চাদের স্তন্যপান করিয়ে মানসিক তৃপ্তি লাভ করছেন।

বর্তমানে আমাদের সরকারও এই বিষয়ে বিশেষ মাত্রায় চিন্তিত এবং সম্প্রতি সরকার কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে যে—প্রত্যেক কৃত্রিম দুগ্ধ নির্মাতা কোম্পানীকে দুধের টিনের উপর লিখে দিতে হবে—"BREAST FEEDING IS BEST FOR YOUR CHILD."
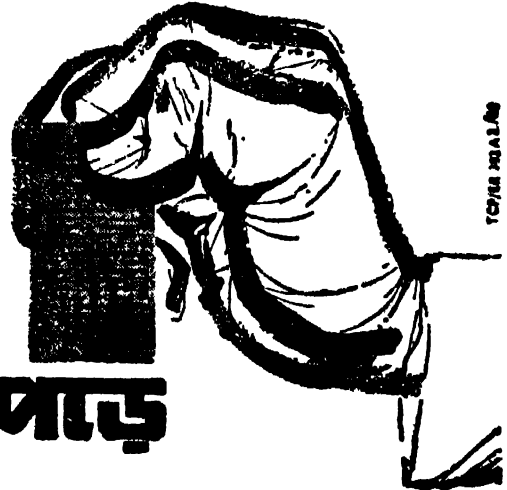
শিক্ষা ও সুস্থ সংস্কৃতির সম্প্রসারণে বামফ্রন্ট সরকারের নজীরবিহীন সাফল্য

শিক্ষা ঃ—শিক্ষাক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্য অবশ্যই নজীরবিহীন। ১৯৭৬-৭৭ এর ১২৯ কোটি টাকা থেকে বর্তমান বছরে শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ দাঁড়িয়েছে ৪৫৯ কোটি টাকায় যা উচ্চতম ব্যয়বরাদ্দের এক নজীর সৃষ্টি করেছে। নৈরাজ্যের অবসান ঘটিয়ে সরকার শিক্ষাজগতে সুস্থ এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে এনেছেন। দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয়েছে এবং পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হচ্ছে। ৩১ লক্ষ শিশুর মধ্যে বিনামূল্যে জলখাবার বণ্টন করা হচ্ছে। ৮০০০ নূতন প্রাথমিক ও ২০০০ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। ফলে প্রাথমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে ১৫ লক্ষ এবং মাধ্যমিক স্তরে ১৮ লক্ষ। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে নূতন পাঠ্যক্রম ও বিষয়সমূহ চালু হয়েছে। মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় সহ সরকারী উদ্যোগে হলদিয়া ও সল্ট লেকে দুটি কলেজ চালু করার কাজ প্রায় সম্পূর্ণ এবং অনুন্নত এলাকায় ২৩টি মহাবিদ্যালয় ইতিমধ্যে খোলা হয়েছে।

সাহিত্য কৃতির জন্য প্রতি বছর রবীন্দ্র, বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিম পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। মাদ্রাসার শিক্ষক ও অ-শিক্ষক কর্মীবৃন্দকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির সমানহারে [illegible] প্রদানের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষাকেন্দ্রগুলির সংখ্যা ১৬,৮০০-তে দাঁড়িয়েছে।

রাজ্যের গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৭৫৩ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৪১১ হয়েছে। রাজ্যের ২৪১১টি গ্রন্থাগারের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৪'৫০ কোটি টাকা।

শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সংশোধিত বেতনক্রমের সম্পূর্ণ আর্থিক দায়িত্ব সরকার স্বয়ং গ্রহণ করেছেন।

সংস্কৃতি ঃ—সংস্কৃতির নামে অসুস্থ প্রবণতার বিরুদ্ধে এই সরকার সুস্থ জীবনমুখী সংস্কৃতির বিকাশ ও প্রসারে সহায়তা করছেন। লেখকদের গ্রন্থ প্রকাশনা অনুদান, গ্রুপ থিয়েটার সহ সমস্ত [illegible] সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে উৎসাহ দান, প্রতিষ্ঠিত ও নবীন চলচ্চিত্রকারদের পরিচালনায় ছবি প্রযোজনা, দুটি নাট্যমঞ্চ নির্মাণ, কলকাতায় নির্মীয়মান একটি কালার ফিল্ম লেবরেটারি এবং একটি আর্ট কম্‌প্লেক্‌স্ শিল্প-চর্চার প্রসারের ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের ঐকান্তিক উদ্যোগের পরিচায়ক।

যুবকল্যাণ ঃ—সীমিত ক্ষমতা সত্ত্বেও যুবকল্যাণ প্রসারে বামফ্রন্ট সরকারের প্রয়াস লক্ষ্যণীয়। ৩৩১টি ব্লকে যুবদপ্তর স্থাপিত হয়েছে এবং ৪০০০ যুবকের কর্মসংস্থান-এর জন্য ৬'৮০ কোটি টাকা অর্থসাহায্য দান করা হয়েছে। তফসিলী জাতি ও উপজাতির প্রায় ১৭০০০ যুবককে কারিগরী শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কলকাতায় একটি সর্বব্যবস্থাযুক্ত রাজ্য যুব যুব কেন্দ্র স্থাপনও বামফ্রন্ট সরকারের কৃতিত্ব।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ/৬০১৬/বিজ্ঞাপন তাং ১৪।৮৪

ক্যামেরা ছাড়াই ছবি

সুনীতিকুমার মণ্ডল*

সাধারণভাবে 'ছবি তোলা' বললেই সর্বপ্রথম একটি ক্যামেরার কথা মনে আসে। ছবি তোলার সঙ্গে ক্যামেরার প্রায় অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথাও সত্য। তবে অন্যান্য অনেক ব্যতিক্রমের মত বিশেষ ক্ষেত্রে এখানেও ব্যতিক্রম আছে। আলোকচিত্র জগতের এই চলতি নিয়মের হেরফের নিয়েই আজকের এই নিবন্ধ

ক্যামেরা ছাড়াই ছবি বিষয়টি বেশ কয়েক বছর আগে আমাকেও কয়েকটি দিন বিব্রত করেছিল—যখন প্রথম আমি বিষয়টি শুনি। মনের উপর অবিশ্বাসের কিছুটা ছায়া পড়লেও প্রকাশ করার মত সাহসের অভাব ছিল যেহেতু বক্তা ছিলেন আলোকচিত্র জগতের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। অবশ্য এটাও জানা ছিল যে কয়েকটি দিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার পরই হাতে-কলমে পদ্ধতিটি শেখার সুযোগ আসবে এবং সত্যি কয়েক দিন পরই সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে ছবি হলো—ক্যামেরা ছাড়াই। আলোকচিত্রের ইতিহাসের পথ ধরে পিছন দিকে কিছুটা হাঁটলে দেখতে পাই একটা সময় বিষয়বস্তুর ছায়া ফেলে ছবি তৈরি করার প্রচলন ছিল। তখন অবশ্য উন্নত ছবি তৈরির পদ্ধতিগুলিও জানা ছিল না।

আমরা যে ধরণের ছবি সচরাচর দেখতে অভ্যস্ত এই পদ্ধতিতে তৈরী ছবিগুলি কিন্তু সে রকম হয় না এবং আমার সন্দেহ হচ্ছে এগুলি আদৌ ছবি হিসাবে সবার কাছে স্বীকৃত হবে কিনা। এই ধরণের ছবিগুলিকে আলোকচিত্র না বলে ফটোগ্রাম (Photogram) বা স্যাডোগ্রাম (Shadowgram) বলার চল আছে। আমার মনে হয় স্যাডোগ্রাম কথাটি অনেক বেশী উপযুক্ত যার বাংলা করলে দাঁড়ায় 'ছায়াচিত্র'। ছায়াচিত্র বললে আলোকচিত্রের সঙ্গে এর তফাৎটি যেমন এক কথায় বোঝান সম্ভব সে রকম নামের মধ্যেই এই পদ্ধতির আসল তত্ত্বটিরও সন্ধান পাওয়া যায়। ছবির বিষয়বস্তুকে সরাসরি আলোকচিত্রের কাগজে রেখে উপর থেকে আলো ফেলে 'ছায়া' সৃষ্টি করেই এই ছবি করা হয়।

এই পদ্ধতিটি বুঝবার সুবিধার জন্য খুবই সাধারণ ভাবে আলোকচিত্র সম্বন্ধে একটু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি। ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলার আগেই ক্যামেরায় একটি ফিল্ম লাগিয়ে নিতে হয়। ছবি তোলার সময় ক্যামেরার লেন্সের মধ্য দিয়ে বিষয়বস্তুটির (Subject) ছবি ফিল্মে গিয়ে পড়ে। আসলে বিষয়বস্তুর প্রতিটি বিন্দু থেকে আলো লেন্সের মধ্য দিয়ে প্রতিসৃত হয়ে ফিল্মের উপর একটি উল্টো প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করে। ফিল্মটির উপর আলো সংবেদনশীল রাসায়নিক পদার্থের (Silver Chloride, Silver Bromide) আস্তরণ থাকে বলে আলো লাগলেই একটি অদৃশ্য পরিবর্তন ঘটে যায়।

সাধারণতঃ বিষয়বস্তুটি সমানভাবে আলোকোজ্জ্বল হয় না, তাই স্বাভাবিক ভাবে প্রতি বিন্দুতে আলোর বিচ্ছুরণেরও তারতম্য ঘটে থাকে। ছবি তোলার সময় বিষয়বস্তুর গা থেকে প্রতিফলিত হয়ে আসা বিভিন্ন ক্ষমতার আলো ফিল্মের রাসায়নিক আস্তরণে ভিন্ন ভিন্ন রকম পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে। একেবারে আলোকিত নয় এমন জায়গা থেকে কোন আলোই প্রতিফলিত হয় না, তাই ঐসব স্থানে ফিল্মটির রাসায়নিক স্তর অপরিবর্তিত থাকে। ছবি তোলার পর ফিল্মটি ডেভেলপ (Develop—সাধারণ কথায় Wash) করলে অদৃশ্য পরিবর্তন দৃশ্য হয়ে ওঠে একটি উল্টো ছবি হয়ে। এটিই
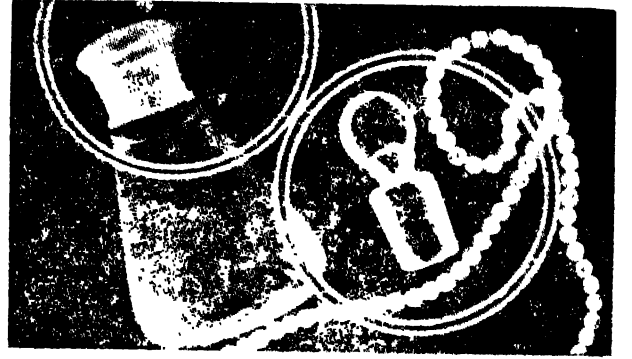
কাচের কয়েকটি স্বচ্ছ ও অর্ধস্বচ্ছ জিনিষের ছবি

আসলে ছবির নেগেটিভ এবং এখানে বিষয়বস্তুর সবকিছুই বিপরীত দেখায়। যেমন মানুষের ছবি তুললে চুল, চোখের তারা, ভ্রূ প্রভৃতি কাল অংশগুলি থেকে কোন আলো প্রতিফলিত হয় না বলে নেগেটিভে ঐ সব জায়গাগুলিতে কোন পরিবর্তন হয় না—তাই সম্পূর্ণ স্বচ্ছ থাকে—অপর দিকে দাঁত সব থেকে সাদা বলে বেশি আলো প্রতিফলিত হয়—তাই নেগেটিভে দাঁত (অবশ্য যদি দেখা যায়) কাল দেখায়। অন্যান্য অংশ থেকেও কম ও বেশীর মাঝামাঝি নানা ক্ষমতার আলো প্রতিফলিত হয় বলে নেগেটিভে নানা ঘনত্বের ধূসর রং দেখতে পাওয়া যায়।

ডেভেলপ করার সময় ফিল্মের আলো-লাগা অংশগুলিতে কাল রং-এর ধাতব রৌপ্যের আস্তরণ (Metalic Silver Deposition) পড়ে কিন্তু আলো না-লাগা অংশগুলি থেকে রূপার লবণ (Silver Salt) ধুয়ে গিয়ে জায়গাটিকে স্বচ্ছ করে। এই নেগেটিভ যখন আলোকচিত্রের কাগজে ছাপা (Print) হয় তখন বিষয়বস্তুর আসল রূপটি ফুটে ওঠে কারণ নেগেটিভের স্বচ্ছ অংশ দিয়ে আলো গিয়ে কাগজে লাগতে পারে কিন্তু কাল অংশ দিয়ে আলো যেতে পারে না। তাই পজিটিভে (Positive) নেগেটিভের (Negative) সম্পূর্ণ

* ছায়া ভিলা, কলেজ পাড়া, পো: কালিয়াগঞ্জ, পশ্চিমদিনাজপুর-733129

বিপরীত ছবিসৃষ্টি হয়। পজিটিভ ছবিতে ধপধপে সাদা (আলোকিত অংশ) এবং কুচকুচে কাল (অন্ধকার অংশ) রং-এর মধ্যবর্তী নানা ঘনত্বের ধূসর রং দেখা যায় যা সবই সৃষ্টি হয় বিষয়বস্তুটির বিভিন্ন অংশে আলোর তারতম্যের ফলে। এই রকম হয় বলেই ছবি সত্যিকারের ছবি হয়ে ওঠে।

আলো-সংবেদনশীল ফিল্ম-এ কম-বেশী আলো পড়ার জন্যই যদি ছবি হয় তাহলে সরাসরি কাগজের উপর ছবি

ছোট ছোট কয়েকটি ফুল ও পাতার ছবি

করলে কি দাঁড়াবে? ছবি নেগেটিভের মত দেখতে হবে। নেগেটিভের মত ছবি দেখতে মনে হয় খুব একটা ভাল লাগবে না। কিন্তু ছবি মানে তো লোকজন, জীবজন্তু, প্রাকৃতিক দৃশ্য ইত্যাদি যেসব ছবি সচরাচর আমরা তুলে থাকি তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। একটু অন্য রকম ছবি করতে দোষ কি। আলোকচিত্রের মূলনীতি আলো-সংবেদনশীল ফিল্ম বা কাগজে আলো লাগলে কাল হবে—আলো না লাগলে সাদা থাকবে। এই নীতিকে যদি সঠিক ভাবে কাজে লাগান যায় তাহলেই অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি করা যেতে পারে—ক্যামেরা ছাড়াই।

আমাদের আশেপাশে ছোট-খাট যেসব জিনিষপত্র দেখি তার মধ্যে অনেক কিছুই কাঁচ ও প্লাস্টিকের। ছায়াচিত্র তৈরি করতে এই রকম স্বচ্ছ, অর্ধস্বচ্ছ নানা আকৃতির জিনিষের বিশেষ এক ভূমিকা আছে। এইসব জিনিষে আলো ফেললে অদ্ভুত রকমের নানা ধরনের আলোর বিচ্ছুরণ হয় যা পরিকল্পনা মত কাজে লাগাতে পারলে উল্লেখযোগ্য ছবি সৃষ্টিতে অতুলনীয়। তাছাড়া আছে নানা আকৃতি ও গঠনের বিচিত্র সব লতা, পাতা, ফুল, ফল, ডাল, কাঁটা, শামুক ও ঝিনুকের খোলা ইত্যাদি আরও কত কিছু। মন দিয়ে খুঁজলে পাওয়া যাবে এই রকম অজস্র জিনিষপত্র যা অনায়াসে হতে পারবে ছবির বিষয়বস্তু। এছাড়া আছে সেলোফেন কাগজ, বাঁকাচোরা তার, ধূপবাতি ও সিগারেটের ধোঁয়া। কাচের উপর তেল বা ভেসলিনের প্রলেপ লাগিয়েও নূতন ধরনের প্যাটার্ন সৃষ্টি করা যেতে পারে। এবার একটি ছবি করা যাক। ছবির পরিকল্পনা ও বিষয়বস্তু আগে থেকে ঠিক করে সেই মত জিনিষপত্র, ফটোগ্রাফি কাগজ, টেবিল ল্যাম্প নিয়ে ডার্করুমে যাওয়া হলো। কাগজ খোলার আগে ডেভেলপ করার জন্য চারটি ট্রে-তে প্রয়োজনীয় সবকিছু সাজিয়ে কাজ আরম্ভ করতে হয়। ঘরের সাদা আলো নিভিয়ে লাল, কমলা কিংবা হলুদ সেফ লাইট (Safe light) জ্বালিয়ে নেওয়া হলো। এবার একটি আলোকচিত্রের কাগজ টেবিলে রেখে ছবির পরিকল্পনা অনুযায়ী জিনিষপত্রগুলি কাগজে সাজিয়ে নেওয়া হলো। তারপর টেবিল ল্যাম্পের সাহায্যে প্রয়োজনমত সময় ধরে কাগজে আলো ফেলা হলো। ঘরের সাধারণ সাদা আলোটিও এই কাজে ব্যবহৃত হতে পারে তবে সেক্ষেত্রেও 25 ওয়াট বাল্ব ব্যবহার করলে সুবিধা হয়। আর আলোটি বিভিন্ন উচ্চতায় ওঠান-নামানর ব্যবস্থা থাকলে আরও ভাল হয়।

এবার কাগজটিকে ডেভেলপ করতে হবে। এর জন্য প্রথম ট্রেতে আছে ডেভেলপার, দ্বিতীয়টিতে স্টপার (জলের সঙ্গে দু-এক ফোঁটা অ্যাসিটিক অ্যাসিড), তৃতীয়টিতে আছে ফিক্সার (হাইপোর দ্রবণ) আর চতুর্থটিতে আছে সাধারণ জল। কাগজটি প্রথম ট্রেতে সমান ভাবে চুবিয়ে একটু নাড়াচাড়া করলেই অল্প সময়ের মধ্যেই দেখা যাবে ছবিটি ফুটে উঠছে। দেড়-দু-মিনিট ডেভেলপ করে কাগজটি দ্বিতীয় ট্রেতে দশ-পনর সেকেণ্ড রেখেই তৃতীয় ট্রেতে দেওয়া হলো। এখানে দশ-পনর মিনিট রাখার পর কাগজটিকে চতুর্থ ট্রেতে দেওয়া হলো। এক ঘণ্টা ধরে বার বার জল পাল্টে খুব ভাল ভাবে ছবিটি ধুয়ে নেওয়া হলো। ওয়াস বেসিন থাকলে ছবি ধোয়ার কাজটি খুবই সহজে করা যায়। ছবি

জ্বেলে দেওয়ার পরই ঘরের সাধারণ আলো জ্বেলে নেওয়া যেতে পারে। ছবিটি ধোয়ার পর শুকিয়ে নিলেই কাজ শেষ।

একটি প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যাচ্ছে—লোকজন, জীবজন্তু, প্রাকৃতিক দৃশ্য এ সব ছবিই যদি না হবে তাহলে কি দরকার এই পদ্ধতির? নিরাশ হওয়ার কিছু নেই—সাধারণ ছবি না করা সরাসরি সহজে লিপিবদ্ধ করার জন্য এই পদ্ধতি খুবই কাজের অবশ্য খুবই দুঃখের বিষয় এই পদ্ধতিটি বহুল প্রচলিত নয়।

এই পদ্ধতিতে পিকটোরিয়েল(Pictorial) ছবি করার প্রচুর সম্ভাবনা আছে এবং অল্পবিস্তর প্রচলনও আছে। অনেক সময় কোন নেগেটিভ প্রিন্ট করতে গিয়ে আংশিক ভাবে এই পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে অপূর্ব ফল পাওয়া যায়। আবার সম্পূর্ণ এই পদ্ধতিতেই

কাচের বাটির মধ্যে আলো ফেলে এই প্যাটার্ন হয়েছে

গেলেও এই ভাবে অনেক নূতন ধরণের ছবি করা যায়—যা অন্য ভাবে পাওয়া সম্ভব নয়। উদাহরণ হিসাবে এখানে কয়েকটি ছবি দেওয়া হলো। মানুষের মুখের ছবিও হতে পারে তবে সে ক্ষেত্রে পার্শ্বে চিত্র করলেই ভাল দেখায়। এই রকম সাদা বা হালকা ধূসর পার্শ্ব চিত্রকে ব্যাকগ্রাউণ্ড করে একই ব্যক্তির পার্শ্ব চিত্রের নেগেটিভ প্রিন্ট করলে খুবই ভাল ফল পাওয়া যায়।

গবেষণার ক্ষেত্রে ছোট ছোট নানা জিনিষের আকৃতি ও গঠন মূল্যবান বিমূর্ত ছবি হতে পারে। (এই ধরনের ছবি বেশ বড় মাপের হওয়ায় প্রবন্ধের সঙ্গে কোন ছবি দেওয়া সম্ভব হলো না)। এই পদ্ধতিতে শিল্প সৃষ্টি করার জন্য চাই পরিকল্পনা মত জিনিষ এর নির্বাচন, আলোর দূরত্ব ও কোণ নির্বাচন এবং ছবিতে জিনিষগুলির সুষ্ঠ বিন্যাস। আর সর্বোপরি প্রয়োজন শিল্পরুচি, শিল্পীসুলভ মৌলিক কল্পনা, সৌন্দর্যবোধ ও সৃজনশীল মন।

অন্ধত্ব নিবারণে চক্ষুব্যাংক

কমল চক্রবর্তী[1]

অন্ধত্ব মানুষের জীবনে এক বড় অভিশাপ। তবে বিজ্ঞানের কল্যাণে আজকাল অন্ধদের এক বিরাট অংশ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাচ্ছে। অন্ধদের উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষা দিতে পারলে তারাও অন্যান্য মানুষদের মত বাঁচার সার্থকতা খুঁজে পাবে। অন্ধত্ব মানুষের জীবনে বিরাট বাধা ঠিকই, কিন্তু এই বাধাকেও অতিক্রম করে জীবনে সাফল্যলাভ করেছিলেন হেলেন কেলার। তিনি শুধুমাত্র দৃষ্টিহীন ছিলেন না, সেইসঙ্গে ছিলেন শ্রবণশক্তিহীন। তাঁর বাক্‌শক্তিও অত্যন্ত ক্ষীণ ছিল। অন্ধদের শিক্ষার জন্য যে ব্রেইল বর্ণমালা ব্যবহার করা হয়, সেই বর্ণমালার শিক্ষা নিয়েছিলেন তিনি। শিক্ষার ফলে তাঁর হাত দিয়ে বিখ্যাত বিখ্যাত বই বেরিয়েছে। তিনি অন্ধদের ব্যথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে তাদের ব্যথা দূর করার জন্য আজীবন চেষ্টা চালিয়েছেন। তিনি আমেরিকান ফাউণ্ডেশন ফর ব্লাইণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

দৃষ্টিহীনদের জ্ঞানের আলো বিতরণ করা সত্যিই সুখের ব্যাপার, কিন্তু যদি তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়া যায় তবেই তো তারা আরও বেশী লাভবান হবে। যাদের অচ্ছোদপটল (কর্নিয়া) স্বচ্ছতা হারিয়ে দৃষ্টিহীন হয়েছে তাদের পূর্ণ দৃষ্টি পাওয়া সম্ভব, এর জন্য একজনের কর্নিয়া অন্যকে দান করার প্রয়োজন। তবে এ ব্যাপারে অসুবিধে হচ্ছে চোখের কর্নিয়া সংগ্রহ করা নিয়ে। মানুষ বিভিন্ন কারণে মৃত্যুর পরেও তার চোখ অপরকে দান করার অঙ্গীকার করতে পারছে না। এর ফলে প্রয়োজনীয় কর্নিয়া পাওয়া যাচ্ছে না। মানুষের কল্যানমুখী মনকে জাগিয়ে তুলতে পারলে মানুষের মৃত্যুর পর তার চোখকে ব্যবহারের অনুমতি দিতে বাধা হবে না। এই চোখ সংগ্রহের জন্য চক্ষু-ব্যাংক গঠন করা হয়েছে। এই ব্যাংক বৈজ্ঞানিক উপায়ে সুস্থ কর্নিয়া সংগ্রহ করে এবং তা প্রয়োজনমত অপরকে সরবরাহ করে। কর্নিয়ার অস্ত্রোপচার এবং তা অন্যের চোখে ঠিকভাবে স্থাপন বর্তমানে সাফল্যের সঙ্গেই সম্ভব হচ্ছে। কর্নিয়া রক্তনালী খুব কম থাকায় অন্যের দেহের টিসুর সঙ্গে সহজেই তা মিল খায়। এ কাজ করার জন্য উপযুক্ত শল্যচিকিৎসক প্রয়োজন, নইলে এত মূল্যবান কর্নিয়া নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

অন্ধদের মধ্যে যাদের বয়স 18 থেকে 40, তাদের ক্ষেত্রে নতুন কর্নিয়া সংযোজন করে বেশী সুফল পাওয়া গেছে। সাধারণত কর্নিয়া তুলে আনার কাজটা কোন ব্যক্তির মৃত্যুর 2-3 ঘণ্টার মধ্যেই করতে হয়। কর্নিয়া হল চোখের সামনের স্বচ্ছ অংশ। চক্ষু-ব্যাংকের রেফ্রিজারেটরে চোখ রাখা হয় খুব সযত্নে।

চক্ষু-ব্যাংক দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এবং এই জনপ্রিয়তার জন্য একটি মার্কিন প্রতিষ্ঠান মূলতঃ কৃতিত্ব দাবি করতে পারে। প্রতিষ্ঠানের নাম ইনটারন্যাশনাল আই ফাউণ্ডেশন সংক্ষেপে আই. ই. এফ। এই প্রতিষ্ঠান 1961 খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ওয়াশিংটন ডিসিতে। তখন তার নাম ছিল ইন্টারন্যাশনাল আই ব্যাংক। এই ব্যাংক কর্নিয়াঘটিত অন্ধ বা প্রায়-অন্ধ মানুষের বন্ধুস্বরূপ। এই প্রতিষ্ঠান অন্ধত্ব দূরীকরণে গবেষণা আর প্রশিক্ষণের কাজে সাহায্য করে। বিদেশে চক্ষু-ব্যাংক খোলার ব্যাপারেও এই প্রতিষ্ঠানটি সর্বপ্রকার সাহায্য করে থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে চক্ষু-বিশেষজ্ঞগণ এসে এই ব্যাংকে প্রশিক্ষণ নেন।

যদিও চক্ষু-ব্যাংক স্থাপিত হয় 1961 খৃস্টাব্দে কিন্তু একজনের থেকে অন্যজনে কর্নিয়ার স্থাপন ঘটেছিল অনেক আগে 1940 খৃস্টাব্দে। প্রথম দিকে একাজ ঠিকমত করা যেত না এবং অনেক কর্নিয়াই নষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু আই. ই. এফ-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং মেডিক্যাল ডিরেক্টর ডাঃ জন এইচ কিং কর্নিয়াকে জলমুক্ত করে ঘরের উষ্ণতায় তা সংরক্ষণের এক বিশেষ উপায় আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের ফলে একটি চোখকে সহজেই পৃথিবীর এক দেশ থেকে অন্য দেশে এনেও কাজে লাগান সম্ভব হয়েছে। তবে এই কাজে সফল হতে হলে শুধু, আই. ই. এফ থেকে চোখ পাঠালেই হবে না, যে দেশে সেটি যাবে, সেখানে উপযুক্ত চিকিৎসবিদ ও যন্ত্রপাতি থাকা দরকার।

ভারতে চক্ষু-ব্যাংকের সংখ্যা এখন বেড়ে গিয়ে 34 টিতে দাঁড়িয়েছে। এই ব্যাংকগুলির কাজকর্ম দেখাশোনা করা এবং তার প্রয়োজন মেটানোর ব্যাপারে নতুন দিল্লীর ন্যাশানাল আই ব্যাংক যথেষ্ট সাহায্য করছে। এই ব্যাংকের বিশেষজ্ঞরা জনসাধারণের কাছে চক্ষু-ব্যাংকের কাজ তুলে ধরেন এবং মৃত্যুর পর তাদের চক্ষুদানে উৎসাহ দেন। চোখ খারাপ হলে সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু-বিশেষজ্ঞদের কাছে যাওয়ার জন্য তাঁরা পরামর্শ দেন।

সারা ভারতে অন্ধের সংখ্যা 60 লক্ষেরও বেশী। তবে একেবারে অন্ধ নয়, অথচ প্রায় অন্ধ এমন লোকের সংখ্যা ভারতে আনুমানিক তিন কোটি। পশ্চিমবঙ্গে অন্ধের সংখ্যা দু'লক্ষের উপর। এদের মধ্যে বসন্ত, অপুষ্টি, আঘাত, অপথ্যালমিয়া প্রভৃতির জন্য যাদের কর্নিয়া অস্বচ্ছ হয়ে গেছে তাদেরকে কর্নিয়া গ্রাফটিং-এর সাহায্যে অন্ধত্ব থেকে বাঁচানো যেতে পারে। কলকাতার নীলরতন সরকার এবং মেডিকেল কলেজে দুটি চক্ষু-ব্যাংক আছে। সম্প্রতি ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে আই. ই. এফ-এর সহযোগিতায় আর একটি চক্ষু-ব্যাংক খোলা হয়েছে।

ভারতে এবং পৃথিবীর অনুন্নত দেশে দেখা যায় অন্ধত্বের মূলে আছে হানি, অপুষ্টি ও বসন্তরোগের এবং আইটাইটিস,

[পরের অংশ 238 পৃষ্ঠায় দেখুন]

[1] কালিন্দী হাউসিং এস্টেট, ফ্ল্যাট নং সি—39/5, কলিকাতা-89

কোণের ত্রিখণ্ডীকরণ অসম্ভব কেন?

নন্দলাল মাইতি*

সমস্যা আছে, থাকেও। কোন কোন সমস্যার সমাধান হয়, কিন্তু সব সমস্যার সমাধান সব সময় সম্ভব নয়। এমন কি কোন কোন সমস্যার সমাধান আদৌ সম্ভব নয় বলে মনে হয়। যে-কোন কোণের ত্রিখণ্ডীকরণ ঠিক এই গোত্রের একটি সমস্যা। তবে আমরা যে কোন কোণই ত্রিখণ্ডিত করতে পারি না তা নয়। যে-সব কোণের ত্রিখণ্ডন সম্ভব তাদের মান 360/n ডিগ্রী ধরনের, যেখানে n একটি অখণ্ড সংখ্যা যা 3 দ্বারা অবিভাজ্য; আর যে-সব কোণের ত্রিখণ্ডন অসম্ভব তাদের মান 360/n ডিগ্রী ধরণের, যেখানে n একটি অখণ্ডসংখ্যা যা 3 দ্বারা বিভাজ্য। আমরা অনেকেই জানি, 180° বা 90°-কে রুলার কম্পাসের সাহায্যে খুব সহজে সমান তিন অংশে ভাগ করা যায়। অর্থাৎ 60° বা 30° অঙ্কন রুলার-কম্পাসের সাহায্যে সম্ভব। কিন্তু 120°-কে সমান তিন অংশে ভাগ করা যায় না রুলার-কম্পাসের সাহায্যে 40° অঙ্কন সম্ভব নয়।

গ্রীকদের রুলার-কম্পাসের সাহায্যে জ্যামিতিক চিত্রাঙ্কনের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। রুলার-কম্পাসের প্রতি আগ্রহের প্রধান কারণ সম্ভবত সরলরেখা ও বৃত্ত সবচেয়ে সহজ ও সরলতম রেখা, আর তা সুন্দরও বটে। মহামতি প্লেটো জ্যামিতিতে রুলার-কম্পাস ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকার যন্ত্রাদি ব্যবহার বিষয়ে বিধি-নিষেধ আরোপ করেন। অবশ্য গ্রীকরা অন্য প্রকার যন্ত্রাদি ব্যবহার করে যে জ্যামিতিক গবেষণা করেন নি তা নয়। অ্যাপোলোনিয়াস তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু প্লেটোর বিধি-নিষেধের ফলে তাঁর কাণিক জ্যামিতি বহুদিন অনাদৃত ও উপেক্ষিত ছিল। সে যাই হোক, কোণের ত্রিখণ্ডীকরণ সমস্যা সমাধানে প্রাচীনকাল থেকে বহুগণিতজ্ঞ প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। প্রথম প্রশংসনীয় প্রয়াস হিপিয়াস (Hippias)-এর। তিনি ছিলেন সক্রেটিসের সমসাময়িক এবং এলিস-এর অধিবাসী। সম্ভবত 460 খ্রীস্টপূর্বাব্দে পেলোপোনেসিয়ার এলিস (Elis)-এ জন্মগ্রহণ করেন। হিপিয়াস এই সমস্যার সমাধানে সফল না হলেও এ-বিষয়ে তাঁর গবেষণা থেকে নতুন একটি বক্ররেখা উদ্ভাবিত হলো। তার নাম কোয়াড্রেট্রিকস (Quadratrix)। হিপিয়াস পারেন নি, আরো অনেক গ্রীক গণিতজ্ঞও পারেন নি, এমন কি বিংশ শতাব্দীর এই অভাবনীয় গাণিতিক সমৃদ্ধির যুগেও কোন গণিতজ্ঞ এই সমস্যার সমাধন করতে পারেন নি। তাই স্বাভাবিক ভাবেই এই প্রশ্ন উঠতে পারে কেন এই সমস্যার সমাধান করা যাচ্ছে না। এর উত্তর দেবার আগে তাদের আরো কয়েকটি কথা জানলে ভাল হয়।

গণিতে কেবলমাত্র সমস্যার সমাধান করাই হয় না, কোন সমস্যা কি কারণে সমাধান করা যাচ্ছে না তার অনুসন্ধানও করা হয়। গাণিতিক গবেষণার এই দিকটির প্রতি নজর দেওয়ার সময় আসে এক ধরনের বীজগাণিতিক সমীকরণ সমাধানকে কেন্দ্র করে। বস্তুত ইটালীয় গণিতজ্ঞ রুফিনি (Ruffiini) ও নরওয়ের গণিতজ্ঞ অ্যাবেল (Abel) এই নব অধ্যায় সূচনা করেন। রুলার-কম্পাসের সাহায্যে কোণের ত্রিখণ্ডীকরণ করতে গেলে—সাধারণভাবে অঙ্কন করতে গেলে কয়েকটি শর্ত মেনে চলতে হয়। সহজ ও সরলতম ভাষায় শর্তগুলি নিম্নরূপ :

রুলার-কম্পাসের সাহায্যে একটি রাশি বা দৈর্ঘ্য অঙ্কন করা যেতে পারে যদি এবং কেবলমাত্র যদি এই রাশি বা দৈর্ঘ্য প্রদত্ত তথ্য (data) অর্থাৎ দৈর্ঘ্য থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক মূলদ প্রকরণ (operation) এবং বর্গমূল নির্ণয়ের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়।

আমরা জানি, কার্তেজীয় সমতলে যে-কোন সরলরেখা একঘাত সমীকরণের লেখ দ্বারা সূচিত হয়। আর বৃত্তের ক্ষেত্রে দ্বিঘাত সমীকরণের লেখ দ্বারা। কেবলমাত্র রুলার-কম্পাসের দ্বারা অঙ্কনের শর্ত থেকে জানা যাচ্ছে মাত্র পাঁচটি প্রকরণ বা প্রক্রিয়া কার্যকরী — যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ ও বর্গমূল নির্ণয়। যে-কোন রেখাংশ n-এর ক্ষেত্রে এগুলি প্রযোজ্য, কিন্তু রুলার-কম্পাসের সাহায্যে ঘনমূল নির্ণয় অসম্ভব। বৈশ্লেষিক জ্যামিতি ও বীজগণিতের সংখ্যা-ক্ষেত্র (number field) থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, X ও Y অক্ষের সমতলে অঙ্কনযোগ্য বিন্দু সেইগুলি যে-সবের বিশেষ ধরনের বাস্তব বীজ (real roots) আছে।

1837 খৃস্টাব্দে একটি গণিত পত্রিকার সর্বপ্রথম P. L. Wantzel কোণের ত্রিখণ্ডীকরণের অসম্ভাব্যতা প্রমাণ করেন। তাঁর প্রমাণটি এখানে আলোচিত না হলেও সে সম্পর্কে দু-একটি কথা বলা যেতে পারে।

চিত্রে (239 পৃঃ) কার্তেজীয় সমতলে 60° কোণের শীর্ষ-বিন্দুটির কথা বিবেচনা করা যাক। এই শীর্ষবিন্দুটি X ও Y অক্ষদ্বয়ের মূল বিন্দুতে অবস্থিত। O-কে কেন্দ্র করে একক ব্যাসার্ধের একটি বৃত্ত অঙ্কন করা হলো। চিত্রে 60° কোণের ত্রিখণ্ডীকারী রেখাটি OP; এই রেখাটি বৃত্তটিকে P বিন্দুতে ছেদ করেছে। এখন যদি কেবলমাত্র রুলার-কম্পাসের সাহায্যে P বিন্দুর অবস্থান নির্ণয় করা যায়, তাহলে যে-কোন কোণের ত্রিখণ্ডন সম্ভব। কিন্তু তা সম্ভব নয়। সুতরাং একটি কোণ

[237 পৃষ্ঠার পরের অংশ]

কেরাটাইটিসের আক্রমণ। অন্ধত্ব যা আমাদের সমাজের এক বিরাট সমস্যা তাকে দূর করার জন্য সমগ্র মানব-সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। চক্ষু-ব্যাংকের বিশেষজ্ঞদের ডাঃ জন. এইচ.কিং-এর আদর্শ মেনে সমাজের কাজে নিজেদের নিযুক্ত রাখতে হবে। এর ফলে অন্ধত্বের কবল থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ নতুন এক আলোর খোঁজ পাবে।

* ঠাকুরবাটীতক, হুগলী,

60°-র ক্ষেত্রে সম্ভব হচ্ছে না বলে সাধারণভাবে কোণের ত্রিখণ্ডীকরণের সাধারণ পদ্ধতি নেই।

যে-বিশেষ কোণের জ্যামিতিক রূপ নিয়ে আলোচনা করা হলো তার একটি বীজগাণিতিক রূপ দেওয়া যেতে পারে। মনে করা যাক, θ একটি কোণ এবং $\text{Cos}\theta=p$; ত্রিখণ্ডিত করার অর্থ হচ্ছে এমন একটি অজ্ঞাত রাশি x নির্ণয় করা

যাতে $x=\text{Cos}\ (\theta/3)$, $\theta/3$-এর Cosine-এর সঙ্গে $\text{Cos}\theta$-র সম্পর্ক নিম্নরূপ :

$$\text{Cos}\theta=p=4\ \text{Cos}^3\ (\theta/3)-3\ \text{Cos}\ (\theta/3)$$
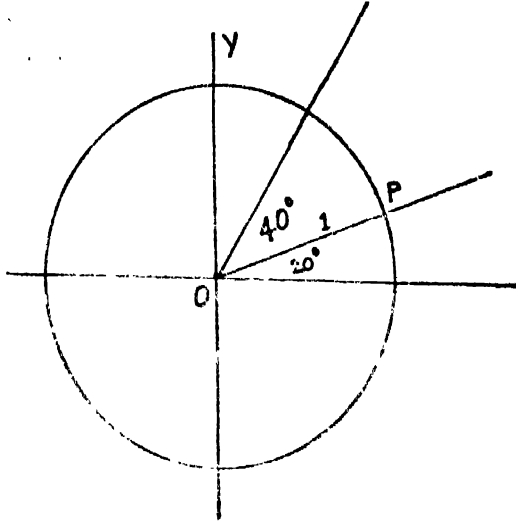
$\text{Cos}\theta=p$-এর θ কোণের ত্রিখণ্ডীকরণ করার অর্থ বস্তুত পক্ষে নিম্নরূপ ত্রিমাত্রিক সমীকরণ সমাধান করা :

$$4y^3-3y-p=O\cdots\cdots(1)$$

কিন্তু সাধারণভাবে এই সমাধান অসম্ভব, এবং তা দেখানোর জন্য ধরা যাক $\theta=60°$, তাহলে,

$$\text{Cos}60°=\tfrac{1}{2}=p$$

(1) নং সমীকরণটি তা হলে নিম্নরূপে পাওয়া যায় :

$$8y^3-6y=1\cdots\cdots(2)$$

কিন্তু (2) নং সমীকরণের কোন মূলদ বীজ (rational roots) নেই। ধরা যাক,

$x=2y$, তাহলে (2) নং সমীকরণ নিম্নরূপে পাওয়া যায় :

$$\cdot 3x=1\cdot\quad\cdot(3)$$

এখন, যদি (3) নং সমীকরণের $x=r/s$ এই মূলদ বীজ থাকে এবং সমীকরণটিকে সিদ্ধ করে এবং যেখানে r ও s অখণ্ড সংখ্যা এবং যার 1-এর চেয়ে বড় উৎপাদক নেই, তাহলে,—

$$r^3-3s^2r=S^3$$

$$\text{বা, } s^3=r(r^2-3s^2)\cdots\cdots(4)$$

(4) নং থেকে দেখা যাচ্ছে ডান পক্ষটি r দ্বারা বিভাজ্য এবং তার অর্থ $r=\pm 1$ না হলে r ও s-এর সাধারণ উৎপাদক আছে। ঠিক এমনি ভাবে s^2 হবে $r^3=s^2(s+3r)$-এর একটি গুণিতক যার অর্থ $s=\pm 1$ না হলে r ও s-এর সাধারণ উৎপাদক থাকবে। কিন্তু আমরা অনুমান করেছি r ও s-এর সাধারণ গুণিতক নেই এবং আমরা দেখলাম যে, (3) নং সমীকরণকে সিদ্ধ করতে পারে এমন সম্ভাব্য সংখ্যা +1 ও −1।

এখন, (3) নং সমীকরণে x-এর স্থলে +1 এবং −1 বসিয়ে দেখা যায় যে. এর কোন মানই সমীকরণকে সিদ্ধ করে না।

উপরের এই গাণিতিক যুক্তি অবলম্বনে এরূপ মন্তব্য করা যায় যে, (2) ও (3) নং সমীকরণের কোন মূলদ বীজ নেই। সুতরাং যে কোন কোণের ত্রিখণ্ডীকরণ অসম্ভব।

বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের হাতে-কলমে কেন্দ্রে রেডিও এবং টেপরেকর্ডার তৈরির প্রশিক্ষণ আগামী জানুয়ারী '85 মাস থেকে চালু হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা নবম শ্রেণী বা তদূর্ধ্বে। ভর্তি হবার শেষ তারিখ 30শে ডিসেম্বর, 1984।

জীবনের সঙ্গে জীবাণুর সম্পর্ক

সমীরণ মহাপাত্র*

জীবজগতে সবচেয়ে নিম্নতম জীব হলো জীবাণুরা। এদের অস্তিত্ব বায়ুতে জলে স্থলে সর্বত্রই আছে। পৃথিবীর আদিমতম অবস্থার সমুদ্রে অ্যামিনো অ্যাসিড ও নিউক্লিওটাইডস সৃষ্টি হওয়ার পর তা থেকে নিউক্লিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। শর্করা-যোগ ও নিউক্লিওটাইড থেকে গঠিত নিউক্লিক অ্যাসিডের চারপাশে বিভিন্ন সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় প্রোটোপ্লাজমের সৃষ্টি হয়। আদিপ্রাণ জীবাণুর উদ্ভব এইভাবে, এই প্রসঙ্গে রাশিয়ান বিজ্ঞানী আই. এম. ওপেরিনের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তারপর প্রায় তিন শত কোটি বছর কেটেছে। এখন মানুষের গুরুমস্তিষ্কে নিউরোন কোষের তড়িৎ-রাসায়নিক ধর্মের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে জীববিজ্ঞান এগিয়েছে এবং ঐ নিউক্লিক অ্যাসিড টতরির কাজেও হাত দিয়েছে। তবু মানবজীবনের সঙ্গে জীবাণুর গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কের গবেষণা হ্রাস পায় নি, জীবাণুর কোষে এনজাইমের ক্রিয়ার সঙ্গে মানবদেহের কোষেরও অনুরূপ প্রক্রিয়া, DNA বিভাজন ইত্যাদি সম্পর্কে জীবাণু কোষ নিয়ে পরীক্ষা জীব-জগতের মৌলিক সাদৃশ্য প্রমাণ করার জন্যই। শুধু তাই নয় জীবাণুর পরিবেশ ও মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গে তাদের অবস্থিতি যে বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক ঘটনা ঘটায় তাতে মানব জীবনের সঙ্গে জীবাণুর সম্পর্কের গুরুত্বই প্রকাশ করে।

লিউয়েনহুক প্রথম 'জীবাণু' এই নামকরণ করেন। অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া খালি চোখে এই জীবগুলিকে দেখা যায় না। পরিমাপ করা হয় মাইক্রন এই দৈর্ঘ্য সম্পর্কিত এককের দ্বারা। জীবাণুর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন অর্থাৎ জীবাশ্মও পাওয়া গেছে। এদের প্রতিকূল পরিবেশে বাঁচবার ক্ষমতাও অসাধারণ। ফুটন্ত জলে বা বরফের চেয়ে কম উষ্ণতায়ও এরা বেঁচে থাকতে পারে। এদের DNA-এর বিভাজনের ফলে এণ্ডোস্পোর অবস্থা সৃষ্টি হয়, যা থেকে স্পোরের মাধ্যমে বংশ বিস্তার হয়। এদের কিছু অংশে যৌন-জননও দেখা যায়। ব্যাকটিরিয়া ছাড়া এককোষী শ্যাওলা যেমন নস্টক ডায়াটম, এককোষী ছত্রাক ইস্ট, এককোষী প্রাণী অ্যাম্টামিবা, জিয়ার্ডিয়া প্লাসমোডিয়াম প্রভৃতি জীবাণু দেখা যায়।

রবার্ট কক, রোনাল্ড রস প্রমুখ বিজ্ঞানীদের নাম জীবাণু সংক্রান্ত গবেষণার সঙ্গে জড়িত।

জীবাণুদের জীবন ও ভূমিকা বিভিন্ন ভাবে উল্লেখিত হতে পারে। সাধারণতঃ উপকারী ও অপকারী দুটি ধরনের ব্যাকটিরিয়ার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায় যারা মানব জীবনের সঙ্গে জড়িত। তৃণভোজী ও শাকাশী প্রাণীদের খাদ্যের উৎস উদ্ভিদ। আবার তৃণভোজী ও শাকাশীরা মানুষের খাদ্য। উদ্ভিদই প্রোটিন খাদ্য উৎপাদক এই প্রোটিনের অন্যতম উপাদান নাইট্রোজেনের উৎস হচ্ছে বায়ু। উদ্ভিদের মধ্যে একমাত্র নীল হরিৎ শ্যাওলা ছাড়া জীবাণুরাও সবাই সরাসরি নাইট্রোজেন শোষণ করতে পারে না। এছাড়া মাটিতে যে নাইট্রেট লবণ আছে তা উদ্ভিদ কর্তৃক শোষিত হওয়ার ফলে মাটির নাইট্রোজেন নিঃশেষিত হওয়ার সম্ভাবনা। তাই রাইজোবিয়াম, ক্লসট্রিডিয়াম, অ্যাজেটোব্যাক্টর ইত্যাদি নাইট্রোজেন স্থিতিকারক ব্যাকটিরিয়া বায়ুর নাইট্রোজেন শোষণ করে নিজ দেহকোষে নাইট্রেট লবণ তৈরি করতে পারে। এছাড়া প্রাণী ও উদ্ভিদের রেচনজাত ও পচনজাত নাইট্রোজেনঘটিত জৈব পদার্থকে ক্রমান্বয়ে অ্যামোনিয়া ও নাইট্রেট লবণে পরিণত করে নাইট্রোসকাস ও নাইট্রোব্যাকটার ইত্যাদি নাইট্রিফাইং ব্যাকটিরিয়ারা। ফলে মাটির নাইট্রোজেন ভাণ্ডার সঠিক থাকে। ব্যাসিলাস ডি নাইট্রিফিক্যান্স ব্যাকটিরিয়া মাটির পচন ও রেচনজাত গলিত জৈব পদার্থ থেকে নাইট্রোজেন মুক্ত করে বায়ুর নাইট্রোজেনের পরিমাণ সঠিক রাখে।

মিক্সোমাইসেটিস নামক এককোষী ছত্রাক জীবাণুও গলিত জৈব পদার্থকে অজৈব উপাদানে পরিণত করে— এই প্রক্রিয়া হলো কার্বনিফিকেশন।

সমুদ্রের ডায়াটম সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় সমুদ্রের 40% অক্সিজেন উৎপাদন করে। সামুদ্রিক মাছ ও গুরুত্বপূর্ণ জীবদের শ্বসনের জন্য এই অক্সিজেন প্রয়োজন। বায়ুর শতকরা আটভাগ O_2 সমুদ্রে দ্রবীভূত হয়। ডায়াটম নিঃশেষিত হলে আরও বেশি O_2 সমুদ্রে প্রয়োজন হবে ফলে বায়ুতে O_2-এর পরিমাণ কমবে।

দুগ্ধশিল্পে ল্যাকটো ব্যাসিলাস ব্যাকটিরিয়া জীবাণু ব্যবহার করা হয়। কৃত্রিম তন্তু উৎপাদনে ব্যাসিলাস সাবটিলিস নামক ব্যাকটিরিয়ার প্রয়োগ হয়। পাঁউরুটি ও অ্যালকোহল শিল্পে ইস্ট নামক এককোষী ছত্রাকের বিশেষ ভূমিকা আছে। শ্বেতসারের উপর ইস্টের পরিপাক ও কোহল সন্ধান-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অ্যালকোহলে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াটি ঘটে। আমাদের ক্ষুদ্রান্ত্রে এসচেরিয়া কোলাই ব্যাকটিরিয়া B-12 ও অন্যান্য ভিটামিন সংশ্লেষ করতে পারে। এই ভিটামিন রক্তাল্পতা রোধ করে লোহিত কণিকা উৎপাদনে সহায়তা করে ও অন্য বিপাক ক্রিয়ায় সাহায্য করে। বৃহদন্ত্রে কতগুলি ব্যাকটিরিয়ার মৃত্যু হলে তাদের দেহাবশেষ থেকে ভিটামিন k পাওয়া যায়। এই ভিটামিন রক্ত-তঞ্চন প্রক্রিয়ার প্রয়োজন। বিভিন্ন জীবাণু ও ছত্রাক থেকে আজ অতি প্রয়োজনীয় জীবনদায়ী অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ তৈরি হচ্ছে। পেনিসিলিন যার প্রথম উদাহরণ।

অপকারী জীবাণুগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুগুলি। এককোষী প্রাণী অ্যান্টামিব বা আমাশয়, প্লাসমোডিয়াম ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, জিয়ার্ডিয়া, ট্রিপানোসোমা প্রভৃতি বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে। কতকগুলি ব্যাকটিরিয়াও রোগ সৃষ্টি করে।

---

* বিরুতলা ব্লকের হাইস্কুল, পোঃ—বিরুতলা, নদীয়া

মাইকোব্যাকটিরিয়াম টিউবারকুলোসিস যক্ষ্মা রোগ, সালমোনেলা টাইফোসা টাইফয়েড রোগ, গনোকক্কাস গনোরিয়া, নিউমোকক্কাস নিউমোনিয়া, ভিব্রিওকমা কলেরা রোগ সৃষ্টি করে। এই ধরণের ডিপথেরিয়া, টিটেনাস, হুপিং কাশি প্রভৃতি রোগই হয়। আবার এই রোগজীবাণু ধ্বংস করার জন্য ছত্রাক, অ্যাক্টিনোমাইকোসিস প্রভৃতি জীবাণুদের কাজে লাগান হচ্ছে। সুতরাং মানুষের জীবনধারণ জীবাণুর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কোন প্রজাতিকে পূর্ণ ধ্বংস করে অন্য প্রজাতির বেঁচে থাকা সহজ নয়। জীবনের বিকাশে ও প্রাকৃতিক ভারসাম্যে প্রত্যেক প্রজাতির বিশেষ ভূমিকা আছে। বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় সেটি পারস্পরিক সম্পর্ক খুঁজে বের করা বেশী গুরুত্বের কথা। এইখানেই পরিবেশ বিজ্ঞানে বাস্তুতন্ত্রের (Ecology) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। মনে রাখতে হবে ব্যাকটিরিয়া ও প্রোটোজোয়াদের সংখ্যা শুধু সমগ্র মানব প্রজাতি নয়, সামগ্রিকভাবে সমস্ত বহুকোষী জীবের সমষ্টি অপেক্ষা অনেক বেশী। অতি ক্ষুদ্র হলেও ঐ জীবাণুদের সামগ্রিক দেহগত বস্তুসমষ্টি (Mass) মানব প্রজাতি তথা সমগ্র প্রাণীকুলের দেহসমষ্টির ওজন অপেক্ষাও বহুগুণ বেশী। আর জীবনের আদি বিকাশ কাল থেকে অদ্যাবধি নিরবচ্ছিন্নভাবে তারা বিদ্যমান, লোপ পায় নি, শেষ হয়েও যায় নি, বেশীর ভাগ মরেও যায় নি, তিন শত কোটি বছর ধরে তাদের দেহের রূপান্তর ঘটেছে মাত্র। তাই বলা যেতে পারে তারাই অমর ; আমাদের মত নশ্বর দেহধারীরা নয়। অ্যান্টিবায়োটিক বা রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগে তাদের আজ সম্পূর্ণ ধ্বংস করা যাবে কি ? না—তাদের সঙ্গে নিরুদ্বিগ্ন সহাবস্থানের কৌশল বের করবেন পরিবেশবিজ্ঞানী তথা উন্নত জীবন বিজ্ঞানের কুশলীগণ ?

বিজ্ঞান-ভাবনা

কণিকা সরকার*

একটা লেটুস গাছকে কুচি কুচি করে কেটে একরকম কেমিক্যাল বা যোগে ভিজিয়ে রাখা হলো। তাতে মেশানো হলো গাছের কতগুলি দ্রবীভূত খাদ্য। নির্দিষ্ট সময় প্রত্যেকটি টুকরো থেকে অঙ্কুর বের হলো। অর্থাৎ বীজ থেকে নয়, একটা গাছের যে কোন অংশ থেকেই অসংখ্য গাছ উৎপন্ন করা যেতে পারে।

সম্প্রতি উদ্ভিদবিজ্ঞানে এই আশ্চর্য আবিষ্কারটি ঘটেছে। এই আবিষ্কার হয়তো একদিন সারা পৃথিবীতে খাদ্য-বিপ্লব এনে দিতে সমর্থ হবে। হয়তো সেদিন সারা বিশ্বে ক্ষুধার্ত মানুষ বলে কেউ থাকবে না। বিজ্ঞানের দৌলতে মানুষ মহাকাশে পাড়ি দিচ্ছে। অচেনা অজানা জগৎকে আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত করছে প্রত্যেক দিন।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের ভূমিকা কি সেটা আমাদের জানতে হবে। বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান। এই জ্ঞান মানুষকে সব অন্তর্মুখী করে। যা কিছু সত্য বা ধ্রুব তাই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। তা সে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই হোক বা দৈনন্দিন ছোটখাট জিনিসই হোক। আজকের পৃথিবীতে পৃথিবীটা যে গোল, চ্যাপ্টা নয়, একথা সকলেরই জানা। কিন্তু একদিন পৃথিবীর এই গোলত্বটা প্রমাণ করতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। যেহেতু সামনে তাকালে ভূপৃষ্ঠ চ্যাপ্টা মনে হয় তাই কেউ সেদিন একথা বিশ্বাস করে নি।

বিজ্ঞানকে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করতে না পারলে বা আমাদের বিজ্ঞান চেতনা না জন্মালে আজকের যুগে মানুষের অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। যেমন এই কলকাতা শহরে, হাওড়ায় এবং বহু পৌর এলাকায় এখন পর্যন্ত মানুষের মল মানুষ মাথায় বয়ে নিয়ে যায়। মনুষ্যত্বের এমন অবমাননা বিংশ শতাব্দীর শেষাংশে কেউ কল্পনা করতে পারে? অথচ বেশ কিছুদিন আগে হাওড়ায় বহু অর্থব্যয়ে একটা বিশাল সিউয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট তৈরি করেছে সি. এম. ডি. এ.। তা সত্বেও হাওড়ার বাসিন্দারা তাদের হাউস কানেকশন নিচ্ছেন না। এটাই হচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনার অভাব। তাহলেই বোঝা যাচ্ছে বিজ্ঞানের কাছ থেকে আমরা এখনও কতটা দূরে সরে রয়েছি।

লোডশেডিং-এর অসুবিধের কথা কাউকে আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। ঘরে ঘরে লণ্ঠন বা মোমবাতি দানের চল। কিন্তু রাত্রে ঘুমানোর আগে জানলা খুলে রাখা যে জরুরী সেটা অনেকেরই খেয়াল থাকে না। আমরা জানি আগুন অক্সিজেন গ্যাসকে পুড়িয়ে কার্বন-ডাইঅক্সাইডে পরিণত করে। ঘরে যদি বাইরের খোলা হাওয়া ঢোকার রাস্তা না থাকে তাহলে ঘরের বাতাসে কার্বন-ডাইঅক্সাইডের মাত্রাধিক্য দেখা দিতে পারে। ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষ টের পাবে না যে কখন শ্বাসের সঙ্গে অক্সিজেনের বদলে সে কার্বন-ডায়োঅক্সাইড ও কার্বন মনোক্সাইড গ্রহণ করতে শুরু করেছে। আর এই গ্যাস মানুষের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক তাই-ই নয়, এর আধিক্যে মানুষের মৃত্যুও ঘটে থাকে। আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে মাটির ঘরে শীতের রাত্রে তুষের আগুন রেখে ঘর গরম করার প্রথা চালু আছে। খবরের কাগজ মারফৎ অনেকগুলি মৃত্যুর খবরই আমরা এসময়ে পেয়ে থাকি। শুধুমাত্র বিজ্ঞান-চেতনার অভাবে ঐ প্রাণগুলি নষ্ট হয়।

পরিচ্ছন্নতা বা পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস মানুষের জীবনের একটি সহজাত গুণ। কিন্তু সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পারিপার্শ্বিক কারণে আমাদের দেশে এরকম ধারণা জন্মেছে যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজটা শুধু মেয়েদেরই। (ঠিক যেমন রান্না সম্পর্কে অনেকের ভাবনা যে ওটা নাকি কেবল নারীরই করণীয়)। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে এটা কোন যুক্তি নয়। মানুষ মাত্রেরই যে কোন কাজ করবার ক্ষমতা রয়েছে এবং এই কুসংস্কার ত্যাগ করলে আমাদের দেশের পরিবেশ আর একটু পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠতে পারে। যেমন বিদেশীদের রান্না বা পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস। আমাদের দেশের পুরুষেরা বিদেশ গিয়ে অভ্যাস করতে বাধ্য হয়। কারণ সেখানে কেউ এই কাজগুলি তার হয়ে করে দেবার থাকে না।

এগুলি জীবনের অত্যন্ত সাধারণ ও ছোটখাট অথচ গুরুত্বপূর্ণ দিক বলা হলো। এই কলকাতা শহরে বারো তেরো লাখ রেজিস্টার্ড বস্তি আছে। তার মধ্যে তিন চার লাখ বস্তিতে সি. এম. ডি. এ. পরিচ্ছন্নতা ও জীবনের পক্ষে নিতান্ত উপযোগী এই জিনিসগুলির ব্যবস্থা করেছে। পানীয় জল, পাকা রাস্তা, রাস্তায় বিদ্যুতের আলো ও খাটা পায়খানার বদলে স্যানিটারি পায়খানার ব্যবস্থা করেছে। পরিবেশ বদলের এই কাজ সি. এম. ডি. এ. এখনও চালিয়ে যাচ্ছে। জগৎ জুড়ে বিজ্ঞানের মহাযাত্রা সামাজিক ও অর্থনৈতিক মান উন্নয়নে অবিরাম কাজ করে চললেও আমাদের দেশ এখনও অনুৎপাদক ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ বা অনুষ্ঠানের দ্বারা দৈবশক্তিতে ভাগ্য পরিবর্তনের অন্ধবিশ্বাসে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। এই অনুষ্ঠানগুলিকে অব্যাহত রেখে একজাতের লোকেরা মুনাফা লুটছে। বারো মাসে তেরো পার্বণের সার্বজনীন ও পারিবারিক পূজা অনুষ্ঠানগুলিতে অজস্র অর্থব্যয় হয়; মন্দির, মসজিদ, মঠ গির্জা তৈরিতে ও রক্ষণাবেক্ষণে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা ব্যয়িত হয়। দিনের পর দিন কীর্তন, গীতাভাগবদ প্রভৃতি পাঠে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে বৃহত্তর জন সমাজকে কর্মবিমুখ নীতি শিক্ষা দেওয়া হয়, শুধু একদিনের কালীপূজায় কেবলমাত্র কলকাতা শহরেই কয়েক কোটি টাকার উদ্দাম উৎসব করা হয়—অথচ শিক্ষার জন্য স্কুল, চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল, গবেষণার জন্য ল্যাবরেটরী সাধারণ জ্ঞানবিস্তারে লাইব্রেরী অথবা নিজেদের

* জনসংযোগ বিভাগ, সি. এম. ডি. এ.

চেষ্টায় বস্তী উন্নয়নের ন্যূনতম ব্যয়ের কোন পরিকল্পনায় অর্থ সংগ্রহ সম্ভব হয় না। এই অবৈজ্ঞানিক আত্মঘাতী মনোবৃত্তির পরিবর্তন কবে হবে, কেমন করে হবে ? কঠিন অসুখ করলে এখনও আমাদের দেশে বহু গ্রামাঞ্চলে এমনকি শহরে তথাকথিত ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা বিধান দিয়ে কালী, শীতলা ওলাইচণ্ডীর মানৎ, কবচ তাবিজ দিয়ে রোগ সারানোর চেষ্টা হয়। চিকিৎসার বদলে ফলমূল, শস্য, বস্ত্র, অর্থ ইত্যাদি ব্রাহ্মণকে দিয়ে পূজো দেয় ঠাকুরের কাছে। সে পূজো ঈশ্বর গ্রহণ করেন কিনা জানা নেই তবে পূজোর উপাচার ঠিকই পৌঁছায় ব্রাহ্মণের হাতে আর ব্রাহ্মণ রোজ রোজ বিধান দেন চিকিৎসার বদলে পূজোর, মানতের, তাবিজের দ্বারা এইভাবে সাধারণ মানুষেরা এই বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগেও শুধু প্রবঞ্চিত হচ্ছে। শিক্ষিত বিত্তবান সমাজ দুর্দিকের সুবিধা নিয়ে স্বার্থপরতার পরিচয় দিচ্ছেন। এই গেল বৈজ্ঞানিক চেতনার অভাবের দু-একটা দিক। এবারে রাজ্য জুড়ে যে বৃক্ষরোপণ অভিযান চলছে তার বৈজ্ঞানিক কারণটা খুঁজে দেখা যাক।

বায়ু দূষণ আজকের পৃথিবীতে এক ঘোরতর সমস্যা। এমনকি আমাদের দেশের মত দরিদ্র দেশের শহরগুলোতে দূষিত বায়ুর সমস্যা বেশ হাঁকডাক দিয়েই দেখা দিয়েছে। যার জন্য 1981 খৃস্টাব্দে এর প্রতিবিধানে আইন পাশ করাও হয়ে গেছে।

বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এই কলকাতা শহর যত ছোটই হোক না কেন, বায়ুদূষণ কলকাতার আবহাওয়াকেও করেছে বিপর্যস্ত। মোটর, বাস, লরি, কলকারখানা, বিভিন্ন জ্বালানিও উনুনের ধোঁওয়া কলকাতার বাতাসকে করেছে অহরহ ভারী। নানান শ্বাসরোগ দেখা দিচ্ছে এখানকার অধিবাসী, বিশেষ করে শিশু ও বৃদ্ধদের জীবনে।

সাধারণভাবে ভাবতে গেলে বায়ুদূষণের বিপক্ষে আমাদের মত সাধারণ মানুষদের বিশেষ কিছুই করণীয় আছে বলে মনে হবে না। তবে আমরা সমস্যার প্রতিরোধে একটা সহজ কিন্তু অমূল্য কাজ করতে পারি। হ্যাঁ ; আমাদের মত সাধারণ মানুষই তা করতে পারি, তা হল বৃক্ষরোপণ। গাছ কার্বনডায়োক্সাইড গ্রহণ করে অক্সিজেন ত্যাগ করে। গাছ পার্শ্ববর্তী এলাকা সুশীতল রাখে। গাছ মাটির ক্ষয় রোধ করে। গাছ পথিককে ছায়া যোগায়। গাছ শোভা বাড়ায়, ফুল ও ফল দেয়। গাছ কেটে কাঠ পাওয়া যায়। গাছ পশু-পক্ষী, পতঙ্গের আশ্রয়স্থল। গাছ ঔষধিও বটে সর্বোপরি গাছ বৃষ্টি আনতে সাহায্য করে। উদ্ভিদবিজ্ঞানী ডঃ তারকনাথ দাসের হিসেবে একটা পঞ্চাশ বছরের গাছের দাম 15 লক্ষ 70 হাজার টাকা। বিশ্বাস হচ্ছে না তো ? বিজ্ঞানী ডঃ দাসের হিসেবটা দেখলেই বোঝা যাবে।

(ক)	ঐরকম একটা গাছ অক্সিজেন তৈরি করে যার দাম	2,50,000 টাকা
(খ)	জীবজন্তুর জন্য যে প্রোটিন দেয়	20,000 ,,
(গ)	মাটির ক্ষয়রোধ ও উর্বরতা বৃদ্ধি করে	2,50,000 ,,
(ঘ)	জলের আবর্তনচক্র ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ	3,00,000 ,,
(ঙ)	পাখী, পোকামাকড়, জীবচক্র ও ছোটখাট উদ্ভিদের আশ্রয় হিসেবে	2,50,000 ,,
(চ)	আবহাওয়া দূষণ নিয়ন্ত্রণ	5,00,000 ,,
	মোট	15,70,000 ,,

এখানে (ঙ) সংখ্যায় বিবৃত জীবচক্র বলে একটা কথা রয়েছে। এটা একটু বিস্তারিতভাবে বলা দরকার। আমরা জানি প্রকৃতিতে পোকামাকড়, জীবজন্তুর মধ্যে আকার-আয়তনে অনেক পার্থক্য থাকে। এই সব ছোট খাট প্রাণী এক একটা বিশেষ বিশেষ গাছের বংশবৃদ্ধিতে অপরিহার্য সহায়তা করে থাকে। আর এই সব ছোট প্রাণী ; কীট-পতঙ্গ এক ধরনের বিশেষ বিশেষ লতাগুল্ম বা ছোটখাট গাছে বাস করে। বন-জঙ্গল সাফ করে শুধু যদি বড় বড় গাছ লাগানোও হয় তথাপি এসব কীট-পতঙ্গকে বাঁচানো যাবে না। ফলে অনেকরকম বড় বড় গাছের বংশও লোপ পাবে। সেজন্যে বনসংরক্ষণ বিভাগ থেকে জঙ্গলকে বাঁচিয়ে রাখার ওপরও এত জোর দেওয়া হয়েছে।

কলকাতা শহরে তো আমরা জঙ্গল তৈরি করতে পারি না। তাই বায়ুদূষণের ব্যাপারে বৃক্ষ রোপণ করে সাধারণ মানুষেরাই এক একটা অসাধারণ কাজ করতে পারে। তাছাড়া শব্দদূষণ প্রতিষেধক হিসাবে শহরের মাঝে বৃক্ষ সারি অতীব কার্যকরী।

এসমস্তই সাধারণ মানুষ হিসেবে বিজ্ঞান নিয়ে ভাবনা চিন্তামাত্র। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতত্ত্বের সবটা সাধারণ মানুষ বুঝতে না পারলেও তাকে হতে হবে সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞান অভিমুখী।

যুগটা যখন বিজ্ঞানের তখন আমাদের চেতনায় বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ ও দৃষ্টিভঙ্গী আনতে হবে। ছোট, বড়, ছেলেমেয়ে, যুবক, বৃদ্ধ নির্বিশেষে আমাদের চোখ কান খোলা রেখে, যুগের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী পথ চলতে শিখতে হবে।

নৈতিকতা ও মূল্যবোধ

থিওডোসিয়াস ডব্‌ঝান্স্কী

[অনুবাদক—সত্যসুন্দর বর্মন*]

[মানুষের আচরণে নীতিবোধ ও মানবিক মূল্যায়নের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও তার গুরুত্ব সম্পর্কে এই প্রবন্ধে যথার্থ বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা করেছেন বিশিষ্ট জীববিজ্ঞানী, প্রজননবিদ—থিওডোসিয়াস ডব্‌ঝান্স্কী। EVOLUTION নামক পুস্তকে 'মানুষের ক্রমবিবর্তন' (Evolution of mankind) শীর্ষক অধ্যায়ে 'Ethics and Values' অংশটির যথাসম্ভব ভাষানুবাদ করা হয়েছে—অনুবাদক।]

বেশির ভাগ মানুষই ভাল আর মন্দকে পৃথক করে বোঝার ক্ষমতা রাখে এবং অধিকাংশই যা ভাল মনে করে তার উন্নতি বিধানের আবশ্যকতা অনুভব করে। তবে প্রায়শঃই তাতে সফল হয় না, হয় পরিস্থিতির চাপে, নতুবা সাধারণতঃ যা মন্দ বলে ভাবে কোন বিশেষ প্রলোভনে তারই বশীভূত হয়ে। তা সত্ত্বেও পৃথিবীর সমস্ত মানব সমাজের যতটা জানা আছে তাদের সর্বত্রই দেখা যায় কিছু বিধিবদ্ধ নীতি সবাইকে মেনে চলতে হয় আন্তরিকভাবে তা বুঝে নিয়ে, না হয় বিশেষ কর্তৃত্বের নির্দেশে। এই নীতিজ্ঞান ও মূল্যবোধের উৎপত্তিতে দুটি আকর্ষণীয় উৎস রয়েছে—একটি হচ্ছে সংস্কৃতিগত, অন্যটি জীববিজ্ঞানগত। প্রত্যেক মানুষের মনে বাল্যে ও কৈশোরেই একটা নীতিবোধের নির্দিষ্ট মান সঞ্চারিত হয় যে সমাজে তারা বেড়ে ওঠে তার অন্যান্য লোকদের দ্বারাই। তাই নীতিবোধটা ঠিক জেনেটিকভাবে (জন্মসূত্রে) পাওয়া সহজাত ধর্ম নয়, এটি অর্জিত গুণ। তবু ওয়াডিংটনের প্রখ্যাত উক্তিটি (1960) গুরুত্বসহ স্মরণ করতেই হয় যে মানুষ জেনেটিকভাবেই (জন্ম-সূত্রেই) নির্ধারিত "নীতিপ্রবণ প্রাণী" এবং বাল্য ও কৈশোরেই সে বিশেষ ভাবে "আদেশমান্যকারী"—(কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রবণ)।

প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার সমাজের নীতি ও মূল্যবোধের সঙ্গে যথাযথ অভ্যস্ত হতে হয়। না হলে সে সমাজের অনুপযুক্ত বা বহিষ্কৃত হয়। তাতে তার নিজের ও বংশধরদের সমাজে প্রতিষ্ঠা বা টিকে থাকাই অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এই প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রভাব এমন চাপ সৃষ্টি করেছে যে জন্মগতভাবে** ঐ 'নীতিপ্রবণ' হওয়ার মতই এক বিশেষ গুণ নিয়ে মানবজাতির প্রত্যেকে এই পৃথিবীতে জন্মে। সেই নির্বাচনের চাপ সম্ভবত দশ লক্ষ বৎসরেরও বেশি কাল (বলা যায় 40,000 প্রজন্ম বা পুরুষকাল) ধরেই চলে আসছে। তবে এই (চাপসৃষ্টিকারী) সংস্কৃতির সংখ্যা যেমন অনেক, তাদের মূল্যায়ন পদ্ধতিতেও তেমনি বহু প্রভেদ। তাই জন্মসূত্রে (জেনেটিক) নির্ধারিত সেই নীতিবোধের মধ্যেই বিশেষ বিপরীতধর্মিতা প্রকাশ পায়। আসলে ঐ জন্মসূত্রে** প্রাপ্ত গুণটি হচ্ছে একটি প্রচ্ছন্ন শক্তি যা ঐ নীতিবোধের প্রবৃত্তিটা বহন করে (নীতিটা কি হবে তা ঠিক করে না), আর পরে ঐ নির্দিষ্ট নীতিবোধটা গড়ে ওঠে যে সমাজে ব্যক্তির জন্ম তারই সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণে। অন্য কথায় বলা যায়, যে অভিব্যক্তির ধারায় মানুষের ক্রমোন্নতি সম্ভব হয়েছে সেই উন্নতি সাধনে কোন একটিমাত্র নীতি পদ্ধতিই কাজ করে নি, তবে ঐ জন্মগত ধর্মবলেই মানব প্রজাতি বিভিন্ন ধরনের নীতিজ্ঞান, মূল্যবোধ ও কর্তব্যপরায়ণতা শিখতে পেরেছে।

এই প্রসঙ্গে দু-ধরনের প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয়। প্রথমতঃ—নরপূর্ব পশুগোষ্ঠী থেকেই মানবপ্রজাতির উদ্ভব। তাহলে আমাদের মধ্যে কি সেই আদিম পূর্বপুরুষ থেকে বংশগতির ধারায় সঞ্চারিত এমন কোন প্রবৃত্তি বা চালিকা শক্তি উত্তরাধিকার সূত্রেই কাজ করে চলেছে যা আমাদের সংস্কৃতি ধারায় লব্ধ নীতিবোধের সঙ্গে একীভূত হয়ে অথবা সংঘর্ষ বাধিয়ে চলে ?

দ্বিতীয়তঃ—মানুষ ছাড়া অন্য কোন পশু প্রজাতির মধ্যে কি ঐ নীতিবোধের ন্যূনতম অস্তিত্বটুকু রয়েছে ? অত্যন্ত আশাবাদী বিশ্বাস নিয়ে ভাবা হয় মানুষ প্রকৃতিগত ভাবে সবাই ভাল, আর দুঃখবাদী মতে মানুষ স্বভাবতঃই দুরাচারী। এই উভয় মতবাদই চলে আসছে—বিজ্ঞানসম্মত জীববিদ্যা ও নৃতাত্ত্বিক আলোচনা আরম্ভ হওয়ার বহু পূর্ব থেকেই। মহান ধর্মমত সমূহে—বিশেষ করে খৃস্টধর্মে উক্ত উভয় মতবাদই একাত্মভাবে গৃহীত। খৃস্টান মতে (মানব প্রজাতির উৎপত্তিতে) আদিম পাপের মতবাদের সঙ্গে—সহজাত পবিত্র সুষমার উপদেশ একত্রে বিদ্যমান।

বংশগতির ধারায় মানুষের সহজাত আবেগ, প্রবৃত্তি ও অনুজ্ঞা সমূহের মধ্যে তার আগ্রাসী ও বলপ্রয়োগের মনোভাবটা প্রবল, না—সেখানে করুণা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মনোবৃত্তিই প্রধান—এই নিয়ে বহু বিতর্ক ও শক্তির অপচয় হয়েছে। মানব-চরিত্র-বিশারদ এবং জীবের আচরণ-অনুসন্ধায়ক-গণের গভীর গবেষণায় জানা যায়—অধিকাংশ পশুর মধ্যেই আক্রমণাত্মক চালচলন, প্রাধান্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও আঞ্চলিক আধিপত্য প্রভৃতি নিয়ে বিভিন্ন ধরনের আগ্রাসী আচরণই প্রবল। তবে একই প্রজাতির অন্যজনের প্রতি আক্রোশের ধারাটা এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপায়ে নিয়ন্ত্রিত হতে দেখা যায়; শক্তিশালীর আক্রমণ প্রচেষ্টায় বা হুমকিতে যদি বশ্যতার ভাব

* কান্দুয়া মহাকালী হাইস্কুল, হাওড়া

দেখানো হয় তবে ঐ আক্রমণের ধারাটা বিক্ষিপ্ত ও প্রশমিত হয়ে যায়। কিন্তু মানুষের বেলায় এইখানেই সমস্যা— (লরেন্স 1966)। সেই প্রস্তর যুগ থেকে হাইড্রোজেন বোমা পর্যন্ত ক্রমোন্নত প্রথায় মানুষ তার আগ্রাসনধারাকে ক্রমেই অদম্য করে তুলেছে, তাতে আক্রমণকারীকে সহজে প্রশমিত করে এমন কোন নৈতিক মান বা উপায় আজও সে আয়ত্ত করতে পারে নি।

এখন তর্কের খাতিরেই ধরা যাক মানব প্রজাতির সমস্ত বা কিছু লোকের মধ্যে জন্মগতভাবে আগ্রাসী এবং প্রাধান্যকারী প্রবৃত্তিই প্রবল। তাহলেও একথা বলা যায় না যে ঐ প্রবৃত্তি বা আবেগকে যথাযথ আয়ত্তে আনা যাবে না। যে কোন ব্যক্তিকে শিষ্ট বা অশিষ্ট করে, শান্তিপ্রিয় বা আগ্রাসী করে তৈরি করাই যায়। নৃতাত্ত্বিকগণের কাছে অজস্র উদাহরণ রয়েছে যে বিভিন্ন সংস্কৃতিতে বিভিন্ন ধরনের আচরণ বিধির দাবী ও প্রয়োজনীয়তা স্থিরীকৃত হয় এবং সাধারণতঃ সবাইকে তা মানতে বাধ্য করা হয়। এই ভাবে কোন সংস্কৃতি হয়ে ওঠে বহির্মুখী, তা বাইরে যোগাযোগ ও প্রাধান্য বিস্তারের প্রেরণা দেয়, আর কোন সংস্কৃতি হয় অন্তর্মুখী অর্থাৎ নিজেদের আত্মসমীক্ষা দ্বারা আত্মোন্নতিতে নিমগ্ন থাকে। আবার কোন সংস্কৃতি কেবল "যুদ্ধং দেহি" মনোবৃত্তি জোগায়, আর কোনটি ভীরু শান্ত প্রকৃতি করে তোলে, কোথাও হয় আত্মগর্বী ঔদ্ধত্যের আধিক্য, কোথাও নম্র শালীনতার প্রবণতা, কোথাও চরিত্রহীন ভ্রষ্টাচারই প্রবল, কোথাও আবার অতি সংযমী মিতাচারের প্রচেষ্টা। (এ সবই ব্যক্তিচরিত্রকে প্রভাবিত করে)।

বিশিষ্ট জীববিজ্ঞানিগণ মানতে রাজী নন যে মানুষ ছাড়া অন্য জীবেও নীতিবোধের ক্ষমতা আছে। তবে কেউ কেউ মনে করেন যে তাদের অনেকের ন্যূনতম নীতিবোধের কিছুটা থাকাও সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ কুকুরের আচরণে মাঝে মাঝে মনে হয় খারাপ কাজের জন্য তারা যেন অপরাধীর ভাব বা খারাপ অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে। অন্যেরা মনে করেন নৈতিকতা ও মূল্যবোধ কেবলমাত্র মানবপ্রজাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। (অন্য জীবে তা নেই)। এই দ্বান্দ্বিক প্রশ্নের সদুত্তর না পেয়েও পশুদের এমন কিছু আচরণ দেখা যায় যা মনুষ্য কর্তৃক প্রদর্শিত হলে সেগুলিকে নির্দ্বিধায় নীতিবোধ বা পরার্থপরতাই বলা যায়, অন্য আচরণ অবশ্যই নীতিবোধ শূন্য এবং আত্মসুখ-সর্বস্ব অর্থাৎ পশুবৎ। উদাহরণ হিসাবে শ্রমিক ও সৈনিক শ্রেণীর পিঁপড়ে ও উইপোকাদের আচরণ আমাদের মনে পরার্থপরতার আদর্শ বা সাধারণের মঙ্গলের জন্য নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের ছবিই এঁকে দেয়। পক্ষান্তরে কিছু আধা-সামাজিক প্রাণী ও পাখীদের মধ্যে দেখা যায় প্রাধান্যকারী প্রবলেরা তাদের অধীনস্থ পুরুষদের খাদ্যসংগ্রহের জমি বা এলাকা থেকে গায়ের জোরে তাড়িয়ে দেয়, ফলে বিতাড়িত জীবগুলি নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হয়। এহেন নিষ্ঠুর আচরণ আমাদের মনে অবশ্যই আঘাত হানে। এই ধরনের অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায়। কিন্তু একই সঙ্গে সিম্পসনের মতামতকেও (1964) আমাদের মানতেই হয় যে "মানুষ ছাড়া অন্য জীবের ক্ষেত্রে নীতিবোধের আলোচনা করাই অসঙ্গত।··· সেখানে নীতিবোধের আলোচনা করার মত বাস্তব কোন যুক্তিই নেই। প্রকৃতপক্ষে নৈতিকতার ধারণাটাই অর্থহীন হয়ে যায় যদি আনুষঙ্গিক কতকগুলি শর্ত বা অবস্থার কথা আমরা না ভাবি। যেমন - (1) ঐসব ক্ষেত্রে কত রকম বিকল্প পদ্ধতির কাজ করা যায়, (2) নীতিগতভাবে কোন বিকল্প পদ্ধতি স্থির করার ক্ষমতা কেবল মানুষেরই আছে, আর (3) নীতিগত ভাবে কোন্‌টা ভাল সেই বিচার করে তাকে ইচ্ছামত গ্রহণ করার স্বাধীনতা তার আছে। ঐসবের বাইরে একটি কথাই ঘুরে ফিরে আসে, মানুষের যে বিশেষ ক্ষমতা তার কাজের ভবিষ্যৎ ফলাফল সম্পর্কে ভাবতে পারে, অন্তত কিছুটা পরিমাণগত ভাবে—সেই অনুপম ক্ষমতার উপরই নীতিবোধের প্রক্রিয়াগত বিবর্তন নির্ভর করে।"

মানুষের কিছু ব্যবহারিক আচরণে নৈতিক মূল্যবোধ পরিস্ফুট। যুক্তিযুক্তভাবেই মনে হয় সেগুলি বিবর্তনধারায় প্রাকৃতিক নির্বাচনের চাপেই নির্দিষ্টরূপে গড়ে উঠেছে। মোটেই আশ্চর্যের নয় যে ঐ আচরণ ধারাগুলির সঙ্গে মনুষ্যেতর জীবগোষ্ঠীর আচরণে হুবহু মিল রয়েছে। মানব পরিবারই সম্ভবত সবচেয়ে পুরাতন সমাজ সংগঠন যাতে জীবনযাপনের প্রক্রিয়াগুলি সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত। মাতৃত্ব সেথায় সর্বদাই অতি মূল্যবান জীবনধর্ম রূপে সমাদৃত. এমন কি যে সমাজে মেয়েরা সম্পূর্ণ পরাধীন ক্রীতদাসীর মত দিন কাটায়, সেখানেও। শিশুদের সর্বদাই সযত্নে পালন ও আন্তরিক স্নেহ করা হয়। সন্তানের মঙ্গলের জন্য মাতাপিতা প্রায়শঃ এবং স্বেচ্ছাকৃতভাবেই কত কষ্ট, দুঃখ সহ্য করে, আত্মত্যাগ করে, এমন কি আত্মবলিদান পর্যন্ত করে। আত্মীয়-সন্তানদের জন্য কম হলেও অনুরূপ কিছু করে; অনাত্মীয় ছেলেমেয়েদের জন্য আরও কম করেও কিছু করা হয়। সন্তান কামনাকে একান্ত স্বাভাবিক ও হিতকর ভাবা হয়। জন্মের পর সন্তানের যত্ন ও ভরণপোষণের ত্রুটি হলে তার পিতামাতার নিন্দা করা হয় এবং তা জঘন্য নৈতিক অপরাধ বলে ধরা হয়। শিশুহত্যা কোন কোন সমাজে রীতি হিসাবে দেখা গেলেও, সাধারণতঃ তা ঘৃণ্য ও আতঙ্কজনক বিবেচিত হয়। অবশ্য কতক ক্ষেত্রে এটি গোটা পরিবার বা গোষ্ঠীর আত্মরক্ষার্থে একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

এইসব মনোভাব ও মূল্যবোধ বংশবিস্তারের দক্ষতাকে সাহায্য করে। সেইজন্য এগুলি প্রাকৃতিক নির্বাচনের ধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু সমাজের অন্যান্য অনেক রীতি ও আবশ্যকতার ক্ষেত্রে এই কথা খাটে না। অথচ সমস্ত না হলেও অধিকাংশ সমাজেই সেগুলির বিশেষ কার্যকর পরিচিতি রয়েছে। উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নলিখিত কাজকে অন্যায়ই বলা হয়, যেমন—চুরি, প্রতারণা, লুণ্ঠন, পথে গুপ্ত আক্রমণ বা অপরকে হত্যা করা— তা আপন গোষ্ঠীর ও নিজ সমাজের লোককে হোক অথবা সাধারণ ভাবে যে কোন মানুষকেই হোক। সেই কাজ যদি লাভজনকও

হয় এবং সেই অপকর্ম অপ্রকাশই থাকে—তবুও তা অন্যায়। আর ঐ কুকর্ম দমনে ও অপরাধীর শাস্তিবিধানে কোন রকম ভয় পাওয়াই উচিত নয়।

অন্যদিকে ন্যায়পরায়ণতা, উদারতা সত্যনিষ্ঠা সুনিশ্চিত-ভাবে প্রশংসনীয়, বিশেষ করে তা যদি কঠোর ক্লেশের মধ্য দিয়ে পালন করা হয়। মানুষের জীবন—তা আত্মীয়ের হোক অথবা অপরিচিত অনাত্মীয়েরই হোক—সব সময়ই গভীর শ্রদ্ধার (পবিত্র) বস্তু; অবশ্য বিশেষ ব্যতিক্রম শুধু যুদ্ধে। তাই সর্বশক্তি দিয়ে সেই জীবনকে রক্ষা করতেই হবে (এমন কি চিকিৎসার অসাধ্য রোগীকেও—যার বেঁচে থাকাতে হয়ত শুধু কষ্টই বাড়বে)। এই নৈতিকতার চূড়ান্ত অনুজ্ঞাই হচ্ছে—সবার প্রতি ভালবাসা (এমন কি শত্রুকেও), পরহিতে কিছু করা এবং অসতের (দুর্বৃত্তের) প্রতিরোধ।

অতিসরল করার ঝুঁকি নিয়ে নীতিবোধকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, পরিবারগত এবং গোষ্ঠী বা প্রজাতিগত নীতিবোধ (ক্যাম্পবেল 1972, ডব্ঝাঁস্কী—1973) মানুষের পারিবারিক নীতিবোধটা অন্ততঃ কিছু পশু গোষ্ঠীর ঐ "প্রায়-নীতিবোধ"-("quasi-ethics")-এর সঙ্গে সমভাবাপন্ন। মানুষ এবং পশুদের এই পারিবারিক নীতিবোধের অনেকগুলিই জেনেটিকশর্তযুক্ত (Genetically conditioned) ব্যাবস্থাপনা বা প্রবণতা। অবশ্য মানুষ তার ইচ্ছাশক্তি বিশেষ অনুশীলনদ্বারা ঐ প্রবণতাকে দমিত বা প্রভাবিত করে। এই পারিবারিক নীতিবোধগুলি প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফল হিসাবেই উদ্ভূত, আর সেই কারণেই আমাদের পূর্বপুরুষ ও কিছু পশুপ্রজাতির মধ্যে জেনেটিক স্তরে তার ভিত্তিস্থাপিত (Genetic bases) বলে বিবেচিত হয়, অন্যদিকে আমাদের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ফলেই গোষ্ঠীগত নীতিবোধের সৃষ্টি, তাতে ঠিক জেনেটিক প্রভাব নেই। এতে ব্যক্তিগত ভাবে কোন সুবিধা হয় না, বরঞ্চ তা অভ্যাস করতে গিয়ে ব্যক্তিকে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, তবে মানব প্রজাতির সামগ্রিক রক্ষার জন্য তা অপরিহার্য। তাই মানুষের [illegible] সহজভাবে আদিম পাপের মতবাদে বিশ্বাসী অথবা রাষ্ট্রাধীন (প্রাদেশিক, আঞ্চলিক) ও অন্যাবিধ সীমিত বৈশিষ্ট্যের প্রভুত্বে উৎসাহী ব্যক্তিরা যাই বলুন না কেন, মানুষ কখনই প্রাকৃতিক নির্বাচনের (অভিব্যক্তির) ধারায় জন্মগত** ভাবে অসৎ দুরাচারী নয়। যত স্বার্থপরতা ও ভোগসুখের প্রবণতা মানুষের মধ্যে থাকুক না কেন ঐ সমস্ত প্রবৃত্তিকে সে অনায়াসে প্রতিরোধ করতে পারে তার মধ্যে জন্মসূত্রে** প্রতিষ্ঠিত যে শিক্ষাপ্রবণতা (Genetically established educability) রয়েছে সেই শক্তিকে সংস্কৃতিধারায় লব্ধ গোষ্ঠীগত নীতিবোধ (Group ethics) দিয়েই। অভিব্যক্তির ধারায় মানুষের ক্রমোন্নতিতে তার জন্মসূত্রে নির্ধারিত আত্মপরতা বা পরার্থপরতা প্রবৃত্তি অপেক্ষা প্রাকৃতিক নির্বাচনে লব্ধ শিক্ষণ প্রবণতা ও নিজের ইচ্ছানুযায়ী আচরণবিধি গঠনের ক্ষমতাই ক্রমে প্রবলতর নির্দেশক শক্ত হয়ে উঠেছে।

** জেনেটিক (Genetic) কথাটির যথাযথ বাংলা প্রতিশব্দ খুবই অসুবিধাজনক। Gene-কে 'জনি" করে জনিগত বা জনিজাত করা যেতে পারে। কিন্তু সাধারণ পাঠকের বোধগম্যের জন্য এই প্রবন্ধে জন্মগত বা জন্মসূত্রে প্রতিশব্দ অনেকবার ব্যবহার করতে হয়েছে। এ দিয়ে বংশগত বা গোষ্ঠী-ঐতিহ্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য বোঝায় না।

রাধাগোবিন্দ চন্দ্র—পল্লী নক্ষত্রবিদ

ইন্দুশেখর সিংহ* ও রণতোষ চক্রবর্তী**

আমাদের দেশে অখ্যাত এক পল্লীতে রাধাগোবিন্দ চন্দ্র নামে একজন নক্ষত্রবিদ্ ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রী বা সুসজ্জিত গবেষণাগার ছাড়া শুধু মাত্র নিষ্ঠা অধ্যবসায় দ্বারা রাধাগোবিন্দের গবেষণা পল্লীর গণ্ডী ছাড়িয়ে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ভাবলে অবাক হতে হয়, হারভার্ড মানমন্দির তাঁর গবেষণা কাজে সাহায্যের জন্য শক্তিশালী একটি টেলিস্কোপ সুদূর আমেরিকা থেকে বাংলার পল্লীতে তাঁর বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। বলাই বাহুল্য, এ থেকেই রাধাগোবিন্দের গবেষণা কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। এছাড়া ফ্রান্স সরকার তাঁকে অত্যন্ত সম্মানসূচক OARF (Officer d' Academic Republique Francai e) উপাধি সেই সঙ্গে একটি রৌপ্যপদক প্রদান করে সম্মানিত করেছিলেন।

রাধাগোবিন্দ চন্দ্র ভ্যারিয়েবল স্টার (বহুরূপী তারা), নোভা, উল্কা, ধূমকেতু,—আকাশের নানা জ্যোতিষ্ক নিয়ে তার পর্যবেক্ষণ প্রায় নিয়মিত জানান হারভার্ড মানমন্দির, বৃটিশ আসট্রোনমিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, ফ্রান্সের লিয়ঁ মানমন্দির— প্রভৃতি বিশ্বের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্যা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। হারভার্ড মানমন্দির থেকে রাধাগোবিন্দকে লেখা একটি পত্রের অংশ (29 শে মে,1920): "Thank you very much for the splendid list of observations of variable stars, which you have been sending to the AAVSO." (American Association of Variable Stars Observers)— এ থেকে তাঁর গবেষণা কাজের মূল্যায়ন করা সহজ। বৃটিশ অ্যাসট্রোনমিক্যাল আসোসিয়েসন থেকেও একই ধরণের বহু চিঠি রাধাগোবিন্দচন্দ্রের পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়। এরই একটি নমুনা (27 শে ডিসেম্বর 1923): "Your excellent observations and remarks are always much valued by this section (Variable Stars Section)" এছড়া হারভার্ড মানমন্দির প্রকাশিত পত্রিকায় টেলিস্কোপের পাশে ধুতিপরা রাধাগোবিন্দ চন্দ্রের ফটো বাঁধান অবস্থায় এখনও তাঁর বাড়ীতে দেখা যাবে।

এছাড়া আমাদের দেশে পঞ্জিকা সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গেও রাধাগোবিন্দ সক্রিয় ভাবে যুক্ত ছিলেন। পঞ্জিকা সংস্কার সম্পর্কে নানা তত্ত্ব ও সূক্ষ্ম হিসাব সম্বলিত লেখা তৎকালীন নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

আমাদের দেশের এই বিজ্ঞানী অধুনা আমাদের কাছে একেবারেই অপরিচিত। হালে কয়েকটি পত্র-পত্রিকা ও আকাশবাণী মারফত তাঁর সম্বন্ধে আমরা আংশিক পরিচিতি পেয়েছি। তিনি জন্মেছিলেন বাংলাদেশের যশোর জেলার বগচর গ্রামে, 1878 খৃস্টাব্দে। তাঁর বাল্য বয়স থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহ জাগে এবং সেইমত তিনি বইপত্র সংগ্রহ করে পড়াশুনা করতেন। 1910 খৃঃ হ্যালীর ধূমকেতু প্রত্যক্ষ করার ব্যাপারে তিনি শান্তিনিকেতনের জগদানন্দ রায়ের সঙ্গে পত্র দ্বারা পরিচিত হন। জগদানন্দের পরামর্শ অনুসারে তিনি বিলাত থেকে 1912 খৃস্টাব্দে নাগাদ সেই যুগের 257 টাকা 6 পয়সা দিয়ে তিন ইঞ্চি ব্যাসের একটি প্রতিসরণ দূরবীন সংগ্রহ করলেন। স্মরণ করার মত। সেই সময় তিনি মাত্র কুড়ি টাকা মাইনের যশোর কালেকটরীতে চাকুরী করেন। এরপর প্রায় 1947 খৃস্টাব্দ পর্যন্ত একটানা প্রায় 30—35বৎসর তাঁর গবেষণা কাজে উইরোপ আমেরিকার নানা জ্যোতির্বিজ্ঞান সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিল।

দেশ বিভাগের জন্য তাঁর গবেষণা কাজ বাধা পায় এবং তাঁকে সপরিবারে কলকাতার কাছে পানিহাটিতে কিছুদিন বাস করতে হয়। এরপর বারাসতে তিনি বাড়ী তৈরি করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। কিন্তু আর্থিক প্রতিকূল অবস্থা, বার্ধক্য আরও নানা কারণে অতিকষ্টে তাঁর শেষজীবন কাটে এবং 1975 খৃস্টাব্দে 3রা এপ্রিল তিনি মারা যান। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় "ধূমকেতু" নামে মাত্র একটি বই প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। এছাড়া তাঁর বহু লেখা নানা পত্র-পত্রিকায় ছড়ান ছিটান অবস্থায় রয়েছে। "ধূমকেতু" ছাড়া "সৌরজগৎ",

[পরের অংশ 248 পৃষ্ঠায় দেখুন]

* বারাসত রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয়, বারাসত, ** সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কলকাতা ৭

বিচিত্র রান্নাঘর

সুস্মিতা ভট্টাচার্য*

কাঠ, কয়লা, কেরোসিন বা গ্যাস এইসব জ্বালানির আর উনানের ধোঁয়া ছাড়া আমরা রান্না করার কথা ভাবতেও পারি না। কিন্তু এই পৃথিবীতেই এমন এক রান্নাঘর আছে, সেখানকার জ্বালানির জন্য কয়লা বা কেরোসিনের দোকানের লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হয় না, কাঠ বা ঘুঁটে ভিজে গেলে কি করে উনান জ্বালানো হবে তার দুশ্চিন্তায় মাথা চাপড়াতে হয় না।

আমরা অর্থাৎ মানুষেরা রান্না করা খাবার খেয়ে বেঁচে থাকি। উদ্ভিদদের কিন্তু রান্না করা বা তার জন্য জ্বালানি সংগ্রহের কোন ঝামেলাই নেই। উদ্ভিদেরা রান্না-করা খাবার খায় না—নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য নিজদেহেই তৈরি করে নেয় নিজেদের বিচিত্র রান্নঘরে। উদ্ভিদের সবুজ পাতাই তার রান্নাঘর। এ এক বিস্ময়কর রান্নাঘর, এখানে গাছ নিজের খাদ্য নিজেই তৈরি করে কাঠ, কয়লা, কেরোসিন তেল, গ্যাস,—এইসব জ্বালানি ছাড়াই।

উদ্ভিদের পাতার সবুজ কলা কোষে ক্লোরোপ্লাসটিড নামক অঙ্গাণুর মধ্যে ক্লোরোফিল থাকে। এ এক বিস্ময়কর রঞ্জক। উদ্ভিদ আলোকের উপস্থিতিতে সবুজ পাতার এই ক্লোরোফিল রঞ্জকের সাহায্যে পরিবেশ থেকে নেওয়া জল ও কার্বন ডাই-অক্সাইড দিয়ে গ্লুকোজ নামে শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে। আলোকের উপস্থিতিতে সরল কার্বন ডাই-অক্সাইড অণু এবং জলের অণু মিলে গিয়ে জটিল গ্লুকোজ অণু $C_6H_{12}O_6$ প্রস্তুত হয় অর্থাৎ সংশ্লেষ হয় বলে এই প্রক্রিয়ার নাম আলোক সংশ্লেষ অর্থাৎ ফোটোসিনথেসিস। গ্রীক ভাষায় ফোটন অর্থাৎ আলোক এবং সিনথেসিস অর্থাৎ সংশ্লেষ, এই দুটি শব্দ মিলে ফোটোসিনথেসিস শব্দ সৃষ্টি হয়েছে।

পাতা ছাড়া উদ্ভিদের কচি কাণ্ডের সবুজ অংশে, ফুলের সবুজ বৃতি এবং কাঁচা ফলের সবুজ খোসাতে ক্লোরোপ্লাসটিড

[247 পৃষ্ঠার পরের অংশ]

"নক্ষত্র জগৎ" "সবিতা ও ধরণী", "তারা চিনিবার সহজ উপায়"—এরকম বেশ কয়েকটি বই এর পাণ্ডুলিপি এখনও জরাজীর্ণ অবস্থায় পুস্তক কীটের খাদ্য হিসাবে রয়েছে। বলা বাহুল্য, তাঁর লেখায় তাঁর নিজস্ব গবেষণালব্ধ নানা বিবরণও স্থান পেয়েছে। কাজেই সেইদিক থেকে এগুলির মূল্য আলাদা ধরণের।

প্রচার-বিমুখ, অতি অমায়িক, সরল চরিত্রের পল্লীবিজ্ঞানী রাধাগোবিন্দ চন্দ্রের লেখা পাণ্ডুলিপিগুলি যাতে যথাসম্ভব পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয় এই আশা করবো।

থাকে, কাজেই এই অঙ্গগুলিতেও সালোক সংশ্লেষ হয়। তবে গাছের পাতার প্রধান কলা- মেসোফিল কলার স্তরে ক্লোরোপ্লাসটিডের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি থাকে। এরাই পাতার প্রধান সংশ্লেষকারী কোষ। জ্বালানীর ঝামেলা না থাকলেও সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়াটি মোটেই সহজ-সরল নয়। অর্থাৎ কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল সরাসরি মিলে গ্লুকোজ সৃষ্টি করে না। অনেক গুলি রাসায়নিক বিক্রিয়া একের পর এক ঘটার পর শেষে গ্লুকোজ তৈরি হয়।

গাছের রান্না করার ব্যাপারটি অর্থাৎ সালোক সংশ্লেষের সমস্ত বিক্রিয়াগুলিকে মোটামুটি দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায় সবুজ পাতার ক্লোরোফিল সূর্যালোক থেকে সৌরশক্তি বা ফোটন কণা শোষণ করে সক্রিয় হয়ে ওঠে। সক্রিয় ক্লোরোফিল তখন পরিবেশ থেকে নেওয়া ও জাইলেম কলার দ্বারা বাহিত জল যা পাতার উপস্থিত থাকে, তার অণুকে ভেঙে ফেলে। একটি জলের অণুতে আছে দুটো হাইড্রোজেন পরমাণু, আর একটা অক্সিজেন পরমাণু। এমনি জলের অণু নিস্তড়িৎ। কিন্তু সবুজ পাতার সক্রিয় ক্লোরোফিল জলের অণু (H_2O)-কে ধন-আধানযুক্ত হাইড্রোজেন পরমাণু বা H^+ আয়ন এবং ঋণ-আধানযুক্ত হাইড্রক্সিল মূলক বা ^-OH আয়নে ভেঙে ফেলে। আলোকের উপস্থিতিতে এই ভাঙাভাঙি বা বিশ্লেষণ বিক্রিয়াটি ঘটে বলে একে আলোক-বিশ্লেষণ বা ফোটোলিসিস বলে। হাইড্রক্সিল আয়ন থেকে ধাপে ধাপে কতগুলি বিক্রিয়ার পর শেষে অক্সিজেন তৈরি হয়। এই অক্সিজেন পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়ে পরিবেশে চলে যায়।

সালোকসংশ্লেষের দ্বিতীয় পর্যায়ে বিক্রিয়াগুলির ফলে হাইড্রোজেন আয়ন কার্বন ডাই-অক্সাইডকে বিজারিত করে এবং শেষে এই কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্লুকোজ অণুর অঙ্গীভূত হয়। সালোক-সংশ্লেষের আলোক দশায় সবুজ পাতার ক্লোরোফিল যে সৌরশক্তি শোষণ করে ত পরিশেষে সালোকসংশ্লেষে উৎপন্ন গ্লুকোজের অণুতে আবদ্ধ হয় এবং ক্লোরোফিল আগের অবস্থায় ফিরে আসে।

একটি গ্লুকোজের অণু $C_6H_{12}O_6$-এর আণবিক ভর 180 এবং গ্লুকোজের আণবিক ভরকে গ্রামে প্রকাশ করলে প্রতি গ্রাম অণুর ভর 180 গ্রাম। সালোকসংশ্লেষের সময় প্রতি গ্রাম অণু বা 1·0 গ্রাম গ্লুকোজের মধ্যে 574 কিলো ক্যালরি সৌরশক্তি স্থৈতিক শক্তি রূপে বন্দী হয়ে থাকে।

রাসায়নিক সমীকরণের ভাষায় বলা হয়—

$$\underset{\text{কার্বন ডাই-অক্সাইড}}{6CO_2} + \underset{\text{জল}}{12H_2O} \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{সূর্যালোক}} \underset{\text{গ্লুকোজ}}{C_6H_{12}O_6} + \underset{\text{জল}}{6H_2O} + \underset{\text{অক্সিজেন}}{6O_2} + \underset{\text{কিলো ক্যালরি}}{674}$$

*148, রামদুলাল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006
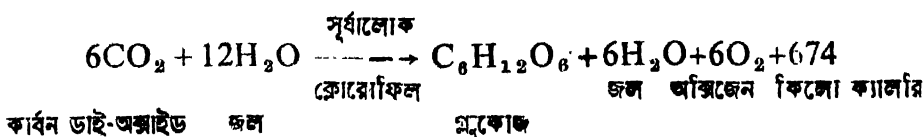
আমাদের রান্নাঘরে রান্না করার সময় কাঠ, কয়লা, তেল ও গ্যাস প্রভৃতি জ্বালানি দহনের ফলে শক্তির যোগান দেয় এবং নিজেরা ফুরিয়ে যায়। এদের থেকে আর শক্তি পাওয়া যায় না। জ্বালানিবিহীন উদ্ভিদের এই আজব রান্নাঘরে অর্থাৎ সবুজ পাতার সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে উদ্ভিদের খাদ্য প্রস্তুতের সময় সূর্যালোকই শক্তি সরবরাহ করে অর্থাৎ জ্বালানির কাজ করে। সৌরশক্তি শুধু জ্বালানির কাজ করে তাই নয়, এই সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় যে সৌরশক্তি রাসায়নিক স্থৈতিক শক্তি রূপে সর্বপ্রথম গ্লুকোজ অণুর মধ্যে বন্দী হয়। গ্লুকোজ অণু থেকে সেলুলোজ নামে এক ধরণের জটিল কার্বোহাইড্রেট তৈরি হয়। সেলুলোজ উদ্ভিদের কোষ-প্রাচীর গঠন করে। গ্লুকোজ থেকে শ্বেতসার ও সেলুলোজ ছাড়া অপর কয়েক ধরণের কার্বোহাইড্রেট তৈরি হয়। কার্বোহাইড্রেট থেকে প্রোটিন, শ্বেতসার ও তৈলজাতীয় খাদ্য সংশ্লেষিত হয়ে থাকে।

এই সমস্ত খাদ্যের বেশীর ভাগই উদ্ভিদ নিজস্ব পুষ্টির প্রয়োজনে ব্যবহার করে। উদ্বৃত্ত খাদ্য উদ্ভিদের দেহের বিভিন্ন অংশে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত থাকে। মানুষ সহ সমস্ত প্রাণী প্রত্যক্ষ ভাবে ও পরোক্ষ ভাবে খাদ্যের জন্য উদ্ভিদ ও তার বিচিত্র রান্নাঘর—সবুজ পাতার উপর নির্ভরশীল।

আমাদের রান্নাঘরে জ্বালানির দহনের ফলে প্রতিনিয়ত শক্তির ক্ষয় হয়। গাছের বিচিত্র রান্নাঘর সবুজ পাতায় সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় সৌরশক্তি স্থৈতিক শক্তি রূপে গ্লুকোজ অণুতে আবদ্ধ হয়।

বর্তমান সভ্যতার তাপশক্তির প্রধান উৎস কয়লা ও খনিজ তেল উদ্ভিদেরই অবদান। প্রায় তিন কোটি বছর আগে পৃথিবীর বিরাট বিরাট অরণ্যাঞ্চল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে মাটির তলায় চাপা পড়ে যায় এবং কালক্রমে ভূ-গর্ভে প্রচণ্ড চাপ ও তাপে এক বিশেষ ধরণের জীবাশ্মে পরিণত হয়, এই জীবাশ্মই কয়লা। কয়লায় সঞ্চিত শক্তি প্রকৃতপক্ষে সালোকসংশ্লেষে বন্দী সৌরশক্তি। খনিজ তেল প্রধানতঃ প্রাণী ও উদ্ভিদের মৃত দেহাবশেষের পচনের ফলে সৃষ্ট তরল জীবাশ্ম।

মানুষের রান্নাঘরের কালো ধোঁয়ায় পরিবেশ দূষিত হয়। আর গাছের ধোঁয়াহীন রান্নার পরিবেশ দূষণমুক্ত হয়। গাছের এই অদ্ভুত রান্নাঘর অর্থাৎ সবুজ পাতা সালোকসংশ্লেষের সময় পরিবেশ থেকে (বায়ুমণ্ডল এবং জলে দ্রবীভূত) কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস গ্রহণ করে; আর সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে অক্সিজেন গ্যাস পরিবেশে ফিরিয়ে দেয়। এইভাবে সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় গাছের এই বিচিত্র রান্নাঘর পরিবেশের কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেনের পরিমাণ বজায় রাখতে সাহায্য করে পরিবেশকে দূষণমুক্ত করতে সব সময় চেষ্টা করে।

দক্ষিণ মেরু

গোপালচন্দ্র দাস*

দীর্ঘকাল মানুষের কাছে দক্ষিণ মেরু অজানাই ছিল। মাত্র দেড়-শ' বছর আগে (চার্লস উইল্‌ক 1839 খৃস্টাব্দে দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার করেন) তার কথা জানা গেছে। বর্তমানে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তার খবরাখবর উপগ্রহ মারফৎ পৃথিবীর যে কোন কোণে পৌঁছে যায়।

দক্ষিণ মেরুর 14200 বর্গ কিলোমিটার স্থলভাগের মধ্যে মাত্র শতকরা পাঁচভাগ দেখা যায়, বাকীটা 2000 মিটারেও বেশী পুরু বরফ দিয়ে ঢাকা থাকে। এই বরফ পৃথিবীর মোট সঞ্চিত বরফের 90 শতাংশ।

দক্ষিণ মেরু বা অ্যান্টার্কটিকার স্থলভাগ সমুদ্রে ঘেরা দ্বীপের মত। প্রায় দু কোটি বছর আগে এই মহাদেশটি পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশ থেকে ভৌগোলিক এবং জলবায়ুর দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরীক্ষায় জানা গেছে যে, এর বরফের তলায় 80 লক্ষ বর্গকিলোমিটার পার্বত্য মহাদেশ আছে। ট্রান্স অ্যান্টার্কটিক পর্বতমালা স্থলভাগকে দুটি অসমভাগে বিভক্ত করেছে: (i) বড়টি পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত তুষারাবৃত মালভূমি, নাম পূর্ব অ্যান্টার্কটিকা এবং (ii) ছোটটি পশ্চিম-দ্রাঘিমায় অবস্থিত তুষাররেখা দ্বীপপুঞ্জ নাম পশ্চিম অ্যান্টার্ক-টিকা। দক্ষিণ মহাসাগর (প্রশান্ত, আটলান্টিক এবং ভারত মহাসাগর মিলে তৈরী) স্থলভাগটিকে ঘিরে রয়েছে। গ্রীষ্মকালে
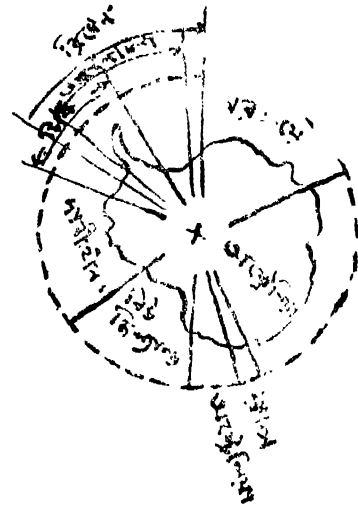
দক্ষিণ মেরুর ভূভাগ

* গ্রাম-পোঃ—গোড়শালা, জেলা-মুর্শিদাবাদ

অঞ্চলটি সূর্যের আলো পায় কিন্তু শীতকালে পায় অত্যন্ত কম। এখানকার সর্বোচ্চ স্থানের (200 মিটার উঁচু) তাপমাত্রা——88·3° সেলসিয়াস। শীতকালে উপকূল ভাগে —20° সেলসিয়াস থেকে—30° সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা ওঠানামা করে কিন্তু মহাদেশটির অভ্যন্তরভাগের তাপমাত্রা —40° সেলসিয়াস থেকে —70° সেলসিয়াস পর্যন্ত থাকে। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা 15° সেলসিয়াস পর্যন্ত ওঠে। মহাদেশের বেশীর ভাগ অঞ্চলই শুষ্ক, বার্ষিক বৃষ্টিপাত 15 সেন্টিমিটারেরও কম। প্রবল বাতাস (গতিবেগ, ঘণ্টায় 250 কিমি.) এখানকার একটি বৈশিষ্ট্য।

একটি হিসাবে বলা হয়েছিল, যদি অ্যান্টার্কটিকার সমস্ত বরফ গলে যায় তাহলে সমুদ্রের জলতলের উচ্চতা 60 থেকে 90 মিটার পর্যন্ত বেড়ে যাবে এবং এক ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হবে কিন্তু বর্তমানে পরীক্ষায় জানা গেছে যে, যদি অ্যান্টার্কটিকার সমস্ত বরফ গলেও যায় তাহলেও ভয়ের কোন কারণ নেই, কারণ সমুদ্রের জলতলের উচ্চতায় উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন ঘটবে না। যাই হোক, ঐ সঞ্চিত বরফের স্তরে স্তরে পৃথিবীর সময়ানুক্রমিক ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে। বরফের অভ্যন্তর তুরপুনের সাহায্যে ছিদ্র (drill) করে অতীতকালের পৃথিবীর জলবায়ুর বৈচিত্র্য আগ্নেয়গিরি ও পরিবেশ দূষণ সম্বন্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়।

রেডিও-অ্যাকটিভ আইসোটোপের পরীক্ষায় জানা গেছে যে অ্যান্টার্কটিকার তুষারমুকুট 40 লক্ষ বছর আগে থেকে তৈরি হতে আরম্ভ করেছে এবং 50 লক্ষ বছর আগে চূড়ান্ত উচ্চতায় উপনীত হয়েছে। দক্ষিণ সমুদ্রে বিরাট বিরাট হিমশৈল ভেসে বেড়ায়, ফলে জাহাজ চলাচলের খুব অসুবিধা হয়। এইসব হিমশৈলের চূড়া জলতল থেকে 60 মিটার পর্যন্ত উপরে থাকে এবং এরা 60 কিলোমিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। অ্যান্টার্কটিকার বরফের মধ্যে উল্কাপাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। এখন পর্যন্ত এরকম 1200টি নমুনা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। যেহেতু এরা প্রায় অবিকৃত অবস্থায় আছে সেইজন্য এরা আদিম যুগের পৃথিবীর ইতিহাসের উপর আলোকসম্পাত করে। উল্কার মধ্যে প্রোটিনের উপাদান অ্যামাইনোঅ্যাসিড পাওয়া গেছে, সেইজন্য বিষয়টি জীববিজ্ঞানীদের কাছে বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। এইসব উল্কা পরীক্ষা করে এই তুষার মহাদেশের বয়স সম্পর্কেও অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়।

স্থলভাগের জীব শতকরা মাত্র চারভাগ স্থানে সীমাবদ্ধ রয়েছে। প্রবল বাতাস, প্রচণ্ড শীত এবং শুষ্কতার জন্য বেশীর ভাগ অঞ্চলে উদ্ভিদ এবং প্রাণী ঠিকমত বাড়তে পারে না। এখানে প্রায় 800 প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে, তার মধ্যে সপুষ্পক উদ্ভিদের মাত্র দুটি প্রজাতি আছে—একটি মসজাতীয় এবং অপরটি সুগন্ধি পুষ্পজাতীয়। এখানে লাইকেনদেরই (Lichens—এক প্রকার নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ যাতে শৈবাল ও ছত্রাক একসঙ্গে মিথোজীবী হিসাবে বাস করে) প্রভুত্ব, এখানে এদের 350-এরও বেশী প্রজাতি রয়েছে। অন্যান্য উদ্ভিদ হচ্ছে মস, লিভারওয়ার্ট, বিভিন্ন প্রকার ছত্রাক, মিষ্টিজলের শেওলা ও ব্যাক্টিরিয়া।

এখানকার প্রাণীরা হচ্ছে বেশীর ভাগই অমেরুদণ্ডী। আণুবীক্ষণিক প্রাণীর মধ্যে রয়েছে হেলিওজোয়ানস্ (heliozoans), রোটিফারস্, (rotifers) নেমাটোডস্ (nematodes), সিলিয়েটস্ (ciliates) এবং প্রোটোজোয়ানস্ (protozoans)। আণুবীক্ষণিক নয় এমন প্রাণীরা বেশীর ভাগই হচ্ছে সন্ধিপদ (Arthropoda)। এখানে তাদেরই প্রাধান্য।

দক্ষিণ মেরুর স্থলভাগ অনুর্বর হলেও তাকে পরিবেষ্টন করে যে জলভাগ রয়েছে তা কিন্তু খুবই উর্বর। তাতে যথেষ্ট পরিমাণ পুষ্টিকারক দ্রব্য, অক্সিজেন এবং ভাসমান আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ (phytoplankton) রয়েছে, সেগুলি খেয়ে ছোট ছোট কীটপতঙ্গ মাছের লার্ভা প্রভৃতি (zooplankton) বেঁচে থাকতে পারে। আবার সেগুলিকে (zooplankton) খেয়ে মাছ, পাখী, সীল, তিমি প্রভৃতি প্রাণী বাঁচতে পারে। উপকূলভাগে একস্থানে আবদ্ধ (sessile) প্রাণী, যেমন—হাইড্রোজোয়া (hydrozoa), প্রবাল, স্পঞ্জ, ব্রাইয়োজোয়া (bryozoa) প্রভৃতি বাস করে। 100-এরও বেশী প্রজাতির মাছ এই সব এলাকায় পাওয়া যায় শিকারী না থাকার জন্য এবং যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য থাকার জন্য অ্যান্টার্কটিকার উপকূলভাগ সামুদ্রিক পাখীদের স্বর্গরাজ্য হয়ে আছে। এদের মধ্যে বিলস্ (bills), স্কাস্ (skaus), টার্নস (terns), সিথ (seath), পেঙ্গুইন (penguins) প্রভৃতি প্রধান। বেশীরভাগ পাখীই শীতকালে অন্যত্র চলে যায় কিন্তু সম্রাট পেঙ্গুইন সঙ্গীহীন অভিভাবকের মত শীতের রাত্রি যাপন করে। এখানে সীলের 6টি প্রজাতি আছে, এরা সামুদ্রিক খাদ্য গ্রহণ করে এবং শিলাময় সমুদ্র সৈকতে কিংবা বরফের উপর বাচ্চা প্রসব করে। অন্যান্য স্তন্যপায়ীর মধ্যে শুশুক ও তিমি প্রধান।

দক্ষিণ মেরুর বিরাট সম্পদভাণ্ডার হচ্ছে ক্রিল (Krill—Euphansia superba)। এটি নরওয়েবাসীদের ছোট একজাতীয় সন্ধিপদ প্রাণীর নাম। এরা 2·35 থেকে 6 সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। দেখতে অনেকটা কুচো চিংড়ির মত। এরা শীতের বরফের নীচে এবং ফাইটোপ্ল্যাংটন ছাড়াও বাঁচতে পারে। এদের বংশবৃদ্ধির হার প্রচণ্ড (একটি স্ত্রী ক্রিল একবারে 200টি পর্যন্ত ডিম পাড়ে। ডিম পাড়বার পর এরা মারা যায় না, এদের খোলস ছাড়ে এবং পুনরায় ডিমপাড়বার উপযুক্ত হয়। হয়ত সেই কারণেই এদের বংশ বৃদ্ধির হার এত প্রবল)। সোনিক টেকনিকের (sonic techniques) সাহায্যে এদের ঝাঁক পর্যবেক্ষণ করা যায় এবং কৃত্রিম উপগ্রহ মারফৎ এদের গতিপথের বিস্তৃত দৃশ্যও দেখা যায়। এই ক্রিল একদিন হয়ত প্রোটিনের উৎস হিসাবে সোয়াবিনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে। যদি ও

মানুষের খাদ্য হিসাবে একে গ্রহণ করার ব্যাপারে কিছু সমস্যা আছে তবুও বর্তমানে পশুখাদ্য হিসাবে একে ব্যবহার করা চলে। ক্রিলের বাৎসরিক উৎপাদন প্রায় দু-কোটি টন যা বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে যত মাছ ধরা হয় তার দ্বিগুণ। বর্তমানে 20000 টন ক্রিল ধরা হয়, দিন দিন অবশ্য এর পরিমাণ বাড়ছে। কিন্তু এত বেশী এই প্রাণী নষ্ট হলে হয়ত বাস্তুসংস্থানের (ecological) দিক দিয়ে ভারসাম্যের অভাব ঘটতে পারে। কারণ, তিমি ছাড়াও অন্যান্য অনেক প্রাণী, যেমন--সীল, পাখী, মাছ প্রভৃতি ক্রিল খেয়ে বেঁচে থাকে।

অ্যান্টার্কটিকার জীবসকলকে টিকে থাকার জন্য এখানকার প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে অনবরত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়। এখানকার জলবায়ু হচ্ছে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা এবং শুষ্ক (যে সব স্থানে বরফ নেই)। শীতকালে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় উদ্ভিদদেরকে খুব অল্প আলোয় সালোকসংশ্লেষ কার্য চালাতে হয় এবং শ্বাসক্রিয়াও খুব ধীরগতিতে চলে। মিষ্টি ও নোনা জলের শেওলারা গ্রীষ্মকালে 14° সেলসিয়াস পর্যন্ত এবং শীতকালে হিমাঙ্কের অনেক নীচ পর্যন্ত উষ্ণতা সহ্য করতে পারে। বর্ণহীন ব্যাকটিরিয়া ছত্রাক ও শেওলারা বালিতে নুড়ির ফাঁকে জন্মায় সেখানে তারা জন্মাবধি আশ্রয় পায়। অ্যান্টার্কটিকায় বাস করার পক্ষে মসের চেয়ে লাইকেনরাই বেশী উপযুক্ত।

সন্ধিপদ প্রাণীরা এখানকার পুরাতন বাসিন্দা, কারণ এরা −50° সেলসিয়াস পর্যন্ত উষ্ণতা সহ্য করতে পারে। দেহের অভ্যন্তরের এক বিশেষ ধরণের তরল পদার্থ এখানকার সামুদ্রিক প্রাণীদেরকে জমে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। লিম্পেটের (এক ধরণের শম্বুক জাতীয় প্রাণী) একটি প্রজাতির শরীর থেকে একপ্রকার মিউকাস নিঃসৃত হয়, যা তাদের শরীরের উপর বরফের কেলাস জমতে দেয় না। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের সামুদ্রিক মাছেদের রক্ত −0·8° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় জমে যায় এবং সোডিয়াম ক্লোরাইডকে এর জন্য দায়ী করা হয়। দক্ষিণ মেরুর মাছেদের রক্ত −2° সেলসিয়াস থেকে −2·5° সেলসিয়াস তাপমাত্রার মধ্যে জমাট বাঁধে। ট্রেমাটোমাস (trematomus) নামক একপ্রকার গ্লাইকোপ্রোটিন তাদের দেহ থেকে পৃথক করা সম্ভব হয়েছে যা তাদের রক্ত জমাট বাঁধায় বিরুদ্ধে ক্রিয়া করে। অন্যান্য অনেক মাছেও এরকম অনেকগুলি যৌগ পাওয়া গেছে।

1982 খৃস্টাব্দের 9ই জানুয়ারী ডাঃ এস জেড কাসেমের নেতৃত্বে যে দক্ষিণ মেরু অভিযানটি হয়ে গেল তা ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণার দিক দিয়ে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ গণ্ডোয়ানার কাল থেকে ভারত দক্ষিণ মেরুর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল, সেইজন্য ভৌগোলিক দিক দিয়ে ভারতের সঙ্গে তার অনেক সাদৃশ্য আছে; তাছাড়া ভারতের মৌসুমীবায়ুর উপর অ্যান্টার্কটিকার প্রভাব আছে। যদিও এর আগেও কয়েকজন ভারতীয় বিজ্ঞানী মহাদেশটি পরিদর্শন করেন তবুও এটিই হচ্ছে ভারতীয়দের প্রথম সফল বৈজ্ঞানিক অভিযান। এই দলটি যে সব কাজ করেছেন তার মধ্যে কয়েকটি হল—উল্কাপাতের অনেকগুলি নমুনা সংগ্রহ; 'দক্ষিণ গঙ্গোত্রী নামক একটি আবহাওয়া স্টেশন স্থাপন, যা সৌরশক্তিতে প্রায় এক বছর চালু থাকবে এবং সেখান থেকে কতকগুলি প্রাচীন লাইকেন ও মস সংগ্রহ করেছেন, যেগুলি নিয়ে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

দক্ষিণ মেরু হচ্ছে সবচেয়ে দূরবর্তী, সবচেয়ে ঠাণ্ডা এবং অব্যবহৃত একটি মহাদেশ যা বিভিন্ন খনিজ পদার্থ, তেল ও খাদ্য সম্পদে পরিপূর্ণ। এখানকার পরিবেশ এবং জীবসমষ্টির এখনও পর্যন্ত কোন ক্ষতি হয় নি। সেইজন্য সেখানকার জীবের বাস্তুসংস্থান পদ্ধতি, শক্তির ব্যবহার ও বংশবৃদ্ধি সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য পাওয়া সম্ভব। ভৌগোলিক ও জ্যামিতিক অবস্থানের জন্য অ্যান্টার্কটিকা সূর্য ও পৃথিবী সম্বন্ধে গবেষণা চালানোর পক্ষে একটি প্লাটফর্ম। জলবায়ু, সাইক্লোন, পরিবেশ দূষণ প্রভৃতি সম্বন্ধে সেখানে যেসব বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলছে তার ফলস্বরূপ একদিন মানুষের কাছে জ্ঞানের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। তাই মতভেদের অবসান ঘটিয়ে একে অন্যের পরিপূরক হিসাবে এবং সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে পৃথিবীর সমস্ত দেশ প্রয়াস চালিয়ে গেলে দক্ষিণ মেরু অভিযান সার্থক হবে এবং আগামী দিনগুলিতে অ্যান্টার্কটিকা মানুষের উত্তর পুরুষদের একটি সাধারণ সম্পদ হয়ে থাকবে।

প্রযুক্তিবিদ্যার আরেকটি স্বাক্ষর
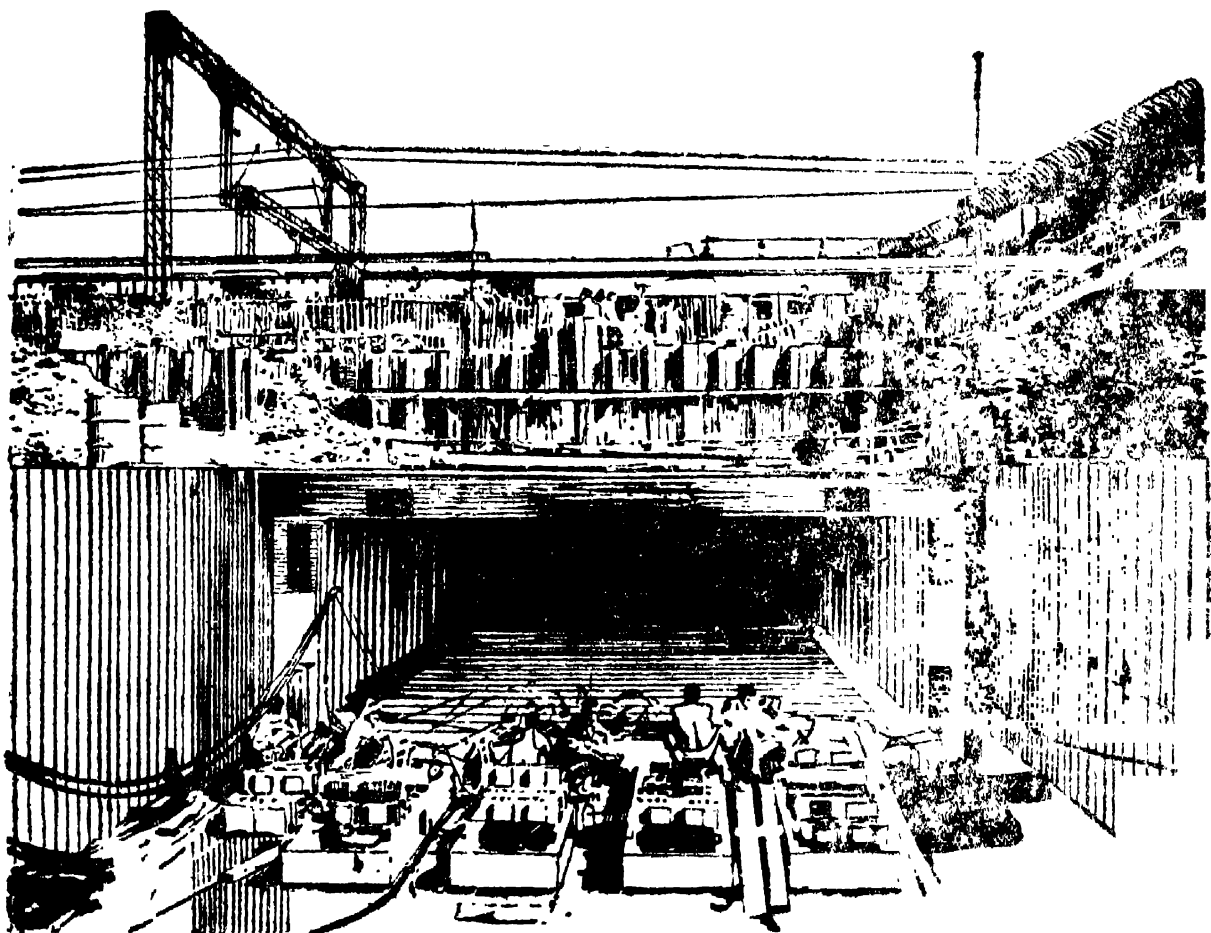
ভিড়ের সময় হাজার হাজার নিত্যযাত্রী পূর্ব-রেলের দমদম স্টেশনের চার প্ল্যাটফর্মে জড় হন। পূর্ব ও মেট্রো রেলের ভিড় একসঙ্গে সামাল দিতে একটি নতুন স্টেশন বানাচ্ছে মেট্রো। প্ল্যাটফর্মের তলায় তৈরি দুটি সাবওয়ে পূর্বরেলের প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে মেট্রোকে জুড়ে দেবে। এখনকার ওভারব্রিজ আর থাকবে না। জ্যাক দিয়ে ছ'টি রেল লাইনের তলা দিয়ে দুজায়গায় আগে ঢালাইকরা চারটি কংক্রিটের বিরাট বাক্স ঠেলে দিতে একেবারে হাল আমলের 'বক্স-পুসিং মেথড' অর্থাৎ বাক্স-ঠেলা-কৌশল প্রয়োগ করেছেন ভারতীয় ইঞ্জিনীয়াররাই। বাক্সগুলি পরপর বসিয়ে দিয়ে মাটিকাটার কাজ হয়েছে ভেতরে ভেতরে। স্টেশনের তলায় যে এতসব কাজ হয়েছে, উপর থেকে টের পাবার জো ছিল না। আরও গর্বের কথা, এত বড় ও এত জটিল কাজ শেষ করতে লেগেছে মাত্র ৩৫ দিন। সাবেক প্রথায় এ কাজে লেগে যেত বেশ কয়েক বছর। শুধু তাই নয়, উপরে ট্রেনের আসা যাওয়ায়ও বিঘ্ন ঘটেনি।

সাবওয়ে খুলে গেলে যে সব নিত্যযাত্রী ভিড়ের সময় দমদম দিয়ে চলাফেরা করেন, তাঁদের পূর্বরেলের লোকালে বা মেট্রোরেলে অফিস যাওয়া বা বাড়ি ফেরার সুবিধা হবে বেশি। এই আসা যাওয়া হবে দ্রুত, নিরাপদ ও স্বচ্ছন্দ।

ফুল ফোটার রহস্য

ঋতিংকর দত্ত*

আমরা বাড়িতে ফুল গাছ লাগাই, ফুল গাছের যত্ন নিই ফুলের সৌন্দর্যের জন্য। ফুল ফুটলে এক অনাবিল আনন্দে ভরে ওঠে পরিবেশ জুড়িয়ে যায় সবার চোখ এমনকি ক্লান্ত মনও। গাছ পরিণত হলে তাতে ফুল উৎপন্ন হয়। কারণ পরিণত গাছ ফুলের সাহায্যে বংশবিস্তার করে, অর্থাৎ ফুল-গাছের জনন অঙ্গ। ফুলের পুং-স্তবকে পরাগ উৎপন্ন হয় এবং স্ত্রী-স্তবকে উৎপন্ন হয় ডিম্বাণু। পরাগ ও ডিম্বাণুর মিলনকে নিষেক বলে। নিষেকের ফলে উৎপন্ন হয় জাইগোট। জাইগোট পরবর্তী কালে বিভাজিত হয়ে বীজ উৎপন্ন করে। বীজ অঙ্কুরিত হয়ে নতুন গাছ সৃষ্টি করে। সুতরাং নিষেক না হলে বীজ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নয়। নিষেক সম্পন্ন হতে গেলে আবার প্রয়োজন হয় পরাগ সংযোগের। পুং-স্তবক থেকে পরাগের স্ত্রী-স্তবকে স্থানান্তরকে বলে পরাগ সংযোগ। পরাগ সংযোগের জন্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হয় বিভিন্ন বাহকের। নানা কীট-পতঙ্গ এই বাহকের কাজ করে। মৌমাছি, প্রজাপতি প্রভৃতি কীট-পতঙ্গেরা এক ফুলের পরাগ অন্য ফুলে স্থানান্তরিত করে পরাগ সংযোগে সাহায্য করে। ফুল তাই উজ্জ্বল বর্ণের দ্বারা কীট-পতঙ্গকে আকৃষ্ট করে। যখন পতঙ্গ কোন ফুলে গিয়ে বসে তখন তাদের গায়ে ঐ ফুলের পরাগ আটকে যায়। পরে যখন ঐ পতঙ্গ অন্য ফুলে গিয়ে বসে তখন পরাগ তাদের গা থেকে ঐ ফুলে ঝরে পড়ে, ফলে সম্পন্ন হয় পরাগ সংযোগ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে পতঙ্গদের আকৃষ্ট করার জন্যই ফুল হয় রঙিন। কিন্তু ফুল রঙীন হবার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কি?

ফুলে অ্যান্থোসায়ানিন (Anthocyanin) নামক একপ্রকার রঞ্জক পদার্থ থাকাই এর কারণ। অ্যান্থোসায়ানিন জলে দ্রবীভূত অবস্থায় কোষ-গহ্বরে থাকে। এর বর্ণ তিন রকমের হতে পারে। যথা—লাল, নীল এবং লাল্‌চে বেগুনী। কোষরসের প্রকৃতি আম্লিক হলে লাল বর্ণ প্রকাশ পায় এবং অম্ল ও ক্ষারের মাত্রা নিরপেক্ষ দলে লাল্‌চে বেগুনী বা নীল বর্ণ প্রকাশ পায়।

অ্যান্থোসায়ানিনের রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে এর প্রধান উপাদান হলো অ্যান্থোসায়ানিডিন (Anthocyanidin) ও গ্লিকোসাইডস (Glycocides)। অ্যান্থোসায়ানিন সংশ্লেষ জিন ও কোষের শর্করার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাছাড়া পরিবেশগত বিভিন্ন শর্তের দ্বারাও অ্যান্থোসায়ানিন সংশ্লেষ নিয়ন্ত্রিত হয়। এগুলির মধ্যে প্রধান হল আলোর তীব্রতা, নিম্ন-তাপমাত্রা, অপেক্ষাকৃত কম অক্সিজেনের জোগান প্রভৃতি। আলট্রা-ভাওলেট রশ্মির উপস্থিতিতেও অ্যান্থোসায়ানিনের সংশ্লেষ ঘটানো সম্ভব।

ফুলকে নানা বর্ণে রঞ্জিত করে পরাগ সংযোগে সাহায্য করা ছাড়াও অ্যান্থোসায়ানিনের আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। যেমন তীব্র আলোতে এটি ক্লোরোফিলকে নষ্ট হতে দেয় না। এছাড়া কিছু উৎসেচকের কাজেও এরা সাহায্য করে। ফলে উদ্ভিদ দেহে শ্বসন ও সালোক-সংশ্লেষ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এরা আলোক শক্তিকে রূপান্তর করতে সাহায্য করে।

এবারে দেখা যাক ফুল ফোটার প্রকৃত কারণ কি? উদ্ভিদের দেহের বৃদ্ধি সম্পূর্ণ হলে ভাজক কলা থেকে flower primordia নামক একপ্রকার বিশেষ কোষ গুচ্ছ সৃষ্টি হয় যা পরবর্তীকালে পরিণত হয় পুষ্প-মুকুলে। গাছে ফুল ফুটাতে প্রধান যে দুটি জিনিস সাহায্য করে তা হল আলো এবং হরমোন। উদ্ভিদের দেহ বৃদ্ধিকারক হরমোনের মধ্যে প্রধান হল ইনডোল অ্যাসিটিক অ্যাসিড (IAA) এবং জিব্বারেলিনস (GA) অনেকে মনে করেন GA কিছুটা ফুল ফোটাতেও সাহায্য করে। তবে ফুল ফোটানর জন্য দায়ী হরমোনের মধ্যে প্রধান হল ফ্লোরিজেন। দেখা গেছে IAA-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে ফ্লোরিজেনের পরিমাণ হ্রাস পায়, ফলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি হয়। আবার ফ্লোরিজেনের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে IAA-এর মাত্রা হ্রাস পায়, ফলে ফুল ফোটে।

আলোর ভূমিকার উপর নির্ভর করে উদ্ভিদকে প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—short day plants. long day plants এবং day-neutral plants। প্রথম দু-প্রকার উদ্ভিদের ক্ষেত্রে আলো হল প্রধান শর্ত যা ফুল ফুটতে সাহায্য করে. কিন্তু day neutral plant-এর ক্ষেত্রে ফুল ফোটানোর ব্যাপারে আলো ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। গ্রীষ্মকালে দিন বড়, তখন long day plants-এ ফুল ফোটে, আবার শীতকালে দিন ছোট, তখন short day plants-এ ফুল ফোটে।

গাছের পাতায় phytochrome নামে একপ্রকার রঞ্জক পদার্থ থাকে যা আলো শোষণ করে ও একপ্রকারের রাসায়নিক পদার্থকে উদ্দীপিত করে। ঐ রাসায়নিক পদার্থটি হল ফ্লোরিজেন (Florigen)। ফ্লোরিজেন পাতা থেকে পুষ্প মুকুলে যায় এবং ফুল ফোটাতে সাহায্য করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আলো ফ্লোরিজেন সংশ্লেষণে সাহায্য করে এবং ফুল ফোটাতে সাহায্য করে। long day plants-এর ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় আলো পাবার পর পাতায় ফ্লোরিজেন-এর সংশ্লেষণ ঘটে তাই এই সমস্ত গাছে গ্রীষ্মকালে ফুল ফোটে। আবার Short day plants-এর ক্ষেত্রে স্বল্পকাল আলো পাবার পর পাতায় ফ্লোরিজেন সংশ্লেষিত হয় ফলে এই জাতীয় গাছে শীতকালে ফুল ফোটে।

[পরের অংশ 25[illegible] পৃষ্ঠায় দেখুন]

* মডার্ন স্কুল, কলিকাতা-700017

মজার খেলা

সঞ্জয় মুখার্জী*

বসন্ত বিদায় নিল, আর তারই সঙ্গে বিদায় নিল 1390 সাল। এল 1391 সাল। নতুন বছরকে বরণ করা যাক একটি মজার খেলা দিয়ে। খেলাটি আর কিছুই নয়, যে কোন মাসের, যে কোন তারিখ কেউ বললে সেটি কি বার পড়বে, চটপট বলে দেওয়া যাবে। কিন্তু তা বলার জন্যে 12 খানা সংখ্যা মনে রাখতে হবে। একটি সংখ্যা কেবলমাত্র একটি মাসের জন্যে প্রয়োগ হবে, যথা :—

মাস					
বৈশাখ	'91	সালের	জন্যে	নির্ধারিত	সংখ্যা = 6
জ্যৈষ্ঠ	,,	,,	,,	,,	,, = 3
আষাঢ়	,,	,,	,,	,,	,, = 6
শ্রাবণ	,,	,,	,,	,,	,, = 2
ভাদ্র	,,	,,	,,	,,	,, = 6
আশ্বিন	,,	,,	,,	,,	,, = 2
কার্তিক	,,	,,	,,	,,	,, = 4
অগ্রহায়ণ	,,	,,	,,	,,	,, = 6
পৌষ	,,	,,	,,	,,	,, = 0
মাঘ	,,	,,	,,	,,	,, = 2
ফাল্গুন	,,	,,	,,	,,	,, = 3
চৈত্র	,,	,,	,,	,,	,, = 5

এবার যে কোন মাসের যে কোন তারিখের দিন নির্ণয় করতে হলে, তারিখটি উপরিউক্ত নির্ধারিত সংখ্যার সঙ্গে যোগ করতে হবে। যোগফলকে 7 দ্বারা ভাগ করে যত অবশিষ্ট থাকবে, সপ্তাহের তত নং দিনই হল নির্ণেয় দিন। কোন ভাগশেষ না থাকলে, দিনটি শনিবার হবে।

আবার, কোন তারিখ মাসের প্রথম সপ্তাহে থাকলে, তারিখটির সঙ্গে নির্ধারিত সংখ্যা যোগ করে যদি 7-এর বেশি হয়, তা হলে নিয়মানুযায়ী করতে হবে। কিন্তু 7 বা 7-এর কম হলে, সপ্তাহের তত নং দিনই হবে নির্ণেয় বার। রবিবারকে সপ্তাহের (1নং) ধরা হয়েছে। দু-একটি উদাহরণ দেখা যাক :—

প্রঃ (i) 1391 সালের শ্রাবণ মাসের 25 তারিখ কবে পড়েছে ?

উঃ (i) চার্ট অনুযায়ী শ্রাবণ মাসের নির্ধারিত সংখ্যা (2) এর সঙ্গে যুক্ত করলাম। যোগ করে হল $(25+2)=27$। এইবার একে 7 দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ থাকবে $(27\div7)=6$। সপ্তাহের 6নং দিনই হবে শ্রাবণ মাসের মাসের 25 তারিখ, অর্থাৎ দিনটি পড়বে শুক্রবার।

আবার, মাসের প্রথম সপ্তাহে কোন দিন থাকলে, তা কি করে নির্ণয় করতে হবে, তারই আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি। যথা :—

প্রঃ (ii) 1391 সালের শ্রাবণ মাসের 5 ও 4 তারিখ কবে পড়বে ? 5-এর সঙ্গে শ্রাবণ মাসের সেই নির্ধারিত সংখ্যা (2) যোগ করলেন যোগ করে $(5+2)=7$ হল। এইবার 7-কে নিয়মানুযায়ী 7 দিয়ে ভাগ করলে মিলে যাবে। তাহলে 5 তারিখ পড়বে 'শনিবার'।

এইবার 4-এর সঙ্গে 2 যোগ করলে 6 হবে। তাহলে, সপ্তাহের 6নং দিনই হবে 4 তারিখ, অর্থাৎ দিনটি পড়বে শুক্রবার।

আরও দেখ, যেরকমভাবে বাংলা তারিখ কি বার পড়ছে বার বার, ঠিক অনুরূপে ইংরেজী মাসের তারিখও ঠিক ঐরকম নিয়মানুযায়ী বার করা যাবে। এই মানগুলো বের করার জন্যে একেবারেই সহজ উপায় আছে।

ইংরেজী মাসের জন্যেও 12 খানা সংখ্যা মনে রাখতে হবে। একটি সংখ্যা কেবলমাত্র একটি মাসের জন্যে। যথা :—

		মাস				
1984	খৃস্টাব্দের	জানুয়ারি	মাসের	জন্যে	নির্ধারিত	সংখ্যা = 0
,,	,,	ফেব্রুয়ারি	,,	,,	,,	,, = 3
,,	,,	মার্চ	,,	,,	,,	,, = 4
,,	,,	এপ্রিল	,,	,,	,,	,, = 0
,,	,,	মে	,,	,,	,,	,, = 2
,,	,,	জুন	,,	,,	,,	,, = 5
,,	,,	জুলাই	,,	,,	,,	,, = 0
,,	,,	অগাস্ট	,,	,,	,,	,, = 3
,,	,,	সেপ্টেম্বর	,,	,,	,,	,, = 6
,,	,,	অক্টোবর	,,	,,	,,	,, = 1
,,	,,	নভেম্বর	,,	,,	,,	,, = 4
,,	,,	ডিসেম্বর	,,	,,	,,	,, = 6

মনে রাখার পর, আগের বাংলা বার যেভাবে বের করা হয়েছে, ঠিক সেরকমভাবে ইংরেজী তারিখ কি বার পড়ছে খুব সহজে বলে দিতে পারবে। তাহলে এবার তোমাদের আনন্দ দেখে কে, ইংরেজী, বাংলা যেই তারিখই বলুক না কেন, কি বার পড়ছে বলে দিতে পারবে।

[253 পৃষ্ঠার পরের অংশ]

বিজ্ঞানী Hess-এর মতে এক বিশেষ প্রকারের রাইবো নিউক্লিক আসিড (RNA) ফুল ফোটাতে সাহায্য করে। একে বলে Reproductory RNA বর্তমানে দেখা গেছে অ্যানথেসিনস (Anthesins) নামক পদার্থও ফুল ফোটাতে সাহায্য করে।

*পি—205, (অক্সি-টাউন) শিবরামপুর, কলিকাতা-700061

ইনফিনিটি ক্যালেণ্ডার

উজ্জ্বলকুমার দত্ত*

তোমরা কি দু-মিনিটের মধ্যে 12,675 খৃস্টাব্দের 23শে জানুয়ারী কি বার হবে বা 198 খৃস্টাব্দের 12ই মার্চ কি বার ছিল তা বলতে পারবে ? বলবে এতো অল্প সময়ে কি করে হবে আরও সময় দিতে হবে, না সময় দেওয়া যাবে না। তবে শোন কি করে এই অল্প সময়ে 1 থেকে অনন্তকাল (Infinity)-এর যে কোন খৃস্টাব্দের যে কোন মাসের যে কোন তারিখ কি বার ছিল বা হবে তা অতি সহজেই নীচের ছক দুটি থেকে নির্ণয় করা সম্ভব। এমন কি সেই খৃস্টাব্দটি লীপ ইয়ার (Leap Year) কিনা তাও ঐ ছক থেকে জানা যাবে। এই ছক থেকে কিভাবে বার নির্ণয় করতে হবে তার নিয়মগুলি ছক দুটির শেষে দিলাম।

ছক—1

Re	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
0	4	0	1	4	6	2	4	0	3	5	1	3
1	6	2	2	5	0	3	5	1	4	6	2	4
2	0	3	3	6	1	4	6	2	5	0	3	5
3	1	4	4	0	2	5	0	3	6	1	4	6
4	2	5	6	2	4	0	2	5	1	3	6	1
5	4	0	0	3	5	1	3	6	2	4	0	2
6	5	1	1	4	6	2	4	0	3	5	1	3
7	6	2	2	5	0	3	5	1	4	6	2	4
8	0	3	4	0	2	5	0	3	6	1	4	6
9	2	5	5	1	3	6	1	4	0	2	5	0
10	3	6	6	2	4	0	2	5	1	3	6	1
11	4	0	0	3	5	1	3	6	2	4	0	2
12	5	1	2	5	0	3	5	1	4	6	2	4
13	0	3	3	6	1	4	6	2	5	0	3	5
14	1	4	4	0	2	5	0	3	6	1	4	6
15	2	5	5	1	3	6	1	4	0	2	5	0
16	3	6	0	3	5	1	3	6	2	4	0	2
17	5	1	1	4	6	2	4	0	3	5	1	3
18	6	2	2	5	0	3	5	1	4	6	2	4
19	0	3	3	6	1	4	6	2	5	0	3	5
20	1	4	5	1	3	6	1	4	0	2	5	0
21	3	6	6	2	4	0	2	5	1	3	6	1
22	4	0	0	3	5	1	3	6	2	4	0	2
23	5	1	1	4	6	2	4	0	3	5	1	3
24	6	2	3	6	1	4	6	2	5	0	3	5
25	1	4	4	0	2	5	0	3	6	1	4	6
26	2	5	5	1	3	6	1	4	0	2	5	0
27	3	6	6	2	4	0	2	5	1	3	6	1

ছক—2

Re	দিন
/ 0	রবিবার
/ 1	সোমবার
/ 2	মঙ্গলবার
/ 3	বুধবার
/ 4	বৃহস্পতি
/ 5	শুক্রবার
/ 6	শনিবার

8/4. ভট্টাচার্য পাড়া লেন. পোঃ-সাঁতরাগাছি হাওড়া-7111 04

1নং নিয়ম ঃ—যে খৃস্টাব্দের বার নির্ণয় করতে হবে, সেই খৃস্টাব্দকে 28 দিয়ে ভাগ করে যে ভাগশেষ (Remainder) থাকবে তা ছক—1-এর (0 থেকে 27) দেওয়া ভাগশেষের সঙ্গে মেলাতে হবে। ছক—1-এ দেওয়া যে ভাগশেষের সঙ্গে নির্ণেয় ভাগশেষ মিলবে, সেই ভাগশেষের সারিটি ধরে আলোচ্য বৎসরের বার নির্ণয় করতে হবে। তবে 1 খৃস্টাব্দ থেকে 27 খৃস্টাব্দ পর্যন্ত কোন খৃস্টাব্দের বার নির্ণয় করতে হলে সেই সালকে 28 দিয়ে ভাগ করার প্রয়োজন নেই। 1 থেকে 27 খৃস্টাব্দ সবগুলিই ভাগশেষ হিসাবে ধরে নিতে হবে।

ধরা যাক, 1978 খৃস্টাব্দের বার নির্ণয় করতে হবে।

1978÷28 = ভাগফল 70 ও ভাগশেষ 18

(তোমাদের দরকার শুধু এই ভাগশেষটি—18)

তাহলে দেখা যাচ্ছে ছক—1-এর Re-18-এর সারি ধরে 1978 খৃস্টাব্দের বার গণনা করতে হবে।

এখানে একটা কথা বলে রাখি, যে যে খৃস্টাব্দের ভাগশেষ 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 হবে, সেই সালগুলি লীপ ইয়ার হবে। যেমন ধর-- 1980÷28=70 ভাগফল ও 20 ভাগশেষ। অতএব এই সালটি লীপ ইয়ার হবে।

2নং নিয়ম ঃ—উপরিউক্ত পদ্ধতিতে নির্ণেয় সারির যে মাসের যে তারিখ কি বার হয় তা বের করতে হলে সেই তারিখের সঙ্গে সেই মাসের সংখ্যাটি যোগ করে যোগফলকে 7 দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগশেষ থাকে তা ছক—2 (Re-0 to Re-6)-এর সঙ্গে মেলাতে হবে। যে সংখ্যার সঙ্গে অবশিষ্টটি মিলবে সেই সংখ্যার পাশের বারটিই নির্ণেয় বার। যদি যোগফল 7-এর কম হয় তবে তা ভাগশেষ হিসাবে ধরে নিতে হবে।

ধরা যাক, 1972 খৃস্টাব্দের 13ই জুলাই ও 1লা অক্টোবর কি বার ছিল তা নির্ণয় করতে হবে।

1নং নিয়ম অনুসারে 1972÷28=70/12 অবশিষ্ট।

এই খৃস্টাব্দটি লীপ ইয়ার (যেহেতু ভাগশেষ 12)

সুতরাং ছক—1-এর Re-12-র সারি ধরে 1972 খৃস্টাব্দের হিসাব করতে হবে।

2নং নিয়ম অনুসারে, ঐ সারির July মাসের সংখ্যা=5

(5+13 তারিখ)÷7=2/4 অবশিষ্ট।

অতএব, ছক—2-এর Re-4-এর পাশের বারটিই হবে নির্ণেয় বার, বা নির্ণেয় বার হবে (THU) বৃহস্পতিবার।

আবার, ঐ সারির October মাসের সংখ্যা=6

(6+1 তারিখ)÷7=1/0 অবশিষ্ট,

এবার, ছক—2-এর Re-0 এর পাশের বারটিই হবে নির্ণেয় বার বা রবিবার (Sun)।

সুবিধার জন্য একটা 28 এর নামতা তৈরি করে নিও।

ডিম উৎপাদনে জিঙ্ক ব্যাসিট্রেসিনের প্রভাব

আন্ধ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোঃ আকস্মিক গবেষণা করে জেনেছেন যে মুরগীর মধ্যে জিঙ্ক ব্যাসিট্রেসিন মিশিয়ে দিয়ে ডিমের উৎপাদন এবং খাদ্য ব্যবহারে উন্নতি লক্ষিত হয়। বিভিন্ন মাত্রায় জিঙ্ক ব্যাসিট্রেসিন মিশিয়ে এবং একেবারে না মিশিয়ে, খাদ্যের মাত্রা সমান রেখে পরীক্ষা চালান হয়। যে সব পাখীর খাদ্যে উক্ত রাসায়নিক মেশানো হয় নি সে সব পাখী বছরে 256·8 হারে ডিম দেয়। 100 পি. পি. এম. মাত্রায় জিঙ্ক ব্যাসিট্রেসিন মেশোনো খাদ্য যেসব পাখীরা খায় তাদের বাৎসরিক ডিম দেবার পরিমাণ 2. 3। এই পাখীরা 170 গ্রাম করে খাদ্য খায় যেখানে মেশানো খাদ্য খাবার পরিমাণ 107 গ্রাম। রাসায়নিক মিশ্রিত খাদ্য যেন পাখীরা খায় তাদের মৃত্যুর হার 5·0% এবং ডিমের ওজন 61·2 গ্রাম (100 পি. পি. এম. জিঙ্ক ব্যাসিট্রেসিন মেশাবার ক্ষেত্রে)। রাসায়নিক ছাড়া খাদ্য যে পাখীদের খাওয়ানো হয় তাদের মৃত্যুর হার ছিল 8·8% এবং ডিমের ওজন 61·1 গ্রাম। 100 পি. পি. এম. ব্যাসিট্রেসিনের দাম উঠে যাবার জন্য পাখী প্রতি 2টি ডিম বেশী হওয়া প্রয়োজন।

[ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ]

জীবন্ত জীবাশ্ম ঃ ফুস্‌ফুস মাছ ও সিলাকান্থ

হীরক দাশ*

'জীবন্ত জীবাশ্ম' কি তা আশা করি তোমাদের অজানা নয়। কোমোডো ড্রাগন, টুয়াটারা, সিলাকান্থ মাছ, ফুস্‌ফুস মাছ, হংসচঞ্চু প্ল্যাটিপাস বা ক্লিনোগুলা, নিওপিলিনা ও নটিলাস নামক সামুদ্রিক জীব এর উদাহরণ। এখানে সিলাকান্থ মাছ ও ফুস্‌ফুস মাছ সম্বন্ধে বলা হয়েছে। জল ছাড়া মাছ বাঁচতে পারে না। কারণ ওদের শ্বাস-প্রশ্বাসের যন্ত্র 'কানকো' এমন ভাবেই তৈরী যা শুধুমাত্র জলেই কাজ করতে পারে। জল থেকে তুললেই কানকো অচল। তাই মাছও নিশ্বাস আটকে মরে যায়। কিন্তু এরও ব্যতিক্রম আছে। পৃথিবীতে এমন এক জাতের মাছ আছে যারা জলে তো ভালভাবেই বেঁচে থাকে—এমন কি, ডাঙ্গায়ও দিনের পর দিন বেঁচে থাকতে পারে। এই অদ্ভুত মাছের নাম ফুস্‌ফুস-মাছ বা লাং ফিস। এরা আবার 'জীবন্ত জীবাশ্ম'ও বটে।

আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া দক্ষিণ আমেরিকায় এই মাছদের দেখা মেলে। এদের দেহের রং হয় ঘন ধূসর থেকে কুচকুচে কালোর মধ্যে। লম্বায় চার-পাঁচ ফুটের মতো এদের প্রায় আঁশহীন দেহটা বেজায় খস্‌খসে। মাথা এবং পেটের ঠিক নিচে দু-জোড়া পাখ্‌না আছে যার সাহায্যে এরা জলের তলায়
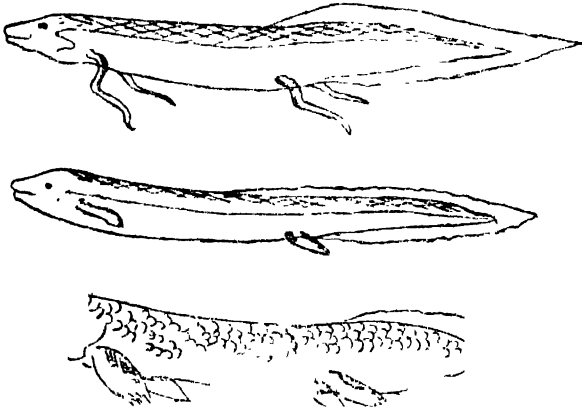
বিভিন্ন প্রজাতির ফুস্‌ফুস মাছ

মাটিতে অনেকটা হামাগুড়ি দেয়ার মতো করে চলাফেরা করে। এদের শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য দুটি যন্ত্র আছে। একটি হলো সাধারণ মাছের মত কানকো। অপরটি হলো 'পট্‌কা' বা বাতাস-থলে। এই পট্‌কা সব মাছের পেটের ভেতর থাকে। তবে অন্যান্য মাছেরা এর সাহায্যে শুধু মাত্র জলে ভেসে থাকার কাজ চালায় কিন্তু এই ফুসফুস মাছ ডাঙ্গায় থাকাকালীন তার পট্‌কার সাহায্যে বায়ুমণ্ডল থেকে সোজাসুজি বাতাস টেনে নিয়ে বেঁচে থাকে। যেভাবে আমরা ফুস্‌ফুসের সাহায্যে নিশ্বাস নি।

ফুস্‌ফুস মাছেরা সাধারণত জলজ ঘাসে ভরা জলভূমিতে বাস করতে ভালবাসে। গ্রীষ্মকালে জলাভূমির জল যখন শুকিয়ে যায় তখন এরা জলাভূমির নরম কাদামাটির মধ্যে দিয়ে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে দু-তিন ফুট গভীরে ঢুকে পড়ে একটা গোলাকার গর্ত তৈরি করে। এই গর্তের মধ্যে এরা এদের দেহটাকে কুণ্ডলী পাকিয়ে মুখটা গর্তের ফুটোর দিকে রেখে বর্ষাকাল না আসা পর্যন্ত কুম্ভকর্ণের ঘুম আরম্ভ করে দেয়। এই সময় থেকে এদের কানকো নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়—পট্‌কার কাজ শুরু হয়। গর্তের ফুটোটা হচ্ছে বাতাস ঢোকার পথ। এই মাছরা ওদের শরীর থেকে একরকম আঠালো রস নিঃসৃত করে। এই রস গর্তের ভেতরের মাটির গায়ে লাগিয়ে এরা এদের বাসাটিকে বেশ মসৃণ করে নেয়। এর ফলে গর্তের উপরের মাটি রোদের তাপে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেলেও গর্তের ভেতরের মাটি ভিজে ও নরম থাকে। এই চার-পাঁচ মাস এই গর্তের মধ্যে এরা ঘুমিয়ে কাটায় এবং খাওয়ার তখন কোন প্রয়োজনও হয় না। কারণ আগে থেকেই এই মাছেরা প্রচুর পরিমাণে খাবার খেয়ে শরীরের মধ্যে অনেক চর্বি জমিয়ে রাখে। দীর্ঘ ঘুমের সময়টা সঞ্চিত ওই চর্বিই এদের বাঁচিয়ে রাখে। তারপর যখন বর্ষা আসে, জলাভূমি জলে পূর্ণ হয়ে যায়—তখন এদের ঘুম ভাঙে। গর্ত থেকে উপরে উঠেই খাদ্য খুঁজতে আরম্ভ করে দেয়। কারণ ঘুম ভাঙ্গার পর রাবনের ভাই কুম্ভকর্ণের মতো এদের দারুন খিদে পায়। এই সময় এদের পট্‌কা নিষ্ক্রিয় হয়ে পরে এবং কানকোর কাজ আবার শুরু হয়।

সিলাকান্থ নামক মাছটি হলো আর একটা জীবন্ত জীবাশ্ম। পৃথিবীতে এদের আবির্ভাব হয়েছিল আজ
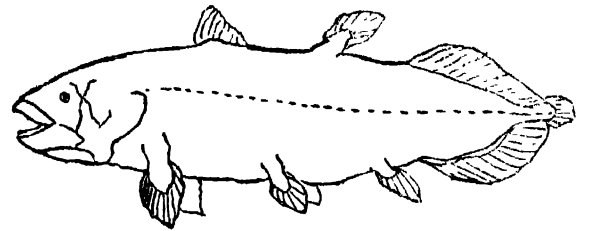
সিলাকান্থ মাছ

থেকে 40 কোটি বছর আগে, কিন্তু আজও এরা আকৃতি এবং প্রকৃতিতে প্রায় অবিকৃত রয়েছে। 40 কোটি বছরের মধ্যে এদের কোন রকমের পরিবর্তন হয় নি। সত্যি অবিশ্বাস্য! এই কিছুকাল আগেও বিজ্ঞানীরা ভাবতেন যে অতীতের ডাইনোসরসদের মতো এই মাছের বংশ পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কারণ এর যেসব জীবাশ্ম পাওয়া গেছে তা

* বৈকবঘাটা, কলিকাতা-700084

প্রায় সবই ওই 40 কোটি থেকে 7 কোটি বছর আগেকার। সুতরাং জীববিজ্ঞানীদের এই ধারণাই জন্মেছিল যে সিলাকান্থরা আজ থেকে 7 কোটি বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এখানে একটা কথা বলি, আজ থেকে 40 কোটি বছর আগে পৃথিবীর ডাঙ্গায় কিন্তু ছিল না কোন পাখী, তখন সবে সমুদ্রের জলে মাছের জন্ম হয়েছে। এর 5 কোটি বছর পর আসে উভচর। এরও 7 কোটি বছর পর সরীসৃপদের জন্ম হয়। আজ থেকে 20 কোটি বছর আগে অর্থাৎ সরীসৃপ আবির্ভাবের 8 কোটি বছর পর আসে স্তন্যপায়ী প্রাণীরা এবং সরীসৃপদের থেকে পাখীদের জন্ম হয় 14 কোটি বছর আগে।

1938 খৃস্টাব্দে ঘটলো একটা ছোট্ট ঘটনা। দক্ষিণ আফ্রিকার সমুদ্রে-মাছ-ধরা জেলেদের আনা দু-মিটার লম্বা ও 85 কেজি ওজনের এক বিকট আকৃতির মাছ দৃষ্টি আকর্ষণ করলো স্থানীয় মিউজিয়ামকর্মী শ্রীমতি ল্যাটিমারের। তিনি তৎক্ষণাৎ মাছটির বিস্তারিত বিবরণ লিখে পাঠালেন আফ্রিকান মৎস্য বিশেষজ্ঞ জে. বি. এল. স্মিথকে। স্মিথ মাছটিকে 7 কোটি বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া সিলাকান্থ মাছ বলে সনাক্ত করতে সমর্থ হন। ব্যাস্, বিজ্ঞান মহলে হৈ চৈ পড়ে যায় এতোকালের 'মৃত' মাছটির প্রাপ্তি সংবাদ পেয়ে। তারপর দীর্ঘ 14 বছর পর 1952 খৃস্টাব্দে দ্বিতীয় সিলাকান্থটি ধরা পড়ে এবং তারপর আরও 69টির সন্ধান পাওয়া যায় আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্ব গভীর উপকূলে।

এই কটি মাছের উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে এরা সাধারণতঃ 5 থেকে 7 ফুট পর্যন্ত লম্বায় এবং 60 থেকে 70 কেজির মতো ওজনে হয়। গায়ের রং গাঢ় নীল বা কালচে নীল। সমুদ্রের 300 থেকে 500 ফুট গভীরে এদের বাস এবং জল উপরিভাগে বা জল থেকে তুলে আনলেই এরা মারা পড়ে। সিলাকান্থের দেহ খুবই তৈলাক্ত এবং বড় বড় আঁশে ঢাকা। আর এদের শক্ত গড়নের দেহের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ হলো এদের পাখ্না। এই পাখ্নাগুলো অন্যান্য প্রাণীর হাত-পায়ের মতো হাড়যুক্ত খানিকটা মাংসল অংশের সঙ্গে যুক্ত আর লেজের পাখ্নার ঠিক মাঝখানে এদের মেরুদণ্ড কিছুটা বৃদ্ধিলাভ করেছে। আরেকটি ব্যাপার হলো, এদের দেহের কঠিন অংশ হাড়ে পরিণত হলেও এদের এই মেরুদণ্ডটি কিন্তু ফাঁপা তরুণাস্থি (cartilage) অবস্থায় রয়ে গেছে। মাছ হয়েও এরা নাকি ডিম পাড়ে না; সরাসরি বাচ্চা প্রসব করে। কী অদ্ভুত ব্যাপার তাই না।

বায়ু-দূষণের প্রভাব

অর্ণবকুমার দে*

যে সকল পদার্থ বায়ু-দূষণের জন্য দায়ী তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—নানাবিধ গ্যাসীয় পদার্থ, ধোঁয়া (smoke) ও ভাসমান ধূলিকণা (particulate aerosols)। বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত এইসকল পদার্থ সহজেই মানুষ ও তার পরিবেশকে ক্ষতি করে থাকে। প্রধান দূষণকারী গ্যাসীয় পদার্থগুলি হল কার্বনমনোক্সাইড (carbon monoxide), সালফারের অক্সাইড (oxides of sulphur), নাইট্রোজেনের অক্সাইড (oxides of nitrogen), হাইড্রোকার্বন ইত্যাদি। অপর একটি অত্যন্ত বিষাক্ত পদার্থ বাতাসে মিশে থাকে যেটি গ্যাসীয় নয়—ধাতব পদার্থ—নাম সীসা (lead)।

কলকারখানায় কাজে যে জ্বালানী পোড়ানো হয় তা থেকেই প্রধানত এই সব বিষাক্ত গ্যাসীয় পদার্থেও সৃষ্টি। বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানা, রাসায়নিক শিল্প, ধাতুনিষ্কাশন শিল্প এবং পেট্রোলিয়াম কারখানা থেকে প্রচুর পরিমাণ দূষিত পদার্থ বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। এছাড়া গৃহস্থের রান্নার কাজে ব্যবহৃত কয়লার উনুনের ধোঁয়া এবং যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া বায়ু-দূষণের উল্লেখযোগ্য কারণ।

এখন কয়েকটি প্রধান বায়ু-দূষণকারী গ্যাসীয় পদার্থের উৎস এবং পরিবেশ ও মানুষের উপর তার প্রভাব আলোচনা করা যাক।

কার্বন মনোক্সাইড—কার্বনের অসম্পূর্ণ দহনের ফলে কার্বন মনোক্সাইড উৎপন্ন হয় $C+\frac{1}{2}O_2 \rightarrow CO$। যানবাহনের ইঞ্জিন থেকে নির্গত ধোঁয়া এই গ্যাসের একটি প্রধান উৎস। বড় বড় শহরে অফিসের সময়ে বাতাসে সর্বোচ্চ পরিমাণ কার্বন মনোক্সাইড উৎপন্ন হয়। এই গ্যাসের সহ্যসীমা (tolerance limit) প্রতি দশ লক্ষ ভাগে 9 ভাগ (9 parts per million)। কিন্তু বড় বড় শহরে এর মাত্রা থাকে প্রতি দশ লক্ষ 50-100 অর্থাৎ সহ্যসীমার 5/10 গুণ বেশী। কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস এই মাত্রায় গ্রহণ করলে ক্ষতি কি ?

কার্বন মনোক্সাইড মানবদেহের রক্তের হিমোগ্লোবিনে যে অক্সিজেন থাকে তাকে প্রতিস্থাপিত করে অপর একটি জৈব রাসায়নিক পদার্থের সৃষ্টি করে—

$CO + HbO_2 \rightleftharpoons HbCO + O_2$ (Hb দ্বারা হিমোগ্লোবিন বোঝানো হয়েছে)

* রসায়ন বিভাগ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

এর ফলে রক্তের অক্সিজেন বহন ক্ষমতা হ্রাস পায়। কার্বন-মনোক্সাইডের একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষতিকর প্রভাব হল চেতনা হ্রাস পাওয়া—এটি যানবাহন দুর্ঘটনার একটি অন্যতম কারণ। আরো অধিক মাত্রায় এই গ্যাস গ্রহণ করলে মাযুতন্ত্র, হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাতাসে এই গ্যাসের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে যদি প্রতি দশ লক্ষ ভাগে 750 হয় তাহলে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মানুষের মৃত্যু ঘটবে।

কার্বনমনোক্সাইড দূষণ প্রতিরোধের জন্য যানবাহনের জ্বালানীর সঙ্গে অতিরিক্ত বাতাস মেশালে এই গ্যাস উৎপন্ন হতে পারবে না এবং বায়ুমণ্ডলকে দূষিত করতেও পারবে না। এই গ্যাস দ্বারা আক্রান্ত হবার পর বেশী মাত্রায় অক্সিজেন গ্যাস গ্রহণ করলে কার্বক্সিহিমোগ্লোবিন যৌগের (HbCO) কার্বন মনোক্সাইড প্রতিস্থাপিত হয়।

সালফার ডাইঅক্সাইড—ধাতুনিষ্কাশন কারখানা যেখানে সালফাইড আকরিক (sulphide ore) থেকে ধাতু উৎপন্ন করা হয় তা সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাসের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এছাড়া পেট্রোলিয়াম শিল্পে, বিদ্যুৎ উৎপাদন শিল্পে, সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদন কারখানা এবং সার কারখানা থেকে এই গ্যাস যথেষ্ট পরিমাণে বাতাসে মিশে থাকে।

সালফার ডাইঅক্সাইড শ্বাসকার্যে ব্যাঘাত ঘটায়। এই গ্যাসের সহ্যসীমা প্রতি দশ লাখে 00·3। প্রতি দশ লাখে 500—এই মাত্রার এই গ্যাস গ্রহণের ফলে মানুষের মৃত্যু ঘটে। সালফার ডাইঅক্সাইড দূষণ অতীতের কয়েকটি মহামারীর জন্য দায়ী। 1930 খৃস্টাব্দে বেলজিয়ামের মিউস নদীর উপত্যকায় একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানা থেকে দূষিত আবর্জনা ফেলার ফলে বাতাসে এই গ্যাসের মাত্রা হয় প্রতি দশ লাখে 38। এই গ্যাস গ্রহণ করায় বহু স্থানীয় অধিবাসী ও তাদের গবাদিপশু প্রাণ হারায়। 1952 খৃস্টাব্দে এই গ্যাসের দূষণে লণ্ডনে চার হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটে। এটি London fog নামে পরিচিত।

নাইট্রোজেন অক্সাইড—বায়ুমণ্ডলে নাইট্রাস অক্সাইড, নাইট্রিক অক্সাইড এবং নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড—এই তিনটি নাইট্রোজেনের অক্সাইড থাকে। এর মধ্যে নাইট্রিক অক্সাইড এবং নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড গ্যাসগুলি ক্ষতিকারক। প্রাকৃতিক ক্রিয়া যেমন বজ্রবিদ্যুৎ এবং জৈব-প্রক্রিয়ার ফলে এই গ্যাসগুলি বায়ুমণ্ডলে উৎপন্ন হয়। এছাড়া জ্বালানীর দহন, বিস্ফোরক পদার্থের কারখানা, যানবাহনের ধোঁয়া এই সকল গ্যাসের উৎস।

নাইট্রিক অক্সাইড কার্বন মনোক্সাইডের মত রক্তের হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অক্সিজেন সঞ্চালন ক্ষমতা হ্রাস করে। নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড গ্যাস গ্রহণের ফলে ফুসফুসের কলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রতি দশ লাখে 500 মাত্রায় এই গ্যাস শরীরে প্রবেশ করলে 2-10 দিনের মধ্যে মৃত্যু ঘটে। জ্বালানীর দহনের সময়ে সীমিত পরিমাণে অক্সিজেন ব্যবহার করলে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড সৃষ্টি না হয়ে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকারক নাইট্রিক অক্সাইড সৃষ্টি হয় ($N_2O_2 \rightarrow 2NO$)। এইভাবে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড দূষণ প্রতিরোধ করা যেতে পারে।

অ্যাসিড বর্ষণ (acid rain)—নাইট্রোজেন ও সালফারের অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে যথাক্রমে নাইট্রিক ও সালফিউরিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। এইসব অ্যাসিড কলকারখানা থেকে নির্গত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বৃষ্টির সঙ্গে মাটিতে ঝরে পড়ে। এই অ্যাসিড বর্ষণ পরিবেশ দূষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।

ভাস্কর্য ও স্থাপত্যশিল্প আজ বায়ুদূষণের হাত থেকে রেহাই পায় নি। মহানগরী ও শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত পাথর বা শ্বেত-পাথরের স্থাপত্য এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যেমন শ্বেতপাথরের স্থাপত্য সুবিখ্যাত আগ্রার তাজমহল বাতাসের সালফার ডাই-অক্সাইডের প্রভাবে বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা, শ্বেতপাথর ($CaCO_3$) নিম্নলিখিত রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে প্লাস্টারে পরিণত হয়ঃ

$$SO_2 \rightarrow SO_3 \rightarrow H_2SO_4 \xrightarrow{CaCO_3} CaSO_4.$$
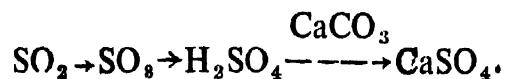
অ্যাসিড বর্ষণের ফলে পাথরের মূর্তিরও ক্ষতি হয়ে থাকে।

ভারতের সমস্ত মহানগরী আজ বায়ু-দূষণের প্রভাবে আক্রান্ত। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যানবাহন থেকে নির্গত দূষিত পদার্থের পরিমাণ সব থেকে বেশী দিল্লীতে (34%), এরপর বোম্বাই (23%) ও কলকাতার (20%) স্থান।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় বায়ু-দূষণ পরিবেশ ও মানুষের উপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। উন্নত দেশগুলি দূষণ প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থাদি নিয়েছে। কলকারখানা ও যানবাহন থেকে নির্গত বিষাক্ত গ্যাস ও ধোঁয়া যাতে পরিবেশে না মিশতে পারে তার জন্য উপযুক্ত পরিশোধন ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। আমাদের দেশে এইরকম প্রতিরোধমূলক কোন ব্যবস্থা এখনো প্রচলিত হয় নি যদিও এদেশের সমস্ত মহানগরী ও শিল্পাঞ্চল সমূহের পরিবেশ আজ মারাত্মক ভাবে দূষিত। তাই সরকার ও জনসাধারণ উভয়কেই এই পরিবেশ প্রতিকারে অবিলম্বে তৎপর হওয়া উচিত নয় কি?

ফ্লজিস্টনবাদ ও লাভোয়াসিয়ে

রতনমোহন খাঁ*

প্রায় দু-শো বছর আগের কথা। 1783 খৃস্টাব্দের 25শে জুন প্যারিসের অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সে জমা পড়ল একটি গবেষণাপত্র ও যে পত্র রাসায়নিক জগতে এনেছিল বৈপ্লবিক পরিবর্তন, মুক্ত করেছিল রসায়নকে—দহন ও দহনজনিত অক্সিজেনের উপর বহু শতাব্দীর নানা দ্বন্দ্ব, দ্বিধা ও ভ্রান্ত ধারণার শৃঙ্খল থেকে। সে আনন্দের আতিশয্যে এক মহিলা তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে প্রকাশ্য রাজপথে পুড়িয়েছিল স্টালপন্থীদের শত শত পুঁথি জঞ্জালের স্তূপ হিসাবে। এই বিজ্ঞানী হলেন অ্যান্টয়েন লোঁরা লাভোয়াসিয়ে আর ঐ মহিলা মাদাম লাভোয়াসিয়ে। 1743 খৃস্টাব্দের 26শে অগাস্ট পৃথিবীর স্বপ্ন নগরী প্যারিসে লাভোয়াসিয়েরের জন্ম হয়। ইতিমধ্যে নিউটন প্রমুখ বহু গণিতবিদ ও পদার্থবিদের গবেষণালব্ধ তথ্য ও তত্ত্বে গণিত ও পদার্থবিদ্যার বুনিয়াদ দৃঢ় হলেও রসায়ন কিন্তু তখনও নানা ভ্রান্ত ধারণার ও অলীক কল্পনায় রিক্ত।

ইউরোপে গ্রীক ও আরবীয়রাই বিজ্ঞানের বীজ বপন করেছিলেন বলে ধরা হয়। ঐ যুগে ভারতীয় আচার্যগণ বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে যে বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শনের সৃষ্টি করেছিলেন, উত্তরকালে উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিচর্যার অভাবে সবই লুপ্ত হয়ে যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে ও প্রথম দিকে রসায়নের উপর চিন্তা-ভাবনা মূলতঃ দুটি দিকে নিবদ্ধ ছিল—একটি রোগ প্রশমনের জন্য গাছ-গাছড়া থেকে ওষুধ তৈরিতে আর অপরটি নিকৃষ্ট ধাতুকে কৃত্রিম উপায়ে সোনায় রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টাতে (কিমিয়া)। প্যারা সেলসাস (1493-1541 খৃঃ) রসায়নকে কিমিয়ার প্রভাব থেকে মুক্ত করে চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত করতে প্রয়াসী হন। ভ্যান হেলমণ্ট (1577–1644 খৃঃ) প্যারা সেলসাসের পথ অনুসরণ করলেও বিভিন্ন গ্যাসের অস্তিত্ব ও ভরের নিত্যতা প্রমাণের মধ্য দিয়ে রসায়নকে স্বকীয়তার প্রতিষ্ঠিত করার কৃতিত্ব তাঁরই। ভ্যান হেলমণ্টই গ্যাস শব্দের প্রবর্তক। হেলমণ্টের গবেষণার বৈশিষ্ট্য হলো—গুণগত বা বস্তুগত পথ কিছুটা পরিহার করে পরিমাণাত্মক পথ গ্রহণ। প্রাচীন রসায়নে তুলাদণ্ডের প্রচলন ছিল না অর্থাৎ যৌগ উৎপাদনে একটি উপাদানের কত অংশ অপর একটি উপাদানের কত অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কি পরিমাণ যৌগ উৎপন্ন হয় তা নির্ণয় করা হত না। বস্তুর বিনাশ নেই—এই মহাসত্য ভারতীয় ঋষিরা দর্শন হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, পরীক্ষামূলক সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন নি। ভারতীয় দর্শনে বিশ্বের যাবতীয় বস্তু পঞ্চভূতের (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) দ্বারা গঠিত এবং বিনাশে ঐ পঞ্চভূতেই অবলুপ্ত। পাশ্চাত্য দর্শনেও বস্তুর অবিনশ্বরতা স্বীকৃত। তবে পঞ্চভূতের পরিবর্তে চতুর্ভূত (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ) সবকিছুর আদি ও অন্ত। ভারতে বৈশেষিক দর্শনকার কণাদ ও গ্রীসে ডিমএনইটাস, এপিকিউরাস প্রমুখ একদল দার্শনিক প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে বস্তুর গঠন, পদার্থের উপাদান প্রভৃতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছিলেন। দর্শনের বিজ্ঞানাবাদে এটি পরমাণুবাদ নামে অভিহিত। যুক্তি পরম্পরায় এসব বাদ দর্শনেই উৎকর্ষতা লাভ করলেও পরীক্ষার কষ্টিপাথরে যাচাই করে সত্যাসত্য নির্ধারণের প্রচেষ্টা শুরু হয়। হেলমণ্টের সময় থেকেই এবং পূর্ণতা আসে লাভোয়াসিয়ের বহু বছরের পরিশ্রম ও সাধনার মধ্য দিয়ে। আধুনিক রসায়নের পথনির্দেশক হয়েও হেলমণ্ট কিন্তু কিমিয়ায় বিশ্বাস করতে পারেন নি।

হেলমণ্টের ধারণা ছিল—অগ্নি হল জ্বলন্ত ধোঁয়া যা বাতাসের সাহায্যে যান্ত্রিক ক্রিয়া ঘটায়। জিনয়ে ও সমসাময়িক বিজ্ঞানীরাও ঐ মতই পোষণ করতেন। অবশ্য অনেকে বিশ্বাস করতেন যে বাতাসে আছে জীবনীশক্তি। বাতাস জীবন ও আগুনের জন্য অপরিহার্য। রবার্ট বয়েল কেবলমাত্র অন্ধ-বিশ্বাসের জন্য দহনের প্রকৃত ব্যাখ্যা দিতে অসমর্থ হন। রসায়নবিদগণ যখন পূর্বসুরীদের দেয় বিশ্বাস ও পরীক্ষালব্ধ ফলের সঙ্গে সামঞ্জস্যের অভাবের সংঘাতে অস্থির তখন জার্মান রসায়নী জর্জ আর্নস্ট স্টাল 1703 খৃস্টাব্দে পরমাণুবাদ এবং চতুর্ভূতবাদ বা পঞ্চভূতাবাদের বদলে এক তৃতীয় বাদ প্রচার করেন। এর নাম ফ্লজিস্টনবাদ। দাহ্যবস্তু যখন জ্বলে তখন কি রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে—এটি ছিল ঐ সময় বিরাট বিতর্কিত প্রশ্ন। কাঠ, কয়লা, গন্ধক আগুনে জ্বলে কেন? বিভিন্ন ধাতু তাপে ভস্মে পরিণত হয় কেন? এ সবের সমাধানে স্টালের মত হল দাহ্যবস্তুর মধ্যে এমন একটি পদার্থ আছে, যা দহন কালে বস্তু থেকে পৃথক হয়ে উড়ে যায়। এই পদার্থের তিনি নাম দেন ফ্লজিস্টন। দহন-ক্রিয়া হল—দাহ্য বস্তু থেকে ফ্লজিস্টন পৃথক করা। ধাতুভস্ম ফ্লজিস্টন ছাড়া ধাতু মাত্র। কয়লাসহযোগে ধাতুভস্ম উত্তপ্ত করলে, মূল ধাতু ফিরে আসে। এর কারণ—কয়লার সাহায্যে ফ্লজিস্টন পুনরায় সংযোজিত হয়। স্টালের এই অনুমান অনেকের কাছেই গ্রহণীয় হল। অনুমানের সত্যাসত্য নির্ভর করে পরীক্ষালব্ধ তথ্যের উপর। দহনের সময় যদি ফ্লজিস্টন বস্তু থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে দহনের ফলে বস্তুর ওজন কমবে। কাঠ পুড়লে যে ছাই পড়ে থাকে তার ওজন অবশ্য কম। কিন্তু স্টালের অনুমান প্রচারিত হবার আগেই রবার্ট বয়েল দেখিয়েছিলেন অ্যালুমিনিয়াম (রাং) ভস্ম মূল ধাতু থেকে ওজনে বেশি। জন মেয়োর পরীক্ষায় অ্যান্টিমনি ভস্মও ওজনে বেশি দেখা গেল। এসব অস্বাভাবিক ঘটনায় ব্যাখ্যায় স্টালপন্থীরা আর এক অদ্ভুত

* 10, প্যাগিক স্ট্রীট, ব্লক—6, ফ্ল্যাট—7, কলিকাতা-70003

কল্পনা করলেন—ফ্লজিস্টনের ওজন ঋণাত্মক, এটি পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হয় না, বিপরীত দিকে ধাবিত হয়। তাই এর সংযোগ বস্তুর ওজন কমে ও বিয়োগে ওজন বাড়ে। বিভিন্ন গ্যাস সম্বন্ধে জ্ঞানের স্বল্পতা, কারিগরি কৌশলের অপ্রতুলতা, পরিমাণাত্মক পদ্ধতি প্রয়োগে নিঃস্পৃহা রসায়নবিদদের ভুলপথে চালিত করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে স্কটল্যাণ্ডের যোসেফ ব্লাক (1728-1799 খৃঃ), সুইডেনের কার্ল উইলহেলম শীলে (1742-1786 খৃঃ), ইংল্যাণ্ডের হেনরী ক্যাভাণ্ডিস (1731-1810 খৃঃ) ও যোসেফ প্রিস্টলে (1733-1804 খৃঃ) এবং ফ্রান্সের লাভোয়াসিয়ে (1743-1794 খৃঃ) প্রমুখ রসায়নবিদদের বিভিন্ন গ্যাসের উপর নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রকৃত সত্যের সন্ধান মেলে। আশ্চর্যের বিষয় লাভোয়াসিয়ে ছাড়া ঐ সময় কেউই ফ্লজিস্টনের প্রভাব মুক্ত হতে পারেন নি।

লাভোয়াসিয়ে ফ্লজিস্টনবাদ সম্পূর্ণ ভুয়ো উপলব্ধি করলেও সঠিক যুক্তি খাড়া করতে পারছিলেন না। ধাতুভস্মের ওজন বেশি, কিন্তু কারণ কি? এর মধ্যেই নিহিত আছে প্রকৃত সমাধান। ইতিমধ্যে দুটি ঘটনায় লাভোয়াসিয়ের সামনে যুক্তির দ্বার খুলে গেল। যোসেফ প্রিস্টলে আতসী কাচের সাহায্যে লোহিত পারদভস্ম গরম করতে করতে একটি নূতন গ্যাসের সন্ধান পেলেন। তিনি এর নাম দেন—ফ্লজিস্টনহীন বায়ু। ফ্লজিস্টনবাদে অন্ধবিশ্বাস না থাকায় লাভোয়াসিয়ের চিন্তায় ধরা পড়ল—মোমবাতি যখন এই গ্যাসে ভালো জ্বলে আবার বাতাসেও জ্বলে তাহলে নিশ্চয়ই প্রিস্টলের আবিষ্কৃত গ্যাস বাতাসে মিশে আছে। বাতাস থেকে এই গ্যাস আহরণ করার জন্য নির্দিষ্ট ওজনের পারদ বকযন্ত্রে নিয়ে বকযন্ত্রের মুখ পারদপাত্রে কিছুটা ডোবান বায়ুপূর্ণ ঘণ্টাকৃতি কাচপাত্রে ঢুকিয়ে দিলেন। তারপর বারোদিন ধরে বকযন্ত্রের পারদ আগুনে গরম করায় দেখা গেল ঘণ্টাকৃতি পাত্রে বায়ুর একের ছয় অংশ কমে গেছে, বকযন্ত্রে পারদের উপর লাল পারদভস্ম তৈরি হয়েছে এবং কাচপাত্রের অবশিষ্ট বায়ুতে মোমবাতি জ্বলছে না। এরপর লাল পারদভস্ম আরো গরম করে পাওয়া গেল প্রিস্টলের গ্যাস। যে গ্যাস আবিষ্কার করে শুঁকবার পর প্রিস্টলে বেশ স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেছিলেন এবং বলেছিলেন একদিন এই গ্যাস অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে, লাভোয়াসিয়ে প্রমাণ করলেন ঐ গ্যাস বাতাসেই আছে। তিনিই এর নাম দেন অক্সিজেন। তবুও ফ্লজিস্টনবাদ বাতিল হল না। জিঙ্ক, তামা প্রভৃতি ধাতু জলীয় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বা সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে ক্রিয়া করে লঘু হাইড্রোজেন গ্যাস ও লবণ তৈরি করে। ফ্লজিস্টনবাদীরা মরিয়া হয়ে প্রচার করতে লাগল—ঐ লঘু হাইড্রোজেনই ফ্লজিস্টন। লাভোয়াসিয়ে চিন্তা করতে লাগলো—হাইড্রোজেন গ্যাস যতই লঘু হোক ওর ওজন আছে। ঐ গ্যাস ধাতু থেকে বেরিয়ে গেলে ধাতুভস্মের ওজন অবশ্যই কমবে, কিন্তু বাড়ে কেন? যখন সব কিছুর ঠিক ঠিক মীমাংসা হচ্ছে না সেই সময় হেনরী ক্যাভাণ্ডিস, যিনি ছিলেন নির্জনতাপ্রিয়, সংসার বিরাগী, সামান্য বিকৃত মস্তিষ্ক অথচ বিজ্ঞান প্রেমিক ও গবেষক, প্রমাণ করলেন যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিলনে জল উৎপন্ন হয়। শুধু তাই না—একভাগ অক্সিজেন ও দু-ভাগ হাইড্রোজেন মিশিয়ে বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গে গরম করলেই পুরো গ্যাস জলে পরিণত হয়। পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করে লাভোয়াসিয়ে শুধু ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলেন না জলীয় বাষ্পকে পোর্সিলেনের নলে গরম লোহার উপর চালনা করে হাইড্রোজেন গ্যাস ও ফেরিক অক্সাইড পেলেন। লাভোয়াসিয়ের ছিল অসামান্য অন্তর্দৃষ্টি। এতদিন পর্যন্ত জলীয় অ্যাসিড ও ধাতুর মিশ্রণে হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয় কেন—এর কারণ ব্যাখ্যা করতে পারছিলেন না। ক্যাভাণ্ডিসের পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে সব কিছুর সমাধান হল। জলীয় অ্যাসিডে জল প্রথমে বিযুক্ত হয়ে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে ভেঙে যায়। ঐ অক্সিজেন ধাতুর সঙ্গে ধাতুভস্ম অর্থাৎ অক্সাইড তৈরি করে। তারপর ঐ অক্সাইড অ্যাসিডের সঙ্গে ক্রিয়া করে লবণে পরিণত হয়। 1783 খৃস্টাব্দের 24শে জুন লাভোয়শিয়ে এই সিদ্ধান্তে আসেন। সব কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে 25শে জুন প্যারিসের অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সে গবেষণা পত্রের মাধ্যমে ঘোষণা করেন—জলীয় অ্যাসিডের সঙ্গে ধাতুর সংযোগে কোন ফ্লজিস্টনের উদ্ভব হয় না, হাইড্রোজেন গ্যাস ও লবণ উৎপন্ন হয়। ফ্লজিস্টনবাদ উচ্ছেদে রবার্ট বয়েল, হুক, মেয়ো, ব্লাক, প্রিস্টলে, সীলে, বার্গমান, ক্যাভাণ্ডিস, রদারফোর্ড প্রমুখ মনীষীদের উৎসর্গীকৃত জীবনের ত্যাগ ও কর্মই লাভোয়েসিয়ের গৌরবময় কৃতকার্যতার পটভূমি। লাভোয়াসিয়ের পর্যালোচনা ও গবেষণার উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত হল—প্রতিটি দহন অক্সিজেনের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। আগুন হল অক্সিজেনে অর্থাৎ দহনে বাতাসের অক্সিজেন ও ধাতুর মিশ্রণের জন্য তাপ ও আলোরূপে শক্তির স্ফুরণ। কাঠ বা কয়লা দহনকালে কার্বন বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে ক্রিয়া করে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয় ও বাতাসে মিশে যায় আর পড়ে থাকে ছাই। ধাতুর দহনকালে বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে ক্রিয়ায় অক্সাইডে পরিণত হয় এবং কোন কিছুই বাতাসে মিশে না। ধাতুভস্মকে কয়লার সঙ্গে গরম করলে অক্সাইডের অক্সিজেন কার্বনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কার্বনডাইঅক্সাইড হয় আর মূল ধাতু ফিরে আসে। এসব রাসায়নিক ক্রিয়ার প্রচারের উদ্দেশ্যে এবং ফ্লজিস্টনবাদের চির-উচ্ছেদকল্পে লাভোয়াসিয়ে ফরাসী বিপ্লববর্ষে (1789 খৃঃ) Traite Elementaire de Chinie নামে বিখ্যাত পুস্তকটি প্রকাশ করেন। পুস্তকটি নিউটনের Principia-এর সঙ্গে তুলনীয়। রসায়ন ছাড়াও বিজ্ঞানের অনেক ক্ষেত্রেই তিনি অবদান রেখে গেছেন। লাপ্লাসের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল গণিত ও পদার্থবিদ্যায় তাত্ত্বিক আলোচনায়। তাপীয় রসায়নেও প্রাণীর শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়ার উপর তাঁর কাজের

সাক্ষ্য পাওয়া যায়। মেট্রিক পদ্ধতি তাঁরই চিন্তা-ভাবনার ফলশ্রুতি। মৃত্যুর আগে প্রাণীর ঘাম নিয়ে তিনি পরীক্ষায় রত ছিলেন।

লাভোয়াসিয়েরের জীবন যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিণতি তেমনি বিষাদময়। বাল্যকালে নামকরা অধ্যাপকদের কাছে গণিত, উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়ন শিক্ষা করেন। বিখ্যাত ফরাসী অধ্যাপক রাউল ছিলেন তাঁর রসায়নের শিক্ষক। রসায়নের প্রতি অনুরাগ ঐ সময়ই তাঁর অন্তরে সঞ্চারিত হয়। পিতার ইচ্ছানুসারে আইন পরীক্ষায় ভালভাবে উত্তীর্ণ হয়েও বিজ্ঞান-চর্চাকেই জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন। বাইশ বছর বয়সে তাঁর প্রথম বিজ্ঞান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পরবৎসর প্যারিসের অ্যাকাডেমী অব সায়েন্সের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় "বৃহৎ নগর আলোকিত করবার উপায়" শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা করে স্বর্ণ পদক পান ও পরিষদের সভ্য নির্বাচিত হন। তাঁর অসামান্য প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে পরিষদের কর্তৃপক্ষ তাঁকে পরিষদের বিভিন্ন বিবরণী রচনা ও প্রকাশনার দায়িত্ব দেন। 1785 খৃস্টাব্দে তিনি এই অ্যাকাডেমির অধিকর্তা ও 1791 খৃস্টাব্দে কোষাধ্যক্ষ হন। পরিষদ ছিল তাঁর জীবন অপেক্ষা প্রিয়। ফরাসী বিপ্লবের সময় যখন সব বিদ্বৎসমাজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছিল তখন তিনি নিজস্ব অর্থে বিজ্ঞানীদের সাহায্য করে পরিষদকে পিতার ন্যায় রক্ষা করার চেষ্টা করছিলেন। অবশ্য রাজাজ্ঞায় এই অ্যাকাডেমিরও অস্তিত্ব লোপ পায়।

লাভোয়াসিয়ে শুধু বিজ্ঞানী ছিলেন না, দেশের নানা সেবামূলক ও গঠনমূলক কাজের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। বেশ কিছু কাল তিনি J. E. Guettard (1715-1786 খৃঃ)-এর সঙ্গে ভূসমীক্ষায় অতিবাহিত করেন ও ফ্রান্সের খনিজ সম্পদের মানচিত্র তৈরিতে বিশেষ সাহায্য করেন। 1768 খৃস্টাব্দে রাজস্ববিভাগের সভ্য হন। 1775 খৃস্টাব্দে সরকারী বারুদ কারখানার অধ্যক্ষ হন এবং বারুদ ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালীর উন্নতিসাধন করেন। 1778 খৃস্টাব্দে তিনি ফারমিয়ে জেনারাল হন। সাধারণ মানুষের কাছে ফারমিয়ে জেনারালরা ছিল সব থেকে ঘৃণার পাত্র। ঐ সময় যাঁরা ফরাসী-দেশে রাজস্ব ও বাণিজ্য শুল্ক সংগ্রহ করত তাঁদের ফারমিয়ে জেনারাল বলা হত। ছ-বছরের রাজস্ব ও বাণিজ্য শুল্ক সরকারী তহবিলে আগাম জমা দিয়ে ফারমিয়ে জেনারালরা খানিকটা করে তালুক ইজারা নিতেন। দরিদ্র প্রজাদের উপর জুলুম, অত্যাচার, উৎপীড়ন ছিল ফারমিয়েদের নিত্য সহচর। রাজদরবারে এদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের বিচার হত না। লাভোয়াসিয়ে অবশ্য অর্থের জন্য ফারমিয়ে হন নি। অত্যাচারী ফারমিয়েদের থেকে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ পৃথক। নিজের জমিদারীতে সুশৃঙ্খল পরিবেশে তিনি প্রজাদের সুবিচারের বন্দোবস্ত করেন, বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষের প্রবর্তন করেন এবং অন্য দেশ থেকে ভাল জাতের পশু এনে মেষ প্রভৃতি পশুর উৎকর্ষ সাধন করেন। এসব সত্ত্বেও তিনি প্রজাদের ঘৃণার দৃষ্টি থেকে অব্যাহতি পান নি। 1787 খৃস্টাব্দে প্রাদেশিক সভার সভ্য নির্বাচিত হয়ে জনসাধারণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতিকল্পে স্বল্প-সঞ্চয় ব্যাঙ্ক, বীমা, শস্যাগার, পয়ঃপ্রণালী, জনস্বাস্থ্য, জনশিক্ষা, মুদ্রা প্রভৃতির প্রচলন করেন। পরিমাপ সংস্থার সম্পাদক হিসাবে 1790 খৃস্টাব্দে তিনি সারা দেশে ওজন ও অন্যান্য মাপে সমতা আনেন। এই চিন্তা-ভাবনার উপর ভিত্তি করেই মেট্রিক পদ্ধতির উদ্ভব হয়।

1794 খৃস্টাব্দের মে মাসে লাভোয়াসিয়ে আরো সাতাশ জন ফারমিয়ে জেনারালদের সঙ্গে রাজদ্বারে অভিযুক্ত হলেন রাজস্ব আত্মসাৎ করার অভিযোগে। ঘোর ফরাসী বিপ্লবে উন্মত্ত মানুষ ভুলে গেল তাঁর নানা দেশহিতকর কাজের কথা, তাঁর অসামান্য বৈজ্ঞানিক অবদানের কথা, তাঁর পবিত্র চরিত্র ও সদগুণের কথা। তাঁর প্রাণদণ্ড রহিত করার জন্য বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির আবেদন উপেক্ষিত হলেন। লাভোয়াসিয়ে নিজে গবেষণার একটি কাজ শেষ করার জন্য বিচারকের কাছে মাত্র কয়েক দিন সময় ভিক্ষা চান। বিচারক কিন্তু রায় দেন—ফরাসী সাধারণতন্ত্রে বিজ্ঞানীদের প্রয়োজন নেই, ন্যায় বিচারই যথেষ্ট। তাড়াহুড়ো করে জুরিদের মন্তব্য লিপিবদ্ধ না করেই বিচারক আশিজনের একই দিনে পরপর মস্তক ছেদনের আদেশ দেন। ভবিতব্যের বিড়ম্বনায় এই বিচারক কফিসালও কয়েক মাসে জুরির মন্তব্য ছাড়াই প্রাণদণ্ড দণ্ডিত হন। 8ই মে লাভোয়াসিয়ের সামনেই তাঁর শ্বশুরের মাথা কেটে ফেলা হল। এরপরই তাঁর পালা। তবুও তিনি স্থির, ধীর, ও গম্ভীর। বধ্যভূমিতে ঘাতকের অসির সামনে এ দৃশ্য অকল্পনীয়। ঘাতকের শাণিত অসিতে দ্বিখণ্ডিত হল লাভোয়াসিয়ের দেহ। হাজার হাজার জনতা নীরব নিস্তব্ধ। শোকে, দুঃখে, ক্ষোভে একজন দর্শক সেদিন বলেছিলেন—এরূপ একটি মাথা কেটে ফেলতে মুহূর্তও লাগে না, কিন্তু এরূপ একটি মাথা একশো বছরেও জন্মাবে কি ?

খাদ্যের ক্যালরি মূল্য

নিমাই দে*

জীবমাত্রেরই দেহের গঠন ও বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কার্যের জন্য শক্তির প্রয়োজন। দেহের মধ্যে উৎপন্ন অথবা বাইরে থেকে সংগৃহীত খাদ্যই জীবদেহের যাবতীয় প্রাণকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির উৎস। খাদ্যের মধ্যে সঞ্চিত স্থৈতিক শক্তির রূপান্তরের ফলে গতিশক্তি উৎপন্ন হয়। এই গতিশক্তির সাহায্যেই প্রাণীদেহে বিভিন্ন জৈব ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

আমাদের শারীরবৃত্তীয় কার্যের জন্য যে শক্তি ব্যয়িত হয় তাকে প্রধানতঃ দু-ভাগে ভাগ করা যায়—তাপশক্তি ও যান্ত্রিক শক্তি। তাপশক্তি শরীরের জৈবক্রিয়া ও স্বাভাবিক উষ্ণতার সঙ্গে সম্পর্কিত। আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনার জন্য যান্ত্রিক শক্তির প্রয়োজন। এককথায় বলা যায়, তাপ ও যান্ত্রিক শক্তির সমন্বয়ে উৎপন্ন শক্তিই শারীরবৃত্তীয় কার্যসমেত সব রকম কার্য সম্পাদনে সাহায্য করে। পদার্থবিদ্যায় তাপের পরিমাণকে যেমন ক্যালরিতে প্রকাশ করা হয়, জীবদেহে ঐ শক্তির পরিমাণ বুঝাতেও তেমনই ক্যালরি ব্যবহার করা যায়।

আমরা জানি, জীবদেহ অসংখ্য কোষের সমষ্টি। এই কোষের মধ্যেই রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে শক্তি উৎপন্ন হয়, মানুষের শরীরও এর ব্যতিক্রম নয়। আমাদের কোষে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী মূল উপাদানগুলো হল তিন শ্রেণীর যৌগ —কার্বোহাইড্রেট (শর্করা ও শ্বেতসার), স্নেহপদার্থ ও প্রোটিন। স্নেহ পদার্থ ও প্রোটিন শক্তির উৎস রূপে কাজ করলেও স্বাভাবিক অবস্থায় অধিকাংশ শক্তিই কার্বোহাইড্রেট জারণ থেকে উৎপন্ন হয়। দেখা গেছে, আমাদের শরীরের সমস্ত শক্তির প্রায় 50 থেকে 60 শতাংশ কার্বোহাইড্রেট থেকে সংগৃহীত হয়।

বেশীর ভাগ কোষেই গ্লুকোজ জারিত হয়ে শক্তি উৎপন্ন হয়। কোষে পলিস্যাকারাইড রূপে সঞ্চিত কার্বোহাইড্রেট মূল বিপাক ক্রিয়ায় প্রবেশের আগেই আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে এক-শর্করা (monosaccharides) অণু গঠন করে। প্রাণী কোষে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন নানারকম এনজাইমের সাহায্যে ভেঙে গিয়ে গ্লুকোজ এককগুলি উৎপন্ন করে এবং গ্লুকোজ-6-ফসফেট-এ রূপান্তরিত হয়। এই যৌগটাই মূল বিপাক ক্রিয়ার অংশ নেয়। বিপাকের দ্বারাই দেহে শক্তি উৎপাদন, বিভিন্ন কলার বৃদ্ধি ও বিকাশ, এনজাইম্ প্রভৃতির সংশ্লেষণ ঘটে।

কোন কারণে গ্লুকোজের সরবরাহ কম থাকলে স্নেহপদার্থ কোষে শক্তির মূল উৎসরূপে কাজ করে। অনাহার, বহুমূত্র জাতীয় রোগ বা অন্যান্য অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্য এই অবস্থার উদ্ভব হতে পারে। কোষীয় বিপাক ক্রিয়ায় প্রবেশের মুখে স্নেহপদার্থ ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসেরলে আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে যায়। গ্লিসেরল রূপান্তরিত হয় ডাই-হাইড্রোক্সিল অ্যাসিটোন ফসফেট এবং গ্লিসেরালডিহাইড—3-ফসফেট রূপে গ্লাইকোলিসিস প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে। আর ফ্যাটি অ্যাসিড রূপান্তরিত হয় একাধিক 'অ্যাসিটাইল-কো-এনজাইম'-এ এককে এবং সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রের মাধ্যমে সম্পূর্ণ জারিত হয়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও জলে পরিণত হয় এবং প্রভূত শক্তি উৎপন্ন করে।

কোষের গঠন এবং জৈবিক ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রোটিন, খুবই প্রয়োজনীয়। শরীরে স্নেহপদার্থের অভাব ঘটলে প্রোটিন, কোষের শক্তির শেষ উৎসরূপে কাজ করে। প্রোটিন প্রথমে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলোতে আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়। অ্যামিনো অ্যাসিড তার পর অ্যামোনিয়া বিমোচন করে তিন রকমের কিটো অ্যাসিড উৎপন্ন করে। এই কিটো অ্যাসিডগুলো সবই বিপাক ক্রিয়ার অংশ নেয়। আর অ্যামোনিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, ইউরিয়া বা মুক্ত অ্যামোনিয়া রূপে কোষ থেকে নির্গত হয়ে বর্জ্য পদার্থরূপে শরীরের বাইরে আসে।

এই ভাবে কার্বোহাইড্রেট, স্নেহপদার্থ ও প্রোটিন থেকে আমাদের শরীরে শক্তি উৎপন্ন হয়। খাদ্যের মধ্যে যে পরিমাণ শক্তি সঞ্চিত থাকে তার সবটাই কিন্তু আমাদের শরীর গ্রহণ করতে পারে না। কারণ শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্যগুলো শরীরের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে জারিত ও পরিপাক হয় না। পরিপাক হয় তারও আবার সবটা শরীরের শক্তি তৈরির জন্য শোষিত হয় না ; অর্থাৎ বিপাক ক্রিয়ার অংশ গ্রহণ করে।

আগেই বলা হয়েছে, জীবদেহের শক্তির মানকে ক্যালরিতে প্রকাশ করা হয়। শক্তির মান ক্যালরিতে প্রকাশের অর্থ—এক গ্রাম খাদ্য থেকে দেহাভ্যন্তরে কত ক্যালরি তাপশক্তি উৎপন্ন হয়—তা বলা। 'ক্যালরিফিক ভ্যালু' কথাটিও জ্বালানি সম্পর্কে প্রয়োগ করা হয়। জীবদেহের শক্তির জ্বালানি সম্পর্কেও একই কথা ব্যবহার করা যায়। কোন 'জ্বালানির ক্যালরিফিক ভ্যালু 100'—একথার অর্থ—এক গ্রাম ঐ জ্বালানি সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হলে 100 ক্যালরি তাপশক্তি উৎপাদিত হয়। সে রকম এক গ্রাম খাদ্য সম্পূর্ণ জারিত ও পরিপাক হয়ে আমাদের দেহে 100 ক্যালরি শক্তি উৎপন্ন হলে বলা হয় ঐ খাদ্যের 'ক্যালরিফিক ভ্যালু' 100

পরীক্ষাগারে একটা ক্যালরিমিটারে প্রোটিন সম্পূর্ণরূপে জারিত করলে (completely oxidised) কার্বনডাই-অক্সাইড, অ্যামোনিয়া, নাইট্রোজেন অক্সাইডস, গন্ধক ও জলে বিশ্লেষিত হয় এবং শক্তি উৎপন্ন হয়। এইভাবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে এক গ্রাম প্রোটিন থেকে 5·6 কিলোক্যালরি শক্তি উৎপন্ন হয়। সেক্ষেত্রে আমাদের সুস্থ, সবল দেহে ঐ এক গ্রাম প্রোটিন থেকে মাত্র 4 কিলোক্যালরি শক্তি সংগৃহীত হতে পারে। একইভাবে স্নেহপদার্থ ও কার্বোহাইড্রেটের প্রতি গ্রাম ক্যালরিমিটারে জারিত

* পি-2, গিরিশ অ্যাভেন্যু, কলিকাতা-700003

করলে যেখানে 9·4 ও 4·2 কিলোক্যালরি শক্তি দেয়, ঐ একই স্নেহপদার্থ ও কার্বহাইড্রেট থেকে আমাদের শরীরে উৎপন্ন শক্তির পরিমাণ সেখানে যথাক্রমে 9 ও 4 কিলোক্যালরি।

আমাদের শরীরে প্রতি নিয়তই শক্তির প্রয়োজন। এমন কি বিশ্রামকালেও শক্তির ক্ষয় হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে—বিশ্রামকালে প্রতি ঘণ্টায় আমাদের শরীরের ওজনের প্রতি কিলোগ্রামে প্রায় এক কিলোক্যালরি শক্তির প্রয়োজন। সেই হিসাবে একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের শুধু বিশ্রামরত অবস্থায় প্রতিদিন 1500 থেকে 2000 কিলোক্যালরি শক্তির প্রয়োজন। যদিও শারীরিক ওজনের সঙ্গে এই মান পরিবর্তনশীল, তবু তা কখনও 1200 কিলোক্যালরির কম কিংবা 2200 কিলোক্যালরির বেশি হয় না। কাজেই খাদ্যের মাধ্যমে সংগৃহীত শক্তির বেশির ভাগ অংশ শারীরবৃত্তীয় কার্য ও স্বাভাবিক উষ্ণতা বজায় রাখতেই ব্যয়িত হয়।

বিশ্রামরত অবস্থায় যেটুকু শক্তির প্রয়োজন তা পূরণ হবার পর আমাদের চলাফেরা, দৈনন্দিন কাজ, খেলাধূলা কিংবা অবসর সময়ের চিত্তবিনোদনের জন্য অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন। হাল্কা কায়িক পরিশ্রমের সঙ্গে যুক্ত কোন ব্যক্তির ঘণ্টায় অতিরিক্ত 30 কিলোক্যালরি শক্তির প্রয়োজন। কোন অফিসের সেক্রেটারী বা এরকম কোন পদে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। আর একটু বেশী কায়িক পরিশ্রম যাদের করতে হয় যেমন ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রী, জলের কলমিস্ত্রী বা কোন অফিসের টাইপিস্ট ইত্যাদি; তাদের ঘণ্টায় অতিরিক্ত 150 কিলোক্যালরির প্রয়োজন। যারা বেশী পরিশ্রম করে, তাদের প্রয়োজন ঘণ্টায় অতিরিক্ত 400 কিলোক্যালরি। কলকারখানার শ্রমিক থেকে ফুটবল খেলোয়াড় কিংবা ভারোত্তোলনকারীকে এই শ্রেণীতে ফেলা যায়।

একই খাদ্য থেকে কোন দু-জন লোক সমপরিমাণ ক্যালরি সংগ্রহ করতে পারে না। কারণ কোন দু-জনই একেবারে এক হতে পারে না। তাদের পরিপাক ক্ষমতা বা সমস্ত রকম শারীরবৃত্তীয় কার্যের হার কখনই এক হতে পারে না। কাজেই আমরা যে সব খাদ্য গ্রহণ করি তার ক্যালরিফিক ভ্যালু ব্যক্তি-বিশেষে বিভিন্ন হয়। তবে এই সংক্রান্ত গবেষণার সুবিধার জন্য এবং বিভিন্ন গবেষকের কাজের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য সাধনের জন্য কার্বহাইড্রেট, স্নেহপদার্থ ও প্রোটিনের ক্যালরিফিক ভ্যালু যথাক্রমে 3·75, 9·0 এবং 4·0 কিলোক্যালরি ধরা হয়। 25-30 বছর বয়স্ক সাধারণ পুরুষদের ক্ষেত্রে ক্যালরিফিক ভ্যালু প্রায় একই থাকে। স্ত্রীলোক ও বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। দীর্ঘস্থায়ী অপুষ্টিতেও এই হার হ্রাস পায়।

অদ্ভুত সমুদ্র

বিপ্লব সরকার*

হ্যাঁ, অদ্ভুতই বটে। ভাবছ বুঝি সমুদ্রের আবার অদ্ভুতত্ব কোথায়। সমুদ্র তো বিরাট বড় হয় যার একুল-ওকুল দেখা যায় না, আর গভীরতা—সে তো অনেক। সমুদ্রে একবার পড়লে নির্ঘাত সলিল সমাধি। এ তো আমাদের সকলেরই জানা কথা। আজ যে সমুদ্রের কথা বলছি তাতে পড়লে কিন্তু সলিল সমাধির ভয় নেই। মানে কিছুতেই ডোবা যাবে না। এই অদ্ভুত সমুদ্রটা হল প্যালেস্টাইনের ডেড সী। দারুন মজার ব্যাপার তাই না। হয়ত ভাবছ সমুদ্রের জল জমে একেবারে বরফ হয়ে গেছে তাই তাতে ডোবা যাবে না। মোটেই না। বরং জল তাতে আছে ঠিকই। কিন্তু জলের একটা বিশেষত্ব আছে। আমরা সকলেই জানি সমুদ্রের জল লবণাক্ত হয় অর্থাৎ নুন থাকে। সাধারণতঃ সমুদ্রের জলে নুনের পরিমাণ শতকরা 2/3 ভাগ। কিন্তু ডেড সী-র জলে শুধু মাত্র উপরিতলেই নুনের পরিমাণ শতকরা 27 ভাগ। আর গভীরতার সঙ্গে এই নুনের পরিমাণ বাড়তে থাকে। এক কথায় ডেড সী-কে লবণের আধার বলা চলে। এই কারণে সাধারণ সমুদ্রের জল থেকে ডেড সী-র জল বেশী ঘন ও ভারী হয়। এটা এত ভারী যার তুলনায় আমাদের দেহেও হাল্কা। ভাসনের শর্ত থেকে আমরা জানি—দেহকে ভাসতে হলে দেহের ওজন অপসারিত জলের ওজনের থেকে কম হতে হবে। এক্ষেত্রে ও ঠিক তাই হয়। সে জন্য ডোবা যায় না।

* ভুমা, সুকান্ত পল্লী, 24-পরগণা

নেপলিয়ন ও আরসেনিক

উদয়ন ভট্টাচার্য*

সেন্ট হেলেনা—আটলান্টিক মহাসাগরের একটি দ্বীপ। পনেরোই অক্টোবর আঠারো'শ পনেরো। সূর্য অস্তাচলের পথে। নেপোলিয়ন চিরনিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন। বন্দীদশা চলছিল। মৃত্যু বন্দীদশা ঘুচিয়ে মহামুক্তির পথে নিয়ে গেল। পাকস্থলীর ক্যানসারই চিরমুক্তির কারণ বলে জানালেন ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাঃ ফ্রানসিস্কো আন্‌টোমার্চি।

পনেরই অগাস্ট, সতেরো'শ উনসত্তর খৃস্টাব্দে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট জন্মগ্রহণ করেন। সেনাবাহিনীতে যোগ দেন সতেরো'শ ছিয়ানব্বই-এ। অঙ্কের নিয়ম মেনে সেনা পরিচালনায় পারদর্শী সেনাধ্যক্ষ তাঁর সমকক্ষ পৃথিবীতে তখন কেউ ছিল না। অস্ট্রিয়া, ব্রিটেন, রাশিয়া চার বছরের মধ্যে তাঁর পদানত হয়। আঠোরো'শ চার খৃস্টাব্দে নিজেকে ফ্রান্সের সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন। ইতিহাস বড় নির্মম। এই মহাপরাক্রমশালী সমরকুশলীরও পরাজয় ঘটে। ডিউক অব ওয়েলিংটনের নেতৃত্বে 'ব্যাটেল অব ওয়াটারলু'-র যুদ্ধে তিনি পরাস্ত ও বন্দী হন। প্রথমে এলবা পরে আঠারো'শ পনেরো খৃস্টাব্দে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে তাঁকে নির্বাসন দেওয়া হয়। আঠারো'শ সতেরো খৃস্টাব্দে শেষার্ধে নেপোলিয়ন অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। পাকস্থলীর তীব্র বেদনা তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। বন্দী হবার পর থেকেই তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে, ব্রিটিশরা তাকে হত্যা করতে পারে। সেই মনোভাবের কথা তিনিই গোপন রাখেন নি—আই ডাই বিফোর মাই টাইম, কিল্ড বাই দি ইংলিশ অলিগার্কি এণ্ড ইটস্ হায়ার্ড অ্যাসাসিনস।

ক্রমশ নেপোলিয়নের অবস্থা খারাপের দিকে যেতে থাকে। একান্নটি বসন্ত পরিক্রমার পর তার জীবন পরিক্রমার সমাপ্তি ঘটে।

গুঞ্জন চলতে থাকে নেপোলিয়নের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। তার কি স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে না বিষ প্রয়োগে মারা হয়েছে? বিষ প্রয়োগে যদি মারা হয়ে থাকে তবে কি সে বিষ যা দিনের পর দিন প্রয়োগ করলেও বাইরে থেকে বোঝার কোন উপায় থাকে না? কি সে বিষ, যা চিকিৎসকদের সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিতে ফেলে? গুপ্ত হত্যার জন্য প্রচলিত যে সব বিষ প্রয়োগ করা হয় তা গোপন করা যায় না, প্রকাশ হয়ে পড়ে। নেপোলিয়নকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করলে—বিশেষ করে প্রচলিত বিষই যদি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, তবে তা গোপন থাকতো না। প্রকাশ হয়ে পড়বেই। তবে কি অকারণে সন্দেহের বীজ বোনা হচ্ছে? নেপোলিয়নের স্বাভাবিক মৃত্যুই হয়েছিল? কানাঘুষো চলতে থাকে প্রশ্নবোধকের মত উত্তর মেলে না।

এক-শ' চল্লিশ বছর পরের কথা। ডাঃ স্মিথ এবং ডাঃ ফরসাফ'উডন—দু'জন স্কটিশ ডাক্তার নেপোলিয়নের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সমস্ত জল্পনাকল্পনাকে অবসান ঘটাতে বদ্ধপরিকর হলেন। তাঁরা সিদ্ধান্তে এলেন নেপোলিয়নকে যদি বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করা হয় তবে সে বিষ অবশ্যই আরসেনিক ছাড়া আর অন্য কোন বিষ হওয়া কোন ভাবেই সম্ভব নয়।

আরসেনিক যদি হয় তবে তা কিভাবে প্রমাণ করা যাবে? বিজ্ঞানের সহায়তায় সে অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায় নিউট্রন অ্যাকটিভেসন অ্যানালাইসিস পদ্ধতি প্রয়োগ করে। মানবদেহে আরসেনিক প্রবেশ করালে তা কেশরাশিতে এসে জমা হয়। নেপোলিয়নের মৃত্যু স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক তা কেবল তাঁর কেশ পরীক্ষান্তেই সম্ভব। সে কেশ কিভাবে মিলতে পারে? তত্ত্বতালাশ চললো পৃথিবীর বিখ্যাত সব জাদুঘরে—কোথায় সংরক্ষিত আছে নেপোলিয়নের কেশ। স্কটিশ ডাক্তারদ্বয় নেপোলিয়নের কেশ পাঠানোর আবেদন জানালেন বিভিন্ন জাদুঘরের সচিবগণের কাছে। উত্তর এলো বাঞ্ছিত কেশের প্যাকেট নিয়ে যার মধ্যে বিশেষ ভাবে রক্ষিত আছে নেপোলিয়নের মৃত্যুর কয় ঘণ্টা আগে কাটা কেশের খণ্ডাংশ। পরীক্ষান্তে প্রমাণিত হলো কেশগুচ্ছ নেপোলিয়নের। এরপরে স্কটিশ ডাক্তারদ্বয় সুইডিস বিজ্ঞানী ডাঃ ওয়াসসেনের শরণাপন্ন হলেন তিনি নিউট্রন অ্যাকটিভেসন অ্যানালাইসিস পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে সেই কেশগুচ্ছে আরসেনিক অস্বাভাবিক মাত্রায় জমা রয়েছে দেখতে পেলেন। সাধারণতঃ মানবদেহের কেশে যে পরিমাণ আরসেনিক থাকে নেপোলিয়নের কেশে তার চেয়ে তেরগুণ বেশী আরসেনিক মিলেছে। অর্থাৎ নেপোলিয়নের কেশে প্রায় 10·4 মিলিগ্রাম আরসেনিক পাওয়া গেছে। নেপোলিয়নকে যে আরসেনিক বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে এ ব্যাপারে আর কোন সন্দেহের অবকাশ রইলো না।

আরসেনিক ভারী মৌল। আরসেনিকের পারমাণবিক বিন্যাসে দেখা যায় এর কেন্দ্রকে আছে তেত্রিশটি প্রোটন এবং বেয়াল্লিশটি নিউট্রন। একটি অতিরিক্ত নিউট্রন যদি কেন্দ্রকে প্রবেশ করানো যায় তবে আরসেনিকের একটি তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক (রেডিও অ্যাকটিভ আইসোটোপ অব আরসেনিক) তৈরি হবে। সুইডিস বিজ্ঞানী ডাঃ ওয়াসসেন নেপোলিয়নের কেশগুচ্ছ নিউট্রন রশ্মির গতিপথে স্থাপিত করেন এবং এই কেশগুচ্ছ থেকে যে তেজস্ক্রিয়তা নির্গত হয় তা পরিমাপের ব্যবস্থা করে আরসেনিক কি পরিমাণে জমা আছে তা নির্ধারণ করেন। মানবদেহে অপরাপর পদার্থের মতো আরসেনিকও সামান্য পরিমাণে বর্তমান। রক্ত, কোষ কলা এবং শরীরের অন্যান্য অংশে আরসেনিক আছে। আরসেনিক প্রয়োগে হত্যাজনিত ঘটনাগুলো পর্যবেক্ষণ করে মোটামুটি দেখা গেছে লিভার, কিডনি ও ফুসফুসে আরসেনিক রয়েছে যথাক্রমে 279·3 188·7 এবং 11·6 মিলিগ্রাম করে। আরসেনিকের বিভিন্ন যৌগ যেমন আরসেনিক

* পলাশবাড়ী, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি

অক্সাইড, আরসেনাইট, আরসেনিক সালফাইড, আরসেনিকট্রাই ক্লোরাইড এবং আরসেনিক হাইড্রাইড অত্যন্ত বিষাক্ত। এক-শ' চল্লিশ বছর আগে কবরে শায়িত নেপোলিয়নের দেহের কিছুই মেলা সম্ভব নয়। তাই কেশরাশির সন্ধান চলেছিল এবং এই কেশরাশি দিয়েই জগৎবাসীকে জানান গেল যে আরসেনিক প্রয়োগে নেপোলিয়নকে সুকৌশলে এবং ঠাণ্ডা মাথার হত্যা করা হয়েছে।

একটা প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়। কি ভাবে আরসেনিক নেপোলিয়নকে দেওয়া হলো? মন্ত্রণাকারীরা কেউ-ই জীবিত নেই। ষড়যন্ত্রের কোন লিখিত দলিলের কথা আজ পর্যন্ত কেউ শুনেছে বলে শোনা যায় নি। সুতরাং সে প্রশ্নের উত্তর অন্ধকারের অতলেই রইলো। তবে অনুমান করা যায় খাদ্যের মাধ্যমে আরসেনিক সরাসরি দেওয়া তো হয়েছেই এছাড়া যে ঘরে এবং যে সব পোশাক-পরিচ্ছদ ও জিনিসপত্র নেপোলিয়নকে ব্যবহার করতে দেওয়া হত তার মধ্যেও বিষাক্ত আরসেনিকের কোন যৌগের প্রলেপ মাখানো থাকত। মোট কথা আরসেনিকের এক ঘন আবেষ্টনীর মধ্যে নেপোলিয়নকে রাখা হয়েছিল যা প্রতি মুহূর্তে এই কুশলী সমর নায়কের জীবনী শক্তি ক্ষয় করে চলত।

ভেবে উত্তর দাও

সৌমিত্র মজুমদার*

[সঠিক উত্তর চিহ্নিত কর।]

1. হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার জনক হলেন—
(a) হেন্‌রি বেসেমার, (b)স্যামুয়েল হ্যানিম্যান, (c) প্রিস্টলী, (d) গ্যালিলিও।

2. "ভাইপেরা রুসেলি" (Vipera russelli) কোন্ সাপের বৈজ্ঞানিক নাম ?
(a) কালনাগিনী, (b), চন্দ্রবোড়া, (c) অজগর, (d) কেউটে

3. ক্লারিয়াস বাট্রাকাস (Clarius batrachus) কোন্ মাছের বিজ্ঞানভিত্তিক নাম ?
(a) মাগুর, (b) কাতলা, (c) ল্যাটা, (d) ইলিশ।

4. গীটার-এর আবিষ্কর্তা হলেন—
(a) এডিসন্, (b) রন্টগেন, (c) বার্লিনার, (d) জোসেফ-পিকাকু।

5. বিজ্ঞানী টোমিটোফিন যা আবিষ্কার করেছেন, তা হলো—
(a) হারমোনিয়াম, (b) ইথার, (c) প্রেসার কুকার, (d) ঘড়ি

6. লবণ উৎপাদনে পৃথিবীতে ভারতবর্ষের স্থান হচ্ছে—
(a) প্রথম, (b) পঞ্চম, (c) সপ্তম, (d) দ্বিতীয়।

7. যে ধাতু সর্বাপেক্ষা হাল্কা, তার নাম হল—
(a) লিথিয়াম, (b) লোহা, (c) দস্তা, (d) অ্যালুমিনিয়াম।

8. পরমাণু নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ যে এককে মাপা হয়—
(a) ফের্মি, (b) ক্যারাট, (c) ফুট, (d) মিটার।

9. বিজ্ঞানী গার্ডেন যা আবিষ্কার করেছেন তার নাম—
(a) ন্যাপথেলিন, (b) ইস্পাত, (c) রেয়ন, (d) রেডিও।

10. প্রাণী-বিজ্ঞানের ভাষায় দর্জি পাখীর নাম হলো—
(a) পায়রা, (b) চড়াই, (c) বাবুই, (d) টুনটুনি।

11. সিনাবার কিসের আকরিক ?
(a) পারদ, (b) লোহা, (c) জিঙ্ক, (d) কপার।

12. প্যান্টোথেনিক্ অ্যাসিড-এর অভাবে যে রোগ হয়—
(a) পেলাগ্রা, (b) জলাতঙ্ক, (c) হাম, (d) বসন্ত।

13. হিমোসিলোমিক্ ফ্লুইড যে প্রাণীর রক্তের নাম—
(a) আরশোলা, (b) মানুষ, (c) কেঁচো (d) ব্যাঙ।

14. বায়োটিন্ কোন্ ভিটামিনের অপর নাম ?
(a) ভিটামিন—C, (b) ভিটামিন—K, (c) ভিটামিন—D. (d) ভিটামিন—H।

15. ওয়াটার গ্লাস—জিনিসটা কি ?
(a) সোডিয়াম সিলিকেট, (b) সিলভার নাইট্রেট, (c) সোডিয়াম ক্লোরাইড, (d) পটাশিয়াম আয়োডাইড।

16. থোরিয়াম ও সিলেনিয়াম মৌলদ্বয়ের আবিষ্কর্তা—
(a) মেণ্ডেল, (b) বার্জেলিয়াস, (c) ডারউইন, (d) লিপারশী।

17. 'লুনার কস্টিক' যার নাম তা হলো—
(a) ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, (b) পটাসিয়াম ক্লোরাইড, (c) সিলভার নাইট্রেট, (d) হাইড্রোজেন ক্লোরাইড।

18. সবচেয়ে উজ্জ্বল গ্রহের নাম হচ্ছে—
(a) শুক্র, (b) বুধ, (c) শনি, (d) প্লুটো।

19. গোবরে শতকরা যত ভাগ নাইট্রোজেন বর্তমান—
(a) 5%, (b) 0·4%, (c) 2%, (d) 0·01%।

20. পিউটার একরকম সঙ্কর ধাতু, এটি কিসের সঙ্কর ?
(a) টিন ও সীসা, (b) সোনা ও রূপা, (c) তামা ও লোহা, (d) দস্তা ও অ্যালুমিনিয়াম।

21. আয়োডিন থাকে যে সব্জীতে তার নাম—
(a) পেঁপে, (b) ফুলকপি, (c) আলু, (d) উচ্ছে।

[পাঠকদের সঠিক উত্তর পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।]

*পূর্বাচল পল্লী, পোঃ-রহড়া, (খড়দহ) 24-পরগণা

শব্দ-শৃঙ্খল

অচিন্ত্যকুমার পাঞ্জা*

উপর-নীচ

1. হাইড্রোকার্বন অণুর হাইড্রোজেন পরমাণু ^{-}OH মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে উৎপন্ন হয় ;
3. মাথার একটি রোগ ;
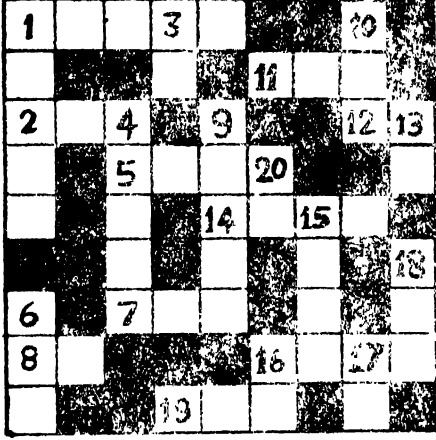
4. এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলামের গায়ে যে গোলাকার বস্তু থাকে ;
6. 'ব্রাসিকা ক্যামপেসট্রিস' এই বৈজ্ঞানিক নামটি যে গাছের ;
9. রাডার যন্ত্রের আবিষ্কারক ;
10. পরিবেশকে বাঁচাতে গেলে যা রোধ করা দরকার ;
13. জিভের দু-পাশের গুটিকার সাহায্যে যে স্বাদ গ্রহণ করি ;
15. পারদের একটি আকরিক ;
16. কোন দৃঢ় বস্তুর উপর যে কোন দৈর্ঘ্য বরাবর বলপ্রয়োগ করে টানলে প্রযুক্ত বলকে বলে ?
17. বহিঃকঙ্কালের সাহায্যে রেচন ত্যাগ করে ;
18. মানুষের চোখের লেন্স ; (উপরিভাগের আকার)
20. ওজন করতে লাগতো ;

পাশাপাশি

1. একটি কম রোধবিশিষ্ট চলকুণ্ডলী গ্যালভানোমিটার ;
2. বিশেষ শ্রেণীর একটি সাপ ;
5. শ্রোণীচক্রের একটি অস্থি ;
7. একক সময় বেগের হ্রাসকে বলে ?
8. একটি দৌড়বাজ পাখি ;
12. 'হোমোসেপিয়েন্স' (Homo Sapiense) বৈজ্ঞানিক নামটি যে স্তন্যপায়ী জীবের ;
12. সমুদ্রপথে দূরত্ব মাপা হয় যে এককে ;
14. ঠাণ্ডা লাগার নামে গলাতে এই রোগটি হয় ;
16. পায়ের একটি অস্থি ;
19. একটি নিষ্ক্রিয় মৌল যার পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক আঠার ;

[পাঠকদের সঠিক সমাধান পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে]

* গ্রাম—পার্বতীপুর, পোঃ তমলুক, মেদিনীপুর, পিন-721636

ধাঁধা

প্রজেশকুমার মল্লিক*

চার বন্ধু, রাম, শ্যাম, যদু এবং মধু প্রত্যেকেই স্ত্রীকে নিয়ে বই-মেলায় গেলেন। আটজনের প্রত্যেকেই আলাদা ভাবে বই কিনলেন। পরে একদিন চা খেতে বসে তারা দেখলেন।

1. আটজনের সকলেই ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যক বই কিনেছেন।

2. আটজনের প্রত্যেকই দেখলেন বই-এর জন্য তিনি যত টাকা খরচ করেছেন, সেটা একটা পূর্ণ বর্গ সংখ্যা এবং সংখ্যাটির বর্গমূল করলে তার কেনা বই-এর সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে।

3. প্রত্যেক স্বামী তার স্ত্রী অপেক্ষা 105 টাকার বেশী বই কিনেছেন।

4. রাম সবচেয়ে বেশী টাকার বই কিনেছেন। যদু, মধুর থেকে 240 টাকা কম খরচ করেছেন।

5. গীতা সবচেয়ে কম বই কিনেছেন। মিতা নীতার থেকে 44 খানা কম বই কিনেছেন।

**** নীতার স্বামী কে ? কার স্ত্রীর নাম এখানে উল্লেখ করা হয় নি ?

[সমাধান পরের পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

* 5 মহেশ্বরাম্মা টেম্পল স্ট্রিট, মুনিরেড্ডি পাল্যা, বাঙ্গালোর-560006

[265 পৃষ্ঠার পশ্নের অংশ]

সমাধান

(ক) মনে করা যাক, চার বন্ধুদের বই-এর সংখ্যা (যথাক্রমে নয়) A, B, C এবং D এবং তাদের স্ত্রীদের বই-এর সংখ্যা (ABCD ক্রম অনুসারে) A_0, B_0, C_0, D_0 ।

(খ) সূত্র (2) এবং (3) থেকে

$$A^2-A_0^2=B^2-B_0^2=C^2-C_0^2=D^2-D_0^2=105$$

এখন 105-কে মাত্র চার ভাবেই দুই সংখ্যার গুণফল হিসাবে প্রকাশ করা যায়।

105×1, 35×3, 21×5 এবং 15×7 এখন মনে করা যাক [সূত্র (1) মনে রেখে]

(গ) $A^2-A_0^2=(A+A_0)(A-A_0)=105=105\times 1$

(ঘ) $B^2-B_0=(B+B_0)(B-B_0)=105=35\times 3$

(ঙ) $C^2-C_0^2=(C+C_0)(C-C_0)=105=21\times 5$

(চ) $D^2-D_0^2=(D+D_0)(D-D_0)=105$ 15×7

(ঘ) থেকে $B+B_0=35$

$B-B_0=3$

$\therefore$ $B=19$ এবং $B_0=16$

(ছ) এই ভাবে বই-এর সংখ্যা (গ, ঘ, ঙ এবং চ থেকে)

স্বামী : $A=53(2809)$, $B=19(361)$, $C=13(169)$, $D=11(121)$

স্ত্রী : $A_o=52(2704)$, $B_o=16(256)$, $C_o=8(64)$, $D_o=4(16)$

বন্ধনীর মধ্যে বই-এর দাম (অর্থাৎ A^2; A_o^2 ইত্যাদি) দেওয়া হলো।

এখন স্বামীদের বই-এর দামের দিকে তাকালে দেখা যাবে কেবলমাত্র 361 − 121 = 240। অতএব সূত্র (4) অনুসারে মধুর বই-এর সংখ্যা 'B', যদুর 'D', রামের 'A', বাকী 'C' নিশ্চয়ই শ্যামের।

স্ত্রীদের বই-এর সংখ্যার দিকে তাকালে দেখা যাবে কেবলমাত্র 52 − 8 = 44, অতএব সূত্র (5) অনুসারে মিতার বই-এর সংখ্যা 'A_o', নীতার 'C_o' এবং গীতার 'D_o'।

এখন দেখা যাচ্ছে 'C' এবং 'C_o' যথাক্রমে শ্যাম এবং নীতার বই-এর সংখ্যা। অতএব (ক) অনুসারে শ্যাম নীতার স্বামী। অনুরূপে দেখা যাবে, রামের স্ত্রী মিতা এবং যদুর স্ত্রী গীতা, অতএব মধুর স্ত্রীর নামই এখানে উল্লেখ করা হয় নি।

পুস্তক পরিচয়

নদী-বিজ্ঞানের আত্মকথা—অধ্যাপক শিবরাম বেরার রচিত। প্রকাশক—শ্রীমতী ভারতী বেরা, 10, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা—700006 এবং পরিবেশক—শরৎ বুক হাউস, 18বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—700073; মূল্য—12 টাকা 50 পয়সা এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা—122।

এতে মোট আটটি অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায়ে লেখক নদীর বিভিন্ন প্রবাহ, বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনা ও জনজীবনে তাদের কল্যাণকর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে রূপায়িত উল্লেখযোগ্য নদী-পরিকল্পনার কথা বিশেষভাবে এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক বন্যা নিয়ন্ত্রণে পরিকল্পিত নদী-সংস্কার সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যাসহ বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এই অধ্যায়ে লেখক, পদার্থবিদ্যার সাহায্যে, যেমন—বাঁধের উপর প্রযুক্ত অপকেন্দ্রিক বল (centrifugal force) বাঁকগুলির বক্রতা ব্যাসার্ধের (rudius of curvature) উপর কিরূপভাবে নির্ভর করে তা ব্যাখ্যা করেছেন। এই ধরনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাসহ আলোচনায় পুস্তকটির গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে, দামোদর নদে বন্যার কারণ ও তার প্রতিরোধ সম্পর্কে লেখক বিস্তারিত আলোচনা করেছেন; এই অধ্যায়ে দামোদর উপত্যকায় বহুমুখী প্রকল্পের জন্য গঠিত ডি. ভি. সি.-র বন্যানিয়ন্ত্রণে ভূমিকা ও ব্যর্থতার উপর জোর দিয়েছেন এবং কিরূপে ডি. ভি. সি. বন্যানিয়ন্ত্রণে যথার্থ ভূমিকা পালন করতে পারে তারও প্রস্তাব করেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে, লেখক ফরাক্কা ব্যারাজ প্রকল্পের ব্যর্থতা ও এর অহিতকর কার্যকারিতার কথা উল্লেখ করেছেন এবং ফরাক্কা সেতুটির রক্ষার উপায়েরও প্রস্তাব দিয়েছেন।

পঞ্চম অধ্যায়ে, নক্সাসহ ব্যারাজের গঠন ও কার্যকারিতার কথা আলোচনা করতে গিয়ে, ব্যারাজের দ্বারা যে বিপর্যয় ঘটে—লেখক তারও উল্লেখ করেছেন এবং এর মুক্তির উপায় সম্পর্কেও প্রস্তাব করেছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে, ভাগীরথী ও হুগলী নদীর মজে যাওয়ার বিভিন্ন কারণ ও তাদের পুনরুজ্জীবনের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর রেনেলের মানচিত্রটির সংযোজন যথোপযুক্ত হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে, বিভিন্ন নদ-নদীর জন্ম-মৃত্যুর খেলা খুবই প্রশংসার দাবী রাখে।

অষ্টম অধ্যায়ে সংযোজিত "প্রশ্নোত্তরে নদীর কথা"—এক নজরে নদ-নদী সম্পর্কিত সকল প্রয়োজনীয় বিষয় জানতে উৎসাহী পাঠককে সহায়তা করবে।

সর্বোপরি, এই পুস্তকটির সাহায্যে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ মানুষও বহু অজ্ঞাত ভৌগোলিক তথ্য সম্পর্কে জ্ঞান

আহরণ করতে পারবে এবং চিন্তাশীল ও উন্নয়নকামী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বন্যাপ্রতিরোধ ও ব্যারাজ প্রকল্পের ব্যর্থতাকে দূরীভূত করবার সুবিনাস্ত চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবে বলে আশা রাখি।

সুকুমার গুপ্ত*

*বঙ্গবাসী সান্ধ্য কলেজ, কলিকাতা-700009

পরিষদ সংবাদ

হিরোসিমা দিবস উদযাপন

1945 খৃস্টাব্দে 6ই এবং 9ই অগাস্ট জাপানে হিরোসিমা ও নাগাসাকি শহর দুটিতে মার্কিন পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু ও ভয়াবহ ধ্বংসলীলা স্পষ্ট করে দিয়েছিল যুদ্ধাস্ত্রের প্রতিযোগিতায় বিজ্ঞানের অকল্পনীয় বিধ্বংসী প্রয়োগ। প্রতি বছরই 6ই অগাস্ট হিরোসিমার পরমাণু বোমা নিক্ষেপের ঘটনাটি স্মরণ করে পৃথিবীর দেশে দেশে উপযাপিত হয় হিরোসিমা দিবস। লক্ষ লক্ষ মানুষ যুদ্ধের বিরুদ্ধে ও পরমাণু অস্ত্রের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানায়। আজ পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের উন্মত্ত প্রতিযোগিতায় যারা মেতে উঠেছে তাদের এই মানবতা বিরোধী যুদ্ধ প্রস্তুতির বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাতে 6ই অগাস্ট, 1984 সোমবার বেলা 2টায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ (সত্যেন্দ্র ভবন, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট কলিকাতা-6, গোয়াবাগান সি. আই. টি. পার্ক) থেকে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে এবং গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠান, ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়া সায়েন্স ক্লাব অ্যাসোসিয়েসান, উত্তর ও উত্তর-পূর্ব কলিকাতা সমন্বয় শান্তি পরিষদ, উৎস মানুষ, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা ও অন্যান্য সংস্থার সহযোগিতায় বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান-কর্মী, শিক্ষক, ছাত্র, ছাত্রী ও সাধারণ মানুষের এক বিরাট বর্ণাঢ্য মিছিল বের হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, কলিকাতা পৌরসংস্থার পক্ষ থেকে অনেক বড় বড় যুদ্ধবিরোধী স্লোগান, পোস্টার ও ব্যান্যার মিছিলের শোভা বর্ধন করে। মিছিলটি সুরু হবার আগে মাননীয় পৌরমন্ত্রী শ্রীপ্রশান্ত সুর পরমাণু অস্ত্র ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে ও শান্তির সপক্ষে এক মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখেন এবং মিছিলের সঙ্গে পদযাত্রা শুরু করেন। মিছিল আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, শ্যাম বাজার মোড়, বিধান সরণী, কলেজ স্ট্রীট, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র স্ট্রীট, লেনিন সরণী হয়ে শহীদ মিনার পাদদেশে এক সমাবেশে শেষ হয়। সেখানে সভায় পরমাণু অস্ত্র ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং শান্তির সপক্ষে বক্তব্য রাখেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে থেকে ডঃ জয়ন্ত বসু এবং ডঃ সুকুমার গুপ্ত। গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে থেকে শ্রীক্ষীতিশ রায়চৌধুরী, কলিকাতা প্রগতিশীল লেখক শিল্পী সংঘের পক্ষে শ্রীকল্পতরু সেনগুপ্ত এবং হিরোসিমা দিবস উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক শ্রীশিবচন্দ্র ঘোষ ও অন্যান্য কয়েক জন বক্তা। সভায় কয়েকটি যুদ্ধ বিরোধী রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীরাজেশ্বর ভট্টাচার্য।

মিছিলের দৃশ্য ফটো--শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়

মিছিলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সারা পথ পোস্টারে সুসজ্জিত লরি থেকে পরমাণু অস্ত্র ও যুদ্ধ বিরোধী গণ সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী ইরা গুপ্ত এবং তাঁর ছাত্রীবৃন্দ।

প্রতিবেদক—পঞ্চানন পাল

প্রচ্ছদ পরিচিতি

একটি বিস্ময়কর (ভৌতিক ?) ফটোগ্রাফি

প্রচ্ছদে পাশাপাশি দুটো আলোকচিত্র (ফটো) দেখা যাচ্ছে।

বাঁদিকে :—টইটম্বুর করে ফোলানো একটা বেলুন। হাঁ—সাধারণ রবারের খেলনা বেলুন। তবে বাতাস বা কোন গ্যাস নয় শুধু জল দিয়েই ভরা। দোলের সময় ছেলেদের জলবেলুনের মতই। বেলুনের মুখটাকে শক্ত করে বাঁধা সুতোটাও দেখা যাচ্ছে। ধারাল ছুরি জাতীয় একটি ছোট বর্শার তীক্ষ্ণ ফলা ফোলানো বেলুনটিকে ফুটো করার জন্য ঠিক মাঝখানে উপর থেকে নেমে আসছে।

ডানদিকে :—ঐ বর্শা দিয়ে জল ভর্তি বেলুনটিকে ঝটিতি বিদীর্ণ করে শক্তিশালী ক্যামেরায় অসাধারণ ক্ষিপ্রগতিতে এক মাইক্রোসেকেণ্ড এক্সপোজার সময়ে (exposure time) তোলা আলোকচিত্র। (এক সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগের একভাগ সময়কে এক মাইক্রোসেকেণ্ড বলে)। ক্যালিফোর্ণিয়ার সান্তাক্রুজ পর্বতমালায় অবস্থিত "লক্‌হীড মিসাইলস্‌ এ্যাণ্ড স্পেস কোম্পানীতে"-তে ক্ষিপ্রগতি ফটোগ্রাফি নিয়ে গবেষণার সময় এই অভিনব নাটকীয় ছবিটি তোলা হয়। সাধারণ ভাবে আমরা

> **বিশেষ বিজ্ঞপ্তি :**—জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসু কিশোর বিজ্ঞানীদের কাছে প্রচ্ছদের অভিনব তথ্যচিত্রটির বিজ্ঞানসম্মত (তাত্ত্বিক) ব্যাখ্যা পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। যথার্থ উত্তরদানকারী কিশোর বিজ্ঞানীকে (কুড়ি বছরের মধ্যেই বয়স হতে হবে) জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করা হবে। উত্তরদাতাকে তার স্কুল-কলেজের পরিচিতি বা অন্যবিধভাবে ন্যায়সঙ্গত বয়স ও কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠাতে হবে। আগামী 1985 জানুয়ারীর 4 তারিখের মধ্যেই বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কার্যালয়ে উত্তর আসা চাই।

দেখি জলভর্তি বেলুন ফুটো করে দিলে ভেতরের জলটা হুড়হুড় করে বেরিয়ে যায় কোন নির্দিষ্ট আকার না নিয়েই, আর একেবারে সঙ্গে সঙ্গেই বেলুনের রবার চুপসে কুঁকড়ে যায়। এই জল বেরনো আর বেলুন চুপসানোর মধ্যে সময়ের কোন পার্থক্য আমাদের কোন অনুভূতির মধ্যেই ধরা পড়ে না। আবার বেলুন ফেটে যাওয়ার পর তার মধ্যেকার জলের পূর্ববৎ নির্দিষ্ট (বেলুন) আকৃতির পৃথক অস্তিত্বের কথা বা ধারণাও আমাদের প্রখর দৃষ্টিতে বা কোন বোধশক্তির মধ্যেই আসে না। কিন্তু ক্যালিফোর্ণিয়ার লকহীড (Lockhead) কোম্পানীর গবেষণা কেন্দ্রে উপরিউক্ত অসাধারণ আলোকচিত্রে (ডানদিকের ছবিতে) দেখা যাচ্ছে—ফুটো বেলুনের রবারটা দ্রুত সঙ্কুচিত হয়ে নীচে তার সুতোবাঁধা মুখটার কাছে গুটিয়ে গেছে। আর রবার অংশের বাইরে অবিকৃত বেলুনাকৃতি জল আধারহীন অবস্থায় সুস্পষ্ট পূর্ব আকারেই অবিশ্বাস্যভাবে বিদ্যমান। একি ভৌতিক কাণ্ড ? নাঃ- ম্যাজিক ! বিনা আধারে জলের নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন কি করে সম্ভব ? বেলুনটা নেই অথচ বেলুন ভর্তি অতটা জল কেমন করে আলগা অবস্থায় নিখুঁত বেলুনের সাইজ ও আকার নিয়েই রয়েছে ? (এটাই মূল প্রশ্ন—এরই উত্তরটা চাই) ম্যাজিক বা ভোজবাজি বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। দৃষ্টিবিভ্রম বা Hallucination বলাও যাবে না। কারণ একেবারে নিপুণ হাতের নিখুঁত ফটোগ্রাফ। মিথ্যা বলার কোন উপায় নেই। তবে সাধারণ ফটোগ্রাফিতে এটা ধরা সম্ভব নয়।

লক্‌হীড কোম্পানীর ফটোগ্রাফিতে গবেষণারত কর্মীদের রিপোর্টে বলা হয়েছে—(ঐ ছবি সম্বন্ধে তাঁদের একজনের মন্তব্য) : "Believe it or not, it stayed like that for twelve or thirteen milliseconds before we got splattered." অর্থাৎ 12 কি 13 মিলিসেকেণ্ড পর্যন্ত আধারহীন অবস্থায় বেলুনাকৃতিতে ঐ জল ছিল। সেই সময়ের মধ্যেই ফটোটি তোলা। তারপরেই সেটা ছড়িয়ে পড়ে। [এক সেকেণ্ডের এক হাজার ভাগের এক ভাগকে এক মিলি সেকেণ্ড বলে] ঐ সময়টুকুর মধ্যে আমাদের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি দিয়েও কোন নির্দিষ্ট রূপরেখার অনুভূতি জাগে না।

উন্নত প্রযুক্তিবিজ্ঞান কিভাবে তত্ত্বীয় চিন্তার সহায়ক বা পথপ্রদর্শকও হয় এটি তার একটি বলিষ্ঠ উদাহরণ। যা দেখা যায় না, কোন অনুভূতি দিয়েও যে সত্তার অস্তিত্ব প্রমাণ করা, এমন কি ধারণা করাও যায় না,—ফটোগ্রাফির উন্নত কলাকৌশলে সেই সত্তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বহুক্ষেত্রেই পাওয়া গেছে এবং তারই বলে তাত্ত্বিক চিন্তারও বিবর্তন ও ক্রমোন্নতি ঘটেছে, ঘটছে, আর তাতে অতীতের অজ্ঞতাজনিত অন্ধবিশ্বাসের অন্ধকার দূরীভূত হচ্ছে। এই ভাবে তথাকথিত বহু ভৌতিক কাহিনী বা অপ্রাকৃত ঘটনার (বুদ্ধি দিয়ে যার ব্যাখ্যা চলে না প্রভৃতি কথার) যথার্থ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্ভব। তার জন্য মন ও জীবন পদ্ধতিকে যথাসম্ভব যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমুখী করে তুলতে হবে।

[কৃতজ্ঞতা—আলোক চিত্রটি ইউনাইটেড স্টেট্‌স ইনফরমেশন সার্ভিস—কলিকাতা-র—সৌজন্যে প্রাপ্ত]

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006 থেকে প্রকাশিত
এবং শুভপ্রেস, 37/7, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-700 009 হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

স্বাধীনতা

এক আশীর্ব্বাদ এবং সুযোগ

৩৭ বছর আগে দাসত্বের শৃঙ্খল ছিন্ন করে আমরা স্বাধীন জাতি সমূহের পরিবারে যোগ দিয়েছিলাম।

তারপর থেকেই জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা দ্রুত পদক্ষেপে অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছি

- আজ আমাদের কৃষকেরা জাতির চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট খাদ্যশস্য উৎপাদন করছে।
- শিল্পোৎপাদনে বিশ্বের জাতি সমূহের মধ্যে আমরা এক গৌরবময় স্থানের অধিকারী

সকলের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করবার জন্য নতুন ২০ দফা কর্মসূচী আমাদের অবিরাম প্রচেষ্টার একটি মুখ্য হাতিয়ার।

এই লক্ষ অর্জনের জন্য কাজ করতে পারলে তবেই আমরা আমাদের স্বাধীনতা এবং সংহতিকে সকল প্রকার অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃশক্তির বিপদ থেকে রক্ষা করে তাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবো। আমাদের স্বাধীনতার ৩৮-তম বৎসরে আসুন আমরা কঠোর পরিশ্রম এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার শপথ গ্রহণ করি -- যা আমাদের কাঙ্খিত লক্ষে পৌঁছে দিতে পারবে।

কেউ যেন আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে না পারে

লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বিজ্ঞান পরিষদের আদর্শ অনুযায়ী জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার মত সমাজের কল্যাণমূলক বিষয়বস্তু সহজবোধ্য ভাষায় সুলিখিত হওয়া প্রয়োজন।
2. মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এবং পূর্ণ ঠিকানাসহ লেখকের পরিচিতি পৃথক কাগজে অবশ্যই লিখে দিতে হবে।
3. চলিত ভাষা এবং চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহৃত হবে। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্র্যাকেটে ইংরাজী শব্দটিও দিতে হবে। আন্তর্জাতিক সংখ্যা এবং মেট্রিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে।
4. মোটামুটি 3000 শব্দের মধ্যে রচনা সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়।
5. বিভিন্ন ফীচার, সমকালীন বিজ্ঞান গবেষণা ও প্রযুক্তিবিদ্যার সংবাদ এবং বিজ্ঞান বিষয়ক সুন্দর আকর্ষণীয় ফটোগ্রাফীও গ্রহণীয়।
6. রচনার সঙ্গে চিত্র থাকলে আর্ট পেপারে চাইনিজ কালিতে সুঅঙ্কিত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন।
7. প্রত্যেক চিত্র প্রস্থে 8 সে. মি. কিংবা এর গুনিতকের (16 সে মি 24 সে. মি.) মাপে অঙ্কিত হওয়া প্রয়োজন।
8. অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব বজায় রেখে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মন্ডলীর অধিকার থাকবে।
9. প্রত্যেক প্রবন্ধ ফীচার-এর শেষে গ্রন্থপঞ্জী থাকা বাঞ্ছনীয়।
10. জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পুস্তক সমালোচনার জন্য দুই কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।
11. ফুলস্ক্যাপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় যথেষ্ট মার্জিন এবং প্রতি লাইনের পর বেশ কিছুটা ফাঁক রেখে পরিস্কার হস্তাক্ষরে প্রবন্ধ লিখতে হবে।
12. প্রতি প্রবন্ধের শুরুতে পৃথকভাবে প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া আবশ্যিক।

সম্পাদনা সচিব

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

১৫৭ সেপ্টেম্বর, 1984
37তম বর্ষ, নবম সংখ্যা

বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের অনুশীলন করে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও সমাজকে বিজ্ঞান-সচেতন করা এবং সমাজের কল্যাণকল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করা পরিষদের উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন লেখকদের স্বাধীন মতামত বা মৌলিক সিদ্ধান্তসমূহ পরিষদের বা সম্পাদকমণ্ডলীর চিন্তার প্রতিফলন হিসাবে সাধারণতঃ বিবেচ্য নয়।

বিষয় সূচী

কিশোর বিজ্ঞানীর আসর

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা: 30·00

মূল্য: 2·50

যোগাযোগের ঠিকানা

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ

কলিকাতা-700006

ফোন: 55-0660

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সপ্তত্রিংশত্তম বর্ষ | সেপ্টেম্বর, 1984 | নবম সংখ্যা

ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সার্থকত

জয়ন্ত বসু

কয়েক মাস পরে 1985 খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস থেকে আমাদের দেশে শুরু হবে নতুন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। বলা বাহুল্য, আধুনিক যুগে এইরকম পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান থাকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উন্নয়নের। তবে পরিকল্পনার এই দিকটিকে সার্থক করতে হলে, সমাজের অগ্রগতিতে সত্যিকারের ফলপ্রসূ করতে হলে দরকার প্রকৃতিবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীদের ব্যাপক ভাবনা-চিন্তার, দরকার এর রচনায় ও রূপায়ণে বিভিন্ন স্তরের বিজ্ঞানীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে পরিকল্পনার কাঠামো তৈরি করেন কার্যত ওপর তলার কতিপয় মানুষ এবং দেশের সার্বিক কল্যাণচিন্তার চেয়ে ক্ষমতাবান গোষ্ঠীগুলির প্রভাবই এতে বেশি পরিলক্ষিত হয়! বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে যা একান্ত ভাবে দরকার, তা হল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সার্বিক প্রক্রিয়াটির যথার্থ গণতন্ত্রীকরণ।

ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর গত 36 বছরে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্র নিঃসন্দেহে বহুগুণ বিস্তৃত হয়েছে, বহু নতুন গবেষণা-প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে, বহুলাংশে বেড়েছে গবেষণার সুযোগ-সুবিধা। 1947-48 খৃষ্টাব্দে যেখানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ ছিল 2·8 কোটি টাকা, বর্তমান ষষ্ঠ পরিকল্পনার পাঁচ বছরে সেখানে বরাদ্দ হল প্রায় 1900 কোটি টাকা। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও আমাদের দেশের উন্নতিতে এদেশের বৈজ্ঞানিক গবেষণার অবদান একেবারেই যথেষ্ট নয়। এই গবেষণা অনেকটা যেন ঘর সাজাবার কাগজের ফুলের মতন, মাটির সঙ্গে তার সম্পর্ক খুবই ক্ষীণ। আরও মনে রাখতে হবে যে, স্বাধীনতা লাভের সময় আমরা বিশ্বের উন্নত দেশগুলির তুলনায় অনেকখানি পিছিয়ে ছিলাম। তারপরও ঐ দেশগুলি বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রয়োগের মাধ্যমে অত্যন্ত দ্রুত হারে এগিয়ে চলেছে। ভারতকে যদি তাদের সমকক্ষ হতে হয়, তাহলে এখানে অগ্রগতির হার [illegible]ক ভাবে যথেষ্ট বেশি হতে হবে। তা না হলে এখানে অগ্রগতি হলেও আপেক্ষিক ভাবে কিন্তু এ দেশ ক্রমেই পিছিয়ে পড়বে। বাস্তব ক্ষেত্রে অনেকাংশে তাই ঘটছে।

দেশের উন্নতিতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার অবদান ঘটে মূলত উৎপাদন-ব্যবস্থার মাধ্যমে। কৃষি এবং বিশেষত শিল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগে উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়ে, নতুন নতুন উপকরণের সৃষ্টি হয়, উৎপাদন উৎকৃষ্টতা লাভ করে। আমাদের দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিদেশী ও দেশীয় বৃহৎ শিল্পপতিদের প্রচণ্ড প্রভাব— তাঁরা নিজেদের স্বার্থে বিদেশ থেকে 'টেকনিক্যাল নো-হাউ' বা কারিগরী জ্ঞান আমদানী করবার পক্ষপাতী। প্রধানত এই কারণেই এদেশের উৎপাদন-ব্যবস্থা এখানকার বৈজ্ঞানিক গবেষণার সঙ্গে প্রায় সম্পর্কশূন্য। শিল্পমুখী গবেষণা ও গবেষণানির্ভর শিল্প, আধুনিক যুগের এই যে শক্তিশালী জুটি, ভারতে তার অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। আমাদের সরকার ও শিল্পপতিদের যদি যথার্থই স্বাবলম্বী হতে হয়, তাহলে দেশীয় গবেষণার উপর নির্ভরশীলতা বাড়াতেই হবে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার অনেকখানি সার্থকতা আসতে পারে সেই পথে।

অবশ্য গবেষণার আর একটি দিক আছে—যাকে বলা যেতে পারে বিশুদ্ধ জ্ঞানের দিক, মানুষের মনের কৌতূহল থেকে যার জন্ম। এই ধরণের গবেষণা স্বাধীন ভারতে পরিমাণগতভাবে বেড়েছে, কিন্তু গুণগত ভাবে যে এর মানোন্নয়ন হয়েছে, তা

বোধহয় বলা যায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে, তবে সব মিলিয়ে যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা খুব আশাপ্রদ নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতে বিজ্ঞানচর্চা করে আজ পর্যন্ত যে একজন মাত্র এদেশীয় বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন, তাঁর সেই বিজ্ঞানচর্চা আমাদের স্বাধীনতা লাভের কয়েক বছর আগেকার ঘটনা। বস্তুত এদেশে বিজ্ঞান চর্চা করে যে সব বিজ্ঞানী সত্যিকারের মৌলিক অবদানে বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই সার্থক গবেষণা ঘটেছিল পরাধীন ভারতে। এর কারণ বোধকরি নিহিত রয়েছে উপযুক্ত মানসিক পরিবেশের মধ্যে। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি, তাঁর নিজের ও তাঁর অনেক সমসাময়িকদের সার্থক গবেষণার অন্যতম অনুপ্রেরণা ছিল তাঁদের তীব্র জাতীয়তাবোধ—আমরাও যে 'সাহেবদের' সমকক্ষ হতে পারি, এইটা প্রমাণ করবার উদগ্র বাসনা। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতে জাতীয়তাবাদের উন্মেষে যে নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল, তাইতে এমন একটি পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল যে, তা অনেক মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, অনুপ্রাণিত করেছিল মহৎ সাধনায়। পরিতাপের কথা, স্বাধীন ভারতে এখনো পর্যন্ত তেমন কোন অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি করা যায় নি। পুরণো সমাজের ক্রমাগত অবক্ষয় হচ্ছে অথচ তার জায়গায় কোন নতুন প্রাণবন্ত সমাজ গড়ে উঠছে না—এমতাবস্থায় মানসিক দৈন্য হয়ে উঠছে প্রকট। উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক না থাকলে যেমন গাছে ভাল করে ফুল ফোটে না, উপযোগী পরিবেশের অভাবে তেমনি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় মহৎ কীর্তি প্রায়শই সম্ভব হয় না।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এবং বিজ্ঞানী নিজেও সামাজিক জীব। স্বাধীনতার পর ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাঠামো গড়ে উঠেছে কিন্তু তাতে যেন আজও প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় নি। সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যদি এদেশে স্বনির্ভর শিল্প ও সমাজমুখী বিজ্ঞান গড়ে ওঠে, যদি সমাজ-মানসে উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হয়, তবেই এখানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা সত্যিকারের সার্থক হয়ে উঠবে।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (1813-1885) ষড়দর্শন সংবাদের অংশবিশেষ*

লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় : হিন্দু কলেজের প্রথম যুগের প্রখ্যাত ছাত্রগণের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। পিতার নাম জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। চব্বিশ পরগণার বারুইপুরের দক্ষিণে নবগ্রামের তিনি অধিবাসী ছিলেন। বিবাহের পর বেচু চ্যাটার্জি ষ্ট্রিটে শ্বশুরালয়ে বাস করতে থাকেন। 1813 খৃস্টাব্দের 24শে মে মাতামহ ভবনে জীবনকৃষ্ণের দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণমোহনের জন্ম হয়। রামজয় বিদ্যাভূষণ জামাতা জীবনকৃষ্ণকে গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে কিছু জমি দিলে, জীবনকৃষ্ণ সেখানে বাড়ী তৈরি করে অতিকষ্টে জীবনযাপন করতে থাকেন। পাঁচ বৎসর বয়সে কৃষ্ণমোহন হেয়ার সাহেবের ঠনঠনিয়ার পাঠশালায় ভর্তি হন। 1823 খৃস্টাব্দে ডেভিড হেয়ার পরিচালিত পটলডাঙ্গায় কলিকাতা স্কুল সোসাইটির একটি ইংরাজী স্কুলে ভর্তি হন। বর্তমানে এটি হেয়ার স্কুল। 1824 খৃস্টাব্দে হিন্দু কলেজে তিনি প্রবেশ করেন। 1828 খৃস্টাব্দে কৃষ্ণমোহন প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন ও মাসিক ষোল টাকার বৃত্তি লাভ করেন। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রকে উচ্চতর বিদ্যা আয়ত্তের জন্য এই বৃত্তি দেওয়া হতো। রাধানাথ শিকদার এই বৃত্তিভোগী ছিলেন।

1829 খৃস্টাব্দে হাবড়া নিবাসী রাধামোহন চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা বিন্দুবাসিনীর সঙ্গে কৃষ্ণমোহনের বিবাহ হয়। ঐ বৎসরই তিনি সোসাইটির পটলডাঙ্গা স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। তাঁর প্রথম পুস্তক 'দি পারসিকিউটেড' নামক ইংরাজী নাটক 1831 খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ঐ সময় হিন্দু কলেজের হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর শিক্ষায় ছাত্রগণ ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা ও দেশপ্রেমের এক নূতন চিন্তায় উদ্বেলিত হয় এবং ডিরোজিওর সভাপতিত্বে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়। কৃষ্ণমোহন ডিরোজিওর ছাত্র ছিলেন না, কিন্তু ডিরোজিওর প্রভাব তাঁর উপর পড়ে ও তিনি নব্য হিন্দুসংস্কারক দলে যোগ দেন। এই নব্যদল হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা ও খৃস্ট ধর্মের নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাতে থাকে। নব্যদলের অভিমত প্রচারের জন্য কৃষ্ণমোহন 1831 খৃস্টাব্দে 17ই মে 'এনকোয়ারার' নামে ইংরাজী সাপ্তাহিকী প্রকাশ করেন। প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন চালানোর জন্য রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ স্বভাবতই তাঁর উপর খাপ্পা হয়ে উঠে। এই সময় গোমাংস ভক্ষণ, হিন্দুগৃহে গোহাড় নিক্ষেপ প্রভৃতি অজুহাতে তাঁকে গৃহত্যাগ করতে হয় ও ইউরোপীয়ের বাড়ীতে বাসা ভাড়া করে থাকতে বাধ্য হন। 1831 খৃস্টাব্দে কৃষ্ণমোহন পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফের সঙ্গে পরিচিত হন ও ক্রমে ক্রমে খৃস্টধর্মে অনুরাগী হন। 1832 খৃস্টাব্দে 16ই অক্টোবর ডাফের গৃহে তিনি খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হন। এর ফলে পটলডাঙ্গা স্কুল থেকে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। অতঃপর কৃষ্ণমোহন চার্চ মিশনারী সোসাইটির মির্জাপুর স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হন। এরপর তিনি খৃস্টধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। 1837 খৃস্টাব্দে বিশপ্‌স কলেজের সংলগ্ন বেগম সমরুর গীর্জার পাদ্রী হন। হিন্দু কলেজের (বর্তমানে প্রেসিডেন্সী কলেজ) কাছে বড়লাট লর্ড অকল্যাণ্ডের হস্তক্ষেপে চার্চ স্থাপিত না হয়ে হেদুয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ক্রাইস্ট চার্চ স্থাপিত হয় 1839 খৃস্টাব্দের 27 শে সেপ্টেম্বর। কৃষ্ণমোহন ঐ চার্চের আচার্যপদে অভিষিক্ত হন। এখানে তাঁর বাংলায় প্রার্থনাসমূহ 1840 খৃষ্টাব্দে 'উপদেশ কথা' নামে প্রকাশিত হয়। তিনি কৃষ্ণনগরে বহু হিন্দুকে খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত করেন। তাঁরই সহায়তায় কবি মধুসূদন দত্ত 1843 খৃস্টাব্দে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হন।

কায়মনে খৃস্টধর্ম প্রচারে রত হলেও কৃষ্ণমোহন গত শতাব্দীর শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ, রাজনীতিতে বিশেষ প্রভাব রেখে গেছেন। ঐ সময় প্রায় সমস্ত কল্যাণমূলক সংস্থার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন 1843 খৃস্টাব্দের 20শে এপ্রিল জর্জ টমসনের সহায়তায় কলিকাতায় বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের সর্ববিধ উন্নতি সাধন। কৃষ্ণমোহন এই সোসাইটির একজন প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন। কৃষ্ণমোহন 1852 খৃস্টাব্দ থেকে শিবপুর বিশপ্‌স্ কলেজে প্রায় ষোল বছর অধ্যাপনার কাজ করেন। বেথুন সোসাইটি ও বঙ্গীয়

* সাহিত্য-সাধক চরিতমালা থেকে সংগৃহীত

সমাজ বিজ্ঞান সভার সহ-সভাপতি ছিলেন। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির ভাষাতত্ত্ব বিভাগে তিনি কৃত্তিত্বের সঙ্গে কাজ করে গেছেন। সোসাইটির শতবার্ষিকী গ্রন্থে কৃষ্ণমোহনের চারিটি প্রবন্ধের উল্লেখ আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় 1857 খৃস্টাব্দে। 1858 খৃস্টাব্দে কৃষ্ণমোহন সেনেটের ফেলো নির্বাচিত হন। কৃষ্ণমোহন দশটি ভাষা জানতেন। একারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা কাজে তিনি অপরিহার্য ছিলেন।

কৃষ্ণমোহন আদতে সাহিত্যসেবী বা সাহিত্যসাধক দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীকাল তিনি সাহিত্য-সাধন করে গেছেন। তাঁর উনিশ বৎসর বয়সের প্রথম বই 'দি পারসিকিউটেড' হিন্দু যুবকদের নামে উৎসর্গীকৃত। তাঁর দ্বিতীয় বই—'The Native Female Education' অর্থাৎ এদেশীয় স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে। কৃষ্ণমোহন স্ত্রী শিক্ষায় বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ছিল তাঁর আন্তরিক অনুরাগ। তিনি বিশ্বাস করতেন—বাংলা একদিন সব শিক্ষায় বাহন হবেই। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব কাটিয়ে বাংলা শিক্ষা প্রচারের জন্য 1844 খৃস্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ বঙ্গপ্রদেশে একশো একটি আদর্শ বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপনের আদেশ দেন। ঐ সময় পুস্তকের অভাব মোচনের জন্য 1845 খৃস্টাব্দে কৃষ্ণমোহন গ্রন্থমালা রচনায় মন দেন। এই গ্রন্থমালা সাহিত্য, ইতিহাস, গণিত, ভূগোল, বিজ্ঞান, জীবনী প্রভৃতির সন্নিবেশে সমৃদ্ধ। কৃষ্ণমোহন এর নাম দেন বিদ্যাকল্পদ্রুম। 1846 খৃস্টাব্দে এটি খণ্ড খণ্ড প্রকাশিত হয়। মোট তের খণ্ড প্রকাশিত হয়। আধুনিক বিশ্বকোষ, মহাকোষ প্রভৃতির এটি পথিকৃৎ। তিনি তৎকালীন বহু পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লেখক ছিলেন। তিনি 'হিন্দু ইউথ' ও 'সংবাদ সুধাংশু' নামে কাগজ প্রকাশ করেন। গভর্ণমেন্ট গেজেটের কিছুকাল সম্পাদক ছিলেন। কৃষ্ণমোহন ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষাতে বহু পুস্তক-পুস্তিকা প্রণয়ন ও সম্পাদন করে গেছেন। বহু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কৃষ্ণমোহনের 1885 খৃস্টাব্দের 11ই মে জীবনাবসান ঘটে।

রচনার নিদর্শন : বিবস্বানের রশ্মিতে পৃথিবী আলোকময়ী হইয়া স্বীয় মেরুদণ্ডের উপর এমন পরিমাণে ঘুরিতেছেন যে তৎসহকারে দিবারাত্রির নিয়ম সমাগম হইয়া থাকে এবং দিবাকরকে আবার এমন নিয়মে অবিরত প্রদক্ষিণ করিতেছেন যে তাহাতে সাম্বৎসরিক ঋতুভেদ উৎপন্ন হয়। এরূপ গতির পরিমাণ যেমন কৌশল সপ্রমাণ হয় তা বিবেচনা কর, সে কৌশল শুদ্ধ বুদ্ধ পরমাত্ম ব্যতীত কি অচেতন জড় পদার্থে সম্ভবে? অপর আমরা দিবাকরকে বারিতস্কর ও মেঘকে জলদ কহিয়া থাকি, ইহার তাৎপর্য দিবাকরের উত্তাপে পৃথিবীস্থ নদনদী সমুদ্রতড়াগাদির জল বাষ্পেতে পরিণত হইয়া আকাশমাঝে উড্ডীন হয়, সেই বাষ্প সংযোগে মেঘ উৎপন্ন হইলে পবন যখন তাহার ভার-বহনে অসমর্থ হয়েন তখন সেই বাষ্প সংহতি পুনশ্চ জলবিন্দু হইয়া ভূতলে পতিত হয়, ইহাকেই বৃষ্টি কহা হয়। যদি উত্তাপের লঘুতায় বৎসরের মধ্যে অত্যল্প মাত্র জল বাষ্পভাবে উড্ডীন হয় তবে সুতরাং মেঘের সঞ্চার ও বারি পতনও অত্যল্প হয়, যদি অধিক জল নভস্তলগত হয় তবে ভূতলও অধিক বর্ষা প্রাপ্ত হয়। অধিক বৃষ্টিকে আমরা অতিবৃষ্টি এবং অল্প বৃষ্টিকে অনাবৃষ্টি কহিয়া থাকি, উভয়ই আমাদের অনিষ্টকর অতিবৃষ্টি হইলে যেমন শস্যাদি পচিয়া যায়, অনাবৃষ্টি হইলে আবার তেমনি শস্যাদি শুষ্ক হইয়া যায়, তন্নিমিত্ত উভয়কেই আমরা ঈতি কহি, উপযুক্ত পরিমাণে বারি বর্ষণ হইলেই পৃথিবী নিরীতিভাব প্রাপ্ত হয়েন। এই নিরীতিভাব সামান্যতঃ সর্বকালে সর্বদেশেই হইয়া থাকে নচেৎ এতদিন পর্যন্ত ধরাতলস্থ প্রাণিবর্গ রক্ষা পাইত না। অতএব উত্তাপ এবং বায়ুর কেমন প্রতিনিয়ত গুণ পরিমাণ বিবেচনা কর। উত্তাপ এতাবৎ মাত্র জল গগন পথে আকর্ষণ করে যাহাতে সেই বাষ্পীভূত জল সংহতিতে মেঘ উৎপন্ন হইলে অস্মৎ প্রয়োজনানুযায়ী বৃষ্টি হইতে পারে, এবং পবনের এতাবৎ মাত্র ধারণের শক্তি আছে যে, আমাদের কুশলোপযোগি মেঘ সংহতি হইলেই বৃষ্টিপাত সম্ভবে। এইরূপে পর্যায়ক্রমে জলের ঊর্দ্ধোধঃ সঞ্চালন না হইলে সংসার সদ্যোবিনাশপ্রাপ্ত হইত, অতএব বৃষ্টি প্রকরণে কি সামান্য কৌশল লক্ষিত হয়? প্রাণি সমূহের অবয়ব এবং স্নিগ্ধোপত্তেজাদি পঞ্চভূত আবার এমত পরিমাণে সৃষ্ট হইয়াছে যে প্রজা মাত্রেই স্ব স্থানে সুখে কালহরণ করিতে পায়। মনুষ্য পশ্বাদি ভূচর পৃথিবীর আকর্ষণ বশতঃ ভূমিতলে স্থির থাকে এবং বায়ুর সঞ্চালনে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস করে, ইহাতে এমত প্রতিনিয়ম দেখা যায় যে কোন অংশে সে নিয়মের ব্যত্যয় হইলে প্রাণধারণ অসাধ্য হয়, আকর্ষণ শক্তির আধিক্য হইলে গমনাগমন অসাধ্য হইত, সকলকেই আলান বদ্ধ মতঙ্গের ন্যায় একস্থানে পড়িয়া থাকিতে হইত, আর সে শক্তির শৈথিল্য হইলে পবন তাহাকে কখন কোন স্থানে তৃণতুল্য হরণ করিয়া লইয়া যাইত তাহার গণনা করা যায় না। পবনের আবার বেগের তারতম্য হইলে জীবের প্রাণহানি হইত, কেননা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের হ্রাস বৃদ্ধি উভয়ই অনিষ্টকর হয়। খেচর জলচরের পক্ষেও ঐরূপ চিন্তনীয়, যে প্রাণি যে স্থানে থাকে তাহার তদনুযায়ি অবয়ব আহারাদির বিষয়েও ঐরূপ কৌশল, যাহার জঠরানল যে দ্রব্য সহজে পাক করিতে পারে তাহার তদনুযায়ি বুভুক্ষা এবং খাদ্য চর্ব্বণাদির উপযোগি দন্তাদি। এবম্ভূত কৌশল অচেতন প্রকৃতি হইতে সম্ভবে না তাহা নিঃসন্দেহে এক শুদ্ধ বুদ্ধ পরমাত্মার কার্য্য। (ষষ্ঠ সংবাদ, পৃঃ 230-3)

বিজ্ঞান প্রবন্ধ

বৈজিক তত্ত্ব ও সঞ্জীবচন্দ্র

নীরেন্দু হাজরা*

'বৈজিকতত্ত্ব'[1] সঞ্জীবচন্দ্রের গবেষণাধর্মী একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে তাঁর গভীর অধ্যয়নশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। সমকালীন যুগের বিজ্ঞানের প্রসার প্রবন্ধকারের কৌতূহলী মনকে আকর্ষণ করে। সেই সময় ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক হার্বার্ট স্পেন্সারের Principles of Sociology, VOL. I (1876) এবং VOL. II ও Date of Ethics (1879) বইগুলি প্রকাশিত হয়। ডাঃ মহেন্দ্র সরকারের 'ভারতীয় বিজ্ঞান সভা, এই সময়েই স্থাপিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'জ্ঞান' প্রবন্ধে কোঁৎ, কান্ট, মিল, হার্বার্ট স্পেন্সার প্রমুখ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের বিভিন্ন মতামতগুলি বঙ্গদর্শনে আলোচনা করেন। ভিক্টোরীয় যুগে চার্লস ডারুইন (C. Darwin)-এর বিখ্যাত বিবর্তন বাদ সমাজ জীবনে আলোড়ন তোলে। তাঁর 'The Origin of Species' যুগান্তকারী গ্রন্থ (1859)। প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক হার্বার্ট স্পেন্সার ডারুইনের বিজ্ঞান সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হন। ডারুইনের বিবর্তনবাদে নতুন চিন্তাধারার সূচনা লক্ষিত হয়। দেশ-বিদেশের সাহিত্যিক শিল্পী, বিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ ডারুইন ও হার্বার্ট স্পেন্সারের মতবাদে আত্মজিজ্ঞাসার নতুন সন্ধান পেয়েছিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্র প্রধানত ডারুইনের Variation of Animals এবং Harbert Spencer-এর principles Biology গ্রন্থ দুটি গভীর ভাবে অধ্যয়ন করেন এবং বৈজিক তত্ত্ব প্রবন্ধটি রচনা করেন। এই প্রসঙ্গে স্যার এফ. গাল্টন (Sir F. Galton)-এর Human faculty (1833) নামক জীববিদ্যা সংক্রান্ত প্রবন্ধটি অবশ্যই উল্লেখ্য। কারণ এই গ্রন্থে Eujencs অর্থাৎ সুপ্রজননবিদ্যা সম্পর্কিত বিষয়ের আলোচনা ইউরোপে স্যার. এফ. গাল্টনই প্রথম সূচনা করেছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্র ও তাঁর বৈজিক তত্ত্বে ভ্রূণতত্ত্ব ও সুপ্রজনন তত্ত্ব সংক্রান্ত বিষয়ের অবতারণা করে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ঊনিশ শতকের বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে 'বৈজিক তত্ত্ব' বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ হিসাবে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য।

প্রবন্ধকার তার সমস্ত প্রবন্ধকে মোট আটটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে আলোচনায় ব্রতী হয়েছেন। এই প্রবন্ধটি রচনার মূলে তাঁর দুটি উদ্দেশ্য লক্ষণীয়—এক, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগৎ থেকে বংশধারা, কুল ও গণের সম্বন্ধে বিচিত্র সংবাদ সংগ্রহ করে বাংলাদেশের কৌলিন্য ও জাতিভেদ প্রথাকে প্রজননবিদ্যার সাহায্যে ব্যাখ্যানের চেষ্টা, দুই—সন্তান তার জনক-জননীর দেহাকৃতির অধিকারী হয়—শুধুমাত্র পিতামাতার অবিকল দেহাকৃতি নয়—সেই সন্তান তার পূর্বপুরুষের ন্যায় হতে পারে কিংবা কিভাবে হয়, অথবা ভিন্ন বংশোদ্ভব কোন ব্যক্তির ন্যায় হতে পারে কিনা আলোচনা প্রসঙ্গে জাতি ও ব্যক্তিবিশেষে বৈজিক প্রবলতার কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। সমকালীন যুগের মানুষের উপকারার্থে তিনি সুপ্রজনন তত্ত্বটিকে অত্যন্ত বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অনুধাবন করেছিলেন।

প্রবন্ধের প্রথম পরিচ্ছেদে তিনি বৈজিক তত্ত্বের কয়েকটি দিক বিশ্লেষণ করেছেন। প্রথমতঃ, বৈজিক তত্ত্বের প্রথম কথা হল—সন্তানের গঠন ও প্রকৃতি বংশানুরূপ হয়। যেমন গো জাতিতে ঘোটক জন্মে না বা ঘোটক জাতিতে গো জন্মে না। দ্বিতীয়তঃ, সন্তানের গঠন জনক ও জননীর ন্যায় হয় তার ছয়টি লক্ষণ উল্লেখ করা হয়েছে। (1) অস্থি—"জনক বা জননীর যে অংশে অস্থি দীর্ঘ বা ক্ষুদ্র, লঘু বা গুরু, রিক্ত বা অতিরিক্ত থাকে সন্তানদেহের সেই অস্থির অবস্থা তদ্রূপ হয়। এই প্রসঙ্গে হার্বার্ট স্পেন্সারের বক্তব্য তিনি পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—"Some special modifications or organs caused by special changes in their functions may also be noted. That large hands are inherited by men and women, whose anecstors led laborious lives, and that men and women, whose descent unused for many generations have been from those unused to manual labour, commonly have small hands are established opinion[2]

1 'বৈজিক তত্ত্ব'[1] প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনে (পঞ্চমবর্ষ) 1284 বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ, পৌষ, চৈত্র এবং 1284 (ষষ্ঠ বর্ষ) বঙ্গাব্দের বৈশাখ ও শ্রাবণ সংখ্যায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'সঞ্জীবনীসুধা' থেকে জানা যায় যে এই তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধটি সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা।

2 The principles of Biology—11, p. 247—Herbert Spencer

* কুমীরমোড়া, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া

(2) কেশ। কেশ সম্বন্ধে জীবদেহের আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষণীয়। ডারউইন ও স্পেন্সারের উদ্ধৃতি দিয়ে তা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। (3) জনক বা জননীর ন্যায় সন্তানের বল মাংস, শিরা, হস্তাক্ষর, চালচলন, ভঙ্গী ও কণ্ঠস্বর সাধারণত দেখা যায়। প্রবন্ধকার ডারউইনের মন্তব্য 'বৈজিক তত্ত্বের' পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন "on what a curious combination of corporeal structure mental character and training hand-writing depends."[3]

(4) অভ্যাস, শিক্ষা, প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ব্যাপারগুলি পিতা-মাতা কর্তৃক প্রাপ্ত। তাই অনেক ক্ষেত্রে পৈত্রিক উপজীবিকা সন্তানের অতি সহজে শিক্ষা হয়। তার প্রধান কারণ বৈজিক। দ্বিতীয় সংসর্গ। Some of the best illustrations of functional heredity, are furnished by the mental characters of human races.' (5) সন্তানের আকৃতি-প্রকৃতি প্রধানত জনকের ন্যায় হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে আয়ু ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি ব্যাপারগুলি পিতা-মাতার ন্যায় হয়। (6) পিতামাতার অসুখবিসুখগুলি সন্তানের সঙ্গে লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত, শ্বাস, কাস, কর্ণ, মৃগীরোগ ও উন্মাদরোগ প্রভৃতি।

প্রথম পরিচ্ছেদে প্রবন্ধকার ডারুইন ও হার্বার্ট স্পেন্সারের মতামতগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে বৈজিক তত্ত্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞতা না থাকলে আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার উন্নতি সম্ভব নয়। তাই তার সুচিন্তিত বক্তব্য:

"জনকের ন্যায় পুত্র হয়, জননীর ন্যায় কন্যা হয় একথা বাঙ্গালায় সর্বত্র রাষ্ট্র। অনেক সময় সন্তানেরা কিয়দংশে মাতার ন্যায় হয়ে থাকে একথাও ভারতবর্ষে চিরপ্রসিদ্ধ। এক্ষণে আমরা এই সর্ব-সাধারণ পরিচিত কথার অনর্থক পুনরুক্তি করে পাঠকদিগের সময় নষ্ট করব না, বৈজিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যে নিয়মগুলি বাঙ্গালায় সচরাচর প্রচারিত নাই এক্ষণে তাই সংক্ষেপে বিবৃত করি এই আমাদের অভিপ্রায়।......

"বৈজিক তত্ত্ব অবলম্বন করলে বোধ হয় তাদের আকৃতি প্রকৃতির ইচ্ছানুরূপ কিয়দংশ পরিবর্তন করান যেতে পারে। ইউরোপ ও আমেরিকা খণ্ডে বৈজিক তত্ত্বের অনুশীলন হওয়া অবধি গৃহপালিত পশুদিগের মধ্যে নানা প্রকার পরিবর্তন সংসিদ্ধ হয়েছে। এক্ষণে দেখলে বোধহয় যেন মনুষ্যের প্রয়োজনানুসারে তা গঠন হচ্ছে।"

সঞ্জীবচন্দ্র যে ডারুইন ও হার্বার্ট স্পেন্সারের মতবাদে প্রভাবিত হয়েছিলেন, তা অনস্বীকার্য। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেও সঞ্জীবচন্দ্র ডারুইনের 'Variation of Animal & plants' থেকে প্রচুর পরিমাণে তথ্য সংগ্রহ করে তিনি তাঁর বক্তব্যকে জোরালো করে তুলেছেন: "পূর্বে বলা হয়েছে যে জনক জননীর ন্যায় সন্তান হয়ে থাকে; কিন্তু অনেক স্থলে তা না হয়ে পিতামহ বা মাতামহের ন্যায় হয়ে থাকে, আবার অনেক সময় প্রপিতামহ বা বৃদ্ধপ্রপিতামহ তদূর্ধ্ব কোন পুরুষের ন্যায় হয়ে থাকে।" আলোচ্য পরিচ্ছেদে প্রবন্ধকার পায়রা, বৃষ ও ছাগ প্রভৃতি প্রাণীর অবয়ব, আচার-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে মন্তব্য করেছেন:

আমাদের প্রত্যেকের শরীরে যে সকল চিহ্ন প্রকৃতি বা শক্তি এক্ষণে প্রত্যক্ষীভূত হয় তা ব্যতিত আরও শতশত প্রকৃতি বা শক্তি গুপ্ত রয়েছে। প্রত্যেক পূর্বপুরুষের শারীরিক ও মানসিক ব্যতিক্রম বা যথাক্রম বীজবহী হয়ে আমাদের শরীরে এসে অপ্রকাশ্য ভাবে রয়েছে, উপযুক্ত কারণ পেলেই তার কোন কোনটি প্রকাশ পাবে, নতুবা পূর্বমত অপ্রকাশ্যভাবে আমাদের শরীরে থেকে আবার যথারীতি বীজানুগামী হয়ে সন্তানে যাবে এবং সেই সঙ্গে আমাদের নিজের চিহ্নও নিয়ে যাবে।"

আলোচ্য পরিচ্ছেদে প্রাণী-জগতের সংকর বীজ প্রসঙ্গে মানব জাতির বর্ণসংকরের কারণ ও তার আচার-আচরণ সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং বিজাতীয় বংশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে— "The parents of all our domesticated animals are of course aboriginally wild in disposition."

তৃতীয় পরিচ্ছেদে, সন্তান আবার বংশের কারো মত না হয়ে একেবারে ভিন্ন বংশোদ্ভব লোকের ন্যায় হতে পারে, তার কারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিধবা-বিবাহ প্রচলন থাকলে এমন দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায় কিংবা গর্ভিনী যে মূর্তি ভাবনা করে, সন্তানের মূর্তি সেইরূপ হতে পারে। প্রবন্ধকার তা প্রমাণ করার জন্য কয়েকটি অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এখানে একটি উদাহরণ উল্লেখ করা হল:

"একজন যুবা একখানি ইংরেজি পট ক্রয় করেন। পটখানিতে একখানি সুন্দর শিশুর নিদ্রাভঙ্গ চিত্রিত ছিল। যুবা একদিন দেখলেন তাঁর স্ত্রী অতি আগ্রহের সহিত পটখানি একা দেখছেন এবং মধ্যে মধ্যে চিত্রিত শিশুকে আদর করছেন। স্বামীকে দেখে যুবতী অপ্রতিভ হলেন এবং হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন আমাদের কি এমন সুন্দর সন্তান হতে পারে? এই সময় তিনি গর্ভবতী ছিলেন। তাঁর স্বামী দেখলেন যে গর্ভবতী সর্বদাই সেই পটখানির নিকট দাঁড়িয়ে থাকেন। পরে যথাকালে তাঁর পুত্র জন্মিল: প্রায় ছয়মাস বয়সের সময় দেখা গেল যে সন্তানটির উদর ও বক্ষের গঠন পটের চিত্রিত শিশুর ন্যায় হচ্ছে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদে তিনি জীবজন্তু-মানুষের বৈজিক প্রবলতার কারণ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেছেন। এখানে লক্ষণীয় যে তাঁর

3 Variation of animal Vol. 1, page 419, Darwin.

বিদ্যাবত্তা কখনো বক্তব্যকে শুষ্ক করে তোলে নি বরং সরস ও সজীব মনের স্পর্শে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি বৈজিক তত্ত্বের দুরূহ বিষয়কে অতি সহজে পাঠকের কাছে পরিবেশন করতে পেরেছিলেন:

"জাতি বিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষে বীজের প্রবলতা থাকে। শৃগাল ও কুক্কুরের মধ্যে শৃগালের বৈজিক প্রবলতা অধিক; অশ্ব ও গর্দভের মধ্যে গর্দভের বৈজিক প্রবলতা অধিক। শৃগাল ও কুক্কুরের শাবক উৎপাদিত হতে শৃগালের ন্যায় শাবক হয়, কুক্কুরের ন্যায় একেবারে হয় না। অশ্ব ও গর্দভ সংযোগে যে শাবক জন্মে তা গর্দভের ন্যায়, অশ্বের ন্যায় হয় না। এই স্থলে বলতে হবে অশ্ব অপেক্ষা গর্দভের বৈজিক বল অধিক সেইজন্য শাবক গর্দভের ন্যায় হয়।"···

এই রূপ বৈজিক প্রবলতা কখন স্ত্রীর মধ্যে কখন পুরুষের মধ্যে দেখা যায়। যেখানে স্ত্রীর বৈজিক প্রবলতা থাকে সেখানে সন্তান জননীর মতো হয়, যে পুরুষের বৈজিক প্রবলতা থাকে সেখানে সন্তান জনকের মত হয়। এই জন্য কোন কোন লেখক বলেন যে, যে স্থলে স্ত্রীর বৈজিক প্রবলতা অধিক সে স্থলে হয় ত কন্যা-সন্তান জন্মে, আর যে স্থলে পুরুষের বৈজিক প্রবলতা অধিক সে স্থলে পুত্র অধিক জন্মে। ওয়াকার সাহেব লিখেছেন যে আইয়রল্যাণ্ড দেশে একজন সাহেব তিন বিবাহ করেন এবং সেই তিন স্ত্রী দ্বারা তাঁর মত সন্তান হয়েছিল এবং সবগুলিই পুত্র হয়েছিল।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদে প্রবন্ধকার পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গের কুলবীজক সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করে জ্ঞাতি-বিবাহের ভালমন্দের দুটি দিকই উন্মোচন করেছেন। বিলাতে পশু-ব্যবসায়ীরা সহোদর আর সহোদরার মধ্যে শাবক উৎপাদন করে থাকে, আবার কখনো পিতা ও কন্যার মধ্যে শাবক উৎপাদন করায়। এই প্রথাকে ইংরাজীতে interbreeding বা in-and-in breeding বলে। বিলাতের কোন গোমেষাদির বংশ যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল তা এই নিয়মের ফলে।

প্রসঙ্গত তিনি জ্ঞাতি বিবাহের কথা আলোচনা করেছেন। জ্ঞাতি বিবাহও একপ্রকার কুলবীজক। ইংরেজ ও মুসলমান সমাজে এই জ্ঞাতি বিবাহ প্রচলিত আছে। কিন্তু জ্ঞাতি বিবাহের খারাপ দিকগুলি সহজে লক্ষ্য করা যায় না। Darwin যথার্থই বলেছিলেন—"The evil results from close breeding are difficult to detect for they accumulate slowly." প্রবন্ধকার ডারুইনের বিজ্ঞানের সেই তত্ত্বকে অতি সহজ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন:

"পশুদিগের মধ্যে ব্যবসায়ীরা যেরূপ করে থাকে, সেইরূপ যদি কোন বংশে পুরুষানুক্রমে চলে আসে তা হলে জ্ঞাতি বিবাহের ফলাফল বুঝা যেতে পারে। শুনা যায় যে মিশর রাজ্যে রাজ-পরিবারের মধ্যে সহোদর সহোদরায় বিবাহ প্রচলিত হয়েছিল কিন্তু সে বংশ শীঘ্রই লোপ পেয়েছে।"

বাস্তবিক, ডারুইনের প্রজনন-বিজ্ঞানের জগতে প্রবন্ধকারের ছিল অবাধ যাতায়াত। তিনি ডারুইনের জীব-বিজ্ঞানের বিশেষ দিকটি জনসমক্ষে উপস্থিত করে মানবতাবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন। জ্ঞাতি বিবাহ সমাজ কল্যাণের পক্ষে সহায়ক নয়, বিখ্যাত বিজ্ঞানী তা' উপলব্ধি করেছিলেন:

"Manifest evil does not usually follow for pairing the nearest relations for two-three or even four generation but several causes interfere with our detecting the evil."

সপ্তম পরিচ্ছেদে সঞ্জীবচন্দ্র আমাদের দেশে জ্ঞাতি-বিবাহ কিরূপ ছিল তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে প্রয়াসী হন। জ্ঞাতিবিবাহ প্রসঙ্গে তিনি গোত্র, কৌলিন্য প্রথার প্রচলন সম্পর্কিত বিষয়গুলি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করেছেন। বৈজিক তত্ত্বের দুরবগাহ গভীরতা সঞ্জীবচন্দ্রের হাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়েছে। পিতৃবীজ ও মাতৃবীজ সংক্রান্ত আলোচনায় তাঁর বক্তব্য প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য:

"শাস্ত্রকারদিগের বিশ্বাস ছিল যে পিতাই জনক, সন্তান কেবল পিতা হতে জন্মে, মাতা ক্ষেত্র মাত্র। এইজন্য পিতৃগোত্রে বিবাহ নিষেধ করে গিয়েছেন কিন্তু এক্ষণে প্রতিপন্ন হয়েছে যে জন্ম সম্বন্ধে মাতাই প্রধানা, পিতৃবীজ কেবল উত্তেজক মাত্র।

বিজ্ঞানের এই সত্যকে বিশ্ববিখ্যাত ডারুইন তাঁর গ্রন্থে বিশ্লেষণ করেছিলেন, সঞ্জীবচন্দ্র সেই তত্ত্বকে মাতৃভাষার মাধ্যম বাঙালী পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। পিতৃবীজ ও মাতৃবীজ প্রসঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে খাঁচায় বন্দী পাখি, মুরগী, হংসী গর্ভে পুরুষ সংশ্রব ছাড়া অণ্ড বা শাবক জন্মায়, তা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাঁর প্রদত্ত দৃষ্টান্ত থেকে একথা সহজেই প্রতিয়মান হয় যে পিতৃগোত্র অপেক্ষা মাতৃগোত্র অনেক নিকট। আমাদের সমাজে পিতৃগোত্র বিবাহ নিষিদ্ধ থাকলেও মাতৃগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ না থাকায় প্রকারান্তরে জ্ঞাতি-বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। কথা প্রসঙ্গে সঞ্জীবচন্দ্র কুলীনসমাজের বংশধারা বিশ্লেষণ করে কুলীনসমাজের খারাপ দিকগুলি বিশেষণ করে দেখিয়েছেন। কুলীনসমাজে পিতৃবংশ ছাড়া অন্য যে কোন বংশে বিবাহ দেবার প্রথা প্রচলন ছিল। এমনকি মাতৃগোত্রে বিবাহ হতে কোন বাধা ছিল না। প্রবন্ধকার এই রীতিকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেন নি। তাঁর বক্তব্য ডারুইনের মতবাদে অনুশীলিত: "বিজ্ঞানবিদেরা বলেন যে, যে স্থলে কুল বীজক রীতি পুরুষানুক্রমে চলে আসে সেখানে কখন কখন নূতন রক্তসংযোগ করাতে পারলে বংশ রক্ষা হয়। [illegible]

বংশ একেবারে লোপ পায় নাই।”

যাই হোক, সঞ্জীবচন্দ্র বল্লাল সেনের কৌলিন্য প্রথাকে বৈজিক তত্ত্বের অনুযায়ী বলে মনে করেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদে প্রবন্ধকার বৈজিক তত্ত্বানুসারে সন্তানের সঙ্গে জনকজননীর বৈসাদৃশ্যের দিকগুলি বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি মনে করেন:

“জনক-জননীর ন্যায় সন্তান এটি নৈসর্গিক নিয়ম আবার জনক-জননীর হতে সন্তানের যে কিঞ্চিত বৈসাদৃশ্য থাকে এটিও আর একটি নৈসর্গিক নিয়ম।”

এই বৈসাদৃশ্যের নানা কারণ তিনি উল্লেখ করেছেন ডারুইনের তত্ত্ব অনুযায়ী। যেমন, ভোগজনিত, ক্রিয়াজনিত, খাদ্যগত ও অবস্থাগত বৈসাদৃশ্যের কারণগুলি তিনি নানা তথ্য-উদ্ধৃত করে বর্ণনা করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যার মধ্যে কোন আড়ষ্টতা লক্ষ্য করা যাবে না। তাঁর বক্তব্য তথ্যসমৃদ্ধ কিন্তু রসগ্রাহী ও সুস্পষ্ট:

“মনুষ্যমধ্যে সূক্ষ্ম বৈসাদৃশ্য আমরা অনেক বুঝতে পারি সত্য, কিন্তু সকলগুলি পারি না। জন্মভূমিগত একরূপ বৈসাদৃশ্য হয় আমরা তা একেবারে দেখতে পাই না। কিন্তু একরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট আছে তারা এই বৈসাদৃশ্য বুঝতে পারে। উষ্ণ প্রদেশ জাত ব্যক্তিকে তারা দংশন করে না, কিন্তু শীতপ্রদেশ জাত ব্যক্তির অনাবৃত দেহ পেলে একেবারে অস্থির করে দেয়। পিতা যদি শীত-প্রদেশে জন্মগ্রহণ করে থাকেন আর পুত্রের বয়স যদি উষ্ণ দেশে হয়, তা হলে পিতাপুত্রে এই এক প্রকার বৈসাদৃশ্য জন্মে। এরূপ বৈসাদৃশ্য কতই আছে।”
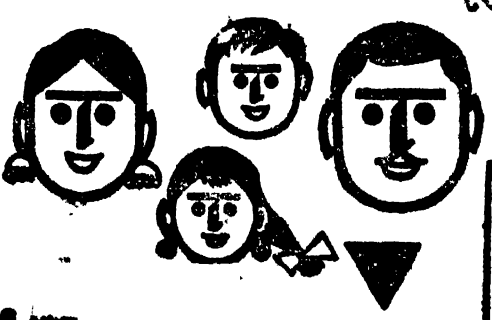
‘বৈজিক তত্ত্ব’ প্রসঙ্গে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

“সঞ্জীবচন্দ্র উদ্ভিদজগৎ ও প্রাণীজগৎ থেকে বংশধারা, কুল ও গণের সম্বন্ধে অদ্ভুত সংবাদ উদ্ধার করেন। কথা প্রসঙ্গেই তিনি বাংলাদেশের কৌলিন্য প্রথা এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষের জাতি ও শ্রেণীভেদকে প্রজননবিদ্যার সাহায্যে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন। এজাতীয় বৈজ্ঞানিক ও সমাজ বিবর্তনমূলক কোন মৌলিক গ্রন্থ অদ্যাপি রচিত হয় নি।”

বস্তুত, মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার পথকেই সঞ্জীবচন্দ্র প্রথম প্রশস্ত করেছিলেন। তার আগে বাংলাভাষায় যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচিত হয় নি, এমন কথা নয়। কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্রের গভীরাশ্রয়ী মন বিজ্ঞানের সত্যকে কখনো অস্বীকার করে নি বরং তিনি সহজ ভাবেই বৈজিক তত্ত্বের গভীর কথা বলেছেন।

কণাত্বরণের ইতিকথা

সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র*

বর্তমান শতাব্দীর আদিতে তেজস্ক্রিয়ার আবিষ্কার থেকে পদার্থ সম্পর্কে আমাদের ধারণার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ তৈরিতে দরকার হয় বেগবান আহিত কণার—যা পদার্থের নিউক্লিয়াসে ঢুকে তাকে তেজস্ক্রিয় করতে পারে। ডিরাক অ্যান্টিইলেকট্রন অথবা পজিট্রন এমন কি অ্যান্টিপ্রোটনের অস্তিত্ব ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। প্রোটনের ভর ইলেকট্রনের চেয়ে প্রায় 1836 গুণ ভারী, তাই পজিট্রন তৈরিতে যে শক্তি প্রয়োজন তার অন্তত 1836 গুণ শক্তি না হলে অ্যান্টিপ্রোটন তৈরি সম্ভব নয়। তাই যথেষ্ট শক্তিশালী কণাত্বরক তৈরী না হওয়া পর্যন্ত অ্যান্টি-প্রোটন আবিষ্কার সম্ভব হয় নি।

1928 খৃস্টাব্দে কক্রফট ও ওয়ালটন 400 হাজার ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তিতে ত্বরণের এক সাদাসিধে যন্ত্র তৈরি করেন। এক ইলেকট্রন ভোল্ট হল—এক ইলেকট্রন ভোল্ট বিভবে একটি ইলেকট্রনের শক্তি যতটুকু বাড়ে। কক্রফট ওয়ালটনের মেসিনে লিথিয়াম নিউক্লিয়াস ভাঙা সম্ভব হল। এজন্য 1951 খৃস্টাব্দে তাঁদের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে ভ্যান ডি গ্রাফ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক জেনারেটর নামে এক ধরণের কণাত্বরণ যন্ত্রের আবিষ্কার করেন, যা দিয়ে 8 মিলিয়ান ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তির প্রোটন পাওয়া গেল।

1931 খৃস্টাব্দে রেখাকার ত্বরণযন্ত্রের আবিষ্কার হল। এতে কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত একটি রেখাকার নলে ত্বরণযোগ্য কণা চালিত হয়। পরবর্তী বিদ্যুৎ ক্ষেত্র এই কণাগুলিকে গতিশীল করে—আর এই ক্ষেত্র এমনভাবে সাজানো যে পরবর্তী প্রত্যেক বিভক্ত খণ্ডে এই ক্ষেত্র বাড়তি ধাক্কা দেয় ফলে কণার গতি বাড়ে। পর পর খণ্ডগুলির দৈর্ঘ্য ক্রমশ বেশী রাখা হয় যাতে এক খণ্ড থেকে আরেক খণ্ডে কণাগুলি ঢুকবার মুখে বাড়তি শক্তি পেতে পারে।

এর চেয়ে ভাল ও উন্নতমানের যন্ত্র হল সাইক্লোট্রন। লরেন্স এর আবিষ্কর্তা। এতে কণাগুলি বৃত্তপথে ঘোরে। চুম্বকের ক্ষেত্রে এরকম বৃত্তপথে আহিত কণা চলে। আধাবৃত্ত শেষ হলে যখন পরিবর্তী বিদ্যুৎপ্রবাহ কণাগুলিকে ধাক্কা দেয় তখন তাদের গতিবেগ বাড়ে ও বৃহত্তর ব্যাসের বৃত্তে চালিত হয়। 1939 খৃস্টাব্দে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ 20 মিইভো: শক্তির প্রোটন পাওয়ার মত সাইক্লোট্রন তৈরি হয়। লরেন্স এই বছরই তাঁর আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পান।

সাইক্লোট্রনে 20 মিইভো থেকে শক্তি বাড়াতে না পারার কারণ হল আপেক্ষিকতত্ত্ব অনুযায়ী এরকম গতিবেগে ভর আর নিত্য থাকে না বরং বাড়ে। আর এই বেড়ে চলা ভর ক্রমশ বিদ্যুৎ তরঙ্গের দশা থেকে এমন পিছিয়ে বাড়তে থাকে যে ত্বরণ সম্ভব হয় না। ভেক্‌সলার ও ম্যাক্‌মিলান বিদ্যুৎপ্রবাহ ও বাড়তি ভরের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে সিনক্রোসাইক্লোট্রন যন্ত্রের আবিষ্কার করেন। এতে 800 মিইভো শক্তিতে প্রোটন ত্বরণ সম্ভব হল।

ইলেকট্রন ত্বরণের সমস্যা অবশ্য আলাদা। তার কারণ নিউক্লিয়াস ভাঙতে যদি ইলেকট্রন প্রয়োগ করতে হয় তবে তার শক্তি প্রোটন থেকে অনেক বেশী হতে হবে কারণ তার ভর অনেক কম। সাইক্লোট্রন দিয়ে ইলেকট্রন ত্বরণ করা যায় না কারণ এতে ভর এত বাড়ে যে ত্বরণই সম্ভব হয় না। তাই 1940 খৃস্টাব্দে কার্স্ট এমন একটি যন্ত্র আবিষ্কার করলেন যাতে বাড়তি ভরের সঙ্গে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রও বেড়ে চলে। এতে ইলেকট্রন একই ব্যাসের বৃত্তে ঘোরে—এর নাম দেওয়া হল বিটাট্রন - যেহেতু তেজস্ক্রিয়ার বিটা হল ইলেকট্রন। বিটাট্রন 340 মিইভো পর্যন্ত শক্তির ইলেকট্রন উৎপাদন করে।

1946 খৃস্টাব্দে গাওয়ার্ড ও বার্নেস তৈরি করেন ইলেকট্রন সিনক্রোট্রন। এতে ইলেকট্রন 1000 মিইভো পর্যন্ত ত্বরণ করা যায়। আরও উপরে ওঠা যায় না কারণ ইলেকট্রনের গতিবেগ বৃত্তপথে যত বাড়ে ততই তার শক্তির ব্যয় হয়—এই ক্রিয়াটি ব্রেমস্ট্রলহং নামে অভিহিত। শব্দটি জার্মানভাষা থেকে নেওয়া—অর্থ হল বিনাশী বিকিরণ। ইলেকট্রন সিনক্রোট্রন থেকে শিক্ষা নিয়ে 1947 খৃস্টাব্দে বিজ্ঞানীরা তৈরি করলেন প্রোটন সিনক্রোট্রন—এতে একই বৃত্তপথে প্রোটন ত্বরণ সম্ভব হয়। কুণ্ডলী আকারে ক্রমশ বেড়ে চলা বৃত্তের ত্বরণ যন্ত্র থেকে এর সুবিধা হল চুম্বকের ওজন এতে অনেক কম হলে চলে। বৃত্তচালিত প্রোটন ইলেকট্রনের মত এত দ্রুত ব্রেমস্ট্রলহঙে শক্তি ক্ষয় করে না। ফলে এরকম যন্ত্রে 1000 মিইভো থেকে বেশী শক্তির প্রোটন তৈরি সম্ভব হল। 1952 খৃস্টাব্দে ব্রুকহাভেনে এরকম যন্ত্র কসমোট্রন তৈরি হল যা 2 থেকে 3 গিগাই: ভো: শক্তির প্রোটন উৎপন্ন করে। (1 গিগা=1000 মিলিয়ান)। দু-বছর পরে ক্যালিফোর্নিয়ায় তৈরি হল আরো বড় যন্ত্র বিভাট্রন যাতে 5 থেকে 6 গি ই ভো প্রোটন পাওয়া গেল। সোভিয়েট রাশিয়ার কেভোট্রনে 10

* সাহা ইনষ্টিটিউট, কলিকাতা-700009

গি ই ভো পর্যন্ত প্রোটন তৈরি করা গেল।

আধুনিক স্ট্রংকোকাসিং সিনক্রোট্রনের কাছে উপরের এসব যন্ত্রও তুচ্ছ মনে হবে। বিভাট্রন শ্রেণীর ত্বরণ যন্ত্রে আহিত কণাগুলি কক্ষের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে নষ্ট হতে পারে কিন্তু নতুন এসব যন্ত্রে পর পর পরিবর্তী চুম্বক ক্ষেত্র দিয়ে কণাস্রোত খুব সরু প্রবাহে চালিত করা হয় যাতে দেয়ালে ধাক্কা না খায়। এতে চুম্বকের ওজনও কম লাগে। এরকম যন্ত্রে 50 গুণ বাড়তি শক্তির জন্য বিভাট্রন থেকে মাত্র দু-গুণ ওজনের চুম্বক প্রয়োজন হয়।

1959 খৃস্টাব্দে সার্ন (CERN—European Committee For Nuclear Research) 24 গি ই ভো-এর স্ট্রংকোকাসিং সিনক্রোট্রন তৈরি করেন। ব্রুকহাভেনে তৈরি হল 30 গি ই ভো আর রাশিয়ায় 70 গিইভো। সার্ন বর্তমান 270 গি ই ভো-এর ত্বরণ যন্ত্র তৈরি করেছে কেমিল্যাবে, 2000 গি ই ভো যন্ত্র নির্মীয়মান।

ত্বরণযন্ত্রে আর একটা নূতন পদক্ষেপ হল যুগল ত্বরণ যন্ত্রের ব্যবহার। এতে দুটি ত্বরণ যন্ত্রের কণা মুখোমুখি সংঘর্ষে আসতে পারে। স্থিতিশীল লক্ষ্য বস্তু থেকে এতে কণার শক্তি চতুর্গুণ বেড়ে যায়। আবার যদি এরকম একটি ত্বরণযন্ত্রে পজিট্রন ও ইলেকট্রন অথবা প্রোটন-অ্যান্টিপ্রোটন পরস্পরের উল্টোদিক থেকে সংঘর্ষে আসে তাদের বিপরীত আধানের জন্য একই চুম্বকে কাজ চলে। সার্নের প্রোটন অ্যান্টিপ্রোটন সংঘাতকারী ত্বরণযন্ত্রে 540 গি ই ভো শক্তি দিতে পারে। এদের বলা হয় সুপার সিনক্রোট্রন। সাইক্লোট্রন থেকে সুপার সিনক্রোট্রন বিজ্ঞান জগতে যেন যাদুকরের প্রদীপ। আলাদীনের মত বিজ্ঞানীরা যা চান এ সব ত্বরণ যন্ত্র থেকে তা পেতে পারেন।

বিভাট্রন তৈরি হওয়ার পর আবিষ্কৃত হল অ্যান্টিপ্রোটন। 1955 খৃস্টাব্দে চেম্বারলেন ও সেগ্রে 6·2 গি ই ভো প্রোটন দিয়ে তামার সঙ্গে বিক্রিয়ায় অন্তত পেলেন ষাটটি অ্যান্টিপ্রোটন। 1959 খৃস্টাব্দে তাঁরা এই আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পান। এই আবিষ্কার থেকে বিপরীত পদার্থের ধারণা প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

সিনক্রোট্রন যেন মেসন তৈরির কারখানা—যা দিয়ে বহু মৌলিক আবিষ্কারই সম্ভব হয়েছে। এই সব কণা পদার্থ ও শক্তি সম্পর্কীয় প্রচলিত ধ্যানধারণার অনেক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। কণা পদার্থবিজ্ঞান এখন উচ্চশক্তি পদার্থবিজ্ঞান হিসেবেও অভিহিত হয় কারণ উচ্চশক্তি কণার সংঘাতে অজানা সব কণা ধরা পড়ে।

অধুনা নভোবিজ্ঞান ও কণাতত্ত্বের সমন্বয় সাধনের যে চেষ্টা চলেছে তাতে ত্বরণযন্ত্রের ভূমিকা আছে।

এমন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে এক বিশাল বিস্ফোরণ থেকে বিশ্বের সৃষ্টি। সৃষ্টির আদিতে চারটি প্রাকৃতিক বল যথা—মহাকর্ষ, তীব্র নিউক্লিয় বল, বীটাক্ষয়ের ক্ষীণবল ও তড়িচ্চুম্বকীয় বল ছিল একাকার। কোন এক সময় প্রথমে মহাকর্ষ ভিন্ন হল পরে তীব্র বল। সৃষ্টির 10^{-12} সেকেণ্ডের পর তড়িচ্চুম্বকীয় ও ক্ষীণবল মিলে ছিল ইলেকট্রোউইক বল। গ্ল্যাসো, সালাম, ভিনবার্গ প্রমাণ করেন যে এই বলের অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজন বোসন কণা পজিটিভ ও নেগেটিভ W এবং উদাসীন Z। 1979 খৃস্টাব্দে এই তত্ত্বের জন্য যখন এঁদের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়, তখন একজন পরীক্ষাবিদ্ বিজ্ঞানী পরিহাস করে বলেছিলেন যে Z ও W কণা যদি আবিষ্কৃত না হয় তবে কি এঁরা পুরস্কার ফিরিয়ে দেবেন? কিন্তু এই পরিহাসকে নস্যাৎ করে 1983 খৃস্টাব্দে সার্নের সুপার সিনক্রোট্রন 540 গি ই ভো যন্ত্রে $W\pm$ ও Z° ধরা পড়েছে। তাদের ভর তত্ত্বের সঙ্গে প্রায় মিলে গেছে। এই পরীক্ষার জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন মির ও রুবিয়া।

ফের্মিল্যাবের 2000 জি ই ভো যন্ত্র তৈরি হলে উচ্চতম শক্তি বিজ্ঞানীদের করায়ত্ত হবে—যা দিয়ে হয়ত এমন সব অজানাকে জানা যাবে যা আজ মানুষের কল্পনায়ও আসে না।

ঘুম না এলে

অমিত চক্রবর্তী*

কথায় বলে—সুখী মানুষেরা নিশ্চিন্তে ঘুমোয়। প্রতি রাতে ঘুমের বড়ি গলার মধ্যে চালান করে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করতে হয় না তাদের। শারীরিক বা মানসিক, যে কোনও কারণেই হোক—বিছানায় শুলেই ঘুম যাদের চোখে ধরা দেয় না তাদের একটা সুখবর জানাই। সম্প্রতি আমেরিকার হারভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের জন প্যাপেন হাইমার এবং তাঁর সহকর্মীরা দীর্ঘ দশ বছর গবেষণার পর, মানুষের শরীর থেকে 'Factor-S' নামে এক বিশেষ ধরনের প্রোটিনকে আলাদা করতে পেরেছেন। এই বিশেষ প্রোটিনটি আসলে তৈরি করে একধরনের জীবাণু—মানুষের অন্ত্রের মধ্যে যাদের বাস। আমাদের মস্তিষ্কের যে অংশ ঘুম নিয়ন্ত্রণ করে তার কাজকর্মের ব্যাপারে ঐ রাসায়নিকটির যে ভূমিকা রয়েছে তা অবশ্য আগেই প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং কেল্লা ফতে! হাতের কাছে 'Factor-S' মজুত থাকলেই ঘুমের জন্য আর চিন্তা নেই।

'ঘুম' নিয়ে বহু প্রশ্ন আছে যার সদুত্তর এখনও বিজ্ঞানীদের অজানা। তবে ঘুমের সময় শরীরে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হয় তার কিছু কিছু অবশ্য ইতিমধ্যেই জানতে পারা গেছে। যেমন, ঘুমের সময় প্রতি মিনিটে আমাদের হৃদস্পন্দন 75 থেকে কমে 60-তে গিয়ে দাঁড়ায়। শ্বাসক্রিয়া এবং শরীরের তাপও খানিকটা কমে। তাছাড়া ঘুমের সময় ঘর্মগ্রন্থিগুলি বেশী সক্রিয় হয়ে ওঠার ফলে ঘাম হয় বেশী। এই সময় হৃদপিণ্ড আর রক্ত-চলাচল ব্যবস্থাও খানিকটা বিশ্রাম পায়। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন—যারা কম ঘুমোন তারা প্রায়ই নানারকম শারীরিক উপসর্গে ভোগেন। 'ঠাণ্ডা লাগা' হলো এইসব উপসর্গের অন্যতম প্রধান।

আমাদের শরীরের পক্ষে কতটা ঘুম নিদেনপক্ষে প্রয়োজন—তা নিয়ে মতভেদ আছে বিজ্ঞানীদের মধ্যে। অনেকে বলেন—যে কোনও পূর্ণবয়স্ক মানুষেরই প্রতিদিন গড়ে 7 থেকে 8 ঘণ্টা ঘুমনো দরকার। না হলে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, দিনের বেলা কাজ করার সময় তিনি অবসাদে ভোগেন। আবার অ্যালট অসলার নামে এক বিজ্ঞানীর মতে—দিনে রাতে 4 ঘণ্টার ঘুমই নাকি যথেষ্ট। ভদ্রলোক নিজেই আবার ভারি অদ্ভুত ভাবে ঘুমতেন। দিনের বেলায় কাজের মধ্যে যখনই তিনি একটু ক্লান্তি বোধ করতেন, অমনি 5 মিনিট ঘুমিয়ে নিতেন।

আমাদের ঠিক যতটা ঘুম প্রয়োজন ততটা কি সত্যিই আমরা ঘুমোই? বোধ হয় না। একবার আমেরিকায় 1122 জন ছাত্রের উপর সমীক্ষা চালিয়ে দেয়া গেলো—ওদের প্রতি 3 জনের 1 জনই ঘুম থেকে উঠে ক্লান্তি বোধ করে। অর্থাৎ ওদের প্রয়োজনীয় ঘুম হয় না।

রাত্রিবেলা ঠিকমতো ঘুম না হলে শারীরিক উপসর্গের পাশাপাশি কিছু কিছু মানসিক গণ্ডগোলও দেখা দেয়। যেমন, মেজাজ খিট্‌খিটে হয়ে ওঠে, 'অলীক' সব ভাবনা মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে—ইংরেজীতে যাকে বলে 'হ্যালুসিনেশন'। ডাক্তাররা মানসিক রোগীদের প্রথমেই তাই ভাল করে ঘুমের নির্দেশ দেন। ফিলিপ টিলার নামে এক ডাক্তার একবার 60 বছর এবং তার চেয়ে বেশী বয়সের বৃদ্ধদের নিয়ে এক পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। তিনি দেখেছিলেন—ঐসব বৃদ্ধদের মধ্যে যাঁরাই রাতে 7 ঘণ্টার কম ঘুমোন, তাঁরা সবাই একধরনের অস্বস্তির কথা বলেন। ডাক্তার টিলার তাঁদের রাতে 10 ঘণ্টা ঘুমনোর পরামর্শ দিলেন এবং দিনের বেলাতেও নির্জন ঘরে 1 ঘণ্টা করে ঘুমতে বললেন। যে সব বৃদ্ধরা ঐ উপদেশ মেনে চললেন তাঁদের যাবতীয় অস্বস্তি দূর হয়ে গেলো কিছুদিনের মধ্যে।

আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটির বিজ্ঞানীদের ধারণা—ঘুমের ধরনধারণের সঙ্গে মৃত্যুরও একটা সম্পর্ক আছে। ওঁরা দেখেছেন—বয়স যাঁদের 65-র বেশী, হয় তাঁদের ঘুম খুব কম, অর্থাৎ দিনে 5 ঘণ্টার কম অথবা ঘুম খুব বেশী, অর্থাৎ দিনে 9 ঘণ্টারও বেশী। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হলো, ঘুম যাঁদের স্বাভাবিক অথবা স্বাভাবিকের চেয়ে কম তাঁদের তুলনায় বেশী সময় ধরে ঘুমোন যাঁরা তাঁদের মধ্যে মৃত্যুহার শতকরা অন্ততঃ ৪০ ভাগ বেশী। এর বৈজ্ঞানিক কারণ এখনও অজ্ঞাত।

বিজ্ঞানীরা বলেন, ঘুমের সময় আমাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাপারটারও খানিকটা হেরফের হয়। ঘুমনোর সময় প্রায়ই স্বাস্থ্যবান মানুষদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস কয়েক সেকেণ্ডের জন্য বন্ধ থাকে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা—এই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার ব্যাপারটা আবার পুরুষদেরই একচেটিয়া। অনেকের ধারণা—মহিলাদের তুলনায় পুরুষরা যে অনেক বেশী সংখ্যায় হৃদরোগে আক্রান্ত হন—এটাই হয়তো তার একটা কারণ। আমেরিকার ফ্লোরিডায় কয়েকজন বিজ্ঞানী 30 জন পুরুষ 19 জন মহিলার উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন—পুরুষদের 20 জনের ঘুমের সময় যেখানে 264 বার অনিয়মিত শ্বাসপ্রশ্বাসের ঘটনা ঘটে, সেখানে মহিলাদের 3 জনের ক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছিলো এবং তাও সব মিলিয়ে মাত্র 9 বার।

ঘুমের মধ্যে 'নাক ডাকা'র ব্যাপারে কিছু ঘটনাও ঘটে। ঠিক

---

*আকাশবাণী, কলিকাতা-700001

উল্টো। পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের, বিশেষ করে বয়স্ক মহিলাদেরই নাক ডাকে বেশী। তবে হ্যাঁ, বুড়ো মানুষদের মধ্যে 'নাক ডাকা'টা হঠাৎ করে খুব বেড়ে যায় তবে ধরে নিতে হবে—মানুষটি শীঘ্রই উচু—রক্তচাপ অথবা হৃদরোগে ভুগবেন

যাই হোক, 'Factor-S'-এর যে প্রসঙ্গ টেনে শুরু করেছিলাম, তাতেই আবার ফিরে আসি। প্রশ্ন হলো—বাজারে যখন হরেক রকমের ঘুমের বড়ি চালু রয়েছে এবং ঘুম আনার ব্যাপারে সেগুলো যখন ভালই কাজ করছে, তখন আবার 'Factor-S' নিয়ে গবেষণা কেন? এটা ঠিকই—অনিদ্রা থেকে মুক্তি পেতে বারবিচুরেটের ব্যবহার চলে আসছে বহুদিন ধরে। ইদানীং কালে আমরা যে সব ঘুমের বড়ি খাই তাতে অবশ্য থাকে 'ক্লোরডায়াহিপক্সাইড, 'ডায়াহিপাম' ইত্যাদি রাসায়নিক। এইসব ঘুমের বড়ি তাৎক্ষণিক ভাবে উপকার দিলেও এগুলি নিয়মিত ভাবে খেয়ে গেলে হাজার রকমের শারীরিক আর মানসিক উপসর্গ দেখা দেয়। যেমন বেশী মাত্রায় এইসব ওযুধ যাদের শরীরে ঢোকে—দেখা গেছে, তারা রক্তচাপের গণ্ডগোল আর কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগেন। তাছাড়া, কোনও ব্যাপারে 'মনোযোগী হওয়া'র ক্ষমতাও হ্রাস পায় তাদের মধ্যে। দেখা গেছে—যে সব মানুষ ঘুমের বড়ি খেয়ে ঘুমোতে অভ্যস্ত, তাঁরা যখন বইপত্র পড়েন—তখন বই-এর এক লাইন থেকে অন্য লাইনে চোখে নিয়ে আসতে তারা সময় নেন অন্যদের তুলনায় অনেক বেশী এবং পড়ার পর সেগুলি মনেও রাখতে পারেন কম। তাছাড়া এদের মধ্যে মৃত্যুর হার সাধারণ মানুষের তুলনায় অন্ততঃ দেড়গুণ বেশী।

সবচেয়ে বড় কথা হলো—ঘুমের বড়ি একবার খেতে শুরু করলে ক্রমে তা মারাত্মক নেশায় দাঁড়িয়ে যায়। সেই নেশা থেকে মুক্তি পাওয়াটা তখন ভারি ঝঞ্ঝাটে ব্যাপার। এ এমনই নেশা—যা হুট্ করে বন্ধ করে দিলে—মানসিক উদ্বেগ, মাথা যন্ত্রণা, দুর্বলতা, বমি বমি ভাব, রক্তচাপের গণ্ডগোল ইত্যাদি নানাধরণের উপসর্গ দেখা দেয়। ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে আস্তে আস্তে নেশা ছাড়াটাই সেক্ষেত্রে বুদ্ধিমানের কাজ।

মূলতঃ এইসব কারণেই বারবিচুরেট বা অন্যান্য রাসায়নিকের বদলে আমাদের শরীরের নিজস্ব প্রোটিন—যা স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের চোখে ঘুম এনে দেয় তার সাহায্য নেওয়ার কথাটা ভেবেছেন বিজ্ঞানীরা। জন প্যাপেন হাইমার-এর সাফল্যের কথা গোড়াতেই বলেছি; 60-এর দশকের শেষের দিকে—দীর্ঘসময় ধরে জাগিয়ে রাখা ছাগলের Spinal Fluid বা সুষুম্নারস অন্য জন্তুর শরীরে চালান করে তাদের ঘুম পাড়াতে পেরেছিলেন তিনি। গত কয়েক বছরে মানুষের শরীরে বেশ কয়েক ধরণের প্রোটিনের সন্ধান মিলেছে, যার সাহায্যে অল্পসময়ের জন্য হলেও মানুষকে ঘুম পাড়ানো যায়। 'Factor-S' এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন। অনায়াসেই এখন আশা করা যায়—অল্পদিনের মধ্যেই অনিদ্রারোগীদের হাতে এসে পৌঁছবে ঐ জিনিষটি—যা তাদের দু'চোখে দীর্ঘস্থায়ী ঘুম এনে দেবে, কোনও রকম পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ছাড়াই।

অপরাধী সৃষ্টির মৌল কারণ

পঞ্চানন ঘোষাল*

অপরাধ-বিজ্ঞানের তথা ক্রিমিনোলজীর কয়েকটি দিকে আছে যথা সোসিয়াল, সাইকোলজিক্যাল, ইকোনমিক্যাল, স্ট্যাটিস-টিক্যাল, হিস্টোরিক্যাল, লিটেরারী, ফরেনসিক, ইঞ্জিনিয়ারিং—এনভায়রনমেণ্টাল এবং ম্যাথেমেটিক্যাল ইত্যাদি। ম্যাথেমেটিক্যাল এ্যাসপেক্ট সম্বন্ধে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে আলোচনাকালে, উনি বলেছিলেন যে, অঙ্কশাস্ত্র দ্বারা মানুষের মন মাপা কঠিন হলেও তা সম্ভব। এরপর তাঁর নির্দেশ ও উপদেশ মত এবিষয়ে আমি কিছু গবেষণা করেছিলাম। কিন্তু—হায়ার ম্যাথেমেটিক্সে জ্ঞান না থাকাতে বেশী দূর অগ্রসর হতে পারি নি। আচার্য বসুকে এটি বললে উনি এই থিসিস ওঁকে দেখাতে বলেছিলেন। কিন্তু—এখন তো তা আর সম্ভব নয়। তাই তাঁর স্মৃতিপূতঃ এই পত্রিকাতে এই অসম্পূর্ণ গবেষণা-পত্রটি পাঠালাম।

অপরাধ-বিজ্ঞানের আঙ্কিক দিকটা বুঝতে হলে নিম্নোক্ত দুটি ফরমূলা তথা মৌল-সূত্র বুঝতে হবে, যথা (1) বুদ্ধিরাঙ্ক [ইনটেলিজেন্স ইনকোয়েণ্ট] এবং অপস্পৃহাঙ্ক [ক্রিমিন্যাল ইনকোয়েণ্ট]। অপরাধ-বিজ্ঞানের আঙ্কিক দিকটি বুঝতে হলে প্রথমে এই দুটি পরস্পর সংলগ্ন মৌল-মূল বুঝতে হবেই। কারণ—প্রতিটি অপরাধে কম বেশী বুদ্ধির প্রয়োজন হয়ে থাকে।

(ক) বুদ্ধিরাঙ্ক

$$\text{বুদ্ধিরাঙ্ক} = \frac{\text{মানস বয়স (Mental age)}}{\text{প্রকৃত বয়স (Chronological age)}} \times 100$$

সমবয়স্ক মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি প্রায়ই কমবেশী ও বিভিন্ন রূপের হয়। এই বুদ্ধিরাঙ্ক পরিমাপ করার বহুবিধ উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। স্বাভাবিক বুদ্ধির গড়ের অধিক বুদ্ধিকে [বুদ্ধিরাঙ্ক 115—125] বহুল বুদ্ধি বা উজ্জ্বল বুদ্ধি, তদূর্ধ্বের বুদ্ধিকে পরম বুদ্ধি বা অত্যুজ্জ্বল বুদ্ধি [125—150] ও তদপেক্ষা বেশী বুদ্ধিকে [150 এবং ঊর্ধ্বের] অত্যাগ্র বুদ্ধি বা প্রতিভাবান বলা হয়। অন্যদিকে—ঐ আভারেজ তথা স্বভাবিক গড়ের কম বুদ্ধিকে [9৺—85] মন্দ বুদ্ধি বা স্বল্প বুদ্ধি ও তদনিম্নের বুদ্ধিকে [85-এরও নিম্নের] নিম্নবুদ্ধি বা ক্ষীণ বুদ্ধি এবং তার চাইতেও নিম্নের বুদ্ধিকে জড় বুদ্ধি বলা হয়।

কোনও এক অপরাধে প্রয়োজনীয় বুদ্ধি কোনও এক তদ্‌সম্পর্কিত অভিযুক্ত ব্যক্তির না থাকলে তাকে নিরপরাধী বুঝতে হবে। আমি সমীক্ষা করে দেখেছি যে, প্রবঞ্চকদের বুদ্ধিরাঙ্ক সর্বাপেক্ষা বেশী। কিন্তু বারগ্লার তথা সিঁদেল চোরদের বা পকেট-মারদের সমতুল বুদ্ধির অধিকারী কাউকে প্রবঞ্চনা অপরাধে অপরাধী করলে তা সন্দেহজনক হবে। এই বুদ্ধিবৃত্তির প্রকারভেদও আছে। সেই মত কেউ আউট-ডোর ওয়ার্ক, কেউ ইনডোর ওয়ার্ক ও কেউ বা থানা ওয়ার্ক, কেউ বা গোয়েন্দা বিভাগের উপযুক্ত হয়। তবে এই বুদ্ধিরাঙ্ক পরিমাপ কালে ওর স্ট্যাণ্ডার্ড ডিভিয়েসনও বিবেচ্য।

(খ) অপরাধ-স্পৃহাঙ্ক

উপরে বুদ্ধিরাঙ্ক সম্বন্ধে একটি ধারণা দেওয়া হলো। এইবার তার সহযোগী অপরাধ-স্পৃহাঙ্ক সম্বন্ধে বলবো। অপরাধীদের চিকিৎসার্থে ওদের অপরাধ স্পৃহাঙ্ক পূর্বাহ্নেই নির্ণয় করে জানাতে হবে যে, কার মধ্যে কতটুকু অপরাধ স্পৃহা আছে।

$$\frac{S + T}{} = C$$

[এখানে S অর্থে সিচুয়েসন তথা পরিস্থিতি। T অর্থে টেণ্ডেনসী তথা প্রবণতা। R অর্থে রেজিসটেন্স পাওয়ার তথা প্রতিরোধশক্তি। C অর্থে ক্রাইম তথা অপরাধ]।

উপরিউক্ত ফরমূলা তথা মৌল সূত্র মত T এবং S-এর সম্মিলীত শক্তি R-এর শক্তির কম হলে মানুষ নিরপরাধী। কিন্তু ঐ দুটির একত্রিত শক্তি R-এর শক্তির বেশী হলে মানুষ অপরাধী।

$$\frac{S^3 + T^2}{R^2} = C(-2)$$

কিন্তু-এই R রেজিসটেন্স পাওয়ার তথা প্রতিরোধ শক্তি তিনটি পৃথক পৃথক শক্তির সমন্বয়ে গঠিত যথা, (1) বংশানুক্রম তথা হেরিডিটি, (2) পরিবেশ ও শিক্ষাদীক্ষা, (3) ভয়-ভাবনা। [ঈশ্বরের বা আইনের] এই জন্য এই R-এর শক্তি বাড়াতে হলে তার ঐ পৃথক তিনটি অংশের শক্তির পরিমাপ বুঝতে হবে। এই তিনটির শক্তি এক একজন মানুষের মধ্যে এক এক প্রকার হলেও ওদের সম্মিলিত শক্তি তথা রেজালটেণ্ট পাওয়ার একই রূপের থাকে। তাই এর একটির ঘাটতি অন্যটি বাড়িয়ে পুরণ করতে হবে।

$$H^3 + E^4 + F^5 = R^{12}$$

(1) এখানে H অর্থে হেরিডিটি তথা বংশানুক্রম। যাঁরা হেরিটডেটিতে বিশ্বাসী নন তাঁরাও বলেন মানুষ এক প্রকার নৈতিক

* 128/2B, নারকেলডাঙ্গা মেন রোড, কলিকা৺া—700054

প্রবণতা নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। (2) E অর্থে এনভায়রনমেণ্ট তথা পরিবেশ [কু বা সু সঙ্গ] এবং এডুকেশন তথা শিক্ষাদীক্ষা। (3) F অর্থে ফিয়ার অফ্ কনসিকোয়েন্স তথা ভয়-ভাবনা। [শাস্তি আদির বা সম্মানহানির ও ঈশ্বরবিশ্বাসীদের ঈশ্বরের ভয়] কারও মধ্যে মর‍্যাল ইনসেনসিবিলিটি তথা নৈতিক অসাড়তা না এলে সম্মানহানির ভয়ও এক প্রকার ভয়।

উল্লেখ্য এই যে—প্রত্যেক মানুষের মধ্যে জৈব কারণে প্রাপ্ত আদিম যুগীয় অপরাধ-স্পৃহা সুপ্ত আছে। তা বাহিরের বা আন্তর উদ্দীপনায় [stimulus] জাগ্রত হলে মানুষ অপরাধী হয়। তবে সাধারণতঃ সভ্য মানুষদের মধ্যে রেজিস্টেন্স পাওয়ার থাকাতে সেগুলি তাদের আয়ত্তের মধ্যে থাকে। জাগ্রত অপরাধ-স্পৃহা ঐ নির্দিষ্ট মানের কম থাকলে তাকে—$-C$ বা $-C^4$ চিহ্ন দিয়ে এবং ঐ নির্দিষ্ট মানের বেশী থাকলে $+C$ বা $+C^1$ চিহ্ন দিয়ে সমীকরণ করে তা চিকিৎসার্থে সংশ্লিষ্ট অপরাধীর 'হিস্ট্রি সিট'এ লিখতে হবে। মানুষের অপরাধ-স্পৃহাঙ্ক নিম্নোক্ত রূপ সমীকরণ দিয়ে আরো ভাল করে বোঝা যাবে। অবলোকন, অনুসন্ধান, পিতৃ-মাতৃ স্বভাব, পারিবারিক চরিত্র ও বংশ পরিচয় এবং তাদের বন্ধুবান্ধবদের প্রকৃতি, আদি স্থানীয় পরিবেশ, শিক্ষাদীক্ষা, অনুমান, অনুধাবন, প্রশ্নোত্তর, মনোবিশ্লেষণ এবং তৎসহ যান্ত্রিক পরীক্ষা দ্বারা এই অপরাধ-স্পৃহাঙ্ক বার করা যায়। তবে—এরা এদের অভিব্যক্তি প্রায়ই গোপন করে।

$$T^2 + S^3 + R^4 = C(-1)$$

প্রাচীন ভারতে এই রূপের দুরূহ তথ্য তথা অজানা X-কে এক বিশেষ পদ্ধতিতে জানা যেতো। এই সম্পর্কে পতঞ্জলি ঋষির [প্রায় 500 B. C.] নিম্নোক্ত প্রমাণ সংগ্রহ সূত্রটি উল্লেখ্য।

"প্রত্যক্ষমাগম অনুমানানি প্রমাণানি।"

প্রত্যক্ষম অর্থে যা চক্ষু কর্ণ আদি ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ রূপে নিজে জানা যায়। আগম অর্থে বিশ্বস্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য ও তার মুখে শোনা তথ্য। এর পর ঐগুলির পরিপ্রেক্ষিতে অনুমানের সাহায্যে ঐ অজানা তথ্য X-কে জানা। এটিকেই এই যুগে অবস্থাঘটিত প্রমাণ বলা হয়। এই রূপ প্রমাণের উপর নির্ভর করে বিচারে মানুষের ফাঁসী পর্যন্ত হয়েছে। ধরা যাক একটি বস্তুর চারটি গুণ আছে। ঐগুলির তিনটি গুণ প্রত্যক্ষম ও আগম দ্বারা জানা গেল। কিন্তু ঐ তিনটি জানা গুণের স্বরূপ বুঝে বাকী অজানা চতুর্থ গুণ X কিরূপ হতে পারে তা সুষ্ঠু অনুমান দ্বারা জানা যাবে। তবে পতঞ্জলি এ বিষয়ে সম্ভাব্য বিকল্প তথা ভ্রান্তির উল্লেখও করেছেন, যথা (1) আন্তর্বিকল্প তথা হ্যালুসিনেসন এবং (2) বহির্বিকল্প তথা ইলিউশন।

[illegible] অপরাধ-স্পৃহা

বলা যেতে পারে মানুষের অপরাধ-স্পৃহা আদিমতম স্পৃহা। দূর অতীতে প্রাগৈতিহাসিক কালেরও পূর্বে তৎকালীন বন্য পরিবেশে জৈব কারণে ও প্রয়োজনে মানুষ খুশীমত যা করত, পরবর্তী কালে সভ্যতার উন্মেষে তার অনেক কিছুই অপরাধের তালিকায়। সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের পর পারস্পরিক স্বার্থে নিয়ম-শৃঙ্খলা তৈরি করতে হয়েছে। তাতে ভাল মন্দ বিচার করে, 'সৎ প্রেরণা রূপ' বিশেষ এক যে প্রবৃত্তি মানুষ লাভ করেছে তা দিয়ে তার আদিম জৈব প্রেরণার অনেক কিছুকে দমন করতে হয়, নইলে অপরাধ হয়। এই শৃঙ্খলাযুক্ত সৎ প্রেরণা মানুষের অপরাধ স্পৃহার বা আদিম প্রবৃত্তির উল্টা বৃত্তি হওয়াতে ওদের একটি বাড়লে অন্যটি আপনা থেকেই কমবে। মনোজগতে যে প্রবৃত্তিটি যত বেশী পুরাতন সেটি তত বেশী স্থিতিশীল ও শক্তিশালী। এই জন্যে পরবর্তীকালে সৃষ্ট সৎ প্রেরণা পূর্ববর্তী কালের আদিম সত্তার স্বাভাবিক স্পৃহা অপেক্ষা স্বভাবতই দুর্বল, তাই আজও আদিম প্রবৃত্তি জাত কাজগুলি যত সহজে করা বা করানো যায়, এত সহজে সৎ প্রেরণার কাজ করানো যায় না। সামাজিক বন্ধনের নিয়ম ও পরে রাষ্ট্রীয় শাসনে ও আইনে আমরা অপরাধ 'প্রতিরোধ-শক্তি'-রূপ একটি অভ্যাসজাত বা শিক্ষাগত প্রবৃত্তি লাভ করেছি। এই প্রতিরোধ-শক্তি সৎপ্রেরণার পক্ষে এবং অপরাধ-স্পৃহার বিপক্ষে কাজ করে। সৎ প্রেরণাজাত প্রতিরোধ-শক্তিই আমাদের এই সহজাত অপরাধ-স্পৃহাকে দমিত করে।

[illegible]

মানুষের দৈহিক ও মানসিক ক্রমোন্নতির বা অভিব্যক্তির ফলে তার মস্তিষ্কে স্নায়ুস্তরের বহু বিবর্ধনও বিকাশ ঘটেছে। মৎস্য, ভেক, সরীসৃপ, সাধারণ স্তন্যপায়ী, লেমুর, বানর, গরিলা প্রভৃতি প্রাণীর মস্তিষ্কের পরিধি পর পর বর্ধিত হয়েছে। মানুষের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। পৃথিবীতে পর পর তিন প্রকার মানুষের সৃষ্টি হয়, যথা, পিথেক্যানথ্রোপাস, নিয়েণ্ডারথাল ও আধুনিক। এদেরও করোটিতে মস্তিষ্কের পরিমাণ পর পর বৃদ্ধি ঘটে। যেহেতু অপরাধ-স্পৃহা আমাদের প্রথম আহৃত বৃত্তি, সেহেতু তা মস্তিষ্কস্থ স্নায়ুস্তরের নিম্নে এবং যেহেতু আমরা সৎ প্রেরণা পরবর্তীকালে অর্জন করেছি, সেহেতু তা মস্তিষ্কের ঐ স্নায়ুস্তরের উপরে স্থান গ্রহণ করেছে। মানুষের বৃত্তিমাত্রেই মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষ আশ্রয়ী হতে বাধ্য। কিন্তু আমাদের এই প্রতিরোধ-শক্তি সর্বশেষে আহৃত বৃত্তি হলেও তা স্বাভাবিক নিয়মে স্নায়ু কুণ্ডলির [Brain Convolution] কুণ্ডলনে তা মস্তিষ্কের সর্বোচ্চ স্থান থেকে সরে এসে আপন প্রয়োজনে নিম্নের অপস্পৃহা ও উপরের সৎ প্রেরণার সম্পর্কিত স্নায়ুস্তরের মধ্যবর্তী স্নায়ুস্তরে স্থান করে নিয়েছে। স্বল্পায়তন করোটির মধ্যে ক্রমবর্ধমান মস্তিষ্কের স্থান সঙ্কুলনার্থে ঐরূপ স্নায়ু কুণ্ডলনের প্রয়োজন অতীতকালে হয়েছিল।

[বিঃ দ্রঃ—মস্তিষ্কের বহু এরিয়া ও স্নায়ুকোষ এবং তৎসহ দেহের বহু সিক্রীসন গ্ল্যাণ্ডেও রসক্ষরণ কোষ এখনও অনাবিষ্কৃত। তদোপরি এখানে মনকে বুঝবার জন্য একটি হাইপোথিটিক্যাল ব্রেনের কল্পনা করা হয়েছে। এই প্রবন্ধটি পাঠকালে এটি বিবেচনা করতে হবে। মনের সঙ্গে ব্রেনের সম্পর্ক স্থাপনই এখানে প্রধানতঃ বিবেচ্য। এই নবজাত প্রতিরোধ-শক্তি দ্বারা অপরাধ স্পৃহা প্রশমিত না হলে তার অত্যধিক গুরুপ্রবাহ বীজ-কোষকে বিনষ্ট বা নিষ্ক্রিয় করে মানুষের বংশলোপ ঘটাতো। তাই যাদের ক্ষেত্রে ঐ বিষয়ে স্বাভাবিক নিয়ম সহায়ক হয় নি, সেই সব মনুষ্য-বংশ পৃথিবীতে জীবিত নেই।]

প্রাচীন যুগে মানুষ অপরাধ-স্পৃহার দ্বারা জীবন-যাপন করতো। খুন, জখম, চুরি ডাকাতি আদি তখন বীরত্ব ও ধূর্ততার আখ্যায় ভূষিত হতো। সমাজ গঠনের সঙ্গে মানুষ সৎ প্রেরণা ও রাষ্ট্র গঠনের সঙ্গে তারা প্রতিরোধ-শক্তি লাভ করে।

প্রাচীন কালে অপরাধ-স্পৃহী নিয়েণ্ডারথাল আদি আদিম মনুষ্য গোষ্ঠি ও এই যুগের মানসিক আটাভিজীমের অত্যুগ্র অপরাধ স্পৃহা আদিম সত্তার প্রাপ্ত উৎকট স্বভাব অপরাধীরা এই একই কারণে বংশ রেখে যেতে পারে নি।
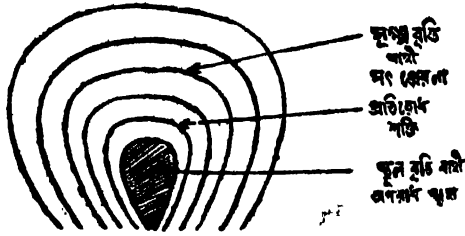
মস্তিষ্কের স্নায়ুস্তরগুলির পর পর সংযুক্তি

এই ভাবে আমরা বুঝবো, যে, মস্তিষ্কের উর্ধ্বের সৎ প্রেরণা সম্পর্কিত স্নায়ুস্তর এবং তার নিম্নের অপরাধ-স্পৃহা সম্পর্কিত স্নায়ুস্তরের মধ্যবর্তী স্থানেতে থাকা প্রতিরোধ-শক্তির আধারভূত স্নায়ুস্তরের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বা না হওয়া নির্ভর করে। কিন্তু—উল্লেখ্য এই যে, এই ক্ষতিগ্রস্ত স্নায়ুস্তর মানুষের কর্তিত নখ ও কেশের মত পুনর্গঠিত হতে পারে। এই জন্য অপরাধী মানুষ পুনরায় নিরপরাধী হতে পারে।

[বিঃ দ্রঃ—মানুষের এই অপরাধ-স্পৃহা বা সৎ প্রেরণা আপন শক্তিতে পরিচালিত হতে পারে না। সৎ প্রেরণাকে তার ধারক ও বাহক সূক্ষ্ম বৃত্তি এবং অপরাধ-স্পৃহাকে তার ধারক ও বাহক স্থূল-বৃত্তি পরিচালিত করে। দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রেম, ত্যাগ, কর্তব্যবোধ, সুবিচারিতা, আদি অংশ দ্বারা সূক্ষ্ম-বৃত্তি এবং লোভ কাম, ক্রোধ, ঘৃণা, মোহ, মদ, অহঙ্কার আদি অংশ দ্বারা স্থূল বৃত্তি সৃষ্ট। এই জন্য অপরাধ-স্পৃহা ও সৎ প্রেরণাকে দুটি পৃথক প্রকৃতির স্পুটনিকের সঙ্গে এবং সূক্ষ্ম বৃত্তি ও স্থূল-বৃত্তিকে তাদের স্ব স্ব বহু ইঞ্জিন-যুক্ত রকেটদ্বয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়। দয়া, ত্যাগ, স্নেহআদি ও ক্রোধ, কাম, লোভ আদি ওদের এক একটি ইঞ্জিন। ওদের যে কোনও ইঞ্জিন চালিত করলেই ঐ রকেট সম সূক্ষ্ম বা স্থূল বৃত্তি তাদের স্ব স্ব স্পুটনিক সম সৎ প্রেরণা বা অপরাধ-স্পৃহা সক্রিয় করবে। এই জন্য কাউকে একটি অপকর্ম করতে প্ররোচিত করলে সে অন্য অপরাধও নির্বিচারে করবে।

এই স্পুটনিকদ্বয়ের [অপরাধ-স্পৃহা বা সৎ প্রেরণা] কম বেশী আয়তন থেকে কার মধ্যে কতটুকু অপরাধ-স্পৃহা বা সৎ প্রেরণা আছে, তা বুঝা ও জানা যায়। কিন্তু তাদের ধারক ও বাহক ঐ রকেটদ্বয়ের শক্তি ও গতি থেকে ওদের কে কত শীঘ্র অপরাধী বা নিরাপরাধী তা বলা যাবে। এইখানে উল্লেখ্য এই যে ভাল বা মন্দ পরিবেশ ও কু বা সু সঙ্গ ও দৃষ্টান্ত পরোক্ষ ভাবে অপরাধ-স্পৃহা বা সৎ প্রেরণার পরিধি ও পরিমাণ বাড়ায় বা কমায়। কিন্তু—প্রয়োজন, অভাব, অধিকার, লোভ, ক্রোধ, অসাম্য প্রভৃতি এবং দয়া, সুবিচার ইত্যাদি প্রত্যক্ষভাবে ঐ রকেট রূপ স্থূল বা সূক্ষ্ম বৃত্তিদ্বয়ের শক্তি ও গতি বাড়ায় বা কমায়। এতে কে কত শী অপরাধী বা নিরপরাধী হবে তা বলা যায়।

উপরিউক্ত রূপ মানসিক ক্ষেত্রের মত দৈহিক ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে, জীবদের দেহের পরিধি, গাত্র, বর্ণ প্রভৃতি তাদের বাসস্থানের বর্ণ ও সেই স্থানে প্রাপ্ত খাদ্যের পরিমাণ মত বর্ণ বা অবয়ব নিয়েছে। তাই মেরু দেশের প্রাণী শ্বেত বর্ণের ও মরু দেশের প্রাণী ধূসর বর্ণের হয়েছে। কিন্তু তাদের অঙ্গাদির পরিবর্তন স্বকীয় চেষ্টাতে অতি ব্যবহারে বা অব্যবহারে বিবর্তনবাদ অনুসারে ঘটেছে। জিরাফের ও উষ্ট্রের লম্বা গ্রীবা এই ভাবে সৃষ্ট হয়। সর্পজীবের পদচতুষ্টয়ও এই ভাবে লুপ্ত হয়েছিল। তবে দৈহিক ক্ষেত্রে এই জন্যে বহু পুরুষ ও বহুকালের প্রয়োজন হলেও মানসিক ক্ষেত্রে তা এক পুরুষে ও স্বল্প সময়ে সমাধা হয়।

চিত্রে (284 পৃ.) দর্শিত ঐ প্রতিরোধ-শক্তির আধার-ভূত সংশ্লিষ্ট স্নায়ুস্তর মানসিক আঘাত ও শক আদি স্নায়বিক কারণে বা বীজাণুর আক্রমণে বা বৃদ্ধি রুখতে [Arrested Growth] আদিতে ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্লিপটো-ম্যানিয়াক নিমপো-ম্যানিয়াক আদি অপরাধ-রোগীর [Abnormal Criminal] সৃষ্টি হয়। এই স্নায়বিক বৃদ্ধি রোধ জ্রূণের মধ্যে জন্মের পরও এক সময় ঘটতে পারে। কিন্তু—বহু বালক একটি বয়সের পর আপনা থেকেই সুচিকিৎসাতে হঠাৎ ঐ বৃদ্ধি রোধ থেকে মুক্ত হয়ে ক্ষতিপূরক দ্রুত গতিতে ঐ প্রতিরোধ-শক্তি সম্পর্কিত মস্তিকস্থ স্নায়ুর গঠন সম্পূর্ণ করে এগিয়ে সুস্থ নিরপরাধী বালকদের সমতুল হয়েছে।

[একটি বালক নষ্ট হওয়া বা না হওয়ার কারণ কিন্তু মূলে তাদের শৈশবেই ঘটে থাকে। তাদের চাহিদা পূরিত না হলে

মানব মন
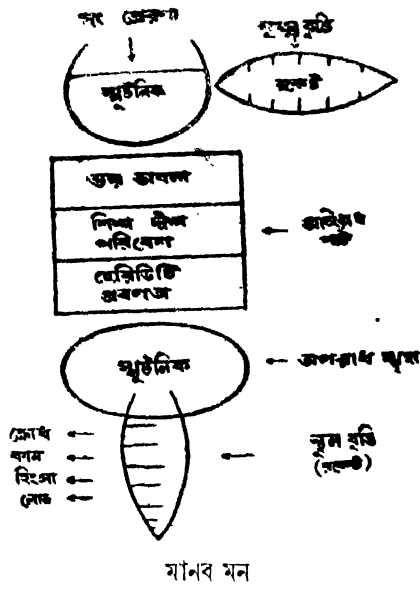
তজ্জনিত আঘাত তাদের শৈশবের কচিকাঁচা মস্তিষ্কের স্নায়ুস্তর বিশেষ আহত করে। এই জন্য শান্তিপূর্ণ ও সচ্ছল পরিবার গুলিতেই মানীগুণীরা বেশী জন্মে। তাই সম্পদ বণ্টনের বদলে জবরদস্তিতে দারিদ্র বণ্টন করা উচিত হবে না। মাতা-পিতার কলহ, অসচ্চরিত্রতা, বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পৃথক অবস্থানও ক্ষতিকর। এতে শিশুরা মাতা বা পিতার প্রতি অনুগত থাকবে তা বুঝতে না পেরে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়। প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রদেশ সরকারের মধ্যে বিরোধে জনগণের আনুগত্য দ্বিধাবিভক্ত হওয়াতে তারা নিয়মতান্ত্রিকতা ও আনুগত্য হীন হয়ে অপরাধপ্রবণ হবে।]

নীরোগ অপরাধী সম্পর্কে আলোচনা—এই বিষয়ে দুটি থিওরীর বিষয় ভাবা যেতে পারে যথা (1) গ্ল্যাণ্ডুলার সিক্রিসন এবং (2) ব্যবহার ও অ-ব্যবহার থিওরী।

[মানুষের দেহে বহু জানা ও অজানা রস-পিণ্ড ও রস-কোষ আছে। এরা দুই প্রকার হর্মোন আদি দেহ-রস ক্ষরণ করে। যথা (1) উপকারী ও (2) অনুপকারী হর্মোন আদি। কিছু ক্ষেত্রে বেশী পরিমাণে যা অনুপকারী তা কম পরিমাণে উপকারী। দেহজাত আয়োডিন এই রস-পিণ্ড ও রস-কোষগুলিতে বেশী জমা হয়। এই আয়োডিন এই রস-গ্রন্থি ও রস-কোষ আদি থেকে অনুপকারী-রস বেশী ও উপকারী রসের কম ক্ষরণের সহায়ক। মানসিক চিকিৎসাতে, ঔষধ সেবনে ও তেজক্রিয়া প্রয়োগে এই আয়োডিন ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।]

মানুষের কোনও চিন্তা বা কর্ম স্থূল বৃত্তিপ্রসূত হলে তার দ্বারা সৃষ্ট স্নায়ু-বিদ্যুতের ভারি প্রবাহে ও তজ্জাত প্রতিকূল ব্রেন ওয়েভের সৃষ্টিতে অনুপকারী হর্মোন আদি দেহরস ক্ষরণ বেশী হয়। এই অত্যধিক অনুপকারী দেহরস রক্ত ধমনীর মাধ্যমে রক্তের সঙ্গে মস্তিষ্কে এসে 'অপরাধ-স্পৃহা ও সৎ প্রেরণাদ্বয় পুরানো বৃত্তি হওয়াতে তদ্‌সম্পর্কিত স্নায়ুকোষ-স্তর দুটিকে রেহাই দিয়ে মাত্র তার প্রতিরোধ-শক্তি সম্পর্কিত নবসৃষ্ট স্নায়ু স্তরকে কম বেশী ক্ষতিগ্রস্ত করে। কারণ নূতনতম ও শেষতম সূক্ষ্ম-স্নায়ু দুর্বল থাকাতে তাই প্রথমে প্রভাবিত তথা অ্যাফেকটেড হয়।

কিন্তু—মানুষের প্রতিটি কর্ম বা চিন্তা কেবল মাত্র স্থূল-বৃত্তি প্রসূত হয় না। পরক্ষণেই তার অন্য চিন্তা বা কর্ম সূক্ষ্ম বৃত্তিপ্রসূত হয়। তাতে তৎক্ষণাৎ হাল্কা তাকে সৃষ্ট স্নায়ু-বিদ্যুৎ প্রবাহে ও তজ্জনিত অনুকূল ব্রেন-ওয়েভ সৃষ্টিতে উপকারী দেহরসের ক্ষরণ হবে। ঐ উপকারী দেহরস [গ্ল্যাণ্ডুলার সিক্রীসেন] তৎক্ষণাৎ ধমনীর মাধ্যমে রক্তের সঙ্গে মস্তিষ্কে এসে প্রতিরোধশক্তি সম্পর্কিত ঐ ক্ষতিগ্রস্ত সূক্ষ্ম-স্নায়ু নিমেষে পুনর্গঠিত করবে। এই ভাঙ্গাগড়া নিয়ত মস্তিষ্কে ঘটাতে তাকে স্থূলবৃত্তিবাহী অপরাধ-স্পৃহা এবং সূক্ষ্ম-বৃত্তিবাহী সৎপ্রেরণার অনন্ত দ্বন্দ্ব স্থল বলা হয়।

তবে—সৎ প্রেরণার সঙ্গে সম্পর্ক শূন্য মাত্র অপরাধ স্পৃহার দ্বারা মানুষের জীবন অতিবাহিত হলে ঐ ক্ষতি স্থায়ী হয়ে মানুষকে মানব-দানব করবে। অন্যদিকে—অনুপকারী রস তিল মাত্র ক্ষরণ ব্যতিরেকে কেউ মাত্র উপকারী রস ক্ষরণ করলে সে মহাপুরুষ হবে। কিন্তু—এই রূপ মানসিক অবস্থা কদাচিৎ ঘটেছে। অতিবড় সাধকেরও চিন্তার শতাংশও বাইরে প্রকাশ পেলে জনগণ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হবে।

[উপরিউক্ত রূপ চিন্তা ও কার্য মুহুর্মুহুঃ হওয়া চাই। সকালে আট ঘটিকাতে খাদ্য দেওয়াতে ভেক জীবের মুখেতে হ্যালিভারী জল বেরোয়। কিন্তু কোনও দিন তাকে খাদ্য না দিলেও ঠিক ঐ সকাল আটটার সময়েই খাদ্যের এক্সপেকটেসনে তথা সম্ভাবনাতে এরূপ লালা তার মুখে আসবে। এটি মাত্র একটি মানসিক রিফ্লেক্স অ্যাকসনের মত হবে]

উপরের তথ্য থেকে আমরা বুঝবো যে, অনুকূল ও প্রতিকূল ব্রেন-ওয়েভ কণ্ট্রোল করে মানুষকে অপরাধী থেকে নিরপরাধী করা যায়। এই জন্য নিম্নোক্ত ফরমুলা তথা মৌল-সূত্র থেকে এই ব্রেন ওয়েভের আকার ও প্রকার, উৎপত্তি, স্বরূপ ও কার্যকরণ বুঝতে হবে।

$$\text{তরঙ্গ দৈর্ঘ্য} = \frac{\text{গতিবেগ}}{\text{কম্পন সংখ্যা}} \times \text{সময়-কাল}$$

এই মস্তিষ্ক তরঙ্গের ও ওদের আনুসঙ্গিক বিষয়গুলি সৎ প্রেরণার ক্ষেত্রে হাল্কা প্রবাহ, দীর্ঘ তরঙ্গ, কম কম্পন ও মন্থর গতির হয়। অন্যদিকে—তা অপরাধ-স্পৃহার ক্ষেত্রে ভারি প্রবাহ, ক্ষুদ্র-

তরঙ্গ, বেশী কম্পন ও দ্রুত গতির হয়। এই দুই প্রকার তরঙ্গের বাহন হয় যথাক্রমে ভারি ও হাল্কা স্নায়ু-বিদ্যুৎ। তবে—ঐ দুটির গতিবেগ এই অপরাধ-স্পৃহা ও সৎ প্রেরণার বাহক ও ধারক স্থূল ও সূক্ষ্ম বৃত্তির গতিবেগের উপর নির্ভরশীল। এই সব কারণে অপরাধ-স্পৃহা ও সৎ প্রেরণাকে এক প্রকার মানসিক ভার তথা মেণ্টাল লোড বলা হয়।

এই অপরাধ-স্পৃহা ও সৎ-প্রেরণা সম্পর্কিত দুই প্রকারের মস্তিষ্ক তরঙ্গ মানুষের চিন্তনজাত স্নায়ু-বিদ্যুতের সঙ্গে একীভূত। এক্স-রশ্মির বর্ণালী গামা রশ্মির গামা-কেমেরাতে এই বিভিন্ন প্রকৃতির হর্মোনের বর্ণালী সহ তার পরিমাণের পরিমাপ জানা যাবে ও তৎসহ বিভিন্ন রূপ মস্তিষ্ক তরঙ্গের চিত্রও হয়তো দেখা যাবে

উপরিউক্ত গ্ল্যানডুলার ক্ষরণ মতবাদের সঙ্গে ব্যবহার ও অ-ব্যবহার থিওরী [Use & Dis-Use] দ্বারাও এই সম্পর্কিত বক্তব্য বিষয় প্রমাণ করা যাবে। এই দুই থিওরীর কোনও থিওরীটি এই বিষয়ে প্রয়োজ্য তাও বিবেচ্য।

মানুষের স্থূল বৃত্তি বেশী ব্যবহারে তা বাড়বে ও সেই অনুপাতে ওদের সূক্ষ্ম-বৃত্তি তার উল্টা বৃত্তি হওয়াতে তা আপনা থেকেই কমবে [Vice-Versa]। এই মানসিক ক্ষেত্রের মত দৈহিক ক্ষেত্রেও এই ভাবে জিরাফ ও উষ্ট্রের গলদেশ বৃদ্ধি ও সর্প জীবের পদচতুষ্টয় বিলুপ্তি ঘটেছিল। তবে—একটি মাত্র কারণে প্রতিটি শ্রেণীর অপরাধীর সৃষ্টি হয় নি। এক এক শ্রেণীর অপরাধীদের সৃষ্টি পৃথক পৃথক কারণে ঘটেছে। এই কারণ মত এক এক শ্রেণীর অপরাধীদের চিকিৎসা পদ্ধতিও এক এক প্রকারের হয়ে থাকে। এই জন্য অপরাধীদের তাদের সৃষ্টির কারণ মত নিম্নোক্ত শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে বিভক্ত করতে হবে।

অপরাধী

উপরিউক্ত নীরোগ-অপরাধীদের অন্তর্গত প্রতিটি উপশ্রেণীর, অপরাধীদের শ্রেণী ভেদে তাদের কম বা বেশী গতিতে দুটি পৃথক পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়, যথা (1) প্রথম পর্যায় ও শেষ পর্যায়। এই প্রাথমিক পর্যায়ের তথা প্রাথমিক অপরাধীদের স্বভাব চরিত্র নিরাপরাধী মানুষের মত থাকে। তারা সভ্য-সমাজে স্ত্রী-পুত্রসহ বসবাসও করে। পৃথিবীর অধিকাংশ অপরাধী সমগ্র জীবন তাদের এই প্রাথমিক অবস্থাতেই থাকে। কেবল মাত্র তাদের মধ্যের স্বল্প কয়জন অপরাধ স্পৃহার গুরু প্রবাহে স্নায়বিক পরিবর্তন হেতু ব্যক্তিত্বের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে শেষ পর্যায়ের উৎকট প্রকৃত অপরাধী হয়। এতে তারা মানসিক ক্ষেত্রে আদিম বৃত্তি ফিরে পেয়ে প্রায় তাদের পূর্বপুরুষ আদিম মানুষদের মত হয়। তখন তারা ঘর সংসার ছেড়ে পঙ্কিল বস্তীতে নিম্নশ্রেণীর বেশ্যাদের সঙ্গে বসবাস করে। এই শেষ পর্যায়ের প্রকৃত অপরাধী-দের ব্যক্তিত্বের আমূল পরিবর্তনে তাদের মধ্যে নিম্নোক্ত রূপ কয়েকটি স্নায়বিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটে।

(ক) প্রাথমিক অপরাধী ও স্বাভাবিক মানুষদের মধ্যে কষ্টবোধ বেশী ও স্পর্শ-বোধ কম ও উষ্ণ বোধ বেশী ও শৈত্য বোধ কম থাকে। কিন্তু শেষ পর্যায়ে উপনীত উৎকট অপরাধীদের মধ্যে এই ব্যবস্থা উল্টে যায়। তখন তাদের মধ্যে কষ্ট বোধ ও উষ্ণ বোধ কম এবং স্পর্শ-বোধ ও শৈত্য বোধ বাড়ে। এর কারণ এই যে, দেহত্বকে কষ্ট-স্পর্শ এবং উষ্ণ-শৈত্য স্পটের প্রোসেশ তথা স্নায়ুদণ্ড আছে। তাই এদের ঐ উল্টা-উল্টি বৃত্তি-দ্বয়ের একটি কমলে অন্যটি বাড়বে। অন্যদিকে ঐ কষ্ট-স্পর্শ এবং উষ্ণ-শৈত্য দণ্ডের অনুক্রমিক বোধ-কেন্দ্রও মস্তিষ্কে রয়েছে। সম্ভবতঃ হর্মোন আদি ক্ষরণজাত রস মস্তিষ্কের ঐ সব অনুক্রমিক বোধ কেন্দ্রগুলি অ্যাফেকেটড করাতেই উক্তরূপ দেহত্বকেও ওলট-পালট ঘটেছে।

[পর্যায়ক্রমে উষ্ণ ও শৈত্য জলে স্নান, বাদাম বা বেসম বাটা হলুদ বাটা, দুধ আদি দেহ ত্বকে লেপনে ওদের ঐ সব বোধ কেন্দ্র পুনরায় স্বাভাবিক করে ওদেরকে পুনরায় নিরপরাধী করা যায়। উল্লেখ্য এই যে, মুখবিবরের মত দেহত্বকের ছিদ্র দ্বারাও খাদ্য গ্রহণ করা যায়। তাই দেহত্বকে বিষ লেপনেও মানুষ খুন হয়েছে।]

স্পর্শ বোধ বেশী থাকাতে পাকাপোক্ত পকেটমাররা আঙুলের টোকাতে কোন্ পকেটে সাদা কাগজ ও কোন্ পকেটে কারেন্সী নোট আছে তা না দেখেই বুঝে। অন্যদিকে—উৎকট অপরাধীদের দেহে কষ্টবোধ কম থাকাতে প্রহারে তারা আরাম পায়। কিন্তু বরফ জলে স্নান তাদের সহ্যাতীত হয়।

(খ) এদের মধ্যে লজ্জাসরমের অভাব ও অনুতাপহীনতা দেখা যায়। কারণ—এদের মধ্যে উপরিউক্ত রূপ দৈহিক অসাড়তা তথা ফিজীক্যাল ইনসেনসেবেলিটির মত নৈতিক অসাড়তা তথা মরাল ইনসেনসেবেলিটিও এসেছে। তদুপরি—সাধারণ মানুষদের ও প্রাথমিক অপরাধীদের মধ্যে লোভ, ক্রোধ, ঘৃণা আদি বহু স্থূল বৃত্তি এবং দয়া, মায়া, ত্যাগ, স্নেহ আদি বহু সূক্ষ্ম বৃত্তি পৃথক পৃথক ভাবে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যায়ের অপরাধীদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনে ঐ সব কয়টি বৃত্তি একীভূত হয়ে মাত্র চারটি মৌল

বৃত্তি সৃষ্টি করে যথা (1) অলসতা, (2) ভাবপ্রবণতা, (3) দাম্ভিকতা ও (4) নিষ্ঠুরতা। তখন এই স্থূল বৃত্তি চতুষ্টয় অস্থির ভাবে তাদের মনের পথে ওঠানামা করে। তাতে তারা কখনও দাম্ভিক, কখনও ভাবপ্রবণ, কখনও অলস ও কখনও বা নিষ্ঠুর হয়। ক্রুদ্ধ বা উত্তেজিত হলে এই রূপ ওঠানামা দ্রুত ও বেশী হয়। নিষ্ঠুর অবস্থাতে তারা অপরাধ করে। এই ভাবে তাদের অপরাধ স্পৃহা নিষ্কাশিত না হলে তাদের মধ্যে চিত্তবিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তাতে তারা প্রহার বা আত্মহত্যা করে কিংবা উন্মাদ বা হিস্টিক লোকের মত ব্যবহার করে। অন্য অবস্থাতে তারা গ্রেপ্তার বা কয়েদ স্বাভাবিক ঘটনা বুঝে শান্ত থাকে। কিন্তু তাদের এই নিষ্ঠুর অবস্থাতে তারা দ্রুত বেগে পালাতে চায়। পুলিশ কর্মীরা তাদের মনের পথে এই বৃত্তি চতুষ্টয়ের ওঠানামা লক্ষ্য করে। এদের ভাবপ্রবণ অবস্থাতে জিজ্ঞাসাবাদ করলে এরা স্বীকারোক্তি করে চোরাই দ্রব্যের হদিশ বলে দেয়। এদের মধ্যে কষ্ট বোধ না থাকাতে এরা এদের রোগ হওয়া সম্বন্ধে সচেতন নয়। তাই এরা হঠাৎ পড়ে ও মরে। পুলিশ হাজতে এটি ঘটলে অযথা ওতে পুলিশকে দায়ী করা হয়।

(গ) এদের মধ্যে ক্ষণস্থায়ী উগ্র তৎপরতা ও তৎপর উগ্র অলসতা দেখা যায়। তাই বেশীক্ষণ পরিশ্রম করলে এরা প্রথমে অলস ও আরও পরিশ্রমে তারা জড় হয়ে যায়। এটি এদের এক প্রকার রোগ। তাই এসব এড়াতে প্রায়ই তালা ভাঙাভাঙি করে ও অপকর্ম অসম্পূর্ণ রেখে গৃহাদি ত্যাগ করে। অধিক পরিশ্রমে [স্নায়বিক পরিবর্তন হেতু] প্রতিষেধক গ্লাইকোজেন ক্ষরণ ব্যতিরেকে অত্যধিক ল্যাকটিক অ্যাসিড এরা দেহেতে ক্ষরণ করে। এতে ঐ ল্যাকটিক অ্যাসিড তাদের স্নায়ু-মুখিকা তথা নার্ভ প্লেট নিষ্ক্রিয় হওয়াতে কেন্দ্রীয় স্নায়ু-সংস্থা থেকে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ আহরণ না করতে পারাতে তাদের মধ্যে এইরূপ অবস্থা ঘটে।

[এদের মধ্যে চতুরতার মত নির্বুদ্ধিতাও আছে। সাফল্যের উত্তেজনা এদের এই নির্বুদ্ধিতা আনে। তাই প্রচুর বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করলেও এরা এদের অপকর্মের মধ্যে বহু সূত্র পুলিশের সুবিধার্থে রেখে যায়। স্বীকারোক্তি আদায়ার্থে এদের গুরু ভোজন করানো হয়। তাতে তাদের মস্তিষ্ক থেকে রক্ত নেমে উদরকে পরিচালিত করে। এতে তাদের ব্রেনের প্রতিরোধ-শক্তির স্নায়ুস্তর দুর্বল হওয়াতে এরা অত্যন্ত সাজেস্‌সিভ ও নির্বোধ হয়ে উঠে। ট্রুথ ড্রাগ দ্বারাও তাদেরকে এই অবস্থাতে আনা গেছে। তাতে তারা শত্রুকে বন্ধু ভাবে এবং ধাপ্পাতে ও লোভ প্রদর্শনে ভুলে। তবে—জেল এদের অন্যদের নিকট থেকে নূতন কায়দা শিখার একটি বিরাট বিদ্যাপীঠ হওয়াতে তারা ইচ্ছা করেও স্বীকারোক্তি করে জেলেতে গিয়েছে। ধর্ম উপদেশ ও মুক্তির আশ্বাস প্রাথমিক অপরাধীদের উপর কার্যকরী হলেও এই শেষ পর্যায়ের অপরাধীদের উপর তা প্রযোজ্য নয়।

[এদের মধ্যে সূক্ষ্ম বৃত্তি দুর্বল ও স্থূল বৃত্তি প্রবল। তাই উপদেশ এরা শুনবে না। কিন্তু—সুন্দর ছবি বা সঙ্গীত সূক্ষ্ম বৃত্তিপ্রসূত হওয়াতে ঐ সবের ব্যবস্থা ওদের আটকস্থলে করলে ঐগুলির পরোক্ষ প্রভাবে ওদের ঐ সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলি সবল হলে তার উল্টা বৃত্তি 'স্থূল বৃত্তিগুলি' আপনা থেকেই সেই অনুপাতে দুর্বল হবে। উপরন্তু—এদের দুর্বল হৃৎপিণ্ডকে চিকিৎসাতে সবল করলে বেশী রক্ত তাদের মস্তিষ্কে এসে তাদের প্রতিরোধ-শক্তি সম্পর্কিত স্নায়ু স্তর পুনর্গঠিত হবে। এই জন্যে সমুদ্রের ওজোন [Ozone] সমৃদ্ধ দ্বীপে মুক্ত অবস্থাতে রাখলে এরা নিরাময় হয়। এদেরকে বেশীক্ষণ পরিশ্রম করতে না দিয়ে এদের কার্যের মধ্যে শ্রম-বিরাম [Rest pause] দিন। এতে ল্যাকটিক অ্যাসিড দেহে কম ক্ষরিত হবে। এর প্রতিষেধক গ্লাইকোজেন এদের দেহে ঢুকান। পরে—ধীরে ধীরে এদের কর্মকাল [Work spell] বাড়ান। প্রথম সপ্তাহে সামান্য ক্ষণ খাটিয়ে, পরে প্রতি সপ্তাহে একটু একটু করে এদের কর্মকাল বাড়িয়ে এদের দিনে আট ঘণ্টা কার্যে অভ্যস্ত করান। উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিলে ও ভাল ব্যবহার করলে এদের মধ্যে আত্মসমান জ্ঞান, লজ্জাসরম ও অনুতাপ বোধ ফিরবে।

স্থূল হেতু অপরাধ স্পৃহা দুটি পৃথক অংশে বিভক্ত, যথা, (1) শোণিত স্পৃহা এবং (2) দ্রব্য স্পৃহা। এই শোণিত স্পৃহার কারণে মানুষ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অ-যৌনজ [খুন জখম আদি] এবং যৌনজ [নারী ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি আদি] অপরাধ করে। অন্যদিকে—এই দ্রব্য-স্পৃহার কারণে মানুষ চুরি প্রবঞ্চনা আদি সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধ করে। তবে—ডাকাত আদি প্রাথমিক অপরাধীদের অপরাধে এই সম্পত্তি-স্পৃহী ও দ্রব্য-স্পৃহী রূপ উভয়বিধ অপরাধী থাকে।

অপরাধ-স্পৃহা
- শোণিত স্পৃহা
  - যৌনজ
  - অ-যৌনজ
- দ্রব্য স্পৃহা

মানুষ আদিমতম যুগে এই অপরাধস্পৃহার শোণিতাংশ দ্বারা জীবনযাপন করতো। মারপিট পশু শিকার আদিতে তারা শোণিত-স্পৃহী হয়। তখন সমগ্র অরণ্য-সম্পদ তাদের সাধারণ এজমালি সম্পত্তি। কয়েকটি প্রস্তর নির্মিত অস্ত্র ব্যতীত তাদের ব্যক্তিগত কোনও সম্পত্তি ছিল না। সেগুলিও মৃত্যুর পর তাদের কবরে রাখা হতো। পারিবারিক বন্ধন না থাকাতে ওই নির্বিচার যৌন মিলনে অভ্যস্ত ঐ সব মানুষের মধ্যে যৌনজ অপকর্মেরও প্রশ্ন ছিল না। সেই সঙ্গে তাদের ঐ সব যাযাবর

মানুষদের সম্পত্তি আহরণেরও নিষ্প্রয়োজনে অপরাধ স্পৃহার দ্রব্য-স্পৃহাংশও তাদের মধ্যে থাকে নি।

পরে মানুষ গ্রাম সৃষ্টি করে পারিবারিক জীবন গ্রহণ করলে তারা সম্পত্তি আহরণও করে। তাতে অপরাধ-স্পৃহার অন্যাংশ দ্রব্য-স্পৃহা তাদের মধ্যে স্থান পায়। তখন সবলরা অন্যদের সম্পত্তি ও নারী কেড়ে নিত এবং ওদের দুর্বলরা তাদের সম্পত্তি চুরি করতো ও তাদের নারীদের সঙ্গে গোপন ব্যভিচারে [Adultry] লিপ্ত হতো। অপস্পৃহার এই নবজাত দ্রব্য-স্পৃহাংশর সঙ্গে এই সব লোকদের মধ্যে অপরাধ-স্পৃহার প্রথমাংশ শোণিত স্পৃহাও [যৌনজ ও অ-যৌনজ] তাদের মধ্যে অব্যাহত থাকে।

বিঃ দ্রঃ—এই নূতন সমাজ ব্যবস্থা প্রাচীনপন্থী তখনকার অসামাজিক সাবেকী লোকেদের অধিকাংশ লোকরাই স্বীকার করে নি ও তারা তা মানতেও চায় নি। কিন্তু—নূতন গঠিত সমাজের সমাজবদ্ধ সংখ্যালঘু মানুষরা সু-সঙ্ঘটিত ও সঙ্ঘবদ্ধ থাকাতে ঐ সঙ্ঘটনবিহীন সংখ্যাগুরু অসামাজিক মানুষরা তাদের এই সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধেতে হার মানে ও পরে ধীরে ধীরে তাদের এই নূতন সমাজ-ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কিন্তু—কোনও বৃত্তি একবার সৃষ্ট হলে তা বিলুপ্ত না হয়ে মাত্র প্রদমিত হয়। তাই এই অসামাজিক উভয় স্পৃহাই মানুষের বীজকোষে ও দেহকোষে সুপ্ত আছে। আন্তঃ ও বহিঃ উদ্বেলকে ঐ অবচেতন মনের অপরাধ-স্পৃহা জাগ্রত হয়ে চেতন মনে এলে মানুষ অপরাধ করে। এই স্পৃহার পরবর্তীকালে সৃষ্ট আমাদের প্রতিরোধ-শক্তির জন্যেই অপরাধ-স্পৃহা বংশানুক্রমে ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে সুপ্ত হয়েছিল।

উল্লেখ্য এই যে—পূর্বকালে অপরাধ মাত্রেই বীরত্ব ও ধূর্ততার আখ্যায় ভূষিত হতো। পরে মানুষ পশু শিকারের বদলে পশু পালন করতে শিখলে তাদের মধ্যে দয়া-মায়া দরদ আদি সূক্ষ্ম বৃত্তি আসে। তাতে অপরাধ-স্পৃহার শোণিত স্পৃহাংশের কিছুটা পরিত্যক্ত হয়। এরও পরে মানুষ কৃষিকার্যে অভ্যস্ত হলে তাদের মধ্য থেকে দ্রব্য-স্পৃহা ধীরে ধীরে তিরোহিত হয়। কারণ—কৃষকরা তাদের অবচেতন মনেতে ধরিত্রীর বুক থেকে শস্য অপহরণ করে। তাতে মনস্তাত্ত্বিক কারণে কৃত্রিম ভাবে তাদের মনের সঞ্চিত দ্রব্য-স্পৃহা নিষ্কাশিত হয়। এই জন্য আজও কৃষি-প্রধান স্থানে বৈধ ভাবে আহৃত জমি ও দ্রব্য রক্ষার্থে মারপিট হলেও চুরি আদি কম হয়। এই ভাবে আমাদের মধ্যে সৎ-প্রেরণা স্থান পায়। পরিবার সমাজ ও গ্রাম গঠন এর অন্যতম কারণ। এরও পরে রাষ্ট্র গঠন হলে নিরপরাধী জীবনযাপন স্বেচ্ছামূলক না হয়ে বাধ্যতামূলক হয়। এরই কারণে আমরা প্রতিরোধ-শক্তিরূপ একটি শেষ বৃত্তি অর্জন করেছি।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে—মানুষের মধ্যে কোন একটি মানসিক বৃত্তি একবার সৃষ্ট হলে তা বিলুপ্ত না হয়ে মাত্র প্রদমিত হয়। এই আদিম বৃত্তির কিছু অংশ আমাদের বীজকোষে [Gamatic cell] ও তার কিছু অংশ আমাদের দেহকোষে [Somatic cell] নিহিত আছে। দেহকোষ অর্থে এখানে ব্রেনের স্নায়ু-কোষ বুঝাবে। দৈবক্রমে মেণ্টাল আটাভিজিম তথা মানসিক গোত্রানুক্রম দ্বারা কোনও শিশুর জন্মকালে ভ্রূণের মধ্যে তার বীজ-কোষে থাকা অপরাধ-স্পৃহার কিছু অংশ তাদের দেহকোষে থাকা অপরাধ-স্পৃহার সঙ্গে মিলিত হলে তার ঐ 'ডবল ডোজে' সংশ্লিষ্ট বালক উগ্র প্রকৃতির স্বভাব অপরাধী হবে। তবে—এদের সংখ্যা অত্যল্প হওয়াতে এরা সচরাচর সভ্য মানুষের নজরে পড়ে না। বীজকোষে থাকা কতটুকু অপরাধ স্পৃহা তাদের দেহকোষে মিশ্রিত হলো তা ঐ স্পৃহার তথা প্রবণতার কম বেশী উগ্রতা থেকে বুঝা যাবে। এদের ঐ অপরাধ স্পৃহা পুনরায় অন্তর্মুখী করে তাদের নিরপরাধী করতে ঔষধ প্রয়োগ, ব্রেন থেরাপী ও বেশী প্রতিরোধ-শক্তির প্রয়োজন। এইখানে তেজস্ক্রিয়া প্রয়োগে অপরাধ-স্পৃহা সম্পর্কিত ব্রেন-ওয়েভ নিয়ন্ত্রণেরও প্রয়োজন। অন্যদিকে অভ্যাস অপরাধীরা তাদের দেহকোষের একক [Single Doze] অপরাধ-স্পৃহা অভ্যাস ও অতি ব্যবহার দ্বারা বাড়িয়ে 'অভ্যাস-অপরাধী' হয়। দেশলাই-এর কাঠির যৎসামান্য আগুনও ইন্ধন যুগিয়ে বাড়িয়ে মশালের বৃহৎ আগুনে পরিণত করা যায়।

বিঃ দ্রঃ—এই একক অপরাধ-স্পৃহা [Single Doze] বা সংযুক্ত অপরাধ-স্পৃহা [Double Doze] মানুষের অবচেতন মনে সুপ্ত অবস্থাতে থাকে বহিঃ বা আন্তঃ উদ্বেলকে [লোভ, প্রয়োজন, দারিদ্র, ক্রোধ আদি] উদ্বেলিত তথা স্টিমিউলেটেড তথা প্রভোকড্ হলে ঐ অপরাধ-স্পৃহার শোণিত স্পৃহাংশ বা দ্রব্য-স্পৃহাংশ তাদের অবচেতন মন থেকে চেতন মনে এলে মানুষ অপরাধ করে। তবে—তৎপূর্বে কার্য-কারণ দ্বারা তাদের অপরাধ প্রতিরোধ-শক্তি তিরোহিত হওয়া চাই।

[সমান ভাবে স্নেহ ভাগ না হওয়া, বা স্নেহের একান্ত অভাবেও প্রতিরোধশক্তি সম্পর্কিত স্নায়ু শৈশবেই বিরূপ প্রতি-ক্রিয়াতে দুর্বল হয়। অন্য দিকে—শিশুদের দ্রুত স্বাধীনতা ব্যাঘ্রাদির মত তাদের নিষ্ঠুর বা গবয়াদির মত তাদেরকে নির্বোধ করবে। ওরা দ্রুত স্বাধীনতাভোগী। তৎসহ তারা পিতামাতার স্নেহ জন্মের কিছু পরেই আর পায় না। কিন্তু মনুষ্যশিশু বহু কাল পিতা-মাতার স্নেহ পায় ও বহু পরে স্বাধীন হয়।]

উল্লেখ্য—এই যে, প্রাথমিক অবস্থাতে অপরাধীরা ভারসেটাইল তথা বহুমুখীতা তথা বহুমুখী অপকর্মে অভ্যস্ত থাকাতে তারা বিভিন্ন প্রকৃতির [যৌনজ ও অযৌনজ] ও বিভিন্ন শ্রেণীর অপরাধ

করবে। তাই তারা একটি অপরাধ বা তার পদ্ধতি ত্যাগ করে অন্য এক অপরাধ বা অপরাধ-পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

এরা সমভাবে দ্রব্য-স্পৃহী ও শোণিত-স্পৃহী অপরাধীও হয়েছে। কিন্তু—তারা শেষ অবস্থায় প্রকৃত উৎকট অপরাধী হলে তারা অপকর্মে একীমুখীতা [স্পেশেলাইজড্] অর্জন করে। এই অবস্থাতে তারা বৃত্তিগত ভাবে একই পদ্ধতিতে একই প্রকারের অপরাধ সুষ্ঠু ভাবে করবে। এই ক্ষেত্রে যারা পকেটমারী চুরি প্রবঞ্চনা আদি অবল-প্রয়োগী অপরাধ করে, তারা খুন জখম, সিঁদ-মারী আদি ব্যক্তি বা বস্তুর বিরুদ্ধে বল-প্রয়োগী অপরাধ করে না। এক জন সিঁদেল চোরকে প্রবঞ্চনা অপরাধে কেউ অভিযুক্ত করলে তা সন্দেহজনক হবে।

এই অপরাধ-স্পৃহার মত আমাদের মধ্যে যৌন স্পৃহা রূপ অন্য একটি বৃত্তি আছে। এই উভয় বৃত্তিকেই আমাদের প্রতিরোধ-শক্তি প্রতিহত করে। যৌনস্পৃহা আমাদের দূর পূর্ব পুরুষ নিরস্থিক জীবদের থেকে ও অপরাধ-স্পৃহা অস্থিক জীবদের থেকে আদিম মানুষদের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি। এই অপরাধ-স্পৃহাকে আমরা কালক্রমে প্রদমিত করলেও আমরা যৌনস্পৃহাকে বংশরক্ষার্থে আমরা পুরাপুরি প্রদমিত না করে তাকে আমরা বিবাহের পথে নিয়ন্ত্রিত করেছি। তাই যৌন স্পৃহার মত অপরাধ-স্পৃহা আমরা অত বেশী অনুভব করি না।

এই যৌন-স্পৃহা অপরাধ-স্পৃহাবাহী হলে তা রেপ আদি যৌনজ অপরাধ। কিন্তু সৎ প্রেরণাবাহী হলে তা নিকষিত হেম প্রেম। এই যৌন স্পৃহা ও প্রেম-বোধ আদির উদ্ভব ও তাদের কার্যকরণ সম্বন্ধে যৌনজ-অপরাধ-শীর্ষক অন্য একটি প্রবন্ধে আলোচিত হবে।

জীবজগতে শিশুপালন

অতসি সেন*

'মা হওয়া কি মুখের কথা, শুধু প্রসব করলে হয় না মাতা'—কথাটি কেবল মানুষের বেলাতেই নয়, প্রাণীজগতের ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। মানুষ ছাড়া প্রায় প্রতি প্রাণীকেই অনেক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে বেঁচে থাকতে হয় বলে, সন্তান পালনে তারা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী সতর্ক। মাতৃদুগ্ধের বিকল্প বেবীফুড, রোগ নিরাময়ে চিকিৎসক আর প্রতিপালকের ভূমিকাটি 'নার্সারী' নেয়ায়, মানব মাতাদের দায়দায়িত্বটি বর্তমানে অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে এসেছে। বিশেষতঃ শত্রু-আক্রমণের আশঙ্কা না থাকায়, জীবজগতের গুরু দায়িত্বটিকে সঠিক উপলব্ধি করাটাই আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

মৌমাছি, পিঁপড়ে, উইপোকাদের সমাজ ব্যবস্থাটি অনেকটা আমাদের মতই। মায়েরা ডিম পেড়েই খালাস, প্রতিপালনের দায়িত্বটি আয়াদের। তবে সেখানেও কর্মী-পতঙ্গদের দায়িত্বটি আমাদের চিকিৎসক কি নার্সারী-কর্মীদের চেয়ে অনেক বেশী। শুধু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা কি খাওয়ানোদাওয়ানোতেই কর্তব্য শেষ হয় না, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেও চলতে হয়। গরমকালে পাখা কি 'এয়ারকুলার' আর শীতকালে 'রুম-হীটার' চালিয়ে দিলেই আমাদের চলে। কিন্তু কর্মী-মৌমাছিদের গ্রীষ্মকালে জল এনে মৌচাক ভিজিয়ে পাখনা নেড়ে হাওয়া করে ঠাণ্ডা করতে হয় আর শীতের সময় সবাই মিলে জড়াজড়ি করে দেহের উত্তাপে গরম করে তুলতে হয় সেটাকে। পিঁপড়ে-কর্মীদেরও তেমনি তাপ আর আর্দ্রতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ডিমগুলিকে বাসার দোতলা-একতলা করতে হয়। গ্রীষ্ম-মণ্ডলীর 'টার্ন'রা বাচ্চাদের রোদের তাপ থেকে বাঁচাবার জন্যে ডানা মেলে ছায়া করে আর ঠাণ্ডা জল এনে তাদের পালক ভিজিয়ে দেয়। কুমিরেরা গর্ত খুঁড়ে, ঝরাপাতা, আগাছা আর আবর্জনার স্তূপ তৈরি করে, পচানো উদ্ভিদের তাপে ডিম ফোটায়। 'স্ক্রাবটার্কি' বলে মুরগীদের জাতভায়েরাও এই রকম করে। শুধু তাই নয়, পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রার উঠানামার সঙ্গে সঙ্গেই জঞ্জালের স্তূপটিকেও কমাতে-বাড়াতে থাকে।

বনে-জঙ্গলে জীবজন্তুদের সদাসর্বদাই বাচ্চাদের বিপদাশঙ্কায় সতর্ক থাকতে হয়। যূথবদ্ধ স্তন্যপায়ীরা শিশুদের দলের মাঝখানে রাখে, আর 'চ্যানচিটো' বলে এক জাতের মাছেদের মা থাকে সন্তানদের সামনে আর পেছনে পাহারা দেয় তাদের বাপ। শত্রু-আক্রমণ থেকে বাঁচাতে বাপমায়েরা নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে দ্বিধা করে না। উত্তর আটলান্টিকের 'মুরগীমাছ' আর 'ফুসফুস মাছ'রা তো সমুদ্রচারী পাখি কি ইঁদুরের আক্রমণে মারা গেলেও ডিম ছেড়ে নড়ে না। কেউ কেউ আবার বাচ্চাদের জীবন বাঁচাতে নিজেরাই শত্রুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হরিণীরা করে 'ভাঙা ঠ্যাং'-এর অভিনয় আর পাখিরা 'ভাঙা ডানা'র। কিছু

* সেণ্ট্রাল ফুড লেবরেটরী, 3, কীড স্ট্রীট, কলিকাতা-700016

কিছু পাখিদের (Eider duck) আবার 'ক্রেশ' বা 'শিশুপালন কেন্দ্রও আছে। যেখানে দুই বা ততোধিক পাখিরা ব্যক্তিনির্বিশেষে সকলের সন্তানই পালন করে।

শুধু স্তন্যপায়ী, পাখি আর মাছেরাই নয় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গদেরও অনেকেই সন্তানপালনে যথেষ্ট যত্নশীল। 'শিল্ডবাগ্'-দের নামকরণের কারণই হল, তারা ডিম পেড়ে নিজেদের দেহ দিয়ে সেগুলিকে ঢেকে রাখে। 'লিফ্‌বীটল্'রাও ডিমগুলিকে পাহারা দেয় আর 'ইয়ারউইগ্' (Earwrig)রা শুধু পাহারাই দেয় না—ছত্রাকের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নও করে। অক্টোপাসেরাও কম যায় না! ডিমগুলিকে তারা নিজেদের দেহ দিয়ে ঢেকে রাখে বলে, খাদ্যপানীয়ের অভাবে সকলেই মারা পড়ে।

বাসা বাঁধার প্রধান কারণই হল প্রকৃতি আর শত্রুর হাত থেকে সন্তানদের রক্ষা করা। পাখিরা অধিকাংশই গাছের ওপরে বাসা বাঁধে, আর কচ্ছপ, কুমীরেরা মাটিতে গর্ত করে। জীবজন্তুদের অনেকেই বাচ্চাদের আরামের জন্যে হরেক রকমারী জিনিষ দিয়ে নরম নরম গদি বানায়। খরগোশের ত এর জন্যে নিজেদের গায়ের লোম পর্যন্ত বিসর্জন দিতে বাধে না। পোকামাকড়েরা অনেকেই মাটিতে গর্ত করে ডিম পাড়ে (উই, পিঁপড়ে), কেউ কেউ নিজেদের গড়া চাকের মধ্যে (বোলতা, মৌমাছি), আর অন্যেরা গাছগাছালির ফাঁকে (প্রজাপতি, মথ)।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 'ভাসমান' ব্যাঙেরা ডিমগুলির আঠালো নির্যাসটিকে ফেটিয়ে এক ধরণের ফেনার বাসা তৈরি করে। যার মধ্যে 'শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত' পরিবেশে ডিমগুলি বাড়তে থাকে। পূর্ব-আফ্রিকার ধূসর বর্ণের গেছো ব্যাঙেরা তাদের ফেনার বাসা তৈরি করে জলজ আগাছার গায়ে। নিউজীল্যাণ্ডের আদিম ব্যাঙেরা পুকুর, নদীর অভাবে নিজেদের ত্রিস্তরায় বাজকোষেই জল জমিয়ে পুকুর তৈরি করে দেয়, যার মধ্যে ব্যাঙাচিরা বড় হতে থাকে।

গাছের ওপরে কি মাটির বুকের চেয়ে জলের তলায় বাসা বানানোটা অনেক বেশী কঠিন। পুরুষ 'ব্যাঙমাছে'রা তাই তাদের ডিমগুলিকে লালার আবরণে ঢেকে ফুঁ দিয়ে ভাসিয়ে দেয় জলের ওপরে। শ্যাম দেশের 'যোদ্ধা' মাছেরা আর বর্মধারী 'বিড়াল মাছেরা এক অদ্ভুত ধরণের গৈরিক বুদবুদেরর বাসা তৈরি করে, যেগুলি পরস্পরে গায়ে আটকে জলের ওপরে ভেলার মত ভাসে। 'স্টিকলব্যাক'রা বাসা বানায় তাদের আঠালো বৃক্কক্ষরণ দিয়ে, জলজ উদ্ভিদ আগাছা জমিয়ে। 'পাচ' মাছেরা তাদের ডিমের মালাগুলিকে জড়িয়ে রাখে জলজ উদ্ভিদের গায়ে। ইওরোপের মিষ্টি জলের 'বুলহেড'রা ডিম পাড়ে পাথরের তলায় গর্ত খুঁড়ে আর 'জ্যাক ডেমসী', 'জুয়েল ফিসরা' (chichlidae) পাড়ে পাথরের গায়ে গর্ত করে। 'গোবী' মাছেরা সামুদ্রিক প্রাণীদের পরিত্যক্ত খোলায় বাস করলেও যাতায়াতের পথটা করে বালিতে গর্ত খুঁড়ে।

মাছেদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ডিমের খোলাটাকেই শক্ত করে বাচ্চাদের রক্ষা করে। সমুদ্র তীরে 'স্কেট' মাছেদের কাঁটা-ওলা ডিমগুলি আর 'পোর্ট জ্যাকসন' হাঙরদের ভাসমান বীজকোষগুলি এ বিষয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। 'মাখন মাছেরা' তাদের মাখনের মত ডিমের তালটিকে লুকিয়ে রাখে সামুদ্রিক প্রাণীদের পরিত্যক্ত খোলায় আর এশিয়, পূর্ব ইওরোপের 'বিটারলিং'রা ডিম পাড়ে ঝিনুকদের শ্বাসনালীতে। কিছু কিছু কীট-পতঙ্গেরাও এইভাবে তাদের ডিমগুলিকে বাঁচায়। তেলাপোকারা ডিমগুলিকে মুড়ে রাখে শক্ত খোলসে আর মাকড়সারা রেশমীতন্তু দিয়ে।

জীবজন্তুদের সকলেই অবশ্য বাসা বানায় না। কেউ কেউ তাদের 'কোলে' করেই 'মানুষ' করে। সন্তানবাহীদের মধ্যে ক্যাঙ্গারুর নাম তো সকলেরই জানা। নবজাতকেরা দুধটাও টেনে খেতে পারে না বলে, পিচকিরীর মত সেটিকে তাদের মুখেও ঢুকিয়ে দিতে হয়। শুধু ক্যাঙ্গারুদেরই নয়, অপোসম, কোয়ালা, ওয়ালেবাই থেকে আরম্ভ করে ইঁদুর, ছুঁচো অনেক জাতের প্রাণীদের মধ্যেই 'সন্তানবাহী থলি'র নিদর্শন পাওয়া যায়।

মাছেদের মধ্যেও এরকম দৃষ্টান্ত বিরল নয়। 'চোঙা মাছ' (pipe fish)' আর সমুদ্র-ঘোড়াদের পুরুষেরাই তাদের লেজের থলিতে ডিমগুলিকে বয়ে বেড়ায়। থলির রক্তনালীগুলি প্রয়োজনীয় অক্সিজেন জোগায়, সেই সঙ্গে বহু পুষ্টিকর বস্তুও। ছয়মাথাওলা তারামাছদের থলিটি থাকে তাদের মুখের কাছে। ডিম পাড়া সাঙ্গ হলেই সেগুলিকে মুছে পরিষ্কার করে তারা থলিতে ভরে নেয় আর সেখানেই দেহতাপের মাধ্যমে ডিম ফুটিয়ে সন্তান জন্ম দেয়। ডিমগুলি আঠালো, চটচটে হওয়ায়, পরিষ্কার না করলেই ময়লা জমে সেগুলি পচে ওঠে, আর থলি থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিলে দেহতাপের অভাবে দিন পাচেকের বেশী বাঁচতেই পারে না। দু মাস ধরে মুখের পাশে থলিটি ডিম ভর্তি থাকার ফলে, মাকে ততদিন উপোস করেই কাটাতে হয়।

'সন্তানবাহী থলি' সবার না থাকলেও সন্তান বহনের বৈশিষ্ট্য দাবী করতে পারে অনেকেই। বিড়ালমাছ, চোয়াল মাছ প্রভৃতি অনেক সামুদ্রিক মাছই ডিমগুলিকে তাদের মুখের ভেতরে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আমরা যে 'তিলাপিয়া' মাছ খাই, তারাও এই দলের। এর ফলে শত্রু-আক্রমণ থেকে রক্ষাই শুধু নয়, অক্সিজেন-ভরা জলস্রোতের সংস্পর্শলাভও ঘটে সর্বক্ষণ। বাচ্চারা বড় হয়ে না ওঠা পর্যন্ত কাছাকাছিই থাকে আর বিপদের গন্ধ পেলেই মার মুখের মধ্যে আশ্রয় নেয়।

কষ্টে বলেই 'কনভয়' মাছেদের অমন নামকরণ। শুধু মায়েরাই নয়, অনেক জাতের পুরুষেরাও এ বিষয়ে সমান পারদর্শী। দক্ষিণ আমেরিকার 'ডারউইন' ব্যাঙেদের বাচ্চারা থাকে তাদের গলার থলিতে। এ অবস্থায় খাদ্যপানীয় গ্রহণ সম্ভব নয় বলে, তাদের বহু দিন অনাহারেই কাটাতে হয়। দক্ষিণ আমেরিকায় 'বিছাগাছে'রা ডিমগুলিকে আটকে রাখে তাদের পেটের তলায়, পুরুষ 'কারতাস' মাছেরা জড়িয়ে রাখে মাথার আবের চারপাশে, আর বিলিতী 'কোলাম'দের জড়ানো থাকে সারা দেহেই। বিরাট জলজ পোকা' আর 'নেকড়ে মাকড়সা'রাও ডিমের থলি বয়ে বেড়ায়। 'নেকড়ে মাকড়সা' আর কাঁকড়া বিছাদের বাচ্চারাও মার পিঠে চড়েই বড় হয়। 'মারমোসেট' বলে আমেরিকার বাঁদরেরা তাদের যমজ শিশুদের পিঠে নিয়ে ঘোরে আর এদেশী বাঁদরেরা ঘোরে কোলে করে। ফিলিপাইনের 'উড়ুক্কু লেমুর'দের ছানাগুলি দোল খায় মায়ের গায়ের চামড়ার দোলনায়। জলচরীদেরও বাচ্চা পিঠে বইতে দেখা গেছে। তিতির, বনমুরগীরা তো ছানাদের পিঠে করে ওড়েও। এম্পারার পেঙ্গুইনরা তাদের বিরাট বিরাট ডিমগুলিকে পায়ের পাতার ওপর রেখে, পালকের আড়ালে ঢেকে, নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে থাকে দিনের পর দিন। কুমেরুর —80° ফারেনহিট ঠাণ্ডা কি 100 মাইল বেগে বহমান তুষার-ঝড় কোন কিছুই তাদের বিচলিত করতে পারে না। দু-মাসের প্রহরায় এভাবে তারা 37 থেকে 45 কেজি পর্যন্ত ওজন হারায়। 'ধাত্রী ব্যাঙ'দের পুরুষেরা তাদের পেছনের পায়ে ডিমগুলিকে মালার মত জড়িয়ে রাখে আর দক্ষিণ আমেরিকায় 'গেছো ব্যাঙ'রা তাদের ডিমের থলিটি বয়ে বেড়ায় পিঠে করে। 'সুরিনাম ব্যাঙে'র স্ত্রীরা আবার ডিমগুলিকে লুকিয়ে রাখে তাদের পিঠের ঢাকনা দেয়া চামড়ার বাক্সে—মৌচাকের মত অগুন্তি খোপে। ব্যাঙাচিগুলি আশী দিন পর্যন্ত মায়ের দেহরস চুষেই জীবন কাটায়। কাঁটাচুয়া আর অধিকাংশ মাংসাশী পশুরাই তাদের বাচ্চাদের ঘাড়ের মাংসটিকে দাঁতে চেপে ধরে তাদের বয়ে বেড়ায়। দন্তুরেরা (rodnet) আবার কামড়ে ধরে দেহের যে কোন অংশই।

একথা অবশ্য ঠিক যে, প্রাণীজগতে সকলেই সন্তানপালনে সমান আগ্রহী নয়। নিম্নতর প্রাণী তথা অমেরুদণ্ডী, মাছ, উভচর আর সরীসৃপদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা অত্যধিক। শুধু সঙ্গীই নয়, ডিমগুলিকেও ফেলে পালাতে তারা দ্বিধা করে না। প্রজাতির উদবর্তনের প্রয়োজনেই অনাগ্রহীদের ক্ষেত্রে ডিমের সংখ্যা অধিক হয়। যাতে যত্নের অভাবে অধিকাংশই প্রাণ হারালেও, অন্ততঃ কেউ কেউ বাঁচতে পারে। সামুদ্রিক 'সূর্যমাছে'রা তো পাঁচ কোটি পর্যন্ত ডিম পাড়ে। ছোট পরিবারের ক্ষীণজীবী শিশুরা যতই মাতৃনির্ভর হয়, পিতামাতাদেরও ততই যত্নশীল হতে হয়। সেইজন্যেই ব্লেনী, বেলে, লাম্পসাকার, যে সব মাছেরা কম সংখ্যক ডিম পাড়ে, তারা তাদের ডিমগুলিকে শুধু যে পাহারাই দেয় তা নয়, স্বাস্থ্য রক্ষার্থে পাখ্না নেড়ে অক্সিজেন ভরা জলস্রোতও পাঠায়। আফ্রিকা আর দক্ষিণ আমেরিকার 'চিচলিড' মাছেরা ত সন্ধ্যে হলেই বাচ্চাগুলিকে বাড়ীতে এনে ঘুম পাড়িয়েও দেয়। পাখি আর স্তন্যপায়ীরাই সর্বাপেক্ষা সন্তানবৎসল। সন্তানদের তারা শুধু রক্ষাই করে না, আহার্যও জোগায়। স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে তো, মাতৃদুগ্ধই নবজাতকদের একমাত্র খাদ্য, যা ছাড়া তাদের প্রাণই বাঁচে না। পাখিদের ক্ষেত্রে ডিম ফোটার পর থেকেই মাবাপ দু-জনকেই বাচ্চাদের পেট ভরানোর জন্যে সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হয়। কখনও কখনও কয়েক-শ' বার আসাযাওয়াও করতে হয় তাদের। কেউ কেউ আস্ত শিকার বয়ে আনে—যেমন পোকামাকড়ভোজীরা, আবার কোন কোন বাচ্চাদের চিবোবার বা হজম করার ক্ষমতা থাকে না বলে, তাদের মাবাপেরা খাওয়ায় হজম-করা খাবার—পায়রাদের বেলা যেটিকে বলা হয় 'পায়রার দুধ'। পাখির ছানারা সাধারণতঃ বেজায় পেটুক হয়, কিছুতেই আর তাদের পেট ভরতে চায় না। বাপমায়েরা স্নেহপ্রবণ হলেও কিন্তু স্নেহান্ধ হয় না কখনই। আর তাই গুরুভোজনের ফলে শিশু মৃত্যুও ঘটতে দেখা যায় না। খ্যাকশিয়াল, সিংহ প্রভৃতি মাংসাশী পশুরা বাচ্চাদের জন্যে আস্ত শিকার বয়ে আনে। অনেক সময় বড় বড় মাংসের টুকরো মুখের ভেতর করে এনেও উগড়ে দেয়। কয়োতের মত কেউ কেউ আবার পায়রাদের মতন হজম-করা খাবারও খাওয়ায়।

মানবশিশুদের মতই পাখির ছানারাও খাওয়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই বিছানা নোংরা করে ফেলে। সেগুলি জমে উঠে যাতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি না করে, সেজন্যে বাপমাদের তখনই তা পরিষ্কার করতে হয়। ক্ষুদে ক্ষুদে গাইয়ে পাখিরা তো এরজন্যে একটা পাত্রই তৈরি করে নেয়। যেটিকে তারা ঠোঁটে করে বয়ে নিয়ে যায়। পাখির বাসা মাত্রেই পোকামাকড় ভরা থাকে, যত্নশীল পিতা-মাতারা যতদূর সম্ভব সেগুলিকে খুঁটে খুঁটে খেয়ে ফেলে। বিড়ালছানারা আবার ভারী শিক্ষিত হয়, মা এসে গা না চাটলে প্রস্রাব পায়খানা কিছুই করে না। মায়েরা তখন ময়লাগুলি বয়ে নিয়ে গিয়ে দূরে ফেলে দিয়ে আসে।

জীবজন্তুদের পিতামাতারা সন্তানদের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারেও আমাদের চেয়ে অনেক বেশী সতর্ক হয়। এক কথায় বলতে গেলে, পুরো ডাক্তারীবিদ্যেটাকেই তাদের আয়ত্ত করতে হয়। স্তন্যপায়ীরা অনেকেই জিভ দিয়ে চেটে বাচ্চাদের 'মাসাজ' করে। এটা যে শুধু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্যেই প্রয়োজন তাই নয়,

নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস আর রক্তসঞ্চালনটিকেও সহজ করে। নবজাত মানবশিশুদের শ্বাসপ্রশ্বাসের গণ্ডগোল দেখা দিলে নার্স ডাক্তারেরা তাদের গরম আর ঠাণ্ডা জলে পর পর ডোবাতে থাকে। 'সীল'দের জ্ঞাতভাই কালিফোর্নিয়ার 'সমুদ্র-সিংহ'রা ডাঙ্গায় জন্ম দিলেও, নবজাতকদের সমুদ্রের জলে চুবিয়ে ধরে তাদের নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস সহজতর করার জন্যে আর শুশুকেরা করে ঠিক এর বিপরীত, জলে জন্ম দিলেও শিশুদের তুলে ধরে জল ছাড়িয়ে বাইরের বাতাসে। মুমূর্ষু রোগীদের আমরা যেমন 'অক্সিজেন-টেণ্টে' রাখি, অনেক মাছেরাও তেমনি পাখনা নেড়ে অক্সিজেনভরা জলস্রোত বাসায় ঢোকাতে থাকে, বদ্ধ জলটা বেরিয়ে গিয়ে যাতে ডিমগুলি পর্যাপ্ত অক্সিজেন পায়। ঠাণ্ডা গরম সম্বন্ধেও তারা খুব সতর্ক। আমেরিকার 'মারমোসেট' বাঁদরেরা তো শীতের রাতে বাচ্চাদের জাপটে জড়িয়ে রাখে যাতে কোনরকমেই একটুও ঠাণ্ডা না লাগে। বেশীর ভাগ সাপেরাই ডিম পেড়ে তাদের কর্তব্য সমাধা করলেও, শঙ্খচূড় সাপেরা ডিমগুলিকে জড়িয়ে থেকে তাপমাত্রাটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিচর্যা আর সুরক্ষার দায়িত্বটি পুরুষদের উপরই বর্তায়। 'স্টিকলব্যাক' মাছেরা ডিমগুলিকে মুখে করে বাসার ছাদে আটকে রাখে, আলগা হয়ে পড়ে গেলেই যত্ন করে তুলে আনে। সাঁতরাতে না শেখা পর্যন্ত এদিকওদিক চলে গেলে খুঁজে নিয়ে আসে। ময়লা-জীবাণু-ছত্রাক প্রতিরোধ আর অক্সিজেন যুক্ত জল যোগান দিতে তাদের আহার নিদ্রা ত্যাগ করতে হয়। বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ কম হলে ইওরোপের 'ধাত্রী ব্যাঙে'রা ডিমের মালাটিকে পায়ে জড়িয়ে পুকুরে ডুবিয়ে আনে। একই কারণে, 'ডেনড্রোবেটস্' জাতের 'বিষাক্ত তীর' ব্যাঙাচিরা বাপের পিঠে চড়ে পুকুরে স্নান করতে যায়।

পিঁপড়ে, মৌমাছি জাতীয় কীটপতঙ্গেরা তাদের অনাগত উত্তর পুরুষদের জন্যেও চিন্তা কম করে না। তারা যেন খাওয়ার কষ্ট না পায়, সেজন্যে আগে থেকেই খাবার জমিয়ে রাখে। মথ আর প্রজাপতিরা তাদের গুটিগুলিকে এমনই এক জাতের গাছের পাতায় আটকে রাখে, যেগুলিই তাদের একমাত্র খাদ্য। ময়দা আর শস্যচূর্ণভোজী বীটলরা ডিম পাড়ে মজুত শস্য ভাণ্ডারে। 'পাতাখোর' মৌমাছিরা ফাঁপা কাণ্ডে কি মাটির গর্তে ফুলের মধু জমিয়ে তাতে ডিম পাড়ে। গোবরে পোকারা পাড়ে বিষ্ঠার মণ্ড জমিয়ে, কারণ বাচ্চারা সেটাই খায়। 'সেক্সটন বীটল্' বা 'বেরিং (burying) বীটল' শিশুরা মাংস খেতে ভালবাসে বলে তাদের মায়েরা পাখি, ছুঁচো, ইঁদুর প্রভৃতির মৃতদেহ মাটির নীচে (কয়েক সেন্টিমিটার গভীরে) পুঁতে তার ওপরে ডিম পাড়ে। 'আম্মেফিলা' বলে একজাতের পোকারা মারা যাবার আগে, শুঁয়োপোকা, গঙ্গাফড়িং ইত্যাদি শিকারকে হুল ফুটিয়ে অজ্ঞান করে তার ওপরে ডিম পাড়ে, যাতে সে মারা গেলেও তার সন্তানেরা না খেয়ে কষ্ট না পায়। অনেকটা আমাদের ইনসিওরেন্স পলিসির মত।

জীবজগতে সন্তানেরা স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত বাপমায়েরা তাদের সতর্ক প্রহরায় আগলে রাখলেও, শিশুশিক্ষার প্রয়োজনীয়-তাটিও তারা ভোলে না। পাহাড়ে ভল্লুকেরা বুনো পেঁয়াজ, বচ প্রভৃতি সব্জী খুঁড়ে বের করতে শেখায় আর সেই সঙ্গেই শেখায় ইঁদুর, কাঠবিড়ালী প্রভৃতি শিকারদের গন্ধ শুঁকে, গর্ত থেকে খুঁচিয়ে বের করতে। সীলেরা শেখায় কি করে মাছ ধরতে হয়, বাঁদরেরা শেখায় বাদাম, কলা প্রভৃতি ফলমূলের খোসা ছাড়িয়ে শাঁস বের করতে। কুমীর, হাঁস, সীলেরা তাদের বাচ্চাদের সাঁতার কাটতে শেখায়। 'পাহাড়ে ভেড়া'রা শেখায় পাহাড়ে ওঠানামা। পাখিরা শেখায় কিভাবে উড়তে হয়। শেখার সময় ক্লান্ত হলে অনেক সময় বাপমায়ের পিঠের ওপরেই তারা আশ্রয় নেয়। গাংচিল জাতীয় যে সব পাখিদের ওড়ার নৈপুণ্য অধিক, তাদের আবার বেশী দিন শিক্ষানবিশী করতে হয়। আবাবিল আর বাতাসীরা শেখে কি ভাবে উড়তে উড়তেই পোকামাকড় ধরতে হয়। নবজাত মুরগীর ছানারা সহজাত প্রেরণাতেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সব কিছু খুঁটতে থাকলেও, মায়েদের শিক্ষার গুণে শীঘ্রই তারা পোকামাকড় আর শস্যকণা চিনতে শিখে, খাদ্যাখাদ্য বিচার করতে শেখে। গাইয়ে পাখিরা জন্ম থেকেই গান গাইতে জানলেও, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা তাদের 'ঘরানা'র বিশেষ রাগটি আয়ত্তও করে নেয়। সেইজন্যেই 'চ্যাফিনরাও একেক এলাকায় এক এক 'প্রাদেশিক' সুরে গান গায়। খরগোসেরা শেখায় কি ভাবে 'মড়ার ভান' করে শিকারীকে ধোঁকা দিতে হয়। হিংস্র পশুরা শেখায় কি করে শিকার করতে হয়। কাঁটাচুয়া আর কুমীর ছানাদের এ ওর লেজ মুখে করে সারি বেঁধে বাপমাকে অনুসরণ করাটা একটা দেখবার মত জিনিষ।

শিশুপালনে প্রথমেই প্রয়োজন মা ও শিশুর পারস্পরিক পরিচিতি। ঘ্রাণ, শ্রুতি, দৃষ্টি আর স্পর্শ এই চারিটি ইন্দ্রিয় মাধ্যমেই প্রধানতঃ এটি সাধিত হয়। গরু, ভেড়া প্রভৃতি স্তন্য-পায়ীরা গন্ধ শুঁকেই নিজের সন্তানটিকে চিনে নেয়। মৌমাছি আর কীটপতঙ্গদের ক্ষেত্রেও তাই। পাখিদের ক্ষেত্রে প্রতিটি পিতামাতারই একটি করে 'বিশেষ' ডাক থাকে, যা শুনে শিশুরা তাদের চিনতে পারে। অস্ট্রেলীয় প্রকৃতি-বিজ্ঞানী ডঃ কনরাড লোরেন্স দেখেছেন, ডিম ফোটার পর সেই 'বিশেষ' ডাকটি অনুকরণ করতে পারলে রাজহাঁসের বাচ্চারা যে কোন অনুকরণ-কারীকেই অনুসরণ করে। আকৃতির প্রভাবটিও অবশ্য কম নয়। পাখিরা বাসায় এলেই বাচ্চারা খাবার জন্যে মুখ হাঁ করে, কিন্তু মাবাবার আকৃতিটি এক্ষেত্রে সঠিক হওয়া প্রয়োজন। স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে স্পর্শেন্দ্রিয়টিরও অসীম প্রভাব

বাঁদর ছানাকে তার মার কোল থেকে নিয়ে মাটিতে বসিয়ে দিলে তার কষ্ট হচ্ছে বোঝা যায়, কিন্তু কোন মানুষ তাকে কোলে নিলে সে তাকেই মা বলে জড়িয়ে ধরে।

জীবজগতে সকলেই যে খুব একটা সন্তানবৎসল তা অবশ্য নয়। হিসেব নিয়ে দেখা গেছে অগণিত প্রজাতির মধ্যে হাজারে মাত্র একজনই এ দলে পড়ে। সমুদ্র-ঘোড়া, স্টিকলব্যাক প্রভৃতি মাছেদের, সালামাণ্ডার জাতীয় উভচরদের আর সাপ, গিরগিটী ইত্যাদি সরীসৃপদের পুরুষেরাই ছেলেমেয়েদের দেখাশোনার ভার নিলেও, বিড়াল, সিংহ প্রভৃতি মাংসাশী শিশুদের অনেককেই নবজাত শিশুদের মেরে ফেলতেও দেখা গেছে। মায়েদেরই সেজন্যে তাদের নিরাপদ আশ্রয়ে লুকিয়ে রাখতে হয়। কাছিম প্রভৃতি অনেক সরীসৃপেরাও সন্তানপালনে বীতস্পৃহ। অবশ্য ব্যতিক্রম থাকলেও তারা যে আমাদের চেয়ে স্নেহ-সতর্ক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বাড়ীর নবজাত বাছুরটিকে আদর করতে গেলেই দেখা যায় বহুদিনের পোষা গরুটিও যেন আমাদের তেমন আর বিশ্বাস করতে পারছে না।

কিশোর বিজ্ঞানীর আসর

ভাবা স্মরণে

রতনমোহন খাঁ*

No power is as experience no power.—পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ প্রয়োগের উপর তৃতীয় জেনেভা সম্মেলনে এই কথাগুলি বলেছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞানী হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা। এই বিজ্ঞানীই হলেন ভারতে পারমাণবিক গবেষণার রূপকার,

ডঃ ভাবা

নিউক্লীয় শক্তির বাণিজ্যিক প্রয়োগের বলিষ্ঠ প্রবক্তা, সার্বিক উন্নয়নের সঙ্গে বিজ্ঞান গবেষণার সমন্বয়সাধনের আজীবন সংগ্রামী সৈনিক ও স্বাধীনোত্তর ভারতের বহু কর্মোদ্যোগের কর্ণধার।

হোমি ভাবা 1909 খ্রীস্টাব্দে 30শে অক্টোবর বোম্বেতে জাহাঙ্গীর এইচ. ভাবা ও মেহেরবাঈ ফ্রামজী পাণ্ডের সন্তান হিসাবে জন্মগ্রহণ করেন। সতের বছর বয়স পর্যন্ত বোম্বের ক্যাথেড্রাল ও জন ক্যানন স্কুল, এলফিনস্টান কলেজ ও বিজ্ঞান কলেজে তাঁর পড়াশুনা চলে 1927 খৃস্টাব্দে তিনি কেম্ব্রিজের কেয়াশ কলেজে ভর্তি হন। পিতা ও পিসেমশায় দোড়াব টাটার ইচ্ছা ছিল হোমি ভাবা ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে জামসেদপুরে টাটা আয়রন এণ্ড স্টীল কোম্পানীতে যুক্ত হবেন। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভর্তি হন এবং মেকানিক্যাল বিভাগে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই শুরু করেন পদার্থবিদ্যায় তত্ত্বগত গবেষণা। গবেষণার মধ্য দিয়ে সত্যকে জানা ও নূতন পথের সন্ধানী হওয়াই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। ভারতের সন্তান ভারতীয় ঋষির মত দীর্ঘ পনেরো বছর পশ্চিমী দুনিয়ায় নিমগ্ন থাকেন বিজ্ঞানের সাধনায়। কাজের সাফল্যের মধ্য দিয়ে তিনি পেয়েছিলেন বহু সম্মানীয় বৃত্তি, পেয়েছিলেন নব নব চিন্তার উন্মেষকারী বিজ্ঞানীদের সাহচর্য। ক্যাভেণ্ডিস গবেষণাগারে তাঁর গবেষণার সূত্রপাত। ঐ সময়ই ইউরোপে ঘটে বিজ্ঞানের নানা বিস্ময়কর আবিষ্কার। 1932 খৃস্টাব্দে স্যাডউইক আবিষ্কার করলেন মুক্ত নিউট্রন যার ভর প্রোটনের সমান অথচ আধানহীন। পরমাণু কেবল ইলেকট্রন ও প্রোটন দিয়ে গঠিত এই ভুল ভেঙ্গে গেল। ঐ বছরই অ্যাণ্ডারসন মহাজাগতিক বিকিরণে পজিট্রনের অস্তিত্ব দেখালেন। ডিরাকের তাত্ত্বিক প্রতিকণা বাস্তবে ধরা পড়ল। 1928 খৃস্টাব্দে কক্রফট্‌ ও ওয়ালটন উচ্চ গতিসম্পন্ন প্রোটনের সাহায্যে লিথিয়াম নিউক্লিয়াস ভাঙতে সমর্থ হন। ব্ল্যাকেটের মেঘকক্ষে ইলেকট্রন জুরির সন্ধান মিলল। কেন্দ্রে প্রোটন ও নিউট্রন একত্রে থাকে কিভাবে—এ প্রশ্নের সমাধানে ইউকাওয়া মেসন তত্ত্বের ধারণা দিলেন। পদার্থবিজ্ঞানে গবেষণার ক্ষেত্র নানাদিকে প্রসারিত হলো। এরূপ যুগসন্ধিক্ষণে ভাবা কোয়ান্টাম গতিবিজ্ঞানে উৎসাহিত হলেন। কাজের সুযোগ এল অভাবনীয়ভাবে। 1933 খৃস্টাব্দে রাউজ্‌বল পর্যটন বৃত্তি পেয়ে ইউরোপে বহু স্থানে ঘোরার সুযোগ পান। জুরিখে পাউলি, রোমে ফার্মি, ইউট্রেশে ক্রামাস প্রমুখ তৎকালীন প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানী-দের সান্নিধ্যে এসে তাঁদের কাজের সঙ্গে, তাঁদের চিন্তাধারার সঙ্গে সরাসরি পরিচিত হন। এরই ফল হিসাবে 1933 খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গবেষণাপত্র ইলেকট্রন স্রোত ও গামা বিকিরণ শোষণের উপর। এই পত্রের জন্যই তিনি নীলস বোর

*সিটি কলেজ, কলিকাতা-700009

সঙ্গে যুগ্মভাবে আইজাক নিউটন বৃত্তি পান। 1935 খৃস্টাব্দে পান কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী। মহাজাগতিক রশ্মি, মৌলকণার শক্তি, উচ্চশক্তি পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের উপর প্রায় পঞ্চাশটি গবেষণা-পত্রে তাঁর মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণতঃ প্রবন্ধগুলি 1954 খৃস্টাব্দের আগেই প্রকাশিত হয়। তিনিই প্রথম ইলেকট্রন-প্রোটন বিক্ষেপণের প্রস্থচ্ছেদ নির্ণয় করেন যা ভাবা বিক্ষোণ নামে পরিচিত।

1939 খৃস্টাব্দে ভাবা দেশে আসেন ছুটিতে। তারপরই শুরু হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। ভাবার আর কেম্ব্রিজে ফিরে যাওয়া হলো না। 1940 খৃস্টাব্দে বাঙ্গালোরে ইণ্ডিয়ান ইনিস্টিটিউট অব্ সায়েন্সে মহাজাগতিক রশ্মি গবেষণার দায়িত্বভার নিয়ে রীডার পদে নিযুক্ত হন। 1942 খৃস্টাব্দে অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে ভাবা পরিবারে কেবল আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না, শিক্ষাদীক্ষায়, শিল্পকলায়, সঙ্গীতে, স্বাদেশিকতায় ঐ পরিবারের ছিল বিশিষ্ট ভূমিকা। ভাবা পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন ছিল টাটা পরিবারের। মেধাবী ছাত্র হিসাবে টাটা পরিবারে হোমি ভাবার ছিল খুবই কদর। স্কুল-কলেজে পড়ার সময়ই তিনি ঐ পরিবারের বিভিন্ন শিল্পের উন্নয়নমূলক আলোচনায় যোগ দিতেন। শিল্পকে আধুনিকীকরণের জন্য বিজ্ঞান ও দেশীয় বিজ্ঞান-কুশলীদের যে একান্ত প্রয়োজন সেটা তখনই তিনি অনুভব করেছিলেন। আবার পিতামহের বিরাট গ্রন্থাগার তাঁকে উচ্চ শিক্ষালাভে আকৃষ্ট করে। পিতা ও পিসিমার সংগৃহীত পেন্টিং, বিটোভেন ও মোৎসার্টের সঙ্গীতের রেকর্ড তাঁকে সৌন্দর্য ও সঙ্গীত-প্রিয় করে তোলে। শৈশব ও কৈশোরের এসব অনুভূতি বিদেশে গবেষণার কাজের চাপে অন্তরে ছিল সুপ্ত। বাঙ্গালোরে থাকাকালীন দেশের উন্নতির জন্য, শিল্পের প্রসারের জন্য দেশের তরুণ বিজ্ঞানীদের আধুনিক বিজ্ঞানের গতিবিধির সঙ্গে পরিচিত করে তুলতে হবে, তাদেরই সাহায্যে দেশকে স্বনির্ভর করে তুলতে হবে —এসব চিন্তা তাঁকে বার বার পীড়িত করতে থাকে। তাঁর মনের বাসনা জানিয়ে স্যার দোড়াব টাটা ট্রাস্টের তত্ত্বাবধায়ক সোরাব সাকলাভাতাকে তিনি এক চিঠি দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে 1945 খৃস্টাব্দে The Tata Institute of Fundamental Research -এর প্রতিষ্ঠা হয় বোম্বেতে একটি ছোট ঘরে। 1948 খৃস্টাব্দে এটি স্থানান্তরিত হয় Royal Yacht Club-এ। বর্তমান ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় 1954 খৃস্টাব্দে এবং এর দ্বারোদঘাটন করেন জহরলাল নেহেরু 1962 খৃস্টাব্দে। মৌল গবেষণা, পারমাণবিক গবেষণা, নিউক্লিয় শক্তির গবেষণা, শিল্প ক্ষেত্রে প্রয়োগভিত্তিক গবেষণার জন্য এই ইনিস্টিটিউট পৃথিবীর নামকরা গবেষণাগারগুলির মধ্যে অন্যতম। কোলাবার এই ভবন ভাবার সৌন্দর্যপ্রীতির অপূর্ব নিদর্শন।

আধুনিক বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি আয়ত্ত করে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা যাতে উন্নত দেশগুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দেশের উন্নয়নের সামিল হতে পারে, ভারতকে যাতে বিদেশী কলাকুশলীদের উপর নির্ভর করতে না হয় তার জন্য ভাবা বেশ কিছু প্রকল্প কার্যকরী করেছিলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় 1948 খৃস্টাব্দে ভারতীয় সংসদে Indian Atomic Energy Act পাশ হয়। Natural Resources and Scientific Research Commission-এর তিনি সভাপতি ছিলেন। 1954তে ট্রম্বেতে স্থাপিত Atomic Energy Establishment-এর পরিকল্পনাও তাঁর। 1967 খৃস্টাব্দে 12ই জুন প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ভাবার নামে এই ভবনটি উৎসর্গ করেন ও এর নূতন নামকরণ করেন—The Bhaba Atomic Research Centre। ভাবার পরিকল্পনা ও নক্সা অনুযায়ী ভারতীয় বিজ্ঞানীরা ভারতে প্রথম রিয়্যাক্টর (1 M W) অপ্সরা নির্মাণ করে ও কাজ শুরু হয় 1956 খৃস্টাব্দের 4ঠা অগাস্ট। ভাবা বিশ্বাস করতেন—ভারতের শিল্প ও কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শক্তির চাহিদা দারুণভাবে বৃদ্ধি পাবে। তিনি অনুমান করেছিলেন ঐ চাহিদা 1971-তে হবে প্রায় 1200 M W এবং 1986-তে হবে 20000 M W-এর মত। পারমাণবিক শক্তি ছাড়া এই বিপুল চাহিদা মেটান সম্ভব নয়। তাই পরমাণু চুল্লী স্থাপন একান্ত প্রয়োজন। পরমাণু বোমার আতঙ্কে ও বিপুল পরিমাণ প্রাথমিক অর্থ বিনিয়োগের কথা ভেবে বহু অর্থবিদ ও রাজনীতিবিদ এই পথ পরিহার করার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু ভাবার দূরদর্শিতা, দৃঢ়তা ও যুক্তি ভারত সরকারকে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণে বাধ্য করে। 1960 খৃস্টাব্দে জুলাই মাসে ট্রম্বেতে কানাডার সহযোগিতায় 40 M W শক্তি উৎপাদনক্ষম পরমাণু চুল্লী স্থাপিত হয়। এরপর এরূপ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে মহারাষ্ট্রের তারাপুরে (1968 খৃঃ) রাজস্থানের কোটায়, তামিলনাড়ুর কলপক্কমে, উত্তরপ্রদেশের নারোরাতে। অবশ্য ভাবা এ কেন্দ্রগুলি দেখে যেতে পারেন নি। ভারতে মহাকাশ গবেষণা পরিকল্পনার উদ্যোক্তাও তিনি। তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় 1962 খৃস্টাব্দে ডঃ সারাভাইকে সভাপতি করে Indian National Committee for Space Research গড়ে ওঠে, আর গড়ে ওঠে Thumba Equatorial Rocket Launching Station. ভাবা কমিটির ইলেকট্রনিক্সের উপর প্রতিবেদনকে ভিত্তি করেই গঠিত হয় Government Electronics Commission. এই কমিশন ও ভারত সরকারের বিজ্ঞান বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির তিনি আমৃত্যু সভাপতি ছিলেন। ভারতের বহু গবেষণা সংস্থা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাঁর কাছে ঋণী। 1960-63 খৃস্টাব্দ

পর্যন্ত তিনি International Union of Pure and Applied Physics-এর সভাপতি ছিলেন। দেশে-বিদেশে তিনি পেয়েছেন নানা সম্মান ও পুরস্কার। 1954 খৃস্টাব্দে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত করেন।

1955 খৃস্টাব্দে ভারত আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রসমূহের শিরোনামে আসে তাঁরই কাজে ও কর্মে। ভারত যে শান্তি ও মৈত্রীর বাণীর ধারক ও বাহক তা আবার ঘোষিত হলো তাঁরই উদাত্ত কণ্ঠে 1955 খৃস্টাব্দে জেনেভায় পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ প্রয়োগের উপর প্রথম সম্মেলনে। এ সম্মেলনের প্রস্তুতিতে তাঁরই ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছিলেন—আমি বিশ্বাস করি, অচিরেই এমন কলাকৌশলে আয়ত্ত হবে যাতে পারমাণবিক শক্তি সুসংযতভাবে উৎপন্ন হবে এবং সারা বিশ্বে আর শক্তির কোন অভাব থাকবে না। এ সম্মেলনের পরেই আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে ঠাণ্ডা যুদ্ধের কিছুটা অবসান ঘটে এবং দুই দেশের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মতামত বিনিময়ের সূত্রপাত হয়। পারমাণবিক শক্তি ও পারমাণবিক গবেষণা দিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য গঠিত হয় International Atomic Energy Agency, যার সক্রিয় সদস্য ছিলেন ভাবা। ভাবার স্বপ্ন ছিল—পারমাণবিক শক্তি হিরোসিমা-নাগাসাকির ত্রাস সঞ্চার না করে মানব কল্যাণে নিয়োজিত হবে, ধনী-দরিদ্র দেশের বৈষম্য লোপ পাবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় জেনেভা সম্মেলনে পারমাণবিক শক্তির প্রয়োগে অনুন্নত দেশগুলির দারিদ্র্য মোচনের উপর তাঁর গবেষণামূলক পত্রগুলি ঐ স্বপ্নেরই সাক্ষ্য বহন করে।

1966 খৃস্টাব্দে 24শে জুন International Atomic Energy Agency-র ভিয়েনা সভায় যোগ দিতে যাবার পথে মণ্ট ব্ল্যাঙ্কে বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় এই মানব দরদী বিজ্ঞানীর। আকস্মিক দুর্ঘটনায় মর্মাহত ইন্দিরা গান্ধী সেদিন বলেছিলেন—To lose Dr. Homi Bhabha at this crucial moment in the development of our atomic energy programme is a terrible blow for our nation. ঐ বছর 4ঠা অগাস্ট তাঁর স্মরণে ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়। তাঁর জন্মের 75 বছর পরে তাঁকে আমরা স্মরণ করছি, তাঁর কর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী হিসাবে স্বীকৃতি লাভের জন্য, ভারতবাসী হিসাবে গর্ব বোধ করছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে স্বপ্ন যে আশা নিয়ে তিনি ভারতে বিজ্ঞান গবেষণায় পথ প্রশস্ত করেছিলেন, সে স্বপ্ন আজো বাস্তবায়িত হয় নি। আজো আমরা গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে বিদেশী কলাকুশলীদের মুখাপেক্ষী, আজো আমরা নিদারুণ শক্তি সঙ্কটের শিকার।

ছত্রাক

সুশান্তকুমার লক্ষ্মণ*

ফানজাই (Fungi) বহুবচন, একবচনে ফাংগাস (Fungus), বাংলায় ছত্রাক হলেও এটি সাধারণের কাছে 'ব্যাঙের ছাতা' নামে পরিচিত। আদি অবস্থায় জীবের বিভিন্ন ধরণের বিপাকীয় কার্যাদির ফলে নানাজীবের উদ্ভব হয়েছে। অভিব্যক্তির কোন এক পর্যায়ে জীবের কিছু বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হয়ে ছত্রাকজাতীয় উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়েছে। ফানজাই বা ছত্রাক সমাঙ্গদেহী বা থ্যালোফাইটা (Thallophyta) উদ্ভিদের অন্তর্গত। এদের দেহটি মূল কাণ্ড বা পাতায় বিভক্ত নেই। দেহটি সমাঙ্গ দেহ বা থ্যালাস (Thallus)। উদ্ভিদবিদ্যায় ছত্রাক বিষয়ক শাখাটিকে 'মাইকোলজী' (Mycology) বলে এবং এই শাখার বিশেষজ্ঞকে মাইকোলজিস্ট (Mycologist) বলে।

পৃথিবীর সর্বত্রই ছত্রাক দেখা যায়। প্রকৃতির এমন কোন জায়গা নেই যেখানে এদেরকে দেখতে পাওয়া যায় না। এদের অভিযোজন করবার ক্ষমতা খুব বেশী। 0°—35°C তাপমাত্রায় এবং সামান্য অ্যাসিড মাধ্যমে (PH'—PH^{6}) এদের বৃদ্ধি সবচেয়ে ভাল হয়। এদের দেহের বৃদ্ধির জন্য আলোকের প্রয়োজন হয় না কিন্তু রেণু উৎপাদনের সময় কিছু প্রয়োজন হয়। গভীর অরণ্য, উন্মুক্ত প্রান্তর বা চাষভূমি, সামুদ্রিক বা মিঠা জল হিমবাহ এমনকি মেরু অঞ্চলেও এদেরকে দেখা যায়। স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে পচা ফল, রুটি, জ্যাম, জেলি, পনীর, মোরব্বা, চাটনি, পশুর মলে, ভিজাচামড়ায়, দারগাদায় কলোনি করে এরা বাস করে। এরা মানুষসহ প্রাণীদেহের উপর পরজীবীরূপেও জন্মায়, গরু, মহিষ, ঘোড়া, ভেড়া, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি গৃহপালিত ও বন্যপশুর খুর (hoof), লোম, চোখ, ত্বক এবং বিভিন্ন আন্তর যন্ত্রেও বাসা বাঁধে।

ছত্রাকের দেহে কোন ক্লোরোফিল কণা থাকে না বলে এরা মৃতজীবী (Saprophyte), পরজীবী (Parasito) ও মিথোজীবী (Symbiotic) রূপে বাস করে। পরজীবী ছত্রাককে আবার অন্তঃপরজীবী এবং বহিঃপরজীবী হিসাবেও বাস করতে দেখা যায়। এদের পরজীবিতাও আবার আংশিক বা সম্পূর্ণ হতে পারে। দেহটি পচা গলা জীবদেহের অথবা অন্য কোন জৈবপদার্থের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংস্পর্শ থেকে খাদ্যবস্তু সরাসরি ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শোষণ করে। পরজীবীয় ছত্রাক হাইফা এবং হস্টেরিয়া (haustoria) নামক বিশেষ একপ্রকার চোষক অঙ্গদ্বারা খাদ্য বস্তু শোষণ করে কিন্তু মানুষের দেহে বসবাসকারী পরজীবীয় ছত্রাক হস্টেরিয়ার সাহায্যে খাদ্যবস্তু শোষণ করে না। হস্টেরিয়াগুলি আবের ন্যায় খর্ব বা দীর্ঘ, শাখাহীন চেটাল বা শাখান্বিত ক্ষুদ্রাকার মূলতন্ত্রের (root-system) মত দেখতে। বহিঃপরজীবী ছত্রাক অ্যাপ্রেসোরিয়াম (appressorium) নামক বিশেষ এক প্রকার সংযোজন অঙ্গের দ্বারা পোষকের দেহে আটকে থাকে। এগুলি ছত্রাকের অনুসূত্র (hypa) থেকে সৃষ্টি হয়। অ্যাপ্রেসোরিয়ামগুলি দেখতে চ্যাপ্টা চাকৃতির ন্যায়।

এদের বসবাস করবার ক্ষমতা চমৎকার। কিছু ছত্রাককে শৈবালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বাস করতে দেখা যায়। শৈবালের সঙ্গে যুক্তাবস্থায় একে লাইকেন (Lichen) বলে। কখনও কখনও ছত্রাকেরা গুপ্তবীজী ও ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের মূলে ঘনিষ্ঠভাবে বাস করে। এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধকে মাইকোরাইজা (Mycorrhiza) এবং এই সমস্ত ছত্রাককে মাইকোরাইজাল ছত্রাক (Mycorrhizal fungi) বলে। এইরূপ দুই অবস্থায় পোষকের কিন্তু কোন ক্ষতি হয়না বরং ঐ সকল উদ্ভিদকে খাদ্য যোগান দেয়। আবার অনেক ছত্রাক উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের দেহের বহির্ভাগে কোনরূপ ক্ষতি না করে পরাশ্রয়ী রূপে (epiphytically) বসবাস করে। এই প্রকৃতির ছত্রাকদের পরাশ্রয়ী ছত্রাক (epiphytic fungi) বলে।

এরা খুব তাড়াতাড়ি বংশবিস্তার করে। অনুকূল বা প্রতিকূল যেকোন অবস্থায় এরা জননক্রিয়া সম্পন্ন করে। প্রধানতঃ যৌন, অযৌন, অঙ্গজ—এই তিনটি পদ্ধতিতে এদের জননক্রিয়া হয়। তবে অপুংজনন পদ্ধতিও কিছু ছত্রাকের মধ্যে ঘটতে দেখা যায়

ছত্রাক অত্যন্ত ভয়ংকর রূপ ধারণ করতে পারে। ফসলের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। এরা ডেকে আনে দুর্ভিক্ষ, মহামারী। 1845-46 খৃস্টাব্দে আয়ার্ল্যাণ্ডে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ তা এই ছত্রাকের দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছিল। তা ছাড়া 1943 খৃস্টাব্দে অবিভক্ত বাংলায় যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, বলা বাহুল্য তারও অন্যতম কারণ ছিল এই ছত্রাক। এরা মানুষ থেকে আরম্ভ করে সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদকুলের রোগ সৃষ্টি করে। উদ্ভিদরোগ সৃষ্টিকারী ছত্রাকের সংখ্যা প্রায় 2,000। উদ্ভিদদেহে যত প্রকারের পরজীবীয় রোগ দেখা যায় তার মধ্যে ছত্রাকঘটিত রোগগুলিই প্রধান। কয়েকটি ছত্রাকঘটিত উদ্ভিদরোগের এবং সেই রোগ সৃষ্টিকারী ছত্রাকের নাম উল্লেখ করা হল :—

* পোঃ—কেঞ্জেকুড়া জেলা:—বাঁকুড়া

	ছত্রাকের নাম	গাছের নাম	রোগের নাম
1.	ওলপিডিয়াম ব্রাসিকি (Olpidium brassicae)	লেটুশ	পাতার কুঞ্চন
2.	সিনকাইট্রিয়াম এণ্ডোবায়োটিকাম (Synchitrium endobioticum)	আলু	গুটি বা গড়ুরোগ (Wart disease).
3.	পিথিয়াম ডিব্যারিয়ানাম (Pythium debaryanum)	অপরিণত তামাক	"ড্যাম্পিং অফ" (Dampingoff disease).
4.	ফাইটফ্থোরা ইনফেস্টান্স (Phytophthora ihfestans)	আলু	নাবিধ্বসা ও স্ফীতকণ্ডের পচন (Late blight & rot)
5.	রাইজোপাস স্টোলোনিফার (Rhizopus Stolonifer)	মিষ্টি আলুর ও স্ট্রবেরীর	নরম পচন ও লিক (Soft rot & Leak).
6.	ক্লাভিসেপস্ পারপিউরিয়া (Claviceps Purpurea)	রাই	আরগট (Ergot disease).
7.	পেনিসিলিয়াম ইটালিকাম (Penicillium italicum) পেনিসিলিয়াম ডিজিটেটাম (Penicillium digitatum)	লেবু ফলের	পচনরোগ (Rot disea e).
8.	পলিপোরাস গিলভাস (Polyporus gilvus)	শাল, বাবলা, শিশু	শ্বেতপচন রোগ (White rot di ease).
9.	অলটারনেরিয়া সোলানী (Alternaria Solani)	আলু	জলদি ধ্বসা (Early blight).
10.	হেলমিনথোস্পোরিয়াম ওরাইজী (Helminthosporium Oryzae)	ধান	চিটে বা পিঙ্গলবর্ণের দাগ (Brown Spot)
11.	ম্যাক্রোফোমিনা ফ্যাসিওলি (Macrophomina Phaseoli)	পাট	কাণ্ডের পচন বা ডাঁটাপচা (Stem rot disease)
12.	কলেটোট্রিকাম ফ্যালকেটাম (Colletotrichum falcatum)	আখ	লোহিত পচনরোগ (Red-rot).
13.	ফিউসেরিয়াম উডাম (Fu arium Udum)	অড়হর	উইল্ট (Wilt).
14.	পিরিকুলেরিয়া ওরাইজী (Piricularia Oryzae)	ধান	ঝলসানো বা ব্লাস্টরোগ (Blast disease).
15.	সারকোস্পোরা পারসোনেটা (Cercospora Personata)	চিনাবাদাম	Leaf spot বা 'টিক্কা' (Tikka).
16.	কলেটোট্রিকাম গ্লিওস্পোরিয়ডিস (Colletotrichum gloeosporioides)	আমফলের	অ্যানথ্রাকনোস বা ঢেঁড়ি (Anthracnose). (গুটির ন্যায় ক্ষত বিশেষ)
17.	ট্রাইকোথেসিয়াম রোসিয়াম (Trichothecium roseum)	আপেলফলের	গোলাপী পচন (Pink rot).
18.	পাক্সিনিয়া গ্রামিনীস ট্রিটিসি	গম	কৃষ্ণবর্ণ মরিচারোগ

	ছত্রাকের নাম	গাছের নাম	রোগের নাম
	(Puccinia graminis tritici)		(Black rust disease).
19.	উস্টিলাগো ট্রিটিসি (Ustilago tritici) (Ustilago nude var. tritici)	গম	আল্‌গা স্মাট বা ছেতোরোগ (Loose smut disease).
20.	পেস্টালোসিয়া থিয়া (Pestalotia theae)	চা	ধূসর ধ্বসা (Grey blight)
21.	উস্টিলাগো মেডিস (Ustilago maydis)	ভুট্টা	স্মাটরোগ (Smut disease).

প্রাকৃতিক পরিবেশে এদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া কঠিন তবে কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করলে সামান্য নিস্তার পাওয়া যেতে পারে। ব্যবস্থাগুলি হল :—

1। নীরোগ ও সুস্পষ্ট ফসলের বীজ ব্যবহার করতে হবে।

2। জমিতে বীজ লাগাবার পূর্বে বীজগুলিকে ছত্রাকনাশক ঔষধ দিয়ে শোধন করে নিতে হবে।

3। জমিতে ফসল লাগাবার আগে আগাছা দমনের ব্যবস্থা করতে হবে।

ফসল লাগাবার আগে জমিতে লাঙল দিয়ে মাটিকে রৌদ্রে শুকিয়ে নিতে হবে।

5। ছত্রাকনাশক রাসায়নিক ঔষধ স্প্রে, চূর্ণরূপে বা সেচন মাধ্যমে করতে হবে।

6। জমিতে উপযুক্ত জলনিকাশের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

রাসায়নিক পদার্থদ্বারা কিছু কিছু ছত্রাককে দমন করা যায়। ছত্রাকনাশক ঔষধ (Fungicides) পরজীবীর পক্ষে বিষাক্ত এবং তাকে ধ্বংস করে কিন্তু হোস্টের কোনরূপ ক্ষতিসাধন করে না। রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে মৌলিক সালফার, সালফার ডাই-অক্সাইড, ক্যাপটান, বেনজয়িক অ্যাসিড, বোরক্স, সোডিয়াম কার্বোনেট, নাইট্রোজেন ট্রাইক্লোরাইট, থিয়াবেন ডাজল হল জোরাল ছত্রাকনাশক উপাদান।

এছাড়া এর মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের আক্রমণ করে রোগ সৃষ্টি করে। ব্রাঙ্কিওমাইসিস স্যাংগুইনিস (Branchiomyces Sanguinis) নামে এক ছত্রাক মাছের ফুলকাপচা (Gill-rot) রোগ সৃষ্টি করে। স্যাপ্রোলেগনিয়া (Saprolegnia) ছত্রাক মাছের ত্বকের গভীরে হাইফি বিস্তার করে খাদ্য শোষণ করে। ফলে মাছ দুর্বল হয়ে মারা যায়। আইসেরিয়া ফেরিনোসা (Isaria farinosa) ও বিউভেরিয়াবেসিয়ানা (Beauvaria bassiana) ছত্রাক রেশমকীটকে আক্রমণ করে চুনাকাঠি রোগ সৃষ্টি করে এপিডারমোফাইটন ফ্লোকোসোম নামক ছত্রাক মানুষের পায়ের দাদ (Ring worm of foot) সৃষ্টি করে। চুলি, খুস্কি, হাজা, কানে ঘা, ফুসফুসে অ্যাসপার জিলোসিস, ক্যানডিডা, ব্লাস্টোমাইসিস, টাইকোফাইটন প্রভৃতি রোগ ছত্রাকের আক্রমণের দ্বারা সৃষ্টি হয়। আরগট রোগাক্রান্ত রাইগাছের শস্যদানাগুলি মানুষ অথবা গবাদি পশু ভক্ষণ করলে 'আরগটিজমে' (ergotism) রোগ হয়। কতকগুলি বিষাক্ত ছত্রাক ভুলক্রমে খেলে বমি, উদরাময়, খিঁচুনি, মাথাঘোরা, মানসিক বিকার ঘটে এমনকি মৃত্যুও ঘটে। অ্যামানিটা ছত্রাকের দেহে ফালিন (Phallin) নামক এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ থাকে তা রক্তকণিকাকে গলিয়ে দেয়। বিষাক্ত ব্যাঙের ছাতাগুলি আমাদের সকলের জানা উচিত। বিষাক্ত ব্যাঙের ছাতাগুলি হল—1। অ্যামনিটা ফ্যালয়ডেস (Amanita Phalloides), আমানিটা ভারনা (A. Verna), আমানিটা ভিরোসা (A. Virosa), বোলিটাস স্যাটানাস (Boletus Satanus), রসুলা ফিটেন্স (Russula foetens), ফ্যালাস রাভেনেলী (Phallus ravenelli), ল্যাপিওটা মরগেনি (Lapiota morgani), লেপিওটা ট্রাইভিয়োলিস। এদের দ্বারা সংঘটিত বিষক্রিয়াকে মাইসেটিমসা (Mycetimus) বলে।

এরা জ্যাম, জেলি থেকে আরম্ভ করে আচার, রন্ধন করা খাদ্যসামগ্রী, সকল প্রকার রুটি, মাখন, দুধ নষ্ট করে, এমনকি পরিধেয় বস্ত্র, কাগজ, চামড়া, চশমা, ক্যামেরা, দুরবীন, মাইক্রোস্কোপ প্রভৃতির লেন্স, রেডিও, কাঠের আসবাবপত্র আক্রান্ত করে নষ্ট করে দেয়।

একসময় ছত্রাককে কেবলমাত্র ক্ষতিকারক উদ্ভিদ হিসাবেই সকলে গণ্য করত, কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানের যুগে বিজ্ঞানীরা এমন অনেক ছত্রাক আবিষ্কার করেছেন যে ছত্রাকের দ্বারা সৃষ্টি রোগ ছত্রাকের দ্বারাই নিরাময় হচ্ছে। ছত্রাকের দ্বারা মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের জীবন রক্ষা পাচ্ছে। এর চেয়ে বড় কাজ আর কি হতে পারে! 1929 খৃস্টাব্দে ইংরাজ বিজ্ঞানী স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং সর্বপ্রথম পেনিসিলিয়াম নোটেটাম (Penicillium notatum) নামক ছত্রাক থেকে পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন। এই পেনিসিলিন ব্যাকটেরিয়াঘটিত জীবাণু ধ্বংস করে। এছাড়া

বর্তমানে পেনিসিলিয়াম ক্রিসোজেনাম (P. Chrysogenum) নামক ছত্রাক থেকেও পেনিসিলিন তৈরি হচ্ছে। স্ট্রেপটোমাইসিস গ্রিসিয়াস (Streptomyces griseus) থেকে স্ট্রেপটোমাইসিন (Streptomycin) উৎপন্ন হয়। এটি যক্ষ্মা রোগ জীবাণু ধ্বংসকারী একটি উত্তম ঔষধ। পেনিসিলিয়াম গ্রিসিও-ফুলভাম (Penicillium grisea-fulvum) থেকে গ্রিসিওফুলভিন (griseofulvin) নামক একপ্রকার ছত্রাকনাশক (antifungal) ঔষধ প্রস্তুত হয়। এটি চর্ম ও নখের ছত্রাকঘটিত রোগ দমনে ব্যবহৃত হয়। ক্লাভিসেপস পারপুরিয়া (Claviceps purpurea) নামক ছত্রাক থেকে এক প্রকার অত্যাশ্চর্য ঔষধ তৈরি হয়। এটি গর্ভবতী স্ত্রীলোকের শরীরে প্রয়োগ করে অনেক ক্ষেত্রে সুযোগ পাওয়া যায়। ঈস্টের একটি প্রজাতির সাহায্যে বেনজালডিহাইড থেকে এফিড্রিন (Ephedrin) নামক হাঁপানির ঔষধ প্রস্তুত হয়। পেনিসিলিয়ামের কয়েকটি প্রজাতি রঙীন ও বিশেষ গন্ধযুক্ত ট্রান্সপিরেশন ফ্লুইড নিঃসৃত করে। হেলমিনথোস্পোরিয়াম ছত্রাক ক্যাটেনারিন (Catenarin) নামক লাল বর্ণের, বোলেটাস স্যাটেনাস ছত্রাক বোলেটল (Boletol) নামক নীল বর্ণের এবং পেনিসিলিয়াম সাইট্রিনাম নামক ছত্রাক সাইট্রিনিন (Citrinin) ঘটিত হলুদ বর্ণের রঞ্জক পদার্থ তৈরি করে। অ্যাসপারজিলাস নাইজার (A. niger) থেকে সাইট্রিক (Citric) ও গ্লুটামিক অ্যাসিড বাণিজ্যিকভাবে তৈরি করা হয়। রাইজোপাস সাইনেনসিস, রাইজোপাস নোডোডাস নামক ছত্রাক থেকে ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। রাইজোপাস স্টোলোনিফার থেকে ফিউমারিক অ্যাসিড (Fumaric acid) পাওয়া যায়। জাপানে অ্যাসপারজিলাস ওরাইজী থেকে এক প্রকার অ্যালকোহল যুক্ত পানীয় প্রস্তুত করা হয়। অ্যাসপারজিলাস (Aspergillus) ছত্রাক থেকে ডায়াসটেস (Diastase) নামক এনজাইম ও জৈব অম্ল পাওয়া যায়। ছত্রাক জমির উর্বরতা বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে। এরা মৃত উদ্ভিদ বা প্রাণীদেহের উপর জন্মায়, এদের পাচিত করে এবং মৃত্তিকায় বিভিন্ন উপাদানের ভারসাম্য বজায় রাখে।

বর্তমানে রোগসৃষ্টিকারী পতঙ্গদের (প্রধানতঃ মাছি) দমনে এনটোমফথোরেলিস বর্গভুক্ত কতিপয় ছত্রাকের পতঙ্গের দেহে (পরজীবীরূপে) চাষ কৃত্রিম উপায়ে কর্ষণ মাধ্যমে (Culture medium) করা হচ্ছে, কিন্তু ঐ সকল কর্ষণ মাধ্যমে পতঙ্গের উপর প্রয়োগ করে পতঙ্গের সংখ্যা সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা যাচ্ছে না। কতকগুলি ছত্রাক যথা অ্যাসচারসোনিয়া অ্যালিয়রয়েডিস (Aschersonia alyroidis). করডিসেপস মেলোনথী (Cordyceps melonthae), আইজেরিয়া ফেরিনোসা (Isaria ferinosa) নামক ছত্রাক কীটপতঙ্গের শরীরে পরজীবীরূপে বাস করে এদেরকে ধ্বংস করে, ফলে প্রচুর পরিমাণে শস্যাদি রক্ষা পায়।

ধান ও গম গাছের মারাত্মক রোগ সৃষ্টিকারী জিব্বেরেলা ফুজিকুরই (Gibberella fujikuroi) নামক ছত্রাকের দেহ থেকে জিব্বেরেলীন (Gibberellian) নামক একপ্রকার বৃদ্ধি সহায়ক হরমোন পাওয়া যায়। এই হরমোনটি বাজারে "জিব্বেরেলিক অ্যাসিড" (Gibberellic acid) নামে বিক্রয় করা হয়। তাছাড়া ঈস্ট থেকে ভিটামিন B পাওয়া যায়। নিউরোস্পোরা (Neurospora), স্যাকারোমাইসিস (Saccharomyces), অ্যাসকোবোলাস (Ascobolus) গণভুক্ত ছত্রাককে জিনতত্ত্বীয় ও কোষতত্ত্বীয় গবেষণাকার্যে ব্যবহার করা হচ্ছে।

কিছু কিছু ছত্রাক খুবই মুখরোচক, প্রোটিনযুক্ত ও পুষ্টিকর খাদ্যরূপে পাশ্চাত্য দেশে বহুকাল থেকে চাষ হয়ে আসছে। বাজারে কেনা বেচার জন্য বর্তমানে এই সকল ভোজ্য ছত্রাকের চাষ পৃথিবীর নানান দেশে ব্যাপকভাবে হচ্ছে। বর্তমানে আমাদের দেশেও ছত্রাকের চাষ হচ্ছে। ভারতে হরিয়ানা রাজ্যে ছত্রাকের চাষ ও গবেষণার জন্য একটি কেন্দ্র গঠিত হয়েছে। যে সমস্ত ছত্রাক খাদ্যরূপে গ্রহণ করলে কোন ক্ষতি হয় না সেই ছত্রাকগুলি হল অ্যাগারিকাস বাইস্পোরাস (Agaricus bisporus), মরচেল্লা এসকিউলেনটা (Morchella esculenta), অ্যামিনিটা ফুলভা (Amanita fulva), টিউবার (Tuber sp.), লেনটাইনাস ইডোডাস (Lentinus edodus), ভলভেরিয়েল্লা ভলভেসিয়া (Volvariella volvacea), ঈস্ট (Yeast), বোলেটাস (Boletus), অ্যাগরিকাস ক্যামপেসট্রিস (Agaricus campestris)। তবে অ্যাগারিকাস বাইস্পোরাস এবং অ্যাগারিকাস ক্যামপেসট্রিস ছত্রাক দুটির খাদ্যগুণ বাঁধাকপির সমতুল্য।

এই সমস্ত ছত্রাক বিদেশের বাজারে রপ্তানি করে কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যেতে পারে। অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশ ছত্রাক চাষে অনেক পিছিয়ে আছে। ভারত সরকারের এই সমস্ত ছত্রাক চাষ ও গবেষণার দিকে আরও ভালভাবে নজর দেওয়া উচিত। ভবিষ্যতে ছত্রাকই হয়তো একদিন পৃথিবীর খাদ্য সমস্যা সমাধানে সহায়তা করবে।

হাইড্রোজেন

আব্দুল হক খন্দকার*

বাজারে আজকাল কত বিচিত্র ধরণের খেলনা দেখতে পাওয়া যায়—কিন্তু বেলুনই বোধ করি একমাত্র খেলনা—যার প্রতি আগেকার মত এখনকার ছেলেমেয়েরাও আকর্ষণ বোধ করে। কারণটি অবশ্য সহজেই বোঝা যায়। এত অল্প দামে এমন মজার খেলনা কটি মেলে? যেমনি পাওয়া অমনি ফুঁ দিয়ে ফোলানো। না ফাটিয়ে কে কত বড় করতে পারে—তারই কসরৎ যেন চলতে থাকে এবং এরই ফাঁকে কারোটি যদি "ফটাস্" করলো তো তা আরো মজার! যাদের ফোলা বেলুনটি তখনও ফাটে নি তারা তখন আনন্দে ফেটে পড়ছে—আর যে বেচারীর ফাটলো, তার মুখটি তখন ঐ ফাটা বেলুনটির মতই চুপ্‌সে গেছে!

কিন্তু সে কথা এখন থাক। বেলুন নিয়ে এমনি মজার খেলা খেলতে গিয়ে তোমরা কি সেটিকে ফুলিয়ে তার, মুখ বেঁধে ওপরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে দেখেছো কখনও? দেখে থাকলে নিশ্চয় দেখেছো, ওপরের দিকে ছুঁড়ে দিলেও ধীরে ধীরে সেটি মাটিতে এসে পড়ে। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও যে ঘটে তাও হয়তো কোনো কোনো সময়ে তোমরা লক্ষ্য করেছ। কোনো উৎসব বা অনুষ্ঠানে অনেক সময় এমনি ফোলানো বেলুন সুতো দিয়ে আকাশে ওড়ানো হয়। গুচ্ছাকারে রঙ-বেরঙের এমনি ভাসমান বেলুন দেখতে বেশ সুন্দর। বাঁধন কেটে দিলে বাতাসে ভাসতে ভাসতে তারা দূরে চলে যায়—মাটির বুকে আর তারা ফিরে আসে না—বাতাসেই ভাসতে থাকে।

কিন্তু কেন এই ব্যতিক্রম? তোমাদের ফুঁ দিয়ে ফোলানো বেলুন তো কখনও এভাবে আকাশে ওড়ে না? তবে কি এর মধ্যে কোনো কারসাজি আছে? তা অবশ্য কিছুটা আছে বৈকি! আর এই কারসাজিটা করা হয়েছে বেলুনের মধ্যে। মুখের ফুঁ দিয়ে যেখানে তোমার বেলুনটি ফোলানো—সেখানে এসব বেলুন ফোলানো হয়েছে, বাতাসে নয়, হাইড্রোজেন নামে একধরণের গ্যাস দিয়ে,—যার সম্পর্কে আরো কিছু মজার কথা এখন শোনাব তোমাদের।

প্রথমেই অবশ্য বেলুনে বাতাসের বদলে হাইড্রোজেন ভরলে, তা আকাশে ওড়ে কেন, বলা প্রয়োজন। কারণটা বোঝা সহজ,—বাতাসের তুলনায় হাইড্রোজেন খুবই হাল্কা। এত হাল্কা যে, যে বাতাসকে আমরা ভারী জিনিসের পর্যায়ে ফেলি না—সেই বাতাস হাইড্রোজেনের চেয়ে 14 গুণের চেয়েও বেশী ভারী। শুধু তাই নয়,—যত ধরণের বায়বীয় বা গ্যাসীয় পদার্থ রয়েছে পৃথিবীতে—তাদের মধ্যে হাইড্রোজেনই সব চেয়ে বেশী হাল্কা—আর এমন হাল্কা হওয়ার কারণে শুধু খেলনা বেলুনে নয়—এক কালে বড় বেলুনে হাইড্রোজেন ভরা হতো আকাশে ওড়ার জন্য,—আকাশযানে ব্যবহৃত হতো দেশ-বিদেশে যাতায়াতের জন্য।

তোমরা হয়তো জার্মানীর আবিষ্কৃত বিখ্যাত "জেপলিন" বিমানের নাম শুনেছ। জেপলিনের ওড়ার ব্যাপারে এই হাইড্রোজেনই ছিল তার সহায়,—কিন্তু এজন্য বিপদও কম ছিল না। কেন না, হাইড্রোজেনের এমন একটি আচরণ রয়েছে—যা খুবই মারাত্মক। খুবই সহজেই এতে আগুন ধরে জ্বলতে থাকে। কোনো আগুনের নাগাল পেলেতো কথাই নেই—সামান্য একটু আগুনের ফুল্‌কির ছোঁয়াই যথেষ্ট। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। হাইড্রোজেনের এমনি স্বভাবের জন্য তাই অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং তাদের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক ও স্মরণীয় ঘটনাটি ঘটে 1937 খৃস্টাব্দের 6ই মে।

যাত্রীবাহী জেপলিনদের মধ্যে 'হিণ্ডেনবার্গ' ছিল সেরা এবং বিখ্যাত। জার্মানী থেকে যাত্রা শুরু করে এটি পুরো অ্যাটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে আমেরিকায় নিয়মিত যাতায়াত করতো। কিন্তু ঐ দিন ঘটলো তার বিপর্যয়। নিউজারসির লেক হার্স্টের ন্যাভাল এয়ার স্টেশনে যেই নামতে যাবে—অমনি হঠাৎ করে ওতে আগুন ধরে নিমেষেই তা পুড়ে ছারখার হয়ে গেল—জীবন্ত দগ্ধ হলো 36 জন যাত্রী।

যা হোক, দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হলো কিন্তু হাইড্রোজেনে কি করে আগুন ধরলো তা সঠিক জানা গেল না—তবে দাহ্য হাইড্রোজেনই যে ঐ মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কারণ এবং তাকে নিয়ে এমনি মারাত্মক ঝুঁকি নেয়া যে আর চলতে পারে না,—সবাই তা বুঝলো। কাজেই হাইড্রোজেনকে বাদ দিয়ে আকাশ পথে চলাচলের অন্য যে প্রচেষ্টা চলছিল তার ওপর জোর দেওয়া হলো—ফলে জন্ম নিল আধুনিক কালের বিমান। অবশ্য আকাশযানে হাইড্রোজেনের ব্যবহার বন্ধ হলেও আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের কাজে 'ওয়েদার বেলুন' বা আবহ-বেলুনে আজও তা ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

অবশ্য হাইড্রোজেনের ব্যবহার আজকাল কেবল যে আবহ-বেলুনে সীমিত তা নয়—আরো অনেক ভাল কাজে তার ব্যবহার রয়েছে—কিন্তু সে কথা বলার আগে,—হাইড্রোজেন কোথায় এবং কি ভাবে পাওয়া যায়—সেসম্পর্কে একটু বলে নেওয়া যাক।

পৃথিবীতে অবশ্য মুক্ত অবস্থায় বা মৌলিক পদার্থ হিসাবে হাইড্রোজেন খুব কমই পাওয়া যায়। বাতাসে রয়েছে যৎসামান্য—আয়তনের তুলনায় শতকরা মাত্র 0·00005 ভাগ,—আর আগ্নেয়-গিরির গ্যাসে রয়েছে কিছুটা বেশী—তবে পৃথিবীর বাইরে—মহা-

* 370, আউটার সারকুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা-17, বাংলাদেশ

শূন্যে, নক্ষত্ররাজি, নীহারিকাপুঞ্জ প্রভৃতিতে হাড্রোজেনের পরিমাণ অনেক বেশী। সূর্যে হাইড্রোজেনের পরিমাণ শতকরা 81·8 ভাগ। এই হাইড্রোজেন হাজার হাজার মাইল দীর্ঘ শিখায় জ্বলছে বলে তার বুকে এত দহন জ্বালা। আমরা বেঁচে আছি সূর্যের এই দহনজ্বালারই দৌলতে

যদিও মৌলিক পদার্থ হিসাবে পৃথিবীতে হাইড্রোজেনের পরিমাণ অনেক কম কিন্তু অন্য মৌলের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যা আছে তার পরিমাণ কম নয়, বিশেষ করে জলে। ওজনের অনুপাতে জলের শতকরা 11 ভাগেরও বেশী হলো হাইড্রোজেন। তাছাড়া যাবতীয় তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, জীবজন্তু ও উদ্ভিদের দেহের একটি বিশিষ্ট উপাদান হিসাবে বিরাজ করছে এই হাইড্রোজেন। কাজেই হাইড্রোজেনকে তৈরি করতে হলে সন্ধান করতে হবে হাইড্রোজেনের কোনো সুবিধাজনক যৌগিক—যেমন, জল কিংবা অ্যাসিড যা থেকে সহজেই হাইড্রোজেনকে উদ্ধার করা যেতে পারে।

তোমাদের মধ্যে যারা কিছুটা বিজ্ঞানের পাঠ নিয়েছো তারাতো জান—দস্তা (জিংক) ও সালফিউরিক অ্যাসিড মিশিয়ে কি করে হাইড্রোজেন তৈরি করা যায়। অবশ্য খাঁটি দস্তা ও খাঁটি সালফিউরিক অ্যাসিড নিলে চলবে না—নিতে হবে খাদ মেশানো দস্তা আর জল মেশানো সালফিউরিক অ্যাসিড। দস্তার বদলে লোহা, টিন, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতুও ব্যবহার করা যেতে পারে আবার সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম প্রভৃতি ধাতু ব্যবহার করলে অ্যাসিডের আর প্রয়োজন পড়ে না শুধু এ সকল ধাতুকে জলে ছেড়ে দিলে হুস্ হুস্ করে হাইড্রোজেন বেরিয়ে আসবে এবং সেই সঙ্গে ধাতুর টুকরোগুলি জলের মধ্যে ছুটোছুটি করতে থাকবে। পটাসিয়ামের বেলা বিক্রিয়া এত জোরালো এবং এত তাপের সৃষ্টি হয় যে উৎপাদিত হাইড্রোজেনে আগুন পর্যন্ত ধরে যায়। আবার এসব সক্রিয় ধাতু ছাড়াও অন্যান্য ধাতু যেমন লোহা, দস্তা প্রভৃতি দিয়েও জল থেকে হাইড্রোজেন পাওয়া যায়—তবে, এখানে হয় ধাতুটিতে খুবই উত্তপ্ত হতে হবে কিংবা জলকে বাষ্পীয় অবস্থায় ধাতুর সংস্পর্শে আনতে হবে। অন্যদিকে কোনো ধাতুর সাহায্য না নিয়ে কেবল মাত্র জলের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিয়ে হাইড্রোজেন এবং সেই সঙ্গে অক্সিজেনও তৈরি করা যায়।

যাহোক, উত্তপ্ত ধাতুর সংস্পর্শে জল আসলে যে হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয় তা তোমরা জানলে কিন্তু এতে যে অনেক সময় অঘটন বা বিপদ ঘটতে পারে তা হয়তো তোমরা জান না। মাত্র দুটি ঘটনার কথা এখানে বলছি তোমাদের -এতেই বুঝতে পারবে ক্ষেত্র বিশেষে ব্যাপারটা কী সাংঘাতিকই না হতে পারে।

বেশ কিছুকাল আগে এক লোহার কারখানায় যখন নিয়মিত কাজ চলছিল তখন হঠাৎ করে প্রচণ্ড শব্দে ব্লাস্ট ফার্নেসের অর্থাৎ লোহা তৈরির চুলোটির তলা চৌচির হয়ে গেল, ধোঁয়া ও আগুনের শিখা ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে, গলিত লোহার প্রবল ধারায় কাছের এক দালান ভেঙ্গে পড়লো, ছয়জন শ্রমিক শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ে ভীষণ ভাবে আহত হলো। অবশ্য কিছু দূরে তারা ছিল বলেই রক্ষা—তাই তারা প্রাণে বেঁচেছিল।

কিন্তু কি করে ঘটলো এমন কাণ্ড, অনুমান করতে পার? অনুমান নয়, অনুসন্ধানে যা জানা গিয়েছিল তা হলো এই যে—কোনো কারণে চুলোটির তলার দিকে ছোট্ট একটি ফুটো হয়েছিল আর সেই ফুটো গলিয়ে গলিত লোহা নীচের একটি নর্দমায় গিয়ে পড়ছিল। ফলে কি হবে বুঝতেই পারছো, তৈরি হবে হাইড্রোজেন। কিন্তু এতে এমন অঘটন ঘটার কি আছে? তা ক্ষেত্র বিশেষে আছে বৈকি? হাইড্রোজেন এবং বাতাসের মিশ্রণ বড় মারাত্মক। বাতাসের তথা অক্সিজেনের সঙ্গে হাইড্রোজেন মিশে এমন এক বিস্ফোরণশীল মিশ্রণের সৃষ্টি করে যা আগুন বা তপ্ত ধাতুর সংস্পর্শে বিস্ফোরক পদার্থের মতই বিস্ফোরিত হয়। কাজেই এখানে গলিত লোহা নর্দমার জলে পড়ে একসঙ্গে যেমন প্রচুর হাইড্রোজেন তৈরি হয়ে বাতাসে মিশে পরিণত হচ্ছিল এক বিস্ফোরণশীল মিশ্রণে তেমনি তা আবার তপ্ত গলিত লোহার সংস্পর্শে এসে এক সময়ে বিস্ফোরিত হয়েছিল, ফলে কারখানাটিতে ঘটেছিল ঐ মারাত্মক কাণ্ড।

দ্বিতীয় ঘটনাটিতে লোহা নয়, দায়ী ছিল দস্তা। এক কারখানায় সবে মাত্র তৈরি করা হয়েছে একটি জাহাজের বয়লার। এখন সেটি ঠিক কাজের উপযোগী হয়েছে কিনা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। ছোটখাটো এক যুদ্ধ-জাহাজে তাই সেটিকে বসিয়ে সাগরে ভাসানো হলো। প্রথম দিকে বয়লারটিকে উপযুক্তই মনে হলো, কেননা বেশ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছিল জাহাজটি। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই শুধু যে বিরাট শব্দে বয়লারটি ফেটে গেল তা নয়—বেশ কিছু লোক হতাহত হলো। কিন্তু কেন যে হঠাৎ করে বয়লারে বিস্ফোরণ ঘটলো তার হদিস অবশ্য তখনই মিললো না, মিললো কিছুদিন পর যখন বয়লারের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেল কিছু দস্তার টুকরো। কী বুঝতে পারছো এখন বিস্ফোরণের কারণটা? কারণ আর কিছুই নয়, বয়লারের তপ্ত জলের সংস্পর্শে দস্তা এবং জলের বিক্রিয়ায় ক্রমেই এত প্রচুর হাইড্রোজেন তৈরি হচ্ছিল যে তারই প্রচণ্ড চাপে শেষ পর্যন্ত অমন উপযুক্ত বয়লারটি ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল। যদিও এ দুর্ঘটনার জন্য নিঃসন্দেহে দস্তাই দায়ী কিন্তু বয়লারে দস্তার টুকরো আনলো কোত্থেকে? ব্যাপারটি আজও রহস্যময় হয়ে গেছে।

হয়তো কারখানার কোনো শ্রমিক নিছক খেয়ালখুশীতে কিংবা

শ্রমিকদেরই কোনো ছেলেমেয়ে খেলার ছলে হাতের কাছে পাওয়া দস্তার কিছু ঢেলা ছুড়ে ফেলেছিল বয়লারের মধ্যে—কিন্তু তারা কি ভাবতে পেরেছিল কখনও, যে তার পরিণতি হয়ে দাঁড়াবে এতটা মারাত্মক, এমনি শোকাবহ।

যাহোক, হাইড্রোজেন নিয়ে দুর্ঘটনার কাহিনী আর নয়;—এখন কিছু কাজের কথায় অর্থাৎ কিছু ব্যবহারের বিষয়ে আসা যাক।

যদিও দু'শো বছরেরও আগে থেকে হাইড্রোজেন মৌলিক গ্যাস হিসাবে পরিচিত ছিল এবং তারও বহু আগে থেকে তা অন্য নামে পরিচিত ছিল ("ইনফ্লেমেবল এয়ার")—তখন, এমন কি বেশ কিছুকাল পরেও তার তেমন বিশেষ ব্যবহার ছিল না, যেটুকু ব্যবহার তা ধরতে গেলে ছিল বেলুন ও জেপেলিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আজকাল অবশ্য নানা কাজে প্রচুর পরিমাণে হাইড্রোজেন ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং তার ব্যবহার ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।

এ সকল ব্যবহারের মধ্যে নাইট্রোজেনের সংযোগে অ্যামোনিয়া, কার্বনমনোক্সাইডের সাহায্যে মিথাইল অ্যালকোহল, নানাজাতীয় উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ তেল থেকে চর্বি বা মাখন জাতীয় পদার্থ, ক্রুড-অয়েল, কয়লা ও পেট্রোলিয়াম কারখানার বাতিল পদার্থ থেকে পেট্রোল এবং গ্যাসোলিন প্রভৃতি প্রস্তুত এবং অক্সি-হাইড্রোজেন ও অ্যাটোমিক হাইড্রোজেন টর্চের সাহায্যে উচ্চতাপ সৃষ্টি করা উল্লেখযোগ্য।

অ্যামোনিয়া ও মিথাইল অ্যালকোহল দুই-ই নানা রাসায়নিক কাজে ও শিল্পে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। জমির উৎকৃষ্ট সার হিসাবে যে অ্যামেনিয়াম সালফেট ও ইউরিয়া ব্যবহৃত হয় তাদের উৎস হলো এই অ্যামোনিয়া। তাছাড়া নাইট্রিক অ্যাসিড, যার প্রধান ব্যবহার বিস্ফোরক দ্রব্য ও নাইট্রেট জাতীয়, জমির সার তৈরির জন্য তাও আজকাল তৈরি হয় এই অ্যামোনিয়া থেকে।

অক্সি-হাইড্রোজেন টর্চের সাহায্যে 2800 ও অ্যাটোমিক হাইড্রোজেন টর্চের সাহায্যে 4000 থেকে 5000 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মত উচ্চতাপ সৃষ্টি করা যায় বলে, ধাতু গলানো, ধাতুর পাত জোড়া দেয়া প্রভৃতি কাজের খুবই সুবিধা হয়েছে, এমনকি কৃত্রিম মণিমুক্তা তৈরির কাজে অ্যাটোমিক হাইড্রোজেন টর্চ বিশেষ কাজে এসেছে। এই টর্চের সৃষ্ট তাপ এত বেশী যে, লোহা গলাতো দূরের কথা, তা একেবারে বাষ্পীভূত বা গ্যাসে পরিণত হয়।

অবশ্য হাইড্রোজেনের সাহায্যে উচ্চতাপ সৃষ্টির যে এখানেই শেষ তা নয়। আধুনিক কালে দু'জাতের ভারী হাইড্রোজেন (Heavy Hydrogen) ব্যবহার করে যে হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করা হয়েছে তাতে ক্ষণিকের জন্য হলেও সূর্যের একেবারে কেন্দ্রস্থলের দুই কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মত তাপমাত্রায় পৌছানো গেছে। হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমার ধ্বংসলীলার কথা তোমরা শুনেছে—কিন্তু হাইড্রোজেন বোমা পরমাণু বোমার চেয়েও অনেক বেশী শক্তিশালী। তাই তার ধ্বংসলীলার কথা ভাবতে গেলে শিউরে উঠতে হয়। আশঙ্কা দাঁড়ায়—হাইড্রোজেন বোমা তৈরি নিয়ে বড় বড় শক্তিশালী দেশগুলির মধ্যে যে জোর প্রতিযোগিতা চলছে তার পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? যদি যুদ্ধ বাঁধে কখনও, তবে সব কিছু ছারখারে হতে আর বাকী থাকবে না কিছু। তাই হাইড্রোজেন বোমার যেমন আমাদের দরকার নেই তেমনি এই সর্বনাশা প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সর্বতোভাবে রুখে দাঁড়াতে হবে আমাদের। আমরা শান্তিপ্রিয় দেশের বাসিন্দা, দুটি খেয়ে পরে শান্তিতে জীবন কাটানো আমাদের কাম্য। তাই এসো, খাওয়াপরার ব্যাপারে হাইড্রোজেনের যে ব্যবহার রয়েছে সে বিষয়েই একটু বিশদভাবে আলোচনা করি, যাতে এ দিকে তার ব্যবহারকে যেন আরো ব্যাপক, আরো সফল করে আমরা তুলতে পারি। আর সেই চেষ্টাই হবে বিজ্ঞানী হিসাবে আমাদের প্রধান ও সঠিক কর্তব্য, কারণ সত্যিকারের বিজ্ঞান সাধনার উদ্দেশ্য হলো, প্রকৃতির রহস্যকে জানা এবং তা জেনে মানুষের কল্যাণে তাকে নিয়োজিত করা। অবশ্য এই উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই হাইড্রোজেনকে যেভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে খাদ্যসমস্যা সমাধানে কাজে লাগিয়েছেন তা যেমন চমকপ্রদ তেমনি মজার।

তোমরা জান, ঘি, মাখন প্রভৃতি বেশ পুষ্টিকর খাদ্য। সুস্থ ও সবল থাকতে হলে দৈনন্দিন এগুলি আমাদের খাওয়া দরকার। কিন্তু দামে সস্তা নয় বলে, আমাদের মত গরীব দেশের সকলের পক্ষে এ সকল দামী জিনিস খাওয়া সম্ভব নয়। কাজেই কোনো উপায় যদি সস্তায় এগুলি তৈরি করা যেত, তা হলে গরীব জনসাধারণের জন্য তা যে কত উপকারে আসতো তা বলার নয়। একথা ভাবতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা তাই ঘি, মাখন, চর্বি এবং নানা জাতের তেল কোন্ কোন্ উপাদানে গঠিত তা পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং হাইড্রোজেনের সাহায্যে এই খাদ্যসমস্যা সমাধানের এক সহজ ও সুলভ উপায়ও খুঁজে পেয়েছেন।

আমাদের দেশে মাছের তেল, তুলাবীজের তেল প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, কিন্তু রান্নার কাজে এগুলি আমরা ব্যবহার করি না, কেন না, এগুলির সে কাজের উপযোগী নয়। তাছাড়া অন্য কাজেও এদের বিশেষ ব্যবহার নেই বলে দামও তাদের কম। কিন্তু মজার কথা কি জান? এ সকল অখাদ্য তেলকে হাইড্রোজেনের সাহায্য এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় [প্রভাবক (catalyst) হিসাবে নিকেল ধাতু ব্যবহার করে] সহজেই সুখাদ্য মাখন বা ঘি জাতীয় জিনিসে পরিণত করা যায়। এমনি ভাবে মাখনের বদলে 'মারগারিন'

ঘিয়ের বদলে 'বনস্পতি' বা 'দালদা' প্রভৃতি করা সম্ভব হচ্ছে আজেবাজে বা অখাদ্য তেল থেকে এবং এগুলি দামে সস্তা হওয়ায় সকলের পক্ষে সেগুলি ব্যবহার করার সুযোগ ঘটছে। অবশ্য আজেবাজে বা অখাদ্য জাতের তেল থেকে এগুলি তৈরি হচ্ছে বলে মনে করো না, এগুলি কোনো মন্দ জিনিস। মোটেই তা নয়। হাইড্রোজেনের সঙ্গে সংযোগের দৌলতে এগুলি এমন সব দ্রব্যে পরিণত হয়—যাদের সঙ্গে ঘি বা মাখনের বিশেষ কোনো পার্থক্য থাকে না। পুষ্টির দিক থেকেও ধরতে গেলে তাদের সমতুল্য এবং সবচেয়ে সুবিধার হলো, এগুলিতে ইচ্ছামত ভিটামিন বা অন্যান্য পুষ্টিকর জিনিস যেমন মেশানো যায় তেমনি পছন্দমত রঙ ও সুগন্ধী মিশিয়ে সেগুলিকে আরো পুষ্টিকর, উপাদেয় ও আকর্ষণীয় করে তোলা যায়।

কাজেই দেখ, বিজ্ঞানীরা কেমন কৌশলে মানুষের এক মহা উপকার সাধনে হাইড্রোজেনকে কাজে লাগিয়েছেন, দরিদ্র জনসাধারণের পুষ্টিসমস্যা সমাধানের এক চমৎকার উপায় তাঁরা উদ্ভাবন করেছেন। তাঁরা যখন জানলেন—ঘি, মাখন প্রভৃতি আসলে কি জিনিস, কোন্ কোন্ উপাদানে কি ভাবে গঠিত কেমনই বা তারা পুষ্টিকর, তুলাবীজ বা মাছের তেলের সঙ্গে কোথায় তাদের পার্থক্য, তখন তাঁরা কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করলেন তাদের বিকল্প আর তা অনেক সস্তায় এবং যত অখাদ্য, অকেজো জিনিস থেকে। শুধু তাই নয়, হাইড্রোজেনকে এমনি সরাসরি খাদ্য তৈরির কাজে ব্যবহার করা ছাড়াও তাঁরা এর সাহায্যে অ্যামোনিয়াম সালফেট, ইউরিয়া, নাইট্রেট, প্রভৃতি জমির সার তৈরি করে পরোক্ষ ভাবে খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করলেন।

যা হোক, বিজ্ঞানীরা কি ভাবে মানুষের কল্যাণার্থে হাইড্রোজেনকে কাজে লাগিয়েছেন তার কিছুটা তোমাদের কাছে তুলে ধরলাম। এছাড়া হাইড্রোজেন আমাদের ও অন্যান্য জীবের এক সর্বাত্মক উপকার সাধন করে চলেছে, সে কথা কি তোমরা জান না ভেবে দেখেছো কখনও? ভাবলে সত্যই বিস্ময়ের আর অন্ত থাকে না।

এই বিস্ময়ের ব্যাপারটা যে কি—এখন এসো, সে সম্পর্কে কিছুটা আভাস দিয়ে আমাদের ও অন্যান্য জীবের জীবনে হাইড্রোজেনের বিরাট অবদানের কথা আজকের মত শেষ করি।

আগেই বলেছি, পৃথিবীতে মুক্ত হাইড্রোজেনের পরিমাণ খুব কম। কিন্তু সূর্য, নক্ষত্র, নীহারিকাপুঞ্জে রয়েছে হাইড্রোজেনে ছড়াছড়ি, এমন কি মহাশূন্যের বুকে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে প্রচুর হাইড্রোজেন। এমনি বিক্ষিপ্ত হাইড্রোজেন থেকে একদিকে সৃষ্টি হচ্ছে যেমন নক্ষত্র, নীহারিকাপুঞ্জ তেমনি সুদূরের নক্ষত্ররাজিতে এবং আমাদের সর্বাপেক্ষা কাছের নক্ষত্র যে সূর্য, তাতেও অবিরাম প্রজ্বলিত শিখায় এবং প্রচণ্ড উত্তাপে জ্বলছে এই হাইড্রোজেন, তৈরি হচ্ছে হিলিয়াম যা হাইড্রোজেনের মত মৌলিক কিন্তু তার চেয়ে চারগুণ ভারী একটি গ্যাস। এই প্রক্রিয়ায় যে প্রচুর শক্তি (তাপ) উৎপন্ন হচ্ছে, তাই যেমন জ্বালিয়ে রেখেছে সূর্যকে যুগ যুগ ধরে তেমনি সেই সূর্য থেকে পরিমিত পরিমাণে তাপ ও আলো আমরা পেয়ে আসছি প্রতিদিন। যদিও এই পরিমাণ যৎসামান্য এবং সূর্যের সমস্ত বিলিয়ে দেয়া তাপ ও আলোর মাত্র 220 কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র, তবু পৃথিবীতে সকল জীবের জীবনধারণের জন্য এটুকুই যথেষ্ট। এর সামান্য হেরফের কোনো দিকে ঘটলে, হয় জ্বলে পুড়ে, না হয় কঠিন শীতে সমগ্র জীবজগৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে পৃথিবীর বুক থেকে। সৌর তাপের কারণে পরোক্ষভাবে পৃথিবীতে ঝরে পড়ে বৃষ্টি। এই বৃষ্টি ভেজা মাটি থেকে যেমন, তেমনি সূর্যালোকে স্নাত হয়ে বাতাস থেকে খাদ্য গ্রহণ করছে উদ্ভিদ। এই উদ্ভিদের লতা-পাতা খেয়ে জীবনধারণ করছে অনেক প্রাণী। আবার এই সব প্রাণীকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে বেঁচে আছে অন্যান্য প্রাণী। এই প্রাণীদের মধ্যে রয়েছি আমরাও। কাজেই পৃথিবীর বুকে এই যে চলমান জীবন প্রবাহ তা একান্তভাবেই নির্ভর করছে সূর্য থেকে পাওয়া ঐটুকু তাপ ও আলোর ওপর। কিন্তু সূর্যের এই তাপ ও আলোর উৎস, একটু আগেই বলেছি, হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম তৈরি হওয়ার জন্য। এজন্য প্রয়োজন প্রচণ্ড উত্তাপ আর সেই ব্যবস্থাই রয়েছে আমাদের সূর্যে।

কাজেই দেখ, যে হাইড্রোজেনকে সহজেই তোমরা পরীক্ষাগারে তৈরি করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করো, সেই হাইড্রোজেনকেই সুদূর আকাশে কৌশলে জ্বালিয়ে রেখে আমাদের সৃষ্টিকর্তা যে এক বিরাট কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন, পৃথিবীতে অক্ষুণ্ণ রাখছেন সকল জীবের জীবন—তা সত্যই বিস্ময়কর নয় কি?

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সকল সভ্য ও জনসাধারণকে জ্ঞাত করা যাচ্ছে যে, শ্রীসঞ্জীব চক্রবর্তীর (বিধান পল্লী, মধ্যমগ্রাম, 24 পরগণা) সঙ্গে পরিষদের কোন সম্পর্ক নাই। কেউ যেন তাঁর সঙ্গে পরিষদ সংক্রান্ত আর্থিক ও অন্যান্য বিষয়ে কোনরূপ আদান-প্রদান না করেন।
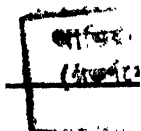
কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

শব্দোত্তর তরঙ্গ

সন্দীপ বিশ্বাস*

শব্দবিহীন পৃথিবী অকল্পনীয়। বিশ্বজগতের যেখানেই বায়ুমণ্ডল রয়েছে সেখানেই রয়েছে শব্দের অস্তিত্ব। শব্দই পার্থিব প্রাণীর ভাবপ্রকাশের প্রধান বাহন। আমাদের চারদিকে শুধু শব্দ আর শব্দ, কোথাও বা নিঃশব্দ। যা আমাদের কাছে নিঃশব্দ, অন্য প্রাণীর কাছে তা সশব্দ। আমাদের চারপাশ দিয়ে নিরন্তর এমন সব শব্দস্রোত বয়ে চলেছে যা হয়তো আমরা শুনতে পাচ্ছি না, কিন্তু শুনতে পাচ্ছে নিকটস্থ অন্য কোনো প্রাণী। প্রকৃতির কেন এই বৈমাত্রসুলভ আচরণ? তা জানতে হলে শব্দসৃষ্টির বিজ্ঞানগত কারণটা আগে জানা দরকার।

কোনো বস্তুকে আঘাত করলে বা শক্তিপ্রয়োগ করলে তার মধ্যে একটা কম্পন সৃষ্টি হয় ঐ কম্পন আবার বস্তুর চারপাশের মাধ্যমেও কম্পন সৃষ্টি করে। তারপর ঐ কম্পন মাধ্যম দ্বারা বাহিত হয়ে আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে পর্দায় আঘাত করে। কানের পর্দা আবার অনুরূপভাবে কম্পিত হয় আর সেখান থেকে শ্রবণানুভূতি স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌঁছে যথারীতি বিচারবিশ্লেষণ হলেই আমরা বুঝতে পারি শব্দের প্রকৃতিটা কিরকম।

শব্দের সঙ্গে 'কম্পাঙ্ক' কথাটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শব্দসৃষ্টিকারী কম্পমান উৎস প্রতি সেকেণ্ডে যতবার কম্পিত হয় সেই সংখ্যাই হল সৃষ্ট শব্দের কম্পাঙ্ক। কম্পাঙ্কের একক হল সাইকল্‌স্ প্রতি সেকেণ্ডে (Cycles per second) বা সংক্ষেপে সি. পি. এস. (c. p. s.)। কম্পাঙ্কের যে ঊর্ধ্বসীমায় শব্দতরঙ্গ শ্রবণানুভূতি উৎপন্ন করতে পারে না তার মান নানা প্রাণীর ক্ষেত্রে নানারকম। যেমন, সাধারণতঃ আমরা 10000 সি. পি. এস.-এর বেশী কম্পাঙ্কের শব্দ শুনতে পাই না। কিন্তু অনেক প্রাণীর ক্ষেত্রে এই মান আরও বেশী। এইকারণেই আমরা এমন অনেক শব্দ শুনতে পাই না যা অন্য প্রাণী শুনতে পায়। তবে পার্থিব কোনো প্রাণীই 20000 সি. পি. এস.-এর চেয়ে বেশী কম্পাঙ্কের শব্দ শুনতে পায় না। এর চেয়েও বেশী কম্পাঙ্কবিশিষ্ট শব্দকে বলা হয় শব্দোত্তর তরঙ্গ (Ultrasonic)।

শব্দোত্তর তরঙ্গের রয়েছে কিছু অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য। যেমন—

(1) একটা পাত্রে কিছু তরল পদার্থ নিয়ে তার মধ্য দিয়ে শব্দোত্তর তরঙ্গ পাঠানো হল। এখন একটা দণ্ডকে ঐ তরলে ডুবিয়ে আন্দোলিত করলে কিছুক্ষণের মধ্যেই দণ্ডটা গরম হয়ে উঠবে।

(2) শব্দোত্তর তরঙ্গের জোরালো প্রবাহের দ্বারা তেল আর জল মিশে যায় এবং সুস্থিত মিশ্রণ তৈরি করে।

(3) এই প্রবাহের দ্বারা ধোঁয়া জমাট বেঁধে যায় ও বড় বড় পিণ্ডে পরিণত হয়।

(4) শব্দোত্তর তরঙ্গের প্রভাবে বহু ক্ষুদ্র প্রাণী, যথা, মাছ, ব্যাঙ ইত্যাদি নিহত বা অঙ্গহীন হয় এবং ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি ধ্বংস হয়।

(5) একটা স্বচ্ছ পাত্রে কিছু স্বচ্ছ তরল পদার্থ নেওয়া হল। এখন ঐ তরলের মধ্য দিয়ে যদি শব্দোত্তর তরঙ্গ এবং আলোকরশ্মি একই সঙ্গে পাঠানো হয় তবে আলোর অপবর্তন (diffraction) পরিলক্ষিত হয়।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শব্দোত্তর তরঙ্গের এইসব বিভিন্ন ধর্মকে বহুভাবে মানব-কল্যাণে নিয়োজিত করা হচ্ছে। সম্প্রতি পঃ জার্মানীর এক চিকিৎসাবিজ্ঞান গবেষণাগারে কিডনীর পাথর অস্ত্রোপচার না করে শব্দোত্তর তরঙ্গের সাহায্যে টুকরো টুকরো করে বের করা হয়েছে। এছাড়া চোখ ও ব্রেন সার্জারীতে এই তরঙ্গ অত্যন্ত সফলভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। কোনো ধাতু বা মোটরগাড়ীর টায়ার ত্রুটিমুক্ত কিনা দেখার জন্য শব্দোত্তর তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়। সংকর ধাতু তৈরিতে এর প্রয়োগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জামাকাপড় সহজে কাচার কাজেও এই তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়। এছাড়া দুধ, প্রোটিন ও অন্যান্য টিনজাত দ্রব্যের পচন রোধার কাজে শব্দোত্তর তরঙ্গের ব্যাপক প্রয়োগ আছে। এই তরঙ্গের অন্যান্য উপযোগিতার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয়। এই কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রটির নাম লেঞ্জবিনের ইকো ডেপ্‌থ্ সাউণ্ডার (Langevin's echo depth sounder)। শব্দোত্তর তরঙ্গের কম্পাঙ্কের মান জানা থাকলে তার সাহায্যে শব্দের গতিবেগেও নির্ণয় করা যায়।

আমরা জানি কোনো তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ও কম্পাঙ্কের গুণফল তরঙ্গের গতিবেগের সমান। এই গতিবেগকে ধ্রুবক ধরলে বলা যায় যে কম্পাঙ্ক যত বাড়বে তরঙ্গদৈর্ঘ্য তত কমবে। আবার কম্পাঙ্ক যত কমবে তরঙ্গদৈর্ঘ্য তত বাড়বে। শব্দোত্তর তরঙ্গের ক্ষেত্রে কম্পাঙ্ক বেশী হওয়ায় তরঙ্গদৈর্ঘ্য খুব কম, যার দরুণ এই তরঙ্গ তার চলার পথে সহজেই বাধাপ্রাপ্ত হয় ও প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে

প্রধানতঃ দুটি পদ্ধতিতে শব্দোত্তর তরঙ্গ কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয়—(1) ম্যাগনেটোস্ট্রিকশান অসিলেটর (Magnetostriction oscillator) পদ্ধতি ও (2) পিজো-ইলেকট্রিক অসিলেটর (Piezo-electric oscillator) পদ্ধতি। প্রথম ধরণের অসিলেটরে

*46/বি, কাঁসারিপাড়া রোড, কলিকাতা-700025

থাকে যেকোনো ফেরো-ম্যাগনেটিক পদার্থের (যথা, লোহা বা নিকেল) একটি দণ্ড যার দুপাশে দুটি প্লেট লাগানো থাকে। দণ্ডটিকে একটি তামার তারের কুণ্ডলীর মধ্যে বসানো হয়। তারপর ঐ তামার তারের কুণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে এ. সি. তড়িৎ-প্রবাহ পাঠালে দণ্ডটি পরিণত হয় চুম্বকে। ফলে দণ্ডটির দুপাশে লাগানো প্লেটদুটির মাধ্যমে ক্রমাগত পর্যায়ক্রমে একবার ঘনীভবন ও একবার তনুভবন ঘটবে, ফলে মাধ্যমে শব্দোত্তর তরঙ্গ সৃষ্টি হবে। এই পদ্ধতিতে সৃষ্ট শব্দোত্তর তরঙ্গের কম্পাঙ্ক 60000 সি. পি. এস. পর্যন্ত হতে পারে। তার চেয়েও বেশী কম্পাঙ্কবিশিষ্ট শব্দোত্তর তরঙ্গ সৃষ্টি করা হয় পিজো-ইলেকট্রিক অসিলেটরের সাহায্যে।

কোনো কোনো স্ফটিক (crystal), যেমন কোয়ার্জ (quartz), উচ্চচাপের প্রভাবে তড়িৎ আধান (electric charge) উৎপন্ন করে। এই ঘটনাকে বলা হয় স্ফটিকের পিজো-ইলেকট্রিক এফেক্ট যাকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করা হয় পিজো-ইলেকট্রিক অসিলেটর। এতে থাকে কোয়ার্জের একটি দণ্ড যার দুপাশে দুটি ধাতব প্লেট লাগানো থাকে। এবার ঐ দণ্ডের মধ্য দিয়ে এ. সি. প্রবাহ পাঠালে শব্দোত্তর তরঙ্গ উৎপন্ন হয় কোয়ার্জের গঠনের বিশেষত্বের জন্য। এই তরঙ্গের কম্পাঙ্কের মান 60000 সি. পি. এস.-এর বেশী।

শব্দোত্তর তরঙ্গের বহুমুখী ব্যবহার একে আধুনিক মানব-সভ্যতার এক অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত করেছে। এই তরঙ্গকে ব্যবহার করে বর্তমানে বিভিন্ন নতুন নতুন যন্ত্রপাতি তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে। তাই অপব্যবহার না করে মানবকল্যাণের কাজে শব্দোত্তর তরঙ্গকে ব্যবহার করা দরকার।

অভিনব কাক-তাড়ুয়া

অসিতকুমার দাস*

ক্ষেতে খামারে ফসলকে পাখীর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বাঁশ, কাপড় ইত্যাদির সাহায্যে 'কাক-তাড়ুয়া' তৈরি করা হয়। এই ব্যবস্থাটিকে আমরা কাকতাড়ুয়া না বলে "পাখী তাড়ুয়া"ও বলতে পারি। বিংশ শতাব্দীতে বিমান-চলাচলের ক্ষেত্রেও পাখী হয়ে উঠেছে একটা বিশেষ অসুবিধাজনক ব্যাপার—তার জন্য কিছু বিমান দুর্ঘটনাও হয়ে গিয়েছে।

বিজ্ঞানীরা পাখীর মনস্তত্বকে কাজে লাগিয়ে নতুন ধরনের বিজ্ঞানভিত্তিক পাখী-তাড়ুয়া আবিষ্কার করেছেন। শিকারী পাখী—যেমন ধরা যাক বাজপাখী—উপস্থিত হলে অধিকাংশ পাখী নিমেষে অন্তর্হিত হয়। বিমান বন্দরগুলিতেও দেখা যায়, টেপ-রেকর্ডারে শিকারী পাখীদের বা অন্য পাখীদের নিজেদেরই ভয়ার্ত আওয়াজ বাজাতে থাকলে পাখীরা ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। বহুকাল ধরে এই ব্যবস্থাতে কাজ হয়ে আসছে।

পাখীদের চিৎকার বা সংকেতের টেপ-রেকর্ড ছাড়াও কৃত্রিম ও যন্ত্রের সাহায্যে উৎপন্ন আওয়াজ—যেমন, সাইরেনের আওয়াজ, বোমা ফাটার আওয়াজ বা ঝমঝম্ আওয়াজ—বাজানো হয়ে থাকে। কানে শোনার আওয়াজ ছাড়াও চোখে দেখার আলোও ব্যবহার করা হয়। পাখীদের দৃষ্টিশক্তি খুব তীক্ষ্ণ এবং ভীতি-জনক আলোর সংকেত অনেক দূর থেকেই এরা দেখতে পায়। তবে এই সমস্ত কিছু করার সময়েই একটি বিষয় বিবেচনা করার আছে তা হচ্ছে পাখীদের বিশেষ ব্যবহার। দেখা দরকার পাখীদের সক্রিয়তা কোন্ সময়ে—দিনের বেলা না রাত্রিবেলা, এবং দলবদ্ধ আচরণ কী রকম।

অতএব কার্যটি দাঁড়াচ্ছে এই—এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করা যাতে পাখীরা ভয় পায়, কোনো এক প্রজাতির নয়, সমস্ত দলের পাখীরা। অর্থাৎ ব্যবস্থাটি হওয়া চাই সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য "পাখী-তাড়ুয়া"। সর্বোপরি ব্যবস্থাটি কার্যকর হওয়া চাই সঙ্গে সঙ্গে—যেমন কানে শোনার দিক থেকে, তেমনি চোখে দেখার দিক থেকে।

এমনি একটি ব্যবস্থা সম্প্রতি প্রস্তুত হয়েছে। ব্যবস্থাটির আবিষ্কারক ক্যাণ্ডিডেট অব সায়েন্স আলেকজান্দর তিখোনভ। তিনি মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যা বিভাগের গবেষণা অধিকারী। ব্যবস্থাটির নাম দেওয়া হয়েছে—"পক্ষি-আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী শব্দ-ভিত্তিক সংকেত জ্ঞাপন ও জৈব-কারিগরী ব্যবস্থা।"

জীব-জন্তুর শব্দভিত্তিক সংকেতকে দুটি ভাগে ভাগ করা চলে, যেমন করা চলে মানুষের মুখের কথাকে। একটি হচ্ছে 'শব্দার্থগত' অপরটি 'আবেগগত'। সে সংকেত তৈরি হচ্ছে তার মধ্যে দুটি ভাগই সর্বনিম্ন মাত্রায় থাকা দরকার, যাতে "শ্রোতারা"—অর্থাৎ পাখীরা—সংকেতের অর্থ ধরতে পারে বা সংকেত যে উদ্দেশ্যে ছাড়া হচ্ছে তা সিদ্ধ হয়। সংকেতকে আরো তীব্র করা হয়েছে দৃশ্যমান বিরক্তিকারক সৃষ্টি করে—তা হচ্ছে সূর্যকিরণ প্রতিসরক আয়না গোলক।

ডিস্কো ক্লাবগুলোতে আলোর নাচ সৃষ্টি করার জন্য যে ধরনের আয়না গোলক ব্যবহার করা হয়, তেমনি আয়না গোলক ব্যবহার করেছেন মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষি-বিজ্ঞানীরা। বিপদ-জ্ঞাপক দৃশ্যমান সংকেত আরোপ করা হয় শব্দভিত্তিক সংকেতের ওপরে। ফলে পাখীরা ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়।

* চৌধুরী পাড়া, হালিশহর, 24 পরগণা।

জুলাই-অগাস্ট '84 সংখ্যার 'ভেবে উত্তর দাও'র উত্তর

1. স্যামুয়েল হানিম্যান 2. চন্দ্রবোড়া 3. মাগুর 4. জোসেফ পিকাড্ 5, প্রেসার কুকার 6. পঞ্চম 7. লিথিয়াম 8. ফের্মি 9. ন্যাপথলিন 10. বাবুই 11. পারদ 12. পেলাগ্রা 13. আরশোলা 14. ভিটামিন-H 15. সোডিয়াম সিলিকেট 16. বার্জেলিয়াস 17. সিলভার নাইট্রেট 18. শুক্র 19. 0·4% 20. টিন ও সীসা 21. ফুলকপি 22. ইউরেনিয়াম 23. ভোল্ট 24. জিব্রালিন 25. 1895 খৃস্টাব্দে 26. ডিম 27. ঝড় আসছে।

জুলাই-অগাস্ট '84 সংখ্যার 'ভেবে উত্তর দাও'র উত্তর দাতাদের নাম

রাণা, বান্টু, টুকুন, ডাকু, লাভলি, বুচু, বাপী, অপু, তপু, টুকটুক শান্তিপল্লী, হুগলী।

জুলাই-অগাস্ট '84 সংখ্যার 'শব্দ-শৃঙ্খলে'র সমাধান

উপর নীচ:—অ্যালকোহল 3. টাক, 4. রাইবোজোম, 6. সরিষা, 9. ওয়াটসন, 10. দূষণ, 13. টক, 15. সিনাবার, 16. টান, 17. সাপ, 18. উত্তল, 20. মন।

পাশাপাশি:—1. অ্যামমিটার, 2. কোবরা, 5. ইলিয়াম, 7. মন্দন, 8. রিয়া, 11. মানুষ, 12. নট, 14. টনসিল, 16. টারসাল, 19. আর্গন।

জুলাই-অগাস্ট '84 সংখ্যার 'শব্দ-শৃঙ্খলে'র সমাধানকারীদের নাম:—

সর্বেন্দু সিংহরায়, শীর্ষেন্দু সিংহরায়, কাঞ্চন রায়চৌধুরী, হরিপাল হুগলী। সৌমিত্র মজুমদার, সৌমেন মজুমদার, সত্যেন মজুমদার, বিনয় ভট্টাচার্য, বিপ্লব ভট্টাচার্য, প্রতিমা ভট্টাচার্য, 24 পরগণা।

পুস্তক পরিচয়

"আধি-ব্যাধির আত্মকথা" পুস্তকটির রচয়িতা ডঃ শ্রীকুমার রায়, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানীর পক্ষে শ্রীঅরুণকুমার পুরকায়স্থ, 79, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-9 থেকে প্রকাশিত। এর প্রচ্ছদ শিল্পী স্বনামখ্যাত শ্রী পূর্ণেন্দু পত্রী। পুস্তকটির মূল্য 18 টাকা মাত্র।

পুস্তকটিতে লেখক প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞানের যুগ পর্যন্ত কিরূপে চিকিৎসাশাস্ত্রের ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতি ঘটেছে তা যথাযথভাবে অত্যন্ত সহজ, সরল ভাষায় মোট ছয়টি পরিচ্ছেদে ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদে লেখক প্রাচীন মিশরীয় সমাজের জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা ও উন্নত পদ্ধতিতে মৃতদেহ সংরক্ষণ প্রণালী, ভারতবর্ষ, চীন ও ইউরোপীয় দেশগুলিতে চিকিৎসা পদ্ধতি কেমন ছিল তার তথ্যভিত্তিক আলোচনা করেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লেখক, আধুনিক শাস্ত্রে রোগের কারণ, পুরাকালে কারণ সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও চিকিৎসা সম্পর্কে কুসংস্কার এবং মারাত্মক অপচিকিৎসার কথা রসাত্মক ভাষায় পরিবেশন করেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে, শল্য চিকিৎসা শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত ইতিহাস ও প্রাচীনকালে বিভিন্ন দেশে কিরূপভাবে শল্য চিকিৎসা সম্পন্ন করা হত তার বিভিন্ন আকর্ষণীয় তথ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মধ্যযুগ পর্যন্ত, ধর্মীয় কুসংস্কারের ফলে চিকিৎসা শাস্ত্রে অ্যানাটমি চর্চা কিরূপভাবে ব্যাহত হয়েছিল, তাও লেখক এই পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন।

যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে আহতদের নিরাময়ের প্রয়োজনে কিরূপে বিভিন্ন কালে ও স্থানে চিকিৎসা পদ্ধতি ও প্রয়োগের নব নব পন্থা আবিষ্কৃত হয়েছে তা চতুর্থ পরিচ্ছেদে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক ভেষজ-চিকিৎসার ইতিহাস ও প্রয়োজনীয়তা এবং সর্বোপরি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার গুরুত্ব আলোচিত হয়েছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে লেখক, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ব্যাধির আক্রমণের হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় উল্লেখ করেছেন। এই পরিচ্ছেদে বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে লেখক একথাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে চিকিৎসা একটি সামাজিক দায়িত্ব—যেখানে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের চেয়েও গণস্বাস্থ্য বা Public Health-এর গুরুত্বই সর্বাধিক।

এই পুস্তকটি—ছাত্র-ছাত্রী তথা সর্বস্তরের মানুষের অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ও অপচিকিৎসার প্রয়োগ ও শিকার থেকে মুক্ত করে প্রকৃত বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসাপদ্ধতি ও সুস্বাস্থ্য সম্পর্কে জ্ঞানের আলো প্রদান করবে।

অলোক ঘোষ*

*বঙ্গবাসী সান্ধ্য কলেজ, কলিকাতা—9

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006 থেকে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেস, 37/7, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-700 009 হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

আবেদন

1948 সাল থেকে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা বিষয়ে পরিকল্পিত ধ্যান ধারণা পরিষদ পালন করে আসছে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রকাশনের মাধ্যমে। ইতিমধ্যে পরিষদ কিছু অমূল্য রচনা বাংলাভাষায় প্রকাশ করেছে। বর্তমান পত্রিকা প্রকাশনা ছাড়াও পরিষদ বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতার বিকাশ ঘটে। গ্রাম বাংলার পল্লীতে, আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে ও শহরের বস্তিতে, যেখানে বেশীর ভাগ মানুষ জ্ঞানের আলো থেকে এখনও বঞ্চিত, তাদের কাছে বিজ্ঞানের মঙ্গলময় রূপ তুলে ধরতে পরিষদ বদ্ধপরিকর। এইসব বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মসূচীর রূপায়নে অর্থের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অথচ পরিষদের দারুণ অর্থাভাব। তাই পরিষদ সরকার, বেসরকারী সংস্থা, ব্যবসায়ী ও সহৃদয় ব্যক্তির কাছে অর্থসাহায্যের আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছে। সাধারণ মানুষের জন্য তৈরী আচার্য্য বসুর পরিষদ যে কোনও সামান্য দানও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করে অবহেলিত মানুষের স্বার্থে ব্যয় করবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে পরিষদে প্রদত্ত সর্বপ্রকার দান আয়করমুক্ত।

কর্মসূচী

1. সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা সৃষ্টি করা এবং বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তোলা।
2 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকাকে সাধারণের নিকট আরও আকর্ষনীয় করে তোলা।
3. পরিষদের মাধ্যমে গ্রামবাংলার বিজ্ঞান ক্লাবগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা এবং তাদের বিজ্ঞান ভিত্তিক জনহিতকর কাজে উৎসাহিত করা।
4. প্রতি বছরে পশ্চিম বাংলায় অন্ততঃ একবার বিজ্ঞান সম্মেলনের ব্যবস্থা করা।
5 গ্রামবাংলার বিভিন্ন মেলায় বিজ্ঞান ক্লাবগুলিকে নিয়ে পোস্টার প্রদর্শনী বিজ্ঞানভিত্তিক সিনেমা, আলোচনাচক্র অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞান, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করা।
6. বছরের শেষে বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা।
7. হাতে-কলমে কারীগরী বিদ্যা শিখিয়ে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রী ও নাগরিকদের স্বনির্ভরশীল করা। ব্যয়ভার বহনের জন্য সামান্য অর্থের বিনিময়ে টি. ভি. টেপরেকর্ডার, রেকর্ড-প্লেয়ার, ট্রানজিস্টার এমারজেন্সি বৈদ্যুতিক আলো, ফটোগ্রাফী বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া।
8. মাটি পরীক্ষার কাজে শিক্ষা দিয়ে গ্রামের বিজ্ঞান ক্লাবগুলিকে সাধারণ চাষীদের সাহায্য করতে উৎসাহিত করা।
9. সাধারণ মানুষের জন্য বিজ্ঞান প্রবন্ধ থেকে মৌলিক গবেষনাপত্র পর্য্যন্ত বাংলা ভাষায় প্রকাশ এবং জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বই ও বিজ্ঞান সাধক চরিতমালা প্রকাশ।
10. যোগব্যায়াম ও তার গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন।
11. পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারটি সুসমৃদ্ধ করে গড়ে তোলা।
12. পরিষদ ভবনে 'বিজ্ঞান সংগ্রহশালা' স্থাপন করা।
13 নির্বিচারে যথেচ্ছ গাছপালা ও বনজঙ্গল ধ্বংসের ফলে পরিবেশ দূষণ ও আবহাওয়ার মারাত্মক পরিবর্তনের ভয়াবহতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সজাগ করা।
14. নির্বিচারে বন্যপ্রাণী ধ্বংসের দরুণ বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যের বিঘ্ন ঘটার বিপদ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা।
15. যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করা।
16. শহর ও গ্রামের প্রতিটি স্কুল, কলেজ ও গ্রন্থাগারে পরিষদের মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার গ্রাহকীকরণের মাধ্যমে পরিষদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচার।

সুকুমার গুপ্ত
কর্মসচিব

লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বিজ্ঞান পরিষদের আদর্শ অনুযায়ী জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার মত সমাজের কল্যাণমূলক বিষয়বস্তু সহজবোধ্য ভাষায় সুলিখিত হওয়া প্রয়োজন।
2. মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এবং পূর্ণ ঠিকানাসহ লেখকের পরিচিতি পৃথক কাগজে অবশ্যই লিখে দিতে হবে।
3. চলিত ভাষা এবং চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহৃত হবে। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্র্যাকেটে ইংরাজী শব্দটিও দিতে হবে। আন্তর্জাতিক সংখ্যা এবং মেট্রিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে
4. মোটামুটি 3000 শব্দের মধ্যে রচনা সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়।
5. বিভিন্ন ফীচার, সমকালীন বিজ্ঞান গবেষণা ও প্রযুক্তিবিদ্যার সংবাদ এবং বিজ্ঞান বিষয়ক সুন্দর আকর্ষণীয় ফটোগ্রাফীও গ্রহণীয়।
6. রচনার সঙ্গে চিত্র থাকলে আর্ট পেপারে চাইনিজ কালিতে সুঅঙ্কিত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন।
7. প্রত্যেক চিত্র প্রস্থে 8 সে. মি. কিংবা এর গুনিতকের (16 সে. মি. 24 সে. মি.) মাপে অঙ্কিত হওয়া প্রয়োজন।
8. অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব বজায় রেখে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মন্ডলীর অধিকার থাকবে।
9. প্রত্যেক প্রবন্ধ ফীচার-এর শেষে গ্রন্থপঞ্জী থাকা বাঞ্ছনীয়।
10. জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পুস্তক সমালোচনার জন্য দুই কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।
11. ফুলস্ক্যাপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় যথেষ্ট মার্জিন এবং প্রতি লাইনের পর বেশ কিছুটা ফাঁক রেখে পরিস্কার হস্তাক্ষরে প্রবন্ধ লিখতে হবে।
12. প্রতি প্রবন্ধের শুরুতে পৃথকভাবে প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া আবশ্যিক।

সম্পাদনা সচিব

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অক্টোবর, 1984
37তম বর্ষ, দশম সংখ্যা

বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের অনুশীলন করে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও সমাজকে বিজ্ঞান-সচেতন করা এবং সমাজের কল্যাণকল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করা পরিষদের উদ্দেশ্য।

বিষয় সূচী

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সপ্তত্রিংশত্তম বর্ষ | অক্টোবর, 1984 | দশম সংখ্যা

বিজ্ঞান ও সভ্যতা

রতনমোহন খাঁ

মানুষকে নিয়ে সমাজ আর সামাজিক ব্যবস্থাপনাই সভ্যতা। বিজ্ঞান মানুষের চিন্তা-ভাবনাকে পরিবর্তিত করছে, আজো করছে, পরেও করবে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে এই চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন সমাজে সর্বত্র পড়ছে। তাই সভ্যতা এক জায়গায় স্থির নেই। হরাপ্পা, মহেঞ্জোদাড়ো, ব্যাবিলোনিয়ান, মেসোপটেমিয়া—আজ ইতিহাসের পাতায় ও যাদুঘরের সাজ-সজ্জায় স্থান পেয়েছে। ভারত ও গ্রীসের মধ্যযুগীয় সভ্যতা আজ লুপ্ত। ইতিহাস বলে উনিশ শতকেও মানুষ প্রাকৃতিক ঘটনায় হতো ভয়ে বিহ্বল এবং বিশ্বাস করত দুর্ভিক্ষ, মহামারী, মড়ক, সংক্রামক ব্যাধি প্রভৃতির পিছনে আছে কোন এক অলৌকিক শক্তির রুদ্ররোষ অথবা পিশাচ, ডাইনী বা অপদেবতার অশুভ দৃষ্টি। ঘটনাবলীর পিছনে আছে কারণ, সে কারণগুলি ছিল সে যুগে অজ্ঞাত। এই অজ্ঞানতা থেকেই বিস্তারিত হয়েছিল কুসংস্কার। বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কারে আমরা আজ অনেক যুক্তিবাদী, নিরাপত্তার অধিকারী, নবসভ্যতার বার্তাবাহী।

মাত্র একশো বছর আগেও পৃথিবীতে শিশুমৃত্যুর হার ছিল 50%-এর বেশি, মানুষের গড়-আয়ুষ্কাল ছিল 30 বছরেরও কম। সম্রান্ত বিত্তবান ঘরেও শিশুদের মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা যেত না। সেখানে এখন দরিদ্র বস্তিবাসী শিশুও সহজে মৃত্যুর শিকার প্রায় হয় না। 'আনন্দমঠে' বর্ণিত দুর্ভিক্ষ পীড়িত, মহামারী কবলিত, অনশনক্লিষ্ট কঙ্কালসার মানুষের ছবি পর্দায় দেখে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। 1665 খৃষ্টাব্দের লণ্ডনের প্লেগে ছয়জনের মধ্যে একজনের মৃত্যুর বিভীষিকা লণ্ডনবাসীর কাছে এখন আষাঢ়ে গল্প। জ্বরে শরীরের উত্তাপ রোধে অঙ্গে ছিদ্র করে রক্ত বের করা আজগুবি বলে উড়িয়ে দেওয়া হবে, কিন্তু একদিন ছিল এ বাস্তব ঘটনা। শারীরবৃত্তীয় জ্ঞান না থাকায় শরীরের বিভিন্ন স্থানে ক্ষত সৃষ্টি করে চিত্র অঙ্কিত হত, বিশেষ করে মেয়েদের উপর এ অত্যাচার ছিল বহুল। দাঁতে চিকন ধাতু আটকান, শরীরে উল্কি লাগান, অলঙ্কার পরিধানের জন্য নাকে-কানে ছিদ্র করান আদিম অজ্ঞানতারই জের। ইটালীতে মেয়েদের ক্ষীণকটি করার জন্য কাঠের বেড় ও চামড়ার কোর্ট পরান হত, চামড়া কেটে হাড়ে আঘাত করায় যন্ত্রণায় অস্থির হলেও বেড় খোলা হত না। এলিজাবেথের সময় মেয়েরা গলায় রাফ্ (একরকম আঁটসাট গলবস্ত্র) পরত, ফলে সুপ খেতে পারত না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মেয়েরা পরত চামড়া ও উলের টাইট পোষাক। একটি পোষাকই সবসময় পরে থাকতে হত, খোলা হতো না, পরিষ্কার করা হতো না। ফলে দুর্গন্ধে শরীর ভরে যেত এবং অল্প বয়সেই অনেকে মারা যেত।

লুই পাস্তুরের (1822—1895) জীবাণু আবিষ্কার আমাদের জীবাণু-সচেতন করেছে, রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ের নব নব পদ্ধতির পথ উন্মুক্ত করেছে, পরিবেশকে স্বাস্থ্যকর ও জীবাণুমুক্ত করার চিন্তা-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। বিজ্ঞানের অবদানে রোগ নিবারণ, রোগ বিস্তার রোধ এবং গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনের মাধ্যমে যেমন মৃত্যুর হার কমেছে অন্যদিকে অন্ধত্ব, বধিরত্ব, পঙ্গুত্ব মোচনের মধ্য দিয়ে যারা ছিল সমাজের বা পরিবারের কাছে দুঃসহ বোঝা তারা আজ অগ্রগতির সহায়ক। মেশিন আবিষ্কারে গত এক শতকে সভ্যতার ক্ষেত্রে এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। বস্ত্র, খাদ্য, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন বেড়েছে, সহজলভ্য হয়েছে এবং সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে এসেছে। পোষাক-পরিচ্ছদ শুধু লজ্জা, শীত বা তাপ নিবারণের হেতু নয়, পোষাকের উপরই শরীরের সুস্থতা, মনের শুচিতা, চিন্তার প্রসারতা, সৌন্দর্যের নির্মলতা নির্ভর করে। বহু খাদ্য-দ্রব্য উৎপাদনে ও সংরক্ষণে, রোগ নির্ধারণে, যাতায়াতে

সময়ের ব্যবধান সংকোচনে, খনিজ দ্রব্য উত্তোলনে, ব্যবহারিক জিনিষপত্র নির্মাণে যে যুগান্তর এনেছে, মাত্র 150 বছর আগে এসব ছিল অকল্পনীয়। মেসিন যেন আলাদীনের প্রদীপের দানবের মত অসীম ক্ষমতার অধিকারী। মানুষ এই যন্ত্রদানবকে বশে এনেই পৃথিবী ছাড়িয়ে চাঁদে নামছে, গ্রহান্তরের খবর আনছে। বিদ্যুৎ, পেট্রোল, কয়লা, সামুদ্রিক সম্পদ, পারমাণবিক শক্তি প্রভৃতির শুভ প্রয়োগ বহু স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে তুলেছে। ছাপাখানা, মুদ্রণ-শিল্পের যথেষ্ট উন্নতির ফলে আমাদের জ্ঞানের পরিধি বহু গুণ বেড়ে গেছে। যারা পড়তে জানে না রেডিও, টেলিভিশন তাদের অজ্ঞানতা দূর করতে সাহায্য করছে, বহুলাংশ কৌতূহল প্রশমিত করছে।

দৈনন্দিন কাজে বিজ্ঞান আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে মিশে গেছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমরা যেসব কাজ করি, তা প্রায় সবই বিজ্ঞান প্রভাবিত বা বিজ্ঞান দ্বারা পরিচালিত। সামান্য চা থেকে নিত্যকার আহার্য, খবরের কাগজ, দাড়ি কামানোর ব্লেড, অফিসে যাওয়ার গাড়ি, দূরের স্বজন-পরিজন সঙ্গে যোগাযোগের জন্য টেলিফোন—এ সবই এসেছে বিজ্ঞানীর চিন্তার ফসল হিসাবে। গ্রামের চাষীও আজ আর ইচ্ছামত চাষ করে না, বিজ্ঞানের নবতম আবিষ্কারকে কাজে লাগায় উন্নত মানে চাষের জন্য। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের ভাব-বিনিময় সহজ হয়েছে। অনুন্নত দেশ উন্নত দেশের সাহায্যে অগ্রগতির পথ ত্বরান্বিত করছে। খণ্ড খণ্ড সভ্যতার সামগ্রিক রূপ নেবার পথ প্রশস্ত হচ্ছে।

তবুও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগে—মেসিনের যুগে মানুষ কি নিজ শক্তির উপর আস্থা হারাচ্ছে না, মানুষ কি মেসিনের দাস হয়ে যাচ্ছে না, উৎপাদন কেন্দ্রীভূত ও ত্বরান্বিত হওয়ায় বেকার সমস্যা কি তীব্রতর হচ্ছে না, মুদ্রণ ও টাইপিং কি স্মরণ শক্তির হ্রাস ঘটাচ্ছে না, প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করে পরিবেশ দূষণের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান কি পৃথিবীর জীবজগৎকে নিশ্চিত চিরঅবলুপ্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না, বিলাসবহুল জীবনের অস্থিরতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা কি সত্যই সভ্যতার অগ্রগতি নির্দেশ করছে? এসব প্রশ্ন অমূলক নয়, তবে এসব ঘটনার জন্য বিজ্ঞান কি দায়ী?

রামেন্দ্র'র পথ না জগদীশ-প্রফুল্ল'র পথ ?*

বিনয়কুমার সরকার

কোন্ পথে চলিবে বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষৎ—প্রচারের পথে, না গবেষণার পথে ?

গবেষণাও জরুরি, প্রচারও জরুরি। তবে গবেষণাটা প্রচার নয়, আর প্রচারটাও গবেষণা নয়। গবেষণা এক চিজ। প্রচার আর এক চিজ। প্রচারে গবেষণায় ফারাক মেরুতে মেরুতে।

বিজ্ঞান-প্রচার বাংলাদেশে আজ নতুন নয়। প্রচারের জন্য একটা জবরদস্ত ব্যবস্থা হইয়াছিল বছর শয়েকেরও আগে। প্রচারক ছিলেন অক্ষয় দত্ত (1810-86)। তাঁহার মেজাজে ছিল ইয়োরামেরিকান বিজ্ঞানবিদ্যাগুলাকে বাংলার জমিনে আনিয়া খাড়া করানো। "তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা" (1843) ছিল সেই পশ্চিমা বিজ্ঞানবিদ্যার বাহন। বিজ্ঞান ছাড়া অন্যান্য মালও এই চৌবাচ্চায় মজুদ হইত। কিন্তু ধর্ম গবেষক আর দর্শন-গবেষক অক্ষয় দত্ত'র তদ্বিরে "তত্ত্ববোধিনী"র তত্ত্বের ভিতর পদার্থতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, আর জীবতত্ত্ব ইত্যাদি সেকেলে প্রাকৃতিক তত্ত্বের সব-কিছুই পাওয়া যাইত। সেই "তত্ত্ববোধিনী"র প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-বিষয়ক বিদ্যাগুলা খাইয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের বাঙালীর বাচ্চারা বিজ্ঞান-নিষ্ঠ হইতে শিখিয়াছিল। সঙ্গে-সঙ্গে বাংলা গদ্যও শিখিয়াছিল। বাংলায় বাঙালীর জন্য বাংলাভাষায় বিজ্ঞান-প্রচারের আখড়ায় অক্ষয় দত্ত নং 1 ওস্তাদ। কাল হিসাবেও বটে, মাল হিসাবেও বটে।

আর এক জবরদস্ত বিজ্ঞান-প্রচারক ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র (1822-91)। লোকেরা তাঁহাকে জানে ইতিহাস আর প্রত্নতত্ত্বের বেপারী বলিয়া। কিন্তু তাঁহার "বিবিধার্থ সংগ্রহ" (1851) পত্রিকা ছিল বাঙালী জাতের দ্বিতীয় "তত্ত্ববোধিনী"। এই হাটে সওদা বিকাইত রকমারি। সাহিত্যকে সাহিত্য, দর্শনকে দর্শন, ইতিহাসকে ইতিহাস আর বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান,—কোনো অর্থই বাদ পড়িত না। বাঙালীর বাচ্চারা রাজেন্দ্রলালের হাতে বিজ্ঞান খাইয়া বেশ-কিছু বৈজ্ঞানিক মাল রপ্ত করিতে পারিয়াছিল। একালের বাঙালী বিজ্ঞান-সেবক, বিজ্ঞান-গবেষক আর বিজ্ঞান-প্রচারকের বাবারা আর বাবার বাবারা অক্ষয় দত্ত আর রাজেন্দ্র মিত্র দুইজনের নিকটই চরমভাবে ঋণী ছিলেন। আমাদের একালের লোকেরা বোধ হয় সেকথা ভুলিয়া গিয়াছে।

বিজ্ঞান-প্রচারের তৃতীয় ধাপে দেখিতে পাই ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে (1825-94)। ভূদেব ছিলেন পরিবার-শাস্ত্রী, আচার-শাস্ত্রী, সমাজ-শাস্ত্রী। তাঁহার হাতে ছিল "এডুকেশন গেজেট" পত্রিকা (1868)। নাম ইংরেজি, কাম বাংলা। এই জন্য লোক-মহলে ভূদেব একমাত্র শিক্ষা-বিজ্ঞানের সওদাগর বলিয়া পরিচিত। ধারণাটা নেহাৎ একচোখো। "এডুকেশন গেজেট" পত্রিকার মারফৎ বাঙালীর পাতে পরিবেষণ করা হইত "বিবিধার্থ সংগ্রহে"রই হরেক-প্রকার জ্ঞান ও বিজ্ঞান।

অক্ষয়, রাজেন্দ্র, ভূদেব,—এই তিনজন ছিলেন বাঙালী বিজ্ঞান-প্রচারকদের কোঠে "বাঘা-বাঘা" পণ্ডিত। আজকালকার বিজ্ঞান-"গবেষকেরা" হয়ত এসম্বন্ধে বেশ-কিছু ওয়াকিবহাল নন। তবে একালের বিজ্ঞান-প্রচারকদের পক্ষে এই ত্রিবীরকে দূর হইতে সেলাম ঠুকিয়া আখড়ায় হাজির হওয়া উচিত। এই ত্রিবীর বাংলায় গদ্য-সাহিত্যের তিন বিপুল-বিপুল খুঁটা। এই জন্যও সকলেরই কুর্ণিশ-যোগ্য।

বিজ্ঞান-প্রচারের ঝুঁকি বাঙলার প্রত্যেক মাসিক পত্রিকাই নিজ ঘাড়ে লইয়াছে। এমন কোনো বড় বহরের মাসিক মাথা খাড়া করে নাই যাহার ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের ছিটে-ফোঁটা বাঙালী মহলে ছড়ানো হয় নাই। বিজ্ঞানের দরদ ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বাঙালীর জীবনে একটা মস্ত দরদ হইয়া রহিয়াছে। একথাটা সর্বদাই মনে রাখা ভাল।

1901 সালে তের-চৌদ্দ বৎসর বয়সে মালদহ হইতে প্রেসিডেন্সি কলেজে আসিয়া ঢুকিলাম। বিজ্ঞান-ঘেঁশা কোনো নামজাদা পত্রিকা তখন ছিল কিনা সন্দেহ। সে-যুগে বাংলা পড়ার রেওয়াজ বড় একটা ছিল না। কিন্তু জানিতাম যে, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের বিজ্ঞানশীল পত্রিকা ছিল অনেকগুলা। তখনকার দিনে একজন জবরদস্ত বাঘা পণ্ডিত বিশেষরূপে বিজ্ঞান-প্রচারক বলিয়া নামজাদা ছিলেন। তাঁহার বৈজ্ঞানিক ইজ্জৎ সেই অক্ষয়-রাজেন্দ্র-ভূদেবের চেয়েও বেশী। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর (1864-1919) কথা বলিতেছি। তাঁহার সঙ্গে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসেবীদের কোনো বৈঠক, সঙ্ঘ বা আড্ডা গাঁথা ছিল না। তাঁহাকে চলিতে হইত একা-একা। কোনো পত্রিকার সঙ্গেও তাঁহার বাঁধা যোগাযোগ ছিল না।

সেকালের ছোকরা মহলে রামেন্দ্রসুন্দরের "প্রকৃতি" (1896) বইয়ের নামডাক ছিল জবর। বইটার প্রবন্ধগুলা

---

* জ্ঞান ও বিজ্ঞান, জানুয়ারী, 1948 সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত

অক্ষয় সরকারের "নবজীবন" (1884), সুধী ঠাকুরের "সাধনা" (1891) আর সুরেশ সমাজপতির "সাহিত্য" (1894) ইত্যাদি মাসিকে বাহির হইয়াছিল। পত্রিকাগুলা বিজ্ঞান-খোরদের কাগজ ছিল না। ছিল "পাঁচ-ফুলে সাজি" বিশেষ। কিন্তু রামেন্দ্র ছিলেন সত্যিকার "বিজ্ঞান-খোর"।

অক্ষয়-রাজেন্দ্র-ভূদেবে আর রামেন্দ্রসুন্দরে প্রভেদ বিস্তর। সেই ত্রিবীর ছিলেন বিজ্ঞান-প্রেমিক মাত্র। তাঁহাদের পেশা বিজ্ঞান-প্রচারের উপরে বা বাহিরে যাইতে পারে নাই। বিজ্ঞানের ভিতরেও তাঁহারা ঢুকেন নাই। রামেন্দ্র মামুলি বিজ্ঞান-প্রেমিক আর বিজ্ঞান-প্রচারক মাত্র নন। তিনি ছিলেন বিজ্ঞান-সিদ্ধ লোক, বিজ্ঞান-খোর পণ্ডিত, বিজ্ঞান-সেবক, বৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞান-সেবা ছিল তাঁহার আসল ও প্রধান পেশা। 1903 সালে প্রকাশিত "জিজ্ঞাসা" বইয়ের প্রবন্ধগুলারও "প্রকৃতি" বইয়ের বিজ্ঞান-সাধকই হাজির দিয়াছেন। দর্শন, সাহিত্য, শিক্ষা, শিল্প, শব্দ, সমাজ, ধর্ম্মাধর্ম্ম ব্যক্তিত্ব, সুনীতি-কুনীতি, বেদ, যজ্ঞ ইত্যাদি নানা মাল সম্বন্ধে রামেন্দ্রর মগজ মৃত্যু (1919) পর্য্যন্ত খেলিয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের আবহাওয়ায় তিনি ভাষা ও সাহিত্যের তাত্ত্বিকরূপে বাজার বসাইয়াছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ প্রবন্ধেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-বিদ্যাগুলা তাঁহার প্রধান আলোচ্য ছিল। বিংশ শতাব্দীর যুবকবাঙলা প্রধানতঃ বা একমাত্র রামেন্দ্র-সাহিত্যকেই হাক্সলে-সাহিত্য বা রেনাঁ-সাহিত্য সমঝিয়া থাকে। আমরা সেকালে বিজ্ঞান-লেখক, বিজ্ঞান-প্রচারক, বিজ্ঞান প্রাবন্ধিক বলিলে রামেন্দ্রকেই বুঝিতাম। গদ্য-রচনার রামেন্দ্রিক রীতি আমাদের পছন্দ-সই ছিল।

একমাত্র বিজ্ঞান-প্রচারের মতলবে পত্রিকা চালানো হালের কথা। 1924 সালে "প্রকৃতি" দেখা দেয় ত্রৈমাসিক রূপে। হাল ধরিবার ভার ছিল পাখী-শাস্ত্রী সত্য লাহার হাতে। পরবর্তীকালের বহু-সংখ্যক বিজ্ঞান-গবেষক আর বিজ্ঞান-প্রচারকের তিনি ব্যক্তিগত বন্ধু। বছর চোদ্দ ছিল এই পত্রিকার আয়ু। ইহার লেখকেরা প্রায় সকলেই বিজ্ঞান-বিদ্যায় মাষ্টার-জাতীয় লোক। প্রত্যেকেই অল্পবিস্তর রামেন্দ্রর পথের পথিক। রামেন্দ্রর সমসাময়িক,—রাবীন্দ্রিক বোলপুরের জগদানন্দ রায়ও এখনকার অনেক যুবা মাষ্টারকে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনায় হদিশ যোগাইয়াছেন।

"প্রকৃতি"র সঙ্গে কোনো সঙ্ঘ বা পরিষদের যোগাযোগ ছিল না। তবে মাঝে মাঝে সত্য লাহার ঘরোয়া বৈঠকে অথবা পাখীর বাগানে বিজ্ঞান সেবক, বিজ্ঞান প্রচারক, বিজ্ঞান গবেষক ইত্যাদি লোকজনের তর্কাতর্কি, প্রশ্নাপ্রশ্নি ও কিঞ্চিৎ কিছু মিষ্টি-মুখের ব্যবস্থা হইত। ফরাসী পারিভাষিকে সত্য লাহার বৈঠকগুলা ছিল "সালঁ"-জাতীয় আড্ডা। এই সকল বৈঠকে কোনো কোনো সময়ে ইয়োরামেরিকান নরনারীর আনা-গোনাও ঘটিত।

ত্রৈমাসিক "প্রকৃতি"র যুগে রামেন্দ্রর মতন "সবে ধন নীলমণি"র ঠাঁই ছিল না। এই অবস্থায় গণ্ডা গণ্ডা বা ডজন ডজন ছোট বড় মাঝারি রামেন্দ্রর কলম চলিত। বিজ্ঞান প্রচার সাধিত হইয়াছে অনেকগুলা বিজ্ঞান সিদ্ধ বিজ্ঞান খোর, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের সহযোগিতায় বা প্রতিযোগিতায়। বলিয়া রাখি যে, এই সকল লেখকদের কেহ কেহ বিজ্ঞান "গবেষণা"রও পাকা লোক ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের গবেষণার ফল প্রথমেই বাংলার "প্রকৃতি"তে বাহির হইত না।

প্রথম বর্ষের "প্রকৃতি"র লেখকেরা বর্ণমালা মাফিক নিম্নরূপ (1924—25) :—অতুল দত্ত (প্রাণ), অনিল ঘোষ (মাছ) উমাপতি বাজপেয়ী (রসায়ন), একেন ঘোষ (চিকিৎসা), জ্যোতির্ময় ব্যানার্জি (মাছ), দুর্গাদাস মুখার্জি (পিঁপড়ে), প্রফুল্ল রায় (শুভেচ্ছা), প্রশান্ত মহালানবিশ (আবহাওয়া) বনোয়ারী চৌধুরী (নৃতত্ত্ব), বলাই দত্ত (সমুদ্র), বিনয় পাল (প্রাণ), বিপিন সেন (আবহাওয়া), ভূদেব বসু (সাপ), যোগেন সাহা (রঙ), ল্যাঙ্কাস্টার (উদ্ভিদ্), শ্যামাদাস মুখার্জি (গোলাপ), সত্য লাহা (পাখী), সুধীন রায় (পিঁপড়ে), সুরেশ দত্ত (ভূতত্ত্ব), সুবোধ মজুমদার (রসায়ন), ও হেম দাসগুপ্ত (ভূতত্ত্ব)।

1924-25 সালে এই অধম ইতালি, সুইট্সাল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মানি ইত্যাদি দেশে ভবঘুরে। সেখানে "প্রকৃতি"র সেবায় কিঞ্চিৎকিছু পাঠাইবার জন্য তাগিদ জুটিত। সেই তাগিদের জবাবে মাঝে মাঝে বিজ্ঞান গবেষণার অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে বিদেশী,—বোধ হয় প্রধানতঃ জার্ম্মান,—তথ্য পাঠাইয়াছি। সে-সব যথাসময়ে ছাপাও হইয়াছে।

শেষ,—চতুর্দশ,—বর্ষের (1938) ছয় সংখ্যায় যেসকল বিজ্ঞান-খোরের লেখা বাহির হইয়াছিল তাঁহদের নাম করিয়া যাইতেছি, যথা :—গোপাল ভট্টাচার্য্য (পোকা), জ্ঞানেন্দ্র রায় (খাল-বিল-হ্রদ), জ্ঞানেন্দ্র ভাদুড়ী (প্রাণি-বিজ্ঞানের পরিভাষা), নিকুঞ্জ দত্ত (উদ্ভিদ), প্রফুল্ল রায় (রসায়ন), বীরেন ঘোষ (সিকিম-হিমালয়ের উদ্ভিদ্)' বিমল চ্যাটার্জি (প্রাণী), যোগেশ রায় (প্রাণি-বিজ্ঞানের পরিভাষা), শরৎ মিত্র (নৃতত্ত্ব), সত্য সেন (ভূতত্ত্ব), সত্য রায়চৌধুরী, সুধীর বসু (পরমাণু), সুরেন চ্যাটার্জি (বিজ্ঞানের ভাষা), সুরেশ সেন (প্রাণী)। 1937 সালে জগদীশচন্দ্রের মৃত্যু হয়। কাজেই 1938-এর পত্রিকার অন্যতম সংখ্যায় জগদীশ-স্মৃতি, জগদীশ-সম্বর্দ্ধনা ও বসু-বিজ্ঞান-মন্দির ইত্যাদি বিষয়ক রচনা বাহির হয়। জগদীশ-লেখকদের নাম নিম্নরূপ :—গোপাল ভট্টাচার্য্য, চারুবালা মিত্র, জ্যোতির্ময় ঘোষ, নির্মল লাহা, বীরবল সাহনি (লক্ষ্ণৌ), মেঘনাদ সাহা, যতীন সেনগুপ্ত, সত্যেন সেনগুপ্ত ও সুধীর বসু।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—চোদ্দ বৎসরের বেশী "প্রকৃতি" টেঁকসই হয় নাই। 1938 সালে পাততাড়ি গুটাইবার সময় কর্ম্মাধ্যক্ষ বিদায় নিবেদনে জানাইতেছেন :—"মাতৃভাষার সাহায্যে বিজ্ঞানসেবার যুগ এখনো বাংলাদেশে আসে নাই।" তাহার

কারণও তিনি বাৎলাইতেছেন, যথা: "এ বিষয়ে আমাদের শিক্ষিত সমাজে সম্পূর্ণ উদাসীনতার ভাবই চতুর্দ্দশ বর্ষ ধরিয়া আমরা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি" যাহা হউক, লোকসান সহিবার ক্ষমতা সত্ত লাহার ছিল। এই জন্য বিজ্ঞানসেবার আর বিজ্ঞানপ্রচারের আর একটা ধাপ (1924-38) বাঙালী সমাজে রহিয়া গেল। "শনৈঃ শনৈঃ পর্ব্বত-লঙ্ঘনম্"। জানিয়া রাখা ভাল যে, গণ্ডা গণ্ডা বিজ্ঞানখোর থাকা সত্ত্বেও বাংলায় 'প্রকৃতি' টিকিল না।

আজ 1948 সাল। বিজ্ঞান-প্রচারের জন্য একটা পরিষৎ কায়েম হইতেছে। বলা বাহুল্য, বর্ত্তমানে বিজ্ঞান-সিদ্ধ, বিজ্ঞান-খোর, বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞান-প্রচারক গুনৃতিতে অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। কাজেই "প্রকৃতি" দ্বৈমাসিকের চেয়ে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' মাসিক অনেক বেশী সুবিধাজনক আবহাওয়ায় পয়দা হইল। বিজ্ঞানের জ্যোতিষীরা এই শিশুর কোষ্ঠী গুনিতে লাগুন।

সোজা চোখে দেখিতেছি যে, বিজ্ঞান-পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রী স্কুল-কলেজে আজকাল হাজার হাজার। আই-এস-সি, বি-এস-সি'র তো কথাই নাই। যাদবপুর আর শিবপুর কলেজের ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রের দলও বেশ কিছু বড়। আর ইহাদের পেটেও রকমারি বিজ্ঞান পড়ে। মায় ম্যাট্রিক ছাত্র-ছাত্রীরাও হাজারে হাজারে বিজ্ঞান-বিদ্যাগুলার সঙ্গে মোলাকাৎ করিতে পারে। ঘটনাচক্রে বাংলা ভাষায়ই একালে বিজ্ঞান চালানো হইতেছে,—নিচের কোটায়। উহা একটি জবর কথা। এই কথাটার কিম্মৎ লাখ টাকা।

বিজ্ঞান-বিদ্যার ছোট-বড়-মাঝারি মাষ্টার একালে গুনৃতিতে বেশ পুরু। বিজ্ঞানের বই-লেখক, নোট-লেখক ইত্যাদি বিজ্ঞান-খোরেরা দু-পয়সা কামাইবার সুযোগ পাইতেছে। কাজেই বিজ্ঞান-প্রচার এযুগে আর কষ্ট-কল্পনার সাধনা না হইতেও পারে। ইহার ভিতর কৃচ্ছ্রসাধন, 'তপস্যা' আর স্বার্থত্যাগের ঠাঁই হয়ত নাই। এমন কি, দ্বৈমাসিক 'প্রকৃতি'র যুগেও (1924-38) বিজ্ঞান-প্রচারের কাজ সত্ত লাহার পক্ষে স্বার্থত্যাগের কাজ বিবেচিত হইত। লেখকদেরকে তাগিদ দিতে দিতে কর্মাধ্যক্ষকে চটিজুতার সুখতলা ক্ষয়াইতে হইয়াছে। তাঁহাকে হয়রান-পরেশান হইতে হইত। আর রামেন্দ্র'র যুগে (1884-1919) তো এটা অতি মাত্রায় আদর্শনিষ্ঠার, পথ-প্রদর্শকের আর ভাবুকতার কাজ ছিল। কিন্তু 1948 সালে বিজ্ঞান-প্রচার কাণ্ডটা মামুলি স্কুল-কলেজের টেক্স্ট বুক প্রকাশের সামিল। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' মাস মাস বাজারে দেখা দিলে বাঙালী জনসাধারণের লাভ ছাড়া লোকসান নাই মনে হইতেছে। দেখা যাউক।

একটা বিজ্ঞান-খোর বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের দল আজকাল বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের তদ্বিরে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার ঝুঁকি লইতেছেন। ঠিক এই দরের বিজ্ঞান-সাধক, বিজ্ঞান-খোর বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের আড্ডা অক্ষয় দত্তর সেকাল হইতে আমাদের একাল পর্য্যন্ত বাংলায় আলোচনার জন্য বাঙালী সমাজে দেখা যায় নাই। এতগুলা পণ্ডিতে মিলিয়া বাংলা বৈজ্ঞানিক পত্রিকা কায়েম করেন নাই। 1948 সালের এই বিশেষত্বটা খুবই মহত্ত্বপূর্ণ। বাঙালী জাত্ ধাপে-ধাপে বাড়তির পথে আগাইতে আগাইতে আজ এক অপূর্ব্ব অধ্যায়ের সৃষ্টি করিতে চলিল। সত্যিকার একটা নয়া বাংলা এই ধাপে কায়েম হইতেছে সন্দেহ নাই।

কাজেই আবার প্রশ্ন করিতেছি। কোন্ পথে চলিবে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষৎ—গবেষণার পথে না প্রচারের পথে ?

বলিয়াছি,—বিজ্ঞান-প্রচারের আসরে রামেন্দ্রকে 'সবে ধন নীলমণি' সম্‌ঝিতাম। সেই যুগে বিজ্ঞান 'গবেষণায়' দৌড় ছিল কিরূপ ? বলা বাহুল্য, বিজ্ঞান-গবেষণা কী চিজ তাহা অক্ষয় দত্ত'র জানা ছিল না, রাজেন্দ্র মিত্র'রও জানা ছিল না, আর ভূদেব মুখাজ্জিরও জানা ছিল না। আর সত্য কথা,—এমন কি রামেন্দ্র ত্রিবেদীও বিজ্ঞান-গবেষণার ধার ধারিতেন না। তাঁহার সঙ্গে খাঁটি ল্যাবরেটরির যোগাযোগ একপ্রকার ছিল না বলিলেই চলে।

কাল হিসাবে বাঙালী জাতের প্রথম বিজ্ঞান 'গবেষক' জগদীশ বসু (1858-1937) আর প্রফুল্ল রায় (1861-1944)। ইঁহারা দুই জনেই নিজ-নিজ কোঠে রামেন্দ্র'র সমসাময়িক। যে বৎসর রামেন্দ্র'র বিজ্ঞান-প্রচার শুরু হয় প্রায় সেই বৎসরই এই দুই বিজ্ঞান-লেখকের বিজ্ঞান 'গবেষণা'ও বাজারে বাহির হয়। 1901-05 সালে আমরা জগদীশ ও প্রফুল্লকে বাঙালী জাতের দুই চোখ, দুই বিজ্ঞানবীর বলিয়া পূজা করিতাম। তখনকার দিনে এই দুই জন ছিলেন বিজ্ঞান-গবেষণার দুনিয়ায় বাঙালী সমাজের 'সবে ধন নীলমণি'। ঘটনাচক্রে এই অধম দুই বিজ্ঞানবীরেরই অকিঞ্চিৎকর ছাত্র (1901-03)। তবে পদার্থ-বিজ্ঞানে আর রসায়নে হাতেখড়ি পর্য্যন্ত হইয়াছিল। দৌড়টা তাহার বেশী যায় নাই। বুঝা যাইতেছে, যাহা কিছু এই আসরে বকিয়া যাইতেছি সবই অনধিকার চর্চ্চা মাত্র।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষৎ কায়েম হইতেছে বিংশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি। বিজ্ঞান প্রচারের আখড়ায় আজ 'সবে ধন নীলমণি'র যুগ আর নাই। এমনকি বিজ্ঞান-গবেষকের আখড়ায়ও আজ 'সবে ধন নীলমণি'র যুগ নাই। রামেন্দ্র'র উত্তরাধিকারীরা আজকাল গুনতিতে ঢের। জগদীশ-প্রফুল্ল'র উত্তরাধিকারীরা গুনতিতে পুরু নয় বটে,—কিন্তু দলটা বেশ চলনসই। গোটা ভারতের হিসাব লইলে বোধ হয় কমসে-কম শ-দেড়েক বাঙালী বিজ্ঞান-সেবক একালে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে বহাল আছে। ছয় কোটি বঙ্গভাষীর পক্ষে শ-দেড়-দুই বিজ্ঞান-গবেষক তুচ্ছ আর নগণ্য। কিন্তু 1901-20-এর তুলনায় ও পরিপ্রেক্ষিতে শ-দেড়-দুই নেহাৎ নিন্দনীয় আর ফেলিতব্য চিজ নয়।

সওয়াল এই,—রামেন্দ্র'র পথে চলিবে, না জগদীশ-প্রফুল্ল'র পথে চলিবে আজকার বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষৎ? মাতব্বরেরা মাথা ঠিক করুন।

আমি আদার বেপারী,—জাহাজের খবর রাখি না। কিঞ্চিৎ কিছু আদার খবর রাখিয়া থাকি। 1926 সালে বঙ্গীয় ধন-বিজ্ঞান পরিষৎ কায়েম করিয়াছি। বাংলা ভাষায় ধন-বিজ্ঞানের নানা শাখার অন্তর্গত তথ্য ও তত্ত্ব আলোচনা এই পরিষদের মতলব। আজ পর্যন্ত ধন-বিজ্ঞানের কোন বাঙালী অধ্যাপক এই পরিষদে পায়ের ধূলা ফেলা উপযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। 'আর্থিক উন্নতি' নামক মাসিক কাগজ চালাইতেছি। ধন-বিজ্ঞানের কোন বাঙালী অধ্যাপক এই পত্রিকায় কলম চালাইতে রাজি হইলেন না। কয়েক জন অবৃত্তিক এম-এ পাস করা গবেষকের সাহায্যে পত্রিকা চালানো হইতেছে। 'বাংলায় ধন-বিজ্ঞান' (দুই ভাগ) আর 'সমাজ-বিজ্ঞান' (প্রথম ভাগ) এই তিন খণ্ড বইয়ের প্রায় হাজার-দুই পৃষ্ঠাও এই সব হাতে বাহির হইয়াছে। লেখকেরা গুনতিতে হইবে গোটা পঞ্চাশেক। তাঁহাদের প্রায় কেহই ধনবিজ্ঞান-বিদ্যায় মাষ্টারি করেন না। এম-এ (বা এম-এ, বি-এল) পাসের পর নানা পেশায় বাহাল আছেন।

অথচ বাংলা দেশের প্রায় শ-দেড়েক কলেজে কম-সে-কম শ-ছয়েক বাঙালী অধ্যাপক ধনবিজ্ঞানের নানা শাখায় ছেলে মেয়ে পিটাইতে অভ্যস্ত। এই সকল পণ্ডিতেরা লেখালেখি সম্বন্ধে একপ্রকার নির্বিকার। বরাতের জোর,—লাহা গুষ্টির আর এক প্রতিনিধি,—দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ,—নরেন লাহা তাঁহার বারান্দায় ধনবিজ্ঞান পরিষদের টোল বসাইতে দিয়া থাকেন। আর তাঁহার টাকাটা-সিকিটা-দোয়ানিটা 'আর্থিক উন্নতি'র মারফৎ ছাপাখানায় বিলি হয়। এই জন্য বাংলায় ধনবিজ্ঞান প্রচার টিং টিং করিয়া চলিতেছে। সত্যি কথা,—এই অধম তাহার সাধনায় ফেল মারিয়াছে।

এই গেল বাংলা ভাষায় ধনবিজ্ঞানপ্রচারের দৌড় বাঙালী সমাজে। এখনো ধনবিজ্ঞান বিদ্যাটাকে ইস্কুল কলেজে বাংলা ভাষায় পড়াইবার কানুন নাই। কাজেই টেক্সটবুকের বাজার, নোটের বাজার ধনবিজ্ঞানের আসরে কায়েম হইতে পারে নাই। সুতরাং বাংলায় ধনবিজ্ঞান লেখালেখির বাজারই আজ পর্যন্ত নাই। এই আখড়ায় দুপয়সা কামাইবার সম্ভাবনা একদম শূন্য।

অপর দিকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিদ্যায় বরাত বেশ কিছু ভাল। কেন না পাঠশালা আর ম্যাট্রিক ইস্কুলে হোমিওপ্যাথিক ডোজে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, খাদ্যবিজ্ঞান আর আবহাওয়াবিজ্ঞান হইতে বিজলীবিজ্ঞান, গ্যাস-বিষ বিজ্ঞান জীবজন্তুবিজ্ঞান আর নক্ষত্রবিজ্ঞান পর্যন্ত সবকিছুই পড়াইবার ব্যবস্থা আছে। আর তাহার জন্য বাংলা ভাষাই বাহন রূপে ব্যবহৃত হয়।

হাতের কাছে রহিয়াছে পঞ্চানন ভট্টাচার্য্যপ্রণীত "আকাশের মায়া" (1947)। প্রথম অধ্যায়ের নাম "শূন্য ব্যোম অপরিমাণ।" কয়েক লাইন উদ্ধৃত করিতেছি, যথা:—"আমরা যে সমস্ত জিনিষের সঙ্গে পরিচিত, তাদের মধ্যে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি ছোটে আলো। অবশ্য শব্দও যে নেহাৎ আস্তে চলে, তা নয়। তা হলেও আলোর গতির কাছে দাঁড়াতে পারে এমন কোনো জিনিষ আমাদের জানা নেই।" পঞ্চানন 1947-এর অন্যতম রামেন্দ্র। এই ধরণের আর এক রামেন্দ্র হইতেছেন ভূপেন দাশ। তাঁহার "বাস্তব ও স্বপ্ন" (1947) বইয়ের আইনষ্টাইনের মতগুলা জলের মতন বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য এই বস্তুটা জলের মতন বুঝা সম্ভব কিনা আলাদা কথা। এক তৃতীয় রামেন্দ্রর নামও করিতেছি। তিনি "বিজ্ঞান ও দর্শন" (1947) বইয়ের লেখক অতীন বসু। রচনা তিনটাই, পাঠশালার ছেলেমেয়েদের জন্য তৈরি।

যাহা হউক, বলিতেছি যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানবিদ্যাগুলোর জন্য বাজার তৈয়ারী হইতে পারিয়াছে। সুতরাং এই কোঠে প্রচার আর প্রচারকের দল পুরু হইতেছে। ধনবিজ্ঞানের বেলায় সেকথা খাটে না।

এদিকে যে দু-এক জন বাঙালীর বাচ্চা ধনবিজ্ঞানবিদ্যায় গবেষণা করেন তাঁহাদের পক্ষে বাংলা ভাষায় পথ মাড়ানো আত্মহত্যার সামিল। ইংরেজিতে না লিখিলে তাঁহাদেরকে যাচাই করিবে কে? নকরি দিবে কে? পদে বাড়াইবে কে? দরমাহায় উঠাইয়া তুলিবে কে? ব্যস্। বাংলা ভাষায় ধনবিজ্ঞানের গবেষণা-ঠবেষণা বিলকুল অচল।

আর প্রচারের ঝকমারি কে পোহাইতে চায়? অবশ্য মাসিক পত্রে চাই মাঝে-মাঝে রাষ্ট্রনীতির দঙ্গলওয়ালা আর্থিক প্রবন্ধ। সংবাদ-বিজ্ঞানের দস্তুরই তাই। এইজন্য পত্রিকার সম্পাদকেরা কয়েকজন কংগ্রেসপন্থী, সমাজতন্ত্রপন্থী মজুরপন্থী অথবা কমিউনিস্ট-পন্থী লেখক ভাড়া করিয়া রাখেন। তাহাতে বাংলা ভাষায় মারফৎ রাষ্ট্রিক অর্থশাস্ত্রের কয়েকটা বুখ্‌নি বাঙালী সমাজে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মন্দ কী? যা পাওয়া যায় তাই লাভ।

অতএব সোজা কথা ভাবিতেছি। বলিয়া রাখি। 1948 খৃষ্টাব্দের বাঙালী বিজ্ঞান-'গবেষকদের' পক্ষে নিজ-নিজ গবেষণার ফল প্রথমে বাংলায় প্রকাশ করা অসম্ভব। গবেষণাগুলার যাচাই বা দরকষাকষির জন্য অ-ভারতীয় ভাষায় প্রকাশ করিতেই হইবে। এখনো অনেক দিন,—কত বৎসর পর্যন্ত বলা কঠিন,—বাঙালী বিজ্ঞানশাস্ত্রীদের পক্ষে ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, রুশ, ইতালিয়ান, স্পেনিশ ও জাপানী ভাষায় নিজ নিজ গবেষণা প্রকাশ করা নেহাৎ জরুরি থাকিবে। যাঁহার যে ভাষায় সুবিধা তাঁহার পক্ষে সেই ভাষার সদ্ব্যবহার করা উচিত—বলা বাহুল্য। একমাত্র ইংরেজিকে বাঙালী পণ্ডিতদের পক্ষে বিজ্ঞানগবেষণা প্রচারের বাহন সম্ঝিয়া রাখা ঠিক হইবে না। জাপানীরা জার্মান, ফরাসী, ইতালিয়ান, রুশ ও স্পেনিশ ভাষায় মারফৎও গবেষণা প্রকাশ করিতে অভ্যস্ত। কথাটার দিকে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের মাতব্বরেরা কান দিবেন কি?

তবে কি আমার মতে, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের চলা উচিত একমাত্র রামেন্দ্রসুন্দরের পথে ? জগদীশ প্রফুল্ল'র পরবর্তী বিজ্ঞান গবেষকেরা—'প্রকৃতি' ত্রৈমাসিকের পরবর্তী বিজ্ঞানখোরেরা বিজ্ঞান গবেষণার পথে এই পরিষদকে চালাইবেন না কি ? চালানো উচিত নয় কি ? এক কথায় জবাব দিয়াছি,—সম্ভব নয়। আজও প্রধানতঃ বিজ্ঞান প্রচারের পথেই—অর্থাৎ ত্রৈমাসিক 'প্রকৃতি'র পথেই—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকাকে চলিতে হইবে।

তবে একমাত্র প্রচারের পথে নয়। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার আধাআধি বিজ্ঞান প্রচারের কাজে বাঁধিয়া রাখা চলিতে পারে। বিজ্ঞান প্রাবন্ধিকেরা রামেন্দ্রসুন্দরের পথে এবং ত্রৈমাসিক 'প্রকৃতি'র পথে বাংলার উঁচু বিজ্ঞানের মাল প্রচার করিতে থাকুন। পত্রিকার অপর অর্দ্ধেকটা বাঁধিয়া রাখা উচিত বাঙালী বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার ফল প্রকাশের জন্য। কোনো গবেষণা প্রবন্ধ ইংরেজিতে, জার্মানে বা অন্য কোনো বিদেশী ভাষায় প্রকাশ করিবার পরেই বাঙালী বিজ্ঞানখোরেরা তাহার চুম্বক বাংলায় প্রকাশ করিতে সুরু করুন। নিজ নিজ গবেষণার চুম্বক নিজের লেখা বাংলা প্রবন্ধে বাহির করিতে থাকিলে তাঁহারা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকাকে গবেষণার পথেই বেশ কিছু চালাইতে পারিবেন। তাহা হইলে বাঙালীর বাচ্চার পক্ষে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝির উপযুক্ত কর্ত্তব্যপালন করা ঘটিয়া উঠিবে।

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' মাসিকটা 'প্রকৃতি' ত্রৈমাসিকের পরবর্তী ধাপ রূপে গড়িয়া উঠুক। হুবহু তাহার জুড়িদার যেন না হয়। জাহাজী কারবার সম্বন্ধে আদার বেপারীর পক্ষে এই পর্যান্ত বলা-কওয়াই যথেষ্ট। একালের বাঙালীজাতের ইজ্জৎ রক্ষা করিবার জন্য বিজ্ঞানখোরদের মজলিসে একটা প্রস্তাব পেশ করিয়া রাখা গেল। ইহার উপর বেশী কিছু বলিতে গেলে মাতব্বরেরা লাঠৌষধি লাগাইবেন আর বলিবেন :—'তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে।' অতএব অনধিকার-চর্চ্চার খতম এইখানে।

কলকাতা ও হাওড়ায় বায়ু দূষণ বেশী

ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (সি. এম. ডি. এ.)-র ব্যবস্থাপনায় নাগপুরের একটি গবেষণা সংস্থা 1972 থেকে কলকাতা এবং হাওড়ায় বায়ু দূষণের একটি সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে, আমেরিকা, বৃটেন, জাপানের শহরগুলির তুলনায় এই দুটি শহরে বায়ুদূষণের মাত্রা বেশী এবং বছরের পর বছর তা বেড়েই চলেছে। কলকাতার বাতাসে যেখানে বছরে দূষণের সর্বনিম্ন মাত্রা ছিল প্রতি ঘনমিটারে 0.1 মিলিগ্রাম এবং সর্বোচ্চ মাত্রা ছিল প্রতি ঘনমিটারে 0.55 মিলিগ্রাম এখন সেই বৃদ্ধির সর্বনিম্ন মাত্রা হল ঐ হিসেবে 0·2 মিলিগ্রাম এবং সর্বোচ্চ পরিমাণ 0·70 মিলিগ্রাম। সমীক্ষকরা দেখেছেন হাওড়া শহরে এখন বায়ুদূষণ প্রতি বছর 50 শতাংশ হারে বাড়ছে। শিকাগোর মত শিল্প নগরীতেও কয়েক বছর আগে বায়ুদূষণের পরিমাণ ছিল প্রতি ঘনমিটারে 0·09 মিলিগ্রাম। আমেরিকা, বৃটেন এবং জাপানের শহরগুলিতে বায়ুদূষণের গড়-মাত্রা হল এই হিসেবে যথাক্রমে 0·07, 0·09 এবং 0·08।

ঐ গবেষণা সংস্থাটি কলকাতা ও হাওড়া শহরের উপর সমীক্ষা করে এ পর্যন্ত সাতটি রিপোর্ট দিয়েছেন। তাঁদের 1980-81 খৃস্টাব্দের রিপোর্টে কলকাতা ও হাওড়ার 17টি জায়গায় সমীক্ষার ভিত্তিতে বলা হয়েছে যে, বেহালা এবং লিলুয়াতে বায়ুদূষণের মাত্রা সবচেয়ে কম—প্রতি ঘনমিটারে 0·2 মিলিগ্রাম। হাওড়া, ভবানীপুর ও কাশীপুরে এই মাত্রা 0·3 থেকে 0·35 মিলিগ্রামের মত। বি. বা. দী. বাগে এই মাত্রা সবচেয়ে বেশী—প্রতি ঘনমিটারে 0·44 মিলিগ্রাম। ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে শীতের সময়েই (নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি) বায়ুদূষণের মাত্রা সবচেয়ে বেশী হয়। এই সময়ে বি-বা-দী বাগ ও ভবানীপুর অঞ্চলেই বায়ুদূষণের মাত্রা সর্বোচ্চ মানে পৌঁছায়। প্রতি ঘনমিটারে এই দূষণ 0·70 মিলিগ্রামকেও ছাড়িয়ে যায়। তবে পরেই আসে হাওড়া, বেহালা এবং কাশীপুর। এখানে দূষণের মাত্রা 0·50 থেকে 0·65 মিলিগ্রামের মধ্যে থাকে। ঐ সময়ে অর্থাৎ শীতকালে লিলুয়া অঞ্চলে বায়ুদূষণের মাত্রা সবচেয়ে কম হয়—প্রতি ঘনমিটারে 0·39 মিলিগ্রাম। কাশীপুর শিল্পাঞ্চল হলেও সেখানে বায়ুদূষণের মাত্রা বি-বা-দী বাগ এবং ভবানীপুর থেকে কম। সমীক্ষায় বলা হয়েছে বর্ষাকালেই বায়ুদূষণ সবচেয়ে কম হয়।

1979-80-র সমীক্ষার রিপোর্টে বলা হয়েছিল বেহালা ও লিলুয়াতে বায়ুদূষণের মাত্রা সবচেয়ে কম—প্রতি ঘনমিটারে 0·1 মিলিগ্রাম। গ্রীষ্মকালে এর গড়পড়তা হিসেব হল 0·4 মিলিগ্রাম। সেক্ষেত্রে শীতকালে এর সর্বোচ্চ মাত্রা ছিল 0·55 মিলিগ্রাম এবং বর্ষাকালে সর্বনিম্ন মাত্রা 0·33 মিলিগ্রাম। ঐ সমীক্ষায় আরও বলা হয়েছে যে হাওড়া ছাড়া 1979-80-তে বায়ুদূষণের মাত্রা আগের বছরের তুলনায় বিশেষ কিছু বদলায় নি। কিন্তু 1979-র পর থেকে কলকাতা ও হাওড়ায় বায়ুদূষণের মাত্রা ভয়ঙ্কর ভাবে বেড়ে চলেছে।

[সূত্র : স্টেটসম্যান, 18.8.83]

বিজ্ঞান প্রবন্ধ

প্রাণ-পরিচয়

মাধবেন্দ্রনাথ পাল*

সূচনা: নানারূপ শক্তির একত্র সমাবেশ বা সমষ্টিগত পরিণামই কি প্রাণের ব্যঞ্জনা দেয়? তা যদি হয়, তবে 'টেলিভিশন' যন্ত্রে বা সবাক চিত্রে যখন পশুপক্ষী বা মানুষের তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়, তখন কি বলা যায় টেলিভিশন বা সবাক চিত্র প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে?

গ্রামোফোন বা টেপরেকর্ড যন্ত্রে রেকর্ড বাজিয়ে মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যায়, তা বলে কি টেপরেকর্ড বা গ্রামোফোন প্রাণশক্তিতে ভরা বলা চলে?

কমপিউটার যন্ত্র তো সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে চিন্তা-ভাবনামূলক সমাধান করে দিতে পারে, তবে কি কমপিউটার যন্ত্র প্রাণবন্ত?

কি সেই শক্তি যাকে প্রাণশক্তি বলা যায়? কি সে ব্যাপার বা ঘটনা যার নাম দেওয়া হয়েছে 'প্রাণ'?

বিজ্ঞানীরা নানাভাবে এইসব প্রশ্নের মীমাংসা করার চেষ্টা করেছেন বা করছেন। কিন্তু, সর্বসম্মত কোন মীমাংসা পাওয়া সম্ভব হয় নি। তবে কাজ চলা গোছের প্রাণের একটা সংজ্ঞা খাড়া করার চেষ্টা হয়েছে। তার রূপরেখা অনেকটা এই ধরণের। জড় বস্তুময় কাঠামোর মধ্যে ভৌতিক ও রাসায়নিক যেসব রূপান্তর, পরিবর্তন বা ঘটনা ঘটে, সে সবের জন্য আবশ্যক শক্তি পরিবেশ থেকে আহরণ করা এবং আহৃত শক্তিকে উপরিউক্ত রূপান্তর, পরিবর্তন বা ঘটনারাশি সংঘটনের উপযোগী অবস্থায় পরিণত করার যে সামর্থ্য বা ব্যাপার তাকে 'প্রাণ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

এই ধরণের সংজ্ঞা থেকে প্রাণের ইঙ্গিত পাওয়া সম্ভব সত্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রাণ যে কি, সে বিষয়ে সঠিক ধারণা হয় কিনা তা আপন আপন উপলব্ধি বা অনুভূতির উপর নির্ভরশীল মনে হয়।

স্বয়ংক্রিয়তা প্রাণ তথা প্রাণশক্তির অন্যতম মুখ্য লক্ষণ। আপন সত্তা বা অস্তিত্ব অটুট রাখার অন্তর্নিহিত ইচ্ছা তার অপর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখার অন্তহীন চেষ্টা প্রাণ তথা প্রাণশক্তির আরো একটি অর্থপূর্ণ স্বরূপ বা লক্ষণ। প্রাণী মাত্র এই চেষ্টার অধীন; পরিবেশের ঘটনারাশি বা অন্য কোন অবস্থাচক্র যখনই প্রাণীর ধারাবাহিকতা ব্যাহত করতে চায়, তখনই সে পরিবেশের এই রূপ চেষ্টা আভ্যন্তরীণ চেষ্টা প্রতিহত করতে থাকে, যাতে সে আপন সত্তা যথাযথ টিকিয়ে রাখতে পারে।

মানুষ অবস্থা বা ঘটনাচক্রে রোগে আক্রান্ত হলে এইরূপ অন্তর্নিহিত প্রতিরোধ শক্তির সাহায্যে সেই আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে। কিন্তু প্রতিরোধ শক্তি নিঃশেষ হয়ে থাকলে, রোগের আক্রমণ প্রতিহত করা যায় না। রোগের প্রভাবে বা প্রকোপে যা পরিণাম তা ঘটতে বাধ্য।

আপন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই প্রাণের অন্যতম লক্ষণ। নানান রূপ আশ্রয় করে প্রাণের আবির্ভাব, বিকাশ ও তিরোভাব ঘটে। বর্ণময় ও সুগন্ধ পুষ্পের ভিতর যে প্রাণ, মনোহর প্রজাপতির মধ্যে যে প্রাণ, হিংস্র, ভয়াল বাঘের মধ্যেও সেই একই প্রাণের স্ফুরণ ও তৎপরতা। অদৃশ্য জীবাণুর মধ্যে যে প্রাণ, সেই একই প্রাণ বিশাল বটবৃক্ষের পাতায় পাতায় স্পন্দিত হয়।

জীবমাত্রই প্রাণের ধারক ও বাহক; প্রাণশক্তি এক জন্ম থেকে পরবর্তী জন্মে ধারাবাহিকক্রমে পরিচালিত হয়ে যায়। এই ধারাবাহিকতা নানাভাবে সচল থাকে। যে প্রাণশক্তি কোন বীজের মধ্যে সুপ্ত ও স্তব্ধ থাকে, তা উপযুক্ত পরিবেশে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে, অঙ্কুরোদগম হয় ও নবীন উদ্ভিদের আবির্ভাব ঘটে।

পাখীর ডিমের ভিতর সুপ্ত প্রাণশক্তি জাগ্রত হলে নতুন আর একটি পাখীর শাবক জন্মলাভ করে।

আশ্চর্যের বিষয়, প্রাণশক্তি যত বেশীকাল উদ্ভিদের বীজের মধ্যে সুপ্ত থাকতে পারে, তত বেশীকাল পশুপক্ষী জীব-জানোয়ারের বীজের (শুক্রাণু বা ডিম্বাণুর) মধ্যে সুপ্ত থাকতে পারে না। কয়েক হাজার বৎসর পূর্বেকার উৎপন্ন গম থেকে উপযুক্ত পরিবেশে নবীন গম শস্যের চারা গাছ উৎপন্ন হতে দেখা গেছে। কি দারুণ, প্রবল এই প্রাণশক্তি; কত সহস্র দীর্ঘকালের ভিতর দিয়ে প্রাকৃতিক কত বিরুদ্ধ পরিবেশের আক্রমণ সহ্য করেও প্রাণ আপন সত্তা অটুট রাখতে পারে, ভাবলে অবাক না হয়ে পারা যায় না।

অপর পক্ষে, পশুপক্ষী জীব-জানোয়ারের বীজ তত কষ্ট-সহিষ্ণু ও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। মানুষের শুক্রাণু নাকি মোটামুটি আটচল্লিশ ঘণ্টার বেশি স্থায়ী হয় না; পরে বিকৃত ও বিনষ্ট হয়ে যায়। আজকাল অবশ্য হিমশীতল অবস্থায় শুক্রাণু বিশুদ্ধ রাখার ব্যবস্থা হয়েছে, এবং এইরূপ বিশুদ্ধ শুক্রাণু অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল সুপ্ত অবস্থায় থেকে প্রাণশক্তি অটুট ও অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে বলে শোনা যায়।

প্রাণশক্তি আপনা আপনি স্ফুরণের পথে বিকশিত হতে

* ষ্ট /7, এম. আই. জি হাউসিং এস্টেট, 37, বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা-700037

পারে কি? না, প্রাকৃতিক নানা উপাদান, আলোক, বায়ু, উষ্ণতা ও জল ইত্যাদির সাহায্যে বিকশিত হয়, এমন প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়। হ্যাঁ, আলোক, বায়ু, উষ্ণতা ও জল ইত্যাদি প্রকৃতির উপাদান যথোপযুক্ত মাত্র বা পরিমাণে একত্রে বিরাজ করলে বীজ থেকে নবীন তরুর আবির্ভাব ঘটে। উপযুক্ত উষ্ণতায় ডিমের গায়ে তা দিলে ডিম ফুটে নতুন পাখীর ছানা বেরিয়ে আসে।

পার্থিব সকল শক্তির আকর সূর্য, একথা প্রায় সুবিদিত। সূর্যের কিরণমালায় শক্তি তরঙ্গের ছড়াছড়ি—তাপশক্তি, আলোক শক্তি, বিদ্যুৎ শক্তি, চৌম্বক শক্তি এমনি কত রূপ শক্তি তরঙ্গের হুড়োহুড়ি লেগে আছে কে তা সচরাচর খেয়াল করে। এক শক্তি থেকে অন্য শক্তিতে রূপান্তর প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম। প্রকৃতি আপন খেয়ালে তাপ থেকে আলোক, বিদ্যুৎ থেকে আলোক; অথবা, বিপরীত মুখে আলোক থেকে তাপ, আলোক থেকে বিদ্যুৎ এমনি নানারূপ শক্তির পারস্পরিক রূপান্তর করে চলে। জ্বালানি দগ্ধ হলে যেমন তাপ উৎপন্ন হয়, সেই সঙ্গে আলোকও বিকীর্ণ হয়। বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে টিউবে বা বাল্‌বে আলোক বিকীর্ণ হয়, আবার সেই সঙ্গে তাপও উৎপন্ন হয়। গতিশক্তি বলে মেঘে মেঘে সংঘর্ষ ঘটলে বিদ্যুৎ চমকানির ঝলক দেখা যায় ও বজ্রপাতের শব্দ শোনা যায়। অপর দিকে বিদ্যুৎ শক্তির বলে পাখা ঘুরলে বা ট্রাম চললে স্পষ্টতঃ গতিশক্তি উৎপন্ন হয়। প্রকৃতির রাজ্যে এমন ভাবে শক্তির একরূপ থেকে অন্যরূপে কত না রহস্যময় নিত্যনূতন খেলা চলছে তার ইয়ত্তা নেই।

প্রকৃতির মধ্যে এক প্রকার তাগিদ বা প্রবণতা, যাকে সচরাচর পোষাকী ভাষায় "ইচ্ছা" বলা চলে, তা সুপ্ত বা অনুক্ত আছে, একথা আমরা প্রায়ই খেয়াল করি না। কিন্তু মনযোগ দিয়ে একাগ্রভাবে ভেবে দেখলে বেশ বোঝা যায় যে, ইচ্ছার প্রকাশ ঘটলেই জড়ের মধ্যে জীবনের লক্ষণ বা চিহ্ন ফুটে বেরোয়। যেমন, অ্যামিবা সম্ভবতঃ কোন শক্তি বলেই তার প্রথম প্রকাশ বা আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে; অথবা আপনা আপনিই হঠাৎ তার প্রথম আবির্ভাব ঘটেছে। উভয় ক্ষেত্রেই অ্যামিবার মধ্যে যেন ইচ্ছা সুপ্ত ছিল; তা যদি না হয়, তবে কিভাবে সে পরিবেশ থেকে তার সত্তা টিকিয়ে রাখার জন্য আহার সংগ্রহ করে, আর কিভাবেই বা সে তার বংশধারা অব্যাহত রাখে, অনুরূপ আর একটি অ্যামিবার জন্ম দান করে? ইচ্ছাই বুঝি জীবের সারসত্তা—ইচ্ছাই জীবনসঞ্চারিণী শক্তির মূল।

অ্যামিবার জীবনযাত্রা অতি সরল। পরিবেশ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে ও বংশবৃদ্ধির জন্য আপন দেহ টুকরো টুকরো করে নূতন অ্যামিবার জন্ম দেয়। নবজাত অ্যামিবারা সেই একই পথ ধরে তাদের ধারাবাহিকতা অটুট রেখে চলেছে। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যাবে, অ্যামিবার ভিতর এমন কোন শক্তি নিহিত যার প্রভাবে এইরূপ লীলা চক্রাকারে ঘটে যাচ্ছে, এই শক্তিকে প্রাণশক্তি আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞানীরা প্রাণশক্তির নানা ধর্ম বা আচার-আচরণ বিষয়ে জানার জন্য ব্যস্ত আছে সত্য; কিন্তু প্রাণশক্তির প্রকৃত স্বরূপ কি, সে বিষয়ে কতদূর ভাবছে তা জানা দরকার। প্রাণ বা চলতি কথায় পরিচিত জীবনের প্রধান প্রধান লক্ষণ—পরিবেশ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করা, আহৃত খাদ্য আত্মসাৎ করা, অনুপোযোগী দ্রব্য বর্জন করা, আপনার বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা, এবং আপনার জড়বস্তুময় কাঠামো জীর্ণ হতে থাকলে নূতন দেহ কাঠামো উৎপাদনের জন্য অনুরূপ দেহীর জন্মদান করা। গাছপালা, পশুপক্ষী বা মানুষ যে কোন জীবের মধ্যেই প্রাণের এইসব লক্ষণ প্রকট।

আরও সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করলে বোধগম্য হবে যে, আচার-আচরণের জন্য জীবের যা প্রয়োজন তা তার অন্তর্নিহিত শক্তি এবং এই শক্তি প্রাণশক্তি ছাড়া আর কি হতে পারে? প্রাণশক্তির আবির্ভাবে জীবের আবির্ভাব বা জন্ম সম্ভব এবং প্রাণশক্তির তিরোভাবে বা অভাবে জীবের বিনাশ বা মৃত্যু ঘটে।

জীব পরিবেশ থেকে মূলতঃ খাদ্যদ্রব্যের ভিতর দিয়ে শক্তি সংগ্রহ করে ও সংগৃহীত শক্তিকে আপন আচার-আচরণের উপযোগী শক্তিরূপে পরিণত করে নেয়; জীবের এই সামর্থ্যকে প্রাণশক্তি বলা হয়েছে। মোট কথা প্রকৃতি বা পরিবেশের মধ্যে বিরাজমান নানারূপ শক্তির এইরূপ পরিবর্তন ঘটানোর জন্য আবশ্যক যে সামর্থ্য বা ক্ষমতা তাকে প্রাণশক্তি বলে, এবং শুধুমাত্র জীবের মধ্যেই এইরূপ সামর্থ্য বা ক্ষমতা বা প্রাণশক্তি লক্ষ্য করা যায়। কে জানে, জীবের তিরোভাবে প্রাণশক্তি আপন স্বরূপে প্রকৃতিতে বিরাজ করে কি না!

এমন পরিস্থিতিতে প্রাণ কি সে বিষয়ে প্রচলিত বিজ্ঞানের পদ্ধতি অনুসারে অনুসন্ধান কার্য কতদূর ফলপ্রসূ হবে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে বা থাকা সম্ভব। তবুও মানুষ যুক্তিবাদী; সেজন্য সে যতদূর সম্ভব ততদূর প্রচলিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে এই বিষয়ে অনুশীলন করবে এটা যেমন সত্য, এও তেমনি সত্য যে, পরীক্ষক বা অনুসন্ধান কর্তা আপন আপন উপলব্ধি বা অনুভূতির আলোকে প্রাণ বিষয়ক অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা না করে পারবে না।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করলে বক্তব্য বিষয় সরল হতে পারে। প্রচলিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে কোন দ্রব্য ভেষজের উপযোগী হবে কিনা তা যাচাই করার জন্য তার গুণাগুণ গিনিপিগ, খরগোস ইত্যাদি ইতর প্রাণীর উপর সেই দ্রব্য প্রয়োগ করে তার ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া নিরীক্ষণ করা হয় এবং তদনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যদি ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া অনুকূল এবং বাঞ্ছিত মত হয়, তবে সাধারণতঃ সেই দ্রব্য মানুষের উপর ভেষজরূপে প্রয়োগ করার বিধি প্রচলিত হয়। মনে রাখতে হবে, এক্ষেত্রে ইতর প্রাণীর প্রতিক্রিয়া বা সাড়া ও মানুষের প্রতিক্রিয়া বা সাড়া সমান বা সমতুল এই ধারণা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে হয়ত তা ঠিক, আবার

অনেক ক্ষেত্রে ঠিক নাও হতে পারে। যেমন একই ভেষজের প্রয়োগে একই রোগে আক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন রোগীর ক্ষেত্রে বা ক্ষেত্রবিশেষে একই রোগীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ফল লক্ষ্য করা যায়, তা বহু অভিজ্ঞতা থেকে ধরা গেছে। অতএব, ইতর প্রাণীর অনুভূতি বা উপলব্ধি ও মানুষের অনুভূতি বা উপলব্ধি সমান বা সমতুল না হওয়াই স্বাভাবিক মনে হয়।

বর্তমান ভারতের কবিরাজ কুল শিরোমণি পণ্ডিত শিবশর্মা আয়ুর্বেদীয় ভেষজক্রিয়া নিরূপণ বিষয়ে একটি কাহিনীর অবতারণা করেছেন। জনৈক বৃদ্ধ ব্যক্তি তাঁর তরুণী ভার্যার সেবা পাবার জন্য উদ্গ্রীব। কিন্তু তরুণী ভার্যা স্বভাববশতঃ বৃদ্ধের প্রতি অনাসক্ত। একদিন রাত্রে যখন স্বামী স্ত্রী শয়নকক্ষে নিদ্রা যাবার উপক্রম করছে, তখন সেখানে এক দুরন্ত চোর প্রবেশ করে। তাকে দেখামাত্র ভীতসন্ত্রস্ত তরুণীভার্যা বৃদ্ধ-পতিকেই সাগ্রহে সজোরে আঁকড়ে ধরে। বৃদ্ধ চোরের উদ্দেশ্যে বলে উঠে, "তুমি যা চাও আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পার। আর, প্রতি রাত্রেই আমাদের এখানে আসতে পার, ও তোমার ইচ্ছামত জিনিসপত্র, টাকা পয়সা, বা অলংকারাদি নিয়ে যেতে পার।"

উপরিক্ত কাহিনীর লক্ষণীয় এই যে, পরিবেশ মানুষের মনোভাব, তথা উপলব্ধি ও অনুভূতি কিভাবে পরিবর্তন করিয়ে দিতে পারে। মানুষের মনোভাব যা প্রাণেরই অভিব্যক্তি, তা পরিবেশের অবস্থারাশির উপর কত বেশী নির্ভরশীল, এই সত্য উক্ত কাহিনী থেকে সুন্দররূপে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

শুধুমাত্র ভৌতিক বা রাসায়নিক বা উভয়প্রকার অবস্থারাশির উপর প্রাণশক্তির বিকাশ নির্ভরশীল নয়; সেইসঙ্গে প্রাণীর অন্তর্নিহিত সত্তার স্বকীয়রূপে টিকে থাকার প্রবণতা বা ইচ্ছাও বিশেষ অর্থপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে, এই বোধ যেন প্রাণ বিষয়ক অনুসন্ধানকারীর মধ্যে সতত জাগ্রত থাকে, এটাই আমার বক্তব্য। এই বোধের আলোকে অনুসন্ধানকার্য পরিচালিত না হলে প্রাণ-বিষয়ক তথ্য ও তত্ত্ব সঠিক আহরণ করা ও পর্যালোচনা করা সম্ভব হবে না এবং সিদ্ধান্তও সঠিক হবে না, বলাই বাহুল্য।

আপেক্ষিকতাবাদ ও কোয়াণ্টাম তত্ত্ব

সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র*

বিশ্বে রয়েছে চার ধরনের বল—মহাকর্ষ, তড়িচ্চুম্বকীয়, তীব্র ও ক্ষীণ; এরাই বিশ্বের নিয়ন্তা। এদের প্রভাবে কয়েকটি নিয়ম মেনে বিশ্বপ্রকৃতি পরিচালিত হয়। আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় নিউটনের বলবিদ্যায় নিয়মই যথেষ্ট, তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে নিউটনের নিয়ম চলে না।

প্রথমত কোন বস্তুর গতিবেগ আলোর গতিবেগের কাছাকাছি মানের হলে বস্তুর গতি নিউটনীয় নিয়মের বাইরে চলে যায়—বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের নিয়ম প্রয়োগ করতে হয়। তাই আলোর গতিবেগ c হল গতিবেগের পরম মান—কোন বস্তুই c-এর বেশী গতিবেগ পেতে পারে না।

দ্বিতীয়ত কোথাও মহাকর্ষ ক্ষেত্র তীব্র হলে সেখানে নিউটনের মহাকর্ষের সূত্র অচল হয়ে পড়ে, এমনকি নিউটনীয় বলবিদ্যা দিয়ে সেখানে বস্তুর গতিবিধি ব্যাখ্যা করা যায় না। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের নিয়মে মহাকর্ষ হল পৃষ্ঠদেশের বক্রতার মত দেশকালের বিকৃতি, যেমন ঘটে একটি গোলকের বেলায়।

তৃতীয়ত যদি কোন বস্তু পরমাণুর সঙ্গে তুলনীয় আকারের হয়, তবে তার গতিবিধি নিউটনের নিয়মে নয় কোয়াণ্টাম তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়।

আপেক্ষিকতাবাদ প্রসঙ্গে—বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের সিদ্ধান্ত হল আলোর গতিবেগ c একটি নিত্যসংখ্যা। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে কোন বস্তুর স্থির ভর m_o যদি v_o গতিবেগে চলে, তবে পর্যবেক্ষকের কাছে তার সমতুল্য শক্তি E হবে

$$E=m_o c^2/\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} \quad \cdots(1)$$

v যখন c-এর কাছাকাছি আসে তখন E অসীমের মানের দিকে এগোতে থাকে। ফলে কোন বস্তুকে c গতিবেগ দিতে হলে অসীম শক্তির প্রয়োজন। আবার v=o হলেও শক্তি লোপ পায় না, তখন $E=m_o c^2$। এই স্থির শক্তি স্থির হলেও বস্তুতে নিহিত থাকে। তাই ভর ও শক্তি তুল্যমূল্য বলা হয়।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় সেকেণ্ডে সূর্য 10^{26} জুল শক্তি বিকিরণ করে। এই শক্তির সমতুল ভর হল 4×10^6 টন অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে সূর্য তার এই পরিমাণ ভর হারায়।

আটটি প্রোটন ও আটটি নিউট্রন মিলে অক্সিজেন নিউক্লিয়াস—তার ভর $2{\cdot}655\times10^{-26}$ কিগ্রা। আবার আলাদা ভাবে আটটি প্রোটন ও আটটি নিউট্রনের ভর $2{\cdot}678\times10^{-26}$ কিগ্রা অক্সিজেন নিউক্লিয়াস গঠনে এই হারানো

* সাহা ইনস্টিটিউট, কলিকাতা-700009

ভর $2{\cdot}3\times10^{-28}$ কিগ্রা নিউক্লিয়াসে কণাগুলির বাঁধনে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে বাঁধা পড়ে।

ভর ও শক্তির তুল্যমূল্যতা থেকে আমরা যে কোন ভরের শক্তি তার গতিমান অবস্থায় বলতে পারি—

$$E=mc^2\cdots(2)$$

যেখানে $m=m_o(1-v^2/c^2)^{-\frac{1}{2}}\cdots(3)$

এটি হল আপেক্ষিক ভর। এর মান বস্তুর গতিবেগের উপর নির্ভর করে। m_o হল স্থির ভর অর্থাৎ $v=o$-তে বস্তুর ভর।

বিকিরণের বেলায় $m_o=o$ হলে $E=o/o$ অর্থাৎ সসীম হতে পারে। বিকিরণের ফোটনের শক্তি অবশ্য তার কাঁপন সংখ্যার উপর নির্ভর করে :

$$E=h\nu\cdots(4)$$

এখানে ν হল তরঙ্গের কাঁপন সংখ্যা।

কোন বস্তু যেমন নিউট্রিনো শূন্য স্থির ভরের হলে, c গতিবেগে চলার সময় তার আপেক্ষিক ভর $m=E/c^2$ বলা হয়।

কোয়ান্টাম তত্ত্ব—কোয়ান্টাম তত্ত্বে কণার তরঙ্গধর্ম এই শতাব্দীর এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। এই তত্ত্বে ইলেকট্রনের মত কণার আলোর মতন আবর্তন ঘটে, ব্যতিচারও হয়। আলোর তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ বিকিরণ ও শোষণে কণার মত আচরণ করে। এই কণা হল ফোটন, আলোর প্যাকেট বা কোয়ান্টা, যা দিয়ে কোয়ান্টাম তত্ত্বের সূত্রপাত।

কোয়ান্টাম তত্ত্বের এই কণা তরঙ্গ বা তরঙ্গ-কণার স্কেল নির্ণীত হয় প্ল্যাঙ্কের নিত্যসংখ্যা h দিয়ে, যার মান $6{\cdot}6\times10^{-34}$ জুল-সেকেণ্ড। কখনো কখনো $h/2\pi$ বা h সংখ্যাও ব্যবহার করা হয়। তরঙ্গের কণাধর্মে শক্তি E ও কাঁপন সংখ্যার (ν) অনুপাত থেকে h পাওয়া যায়, কারণ

$$E=h\nu\cdots\cdots\cdots(5)$$

আবার কণার তরঙ্গ ধর্মে h হল ভরবেগ p ও তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের (λ) গুণফল, কারণ

$$p=h/\lambda\cdots\cdots\cdots(6)$$

যেখানে কোন বস্তুর সংশ্লিষ্ট সংখ্যার মান h-এর সঙ্গে তুলনীয়, সেখানে কোয়ান্টাম তত্ত্ব অপরিহার্য। যেমন পরমাণুর কক্ষে ইলেকট্রনের শক্তি 10^{-19} জুল, তার আবর্তনকাল 10^{-15} সেকেণ্ড। সেখানে শক্তি ও আবর্তনকালের গুণফল 10^{-34} জুল-সেকেণ্ড h-এর সঙ্গে তুলনীয়। ফলে পরমাণু বা আরো ছোট বস্তুর গতিবিধি জানতে কোয়ান্টাম তত্ত্ব ছাড়া চলে না।

তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রয়োগে দেখা যায় শক্তি ও ভরবেগ পরিবহনে বিকিরণের কণাধর্মী ফোটন কণার ঐ ক্ষেত্রে অস্তিত্ব থাকে। যেখানে তড়িৎ আধান ও প্রবাহ কাজ করে সেখানেই এ রকম কণাধর্মের আরোপ অবশ্যম্ভাবী। কোন আধান e_1 গতিশীল হলে ফোটন বিকিরণ হয়। e_2 আধান তা শোষণ করে গতিশীল হয়। তড়িচ্চুম্বকীয় বল বলতে তাই ক্ষেত্র কোয়ান্টার এরকম বর্ণনা প্রয়োজন হয়। ফোটন যেন দুটি উৎসের মধ্যে দূতের মত কাজ করে।

অন্যান্য বলেরও এরকম বিনিময় কণা আছে। মহাকর্ষ বলের ক্ষেত্রে বিনিময় কণা হল গ্র্যাভিটন। ক্ষীণবল—যা বীটক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত, তার বিনিময় কণা হল মধ্যবর্তী ভেক্টর বোসন $W^{\pm}$ ও Z। তীব্র বলের বিনিময় কণা হল যুকাওয়া কথিত মেসন। এখন এই বল যা দিয়ে নিউট্রন প্রোটন পরমাণু কেন্দ্রে আবদ্ধ থাকে তাকেও বলা হচ্ছে প্রোটন বা নিউট্রন যে সব ক্যুআর্ক কণায় তৈরী তাদের ভেতরকার বলের একটি দুর্বল অংশ। ক্যুআর্ক মধ্যবর্তী বলের বিনিময় কণা হল কাল্পনিক কণা গ্লুওন।

আপেক্ষিকতাবাদ ও কোয়ান্টাম তত্ত্বের সমন্বয়—উপরিউ দুটি তত্ত্ব যুক্ত হলে আমরা নতুন এক ক্রিয়ার সন্ধান পাই। তা হলো কণার জুড়ি বিকিরণে বিনাশ ও বিকিরণ থেকে জুড়ি কণার সৃষ্টি।

$E=m_oc^2$ থেকে দেখা যায় যে, m_oc^2 শক্তি থেকে m_o ভরের কণা উৎপন্ন হওয়া বিচিত্র নয়। পরীক্ষায় দেখা গেছে, গামারশ্মি থেকে ইলেকট্রন ও পজিট্রন জুড়ি তৈরি হয়। পজিট্রন ইলেকট্রনের বিপরীত কণা। তেমনি প্রোটন—অ্যান্টিপ্রোটন অথবা অন্য জুড়ি মৌলিক কণা উৎপন্ন করা যায় যদি গামারশ্মির শক্তি এরকম জুড়ি তৈরির মত শক্তিমান হয়। ফোটনের মত যে কণার সঙ্গে বিপরীত কণার পার্থক্য নেই, সেখানে একক কণা তৈরি হয়।

জুড়ি গঠনে শক্তি $2m_oc^2$ পাওয়ার পদ্ধতি হল দুটি বেগবান কণার সংঘাত ঘটিয়ে, তাপীয় শক্তি থেকে, তড়িচ্চুম্বকীয় স্থৈতিক শক্তি বা অন্য কোন কণা স্থির ভরের শক্তির সাহায্যে। জুড়ির বিনাশ ঘটতে পারে যখন কণা ও বিপরীত কণার সংঘাত হয়।

কোয়ান্টাম তত্ত্বও আপেক্ষিকবাদ মিলিয়ে (2) ও (4) নং সমীকরণ থেকে পাওয়া যায়

$$c/\nu=h/mc\cdots\cdots\cdots(7)$$

এই সম্পর্কটির একক হল দৈর্ঘ্য। m যদি কোন কণার স্থির ভর হয়, তাহলে h/m_oc হল কণার দৈর্ঘ্য যা কম্পটনের নামানুযায়ী কম্পটন দৈর্ঘ্য নামে অভিহিত হয়। প্রোটনের কম্পটন দৈর্ঘ্য $\sim10^{-15}$ মি. (l_p)। প্রোটনের কম্পটন সময় $t_N : 1/\nu=\frac{h}{m_oc^2}$ হল $\sim10^{-24}$ সেঃ।

m_oc^2 মানের শক্তি ছাড়া স্থায়ী কোন কণা তৈরি না করা গেলেও বাইরের শক্তি ছাড়া অবাস্তব কণা অস্থায়ী ভাবে তৈরি করা অসম্ভব নয়। তার মূলে আছে হাইসেনবার্গের অনিশ্চয়তাবাদ

$$\triangle E\triangle t\sim h\cdots\cdots(8)$$

যার সাহায্যে $\triangle t$ সময়ের জন্য $\triangle E$ শক্তি শক্তির নিত্যতাবাদ না মেনেও আমদানী করা যায়। ফলে কম্পটন সময়

$\Delta t \sim h/m_o c^2$-এর মধ্যে এরকম অস্থায়ী অবাস্তব কণা ΔE থেকে তৈরি হতে পারে। তার পাল্লা অবশ্য বেশী নয়—আলোর গতিবেগেও যে দূরত্ব অতিক্রম করবে তা কম্পটন দৈর্ঘ্যের সমান। তাই ঐ দৈর্ঘ্য অবাস্তব কোন কণার সর্বোচ্চ পাল্লা বলা যেতে পারে।

বলের বিনিময় কণাগুলি সাধারণত অবাস্তব। তাই তাদের আয়তনের পাল্লাও কম্পটন দৈর্ঘ্যের মধ্যে পড়ে। তড়িচ্চুম্বকীয় বলের বিনিময় কণা ফোটনের ভর শূন্য, তাই তার কম্পটন দৈর্ঘ্য ও পাল্লা অসীম। তাই অসীম দূরত্বে তড়িৎ-এর প্রভাব থাকে। গ্র্যাভিটনেরও ভরশূন্য, তাই মহাকর্ষ বলের বেলায়ও একই নিয়ম। ক্ষীণবলের বিনিময় কণা $W^{\pm}$ ও Z বেশ ভারী তাই তাদের পাল্লা কম ($<10^{-15}$ মি.) ও নিউক্লিয়াসের মধ্যে আবদ্ধ। তীব্র বলেও প্রায় একই নিয়ম খাটে।

পরমাণুর আভ্যন্তরীণ ক্রিয়ায় তড়িচ্চুম্বকীয় ও কোয়ান্টাম তত্ত্বের সমন্বয় ঘটে। ফলে এই সব ক্রিয়ায় e, h, c এই তিনটি নিত্যসংখ্যার উপর নির্ভর করতে হয়। তাছাড়া তড়িতের নিত্যসংখ্যা ϵ-ও আছে। এই সব নিত্যসংখ্যা সহযোগে একটি মাত্রাহীন সংখ্যা α পাওয়া যায়

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon hc} = \frac{1}{137{\cdot}036} \qquad (9)$$

বস্তু ও বিকিরণের বিক্রিয়ায় α সংখ্যাটি একান্ত অপরিহার্য। একটি উত্তেজিত পরমাণু কি হারে ফোটন বিকিরণে প্রশমিত হবে তা α দিয়ে স্থির করা যায়। পরমাণু কি হারে বাইরের শক্তিতে উত্তেজিত হবে তাও α দিয়ে নির্দিষ্ট হয়। ইলেকট্রনের ঘূর্ণীয় চুম্বকীয় ভ্রামকের সঙ্গে পরমাণু কক্ষের চুম্বক ক্ষেত্র যুক্ত হয়ে বর্ণালীতে কি ভাবে সূক্ষ্মতর রেখায় শক্তির পার্থক্যে ধরা পড়ে, তা α দিয়ে নির্ণীত হয়, তাই α-কে সূক্ষ্ম গঠনবিন্যাসের নিত্য-সংখ্যা বলা হয়।

তীব্র ও ক্ষীণ বলের পাল্লা কম বলে সেখানেও কোয়ান্টাম-তত্ত্ব প্রয়োগ করা যায়।

উপসংহারে h, c ও মহাকর্ষীয় নিত্যসংখ্যা G কি ভাবে একটি মৌলিক দৈর্ঘ্যের মান দিতে পারে তা দেখান যায়।

$$l_p = (Gh/c^3)^{\frac{1}{2}} \simeq 10^{-35} \text{ মি}$$

অনুরূপ মৌলিক সময় হল

$$t_p = \left(\frac{Gh}{C^5}\right)^{\frac{1}{2}} \simeq 10^{-43} \text{ সে}$$

ঐ দৈর্ঘ্য ও সময় যথাক্রমে প্ল্যাঙ্ক দৈর্ঘ্য ও প্ল্যাঙ্ক সময় নামে অভিহিত হয়। এই দৈর্ঘ্য সময়ে কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও মহাকর্ষের সমন্বয় আশা করা যায়। l_p ও t_p পরীক্ষায় ধরার কোন যন্ত্র এখনো আবিষ্কৃত হয় নি, তাই কোয়ান্টাম মহাকর্ষ এখনও আমাদের কাছে রহস্য হয়ে আছে।

t_p ও কম্পটন সময় t_N অথবা বিশ্বের বয়স t_H থেকে আর দুটি অনুপাত পাওয়া যায়।

$$t_N/t_P \sim 10^{20} = (10^{40})^{\frac{1}{2}}$$
$$t_H/t_N \sim 10^{40}$$

কম্পটন সময় হল নিউক্লিয়াসের সঙ্গে জড়িত, তার সঙ্গে বিশ্বের তত্ত্ব জড়িয়ে যে 10^{40} সংখ্যাটি পাওয়া যাচ্ছে, তা কি অর্থবহ? আধুনিক বিশ্বতত্ত্বে তাই কোয়ান্টাম তত্ত্বের কণা ও আপেক্ষিকতা-বাদের বৃহৎ বিশ্বের চিত্রের সমন্বয় করা সম্ভব কি না তার পরীক্ষা চলেছে।

সুন্দর ফুলগাছ

বড় বড় ডিম্বাকৃতি পাতায় ও সোনালী হলুদ ফুলে ভরা একটি ঝোপ জাতীয় ফুলের গাছ হল ওয়রমিয়া বারবিজেই। সুন্দর বাগানের স্বপ্ন রাজ্যে পরীর মত শোভাময়ী হতে পারে এই ফুলগাছটি। কলকাতায় মে-জুন মাসে এই গাছে গোলাপী বা লালচে গোলাপী ফুল হয়। এর পাতায় থাকে 15-18 জোড়া স্পষ্ট শিরা। ডিলেনিয়েসি উদ্ভিদ পরিবারের এই গাছের মাতৃভূমি উত্তর বোর্নিও। সর্বপ্রথমে এটি মানুষের নজরে আসে লণ্ডনের 'কিউ' উদ্ভিদ উদ্যানে প্রায় 70 বছর পূর্বে। বর্ষায় 'গুটি বাঁধা' প্রথায় এর বংশবিস্তার করা হয়। 80% ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি সফল হয়। নতুন চারা হতে 6-8 সপ্তাহ সময় লাগে।

[ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ]

যৌগের আকৃতি নির্ণয়ে ইলেকট্রন জোড়ের ভূমিকা

তারাশঙ্কর পাল* ও অঞ্জলি পাল*

সঙ্গীত জগতে কখনও সুর আগে কখনও বা কথা আগে তৈরি হয়। উভয়ের মিলনে আমরা যা পাই, তাই সঙ্গীত। 1900 খৃস্টাব্দের আগে রসায়নবিদেরা জানা বা অজানা উপায়ে নানা পদার্থ তৈরি করতেন। তখন জানার বিশেষ উপায় পাওয়া যেত না তাই জ্যামিতিক গঠন অজানা থাকতো। বর্তমানে রসায়নাগারে পদার্থ তৈরি করা হয় কখনও তত্ত্বের সাহায্যে পূর্বে জ্যামিতিক গঠনের ধারণা নিয়ে অথবা পদার্থ তৈরির পর আকৃতি নিয়ে মাথা ঘামানো হয়। অর্থাৎ কখনও তত্ত্ব আগে পরে পদার্থ অথবা উল্টো ব্যাপারও ঘটে। আমারা তখন জানতে পারি পদর্থের আসল রূপ। তাপগতি বিদ্যার (Thermodynamics) সাহায্যে কোন্ কোন্ পদার্থের মধ্যে কী কী বিক্রিয়া হতে পারে জানতে পারি, তেমনই রাসায়নিক গতিতত্ত্বের (Chemical kinetics) সাহায্যে বিক্রিয়া কেমন গতিতে হবে তা জানতে পারি। 1940 খৃস্টাব্দের সিজউইক (Sidgwick) এবং পাওয়েলের (Powell) পরে 1957 খৃস্টাব্দে গিলেসপি (Gillespie) এবং নাইহোম (Nyholm) মারফত আমারা অতি সহজে সাধারণ কতকগুলো যৌগের গঠন জানতে পারলাম। অবশ্য আগেই বিশ্ববিখ্যাত ভারনার (Werner) জটিল যৌগের (Complex compound) গঠন সম্পর্কে যুগান্তকারী তত্ত্ব জানিয়ে 1913 খৃস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান। তখন থেকেই অজৈব রসায়ন জগত গবেষণায় মেতে আছে ধাতব মৌলের বিভিন্ন যৌগ তৈরির ক্ষেত্রে আর সেই সকল পদার্থের জ্যামিতিক গঠন নিয়ে। মূল সুরটি ভারনারের, তিনি বলেছিলেন ধাতব মৌলের দু-ধরনের যোজ্যতা সম্ভব। শুধু জ্যামিতিক গঠন আমাদের জানার আগ্রহ মেটালো এমন ভাবার আজ কোন কারণ নেই। পদার্থের জ্যামিতিক আকৃতি জানা গেলে পদার্থের সম্ভাব্য বিক্রিয়া সম্বন্ধে অনেকখানি ধারণা করা যায়। শুধু তাই নয়, আমরা গঠন-প্রকৃতি থেকে যৌগের স্থায়িত্ব (Stability), বিক্রিয়া, বর্ণ আরো অন্যান্য ধর্মের বেশ কিছু পরিচয় পেতে পারি। তাই পদার্থের জ্যামিতিক আকৃতি নিয়ে নানান ভাবে ভাবা হয়েছে। এসব চিন্তার এক ফসল গিলেসপি এবং নাইহোমের তত্ত্ব। এরই সাহায্যে আমরা বেশ কিছু সাধারণ যৌগের আকৃতি জানতে পারি।

কোন পদার্থের বাইরের খোলের (Valence shell) ইলেকট্রন জোড়ের বিকর্ষণ গুরুত্ব ওই সহজবোধ্য তত্ত্বের মূল কথা। যৌগের চেহারা বা রূপরেখার জন্যে বাইরে বসেই ইলেকট্রন জোড় গোপনে কাজ করে যায়। তাই এই তত্ত্বের নাম 'বাইরের খোলের ইলেকট্রন জোড়ের বিকর্ষণ তত্ত্ব' বা Valence Shell Electron Pair Repulsion Theory বা সংক্ষেপে VSEPR তত্ত্ব। রাসায়নিক বিক্রিয়াতে মৌলের বাইরের খোল অংশ নেয়, এই তত্ত্বে তেমনি বাইরের খোলের ইলেকট্রন জোড়গুলির সাহায্যে যৌগের জ্যামিতিক আকৃতি ঠিক বোঝা যায়। যেমন জলের বেলাতে কেন্দ্রীয় পরমাণু অক্সিজেনের কথা ভাবতে হবে। অক্সিজেন বাইরের ছয়টি ইলেকট্রন নিয়ে হাইড্রোজেনের সঙ্গে জোট বাঁধে। দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু এই সুযোগে দুটি ইলেকট্রন দিয়ে আটটি অর্থাৎ চার জোড়া ইলেকট্রন বেষ্টনীতে অক্সিজেনকে আটকে ফেলে। এই চার জোড়া ইলেকট্রনের অবস্থান এবং প্রকৃতি জলের আকৃতি বলে দিতে সক্ষম। অবশ্য আমাদের মনে রাখতে হবে সুস্থির হওয়ার জন্যে ইলেকট্রন জোড় সবসময়েই সর্বোচ্চ দূরত্বে অবস্থান করতে চায়। জলের মধ্যে অক্সিজেনের প্রাপ্ত চার জোড়া ইলেকট্রনের দু-জোড়া দুটি হাইড্রোজেন পরমাণুকে আটকানোর জন্যে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ বন্ধ ইলেকট্রন জোড় (Bond pairs)। অন্য দু-জোড়া যেহেতু অন্য পরমাণুর সঙ্গে আবদ্ধ নয় তাই আকৃতি এবং প্রকৃতিগত ভাবে এই মুক্ত জোড়া দুটি (Lone pairs) বন্ধ জোড়ের থেকে একেবারে আলাদা। বন্ধ ইলেকট্রন জোড়া দুটি পরমাণুর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে গিয়ে খুবই শীর্ণ (Slimer) হয়ে যায় ফলে কৌণিক আয়তন (Angular space) কমে যায়। অন্য দিকে নিঃসঙ্গ জোড় দুটি স্থূলকায় (Fatter) থাকে। এই নিসঙ্গ জোড় যৌগের জ্যামিতিকে নানা ভাবে প্রভাবিত করে। এই প্রভাব বন্ধ ইলেকট্রন জোড়ের তুলনায় অনেক বেশী। যৌগের কাঠামো মানেই হল যৌগের মধ্যে মৌলের অবস্থান নির্ণয়। নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোড়ের অবস্থান নির্ণয় করা সহজ নয়। কিন্তু যৌগের মধ্যে ওই নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোড় সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে।

সবচেয়ে কম বিকর্ষণ বলের জন্যে যৌগ একটি সুস্থির আকৃতি খুঁজে পেতে চেষ্টা করে। বন্ধ ইলেকট্রন জোড়ের সংখ্যা জানা থাকলে যৌগের জ্যামিতিক গঠন জানায় সুবিধা হয়।

বন্ধ ইলেকট্রন জোড়ের সংখ্যা	জ্যামিতিক গঠন
2	রৈখিক (Linear)
3	সামতলিক ত্রিভুজ (Triangular)
4	চতুস্তলক (Tetrahedral)
5	ত্রিভুজাকৃতি দ্বিপিরামিড (Trigonal bipyramid)
6	অষ্টতলকীয় (Regular octahedral)

* রসায়ন বিভাগ, আই. আই. টি. খড়্গপুর, পিন—721302

যৌগের গঠন ঠিক করার জন্য নীচের নিয়মগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে।

1. (ক) বদ্ধ ইলেকট্রন জোড় অপর বদ্ধ ইলেকট্রন জোড়কে চাপ (Squash) দেবে।

(খ) বদ্ধ ইলেকট্রন জোড় অপর নিঃসঙ্গ জোড়কে চাপ দেবে।

(গ) নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোড় অপর নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোড়কে চাপ দেবে।

এই তিন ধরনের মধ্যে (ক) চাপ (খ) চাপের চেয়ে এবং (খ) চাপ (গ) চাপের চেয়ে কম শক্তিশালী। (গ) চাপ সবচেয়ে শক্তিশালী, সুতরাং এই চাপের প্রভাব যৌগের জ্যামিতিক গঠনকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করে। নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোড় বেশী কৌণিক আয়তন নিয়ে একটি মৌলের সঙ্গে যুক্ত থাকে সেই জন্যে অপর ইলেকট্রন জোড়কে বেশী চাপ দিতে সক্ষম। বদ্ধ ইলেকট্রন জোড় দুটি মৌলের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ায় শীর্ণকায় হয়ে অন্য ইলেকট্রন জোড়ের উপর কম চাপ প্রদান করবে।

মিথেন (CH_4), অ্যামোনিয়া (NH_3), জল (H_2O)--এই যৌগগুলিতে কোণের মাপ (Bond angle) যথাক্রমে $109^\circ 28'$, 107° এবং 104°। মিথেনের মধ্যে সব কয়টি ইলেকট্রন জোড়ই বদ্ধ অবস্থায় আছে। অ্যামোনিয়া এবং জলের অণুগুলিতে যথাক্রমে একটি এবং দুটি নিঃসঙ্গ জোড় বর্তমান। জলের অণুতে দুটি বদ্ধ ইলেকট্রন জোড় দুটি নিঃসঙ্গ জোড় দ্বারা বেশী চাপ অনুভব করে। তাই এই তিনটি যৌগের মধ্যে জলের মধ্যে কোণের পরিমাপ অর্ন্তভলকীয় (109°) কোণের থেকে বেশ কিছুটা কমে যায়। অ্যামোনিয়ার ক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোড়ের প্রভাব অ্যামোনিয়ার অণুর চেয়ে কম এবং মিথেন অণুর চেয়ে বেশী। কোণের পরিমাণ তাই 109° এবং 104°-এর মাঝেই (107°) থাকে।

2. পর্যায় সারণীর (Periodic table) একটি গ্রুপের উপর থেকে নীচে নামার সময় মৌলগুলির আকৃতি বড় হয়, সঙ্গে সঙ্গে তড়িৎ-ঋণাত্মক ধর্ম (Electro-regativity) কমে যায়। কেন্দ্রীয় পরমাণু একই গ্রুপের বিভিন্ন মৌলের সঙ্গে যুক্ত হলেও কোণের মাপের হেরফের হয়। সংযোগী মৌলের তড়িৎ-ঋণাত্মক ধর্ম বেশী হলেই বদ্ধ ইলেকট্রন জোড় বেশী শীর্ণকায় হবে। ফলে যৌগে কৌণিক আয়তন কমে যাবে এবং সেক্ষেত্রে সংযোগী মৌল দুটি কাছাকাছি এসে পড়বে।

উদাহরণ হিসাবে PCl_3, PBr_3 এবং PI_3 নেওয়া যেতে পারে। এখানে কোণের মাপ যথাক্রমে 100°, $101{\cdot}5^\circ$ এবং 102°। এখানে কেন্দ্রীয় পরমাণু P-এর সঙ্গে Cl, Br এবং I যুক্ত হয়ে তিনটি যৌগ তৈরি করেছে। এই সংযোগী মৌলগুলির মধ্যে Cl সবচেয়ে বেশী ঋণাত্মকধর্মী। তাই P-Cl বদ্ধ ইলেকট্রন জোড় সবচেয়ে বেশী শীর্ণকায় হবে এবং P-I হবে সবচেয়ে স্থূলকায়। $\angle$Cl-P-Cl কোণ তাই ছোট হয়ে পড়ে।

3. কেন্দ্রীয় মৌলটির বাইরের সব কয়টি উপখোল (Subshell) যদি পূর্ণ থাকে তবে এক বা বেশী সংখ্যক নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোড় সংযোগী মৌলের বদ্ধ ইলেকট্রন জোড়ের উপর চাপ সৃষ্টি করে। কিন্তু তার পরিমাণ খুবই কম। ধারণা স্পষ্ট হয় NH_3 যৌগের উদাহরণ নিলে। এখানে কেন্দ্রীয় মৌল N বাইরের খোলে 8টি ইলেকট্রন অর্থাৎ 4 জোড়া ইলেকট্রন সংগ্রহ করে (N-এর 5টি এবং 3টি H-এর)। ওই 4টি জোড়ের একটি নিঃসঙ্গ জোড়। বাকি তিনটি H দ্বারা বদ্ধ। ওই 4টি জোড় একই ধরনের (বদ্ধ) হলে কোণের পরিমাপ হত 109° যেমন NH_4^+ যৌগ মূলকে দেখা যায়। একটি নিঃসঙ্গ জোড় মাত্র 2° পরিমাণে কোণের আয়তন কমিয়ে দেয়। নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে বা B, C, O, F-এর ক্ষেত্রে একটি s উপকক্ষে এবং 3টি p উপকক্ষে ওই 4 জোড়া ইলেকট্রন ছড়িয়ে থাকে (খালি উপকক্ষ নেই) যদি কেন্দ্রীয় পরমাণু P হয়। হাইড্রোজেন PH_3 যৌগ তৈরি করে। PH_3 অণুর ক্ষেত্রে P-এর 9টি উপকক্ষ বর্তমান। তারা একটি s, তিনটি p এবং পাঁচটি d (খালি)। এই 9টি উপকক্ষ একটি নিঃসঙ্গ জোড়কে স্থান দিয়ে বেশী চাপ অনুভব করে এবং সংকোচন বেশী অনুভব করে। ফলে $\angle$H-P-H কোণ অনেক ছোট ($93{\cdot}8^\circ$) হয়ে যায়। P-H বন্ধনী দূরত্ব (Bond length) বেশী হয় তাতে P-H বন্ধনী শীর্ণ হয় এবং বিকর্ষণ (H-H) অনেক কমে যায়।

4. সংযোগী মৌলগুলি একাধিক ইলেকট্রন জোড় দ্বারা (একাধিক বন্ধনী দ্বারা) যুক্ত হলে, মৌলগুলি কেন্দ্রীয় পরমাণুর খুবই কাছে এসে পড়ে। এইরূপ বন্ধনীযুক্ত মৌলের দ্বারা অপর সংযোগী মৌল বেশী বিকর্ষিত হয়। সহজ উদাহরণ হিসাবে C_2H_4 যৌগ নেওয়া যেতে পারে। এখানে কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধনী দ্বারা যুক্ত। দু-রকমের কোণ এখানে তৈরি হয়েছে, $\angle H-C=C$ এবং $\angle H-C-H$। প্রথম কোণের পরিমাণ দ্বিবন্ধনীর জন্যে $121{\cdot}7^\circ$ হয় এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে $116{\cdot}6^\circ$। অবশ্যই প্রথম ক্ষেত্রে অধিক বিকর্ষণের দরুণ কোণটি বড় হয় কারণ C=C দ্বিবন্ধনী। PF_5 অণুর ক্ষেত্রে একটি মজার ঘটনা ঘটে। একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণে তিনটি F পরমাণু (সামতলিক—equatorial) এবং ওই একই তলে P অবস্থান করে। ওই তলের উপরে এবং নীচে দুটি পরমাণু স্থান পায় (আক্ষিক অবস্থান—axial)। এইরূপ অবস্থানকে ত্রিভুজাকৃতি দ্বি-পিরামিড অবস্থান বলা হয়। এখানে একটি যে কোন আক্ষিক পরমাণুর বদ্ধ ইলেকট্রন জোড় মোট তিনটি অপর সামতলিক মৌলের দ্বারা 90° কোণে প্রভাবিত হবে। অপর পক্ষে একটি

সামতলিক মৌল অপর দুই আক্ষিক মৌল দ্বারা 90° কোণে প্রভাবিত হবে। যেহেতু আক্ষিক মৌল তিনটি 90° বিকর্ষণ বলের সম্মুখীন হয়। আক্ষিক মৌলগুলি সামতলিক ক্ষেত্রের মৌলের তুলনায় কেন্দ্রীয় P মৌল থেকে বেশী দূরে সরে যাবে। অর্থাৎ ওরূপ অণুর বন্ধনী-দূরত্ব দু-ধরনের হবে। একই কারণে সংযোগী একটি মৌল কম তড়িৎ-ঋণাত্মক ধর্মী বা নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোড় হলে তা সামতলিক অবস্থান নেবে। SOF_4 এবং PF_4CH_3 যোগে যথাক্রমে অক্সিজেন এবং CH_3 গ্রুপ কেন্দ্রীয় মৌলের সঙ্গে একই সমতলে অবস্থান করে।

সুর এবং ভাষা মেলালে সঙ্গীত পাই। এখানে তত্ত্ব এবং ইলেকট্রন থাকলেই যৌগের কাঠামো তৈরি করা যাবে এমন ভাবনা কিন্তু ঠিক না। যদি কোন কোটের বাইরে একটি মাত্র ইলেকট্রন থাকে তখন এই তত্ত্ব কাজে লাগে না। যেমন NH_3^+, CH_3 মূলক বিক্রিয়ার সময় কেমন আকৃতি নেয় তত্ত্বে তাও বলা হয় নি। তাই বলা হয় শুধু যৌগের অনুত্তেজিত (Ground state) অবস্থা এই তত্ত্বের সাহায্যে জানা যায়। পর্যায় সারণীর তৃতীয় এবং চতুর্থ সারির মৌল-গুলির হাইড্রাইড যৌগের আকৃতি এই তত্ত্বের সাহায্যে সমাধান করা যায় না। কিন্তু প্রথম, দ্বিতীয় সারির ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব সহজেই প্রয়োগ করা যায়। ক্ষারীয় মৃত্তিকা ধাতুগুলির হ্যালাইড কেন যে রৈখিক নয়, তা বলা যায় না এই তত্ত্বের সাহায্যে। $TeCl_6^{2-}$, $TeBr_6^{2-}$ ইত্যাদির গঠন এই তত্ত্ব বলে দিতে পারে না। সংযোগী মৌলগুলির আকৃতি কেমন করে বিকর্ষণের সঙ্গে পাল্লা দেয় তার কথাও বলা নেই তত্ত্বে। এখানে অধিকাংশ সন্ধিগত মৌলের (Transitional element) দ্বারা তৈরী যৌগ নিয়ে আলোচনা করায় কোন বিশেষ ফাঁক খুঁজে পাওয়া যায় না। এত কিছু সীমাবদ্ধতা মেনে নিলেও সহজ সরল ভাবে এই তত্ত্ব অনবদ্য।

কলকাতার নিকাশী ব্যবস্থা

(আদিম অবস্থা)

বরুণ দাসগুপ্ত*

কলকাতায় বর্ষার সময়কার জলনিকাশের সমস্যা বা নিকাশী ব্যবস্থার সমস্যা কলকাতা সহরের মতই পুরোনো। 1859 থেকে 1875 খৃস্টাব্দের মধ্যে কলকাতার ভূ-গর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা তৈরি হয়। তার আগেও কলকাতার নিকাশী সমস্যা যা ছিল, আজ বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এসেও তার চেহারা কিছু মাত্র পাল্টায় নি।

উদাহরণ স্বরূপ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ডঃ গ্রাহাম বলেছিলেন, এক পশলা প্রবল বর্ষণের পর "a canoe was the preferable mode of transit in Chitpore Road." আজ বিংশ শতাব্দীর আশীর দশকে, আমহার্স্ট স্ট্রীট, সুকিয়া স্ট্রীট, রাজাবাজার এবং আরও অনেক এলাকায়, প্রবল বর্ষণের পরে কি নৌকা চালাতে হচ্ছে না ?

এই নিবন্ধে আমরা মূলত কলকাতার নিকাশী সমস্যাটি পর্যালোচনা করব, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে। এই লেখক যতটা খুঁজে পেতে বের করতে পেরেছে, তাতে দেখা যায় যে সরকারী ভাবে কলকাতার নিকাশী সমস্যা সম্পর্কে প্রথম উল্লেখ করেন লর্ড ওয়েলেসলী, গভর্ণর জেনারেল। 1803 খৃস্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত 'মিনিট'-এ (Minute) তিনি নিকাশী সমস্যার ওপর সব থেকে বেশী জোর দিয়েছিলেন। কলকাতায় তখনো ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী তৈরি হয় নি। সবটাই খোলা নর্দমা।

তখনই তিনি বলেছিলেন যে এই খোলা নর্দমাগুলি এমন ভাবে তৈরি করা হয়েছে যে এতে না হয় সহরের নোংরা জল বের করে দেওয়ার কাজ, না হয় বর্ষাকালের অতি বারিপাতজনিত জমে ওঠা জল নিষ্কাশন। বর্ষাকালের শেষের দিকে কলকাতার যে পরিবেশ হয় "তার জন্য প্রধানত দায়ী নর্দমা এবং জলপথ-গুলির অবস্থা।" তার পরেই তিনি লিখছেন, "গোড়ায় গলদ হয়ে গেছে নর্দমাগুলো হুগলী নদীর দিকে বইয়ে দিয়ে। মনে হয় জমি ঢালু হয়ে গেছে সল্ট লেকের দিকে [খুব সত্যি কথা ! সল্ট লেকে উপনগরী গড়বার কুফল সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব– লেখক], কাজেই নিকাশী নর্দমা ও জলপথগুলিকে ঐদিকে বইয়ে দিতে হবে। অভিজ্ঞতায় থেকে দেখা যাচ্ছে যে বর্ষাকালে, (গঙ্গা) নদী যখন পুরো ফুলে ফেঁপে উঠেছে, তখন এই নর্দমাগুলি অকেজো হয়ে পড়ে। তখন সহরের বহু এলাকায় সপ্তাহের পর সপ্তাহ জল জমে থেকে ইউরোপীয় অধিবাসীদের জীবন বিপন্ন করে তোলে।"

ওয়েলেসলী, আজকের পরিভাষায়, একটি "উচ্চ ক্ষমতা

*1/8B, ওলাইচণ্ডী রোড, কলিকাতা-700037

সম্পন্ন কমিটি" গঠন করলেন। কমিটির বিচার্য বিষয় হল :

1. নর্দমাগুলির লেভেল সার্ভে করা এবং সেগুলি কোন্ দিকে প্রবাহিত করা দরকার তা দেখা ;

2. ড্রেনের লেভেলের তুলনায় বর্ষাকালে নদীর লেভেল কি দাঁড়ায় তা পরীক্ষা করা ;

3. নর্দমা ও জলপথগুলি কি ভাবে করলে (ক) বর্ষার জল যাতে সহর ও তার আশেপাশে না জমে থাকে, (খ) সহর পরিষ্কার করা যায়, সে বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া ;

4. নর্দমা ও জলপথগুলি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতির জন্য কি ধরণের প্রতিষ্ঠান গঠন করা দরকার।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই কমিটির কার্যবিবরণীর বা প্রদত্ত সুপারিশের কোন রেকর্ড নেই যদিও তাঁদের সিদ্ধান্তগুলি মোটামুটি কি ছিল, তা জানা যায়। কিন্তু সেকথা পরে।

তারপর থেকে 1859 খৃস্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতার নিকাশী সমস্যা যে সরকার ও পৌর কর্তৃপক্ষের প্রভূত শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে রয়েছিল তার ভুরিভুরি নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত এইখানে বলে রাখি যে কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান তার বর্তমান চেহারা একদিনে পায় নি, দীর্ঘদিনের বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে তার আইনগত ক্ষমতা ও সাংগঠনিক কাঠামো বর্তমান চেহারা পেয়েছে।

কলকাতায় একটি পৌর সংস্থা প্রতিষ্ঠার পথে প্রথম পদক্ষেপ হল 1727 খৃস্টাব্দে, অর্থাৎ প্রথম জর্জের রাজত্বের 26তম বর্ষে, একটি রাজকীয় অনুজ্ঞাপত্র বা রয়াল চার্টারের দ্বারা একজন মেয়র এবং নয়জন অল্ডারম্যান নিয়ে গঠিত কর্পোরেশন গঠন। কলকাতায় "জমিদার" বলে পরিচিত কালেক্টার সাহেব হলওয়েল ঐ প্রথম পৌর সংস্থার সভাপতি হন। সহরের ইংরেজ অধিবাসীদের ওপর ঐ পৌর সংস্থার দেওয়ানী (সিভিল), ফৌজদারী (ক্রিমিনাল), ও গীর্জাসম্পর্কিত (এক্লেসিয়াস্টিকাল) এক্তিয়ার ছিল। কিন্তু যাক্ সে কথা। নিকাশী সমস্যায় আবার ফিরে আসি।

1810 খৃস্টাব্দে বেলেঘাটা খাল কাটা হল এবং 1821 খৃস্টাব্দে লেফটেনান্ট Schalch তাঁর সার্ভে রিপোর্টে প্রস্তাব দিলেন যে (গঙ্গানদী) থেকে ইঁটের গাঁথনীকরা বড়ো বড়ো ভুগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী তৈরি করে নিয়ে যাওয়া হোক প্রস্তাবিত সার্কুলার খালে যাতে ঐ খাল দিয়ে কলকাতার সব আবর্জনা ও ময়লা সল্ট লেকে গিয়ে পড়তে পারে।

আগে ওয়েলেসলী গঠিত যে কমিটির উল্লেখ করেছি সেই কমিটি যতিতি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে কলকাতার নিকাশী সমস্যার একমাত্র সন্তোষজনক সমাধান হল ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ। কিন্তু ক্যাপ্টেন প্রিন্সেপ বললেন যে ঐ পয়ঃপ্রণালীর মধ্য দিয়ে যদি জলস্রোত অবিরাম প্রবাহিত হতে না থাকে তাহলে এ জাতীয় কোন পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থাই ঠিকমত কাজ করবে না এবং কালে 'রোগের থেকেও বেশী বিপজ্জনক দাওয়াই' হয়ে দাঁড়াবে। আবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও বললেন যে পয়ঃপ্রণালীতে জলস্রোত নিত্য প্রবহমান রাখতে গেলে পাম্পের ব্যবস্থা করতে হবে এবং কলকাতার মত সহরের পক্ষে ঐ পাম্প চালানোর বিপুল খরচ বহন করা সাধ্যাতীত। ক্যাপ্টেন প্রিন্সেপ পরিষ্কার বললেন, তিনি কলকাতায় ভুগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা তৈরি করার ঘোর বিরোধী।

বিকল্প ব্যবস্থা তাহলে কি হতে পারে ? সেটা হল নর্দমা কাটা, প্রতি বাড়িতে উনুনের ছাই ফেলবার জন্য পাত্র রাখা এবং মজুর দিয়ে সেই পাত্র পরিষ্কার করানো যাতে ঐ ছাই ড্রেনে গিয়ে না পড়তে পারে। [নিঃসন্দেহে খুবই সুপরামর্শ। কলকাতা পৌরসভার বর্তমান এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার হীরেন চক্রবর্তী অতি সম্প্রতি এই লেখককে বলেছেন যে গৃহস্থ বাড়ীর আবর্জনা যেমন, ছাই, তরকারীর খোসা, কাগজ, টুথপেস্টের টিউব— এই সব বছরের পর বছর পয়ঃপ্রণালীতে ঢোকার ফলে পয়ঃ প্রণালীগুলো বুজে এসেছে।] ক্যাপ্টেন টমসন হিসেব করে বললেন যে নর্দমা কাটার খরচ পড়বে সাত লক্ষ টাকারও বেশী। কিন্তু কমিটি অভিমত দিলেন কলকাতার মত এত বড়ো ও ঘনবসতিসম্পন্ন সহরে ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী ছাড়া স্থায়ীভাবে সন্তোষজনক সমাধান আর কিছু নেই।

তারপর 1835 খৃস্টাব্দে ব্লেচিণ্ডেন (সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অফ রোড্স্) তাঁর আগের থিওরী—অর্থাৎ গঙ্গার দিকে নিকাশী ব্যবস্থাকে প্রবাহিত করা—বাতিল করে ভুগর্ভের সুড়ঙ্গ তৈরি করে উত্তর কলকাতার জল পুব দিকে পাঠাবার প্রস্তাব দিলেন।

ক্যানাল ইঞ্জিনীয়ার ক্যাপ্টেন টমসন বললেন, ভূগর্ভে বড়ো বড়ো নর্দমা করা হোক আর ঐ নর্দমা সাফ করানো হোক অংশত গঙ্গার জল আর অংশত এণ্টালী খালের পশ্চিম প্রান্তে একটা জলাধার নির্মাণ করে তার জল দিয়ে। এই রকম নানান জনে নানান প্রস্তাব আর পরামর্শ দিতে থাকলেন।

কিন্তু কমিটি আকৃষ্ট হলেন ক্যাপ্টেন ফরবেসের পরিকল্পনার প্রতি। তাঁর অভিমত ছিল, সহর স্থাপনের জন্য কলকাতাকে হঠাৎই বাছা হয়ে থাকুক বা ভেবেচিন্তেই বাছা হয়ে থাকুক, নিকাশী ব্যবস্থার দিক থেকে কলকাতা খুবই সুনির্বাচিত হয়েছে, কারণ কলকাতার সব থেকে নীচু এলাকাও সল্ট লেকের সব থেকে উঁচু জায়গার থেকে সাড়ে আট ফুট উঁচুতে। এ থেকে বোঝা যায় যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষ দিক থেকেই বিশেষজ্ঞেরা কলকাতার নিকাশী ব্যবস্থাকে গঙ্গাভিমুখী না করে সল্ট লেক-অভিমুখী করার দিকে ঝুঁকেছিলেন, কারণ ততদিনে তাঁরা বুঝে গেছেন যে কলকাতার ঢাল গঙ্গার দিকে নয়, সল্ট লেকের দিকে।

খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে, ক্যাপ্টেন ফরবেসের প্রস্তাব ছিল এই : পুরোনো চিৎপুর ব্রিজ থেকে পার্ক স্ট্রীটের পুরোনো কবরখানা

পর্যন্ত ইঁটের গাঁথনির একটি "আকুইডাক্ট" তৈরি করা হবে এবং কবরখানার থেকে সল্ট লেক পর্যন্ত একটা চওড়া খাল কাটা হবে। এই খালটি এন্টালী খালের প্রায় সমান্তরাল যাবে। নদী আর সল্ট লেকের সঙ্গে আকুইডাক্টের সংযোগ সাধন করা হবে স্লুইস গেট দিয়ে যাতে প্রয়োজন মত গঙ্গা বা সল্ট লেক, যে কোন দিক থেকে জল ঢোকানো বা আটকানো যেতে পারে। আকুইডাক্টের দু-পাশ থাকবে ঢাকা নর্দমা আর এই ঢাকা নর্দমা দুটির সঙ্গে যুক্ত হবে অসংখ্য ছোট ছোট নর্দমা। সারা সহরের মাটির ওপরকার যত আবর্জনা, সব এই সব নর্দমা দিয়ে এসে পড়বে প্রধান নর্দমা দুটিতে। আবার প্রধান নর্দমা দুটি, অনেকখানি ঢালুর দিকে গিয়ে আকুইডাক্টের সঙ্গে যুক্ত হবে। প্রধান নর্দমা দুটিকে পরিষ্কার রাখার পদ্ধতিও ক্যাপ্টেন ফরবেস বলেছিলেন, কিন্তু তার বিস্তৃত বিবরণ এখানে উল্লেখ করার দরকার নেই।

কিন্তু ক্যাপ্টেন ফরবেসের প্রস্তাব গৃহীত হয় নি। পৌর সংস্থা 1855 খৃস্টাব্দের 29শে ডিসেম্বর শেষ পর্যন্ত যে পরিকল্পনাটি গ্রহণ করলেন সেটি ক্লার্ক সাহেবের। এই পরিকল্পনাই কলকাতা সহরের বর্তমান নিকাশী ব্যবস্থার নির্মাণের পথে প্রথম সুনিশ্চিত পদক্ষেপ।

কলকাতার সেই নিকাশী ব্যবস্থা নির্মাণ সম্পর্কে ক্লার্ক সাহেবের স্কীমটি ছিল 26·5 লক্ষ টাকার। 1856 খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে সরকার, প্রথাগত পদ্ধতিতে, একটি কমিটি গঠন করলেন ক্লার্ক সাহেবের স্কীমটি পর্যালোচনা করার জন্য। প্রায় এক বছর বাদে, 1857-র জুন মাসে, কমিটি বললেন যে কিছু অদল-বদল করে স্কীমটি গ্রহণ করা হোক। খরচের হিসেব অবশ্য অনেক বাড়াতে হলো: ভূগর্ভস্থ নিষ্কাশন ব্যবস্থার জন্য ধরা হলো 33 লক্ষ টাকা আর জল সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য 11·5 লক্ষ টাকা। বলা হলো ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ হলো বিস্তৃত জল সরবরাহ ব্যবস্থা, তাই দুটোই চাই।

1858-র মার্চ থেকে 1859-এর মার্চ পর্যন্ত এক বছর ধরে সরকারী ড্রেনেজ কমিটি সহরের বিভিন্ন জায়গার লেভেল নিলেন এবং এই সব জায়গায় গঙ্গার বানের প্রতিক্রিয়া কি হয় তা লক্ষ্য করলেন। চিৎপুর, বামুনঘাটা টালির নালা, চাঁদপাল ঘাট ইত্যাদি জায়গায় এইসব পর্যবেক্ষণ চালানো হলো। কাতরং-এর ইঁটের ভাটি-টি সরকার বাহাদুর 'অধিগ্রহণ' করলেন 1858 খৃস্টাব্দে, ইংল্যাণ্ডে ইঁট বানানোর যন্ত্রপাতির অর্ডার দেওয়া হলো, যাতে স্কীমটির চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া গেলেই পয়ঃপ্রণালী নির্মাণের কাজ শুরু হতে পারে।

কিন্তু এদিকে, সরকারী কাজকর্মে যা সচরাচর হয়ে থাকে, আবার এক ফ্যাকড়া বাধল। স্কীমটি সোজাসুজি অনুমোদন না করে সরকার সেটিকে আর এক বিশেষজ্ঞকে দিয়ে দেখিয়ে নেবেন বলে ঠিক করলেন। সেই বিশেষজ্ঞ হচ্ছেন লণ্ডনের স্যানিটারী ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থা রেণ্ডেল ব্রাদার্সের এম রেণ্ডেল। 1858-র ডিসেম্বরে রেণ্ডেল তাঁর রিপোর্ট দাখিল করলেন, সঙ্গে জুড়ে দিলেন নিজের একটা স্কীম। দেখা গেল ক্লার্কের স্কীমের সঙ্গে রেণ্ডেলের স্কীমের বিস্তর তফাৎ।

ক্লার্কের স্কীম অনুযায়ী সার্কুলার রোড ও গঙ্গার দ্বারা শহরের যে অংশটুকু পরিবেষ্টিত সেইখানকার পয়ঃপ্রণালী ঢালু হয়ে নেমে যাবে এন্টালীর দিকে এবং এন্টালী থেকে পাম্প করে সেই ময়লা জল তুলে নিয়ে ফেলা হবে সল্ট লেকে যার লেভেল আরও উঁচুতে। কিন্তু রেণ্ডেল যে পাল্টা স্কীম দিলেন তাতে বলা হলো সহরের ঐ অংশটুকুর নিকাশী ব্যবস্থাকে পাম্প না করে গঙ্গায় নিয়ে ফেলা হবে। অর্থাৎ, 55 বছর আগে, 1803 খৃস্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলী যাকে বলেছিলেন "গোড়ায় গলদ হয়েছে", রেণ্ডেল সেই ভুলটাই আবার করতে চাইলেন নিকাশী ব্যবস্থাকে গঙ্গার দিকে প্রবাহিত করতে চেয়ে।

মজার ব্যাপার এই যে রেণ্ডেল স্বীকার করলেন যে নিকাশী ব্যবস্থাকে সল্ট লেকের দিকে প্রবাহিত করতে গেলে ক্লার্কের স্কীমই (কিছু "গুরুত্বপূর্ণ অদলবদল" করে) সব থেকে ভালো কিন্তু বললেন যে তাঁর নিজের অভিমত হলো নিকাশী ব্যবস্থাকে গঙ্গার দিকে প্রবাহিত করাই যুক্তিযুক্ত হবে। অনাবশ্যক বিবেচনায় রেণ্ডেলের স্কীমের বিস্তৃত বিবরণ দিলাম না। কিন্তু সরকারী দীর্ঘসূত্রিতার নিয়ম অনুযায়ী রেণ্ডেলের স্কীমটাকে আবার পাঠানো হলো ক্লার্কের কাছে। তিনি আবার তার ওপরে দীর্ঘ সমালোচনামূলক মন্তব্য করে সেটাকে সরকারের কাছে ফেরৎ পাঠালেন। শেষ পর্যন্ত, বিস্তর কালক্ষেপের পর, 1859 খৃস্টাব্দের 20 এপ্রিল, সরকার বাহাদুর ক্লার্কের স্কীমটিই অনুমোদন করলেন। আগেই বলেছি, ক্লার্ক যে ধরণের পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার কথা বলেছিলেন তাতে বৃষ্টির জল এবং আবর্জনাবাহী ময়লা জল, দুই-ই একই ভূগর্ভস্থ নর্দমা দিয়ে গিয়ে সল্ট লেকে ফেলবার জন্য পাম্প করতে হবে।

ক্লার্কের স্কীম বিস্তারিত আলোচনার দাবী রাখে, কারণ এই স্কীম অনুযায়ী যে পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা নির্মিত হয়, আজও সেইটিই এই পোড়া শহরের প্রধান নিকাশী ব্যবস্থা। এই স্কীম হলো, পাঁচটা প্রধান নিকাশী নালা (ভূগর্ভস্থ) থাকবে আর তাদের সঙ্গে যুক্ত থাকবে অসংখ্য শাখা-প্রশাখা নালা, আউটফল ওয়ার্কস ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা। পাঁচটি প্রধান নালার মধ্যে তিনটি গঙ্গার দিক থেকে সার্কুলার রোডের দিকে যাবে। একটা নিমতলা ঘাট স্ট্রীট বরাবর, একটা কলুটোলা স্ট্রীট বরাবর এবং একটা ধর্মতলা স্ট্রীট বরাবর। আর দুটি প্রধান নালার একটা উত্তর দিক থেকে আসবে। গঙ্গার ধারে শোভাবাজার স্ট্রীট থেকে পূব দিকে এসে সার্কুলার রোডে পড়বে আর তারপর আপার সার্কুলার রোড বরাবর দক্ষিণ দিকে গিয়ে মৌলালীর কাছে আসবে এবং পথে তিনটি আড়াআড়ি (অর্থাৎ পশ্চিম থেকে পুবে) প্রবাহিত প্রধান নালাকে পার হয়ে আসবে।

সার্কুলার রোডের এই পয়ঃপ্রণালী থেকে সার্কুলার খাল পর্যন্ত থাকবে চারটে স্টর্ম ওয়াটার ওভার ফ্লো। এগুলির জল ধারণ ক্ষমতা পয়ঃপ্রণালীগুলির থেকে অনেক বেশী হবে। অন্য প্রধান নালাটি জীরাট ব্রিজের কাছে টালির নালা থেকে বেরিয়ে লোয়ার সার্কুলার রোড বরাবর এসে মৌলালীর কাছে পড়বে। এইভাবে উত্তর ও দক্ষিণ—দু দিককার দুটি প্রধান নালা এসে মৌলালীতে মিশবে। সেখানে 15 ফুট 6 ইঞ্চি × 15 ফুট 9 ইঞ্চি আয়তনের একটি প্রধান আউটফলের মধ্যে দিয়ে পয়ঃপ্রণালী যাবে এন্টালীর পামার বাজার পাম্পিং স্টেশনে এবং সেখান থেকে বেলেঘাটা খালে (1810 খৃস্টাব্দে কাটা)।

এই প্রধান নালাগুলি হবে ডিম্বাকৃতি। গঙ্গার ধারে, যেখান থেকে এদের শুরু, সেখানে এদের আয়তন হবে 6 ফুট 6 ইঞ্চি × 4 ফুট 4 ইঞ্চি। তারপরে আয়তন বাড়তে বাড়তে মৌলালীতে এসে হবে 9ফুট 4·5 ইঞ্চি × 7 ফুট 3 ইঞ্চি। নালাগুলির ঢাল হবে প্রথমে প্রতি মাইলে চার ফুট। তারপরে ঢাল কমতে কমতে আউটফলের কাছে এসে হবে মাইলে দু ফুট। নালাগুলি পুরো ভর্তি হয়ে যখন জল যাবে তখন জলস্রোতের গতিবেগ হবে সেকেণ্ডে তিন থেকে চার ফুট।

অনুমান করা হলো যে পামার ব্রিজের কাছে ময়লা জল আসার সর্বোচ্চ পরিমাণ হবে (সহরের লোকসংখ্যা যদি পাঁচ লক্ষ হয়) সেকেণ্ডে 45 কিউবিক ফুট। কিন্তু হিসেব করে দেখা গেল যে এই পরিমাণ জল এই গতিবেগে প্রবাহিত হলেও পয়ঃপ্রণালীর তলায় থিতিয়ে পচা ময়লা আপনা থেকে পরিষ্কার করার পক্ষে এই গতিবেগ যথেষ্ট নয়। সেজন্য ঠিক হলো, সেকেণ্ডে 45 কিউবিক ফুটের সঙ্গে সেকেণ্ডে আরো 21 কিউবিক ফুট নদীর জল ঢোকাতে হবে গঙ্গার থেকে এবং টালির নালা থেকে। অর্থাৎ বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময়ে সেকেণ্ডে 66 কিউবিক ফুট ময়লা জল প্রবাহিত হবে সেকেণ্ডে 2 ফুট গতিতে। এই পরিমাণ জল এই বেগে প্রবাহিত হলে পয়ঃপ্রণালীর তলায় জমে থাকা ময়লা আপনিই ধুয়ে বেরিয়ে যাবে বলে মনে করা হলো।

এই ময়লা জল বেলেঘাটা খালে অবাধ স্রোতে এসে পড়বে কিন্তু বেলেঘাটা খালের জলের ওপরের স্তর (সার্ফেস লেভেল) হবে সল্ট লেকের নীচু জলস্তরের নীচে। অর্থাৎ বেলেঘাটা খালের জল পাম্প করে আবার ওপরে তুলতে না পারলে ঐ ময়লা জল সল্ট লেকে প্রবাহিত করা যাবে না। সেজন্য ঠিক হলো যে পামার ব্রিজে একটা বিদ্যুৎ চালিত পাম্প বসানো হবে ঐ পাম্প ময়লা জলকে পাম্প করে 14 ফুট উঁচুতে তুলে আর একটা পয়ঃপ্রণালীতে ফেলবে এবং সেখান থেকে প্রবাহিত হয়ে গিয়ে দু'মাইল দূরে ট্যাংরা খাঁড়িতে পড়বে। পয়ঃপ্রণালীগুলির নিকাশী ক্ষমতা হবে ঘণ্টায় সিকি ইঞ্চি বারিপাত বা মিনিটে 69 হাজার কিউবিক মিটার জল বের করে দেবার। এই হিসেবের মধ্যে অবশ্য 4600 একর এলাকার থেকে আসা ময়লাও ধরা হয়েছে।

সংক্ষেপে এই হলো ক্লার্কের স্কীম। এতে থাকছে ইঁটের গাঁথনির মোট 30 মাইল লম্বা প্রধান পয়ঃপ্রণালী এবং মোট 79·5 মাইল দৈর্ঘ্যের উপ-পয়ঃপ্রণালী, থাকছে পাম্পিং স্টেশন 'গালি' (gullies), পেনস্টক, মাটির ওপর দিয়ে প্রবাহিত নালা, আউট ফল, উঁচু জায়গা থেকে প্রবাহিত পয়ঃপ্রণালী এবং এই ব্যবস্থা পরিচালনা করার জন্য দপ্তর এবং জায়গা-জমি। এই স্কীমের জন্য খরচ ধরা হলো 34 লক্ষ টাকার মত এবং সরকার এটিকে অনুমোদন করলেন 1859 খৃস্টাব্দে। দুর্ভাগ্যবশতঃ একটি জিনিষ করা হলো না রেণ্ডেল যেভাবে একটা পয়ঃপ্রণালীকে আর একটা পয়ঃপ্রণালীর সঙ্গে জুড়তে চেয়েছিলেন সেটা গ্রহণ করা হলো না।

রেণ্ডেল বলেছিলেন, পয়ঃপ্রণালীগুলি জুড়বার সোজা উপায় হচ্ছে প্রধান পয়ঃপ্রণালীকে এমন ভাবে তৈরি করা যাতে সেটা ঢালু হয়ে নেমে যায়। এতে সুবিধা এই যে প্রধান পয়ঃপ্রণালীর একেবারে সামনের দিকে যে বেশি পরিমাণ ময়লা জল প্রবাহিত হবে তার স্তর কখনই পয়ঃপ্রণালীর বাকী অংশে অবাধে প্রবাহিত জলস্তরের থেকে বা উপ-পয়ঃপ্রণালীতে প্রবাহিত জলস্তরের থেকে ওপরে উঠে যাবে না। সহজ কথায় প্রধান পয়ঃপ্রণালীর সামনের অংশ থেকে ময়লা জল 'ব্যাক-ফ্লো' করবে না। এটা করা হলো না।

কলকাতার ময়লা নিকাশী ব্যবস্থায় একটা গুরুতর ত্রুটি হলো এই যে প্রধান পয়ঃপ্রণালীগুলি এবং উপ-পয়ঃপ্রণালী সবই নির্মিত হয়েছে 'ইনভার্ট টু ইনভার্ট' পদ্ধতিতে। উচিত ছিল বড় ছোট সব প্রণালীকে এমন ভাবে তৈরি করা (হয় 'টপ টু টপ' নয় 'সাফট টু সাফট') যাতে বড় ছোট যে প্রণালী দিয়েই ময়লা জল আসুক না কেন, তা যখন সব থেকে বেশী পরিমাণে প্রবাহিত হবে তখনও ছোট এবং বড় প্রণালীর জোড়ের মুখে দু'দিক থেকে আগত জলস্রোত সমান স্তরে এসে মেশে, একটা উঁচু একটা নীচু না হয়। তার জন্য দরকার হলে আউটফলকে বেশী গভীর করা হতো।

যাই হোক, 1868 খৃস্টাব্দে ক্লার্কের স্কীম দক্ষিণ কলকাতায় (অবশ্যই সে সময়কার দক্ষিণ কলকাতা আর আজকের দক্ষিণ কলকাতা এক নয়) পার্ক স্ট্রীটের দক্ষিণ দিক পর্যন্ত চালু হয়ে গেল। স্কীমের এই অংশের মধ্যে রইল টালির নালা থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত প্রধান পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ, উঁচু লেভেল-এ তৈরী পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ এবং পাম্পিং স্টেশন বসানো।

এবার কথা উঠল নিকাশী ব্যবস্থাকে উত্তর কলকাতায় সম্প্রসারিত করতে হবে। আবার অনেক রিপোর্ট তৈরি হলো। কর্পোরেশনের ইঞ্জিনীয়ার ও হেল্থ অফিসারকে সার্টিফিকেট দিতে হলো যে, যেটুকু কাজ হয়েছে (দক্ষিণ কলকাতায়) তা ভালই হয়েছে এবং এই ব্যবস্থা এবার উত্তরে সম্প্রসারণ করা দরকার। তখন ঠিক হলো বার্ন কোম্পানীকে দিয়ে ধর্মতলা থেকে কলুটোলা পর্যন্ত প্রধান পয়ঃপ্রণালীটি তৈরি করা হবে।

1871-এর জানুয়ারীতে উত্তর কলকাতার নিকাশী ব্যবস্থা নিয়ে আবার আলোচনা হলো। সবাই স্বীকার করলেন যে, যেটুকু কাজ করা হয়েছে তা খুবই সফল হয়েছে এবং এবার সারা কলকাতাকে এই নিকাশী ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে। কিন্তু তার পর কর্পোরেশনের কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে মতপার্থক্যের দরুন গোটা ব্যাপারটাই অনেক পিছিয়ে গেল।

যাই হোক, অনেক বিশেষজ্ঞ এবং কমিটির আলোচনা, রিপোর্ট ইত্যাদি দিয়ে বহু কালক্ষেপের পর সিদ্ধান্ত হলো যে বাকী স্কীমটিকেও কার্যকরী করতে হবে এবং এজন্য আরো অন্তত 56লক্ষ টাকা লাগবে। (আগের কাজটুকুর জন্য লেগেছিল 50 লক্ষ টাকা)। কর্পোরেশনের 'জাস্টিস'-রা বললেন যে এত টাকার দায় কর্পোরেশনের ওপর চাপানো ঠিক হবে না। কাজেই এখন শুধু প্রধান নিকাশী প্রণালীগুলি তৈরি করা হোক আর প্রণালীগুলির মধ্যে যে নর্দমাগুলি আছে সেগুলিকে উন্নত করা হোক।

শেষ পর্যন্ত 1872 খৃস্টাব্দে আইন পাশ করে 'জাস্টিস'দের ঋণ নেবার ক্ষমতা আরো 30 লক্ষ টাকা বাড়ানো হলো এবং সরকার $4\frac{1}{2}$ শতাংশ সুদে 21·2 লক্ষ টাকা ঋণ দিলেন। ঋণ শোধ করার জন্য একটা 'সিংকিং ফাণ্ড'-ও সৃষ্টি করা হলো।

ক্লার্কের স্কীম অনুযায়ী প্রধান পয়ঃপ্রণালীগুলি তৈরি শেষ করতে ষোল বছর লেগেছিল। ক্লার্কের পর এলেন লেসলী। সেটা 1875 খৃস্টাব্দ। তিনি ক্লার্কের স্কিমের বাকী কাজগুলি সম্পূর্ণ করার জন্য 19 লক্ষ টাকার একটা এস্টিমেট দিলেন। দক্ষিণ কলকাতার পুরো কাজটা সমাধা হলো 1878 খৃস্টাব্দে। উত্তর কলকাতায় শেষ হলো 1885-86 খৃস্টাব্দে। কিন্তু পুরো কাজ শেষ হবার আগেই প্রবল বর্ষণজনিত জল যাতে খালে চলে না যায় তার জন্য কর্পোরেশনকে বাড়তি কতকগুলি কাজ করতে হয়েছিল।

1890 খৃস্টাব্দে কলকাতায় মোট 37 মাইল দৈর্ঘ্যের পাকা অর্থাৎ ইঁটের গাঁথনীর পয়ঃপ্রণালী এবং 147 মাইল দৈর্ঘ্যের উপ-পয়ঃপ্রণালী, অর্থাৎ পাইপের প্রণালী ছিল এবং এই ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী করতে মোট খরচ হয়েছিল 1 কোটি 10 লক্ষ টাকা।

সংক্ষেপে এই হলো কলকাতার ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী নির্মাণের ইতিহাস। [পরের সংখ্যায়—বর্তমান সমস্যার কথা]।

[এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত তথ্যাদির জন্য লেখক 'পুরশ্রী'র সম্পাদক শ্রীসমরেশ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে কৃতজ্ঞ]

নতুন চন্দ্রমল্লিকা

ব্যাঙ্গালোরে চন্দ্রমল্লিকা নিয়ে গবেষণার ফলে দুটি সংকর জাতের এবং একটি মুক্ত পরাগযোগী চন্দ্রমল্লিকা উদ্ভাবিত হয়েছে।

'রেড গোল্ড' সংকর জাতের চন্দ্রমল্লিকা—'ফ্লার্ট' × 'ভ্যালেনটাইন' জাতের সংকর এটি। বাদামী কমলা রং-এর ফুল দেয় 110 দিন বয়সে। প্রতি ফুলের ব্যাস 6·9 সেমি. হয়। এতে মাঠের গাছে 211টি ফুল এবং পাত্রে 37টি ফুল হয়।

'ইন্দিরা'—এটি মুক্তপরাগী জাত 'লর্ড ডুলেক্স' নং এলডি 14 এবং 'ফ্লার্ট×ভ্যালেনটাইন' নং এফ এক্স 5-1 সংকর-এর সংকর জাত। ফুলের কুঁড়ি হলুদ এবং ফুটন্ত ফুল বাটার কাপ হলুদ রং-এর হয়। প্রতি ফুলের ব্যাস 6·2 সেমি., মাঠে প্রতি গাছে 90-এর পাত্রে 34টি ফুল পাওয়া যায়। রাখী—এটি লর্ড ডুলেক্স' জাতের মুক্তপরাগীজাত। 89 দিনে ফুল হয়, ফুলের রং এনিমোন প্রিমরোজ এবং লাল ডোরাযুক্ত পাপড়ি। প্রতি ফুলের ব্যাস 5·9 সেমি.। গাছ ঝোপের মত, ভরা এবং উজ্জ্বল পাতার ভরা।

[ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ]

বিভাজ্যতা পরীক্ষা

হরষিত মজুমদার*

স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং সাধারণ পাঠকের উপযোগী করে বিভাজ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রচলিত নিয়ম ছাড়াও কতকগুলি ভিন্নতর নিয়মের সাহায্যে বিভাজ্যতা-পরীক্ষার বর্ণনা দেওয়া আছে। বিশেষভাবে প্রাইম-সংখ্যা (Prime Number) দিয়ে বিভাজ্যতা এবং কনগ্রুয়েন্সি (Congruency) গণিতের সাহায্যে বিষয়টি সাধারণীকরণের (Generalisation) চেষ্টা করা হয়েছে।

'বিভাজ্যতা' শব্দটা সবারই জানা ; কিন্তু 'বিভাজ্যতা পরীক্ষা' ব্যাপারটার সঙ্গে সবাই পরিচিত কি ? বোধ হয়, না। ভাজক, ভাজ্য, ভাগফল ও ভাগশেষের মধ্যে সম্পর্কটা একটা পঞ্চম বা ষষ্ঠমানের ছাত্রেরও নখদর্পণে। কিন্তু ছাত্রতো বটেই অনেক শিক্ষকরাও হকচকিয়ে যাবেন যদি তাঁদের জিজ্ঞাসা করা হয়—2345781 সংখ্যাটি 7 বা 13 বা 23 দ্বারা বিভাজ্য কিনা ? কোন নিয়ম জানা না থাকলে তার পক্ষে সোজাসুজি ভাগক্রিয়া না করে বলা সহজ নয়। অনেকে বলতে পারেন যে, অমুক সংখ্যা, তা যত বড়ই হোক, তমুক সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য কিনা তার জন্য মাথাব্যথা করেই বা কী লাভ কিংবা জেনেই বা কী লাভ। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই নিছক শব্দ-জব্দ ধরণের নয়—কারণ এর একটা অব্যবহারিক ও শিক্ষণীয় মূল্য আছে। তার চেয়েও বড় হলো এর ব্যবহারিক দিকটা। বস্তুতঃ ফলিত গণিতে (Applied Mathematics) অনেক সময় কোন যৌগ সংখ্যার মৌল উৎপাদকগুলি বার করার দরকার হয়, কিংবা হয়তো জানা প্রয়োজন কোন সংখ্যা অন্য একটি সংখ্যা (প্রায়শই মৌল) দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য কিনা। সেক্ষেত্রে যদি ভাগক্রিয়া করে জানতে হয় তবে অনেক সময় লাগবে। তাই তাড়াতাড়ি জানার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করতে হয়। আমি সংখ্যার গাণিতিক গঠন ও গুণাবলী পর্যালোচনা করে কতকগুলি পদ্ধতি বার করেছি, যেগুলির সাহায্যে সোজাসুজি ভাগ না করেই জানা যাবে কোন সংখ্যা অন্য একটি সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য কিনা।

কোন সংখ্যা আর একটি সংখ্যা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য বলতে আমরা বুঝি যে, প্রথমোক্ত সংখ্যাকে শেষোক্ত সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ/শূন্য হবে। বিভাজ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য আমরা সংখ্যাকে 10-এর নিধানে (to the base 10) প্রকাশ করবো।

কোন সংখ্যা 3 দ্বারা বিভাজ্য কিনা তা জানতে হলে—যে কোন একটা সংখ্যা নিন। এরপর সংখ্যাটিকে দুই বা ততোধিক সংখ্যায় পরিণত করুন যাতে প্রতিটি সংখ্যা প্রথমোক্ত (বা আসল) সংখ্যার বিভিন্ন স্থানীয় অঙ্কগুলি (digits of the parent number) নিয়ে গঠিত হয় (এই সংখ্যাগুলি বিভিন্ন স্থানীয় অঙ্কগুলির যে কোন বিন্যাস দ্বারা গঠিত হতে পারে) এবং প্রতিটি সংখ্যার ও একাধিক সংখ্যায় কোন একটি বিশেষ—স্থানীয় অঙ্ক (particular digit) যেন একবারের বেশী না থাকে। এরপর ঐ সংখ্যাগুলি যোগ করুন এবং যোগফল নিয়ে উপরিউক্ত নিয়মানুযায়ী কাজ করুন যতক্ষণ না যোগফল দেখে আপনি বুঝতে পারেন ওটা 3 দ্বারা বিভাজ্য কিনা। বিভাজ্য হলে আসল সংখ্যাটিও 3 দ্বারা বিভাজ্য হবে।

উদাহরণস্বরূপ, ধরুন সংখ্যাটি হলো 23568-এর থেকে দুটি সংখ্যা 235 ও 68 তৈরি করলাম (253 386 বা 23, 5, 68 বা 2, 536 ও 8 ইত্যাদিও হতে পারে)। এখন $235+68=303$, পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করে পাই $303 \rightarrow 3+03=6$ এখন 6 হচ্ছে 3 দ্বারা বিভাজ্য ; সুতরাং 23568-ও 3 দ্বারা বিভাজ্য। প্রমাণটা খুবই সহজ, পাঠক চেষ্টা করে দেখতে পারেন। এখানে একটা মজার জিনিষ লক্ষণীয় হলো যে—এই নিয়ম থেকে আমরা প্রচলিত নিয়মটি পেতে পারি। প্রচলিত নিয়মটি হলো :—সংখ্যাটির বিভিন্ন স্থানীয় অঙ্কগুলির যোগফল যদি 3 দ্বারা বিভাজ্য হয়, তবে সংখ্যাটিও 3 দ্বারা বিভাজ্য। এটা হলো উপরিউক্ত নতুন নিয়মটির একটা বিশেষ ক্ষেত্র (special case)।

কোন সংখ্যা 7 দ্বারা বিভাজ্য কিনা তার জন্য নতুন পদ্ধতিটা হলো :—একক স্থানীয় অঙ্ককে $1 \cdot 2^0$ দ্বারা, দশক স্থানীয় অঙ্ককে $3 \cdot 2^0$ দ্বারা, শতক স্থানীয় অঙ্ককে $1 \cdot 2^1$ দ্বারা···এবং n-তম স্থানীয় অঙ্ককে $1 \cdot 2^{\frac{n+1}{2}-1}$ (যদি n বেজোড় সংখ্যা হয়) বা $3.2^{\frac{n+1}{2}-1}$ (যদি n জোড় সংখ্যা হয়) দ্বারা গুণ করে গুণফলগুলিকে যোগ করা হলো। পরে যোগফল নিয়ে উপরিউক্ত নিয়মের পুনরাবৃত্তি করা হলো যতক্ষণ না সংখ্যাটি পর্যবেক্ষণ করে বলা যায় যে ওটা 7-এর গুণিতক কিনা। যদি হয়, তবে সংখ্যাটিও 7-দ্বারা বিভাজ্য হবে।

উদাহরণ স্বরূপ 23436 সংখ্যাটি নেওয়া যাক। এটা 7 দ্বারা বিভাজ্য হবে

যদি $6.1+3.3+4.2+3\ (3.2)+2.2^2$ —7 দ্বারা বিভাজ্য হয়,

বা $(6+9+8+18+8)$—7 দ্বারা বিভাজ্য হয়

বা 49—7 দ্বারা বিভাজ্য হয়। 49 দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে এটা 7-দ্বারা বিভাজ্য—সুতরাং সংখ্যাটিও 7-দ্বারা বিভাজ্য। প্রমাণটি নিম্নরূপ। ধরি সংখ্যাটি হলো u v w x y z

*সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, বিধান নগর, কলিকাতা-700065

(এখানে u = লক্ষস্থানীয়, v = অযুতস্থানীয়, w = সহস্রকস্থানীয়, x = শতক স্থানীয়, y = দশকস্থানীয় ও z = এককস্থানীয় অঙ্ক)। এখন আমরা দেখাব যে যদি

$$1.2^0.z+3.2^0y+1.2^1x+3.2^1w+1.2^2v+3.2^2u$$

—7 দ্বারা বিভাজ্য হয় তবে সংখ্যাটিও 7 দ্বারা বিভাজ্য হবে।

এখন 10-এর নিধানে আমরা পাই

$$u\ v\ w\ x\ y\ z=10^5u+10^4v+10^3w+10^2x+10^1y+10^0.z$$
$$=(99995+5)u+(9996+4)v+(994+6)w+(98+2)x+(7+3)y+z$$
$$\equiv 5u+4v+6w+2n+3y+z \pmod 7$$
$$\equiv 12u+4v+6w+2n+3y+z \pmod 7$$
$$=(1.2^0)z+(3.2^0)y+(1.2^1)x+(3.2^1)w+(1.2^2)v+(3.2^2)u \pmod 7$$

এখন যদি ডানপক্ষ $\equiv 0 \pmod 7$ হয় অর্থাৎ যদি ডানপক্ষ 7 দ্বারা বিভাজ্য হয় তবে $uvwxyz \equiv 0 \pmod 7$ হবে অর্থাৎ সংখ্যাটিও 7 দ্বারা বিভাজ্য হবে!

সাধারণতঃ আমরা জানি যে একটি সংখ্যা 8 দ্বারা বিভাজ্য হয় যদি সংখ্যাটির একক, দশক ও শতক স্থানীয় অঙ্কটি নিয়ে গঠিত সংখ্যাটি 8 দ্বারা বিভাজ্য হয়। আলোচ্য পদ্ধতিটি হলো: সংখ্যাটির একক স্থানীয় অঙ্ককে 2^0 দ্বারা, দশক স্থানীয়কে 2^1 দ্বারা এবং শতক স্থানীয়কে 2^2 দ্বারা গুণ করে গুণফলগুলি যোগ করুন এবং যোগফল নিয়ে উপরিউক্ত নিয়মানুযায়ী কাজ করুন। পর্যবেক্ষণ দ্বারা দেখুন নতুন যোগফলটি (পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করার পর যোগফলটি যখন এক অঙ্ক বা দু-অঙ্ক বিশিষ্ট হবে) 8 দ্বারা বিভাজ্য কিনা; যদি এক অঙ্ক বা দু-অঙ্কবিশিষ্ট হবে) 8 দ্বারা বিভাজ্য কিনা; যদি হয় তবে সংখ্যাটিও 8 দ্বারা বিভাজ্য হবে। মনে করি সংখ্যাটি 1136

পদ্ধতি ও পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করে পাই

$$1136\to 136\to 6\cdot 2^0+3\cdot 2^1+1\cdot 2^2=$$
$$24\to 4\cdot 2^0+2\cdot 2^1=8\equiv 0 \pmod 8$$

সুতরাং সংখ্যাটি 8 দ্বারা বিভাজ্য। এখানে সহস্রক বা তার উপরের অঙ্কগুলি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ 1136=1000+136 এবং 1000 সংখ্যাটি 8 দ্বারা বিভাজ্য।

11-এর বেলায় বিভাজ্যতা নির্ণয়ের পন্থাটি হলো:— যে কোন একটি সংখ্যা নেওয়া হলো। এর পর জোড় (even) ও বিজোড় (odd) স্থানীয় অঙ্কগুলিকে আলাদা করে যোগ করলে যদি একটি যোগফল অপর যোগফলটির চেয়ে $11n$ বেশী বা কম হয় $(n=0, 1, 2\cdots)$ তবে সংখ্যাটি 11 দ্বারা বিভাজ্য হবে।

উদাহরণ (1) সংখ্যাটি যদি 66792 হয় তবে

জোড়-স্থানীয় অঙ্কগুলির যোগফল $=9+6=15$

বিজোড়-স্থানীয় ,, ,, $=2+7+6=15$

সুতরাং সংখ্যাটি 11 দ্বারা বিভাজ্য (এখানে $n=0$)।

উদাহরণ (2): সংখ্যাটি = 92 070

জোড়-স্থানীয় ও বিজোড়-স্থানীয় অঙ্কগুলির যোগফল যথাক্রমে 24 ও 2। এদের পার্থক্য $22=2\times 11$। সুতরাং সংখ্যাটি 11 দ্বারা বিভাজ্য। প্রমাণটি উৎসাহী পাঠকের জন্য রইলো।

13 ও 23 দ্বারা বিভাজ্য তা সম্বন্ধে জানতে হলে নিম্নলিখিত নিয়ম দুটির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

(1) 13-এর জন্য:—সংখ্যাটির একক স্থানীয় অঙ্ককে 3 দ্বারা, দশক স্থানীয়কে 4 দ্বারা গুণ করে এদের যোগফলকে অবশিষ্ট অঙ্কগুলি দিয়ে গঠিত সংখ্যার সঙ্গে যোগ করুন। এই যোগফলটি (এক বা একাধিক বার পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করার পর) যদি 13 দ্বারা বিভাজ্য হয়, তবে সংখ্যাটিও 13 দ্বারা বিভাজ্য হবে।

উদাহরণ: সংখ্যা = 329446

নিয়মানুসারে $329446\to 3294+6\cdot 3+4\cdot 4=3328$

পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করে $3328\to 33+8\cdot 3+2\cdot 4=65$

যেহেতু 65 13 দ্বারা বিভাজ্য, সংখ্যাটিও 13 দ্বারা বিভাজ্য।

(2) 23-এর জন্য:—একক স্থানীয় অঙ্ককে 3 দ্বারা ও দশক স্থানীয়কে 7 দ্বারা গুণ করে দুটিকে যোগ করুন। এই যোগফলের সঙ্গে অবশিষ্ট অঙ্ক দ্বারা গঠিত সংখ্যাকে যোগ করুন। এই যোগফল (অথবা যোগফলকে নিয়ে পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করার পর লব্ধ যোগফল) যদি পর্যবেক্ষণ দ্বারা বোঝা যায় যে 23-এর গুণিতক তবে সংখ্যাটি 23 দ্বারা বিভাজ্য হবে।

পাঠক যে কোন সংখ্যা নিয়ে এর যাথার্থ্যতা পরখ করে দেখতে পারেন।

এখন আমরা কনগ্রুয়েন্সি গণিতের (Mathematics of Congruency) সাহায্যে বিভাজ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করবো। এই প্রক্রিয়াটি বিভাজ্যতা নির্ণয়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী উপায়। নিধান 10-এর জ্ঞানই আমাদের একটি সংখ্যাকে বিভিন্ন রকমে লিখতে বা উপস্থাপিত করতে সাহায্য করে। এর ফলে আমরা একটি সংখ্যাকে $10a+b$-এর আকারে লিখতে পারি (এখানে b হলো একক স্থানীয় অঙ্ক ও 'a' হলো বাকি অঙ্কগুলি দিয়ে গঠিত সংখ্যা)। এছাড়া সংখ্যার (integer) কতকগুলি ধর্মের, যেমন, commutativity, associativity ও distributivity প্রভৃতির জন্য '$10a$'-কে ভাঙতে পারি এবং একে পুনরায় ইচ্ছামত অংশে পরিণত করতে পারি। এর ফলে আসল সংখ্যার কোন পরিবর্তন হবে না।

উপরিউক্ত আলোচনাকে কেন্দ্র করে আমরা বিভাজ্যতা নির্ণয়ের কতকগুলি পদ্ধতি পেতে পারি। প্রথমে আমরা $2a+b\equiv 0 \pmod{k}$—এই কনগ্রুয়েন্স নিয়ে আলোচনা শুরু করি। a ও b-এর সংজ্ঞা আগের মতই।

আমরা পাচ্ছি $2a+b\equiv \pmod{K}$

$\therefore\ 2a\equiv -b \pmod{k}$

এখন, সংখ্যাটি হলো $10a+b\equiv -5b+b \pmod{k}$

$\equiv -4b \pmod{k}$

$\equiv 0 \pmod{4}$

সুতরাং কোন সংখ্যা 4 দ্বারা বিভাজ্য হবে

যদি $2a+b\equiv 0 \pmod{4}$ হয়।

অনুরূপ ভাবে $2a+3b\equiv 0 \pmod{l}$

তবে $10a+b\equiv 5(-3b)+b \pmod{l}=-14b \pmod{l}$

$\equiv 0 \pmod{14}$

এটা লক্ষণীয় যে, $(2a+b)$ ও $(2a+3b)$-তে আমরা ভাজক পাচ্ছি যথাক্রমে 4 ও 14। এদের পার্থক্য হলো 10। তাহলে আমরা আশা করতে পারি যে $(2a+5b)$-তে ভাজক হবে $14+10=24$। এইভাবে আমরা নিম্নোক্ত ভাজক-তালিকা (সারণী 1) তৈরি করতে পারি :

সারণী 1

কনগ্রুয়েন্স	2a+b	2a+3b	2a+5b	2a+7b	2a+9b
$10a+b\equiv$ 0 যার modulus হলো	4	14	24	34	44
ভাজক (উপভাজক)	2,4	2,7	2,3,6,12	2,17	4,11

উদাহরণ : একটি সংখ্যা 409054 নেওয়া হলো। এখানে a=40905 এবং b=4। যদি ভাজক 34 হয়, তবে

$2a+7b=81810+28=81838$

পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করে $81838\rightarrow 16366+56\rightarrow 16422$

$\rightarrow 3284+14=3298\rightarrow 658+56=714$

$\rightarrow 142+28=170\rightarrow 34\equiv 0 \pmod{.34}$

$\therefore$ সংখ্যাটি 17 ও 34 দ্বারা বিভাজ্য।

আবার আমরা 2a ও b-এর সংযোগ চিহ্ন পালটে দিয়ে দেখতে পারি $2a-b\equiv 0 \pmod{l}$ কি দেয়।

$2a\equiv b \pmod{l}$

তাহলে $10a+b\equiv 5b+b \pmod{l}=0 \pmod{6}$

এইভাবে আমরা দেখি যে $2a-3b\equiv 0 \pmod{16}$, $2a-5b\equiv 0 \pmod{28}$.........ইত্যাদি হলে সংখ্যাটি 16 ও 26 দ্বারা বিভাজ্য হয়। এর থেকে ভাজকের একটা তালিকা (সারণী 2) তৈরি করা যেতে পারে।

সারণী 2

কনগ্রুয়েন্স	2a–b	2a–3b	2a–5b	2a–7b	2a–9b
$10+b\equiv 0$ যার mod l=	6	16	26	36	46
প্রধান ভাজক (উপভাজক)→	3,2	8	13	9	23

ভাজকের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য আমরা ভাজ্যকে $100a+b$ রূপে লিখব। এখানে b হলো দশক ও একক স্থানীয় অঙ্ক দিয়ে গঠিত সংখ্যা এবং 'a' হলো বাকী অঙ্কগুলি দিয়ে গঠিত সংখ্যা। এখন আমরা যদি $2a+b\equiv 0 \pmod{m}$—এই কনগ্রুয়েন্স পর্যালোচনা করি তবে

$100a+b=50.2a+b\equiv 50(-b)+b \pmod{m}$

$\equiv -496 \pmod{m}\equiv 0 \pmod{49}$

এর থেকে দেখছি যে $2a+b\equiv 0$ (modulus 7 বা 49) সুতরাং সংখ্যাটি 49 দ্বারা বিভাজ্য হবে যদি 2a+b, 49 দ্বারা বিভাজ্য হয়। অনুরূপভাবে $2a+3b\equiv 0$ থেকে পাই modulus 149 ; $2a+5b\equiv 0$ থেকে পাই modulus 249। এর থেকে সারণী 3 তৈরি করতে পারি।

সারণী 3

কনগ্রুয়েন্স	2a+b	2a+3b	2a+5b	2a+7b	2a+9b
$100a+b\equiv 0$ যার mod হলো	49	149	249	349	449
প্রধান ভাজক (উপভাজক)	7,49	149	83,249	349	449

উদাহরণ : সংখ্যা = 78645। ধরা যাক, ভাজক 49

এখানে a=786, b=45, $2a+b=1572+45=1617$

$\rightarrow 32+17=49\equiv 0$ (mod. 49)

সুতরাং সংখ্যাটি 49 দ্বারা বিভাজ্য।

এবার কনগ্রুয়েন্সগুলি যদি $2a-b$, $2a-3b$......... ইত্যাদি নিই, তবে যথাক্রমে 51, 151, 251......ইত্যাদি ভাজকগুলি পাই। এইভাবে কনগ্রুয়েন্স গণিতের সাহায্যে আমরা ছোট সংখ্যা থেকে শুরু করে বড় বড় সংখ্যা দিয়ে বিভাজ্যতা নির্ণয় করতে পারি।

শ্রীমতি পেরেথের রান্নাঘর

রতনলাল ব্রহ্মচারী*

এই রান্নাঘরে ঢুকতে পেরেছি ডঃ সামন্তের কল্যাণে। দেখেই চমকে গেলাম। মনে পড়ল বছর দুই আগেকার কথা।

জিম্বাবোয়ের গভীর অরণ্যে একটি পাহাড়ের ওপর দুটি কুটির, তাতে রয়েছি আমি আর একজন আফ্রিকান। গাছের ডালপালা দিয়ে আগুন জ্বেলে রান্না করছি আমরা আর শুনছি অরণ্যের সান্ধ্য সঙ্গীত,—দুটি সিংহ-সিংহির ডুয়েট (duet), স্পটেড হাইনার (Spotted hyena) ডাক, হাতির বৃংহন। খুবই রোমাঞ্চকর পরিবেশ, কিন্তু অগুন জ্বালাতে না পারলে আমরা না খেয়ে মরতাম। প্যারাফিন তেল না থাকলে কিছুতেই কাঠে আগুন ধরাতে পারতাম না। তখন মনে হয়েছিল আরও বছর দুই আগেকার কথা। বর্ণ ফ্রী সিনেমা-খ্যাত জর্জ এ্যাডামসনের ওখানে রয়েছি। ক্যাম্প থেকে বহু দূরে দু-জন আফ্রিকান সহকারি, একটি নরম গাছের ডাল ভেঙ্গে, বিশেষ কায়দায় ঘষে ঘষে আগুনের ক্ষীণতম স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করল। তার ওপর চাপা দিল হাতির শুকনো মল,—অর্থাৎ শুকনো ঘাস। একটু পরেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল অগ্নিশিখা। মানুষের কত বড় আবিষ্কার!

শ্রীমতি পেরেথ হেসে বললেন "আমাদের মা-ঠাকুমারা দেখে গেছেন কাঠের আগুন, তারপর গ্যাসে রান্না, তারপর বিদ্যুতে। বিজ্ঞানের উন্নতি হচ্ছে, এইবার দেখুন আমার মাইক্রো-ওয়েভের (micro-wave)-এর রান্না!"

শ্রীমতি পেরেথ, তাঁর স্বামী আর দুটি ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে এই পরিবারটি আধুনিক ছিমছাম রান্নাঘরে বিশ্বাসী। তাছাড়া উপায়ও নেই। এই বিদুষী মহিলা নানা ভাষা জানেন। বাড়ীতে বসেই তিনি প্রচুর অনুবাদের কাজ করেন। মাইক্রো-ওয়েভের সাহায্যে তিনি নাকি ছ'ঘণ্টা সময় বাঁচিয়েছেন। স্প্যানিশ (Spanish) ভাষায় লেখা তাঁর দৈনন্দিন রান্নার কাজের বিবরণ এগিয়ে দিলেন।

সকাল সাড়ে ছটায় বাচ্চা মেয়েটি দুধের জন্য চেঁচিয়ে ওঠে। মাইক্রো-ওয়েভ চুল্লীতে এক মিনিটে দুধ গরম হয়ে গেল। সাতটার সময় শ্রীপেরেথের জন্য এক কাপ কফি করা হল, মিনিট দেড়েকে, আর ডিপ ফ্রিজে (deep freeze) মধু ছিল, তিরিশ সেকেণ্ডে সেটা তরল হয়ে গেল। সাড়ে সাতটায় ছেলেটির জন্য কফি তৈরি হল। পরে একসময় মোট দশ মিনিটে রুটি সেঁকে, ডিপ ফ্রিজ থেকে পালংশাক বের করে রান্না করা হল। এভাবে কাজের ফাঁকে, অতি সামান্য সময়ে শ্রীমতি পেরেথ রান্না করে যেতে লাগলেন। সন্ধ্যার দিকে তিনি অনেক অনুবাদ করে ফেলেছেন। একটু বিশ্রাম করে রাতের রান্না। এবার মুরগি রোস্ট হল—চৌদ্দ মিনিট লাগল।

আগামী কাল শ্রীযুক্ত পেরেথ নিজেই রান্না করবেন। ডিপ ফ্রীজে রয়েছে খরগোশ। সেটাকে চুল্লীতে দিয়ে গরম করে তারপর রান্না করতে সময় লাগবে মোট ন' মিনিট।

কি এই চুল্লীর রহস্য?

এর ভেতরে মাইক্রো-ওয়েভ, অর্থাৎ খুব ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বেতার ঢেউ উৎপন্ন হয়। একটা ওয়েভ-গাইডের সাহায্যে এগিয়ে শেষে ওপর থেকে নিচে নেমে ঢেউগুলি এসে খাদ্যবস্তুকে আঘাত করে, কিছু ঢেউ চুল্লীর ধাতব দেয়ালে প্রতিফলিত হয়ে থালার রাখা খাদ্যের ওপর আঘাত হানে। (ধাতব বা এনামেলকরা পাত্রে রান্না করা যাবে না, চীনামাটির বাসন ব্যবহার করতে হবে।) ঢেউগুলি খাদ্যবস্তুর ভিতর 2 সেঃমিঃ গভীরে ঢুকে যায়।

সব খাদ্যদ্রব্যেই কিছু জলের অণু রয়েছে, সাধারণতঃ খাদ্যের 60—95% জল। মাইক্রো-ওয়েভের আঘাতে জলের অণুগুলি সেকেণ্ডে 245 কোটি বার আন্দোলিত হয়। ব্যস এই হল রহস্যের চাবিকাঠি। এর ফলেই তাপ জন্মায় আর তাতেই রান্না হয়।

কাঠ ঘষে আগুন জ্বালাতেও দেখেছি, মাইক্রো-ওয়েভের রান্নাও দেখলাম,—প্রথমে Salisbary (অধুনা Harare) সহরের বিনু প্যাটেলের বাড়ীতে, তারপর এখানে আরও ভাল করে।

স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল, শ্রীমতি পেরেথ মিলিয়ে গেল। ডঃ সামন্তের হাতে স্প্যানিশ ভাষায় লেখা চুল্লী কোম্পানীর বিজ্ঞাপন, তাতেই সব কিছু লেখা রয়েছে, কাল্পনিক পেরেথ পরিবার জীবন্ত হয়ে ওঠে ঐ বিজ্ঞাপন পড়লে। ডঃ সামন্ত একটি চুল্লী এনেছেন তাঁর বাড়ীতে। শ্রীমতি সামন্ত এখন অনেক সময় বাঁচাতে পারেবেন। তিনিও বিদুষী মহিলা, সময়ের মূল্য তাঁরও খুব বেশী।

* ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট, 203, বি. টি. রোড কলিকাতা-700035

চল একটু হাওয়া খেয়ে আসি

আব্দুল হক খন্দকার*

বাইরে—বিশেষ করে মাঠে-ময়দানে কোনো বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে বেড়ানোর কথা বলতে হলে—আমরা অনেক সময়—"চল একটু বেড়িয়ে আসি"—না বলে—"চল একটু হাওয়া খেয়ে আসি"—বলে থাকি। এখানে হাওয়া খাওয়া অর্থে বাইরে একটু ঘুরে বেড়ানোকেই আমরা বুঝে থাকি। কিন্তু সব সময়েই যে সত্যি সত্যি আমরা হাওয়া খাচ্ছি এবং হাওয়া না খেলে আমরা যে কোন ক্রমেই বেশিক্ষণ বাঁচি না—সেকথা কি তোমরা কখনও ভেবে দেখেছো ?

যা হোক, হাওয়া-খাওয়া কথাটা আমরা যে ভাবেই ব্যবহার করি না কেন, এখন এটুকু তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে,—হাওয়া অর্থাৎ বাতাস আমাদের বেঁচে থাকার জন্য কতটা প্রয়োজন। তাছাড়া, কেবল আমরা না, অন্যান্য জীবজন্তু, গাছপালা প্রভৃতির জীবনধারণের জন্যও প্রতিক্ষণ বাতাসের প্রয়োজন। অবশ্য জীবনধারণের জন্য আমরা বাতাসকে ব্যবহার করলেও—আসলে বাতাসের একটি অংশ বা উপাদানকেই আমরা ব্যবহার করে থাকি—যার নাম অক্সিজেন। কিন্তু বাতাসে যে অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি—তা নয়,—আয়তন হিসাবে বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ শতকরা 20·9 বা প্রায় 21 ভাগ। এই অক্সিজেন অভাবে সকল জীবজন্তুর (সামান্য কিছু জীবাণু ছাড়া) জীবনধারণ অসম্ভব। এ বিষয়ে রাজার প্রজার কোনো প্রভেদ নেই। পরিমিত অক্সিজেনের অভাবে রাজ্যের কর্তাব্যক্তির পক্ষে রাজ্য শাসনে যেমন বিঘ্ন ঘটবে—একজন ঝাড়ুদারের পক্ষে রাস্তার ঝাঁট দেয়ার কাজটিও তেমনি অসাধ্য হবে। খাদ্য ও পানীয় অভাবে আমরা কিছুদিন বাঁচতে পারি কিন্তু অক্সিজেনের অভাবে আমরা পাঁচ মিনিটের বেশি বাঁচি না। বাতাস থেকে অক্সিজেনকে যদি সরিয়ে নেয়া যায়, তবে মিনিটখানিকের মধ্যেই ডাঙার সমস্ত জীবজন্তু শ্বাসরোধের জন্য ছটফট করে মাটিতে গড়াগড়ি দেবে এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সকলে মারা পড়বে। জলাভূমি, নদী-নালা, সমুদ্র অসংখ্য মাছ এবং অন্যান্য জলজ জীবের মৃতদেহে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে—কেননা, জলজ জীবের জীবন জলে যেটুকু অক্সিজেন দ্রবীভূত থাকে তারই উপর নির্ভর করে। কাজেই অক্সিজেনের অভাবে পৃথিবীর বুকে কোথাও কোন প্রাণচাঞ্চল্য থাকবে না—সমস্ত পৃথিবী পরিণত হবে এক ঘুমন্ত পুরীতে! অবশ্য উদ্ভিদ জগতে সহসা তেমন কোন বিপর্যয় দেখা দেবে না—কিছুকাল পর্যন্ত তারা বেঁচে থাকবে বটে—তবে শেষ পর্যন্ত তারাও সমূলে ধ্বংস হবে—কেননা, পরিপূর্ণ জীবনধারণের জন্য কিছু পরিমাণ অক্সিজেন উদ্ভিদেরও প্রয়োজন। শুধু ধ্বংস হবে না সামান্য কয়েক জাতের জীবাণু বা ব্যাকটেরিয়া—যাদের জীবনধারণের কৌশল এমনি বিচিত্র যে—অক্সিজেনবিহীন পরিবেশেই তারা স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকতে সক্ষম।

যা হোক, আমাদের জীবনধারণের জন্য বাতাসের অক্সিজেন যদিও অপরিহার্য, তবু অবিমিশ্র অক্সিজেন আমাদের জীবনধারণের জন্য অনুকূল নয়—অধিকন্তু তা মারাত্মক। শুধু মাত্র অক্সিজেনে শ্বাস নিলে দেহের তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং প্রাণীর মৃত্যু ঘটে! বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাণীর জীবনধারণের জন্য যেমন উপযোগী নয়, তেমনি তার পরিমাণের কমতিও জীবনধারণের প্রতিকূল। বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ শতকরা 12 ভাগের কম হলে জীবনের ওপর তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং শতকরা 7 ভাগের কম হলে জীবজন্তু সে বাতাসে শুধুমাত্র স্বল্পকালের জন্য বেঁচে থাকতে পারে। বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ শতকরা 17 ভাগের কম হলে সে বাতাসে মোমবাতি জ্বলে না। অধিকাংশ দহন ক্রিয়া দাহ্যবস্তুর সঙ্গে অক্সিজেনের সংযোগে সংঘটিত হয়—কাজেই শ্বসন-ক্রিয়া এবং অধিকাংশ দহনকার্য চালানোর জন্য বাতাসে পরিমিত পরিমাণ অক্সিজেন থাকা প্রয়োজন। এই পরিমাণের বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটলে জীবজগতে যেমন বিপর্যয় ঘটবে তেমনি জড়জগতেও অনেক কিছুর অন্যথা হতে দেখা যাবে। বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ কম হলে আমাদের প্রয়োজনীয় আগুনকে আমরা আর জ্বালাতে পারবো না। তেল, কয়লা, কাঠ প্রভৃতি দাহ্য পদার্থ পুড়বে না—ফলে বাতি জ্বলবে না, কাঠ, কয়লা বা গ্যাসের চুলোতে রান্নার কাজ চলবে না—রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি, জাহাজ, কলকারখানার যন্ত্রপাতি প্রভৃতিও অচল হয়ে পড়বে। অন্য দিকে বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে—দাহ্যবস্তু সহজেই জ্বলে উঠবে এবং তা তৎক্ষণাৎ দাবানলে পরিণত হবে। আগুনকে আয়ত্তে আনা তখন যেমন কঠিন হবে—তেমনি চারিদিকে অহরহ আগুনের অত্যাচারে জীবন আমাদের অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। চুলোতে কয়লা এমন দাউ দাউ করে জ্বলবে যে—কয়লার নীচের লোহার শিকেও আগুন ধরে যাবে এবং তা গলে গিয়ে জ্বলতে থাকবে!

জীবজন্তুর জীবনপ্রক্রিয়া ধরতে গেলে একপ্রকার দহন ক্রিয়া—তবে অন্যান্য দহনক্রিয়ার মত তা তত উগ্র নয়—অত্যন্ত মৃদু। এরূপ দহনক্রিয়ায় আগুন জ্বলে না,—তবে তাপ উৎপন্ন হয়। আমাদের দেহের ভিতরে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের মৃদু দহন অক্সিজেনের সাহায্যেই ঘটে থাকে। এই অক্সিজেন আমাদের নিঃশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং ফুসফুসের পাতলা পর্দার মধ্য দিয়ে রক্তের সংস্রবে আসে। রক্তের লোহিত কণিকায় একপ্রকার পদার্থ থাকে,—যাকে বলা হয়

---

* 370, আউটার সারকুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা—17, বাংলাদেশ

হিমোগ্লোবিন। এই হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে অক্সিজেনের একপ্রকার অস্থায়ী সংযোগ ঘটে—যার ফলে ঐ অক্সিজেন রক্তধারার সঙ্গে শরীরের সর্বত্র পরিচালিত হয় এবং দৈহিক দহন কাজে অংশ-গ্রহণ করে শক্তি (তাপ) উৎপন্ন করে আর এ শক্তি লাভের জন্যই আমরা সকল প্রকার কাজ,—দৈহিক ও মানসিক—সম্পন্ন করতে পারি। তাই বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে এই দৈহিক দহনক্রিয়া আর মৃদু থাকবে না। দ্রুত তালে চলতে থাকবে—উৎপন্ন হবে অত্যধিক তাপ—যার ফলে জীবজন্তুর জীবনধারণ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে। কাজেই দেখা যায়, বাতাসে অক্সিজেনের বাড়তি বা কমতি—উভয়ই প্রাণীর পক্ষে বিপজ্জনক।

অতএব বাতাসে যে পরিমিত পরিমাণ অক্সিজেন থাকে, তাই নানাদিক থেকে আমাদের উপযোগী এবং এই পরিমাণের মাত্রা যাতে ঠিক থাকে, সেজন্য প্রকৃতিতে তার ব্যবস্থা রয়েছে। জীবনধারণের জন্য জীবজন্তু বাতাসের অক্সিজেন গ্রহণ করে—কার্বন ডাই-অক্সাইড ছেড়ে দেয়—আর উদ্ভিদ এই কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে অক্সিজেনকে মুক্ত করে। প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের মধ্যে এভাবে মোটামুটি সমতা বিধানের এক বন্দোবস্ত রয়েছে বলে—বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ অনেকটা ঠিক থাকে। এ থেকে দেখা যায় যে প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে এবং এজন্য পৃথিবীতে উদ্ভিদের পরিমাণও পরিমিত থাকা প্রয়োজন। বেশী বেশী গাছপালা কেটে ধ্বংস করা তাই কখনও উচিত নয়—কেন না, এতে বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাবে,—ফলে, আমাদের এবং অন্যান্য জীবজন্তুর জীবনে ঘটবে বিপর্যয়।

পৃথিবীতে মৌলসমূহের মধ্যে অক্সিজেনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী। বাতাসের সূত্রে এটি শুধু যে আমাদের চারপাশ বেষ্টন করে আছে তা নয়—ভূপৃষ্ঠের উপাদানসমূহের মধ্যেও এটি সংযুক্ত হয়ে বিরাজ করছে। পুরানো পাথরের (সিলিকেট জাতীয়) মধ্যে অক্সিজেনের পরিমাণ 45 থেকে 48 ভাগ। অন্যান্য পাথর—যেমন চুনাপাথর, খড়িমাটি, মার্বেল প্রভৃতির মধ্যে অক্সিজেনের পরিমাণ আরো বেশী—শতকরা 48 থেকে 52 ভাগ। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে,—শক্ত পাথরে গঠিত আকাশ ছোঁয়া পর্বতগুলির ওজনের প্রায় অর্ধেকটাই হলো বায়বীয় অক্সিজেন। শুধু তাই নয়, জলের মধ্যে এই পরিমাণ আরো অনেক বেশী, ওজনের হিসাবে জলের শতকরা 88 ভাগেরও বেশী হলো অক্সিজেন। তবে বায়ুমণ্ডলই হলো মুক্ত অক্সিজেনের আধার এবং সেখান থেকে জড় ও জীবের সঙ্গে তার যেমন মিলন ঘটছে—তেমনি নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা আবার মুক্ত হয়ে বাতাসের বুকে বিলীন হচ্ছে!

পূর্বেই বলেছি যে, বেশীর ভাগ দহনক্রিয়ায় অক্সিজেন প্রয়োজন। কয়লা, তেল প্রভৃতি জ্বালানি অক্সিজেনের সঙ্গে রাসায়নিক সংযোগে জ্বলে থাকে। কেবল কয়লা বা তেল নয়—সকল প্রকার উদ্ভিদ ও প্রাণীর দৈহিক অংশ অক্সিজেনের সঙ্গে রাসায়নিক সংযোগে জ্বলতে পারে এবং এই দহনক্রিয়ায় সকল ক্ষেত্রে যা সৃষ্টি হয়—তা হলো—কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং জল। সকল প্রকার জ্বালানির দহনপ্রক্রিয়াটি তাই দেখা যায়, একই। বস্তুর মধ্যকার কার্বন এবং হাইড্রোজেন অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হয়ে যথাক্রমে উৎপন্ন করে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং জল। জ্বালানি বা দাহ্য বস্তুকে যদি অক্সিজেনের সঙ্গে খুব ভালভাবে মিশিয়ে তাতে আগুন ধরানো যায় তবে খুব দ্রুত দহন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় বলে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং বাষ্প স্বল্প সময়ে যেমন সৃষ্টি হয় তেমনি তা দহনক্রিয়ার উত্তাপে প্রসারিত হয়,—ফলে, এরূপ দহনক্রিয়ায় বিস্ফোরণ ঘটে। এজন্য ময়দা, কয়লা প্রভৃতি দাহ্য পদার্থের গুঁড়ো যদি বাতাসে ভাসমান অবস্থায় থাকে এবং কোন আগুনের শিখার সংস্পর্শে আসে তবে এই ধরণের বিস্ফোরণ ঘটে। পেট্রোল এবং অক্সিজেনের মুহূর্তকালের দহনক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে মোটর গাড়ী চলে থাকে। অনেক উঁচুতে অক্সিজেনের পরিমাণ অল্প থাকে বলে উড়োজাহাজ যখন খুব উঁচুতে ওঠে তখন আলাদা ভাবে অক্সিজেন ইঞ্জিনে প্রবেশ করানোর প্রয়োজন পড়ে। জেট ইঞ্জিনের সম্মুখভাগে বাতাসকে টেনে নিয়ে জ্বালানির সঙ্গে মিশিয়ে জ্বালানো হয়। এই জ্বলনের ফলে প্রচুর পরিমাণে যে প্রসারিত গ্যাস প্রস্তুত হয় তাকেই পেছনের দিকে বেগে নিঃসৃত করানো হয়। পেছনের দিকে এমনি ভাবে গ্যাস নিঃসরণের ফলে জেট বিমান সামনে এগিয়ে চলে। রকেটকে তার প্রয়োজনের অক্সিজেনকে সঙ্গেই নিতে হয়—কেন না, অক্সিজেন বিহীন মহাশূন্যের বুকে তাকে পাড়ি দিতে হয়। বারুদে কার্বন, গন্ধক এবং সোরা বা পটাসিয়াম নাইট্রেট মিশ্রিত থাকে। বারুদে যা জ্বলে তা হলো কার্বন এবং গন্ধক—আর এদের প্রজ্বলনের জন্য যে অক্সিজেন প্রয়োজন হয় তা সরবরাহ করে ঐ পটাসিয়াম নাইট্রেট। কাঠকয়লা, কাঠের গুঁড়ো, ঝুল এবং অন্যান্য কার্বনজনিত দ্রব্য যদি দহনক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পায় তবে সেগুলি একই সঙ্গে বিস্ফোরিত ও প্রজ্বলিত হয়। এই প্রক্রিয়াটির ওপর নির্ভর করে কার্বনের গুঁড়ো এবং তরল অক্সিজেন (যান্ত্রিক কৌশলে বাতাসকেও তরল করা যায় এবং এই তরল বাতাস থেকে তরল অক্সিজেন পৃথক করা হয়) মিশিয়ে এক প্রকার কার্তুজ তৈরি করা যায়—যা খনির খনন কিংবা সুড়ঙ্গ তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। এ সকল কার্তুজ বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গের সাহায্যে বিস্ফোরিত করা হয়। এগুলি ব্যবহারের সুবিধা হলো কোনো কারণে তারা বিস্ফোরিত না হলে বিপদের কোনো কারণ থাকে না—কেননা, তরল অক্সিজেন উড়ে গেলে সে কার্তুজে কেবল গুঁড়ো কার্বনই অবশিষ্ট থাকে।

অক্সিজেনের যত প্রকার ব্যবহার রয়েছে—তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার হলো—সকল প্রকার জীবের (দু-এক জাতের জীবাণু ছাড়া) জীবনধারণের জন্য প্রতিক্ষণেই তার প্রয়োজন। ভূপৃষ্ঠের

কাছাকাছি বাতাসে যে পরিমাণ অক্সিজেন রয়েছে, উঁচু পাহাড়ের ওপর তা অনেক কম। কাজেই ভূপৃষ্ঠে আমাদের প্রয়োজনের জন্য যে পরিমাণ অক্সিজেন আমরা গ্রহণ করি, পাহাড়ের ওপর সেই পরিমাণ অক্সিজেন গ্রহণ করতে হলে আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ অনেক দ্রুত চালাতে হবে। ফলে, অল্পক্ষণেই আসবে আমাদের ক্লান্তি। তা ছাড়া, পরিমিত অক্সিজেনের অভাবে মাথা ধরে, বমি বমি ভাব আসে, হাতমুখ নীল হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যু ঘটতে পারে। এজন্য পর্বতারোহীদের এবং অধিক উঁচুতে বিমান চালকদের সঙ্গে অক্সিজেন সরবরাহ-কারী এক প্রকার যন্ত্র থাকে,—যাতে করে তাঁরা অক্সিজেন গ্রহণ করে শ্বাসকষ্ট লাঘব করতে পারেন। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের শ্বাসকষ্ট লাঘবের জন্যও এরূপ যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। তাছাড় ডুবো জাহাজে, জলের নীচে ডুবুরীদের, রোগীর শ্বাসকষ্টের সময় শ্বাসকার্য পরিচালনার জন্য কৃত্রিম উপায়ে অক্সিজেন সরবরাহ করা হয়।

হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিশ্রণ একটি সরু নলের মুখে জ্বালিয়ে দিলে অতি উত্তপ্ত (2800 ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড) শিখার সৃষ্টি হয়। একে "অক্সি-হাইড্রোজেন" শিখা বলে। অ্যাসিটিলিন গ্যাসের সঙ্গে অক্সিজেন মিশিয়ে এর চেয়েও উত্তপ্ত শিখার (3100—3315 ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড) সৃষ্টি করা যায়—যার নাম "অক্সি-অ্যাসিটিলিন" শিখা। এসকল উত্তপ্ত শিখা দিয়ে ধাতুর পাত কাটা কিংবা জোড়া দেয়া হয়ে থাকে। ধাতুর পাত পরিষ্কার করার কাজেও এসকল শিখার ব্যবহার দেখা যায়। অক্সি-অ্যাসিটিলিন শিখা ইস্পাতের গায়ে ধরলে ওপরের ময়লার আবরণ স্ফুলিঙ্গাকারে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে খুব সুন্দর পরিষ্কার হয়। এরূপ পরিষ্কৃত ইস্পাত রঙ লাগানোর জন্য খুবই উপযোগী এবং সে রঙ বেশ টেকসই হয়। ধাতুর গায়ে প্লাস্টিকের প্রলেপ দেয়ার কাজেও অক্সি-অ্যাসিটিলিন শিখা ব্যবহৃত হয়। প্লাস্টিকের গুঁড়ো শিখার মধ্যে দিলে তা তৎক্ষণাৎ গলে গিয়ে ধাতুর গায়ে লেগে যায়। কোনো কোনো ধাতু নিষ্কাশনের কাজেও অক্সিজেন ব্যবহৃত হয়। লোহা তৈরির জন্য যে ব্লাস্ট ফার্নেস ব্যবহৃত হয় তার উচ্চতা প্রায় 100 ফুট হয়ে থাকে। ধাতু নিষ্কাশনের জন্য ব্লাস্ট ফার্নেসে বাতাস প্রবেশ করানোর প্রয়োজন হয়, কিন্তু এই বাতাসের পরিবর্তে যদি অক্সিজেন ব্যবহার করা যায়—তবে এসকল ব্লাস্ট ফার্নেসের অত্যধিক উচ্চতা অনেক পরিমাণে কমানো যায়,—ফলে এদের রক্ষণাবেক্ষণ যেমন সহজতর হয়, তেমনি খরচও কম পড়ে। নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য তৈরির কাজেও প্রচুর অক্সিজেন প্রয়োজন হয়—যাদের মধ্যে নাইট্রিক অ্যাসিড এবং সালফিউরিক অ্যাসিড উল্লেখযোগ্য। নাইট্রিক অ্যাসিড প্রধানতঃ জমির সার এবং বিস্ফোরক দ্রব্য তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। প্রথমটি খাদ্যশস্য ও অন্যান্য ফসল উৎপাদনে সাহায্য করে এবং দ্বিতীয়টি দেশ রক্ষা, খনি খনন ও রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য দরকার হয়। কাজেই আমাদের খাদ্যশস্যের ফলন ও প্রতিরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ও অক্সিজেনের ওপর নির্ভরশীল। সালফিউরিক অ্যাসিড একটি অতি প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য। এমন শিল্প খুব কমই আছে, যেখানে সালফিউরিক অ্যাসিডের ব্যবহার নেই। শিল্পের ওপরেই দেশের সমৃদ্ধি নির্ভর করে। কাজেই যে দেশ শিল্পে যতটা সমৃদ্ধ—সে দেশ ততটা উন্নত—ততটা সভ্য। যেহেতু প্রায় প্রত্যেক শিল্পেই সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহৃত হয়—সেজন্য বলা যায় যেদেশ যত সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহার করে সেদেশ তত উন্নত, তত সভ্য এবং এজন্য অনেক সময় কোনো দেশের সভ্যতার পরিমাপ তার সালফিউরিক অ্যাসিডের ব্যবহারের মাপকাঠিতে নির্ধারিত হয়ে থাকে।

কাজেই দেখা যায়, কি জীবনধারণে, কী জীবন সংরক্ষণে, অক্সিজেন যেমন প্রয়োজন—তেমনি আমাদের দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা—এমনকি আমাদের সভ্যতাও অক্সিজেনের বিশেষ ব্যবহারের ওপর নির্ভরশীল।

বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞান পরিষদের সভ্যদিগকে অনুরোধ করা যাচ্ছে—তাঁরা যেন তাঁদের 1985 খৃস্টাব্দের বার্ষিক সভ্য চাঁদা 25·00 টাকা 20.2.85 তারিখের মধ্যে পরিষদ কার্যালয়ে জমা দেন।

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

স্যামন মাছ

নারায়ণ চক্রবর্তী*

সমুদ্রচারী মা—স্যামন (Salmon) মাছেরা নদীতে এসে ডিম পাড়ে, ঐ ডিম থেকেই নতুন স্যামনদের জীবনের শুরু। ডিমগুলো ছোট্ট লাল লাল বলের মতো দেখতে। ইউরোপের, বিশেষ করে ইংলণ্ডের উত্তর দিকের খরস্রোতা নদীগুলোর নুড়ি-কাদামাটি-বিছানো তলদেশে নুড়ি আর মাটি চাপা অবস্থায় থাকে ঐ ডিমগুলো। সে জায়গাটা বেশ অন্ধকার। ডিম ফুটে যখন বাচ্চা স্যামন মাছেরা বেরিয়ে আসে, তখনও তারা অনেকদিন ধরে সেই নদীর অন্ধকার তলদেশেই থাকে। এই সময়ে স্যামন-শিশুরা শরীর-সংলগ্ন ডিমের নরম খোলসটা

স্যামন মাছ

ত্যাগ করে। সাধারণতঃ স্যামন মাছেরা আট থেকে নয় বছর বাঁচে, তবে ততদিন বেঁচে থাকার সুযোগ বেশির ভাগ স্যামনই পায় না, কারণ তাদের তো শত্রুর অভাব নেই। শত্রু আছে সমুদ্রে, শত্রু আছে নদীতেও। ওদের সব চেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে মানুষ। ইউরোপের এবং উত্তর আমেরিকার জেলেরা শয়ে শয়ে স্যামন মাছ ধরে নদীতে নাইলনের জাল ফেলে। তাই এদের ঐ বাচ্চা বয়েসটাই সবচেয়ে নিরাপদ।

ডিমের নরম খোলস থেকে বেরিয়ে আসবার পরেই বাচ্চা স্যামনরা নদীগর্ভের নুড়ির তলা থেকে বেরিয়ে আসে, আর তখন থেকেই শুরু হয়ে যায় বেঁচে থাকার জন্য তীব্র লড়াই। তখন স্যামন শিশুরা লম্বায় এক ইঞ্চিরও কম। বাচ্চা স্যামনরাও খেতে দারুণ-স্বাদু বলে ইল মাছ, পাতিহাঁস আর ঐ বাচ্চাদের চেয়ে আকারে বড় বড় মাছেরা ধরে ধরে খায় স্যামন-শিশুদের। তাই ডিমের খোলস ত্যাগ করে বাইরে নদীর জলে বেরিয়ে আসবার কয়েক দিনের ভেতরেই বাচ্চা স্যামনদের শত শত ভাই-বোনেরা শত্রুর ভক্ষ্য হয়ে অকালেই জীবনলীলা শেষ করে।

অবশ্য বাচ্চা স্যামনরাও নেহাৎ কম যায় না, ওরাও ওদের চেয়ে ছোট ছোট বাচ্চা মাছ ধরে ধরে খায় বেঁচে থাকবার জন্য। এইভাবে পুষ্টিকর খাবার খেয়ে খেয়ে বাচ্চা স্যামনরা ওদের সমসাময়িক বাচ্চা বাচ্চা অন্যান্য মাছ কিংবা বাচ্চা ট্রাউট মাছ থেকেও তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ওঠে। দুই বছরে শিশু স্যামনদের ওজন হয় মাত্র কয়েক আউন্স, তখন ওরা লম্বায় মাত্র কয়েক ইঞ্চি।

তারপর একদিন ওরা সমুদ্রের ডাক শুনতে পায়। এ ডাক যেন জন্ম-জন্মান্তর ধরে ওদের রক্তের সঙ্গে মিশে আছে, এ ডাক উপেক্ষা করবার শক্তি কোন স্যামন-শিশুরই নেই।

তখন স্যামন শিশুরা দলে দলে, ঝাঁকে ঝাঁকে নদীর স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে নদীর মোহানার দিকে নামতে থাকে হাজারে হাজারে, লাখে লাখে। সমুদ্রের এই ডাক যেন পুরুষ পরম্পরাগত ভাবে ওদের রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। নদীর স্রোতে নিচের দিকে নেমে যাবার সময়ে স্যামন-শিশুদের মাথা থাকে কিন্তু নদী-স্রোতের বিপরীত দিকে, যেন ওরা জন্মের জায়গাটি ছেড়ে যেতে চায় না, তবু কিন্তু যেতেই হয়। নদীর স্রোতে নিচে নামতে নামতে মোহানার কাছে যাবার সময়েও কতই না বাধা-বিঘ্ন—আছে নদীর জলের ঘূর্ণি-স্রোত, আছে ছোট বড় জলপ্রপাত। এইভাবে ওরা শত শত মাইল জলপথ অতিক্রম করে মোহানার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে সব বাধা-বিপদকে তুচ্ছ করে।

মোহানার কাছাকাছি নদী-স্রোতের তীব্রতা কমে যায়, নদী চওড়া হয়, নদীর মিষ্টি জলের সঙ্গে সমুদ্রের লোনা জল এসে মেশে। তখন স্যামনরা সমুদ্রের দিকে মাথা ঘোরায়, আর সেই থেকে তাদের দেখাই যায় না। সেই সময়ে যে ওরা কোথায় যায় তা কেউ জানে না।

তবে, সমুদ্রে যদি স্যামনরা অন্য জলচর প্রাণীর পেটে না যায়, তা হলে আবার ওরা বড় হবার পর নদীর দিকে যাত্রা করে। সমুদ্রে বড় হতে ওদের সময় লাগে পাঁচ থেকে ছয় বছর। একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, যে নদীতে ডিম ফুটে শিশু স্যামন প্রথম পৃথিবীর মুখ দেখেছিল, বড় হবার পরেও সমুদ্র থেকে ঠিক সেই নদীতেই ফিরে আসে। কী করে যে এতগুলি বছর পরে সেই সঠিক নদীটিকে চিনে নেয়, সে এক রহস্য।

সমুদ্রে থাকবার সময়ে স্যামনদের আকৃতির বিপুল পরিবর্তন হয়। যখন সমুদ্রে এসেছিল তখন তারা ছিল সার্ডিন মাছের মতো ছোট্টটি। কিন্তু মাত্র এক বছর সমুদ্রে থাকবার পরেই তারা

* MF/18, সিমুলগ্রাম, পোঃ কুলটি, বর্ধমান-713343

লম্বায় হয় আঠারো ইঞ্চি, আর তখন তাদের ওজন হয় আট পাউণ্ড। সমুদ্রে যদি ওরা আরও বেশি দিন থাকতে পারে, তাহলে ওদের ওজন হবে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পাউণ্ড। তখন স্যামনরা হবে বিরাট শক্তিমান, সুন্দর আকৃতির এক রূপালি মাছ!

এই বিপুল শক্তি ওদের তখনই বিশেষ কাজে লাগে, যখন ওরা নদী অভিমুখে যাত্রা করে। স্যামনদের যাত্রাপথে ওৎ পেতে থাকে বহু নতুন শত্রু, তাদের মোকাবিলা করা চাই তো? নদীর স্রোতের বিপরীত দিকে সাঁতার কাটবার সময়ে স্যামনদের প্রধান শত্রু হচ্ছে ভোঁদড়, তারা যেন স্যামন মাছ খাবার জন্যই ওৎ পেতে থাকে।

তবে স্যামনদের সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে মানুষ, সেখানে স্যামনদের গায়ের জোর একেবারেই খাটে না। নদীতে নৌকা করে জেলেরা শক্ত নাইলনের জাল পেতে ধরে ওদের। তাছাড়া হ্রদ বা পুকুরে ছিপ ফেলে ওদের ধরে মৎস্যশিকারীরা। তবু যে ওরা বিরামবিহীনভাবে নদীর উজানে যেতেই থাকে, তার একমাত্র কারণ এই যে মিষ্টি জলে ছাড়া আর কোথাও ডিম পাড়তে পারে না মা-স্যামন মাছেরা।

স্যামনরা ঝাঁকে ঝাঁকে ক্রমাগত, ক্লান্তিহীন ভাবে সাঁতার কেটে নদীর উজানে যেতে থাকে, দিনে ওরা তিন থেকে দশ মাইল জলপথ অতিক্রম করে। সাঁতার কাটবার সময়ে স্যামনরা ঝাঁক বেঁধে চলে। বিশাল সেই সব ঝাঁক, এত বড় যে নদীর জল একেবারে মাছে মাছে ছয়লাপ হয়ে যায়। দীর্ঘ যাত্রা পথে ওরা খাবার জন্যও থামে না। তবে গায়ে ওদের ঐ অসীম শক্তি আছে বলেই ওরা খরস্রোতা নদীর উজানে বহু দূর পর্যন্ত দিব্যি এগিয়ে যায়, দশ ফুট উঁচু জলপ্রপাতও ওরা এক লাফে পার হয়ে যায়। এই সময়ে স্যামনরা অতীব সুস্বাদু হয় খেতে। পাশ্চাত্য দেশের রান্না ঘরে, হোটেল-রেস্তোরাঁয় এই স্যামনদের দারুণ চাহিদা, অনেকটা প্রাচ্যদেশের মানুষের কাছে ইলিশ মাছের মতোই। স্যামন, ইল, ইলিশ মাছ আধা-সামুদ্রিক ও আধা মিষ্টি জলের মাছ। সব মাছেরই পর্ব বা ফাইলাম করডাটা—ফিশ।

নদীর উজানে অনেক উপরে গিয়ে স্যামনরা নিজেদের জন্মস্থান সেই নদীর কাদা-বালি-নুড়ি বিছানো তলদেশ দেখতে পায়! সেখানে স্যামন মাছের স্বামী-স্ত্রীরা আলাদা আলাদা জোড়া বাঁধে, সংসার পাতে। মেয়ে-স্যামন সাঁতার কেটে একেবারে নদীর তলায় চলে যায়। চিৎ হয়ে লেজ দিয়ে বালি-মাটি-নুড়ি খোঁড়ে, অনেকগুলো বারো থেকে আঠারো ইঞ্চি গভীর গর্ত খোঁড়ে। সেখানেই মেয়ে স্যামনরা প্রতি ক্ষেপে বারোটি করে ডিম পাড়তে থাকে। এইভাবে বারে বারে পাঁচদিন ধরে ডিম পাড়ে। ঐ পাঁচদিনে এক একটি মেয়ে স্যামন প্রায় কুড়ি হাজার ডিম পাড়ে। পুরুষ-স্যামনটি ক্ষেপে ক্ষেপে ডুব দিয়ে ডিমগুলি নিষিক্ত করে, তারপর মেয়ে-স্যামনটিও ক্ষেপে ক্ষেপে ডুব দিয়ে নুড়ি কাদা-বালি দিয়ে নিষিক্ত ডিমগুলি ঢেকে দেয়। অবশ্য মাত্র একটা গর্তে অত ডিম আঁটে না, তাই মা-স্যামনকে বারে বারে গর্ত খুঁড়তে হয় নদীর তলায়।

বংশবিস্তারের কাজ শেষ হলে মা-স্যামন আর বাবা-স্যামন উভয়েই বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে। যেটুকু শক্তি অবশিষ্ট আছে তারই সাহায্যে তারা তখন নদীর স্রোতের অনুকূলে সমুদ্রের দিকে যাত্রা করে। সমুদ্রে পৌঁছেই আবার তারা শক্তি ফিরে পায়। আবার ডিম পাড়ার সময় হলে তারা ঝাঁকে ঝাঁকে আগের মতোই নদীর দিকে যাত্রা করে। ততদিনে অবশ্য তাদের ছানা-পোনারা একটু বড় হয়েছে।

ওপরে যে সব তথ্য দেওয়া হল তা মৎস্য-বিজ্ঞানীরা বহু যত্নে, বহু পর্যবেক্ষণ করে পেয়েছেন। তবু স্যামনদের বিচিত্র জীবনে এমন অনেক রহস্য আছে যার মর্মোদ্ধার করতে পারেন নি বিজ্ঞানীরা। সেই সব রহস্যের প্রথমটি হচ্ছে এই যে, যে কয় বছর স্যামন মাছেরা সমুদ্রে ছিল, তখন তারা সমুদ্রের কোথায় কোন্ অঞ্চলে ছিল এবং সেই সুদীর্ঘ সময়ে তারা কী করছিল? সেই সময়ের জীবনযাত্রা তাদের কেমন থাকে? স্যামন-শিশুরা নদীর মোহানা থেকে সমুদ্রে পড়বার পরমুহূর্তে ভোজবাজীর মতো কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়? শত চেষ্টা করেও তো বিজ্ঞানীরা তাদের ঝাঁক দেখতে পান না? দেখতে পান শুধু পাঁচ ছয় বছর পরে,—যখন স্যামন যুবক-যুবতীরা সমুদ্র থেকে উঠে এসে নদীর মোহানা দিয়ে রূপালি ঝিলিক তুলে নদীর উজানে এগিয়ে যেতে থাকে।

বিশ্বের বিজ্ঞানীরা এই রহস্যের সামনে এসে বিমূঢ়, হতবাক। কারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে সাত-সমুদ্র তাঁদের নখ-দর্পণে, তা সে সমুদ্রের গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন তলদেশই হোক, অথবা তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ সাগর-বক্ষই হোক। সর্বত্র তাঁদের সন্ধানী দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়েছে। তবু তাঁরা সমুদ্রচারী স্যামন মাছদের দেখতে পান না। হাজার হাজার আধুনিক সাজসরঞ্জাম সমন্বিত মাছ ধরার জাহাজ সমুদ্র থেকে কতো রকমেরই না টন টন মাছ ধরছে, কিন্তু তাদের জালেও স্যামন মাছ কদাচিৎ ধরা পড়ে।

দ্বিতীয় রহস্য হচ্ছে এই যে, সমুদ্রে থাকবার সময়ে স্যামনরা নিশ্চয়ই প্রচুর খাবার খায়। খেয়ে খেয়েই না তারা আড়ে ও দীঘে বিরাট আকারের হয়ে পড়ে। ওদের রঙও বদলে হয়ে যায় রূপালি। কিন্তু কী খায় তারা? সে সব খাদ্য কোথায়ই বা পায় তারা?

তৃতীয় রহস্যটিই বিজ্ঞানীদের সবচেয়ে বেশি ভাবিয়ে তুলেছে। গভীর সীমাহীন সমুদ্রের শত শত, হাজার হাজার মাইল জলপথ পাড়ি দিয়েও ওদের জন্মস্থান সেই নদীর মোহানাটিতেই এসে কি করে হাজির হয়? কি করে সোজা চলে যায় সেই নুড়ি কাদা বালি বিছানো নদীগর্ভে?

এইসব রহস্যের জবাব কারুর জানা নেই। তবে অনেক মৎস্য-বিজ্ঞানী অনুমান করেন যে অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের স্যামনরা ঝাঁকে ঝাঁকে চলে যায় উত্তর মেরুর ভাসমান বরফের নিচে। সেখানেই নিশ্চিন্তে নিরাপদে দুই থেকে পাঁচটি বছর কাটিয়ে দেয় ওরা। সেখানে ভাসমান তুষার স্তরের নিচে থেকে ওরা জলচর অন্যান্য প্রাণী আর সামুদ্রিক শ্যাওলা ইত্যাদি খেয়ে মোটা-তাজা এবং বড় হয়ে ওঠে। ইউরোপের নদীগুলো এবং উত্তর আমেরিকার নদীগুলো থেকে নেমে আসা স্যামনরাও ইংলণ্ডের স্যামন ঝাঁকের সঙ্গে মিশে গিয়ে চলে যায় উত্তর-মেরুর ভাসমান তুষার স্তরের তলায়। সেখানে তারা প্রচুর খাবার পায়। এই খাবার খেয়েই লাখে লাখে শিশু স্যামনরা বড় হয়ে ওঠে। এ জন্যই তাদের অন্যত্র সমুদ্র-জলে দেখা যায় না। তা ছাড়া উত্তর-মেরুর ভাসমান তুষার স্তরের নিচে স্যামনদের সাধারণ শত্রুর সংখ্যাও অনেক কম। আর একথা ঠিক যে উত্তর-মেরুর ঐ ভাসমান তুষার-স্তরের নিচে আছে নানান জাতের চিংড়ি, বাগদা চিংড়ি, গলদা চিংড়ি ইত্যাদি। বরফের পুরু আচ্ছাদনের নিচে নিরাপদে থেকে স্যামনরা ঐ পুষ্টিকর চিংড়ি খায়। চিংড়িরা কিন্তু মাছ নয়। ওদের পর্ব বা ফাইলাম আরথ্রোপডা; শ্রেণী ক্রাস্টেশিয়া।

তবে কি করে স্যামনরা বড় হয়ে নিজ গৃহে, অর্থাৎ জন্ম-নদীতে ফিরে আসে সে সম্পর্কে কিন্তু বিজ্ঞানীরা আজ পর্যন্ত কোনো অনুমানও করতে পারেন নি। এই আপন ঘরে ফেরার সহজাত প্রবৃত্তি অন্য আরও কিছু মাছেরও আছে, আছে বেশ-কিছু পরিযায়ী পাখিদেরও।

এই রহস্যকে প্রকৃতি এমন ভাবে ঢেকেঢুকে রেখেছে যে যে কোনো বিজ্ঞানীই এই রহস্য ভেদ করতে পারেন নি।

এক পেয়ালা কফি

স্বপন দাস*

শীতের সকালে এক পেয়ালা কফির সঙ্গে খবরের কাগজের যোগাযোগ কি মধুর আবেশ সৃষ্টি করে তা বোধ করি বোঝানোর দরকার নেই। শরীর-মনকে চাঙ্গা করার ব্যাপারে কফি সত্যিই আদর্শ পানীয়। জনপ্রিয় পানীয় হিসাবে সারা ব্রিটেনে যদিও এর কদর খুবই বেশী তবুও পৃথিবীর অন্যান্য অংশে চা-র পরই এর স্থান।

এই যে কফির গুঁড়ো আমরা দেখতে পাই, এগুলি কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট কোন গুঁড়ো পদার্থ নয় বরং কফি হল এক ধরণের বৃক্ষজাত ফলবীচির চূর্ণ বিশেষ।

ইতিহাসের বিচারে কফির প্রথম প্রচলন হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আরবদেশে। সেখান থেকে এর ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপ ও আমেরিকায় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে।

সারা বিশ্বে বিভিন্ন ধরণের কফি গাছ পাওয়া যায়, তবে আরবদেশীয় কফিগাছেরই সমাদর বেশী। বস্তুতঃ এ প্রজাতির গাছগুলিই বিশ্বে কফির চাহিদা বহুলাংশে পূরণ করে। জেনে রাখা ভাল এ আরবদেশীয় কফি গাছের ল্যাটিন নাম কফি আরবিকা (Coffea arabica). এ গাছগুলির পাতা চওড়া, ঢেউ খেলানো ও সামনের দিকটা ছুঁচলো। পাতার রং চিরসবুজ। লম্বায় গাছগুলি তিরিশ ফুট বা তার চেয়েও বেশী হতে পারে তবে ফল সংগ্রহের সুবিধের জন্যে গাছগুলিকে কখনোই দশ ফুটের বেশী বাড়তে দেওয়া হয় না। কফি সাধারণতঃ গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। ব্রেজিল সর্বাধিক কফি উৎপাদনকারী দেশ। সময়কালে কফিগাছে সুগন্ধিযুক্ত ছোট ছোট সাদা ফুল ধরে ও ফল বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে ফলগুলি ঝরে পড়ে, এ ধরণের প্রক্রিয়া চলে বছরে আটমাস ধরে! একটি গাছ থেকে গড়ে প্রতিবছর সাড়ে তিন কিলোগ্রাম কফি পাওয়া যায়। এ গাছ চল্লিশ বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে।

কফিফল পাকলে সুদৃশ্য চেরিফলের মত লাল টুকটুকে হয়। এ ফলগুলিকে বলে বেরি। এই বেরির লাল চামড়ার নীচে থাকে দুটি বীচি। বীচির উপরের তেলতেলে পর্দা ছাড়িয়ে ভালভাবে পরিষ্কার করে রোদে 10—15 দিন ধরে শুকোতে দেওয়া হয়। শুকনো বীচিগুলিকে পরে ঝল্‌সে নিয়ে গুঁড়োগুঁড়ো করা হয়, তখনই আমরা বিশেষ সুগন্ধিযুক্ত কফি গুঁড়ো পাই।

অনেকে আবার ব্ল্যাক কফির ভক্ত। এগুলি আর কিছুই নয়, শুধু বীচিগুলিকে আরও কিছুক্ষণ ধরে ঝলসালে কফি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে ও তীব্র গন্ধযুক্ত হয়। ইদানীং কালে তাৎক্ষণিক কফির (instant coffee) প্রচলন হয়েছে। তরল কফিকে বিশেষ পদ্ধতিতে পাউডারের রূপ দিলে এ ধরণের কফি প্রস্তুত হয়। এ পদ্ধতির একটি হচ্ছে 'ফ্রিজ-ড্রাইং' পদ্ধতি। এখানে পূর্বে 'তৈরী তরল কফি'কে হিমায়িত করে একটি প্রকোষ্ঠে (vacuum chamber) রাখা হয়। অতঃপর তাপ প্রয়োগে হিমায়িত কফির গলনোদ্ভূত জলে সরাসরি বাষ্পে পরিণত হয় ও পাউডার বা গুঁড়ো কফি পড়ে থাকে।

কফিপানে যে চাঙ্গা বোধ করি তার মূল কারণ ক্যাফিন নামে কফিতে এক ধরণের রাসায়নিক যোগ। এ ধরণের যোগ

[পরের অংশ 336 পৃষ্ঠায় দেখুন]

* প্রযত্নে / জে. এম. দাস, পোঃ-লালগোলা, মুর্শিদাবাদ

বোড়ালের শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

রণতোষ চক্রবর্তী*

গাড়িয়া বাস টার্মিনাস থেকে পায়ে হাঁটা পুল পার হয়ে কয়েক মিনিট পথ হাঁটলেই বোড়ালের শিব দাদুর বাড়ি এবং এ বাড়ী এ এলাকার সবার পরিচিত। বলা বাহুল্য, বোড়ালের শিবদাদুই শ্রীশিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি এ বছর (1984) কল্যাণী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডি. এস. সি. পেলেন। তাঁর সম্বন্ধে জানতে হলে অবশ্যই বোড়ালে তাঁর বাড়ীতে যাওয়া প্রয়োজন। মাটির দাওয়ায় বসে একাশি বছর বয়সের শিববাবু এখনও শিশুর মত হাসিভরা মুখে তাঁর অতীত জীবনের নানা দুঃখ-বেদনার স্মৃতি ও সেই সঙ্গে কৃষি জীবনের নানা গবেষণালব্ধ রকমারি ফুল, ফল তৈরির গল্প শুনাতে বিমুখ হবেন না। তাঁর ঘরের সংলগ্ন কঞ্চির বেড়া দেওয়া খানিকটা জায়গায় এরই ফাঁকে তিনি হাতে গড়া জল-গোলাপ গাছের চারা, একই গাছে রকমারি কাঁঠাল বা একই গ্রাফটিং করে একই পেয়ারা গাছের নানা ডালে ভিন্ন পেয়ারা—একাধিক রকমের কফি গাছ—এসব দেখিয়ে দেবেন। একটু হেঁটে তাঁর জমির অন্য অংশে "ব্যানার্জীস জায়ান্ট", 'পলি-ফ্লাওয়ার, বা টাঙ্গুর"—প্রভৃতি একান্ত তাঁর গবেষণালব্ধ নানা জাতের গাছ তিনি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবেন। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরেরও বেশী দিন ধরে শিববাবু রকমারি ফুল, ফল, গাছের সার, কৃষিবিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই কারণেই আমাদের দেশের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় যথার্থই আমেরিকার বিশিষ্ট কৃষি বিশেষজ্ঞ লুথার বারব্যাংক নামে তাঁকে অভিহিত করেছিলেন।

বর্তমানে বাংলাদেশের খুলনা জেলায় 1904 খৃস্টাব্দের 4ঠা জানুয়ারীতে শিবপ্রসাদের জন্ম। মাত্র আড়াই বৎসর বয়সে তাঁর পিতা নিবারণচন্দ্রের মৃত্যু হয়। ফলতঃ শিবপ্রসাদের শৈশব ও যৌবন খুবই কষ্টে কাটে। পিতৃহীন শিবপ্রসাদ কোনও প্রকারে টাকির পূবে শ্রীপুর স্কুলে কিছুকাল পড়াশুনা করেন। অবশ্য 1923 খৃস্টাব্দ থেকে তিনি তাঁর পৈতৃক ভিটা বোড়ালে বসবাস করতে শুরু করেন এবং হাইস্কুল থেকেই 1925 শিবপ্রসাদ প্রথম বিভাগে মেট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শ্রীপুর স্কুলে ছাত্রাবস্থায় তিনি আচার্য

শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
ফটো—ভোলানাথ ঘোষাল

প্রফুল্লচন্দ্রের প্রিয়ভাজন হয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁর পরামর্শ মতোই শিবপ্রসাদ স্কুলের পাঠ শেষ করে পৈতৃক জমিতে চাষ আবাদ শুরু করেন। জমিতে চাষ করায় ফলে চাষীদের সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ, নানা সমস্যাদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত হলেন। সেই কারণে শুরু করলেন বীজের ব্যবসা। ইউরোপ, আমেরিকা থেকে নানা জাতের বীজ আমদানি করে চাষ করতে লাগলেন—শুরু হলো নানা গাছ নিয়ে গবেষণা। এরই মধ্যে চাষীদের জীবনে শিক্ষার অভাব, ব্যবহারিক জ্ঞানের অভাব। নানা কুসংস্কার—এই সবকে দূর করে আধুনিক জ্ঞানপ্রযুক্তি প্রয়োগের জন্য শিবপ্রসাদ গড়ে তুললেন কৃষক সমিতি। সংঘটিত করলেন কৃষি-মেলা। শুধু চাষ-আবাদই নয়, স্বাধীনচেতা শিবপ্রসাদ দেশের ডাকেও সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেন নি—অংশ নিলেন অসহযোগ, সত্যাগ্রহ আন্দোলনে। শিবপ্রসাদের অনুসন্ধিৎসু মন উদ্ভিদ বিজ্ঞান ছাড়া তাঁর এলাকা অর্থাৎ বোড়ালের পুরাতত্ত্ব ও

[335 পৃষ্ঠার পরের অংশ]

চা, কোকো বা কোলা জাতীয় পানীয়েও অল্পবিস্তর থাকে। এ ক্যাফিনই আমাদের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে উদ্দীপিত করে অবসাদ ঘোচায়।

এতক্ষণ কফির গুণগান করলেও এর যে কতগুলি অন্ধকার দিক আছে সেগুলির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ প্রয়োজন। বহুদিন ধরে অধিক পরিমাণ কফি পানের কুফলও আছে কারণ তাহলে কফি পান নেশায় পরিণত হতে পারে, যার পরিণতি হিসেবে মেজাজ খিটখিটে, অনিদ্রা প্রভৃতি বদগুণের সমাবেশ হতে পারে। কফির মাধ্যমে শরীরে অতিরিক্ত ক্যাফিনের প্রভাবে উচ্চ রক্ত-চাপ ও হৃদরোগের সমস্যাও দেখা দেয়। তবে বিজ্ঞানীরাও বসে নেই, তাঁরাও ক্যাফিনের ক্ষতিকর প্রভাব কাটাবার জন্যে 'ক্যাফিনহীন কফি' (decaffeinated coffee) প্রচলন করেছেন।

* শারীরতত্ত্ব বিভাগ, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কলিকাতা-700009

পুরাকীর্তি অন্বেষণ ও এর সংরক্ষণ বিষয়েও নানা প্রচেষ্টা করেছেন।

কৃষি খামারে শিবপ্রসাদের অবিরাম পরিশ্রম ও বিজ্ঞান সাধনার ফলশ্রুতি হিসাবে প্রথম সাফল্য আসে 1932 খৃস্টাব্দে। শীতপ্রধান অঞ্চলের দ্বিবর্ষজীবী বীটের উৎপাদন ও বীজ সৃষ্টি হয় তাঁর নিজের চাষ করা সমতল ভূমিতে। এর পরের বছর অর্থাৎ 1933 বিশালাকার পালং চাষ করে বিজ্ঞানীদের বিস্ময়াবিষ্ট করেন। বীট ও পালং-এর সংকর—মিশ্রণজাত এক ধরনের সবজি এই পালংকে সুস্বাদু করতে সক্ষম হলেন 1935-36 খৃস্টাব্দে। এই ধরনের এক একটি পালং-এর ওজন আট থেকে দশ কেজি, একেই "ব্যানার্জী'স জায়েন্ট" নামে কৃষিবিজ্ঞান ক্ষেত্রে পরিচিত করা হয়েছে। এই পালং থেকে পরবর্তীকালে নানা পরীক্ষা ও বাছাই করে সৃষ্টি করলেন "সরবতী পালং"—যা কাঁচা বা সরবৎ করে খাওয়া যায়। এর কয়েক বছর পর কৃষি জগতকে তিনি আরও একটি কৃষিজাত ফসল উপহার দিলেন—ইতালীয়ান ব্রোকেলী (ইতালীর এক জাতের ফুলকপি) ও দেশী ফুলকপির মিলন ঘটিয়ে সৃষ্টি করলেন নতুন এক সবজি, নাম দিলেন "পলি-ফ্লাওয়ার"।

এছাড়া বারো তেরো রকমের সংকর টমেটো তিনি তৈরি করেছেন—যেমন আঙুরের মতো, যার নাম দিয়েছেন 'টাঙুর', আমের আকৃতির, পটলের আকৃতির, নারকোলী কুলের আকৃতি—এই সঙ্গে রকমারি রঙের।

ফুলগাছ নিয়েও তিনি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। বস্তুতঃ প্রায় চব্বিশ-পঁচিশ রকমের গোলাপ তিনি সৃষ্টি করেছেন। তবে এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো জলা জায়গাতেও চাষের উপযোগী একজাতের গোলাপ গাছ তৈরি। দক্ষিণ বাংলায় এ ধরনের গোলাপ চাষ সম্ভব। এ জাতের গোলাপ গাছ নিয়ে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখনও চলছে।

শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরও একটি অভিনন্দনযোগ্য প্রচেষ্টা হচ্ছে খরার সঙ্গে চাষীদের মোকাবিলার জন্য এক ধরণের সার আবিষ্কার—"গোলাসার"। 1955 খৃস্টাব্দে এই "গোলাসার" তিনি নানা পরিক্ষা করে বার করেন। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে অতি সাধারণ তুচ্ছ জিনিষে এ সার প্রস্তুত করা সম্ভব, এছাড়া এই সার প্রয়োগে সেচের মাত্রা 40% কমালেও গাছের পুষ্টিতে কোন অসুবিধা হয় না।

একাশি বছরের শিবপ্রসাদ এখনও কিন্তু অনেক দিক থেকে তরুণ। তাঁর সংস্কারমুক্ত উদার মন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে প্রকৃতিকে জানতে চায়। শিবপ্রসাদের মনোলোকের বহুমুখী ব্যাপ্তি শুধু বিজ্ঞান নয়, সাহিত্য, ধর্ম ও আরও নানা বিষয়ে প্রসারিত। ছড়া কাটা বা তাঁর কবিতা শুনলে সত্যি অবাক হতে হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় ডিগ্রী বা কর্মসূত্রে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত না হয়ে, আন্তর্জাতিক বা দেশীয় সরকারী এমন কিছু খ্যাতির অধিকারী না হলেও তিনি পেয়েছেন সৃষ্টির অফুরন্ত আনন্দ এবং খ্যাতিও কুড়িয়েছেন, তবে তা এসেছে তাঁর চারপাশের নিরক্ষর, দরিদ্র কৃষক ভাইদের কাছ থেকে। আর পেয়েছেন সম্মান, ভক্তিশ্রদ্ধা—অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে।

উৎস : (ক) শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও কথোপকথন। (খ) 'JOURNAL' প্রকাশিত—"নব ভারতের লুথার বারব্যাংক"। (গ) অধ্যাপক সনৎ কুমার সরকার ও প্রবীর কুমার সরকার।

আবেদন

- নিজের পরিবেশকে দূষণ থেকে মুক্ত রাখুন।
- সকল প্রকার বন্যপ্রাণী ধ্বংস রোধ করুন।
- খরা, ভূমিক্ষয় ও পরিবেশ দূষণ রোধে বৃক্ষ রোপণ করুন।
- খাদ্য ও ঔষধে ভেজাল দেওয়ার বিরুদ্ধে দুর্বার জনমত গঠন করুন
- সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা গড়ে তুলুন।

—কর্মসচিব

মহাকাশ অভিযানে ভারত

অভিজিৎ ঘোষ*

"বিপ্-বিপ্-বিপ্"—এই আওয়াজটাই একদিন মানুষের কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হয়ে বিশ্ববাসীকে আলোড়িত করেছিল। কারণ এটাই ছিল মনুষ্যসৃষ্ট প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুটনিক-1-এর মহাকাশ থেকে প্রেরিত বার্তা। 1957 খৃস্টাব্দের 4ঠা অক্টোবর মহাকাশে প্রথম উপগ্রহ পাঠিয়েই ক্ষান্ত হন নি রাশিয়ার ইণ্টার কসমস কমিটি। বরং 1961 খৃস্টাব্দের 12 এপ্রিল মহাকাশে প্রথম মানুষ পাঠিয়ে রীতিমত চমক সৃষ্টি করলেন। প্রথম মহাকাশচারী ইউরি গ্যাগারিন সেদিন মৈত্রীর হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন ভারতের দিকে। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী 'শান্তির দূত' জহরলাল নেহরু প্রস্তাব দিয়েছিলেন রুশ মহাকাশ অভিযানে ভারতের প্রতিনিধি পাঠানোর। উন্নয়নশীল ভারত মহাকাশে প্রথম উপগ্রহ 'আর্যভট্টকে' প্রেরণের (1975) সেই উষালগ্ন থেকেই হাত মিলিয়েছে রাশিয়ার সঙ্গে। ইতিমধ্যে মহাকাশের দিকচক্রবালে রাশিয়ার এক চক্কর ম্যারাথন দৌড় শেষ হয়ে গেছে। মহাকাশ অভিযানে রুশ ভারত মৈত্রীর ইতিহাসে বেশ কয়েকটা অধ্যায় কাটিয়ে ভারত মহাকাশে নভোশ্চর পাঠিয়েছে। অভিযানের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করে ঠিকমতো প্রশিক্ষণ দিয়ে রাশিয়া নিজেদের মহাকাশ অভিযানের সঙ্গী করে নিলেন ভারতীয় প্রতিনিধি রাকেশ শর্মাকে। 3রা এপ্রিল, '84 ব্যাপক কর্মসূচী নিয়ে সয়ুজ T-11 মহাকাশ যানে করে প্রথম ভারতীয় হিসাবে মহাকাশে পাড়ি দিলেন রাকেশ শর্মা।

সূচনা—সাত ঘোড়ার রথে চড়ে সূর্য চলেছেন আকাশপথে। সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন এই পৃথিবীর তিন মহারথীকে। আবীররাঙা রাগী সূর্যের ত্রিনয়নে রক্তরাগ পরিস্ফুট—এটি মহাভারতের যুদ্ধকালীন কুরুক্ষেত্রের কোন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নয়, এটিই হল রুশ-ভারত যৌথ মহাকাশ অভিযানের প্রতীক—ভারতের মহাকাশ গবেষণার অভিব্যক্তির সোপানে একটি বিরল নজীর। আর মহারথী তিনটি হলেন ভারতীয় নভোশ্চর স্কোয়াড্রন লিডার রাকেশ শর্মা এবং তাঁর সঙ্গী দুই নভোশ্চর ফ্লাইট কমাণ্ডার ইউরি ম্যালিশেভ এবং ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার গেনাডি স্ত্রেকালভ।

"The earth is the cradle of the mind, but one cannot live in a cradle forover…… The foundation of the first colony near the earth requires constant aid from the earth ………The earth will send machines, materials, structures, food and people"—এটি লিখেছিলেন রাশিয়ার মহাকাশ অভিযানের পথপ্রদর্শক Konstantin Edwardovich Tsioilkovsky এবং তিনিই প্রথম বৈজ্ঞানিক উপায়ে বহুস্তরী রকেটের সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে প্রেরণের ধ্যানধারণা প্রণয়ন করেন (1926)। তাঁর এই চিন্তাধারার সার্থক রূপায়ণ এবং বাস্তব পরিণতি হল 1957 খৃস্টাব্দে 4ঠা অক্টোবর—এদিন রাশিয়া বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ 183 পাউণ্ড ওজনের স্পুটনিক-1-কে মহাশূন্যে প্রেরণ করে। এরপর থেকে রাশিয়ার মহাকাশ অভিযান এগিয়ে চলতে থাকে দুর্বার গতিতে। কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের পর থেকে পঞ্জিকা বৎসরে বেশ কিছু সংখ্যক কৃত্রিম উপগ্রহ যেমন লুনা, ভেনেরা, কসমস্ ইত্যাদি প্রেরণ করে মহাকাশে জাঁকিয়ে আসর বসিয়েছে রাশিয়া। তারপর তাদের পরিকল্পনা মহাকাশে মানুষ পাঠাবার। ইতিমধ্যে একবার সার্থক প্রচেষ্টাও চালানো হয়েছে, স্পুটনিক-2-তে লাইকা নামক একটি কুকুর পাঠিয়ে। শুধু কুকুর পাঠিয়েই ক্ষান্ত হন নি রাশিয়ার ইণ্টার কসমস কমিটি। মহাকাশে প্রথম মানুষ পাঠিয়ে তাঁরা যেন অসাধ্য সাধন করলেন। আর প্রথম মহাকাশ-চারীর নাম তো আজ বিশ্ববাসীর সকলেরই জানা। পরিচিত সেই মানুষটি হলেন অসম সাহসী, উদ্যমে ভরপুর, আত্মপ্রত্যয়ে অবিচল, এবং সদা হাস্যময় যুবক ইউরি গ্যাগারিন, যিনি পৃথিবীবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম নিজের গ্রহকে দেখেছিলেন মহাশূন্য থেকে। আর সেই স্মরণীয় দিনটি হল 1961 খৃস্টাব্দের 12ই এপ্রিল যেদিন গ্যাগারিন Vostok-1 মহাকাশযানে করে পৃথিবীর মহাকর্ষ বলকে অগ্রাহ্য করে নীহারিকার মহাঅঙ্গনের দিকে পাড়ি জমিয়েছিলেন এবং মহাশূন্যে 108 মিনিটের সফর শেষ করে অভিজ্ঞতার প্রাণপাত্রটি কানায় কানায় পূর্ণ করে ফিরে এসেছিলেন এই পৃথিবীর বুকে। সেদিন তিনি বিশ্ববাসীকে শুনিয়েছিলেন "There's enough room for everyone in space."

জহরলাল নেহরুর আমন্ত্রণে সেই সময় গ্যাগারিন এসেছিলেন ভারত সফরে। সেদিন বিশ্বের প্রথম মহাকাশচারী ইউরি গ্যাগারিন বলেছিলেন—"হয়ত এমন একদিন আসবে যেদিন রুশ মহাকাশ অভিযানে থাকবে একজন ভারতীয়।"

1962 খৃস্টাব্দে সরকারী উদ্যোগে গড়ে উঠল—Indian National Committee for Space Research বা 'ইনকসপার' এবং ত্রিবান্দ্রমের 6 km উত্তরে থুম্বায় স্থাপিত হয় Equatorial Rocket Lunching Station বা 'TERLS'। এই কর্মকাণ্ডের পুরোভাগে ছিলেন ডঃ বিক্রম সারাভাই। থুম্বার এই উৎক্ষেপণ মঞ্চ থেকে NASA প্রদত্ত Nika-Apache নামক প্রথম আবহাওয়া সংক্রান্ত উপগ্রহ উৎ-ক্ষেপণ করা হয় 1963 খৃস্টাব্দের 21শে নভেম্বর। '68 খৃস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী 'থুম্বার রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্রটিকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের হাতে অর্পণ করার পর এ পর্যন্ত প্রায় 600-র

* পান্না পক্ষপাড়া, পোঃ-পান্না, জেলা-বর্ধমান-713151

বেশী আবহাওয়া সংক্রান্ত উপগ্রহ ঐ কেন্দ্র (TERLS) থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। এরপর 1970 খৃস্টাব্দে মহাকাশ গবেষণার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বাঙ্গালোরে গঠিত হল Indian Space Research Organisation বা ISRO এবং এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হলেন সতীশ ধাওয়ান। ISRO-র তত্ত্বাবধানে আমেদাবাদে SAC (Satellite Application Centre) এবং শ্রীহরিকোটার রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র SHAR (Srihorikota High Altitude Range) গঠিত হল। শ্রীহরিকোটা উৎক্ষেপণ মঞ্চ থেকে 1971খৃস্টাব্দে প্রথম ভারতের তৈরী নিজস্ব রকেট SLV-3-E-OIAএর পরীক্ষামূলক উড্ডয়ন শুরু হয়।

1972 খৃস্টাব্দের 10ই মে ভারতের সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার বিজ্ঞান একাদেমীর উপগ্রহ উৎক্ষেপণ সংক্রান্ত এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর পর থেকেই ভারতের দ্বিতীয় পর্যায়ের মহাকাশ অভিযানের সূচনা। সেই চুক্তিমতো 1975 খৃস্টাব্দের 19শে এপ্রিল রাশিয়ার 'কাপুস্তিন ইয়ার' কসমোড্রোম থেকে নিক্ষিপ্ত হয় ভারতীয় প্রথম উপগ্রহ 360kg ওজনের আর্যভট। এই বছরেই রুশ বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় ভারতীয় উদ্যোগে মাদ্রাজের 'কাভালুর' শহরে গড়ে ওঠে 'satellite tracking centre. এরপর 1979-এর 7ই জুন সোভিয়েত পরিবাহী রকেটের সাহায্যে ভারতের ভূতাত্ত্বিক গবেষণা সংক্রান্ত উপগ্রহ 'ভাস্কর-1' কক্ষপথে প্রেরণ করা হয়।

ইতিমধ্যে ভারতের রকেট তৈরির প্রচেষ্টার সার্থক রূপায়ণ করতে 1979-র 10ই অগাস্ট শ্রীহরিকোটা থেকে মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয় প্রথম SLV-3 রকেট। এরপর শুরু হয় মহাকাশে রোহিণীর জয়যাত্রা। 1980 খৃস্টাব্দের 18ই জুলাই রোহিণী-I (RS-E-2/SLV-3-E-02), 1981 খৃস্টাব্দের 31শে মে রোহিণী-D-I (RS-D-1/SLV-3-D-01) এবং সবশেষে 1983-র 17ই এপ্রিল মহাকাশে পাড়ি দেয় রোহিণী-D-II। কিন্তু দুঃখের বিষয় এদের কেউই মহাকাশে নির্ধারিত আয়ুষ্কাল কাটাতে পারে নি—উৎক্ষেপণ রকেটের গোলযোগের ফলে অকাল মৃত্যু হয়েছে রোহিণীর।

ব্যর্থতার এই বিষাদ কিন্তু ভারতের মহাকাশ অভিযানকে পঙ্গু করে দিতে পারে নি। বরং আত্মান্বেষণের ধারায় ভুল শুধরে নিয়ে কাজ শুরু হল নতুন উদ্যমে। 1981-এর 19শে জুন ফরাসীগায়ানার কুরু থেকে ভারতের প্রথম পরীক্ষামূলক 'Communication Satellite' APPLE (Ariane passenger payload expriment) নির্বিঘ্নে মহাকাশে প্রেরিত হয়। ESA-র (European Space Agency) এরিয়ান রকেট পৃথিবী থেকে 36,000 কিমি. উপরে ভূসমলয় কক্ষপথে পৌছে দিয়ে আসে APPLE-কে। এই ধরনের উপগ্রহ উৎক্ষেপণের ক্ষেত্রে পৃথিবীর মধ্যে ভারতের স্থান নবম (আমেরিকা 1963, গ্রেটব্রিটেন-1969, রাশিয়া-1974, ফ্রান্স ও পঃ জার্মানী 1975, ইতালী ও জাপান-1977). অবশ্য এই উৎক্ষেপণের আগের আরও দুটি প্রকল্প থেকে ভারতের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্‌রা উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগ ও টিভি অনুষ্ঠান প্রচারের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। প্রকল্পটির নাম SITE (Satellite Instructional Television Experiment) এবং STEP (Satellite Telecommunications Experiments Project).

রাশিয়ার ইন্টারকসমস রকেটে চড়ে 1981-র 20শে নভেম্বর মহাকাশে পাড়ি দিল ভাস্কর-2. তারপর 1982-এর 10ই জুলাই ফ্লোরিডার কেপক্যানাভেরাল থেকে 43910 রকেটে চড়ে মহাকাশে পাড়ি দেয় ভারতের প্রথম Multipurpose satellite-Insat-IAC (Indian National Satellite System). এ-ধরনের উপগ্রহ উৎক্ষেপণের ক্ষেত্রে ভরতের স্থান ষষ্ঠ (আমেরিকা, রাশিয়া, কানাডা, জাপান ও ইন্দোনেশিয়া)। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পাঁচ মাস পরেই এটা অকেজো হয়ে পড়ল। তবে সমস্ত ভুল শুধরে নিয়ে পরের বছর (1983) 30শে অগাস্ট মার্কিন মহাকাশফেরী চ্যালেঞ্জারের সাহায্যে ভারত মহাকাশে পাঠাল Insat-IB-কে যেটি ভূসমলয় কক্ষে দাঁড়িয়ে আজও জাতির সেবায় নির্ভুলভাবে কাজ করে চলেছে।

মহাকাশ অভিযানে রুশ-ভারত মৈত্রীর ইতিহাসে বেশ কয়েকটি অধ্যায় পেরিয়ে এসে এবার ভারতের মহাকাশে নভোশ্চর পাঠানোর পালা। বড় বড় ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ার, উইংকমাণ্ডার, এয়ার মার্শাল এবং স্কোয়াড্রন লিডারদের তরফ থেকে 200 দরখাস্ত এসে পড়ল সরকারী দপ্তরে। দুজন ভারতীয় প্রতিনিধি ঠিক করার জন্য। শীর্ষস্থানীয় দুজন প্রতিনিধির মধ্যে একজন হলেন এই কলকাতার খিদিরপুরের সেন্ট টমাস স্কুল থেকে সিনিয়ার কেমব্রীজ পাশ করা, বর্তমান পাকিস্তানের লাহোরে 25শে ডিসেম্বর 1943 খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণকারী, সর্বোপরি একনাগাড়ে 3400 ঘণ্টা আকাশে ওড়ার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সেরা ভারতীয় উইং কমাণ্ডার রবিশ মালহোত্রা। এছাড়াও প্রায় 40 রকমের যুদ্ধবিমান তিনি দক্ষতার সঙ্গে চালনা করেছেন। যেমন—ভ্যামপায়রস্, এফ-86, টি-33, প্যানথম, এফ-4, টি-38 এ-7, বি-32, এফ-100, মিগ-21, সুখোই-7, ইত্যাদি।

আর একজন হলেন, 1949 খৃস্টাব্দের 13ই জানুয়ারী পাঞ্জাবের পাতিয়ালায় জন্মগ্রহণকারী, একনাগাড়ে আকাশে 1600 ঘণ্টা ওড়ার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সেরা স্কোয়াড্রন লিডার রাকেশ শর্মা। তিনিও মিগ, হান্টার, ইসকারা, মারুট, ভেরিয়ান্টস, এইচ. এম-748, এইচ. পি. টি-32এর মতো জঙ্গী বিমানগুলি দক্ষতার সঙ্গে চালনা করেছেন। এই দুই ভারতীয় প্রতিনিধির মধ্যে অভিজ্ঞতা এবং বয়সের দিক থেকে রাকেশই ছোট। যাই হোক, এই দুজন প্রতিনিধি ঠিক

হলেও ইন্দো-রুশ চুক্তিমতে প্রথম ভারতীয় হিসাবে মহাকাশে ওড়ার সুযোগ পাবেন ওদের মধ্যে একজন।

ইউরি গ্যাগারিন নভোশ্চর শিক্ষণ কেন্দ্রে ভারতীয় প্রতিনিধিদের দুটি পর্যায়ে মোট 18 মাসের ট্রেনিং নিতে হয়েছিল। ট্রেনিং দেওয়ার গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত ছিল এই কেন্দ্রের ডিরেক্টর দুবার 'হিরো অব সোভিয়েত ইউনিয়ন' খেতাবে ভূষিত লেঃ জেনারেল গ্রেগরী বেরেগোভাই-এর উপর। প্রথম পর্যায়ের 'নয় মাস ট্রেনিং-এর মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরে শেখান হল রুশ ভাষা—কারণ প্রযুক্তিবিদ্যার পড়াশুনা, যন্ত্রাদির পরিচয় এবং প্রশিক্ষকের নির্দেশ সবই রুশ ভাষায়। তত্ত্বগত এবং ব্যবহারিক উভয় প্রকার ট্রেনিং তাদের দেওয়া হয়েছিল। শরীরচর্চার উপর যথেষ্ট নজর দেওয়া হয়েছিল। প্রতিদিনের প্রশিক্ষণ আরম্ভই হতো শারীরিক উপযুক্ততা বিষয়ক অধিবেশন। যেমন দিনের শুরুতেই তিন কিলোমিটার জগিং, 45 মিনিট টেনিস খেলা ও সাঁতার কাটা ছিল আবশ্যক কর্মসূচী। এ ছাড়াও ছিল ভারোত্তোলন। তত্ত্বগত দিক থেকেও তাদের পড়াশুনার পরিধিটাও ছিল বেশ বিস্তৃত। যেমন Space Physics, Astronomy, Meteorology, Dynamics of jet flight, Space rocketry technology, Space navigation, Communication system, Automation, Computer techniques, Electronics প্রভৃতি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে হয়েছে। প্রশিক্ষণের উৎকর্ষতার জন্য এখানে একটি সয়ুজ-এর মডেল রাখা হয়েছিল। আবার পাঁচ থেকে ছয়গুণ অভিকর্ষ টানের (Gravitational pull) বিরুদ্ধে শরীরকে ঠিক রাখারও প্রশিক্ষণ তাদের দেওয়া হয়। (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 'এবাফ' অভিকর্ষ বলের টানের প্রভাবে কোন বস্তু 32·16 ফুট/সেকেণ্ড বেগে গতিশীল হয়।) এ ছাড়াও 0-Gravity-তেও ঠিকমতো কাজ চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মাধ্যাকর্ষনহীনতার ফলে মহাকাশে নভোশ্চরদের মস্তিষ্কে অতিরিক্ত রক্ত সরবরাহ হয়, পেশীর আয়তনে সংকোচন ঘটে, অস্থিমজ্জার উপাদানের পার্থক্য ঘটে এবং সর্বোপরি বিপাকের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।' মহাকাশে শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপ ঠিক রাখার জন্য এদের স্পেসস্যুট (space suits) পরিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মহাকাশ স্টেশন স্যালুট-7-এ গবেষণার কাজ ঠিকমতো চালানোর জন্য একটি স্যালুটের মডেলে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ভারতীয় নভোশ্চরদের প্রথম পর্যায়ের প্রশিক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল আপৎকালীন অবস্থার মোকাবিলা করা। অর্থাৎ মহাকাশে যদি কোন বিপদ হয়, অথবা মহাকাশযান যদি ঠিকমতো অবতরণ করতে না পেরে সমুদ্রে পড়ে তাহলে সেই বিপদ থেকে সহজে মুক্তি পাবার উপায় নভোশ্চরদের শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেইজন্যই তো রাকেশ শর্মা এক ভারতীয় সাংবাদিকদের উদ্বেগজনক প্রশ্নে উত্তরে বলেছেন—"সাধারণ বিমান চালানোর চেয়ে মহাকাশযান চালান অনেক বেশী নিরাপদ—এমন কি রাস্তায় একটি মোটর গাড়ি চালানোর চাইতেও কম বিপজ্জনক।"

প্রথম পর্যায়ের প্রশিক্ষণ সুষ্ঠুভাবে রপ্ত করে রাকেশ শর্মা এবং রবীশ মালহোত্রা জুলাই (1983) মাসে দেশে এসেছিলেন এক মাসের ছুটি কাটাতে। ছুটি কাটাতে ঘুরে বেড়ালেন দিল্লী, বোম্বাই, ব্যাঙ্গালোর ও কলকাতা ছাড়াও আরও অন্যান্য কয়েকটি শহর এবং বহু অনুসন্ধিৎসু সাংবাদিক ও দেশবাসীকে জানালেন তাঁদের প্রশিক্ষণ ও মহৎ উদ্দেশ্যের কথা। এরপর আবার স্টারসিটিতে ফিরে গিয়ে শুরু হল দ্বিতীয় এবং শেষ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ। এই পর্যায়ে মূলত সয়ুজ-এর ভিতর সাধারণ ও আপৎকালীন অবস্থার কাজকর্মের পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়া সয়ুজ চালনা, সয়ুজকে মহাকাশে অপেক্ষারত স্যালুট-এর সঙ্গে যুক্ত করা, যুক্ত হওয়ার পর সয়ুজ থেকে স্যালুটের ভিতর যাওয়া এবং স্যালুটের ভিতর থেকে গ্রাউণ্ড কণ্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা, স্যালুটের মাল্টিস্পেকট্রাল ক্যামেরাগুলির সাহায্যে ছবি তোলা রপ্ত করা এবং সবশেষে ঠিকমতো কাজ সেরে সয়ুজ-এর ভেতর প্রবেশ করে স্যালুটকে আলাদা করা ইত্যাদির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। অবতরণ করার প্রশিক্ষণ আগেই দেওয়া হয়েছিল।

ভারতীয় প্রতিনিধিদ্বয় রাকেশ শর্মা ও রবীশ মালহোত্রা খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে প্রশিক্ষণ নেওয়ার কাজ শেষ করেন। ইউরি গ্যাগারিন মহাকাশ শিক্ষণ কেন্দ্রের ডিরেক্টর গ্রেগরি বেরেগোভাই বলেন—'ওদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই।" এই অভিযানের অন্যতম রুশ প্রতিনিধি ফ্লাইট কমাণ্ডার ইউরি ম্যালিশেভ ভারতীয় শিক্ষানবীশদের উদ্দেশ্যে বলেন—"In the course of joint training sessions with Indian pilots, we could fully appreciate their industriousness and responsible approach for their duties.

প্রশিক্ষণের কাজ শেষ, এবারে মহাকাশে পাড়ি জমানোর পালা। দিন ঠিক হয়েছিল 3রা এপ্রিল রাশিয়ার ঐতিহাসিক কসমোড্রোম বৈকানুর থেকে তিনজন মহাকাশচারীকে নিয়ে অত্যাধুনিক স্পেসক্রাফ্‌ট্‌ সয়ুজ—T-II ত্রিস্তর রকেটে চড়ে মহাকাশে রওনা হবে। মহাকাশে ভারতের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল এই এপ্রিল মাসেই 1975 খৃস্টাব্দে—যেদিন রাশিয়ার ইন্টারকসমস রকেট ভারতীয় প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ আর্যভট্টকে নীহারিকার মহাঙ্গনে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল। সেই উৎক্ষেপণের ঠিক নয় বছর পর (1984) এপ্রিল মাসেই মস্কো থেকে 2,500 কিমি. দূরে সাইবেরিয়ার কাজাকিস্তানের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত রাশিয়ার বৃহত্তম কসমোড্রোম 'বৈকানুর' থেকে মহাকাশে পাড়ি দেবেন প্রথম ভারতীয় নভোশ্চর রাকেশ শর্মা। প্রথম থেকেই দুজন ভারতীয় প্রতিনিধির কথা বলা হয়েছে—কিন্তু ইন্দো-রুশ চুক্তিমতো মহাকাশে পাড়ি দেবেন একজন ভারতীয়। তাহলে প্রশ্ন থেকে

যার অপরজনের প্রয়োজনটা কোথায় ? আসলে রুশ-ভারত যৌথ অভিযানের জন্য সমান দক্ষ দুটি দল তৈরি রাখা হয়েছিল ; প্রত্যেক দলেই ছিল একজন ভারতীয় এবং দুজন রুশ প্রতিনিধি। প্রথম দলে ভারতীয় প্রতিনিধি ছিলেন রাকেশ শর্মা এবং তাঁর দুই রুশ সঙ্গী ইউরি ম্যালিশেভ ও গেনাডি স্ট্রেকালভ। আর দ্বিতীয় দলের ভারতীয় প্রতিনিধি ছিলেন রবীশ মালহোত্রা এবং তাঁর দুই রুশ সহযাত্রী গ্রেগরী গ্রেচকো এবং আনতালি বেরেগভাই। তবে কোন্ দলটি যাবে তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন সোভিয়েত ইউনিয়নের ইণ্টারকসমস কমিটি। উৎক্ষেপণের ঠিক আগে। চূড়ান্ত শারীরিক সুস্থতার পরীক্ষার পাশ করতে হবে প্রথম দলের তিনজনকেই। যদি একজনও শতকরা একশো ভাগ উপযুক্ত না থাকেন তবে গোটা দলটাই বাদ পড়ে যাবে। সেক্ষেত্রে অভিযানে রওনা হবে দ্বিতীয় দলটি। সেইমত চূড়ান্ত পরীক্ষায় সফল হলেন প্রথম দলটি।

ইতিমধ্যে বৈকানুর কসমোড্রোমে মহাযজ্ঞ সম্পাদনের কর্ম-তৎপরতা পূর্বাপর বেড়েই চলেছে এবং উৎক্ষেপণের মুহূর্তটি নির্ধারণের জন্য কাউণ্ট-ডাউনও শুরু হয়ে গেছে 1লা এপ্রিল থেকে। এদিনই উৎক্ষেপণ মঞ্চের স্ট্যাণ্ডে বুস্টার রকেটসহ সয়ুজ—T-11-কে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। সয়ুজকে মহাকাশে পৌঁছে দেবার জন্য অত্যাধুনিক যে বুস্টার রকেটটি ব্যবহৃত হয়েছে সেটি প্রায় 16 তলা বাড়ির সমান উঁচু এবং ওজনে 300 টন। আর তিন কামরা বিশিষ্ট সয়ুজ-এর দৈর্ঘ্য প্রায় 7 মিটার এবং এবং ওজনে প্রায় 6,850 কিগ্রা। সয়ুজ—T-11এর কামরা তিনটি হল অরবাইটাল মডিউল (বা ওয়ার্ক মডিউল), ডিসেণ্ড মডিউল এবং ইঞ্জিন মডিউল।

মঞ্চে দাঁড়ান সয়ুজ-এর দক্ষতা শেষবারের মতো পরীক্ষা করে নেওয়া হল 2রা এপ্রিল। এর পর 3রা এপ্রিল বিকেলের সেই নাটকীয় মুহূর্তের জন্য সকলের প্রতীক্ষা। বৈকানুর কসমো-ড্রোমের টেস্ট কমপ্লেক্সে চূড়ান্ত শারীরিক পরীক্ষা দিয়ে অ্যাসেমব্লী হাউসের করিডোর দিয়ে বেরিয়ে এলেন সাদা স্পেস স্যুট পরা তিন মহাকাশচারী—রাকেশ শর্মা, ইউরি ম্যালিশেভ এবং গেনাডি স্ট্রেকালভ। তারপর তাঁরা এগিয়ে গেলেন উৎক্ষেপণ মঞ্চের পাদদেশে—প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সুটকেসে নিয়ে প্রবেশ করলেন সয়ুজ-এ। তারপর রাকেশ ও ম্যালিশেভ দু-দেশের মানুষের উদ্দেশ্যে বার্তা পাঠালেন। এবার 10 সেকেণ্ডের চূড়ান্ত গণনার শেষে 'লাঞ্চিং ডিরেক্টরের নির্দেশ এল, 'Take off'—চালু হয়ে গেল টার্বো পাম্প (Turbo Pump)—গর্জে উঠল বুস্টার ইঞ্জিনের combustion chamber, গগনভেদী আওয়াজ এবং ধোঁয়ার ঝর্ণাধারা আর আলোর রোশনাই ছড়িয়ে সয়ুজকে নিয়ে রকেট উড়ে চলল মহাশূন্যের পথে। তখন রাশিয়ার সময় সন্ধ্যা 5টা 8 মিনিট ভারতীয় সময় 6টা 38 মিনিট। সয়ুজ T-11-এর মহাকাশ-চারীরা প্রথম পর্যায়ে 520 সেকেণ্ডের চরম দশা খুবই সন্তোষজনক ভাবে অতিবাহিত করেন। উৎক্ষেপণের 100 সেকেণ্ড পর ত্রিস্তর রকেটের প্রথম স্তরের কাজ শেষ হয়ে যায় এবং আরও 50 সেকেণ্ড পর এটি জ্বলে যায়। এরপর রকেটের গতি ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং 290 সেকেণ্ড পর দ্বিতীয় স্তরটিও জ্বলে যায়। বাকী থাকে শুধু বুস্টার রকেটের তৃতীয় স্তরটি। মহাকাশযানের গতি আরও বাড়তে থাকে এবং অবশেষে 520 সেকেণ্ড পর বুস্টার রকেটের তৃতীয় স্তরটিও জ্বলে যায়। ইতিমধ্যে সয়ুজ O-Gravity-তে পৌঁছে গেছে এবং গতিবেগ আট (8) কিমি./সেকেণ্ড। O-Gravity-তে পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত মহাকাশচারীদের মনে হয় তাঁদের ওজন যেন আসল ওজনের পাঁচগুণ বেড়ে গেছে। অবশ্য এই অস্বস্তিকর অবস্থাকে কাটিয়ে ওঠার প্রশিক্ষণ তাঁদের দেওয়া হয়েছিল এবং মহাকাশযানের মধ্যেও এই পরিস্থিতিকে প্রতিহত করার ব্যবস্থা ছিল। O-Gravity-তে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই সয়ুজকে এবং এই গোটা অভিযানকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় মস্কোর উপকণ্ঠে 25 কিমি দূরে অবস্থিত কালিনিনগ্রাদের মিশন কণ্ট্রোল কেন্দ্র থেকে।

উৎক্ষেপণের 9 মিনিটের মধ্যেই সয়ুজ ঢুকে পড়ল প্রাথমিক কক্ষপথে পৃথিবী থেকে 283 কিমি ঊর্ধ্বে। এরপর সয়ুজ আরও দুটি কক্ষপথ পেরিয়ে চতুর্থ কক্ষপথে এসে পৃথিবী পরিক্রমা করতে লাগল। মহাকাশচারীরা ইতিমধ্যে সয়ুজ-এর কামরা বন্ধ করা থেকে আরম্ভ করে ইঞ্জিনের সমস্ত যন্ত্রপাতির দক্ষতা পরীক্ষা করে নিয়েছেন। আসল কাজ তো সারতে হবে এবার অর্থাৎ প্রদক্ষিণরত মহাকাশ স্টেশন স্যালুট-7-এর সঙ্গে সয়ুজ-এর মহামিলনের সেই মহাসন্ধিক্ষণের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে মহাকাশচারীদের। অবশ্য বেশীর ভাগ ব্যবস্থাই স্বয়ংক্রিয় এবং মিশন কণ্ট্রোল থেকে নিয়ন্ত্রিত। মহাকাশচারীদের কাজ শুধু মানসিক প্রস্তুতি নেওয়া এবং যন্ত্রপাতির উপর চোখ রাখা। পঞ্চম কক্ষপথে transposition manoeuvre চালু করে সয়ুজকে আরও উপরের কক্ষপথে নিয়ে যাওয়া হয়। সয়ুজ-এর ষষ্ঠ থেকে একাদশতম কক্ষপথে পরিক্রমা পর্যন্ত মহাকাশচারীরা বিশ্রামে ছিলেন নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায়। ইতিমধ্যে সয়ুজের Counter Booster Rocket চালু করা হয়। এরপর সয়ুজ-এর মুখ্য ইঞ্জিন চালিয়ে গতি সাময়িকভাবে কমিয়ে এনে সয়ুজকে স্যালুটের Transitional Plane-এ আনা হয়। এবার 17তম কক্ষপথে স্যালুটের কাছাকাছি এসে সয়ুজ-এর Thruster motor চালু করা হয়। ফলে সয়ুজ স্যালুটের চেয়ে 30 মিটার/সেকেণ্ড বেশী গতিবেগে এসে ধাক্কা মারে স্যালুটের পিছনের দিকে। সামান্য দুলে ওঠে গোটা মহাকাশ কেন্দ্রটি আর সেই সঙ্গে স্যালুট আটটি হুকের সাহায্যে আঁকড়ে ধরে অতিথি সয়ুজকে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রিমিয়ার উপর ভূপৃষ্ঠ থেকে 300 কিমি উপরে 18তম কক্ষপথে ভারতীয় সময় রাত 8 বেজে 1 মিনিট 13 সেকেণ্ড (মস্কো গ্রীষ্মকালীন

সময় সন্ধ্যা 5টা 31 মিনিট 13 সেকেণ্ড। সয়ুজ-T-II মহাকাশযান স্যালুট-7-এর সঙ্গে মিলিত হয়। এটি ঘটেছিল উৎক্ষেপণের প্রায় 24 ঘণ্টা পর। সয়ুজ ও স্যালুটের মিলনের সময় সয়ুজের নভোশ্চরদের গায়ে যে চাপ পড়ে তার পরিমাণ প্রায় 20 মেট্রিক টনের মতো। অবশ্য এই চাপ সহ্য করার মতো প্রশিক্ষণ তাঁদের আগেই দেওয়া হয়েছিল।

স্যালুটের সঙ্গে মিলনের পর 3 ঘণ্টা ভারশূন্য অবস্থায় কাটিয়ে সয়ুজ-এর তিন অভিযাত্রী রাকেশ, ম্যালিশেভ ও স্ত্রেকালভ হ্যাচওয়ে দিয়ে স্যালুট-7 গবেষণাগারে প্রবেশ করেন এবং তাঁদের অভিনন্দিত করেন 55 দিন আগে থেকে স্যালুটে অবস্থানকারী তিন রুশ মহাকাশচারী। এই তিন জন হলেন, লিওনাদ কিজিম, ভ্লাদিমির সলোভভ, এবং অলিগ আটাকভ। অলিগ আটাকভ একজন হৃৎপিণ্ড বিশেষজ্ঞ এবং অপর দুজন প্রযুক্তিবিদ। তিনজনের এই রুশ অভিযাত্রী দলটি আগে 9ই ফেব্রুয়ারী সয়ুজ—T-10 মহাকাশযানে করে স্যালুট—7-এ উপনীত হন। এইভাবে মোট ছয়জন নভোশ্চরের একত্রে স্যালুটে অবস্থান এবং মহাকাশ গবেষণার কাজ পর্যালোচনা এই প্রথম। এছাড়া রুশ-ভারত যৌথ মহাকাশ অভিযানে নভোশ্চর পাঠানোর ক্ষেত্রে অ-কমিউনিস্ট দেশ হিসাবে ভারতের স্থান হল দ্বিতীয়। এক্ষেত্রে প্রথম স্থানাধিকারী দেশটি হল ফ্রান্স। ফ্রান্সের প্রথম নভোশ্চর Jean Loup Chrelien 1982-র 24শে জুন সয়ুজ T-6-এ করে স্যালুট—7-এ পৌঁছেছিলেন। আর মহাকাশে রাকেশ শর্মা পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই জগৎসভায় ভারত হল ত্রয়োদশতম (13) দেশ যারা মহাকাশে নভোশ্চর পাঠিয়েছে। ভারতের আগে যে বারোটি (12) দেশ মহাকাশে প্রথম নভোশ্চর পাঠায় তারা হল যথাক্রমে রাশিয়া (এপ্রিল, 1961) আমেরিকা (জুন, 1962), চেকোস্লোভাকিয়া (মার্চ, 1978), পোল্যাণ্ড (জুন, 1978) পশ্চিম জার্মানী (অগাস্ট 1978), বুলগেরিয়া (এপ্রিল 1979), হাঙ্গেরী (মে, 1980) ভিয়েতনাম (জুলাই 1980), কিউবা (সেপ্টেম্বর, 1980), মঙ্গোলিয়া (মার্চ, 1981), রুমানিয়া (মে, 1981) এবং ফ্রান্স (জুন, 1982)। প্রথম মহাকাশচারী ইউরি গ্যাগারিনের মহাকাশ সফরের পর এ পর্যন্ত মানুষসহ মহাকাশে অভিযান হয়েছে নব্বই (90) বার যার মধ্যে পঞ্চাশটি (50) অভিযান সম্পন্ন হয়েছে রাশিয়ার তত্ত্বাবধানে। আর সয়ুজ T-II-এর উৎক্ষেপণ হল 91তম।

স্যালুট-7 হল রাশিয়ার মহাকাশ গবেষণার ইতিহাসে দ্বিতীয় প্রজন্মের কীর্তি। 15 মিটার লম্বা এবং 18900 কিলোগ্রাম ওজনের এই মহাকাশ স্টেশনটি 1982-র 19শে এপ্রিল মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। দুটি মূল নলাকার অংশ নিয়ে গঠিত স্যালুটে রয়েছে পাঁচটি কামরা। যথা—অ্যাডাপটার মডিউল, ওয়ার্ক মডিউল, সারভিসেস মডিউল, সাইন্টিফিক পেলোড মডিউল এবং এয়ারলক মডিউল। স্যালুট-7-এর বাইরের দিকে রয়েছে বিরাট আকারের তিনটি সৌরপাখনা, সামনে পিছনে রেডিও টেকনিক্যাল ডকিং সিস্টেমের দুটি অ্যানটেনা আর মহাকাশে বেরোবার হ্যাচওয়ে। ফটো এলিমেণ্ট প্লেট সহ সোলার প্যানেলের দৈর্ঘ্য 17 মিটার আর ক্ষেত্রফল প্রায় 45 বর্গ মিটারের মতো এবং প্রত্যেকটির বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা 3 কিলোওয়াট। এছাড়াও আছে আরও দুটি অতিরিক্ত সৌর ব্যাটারী। স্যালুট-7 এর সামনের দিকের বিশেষ ধরনের সাতটি জানালা সমন্বিত অ্যাডাপটার মডিউল থেকে মহাকাশে এবং নক্ষত্র জগতে পর্যবেক্ষণ চালান হয়। এই কক্ষেই রয়েছে স্টার ফটোগ্রাফীর ক্যামেরা এবং KRT-10 রেডিও টেলিস্কোপ। অ্যাডাপটার মডিউলের পিছনের দিকে মহাকাশ স্টেশনের মাঝামাঝি জায়গায় বিভিন্ন আধুনিক যন্ত্র ও ডিভাইসে ঠাসা সবচেয়ে বড় কক্ষটি হল ওয়ার্ক মডিউল। ওয়ার্ক মডিউলের বিভিন্ন যন্ত্রের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দুটি হল Wide angle topographical 'Kate-140' camera এবং Multispectral 'MKF-6M' camera। অত্যাধুনিক এই ক্যামেরাগুলির ফ্রেমে ধরা পড়বে পৃথিবীর 450 km অঞ্চল। ফলে ক্যামেরার একটি সম্পূর্ণ ছবিতে দু-লক্ষ (2,00,000) বর্গ কিমি. অঞ্চলের 'টেরা' নিহিত থাকবে। 'MKF-6' ক্যামেরাটি জার্মানীর (GDR) 'Karl Zeiss Jena Enterprises'-এর তৈরী এবং স্যালুটে এরকম ক্যামেরা আছে যাদের প্রত্যেকটির ওজন 204 kg. এই ক্যামেরাগুলির প্রত্যেকটি ফটোরিলের দৈর্ঘ্য প্রায় আড়াইশো মিটার।

এই ক্যামেরাগুলি দিয়ে মহাকাশ থেকে 5 মিনিটে পৃথিবীর যতগুলি ছবি তোলা যাবে প্রচলিত 'aerial photography'তে ততগুলি ছবি তুলতে সময় লাগবে পাক্কা দু-বছর। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রের মধ্যে রয়েছে। Biogravistat device, Medical research device, Celestial navigation device, Exercycle, Oxymeter, Massmeter, Crystal apparatus, এবং Metal container-সহ ফার্নেস। ওয়ার্ক মডিউলের মধ্যেই মহাকাশচারীরা মূল গবেষণার কাজগুলি করেন। এছাড়াও তাঁদের স্নান, খাওয়া-দাওয়া, এবং ঘুমানোর ব্যবস্থাও এখানে। তাই এখানে রয়েছে আধুনিক গৃহসজ্জা। কাজের জন্য রয়েছে টেবিল, স্নানের জন্য শাওয়ার আছে। আছে শৌচাগার এবং ঘুমানোর সুবন্দোবস্ত। বিনোদনের জন্যও রয়েছে যথেষ্ট উপকরণ (যেমন টেপরেকর্ডার, ভিডিও ইত্যাদি)। রাশিয়ার অন্যতম নভোশ্চর A. Ivanchenkov তো নিজের গিটারটিকেও নিয়ে গেছিলেন। আমাদের রাকেশ নিয়ে গেছেন গানের ক্যাসেট এবং মহাত্মা গান্ধী, জহরলাল নেহেরু, ইন্দিরা গান্ধী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী আর. ভেঙ্কটরামনের ছবি। ওয়ার্ক মডিউলের ঠিক তলায় সার্ভিস

মডিউল। এখানে রয়েছে ইঞ্জিন, সারি সারি কম্পিউটার, সোলার প্যানেল (বাইরের দিকে) এবং ক্যামেরা ও অ্যানটেনা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। স্যালুটের একেবারে পিছনে রয়েছে পাশা-পাশি দুটি কক্ষ—এয়ারলক মডিউল এবং সাইন্টিফিক পেলোড মডিউল। এয়ারলক চেম্বারের মূল যন্ত্রটি হল SPLAV–01 Unit এবং Loading hatch। সায়েন্টিফিক পেলোড মডিউলের মধ্যে রয়েছে গামা টেলিস্কোপ, স্পেকট্রোমিটার, সাব মিলিমিটার টেলিস্কোপ-BST-IM ইত্যাদি।

[বাকি অংশ পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে]

মডেল তৈরি

ফায়ার অ্যালার্ম

অজিত চৌধুরী*

একটি চোঙে বায়ু-নিরুদ্ধ পিস্টন দ্বারা আবদ্ধ কিছু পরিমাণ বায়ুর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে তার প্রসারণ হবে। পিস্টন চোঙ থেকে একটু বের হয়ে আসবে। এর উপর ভিত্তি করে ফায়ার অ্যালার্ম তৈরি করা যাবে।

একটি কাচের ইনজেকশনের সিরিঞ্জ (পাঁচ সি. সি.) দিয়ে মডেলটি তৈরী করা যাবে। এর সঙ্গে ধাতব পাত, একটি স্প্রিং, কিছু পরিবাহী তার, একটি বৈদ্যুতিক ঘণ্টা (k) তড়িৎ-কোষ, সুইচ (S) ইত্যাদি প্রয়োজন। পিস্টনটা চোঙের মধ্যে বেশ কিছুটা ঢুকিয়ে নিয়ে সিরিঞ্জের যে দিকে সূঁচ লাগানো হয়, সে দিকের ছিদ্র বন্ধ করতে হবে। পিস্টনের সঙ্গে একটি ছোট ধাতব পাত লাগাতে হবে। চোঙের (ব্যারেলের) সঙ্গে চিত্রের ন্যায় এক প্রান্তে বাঁকানো একটি ধাতব পাত আটকাতে হবে। তড়িৎ-কোষের এক প্রান্ত এর সঙ্গে এবং অপর প্রান্ত সুইচ, বৈদ্যুতিক ঘণ্টা হয়ে পিস্টনের সঙ্গে যুক্ত ধাতব পাতের সঙ্গে যুক্ত হবে পরিবাহী তারের মাধ্যমে। একটি স্প্রিং নিয়ে তার এক প্রান্ত পিস্টনের সঙ্গে এবং অপর প্রান্ত চোঙের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।
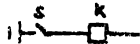
যেখানে আগুন লাগার সম্ভাবনা আছে, সেখানে সিরিঞ্জটি রাখতে হবে। সুইচ অন করে রাখতে হবে। বৈদ্যুতিক ঘণ্টা এমন জায়গায় রাখা প্রয়োজন যাতে এর শব্দ কানে যাবে, ঘুমিয়ে থাকলে ঘুম ভেঙ্গে যাবে। আগুন লাগলে চোঙে আবদ্ধ বায়ুর প্রসারণ হবে, পিস্টন চোঙ থেকে অংশতঃ বেরিয়ে আসবে। শীঘ্রই পিস্টনের সঙ্গে যুক্ত ছোট পাতটি চোঙের সঙ্গে যুক্ত বাঁকানো পাতটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে বর্তনী সম্পূর্ণ করবে, বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বেজে উঠবে। শব্দ শুনে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। কল-কারখানায় বৈদ্যুতিক ঘণ্টার পরিবর্তে সাইরেন ব্যবহার করা ভাল। সেক্ষেত্রে তড়িৎ সরবরাহের জন্য তড়িৎ কোষের পরিবর্তে মেন লাইন ব্যবহার করা যেতে পারে।

বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে বা চাপ-হ্রাস পেলে চোঙে আবদ্ধ বায়ু প্রসারিত হবে—একথা স্মরণ রেখে মডেলটি তৈরি করতে হবে অর্থাৎ চোঙের বায়ুর সামান্য প্রসারণেই বর্তনী সংহত যাতে না হয় তার জন্য ছোট পাত এবং বাঁকানো পাতের মধ্যে দূরত্ব একটু বেশী (সাত-আট মি.মি) হওয়া প্রয়োজন।

*কৃষ্ণারক, রূপশ্রীপল্লী, পোঃ রাণাঘাট, নদীয়া

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মূর্তি নির্মাণ তহবিলে চাঁদাদাতাদের তালিকা

	নাম	ঠিকানা	টাকা
1.	শ্রীশ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা-19	100·00
2.	,, দিলীপকুমার ঘোষ	সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9	10·00
3.	,, অর্ধেন্দু চক্রবর্তী	সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9	10·00
4.	,, দীপ্তি পাল	সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9	10·00
5.	,, সরোজকুমার মজুমদার	সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9	10·00
6.	,, পঙ্কজনারায়ণ রায়	সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9	10·00
7.	,, পরেশনাথ মুখোপাধ্যায়	সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9	10·00
8.	,, সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9	10·00
9.	,, অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9	10·00
10.	,, সুবিমল সেন	সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9	10·00
11.	,, দিলীপকুমার ভট্টাচার্য	সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9	10·00
12.	,, রঙ্গলাল ভট্টাচার্য	সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9	10·00
13.	,, স্নেহলতা বিশ্বাস	সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9	10·00
14.	,, ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত	সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9	10·00
15.	,, মোহনলাল চট্টোপাধ্যায়	সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9	5·00
16.	,, প্রতাপ ভট্টাচার্য	সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9	5·00
17.	,, নলিনীমোহন ঘোষ	সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9	5·00
18.	,, পার্থসারথি ভট্টাচার্য	সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9	5·00
19.	,, অসীমকুমার সেনগুপ্ত	সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9	5·00

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006 থেকে প্রকাশিত
এবং গুপ্তপ্রেশ, 37/7, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-700 009 হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

আবেদন

1948 সাল থেকে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা বিষয়ে পরিকল্পিত ধ্যান ধারণা পরিষদ পালন করে আসছে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রকাশনের মাধ্যমে। ইতিমধ্যে পরিষদ কিছু অমূল্য রচনা বাংলাভাষায় প্রকাশ করেছে। বর্তমান পত্রিকা প্রকাশনা ছাড়াও পরিষদ বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতার বিকাশ ঘটে। গ্রাম বাংলার পল্লীতে, আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে ও শহরের বস্তিতে, যেখানে বেশীর ভাগ মানুষ জ্ঞানের আলো থেকে এখনও বঞ্চিত, তাদের কাছে বিজ্ঞানের মঙ্গলময় রূপ তুলে ধরতে পরিষদ বদ্ধপরিকর। এইসব বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মসূচীর রূপায়নে অর্থের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অথচ পরিষদের দারুণ অর্থাভাব। তাই পরিষদ সরকার, বেসরকারী সংস্থা, ব্যবসায়ী ও সহৃদয় ব্যক্তির কাছে অর্থসাহায্যের আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছে। সাধারণ মানুষের জন্য তৈরী আচার্য বসু পরিষদ যে কোনও সামান্য দানও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করে অবহেলিত মানুষের স্বার্থে ব্যয় করবে। এই প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য যে পরিষদে প্রদত্ত সর্বপ্রকার দান আয়করমুক্ত।

কর্মসূচী

1. সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা সৃষ্টি করা এবং বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তোলা।
2. 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকাকে সাধারণের নিকট আরও আকর্ষণীয় করে তোলা।
3. পরিষদের মাধ্যমে গ্রামবাংলার বিজ্ঞান ক্লাবগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা এবং তাদের বিজ্ঞান ভিত্তিক জনহিতকর কাজে উৎসাহিত করা।
4. প্রতি বছরে পশ্চিম বাংলায় অন্ততঃ একবার বিজ্ঞান সম্মেলনের ব্যবস্থা করা।
5. গ্রামবাংলার বিভিন্ন মেলায় বিজ্ঞান ক্লাবগুলিকে নিয়ে পোস্টার প্রদর্শনী বিজ্ঞানভিত্তিক সিনেমা, আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞান, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করা।
6. বছরের শেষে বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা।
7. হাতে-কলমে কারীগরী বিদ্যা শিখিয়ে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রী ও নাগরিকদের স্বনির্ভরশীল করা। ব্যয়ভার বহনের জন্য সামান্য অর্থের বিনিময়ে টি ভি টেপরেকর্ডার, রেকর্ড-প্লেয়ার, ট্রানজিস্টার এমারজেন্সি বৈদ্যুতিক আলো, ফটোগ্রাফী বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া।
8. মাটি পরীক্ষার কাজে শিক্ষা দিয়ে গ্রামের বিজ্ঞান ক্লাবগুলিকে সাধারণ চাষীদের সাহায্য করতে উৎসাহিত করা।
9. সাধারণ মানুষের জন্য বিজ্ঞান প্রবন্ধ থেকে মৌলিক গবেষণাপত্র পর্যন্ত বাংলা ভাষায় প্রকাশ এবং জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বই ও বিজ্ঞান সাধক চরিতমালা প্রকাশ।
10. যোগব্যায়াম ও তার গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন।
11. পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারটি সুসমৃদ্ধ করে গড়ে তোলা।
12. পরিষদ ভবনে 'বিজ্ঞান সংগ্রহশালা' স্থাপন করা।
13. নির্বিচারে যথেচ্ছ গাছপালা ও বনজঙ্গল ধ্বংসের ফলে পরিবেশ দূষণ ও আবহাওয়ার মারাত্মক পরিবর্তনের ভয়াবহতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সজাগ করা।
14. নির্বিচারে বন্যপ্রাণী ধ্বংসের দরুণ বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যের বিঘ্ন ঘটার বিপদ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা।
15. যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করা
16. শহর ও গ্রামের প্রতিটি স্কুল, কলেজ ও গ্রন্থাগারে পরিষদের মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার গ্রাহকীকরণের মাধ্যমে পরিষদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচার।

সুকুমার গুপ্ত
কর্মসচিব

MONTHLY JOURNAL JNAN-O-BIJNAN Regd. No. WB/NC-210 October 1984

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—শৈলী, কলিকাতা—54 মূল্য—2.50